

আধুনিক ধরণের রুচিসম্মত ও কারুকার্যময় নানা প্রকার চায়ের
সরঞ্জাম, ভিনার সেট, কাপ, ডিস, প্রভৃতি ক্রয় করিবার সমস্ত বেসল
পট্টারীর তৈয়ারী অব্যাহিই ক্রয় করিবেন।

ইহা ভারতের পক্ষে প্রকৃতই পৌরবের বিষয় যে, বেসল পট্টারী
বর্ধমান যে সকল অব্যাহি প্রস্তুত করিতেছে, উহা তুলনায়, কি
কারুশিল্পে কি গঠনবৈচিত্র্য বা সৌন্দর্যে, পৃথিবীর যে কোনও
দেশের তৈয়ারী অব্যাহির সমকক্ষ।

বেসল পট্টারীজ লিমিটেড

৪৫ নং টেংরা রোড, কলিকাতা।

সোল সেলিং এজেন্ট : এলায়েড ডিস্ট্রিবিউটর্স এন্ড কোঃ ২২, আবোর্ন গেট,

কলিকাতা।

প্রকাশিত হল

নগেন দত্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ

হে মহানগর

যন্ত্রাঙ্গল এক নাগরিক জীবনের মানস-যন্ত্রণার
উন্মোচন

বোর্ড বীণাই

দাম দেড় টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :

মন্দির কার্যালয়

৩২, আগার সাহু লার রোড,

কলিকাতা-৯

উভয় বাংলার বস্ত্রশিল্প

বিজয়-বৈজয়ন্তী বাহী

মোহিনী মিলস লিমিটেড

(স্থাপিত ১৯০৮)

১ নং মিঃ

কুষ্টিয়া (পূর্ব বাংলা)

২ নং মিঃ

বেলঘড়িয়া (পশ্চিম বাংলা)

ম্যানেজিং এজেন্টস

চক্রবর্তী সঙ্গ ও কোং

২২, ক্যানিং ইট, কলিকাতা।

বৈশাখ—১৩৬৪

— সূচীপত্র —

একবিংশ বর্ষ— প্রথম সংখ্যা

১। স্মৃতি-কথা—ঔকাসিহাস রায়	১	১০। নীল অঙ্ককার—ঔপ্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩০
২। শিশু-প্রাণ বহীঃপ্রাণ—ঔনিবারণচন্দ্র বিশ্বাস	২	১১। নিরুত্তর—ঔগমীঃকুমার গুপ্ত	৩১
৩। নির্বাচিত—ঔকৃত্যবৈ রায়	১২	১২। যেনই : হাবিরে গেছে—	
৪। কবনের ক্রমবিকাশ—ঔবিলস বে	১৪	ঔশিপ্রা খোশ	৩২
৫। রশ্মি-কল্প—ঔপ্রবন্ধকুমার মেন	২১	১৩। শিরসঃকার নীতি ও তারতম্যের শ্রমিক—	
৬। তারতম্য নোটক—		ঔপ্রবোধচন্দ্র হস্ত	৩৩
২৪। নবর কাশ্মীরী নোটক—		১৪। আর্থিক প্রসঙ্গ—	
ঔমতিলাল বারুয়া	২৪	ঔশ্রবৎপ্রদায় তট্টাচার্য	৩৬
আধুনিক গল্প-কথা নোটক—		১৫। আত্মদানের সবুজ সপ্ন—ঔ	৪০
ঔ জি. ডি. ব্যাস—	২৬	১৬। অমায়িক ভূমি ডাক বিলে গো দেই কণে	
আধুনিক উর্দু নোটক—ঔসম্মান গুপ্ত	২৭	ঔপ্রতিভা চট্টোপাধ্যায়	৪১
আধুনিক উর্দু নোটক—ঔসম্মান গুপ্ত	২৮	১৭। বহীঃ স্মৃতি উৎস সঙ্কলনে—	
ঔকাসিহাস রায়	২৮	ঔঅবিল বসুপাধ্যায়	৪২
৭। জ্বর : প্রেম : পুণ্ড্রী—		১৮। গাহো—ঔঅবিল বসু	৪২
ঔসিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়	২৯	১৯। বড়ি—ঔঅবিল বসু	৪৩
৮। তারতম্য নোটক—ঔসম্মান গুপ্ত	২৯	২০। অমায়িক—ঔঅবিল চট্টোপাধ্যায়	৪৪
৯। নব বিহঙ্গী—ঔপ্রবোধচন্দ্র তট্টাচার্য	৩০	২১। কালের বাজা—সম্পাদক	৪৫

‘মন্দির’র নিয়মাবলী

১। মন্দির'র বঙ্গের বৈশাখ মাসের আদিত।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা—৬০

” অর্ধ পৃষ্ঠা—৩০

” সিক পৃষ্ঠা—২০

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার

গতদ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের বঙ্গ বেঙ্গল সত্ত্বও কোন বিজ্ঞাপনের
রকম নষ্ট হ'লে আমরা তদন্ত দায়ী নই। কাজ শেষ
হবার পর বঙ্গ সত্ত্বের সত্ত্ব রকম ফেরৎ নেবেন।

প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, টোকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি
নিম্ন টিকানায় পাঠাবেন।

ম্যানেজার—মন্দির

৩২ আপার মাছুলা রোড, কলিকাতা-২

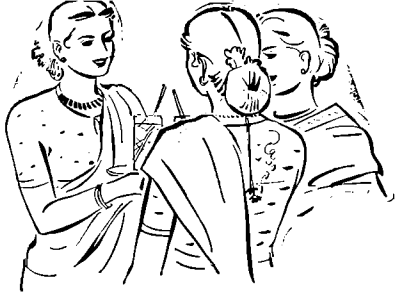
ফোন ১-৩৪-২৬৬০

২। প্রত্যেক সংখ্যার বামে আট আনা। বাবিক
সভাক সাড়ে ছয় টাকা; বাবিক তিন টাকা চার
আনা। বঙ্গের দুইবার প্রত্যেক সংখ্যা যাবে, বৈশাখ
বা কাশিক। অল্প কোন সংখ্যে প্রত্যেক সংখ্যে
বৈশাখ বা কাশিক থেকে বঙ্গের মুদ্রা হবে। টিকানা
পরিবর্তন হলে সময়ে জানাবেন। পত্র সেবাবার
সময় প্রত্যেক নবর দেবেন। ‘মন্দির’ প্রত্যেক
মাসের শেষ মাসেই প্রকাশিত হয়। নবর মত
কাগজ না পেলে ডাকঘরের বিপোর্ট সহ প্রত্যেক নবর
উল্লেখ করে আমাদের জানাবেন।

লেখকদের প্রতি

লেখকদের নতুন বাসান ব্যবহার করবেন। মকল
হবে বঙ্গনা পাঠাবেন। ডাকটিকিট না দেওয়া
থাকলে অনমনোহিত বঙ্গনা নষ্ট করা হয়। কবিতা
ফেরৎ পাঠান ছয় না।

প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের মত সম্পাদক
দায়ী নহেন। নাম ও টিকানা না দেওয়া থাকলে
কোন প্রবন্ধই প্রকাশ করা হয় না।



coolness... a pastime tale...

Sipping of Iced drinks & taking Ice Cream no doubt gives temporary respite from the terrible heat. But, all discerning people know that the only way to get real relief of the sweltering heat is to install an **INDIA ELECTRIC Fan**. They are famous for their Quality, Workmanship & performance for over 25 years.



The famous family of

India Electric
fans

SPECIALITIES.

- Low Current Consumption.
- Smooth & Carefree Service.
- High Class finish
- Large Air displacement
- Rigorous test of each component part before assemblage.

- INDIA & ROHTAS—D. C. Ceiling Fans
- BEHALA, BHARAT & RANJIT—A. C. Ceiling Fans
- TARA—A. C. or D. C. Table Fan.
- CAJIN FANS
- A. C. or D. C.

PEDESTAL FANS—
A. C. or D. C.

Manufactured by :—

The India Electric Works Ltd.

Diamond Harbour Road, Behala, Calcutta—34

জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৪	— সূচীপত্র —	একবিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা
১। স্বস্তি কথা—ঐতিহাসিক বার	৬১	১২। আদিক প্রসঙ্গ—ঐশ্বর্যপ্রসঙ্গ তত্ত্বাচার্য ১০২
২। বহিঃবহা—ঐগোত্রকুলার মিত্র	৭১	১৩। ভারতীয় নাটক—
৩। জীবনের ক্রমবিকাশ—ঐদিল্ল বৈ	৭৮	আধুনিক বেলেগ নাটক—
৪। দুটি এল—কর্ণ শর্মা	৮৭	ঐ এ, রামকৃষ্ণ রাও ১০৪
৫। দায়া নিষ্ঠান—পরিমল চক্রবর্তী	৯২	আধুনিক পাঞ্জাবী নাটক—
৬। স্বর্ণ-সন্ধ্যা-দাখ—ঐশ্বর্য গুপ্ত	৯২	ঐশ্বর্যবচন সিং তালিব ১০৬
৭। আবহমান—বিক্রম হাল	১০	১৪। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার বাচন পদ্ধতি
৮। একটি ভীত প্রার্থনা—স্বপ্নাশ ভট্টাচার্য	১০	ও প্রবচনের মাসুজ—
৯। আমরা উই প্রবেশের দৈর্ঘ্যের—		ঐ এন, সত্যনাথায়ণ এম, পি ১০৮
অটোপ্রচ'২ যোগোপাধ্যায়	১৪	১৫। পুস্তক পরিচয়— ১১৩
১০। প্রথম বর্ষায়—দ্বিজ্ঞান যোগোপাধ্যায়	১৪	১৬। চিত্র—নাটক—অসলা—রমেন চৌধুরী ১১৬
১১। ছেলে সন্তীর নয়—আশা যোগোপাধ্যায়	১৬	১৭। কালের বাত্মা—সম্পাদকীয় ১১৯

‘মন্দিরা’র নিয়মাবলী

১। মন্দিরার বৎসর বৈশাখ হ'তে আরম্ভ।

২। প্রত্যেক সংখ্যায় ছান আট আনা। বার্ষিক সভার সাথে ছয় টাকা; গাভাসিক তিন টাকা চার আনা। বৎসরে দুইবার গ্রাহক হস্তাক্ষর, বৈশাখে বা কাঠিকে। অত্র কোন সময় গ্রাহক হলে বৈশাখ বা কাঠিক থেকে বৎসর শুরু হবে। টিকানা পরিবর্তন হলে সময়ে জানাবেন। পত্র লেখবার সময় গ্রাহক নম্বর দেখেন। ‘মন্দিরা’ প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। সময় নত কাগজ না পেলে ডাকবহের বিপাক সহ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে আনকের জানাবেন।

লেখকদের প্রতি

যদানন্তর নতুন বারান পত্রচার করবেন। মঙ্গল রোষে রচনা পাঠাবেন। ডাকটিকিট না দেওয়া থাকলে অমনোনীত রচনা নষ্ট করা হয়। কবিতা চেহে পাঠান হয় না।

প্রকাশিত প্রবন্ধটির মতামতের অত্র সম্পাদক দায়ী নহেন। নান ও টিকানা না দেওয়া থাকলে কোন প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হয় না।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ পূর্ব পৃষ্ঠা—৬০

” অর্থ পৃষ্ঠা—৩৫

” সিকি পৃষ্ঠা—২০

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার
পত্রচারী জ্ঞাতব্য।

আমাদের বহু নেওড়া সন্তোও কোন বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হ'লে আমরা তত্কাল দায়ী নই। কাজ শেষ হবার পর যত সন্তর সম্বয় ব্লক কেহও নেবেন।

প্রবন্ধটি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিয় টিকানায় পাঠাবেন।

ম্যানেজার—মন্দিরা

৩২ আগার সাহুল্লাব রোড, কলিকাতা-৯

ফোন :—৩৫-২৬৬০

আষাঢ়—১৩৬০	— সূচীপত্র —	একবিংশ বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা।
১। ভারতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রভাব— ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১২৪	৮। বহিঃ-বহা—ঐগজেন্সকুমার মিত্র ১৬০
২। শিকার হেরফের—মণেন দত্ত	১২৬	৯। পিতৃহি—সুভাষ মজুমদার ১৬২
৩। জীবনের ক্রমবিকাশ—ঐশ্বিন্দ্র দে	১৩০	১০। উজ্জ্বল সর্পীতের কথা— ঐশ্বিন্দ্র উমা দে ১৬৪
৪। কাছ কাছান—(ত্রি)	১৩২	১১। মহাদানীশী গেরট—বনি নাপতি ১৬২
৫। স্মৃতি কথা—ঐশ্বিন্দ্র দে	১৪১	১২। আর্থিক প্রসঙ্গ— ঐশ্বিন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য ১৬৫
৬। ভারতীয় দূতাব কথা—ঐশ্বিন্দ্র দে	১৪২	১৩। পুস্তক পরিচয়— ১৬৬
৭। হেড মাস্টার—ঐশ্বিন্দ্র দে এম. এ. ডি. বিলু	১৪৪	১৪। কালের যাত্রা—সম্পাদক ১৬৭

ভারতে সর্বাধিক বিক্রায়ের গৌরব অর্জন করছে



সুলেখা

ফাউন্টেনপেন কালি

সবদময় ও সবল বহুতে এবং শান্তপ্রাণন চাক্ষুসিং
হইতে প্রীতপ্রাণন রাচপুতানা পবিত্র যে কোন স্থানে কলম
হইতে সমভাবে কালি নির্গত হইয়া আসে—সলভেটে কলম
নিরোপক উপাধান আছে বলিয়া এমন কি হিমাক্তেও
কালি সম্পূর্ণ তরল থাকে।

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

THE BHARAT LINE LIMITED

(Incorporated in Bhavnagar State. The Liability of the members is Limited.)

NATIONAL SHIPPING COMPANY

SERVICES OPERATED

THE INDIAN COASTAL TRADE
PAKISTAN/INDIA-BURMA-CEYLON TRADE
CEYLON/INDIA TRADE
BURMA/INDIA TRADE
BURMA/CEYLON TRADE
INDIA-PAKISTAN-BURMA CEYLON/PERSIAN GULF TRADE

OTHER FIXTURES FOR OTHER PORTS ACCORDING
TO DEMAND

For Rates of Freights, Sailings, etc., apply to the Company's Bombay Office at :
BHARAT HOUSE, 104, APOLLO STREET, FORT, BOMBAY 1

Telephone Nos. 30891, 30892 & 30893

FREIGHT BROKERS

PITAMBER LALJEE & SONS
BHARAT HOUSE, 104, APOLLO STREET, FORT, BOMBAY 1

Telephone Nos. 35946, 35030

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে অসুখ্য কোষের সম্বন্ধে শরীর
ও মস্তিষ্ক গঠিত হয়, রক্ত প্রবাহের
মাধ্যমেই তারা পুষ্টিলাভ করে; তাই
রক্তকে প্রাণরক্ষার প্রধান উপাদান
বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত
হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতই বিবিধ
কঠিন ব্যাধির আক্রমণে শরীর দুর্বল
হয় বলে ওঠে।



সারিষাদি সালসা প্রায় অর্ধ শতাব্দী
যাবৎ অগণতের সর্বত্র সর্বশ্রেষ্ঠ
রক্ত শোধক মহৌষধরূপে প্রসিদ্ধ।
সারিষাদি সালসা সেবনে নিয়মিত
কর্তৃ পরিষ্কার হয়, খেপে, পাঁচড়া,
ছোট কব্জ, একধিমা প্রভৃতি সর্ববিধ
চর্মরোগ, বাত ও রক্ত-দীবাণু
সংক্রমণজনিত সমস্ত কঠিন রোগ
সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, নিজায়েয় ত্রিমা
স্বাভাবিক হয়, মুখা রুচি পায় এবং
শরীরে প্রকৃষ্ট বিত্ত্ব নৃতন রক্ত
সঞ্চারিত হয়।

সারিষাদি সালসা

ওষধশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক ঔষধোৎসর্গ



অধ্যক্ষ চৌদাণেপেজ বোম, এম.এ.
ম্যাকালিস্টনগারী, এম.বি.এস (মিঃ),
এম.বি.এস (ম্যাকালিস্টনগারী), জাপানপুর
কলেজের ম্যাকালিস্টনগারী ডুটুল
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
(এম.বি. (কলি)), ম্যাকালিস্টনগারী।
৩৬ নং গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

সাধনা ওষধখালয় ঢাকা

শাখা ও একমুখী-দুখী-বর্ষিক

জীবন—১৩৬৫

—সূচীপত্র—

একবিংশ বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা

১। স্বত্বকথা—ক্রীড়াসিঙ্গ দাস	১১০	১০। বিটপী-বিবিদ্য—ক্রীড়ার ৬৩	২০১
২। বালাপেশের শিক্ষা সমস্তের একত্রিক— ক্রীড়ার বিচারে রত	২০২	১১। শব্দ এসেছে—ক্রীড়ার দ্বারা	২০২
৩। মিস্টার স'হিত্যিকের ডায়েরী— ক্রীড়ার দ্বারা	২০৩	১২। আর কতকাল—ক্রীড়ার দ্বারা	২০৩
৪। কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস— ক্রীড়ার দ্বারা	২০৪	১৩। একটু বিবরণ—ক্রীড়ার দ্বারা	২০৪
৫। দেব নগর—ক্রীড়ার দ্বারা	২০৫	১৪। পালক কামিনী—ক্রীড়ার দ্বারা	২০৫
৬। কেরান্দিয়াব কৈবল্যপ্রাপ্তি—ক্রীড়ার দ্বারা	২০৬	১৫। দ্বারা—ক্রীড়ার দ্বারা	২০৬
৭। মেস—ক্রীড়ার দ্বারা	২০৭	১৬। নীল বোপ—ক্রীড়ার দ্বারা	২০৭
৮। ভারতীয় মুদ্রার কথা—ক্রীড়ার দ্বারা	২০৮	১৭। মানবের ইতিহাস ও বিবর্তন— ক্রীড়ার দ্বারা	২০৮
৯। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ—ক্রীড়ার দ্বারা	২০৯	১৮। আরও প্রসঙ্গ—ক্রীড়ার দ্বারা	২০৯
		১৯। জীবনের ক্রমবিকাশ—ক্রীড়ার দ্বারা	২১০
		২০। ছবি-মাটক-কলস—ক্রীড়ার দ্বারা	২১০
		২১। কালের দ্বারা—	২১১

প্রকাশিত হল

নগেন দত্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ

হে মহানগর

যন্ত্রগুলি এক নাগরিক জীবনের মানস-স্বপ্নের
উন্মোচন

বোর্ড-বীথি

দাম দেড় টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

মন্দির কার্যালয়

৩২, আপার সার্কুলার রোড,

কলিকাতা-১

উভয় বাংলার বস্ত্রশিল্প

বিজয়-বজ্রস্বতীবাঠী

মোহিতী মিলস লিমিটেড

(স্থাপিত ১৯০৮)

১ নং মিল

কুষ্টিয়া (পূর্ব বাংলা)

২ নং মিল

বেলঘরিয়া (পশ্চিম বাংলা)

ম্যানেজিং এজেন্টস

চক্রবর্তী সন এণ্ড কোং

২২, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা।

আধুনিক ধরণের রুচিসম্মত ও কারুকার্যময় নানাপ্রকার চায়ের
সরঞ্জাম, ডিনার সেট, কাপ, ডিস, প্রভৃতি ক্রয় করিবার সময় বেঙ্গল
পটারীর তৈয়ারী ড্রাবাদিই ক্রয় করিবেন।

ইহা ভারতের পক্ষে প্রকৃতই গৌরবের বিষয় যে, বেঙ্গল পটারী
বর্তমানে যে সকল ড্রাবাদি প্রস্তুত করিতেছে, উহা তুলনায়, কি
কারুশিল্পে কি গঠনোচ্চাত্তো বা সৌন্দর্য্যে, পৃথিবীর যে কোনও
দেশের তৈয়ারী ড্রাবাদির সমকক্ষ।

বেঙ্গল পটারীজ লিমিটেড

৪৫ নং টেংরা রোড, কলিকাতা।

সোল মেলিং এজেন্ট : এলায়েড ডিপ্লোমিউটস এণ্ড কোঃ ২২, আনবার্ন রোড,
কলিকাতা।

সকপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক
শ্রীঅবনীনাথ রায়ের
নূতন উপন্যাস

আমরা দু'জনা

দুগ্ধস্রব বসেন “ভীবনকে তার মহলরূপে হুটিয়েছেন
শেষক, তাই মাথারপে ভিতর বা অশাশ্বত, বলার মতো
বা অনির্বচনীয়, তার স্পর্শে কপম্পন হয়েছে বইটি।

মূল্য—৩, টাকা

প্রাপ্তিস্থান :—

জেনারেল বুক ষ্টেল

এ-৬৬, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

প্রকাশিত হল

নগেন দত্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ

হে মহানগর

যন্ত্রকটিল এক নাগরিক জীবনের মানস-যন্ত্রণার
উন্মোচন

বোর্ড বানাই

দাম দেড় টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

মন্দিরা কার্যালয়

৩২, আপার মাকুলার রোড,
কলিকাতা-৯

তারিখ—১৩৬৫	— সূচীপত্র —	একবিংশ বর্ষ—পঞ্চম সংখ্যা	
১। স্বত্বিকথা—ঐকালিদাস দায়	২০৫	৯। হাসপাতালের কেবিন—	
২। বহিঃবঙ্গা—ঐগভেজকুমার দিত্র	২০৬	ঐ অশোক মুখোপাধ্যায়	২০৪
৩। শিরের চেতনাবোধ—নগেন দত্ত	২০৭	১০। স্বর্ণা—প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়	২০৪
৪। অধুনিক তামিল সাহিত্যের ভূমিকা—		১১। দার্শনিক ঐতিহ্য—ঐরাগাঙ্গা চক্রবর্তী	২০৫
ঐ দুলালকান্তি মুখোপাধ্যায়	২১১	১২। এশিয়ায় মুক্তিকা সংঘে কৃষি-অর্থনীতিক্ষেত্রে	
৫। উচ্চ—ঐগকানন চট্টোপাধ্যায়	২১৪	বৈঠক—ঐ	২১০
৬। শিকার বিপ্লব—		১৩। জীবনের জন্মবিকাশ—ঐবিদল দে	২১২
ঐ বিনোদবিহারী হস্ত	২১১	১৪। বেকার—ঐনতী হিংস্রী বসু	২১৮
৭। তার দুহাব দিন—		১৫। আর্থিক প্রশ্ন—ঐশব্দপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৩০৩
ঐ প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	২১৩	১৬। পুস্তক-পরিচয়—	৩০৮
৮। জীবন মার্গ—ঐ সুবীর গুপ্ত	২১৩	১৭। কালের দ্বারা—সম্পাদকীয়	৩১০

‘মন্দির’র নিয়মাবলী

১। মন্দির'র বৎসর বৈশাখ হ'তে আরম্ভ।

২। প্রত্যেক সংখ্যার ছান আট আনা। বৈধিক সভাক সাড়ে ছয় টাকা; বার্ষিক তিন টাকা চার আনা। বৎসর দুইবার গ্রাহক হওয়া যায়, বৈশাখে বা কা্তিকে। অত্র কোন সময়ে গ্রাহক হলে বৈশাখ বা কা্তিক থেকে বৎসর শুরু হবে। ঠিকানা পরিবর্তন হলে সময়ে জানাবেন। পত্র দেখবার সময় গ্রাহক নথর দেখেন। ‘মন্দির’ প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। সময় মত কাগজ না পেলে ডাকঘরের হিঃপাঠ সহ গ্রাহক নথর উল্লেখ করে আমাঘেট জানাবেন।

লেখকদের প্রতি

ধ্যানসত্ত্ব মনু বানান যত্নসহ করবেন। মকল বেধে পড়না পাঠাবেন। ডাকটিকিট না দেওয়া থাকলে অমনোমত পড়না নষ্ট করা হয়। কবিতা কেবল পাঠান হয় না।

প্রকাশিত প্রবন্ধাবির নতুনতের লক্ষ সম্পাদক দায়ী নহেন। নাম ও ঠিকানা না দেওয়া থাকলে কোন প্রবন্ধাবি প্রকাশ করা হয় না।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা—৬০

” অর্ধ পৃষ্ঠা—৩৫

” সিকি পৃষ্ঠা—২০

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার

পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের ঘর নেওয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনের লক্ষ নষ্ট হ'লে আমরা তজ্জর দায়ী নই। কাজ শেষ হবার পর মত লক্ষর সত্ত্ব লক্ষ ফেরৎ নেবেন।

প্রবন্ধাবি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিয় ঠিকানায় পাঠাবেন।

মানোজ্ঞার—মন্দির

৩২ আপার নবুহলায় রোড, কলিকাতা-২

ফোন ১—৩৫-২৬০০



পুজার শ্রীতি অভিনন্দন

কেভেন্টার-মানেই
ভালো মাখন! এখন
থেকে সুবিধাজনক
• আউসের টিনেও
পাওয়া যাবে।



এভওয়ার্ড কেভেন্টার প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা • দার্কিলিং

লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীঅবনীনাথ রায়ের নূতন উপন্যাস আমরা দু'জনা

সুখ-স্বপ্ন বলেন "কোনকে তার সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গন
লেখক, তাই সাধারণের ভিতর বা অসাধারণ, বলার মধ্যে
বা অনির্বচনীয়, তার স্পর্শে অপূরণ হচ্ছে বইটি।

মূল্য—৩ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :-

জেনারেল বুক ষ্টল

এ-৬৬, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

প্রকাশিত হল

নগেন দত্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ

হে মহানগর

যন্ত্রাঙলি এক নাগরিক জীবনের মানস-যন্ত্রণার
উন্মোচন

রোড বীদাই

দাম দেড় টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

মন্দিরা কার্যালয়

৩২, আপার মার্কেট রোড,
কলিকাতা-৯

আখিন ও কাভিক—১৩৬৫	— সূচীপত্র —	একবিংশ বর্ষ—ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা	
১। পূজা—ঐশ্বর্যপ্রদায় দুঃখাপায়	৩১৫	১৬। মনোহারীণী—ঐশ্বর্যপ্রদায়	৩৮১
২। উষা-হস্ত—ঐশ্বর্যপ্রদায় দুঃখাপায়	৩১৭	১৭। কিছুই বলা যায়না—ঐশ্বর্যপ্রদায়	৩৮৪
৩। স্বামীম ভারতে সংকট দিকান্তে মন্ত্রণাবৎ— অশোক ভট্ট—ঐশ্বর্যপ্রদায় চৌধুরী	৩১৮	১৮। নাহুয়েত মাথা—ঐশ্বর্যপ্রদায় মিত্র	৩৮৬
৪। বিত্ত ভোগী—ঐশ্বর্যপ্রদায় চৌধুরী	৩১৯	১৯। উত্তর পুরুষ—ঐশ্বর্যপ্রদায় মিত্র	৩৮৮
৫। জ্যোতির্ময়ী গল্পোপাখ্যায়— ঐশ্বর্যপ্রদায় বাগল	৩২০	২০। পুত্র-কটক—ঐশ্বর্যপ্রদায় বাগল	৩৯০
৬। বৃন্দাবন বৈষ্ণব কবি—ঐশ্বর্যপ্রদায়	৩২১	২১। একটি স্তব্ধ—ঐশ্বর্যপ্রদায়	৩৯২
৭। ঐকান্ত ৪র্থ পর্ব—ঐশ্বর্যপ্রদায়	৩২২	২২। বৈষ্ণব—মোহন দত্ত	৩৯৪
৮। 'বিশ্বকোষ' কবিতার ভূমিকা— ঐশ্বর্যপ্রদায় চক্রবর্তী	৩২৩	২৩। দ্বৈত-মোহন দত্ত	৩৯৬
৯। জ্যোতির্ময়—ঐশ্বর্যপ্রদায়	৩২৪	২৪। দ্বৈত-মোহন দত্ত	৩৯৮
১০। একই স্বরে গীতা—বি. বিশ্বনাথ	৩২৫	২৫। দ্বৈত-মোহন দত্ত	৩৯৯
১১। অশ্বিন—ঐশ্বর্যপ্রদায় চৌধুরী	৩২৬	২৬। দ্বৈত-মোহন দত্ত	৪০০
১২। পৌরমেহন—ঐশ্বর্যপ্রদায় চক্রবর্তী	৩২৭	২৭। দ্বৈত-মোহন দত্ত	৪০১
১৩। রাতের আকাশ— ঐশ্বর্যপ্রদায় অধিকারী	৩২৮	২৮। দ্বৈত-মোহন দত্ত	৪০২
১৪। উষা-হস্ত—অশ্বিন ও কাভিক	৩২৯	২৯। দ্বৈত-মোহন দত্ত	৪০৩
১৫। উত্তর কাল—ঐশ্বর্যপ্রদায়	৩৩০	৩০। দ্বৈত-মোহন দত্ত	৪০৪

**কিউটা
টোন**

ওয়েদনার জল

**দাদ ও
কাউন্সেল
মলম**

**লিম
মলম**

থ্রাস ও পাচক জল

**ডোল ও কোং বরান গর
কলিকাতা-৩৫**

অগ্রহায়ণ—১৩৬৪	— সূচীপত্র —	একবিংশ বর্ষ—অষ্টম সংখ্যা	
১। গীতা ও বর্ণনাবলী—অধ্যক্ষ প্রিয়মা চৌধুরী	৪৪৪	১৪। ধরিতা—প্রিয়বিল চক্রবর্তী	৩৮৯
২। কাঁধে আর উৎসর্গ যাত্রা—প্রিয়গুপ্তী প্রসাদ	৪৪৮	১৫। বীপের সার্বভূতা—প্রিয়দীপ গুপ্ত	৪৮৯
৩। বর্ষ শেষের মাদুকরী—প্রিয়দীপ গুপ্ত	৪৫১	১৬। বোহিন্দু পাণ্ডেয়নাথ এবং মোহন প্রবন্ধ	
৪। বিবি—প্রিয়দীপ নাথ রায়	৪৫৮	—দেবদত্ত মুখোপাধ্যায়	৪৯০
৫। লাইক টাইম—প্রিয়প্রতিন চৌধুরী	৪৭০	১৭। সেপতা আতি—অনিলা রায়	৪৯২
৬। সুরেন কুমারী—প্রিয়প্রেম কুমার বসু	৪৭৪	১৮। গুপ্ত কবির কবি প্রতিভা ও জীবনবাহ	
৭। চীনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তনের ইতিহাস	৪৭৭	প্রিয়দীপ বসু	৪৯৩
৮। জীবনের ক্রমবিকাশ—প্রিয়মল দে	৪৮০	১৯। বহিঃস্থ—পদ্মেন্দ্রকুমার মিত্র	৪৯৭
৯। এ শুভ বালকবেলা—প্রিয়সত্যকান্তি বোম	৪৮৭	২০। কাঁচা ডিম—প্রিয়দেব রায়	৫০৫
১০। কুচুবিপানা—প্রিয়তাজ নাথ বাগচী	৪৮৭	২১। আর্থিক প্রদর্শন—প্রিয়দেব প্রসাদ শুভাচার্য	৫০৭
১১। আকাশের বৃষ্টি—প্রিয়দীপ চট্টোপাধ্যায়	৪৮৮	২২। পূর্ণ্য ভাষ্য বানেশ্বর—	
১২। বক্তব্য—প্রিয়প্রতাপ মাস্তি	৪৮৮	প্রিয়দীপেন্দ্র নাথ সিংহ রায়	৫১২
১৩। বৃষ্টির সুর—প্রিয়দীপেন্দ্র নাথ গুপ্ত	৪৮৮	২৩। পুস্তক পরিচয়	৫১৪
১৪। ভাস্কর্য বহু—প্রিয়দীপ বিদ্যাস	৪৮৯	২৪। কালের যাত্রা (সম্পাদকীয়)	৫১৬

‘মন্দির’র নিয়মাবলী

১। মন্দির'র বৎসর বৈশাখ হ'তে আরম্ভ।

২। প্রত্যেক সংখ্যার হাম আট আনা। বাৎসরিক সড়াক শাড়ে ছয় টাকা; বাৎসরিক তিন টাকা চার আনা। বৎসর দুইবার গ্রাহক হওয়া যায়, বৈশাখে বা কাটিকে। অল্প কোন সময়ে গ্রাহক হ'লে বৈশাখ বা কাটিক থেকে বৎসর শুরু হবে। ঠিকানা পরিবর্তন হলে সময়ে জানাবেন। পত্র লেখবার সময় গ্রাহক নম্বর দেখবেন। ‘মন্দির’ প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। সময় মত কপিল না পেলে ডাকঘরের বিপোর্ট ল'হ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে আমাদের জানান।

লেখকদের প্রতি

যথাসম্ভব নতুন বানান ব্যবহার করবেন। নকল রেখে রচনা পাঠাবেন। ডাকটিকিট না দেওয়া থাকলে অমনোনীত রচনা নষ্ট করা হয়। কবিতা কেবল পাঠান হয় না।

প্রকাশিত প্রবন্ধাদি মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। নাম ও ঠিকানা না দেওয়া থাকলে কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হয় না।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা—৬০

“ অর্ধ পৃষ্ঠা—৩৫

“ সিক পৃষ্ঠা—২০

কভার ৪৫/বিশেষ পৃষ্ঠার হার

পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের হস্ত নেওয়া সড়ক কোম বিজ্ঞাপন গ্রহণ নষ্ট হ'লে আমরা তদন্ত করি নাই। কার শেখ হবার পর দত্ত সময় সম্ভব রকম ফেরৎ দেবেন।

প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

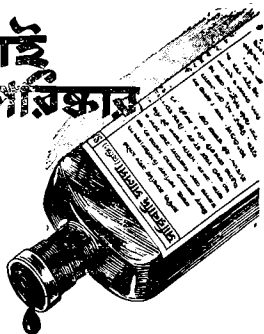
ম্যানেজার—মন্দির

৩২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-২

ফোন :—৩৫-২৬৬০

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে অসুখ কোষের সহায়ের শরীর
ও বিভিন্ন গঠিত হয়, রক্ত প্রবাহের
মাধ্যমেই তারা পুষ্টিলাভ করে; তাই
রক্তকে প্রশ্রয়কার প্রধান উপাদান
বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত
হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতই বিবিধ
কঠিন ব্যাধির আক্রমণে শরীর দুর্বল
হয়ে ওঠে।



সারিবাতি সালসা প্রায় অর্ধ শতাব্দী
যাবত ধর্মতের সর্বত্র সর্বশ্রেষ্ঠ
রক্ত শোধক মহৌষধরূপে প্রসিদ্ধ।
সারিবাতি সালসা সেবনে নিয়মিত
কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, খোস, পাঁচড়া,
ঠুট ক্ষত, একছিয়া প্রভৃতি সর্ববিধ
চর্মরোগ, বাত ও রক্তে দোষ
সাক্ষমগলনিত সহজ কঠিন যোগ
সম্পূর্ণ নিরানর হয়, লিভারের ক্রিয়া
স্বাভাবিক হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় এবং
শরীরে প্রচুর বিতর্ক নৃতন রক্ত
সঞ্চারিত হয়।

সারিবাতি সালসা

ওর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক ঔষধ



অসুখ ভীষোৎপাদক যোষ, এম-এ,
আল্ফ্রেড বসারী, এক-সি-এস (নতুন),
এম-সি-এস (আগেবিকা), ভাগলপুর
কলেজের রক্তবিশেষজ্ঞ ডক্টর
অধ্যাপক।

**সাধনা
ওষধালয়
ঢাকা**

পাণ্ডা ও কলকৌণিকার চর্চারে

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
(এম-বি (কলিঃ), আল্ফ্রেড-আচার্য।
ওলন্দা সোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

পৌষ—১৩৬৫	— সূচীপত্র —	একবিংশ বর্ষ—নবম সংখ্যা
১। জীবনের ক্রমবিকাশ—ঐশ্বর্য দে	৫১৯	১০। ঐতিরীতি—ঐশ্বর্য দে
২। পশ্চিম বাংলায় আবিষ্কার —ঐশ্বর্য দে	৫২২	১১। দ্বন্দ্ব—ঐশ্বর্য দে
৩। কলিন-কলিকার তিন বংশ —ঐশ্বর্য দে	৫২৭	১২। অতীত—ঐশ্বর্য দে
৪। শিক্ষা ও সমাজ—ঐশ্বর্য দে	৫৩২	১৩। পৃথিবী ভেদে মনে—ঐশ্বর্য দে
৫। কালীঘাটের কালী —ঐশ্বর্য দে	৫৩৫	১৪। মনোমোহন—ঐশ্বর্য দে
৬। শিক্ষা—ঐশ্বর্য দে	৫৩৬	১৫। কালপ পত্র—ঐশ্বর্য দে
৭। বিকল্প—ঐশ্বর্য দে	৫৩৭	১৬। তিনটি ধর্ম চর্চাই—ঐশ্বর্য দে
৮। স্বকীয় পন—ঐশ্বর্য দে	৫৪০	১৭। পত্র বৈশিষ্ট্য—ঐশ্বর্য দে
৯। বহিঃস্থ—ঐশ্বর্য দে	৫৪৩	১৮। আর্থিক প্রশ্ন—ঐশ্বর্য দে
		১৯। আরও অজ্ঞাত অঙ্গ—ঐশ্বর্য দে
		২০। পুস্তক পরিচয়
		২১। কালের ব্যাঘ্র (সম্পাদকীয়)

‘মন্দির’র নিয়মাবলী

- ১। মন্দির বৎসর বৈশাখ হতে আরম্ভ।
- ২। প্রত্যেক সংখ্যার দাম আট আনা। বাৎসরিক সাড়ে ছয় টাকা।; বাৎসরিক তিন টাকা চার আনা। বৎসরে দুইবার গ্রাহক হওয়া যায়, বৈশাখে বা কাটিকে। অত্র কোন সময়ে গ্রাহক হলে বৈশাখ বা কাটিক থেকে বৎসর শুরু হবে। টিকানা পরিবর্তন হলে সময়ে জানাবেন পত্র লেখবার সময় গ্রাহক নথর যাবেন। ‘মন্দির’ প্রত্যেক মাসের প্রথম দশত্রে প্রকাশিত হয়। সময় মত কাগজ না পেলে ডাকঘরের দ্বিগুণ মূল্য গ্রাহক নথর উল্লেখ করে আদায়ের জানাবেন।

লেখকদের প্রতি

যথাসম্ভব নতুন বাতান ব্যবহার করবেন। সকল যথেষ্ট রচনা পাঠাবেন। ভাটকটিকি না দেওয়া থাকলে অমনোনীত রচনা নষ্ট করা হয়। কবিতা কেবল পাঠান হয় না।

প্রকাশিত প্রবন্ধটির মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। নাম ও টিকানা না দেওয়া থাকলে কোন প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হয় না।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ পূর্ব পৃষ্ঠা—৬০

“ অর্থ পৃষ্ঠা—৩৫

“ সিক পৃষ্ঠা—২০

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার

পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের বই নেওয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনের এক নষ্ট হলে আমরা তৎক্ষণাতঃ নষ্ট। কাজ শেষ হবার পর মত সময় সম্ভব রকম ফেরত দেবেন।

প্রবন্ধটি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি মিশ্র টিকানায় পাঠাবেন।

ম্যানেজার—মন্দির

৩২ আগার সার্বভৌম রোড, কলিকাতা-৯

ফোন :—৩৫-২৬৬০

THE BHARAT LINE LIMITED

(Incorporated in Bhavnagar State. The Liability of the members is Limited.)

NATIONAL SHIPPING COMPANY

SERVICES OPERATED

THE INDIAN COASTAL TRADE
PAKISTAN/INDIA-BURMA-CEYLON TRADE
CEYLON/INDIA TRADE
BURMA/INDIA TRADE
BURMA/CEYLON TRADE
INDIA-PAKISTAN-BURMA CEYLON/PERSIAN GULF TRADE

OTHER FIXTURES FOR OTHER PORTS ACCORDING
TO DEMAND

For Rates of Freights, Sailings, etc., apply to the Company's Bombay Office at :
BHARAT HOUSE, 104, APOLLO STREET, FORT, BOMBAY 1

Telephone Nos. 30591, 30892 & 30893

FREIGHT BROKERS

PITAMBER LALJEE & SONS

BHARAT HOUSE, 104, APOLLO STREET, FORT, BOMBAY 1

Telephone Nos. 38946, 38030

মাঘ—১৩৬৫

— সূচীপত্র —

একবিংশ বর্ষ—দশম সংখ্যা

১। শ্রুতিকথা—ঐকালিধাম রায়	১৬০	২। জীবন সৌন্দর্য (কাকা দাংব কালেক্টর)	
২। হে অজিত কথা কও—ঐবর্ণন কুমার সেন	১৬৮	—অনুশাসক ঐপ্রিয়ব্রজ সেন	১১০
৩। কুলীন-কলিকায় তিন বৎসর —ঐনাথায়ণ চৌধুরী	১৭৭	১০। আন্তর্জাতিক চর শিউলী ব্রহ্মী —ঐদত্তী কৃষ্ণ সেন	১২২
৪। বাগানো ফুল (একাঙ্কিকা) —ঐঅন্নদা ঘোষন বাগচী	১৮২	১১। প্রবন্ধ, ও বসন্তচন্দ্র ও সেই নিবন্ধে অন্য চৌধুরী—শিপ্রা ঘোষ	১৩২
৫। জীবনের ক্রমবিকাশ—ঐবিমল ঘোষ	১৯১	১২। আর্থিক প্রশ্ন—ঐনবদ্ব প্রদত্ত ভট্টাচার্য	১৩৫
৬। নারী ও বাহি—ঐপ্রব্রজেন্দ্র বাসুগুপ্ত	১৯৪	১৩। পুস্তক পরিচয়	১৩৭
৭। লেখক নিচয়—ঐমাধব রায়	১৯৫	১৪। কালের যাত্রা (সম্পাদকীয়)	১৩৯
৮। বহিঃস্থ—ঐজলেন্দ্রকুমার মিত্র	১৯৭		

‘মন্দিরা’র নিয়মাবলী

১। মন্দিরার বৎসর বৈশাখ মাসে আরম্ভ ।

২। প্রত্যেক সংখ্যার বাম আট আনা। বার্ষিক সভাক শাড়ে ছয় টাকা। বার্ষিক তিন টাকা চার আনা। বৎসরে দুইবার গ্রাহক হওয়া যায়, বৈশাখে বা কাটিকে। অন্য কোন সময়ে গ্রাহক হলে বৈশাখ বা কাটিক থেকে বৎসর শুরু হবে। ঠিকানা পরিবর্তন হলে সময়ে জানাবেন। পত্র লেখবার সময় গ্রাহক নম্বর দেখেন। ‘মন্দিরা’ প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। সময় মত কাগজ না পেলে ডাকঘরের বিপোর্ট সহ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে আমাঘের জানাবেন।

লেখকদের প্রতি

গদ্যপদ্য নতুন বানান ব্যবহার করবেন। নকল বেখে বচনা পাঠাবেন। ডাকটিকিট না দেওয়া থাকলে অননোনীত বচনা নষ্ট করা হয়। কবিতা কেবল পাঠান হয় না।

প্রকাশিত প্রবন্ধাদির মতামতের লক্ষ্য সম্পাদক হারী করেন। নাম ও ঠিকানা না দেওয়া থাকলে কোন প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয় না।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা—৬০/-

" অর্ধ পৃষ্ঠা—৩৫/-

" সিকি পৃষ্ঠা—২০/-

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার

পত্রচারে জ্ঞাতব্য।

আমাদের দর নেওয়া নতুন কোন বিজ্ঞাপনের দ্রক নষ্ট হ'লে আমরা তদন্ত করি নাই। কাজ শেষ হবার পর মত সহর সম্ভব দ্রক ফেরৎ নেবেন।

প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

ম্যানেজার—মন্দিরা

৩২ আগার বাবুলসার রোড, কলিকাতা-২

ফোন :—৩৫-২৬৬১

THE BHARAT LINE LIMITED

(Incorporated in Bhavnagar State. The Liability of the members is Limited.)

NATIONAL SHIPPING COMPANY

SERVICES OPERATED

THE INDIAN COASTAL TRADE
PAKISTAN/INDIA-BURMA-CEYLON TRADE
CEYLON/INDIA TRADE
BURMA/INDIA TRADE
BURMA/CEYLON TRADE
INDIA-PAKISTAN-BURMA CEYLON/PERSIAN GULF TRADE

OTHER FIXTURES FOR OTHER PORTS ACCORDING TO DEMAND

For Rates of Freights, Sailings, etc., apply to the Company's Bombay Office at :

BHARAT HOUSE, 104, APOLLO STREET, FORT, BOMBAY 1

Telephone Nos. 30391, 30892 & 30893

FREIGHT BROKERS

PITAMBER LALJEE & SONS

BHARAT HOUSE, 104, APOLLO STREET, FORT, BOMBAY 1

Telephone Nos. 38946, 38930

সর্বত্র উচ্চপ্রশংসিত

সরস্বতী লাইব্রেরীর কয়েকখানা বই

ঐভূপেন্দ্র কুমার দত্ত	হরিদাস মজুমদার	
বিপ্লবের পদচিহ্ন	৪'০০	পলাশীর প্রান্তরে (২য় সংস্করণ) ১'৫০
ঐপ্রভাত দেব সরকার		ঐঐকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
দিনকাল [উপন্যাস]	৪'০০	বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা ৬'৫০
ঐনগেন দত্ত		ঐরঞ্জন কুমার সেন
সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক নীতি	২'০০	নানা ফুলের সাজি ৩'৫০
ঐনরেন্দ্র নাথ রায়		অধ্যাপক ঐবিভূষণ ওহ
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (৩য় প্রকাশিত ২য় সংস্করণ) ১'৭৫		অবাধ্য শিশু ও শিক্ষা সমগ্র ৩'০০
ঐঅরুণচন্দ্র ওহ		ঐমুনোমোহন চক্রবর্তী
সৃষ্টি ও সভ্যতা (৩য় সংস্করণ) ২'৫০		ডাক্তারের দিগ্বিজয় ২'৫০
সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (৪র্থ সংস্করণ) ১'০০		প্রকাশের পথে—মৌমাছির
রূপকথা (বাবিলোনীয় উপকথার গল্প) ২'০০		রাষ্ট্র-জ্ঞানের মধুভাণ্ড
		মনীষীদের ছোট বেল

সরস্বতী লাইব্রেরী

৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বোড, কলিকাতা-৯

। ও অগ্রান্ত পুস্তকালয় ।

— আমরা মক্কেলের অর্ডার সাপ্লাই করিয়া থাকি —

আমাদের মিজেদের বই এক সঙ্গে ১৫ টাকার অর্ডারে ১০% কমিশন দিয়া থাকি ।

কাল—১৩৬৪

—সূচীপত্র—

একবিংশ বর্ষ—একাদশ সংখ্যা

১। স্বত্বিকথা—শ্রীকালিদাস দায়	৬৪১	১১। দ্বারদ্বন্দ্বিত্ব ও প্রাপ্তিসমূহ	
২। বহিঃস্থ—শ্রীমৎসংস্কৃত মিত্র	৬৪৪	শ্রীমতীভূষণ সেন	৬৪৪
৩। তবু আদি (কবিতা)—শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস	৬৪১	১২। আবহমান কাল—শ্রীমহীত ত্রাণ	৬৪৭
৪। প্রভাববর্তন (কবিতা)—শ্রীমহীত ত্রাণ	৬৪২	১৩। সুদীর্ঘ-কলিকাতা তিন বৎসর	
৫। হেনা (কবিতা)		—শ্রীনারায়ণ চৌধুরী	৬৮১
—শ্রীমহীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৪২	১৪। পশ্চিম বাঙ্গালার আবিষ্কারী কল্যাণ	
৬। ভাবনা (কবিতা)—শ্রীমুখারঞ্জন চক্রবর্তী	৬৪৩	—অনিমা দায়	৬৮৭
৭। বিবেক (কবিতা)—শ্রীবিকাশ দায়	৬৪৩	১৫। দীর্ঘমেয় ক্রমবিকাশ—শ্রীবিমল দে	৬৯১
৮। নকল সংসার—শ্রীঅদিত্য নাথ মুখোপাধ্যায়	৬৪৪	১৬। কি করে ইন্দ্রাজিত তৈরী হয়—[শ্রী]	৬৯৮
৯। বহাট বারুন্দ—শ্রীবিধ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	৬৪৭	১৭। আর্থিক প্রসঙ্গ—শ্রীশঙ্কর প্রসাদ ভট্টাচার্য	৭০১
১০। অবশেষ—শ্রীঅমলিনাথ দায়	৬৪৭	১৮। কালের দ্বারা (সম্পাদকীয়)	৭০৪

‘মন্দির’র নিয়মাবলী

১। মন্দির বৎসর বৈশাখ মাসে আরম্ভ।

২। প্রত্যেক সংখ্যার হাট আট আনা। বার্ষিক মূল্যক সাড়ে ছয় টাকা। বার্ষিক তিন টাকা চার আনা। বৎসর দুইবার গ্রাহক হওয়া যায়, বৈশাখে বা কা্তিকে। অল্প কোন সময়ে গ্রাহক হলে বৈশাখ বা কা্তিক থেকে বৎসর মূল্য হবে। ঠিকানা পরিবর্তন হলে সময়ে জানাবেন পত্র লেখবার সময় গ্রাহক নম্বর দেবেন। ‘মন্দির’ প্রত্যেক মাসের প্রথম মধ্যাহ্নে প্রকাশিত হয়। সময় মত কাগজ না পেলে ডাকঘরের রিপোর্ট সহ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে আদায়ের জানাবেন।

লেখকদের প্রতি

লিখা সমস্ত নতুন বানান গ্যাপসহ করবেন। নকল পেশে রচনা পাঠাবেন। ডাকটিকিট না দেওয়া থাকলে অনন্যোনীত রচনা মষ্ট করা হয়। কবিতা কেবল পাঠান হয় না।

প্রকাশিত প্রবন্ধটির মতামতের ওপর সম্পাদক দায়ী নহেন। মান ও ঠিকানা না দেওয়া থাকলে কোন প্রবন্ধটির প্রকাশ করা হয় না।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা—৬০

” অর্ধ পৃষ্ঠা—৩৫

” সিকি পৃষ্ঠা—২০

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার

পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের যত নেওয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনের ব্লক মষ্ট হলে আমরা তৎক্ষণাত্ দায়ী নই। কাজ শেষ হবার পর দাতা মস্তর মস্তর ব্লক ফেরৎ নেবেন।

প্রবন্ধটি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

ম্যানেজার—মন্দির

৩২ আপার সাবুল্লার রোড, কলিকাতা-৩

ফোন :—৩৪-২৬৬০

অবাধ্য শিশু ও শিক্ষা সমস্যা

মূল্য—২ টাকা

অধ্যাপক শ্রীবিভূষণগুহ

মানব বৈখানার পরিচয়। শিশু অবাধ্যতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথোনা, তবু কেন অবাধ্য হয়। দেশক এই বইয়ে এই জটিল প্রশ্নটির বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বাবা পদ্ধতিও এমন অনেক মনোবীর অস্তিত্বের কথা, শিক্ষার ঠান্ডাওর ক্রমবিকাশ, শিশু শিক্ষার বাস্তবায়নের অগ্রপথিক কথাও এতে পাঠ্য। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হুগো কুমার মিত্র এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কে. কে. মুখোপাধ্যায় বইখানার ভূমিকা এবং অন্তিমত লিখে বইখানাকে সমৃদ্ধ করেছেন। শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীসমূহ এ বই পড়ে উপকৃত হবেন। সমস্ত সংগ্রহপত্র উক্ত প্রকাশিত।

“দেশ” পত্রিকার অন্তিমতে.....বর্তমান যুগে শিক্ষা-সমস্যা লাইয়া পৃথিবীর হৃদিত্তা। সমস্যা সমাধানের উপায়ও পৃথিবী বাবির কথার চেটা চিন্তিত্তে। প্রত্যেকের কৃতিত্ব মুখোপাধ্যায় এই সমস্যাটি সমাধানের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। অবাধ্য শিশুদের শিক্ষা-সমস্যার বিভিন্ন দিক বঙ্গদেশের অগ্র কথার অর্থ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থটিতে আলোচিত হইয়াছে। দেশের শিক্ষা-ক্ষেত্রে গ্রন্থটি বহু প্রচলিত হউক ইহাই কামনা করি।

শুশান্তির অস্তিমত—শিশু অবাধ্য কেন হয়, সে কি সমস্যার কারণে, না সামাজিক আবেষ্টনী প্রভাবে, না পিতা-মাতার অনবদানে, তা ঠিক যতো না বুঝে এবং অবাধ্যতা মাত্রকেই হঠাৎ অপরাধরূপে গণ্য করলে, শিক্ষাও সম্পূর্ণ বা মার্বক হয় না। প্রত্যেকের একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক, তত্ত্বাবধি সুপণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি। এই বইয়ে তাই তিনি সমস্যাটির বহুত্ব ও প্রতিকারের উপায় বিশ্লেষণ করেছেন, যা অস্তিত্ববৎ, শিক্ষক, সমাজ চিন্তিত্তা, সকলেরই বিশেষ কাছে লাগবে। বইটির বহুত্বপ্রধান অতি মনোহর। প্রত্যেকটি বিষয়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণে তিনি অনুরণন করেছেন প্রামাণ্য পুথিপত্র এবং উদাহরণ, বর্ণন ও মনোবিজ্ঞানের নিখিবে তাঁর প্রতিপাত বিষয় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। শিক্ষক শিক্ষণ বইটি বিশেষ উপযোগী হবে। সাধারণ পাঠকও পড়ে উপকৃত হবেন।

“প্রবাসী” বলছেন—সংসারে আনন্দের বহু যোগ্য শিশু। মনোবীর তথা দেশের ভবিষ্যৎ শিশু। শিশু বহির্দেশেও মনে মনে বইয়া না উঠে তাহা হইলে তাহারাই ভবিষ্যতে সমাজ-বাহে হই কতক স্থিতি করির চতুর্দিকে আবহাওয়াকে বিমুক্ত করিয়া তেলে। দাঃ-আক্রান্ত মাতৃবীর যেমন ডিকিংসার প্রয়োজন, অপরাধপ্রবণ চৈ-প্রকৃতির শিশুও যেমন সাংসার আশ্রয়। শিশু মনোবিজ্ঞানী ও পু মাত্র দৈনিক শান্তির মধ্যে বৈমাত্ত্য থাকিলেই চলিবে না। শিশু মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সহায়তায় সাক্ষ্য লাভ করত প্রচেষ্টা আর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলিয়াছে।

মুখোপাধ্যায় পৃথিবীতে মানব-গোষ্ঠীর একটা বৃহৎ অংশ আধ্বর্ষিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া শিশুর অবাধ্যতা, মানসিক বিকার ও অপরাধপ্রবণতা এত বেশী হইয়াছে যে, ইহাকে আর আর বহুত্ব করা চলে না। আমাদের দেশে পাশে ইহাও অমত্যা দৃষ্টান্ত প্রতিদিন চোখে পড়ে। হুগো পাই—ভবিষ্যতের একটা ভয়াবহ রূপ কল্পনা করিতে গিয়া শিথিয়া উঠি। শ্রীযুক্ত হুগো মহাশয় সমাজের পুণ্ডরীকানিতে বর্তমান কালের একটি অতি প্রয়োজনীয় সমস্যা অতি দৃষ্টি দিয়াছেন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিশু-অপরাধপ্রবণতা ও তার প্রতিকারের বহু নীতি আমাংদের চোখের সমুখে ভুলিয়া গতিয়াছেন। নূতন মাতৃবীর প্রতি শিশুপালন সম্বন্ধে মার্কিন প্রবর্তিত সুন্দর।

হুগো মহাশয় কতকগুলি উপদেশ দিয়াই তাঁহার কর্তব্য শেষ করেন নাই, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে শিশু বিজ্ঞানমণ্ডলি কি ভাবে নানা প্রকার শিশুদের শিক্ষা দিয়া সকল হইয়াছে, তাহারও বহু দৃষ্টান্ত এই পুস্তকখানিতে পরিবেশিত হইয়াছে।

এইরূপ একখানি অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রদান করিয়া শ্রীযুক্ত হুগো মহাশয় সমাজের একটি গুরুতর সমস্যা প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন।

“Hindusthan Standard”.....for teachers in training schools and colleges this is an excellent educational handbook in Bengali.....

সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা—১

চৈত্র—১৩৬২	— সুচীপত্র —	একবিংশ বর্ষ—দ্বাদশ সংখ্যা
১। কল্যা পূর্ণা—শ্রীবোম্বেল মাঘ বুধোপাখ্যায়	১০৭	১২। একটি ছুঁবেব কবিতা (কবিতা)— শ্রীবিমল চক্রবর্তী ১৪৬
২। মানব কল্যাণে ভীষণ—ডঃ বেঙ্গলম্যান এ. ওয়েলস্‌ম্যান	১০৮	১৩। তিনটি পাখির কবিতা (কবিতা) —শ্রীসুনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৪৮
৩। ভীষ্মের ক্রমবিকাশ—শ্রীবিমল বে	১১০	১৪। ডাক (কবিতা) —শ্রীসুজাতা কুমার অধিকারী ১৪৮
৪। চাঁদা দাখিলে জাহাজের প্রত্যাহ —শ্রীবিমল বোষ	১১০	১৫। জগদাচার্য (কবিতা) —শ্রীদ্বিজয় গঙ্গোপাধ্যায় ১৪৬
৫। মূৰ্খের অতীত—শ্রীপ্রবীণ কুমার সেন	১১৪	১৬। বহুব্রহ্ম—ভীষণচন্দ্রকুমার মিত্র ১৪৭
৬। ছুই সোতা নদী—শ্রীমঙ্গল বসু	১১৪	১৭। টোপে বিভ্রম—শ্রী অরুণ নাথ বসু ১৪২
৭। পঙ্কজ—শ্রীপ্রতিনয়ী কব	১১১	১৮। ভারতীয় মুদ্রার কথা —শ্রীপ্রবীণ চক্র বসু ১৪০
৮। বৈকুণ্ঠ বন—শ্রীপতীভূষণ সেন	১০৮	১৯। ভীষ্ম বহুস্ত—শ্রীতমাল বার চৌধুরী ১৪৬
৯। নিয়ন্তাঃ হস্ত কর্ণবন (কবিতা)— অধ্যাপক বিজ্ঞানেন গুহ	১১০	২০। ভীষ্ম বিজ্ঞান—কর্ষ বর্মা ১৪২
১০। সূর্য-সুজ (কবিতা) —শ্রীহরীপ্রবীণ বুধোপাধ্যায়	১১৪	২১। আদিক প্রদগ—শ্রীশ্রবণ প্রসাদ শুক্লাচার্য ১৬৪
১১। কাঞ্চরী কল্যা (কবিতা) —শ্রীপ্রবীণ চট্টোপাধ্যায়	১১৪	২২। কালের মাজা (সম্পাদকীয়) ১৬৮

‘মন্দির’র নিয়মাবলী

- ১। মন্দির বৎসর বৈশাখ হতে আরম্ভ।
- ২। প্রত্যেক সংখ্যার দাম আট আনা। বার্ষিক পত্রাক সাড়ে ছয় টাকা। বার্ষিক তিন টাকা চার আনা। বৎসরে ছুইবার গ্রাহক হওয়া যায়, বৈশাখে বা কাটিকে। অত্র কোন সময়ে গ্রাহক হলে বৈশাখ বা কাটিক থেকে বৎসর শুরু হবে। টিকানা পরিবর্তন হলে সময়ে জানানবেন। পত্র লেখবার সময় গ্রাহক নম্বর যেনে। ‘মন্দির’ প্রত্যেক নম্বরে প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। সময় মত কাগজ না পেলে ডাকঘরের বিপোর্ট সহ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে আমাদের জানানবেন।

লেখকদের প্রতি

বাসস্তব নতুন বানান ব্যবহার করবেন।। নকল বেবে ২৫না পাঠাবেন। ডাকটিকিট না দেওয়া থাকলে অননোনীত ২৫না নষ্ট করা হয়। কবিতা কে২৫ পাঠান হয় না।

প্রকাশিত প্রবন্ধাদি নতুনতর কল্প সম্পাদক দ্বারা নহেন। নান ও টিকানা না দেওয়া থাকলে কোন প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয় না।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি —

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা—৭০

” অর্ধ পৃষ্ঠা—৪০

” সিকি পৃষ্ঠা—২২

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার
পত্রচারে জাতব্য।

আমাদের বক্তব্য-মেওড়া যাক্তে কোন বিজ্ঞাপনে ২৫ নষ্ট হলে আমরা তত্ত্ব দায়ী নই। কাজ শেষ হবার পর দত্ত সময় সন্তুষ্ট রক কে২৫ নেবেন।

প্রবন্ধাদি, চিত্রপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিয় টিকানায় পাঠাবেন।

ম্যানেজার—মন্দির

৩২ আপার সাতুল্লার বোড, কলিকাতা-২

ফোন :—৩৪-২৬৬০



একবিংশ বর্ষ

বৈশাখ, ১৩৬৩

প্রথম সংখ্যা

স্মৃতি-কথা

ঐকালিদাস রায়

পূর্বাহ্ন

ইংরাজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে সমভাবে নিষ্কাত প্রথমে
অধ্যাপক পদে কুচবিহারের অল্প সংব্রব্ধে যোগ্য আনার
২য় সংস্করণের কতুমঙ্গল পড়ে লিখেছিলেন :

শুভস্বপ্ন—

চার পাঁচ দিন ধরে আপনার কতুমঙ্গলখানি আমার
পড়ছিলাম যদি বলেন ৪৫ দিন ছোট কাব্য
পড়তে লাগল কেন ? খুব critically পড়ছিলাম।
খুব critically না পড়লে এসব বই পড়াই
যা। বইখানার সর্বদে সংস্কৃত শ্লোকের নামাংলি পরিয়ে
দিয়েছি।

পড়তে পড়তে ভাবছিলাম—এ বই ক'জনের চুত
লিখেছেন ? বইএর শেষে এবার চীকটিগ্ননী সংযোগন
করেছেন। তাতেই বা কি লাভ হবে ? সংস্কৃত কাব্য নাট্য
যার ভালো ক'রে পড়া আছে—শুধু পড়া নয়, যে রীতিনীতি
সম উপভোগ করেছে, নিজে কবিতাব্যাপার এবং বাংলা
কবিতার প্রতি অহুয়াপ আছে—এমন সুপণ্ডিত ব্যক্তি
হাতে যদি বইখানা পড়ে, তবে এ বইয়ের সার্থকতা।

এরূপ পাঠক কি পাবেন ! যাক আপাততঃ একজন
পেয়েছেন।

প্রত্যেক লেখক যখন সাহিত্য রচনা করে তখন সে
তার মনকে লেখার পাঠকের নাকের নাকের মধ্যে মেঘ।
অনেক সময় তার পাঠকের একজন প্রতিমিতি তার
কল্পনার মধ্যে গুঠে। আমার মনে হয়—এর কবিতা-
শ্রুতি লিখবার সময় ব্যর্থতার আমার স্মৃতিটাই আপনার
মনে উদ্ভিত হয়ে থাকবে।

সেজন্য আমারও পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয়েছে,
আমার ওস্তাই হতে আপনি লিখেছেন। যদি এ বইএর
দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠক পান—তার কাছে আমার নাম
করবেন।

এ বই আপনার অল্প বয়সে যদি পড়ে তবে তাহা মনে
করবে আপনি বৃষ্টি আগাগোড়া সংস্কৃতবই অহুয়া
করেছেন। কবিতাশ্রুতি যখন মাসিকে বেক্সিস
তখন আপনার বহু অমল হোম তাই মনে করেছিলেন।
আপনি লিখেছিলেন কতুমঙ্গলে দুই শ্রেণীর কবিতা আছে

—কতকগুলি বাংলা দেশের আর্ন্তরী প্রকৃতির কথা—অবশ্য মানবজন্মের সঙ্গে তার সংযোগ আছে। এ ভালো আলংকারিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া অন্য কোন বৈশিষ্ট্য নেই। এসব কবিতা অরণ্যে লিখতে পারত।

আর এক শ্রেণীর কবিতা আছে—সেগুলির পরিমাণ ও সংখ্যা বেশি। এগুলি সংস্কৃত কবিদের যে ভারতবর্ষ তাই আর্ন্তরূপ জ্ঞানবোধের কথা—সেই ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও মানব জন্মের কথা। এইগুলিতেই বৈশিষ্ট্য আছে। এইগুলিই সাধারণ পাঠকের হয় সুবিশিষ্ট, নয় অনবিশিষ্ট।

এইগুলির মধ্যে কতটা সংস্কৃত কবির আর কতটা আপনার নিজস্ব, আমি তাই এই কয়দিনে তা বিশ্লেষণ করছিলাম। বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিদিত হলাম—অধিকাংশই আপনার নিজস্ব। কিন্তু এমন স্তরীতে তা প্রকাশ করেছেন যে মনে হয় যেন সংস্কৃত রোকেটই বৃষ্টি অসুখ। একেই বলে আসল classicism, যাঁরা নামে সংস্কৃত রোকেট অসুখ আছে সেগুলির সঙ্গে আপনার নিজস্ব রচনা এমন আশ্চর্য ভাবে মননর সাংস্কৃত ও সংগতি লাভ করেছে যে ধরাযে যে নেই। এ গভীর ভাষা দেখে কেউ কহেনি। রবীন্দ্রনাথ পড়লে হয়ত হাসবেন। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত কাব্যনাট্যের ঐতিহাসিক দিকটাই শুধু নিয়ে নিজের কল্পনায় পরিণত করে স্বতন্ত্র কবিতা লিখেছেন। আগনি শুষ্ক অসুখ করেছেন—সেই সঙ্গে সংস্কৃত কবিদের আলংকারিকতাকে একবারে বেনামে আঁতরণ করেছেন। সংস্কৃত কবিদের conventionগুলো পর্যন্ত নিয়েছেন। সেগুলো অন্যভাবে ব্যাখ্যাত করতে পারতেন। বর্তমান বাংলায় সেবা না হ'লে আপনাকে পাল রাখারই আমলে চালান দিতাম।

অমরা সংস্কৃত কবিদের রচনার বস আচার করেছি—আগনি চর্চা করে গলাধঃকরণ করে ছন্দ করে কেলেছেন। কি ভদ্রানন্দ লোক আপনি!

এর পর কি কথা হবে আপনার? এ যুগে এতটা কিছু হাঁটা লোকে নাইবো না।

সোড়ার শুষ্কতা কবিতাটাকেই কাব্যনামার Key-note পাওয়া আছে।

নিম্নে ভোনার রক্তাণী রূপ ইচ্ছাশী বরাহ শরতে শুভ্র বাগেদী তুমি ভাষার তব কার জ্ঞান হেনতে কলাণী বধা, অসুখী শ্রীতে প্রেম বসন্তে সুলভ রক্তে রক্তিরূপ অটবীতে।

এক চোখে দ্বাদি আর চোখে দ্বাদি মেঘে ঢাকা তব দেহী অশেষ ক্রামল বাসবিন্দুরে ক্রামল বাসবিন্দু

এই পর্যন্ত আপনাব নিজস্ব। তারপর সংস্কৃত কাণ্যের ন্যায়কারে মাদুর ও মৌল্য প্রসঙ্গে যে পুণ্যবিকাশ সজ্জা কবিনন্দরপ্রদিতের দ্বারা—ঈশাং সম্পর্কে প্রিয়দূপিকান্তি—ইত্যাদি রোকেট অসুখ। তারপর চারিচরণ—বেদান্তের ‘হস্তে দীপক’কল্পমলক বাসবিন্দু—বিদ্য রোকেট অসুখ।

শেষে আপনাব সম্পূর্ণ নিজস্বতার climax ঘটানোর বড় বাণে তব দীপাবিকাশা হোলে, সুখিক। পরে কৃত্তিকা তুমি বদানন তব কোলে।

একই প্রকৃতির বড় ওড়তে ছোট রূপ। প্রকৃতির এই কৃত্তিকা রূপের কোলে যা কিছু উপভোগ্য তা বড়াননের মত বিদ্যায় করছে। সংস্কৃত কবিদের সঙ্গে সহযোগিতায় এই কবিতার সৃষ্টি। এই সহযোগিতাটাই কৃত্তিক। বনের কুলের সঙ্গে নিজের আড়িনার সুল মিশিয়ে এ যেন মালা গাঁথা। একে কি কেউ কবিতা বলবে?

কতকগুলির বহু কবিতাতেই এইরূপ শুষ্কনের আঁট বিদ্যমান।

এই শুষ্কতা কবিতা থেকেই যে আলংকারিকতার সূত্রপাত হয়েছে—তাই বরাহ চলেছে প্রাচীন ধারার কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে। এই আলংকারিকতার ধারা সংস্কৃত কবিদেরই, বেশির ভাগ আপনাব নিজস্ব—কিন্তু সংস্কৃত কবিদের পক্ষ অসুখের পথিকদ্বিত। এই ধারায় যে শব্দসূত্রের প্রয়োগ হয়েছে—সেগুলি অকাণ্ডে আসেনি। মুশকিল হয়েছে সে সব শব্দ সাধারণ পাঠকের অপরিচিত—সেগুলির শুধু অর্থ জানলেই হবে না—সেগুলি যে সব সংস্কৃত শব্দে প্রয়ুক্ত হয়েছে সে সকল রোকেট শব্দেও পরিচয় থাকে চাই। সে সব রোকেট অসুখবিত্ত রসে শব্দগুলি পরিচয় বলেই সেগুলি কবিতার বহাধানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ শব্দগুলি সংস্কৃত কাব্য নাট্যের

বান্ধানগুলিকে অরপ করিয়ে দেন, এবং সেই বান্ধানের পরিঃষ্ঠানীর দৌল্লভ্য ঐ সঙ্গে মনে উদ্ভিত হয়ে বহুসংখ্যক সংযুক্তি বহে। তাই বলছিলাম—আপনি ক'নের ওস্ত এই বই লিখেছেন? ক'নের প্রযুক্ত শব্দাবলীর সম্বন্ধান বা বান্ধানীর খোঁজ রাখে। সে খোঁজ না রাখলে আপনার কবিতার আসল দাপুর্ন উপভুক্ত হবে না। তাই বলছি আপনাতর পণ্ডিত। আপনি দেখবেন আপনার প্রযুক্ত অপ্রসঙ্গিত শব্দাবলী অকাব্যে প্রযুক্ত মনে করে অনেকই উপহাস করবে। সংযুক্ত কবিতার পদ্ধতি অনুসরণ করে আপনি যে অলঙ্কারগুলির সৃষ্টি করেছেন সেগুলিকে সংযুক্ত কবিতার চিহ্নিত অলঙ্কারবহুই পুনরাবৃত্তি মনে করবে এবং পৌরাণিক উদ্ভাত (allusiveness) সাধারণ পাঠকেরা হয়ত বুঝে কিছু কাব্যান্যটপ্ত উদ্ভাতগুলি একবারে তাৎপৰ্য্য কান্দে বার্য্য হয়ে যাবে। আপনার ব্যবহৃত সংযুক্ত শব্দাবলীর উল্লেখ করে কোন কোন লেখক কোন কোন লেখককে আমি পরিহাস করতে শুনেছি। তারা ঐ রূপ শব্দপ্রয়োগের সার্থকতা আরো খোঁজেনি। আপনার বহু কবি দঃপ্র-নাথই ত ব্যাক করেছেন এবং বলেছেন বহু ভালো দিত্ত লবণ একটু কম! কবি আপনার চিন্তাকে বর্ণনার আবঃড় বলে উপমিত করেছেন। তিনি বহি কাব্যের রূপ-ভাস্করিতার দিকটা দেখতেন তা হলে 'লবণ' না 'লে' 'লাবণ্য' একটু কম তাই বলতে পারতেন না।

প্রাচীন ভারতের আবহাওয়া সৃষ্টির দঃড় যে সব চিত্র, উদ্ভাত বা শব্দ প্রয়োগ হয়েছে—সে সমস্তকেও সাধারণ পাঠক হয় অথবা মনে করবে—নয়ত pedantic মনে করবে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের গভীর সংযোগের কথা বাস্তবিক রাসায়নে বঃকায়ঃর বঃগণনাগণের পরিঃবেশে গীতাঃরা রাসঃজঃর ব্যথিত জঃরের তাবোঃঙ্গাঃনে আছে—আব আছে কালিঃরাসের শক্তঃলাঃ শক্তঃলাঃ বিঃগঃ দঃড়। অঃস্তঃ সংযুক্ত কবিতার প্রকৃতিবর্ণনা কেবল পরিঃবেশঃসৃষ্টিঃ লঃ। আপনি অঃস্তঃ কবিতার প্রকৃতিবর্ণনা অনুঃদঃলঃ এঃগ করেছেন কিন্তু তাতেও মানবজঃরের সংযোগ স্থাপন করেছেন। এ হলো ইংঃরাঃী রোমান্টিক কবিতার হাঃবঃ পাঠ এবং বঃীঃপ্রনাঃর কাব্য পাঠের ফল। বঃীঃপ্রনাঃর

পর তাঁর কোন শিঃ কবি কখনো তা না করে পারেন না।

এক হিসাবে আমাদের দেশের দিঃ প্রাঃীঃ কি অঃরাঃীঃ সাহিত্যে প্রকৃতির প্রভাঃ ও সক্রিয়তা ও অঃস্থিঃক্তিঃ ইংঃরাঃীঃ সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতঃ, সঃস্তঃতঃ অঃস্থিঃকঃরঃ বিঃচিত্তঃ ও গভীঃতঃ। তার কারণ, ইংঃরাঃে আমাদের দেশের মতো বঃগঃজঃর এমন সনাতঃগঃরঃ বিঃচিত্তঃ এবং জঃবঃ-প্রাঃীঃ প্রাঃল্যঃ বা প্রঃপে নেই। বাঃস্তঃিক থেকে বঃর্তমানঃ কাল পর্যন্ত কবিতার কাব্য বঃীঃ প্রকৃতির সঙ্গে মানব-জঃবঃরের তাবঃস্থিঃনিঃয়ঃ বা দঃীঃরূপ লাভ করেছে তা ইংঃরাঃীঃ সাহিত্যে সঃস্তঃতঃ নয়। বঃগঃর প্রভাঃপঃ ও প্রভাঃবঃরঃ কথা বঃীঃপ্রনাঃনে চূড়ান্ত রূপ হয়েছে। আপনি বঃীঃপ্রনাঃর অনুঃরূপ করেছেন মঃ—তবে আপনার বঃলঃরঃ শুঃকঃীঃ সংযুক্ত কবিতার তাঃবঃই অঃস্থিঃকঃিতঃ। কিন্তু আর এক জঃরঃ প্রভাঃপঃ ও প্রভাঃপের কথা আপনি নিঃঃশঃ করেই বলেছেন। এই জঃরঃ হলো নিঃঃ। বঃগঃর মতো ইংঃরাঃেও নিঃঃ নেই—সেজঃ প্রঃলঃ পরাঃক্রাঃ্ত নিঃঃরঃরঃ কথা ইংঃরাঃের সাহিত্যে নেই। বাকঃরঃ কথাও নয়, বঃং পাহাঃীঃ সাহিত্যে কতকটা আছে। সংযুক্ত সাহিত্যে নিঃঃরঃকঃ প্রাঃদনঃতঃ বঃলঃরঃ বঃগঃরঃ হয়েছে নাঃস্থিঃকঃ জীবনঃরঃ বিঃগঃসঃীঃলাঃ। বাংলা সাহিত্যে নিঃঃরঃরঃ প্রভাঃবঃ কম নয়। বঃীঃপ্রঃ সাহিত্যে নিঃঃরঃ রূঃরঃরঃ প্রাঃকৃঃতিকঃ রূপ। নিঃঃরঃরঃ মঃগঃজঃরঃ কবিতকে তাবঃস্তঃরঃ কিংবা বঃলাঃলঃ করেছে।

আপনি নিঃঃরঃরঃ উপর একটা ছোট কাব্যই লিখে ফেলেছেন। এই নিঃঃরঃরঃ অনেক অঃগঃ সংযুক্ত কবিতার কাব্যান্যটপ্ত থেকে গুঃীঃতঃ। আপনি নিঃঃরঃরঃ নাঃস্থিঃকঃ জীবনে বিঃবঃ বলে চিত্রিত করেছেন। ফলে সংযুক্তকাব্য নাট্যঃরঃ নাঃস্থিঃকঃরঃরঃ বিঃঃরঃরঃ রূপটা মনঃজঃটাই নিঃঃরঃরঃ অঃীঃকৃত হয়েছে।

সংযুক্ত কবিতার নিঃঃরঃ মঃগঃস্থিঃকঃ নিঃঃরঃ, আপনি নিঃঃরঃরঃ সক্রিয়তা ও প্রভাঃবঃরঃ সঃস্থানঃ করেছেন—সমঃ্রঃ তাঃতে—এমন কি ভাঃতঃ ছাঃড়িঃরঃ আঃঃঃ সাঃগঃরঃ পঃঃঃ হঃঃঃ তঃলে গেছেন। আপনি সঃঃঃশঃগঃকঃ নিঃঃরঃকঃ ও নিঃঃরঃরঃ শোঃগঃ করেছেন। তবে আপনার নিঃঃরঃ কাব্য শিঃকঃ হয়নি। আপনার শুঃকঃ নিঃঃরঃরঃ প্রভাঃবঃকঃ গীঃতিকঃবিতাঃরঃ পঃস্থিঃতঃ

করেছেন। আপনি কতকগুলি চিত্র অঙ্কন করেছেন—
সংস্কৃত শ্লোকের মত কতকগুলি শ্লোক লিখেছেন এবং
আলঙ্কারিকতার চাকুরি দেখিয়েছেন। এতে রবীন্দ্রনাথের
প্রভাব নেই, সংস্কৃত কবিতারই প্রভাব বিস্তারিত। তা
সত্ত্বেও আপনার নৌসিকতা ও স্বকীয়তা যথেষ্টই আছে।
আপনার নিম্নম্ন ভাবসমূহের সুনির্বাচিত সংস্কৃত
কাব্যনাট্যের উদ্ভাবনগুলি কালের মত প্রামাণ্যে পরিণত
হয়ে আছে।

আমার একবার মনে হয়েছিল—এই ছোট কাব্যখানি
সংস্কৃত শ্লোকে অনুবাদ করি। তারপর মনে হল এর ইংরেজি
অনুবাদের দিকে কেউ করে তবে সব চেয়ে ভালো হয়। কারণ
ইউরোপীয়রা ভারতের এই ছন্দটার সঙ্গে পরিচিত নয়—
যারা এংলো বাস করে দিয়েছে তারা এই নিয়মকে
উপভোগ করেনি। ক্রীতকালে তারা সিন্ধু হারভিস্টে
পালিয়ে যেত। নিরাশ ভাবের অন্তরে যে কত উপভোগ্য
তারা তার পরিচয় পেয়ে যায় নি।

নিবন্ধ না হলে একালে কবিতা বলে গণ্য হয় না—
কাজেই আপনার নিরাশ এ রূপে আবৃত্ত হতে না।

প্রাচীন কবিতার বর্ষা, প্রাচীন কবিতার শরৎ ও প্রাচীন
কবিতার বসন্ত প্রাথমিকঃ সুনির্বাচিত শ্লোকগুলির অনুবাদ।
যাহোক সংস্কৃত কাব্যনাট্য পড়া আছে তারা বুঝতে পারেন
এতে কবির নিম্নম্ন সংযোগের কোথা কোথা আছে।
সংস্কৃত সাহিত্যের পদনামে আপনি 'ওপু' সংযোগ
করেছেন—যাওটা সংস্কৃত কবিতারই পরিচয়, কিন্তু পড়টা
আপনার নিজেই। এ যেন সংস্কৃত শ্লোকবন্দীর চূড়ার
চূড়ার আপনি মনু পাখা তুলে দিয়েছেন।

আপনার 'স্বপ্নসংহার' ও 'সুখসংস্রব' কবিতার
কৌশলটা নিম্নের এগুলির পাঠকরাও বুঝতে পারবে।
উদাহরণস্বরূপ হালদাসলীলার ছয়টি পঙ্কতি ছাড়া বাক্য
ক'রে বড়াননি সুখসংস্রবের অন্যতম বলা এ একবারে অস্বস্ত
পরিচয়। কৃত্রিম আশ্রয় ক'রে সবটা বলা হয়েছে—এ
টেকনিক সংস্কৃত কবিতার নয়। রবীন্দ্রনাথের টেকনিকের
শব্দই বসে। আপনি এ কবিতা রবীন্দ্রনাথকে
উদ্ভাবন—নিম্নের এটা উদাহরণ ভালো লাগবে। সঙ্গত
পাঠকের কাছে আমার নিবেদন জানাবেন—কীভাবে যেন

স্বপ্নসংহার কবিতার 'সুখসংস্রব' ও 'কোলে'—এই
চরণগুলি মনে রাখেন এবং সুখসংস্রবের অর্থ সুখসং-
স্রব একবারে যেন ভোলে না।

বর্ষার কবিতাগুলিতে বাংলায় বর্ষাও নিম্নম্ন রূপে দেখা
দিয়েছে—এগুলিতে বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু নেই। 'জাহাঙ্গীর
প্রথম দিবসে' কবিতায় যথেষ্টের একটা symbolical,
rather spiritual significance দিয়েছেন, এও
রবীন্দ্রনাথেরই অস্বস্তি। ইঙ্গিতও Campbell এর
Rainbow-এর অনুবাদ। বর্ষা পর্যায়ের কবিতায় 'বৌবনের
অভিষেক' কবিতাটিই আসল নিবন্ধ। অস্তিত্ব কবিতা-
গুলিতে ছন্দের কাবিত্ব আছে। শিশুপালন, মালতী-
মাংস, দুধকটিক ও শুভসংস্রবের বর্ষাবর্ণনার শ্লোকগুলি
নিম্নে মালা গাঁথা হয়েছে। এতে শুধুমাত্র শিশুটিই লক্ষ্য নয়।
নাট্যের মহাদান 'প্রাণ প্রাণের' বসন্তই সুখ্যাত্তি কল্পন—
এতে শব্দভাষ্য ও strained metaphor এর সমাবেশই
প্রধান মূল। এতে সংস্কৃত কবিতার প্রভাবও নেই। কাজেই
এই artificiality কয়েক জালা লাগবে না। বর্ষাপর্যায়ের
ছটিগানে Lyrical excellence পাওয়া যায়—একটি
কাব্যী—অস্বস্তি ভাবে। কাব্যীর প্রথম ছটি চরণ
কানে শুধুমাত্র বসে—

শোভন গ্রহনে ঘন যদিও ঘটা বরা বনে এসো নই
শব্দন গগনে হেন তড়িৎ ছটা মোরা কোণে কেন রই।
শোভন+শব্দন, গ্রহনে+গগনে, ঘন+হেন, যদিও+
তড়িৎ, ঘটা+ছটা, বরা+মোরা, বনে+কোণে, এসো নই
+কেন রই—বরাবর একটানা মিল চলেছে, এসো ও
কেন-র বসলে আর+হায় করলেই একেবারে নির্বৃত্ত হতো।
শেষ লাইনে খুব মাত্র দিয়েছেন—

কিহিবেনা যৌবন বিশ-বছরী জুনি—কীনা বতই।
ভাষ্যে—গানটি ধৃত্যন্তেই বেশ কয়েকটি

আজিকের মনু ভরা ভাবে।

যবে যোনে নীর বারা যবে যবে কীর বারা

হাছুরী মুখা হলো আবে।

এসব গান কেউ গায় না ? সত্যিভাবে (সত্যি বটক)

বলুন-না পুর বিতে।

সংস্রব পর্যায়ের সংস্রবের প্রভাব খুবই কম। সংস্রবপর্যায়ের

অদিকান্ধই গান। গানগুলি অগ্ৰত বেশ সুবচিত।—সুৰ
দিয়ে পাওয়া চলে।

১। ঘুমিয়ে ছিলাম অন্ধার স্বপ্ন স্বপ্নবরণ রাতে

২। বলন্ত কি শব্দ হয়ে আসলে ফিরে মোদের ঘরে
ইত্যাং গান সকলেরই ভালো লাগার কথা। এ পর্বতের
শরতের গান কবিতাটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রথম বন্ধন ১২-১৪
বছর আগে মানসীতে বেংগের তখনি এই সুখ্যাতি শুনে-
ছিলাম। কবিবর বতীন্দ্রমোহন ও কল্পবানিধান খুব
সুখ্যাতি করেছিলেন। এতে বেশ মৌসিক অসন্তোষ
আছে—

চপলা আজি অচলা হ'লো সঙ্ঘাতাপগুণে।

চাতক এসে আলির বেশে ঘুলের খেলে গুণে।

জলের বান শুকিয়ে বোমো

আলোর বান তপন সোমে

মেঘের রক্ত কাড়িয়া ছুনি ঝাঝা শতভগ বে।

ইজ্ঞবন্ত কোটিখা হলো বনকুহুম কুণ্ডে।

সংস্কৃত বারি অলপূত সুখ্যাতিভুক্ত

ভারতপাঠে জনমেজয় যেন কলুষকুণ্ড। ইত্যাং

ছন্দের চাতুর্ঘ্য থাকলেও আগমনী-বিজয়ত গান
সত্যসুগতিক ব্যাভ্যন্তরেই বচিত।

হেমন্ত পর্বতে—বাংলার পল্লীসংসারের কথাই বেশি
বেশি—সংস্কৃত কবিত্বের সঙ্গে বা বতীন্দ্রনাথের সঙ্গে এতদিন
কোন স্পর্শ নেই। হেমন্তনিশিধে—একটি প্রেমের
কবিতা। কেবল হেমন্ত—কবিতাটিতে শুভসংসারের
প্রভাব খুবই স্থল্লেখ। এর অর্ধেকটা শুভসংসার থেকে
আছন্ত, অর্ধেকটা আপনার নিঃস্ব। তবে শুভসংসার বে
পড়েনি তার ধরবার উপায় নেই।

ঐক্যিকা গায় আজি কুন্তের পুরবী

খজোতে শোভে গুন হর

কল্লবী হলো আজ বিলালের সুখতি

পুষ্প ফুটে না চির দিন ত।

মিত্র বেবতা আজি সত্যই মিত্র

কৃপা নাই বরুণের বকে।

হুজুরি নিজে হল অকল্পন ব্রহ্ম

বহিই অকল্পে বকে।

কেজের ডালি শোভে নবশালি রাতে

আলি তার শোভে হ্রোণ অর্কে

ধালি শোভে পিঠাখুলি মিঠা পদমায়ে

ভাগে ভোগ কোটি মনুপর্কে।

তাহুল মল্ল পিসাপোপকরণে

কল্ল সুখান অস্ত।

নাথিকেল কীর আজি বেহ কৃষাঘরণে

পের নাথীকুল কৃষমন্ত।

এ সমস্ত আপনার নিঃস্ব, সংস্কৃত কাব্যনাট্যে এমন
পাইনি।

শ্রীতপর্বতের কবিতাগুলির সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের
বিশেষ কিছু স্পর্শ নেই।

বতীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবকে তাপসরূপ দিয়েছিলেন, আপনি
শ্রীতকে বলেছেন—

ঈশ্বরে মুক্ত ভূমি গুণার্থ সাধ কবি ক্রমে

আচার্যের নর্ভাগমে বসিলাছ ভূতীর আশ্রমে।

তাপসর শ্রীতের বাহা কিছু মল্ল সমস্তকে রূপভাষিত
করে বর্ণনা করেছেন, তাপসর ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক
বাস্তবিকতা নিয়ে দিয়েছেন। এটা অনেকটা বতীন্দ্রনাথের
অনুভূতি। যে শুধিৎ শুভবর—ভূমি—

অন্তঃপুর হতে ডাকো তোপহত ব্যাতিমন্তলে

হেমন্তে বনস্ত সুখ বাবা চাহে হুস্তিতে সংসে

পুতুরা স্নেহের পায়ে পান করি নীহারের নীর

অক্ষিরা পলিতপত্র নিক তোমা ব্রত তপবীর।

স্নাত্ত বাবা মনোভিকা ইজ্ঞবন্তু-স্বতীর বিরমে

ভায়া আজি হোক শান্ত মোহমুক্ততোমার আশ্রমে

জানকাত কহ যোগী যেহি তব পুণ্য হোমানল

বহুক অহলি ভূক্তি ব্রত ব্রহ্মভিক্ষাশ্রয় হল।

এতে শুধিক ও ব্রহ্মজের মধ্যে পার্থক্য বাহা
হয়নি—কাজেই কথকাত ও জানকাত মিশে গিয়েছে।
এতে ঘোষ ঘটেছে।

শ্রীতপর্বতের অবিক্রাশ কবিতা বাংলার কৃষিপল্লী ও
কৃষক জীবন নিয়ে লিখিত। এ শ্রেণীর কবিতা আপনার
পল্লী কবিতাবই শ্রেণীভুক্ত। বাংলার ক্ষেতখামার নিয়ে
এ শ্রেণীর কবিতা কেউ লেখেনি—বতীন্দ্রনাথও লেখেন নি।

অস্তিত্ব কবিতা দুই একটা লিখেছেন। জানি না বাংলায় পাঠকরা এটিকে লক্ষ্য করেছেন কি না।

বাংলায় বঙ্গতত্ত্ব-শাস্ত্রী,—শ্রীতান্ত্র হওয়াট কিছু দিন পক্ষেই প্রায়ের অভ্যাস হয়। বঙ্গতত্ত্ব শুধু জানাঘের মনে বিশেষ কোন প্রত্যয় বিস্তার করে না। কাজেই এদেশ বঙ্গতত্ত্ব কবিতার উপাধান উপচার সবই হয় Conventional—এং প্রমাণাদি হতেই আশ্রয়ানী করা হয়। বঙ্গতত্ত্বের আভ্যন্তরীণ বা কিছু সম্পদ সবই বস্তুনিষ্ঠ বিশেষ করে কাব্যরচনার কাজে লাগিয়েছেন, সবুজি পদ্ধতি যা ছিল আপনি তা হুড়িয়ে হুড়িয়ে গান লিখেছেন।

এদেশে বঙ্গতত্ত্বের আগে বেছে ভট্টিকার রূপ, নগরে তার নোহনরূপ বেধা যায় না—এমনকি সে উর্জি হিরে চলে যায়। বঙ্গতত্ত্ব আসে বনে আর মাছের মনে। বনে বঙ্গতত্ত্ব অর্থে শ্রীতান্ত্র—আর বনে আসে বঙ্গতত্ত্বের কোন কালে। তাই কবির মনের বঙ্গতত্ত্ব কাব্যে রূপলাভ করে। তাতে বঙ্গতত্ত্বের সাক্ষ্যোপাঙ্গ সাক্ষ্যবজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়।

আপনার বঙ্গতত্ত্বের কবিতাগুলোতে সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই অধিকাংশ উপাধান উপলব্ধি পেয়েছেন। তবে শুধু তার উপবি নির্ভর করেন নি—বঙ্গতত্ত্বের সন্ধান আপনি চোখেও রেখেছেন বোধ হয়—কারণ কৈশোরে আপনি এমন ঠায়ে ছিলেন যেখানে গ্রামের সঙ্গে বনভূমি বিশেষে। নইলে বাধান পাছের গিরে বঙ্গতত্ত্বকতন—গায়েব পাছের রাজা রাজা কচিপাতার ডেউ, সৌখাল হুসের স্বর্গমন্দির ঘেঁষতে পেতেন না। না যেখানে লিপতে পারতেন না—

অরুণ কুসুম অলমসি কুটে শাকলীঘেঁষে নরম রসে,
বনে অ-পর্ণা শাখায় শাখায় শিখায় শিখায় অলম অলম
হৃদয় ভাগে কঙ্কালদারা যেন অ-পর্ণা গড় 'গরে
হরচরন নব জীবনের শোণিতপুঞ্জ স্থলন করে।

বঙ্গতত্ত্বের ভাষাটা সংস্কৃতকবির, কিন্তু বর্ণনায় বঙ্গ আপনার নিখোর চোখেই বেধা। আপনার নবের বঙ্গতত্ত্বকেই প্রাকৃতিক বঙ্গতত্ত্ব জীতে রূপমান করেছেন। মাতারমনে বঙ্গতত্ত্ব সন্ধানের কথাও একটা কবিতার আছে। বঙ্গতত্ত্ব বিচারে—মনের বঙ্গতত্ত্বকেই বিচার দিয়েছেন—

নীরক্ত বনশ্রী নবমাতারের প্রসূতির মত
শিশল কাছনা বহি পূর্ণাহুতি লভি কনকত
ধর্মের মুকুল লভে রক্ত সত্য বলে পরিণতি
বাড়িঘের শাখা শাখা অলালুর লতা ফলবতী।
গোলাশ্রী কেশব করে দাখি হুয়ে আদরল গুটি
বেলাশেবে বেলাশেব হুকে হুকে গড়াগড়ি খুঁটি।
জামাজম-শল্যাকার কে বে আখি করে উদ্ভাসন ?
চোখ খেল চোখ খেল, বিশ্বময় উদ্ভিল যোবন।
অকুরের জুর বাণী কে শুনাশো তমালতপার ?
বেগুনমালা ত্যাকি নিল আখি বঙ্গতত্ত্ব বিহার।

আমিও বিচার মিচ্ছি বহু। শুভমসদের বিচার সংকল্প হলো। এ বই কেউ কিনবে বলে মনে হয় না—কিনলেও এর রস উপলব্ধি করতে খুব কম পাঠক। তবু এ বই থাকে তাকে বিসি করবেন না। অধিকারী পাঠক পেলে উপহার যেন। এই ভাবে বঙ্গতত্ত্বের সুরার সুরায়ে—তারপর আর সংকল্প না করে এর কবিতাগুলো বেছে বেছে যে বইএর সংকল্পে হবে তার মধ্যেই দিয়ে যেন।

বৈষ্ণব তত্ত্ব সংকল্পে জান না থাকলেও আপনার ব্রহ্মবৈষ্ণব কবিতা রোমান্টিক কবিতা বলে অনেক আদর করবে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের ভিত্তি না থাকলে বহু মঙ্গলের দল কেউ উপলব্ধি করতে না।

সংস্কৃত সাহিত্য বিন বিন অনাবৃত হতে চল, কাজেই পাঠক পাঠক খুব কঠিন হবে। এই বই যদি কোন বিন বি-এ বা এন-এ, পাঠ্য হয় তাহলে অব্যাপককে সংস্কৃত সাহিত্য ভালো করে পড়ে নিয়ে দর্শনবিজ্ঞান করে পড়াতে হবে—তখন এর মর্যাদা উপলব্ধি হবে। বিন বিন সংস্কৃত ও সাহিত্য যেনে উপেক্ষিত হচ্ছে, কাজেই এ বইএর অনাধর হবে। সেজন্য দুঃখিত বলেন না। কাল বহলে থাকে, যেনের ভ্রুটি প্রসূতির রক্ত বদল হচ্ছে। “কালক্রম হলে কবি শোভা নাহি পায়।” ইতি

আপনার শরণচক্র।

এখানে থাকার সময় আমার যে সকল সাহিত্যিকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় তাঁদের অঃ মনের কথা বলি।

আমার বাবার নিকটেই থাকতেন তখন ডাঃ প্রমোদ চন্দ্র বাগচি (বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব

উপাচার্য)। প্রতি রবিবার সকাল বেলায় তাঁর গৃহে স্নানোৎসব চা পানের আয়োজন ছিল আমার। তিনি সর্বদাই গবেষণায় ব্যস্ত থাকতেন—কিন্তু রবিবারের প্রাতঃকালটা আমার সঙ্গে সাহিত্যের নানা শাখার আলোচনার তাঁর অনেককণ অপর্যিত (তিনি অল্পই বলতেন সন্ধ্যারিত) হ'ত। নানা আলোচনার মধ্যে চর্চাপথের ছন্দ সবেছে আলোচনাটা আমার মনে বসে আছে। আমি তাঁকে বলছিলাম—ছন্দের দিক থেকে চর্চাপথের পাঠোদ্ধার অনেকটা কষ্টা যায়। তিনি তা বীকার করে দিয়েছিলেন। বঙ্গবরের ঐক্যবাস্তবতা বড়ই কষ্টপূর্ণ।

কবি বেংকুয়ার সায়চৌধুরীর পুত্রের বিবাহ হয় বেংকু-পুর রাজবাড়ীতে। Special train-এ চড়ে আমরা বরষাট্টী যাই। সেখানে ঐর হস্তে আমারের আপ্যায়নের তার ছিল তাঁর নাম হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। সেই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তখনও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় ভালো করে জানতাম না। ক্রমে তাঁর সঙ্গে যত সৌহার্দ্য বৃদ্ধির হতে লাগল—তাঁর দেখার সঙ্গে আমার পরিচয়ও তত প্রাচুর্য হ'ল। এখন সারথত কেন্দ্র তিনি আমার পরম বন্ধু এবং সহযোগী।

বঙ্গবাসী পত্রিকা স্তার আশুতোষের গৃহ থেকে প্রকাশিত হ'ত—মনোবী বিষয়গ্রন্থ মজুমদারের সম্পাদকতায়। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিশু সুপণ্ডিত কবি। তিনি তখন অল্প। তাঁর সঙ্গে উল্লিখিত থাকতে পত্র যাবতীয় হ'তো কিন্তু অজো দেখা হয়নি। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে (দেখা দিতে নয়) গেলাম তাঁর বাড়ীতে, বহুক্ষণ পরে আলোচনা করলেন আমার সঙ্গে। কিন্তু আলোচনার বিষয়টা সম্পূর্ণ ভারতীয় সংস্কৃতি সবেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি সবেছে আমি একেবারে অজ্ঞ নই কাজেই আলোচনার যোগ্য বৈজ্ঞানিক বিশেষ জ্ঞানবিদা হয় নি। সে দিন চলে এলাম তাঁর পর একদিন পরে একখানি পত্র পেলাম—তাতে তিনি লিখেছেন 'আমি কালিহাস' বলে—আপনি প্রবাস করলেন—আমি অল্প তাতে ভারতীয় আপনি কালিহাস নাম—আমি তাই মনে করে—আলাপ করেছিলাম। আমি চক্ষুমান হলে আপনার বাড়ী যেতাম। আপনি যদ্য করে আর একদিন আসবেন। তবে আমি শান্তি পাব।"

পত্র পেয়ে আমি সেলাম—আমাকে কাছে ডেকে বৃক্কে চেপে বসলেন। তারপর বহুক্ষণ পরে নানা সাহিত্যের আলোচনা করলেন। তিনি অনর্থক প্রাকৃত ভাষার নানা ছন্দের নিবর্ণন আকৃতি করতে লাগলেন। আমি বিজ্ঞান্য কংলায় এসব ছন্দ আমি কোথায় পাব? তিনি বললেন, 'প্রাকৃত পিঙ্গল' বলে ছন্দের বইয়ে পাবেন। আপনার পেটলো পড়ে দেখার স্বকায়। মন্তব্য সংস্কৃত ছন্দগুলিকে বাংলায় ননয়ন দিচ্ছেন—সেই হচ্ছে। কিন্তু গুণলো বাংলা সাহিত্যে ছন্দের নিবর্ণন হয়েছে থেকে যাবে—গুণলো চলবে না। গুণলু স্বতের প্রবন্ধবিশেষ বাংলা ভাষার পক্ষে উপযোগী নয়। প্রাকৃত ছন্দগুলোতে গুণলু স্বতের সন্নিবেশের প্রবন্ধ নেই। আপনি প্রাকৃত ছন্দগুলোকে বাংলার ননয়ন বান করুন। আমার ব্যাধি হবে না।

আমি বঙ্গবর ভাষাতত্ত্ববিদ বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে 'প্রাকৃতপিঙ্গল' বইখানি সংগ্রহ করে আনাগোড়া পড়লাম। তার ফল হল বহুসংখ্যে প্রকাশিত ছন্দের প্রবন্ধমালা। তার কথা আমি আগেই বলেছি, প্রত্যেক প্রবন্ধটি বিশদ্রবাক্যে শুনিয়া আপ্যায়ন, তারপর পত্রিকার আকসে দিতাম। বিশদ্রবাক্য আমার গুণলুমানীয় ব্যক্তি। তাঁর ক্যাব্রাহুগুলিকে আমি সবেছে রক্ষা করেছি। তাঁর খেদীয়াখটি আমায় চুঁচি দিয়েছে। সে বই কি আর কোথাও পাব? মন্তব্যমাঝের আগে বিষয়গব্যই কবিতার সংস্কৃত ছন্দের বাংলায় অন্তিমর রূপ দেখিয়েছিলেন। বিশদ্রবাক্য খুব বড় কবি হতে চান নি—তিনি ছন্দ নিয়ে খেলা করে আনন্দ পেতেন।

বর্তমানকালে তত্ত্ববদ্য ঐক্যে দর্শ প্রেষ্ঠ কবি বল মনে করেন—সেই জীবনানন্দ হাস একদিন তাঁর 'স্বরা পালক' নামক বইখানি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেন। সেই বইএর কবিতাগুলিতে তাঁর প্রতিভার অন্তর্যের পরিচয় পেয়েছিলাম।

আমি জীবনানন্দের স্বরাপালক পড়ে একটা কবিতা লিখেছিলাম। সে কবিতাটা এই—

পালক ভোমারে অঙ্গে বুলিয়ে পুলক পরল লভি
সে পরশে মনে হ'ল আশার বনের অন্ধান কবি।

সে পথের পাই শত কাননের কত মধু সৌভ,
 নীলআকাশের উদার সূক্তি করি তার অমৃতব।
 তাহার মাক্ষ্যে শুনি বেন সেই অসীমার তুমাথ্য,
 কত না তরুর শ্রান তরুণিমা নিঃসরণ বেষ আদি।
 কত না নীড়ের উকতাইলু ঠকল করে শ্রাণ
 অজ্ঞে আদার চামর বুলার চৈতী নলর বাহু।
 নানা ভক্তিতে কত সজ্জিত হুহুবিয়া ওঠে কানে।
 বন মর্মর, সরণার ধারা স্বপ্নার তোলে প্রাণে
 অকানা পাখীর খলিত পালক ভোমার পরণ গেয়ে
 তরুণ অরুণ বন্ধনা পান ঘোর প্রাণ উঠে গেয়ে।

সীতারাম কুটিরের দলয়ক্রের বৈঠকে মাঝে মাঝে
 নলিনীকান্ত সরকার ও কাজী নওরুল ইসলাম এসে
 মজলীসকে মশগুল করে হিত। এই কাজীর একখানা
 চিঠি—

কালিদা,

এইমাত্র সুবোধের কাছে জনলাব আমার ওপর রাগ
 করেছেন। আমার মাক্ষি বই এবং পত্রও বিয়েছেন। অবস্ত
 কোন ঠিকানার বিয়েছেন তা আপনাই জানেন। কৃষ্ণদগরের
 ঠিকানার নিশ্চয়ই ফেননি—তা। হলে নিশ্চয়ই পেতুম।
 শব্দবই সঙ্গে যেখা হয় কোথাও না কোথাও—তবু আপনাবই
 যেখা পাওয়া যায় না। অ.গানী রবিবার লন্ডায় যাবি।
 থাকবেন যেন, নইলে বাড়ীতে লঙ্কাভাঙ করে আশ্রয়।
 আপনার সীতারামকুটির ব্যবসের লক্ষ্য হয়ে উঠবে।
 আমার গল্পের লেখ নিয়ে খুব বড় একটা Leap বিয়েছি।
 সেলেই যেতে পাবেন। ইতি—

প্রণত
 নওরুল



শিশু-প্রাণ রবীন্দ্রনাথ

ত্রিনিবারথল বিখ্যাত

“বিল ডাক হলে বৈশাখ” নেমে এসে মর্ত্যের মাটিতে অমর্ত্যের রসি। দিকে দিকে শিকণিত হ’ল। ভাঙে-আঁসার কিশলয়। পূর্ব মাধুরী নিয়ে কুঠতে লাগলো স্বভাবল সহস্রবল বাংলায় সাহিত্যে কলার কুঠিতে। যুদ্ধনেত্র তাকিয়ে বেঁচলো শব্দ পৃথিবী। জানালো স্বভাঙে অভিন্নমন—বিশ্বয়ে সঙ্গমে প্রবতি জানালো। বাংলার রসি হলেন বিধেব কবি।

এমনি একদিনে ৯৮ বৎসর আগে কলিকাতার ষোড়শীকোঠাভূর বাড়িতে শিশু বাচ্চিয়ে যে আবিষ্কারকে স্বপ্নে আনিয়ছিল তার বিকাশ ও ব্যাপ্তি বিরাট—অনন্ত সম্ভাবনার সূত্র। তার সৃষ্টি ও অর্থহান দ্বিগুণে বিলীন বিশাল রচাকর। আমরা সাধারণ মানুষ তার বাণ্যকাবেসার গাড়িয়ে উমিমালায় নৃত্যভঙ্গি দেখি। শুনি তার “বেহমন্ত-শব্দ ভাষা নিবন্তর প্রপাত অধরে, মহেন্দ্রমন্দিরপানে অস্তরের অনন্ত প্রার্থনা”। যেখি “আর্জকরি হিরে যায় ধরিত্রীর নির্বল লগাট আশীর্বাণে”। কখনও বা শুনি মহাকল্প বন্দলিত গর্বাছ নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিধ্বরে তার দাবধানী গর্জন।

রবীন্দ্রনাথ সহজাত কাব্যমালিকা কণ্ঠে ধারণ করেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি বাচ্চির বরপুত্র গুণী গরীয়ান। তাঁর ভাষায়ই বলি—“তুমি কেমন করে গান করবে গুণী—অথাক হয়ে শুনি কেবল শুনি।” “কিছু তার যেখি আভাণ—কিছু পাই অগ্রমানে—কিছু তার বুদ্ধিমা বা।” বুদ্ধি আর নাই বুদ্ধি ভালো লাগে। তাঁর বহুবুখী প্রতিভা বিকণিত হয়ে বর্ণে গন্ধে সানে দিকে দিকে পরিবেশন করেছে আনন্দ ও সুখমা। তাঁর অর্থহান আকাশের মত উদার, সপ্তস্তের মত গম্ভীর। সেই হৃদয় পারাবার তীরে তরঙ্গবিশিষ্ট অগণিত উপল খণ্ডে হ’ এগুটি মাত্র সংগ্রহে এ অর্থ নিবেদন। এ হচ্ছে গঙ্গাকলে গঙ্গাপুখা। তাঁরই কথায় তাঁরই আলোচনা। কথা

কোথা পাবো? “কইতে কথা বাধে—হার কেনে যে পরাণ শুধু কাঁধে।”

কাব্যমালকের স্বভাব-মালিকের রবীন্দ্রনাথ যে পন্নিবেশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা ছিলো কবি প্রতিভা বিকাশে পক্ষে সর্বতোভাবে পরিপোষক। বাণ্যে বা কৈশোরের সাহিত্যচর্চার প্রভাস দখল অশোভন হলে মনে করার রেওয়াজ ছিল অস্তিত্বক মরলে, তখনই তিনি স্বচ্ছিত সানে পেয়ে পিতার কাছ থেকে পুংস্বার পেয়েছিলেন পাঁচ শত টাক। তার থেকে প্রভাবের কাছ থেকে তিনি পেতেন অভাবিত উৎসাহ ও প্রেংখা। এমনি উৎসাহ-ভোক্তক পরিবেশে শিশুরবি হয়ে উঠলেন শিশু-কবি। তিনি একদিন লিখে বসলেন—

অনন্ত হৃদে ফেলি তাহাতে কহনি বলি—

শব্দেখি বাহিয়া বিয়া ভাতে
হাপুগ হাপুগ শব্দ চাহিবিকি নিহু
পিপীড়া কাঁহিয়া যায় পাতে।

সাতকড়ি মাটির চাংপখী কবিতার—

রবি-করে জালাতন আছিল সবাই
বহুখা ভরলা বিল আর তর নাই

লিখে আর ছ’ পর রবীন্দ্রনাথকে পূরণ করতে দিলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গেই শিশুরবি লিখে গিলেন—

মৌগণ মৌগ হয়ে ছিল সরোবরে
এখন ত্যহার শ্রুৎ হলজীড়া করে।

কবির খেলাশী রচনা এক বিশ্বয়। কি তার শব্দ-শিক্সা, অর্থ-সজ্জিত, ছন্দ-মাধুরী! তিনি লিখলেন—

নিমিষিনি গাড়িয়ে আছ মাঝর সার জট
ছোট ছোট মনে কি গড়ে ওগো প্রাচীন বট।

এমনি কত কবিতাই না কবির বাতার পাতায় তরে উঠলো। তাঁর প্রথমলেখা একখানা নীল বাতা হারিয়ে গিয়ে কত মনিষুকুই না হারিয়ে গেছে। আমরা আশা-

করি বিশ্বাস্যতী ও বহীষ্কপরিবারের এটোয়ার তাঁর
অগ্রকানিত শিশু কবিতাগুলো সংগৃহীত হয়ে বাংলায়
শিশু-সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

তিনি ছিলেন শিশুদের পরম আত্মীয় পরম কল্যাণকামী।
জগৎ-পারাবার তাঁরে শিশুর মহামেলার তিনি নিত্যক
কেনেছিলেন ছায়ে। শিশুরা তাঁর কাছে পৌছায় নবনের
সংবাদ। তাইত বৃক্কের নাকারে নিয়ে পরিপূর্ণ প্রাণ দিয়ে
তিনি করেছেন এদের আশীর্বাদ। “এই ছানিমুখগুলি
হাসি পাছে যায় ভুলি পাছে যবে আঁধার প্রদান”—একজ
তাঁর ভাবনার অঙ্গ নাই। কবির গান—

“এদেরে নবাই বিবে রাখে

সত্যের পথের পরে নান ধরে ডাকে।”

শিশুরা আসে তাঁর কাছে “জগতের স্বপ্ন হতে ডাঙ্গিরা
আনন্দ স্রোতে।” এরা তাঁর পরম পাওয়া—“দব দেহতার
আহেরে ধন”। তাই মায়ের মেহে বৃক্ক চেপে রাখেন—

“হাড়াই হাড়াই ভরে গো তাই

বৃক্ক চেপে রাখতে যে চাই

কঁধে মরি একটু সরে দাঁড়ালে।”

এমন করেই কবি ভালোবেসেছেন খুলির শিশুদের।
ধনীত চুয়ারে কাছালিনী ভিখারিণী মেরেকে বেধে তাঁর
চোখে রয়েছে অঝোর ধারা। মায়ের সোহাগে তিনি
চেরেছেন—“ছবনখানি-গগন হ’তে উপাড়ি আমি ভুলিয়া
হিতে ছ’হাত ভরিয়া।” ভালোবাসেন তিনি শিশুদের
“শিশু বলেই, ভাল বলেই নয়।”

কবি ছিলেন হংসী স্রষ্টা ও স্রষ্টা। তাঁর দৃষ্টিতে
শিশুদের কোনো অলিগলিই বাক পড়ে নাই। খোকার
মনের ঠিক মাঝখানটিতে তিনি আসন পেতে বসে আছেন।
তাই তাঁর কবিতায় খোকার মনের সাধ আচ্ছাদিত রূপ
অভিমান মল্ল রূপ পেয়েছে।

“রবি নশী তারা সভা করে আকাশের তলে

খোকার সাথে গোপনে কথা বলে।”

“আদি শালবনপরে মেঘেরা মস্তথা করে

খোলা করিবারে তার মাথে।”

এমন কি “আশার অতীত ধারা সরে” তারাত খোকার
কাছে বসে ধরে “কত হে-এ কত বলবৎ”। খোকার মন

অস্বাভে নির্ভর বেড়িরে আসে “কুশোণছাড়া অগুরুপ
অসম্ভব হেহে” :

“সেবা কুল সাছপালা

নাগ কল্যাণে বালসা

মাছুষ রাক্ষস পশুপাখি

যাহা খুলি তাই করে

সত্যেরে কিছু না ভবে

সংসারেরে দিয়ে তার কাকি।”

তাঁর “খোকার হেরে গল্পবচন বর্ষা শরৎ—খেলার গৃহ
হয়ে উঠে বিশ্ববঙ্গ”। আলোর সদায়সী মুক্তিলাভ
নিত্যকালের খোকারা ছুটির নেহার ছুপুরকণ্ড বিকাল
করে। মাঝ আকাশের স্বর্গকণ্ড ডুবিয়ে দেয় মাঠের
শেষে।

“মনে করে উঠলো নীলমের তারা

মনে করে গড়ো হলো যেন

রাতের বেলা ছুপুর বহি ঘর

ছুপুরবেলা রাত হবেনা কেন?”

খোকা সদায়সী হেরে হতে চার কুকুর ছানা, টিরেপাখি
আবও কত কি? মুক্তিগাঙ্গল মন পাঠশালার পথের
ফিরিওরালাকে ঘেঁষে চায়—‘শেষে তেলে দিয়ে অমন
করে বেড়াই নিয়ে ফেরি’ বাধনশাসন মেহের অত্যাচারে
অতিষ্ঠ খোকার মন চার বাহুরে কুদবাগানের মাদী হতে।
সেখানে—

“কেউ এসেত বকবে না তার কাছে

মা ভাবে ত পরায় না মাফ মাফ

ধুরে হিতে চায়না খুলাবালি”

শইচ্ছে হয় পাখারগালা হয়ে

গদির ধারে আপন মনে আসি।”

মাষ্টারি করার আগ্রহও তাঁর কম কিছু নয়। “গোড়ো
করে বিড়াল ছানাটি মিছিমিছি খসে নিয়ে কাটি”। বাবার
চিঠি না পেয়ে কতি মনের ব্যাকুলতায় “লাইন কেটে মোটা
মোটা বড় বড় গোটা গোটা” অঙ্করে চিঠি লিখে আপনি
এনে মাকে পড়িয়ে দেবে। কেননা পিয়নের স্বভাব—
“ভালো চিঠি দেয়না ওরা পেলো”

শিশু মনের এ এক অপূর্ণ কাব্যরূপ। কবির শিশু মানি

হয়ে এপার ভগ্নার দুই পায়েতেই নৌকা বসে যায়।
মর্ত্যের হাটে নিয়ে আসে স্বর্ণের সত্ত্বা। শিশু মনের
হাঝারো রকমের খেলায় বাসনা কবির ভাষায় ছবি হয়ে
দুটে রয়েছে। তাঁর খোকা কখনও বা বাবার মতো বড়
হয়ে একলাটি রথের ভীড়ে ঢুকে পড়েছে। শঙ্কানবায়
মানকে আবার বদকাচ্ছে—

“বেছেছ নাকি হয়েছি সে বাবার মতো বড়ো।”

কুণ্ডু আগছে নিয়ে যেতে মাঠে বিকেল বেলা, তাকেও
ঘমনিরে বলছে “কাল ক’ছি গোল করনা বেলা।” ঝাঁর
পুরুষ হয়ে ভীতিবিহ্বল। মাকে অস্তর দিয়ে হাঁকছে—
“আনি আছি তব্ব কেন মা কর তু” কখনও বা মধুনাড়ির

“নৌকা চড়ে বাজার ছেলে হয়ে—

নৌকা ভরা নোনা মানিক হয়ে

আঙুলে আর স্রাবকে নিয়ে মাঝে
বেড়িয়ে আগে তেপান্তরের মার্গ”

দেখা থেকে—

“বাজার লজ্ঞ আনবে মেঘেওড়া

পক্ষীবাচ্চের পাছা দুটি খোড়া

কমক লতার চারা অনেকগুলি

মায়ের তরে যেবে কোঁটা খুলি

শান্ত বাজার ঘন মানিক একটি জোড়া।”

কখনও বা হাওয়া হয়ে মায়ের বুকে বসে যায়, কখনও
অলের চেটে হয়ে মনের বেলা খেলছে মায়ের সাথে।
আবার বাবদ্যাহতে গায়ের বনে স্বরস্বরানি গান গায়।
বিজলি হয়ে আনালা দিয়ে মাকে উঁকি মেয়ে ধেয়ে।
ঘোংঝা হয়ে মায়ের চোখে চুমো ধোয়ে পাল্লায়। “কণ
হয়ে আঁধার কীকে বেশতে খোকা আসে মাকে।”
এমনিতরো শিশু মনের হাঝারো রকমের ইচ্ছা অনিচ্ছা
খেলায় খুশির বিচিত্রতা কবির কাব্যিক হৃৎ-এ ছবি হয়ে
রয়েছে। শিশুদের অস্ত তিনি বেখে পেছেন কত কথা কত
গান। এত প্রাণ তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন শিশুদের মধ্যে।
তাই তাঁর মুখে শুনি

“ওরে মোর শিশু তোলামাখ মোরে তত্ত্ব বলে

নে যে তোঁর ভাঙবের বলে

যেয়ে চিন্তে মোর সকল তোলায় ঐ বোর

বেলনাভাকার খেলা’বে আমারে বলি।”

শিশুর মেলায় শিশুর খেলায় তিনি পেয়েছেন আনন্দ,
মেখেছেন মুক্তি। তিনি লিখেছেন—“আমাবিবার বস্ত
গ্রাস থেকে বেহিয়ে এসে শিশুতোলামাখ লিখতে বনে-
ছিলাম, বকী যেমন কীক পেলে ছুটে আসে সমুদ্রের খারে
হাওয়া যেতে। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়লে তবেই মানুষ
লপ্ট করে আবিষ্কার করে তার চিন্তের লজ্ঞ এত বড়ো
আকাশেরই কীকটা ঘরকার। প্রবীণের কেলার মধ্যে
আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার
করেছিলাম অস্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তাইই খেলায় কেত্র
সোক সোকাস্তরে বিস্তৃত। এই লজ্ঞ কল্পনার— শিশুসীমার
মধ্যে ভুব বিলুপ্ত—শিশুসীমার তরফে সীতার কাটলুং।
মনটাকে শিশু করার লজ্ঞে নির্দল করার লজ্ঞে মুক্ত করার
লজ্ঞে।”

বৃত্তিধারার মতে: কত মিঠি কবিতাই না কবি ছড়িয়ে
দিলেন। তার হৃদয়সজ্জার শিশুউত্থান তার উঠলো
ফুল ফলে। প্রবীণ কবি পাতলেন খেলাবার শিশুর
ভুবনে।—শিশুতোলামাখের সাথে স্তব্ধ হলো কি বিচিত্র
বেলা—

“গাছের বেলা ফুল ভরাবো

ফুলের বেলা ফল ধরাবো

ফলের বেলা অস্তুরের অস্তুরে

ফলের বেলা অলের কোলে

ফলের বেলা হাওয়ায় ফোলে

হাওয়ায় বেলা আপন বাঁধি বসে।”

ফুলটো কতো পরিচাত বর্ষে গড়ে। শিশুমনে লাগলো
খোলা। তার মনের আকাশে দেখা দিলো ইন্দ্রধনু। অস্তুরে
তাঁর কথা—অস্তুরে তাঁর গান। কইতে গিরে হার মেনে
কীটাই হয় সার। পরাজিত মন দেখেবো হয়ে উঠে
প্রকাশের বিহ্বলভার।

আমকের দিনে অষ্টমবর্ত্তিতম রবীন্দ্রাব্দে শিশুপ্রাণ
রবীন্দ্রনাথকে জানাই প্রণতি—

পথম প্রমাণে শিশুতোলামাখে

নিয়োছিলে বুকে টানি

সেই স্বতি মুখে পরমপুলকে

রাখিলু প্রণাম খানি।

নিবাসিত

শ্রীজয়দেব রায়

বাগডে আইল্যান্ডে খুব বেশী লোক বোধহয় থাকেনি। এই দ্বীপটা হচ্ছে টেংগে যোজকে, ক্যান্টোন হুঙ্ নাকি এই দ্বীপটাকে কোন-এক বৃহস্পতিবার আবিষ্কার করেছিলেন। স্থানীয় লোকে বলে এই আয়গাটা নাকি ঈশ্বর সর্বাঙ্গে সৃষ্টি করেছিলেন। হঠাৎ সৃষ্টিই তাই। সিডনিতে থাকার সময় অনেকেই বলেছিলেন—“মশাই, মশাই, ওখানে কিছুই দেখবার নেই।”

তবু কেমন যেন জেব হ'ল—না একবার বেড়িয়ে আসি।

একটা ছোট ভিডি জাহাজ আমাকে ব্যাঙ্কিংসলায় নামিয়ে দিয়ে গেল—বাংলায় সমুদ্র তীরের একজন বঙ্গল—‘সাননে এগিয়ে গেলে একটা ঘোতলা বাড়ী পাবেন, সেটাই হোটেল।’

আমি অস্বাভাবিক অনেক কষ্টে পথ দেখতে দেখতে হোটেল বাড়ীটার সিরে পৌঁছালাম। বড়ঘাটা বড় ছিপ—বারগার হীক বিলান কড়া নাড়ল্যাম। ওপরের একটা ছোট জানলা খুলে একটি বৃদ্ধা মহিলা বললেন—দে, কে ? কি চাও ?

আমি বললাম—আমি এইমাত্র দ্বীপে এসে পৌঁছালাম।

আমি একটা ঘর পাবো কি ?

—নেমে যাচ্ছি।

প্যাবাকিন ল্যাম্প হাতে একটি বৃদ্ধা বেনে এসো; পোষাকটি বেঁধে দেন হ'ল অবস্থা সুবিধার নয়। আমাকে একটা ঘর দেখিয়ে দিয়ে বসল—আজ আর কিছু খেতে দিতে পারব না। শুয়ে পড়ুন এই ঘরে।”

তারপর জেত সিরে কিংবে দাঁড়িয়ে বসলো—“আপনি এ দ্বীপে কেন এসেছেন ? আপনাকে দেখে তো জাহাজী বলে মনে হয় না ?

আমি সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম—“হোটেলের কি কেউ থাকেন না ?

হুড়ী একটু বিরক্ত হয়ে বললেন—“ক্যান্টোন বারগেট এখানকার দ্বীপী বাসিন্দা আর কালেভালো কেউ হয় ত এসে থাকেন।”

পরদিন সকালে ক্যান্টোনের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তখনলোক বেশ লম্বা চওড়া, এককালে কাজকর্ম করতেন হয় তো, এখন অসুস্থ নিয়ে এখানে বাস করছেন।

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বললেন—“মশাই, আপনি এই দ্বীপে এসেছেন যখন একবার ফ্রেন্সে জো-কে দেখে যাবেন। বেচারার খোঁজ খবর নেবার কেউ নেই। লোকটির বয়স হয়েছে ১০০ বছর কাছাকাছি—আপনি করানী জানেন তো ?”

সেদিনই তাঁর সঙ্গে ফ্রেন্সে জো-কে দেখতে স্থানীয় হাসপাতালে গেলাম। লোকটি স্ক্রানেলের পাখামা পরে বিছানায় কাত হয়ে পড়ে আছে; জামা, পাজামা যেমন পুরোনো তেমনই ছিন্নভিন্ন। বুকের পায়ের গেল অপরের ব্যবহৃত।

শেষ ফিটফাট চেহারা কিন্তু, গোঁফবাড়ি ভাল ক'রে কামানো। কথা বলতে গিয়ে উচ্চারণ শুনে বংগে পাংলান লোকটি কদিকান। ইংরেজিও বলতে পারে ডাক্তারভাড়া, কথা বলতে বলতে গলার স্বর এমন ভাবে মাঝে মাঝে চেপে যায় যে, মনে হয় বহুদূর থেকে কে কথা বলছে।

শুনলাম যে কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। করানী দেশের এককালের বহু নামকরা অভিজাত পরিবারের কথা তিনি বলতে লাগলেন—

“আমাদের পরিবারে অনেক জেনারেল জন্মিয়েছেন। নেপোলিয়নের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আছে। আমি তাঁর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছি।”

তাঁর কাছ থেকে যে ইতিহাস শুনলাম তা যেমন চমকপ্রবণ তেমনই রোমাঞ্চকর। ১৮৪১ সালে তিনি করানী

সৈন্তবলে গেল বেন—ভারপর দীপ ১৫ বৎসরের ইতিহাস
তিনি অনবল বলে গেলেন। বহু বুদ্ধি তিনি লড়েছেন।

তিনি বলছিলেন—১৮৭০ সালে আমি প্রাণিয়ার সঙ্গে
লড়াইতে সাংঘাতিকভাবে আহত হই। যে সৈন্ত আমাকে
তবাবিরি আঘাত করেছিল, তারও বুকের মধ্যে গিরে
আমার তবাবিরি চাপিয়ে তাকে মাটির সঙ্গে বেঁধে ফেলি।
মরবার সময় সে কেঁবে বল—‘মা মা’ বাজাচ্ছে।

বহু বৎসর আগে নিহত সেই স্তম্ভের কথা মনে
করতে জো-র চোখ দিয়ে হরহর করে বল পড়তে লাগল।

জো বলে চললেন—কিন্তু ফরাশী সাম্রাজ্যের পতন
হ’ল, আমি শুধুমাত্র সাধারণতন্ত্র হয়ে যোগ দিলাম। ম’সিয়ে
মোরাসের সৈন্তবাহিনীর সঙ্গে আমি লড়ি—অন্তি নজার
লোক ছিল।

বলতে বলতে তাঁর মুখ ব্রণাবিধেবে কালো হয়ে গেল।
তাঁরি অদ্ভুত লাগছিল, বলতে কি লড়াই লাগছিল যে লোক
৫০ বছর আগে মারা গিয়েছে, তার সম্পর্কে এখনও জো
এতটা বিবেচ পোষণ করেন।

তারপর বলে চললেন—শতাব্দের হাতে বন্দী হয়ে আমি
নিউ ফার্সিজোলিয়ায় নির্বাসিত হই।

তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন—আমাকে
তারা খুবই কষ্ট, কিন্তু বুঝলেন, সাহস করে নি।

যে জাহাজে করে নির্বাসিতরা আসছিল, সেখানকার
এক ক্যাপ্টেনের সাহায্যে ফ্রেন্সে জো এক তান্ত্রিতে পালিয়ে
গাঁতার কেটে এক নির্জন ঘোঁরে গিয়ে উঠলেন। বলতে
লাগলেন—‘ঘোঁরে কোন লোক আমার কোন কথা বুঝতে
পারল না। যাই হোক, আমি মুক্তি পেলাম।

তারপর নানা অভিযান শুরু হ’ল, নানা ভাবে কষ্ট
ক’রে আমি নিউ গিনি ঘোঁরে গিয়ে উঠলাম। সেখানেও
নানা চূনামারগিক কাজের পর আমি একজন হিংস্র বড়
নেতিবেরে রাজা হয়ে উঠলাম।”

জো কাঁপা গলায় বললেন—‘জানেন, আর যে-আমি
আপনারেই হায়ার উপর নির্ভর করে এই হাসপাতালে পড়ে
আছি, আমিও একদিন সাবা তম্বাটের রাজা হয়ে
উঠেছিলাম।

তারপর ইংরেজ সৈন্তবলের সঙ্গে আমার লড়াই হল,
আমি রাজ্যচ্যুত হলাম, সেখান থেকে পালিয়ে আমি এক
লম্বা সময়ের হল গড়লাম, সে হলও হারিকেনের উপর

হুতভ হতে গেল। তাৎপর এই ঘোঁরে আমি ভাগতে
ভাগতে এসে পড়লাম। মাপার একটা এন্টও আঘাতে
আমার কর্ণপঞ্জি একেবারে নষ্ট হয়ে গার।

সেই এই হাসপাতালে স্থানীয় লোকের ব্যার উপর
নির্ভর করে আমাকে পড়ে থাকতে হয়েছে।”

বললাম—আপনি কিসের কথা কহলে কিংবা কিংবা কিংবা
না কেন? এখন তো সেখানে কোন লড়াই নেই।

লোকটি এগুটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ৫০ বছর পরে
জানাই বলুন আর কিসেরই বলুন, দুইই আমার কাছে
অচেনা ব্যাপার। কদিকাতে আমার যা ভবিষ্যৎপা ছিল
তা আমার আর্দ্রত্বা কেড়ে ফেড়ে নিচ্ছে। এখন ঘোঁরে
ফিরে গেলে তারের সঙ্গে আমার মারপিট করতে হয়।
তা আমি চাই না।

বলতে বলতে জো-র চোখ জড়িয়ে এল। হাসপাতালের
নার্স বিছানার ধারে গাড়িয়ে ছিল। সে বলল—ফ্রেন্স
জো তারি মবার লোক।

আমি বললাম যাই হোক, বেশ বৈচিত্র্যময় জীবন
কাটিয়ে গেলেন।

লোকটি জো খুলে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন—
—‘না না, আমি এক কষ্টকর জীবন কাটিয়ে গেলাম।
আমার সারা জীবনই বার্ষিকার ইতিহাস। আর আমি
শুধুমাত্র বক্তব্য দিই, যা আমার বেশ নেই। তা হলে
তারেরও এই দুর্ভাগ্য বহন করতে হ’ত।”

নার্স বলল—তুমি ইংরেজ পারের দশ মণে হাও না
কেন?

লোকটি বিরক্ত হয়ে বলল—“এই বিজ্ঞি ৪৭২ যিনি
স্বর্গ করেছেন তাঁকে কেন তাকি করব?”

নার্স আমাকে বলল—দময় হয়েছে, এবার বাইরে
চলুন।

যাবার সময়ে জো-কে আমি বললাম—আপনার ভক্ত
আমি কি কিছু করতে পারি?

লোকটি স্নান ঘাণি ঘেঁষে বলল—“বক্তব্য, একমাত্র
মৃত্যু ছাড়া আমার কামা আর কিছু নেই।—আজ্ঞা,
জ্ঞানেশ্বর, নিম্নে ইউরোপের যে কোন দেশে তৈরি একটা
লিফটেট বহি দিয়ে যান। দেশের একটু ছোঁয়া আছে
এমন একটা জিনিষ—”

জীবনের ক্রমবিকাশ

বিমল ঘো

(পৃষ্ঠাস্বরূপি)

বাস্তবিক পক্ষে যেহেতু মনে কোনো স্থানান্তর অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। এই দুইটি যে একই সত্যের বিভিন্ন দুইটি রূপ তাহা 'spinoza' গ্রন্থে চিন্তাশীলদের মনের হইতেই মানুষ বিধিস করিয়াছে। যেহেতু মনের এই শব্দকে তাঁহারা 'mind body' বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এই শ্রেণীর চিন্তার ধারাকে 'নমিষ্ট' বলা যায়। Spinoza-র Nomism, Descartes-এর Dualism-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এই প্রকারের চিন্তাধারা প্রাণীবিজ্ঞান-ক্ষেত্রে তীব্রতর খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু ইহা মনে রাখা প্রকার যে প্রাণীবিজ্ঞান-ক্ষেত্রে তীব্রতর Nomism-এর প্রভাব আছে সত্য কিন্তু সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা বৈতন্যকেই (dualism) বেশী করিয়া চিনিয়াছিল এবং বিশ্বের সমস্ত প্রবাহকে ঐ চিন্তাধারার দুটি দ্বিধাই বেঁধিত। সাধারণ মানুষ এখনও শরীর এবং আত্মাকে ভিন্ন করিয়া দেখে। সাধারণ মানুষ এখনও বিশ্ব এবং ইহার ঘটনা-প্রবাহকে ভৌতিক এবং মানসিক সত্যে ভাগ করিয়া দেখে এবং এই দুইটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দুইটি সত্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রাণীবিজ্ঞান এই বৈতন্যবাদ হইতে দীর্ঘ দূরে চলিয়া গাইতেছে এবং একই সত্যের বিভিন্ন রূপ ভিন্বে দেখিতে শিখিয়াছে। প্রাণী-বিজ্ঞান আর বিশ্বের ভৌতিক এবং মানসিক ঘটনাবলীকে একই বিশ্ববস্তু (world stuff) ভিন্ন রূপ বলিয়া বিধান করে এবং এই বিভিন্ন দুইটি রূপের চরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে আদিম প্রাণী এবং তাহার চিন্তাধারা, আবেগপ্রাণ এবং চিন্তা-শক্তি।

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (conditioned reflex) ও চেষ্টিতবাদ (behaviourism) :—বর্তমানে চেষ্টিতবাদের সম্বন্ধে দুইটি সম্ভাব্য বর্তমান। একটি সম্ভাব্যের নেতা

আমেরিকার Watson, অপরটির নেতা রাশিয়ার Pavlov. Behaviourist বলিতে সাধারণত আমেরিকার সম্ভাব্যকেই বুঝায়। কিন্তু রাশিয়ার সম্ভাব্য যার Pavlov এই ক্ষেত্রে আর ৪০ বছর ধরিয়া এই বিষয় গবেষণা করিতেছেন, তাঁহারাও মূলতঃ আমেরিকার Behaviourist-দের মতবাদেই বিশ্বাস করে। তাঁহাদের গবেষণা আমেরিকার সম্ভাব্যদের মতই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে (objective-method) চালাইয়া থাকে। রাশিয়ান সম্ভাব্য তাঁহাদের গবেষণা কুহুর লাইচা করিয়া থাকেন। কুহুরের উপর পরীক্ষা চালাইবার কতকগুলি সুবিধা আছে। কুহুরের মানসিক গঠন মানুষ হইতে অনেক কম জটিল। তাহা হইলেও ইহাদের মানসিক ক্রিয়া প্রতিবেশের ঘটনাবলীর সংঘাতে মানুষের মানসিক ক্রিয়ার মতই একই নিয়মে পরিচালিত হইতে যায়। কয়েকই কুহুরের মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার গবেষণামূলক পরীক্ষার ফলাফল মানুষের বেলায়ও কাঙ্ক্ষিত লাগিতে যায়। অথচ কুহুরের মানসিক গঠন কম জটিল বলিয়া ইহার উপর গবেষণা করা অনেক সহজ। প্রাণী-বিজ্ঞান এই অংশ এখনও গবেষণাধারার কোঠা ছাড়াইয়া পরিপক্ক বিজ্ঞানের আসনে স্থান পায় নাই। কয়েকই ইহা হইতে আমরা বর্তমানে একটি পরিপক্ক বিজ্ঞানের নির্ভুল সিদ্ধান্ত আশা করিতে পারি না। তথাপি বর্তমানে আমরা নির্ভর্যে বলিতে পারি যে ইহা মনোবিজ্ঞানকে এক নতুন দিকের পথ দেখাইয়াছে এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া মনোবিজ্ঞান প্রাণীবিজ্ঞান এক শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করিবে।

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত কি কি :—বিশেষ শব্দের প্রথম দিকে Pavlov দেখের কতগুলি গ্রন্থি এবং ইহার সক্রিয়তা সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিলেন। প্রধানতঃ পাকস্থল সম্বন্ধে গবেষণাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি দেখিতে পাইলেন

লালাগ্রন্থি জীববৈজ্ঞানিক প্রয়োজন অনুসারে কাজ করিয়া থাকে। তিনি দেখিলেন যখনই মুখে কোনো খাদ্য দেওয়া হয় তখনই এই গ্রন্থি সক্রিয় হয় এবং সুপেয় তরিতর এমন পরিমাণ লালাস্রবণ হয় যাতে ঐ খাদ্যগ্রন্থি ভালভাবে ভিজিয়া যায়। অল্পমাত্রা খাদ্য মুখে দিলে যে পরিমাণ লালাস্রবণ হয় শুকনো খাদ্য মুখে দিলে তাহা হইতে অনেক বেশী লালাস্রবণ হয়। খাদ্যের বিভিন্নতার জন্য কেবল এই লালায় মাত্রিক (Quantitative) প্রভেদই দেখা যায় তাহা নহে খাদ্যের গুণগত বিভিন্নতার জন্য লালায় আঙ্গিক বিভিন্নতাও দেখা যায়। যদি এমন কোনো খাদ্যগ্রন্থি মুখে পড়ে, যাখা গিলিয়া ফেলান প্রয়োজন, তাহা হইলে এই গ্রন্থি সে লালাস্রবণ করিবে তাহা তৎপরে হইবে, যাতে গিলিয়া ফেলিতে কষ্ট না হয়। অপর দিকে মুখে যদি কোনো কর্ণব বস্তু অথবা রাসায়নিক বস্তু পড়ে যাহা তৎক্ষণাত্ ফেলিয়া দেওয়া প্রকার তাহা হইলে এই গ্রন্থি জলের মত তরল লালাস্রবণ করিয়া থাকে—যাহাতে ঐ বস্তু মুখ হইতে পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া দেওয়া যায়। Pavlov প্রদত্তঃ মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালী এবং শরীরের সহিত মনের সম্পর্ক লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন গ্রন্থির কার্যপ্রণালী নির্ণয় করা। কারণেই একই গ্রন্থির বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার এবং কি পরিমাণ লালাস্রবণ হয় প্রথম প্রথম তাহা তাহার মনে বিশেষ ধাপ কাটিতে পারে নাই। কিন্তু যতই দিন যাইতে আরম্ভ করিল ততই এই দিকে তাঁহার নজর পড়িতে আরম্ভ করিল এবং অনেক গবেষণার পর তিনি নিম্নোক্তে পৌঁছাইলেন যে, লালাগ্রন্থির বিভিন্ন সময়ে এইপ্রকার বিভিন্ন স্বকর্ম প্রতিবেদন দ্বারা যে গুণগত প্রতিবর্ত প্রতিবেদন (inborn reflex response) ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার সহিত মানস-ক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক নাই। যখনই কোনো ভ্রম্য জিন্সের সংস্পর্শে আসে তখনই ইহার দ্বারা জিন্স এবং তাহার (Palate) বিশেষ স্বাদবস্তুর প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করে। এই প্রতিক্রিয়া স্বাদবস্তুর সংস্কৃত নার্ভ বাহিয়া লালাগ্রন্থিতে যাইয়া আঘাত করে। লালাগ্রন্থিতে আঘাত পৌঁছাইবারাত্র আঘাতের আঙ্গিক (Quality) এবং মাত্রিক (Quantity) অনুসারে স্বতন্ত্রভাবে লালাস্রবণ করিয়া থাকে।

Pavlov-এর গবেষণার এইখানে বীরে বীরে মন আসিয়া যোগ দিল।

তিনি দেখিলেন লালাগ্রন্থি যে কেবল স্বাদবস্তুর দ্বারা প্রেরিত সংবোধের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ লালাস্রবণ করিয়া থাকে তাহাই নহে। ইহা হইতে একটি অদ্বন্দ্ব উপায়ে লালাগ্রন্থিকে মিত্ররূপ করা যায়। তিনি দেখিলেন যে, লালাগ্রন্থি যে কেবল মাত্র খাদ্যগ্রন্থি জিন্সের সংস্পর্শে থাকিলেই লালাস্রবণ করে তাহাই নহে, খাদ্য গ্রন্থের গন্ধ দৃষ্ট এমন কি খাদ্যগ্রন্থি তখন করিবার লক্ষ্য বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিতে আঘাত করিয়া মাত্র লালাস্রবণ আরম্ভ হয়। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, একটি কুকুরের কাছে যদি তাহার প্রিয় কিছুটা খাদ্য রাখা যায় তবে তাহাকে খাদ্যটি খাইতে না দিলেও তাহার জিন্স হইতে লালাস্রবণ হইতে আরম্ভ করিবে। তিনি আরও দেখিলেন, সেই কুকুরটির কাছেই তাহার খাইবার অল্পমাত্রা খাদ্যগ্রন্থি লইয়া খাইয়া মাত্র তাহার মুখে প্রচুর পরিমাণে জলের মত লালা দেখা দেয়। এইখানে আমরা সাধারণ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (reflex-action) জগৎতে প্রতিবেদন (response) ছাড়াও অল্প কিছু পাইতেছি। একটি কুকুরের কাছে প্রথমবার যখন খাদ্য অথবা অখাদ্য দেওয়া যায় তখন এই সনত প্রতিক্রিয়ার একটিও দেখা যায় নাই। এই প্রকারের প্রতিবেদন (response) নির্ণয়ের জীবনের পূর্ণঅভিজ্ঞতার ফল। একটি কুকুরের গুরুমস্তিক অকর্ষণ্য করিয়া বিয়া অথবা দরায়ীয়া লইয়া যদি উহার মুখে খাবার দেওয়া যায় তাহা হইলেও উহার লালাগ্রন্থি স্বাভাবিক ভাবে কাজ করিবে। কিন্তু যদি ঐ কুকুরটিই চোখের কাছে অথবা নাকের কাছে ঐ খাদ্য বস্তু রাখা তবে তাহার লালাগ্রন্থিতে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না। ইহা হইতে আমরা এই বুঝিতে পারি যে খাদ্য কুকুরটির জিন্সের সংস্পর্শে থাকিলে, গুরুমস্তিকের সাহায্য ছাড়াও লালাগ্রন্থি সক্রিয় হয় কিন্তু দৃষ্ট অথবা স্বাদবস্তুর নথ্যহীন লালাগ্রন্থিকে সক্রিয় করিতে হইলে গুরুমস্তিকের সাহায্যগিতা ছাড়া সম্ভব নহে। গুরুমস্তিকের সাহায্য ছাড়া কুকুরটি খাদ্যগ্রন্থি তিনিতেই পাবিবে না। এইখানেই Pavlov জীববিজ্ঞানের এক নতুন পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি কেবলই এই প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজিতে আস্তে আস্তে করিলেন যে কি প্রকারে এই মানসিক প্রতিবেদন (Psychological response) লালগ্রন্থিকে সক্রিয় করিতে সমর্থ হয়। তিনি হনরিং ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন শরীরবৃত্তিবিদ, তাই তিনি বিষয়টি ঠিক একজন শরীরবৃত্তিবিদের দৃষ্টি দিয়া বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বেহাঃস্বের বৈজ্ঞানিক পর্বেক্ষণ এবং অভিক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে চাহিলেন। এই অভিক্রিয়া হইতে তিনি মস্তিষ্কের গঠন এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে কতগুলি মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ তাঁহার অভিক্রিয়ায় বিবরণস্বরূপ এবং পারিপার্শ্বিক বস্তুটা সম্ভব সহজ করিতে চেষ্টা করিলেন। তাহার প্রথম-স্বরূপ সম্বন্ধে গবেষণা কুকুর দ্বারাই চলিতেছিল, তাই তিনি তাঁহার এই নয় প্রচেষ্টা ঐ কুকুরের দ্বারাই আরম্ভ করিলেন। তাহার অভিক্রিয়ার (experiment) একটি উদাহরণ নিচে হস্ত বিয়টি বৃত্তিতে সহজ হইবে। Pavlov একটি কুকুরকে বস্তুটা সম্ভব বিকল্প উত্তেজনা distracting excitement হইতে উদ্ধার করিয়া একটি শব্দ কামবাক্যে মগ্ন করিয়া রাখিলেন। কামরাটির প্রিতর একটি তারবস্তুর টুং টুং শব্দ হইতে আরম্ভ করিল। এই বস্তুটির শব্দ সম্বন্ধে কুকুরটি সম্পূর্ণই অমনতিজ্ঞ। এইরূপ শব্দ হইবার কিছু সময় পর ঐ কামরার একটি লুকান স্থান হইতে একটি ছদ্ম তারের মাধ্যম দ্বারা এক প্লেট তাল পাগড় কুকুরটির সামনে নামিয়া আসিল। কুকুরটি গন্ধ শব্দ, দেখে, লেগে নাড়িল, বুধ চাটিল, অবশেষে খাবার-টুকু খাইয়া ফেলিল। আবার তারবস্তুর টুং টুং শব্দ আরম্ভ হইল এবং কিছু সময় পর পূর্বের মত এক প্লেট খাবার নামিয়া আসিল। কুকুরটিও পূর্বের মতই অমনতিজ্ঞ করিয়া খাবারটুকু খাইয়া ফেলিল। এই প্রকার একই নিয়মে সব সময়ের ব্যবধানে তারবস্তুর টুং টুং শব্দ, কুকুরটির সামনে খাবার নামিয়া আসা এবং নিশ্চিষ্ট প্রকার শারীরিক ভাব করিয়া শুষ্ক করা চলিতে আরম্ভ করিল। প্রথম হইতেই কামরাটির দেওয়ালের একটি ছিদ্রপথে কুকুরটির মানসিক এবং শারীরিক অভিক্রিয়া পর্বেক্ষণ করা হইতেছে। এই পর্বেক্ষণে প্রকাশ পাইল

যে প্রথম যখন তারবস্তুর শব্দ হইতে আরম্ভ করিল তখন কুকুরটির ভিতর বিশেষ কোনো অভিক্রিয়া দেখা দেয় নাই, কিন্তু কয়েকবার শূন্যপূর্ণ তারবস্তুর শব্দ এবং খাবারের উপস্থিতি চলিতে থাকিলে দেখা গেল যে কেবল মাত্র তারবস্তুর শব্দই কুকুরটির ভিতর খাবারের উপস্থিতিতে যে সমস্ত অভিক্রিয়া উপস্থিত হইত, সেই সমস্ত অভিক্রিয়াই দেখা যাইতেছে। বর্তমানে কুকুরটি কেবল মাত্র তারবস্তুর শব্দ শুনিয়াই জিহ্বা দ্বারা চোঁট চাটিতে এবং লেগে নাড়িতে আরম্ভ করিল। উদাহরণ দ্বারা লাল দেখা দিল এবং খাদ্যস্বরূপ দেখিলে তাহা খাইবার প্রস্তুত ব্যাকুল হইয়া ওঠে ঠিক সেইরূপ ব্যাকুলতা দেখাইতে আরম্ভ করিল। এমন কি খাদ্য পাইবার আশায় উদার পাকস্থলীও সক্রিয় হইয়া উঠিল এবং তাহার ভিতর পাকস্থলি দেখা দিল। কুকুরটির বেহাঃস্বের, বিশেষ করিয়া লালগ্রন্থির এই প্রকার তারবস্তুর শব্দে সড়া যেওয়া সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিলেন যে, কুকুরটি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া তারবস্তুর শব্দ এবং খাবারকে এক করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে অথবা তারবস্তুর শব্দ এবং খাদ্যকে, একটি আর একটির অনুরূপী ক্রিয়া হিসাবে দেখিতে শিখিয়াছে। Pavlov কিন্তু এই ব্যাখ্যার সম্বন্ধে হইতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার নিজের অভিক্রিয়াপ্রসূত অভিজ্ঞতা হইতে জীববিজ্ঞানের সহিত ঘটনাবলীর সৌসঙ্গত বন্ধন রাখিয়া ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিলেন। Pavlov দেখিলেন কুকুরটির ভিতর এই নতুন অভিক্রিয়া-শীলতা অত্যন্ত হইয়া যাইবার পর, সাধারণ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সহিত বাহ্যিক বস্তুতে ইহার কোনো প্রভেদ ঘেঁষা যায় না। তারবস্তুর শব্দ কুকুরটির লালগ্রন্থিকে ঠিক সেই প্রকার সক্রিয় করিল যে প্রকার, একটি আড়ল হঠাৎ চোখের সামনে নিলে চোখের পাতা সক্রিয় হয়। দুইটির মধ্যে প্রভেদ এই যে প্রথমটি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত অভিক্রিয়া, অপরটি সাধারণ অল্পমত প্রতিবর্ত ক্রিয়া। Pavlov এই দুইটির প্রথমটির নাম শিখাছেন সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (conditioned reflex), কারণ ইহা কুকুরটির ব্যক্তিগত জীবনও তাহার অভিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। অপরটির নাম হইতেছে

অন্যেক প্রতিবর্ত (unconditioned reflex), কারণ ইহা কুহুটটির ব্যক্তিগত জীবন অথবা প্রতিবেশের উপর নির্ভর করে না, ইহা তাহার শারীরিক গঠনের অন্তর্গত ক্রিয়া। দুইপ্রকার প্রতিবর্ত ক্রিয়ার এই তুলনামূলক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যত্ন কেষ্ট্র প্রদান ক্রীতে পাবেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে তারপরে শব্দ কুহুটটির লালা-গ্রন্থি ক্রিয় এবং চোখের পাতার আন্তঃকান্দক 'নিউনিউ' করা একই প্রকারের নহে। প্রথমটি বিস্তারিত অপেক্ষা কম অব্যর্থ। তাঁহারা বলিতে পারেন যে তার-পরের শব্দ তত সময় পর্যন্তই লালাগ্রন্থিকে সক্রিয় করিতে পারে যত সময় পর্যন্ত কুহুটটি জ্ঞান আছে। কুহুটটির পেট ভালভাবে ভরিয়া গেলে তারপরের শব্দ আর তাহার জ্ঞান উত্তেজিত হইবে না এবং জ্ঞান উত্তেজিত না হইবার জন্য লালাগ্রন্থিও সক্রিয় হইবে না। কিন্তু ইহা যখন বাধা ঘরকার যে সাধারণ প্রতিবর্তক্রিয়াও শারীরিক অস্থায়ী উপর নির্ভর করে। যৌন প্রতিবর্ত ক্রিয়া ইহার একটি ভাল উদাহরণ। অনেক বয়স্ক লোকই যৌনক্রিয়া বৃদ্ধির একটি নির্দিষ্ট সময়ে সীমান্ত থাকে এবং এই সময় নির্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহারের শরীরাত্মত্বের নির্দিষ্ট প্রকার ক্রিয়ক্রিয়া দ্বারা। অপর দিকে একটি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াও, বাহ্য শারীরিক বৈধন্য উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠে; অল্পমত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতই মস্তিষ্কালী হইতে পারে। কারণেই এই দিক দ্বিগা এই দুই প্রকার প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ভিত্তি কোনো বিভ্রান্ত থাকিলেও তাহা স্পষ্টগত নহে, তাহা কেবল মাত্রাগত দ্বিগত।

সাধারণ ভাবে দেখাতে গেলে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া, অনাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া অপেক্ষা মন্বর গতি, কারণ এই প্রতিবর্ত ক্রিয়া মস্তিষ্কত্বের মধ্যস্থতার সম্প্রতি হইয়া থাকে। ইহাকেই শরীরাত্মত্বের তাহার বলিলে আরও সহজ হইবে। আমরা জানি একটি অনাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া অথবা সাধারণ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার গতি এবং পদ্ধতি নির্ভর করে জীবের মস্তিষ্কত্বের বিশেষত্বের উপর। ঠিক যেমন নাকি একটি মস্তিষ্কত্বের ভিতর বিদ্যুতের গতি নির্ভর করে ঐ মস্তিষ্কত্বের (circuit) বৈজ্ঞানিক ভাবে

সংযোগ প্রণালীর উপর। পূর্ণ কবিত কুহুটটির মূখ অথবা দ্বিবার করে যে মস্তিষ্কত্বের মত তরল লালা নির্গত হয় সেই উদাহরণটি শরীরাত্মত্বের ছন্দে কেলিয়া পরীক্ষা করা হউক। অথচটি দ্বিবার ইন্দ্রিয়ত্বের সংযোগে আনিয়া দ্বারা তৎকালিত আবেগ (impulse) বিশেষ একপ্রকারের মার্কতত্ত্ব বাহিয়া মস্তিষ্কত্বের একটি বিশেষ স্থানে দিয়া উপস্থিত হয়। মস্তিষ্ক হইতে আবেগদ্বারা অল্প একটি মার্কতত্ত্ব বাহিয়া লালাগ্রন্থিতে দিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই স্থান হইতে আবার আবেগদ্বারা লালাগ্রন্থিও জলীয় লালা-উৎপাদনকারী বিশেষ স্থানে দিয়া উপস্থিত হয়—অমনিই লালাগ্রন্থিও ক্রিয় আরম্ভ হয়। এই একই সময়ে এই আবেগের কতকাংশ আবার অল্প নির্দিষ্ট মার্কতত্ত্ব বাহিয়া নির্দিষ্ট পেশীতে বাইয়া আঘাত করে এবং অমনি সেই পেশী অথচটি দ্বিবার হইতে কেলিয়া দ্বিতীয় দ্বিবার করে। এই সময় কার্যপদ্ধতিই নির্দিষ্ট করিয়া দ্বিবার হইতে মস্তিষ্কত্বের কতকাল মার্কতত্ত্বের বিশেষ এক প্রকারের গঠন এবং বিশেষ-প্রণালি। কিন্তু সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার আবেগদ্বারাটিকে আরও কঠোর পথ অভিক্রম করিতে হয়। একটি উদাহরণ বেগ্না হউক। দ্বিবার দ্বিবার হউক যে একটি কুহুটের ভিতর নিম্নলিখিত উপারে একটি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত গড়িয়া তোলা হইয়াছে। একটি বংশীর ধনি করা হইল এবং তাহার পরই কুহুটটির মূখ একটি দ্বিবার দ্বিবার পুছিয়া বেগ্না হইল। যত সময় পর্যন্ত না বংশীর শব্দ কুহুটটি লালাগ্রন্থিকে উত্তেজিত করিয়া লালাগ্রন্থিও কদাইতে সময় হয়, তত সময় এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিয়া বাইতে হইবে। এখন দেখা হউক কি ভাবে কুহুটটির এই সাপেক্ষ প্রতিবর্তক্রিয়া কার্যকরী হইতেছে।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে বংশীর শব্দ কর্পণটিতে আঘাত করিযামাত্র আবেগতত্ত্বের সেখান হইতে মার্কতত্ত্ব বাহিয়া মস্তিষ্কত্বের এক বিশেষ অংশে বাইয়া উত্তেজিত করিতেছে এবং যখন অথচটি মূখ হইতে কেলিয়া দ্বিবার অল্প লালাগ্রন্থিতে এবং প্রয়োজনীয় পেশীসমূহে প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে তখন পূর্ণ-কবিত আবেগতত্ত্ব অপর একটি মস্তিষ্কত্ব কেন্দ্রে হইতে প্রবাহিত হইয়া লালাগ্রন্থিতে এবং পেশীগুলিতে বাইয়া

আঘাত করিতেছে। শাপেক প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় যেকোনো ভাবেই হউক দুইটি কেন্দ্রের ভিতর (এখন কেন্দ্রটি হইতে একটি আবেগের উৎপত্তি এবং দ্বিতীয়টিতে তাহার পবিসমাপ্তি) সংযোগস্থাপিত হওয়া সহকারে। পূর্ব কথিত উদাহরণে কর্ণপট্টে এবং লালাগ্রন্থির মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহা সমস্ত হইয়াছে এই দুইটি স্থানের দুঃপং উদ্ভীর্ণনার মস্ত। এই বিষয়ে আরও পটীকার প্রকাশ পাইল যে এই সংযোগক্রিয়া গুরুমস্তিষ্ক (cerebrum) মধ্যস্থতার হইয়া থাকে। এখানে গুরুমস্তিষ্ক ঠিক একটি সুইচ বোর্ডের মত কাজ করিতেছে। একটি বৈদ্যুতিক সুইচবোর্ড যেমন বিভিন্ন বৈদ্যুতিক কেন্দ্রে সহিত সংযোগ স্থাপন করে ঠিক সেইরূপ এই গুরুমস্তিষ্ক শরীরের বিভিন্ন নার্ভকেস্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। এই গুরুমস্তিষ্কের মধ্যস্থতাই হইতেছে শাপেক প্রতিবর্ত এবং অনঃপেক প্রতিবর্তের মধ্যে প্রভেদ। ইহার আবিষ্কারই pavlov এর কাছে এক নতুন ধাপের আনিয়া যায় এবং ইহা সহ্যই তিনি দীর্ঘ কৃতি বহু ব্যাপ্ত থাকেন, যাযাতে তাহার বংশধরগণ জ্ঞানের এক নতুন অধ্যায় আতিক্রম করিয়া অদ্ব্যগ্রহণ করিতে পারে।

মস্তিষ্ক জীবজগতের জটিলতম বস্তু। ইহার গঠননৈপুণ্য বিস্ময়কর ব্যাপার। আমরা যেহিঁতে পাইতেছি আমাদের ঘেঁহের বিভিন্ন নার্ভপুঞ্জ একটোপাশের মত শাখা বিস্তার করিয়া এই মস্তিষ্কে আশিয়া শেষ হইয়াছে। আরও ভীক্ষভাবে দেখিলে দেখিতে পাইব যে ঘেঁহের বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নার্ভতন্ত্রের মস্ত মস্তিষ্কের এক একটি স্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে। সেখানে রহিয়াছে প্রাণ কেন্দ্র, বহিরাগ্রে দৃষ্টি কেন্দ্র, শ্রাণ কেন্দ্র, বিচলন কেন্দ্র, (movement centre) এবং আরও অনেক। এই সমস্ত বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি একটি অপরাট হইতে অতি নিপুণ ভাবে বিভক্ত রহিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে আমাদের শরীরের জ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহার নার্ভতন্ত্র এবং তাহার কার্যপদ্ধতির নম্রা আঁকা রহিয়াছে ঐ ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ভিতর। বর্তমানে আমরা জীবিত থাকি ততদিন আনিবার গতিতে এই ক্ষুদ্র নম্রাটিতে উদ্ভীর্ণনা এবং তাহার নিধারণ (inhibition) চেষ্টা দিনের বাত্যাচকল বনানীর আলোছায়া

খোলনের মত খেলা করিয়া চলিয়াছে। এই খেলার পবিসমাপ্তি কেবল হইতে পারে সেখিন যেখিন ঘেঁহের তাহার নিপাকক্ষমতা ছাড়াইহা কলে। ইহার মধ্যে আবার কোনো কোন মস্তিষ্কে আলোর ঝলক বেশী দেখা যায়। এই সমস্ত জীবন উত্তেজনা পূর্ব দেখা যায়। আবার কোনো কোনো মস্তিষ্কে ছায়ায় ঝিলতা বেশী অহতুত হয়। এই সমস্ত জীবন বীর দ্বির এবং সংযমপূর্ব হয়। জীবনপথে চলিতে চলিতে মানুষ অসংখ্য নব নব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। এই নব নব অভিজ্ঞতা তাহার বালক মস্তিষ্কের নম্রাটির উপর দৃষ্টি কাটিয়া যায়। শাপেক প্রতিবর্ত ক্রিয়া গঠিত হইয়া গেলে শরীরের বিভিন্ন নার্ভকেস্টের ভিতর আলোর মত সংযোগ স্থাপিত হয়। তার সেই সমস্ত প্রতিবর্ত ক্রিয়াগুলি যখন বৃদ্ধি বিবেচনা এবং নব অভিজ্ঞতা দ্বারা বহিত হয় তখন আবার এই শাপেক প্রতিবর্ত ক্রিয়া দ্বারা নব গঠিত সংযোগ পথগুলির কোনোটি বা নষ্ট হইয়া যায় আবার কোনোটি বা পাকপোস্ত হইয়া যায়। এই নব গঠিত পথের সেলপুঞ্জের কতকগুলি উত্তেজনা পূর্ব হইয়া গাভার আবার কতকগুলি বা উত্তেজনা নিবারণ হিসাবে কাজ করে। সেলপুঞ্জের এইরূপ বিভিন্ন চক্রি লাভ করিবার মূলে রহিয়াছে বিভিন্ন শাপেক প্রতিবর্তক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকার ভাবতরঙ্গ। ভাবতরঙ্গগুলি বিভিন্ন চাপের এবং মাপের হয় বলিয়া এই নব গঠিত পথগুলির সেলপুঞ্জও বিভিন্ন চক্রি লাভ করে। Pavlov গুরুমস্তিষ্কের গহিত এক টুকরা কাস্ককার্ণ বহিত প্রস্তর খণ্ডের সহিত নতুননা করিয়াছেন। মস্তিষ্কের কাস্ককার্ণ হইতেছে ইহার বিভিন্ন প্রকার কার্যক্ষমতা এবং তৎজনিত মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্বাবৈদ সেলপুঞ্জের বিভিন্ন প্রকার গঠন এবং বিভাগসংগীতিয়া। তবে এই মস্তিষ্কের Mosaic-টি জীবিত এবং আমাদের জীবনের নব নব অভিজ্ঞতা এবং নব নব প্রতিবর্ত ক্রিয়া গঠিত হইবার মস্ত ইহার কাস্ককার্ণের পরিবর্তন এবং পরিবর্তন হইয়া থাকে। কাহেই ইহাকে পরিবর্তনশীল mosaic বলা চলে। ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিবেশ, অভিজ্ঞতা এবং তাহার প্রতিক্রিয়া এই mosaic-এর গঠন-বিভাগ ঠিক করিয়া যায়।

মানুষ ও চৈতন্যবাদ :- Pavlov-এর চৈতন্যবাদের

পরেই স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের বৃষ্টি আমেরিকার J. B. Watson-এর চেষ্টিত্বাবলম্বের উপর দিয়া পড়ে। প্রকৃত-পক্ষে বলিতে গেলে Pavlov কুহুং লইয়া যে পরীক্ষা করিয়াছেন Watson এবং তাঁহার সম্প্রদায় তাহাই মান্য করে। পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তবে Watson এবং তাঁহার অনুচরগণ চেষ্টিত্বাবলম্বকে আরও একটু বড় স্থান দিবার জন্য ইহার শুধু ব্যাপ্তিক ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ইহা করিতে যাইয়া চেষ্টিত্বাবলম্বকে যেন তাঁহারা বস্তুতত্ত্বাবলম্বের আওতার বাহিরে লইয়া বাইরা একটু নিসৃষ্টিক করিয়া ফেলিয়াছেন। Watson এর মতে চেষ্টিত্বাবলম্বের দুইটি দিক আছে। একটি হইতেছে তাহার ব্যাপ্তিক দিক, যাহা কেবল শরীরবৃত্তি এবং তাহার কার্যপ্রণালী, অপরিণত হইতেছে ইহার মানসিক সত্য যাহা শরীরবৃত্তির বিশ্লেষণ অথবা শরীরবৃত্তির কার্যক্রমের বিশ্লেষণ প্রকাশ পায় না। যাহা শরীরবৃত্তির সক্রিয়তার ভিতর দিয়া নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। চেষ্টিত্বাবলম্বের প্রথম দিক জীবের চেষ্টিত্বাবলম্বের ব্যাপ্তিক ব্যাখ্যা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে—এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভ্রমেই বৈষম্যিক সত্যের ভিতর সীমাবদ্ধ। ঠিক যেমন ন্যাকি রসায়ন বিভিন্ন বস্তুর স্বর্ণাণু এবং ইহাযের একটির উপর অপর একটি প্রতিক্রিয়ার বৈষম্যিক ব্যাখ্যা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে। Pavlov চেষ্টিত্বাবলম্বকে এই বৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ই বিভাগ করেন। কিন্তু Watson এবং তাহার অনুচরগণ চেষ্টিত্বাবলম্বকে এই ক্ষুদ্র গতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলেন না। তাঁহারা ইহাকে বিপর্যয় সত্যের প্রকাশের বাহিরে স্থান দিয়া এক নতুন বাবলম্বের (doctrine) মহিমায় বহিমান করিয়া তুলিলেন। আমেরিকান চেষ্টিত্বাবলম্বাবলম্ব বলেন যে, চেতনা অথবা মনের, মস্তিষ্ক ছাড়া অস্ত্র কোনো অস্তিত্ব বিজ্ঞানসম্মত নহে। তাঁহারা চেতনার সংজ্ঞান গতি-শীলতা অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, চেতনা বলিয়া কিছু থাকিলেও ইহার কোনো সংজ্ঞান কর্মপদ্ধতি নাই। Watson নিজেই বলিয়াছেন—মনোবিজ্ঞান কোন বিনয়ী বিজ্ঞানের আসন দাবী করিতে পারিবে না। এমন কি ইহাকে বেশী বাঁচিয়া থাকিতে হইলেও ইহার আন্তর্জাতিক পদ্ধতি, অধ্যাত্মীয় বিষয়, এবং ইহার বর্তমান সংজ্ঞা ভ্রম

করিতে হইবে। Watson এর দৃষ্টান্ত অনুসরণে হইতেছে শিশুর শরীরবৃত্তির প্রতিক্রিয়াগুলিকে সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার পরিণত করা এবং আবার সেই সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়াগুলিকে দূর করিয়া স্বাভাবিক শরীর বৃত্তির প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা। Watson পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে মনুষ্য মানস প্রকাশিতের সহজ প্রকৃতি মানস শরীর বৃত্তির ক্ষমতাটি একসরকম নাই বলিলেই চলে। অথচ এই ক্ষমতা মানুষ অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকাশিত ভিতর বিশেষ ভাবে দেখা যায়। সহজ প্রকৃতি বলিতে আমরা যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ প্রকারের উদ্দীপক (stimulus) বিশেষ প্রকারের চেষ্টিত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে তাহাকেই বুদ্ধি এবং এই চেষ্টিত্ব সাধারণ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার মতই নির্ভুল ভাবে হইয়া থাকে। পিপীলিকা এবং মৌমাছির সহজ প্রকৃতি সম্বন্ধে অল্প বিস্তার আশা লাই জামি।

এক প্রকারের বোলতা আছে তাহার কেবল মাত্র এক প্রকারের শিকার বেধিলেই আক্রমণ করিবে। ইহার কারণ হইতেছে ঐ নির্দিষ্ট প্রকারের বোলতার শারীরিক গঠন এবং তাহার দেহপুত্র এমন ভাবে গঠিত এবং বিস্তৃত যে ইহাযের ভিতর ঐ নির্দিষ্ট এক প্রকারের শিকার বেধিলেই খাইবার প্রকৃতি জাগে এবং ইহাযে চেষ্টিত্ব শিকারটিকে ধরিয়া ভক্ষণ করিবার ভিতর প্রকাশ পায়। এক প্রকারের পোকা আছে, ইহাযা বিশেষ এক প্রকারের গাছের শেওলায় ভিতর থাকে এবং ঐ গাছের শেওলা ও শুষ্ক ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। এই পোকাগুলিকে ঐ নির্দিষ্ট প্রকারের গাছ ছাড়া অস্ত্র কোনো গাছে থাকিতে লাগ কহিলে ঐ পোকাগুলি না খাইয়া শুকাইয় নষ্ট হইবে। পোকাগুলির এই প্রকারের চেষ্টিত্ব দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না, যে কেবল মাত্র এক প্রকারের গাছ ছাড়া অস্ত্র অস্ত্র কোনো গাছে ঐ পোকাগুলি বাঁচিতে পারে না। অস্ত্র এমন অনেক গাছ আছে যাহার শুষ্ক এবং শেওলা খাইয়া আশ্রয় লাগে তাহাযে ঐ পোকাগুলি বাঁচিতে পারে কিন্তু সে ঐ সহজ প্রকৃতি দ্বারা চালিত হইয়া কেবল মাত্র ঐ এক প্রকারের গাছের শেওলা এবং শুষ্কই খাইতে উত্তম হইবে অস্ত্র কোনো প্রকার গাছের শুষ্ক

অথবা শেওলা খাইবার ইহার প্রকৃতিই হইবে না। এমন কি মানুষের নিকট আত্মীয় বিড়ালের ভিতরও এই সহজ প্রকৃতিবিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অল্প কয়েক সপ্তাহ বয়সের একটি বিড়াল ছানাকে, এমন কি বাহ্যিক কোনো বিড়ালের সহ পায় নাই, তাকে যদি এক খাঁচার ভিতর একটি ইঁদুরের সহিত বদ্ধ করিয়া রাখা যায় তবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেখা যাইবে যে বিড়াল ছানাটি একটি পূর্ণ বয়স্ক বিড়াল একটি ইঁদুর শিকার করিবার পূর্বে যে সন্তোষ প্রকাশ করে এই বিড়াল ছানাটিও ঠিক সেই প্রকৃতিবিশিষ্ট প্রকাশ করিতেছে এবং ইঁদুরটিকে মাঝিবার লক্ষ্য মায়ের লোম ফুলাইয়া, লেজ নাড়িয়া গড় গড় শব্দ করিয়া বাবা বাবা ইঁদুরটিকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। বিড়ালের ছানাটির এই প্রকার করিবার পর্ব হইতেছে এই যে ইঁদুরই

হইতেছে উহার স্বাভাবিক শিকার, পৃথিবী সমস্তে নিত্যই অনন্ত ক্ষুদ্র প্রাণীটি তাহার সহজ প্রকৃতি ধরাই ইহা বুঝিতে পারিয়াছে। এখানে বুদ্ধি অথবা অভিজ্ঞতার কোনো স্থান নাই। মানুষের ভিতর এই প্রকারের কোনো ক্ষমতা আছে বলিয়া মনে হয় না। মানুষ জন্মাবার সময় স্বভাব নিরস্ত্রকারী বস্ত্র লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। নবজাত শিশু স্বাভাবিক ভাবে মাথের দুইগ্রন্থি চুবিবে; একটি লাঠি অথবা একটি আতুল তাহার কাছে নিলে আকড়াইয়া ধরিবে, অবলম্বন হঠাৎ সরাইয়া নিলে ভয়ের লক্ষণ দেখা দিবে। ইহার কাছে বড় শব্দ করিলে চমকাইয়া উঠিবে এবং ভয়জনিত প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ তাহার ভিতর দেখা দিবে। মায়ের দুইগ্রন্থি চোখ অথবা বড় শব্দ ভয়জনিত প্রতিক্রিয়া ছাড়া শিশুর ভিতর অল্প কোনো প্রকার সহজ প্রকৃতি দেখা যায় না।

[ক্রমশঃ]



দর্শন-তত্ত্ব

রণজিৎকুমার-সেন

অনেকের মনেই দর্শন-তত্ত্ব সম্পর্কে অনেক সমস্যা প্রশ্ন থাকে। আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি এ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞান। অথচ নানা এই যে, তাৎপরে মনের মধ্যেও দর্শন-তত্ত্বের আশ্রয় আছে। দর্শন, জীবন-দর্শন, দার্শনিক, দর্শন-তত্ত্ব প্রভৃতি শব্দগুলি জনসাধারণের মধ্যে বড় বেশী প্রচলিত, শব্দগুলির অর্থবোধ তত বেশী নেই। কলে বিশ্ববিদ্যালয় তাৎপরে কাছে কিছুটা উচ্চশ্রেণীর বিদ্যাপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও শাস্ত্র এবং কিছুটা মটিলতার আলো আশ্রয় দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এতকাল ধরে এমন সমস্ত কথাটা কেউ তাদের খসে বেয়নি যে, দর্শন অর্থে বোঝা এবং সেই অর্থে প্রত্যয় বা বিশ্বাস। কিন্তু সব বোঝা এবং যে-কোনো প্রত্যয়কেই কি দর্শন ব'লবে? তা নয়। আমাদের এই চোখ দুটো দিয়ে তো আমরা কত কীই দেখি, অতি-অভ্যাস এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা কত কীই তো বিশ্বাস করি এবং ধারণাশক্তির দ্বারা আমাদের তো বড় কিছুই প্রত্যয় হয়। সেগুলি তবে সবই দর্শন? তাও নয়। সেগুলি দর্শনের 'অঙ্গ' বটে, তবে পুরোপুরি দর্শন নয়। ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তিতে হির-লক্ষ্য যিনি, ধীর বসন্ত চিত্তে একটা বিশেষ স্তরে এসে পৌঁছোতে এবং নিজের ও বিশ্ব-চরাচর সম্পর্কে ঐশ্বর্য্য আন একটি নিখিট সূক্ষ্মতার নিঃস্বরে এসে দাঁড়িয়েছেন, তিনি বহুদূর মধ্যে থেকেও নিজেকে নিজের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী, তিনিই প্রকৃত পক্ষে বেধেন; যেহেতু যেহেতু আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে প্রত্যয়বাদের সৃষ্টি হয়। এই প্রত্যয়ই তাঁর জীবন-দর্শন, এবং এই বোঝাটাই প্রকৃত দর্শন। দর্শন থেকেই মানুষ জীবন-দর্শন খুঁজে পায়, দর্শন থেকেই সৃষ্টি হয় দর্শন-তত্ত্বের। যিনি বড় বেশী প্রত্যয়বাদী ও বড় বড় জ্ঞানী, তিনি তত বড় দার্শনিক।

তবু একশ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত সন্তানদের মধ্যেই এ তত্ত্ব

সংগঠিত নয়; অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও কখনও কখনও এ তত্ত্বের অহুসান মেলে। আমাদের দেশের মধ্যযুগীয় সাধক সন্তানদের আত্মনিকত্বের শিখার মানাশ্রুপাতের দ্বারা যে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন, এমন নয়, কিন্তু বৈদ্যদ্বন্দ্ব জীবন-চর্চার দ্বারা দিয়ে তাঁদের অহুসানপ্রবণতা ও অন্তর্দৃষ্টি এত শক্তির ছিল যে, দর্শনের শেষ স্তর অবধি তাঁরা পৌঁছাতে পেরেছিলেন। এ যুগেও এমন দৃষ্টান্ত বিহীন নয়। আমরা বর্তমানই তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকি। আমাদের দৃষ্টিশক্তির কোণতাই তার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। জীবন-চর্চা বলতে সাধারণতঃ আমাদের কিছু নেই। বাজারের পাইকাহারা যেমন মঞ্চস্থল থেকে বস্তাবন্দী ক'রে জিনিষ এমন ক'লকাতার বাজারে ছেড়ে দিয়ে যায়, আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞানাহুদ্বৈলন অনেকটা সেই রকমের। ফলে ইংরেজি শিক্ষার খাতিরে আমরা সজেক্ট, প্রেটো, এ্যাডভান্ট, ক্রেশা, ভলিউম, ক্যাট, লক্, হেগেল, কোন্স, ডায়লেক্টিক, স্পেন্সার, নিউসে, ওয়াগনার, জবগুট্ট, জোন্স, হেয়ার্ড, স্পিনোজা, সোপেনহায়ার, রাসেল, বার্মান, সাতান, উইলিয়াম জেমস প্রভৃতি বড় বড় বিদ্বান দার্শনিকের সম্মান পেলেও তাঁদের অলোক-সামান্য জীবনচর্চার রূপমাত্রের আমাদের মধ্যে প্রবেশ না ক'রে এক হাট থেকে নিয়ে আর এক হাটে বিক্রয় হয়ে আসি। দার্শনিককে পেলেও দর্শন-তত্ত্বের ক্ষেত্রে আমরা মুক। আমরা শুধু দেখিই, সম্যকরূপে দর্শন করি না। মন দিয়ে দেখলেই তবে সম্যক দর্শন হয়। তবে সে মন স্থিতপ্রজ্ঞ হ'তে হবে। বিভিন্ন যুগে যে সকল দার্শনিক পৃথিবীতে এসেছেন, তাঁরা এক এক কালে মরণ ও জীবনকে নিবেদনের অহুসানির দ্বারা একে দেখেছেন। তাঁদের প্রাণস্বার্থ ও বিশ্বচর্চার মধ্যে কোনো তেজ নেই। এই অভাবাদ্য থেকেই মানুষ আত্মদর্শন করে এবং ধীরে ধীরে প্রত্যয়-

বারী হ'য়ে জীবন-বর্ণনের রূপ দেয়। সজেক্ট-প্রেটোরাতও
দিয়েছেন, আন্দালর মধ্যস্থীয়া সাংকেতিকও দিয়েছেন এবং
এখনও অনেকই বিজ্ঞান।

অনেকে আবার পাণ্ডিত্যকে এবং ঈশ্বর-ভক্তিকে বর্ণন-
তত্ত্বে সঙ্গে এক ক'রে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু এ তিনটি
আত্মিক সম্পর্ক থাকলেও বিপর্যয়ে যে তারা স্বতন্ত্র, সে
কথা অনেকে বোঝেন না। পণ্ডিত এবং ঈশ্বর-নির্ভর ব্যক্তি
মাজেই যে বর্ণন তত্ত্বের অঙ্গুগামী বা তাৎপের প্রত্যেককই
যে জীবন-বর্ণন ব'লে অবিলম্ব কোনো পদার্থ থাকতে হবে,
এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমি এক পণ্ডিত ব্যক্তিকে
জানতাম, তিনি কালোবাক্যে লেন-বনের কাঁচাবারী
ছিলেন এবং জুৎসিং সংস্পর্কে কোনো বারংবার প্রতি
আসক্ত ছিলেন, কিন্তু প্রতি সুহৃৎ ঈশ্বর-নির্ভরতার ব্যাপ্তি
তিনি পকেটে গীতা রাখতেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতি
দৃশ্যের কোনো কারণ ছিলনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম
শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত। কৌতূহলবশে একদিন আমি
তাকে কিল্লস ক'রপান, 'জাপনার জীবন-বর্ণন কি?'
তিনি কথটা নিয়ে নিষেধ মধ্যে অনেককণ বেগলেন,
কিন্তু জবাব দিতে পারলেন না। যদি প্রকৃতই তাঁর
জীবন-বর্ণন ব'লে কিছু থাকতো, তবে তিনি তা অস্ত্রই
আমার মধ্যে অঙ্গুপ্রস্থি করার প্রয়াস পেতেন।—আবার
এর ঠিক উল্টোও যে না দেখা যায়, এমন নয়। কোনো
ব্যক্তির হয়তো আদৌ জীবন-বর্ণন ব'লে কিছু নেই; কিন্তু
যে-যেজু তিনি শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত এবং সামাজিক
দাব্যগুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে অভ্যস্ত, প্রমত্তারীকে খুসী
ক'রবার মতো একটা-কিছু 'কোন্টেশন'-বর্মী জবাব তিনি
সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিতে পারেন; অবশ্য সেই জবাবের সঙ্গে
তাঁর প্রাত্যহিক প্রাপ্তবীর আদৌ কোনো গোগ নেই।

তা হলে দেখা যায়, পাণ্ডিত্য এবং ঈশ্বর-নির্ভরতাই
বর্ণনের সব নয়। ডায়ালেক্টিক মেটাবিশাদিগন্ বা
হেটাক্তিকিয়ার মধ্য দিয়েও সেই বর্ণন আশ্রিত পারে,
অন্তরের গভীরতম অঙ্গুভূতির মধ্য দিয়েও সেই বর্ণন আগতে
পারে, আবার ঈশ্বর-চেতনার মধ্য দিয়েও আত্মিক উৎকর্ষ
হতে পারে, কিম্বা বস্তববাদী সংগ্রাম ও সংসার-অভিজ্ঞতার
মধ্য দিয়েও এ উৎকর্ষ দেখা দিতে পারে। আমলে নিজে

জীবনমর্মে উন্নত ক'রে অপরকে বা সেই উন্নত মনের
স্পর্শ দিতে অক্ষম, তা প্রকৃত বর্ণন নয়, বর্ণন-তত্ত্বে তার
হান অত্যন্ত নিচে। তার মস্ত চাই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে
একটা পূর্ণ অভিজ্ঞান। বৈদ্যাত্মিক, বৌদ্ধ, চার্বাকবাদী,
সুফীবাদী বা ইসলামিক—কেউই যোগ্যকরি এ কথা বলবেন
না যে, যে চোর বা নিচায়র চৌধুরী এবং নিচায়রকেই
জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ ক'রেছে, যার দৃষ্টি ঐ দুটি
ক্ষেত্র ভিন্ন কোনো উচ্চলোকে সঞ্চারিত নয়, সে ব্যক্তি
দার্শনিক। জীবন-বর্ণন ব'লেও জীবনের আদর্শ বোঝার
সম্ভব নেই, কিন্তু যে আদর্শ জীবনকে মহত্ত্বের দিকে তুলে
দেয় না, তাকে বর্ষতত্ত্বে পেলেও বর্ণনতত্ত্বে পাই না।
আত্মবিশ্বাসে বা বাস্তব কথা যায়, তাই বর্ষ; তা চোখের
বর্ষও হ'তে পারে, সাধুর বর্ষও হ'তে পারে; তা জীবনমর্মে
হ'লেও জীবন-বর্ণন কি? আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে
অনেকটা তাই। কিন্তু এহো বাহ। তার উপরেও
আছে। সেই উপরের স্তরটাই বর্ণন, যেমন জলের
উপরে মাটি, মাটির উপরে বেঘ আর ইধার, তার উপরে
আকাশ।

এই বর্ণন-ভক্ত কোনো সদয়ই বেশ-কালের উল্লেখ নয়।
মাহুয মাজেই বহন সামাজিক জীব, বেশ ও কালের গতির
সঙ্গে তখন সে অক্ষান্তভাবে দূর। স্মৃত্যায় বেশ-কালের
উত্থান-পতনের সঙ্গে তার মনোবৃত্ত উত্থান-পতন আছে।
সেই উত্থান-পতনের চড়াই-উৎথাই পথ ব'রেই মানবিক
বর্ণন রূপ পায়। বহুজগতের ইট-পাথর আর গাছকে
ছাপিয়ে সে মাহুযের মহত্ত্ব জীবনের স্বপ্নে তদ্রূপ হ'য়ে ওঠে।
সজেক্টস তাই বলেন: "...there is an infinitely
worthier subject for philosophers than all
these trees and stones, and even all those
stars; there is the mind of man. What is
man, and what can he become?"—মাহুয কি,
এবং মাহুয কি হ'তে পারে, বর্ণন-তত্ত্বের এইটাই হ'লে
সব চাইতে বড় কথা। সেই কথাই বর্ণনাত্মক জোকে বুদ্ধবৈ
হ'লেছেন—

'যথাপি পুণ্ডরাসিন্দু্য করিষ্যাম্যাক্ষণং বহ।

এবং জাতেন মজেন কত্তবং কুলসং বহুং।'

অর্থাৎ—যেমন বাশি বাশি পুষ্প থেকে নানা প্রকারের মালা গাঁথা যেতে পারে, তেমনি সে মানবজন্ম পরিগ্রহ করেছে, তার বারো অনেক সংস্কর্ষ সাদিত হ'তে পারে।'

দর্শনতত্ত্বে মূলতঃ আমরা এই সংস্কর্ষের সন্ধান পাই।

কৌন্ড দ্ব্যংগবাহী হোক বা সমস্তের অবৈতন্য বা মায়াবাহী হোক, তাঁদের এক জৈবী ইন্দ্রিয়গত বিবর্তন উপর আর দ্বিগুণ জীব-মুক্তির অমূল্যমান ক'রেছেন, অল্প জৈবী নব-পৃথিবীর অগাধ বিবেচনা ক'রে জগৎ-কারণ ঐক্যমূল্য হ'য়ে আত্মিক উন্নতি ও আত্মমুক্তির সাধনা ক'রেছেন। বাংলার বাউল সম্প্রদায় 'মনের মানুষের' সন্ধানের বহু ক্ষেত্রে বেরিয়েছেন। সেও আত্মমুক্তির প্রয়াস। সকলের মূলেই বুদ্ধি, সকলের মূলেই একটা সাধনগত অভ্যাস ও প্রত্যয় কাজ ক'রেছে। এখানে যত মত তত পথ; কিন্তু সব পথই এক মহামুক্তির দখা-নদুত্তরামী। কোথাও ব্যক্তিত্বের প্রবল, কোথাও সমাজচেতনা প্রবল। এই নিয়ে ব্যক্তিবাণে ও সমষ্টিবাণে বহু তর্কের অবকাশ আছে। ব্যক্তিসাধকেরা সমষ্টির চাইতে আত্মিক উন্নতিই প্রয়াসী। কিন্তু সমাজ-সাধকের সাধনবুদ্ধির মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তিই আছে; সেখানে কাউকে বার দ্বিগুণ বুদ্ধি কোথাও সীমিত নয়। শাস্ত্রে তাই বলা হয়েছে—'বেদা বিত্তমঃ, শ্রুতয়ো বিত্তমঃ, নানো মুনির্বাধ মতমভিহুয়।' হেগেল দর্শনশাস্ত্রকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে দেখেছেন। তাঁর মতে—দৈশকালিক অতীত প্রজ্ঞার বেশ ও কালে প্রকাশই জগৎ। স্তারের সঙ্গে সমস্তবুদ্ধি পর্যাবসিতের সমঝারকেই তিনি 'বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা' বলেছেন। এ সমস্ত পর্যাবসিত ইচ্ছারাজ্যত ব'লে তাঁদের সমঝার 'বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা' নামে অভিহিত। বেশ-কালাজ্যত এই সমস্ত পর্যাবসিত বেশ ও কালে ইচ্ছারাজ্য বিদ্যায় ও চিন্তারূপে আবর্তিত এই বৃত্তমান জগৎ। তাঁদের স্তারের ক্রমে আত্মজ্ঞানে অভিব্যক্ত হওয়ার ইতিবৃত্তই দর্শনের ইতিবৃত্ত।

সংসারে বাঁচা দুঃখবাহী, তাঁরা দুঃখের মধ্য দিয়েই দুঃখাতীত সত্তার দিকে বৃত্তিনিবদ্ধ ক'বে থাকেন। তাঁদের মনে তেজস্বী এই দুঃখ অনিবার্য আলোকনিখা আলিয়ে

রাখে। বসন্তনাথের তাৎপার্য—'বিশ্বব্রহ্মতে তেজঃপদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইব্রহ্ম; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই সতি, তাহাই প্রাণ; তাহাই চক্রপথে বৃত্তিতে বৃত্তিতে মানবসমাজে নৃতন নৃতন কর্ণলোক ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিতেছে; এই দুঃখের তাপ কোথাও বা প্রকাশ পাইয়া, কোথাও বা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, মানবসমাজের সমস্ত বাহুবলবাহুগণিকে বহনান করিয়া বাহিয়াছে।'—এ কথা দুঃখবাহী দার্শনিকের কথা, দুঃখের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রত্যয় তাঁর বড়। সংসারের সাধনগত দুঃখবাহী মানুষেরা দুঃখে দুঃখে হিসেবে বেশ জীবন ও জগৎ দেখে 'সিনিক' হ'য়ে ওঠে। সিনিকবাদী মানুষের জীবন-দর্শন হচ্ছে জগৎকে ছেঁজ্ঞানে নিঃসর অথচ প্রচ্ছন্নগতিতে মনের উপর তদার উত্তির বহা। সেখানে চিন্তা বা মনের ব্যাপ্তি বা তাঁর ধর্ম নেই। উদাহরণের বুদ্ধি—তাঁর মধ্যে প্রজ্ঞার পূর্ণতা নেই, এই পূর্ণতার অভাবে দর্শন এখানে বিচ্ছিন্ন। এমন কোনো ব্যক্তির কাছে পার্থক্য কোনো বিষয় সম্পর্কে শিষ্টাভি আশা করা যায় না। কারণ, সে ব্যক্তি নিজেই কোনো তত্ত্ব সম্পর্কে শিষ্টাভি নই। এই অবস্থাকে বিরোধ ক'রতে গিয়ে কান্ট বলেছেন—
“...These false conclusions are the result of false premises: you assume that all knowledge comes from 'separate and distinct' sensations; naturally these cannot give you necessity or invariable sequences of which you may be forever certain; and naturally you must not expect to 'see' your soul, even with the eyes of the internal sense.”

আমাদের প্রচলিত জীবনধারণার উপর একটি মহতঃ জীবনের অবিকার আমাদের প্রত্যেকেরই প্রতি মুহূর্তে কাম্য। এই কাম্য থেকেই এক জৈবী মানুষ যেমন ব্যর্থতার কটকে বিদ্ধ হ'তে হ'তে ক্রমে 'সিনিক' হ'য়ে ওঠে, আর এক জৈবী মানুষ যেমন প্রচলিত জীবনধারণা থেকে মুক্তি পেয়ে এক অগাধ শান্তির জগতের সন্ধানের মনকে বলাকার মতো উৎকর্ষিত মনের আকাশে উড়িয়ে

দিয়ে নিশ্চিত জীবনযাত্রার প্রদর্শন হ'য়ে থাকে। প্রকৃত দার্শনিক-জীবনের এটি একটি প্রধান লক্ষণ। ঠিক এই কথাটিই শ্রীমদেবা তাঁর নিজের সম্বন্ধে বলেছেন— 'After experience had taught me that all things which frequently take place in ordinary life are vain and futile, and when I saw that all the things I feared, and which feared me, had nothing good or bad in them save in so far as the mind was affected by them; I determined at last to enquire whether there was anything which might be truly good, and able to communicate its goodness, and by which the mind might be affected to the exclusion of all other things; I determined, I say, to enquire whether I might discover and attain the faculty of enjoying throughout eternity continual supreme happiness.'

প্রচলিত জীবনযাত্রা থেকে এক মহত্তর শান্তিময় জীবনে উত্তীর্ণ হবার এই প্রয়াসই দার্শনিক-মনোবর্মা ব্যক্তি নামেই প্রদান। তারতীয় ধর্ম্মে এই প্রয়াসের

প্রবলতাই প্রকাশ হ'য়ে উঠেছে একটি মাত্র বাক্যঃ 'যে নাহং নামতা ত্বাদ্ কিমহং তেন তুর্গাম্।' অর্থঃ—'যে বস্তুতে অমৃত ফললাভ নেই, তা দিয়ে আমি কি করবো?' আমার ভোগের ক্ষমতা, আমার সুখের ক্ষমতা আমার চারদিকে কত বড়ই তো ছড়িয়ে আছে। তাতে সবই আছে, বিশ্ব অমৃত নেই। তা ক্ষুদ্রের স্বাভাবিকতা, সীমার স্বাভাবিকতা, তা শুধু 'ছোট আমি'র অহংয়ের স্পর্শে মুছিত; আমি যে অমৃত-পিয়ালী, আমি যে বৃহৎ ও অদ্বৈতের পথযাত্রী, আমি যে 'বড় আমি'র স্বর্ণপথে নিত্য ধাবমান! তাহের ছেড়ে সীমিত স্বভাবিত এগর দিয়ে আমার কি হবে!— 'যো বৈ ভূম্বা তৎস্বয়ং, নামে সুবদন্তি।' ভূম্বাকে লাভের মন্তই যে আমার এই প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-সৌক্য!

জীবনের কোন পরীকৃত্য ন্যস্ত ও নিত্য প্রত্যয়ে পৌঁছালে এই জ্ঞানভ্রমী ধূলি সত্ত্ব, স্বর্গ-ভক্তের আলোয় ভিন্ন তা উপলব্ধি করা কঠিন। এই স্বর্গ চর্চা সম্পর্কে বতই আমাদের মন অনিশ্চিতবস্তুর হবে, আমরা ততই ক্ষুদ্রতা ও নীচতাকে কাটিয়ে অবজীবনে উন্নীত হ'তে পারবো, এবং আমাদের শির, সাহিত্য ও সঙ্গীতে তা ত্রপারিত ক'বে আশাযের সাংস্কৃতিক সৃষ্টিফলতাকে মহত্তের অধিকারীক'বে তুলতে পারবো।



বর্তমানের কাশ্মীরী নাটক

শ্রীমতিলাল রায়না

বর্তমান কাশ্মীরী নাটক বেশী দিনের সৃষ্টি নয়। হুইয় অষ্টম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে আমাধের উৎকৃষ্ট সংস্কৃত নাটক ছিল। কি ক'বে সংস্কৃত নাটক কাশ্মীরী নাটকে রূপান্তরিত হয় তা জানা যায় নি। “বীথপাতের” নামক লোকনাটকের মাধ্যমে অর্জিত ও বর্তমানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন হলেও একটা সম্পর্ক রয়েছে। পাতের কথটি সংস্কৃত পাত্র (অর্থাৎ নাট্যাঙ্গিণি পাত্রপাত্রিগণ) কথা থেকে উদ্ভূত। ইহা কাল্পনিক ও বাস্তব চিত্রের মধ্যবর্তী। এই নাটকটি আমাধের গ্রামবাসীদের একমাত্র উৎসব।

গত বিশ-পঁচিশ বৎসরে কাশ্মীরী দর্শক স্থাপনের অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রীমতের মনোমুগ্ধ রক্তকে আগা বাসার কাশ্মীরীর লিখিত কয়েকটি উৎসব নাটকের অভিনয় করা হয়। শেষের অভিনেতাগণ মহাকাব্যের কয়েকটি দৃষ্ট অভিনয় করেন। প্রায় ঐ সময়ে নন্দলাপ কডিল “নানুগ” নীত্যাক কাণ্ডাত ওরফে হরিদন্তের রাজ নামে একখানি নাটক রচনা করেন এবং তা মঞ্চস্থ করা হয়। হিলমোজে নামক একজন লেখক কয়েকখানি গ্রন্থন নাটক রচনা করেন। ১৯৪০ সালের পর হইতে কয়েকটি শেষের অভিনেতা হল গঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে কলেজের ছাত্র ও বাইরের লোক আছে। আমাধের ইতিহাসে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সে-সময় জাতীয় আন্দোলন অগ্রসর হচ্ছিল এবং সামাজিক চেতনার সংস্কার চলছিল। কাশ্মীরী বাজমে-আহাব বর্ষীয় পরবেশী লিখিত “বাতহাং” নাটক মঞ্চস্থ করেন। কামদ্বি ও সুপার সমিতি যথাক্রমে “বিধবা” ও “ভূগ” নাটক মঞ্চস্থ করেন। এ’ দুইখানি নাটকে সমাজের তৎকালীন দোষত্রুটি বর্ণনা করা হয়েছে।

গত সাত-আট বৎসরে কাশ্মীরী নাটক আলোকপ্রাপ্ত সামাজিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে চলছে। এইসব নাটকে সমকালীন সমস্যা বিবেচনা মনোযোগ আকর্ষণের

চেষ্টা করা হয়েছে। নাহিম, রোশান, কামিল ও সোনে—এই কয়েকজন লেখক “আমিন কামি পাণ, হাইলে পান” (কমি কার ? লাঙ্গল ঘার), “উইল ছি সোনে” (আগামীকাল আমাধের), “চোর বাজার” (কোলা বাজার) ও জজাল (যুজ-বাজ) নাটক রচনা করেন। জনগণ বিস্তারিতকারী ও শাস্ত্রনাটকের বিরুদ্ধে একত্র মিলিত হয়েছে এইসব নাটকে ইহা দেখান হয়েছে।

কাশ্মীরী গীতিনাট্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রথম চেষ্টা হিলাবে নাহিম “বুধবতে বাবেলজাল” রচনা করেন এবং তা সাকল্যমণ্ডিত হয়। গাঢ় কাব্যের ও হুম্ব অমৃত্তির ক্ষেত্রে এই গীতিনাট্য প্রসিদ্ধ। ১৯৫৬ সালে কাশ্মীর উৎসবের সময় নাহিম ও রোশান “হিমল নাগরাই” রচনা ও মঞ্চস্থ করেন।

কাশ্মীর উৎসব ঐ বাজার সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক নতুন পর্বাঙ্গ বিশেষ। উৎসবের সময় বেশ কতকগুলি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করা হয়। দেওদির মধ্যে কমিল রচিত “হাস্য বাতুন” ও হিম্ব হাইলুপ প্রণেত একটি কাল্পনিক নাট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সবক'রে স্থায়ী নাট্যশালা নির্মাণ করেন এবং শেষের অধ্যয়নিক উৎসাহিত করে থাকেন।

কাশ্মীরী ভাষার বেতরে নাটক প্রচাৰ বন্ধ হয়েছে। কাশ্মীরী ভাষার নাট্য সাহিত্য কোন প্রকারেই চিত্তাকর্ষক নয়। উপযুক্ত দর্শকের অভাবে নাটককার অসুবিধা বেগম করেন। চলচ্চিত্র দর্শকবিধকে পুলকিত করে তোলে। কাশ্মীরী নাটক লেখকগণ উৎকর্ষ সাধনের আদর্শ অন্বেষণ করছেন। সশ্রুতি ইন্দেন ও দেবপীয়াবের কয়েকখানি নাটকের অসুবিধা হয়েছে। শ্রীমতের এখন তিনটি স্থায়ী নাট্যশালা গড়ে উঠেছে। সবক'রে সম্ভবপর মঙ্গল দিক দিয়ে উচ্চাভিলাষীদ্বিগকে সহায়তা করছেন। এ সবই সুলবণ। ভবিষ্যতে আরও উন্নতি ঘটবে বলে আশা যায়।

আধুনিক গুজরাতি নাটক

ডাঃ ডি. বি. বাস

দাম্পূর্ণ ভারতীয় রীতিতে গুজরাতি নাটকের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। প্রায় ১০০ বৎসর আগে সংস্কৃত ভাষাতেই কাব্য ও নাট্য সাহিত্য রচিত হতো। বেশ কতগুলি সংস্কৃত নাটক সে সময় রচিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে।

সাধারণতঃ জনগণের ভাষাতেই নাটকের রস পরিবেশিত হতো। এই নাটকের প্রকাশ দেখি তাৎসং আর বাকসীলা নাটকে। নাট্যসাহিত্যের আগে নাট্যসাহিত্য রচিত হয়। এই কারণে নাটক ও নাট্যরসী রচনায় প্রাচুর্য দেখা দিচ্ছিল। সামান্য কিছু মুক্তি হলে প্রকাশ হয়েছে : অনেকটাই অল্প কালের ভুলে হারিয়ে গিয়েছে। আর সামান্য কিছু হয়ত পুঁথিপত্র বা প্রাচীন শিল্পীর মনে এখনও টিকে আছে।

এই সত্যবাদ্যপূর্ণ ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই ১৮৭০ সালে মধের নাট্য আন্দোলন হানা বেঁধে উঠতে আরম্ভ করলো। প্রথমে দিকে পার্শী নাট্যকাররা আর কিছু সংখ্যক কবি ও গুপ্তী নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। এইভাবেই আধুনিক গুজরাতি সাহিত্যভাণ্ডার ভরে ওঠে। প্রচলিত রীতিতে রচিত অপ্রকাশিত নাটকগুলো হিন্দাব কংগ্রেস এর বিরুদ্ধেটা চোখে পড়বে।

সব নাটকই মঞ্চস্থ হয়নি। এর মধ্যে কারণ হতে পারে। হয় অত নাটক মঞ্চস্থ করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না, না হয় সেগুলি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতো না। বা হোক, প্রত্যেকভাবে বা পরোক্ষভাবে রচনার দিক থেকে মঞ্চস্থ ছিল রচয়িতাদের আশংকা।

পারদর্শী যে গুজরাতি ভাষায় রপ্ত তাতেই তারা নাটক রচনা করেছে। অস্ত্রান্ত সবাই সাহিত্যেও ভাষায় নাটক রচনা করেছেন। এই তাতেই গুজরাতি নাটকের ভাষা গড়ে উঠেছে এবং বিভিন্ন রস ও ভাব পরিবেশনের জন্য একটা বিশিষ্ট রচনাস্ট্রী অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

এখন প্রথম সাহিত্য, আবার উপন্যাস এবং পত্রাভ্যন্তর নাটক ও উপন্যাস থেকে ভাব গ্রহণ করে গুজরাতি নাটকের বিবরণ রচিত হতো। তারপরে কাহিনী, রম্যগান, ইতিহাস, কাব্য এবং পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে বহু নাটকের সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক নাট্য প্রায় সম্প্রতি স্থলী।

১৯১৪ সন থেকে স্বাধীনতা ৫০ তমার উদ্দেশ্যে মঞ্চ

সঙ্গে সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকের উপর তার প্রতিফলন সূত্র হলো। বনতন্ত্র ও ত্রমিক বার্থের সংঘর্ষ আর স্বাধীনতার আন্দোলন হয়ে গাঁড়ালো নাটকের বিষয়বস্তু।

প্রতিটি নাটকে সাধারণতঃ তিনটি অঙ্কে ভাগ করা হতো। আবার প্রত্যেক অঙ্কে বহু দৃশ্য থাকতো। কেত্র দৃশ্যে অস্ত্রাধার আর নাটকীয় উৎকর্ষায় অবতারণা করা হতো। নাটকগুলি সাধারণতঃ মিলনান্তক করা হতো। তবে বিরোপান্তক নাটকও যে করেকটা লেখা হয়নি এমন নয়।

বহু প্রাচীনকাল থেকে নাটকে সংগীত স্থান পেয়েছে। গুজরাতি ভাষায় মাত্র করেকটা গীতিমালা রচনা হয়েছে।

আজকাল সামাজিক নাটকই বেশী মঞ্চস্থ করা হচ্ছে। নাটকের বিবরণের নির্বাচন আর তাকে মঞ্চস্থ করবার ব্যাপারে যথেষ্ট উগ্রতা হয়েছে।

সৌমিন নাট্যসম্প্রদায়ের হাতে নাটক রচনার এক নতুন ধারার প্রবর্তন হয়েছে। এক দিনরাত্রে অভিনয়ের উপযোগী নাটক রচনার রীতি তাঁরা যেমন চলছেন। একাক নাটকও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তিন ভাষায় রচিত নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত নাটক এবং মূল নাটক যথেষ্ট সংখ্যায় রচিত হচ্ছে। তিন ভাষায় রচিত নাটকের ছায়া অবলম্বনে নাটক রচনা বহুকাল থেকে চলে আসছে। অবশ্য আজ এর থেকে আর বিপক্ষে নানাবিধ সমালোচনা শোনা যায়।

গত্রে ভাব প্রকাশের ব্যাপক চেষ্টা বিরল। পড়তেই অধিকাংশ নাটক লিখিত হয়ে থাকে। সুবিধা থাকে সন্তোষ স্থান বিশেষে নাটকের পরিসর তাতে সক্ষম হয়ে আসে। যে সব অবস্থায় সংগীত অপরিহার্য সেখানে গুজরাতি নাটকীয় রস সূত্রেরে তোলা সম্ভব নয়।

মিলনান্তক নাটক সাধারণতঃ উপেক্ষিত হলেও বর্তমানে এই ধরণের নাটকের চাহিদা যথেষ্ট বেড়েছে। করেকজন নতুন লেখক পূর্ণ বৈধের মিলনান্তক সামাজিক নাটক রচনা করেছেন। বলাই বাহুল্য এতে আদর্শ পরিবেশনের উপযোগেই বেশী কোর দেওয়া হয়েছে। বর্তমান নাটকে সাধারণতঃ স্থান অল্প থাকলেও উৎকর্ষা ক্রমশঃই প্রোথিত লাভ করছে।

আধুনিক উর্দু নাটক

সাজ্জাদ জাহী

প্রথম উর্দু নাটক আমানতের 'ইজ সত্‌তা' অভিনীত হয়েছিল অযোগ্যার শেখ বাহার সত্যার, লক্ষ্যোক্তে। তখন মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির পোখুলিলগ। অযোগ্যার রাফের পূর্ণপোষকতার কবিতা সম্রতি আর নৃত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। উদ্যম নাচ আর তুংতীর দুর্ধ্বনা এই সময়ই আবিষ্কৃত হয় আর স্বকীর মাধুর্যগণে চাটখিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমানতের নাটকে স্বর্গরাজ ইন্দের সত্‌তা আমরা দেখি। স্বর্গীর অপরাধগণ তাঁর চিত্তবিনোদনের জন্য নাচছে, গাইছে আর প্রেম নিবেদন করছে। এটি একটি নৃত্যগীতসুখের নাটক—কোন কাহিনী নেই বললেই চলে। তা সত্ত্বেও বহু বছর ধরে এই নাটকটি অভিনীত হয়েছে।

১৮৪৭ সালের বিরাট রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতিফলিতা উর্দু নাট্যসাহিত্যের এই ধারার উপর দেখা দিয়েছিল কিন্তু এটা একেবারে লুপ্ত হয়নি। ইঙ্গলন্ডার পরিচালিত সংস্করণ মঞ্চস্থ হতে থাকে। সেখান হুদু বোম্বাইতে পার্শী উজ্জ্বলতার পরিচালনায় উর্দু নাটক আর মঞ্চ উন্নত পর্যায়ে পৌঁছন যায়। সূত্র কবল। এই নবীন যুগে পের্টন ক্রাফ্‌ট ১৮৭০ সালে প্রথম বহুদলক স্থাপন করেন। পরে অক্সফোর্ড নাট্যসম্প্রদায় গঠিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আলফ্রেড ও নিউ আলফ্রেড সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছে। উত্তর ভারতের নাট্যকারগণ এই সব ধরনের জন্য নাটক রচনা করতেন। তাঁদের মধ্যে আলম লক্ষ্যোই আগা হাসনু কাশ্মীরী, বিনায়ক প্রসাদ ডালিও এবং নারায়ণ প্রসাদ বেত্তাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ভারতীয় ও পারস্যিক ক্লাসিক্যাল কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচনা করেছেন। তাঁরা আবার সেন্সীটিভের উপরও কলম চালিয়েছেন। সেন্সীটিভের বিরোধাত্মক নাটকগুলি তাঁদের হাতে পড়ে নিরন্তরের নিশানযুক্ত নাটকে পূর্ণবিস্তৃত হয়েছে। তাহলেও 'আবদ-ই-হাশন', 'রাফা হরিক্ত্র' এবং 'সুফেখ খুন' নাটকগুলি পুরা পুরি ভারতীয়, বেশ চিত্তবিনোদক এবং জনপ্রিয় হয়েছে। বুদ্ধিবীণ সহন শলোণ, মাফে মাফে নাচ আর গান, অতি নাটকীকতা, কাব্যিক গজ আর সামাজিক ব্যঙ্গ, ব্যঙ্গব্যঙ্গ। আব বম্‌ভাগ, সাধারণ প্রমোদ ও শুভ্রগজীর বক্তৃতার এক অদ্বুত সংমিশ্রণ এই নাটকগুলি।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে চলচ্চিত্রের আবিষ্কারের ফলে এই নাট্য দলগুলি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শেখ পর্যন্ত উঠে যায়। ইতিমধ্যে বেশের জনসাধারণ ক্রমশই সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন। ফলে কয়েকজন লেখক সমালোচনার ও সাদাচার-বাহের বিরোধিতামূলক বিষয়বস্তু অবলম্বনে নাটক রচনা শুরু করেন। কুচ্‌চাঁব রেবা বচিত 'অশনী পাঞ্জাব' নাটকটি ব্রিটিশ সরকারি নিষিদ্ধ বলিয়া আরোহণ জারী করেন। কিন্তু এ সময় নাটকই ছিল নাটকের আঙ্গিকে প্রবন্ধ মাত্র। আর সেইজন্যই পেশাবাদী দলগুলি কখনও এই নাটক মঞ্চস্থ করে নি। এতে না ছিল কোন বৈজ্ঞান্য, না ছিল জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ।

তবে উর্দু নাট্যসাহিত্যে সম্প্রতি যে বিকাশ হয়েছে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯০২ সালে ভারতীয় গন-নাট্য সমিতি সংস্থাপিত হয়। দৌখান নাট্যোৎসাহগণ সামাজিক ও রাজনৈতিক সহজাতা জড়িত নাটক মঞ্চস্থ করেন। প্রেমচাঁদের বিখ্যাত গল্প 'কফনে'র নাট্যরূপ রেওয়া হয় এবং বিশেষ সাফল্যের সহ লক্ষ্যোক্তে উদাহরণ মঞ্চস্থ হয়। আমান এবং সর্গার মাফরি সাদাচারবাহের বিরোধিতামূলক বিষয় বস্তু নিয়ে নাটক রচনা করেন এবং তা অভিনীত হয় বোম্বাইতে। সেই সঙ্গে একাধিক নাটকও আত্মপ্রকাশ করল। রাক্ষস বিং বেদি, কুচ্‌চাঁব, মাল্টো আর প্রভৃতির মত খ্যাতনামা গল্প লেখকগণ বেত্তার প্রভাবের জন্য কতকগুলি সোভা একত্রিত নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু এগুলি মঞ্চস্থ করার জন্য দৌখান নাট্যসম্প্রদায়কে বেত্তা হয়েছিল। এক্ষতগণকে রচনা শৈলী ও বিষয়বস্তু বিক থেকে উর্দু একাধিকা নাটকের বিকাশ খুবই আবশ্যক। যেহেতু 'মকলি মকলি' অন্তর্ভুক্ত সৃষ্টি। উর্দু নাটকের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে পেশাবাদী নাট্যসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে শিল্প ও মনোবাহ বিক থেকে এই হল অজ্ঞান মঞ্চ উর্দু পর্যায়ের। উদাহরণ স্বরূপ আমি পুণ্ডিগার কাপুদের পুণ্ডি থিয়েটার তাঁদের 'পাতান', 'পদমা' আর 'কিষণ' নাটকের উল্লেখ করছি। তাছাড়া বিনী হিন্দুস্থানী থিয়েটারেরও উল্লেখ করা উচিত। তাঁরা সম্প্রতি বিনীতে কালিদাসের শতুত্তম মঞ্চস্থ করেছেন।

আধুনিক উড়িয়া নাট্য সাহিত্য

কালীন্দ্রনাথ পানিগ্রাহী

উড়িষ্যাতে স্থপরিচিত অল্পপূৰ্ণ। বহুদিকে এখন বায়স্ক্র
মিশ্রেৰ সামাজিক বাৰ্জ নাটক 'চান্দুক'ৰ অভিনয় চলিছে।
অবশ্যইইল মন্যবিত্ত ভীষ্মৰ টোকাৰী মুটে উঠেছে এই
নাটকে।

একজন তত্ত্বপ অফিসাৰ সেক্রেটাৰিৰ চটুল কৰ্মকে
বিত্তে কবতে অস্বীকাৰ কৰে চান্দুকিটা হাৰাল। চপম
হাৰিষ্যোব মন্থে তাকে ভীষ্ম কাটাতে হল। বৈতে থাকিব
কন্তু নামা কাক তাকে কবতে হৱেছে এমন কি হিমা টোনাও
বাহ বায় নি। একদিন সেই সেক্রেটাৰিৰ মেচেকেও সে
হিমা টোনে নিৱে গেল। একটা শৰীৰ হিমাগুণালাব জাযা
নছুৱী হিতে গিছেও মেচেকিৰ চূড়ান্ত হান্তিকতাৰ পৰিচয় সে
গেল। তাৰপৰ কয়েকটি বছৰ সাহায্যে সে প্ৰকাশ কৰল
'চান্দুক' নামে একটি পত্ৰিকা। সেক্রেটাৰিৰ অপকৰ্মে তীব্ৰ
সমালোচনাৰ তাৰ পত্ৰিকা মূৰ হৱে উঠল। পৰে
প্ৰাণেৰ যে মেচেকিকে সে ভাঙ্গাবাসতো তাকে সে বিয়ে
কৰল।

আধুনিক উড়িয়া নাট্য সাহিত্য কোন পৰে চলিছে তাৰ
পৰিচয় এই 'চান্দুক' নাটকৰেই পাওৱা যাবে। বায়স্ক্র
মিশ্ৰ যৌব পৰিবাৰেৰ প্ৰেম ও স্বৰ্ণ নিদে বৰ নাটক চপনা
কৰেছেন। তাছাড়া ভীষ্মী অবলম্বনে একটা নাটক
চপনাৰ চেষ্টাও তিনি কৰেছেন। কলকাতা উড়িয়া শ্ৰমিকৰ
জীবন অবলম্বনে তাঁৰ বচিত একটা নাটক ১৯৪৫ সালে
নকস্ব হ'ল। প্ৰকৃত পক্ষে পত পনেৰো বছৰেৰে উড়িয়া
বহুক্ষেত্ৰে ইতিহাস ভাৰতৰ স্বাধীনতা লাভেৰ আগে ও
পৰেৰ বৈমনিৰ ঘটনাৰই ইতিহাস।

অধিনী জুনাৰ যৌব এবং তাঁৰ পূৰ্ণবৰ্তী বা মনকালীন
বিখ্যাত নাট্যকাৰেৰ নাটকে যে জলস্বৰ্ষেণ-প্ৰেম ৰূপ
গেৰেছে তাতেই স্থাপিত হৱেছে অস্বনিয়ন্ত্ৰণেৰ ভিত্তি।
তাৰেৰ চপনাশৈলী দেখুৱিগাৰেৰ অস্বৰূপে গড়ে উঠেছিল।
তাৰেৰ নাটকে ঐতিহাসিক নায়কগণ অমিত্ৰাক্ষৰ হাজ
জামানীৰ বক্তৃতা হিচনে। এইদৰ নাটকেৰে মূলে আধুনিক
নাটক। আধুনিক সাংবাদীঃ৫ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক ও
রাজনৈতিক সমান অধিকাৰ পাবাৰ প্ৰচেষ্টাৰ কাহিনী হল
এই নাটকেৰ উপলব্ধী। সুছাত্তবকাসেৰ নাট্যসাহিত্যে

মনকালীন পৰিবৰ্ত্তনৰ ৰূপটি যেন ভালচাবে মুটে উঠেছে।
কৃত যে সমস্ত ঘটনা খটে গিৱেছে সেগুলি আধুনিক নাট্য-
কাৰেৰে চোখ এড়াতে পাৰে নি। স্বাধীনতা লাভ,
সাম্প্ৰদায়িক হাৰ্জা, উষ্মাত মনস্তা, বৈমনিঃ-এৰ কল, বুনাফ-
বাৰ্জি আৰ কাণোখাৰ্জি, হুটিক আৰ অভাব বা মন-
জীবনেৰ বিকাশে বাৰাৰ সঠি কৰেছিল সে সমস্তই আধুনিক
নাটকে স্থান পেৰেছে।

১৯৪৪ সালে প্ৰকাশিত কালিচয়ণ পট্টনায়েকৰ 'ভাত'
নাটকে চূড়ান্ত ব্যক্তাতাব আৰ বৈমক অন্ত্য্যচাৰী অধিবাৰেৰ
জ্বৰেৰ পৰিবৰ্ত্তন দেখান হৱেছে। তাৰপৰেই ১৯৪৭
সালে প্ৰকাশিত হয় তাঁৰ 'বক্তমাটি'—এৰ নায়ক একজন
কবি। সে বিয়ে কৰল এক অজুৎকৰ্মকে। তাঁৰ 'কাটা
তু'ই' নাটকে ভাৰতৰ স্বাৰ্থনৈতিক চূৰ্ভাগ্যেৰ ইঙ্গিত কৰা
হৱেছে। শাৰা যেন চূড়ান্ত হৱে বাগ্ৰাত আশঙ্কা।
কালিচয়ণেৰ পৰেই এগুন একাধিক প্ৰতিভাযান
নাট্যকাৰ। তাঁৰেৰে মন্থে অৰ্থেচচৰণ মহান্তি, মামচেন্দ্ৰ মিশ্ৰ,
গোপাল ছোজে, ভৰ্জকিশোৰ পট্টনায়েক এবং মনোৱজন হাস
স্থপৰিচিত। তাঁৰা তাৰেৰ বিধববৰ্জক নিপুণতাৰ সজে
হুটিয়েছেন। জুগা, বেকাৰ, মস্তা, শোষণ ও অবিচাৰ জুৰা
আমাৰেৰ মন্থাৰ তাঁৰেৰ নাটকে পুৰামাত্ৰাৰ প্ৰতিফলিত
হৱেছে।

গোপাল ছোজেৰ 'কেতিয়া' (১৯৪৬ সাল) আৰ 'পাৰা
কলম' (১৯৪৭ সাল), মনোৱজন হাসেৰ 'আগষ্ট না' এবং
ভৰ্জকিশোৰ পট্টনায়েকৰ 'সান্তা বৰ' একই পৰ্যায় পড়ে।
যে সব স্বাৰ্থনৈতিক নেতা ও বল আপন হৰল কৰাৰ পৰ
ভোটগাতাৰেৰ কথা শোনে না 'পাৰাকলম' তাৰেৰ প্ৰতি
তীক্ষ্ণ বিক্ৰপ নাট্যনৈৱীৰেৰ চিন্তাৰ পোতাক যোগায়।
'সান্তাবৰে' বাস্তবতা তাৰ শিল্পসৌধৰ্ব একই মূলে মুটেছে।

মনকালীন উড়িয়া নাটকে বিধববৰ্জ আৰ বচনাশৈলীৰ
বিক থেকে মোটাটুটি ইংগেনকে অহুদৰণ কৰা হছে।
সামাজিক বা সামাজিক স্বাৰ্থনৈতিক নাটক না হলে কোন
নাটকই আজ ৰ্বৰ্ষক সাধাৰণেৰ মনঃপূত হয় না। আজকেৰ
নাটক ৰচয়িতাও আধুনিক নাটকেৰ নতুন মাহুৰ আৰ নতুন
নায়কেৰ সজনে ব্যস্ত।

ঐশ্বর্য গুচ্ছ

॥ হৃদয় : প্রেম : পৃথিবী ॥

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

হৃদয়ের সব কিছু দিয়ে ফেলে
স্বপ্নের হওয়ার পরও
বাকী থাকে আরও কিছু বেওয়া।

যেই বাণী পুঁজিটুকু টেনে নিলে
নিম্নের ভাঁড়ারে, তবু,
বাকী থাকে আরও কিছু বেওয়া।

এ-বেওয়াত, এ-বেওয়াত, পরিমাণ তুলানগে নয়,
এ-হৃয়ের মাঝে বয় দীর্ঘ এক মিসিসিপি নদী,
নিজেকে লুকানো থাকে অন্তরের স্রোত পরিচয়,
ছলনায় খেলা চলে স্রোত থেকে অস্তিম অবধি।

তবুও কেহেতু তাতে মেঘ-ছোঁয়া বিয়ের পাখর,
তালবাসা আঁকও তাই পৃথিবীতে অকত, অমর।

॥ ভাটায় গঙ্গা ॥

শ্রীমদ্বীর ভণ্ড

প্রশমিত জোয়ারের প্রবাহ এখন ;
ধিকিত ভাটায় দীর্ঘে নামে মল-বেধা ;
পলি-পড়া মল-সিক্ত তীরে যায় বেধা
বেধা-বেধা তোস-অস্যা পুণ্ডিত-যপন
কৃত্তিক কচু-কুঙ্ক ; গুত্র কাশ-বন
আশে পাশে—যেন মল উমি-ফেন-লেখা ;
তা'রই পটভূমি পরে বক একা একা
আহ ময়—পলিগুরে করে বিচরণ।

সংজ্ঞিত আকাশের আদৃত আভার
ভাটায় গঙ্গার শোভা সুন্দর—মধুর—
প্রশান্ত—মলগনয়। অস্তরে কাগর
কুল-কলগান এক আশ্বের স্বর।

যে দিক-সন্ধান-সঙ্গ টানিছে ভাটায়
গঙ্গাতীরে পাই আমি সে দগ্ধ ইদুর।



॥ মন বিহংগী ॥

শ্রীমেদীশ্বরসাক্ত চট্টোচার্য

নীল চেউ ঘেরা নমুনের কোল : নির্জন বীপ,
পৰ্ণ পথে স্থনিবিড় নীড় ।
বক্ষল-শোভা যৌবন চল : মাতাল ছব্বর ।
চকল তরু : নৃত্য মাহল : পুরুষ প্রকৃতি ।

নবনীতকলা নওকী নটী, যেউল প্রহীপ :
রূপ বজ্রায় বিজেতাই মেলে ।
হৃদ্যার্চ্য এ এক সাম্য মনতার ভিড়ে ।
কাব্য-গুহার শিল্পী-তুলিতে আঁকা হয়ে আছে ।

মন বিহংগ : অংগ মহির—
স্বসত আলাপে অলপ সন্ধ্যা ঘিমেব রাখেনা ।
চাঁদের আকাশ রাত বলে ঘের
নির্মীলিত চোখ, ঘুনের বিহীনী আলসোছে নায়ে ।

বার্তাবাহী উপকূল কাঁধে—
মন বিহংগী বিহর কালো : জানা কোথা গেল ?
নিপুণ হুস্তে বন্দী করেছে : সীমান্ত বেধা ।
নিমেঘে নিমেঘে প্রলাপের হাপ বাগুচর ঘোছে ।

॥ নীল অঙ্ককার ॥

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কি অপূর্ব নীল নর তারার তপ্তাত্ম অঙ্ককার !
হাওয়ায় উদ্ভাস প্রেম ! আকাশের এ তরঙ্গতার
মহাধানে এ-হৃদয় আনন্দের স্বপ্নিল সাগরে
সবরের তীর থেকে বারংবার ঝাঁপ দিয়ে পড়ে
হৃদয়কে ভেসে যায় ! অশীমের অজ্ঞাত সংগীতে
কি-আল্‌তর্বি অল্পতব স্বাধুতে শিবার বননীতে
দিহরণ নিয়ে আসে ! অজুরান কথাব কন্ঠালে
সম্মোহিত মন যেন মালকলতার নতো হোল !

জলের মতোই বিড় অনবদ্য অঙ্ককার রাতে
আব কিছু চাই নাফো, চাই শুধু মিতালি পাতাতে
বগ্ন সন্ধিনীর সাধে, পুঁথিবী বিস্তৃত হওয়া কথা
কয়ে কয়ে ভবে নিতে চাই শান্ত নীল নীলবস্তা
সাবাহিন যাপনের লবণাক্ত নমুনের বাব
মুছে কেসে, কবে যেতে চাই শুধু অগ্নের আবাহ ।
অতলায় অঙ্ককারে ছায়া-মাথা বগ্ন স্বরা পথে
যেতে যেতে কোন কপে মিলে যাব ঘুনের মগতে ।



॥ বিকৃত্তর ॥

সমীরকুমার শুক্ল

“কি হবে কবিতা দিগে ?” বখন শুধাও তুমি যেনে
বখন তোমারো মুখে এই প্রশ্ন স্তম্ভি অবশেষে
আচম্বিতে কেঁপে ওঠে স্বর
কেমন তাকিগা পড়ি, মহলা আসে না উত্তর ।

ভারপর একে একে ছুটে আসে হৃৎ-বেণুবাঁধকের পানে
নক্ষত্র বেহুয় হল । বিরক্তর হৃৎকের ব্যাকুল আধানে
ব্যথার বিবশ চাঁদ মাঠে মাঠে মাথা হুঁটে মারা
সময় ছুটিয়া যায়, মাটি হল কোঁতে আশ্রয়তা
আমাকে বিপন্ন দে'বে । কেটে চোঁবির হ'রে
ফলে ওঠে আগ্রের পাহাড়
আমি বিরক্তর থাকি, ওরা যেন উত্তর আবার ।

ক্রমে ক্রমে বাড়ি যায় দ'বে
পাখী ডাক, হুল কোটে, কোঁটা কোঁটা রোঁজ এসে পড়ে
তোমার চিকণ ভীকু ঠোঁটে
বিস্মৃতে নিছক কনি হৃৎক-দিগন্তে কেঁপে ওঠে ।

লক্ষপতি, কোটীপতি, হৃৎকের অবিপত্তি থেকে মুক্ত ক'বে
মহারাণা, মহামন্ত্রী, সৈন্য সামন্ত সব দ'বে
কুণী ভোগী ভোগীহেতুও নেহজরে বলি আমি ডে'কে
বড়ই করুণা হয় তোমাদের দে'বে ।

বড়ই বেরনা পাই, অহু
বখন তোমারো চোখে কুয়াশার মুছে যায় আকাশের ওই রামধনু
ওই আঁক। ঝাঁক। চাঁদ, তারকার রাশি
জ্বলন-গোপন করা হানি ।
অরণ্য, পর্বত, নদী, প্রান্তরের প্রান্ত অকবিতা
ওরাই তোমার কাব্য, আর তুমি ওদেরি কবিতা ।

॥ যেনেই : হারিয়ে গেছে ॥

শিশু ঘোষ

পৃথিবীর মানুষকে ভালোপড়ে চেয়ে
স্নাত হয়ে গেছি ।

রক্ত-সুৰ্য সাহিত বিকেলে
যেবেছি জীবন শুধু
রক্ত রাঙা পতীর বিদ্যর !
সেখানে স্পন্দন নেই
আছে শুধু ছনিবার গতি,
ছবির কোনো ধোঁজ
হাথে না সময় ।

ধান-ঝড়-সূর্য্যার
দিনান্তের নয়ন-পরীতে ;
স্পর্শতীক্ষ্ণ-সজ্জাবতী
মুখ ঢাকে তারারের ভিড়ে ।
শিশিরের বজা করে
সবুজ-বাসের বুকে
কিবা কোনো গল্পবিত-নাথে ;
আনন্দেরো চোখে লস :
চুলেতে মধুর আণ
অঙ্ককারে খুঁজে কিরি তাকে ।

সে নেই : হারিয়ে গেছে
এই সব মধী-বন
অমল সে তারারের ভিড়ে ;
সেখানে মানুষ নেই
কি করে বাঁচবে আমি
অঙ্ককার হাড়ির গভীরে ।

শিল্পসংস্কার নীতি ও ভারতের শ্রমিক

প্রবোধ চন্দ্র দত্ত

শিল্প বিপ্লবের স্তম্ভ থেকে শিল্পায়নের যে সব ব্যাপ্তি হয়েছে শিল্প সংস্কার নীতি (rationalisation) তার মধ্যে অন্তর্গত। উন্নত দেশগুলি এ নীতি কার্যকরী করেছে প্রায় প্রতিটি শিল্পক্ষেত্রে; ফলে পেয়েছে কম খরচে বেশী উৎপাদন এবং তারই ফলরসি প্রচুর। পরিণামে পেয়েছে বৈদেশী বাজারে প্রাধান্য এবং লক্ষ্যমাত্রা হায়েছে তাদের জনগণকে কম দামে জরুরি সববস্তুই ক্রয়—অর্থাৎ বাস্তব অভিজ্ঞতার দেখা পেছে এ নীতি কার্যকরী (implement) করার ফলে এটা লাভবান হয়েছে। অল্পকাল মধ্যেই এটা হাওয়া লেগেছে কিন্তু কতকগুলি সমস্যা আছে যা এলবিশেষে এ নীতির প্রবর্তনের পথে অন্তরায় হয়ে জনগণ পাথরের স্তর গাড়িয়ে আছে, যেমন বেকার সমস্যা। ভাবে কেহই এ ব্যবস্থার বিরোধী নয়, কিন্তু বাস্তব অবস্থার নীতিগত সম্মুখীন হয়ে এতদ পক্ষে আশঙ্ক সংস্কার নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি; ফলে এটা একেবারে হারিয়ে যাওয়া সীমা লঙ্ঘন করতেও পারছেনা। এতটা অল্পকাল সময়ের সম্মুখীন এরা—সংস্কার নীতি প্রবর্তন করতে না পারায় বিদেশের সঙ্গে পার্থক্য এটা হয়েছে যাচ্ছে ব্যয় বাহ্যল্যেব অন্তে আর বেশের হ্রাস লাভবান বাধ্য হচ্ছে জরুরি বেশী দাম দিয়ে কিনতে অর্থাৎ কম খরচায় বেশী উৎপাদন এটা করতে পারছেনা।

বিস্তারিত আলোচনা ক্রমের পূর্বে সংস্কার নীতি সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা প্রকৃত। শিল্প সংস্কার নীতি বলতে শিল্পক্ষেত্র ও পরিচালনার এমন একটি অনুসংঘ ব্যাবস্থা বুঝায় যাতে শ্রম, অপচয়, খরচ ইত্যাদি সব চেয়ে বেশী কমানো যায়। বিপুল সমস্যায় শিল্প সংস্কার হয়ে শ্রম প্রমোদী হয় আর কাঁচা মালের অপচয় ও অপব্যবহার নিবারণ হয়ে বেশের বন বৃদ্ধি করে। শ্রম আদায়ের বেশের বন অল্পকাল মধ্যেই স্পষ্ট বটে কিন্তু প্রকৃতির বিধান শ্রম বস্তুগণকে

সুদৃষ্ট কারণ বিজ্ঞান দ্বারা উন্নয়নে সমর্থ কিন্তু মানুষ সৃষ্টিতে অপারগ। তাছাড়া আশঙ্ক যে মানুষটি অন্যায় কালই তাকে দিয়ে প্রতিক্রিয়া কাজ করানো যাবেনা—কমপক্ষে বোলো বছর অপেক্ষা করতে হবে তার শ্রম কালে লাগানোর অন্তে। জাতীয় জীবনে একদম যে দুর্লভ ব্যক্তি তার অপচয় নিবারণের চেষ্টা তাই আশঙ্ক উন্নত দেশগুলির একটি প্রধানতম লক্ষ্য। কাঁচামাল প্রাপ্তিও বলা যায় নিষিদ্ধ কোনও দেশেও কাঁচামাল উৎপাদন ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিতে একটা নিষিদ্ধ সীমা পর্যন্ত এ উৎপাদন বাড়ানো চলে কিন্তু ঠিক ঐ সীমা পর্যন্তই। তারপরই প্রান্তিক (marginal) উৎপাদনের প্রায়—অর্থাৎ এরপর উৎপাদন ব্যয় পড়ে বেশী ও ক্ষতিজনক (unprofitable) কারণ খোরালী প্রকৃতির দানের উপর বিজ্ঞানের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ, তাই ক্রমশঃ হ্রাস উৎপাদন (diminishing return) অবলম্বিত। শিল্প সংস্কার নীতি উৎপাদনের এ দুটি উপাধান (শ্রম ও কাঁচামাল) পার্শ্বভাবে নিয়োগ করতে সহায়তা করে। এ ব্যবস্থার উৎপাদন ব্যয় কমে, উন্নত শ্রেণীর দ্রব্য উৎপাদিত হয়, বিজ্ঞানের দানে যে আধুনিকতম যন্ত্রাদি আবিষ্কার হয়েছে তা ব্যবহৃত হয়, অপব্যয়ের পথ রুদ্ধ হয়—সংক্ষেপে এই-ই-এ ব্যবস্থার ভাবাবলী।

এ নীতির স্বপক্ষে উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের কথাই বেশী বলা হয়। উৎপাদন ব্যয় হ্রাসই মুখ্য উদ্দেশ্য বলেও ভোগকারীর (consumer) সুবিধা বিধানই এর গৌণ ও শেষ উদ্দেশ্য। অর্থনীতিবিদ সমাজতান্ত্রিকও যতন; তাঁর কাজ অর্থনীতির নীতি নিয়ে বিচারবক্তা দেখানো নয়, সমাজের প্রকৃত উপকারের পথ নির্দেশ করাই তাঁর প্রধান কর্তব্য। উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে ভোগকারীর বাচ্ছায়াবিধান ও বেশী সামাজিক বন (Social wealth) সৃষ্টি করার তাগিদেই আশঙ্ক অর্থনীতিবিদগণ শিল্প সংস্কার নীতির পক্ষ সমর্থন

কম্বুহীন, উৎপাদন ব্যয় কমলে উৎপাদক কম হাটে অব্যাহি বিক্রী করেও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। হোঙ্গকাটীরা উপকৃত হবে। দু'দিক থেকে হারা বেষ্টি হাটে অব্যাহি ক্রয় করে তাদের শুল্ক বাড়বে আর ঘাটা বেষ্টি হাটেও ক্ষতি বহু ভোগ্য মানব্রী সংগ্রহ করতে পারেন। তাবাত গোণাপনা সংগ্রহে সমর্থ হবে। অল্প কথার সমালোচন একটা বিরাট শ্রেণীর কল্যাণের মাধ্যমে সমগ্র সমালোচন কল্যাণ সাধিত হবে।

এ সম্বন্ধ সত্যটা সকলেই বোঝে। কিন্তু শ্রমিকগণ কেন এ নীতি গ্রহণের বিরোধিতা করে? তাবাত কম্বু হাটে অব্যাহি পেলে উপকৃত হবে, তবু তাদের আপত্তি কেন? সমালোচন উপরে উঠে এমন একটা তাবাত আম চলেছে যা ঠিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নয়। এটা মনে করে শ্রমিক সাধারণ শিল্প ব্যবস্থার যে কোনও পরিবর্তনের প্রতি বিরূপ। মুখের দুইদিক এসাধনে ঢেকে তাবাত মত এ দৃষ্টিভঙ্গীও আসল সমস্যাটাকে ঢেকে রেখেছে। অসহন্য দেশের/অভিশপ্ত সমালোচক এ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়তির নিষ্ঠুর পরিচয়। মূল সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে না পেলে এরূপ মনোভাব দেখা দেয় এবং এতে সৃষ্টিয়ে থাকে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভুক্তি যা সমালোচক চরম দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। ভারতের শ্রমিকগণ স্বতাবৃত্তই পরিকল্পনামূলকতার বিরোধী এরূপ আলোচনাও শোনা যায়—কিন্তু সত্যি অবস্থাটা তার বিপরীত। শ্রমিক কল্যাণমূলক সে সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে যাতে কি এটা বিরোধিতা করে? সুখ স্বাস্থ্য মাদ্রুবে কায, কোনও ব্যবস্থার স্বাস্থ্য বাড়বে কোনও এর প্রতিবন্ধকতা কেউ কখনো করে এরূপ নবীর ইতিহাসের পাতার পাণ্ডা যায় না। শিল্পক্ষেত্রের নীতির নীতির প্রতি শ্রমিকের বিমুখীনতার প্রধান কারণ, কৃষ্টি হারানোর ভয়, কৃষ্টি হারানোর খেদ। কৃষ্টিহাতিয়ে যার দুইদিক। একটি কর্তৃকর্তের সংস্থান সে উৎপাদন ব্যয় তথা অব্যাহি হারানোর আশায় উৎক্লম্ব হবে কেন? সৃষ্টিতে? বিকল্প নিয়োগের পথ থাকলে কোন শ্রমিকই এ ব্যবস্থার বিরোধিতা করবেনা, করতে পারেনা—উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক ইতিহাসে অন্ততঃ তাই বলে। শিল্পপতি সংস্কারনীতির উৎকট সমর্থক—তার কাছে প্রতীপের নীচেকার আধারের জায় শ্রমিকের দৃষ্টি উপেক্ষণীয়, তার

মুনাফার দিকই সে বিশেষ লক্ষ্য রাখে আর এতে অস্বাভাবিকতা খুব বেশী কিছু নেই। কারণ ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিজের আর্থিক উন্নতি তথা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ঐক্য সকলেরই থাকে। সংস্কার ব্যবস্থার তার হারানোর নেই কিছুই কিন্তু শ্রমিক বেকার হয়ে হারানোর তার 'জীবন, ধর্ম, ধন, মান' কারণ সংকট শিল্পে আর্থনৈতিক সমস্যাটি ব্যবস্থার কত শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। অল্প হ্রাসপ্রসারী ফল অল্পকম অর্থায় ব্যবস্থার ব্যয়ব্যয় উন্নয়নে নতুন নিয়োগ পথ সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে আল বেঁচে থাকার পথ পেলনা সে কোন্ আলোচনার পেছনে ঘুরবে ভবিষ্যতের আশায়? ভারতের শ্রমিক পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণীর মতই চোঁটা করছে সুনামকে ভাবে তার অবস্থার উন্নতি করতে—সে আল নিয়তির খেদার পুতুল হয়ে ভিলে ভিলে করে যেতে পারাণ।

বেকার সমস্যার অভিযোগ আমাদের সমালোচক দুইদিক হয়ে উঠেছে। পরিগণ্যমানের দিকে বেশী না সূচকও বলা যায় প্রতি বছর গড়ে দুই লক্ষ কার্যক্ষম ব্যক্তি বেকার বলে থাকছে আর বর্তমানে দেশে প্রায় ১২ লক্ষ বেকার রয়েছে। এ হিসাবে আগামী পাঁচ বছরে বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে পঁচিশ লক্ষ। প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার বেশে প্রচুর কাজ হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু নিয়োগব্যবস্থার উন্নতির স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতার (limitation) ক্ষেত্রেই বেকার সমস্যা খুব কঠিন সমস্যা হয়নি। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার ক্ষুদ্র শিল্প ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়োগের সুযোগ বাড়বে সন্দেহ নেই কিন্তু বেকার সমস্যার মূলোচ্ছেদ হবেনা। তাই আল ভারতীয় শ্রমিক সংস্কারনীতির বিরোধী। ভারতের পঞ্চম সাংবিধান কল্যাণ রাষ্ট্রের (Welfare State) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রধান কাজ কর্তৃকর্ত ও কর্তৃকর্তের সমাধান নিয়োগ, বেকারের সমস্যা বাড়ানো নয়। কাজেই শিল্প সংস্কার নীতি তাড়াতাড়ি প্রবর্তন করে কিছু শ্রমিকের কৃষ্টি বন্ধ করার ব্যাপারে রাষ্ট্র সমর্থন জানাতে পারেনি। অতীতকে এ নীতিকে চিহ্নিত উপেক্ষা করাও রাষ্ট্রের পক্ষে উচিত নয়, কারণ বিজ্ঞানের অবদান মানুষ নিজের কাজে বড়টা সাপাতে পারে ততটাই মঙ্গল। বিশ্বজোড়া অগ্রগতির সূত্র অগ্র-

পদ্মনের দিকে চোখ কান বদ্ধ করে দত্তপুরুষ সেজে উগ্ররূপে নির্যাসক্তি দেহানো রাষ্ট্রের পক্ষে বাঞ্ছিত নয়। তাই নীতির বিক থেকে রাষ্ট্র এ ব্যাংককে অস্বীকার করেনি, সময় ও সুযোগ মত এর প্রবর্তনের চেষ্টা করবে।

সময় ও সুযোগ বলতে কি বোঝায় দেখা যাক। বেকার সমস্যা না বাড়িয়ে শিল্পসংস্কার নীতি কার্যকরী করা যাবে এতদূর একটা অবস্থাই এতে বোঝায়। এখন দেখা যাক কি করে এতদূর অবস্থা বর্তমান পরিস্থিতিতে অমরা সৃষ্টি করতে পারি। সৃষ্টিধর্মী মানবমন, সৃষ্টির নীতিবদ্ধতার মধ্যে থেকেও সুযোগ সৃষ্টির নব নব ধারা প্রবর্তনের ক্ষমতাই জাতীয় চরিত্রের গুণাগুণের পরিচায়ক। আমদানি বিপত্তির মুখে, সমস্যার মুখে সনাক্ত করে তাসিয়ে দিয়ে জাগ্রাবাদীর মত নীরবে থাকতে পারি—অর্থনীতি ও ভাণ্ডারী হ'তে শিক্ষা দেয়না। শিল্প সংস্কার করবার একটা পথ আপাততঃ কিছুটা সহজ। বিশেষে যে সমস্ত পণ্য রপ্তানী হয় সে সমস্ত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে না পারলে রপ্তানী বাণিজ্যে আমদানের হঠে আসতে হবে। তাই যে সব শিল্প প্রধানতঃ রপ্তানী পণ্য উৎপাদন করে সেগুলিতে আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সহায়তায় সংস্কার সাধন করতে হবে। এতে যারা বেকার হবে একটু চেষ্টা করলেই যে সব শিল্প দেশের চাহিদা পূর্ণ্য উৎপাদন করে তাতে তাৎক্ষণিক কাজে ব্যবস্থা করা শক্ত হবেনা। এর ফলে আরেকটা সুবিধাও হবে—আমরা আধুনিকতম যন্ত্রপাতি আমদানী করি, শুধু রপ্তানী শিল্পের ক্ষেত্রে আমদানী কংল যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত মোট ব্যয় সামগ্রিকভাবে শিল্পসংস্কারের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ব্যয়ের প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক কম

হবে। রপ্তানী বাণিজ্যে নিখুঁত শিল্প শাইলের প্রতিযোগিতার জন্য হ'লে বিশেষে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাবে আর তার ফলে ঐ সমস্ত শিল্পে সম্প্রদায় প্রয়োজন হলে অর্থাৎ তাতে নতুন কর্মসংস্থানের পথ হবে। দেশের চাহিদা পূর্ণ্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলি আমদানের চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মিটাইতে পারছেন। ফলে গত মহাযুদ্ধের পর থেকে সববর্ষের অপেক্ষা চাহিদার পরিমাণ বেশী হওয়ায় মূল্যের হারে মুদ্রাস্ফীতি (price inflation) দেখা দিয়েছে। চাহিদা অসুখারে পণ্যের গতি (flow of goods) নির্ধারিত হওয়া অর্থনীতির একটা প্রধান সূত্র—ভারতে আজ এ সূত্র লঙ্ঘিত। ফলে ভোগকারীর দুর্ভাগ্য ও মুদ্রাস্ফীতিজনিত অনবিধাগুলি দেখা দিয়েছে। এ সমস্ত শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধিতে শ্রমিক নিয়োগ করে এ অবস্থার কিছুটা উন্নতি সাধন করা চলে।

শিল্পসংস্কার কান, কিন্তু শ্রমিকের তথা সমাজের উন্নতি কাম্যতম। অপরপক্ষে এ সংস্কার অপরিহার্য। তাই বর্তমান অবস্থায় তাড়াতাড়ি করে সমস্ত শিল্পক্ষেত্রে এ প্রবর্তন বা কোনও ক্ষেত্রেই প্রবর্তন না করে বসে থাকে কোনটিই দৃষ্টিভুক্ত নয়। কার্যকারিতা ও নিয়োগ ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। তাবিস্থ্য উন্নতির সিংহদ্বার থাকবে আমদানের কাছে চির অন্তর্ভুক্ত এতো ব্যতির কোনে মরল ব'লে আনবেনা; আবার তাতির তথা সমাজের নেতৃত্বও শ্রমজীবীর কোনে নেমে আসবে ঘন অন্ধকার এও সামাজিক দৃষ্টি কোন থেকে সন্দর্ভীয় নয়। সময় এসেছে সুবিবেচনা, সময় এসেছে সমাজতন্ত্র ও অর্থনীতির সুদৃষ্টি নিয়োগের।



আর্থিক প্রসঙ্গ

শঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

॥ ভারতের বৈদেশিক সাহায্য ॥

বিগত ১৯৫৭ সাল আর্থিক দিক দ্বিগুণ ভারত সরকারের কঠিন বন্দব গিয়েছে। দেশের আত্যন্তচরী ও বহিঃ সঙ্কতিগুলি গুরুতররূপে শোবিত হয়। বৈদেশিক দেন- যেন সরকারকে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। এই তরানিক অবস্থার উন্নতির জন্য সরকার কঠোর অর্থ- নৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ কববার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বৈদেশিক মুদ্রা সংবন্ধে অল্প সরকার গ্রহণ ব্যবস্থা হিসাবে আমদানীর পরিমাণ বহুল পরিমাণে কমিয়ে দেন। বৈদেশিক মুদ্রার বর্তমান প্রয়োজন মিটান ছাড়াও, বিত্তীয় পক্ষ- ব্যাবিক পরিকল্পনার প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। এ অল্প ভারতকে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নেই। বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্য আনবার অল্প গন্ত বন্দব ভারত সরকারের পক্ষে থেকে তথ্যনিশ্চয় অর্থ মন্ত্রী শ্রী টি. টি. কুমারচাট্টা ও বেসরকারী শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে শ্রী বি. ডি. বিজলাব নেতৃত্বে একটি দল বিদেশ ভ্রমণ করেন। এঁদের এই প্রচেষ্টার ফলে ভারতকে অর্থ সাহায্য করার ইচ্ছা অনেক দেশ প্রকাশ করেছেন।

প্রথম পক্ষ-ব্যাবিক পরিকল্পনাকালে ভারত বিদেশ থেকে ঋণ ও অগ্রদান হিসাবে ১৬৬ কোটি টাকা সাহায্য পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল্য থেকে ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত ভারত মোট ৪৮০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছে। এর মধ্যে আমেরিকার দ্বার হওয়া পনের অল্প লোকদান বাবদ ১৭ কোটি টাকা আছে। এই ১৭ কোটি টাকা বাব দিলে, প্রথম পরিকল্পনার মূল্য

থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ ভারতকে মোট ৬১০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য অগ্রদান করেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বন্দবে বৈদেশিক সাহায্য হাতে পাওয়া গিয়েছে ৩৭৭৫ কোটি টাকা এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে হাতে পাওয়া গিয়েছে ১০৫ কোটি টাকা। বর্তমান ১৯৫৮-৫৯ সালে ৩২৫ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে এবং চলতি সালের জানুয়ারি এই টাকার হিসাব নেওয়া হয়েছে।

এই বৈদেশিক সাহায্য থেকে ১৯৫৬-৫৭ সালে কাজে লাগানো হয় ১৬ কোটি টাকা। ১৯৫৭-৫৮ সালে বৈদেশিক সাহায্যে সদ্যবহারের পরিমাণ প্রায় ১৩০ কোটি টাকা দাঁড়াবে বলে অগ্রদান করা যাচ্ছে।

১৯৬৭-৬৮ সালে বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে অনেক আলোচনা আলোচনা ও চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। এই বছর বিশ্ব ব্যাংক ভারতকে নিম্নলিখিত ঋণসমূহ অগ্রদান করে :—

(১) ট্রুথোতে বার্মাল স্টেশন সম্প্রদায়ের অল্প টাটা গ্রুপ হাইড্রো ইলেকট্রিক কোম্পানীগুলিকে ৪৬৭ কোটি টাকা ঋণ দেয়। ভারত সরকার এই ঋণের আদান হয়েছে।

(২) ভারতীয় রেলপথের উন্নয়নের অল্প ৪২৬৮ কোটি টাকা ঋণ অগ্রদান করে।

(৩) টাটা সৌর কারখানার সম্প্রদায়ের অল্প ১৫৫৭ কোটি ঋণ দেয়। এর পূর্বে ১৯৫৬-৫৭ সালে বিশ্বব্যাংক এই অল্প প্রায় ৩৫৬২ কোটি টাকা ঋণ অগ্রদান করেছিল। এই ঋণেও ভারত সরকার আদান হয়েছিলেন।

এই সময়কাল দিয়ে এ পর্যন্ত বিশ্ব ব্যাংক ভারতকে মোট ১৭০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। এখন দানোয়ার উপভাষা পরিবর্তন, করলা মণিবিদ্যুৎ পরিবর্তন এবং কলিকাতা ও ময়াজ্ঞ বন্দর উন্নয়নের জন্য আরও ঋণের জন্য বিশ্ব-ব্যাংকের সঙ্গে ভারত সরকারের আলোচনা চলছে।

গত বছর বৈদেশিক লেন-দেনের সামগ্রিক অসুবিধার নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার থেকে ১৫.২৪ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের জন্য এক চুক্তি করেন। এই টাকা ঐ বছর ফেব্রুয়ারী থেকে জুন মাসের মধ্যে তিন কিস্তিতে ভারত সরকার তুলে নেন।

এ সব ছাড়া আরও যে সব ঋণ ভারত সরকারকে বৈদেশিক বাণিজ্যসমূহ গত বছর অসুবিধা করছে তা নিয়ে দেওয়া হল :—

(১) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার আমদানী-রপ্তানী ব্যাংক ও উন্নয়নমূলক ঋণ ভাণ্ডার থেকে ১০.৭.১৫ কোটি টাকা ঋণ দিতে বীজ্জিত হয়েছেন।

(২) জাপান—ভারতের বিত্তীয় পক্ষ-বার্ষিক পরি-কল্পনার জন্য জাপান থেকে আমদানীকৃত ২০.৮১ কোটি টাকা মূল্যের সুনিয়মিত শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রী করতে জাপান সরকার রাজী হয়েছেন।

(৩) পশ্চিম জার্মানী—পশ্চিম জার্মান সরকারও ভারতকে তার বৈদেশিক মুদ্রার অসুবিধা দূর করার জন্য সাহায্য আশ্বাস দিয়েছেন। এর প্রথম ব্যবস্থা হিসাবে পাঁচ জার্মান সরকার রুব্রকেলা শৌখ কারখানার জন্য আগামী ৩৬ মাসের মধ্যে যে সব টাকা দিতে হবে তার তারিখ পিছিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। অন্তর্জাতীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে প্রথমে ১০.৬১ কোটি টাকা ও পরে ৭৫ কোটি টাকার প্রায়ের তারিখ পিছিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন।

(৪) ফ্রান্স—ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগীতার চুক্তি অসুসায়ে কলসী সরকার ভারতকে বিত্তীয় পরিবর্তনজনক মুনিয়মিত শিল্পজাত দ্রব্য ও রপ্তানীর ব্যবস্থা ২৮ কোটি টাকা সাহায্য করতে বীজ্জিত হয়েছেন। এই ক্রয়ের নির্দেশ ১২ মাসের মধ্যে দিতে

হবে এবং এর সর্বভালি ভারতসরকারের অসুবিধা হওয়া চাই।

(৫) রাশিয়া—১০.৫৭ মাসের নতুন মাসে ভারত সরকারের সঙ্গে এক চুক্তি অসুসায়ে দোস্তিভেৎ সরকার ভারতকে মাত্র শতকরা ২৫ টাকা হার সুদে ৬০ কোটি টাকা ঋণ দীর্ঘ মেয়াদে দিতে রাজী হয়েছেন। এই ঋণ একটি শুষ্ক মেশিন তৈরী কারখানা, একটি কল্যাণমির মেশিন তৈরী কারখানা, একটি দুগ্ধ সঞ্চয়ী কারখানা কারখানা একটি তাম্র শক্তি কারখানা স্থাপন ও কংক্রিট কল্যাণমির উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে। ঋণের টাকা এক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাল পৌছিয়ে দেবার এক বছর পর থেকে শুরু করে ১২টি সমান কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আমেরিকা আরও অনেক ভাবে সাহায্য করছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারত ১৯৫৮ রাষ্ট্রব্যবস্থার ভারতকে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সাহায্য দেবার জন্য ৬০ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করেছেন।

উপরে যে আমেরিকার ১০.৭.১৫ কোটি টাকা ঋণের কথা বলা হয়েছে, তা ছাড়াও ভারতের ভারতের বিত্তীয় পূর্ববর্তনের জন্য সাহায্য করার জন্য আমেরিকা সরকার আরও ব্যবস্থা করা বিবেচনা করেছেন। তারা বেশে মালেশিয়া নিবাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সাহায্য তহবিল ও এশিয়ার উন্নয়ন তহবিল থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ৪৭ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করেছেন।

১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসের যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৃষি-পণ্যক্রয়ের চুক্তি অসুসায়ে আমেরিকা ১৯৫২ সালের জুন মাস পর্যন্ত তিন বছরে ৩৬ কোটি ডলার মূল্যের উন্নত কৃষি জাত্য ভারতের কাছে বিক্রী করবে। ইতিমধ্যে ২৫.১৫ কোটি ডলার মূল্যের গম, ২.৯৯ কোটি ডলার মূল্যের চাল, ৩.২৬ কোটি ডলার মূল্যের তুলা, ৫৬ লক্ষ ডলার তামাক এবং ১২ লক্ষ ডলার মূল্যের দুগ্ধজাত দ্রব্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাকি ৪.২ কোটি ডলার এখন গম কেনার জন্য পাওয়া যাবে, আগে এই টাকা তুলার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। ১৯৫৮-৫৯ সালের প্রথমার্ধের মধ্যেই গম পাওয়া যাবে।

কলম্বো পবিত্রকল্পনা অনুসারে কানাডা গত ১৮৮৫-৮৬ লক্ষ ডলার মিরে ভারতকে ২১ কোটি ডলার সাহায্য অনুমোদন করেছে। এই টাকা কানাডা থেকে এলুমিনিয়াম, তামা, নিকেল ও হেল পথের মস্ত কার্ট-বগু আমদানীর মস্ত এবং মস্ত মলবিদ্যুৎ পবিত্রকল্পনা ও কানাডার বিদ্যুতের পবিত্রকল্পনার মস্ত বৈদেশিক দ্রব্য কেনার মস্ত পাওরা হবে। কানাডা ভারতের ঋণাত্মক পূরণের মস্ত আরও ৭০ লক্ষ ডলার অনুমোদন করেছে এবং আরও অতিরিক্ত একলক্ষ টন গম ক্রয়সম্পন্ন সর্বোত্তম সরবরাহ করতে বাণী হয়েছে।

মুক্তরাষ্ট্রের কোর্ড কাউন্সিলের কাছ থেকেও ফিট ও কুই শিল্পের মস্ত, ভারতীয় ইঞ্জিনারদের মুক্তরাষ্ট্রের শৌখিন শিল্পে শিক্ষা গ্রহণের মস্ত ও ইংরেজী—ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মস্ত আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে।

এ ছাড়া ভারত কলম্বো পবিত্রকল্পনা মুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা কোর্ড প্রোগ্রাম এবং রাষ্ট্র সন্মেলন পরিদর্শনী সাহায্যের মস্ত পবিত্রকল্পনা থেকেও কারিগরী সাহায্য পাচ্ছে।

৥ ভারতীয় অর্থনীতিতে শিল্পীয় এস্টেট

পৃথিবীর অত্যন্ত শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে ভারতের অর্থনীতির এক মূলগত পার্থক্য এই যে এদেশে শিল্পের উপরে জনসাধারণের চাপ অত্যন্ত বেশী। এই চাপকে কমানোর মস্ত ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন সাধক করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বৃহৎ শিল্পে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক সুযোগ সুবিধা থাকার ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রদায়ের পক্ষে বাধা আছে। এই বাধাকে অতিক্রম করার মস্ত পবিত্রকল্পনা কমিশন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পীয় এস্টেট স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মন্ত্রিপাতি এবং কাঁচা মালের অর্থনৈতিক ব্যবহার ও উৎপাদনের এককম মান বৃদ্ধি করে কারখানার কাঁচের দক্ষতা ভাল রাখার মস্ত অবস্থা বন্ধার বাধার উদ্দেশ্য নিয়েই এই শিল্পীয় এস্টেট স্থাপন করা হবে। ক্ষুদ্র শিল্পগুলি আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত হলে কেবল মাত্র উৎপাদনই বৃদ্ধি পাবে না, ভাঙে দেশের বেকার সমস্যাও সমাধানের অনেকটা সাহায্য হবে। শিল্পীয় এস্টেটে অনেকগুলি ক্ষুদ্র শিল্পকে একই আরগার গড়ে তোলা হবে। এর ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ, মল, গ্যাস, বাষ্প, হেলপথের

পাইপিং প্রেছার প্রভৃতি সাধারণ প্রয়োজনগুলি অতি অল্প খরচে বিভিন্ন শিল্পগুলি ভোগ করতে পারবে। তাছাড়া শিল্পীয় এস্টেটকে এমনি করে গড়ে তোলা হবে যাতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ভাল থাকে। শ্রমিকদের মস্ত গৃহ, বিদ্যালয় এবং অত্যন্ত সামাজিক সুবিধার ব্যবস্থা হলে তাদের কর্মক্ষমতারও উন্নতি হবে।

দ্বিতীয় পবিত্রকল্পনার শিল্পীয় এস্টেট স্থাপনের মস্ত ১০ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ টাকারই বাণী-সরকার মনুষ্যিক দিয়ে দেওয়া হবে। গত ১৯৪৭-৪৮ সালেও কেন্দ্রীয় বাজেটে ১ কোটি টাকা এ মস্ত বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং পরে এই বরাদ্দকে বাড়িয়ে ১৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। গত ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ৩৪টি শিল্পীয় এস্টেট স্থাপন অনুমোদন লাভ করেছে। এর ব্যয় পড়বে ১ কোটি টাকা।

বাংলাকে শিল্পীয় এস্টেটে চারটি ইউনিট কারখানার প্রত্যেকটির মস্ত ১০টি ব্লক স্থাপিত হয়েছে এবং তার মধ্যে ১৪টি ব্লক ইতিমধ্যেই ক্ষুদ্র শিল্পপতিরা দখল করে নেয়েছেন। কেরালাতে পাল ষাট ও কুইলনে ১৪টি ইউনিট কারখানা প্রস্তুত হচ্ছে। মাদ্রাসের শুইচী এস্টেটে ৩০টি ইউনিট কারখানা তৈরীর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। উত্তর প্রদেশ, বাংলা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি বাংলা শিল্পীয় এস্টেট স্থাপনের মস্ত ইতিমধ্যেই আরগ্য কেনা হয়ে গিয়েছে এবং কারখানা স্থাপনের কাজও শীঘ্রই আরম্ভ হবে। নয়া দিল্লীর পার্শ্ববর্তী ওখলা ও এলাহাবাদের শিল্পীয় এস্টেটগুলি ভারতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন তৈরী করছেন। এ ছাড়া বাকি শিল্পীয় এস্টেটগুলি নিজ নিজ রাজ্য সরকারসমূহ তৈরী করছেন। এলাহাবাদ শিল্পীয় এস্টেটে ২৪টি কারখানা তৈরী হয়ে গিয়েছে এবং আরও ১০টির তৈরীর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ওখলা শিল্পীয় এস্টেটে ৩৪টি কারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং ক্রমে আর ১০টি স্থাপন করা হবে।

বড় বড় শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বড় শিল্পীয় এস্টেট স্থাপন করা ছাড়াও, শরী উন্নয়ন ব্লক ও পাইলট পরি-কল্পনা অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পীয় এস্টেট স্থাপন অনুমোদন করা হয়েছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে কেন্দ্রীয় বাজেটে ১৫

কোটি শিল্লীয়া এস্টেট স্থাপনের উদ্দেশ্যে রাণ্য সরকার
সবুজকে স্বর্ণ বেতার মত বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া
বিদ্যুৎ, হিমাচল প্রবেশ, মণিপুর ও ত্রিপুরার প্রত্যেকটি
কেব্রীয়া শাসিত অঞ্চলের মত পল্লী উন্নয়ন ত্রুকে একটি
করে শিল্লীয়া এস্টেট স্থাপন করবার মত ১০৮২ লক্ষ টাকা
বরাদ্দ করা হয়েছে।

শিল্লীয়া এস্টেট ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নকে অব্যাহতি করতে
এবং বেশের বেকার সমস্যা সমাধানের দখেই সাহায্য করতে
সম্মত নেই। এমনকি শিল্লীয়া এস্টেট ক্রমেই বেশী লম্বিত্বপূর্ণ
অর্জন করছে। কিন্তু শিল্লীয়া এস্টেট ঘাতে আধুনিক কল-
কজা ও সামগ্রিক শিল্প শিল্পিত হয় সে দিকে সন্নিবেশ
দৃষ্টি রাখতে হবে। পুরাতন পদ্ধতিতে ও পুরাতন কল-
কজার উৎপাদনে যেমন গুরুতর ভুল করবার সম্ভাবনা

তরয়েছে অপর পক্ষে আধুনিক কল-কজার ও আধুনিক
পদ্ধতিতে উৎপাদনে দখেই লাভের সম্ভাবনা আছে।

শিল্লীয়া এস্টেট স্থাপনের অর্থ বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতি-
যোগিতা নয়। বস্তুতঃ পক্ষে এরা একে অপরের সম্বন্ধপূর্ণক
মাত্র। বৃহৎ শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তার কাঁচা মালের
মত ক্ষুদ্র শিল্পের সম্মানার্থেও প্রয়োজন হয়ে পড়বে। তাই
শিল্লীয়া এস্টেট স্থাপন সময়োপযোগী ব্যবস্থাই হয়েছে।

ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপন্ন মাল কাটকিৎ মত জাতীয় ক্ষুদ্র
শিল্প কর্পোরেশন প্রশংসনীয় কাণ্ড করছে। বেশের বৃহৎ
শিল্পসমূহের কাছ থেকে অর্ডার সংগ্রহ করতে, অন্যান্য
ডিপো ও চলন্ত গাড়ীর সাহায্যে প্রচার ও বিক্রীত ব্যবস্থা
করছে এবং এমন কি শ্রবুর মোড়িতে রাণ্য, পোলাও এবং
নিউজিল্যান্ড থেকে পর্যন্ত সর্ভাঙ্গ সংগ্রহ করেছে।



আশ্বামানের সপ্তম সম্পদ

৩

আশ্বামান বীপপুঞ্জের বিগতবিস্তৃত গহন বনে পূর্ব বঙ্গ উপত্যাকারের বাস করিত। আশ্ব সেখানে প্রায় ৫ হাজার দৈনিক বনবাস করিতেছে। তাহার গাছ কাটিয়া, চেবাই করিয়া এবং সুন্দর অকলে তাহা চালান দিয়া ঐকি নির্বাহ করে।

আশ্বামান বীপপুঞ্জে বিভিন্ন বকরের কাঠ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মোট ২৫৮ বর্গমাইল অঞ্চলের ২১০টি বীপ লইয়া এই বীপপুঞ্জটি গঠিত। উহার মধ্যে বঙ্গিলা ছাড়াই প্রায় ১৫০০ বর্গমাইল স্থান অরণ্য সমাচ্ছন্ন। খেড়ে প্রতি একর জমিতে ৫ হইতে ৩০ টন অর্থাৎ সমগ্র বীপপুঞ্জে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ হইতে বেড়ে কোটি টন সুশুক শাল গাছ আছে। গাছ কাটার পর ঘাতীং সাহায্যে সেগুলি অল্পত্নে মেওয়া হয়। এইরকম ভাবে হইতে এখানে ঘাতী আমছানী করিতে হইয়াছে। কারণ আশ্বামান বীপপুঞ্জে ঘাতী ড'রুর কথা, কোন প্রকার বস্ত্র বস্ত্রই নাই।

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেও এখানে আদিম প্রথার কাঠ সংগ্রহ করা হইত। কিন্তু এক্ষণে এই বীপপুঞ্জের সর্বত্র সংগ্রহের ক্ষমতা বনবিভাগ নানাপ্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের ব্যবহার করিতেছেন। সকল বর্ষীয় গাছের চাব হুড়ির সমস্তও চেষ্টা করা হইতেছে। কারণ গম্বী অকলে টেলিগ্রাফ ও বৈদ্যুতিক যোগাযোগ সাধন কার্যে এই ঘাতীর কাঠ আদর্শ ধামরূপে ব্যবহার করা চলে।

আশ্বামান বীপপুঞ্জ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৪০ লক্ষ বন হুট শাল কাঠ কাটা হয়। উহার প্রায় অর্ধাংশ ভারতে

প্লাইউড বেলমাইয়ের কাঠি, প্যাকিং বাক্স ও রেলগাড়ীর বগীর নির্মাণ কার্যে ব্যবহার হয়। সেজন্য উহা চেনা না করিয়া বড় বড় হুড়ির আকারেই ভারতে প্রেরিত হয়। অবশিষ্ট কাঠ চাখাম, ভারতা, বেতাপুর ও নাগদাম্বারের চেবাইকলগুলিতে বিভিন্ন আকারে কাটা হয়।

এশিয়ার বৃহত্তম কাঠ চেবাই কল

আশ্বামান বীপপুঞ্জের চাখামে এশিয়ার বৃহত্তম কাঠ চেবাই কল আছে। এখানে দৈনিক গড়ে প্রায় ১০০ টন কাঠ কাটা হয়। এখান হইতে ভারতীয় রেলওয়েসমূহের রীপার এবং নৌকা ও গৃহ নির্মাণোপযোগী কাঠ চালান যায়। চাখামের চেবাই কল হইতেই টকটকে লাল স্মৃতি ও মূল্যবান “আশ্বামান পার্বোঁক” এবং ‘জেব্রা’ কাঠ চালান যায়। পাকিস্তান ভ্রমণে উহারের যথেষ্ট চাহিদা আছে। চেবাই কলটিতে দৈনিক ক্ষেপে প্রায় বেড়ে হাজার কর্মী মোট ১৮ বটী কাজ করেন।

এই কাঠখানার চেবাইয়ের সমস্ত বিভিন্ন স্থান হইতে বৈদ্যুতিক লম্বানের সাহায্যে কাঠের বড় বড় হুড়ি মলপথে পোর্ট ত্রোয়ার বন্দরে আনা হয়। সেখান হইতে এগুলি সমুদ্রের স্রোতের সাহায্যে পরিচালিত ক্রকের দ্বারা শুল্ক উপস্থিত হয় এবং মূল্যপথে অগণিত শিকলের সাহায্যে কবাত কাঠখানার নীত হয়।

কাঠখানাতে বিদ্যুৎ চালিত কব্বাতে ঐগুলিকে মন্থন করিয়া কাটা হয় এবং অল্পত্নে চালান বেওয়ার পূর্বে উহারের ক্ষয় ক্ষতি নিবারণের উদ্দেশ্যে নানারূপ ঐটা লাগান হয়।



আমায় তুমি ডাক দিলে গো সেই ক্ষণে

অভিমা চট্টোপাধ্যায়

যখন আমি শ্রান্ত হয়ে আপন মনে
জয়হিসাম কাকের শেষে গৃহের কোণে ;
আকাশ পাতের থেকে এসে সছা-ভায়া
চেয়েছিল আমার পানে নিমেষ হারা—
আমায় তুমি ডাক দিলে গো সেই ক্ষণে ।

যখন আবার এল কালল কাসো হয়ে
তীরের পানে এল মাকি শুই বেয়ে
শিখর আগে কহবে আর বহুল স্ববে
ছোট বধূর রাঙা ছুটি চরণ পরে—
আমায় তুমি ডাক দিলে গো সেই ক্ষণে ।

যখন বেলে বসন্ত তার হাওয়ার বেলা
বিকে বিকে ডাক পাঠালো কুলের মেলা
সপ্ত রাঙা আকাশ ডাকার ব্যাকুল চোখে
কঁপে ওঠে বেবহাঙ্গ গাছ নেশার স্কোকে,
আমায় তুমি ডাক দিলে গো সেই ক্ষণে ।

যখন আমার আকাশ পাতের প্রান্তে এসে
আলোর আলোর কেমন করে গেল মিশে
সকল চোখে দাঁড়িয়েছিলেম এলোকেশে
সব স্বাব্যনোব চিহ্ন আমার ছিল বেশে—
আমায় তুমি ডাক দিলে গো সেই ক্ষণে ।

রবীন্দ্র সৃষ্টির উৎস সন্ধানে

অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়

সত শতাব্দী কাল ধরে বাংলার বুকের উপর দিয়ে নদীধার বেে এসেচেন। শে.ভাষাত্তা পথ অতিক্রম করে চলেছে তার সূচনা-প্রান্তে রামমোহন ও শে.প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। এই দুটি প্রান্তসীমা চূষন করে তারতের ভাষাভাষী তৎসম ভাষা লীলাসিতা রামমোহনের আবির্ভাবে শতাব্দীর নিখর ঝাঁধার কৈঃপ উঠলো, তাঁর প্রথম প্রতিভা সূচক প্রকাশী দৃষ্টি দিয়ে বেে ভাবী গন্তব্য পথ চিহ্নিত করে বিন রবীন্দ্রনাথ সে প্রবাহের পারে বাড়িয়ে তুললেন ছন্দে নুপুঃনিকণ, তার বিশ্লেণে ধ্বনির তুললেন মলতরঙ্গের স্রবচ্ছন্দ। প্রবাহের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সে প্রবাহকে বিশ্লেণ বিশ্বদয় ব্যাপ্তি, নিগূঢ়তার দিক দিয়ে তার মধ্যে স্কারিত করলেন অন্তর্গুঢ় আবেগ ও আকৃতি, যা ছিল মস্তকের কোটরে তাকে মাথিয়ে আনলেন মেঘসঙ্গ জ্বরের সমলে, স্রামল স্কেজে।

বহুকাল আগে কবি লিখেছিলেন, “সহিত শব্দ এইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি।” মাহুঘের সহিত মাহুঘের, অতীতেঃ সহিত বর্ডমানের, দুবের সহিত নিম্বটেঃ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধনই সাহিত্য, অন্তরের জিনিষকে বাহিরেঃ, তাবের জিনিষকে ভাবার, নিজের জিনিষকে বিশ্বমানবর এবং স্বপ্ণকালের জিনিষকে চিরকালের কথিয়া তোলা সাহিত্যের কাটা।”

কবির সংবেদনশীল মনের জিজ্ঞাসার জ্বাবে লড় ও চেতন ধীরে ধীরে তারের গোপন রহস্যলোকের স্রুত্ভার উন্মুক্ত করে ছিল। কবি মাথার তারের আনয়ণ করে নিলেন অন্তরের অন্তঃপুরে, ছয় লড় নৃত্যে যেতে উঠল, কখনো বেশি প্রোভাত্তপ, কখনো মধ্যাক্ ভাবর, কখনো আকাবের বিদ্রাঃ, চন্দ্ৰের স্রুত্ভ ভ্যাতি আবার মর্ডোর বুকের স্রুত্ভের হাসি, নদীর চেট, পাখীর কাকলী, কখনো স্বর্গ থেকে বিধায়ের স্বপ্ণ আবার দ্যানন্তিমিত স্বপ্ন স্বর্গের উদ্দেশে হাতছানি। বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে নারীর বিভিন্ন

রূপ কবির প্রাণে যোগা ছিল। চারি বছরের মেয়ে মৌন নিগিমেখে বিধায়ের আয়োগেন দেখছিল, ‘মেতে আমি বিশ্বনা তোমার’ বলে সে জ্বরের মেহ অধিকার প্রচার করলো। ‘হুত্ভ বেণী; ঘোমটা খোলা, স্রামা মেয়ে এ্যন্ত ব্যস্ত পথে স্রুত্ভর থেকে বেহিয়ে এসো’—কবি মেখলা দিনে যাঠের পরে তার কাণো হহিণ চোখ মেখে স্রুত্ভ হলেন। কলসী কাঁখে স্রুত্ভতা মধু বংগের বহুকে মেখলেন, স্রুত্ভীর মাঝে কল্যাণীকে পেলেন। আবার মাতা, কস্তা, বধুর বহন থেকে মুক্ত ভুবনদোষী অনন্ত যৌবনা উর্দ্বশ্বিঃ মাংস স্রুত্ভান পেলেন বিশ্বর প্রেরণীয়।

বিশ্বর বিভিন্ন লখনস্রার বিভিন্ন গায়র উঠে প্রণব-লানিতে গগন চূষন করছে—কবি উৎকর্ষ হয়ে তা শুনলেন, উপলব্ধি করলেন তার অন্তর্নিহিত ইন্দিঃ, তাৎপর্য,—পাখীর কর্ণে স্রুত্ভর বিশ্লেণে; নদীর কল্লোলে। বনীর ধূলিকে স্বর্গেরণু করে মেখলেন, মাহুঘকে স্রুত্ভের মাঝে স্রুত্ভের মত ভালাললেন। স্বর্গ ও মর্ডোর মাঝে স্বর্গ-সেহু চচিত হলো, আর তার সোপান থেকে স্রুত্ভি হতে বহনে, তাব হতে রূপে অবিদ্যাম আনাগোনা চলতে লাগলো। বিশ্বজন আবর্ডনে রূপাঙ্কিত হলো।

বৈশ্বদ্বিন জীবনের প্রায়োগেন মাহুঘ স্রুত্ভর থাকতে চার না, তার উপরিত কিছু চিত্তা করতে চাহ,—সে চিত্তা আস্থার চিত্তা; মাহুঘ বধন স্বর্গ থেকে পরার্থে, অস্রুত্ভুতি থেকে পরমাস্রুত্ভুতিতে পৌছে তখনই প্রকৃত নহুত্ব অর্জন করে,—এই ভাবার্থ বিশ্বর বিরাট স্কেজে তিনি ছড়িয়ে বিলেন। তাঁর কবিতা, তাঁর গান অচেতন মনের ধূদর আংছাকে করে দীপ্ত, দৃষ্টিকে করে স্রুত্ভপ্রকাশী, স্বপ্নে স্বকৃত করে তোলে বিশ্ববাবীর স্রুত্ভ, সমগ্র স্রুত্ভাকে তারিয়ে নিয়ে যার স্বপ্ণলোক, ডুবিয়া বেধ বসাদগয়ে, হতপ্রী জীবন ও পরিবেশকে করে স্রুত্ভ, স্বপ্নর জীবিত—যাতে মাহুঘ বৈত্ত ও মানির পঙ্কজুপ থেকে পঙ্কজের মত স্রুত্ভ স্বপ্নর মাহুঘ

হুটে ওঠে। রাগে, স্নাত্তে, শিকারে, সংকীর্ণিতে, নিখের
মঃস্থের আহান-প্রদানে; বিশ্বমানব এই বিশ্বাত্মক
বেধেতে চেপেছিলেন। মানবিকতার উৎস কুমিত্তে ধাঁড়িয়ে
বিশ্ব শান্তি ও মৈত্রীর বাণী ঘোষণা করলেন। জীবন
দেবতার কাছে চাইলেন, 'নূতন কর্তব্য লগ্না আত্মার
চিরপুণাতন ঘোরে।'

যে চোখে আল আযরা জগৎ, জীবন ও প্রেমকে দেখি,
যে সৌন্দর্যবাহ, মৈত্রীবাহ, মানবাত্মাবাহ আধুনিক ভারতীয়
সংস্কৃতির প্রাণবাহীরূপে আল সার্বজনীন স্বীকৃতি পণ্ড
করেছে তার প্রাণলোকে রবীন্দ্রনাথই পুরুষোত্তম রূপে

বিজ্ঞান। আধুনিক ভারতের তিনি যুগাধার, নিখিল
বঙ্গের উদ্বোধক মহাকবি, মহাপ্রজ্ঞী।

ছঃ, বিজ্ঞেয়, কতি, দৃষ্ট্য মাহুগকে পীড়া দেয়, মঃস্থের
মাহুগে নিরোধ-বিজ্ঞেহের হৃদে করে তপসই—দগ্ন মঃস্থ
জীবনকে বিস্ত্রি, গিখিত্ত করে বেধে। উপনিষদের
জ্বির বিবাসুত্তি নিয়ে ব্যস্তি মঃস্থে সমীক, দীমার মঃস্থে
অসীমকে, জগের মঃস্থে অগ্নপকে, খেওর মঃস্থে অগ্নপকে
দেখলেন শাস্ত্র জীবনের পূজারী। এই অগ্ন জীবন-দগ্নন
রবীন্দ্র হৃদয় স্বপন পুরীর সোনার কাঠি। ভারতীয়
সামান্য চরম কথা জুনার উপলক্ষি, তা তাঁর হয়েছিল যার
দেই উপলক্ষি থেকে তাঁর সকল হৃদে উৎসাহিত।



এমন কিছু কঠিন নয়

ছোট ছেলের সঙ্গেও সম্ভব যদি চিকমতো
হাঁকিয়ে দেওয়া যায়



আপনার সম্ভ্রম্যই
আপনার পুণ্যের কর্ম-জীবনের
সামান্য বিমোক্ষভাবে
সূচিত হবে।



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪নং ব্রাইড ঘাট স্ট্রিট, কলিকাতা-১

গারো

অগ্নিমা রাত্র

গারো উপজাতি বাসিয়া জয়ন্তি পাহাড় থেকে এসে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে বলে আমাদের অনুমান করেন। তারা ২৬টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত,—যেমন (১) বেহর (২) চাম্পক (৩) ধলাংলা (৪) মাক্তি (৫) কড়া (৬) উনি (৭) লেং (৮) লক্‌ক (৯) চিংগের (১০) বাঙা (১১) বানটার্ড (১২) কামা (১৩) শুম্রি (১৪) নাপরা (১৫) কালাংছের (১৬) পোংরাই (১৭) বংগাত (১৮) সাদুক (১৯) লগমান (২০) শাদু (২১) পঞ্জিগাক (২২) বংকান (২৩) নাপগান (২৪) ছাপরা (২৫) বাপরা (২৬) ছাওদি।

সমগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের বিবাহ হয় না। পুরুষারা মাতৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত হয়।

গারোরা মাতৃত্ব-শাসিত। পুরুষের দৃত্যার পর বিবাহ স্ত্রী সম্পত্তির অধিকারিণী হয়। স্ত্রী স্বামীর দৃত্যার পূর্বে গত হ'লে কন্যা বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী হয়। কন্যা না থাকলে নিকটস্থ আত্মীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়। স্ত্রী মারা গেলে পুরুষ তার অবিবাহিতা শাশুীকাকে বিবাহ করে। যদি সে শাশুীকাকে বিবাহ ক'রতে রাজী না হয় তখন তাকে দত্ত স্ত্রীর ব্যবস্কা পতিভাগ ক'রে নিজের পিতামাতার কাছে চলে যেতে হয়।

কিছুদিন পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করবার পর পুরুষ ও নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে চায়। কন্যা তখন পুরুষটিকে বিবাহ ক'রবার জন্য মাতার কাছে অনুমতি চায়। তার মাতা তখন প্রথমে খেনো নব (চকোট) তৈরি করে যুবকটিকে বাতে নিজের ঘরে নিমন্ত্রণ ক'রে এই বিবাহে মত আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। যুবকটি সম্মতি জানালে কনের মাতা যুবকটিকে একটি কাপড় ও চারিটি সুপারী দেন। যুবকটির এই দান গ্রহণ করাকে 'কুদ' বলে। এই দান গ্রহণ করার দিন থেকে যুবকটির

আর অল্প কোন বয়সের মধ্যে মেলামেশা করা নিষিদ্ধ। যুবকটি তখন নিজের পিতামাতার কাছে চলে যায়। তিনচারদিন পরে কনের বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। বিবাহের দিন সন্ধ্যার সময় বর উপস্থিত হ'লে বরখাঞ্জীঘের ভিতর 'চকোট ও সুপারী' বিতরণ করা হয়। বর ও কনে দুজনেই মস্তকে শাণ্ড কাপড়ের পাগড়ী বেঁধে একটি ঘরের পাশাপাশি বসে। তখন হুজি (পুরোহিত) ছুটি সুপারী অর্ধেক করে ছুটুকরা বরের ডান হাতে ও ছুটুকরা কনের ডান হাতে দেয়। কিছু পরে হুজি বরের ডান হাতের সুপারীর টুকরা ছুটি কনের ডান হাতে এবং কনের ডান হাতের সুপারীর টুকরা ছুটি বরের ডান হাতে দিয়ে দেয়। এই সুপারী পরস্পরের মধ্যে বিনিময় ক'রেই বিবাহ সম্পন্ন হয়। গারোদের মধ্যে বিবাহ বিবাহ প্রচলিত। পুরুষ একাধিক নারীকে বিবাহ ক'রতে পারে কিন্তু সচরাচর তা করে না। পুরুষেরা স্ত্রীর কাছে থাকে। স্বামীর পুরুষতার উপর কোন অধিকার থাকে না। শাশুরবাড়ি যোগ বছর বসে তাদের বিবাহ হয়।

গারোদের গৃহ পূর্বমুখী বা পশ্চিমমুখী হয়। প্রত্যেক বাড়িতে তিনটি ক'রে কামরা থাকে। একটিতে দান ও অন্যান্য জিনিষ রাখা হয়—সে কামরটিকে চাম্প বলে। মাথের কামরাটির নাম ককার—এটি রাগাঘর, সে-বয়সটির নাম 'জু' অর্থাৎ শোবার ঘর।

গারোদের প্রধান ব্যস্ত ভাত এবং মাছ। দূর, ঘরিন, ছাপল, হাঁস, হুংগী এবং পারায়র মাংস তারা খায়। গভীরের মাংস পেলে তারা অত্যন্ত খুশী হয়। কড়িং এবং পলপাল তারা খেয়ে থাকে। ছু ও ডিম তারা খায় না। পুরুষেরা শোবার ঘরে খায় এবং নারীরা রান্না ঘরে খায়। চক্‌মকি দিয়ে তারা আন্তন জালায়।

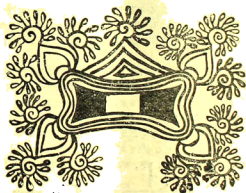
গারোরা তুলা, ভাদ্রুট বান, সরষে এবং নিকুঠ ডামাকের
অল্প চাষ করে। গারোদের মাছ ধরার কৌশল বড়
অদ্ভুত। ছোট ছোট নদীতে ঝাঁপ বেঁধে জল আটকে ধের
এবং পুকুরে একরকম বিধ চলে যায়। বিধে মাছ মেতে
উঠে এবং কিছু মাছ মরেও যায়। তখন তারা সব মাছ
ধরে নেয়। এই বিধকে এরা “গারাইহুং” বলে। কোচাই
গাছের ছাল থেকে এই বিধ তৈরি হয়।

গারোদের প্রধান বৃক্ষরিত্রী দেবীর নাম ঋষি। এই
দেবীর স্বামীর নাম “গাপেগা”। উভয়কে তারা পূজা
করে, তবে ঋষি সর্ব উচ্চে। এই আধর্শে গারো পুরুষকে
গারো নারীর কাছে দব সমর মাথা হেঁট করে থাকতে হয়।
ম্রীর ধানখেয়ালী আখ্যার স্বামীকে হুকুন বলে মানতে
হয়। ঋষি ও গাপেগা ছাড়া গারোদের আর তিনটি দেবতা
আছেন (১) মহেশপাত্তুর (২) মহাকাল এবং লামেংছু।
ব্যাবির হাত থেকে বাঁচবার জন্য গারোরা এই তিনটি
দেবতার পূজা করে।

কোন গারো দ্বারা গেলে গ্রামের মাতঙ্গরত ও গিন্নীরা
দুত বেধটিকে আগলানোর দ্বারা উপস্থিত হয়। দ্বারের পূর্বে
বাড়ীতে যতো “চকোট” থাকে তদন্ত অন্য বাড়ীতে
স্থানান্তরিত করা হয়। পথের দিন সকলে মিলে দুত
দেহটিকে পোড়ান তবে না বনব বেওরা হবে ঠিক করে।
নুতব্যাধি বা অপর কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি দ্বারা গেলে
তাকে কবর দেওয়া হয়। দ্বার কোন বন্ধ বা জাহী
স্বজন না থাকে তাকেও মরবার পর কবর দেওয়া হয়।
‘জ্রী, পুজ, ও সম্পত্তি’ থাকলে দুতকে পোড়ান হয়।

পশ্চিম বাঙালার গারো সমাজ গুলপাইগুড়িতে আছে।
দ্বানীর ভাষার ভাষের মাধ্যমে বলা হয়। তাদের উপজাতীর
সমাজ গঠন এখনও অসুট আছে। বর্ধিত ভাষার উপজাতীর
সংস্কার বর্তমান এবং তাদের অসংস্কারিত ও খায়ে হিন্দুদের
কোন সংস্কার এখনও পৌছায়নি।

পশ্চিম বাঙালার গারোদের সংখ্যা মাত্র ১৯৯৬।
তাদের ভাষা বোড়ো ভাষাগুলির অন্তর্গত।



বিপ্লবের পদচিহ্ন

৪'০০

[বিপ্লব যুগের উজ্জল ইতিহাস]

ত্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

বিভিন্ন সংবাদপত্রের সত্মামত

"Amrita Bazar Patrica".

—“This is a graphic and intimate account of the revolutionary movement in Bengal when the Bengalee youths rose in revolt against the mighty British Raj. The full story of the movement is still to be unfolded in all its glory. From the very few accounts which have made their appearance uptil now the hearts of Bengalees are filled with pride. Freedom-loving people all over the world will also cherish these accounts as priceless contributions of a nation in revolt against an alien and tyrannical rule.....”

—“Those who want to know about the immortal youths of Bengal in all their glory and of whom Rabindranath sang and gave adequate expression will do well to go through this book. This book will also help future historians who may undertake the task of writing a full and authentic account of Bengal's revolutionary movement. We know how the Bengalee youths, forgetful of their personal safety and promises of earthly riches mounted gallows in such a cheerful way that even their executioners were surprised. We should know the history of this period of Bengal.”

“দেশ”

...“ত্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত বাঙালি বিপ্লবী দমঃ ‘যুগান্তর’ প্যাটির অন্ততম স্তম্ভ। ‘বঙ্গদা ক্যাম্প’ নামক গ্রন্থে তাঁহার এইরূপ একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র-পরিচয়ের সাক্ষ্য পাওয়া যায়,—“যে কয়েক ব্যক্তির পড়াশুনা খুব বেশী বলিয়া জেলে খ্যাতি ছিল, ভূপেনদাসও তাঁহারদেরই একজন। ভূপেনদাস ছাত্র হিসাবে খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন, ইংরেজী ভালো লিখিতে পারেন বলিয়া বঙ্গিমহলে স্বীকৃত। তেজ, বুদ্ধি, ব্যক্তিগত ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের সংমিশ্রণে ভূপেনদাসের যে চরিত্র গঠিত হইয়াছে, তাহাতে অনায়াসে বিপ্লব আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন। এই শক্তিবান পুরুষ ভবিষ্যতে দেশের বাহিনীতে কি অংশ গ্রহণ করিবেন, বঙ্গদা ক্যাম্পে বহুবার এই কথা অনার মনে জাগ্রত হইয়াছে। ‘বিপ্লবের পদচিহ্ন’ তাঁহারই জেলজীবনের কাহিনী। ইহা নিছক তাঁহার আত্মকথন নহে, ইহাকে বাঙালি বিপ্লব যুগের কাহিনী পা ইতিহাস বলা চলে।”

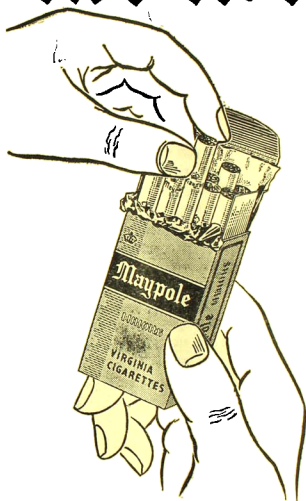
...“গ্রন্থে হুতাশকল্প, বাহুসোপান মুখোপাধ্যায়, অরুণ ওর প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের সাতখানি ফটো মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলার বিপ্লবের অনিন্দ্যরক যতীন মুখার্জির ‘বহাদুরান’-এর (বালেশ্বর) যে অপ্রকাশিত ফটোখানি প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা গ্রন্থের মধ্যে ও সেরাই মুদ্রিত করে নাই, ইহা বাঙালি একটি অবিস্মরণীয় সম্পদরূপে গ্রন্থের হান বলিয়া বিবেচিত হইবে। শুধু এই ফটোখানির জন্যই ভূপেনদাসকে বাঙালীর জনসাধারণ দক্ষতম বক্তব্য জানাইবে। ‘বিপ্লবের পদচিহ্ন’ শুধু এককারণকেই নহে গ্রন্থে বর্ণিত বহু বিপ্লবীকেই অবদান করিয়া থাকিবে। ইহাদের আশ্রয়দানে ও সংগ্রামে দেশের স্বাধীনতার প্রথম ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহারদেরই কাহিনী এই ‘বিপ্লবের পদচিহ্ন’ এবং বাঙালীর বুকে এই পদচিহ্ন যতদিন স্পষ্ট ও স্মৃতি বহিবে, ততদিন বাঙালীর দুখ নাই—ইহাই হইল গ্রন্থের মর্মবাকী।”

সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা-১২

অক্টো-৩২, আগার সার্কুলার রোড

কলিকাতা-১

অতি... স্নোপোল



দ্রব চেয়ে ভাল

বড়দি

আবুল মাতাক বোনা

(১)

যুব কৈকেই তবু বিজ্ঞান। ছাত্রতে ইচ্ছা করছে না।
দিনগণা চোখে শুয়ে আছি। এক থোকা অন্ন ভাবনা বিশেষ
যাত্রা উজ্জ্বল চিত্তা পাগল করে তুলেছে আনন্দে।

হঠাৎ একটা ঘট করে শব্দ হল। চমকে উঠলান
আমি। বেখলান হওয়া চেষ্টা প্রবেশ করেছে ইরা। এত
সকালে ইগকে বেধে জিজ্ঞাসা দৃষ্টান্তে উঠে বললান। কিছু
তার ব্যাখ্যাতুল সুখের প্রতি চেয়ে আমার কণ্ঠ ঘন রেখ
হয়ে এস। একটা অবিদ্যাক্ত অনঙ্গলকর যোগে হঠাৎ
বিশ্বাসের কঠিন ভিত্তিতে মাথা ঢাকা দিয়ে উঠলো। বৃহ
বিজ্ঞান দৃষ্টান্তে তার দিকে চেয়ে নির্ধাক আনন্দহীন ঘুরে
উঠে গাড়ালান আমি।

ইচ্ছা মালতীর ছোট বোন। সাত বোন ওয়া।
মালতীই বড়। যেদিন মালতীর সঙ্গে আধার প্রথম
পরিচয় সেইদিন হতেই আমি তাকে বড়দি বলে ডাকতাম।
অবশ্য বয়সেও বড় বেশী নয়। বৎসর ধানেক হবে।

আমাকে অনেক কথাই বলতো। বড়দি। ব্যাখ্যার বেধনার
জীবনের কালার ইতিহাস বলতো ও শুনতো সে। কবে কবে
সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল, কে কবে তার সঙ্গে বেচে
প্রেম করতে এসেছিল, কোন ছেলে তার পছন্দ হয় নাই,
কে তাকে বিয়ে করবার কথা দিয়েও করে নাই—সে অনেক
কথা। দীর কণ্ঠে বলতো বড়দি—সেই সঙ্গে সঙ্গে তার
ব্যথা বেধনার আনারও অন্তর্ধানি ছিলে ছিলে উঠতো।

কোন কোনদিন বেধনার সঙ্গে মুখে বলে থাকতে বেধতান
—সেই বিবাহের প্রতিমা, স্তিমিত্তি নিরাশা। জিজ্ঞাসা
করতাম আমি—“কি হয়েছে বড়দি, সুখটা এত বদলনে
কেন?”

একটি দীর্ঘাশ্বাস ছেড়ে বলতো বড়দি—“কি আর হবে
তার, হতভাগীষের বা হয়ে থাকে।”

কথা আর বাড়াতাম না। বুঝতাম বাড়ীতে অগভা-
ঝাটি হয়েছে। হজো দিয়ে মজ্জাক্ত ব্যাপারে কথা কাটা-
কাটি হয়েছে। যা বাড়ীতে সাধারণত হয়ে থাকে।
বড়দিকে বিরক্ত না করে মাকে জিজ্ঞাস করতাম। বড়দির
মাকে আমিও মা বলতাম—“কি হয়েছে মা, বড়দির রাগ
হল কেন?”

উত্তরে বলতেন তিনি—“আর বল না বাবা হারামজারীর
কথা। হারামজারী বিয়ের বলে বাঁচি। বাড়ি বাতাল
লাগে। কোনদিন বাবা ভাত মুখে তুলতে পার না। কিছু
হয়েছে বিয়ে করবো না। পছন্দই হয় না। বলি আমার
যেমন তেমন তো দ্রুতবে। আকাশ কুহুম কলনা করলে
পারি কোথায়?”

বলতাম আমি—“এ তোমার ভারী অজ্ঞান আচার
বড়দি। বিয়ে করতে চাও না কেন? বাইণ বৎসরের
নেয়েকে এরা হয়ে রাখে কি করে, বল? তাছাড়া তোমার
ব্যোকা উচিত তোমার বিয়ে না হলে তোমার ছোট বোনদের
বিয়ে হবে কি করে?”

ব্যাখ্যার ক্রান্ত দৃষ্টান্তে চাইতো বড়দি। চোখ দুটি
জলে ভরা, কিছু বলবার আগেই মনটা আমার কোমল হয়ে
ছেতো। অন্তরের নিম্নত কোণে একটি ব্যথা বড়দির অন্তে
বাহবার আঘাত হানতো। বলতো বড়দি—“কাকে বিয়ে
করবো অতুল, ওরা যে আমাকে ঘাতে পারে হাড়ি বেঁধে
জলে তানিয়ে দিতে চায়।”

কথাটি সত্যি। বর হিসেবে বাবা বড়দিকে বিয়ে
করতে চায়, তার কেউ বড়দির যোগ্য বর নয়। বিয়ে
করে আইবর নাম সূচতে পারে, কিন্তু বিয়ের মধ্যমা
লাভ করা যায় না।

কোনী হুলেব নেয়ে সে। রূপ রূপ দ্বারা কোনটার

অভাব ছিল না। অভাব ছিল বাবার টাকা। আর অভাবে তার এই শান্তি।

কোন কোনদিন এক স্বলক ব্যক্তি নিঃশ্বাস ছেড়ে দতাপ কর্তে বলতো—“আমার আর বিয়ে হবে না অতুল।”

কত মিথ্যার ফলে তার এই ধারণা হয়েছে তা আমিই ভালভাবে জানি। আমি মাঝনা দিয়ে বলতাম—“কি যে বল বড়দি, তোমার মত মেয়ের বিয়ে হবে না! দেখো তোমার খুব ভাল হবে বিয়ে হবে। শুধু শুধু মন খারাপ কোরো না।”

একটু তীক্ষ্ণ কর্তে বলতো বড়দি—“আমি বিয়ের জন্তে পাগল ছয়নি অতুল। শুধু ভাবছি ভবিষ্যতে আমার স্থান কোথায়। মা বাবা তো আর চিরদিন থাকবে না।

আমি একটু স্বভাব দিয়ে বলতাম—“তোমার বত সব বাজে চিত্তা বড়দি।”

একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল বড়দি—“যাত্রা নিষেধ মন দিয়ে অপরের মনকে বিচার করে না, তাহা এই কথাই বলবে, তা বলা স্বাভাবিক।”

কেন জানি না সেদিনের সেই কথার সত্যিই আমি আখ্যাত পেয়েছিলাম—এক অত্যাশ্চর্য অভিমানের বোঝা খিঁচ বহল আমাকে। কাবণ বড়দির স্বপ্ন দুঃখের একমাত্র সঙ্গী ছিলাম আমি। বাবা বেহনার একমাত্র মর্মগায়ী আমি, আর একমাত্র সাধনার স্থল আমি, সে হিসাবে আমার অভিমান স্বগোষ্ঠী স্বাভাবিক ছিল না। বীর পায়ে ঘর হতে বেরিয়ে এসাম।

ব্যক্ত কর্তে তাকাল বড়দি—“ফেরা না বলছি, শোন অতুল।” আমি গ্রাহ্য করলাম না। এরপর কয়েকদিন বড়দির নিকট যাইনি। কিন্তু একদিন বৈকালে ঘর হতে বাম্বি এমন সময় ইত্থা এসে বলল, “যেমন, মা আপনাকে ডাকছেন। এখুনি আমার সঙ্গে আসুন।”

অনিচ্ছার মাঝে যুগা অগ্রে উঠল। আমি বীর কর্তে জিজ্ঞাস করলাম—“বড়দি কি কবছে রে ইত্থা?”

“বড়দি আপনার উপর খুব রাগ করেছে দেখনা। আপনার সঙ্গে আর কথা বলবে না।”

“কেন রে?”

“আপনি আর অন্যায়ের বাড়ী আসেন না তাই।”

“আমি না গেলাম তো বড়দির কি হল?”

“বাবু, বড়দি যে আপনার কথা বলে।”

“কি বলে রে?”

“অন্তরিকে বলছিল যে।”

শুধি বলছিল রে ইত্থা?—সবটুকু শুনার মত আমার মনখানি নেচে উঠল।

“অন্তরিক বড়দিকে বলছিল—কি রে মালতী খুব তার কেন? অন্যায়ের সঙ্গে যে আজকাল কথাই বলি না। কি হলো রে তোব?”

বড়দি তখন বলল—“অতুল আমার উপর রাগ করে আর আসে না—তাই, মনটা খারাপ।”

আন্তে আন্তে ইতার মাঝে গেলাম।

আমাকে ধেঁষে খাপনের স্বপ্নে বলল বড়দি—“এই কয়েক দিন আসো নাই কেন?”

“এমনি,”—মহাক কর্তে উত্তর দিলাম।

“এমনি, মা আমার উপর রাগ করে?”—হেসে ফেলল বড়দি।

এমন সময় মা এদে জিজ্ঞাস করলেন—“কি বাবা শরীর ভালতো? এই কয়েকদিন মা ধেঁষে ত্যাগলাম, কোন অসুখ বিসুখ হল না তো! তাই বোঝ মনতে ইরকৈ পাটিয়েছিলাম।

একটু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বললাম—“কাজে আটকে গিয়েছিলাম মা, তাই আসা ছয়নি।

“কাজে যখন আছে বাবা, মাঝে মাঝে এসো। তোমার মাকে ভুল না”—কথাটা বলে, যেতে যেতে আবার কিবো জিজ্ঞাস করলেন—“তুমি একটি বয়ের কথা বলছিলে, তার কি কোন সংসার গেলে বাবা?”

একটি প্রতিষ্ঠিত ছেলেকে বিয়ের জন্তে লিখেছিলাম আমি, ছেলেটি বর হিদাবে আকাশের চাঁদ। ঘন মান বাহ্য—কোনটারই অস্তাব ছিল না তার। সে এই কেমনী ফুলে বিয়ে করবে বলে বিশ্বাস ছর মা। তবু এক কলম লিখেছিলাম। কিন্তু কোন উত্তর এদে এখনও পৌছায় নি।

বললাম—“এখনও কোন উত্তর আসে নি মা।”

আমার উত্তর শুনে একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। আমি আশা করেছিলাম এই দীর্ঘশ্বাসটা শুধু এক সপক উত্তর দিখান নয়—হঠাৎ তবুও এক সপক বেহায়া চলে।

দীর্ঘ কণ্ঠ বলল বড়দি—“শুধু শুধু চোঁটা করছ অতুল ?”
আমি বিস্মিত কণ্ঠে বললাম—“শুধু শুধু কেন হবে ?
বর হিসেবে সে আকাশের চাঁদ ?”

“হতে পারে। আমি কিন্তু বিয়ে করবো না অতুল।”

“কেন ?”

“এমনিই, ইচ্ছা করে না তাই।”

“ইচ্ছা না হওয়ার কারণ ?”

“তোমার প্রেমের উত্তর দিতে পারলাম না।”

“তোমার এ পাগলামী কবে ঘুচে বড়দি ?”

“নরল, তার আগে নয় অতুল”,—বুড় কণ্ঠে বলল বড়দি। আমি অস্বস্তি হলাম। কিন্তু কথাটাকে নিয়ে আর বাড়ানোর দরকার নেই। কারণ সে বরের আশাও একবারে শূন্য।

কিন্তু আশ্চর্য। তপসের এই-ই বিচিত্র মিশ্রণ। মাহুদ বা ভাবতেও পারে না তার সত্য হবে কেবো হয়। যা জান তপসের বাইরে, তা একদিন অতি বাস্তবের স্মৃতিতে সামনে এসে পড়ায়। তাই হল আমার। সে বরের আশা কটিল। শুধু খেয়ালের বসে ভিজেন্স করেছিলাম, সে এক সর্ব-গণাধিতা কেহানীর মেয়েকে উদ্ধার করতে ইচ্ছুক কি না।

পরে বিন বেদি সত্যি সত্যি সে এসে হাজির। আমার আশা নেচে উঠল আমার মন; মেয়েও গছ হল তার। কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার—বড়দি কিছুতেই বিয়ে করতে রাগি হল না। মা বাবা কেউ বুঝিয়ে পারলেন তাকে।

সঙ্গে সঙ্গে অহুতাপে চোখ কেটে জল বেগিয়ে এল আমার। বড়দিয়ের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম আর কোন পক্ষের রাগবো না। সত্যিই কয়েকটা দিন এখের বাড়ীর সুখের আশা হইল।

দিনভিনেক পর ইবা এসে হাজির। বলল আমাকে—“মেঘনা বড়দি ডাকছে আপনাকে। এখনি যেতে হবে।”

“তোমার বাড়ী আর ঘাঘ না ইবা।”

“কিন্তু বড়দি যে আমার হবে নিয়ে যেতে বলেছে।”

“বলুক, ঘাঘ না। বড়দি তো আমার কথা রাখতে পারল না।”

“হ” সেই অজ্ঞেই তো, মা সেদিন রাতে বড়দিকে মেয়েছিলেন। ঘাঘ কত বললেন, সব হতে তাকিয়ে যিরেছিলেন। বড়দি-সেই রাতে মাহুমামীর বাড়ীতে ছিল।”

“তাই নাকি ?”

“হ্যাঁ, তবে সেদিন কেউ কিছু খাবারি। মা তো কেঁবেই লারা।”

বড়দির এই আকস্মিক ব্যবহারে তার প্রতি যে বিতর্ক আর বোকা আমার মনের উপর চেপেছিল তা হুহুর্ভের মধ্যে ঘুং হলো। বড়দির দ্বন্দ্ব মন আমার ব্যাচল হয়ে উঠল।

আমাকে ঘেঁষে দীর্ঘ কণ্ঠে বলল বড়দি—“আমার উপর খুব রাগ করছে, না ?”

“রাগ করি নি। কিন্তু তোমার এই অস্বাভাবিক আচরণে সত্যিই অস্বস্তি হয়েছি বড়দি। ব্যাপার কি বল তো ?”

একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ব্যাবার্ড কণ্ঠে বলল বড়দি—“সে বুঝবে না অতুল।”

“বুঝবে না কেন ? আমি কি তোমার শত্রু ?”

“হ্যাঁ, তুমি আমার শত্রু নইলে আমাকে তাকানোর দরকার তুমি এত ব্যস্ত কেন ?”—কথাটা বলে জল ভরা চোখে চাইল সে। ব্যাবার্ডের দৃষ্টি সে বুজি।

আবার দীর্ঘ কণ্ঠে বলল বড়দি :—তোমাকে আমি একটি কথা বলি নাই। ভেবে দেখলাম, কথাটা আর চেপে রাখা উচিত নয়। বলা দরকার।”

“কি কথা বড়দি”—জিজ্ঞাস করলাম আমি।

“আগেই আমি একজনকে ভালবেসে ফেলেছি।”

“এ কথা আগে বল নাই কেন ?”

“তবে।”

“কারণ ?”

“তোমার।”

“আমার ভয়ে ?”

উঠয়ে চুপচাপ, মিনিট খানেক কাটল।

পুনঃবার বললাম :—“বড়দি আমি মনে করতাম, তুমি আমাকে খেঁচ কর। কিন্তু দেখছি সব নিষে। নইলে এমনি করে আমাকে আশ্রয় পাবতুম, পারতেন না।”

ব্যস্ত ব্যাকুল হয়ে কান্নাঝিনুপিত কণ্ঠে বলল বড়দি :—
আমাকে তুল বুঝ না জতুল, আমি আমার সবটুকু দিয়ে তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারবো না। অতুল, তুমি আমাকেই বিয়ে করো। আমি তোমাকেই ভালবাসি।”

“এ কি বলছ বড়দি”—চমকে উঠলান আমি।

“জানি কথাটা শুনে তুমি চমকে উঠবে। কিন্তু এই নিষ্ঠুর সত্যটাকে আর চেপে রাখতে পারলাম না।”

“কিন্তু তা হয় না বড়দি, তুমি যে আমার বড়দি।”

“নিয়ের আগের শব্দটায় কোন ধাম নাই অতুল ? আর বয়সের কথা বহি বল, হলামই বা দুই বছরের বড়, কতি কি ? কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি তোমার কোন কতি করবো না। কেবল তোমার পাশে আমাকে তোমার স্ত্রী রূপে স্থান দাও। তাছাড়া তুমি তো একটা মেয়েকে বিয়ে করবেই। আমাকেই যদি সেই স্থানে বসিয়ে দাও, তাতে কতি কি ?”

“কিন্তু তা হয় না বড়দি ?”

“কেন হয় না ?”—হল ছল চোখে ব্যাখ্যার কণ্ঠে চমক প্রসঙ্গি বিজ্ঞাসা করল বড়দি।

“এ তোমার ছেলেকাহুবি প্রশ্ন বড়দি।”

“না। আমি শুনেছি চাই।”

“প্রথমতঃ আমি তোমাকে বড়দি বলে শ্রদ্ধা করি।”

“ও কথা ভুলে যাও অতুল।”

“তা হয় না, থাকে একদিন বড়দি বলে……তা’ ছাড়া আমাকে এমন-এ পাশ করবার জন্যে এখনও দুই বছর অপেক্ষা করতে হবে।”

“বৈশ, আমিও তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো। দুই বছর কেন বড়দিন বলবে।”

“বড়দি তুমি এ পাগলামী ত্যাগ করো। বরং ঐ ছেলেকেই বিয়ে করো।”

“তা হয় না অতুল। হয় তুমি কথা দাও। তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো—নইলে এই ব্যাখ্যার জীবনের শেষ হওয়াই ভাল।”

সারা সন্ধ্যাটা এ নিয়ে বড়দ্বির সঙ্গে কেটে গেল। শেষ কথা হলো, “তা হয় না বড়দি।”

বীর কণ্ঠে বলল বড়দি :—“ভালবাসা বহি অন্তর্য যে অন্তর্য আমি করেছি। আমাকে বুঝিয়ে পাববে না, বৃথা তর্ক কবছ তুমি অতুল, আমার ঐ একই পণ ?”

চুপে আর ক্ষোভে বিস্তৃত গোধ পললাম। বললাম :—“তাহলে তুমি তোমার বর বেছে নেওগে বড়দি। আমি অক্ষম।”

মেসে কিরতেই মনটা হাহাকার করে উঠল। তারপর এক অশ্লব ঘটনা, এক অজানি ব্যাকুলতা, এক মূগ বোধনবোধ আমাকে ব্যাখ্যার করে তুলল। অহতাপ আর অশ্রুশোচনায় হত্ব হলো মন—“এ কি কলসন, কেন বড়দিকে এমনভাবে আঘাত দিলাম।”

জানি আমি—আমার অস্বস্তির সারাটা স্থান জুড়ে রয়েছে আমার বড়দি। চক্রকিরণে প্রাণিত তরা গন্ধা দেখলে যেমন চক্ষু জুড়ায়, তেমনি বড়দ্বির মুখের হাসি, চোখের সাননে পুসে উঠলো, স্বপ্নমধুর আবেগে আমার মন জড়িয়ে এলো।

সারাবাত্রি ঘুম এলো না চোখে। এক অশ্লব ঘটনার ছট কট করতে লাগলাম আমি। কখনো বিছানায় গড়াপড়ি, কখনো কবের মধ্যে পারচাড়ি কললাম। কিন্তু মন কিছুতেই স্থির হলো না। “ব্যাখ্যার জীবনের শেষ হওয়াই ভাল”—কথাটা মনের মাঝে বারবার থাকা রিতে লাগল।

আমার অন্তরের সমস্ত অজুহুতি একসঙ্গে দায় দিঃ উঠল—হঠাৎ যেন বুঝলাম, আমি বড়দিকে চাই, বড়দিকে ভালবাসি আমি, বড়দি বিনা আমারও জীবনটা বৃথা। তাকে ছেড়ে আমিও বাঁচতে পারবো না। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য, বড়দ্বির প্রতি আমার এত ভালবাসা কোথায় ছিল গোপন মনে ? হঠাৎ বড়দ্বির আকর্ষণে মন চকল হয়ে উঠলো। এই অদ্বির অকর্ষণ যদি প্রেম হয় তাহলে আমিও বড়দ্বির প্রেমে পড়েছি—সে বিষয়ে কোন

সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমাদের এই সম্বন্ধের মাঝে পাহাড়ের মত গভীর বেঁধেছিল “বড়দি” শব্দটি। সেটা তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধ-ভাঙ্গা জলের ছাপ আমাদের অন্তরের অন্যতর ভালবাসা আমাদের লাগে। অন্তরটা কাগিঃ বিল, যা শুধু বড়দি শব্দটার সঙ্গে মিশেই হয়েছিল এতদিন।

সারাগাতি মনের সঙ্গে হৃদয় করে ছিন্ন করলাম, বড়দিকে দিয়ে করবো।

সকাল বেলায় ইরাকে বেঁধে চমকে উঠলাম আমি।
তরে তরে জিজ্ঞেস করলাম :—“কি খবর ইরা?”

বলল ইরা—“অতুললা, ত্যাঁড়াভাঙি অ’সুন। মা আপনাকে ডাকছেন।”

শক্তিত চিত্তে চাপা গলার জিজ্ঞেস করলাম :—“কেন রে?”

“জানি না”—ছোট কথায় জবাব দিল।

“বড়দি কি করেছে রে?”

“গুরে আছে, আর মা বড়দিকে মাঝার কাছে বসে আছে। আমাদের বললেন, “ত্যাঁড়াভাঙি তোমর অতুললাকে ডেকে আনতো।”—কথাটা বলে একপ্রকার ছুঁতে পাগিয়ে পেল ইরা। যেতে যেতে বলল :—“ত্যাঁড়াভাঙি অ’সুন, মা আপনাকে সঙ্গে অপেক্ষা করছেন।”

সঙ্গে সঙ্গে এক অমাবা। নিষ্ঠুর আশঙ্কা স্পষ্ট স্মৃতিতে ভেসে উঠল। ধর ধর করে কঁপে উঠল আমার বেঁধ।

আমি নিয়ন্ত্রিত হোলার আন্দোলিত মন নিয়ে এক-প্রকার ছুটেতে আরম্ভ করেছি। সূঁকর স্পন্দন দ্রুত খেঁচে চলেছে। মাঝে মাঝে একটি অতি নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর আশঙ্কা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, পায়ের গতি আরও বাড়িয়ে দিলাম। হৃৎকার কাছে আগন্তেই মন আমার ব্যাকুল আগ্রহে উৎকর্ষ হয়ে উঠল কি যেন স্তম্ভাব আশায়।

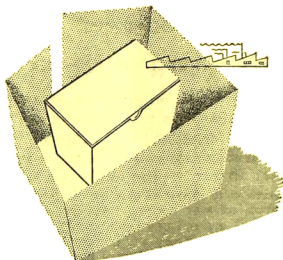
কশিত হাতে বার হুঁরেক কড়া নাড়তেই বরজা বুলে গেল। সামনে চাইতেই অবাক হলাম, দ্রুত বেঁধার দ্বার চমকে উঠলাম। বিস্মিত বৃষ্টিতে বেঁধলাম সামনে দাঁড়িয়ে “বড়দি”। সহস্রা মুখে বলল সে—“অতুল আমার বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। কাল তোমার যাওয়ার পর মাসীমা এসেছেন। তিনি সব ব্যবস্থা করে এসেছেন। তারা আমাকে আশীর্বাদ করতে আসবে। তোমাকে আর বিরক্ত করবো না।”

“ইয়া বাবা”—পিছন হতে মা এসে বললেন।

“একটু পরেই তারা এসে পড়বে। তাই তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। আর কিন্তু তোমাকে আমাদের বাড়ীতে থাকতেই হবে।”



factory freshness preserved



with

★ **POLYBOARD**
★ **POLYKRAFT**

packaging

Acid, alkali and moisture resistant polythene-coated **POLYBOARD** and **POLYKRAFT** help to preserve the factory-freshness of your products, whether they be confectionary, tea, biscuits or chemicals.

These new, revolutionary packaging materials are several times stronger than ordinary board or paper and prevent damage to your products even when they are subjected to rough handling. And the eye-appeal of your products is enhanced considerably because of the glossy finish on **POLYBOARD** and **POLYKRAFT**.



CHANGE TO
★ **POLYBOARD** ★ **POLYKRAFT**
PACKAGING FOR INCREASED SALES

ORIENT PAPER MILLS LTD., CALCUTTA.

স্বপ্নসাধ

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

লগ্নাবধি থেকে কাতরান পর্যন্ত কতটা রাত্তা? তিন মাইল। আর এই তিন মাইল রাত্তার একের পর এক পাঁচটা কোলিয়ারি। লগ্নাবধির পরেই বেহুড়ি আর সংখ্যে কাতরাপের আগে চতুতপুর। ঝৈলের বাঙা, কলসার পাখাড়ী জুগ, জুপি ঝাংগে ফ্রেম, চাকুরেঘর খাপরাত ঢাল কোথাটার। হ্যাঁ এই তিন মাইল রাত্তার চোখে পড়ে শুধু ভাইগুলি। আর মাঝে মাঝে নরনরম্য বাংলাবাড়ী—উচ্চগহ্বর অধিসাধের।

হাঁটু পর্যন্ত ঝাঁতের মোটা হুতি। একটা গলাবন্ধ সেকলে কোট আর পায়ে টারারের চটি পরে পর পর পাঁচটা কোলিয়ারির ভিতর দিয়ে সে বাতাসঘাত করে। আর প্রতিদিন। সেই সকাল থেকে, কোলিয়ারির ঝৈলের রাত্তার বখন ঢাকল্য আগে অবিশ্রুত্যা চাকুরে আর কুলীঘরে ভীড়ে, অক্লান্তবের মোটর গাড়ীর শব্দে তখন সে বেরিয়ে পড়ে লগ্নাবধি থেকে। শুভ্র হয় তার কোলিয়ারি পরিক্রমা।

পাঁচটা কোলিয়ারির বাবুপাড়ার মাছুষগুলোর চিনতে ভুল হয় না মথুরা বিশ্বাসকে। কারণ তারা বছর দুই যত্নে তাকে বেধছে। বীর মস্তুর গতি মথুরা বিশ্বাস। আর তাক অঙ্গুলবণ করে একটা শোক। মিশকালো, ষোড়ান চেহারা। মাধার মস্ত এক কাপড়ের বোতা। কাপড়ের ফেরা করে মথুরা বিশ্বাস। পাঁচটা কোলিয়ারির বাবুপাড়ার ছেলে ছোকরা, বোঁকির তাকে কাপড়গুয়াল বলে ডাকে। চাই কাপড়—কাপড় চাই—মথুরা বিশ্বাস হাঁকে। সকালের বৃহ আমেঝী আলোর বেজডির কর্মবাক্ত বাবুপাড়া আর দুপুরের চড়া বোঁবে বিশ্রামত চতুতপুরের বাবুপাড়ার একই স্বর দুব থেকে দুবে মিলিয়ে যায়। চাই কাপড়—কাপড় চাই, মথুরা বিশ্বাস হাঁকে। কেউ কেউ ডাকে। হরৎসর করে। আলতো হাতে নেড়ে চড়ে এটা সেটা কেনে।

ছারানীতল অভ্যন্তরে একটু বিশ্রাম। মুঠটার মাধার হাং কণিকের তরে লাগন হয়। আবার শুভ্র পরপরিক্রমা—জীবিকার অবেষণ।

মাঝে মাঝে মুঠটা ছুটি গায়। কঠিন পরিগ্রম থেকে ছুঁ একদিনের অব্যাহতি। কিন্তু মথুরা বিশ্বাসের বিশ্রাম নেই। তাকে তখন মুঠে হয় ধানবাগ, কুচিটা। বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে কাপড় আনতে। বড় বিজ্ঞ লোক মথুরা বিশ্বাস। সংসারের কটিল নিয়মের সঙ্গে ব্যবসায় মনে-প্যাচ তার জানা আছে। কাঁচা বরগের মেয়েবেত সঙ্গে তার সম্পর্ক। সুখ বেধেই তাবের মনের ভাষা পড়তে পারে সে। বহল হয়েছে—পকাসের সীমাবেশায়। বহনোচিত গাড়ীও, মুখে মিষ্টি বুলি আর তার ভ্রম ব্যবহার—মেয়েবেত আকর্ষণ করে। বাবা বেহ না বাড়ীর প্রবীণরা। আর সেই কারণে মেয়েবেত সঙ্গে মেলামেলাম তার সজোড় নেই। সবাই তো মেয়ে আর নাভীনীর বরগী। বেহুড়ির কালিয়ার বাবুর মেয়ে করবী সেন কি সাত গানের কম্পাউন্ডারের বোঁ—তাবের পছন্দসই কাপড় সে আনে আর বেশ মোটা বরগের লাভ রেখেই গছিয়ে বেদ। হরৎসরকি হয়, কথ্য কাঁচাকাটি হয়। তা হোক, মথুরা বিশ্বাসের জানা আছে কচি কলাপাতি হংএর বাজারের বাড়ী—ক্যালিয়ারের মেয়ে করবী সেন কিনবেই। গ্রন্থবাহার হাম্ভী সে বেশী বলে আর অনেক বলাকওয়ার পর যে টাকোটা পেরটে আসে লাভের অংশ বেশ কিছু থাকে তাতে।

সেদিন কোলিয়ারীর বাবুপাড়ার ডাক্তার বাড়ীতে তার ডাক পড়েছিল। হা, মেয়ে বোঁ সবাই কাপড় কিনতে চায়। বোনাস আর উপরি পাওনাতে মোটা টাকা পেতেছে ডাক্তার। কাপড় কেনার ভাবনা কি? মথুরা বিশ্বাস মোটা খুলে সার সার কাপড় অনেকগুলি উত্তরক গোশের সামনে রেখে দেয়। শান্তিপুর, ঢাকাই, হুন্দিয়াব আরও কত

বকমের চোখ ঝলসলেনা শাড়ী। কি বাহাৎ, কি তাই বা।
আর সেই কবেই লুহ হয়ে ওঠে ঘেরেঘের মনের কামনা।
লুহ হয়ে আসে চোখের দৃষ্টি।

ট্রাউজ, তার আছে। ওহের চোখের সামনে ধরে
ধের নানা বহুতর ট্রাউজ। চৌকো, গোল গলা, নরম।
ঝাঁক—ভরল দিচ্ছ, সুতী। কিন্তু হান তুনেই চমকে ওঠে
লুহ কামনাগুলি। ডাক্তার গিন্নী বলে—না বাপু,
শান্তিপুটীটার তুমি বেশী হান বলছ। উনি তো হানশার
থেকে এই কাপড়ই নিয়ে এসেছিলেন কমলার ওস্তে।
অবশ্য তোমার কাছে বেশ হান শুমছি।

মধুগা বিশ্বাস অবাক হয়ে শোনে। তারপর বলে আনুন
না সেই কাপড়। কাপড় আনা হয়। কুছির দৃষ্টি নিয়ে
পথের কটে মধুগা বিশ্বাস। কপালে ভ্রু উঠিয়ে বলে—হা, এই
কাপড় আর আমার কাপড়! এ যে আকাশ জমীন
ফারাক। বুটোর পাড় ধেখুন, গা ধেখুন। তারপর দিয়ার
করবেন।

ডাক্তার গিন্নী শব্দধরে বলেন—তা বলে তুমি লাভ
কর না বলতে চাও? মধুগা বিশ্বাস বিনীত হাসি হাসে।
বলে—ক'র না বললে মিথো কথা বলা হবে না। সত্যদিন
পূরে ত্রিবে যে টাকটা হোজগার ক'রিতে তাতে একলা নাহুৎ
বলে কোন বকমে চলে। গরীব নাহুৎ। অপনাদের
দহাতে বৈঠক আছে। শেখের ঘিকে দরুণ শোনার
গলার হয়।

হাস। এতকুন্তেই কাজ হয়ে যায়। মধুগা বিশ্বাসের জীর্ণ
পোষাক, বরষের ভায়ে ভেঙ্গে পড়া বের, কচুপ আয়-
নিবেশন—বিশ্ববীণতার ছাপ সর্বত্র। বেয়েহের কোনল
মনে ছাড়া কেলে মধুগা বিশ্বাস।

বছর দুয়েক হল লম্বাবধি এসেছে সে। কারখানার
কাছে কুলীখানার একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সে থাকে।
আর থাকে সেই বুটেটা। বিহাংদের ছাপরা জেলাব লোক।
মধুগা বিশ্বাসের আবি বাড়ী ছিল বীরভূম জেলার মতাল
গ্রামে। বিংলা নদীর পাশে। আশ বছর বায়ে হল বেশ
ছেড়েছে মধুগা বিশ্বাস। প্রথমে কলকাতা তারপরে বর্ধমান।
স্বাস্থ্যের বাবে কাপড়ের পশরা মাখিয়ে তার ব্যবসার

জীবনের হুত্রপাত। বাংলার নানা মহবে, গ্রামে খুবেছে
সে। তারপর হঠাৎ এলদিন স্বহিত্যর কল্যাণনি
অকলে চলে এল ব্যবসা করতে। আর এখানে এসেই,
বাণিজ্য লম্বী তার উপর মহর হয়ে উঠল। এক একটা
কোলিয়ারি হাখাব লোকের অন্নসংস্থান। কল্যাণনির
অতল অধকারে যে গত বেশী নদীরেব শক্তি হয়
কবে, পরমা আপে তার কাছে তত বেশী। কুলী-
খানাকের বাণীকারা সদন্ত দিন অজ্ঞাত পরিভ্রম আর
বাতের বেলার বেশী মহের যোজনে মাতাল হয়ে পড়ে
বাক্য, নরতো মহর বাজারে বেতাপাড়ার। আশ্রয় জীবন।
আগা নেই, আকাজকা নেই শুধু ভরপেট ভাত আর তাকী
খাওয়ার পরমা মুটলেই হল। বিচার বুদ্ধিও নেই, নইলে
তার শ্রমিক নেতার বক্তার আকর্ষক উদ্ভেদনার সমাধ
সংস্কার তুলে বশুকের নলের কাছে থুক পেতে যায়। মধুগা
বিশ্বাসের আশেপাশেই ওরা থাকে। শান্ত নিদিয়োণ
জীবনযাত্রা।

মধুগা বিশ্বাসের কাপড়ের পের্টালা বেখে কুলী বৃক্ষের
চোখও চকচক কবে উঠে। কাপড়ের রং আর মৌলুৎ বেখে
মনের অন্তরালে সাধ-আজ্ঞার গোপন কামনা উঁকি
যেয়। কিন্তু ইচ্ছা পূরণ হয় না কোনদিন। বাণীর পরী-
ক্ষী উপার্জন রাত্রির আশল বিলাস আর তাকীর যোজনে
শেষ হয়ে আসে। নারী মনের সাধ-আজ্ঞাকে সম্পূর্ণ
বিশর্জন ঘিরে ব্যারাকের বুণ্ডি ধরে নিশ্চয় কান্না আর থুক
চাপা ব্যাধা নিয়ে কেটে যায় জীবনের বাকী দিনগুলো।
প্রথম প্রথম ওহের বেখে বিস্তিত হত মধুগা বিশ্বাস। প্রতি-
বেশী হয়ে উন্নতির জন্ত উপদেশ দিত। কিন্তু কে কার কথা
শোনে। তাই ওহের জীবনের শ্রম দুঃখের সঙ্গে পরিচিত
হওয়া, চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছে সে। ব্যবসারী মানুষ।
তার জন্ত আছে পাঁচটা কোলিয়ারির বাবুপাড়া ভবনঘর
ঘেরেরা।

মধুগা বিশ্বাসের জীবন আগের চেয়ে অনেক বদলায়
এসেছে। ব্যাকারী জীবনের প্রথমে সেই জাতিবিরুদ্ধতা
হিনগুলি আর পুনরাবৃত্তি হয় না। এইবার বছরের ব্যবসারী
জীবনে অমার খাতার যে অফটা উঠেছে তাতে ভবিষ্যতে
কাপড়ের কোরী না কবে মহর বাজারে একটা স্থানী যোজন

দেওয়ার ইচ্ছা আছে তার। এখানে নয় তার গ্রামের কাছাকাছি কোন সহরে।

জীবনের শেষ প্রহরে মানুষ সংসার মুক্ত হয়ে কোন শাস্তির আশ্রয়ের পরকালের চিন্তা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মধুবা বিশ্বাসের। একান্ত আত্মীয় বলতে এ অঞ্চতে কেউ নেই। খারাপ ছিল—যেহে, বউ মধুবা বিশ্বাসের বাস্তবজীবন থেকে সংসারের জটিলতা থেকে তারা চিরদিনের মত মুক্তি নিয়েছে। প্রথম যৌবনে হী গভ হয়েছে। মেয়ে ছিল একমাত্র সন্তান। নাম ছিল সরনা। মৃত জীবের বেদনা, মেয়েকে পেয়ে ভুলে ছিল মধুবা বিশ্বাস। আত্মবিরোধী ছিল তার মেয়ে। তবু বছর বয়সে মেয়েকে ভাল করে পালন করেছিল মধুবা বিশ্বাস। কিন্তু বছর চারেক পরে পর পর দুটি ছেলের জন্ম দিয়ে তৃতীয়বার প্রসবের সময় প্রসূতি আগায়ে শেষ নিশ্বাস ফেলল সরনা। মধুবা বিশ্বাসের জীবন থেকে দুটি ভালবাসার প্রাণী অকালে বিদায় নিল। মনের মধ্যে বেবে গেল সীমাহীন বেদনা, আত্মহু হইন জালা। বেশ ছেড়ে গেলিবে পড়েছিল মধুবা বিশ্বাস। তার বছর ধরে সেই সীমাহীন বেদনার তীব্র অহুত্বভিত্তিক ভুলতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি সে। নিঃসহায় বিজ্ঞতার ব্যাধির ক্ষত বিকত হয়ে গেছে ক্রমশ অনেক অহুত্বভিত্তিক মূর্ত্তে। বিজ্ঞ স্বপ্নের বাহ্যিকার বেদনা পারিনি শ্রীতির স্পর্শ। মগণ কাপড়গুলোর বস্ত্র কাবও ক্রম হইন ওঠেনি উৎপল। মমতাবিশুয় বয়সি কারো চোখের মুষ্টি। তার জাঁপ পোষাক, শীর্ষ দেহ, কল্পন আবেশন অনেকের মুখে বিশ্বাসের ছায়া ফেলেছে। কিন্তু সংবেদনশীল মনের শূন্য অহুত্বভিত্তিক উপলব্ধি দিয়ে কেউ তার জীবন বিচার করেনি। তারা যেখানে তার বাইরের রূপ, কর্তার প্রমের জীবিকা, তার দায়িত্ব। মনের অন্তরালে গভীর ব্যাধির তাতে উপশম হয় না।

রাতের অন্ধকারে শান্ত ভক্ত আসে দিনমানের কর্মমুখর করলাধনি। বীণলি আলোর মেঘলা পরা দুই বিভাবিত স্বপ্নায় করলাধনি অকল আবিগত অন্ধকারে অপরূপ মনে হয়। কোকপ্লাণ্টের চিম্নী নির্গত লকলকে আশ্রয় শিখার লাল হয়ে ওঠে আকাশের একাংশ। বাবুদের পাড়ার পাড়ায় ভাল পাশায় আত্মা জমে ওঠে। অক্ষিয়ারদের ক্রান্তবের শাসনে ঘোড়ের সারি ক্রমশ লম্বা হয়। তখন সূর্য্যোদয়কে

টিমটিম করে জলে কেরোয়ানি তেলের ডিবে। কুলাবধুর প্রতীক্ষা জন্মের হয়ে উঠতে থাকে—মাতাল স্বামী কখন ঘরে ফিরবে? তাদেরই প্রতিবেশী মধুবা বিশ্বাস তারা বেশ করে অনুভবেরে থাকে নিয়ে বলে। মাকে বাম্বো হাতের নিস্তব্ধ নিস্তব্ধিতে মনের মধ্যে ভীড় করে অন্তরের টুকরো টুকরো স্মৃতি। হী, মেয়ে, মতাল। প্রবাসী জীবন উন্নয়ন হয়ে ওঠে।

কিন্তু কোথায় যাবে সে। মতাল। দেখানে তারা আছে তারা চার অর্থ, মধুবা বিশ্বাসের শাস্তি কামনা দেখানে হুত্ব মতাল। এই বিশাল পৃথিবীতে বেশ জীবনের শাস্তির আশ্রয় কেউ রচনা করেনি তার জন্য। কাপড়ের কেবী করে কুলী ব্যাংকারের খুশি করে বাকী জীবনটা কেটে যাবে? শাস্তি স্বপ্নের আশায় মধুর কল্পনাকার কামনা কি কোনদিন রূপ পাবেনা। নৃকের ভিত্তি ছুটকট করে অনেকগুলি প্রশ্ন।

শরতের শুরু। আকাশের জন্মী নীলিনাথ কাপড়ের মত শুভ্র মেঘের পুর। পূর্বের আর কেবী নেই। আর এই সময়ে কাপড়ের চাবিকা বৈদ্য। মধুবা বিশ্বাসের মত অনেক কাপড়ওয়ালা সমস্ত দিনমান কাপড়ের কেবী করে। চাই কাপড়—কাপড় চাই—মতাল থেকে সত্যো পর্যন্ত ডাক শুনেতে পাওয়া যায়। লম্বাবার থেকে কতকাল পর্যন্ত সারাদিন কাপড়ের কেবী করে মধুবা বিশ্বাস। এ সময়ে পরিভ্রম একটু বৈদ্য হয়। দুপুরের চড়া রোহে দীর্ঘ পথ শ্রমে ক্লান্ত হয়ে চতুঃপূর্বে বিশ্রাম নেয়। চতুঃপূর্বের বাবুপাড় থেকে একটু দূরে একটা অশ্ব গাছের ছায়াশ্রিতল নিস্তব্ধিতে মধুবা বিশ্বাস আর দুটো বসে। গামনেই একটা জলের কল। দিনের খাওয়া ভাখানেই দাঁপ হয়। শকালের তৈরী রুটি তরকারি। দুটোটা ছাতু খায়।

সেদিন খাওয়া শেষে ওরা গাছের ছায়ায় বসেছিল। আর একটু বিশ্রাম নিয়ে কাতরদের রাস্তা ধরে। মধুবা বিশ্বাসের মনে তখন লাত কতির বিশ্রাম। পাঁচটা কোলিয়ারি বাবুপাড়ার কে কটা কাপড় নিয়েছে, কে কি করমান করেছে তার চিন্তা। রোহ রূপমল শরতের মধুর মধ্যাহ্ন। দুবে চিম্নির পুর পুর বোয়োর শূন্য দুবে বিপদিল গতি।

এই সোণো—এই,—মথুরা বিশ্বাসের চিত্তার বাণ
পড়ল। কচি পলাব স্বঃ। আঁকিয়ে বেঁধে ছয় মাত
বহুতের ছোট একটা ছেলে।

—মা ডাকছে।

আমাকে ?—মথুরা বিশ্বাস বলে। মাথা বেড়ে নীরব
সমস্তি জানায় ছেলেটা।

কই, কোথায় ?

উই যে—হাত বাড়িয়ে একটা খাশতার ঢালের বাড়ী
দেখিয়ে দিল সে।

চল। মুঠের মাথায় কাপড়ের বোকা তুলে খপরের
ঢালের বাড়ীর সামনে এসে মথুরা বিশ্বাস।

কই, কোথায় তেমনার মা ?

ভিতরে আজ্ঞা—বরের ভিতর থেকে বসল ছেলেটির
মা।

হু কুঠুরি ঘর। ভিতরের দেওয়ালের চূপকাম ২৫ চটে
বিবর্ণ হয়ে গেছে। কাঠের তক্তা, হাড়ীর বাট, ছোট একটা
টেবিল—আগাবাষ বসতে গুই। বরের ভিতর ঘিরে
আগাবাষ সময় চোখ কুলিয়ে নিল মথুরা বিশ্বাস। ভিতরের
দিকে এক কালি ব্যাঙ্গাঙ্গর গাট তুলে কাপড় বার করল।
সাড়ী, মায়া, ব্র উজ, ছোটবেশি পরিচ্ছদ।

—দেখুন না।

ছোট একটা কথার অভ্যর্থনা আনিয়া বোটি এতকণ
বোকা হয়েছিল। ২৫ বেরাওর মনোহর সাড়ীর গানের
কাছে এনিয়া এসে। ২৫টি কালো, মঙ্গল কালো আর
ভাপর কালো চোখে বিকৃত বিষয়ণ পরনে চওড়া কালো
পাড় একটা সাধা ২৫ সাড়ী। আর ঘোনাটা। ঘোমটার
আবরণে গীথির দিল্লুর আর টেউ তোলা বোলা চুলের
ইসাদ। বেন কুয়াসা ঢাকা কালো গীথির হল।

বীবে বীবে বোটি বসল—আমকে না শু কিনতে পাবি,
কিছু মনে করবেন না তো ?

টোটে কোণে শীর্ণ হাসির বেগা মুঠিয়ে মথুরা বিশ্বাস
বলে—সে কি না, আপনায় পছন্দ হলে কিনবেন। আমকে
কিনতে হবে এমন কোন কথা নয়। পরণ করে হাশনি
পরে কিনবেন। একটার পর একটা কাপড় মুঠিয়ে বেধল

বোটি। তাহপর কাপড়ের সাহ বে.ক একটা সাড়ী বার
করল। হাঙা নীল রং, বাঁকালোর সিদ্ধ।

এব হাম কত ?—চোখ তুলে তাকাল বোটি। মুঠিতে
মুড় বিষয়ের আবেশ।

চল্লি টাকা—সাতের অংশ না বেধে এই প্রথম খরিব
হাম বসল মথুরা বিশ্বাস।

চল্লি টাকা! অত্যাচারী চমকের মত শোনাল
বোটির বিমিত কণ্ঠস্বর।

বোটির কথার চমক মুকের ভিতর বাহার মত বেঁধে
উঠল। বিচলিত হয়ে উঠল মন। বোটির ভিমিত
চোখের বিষয় ছাড়া পড়ল তার মুখে।

বসল—না, পছন্দ হলে সাড়ীটা বেধে দিন। ভাল
কবে পরণ করে পরে না হয় হাম দেখেন। আমি তো
বোঝ আদি।

বোটি আবার বোকা হয়ে যায়। করেকটি সবকণ
মুহুর্ত। সুখের বিষয় বাজনার এক নীরব সম্বর। বীবে
বীবে মাথা বেড়ে বলে, আচ্ছা বেধে না হয় বিলাম।
পছন্দ হলে পরে হাম বিলে হবে তো ?

মথুরা বিশ্বাস মুহু হেসে বলে—আপনায় বখন ইচ্ছে
না। বোটিব কাছে বিদায় নিয়ে কাতবাগ আর বাওয়া
হয়ে গুটে না। লম্বাখয়ের রাজা হবে মথুরা বিশ্বাস।
মনের মধ্যে বাবে বাবে উঁকি বের বোটি। আবা কি
মমতাময়ী ভ্রপ। বোটিব কাছে থাকলে জীবনের সব
জালা যেন জুড়িয়ে যায়। কত মেয়ে বো আক বার বছর
হবে দেখছে মথুরা বিশ্বাস। কিন্তু এমন ভাবে ভাল লাগেনি
কাউকে। কিন্তু কেন এত ভাল লাগল ? কার সঙ্গে
ভার সাধুত। স্ত্রী না মেয়ে ? চিত্তাচুল মনে জড় করে
কেলে আগা বিনতলোর শ্রুতি। স্ত্রীর ভালবাসা,
মেয়ের সেবার মতালোর সেই সুখের জীবন। হ্যাঁ, গুই
বোটি তার জীবনের ছঃপতিতানলে শীতল শান্তি আনতে
পারে। ক্ষুদ্র ছবরের অসহায় বেনা মিলিয়ে যাবে তার
মহতা আর ঐতির স্পর্শে।

চকুরগুরুর সেই ছোট বাড়ীর সুখের সংসারের বর দেখে
মথুরা বিশ্বাস। প্রতিদিনের মত কেরী করে কোলিগারি
বাবুপাড়ায়। কিন্তু বেরী সয়না কোথাও। বেগড়ির পর

গীতলা। কোলিয়ারি পৌছতেই ছটকট করে মন। চতুঃপুত্র আর কতদূর ?

পূর্ব মাথার উপর উঠতেই বায়োটার ডে' বাক্সে চতুঃপুত্রের বোঝাঙ্গমা আকাশ-বাতাস ঘূর্ণন করে, বিহততির অবসরে বোনের বাতায় কর্মকান্ত গৃহস্থবী মাথনের মিছিল দেখা যায় তখন মধুরা বিশ্বাস বাবুপাড়ার ক্ষেদী শেষ করে অশথ সাহেবের ছায়া বেদা নিবৃত্তিতে বিশ্রাম করে। বুকের ভিতর ছব-পিণ্ডের গতি চকল হয়ে ওঠে। যিনেং খাওয়া শাক বলে ছোট বাড়ীর বদলার মধুরে গলায় ডেকে মধুরা বিশ্বাস—

—মা ভিতরে আছেন নাকি ? বৌটি বেগেয়ে আসে হানিমুখে। সন্কে সেই ছেলটা। এক রাস বল—মিনতির গলায় বলে মধুরা বিশ্বাস।

বৌটির কাছে বল চাওয়া একটা ছিল। কারণ এতদিন এ সংসারের সন্কে পরিচয় হবার আগে একটু দূরে গেলের কলে, তার পিণালা শান্ত হত। মমতাপ্রপীক বৌটির সন্কে তার জীবনের সুখ দুঃখের কথা বলার বক্ত অধ্যা হয়ে ভর্তে মনের ইচ্ছা। আর সেই কারণে তাকে ছেলের আশ্রয় নিতে হয়।

চতুঃপুত্রের ছোট বাড়ীর শান্তির সংসার তাকে টেনে নিয়ে আসে। আর আশ্চর্য, বৌটির কাছে এসেই জীবনের অক্লান্ত কামনার তাপিত জালায় শীতল বায়ু নিকিত হয়। আনন্দের ভীড় অল্পভূতির আবেগে কেবল পথে কেবী করতে ভুলে যায় মধুরা বিশ্বাস। কাতরাসের বাতায় পা পড়ে না অনেক সময়।

কেবীর ব্যবসায় মন্কা পড়ে গেছে। আগের মত বিক্রি হচ্ছে না। গানবার, কাবিরায় কাপড় আনতে বাঙলা গ্রাম বদ্ধ হয়ে গেছে। তা বোক, মধুরা বিশ্বাসের অশান্ত জীবনে-শান্তি বিধে এসেছে। নাই বা রইল লক্ষ টাকা পরসার দিকে ?

ইতিমধ্যে বৌটির কাছে মধুরা বিশ্বাস তার জীবনের কাহিনী বলছে। দুইটুবি ঘরের একফালি বাহালা কত মধুর মধ্যাহ্নে খমখমে হয়ে গেছে একটি অশবায় বেবনার জীবনের বিহুতিতে। ব্যাধা মৌন হয়েছে বৌটির হু চোখের

দৃষ্টি। বড় ভাল লেগেছে মধুরা বিশ্বাসের। তার জীবনেও আত্মরিক সমবেদনা, মহানুভূতি আনবার লোক আছে।

বাতের অন্ধকারে বিনিময় গোপন কলসাকের কানমা করে মধুরা বিশ্বাস। বৌটি তার মেয়ে। ছেলটি তার নাতি। এদের সংসারে শেষ জীবনেও শান্তির আশ্রয় পুঁজি পেয়েছে মধুরা বিশ্বাস। আর, কি মধুর সেই শান্তি। দিল্লি জব্বার গভীর বাবা কলসাকের মধুর কানমার মিলিয়ে গেছে। ভবের বহেব কাছে একটা ছোট বোকান বেবে আর ওই ছোট সংসারের একজন হয়ে পড়বে। তার জীবনের দীপ্ত অস্তিত্ব বৃষ্টি বাতবে রূপ নেবে। বৌটির মাঝে পুঁজি পেয়েছে এতদিনে—স্নী, মেয়ে, শান্তির সংসার।

কথায় কথায় ওদের সুখ দুঃখের সন্কে পরিচিত হয়েছে মধুরা বিশ্বাস। বৌটির বানী পাশ পাশা বাসাদার কাল করে। মকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত, আট ঘণ্টার ডিউটি। মাইনে সব মিলিয়ে আশি টাকা। টানাটানির সংসার। একজন নিকিত তর শক্তনের পক্ষে পাশা বাসাদার পরে থাকা নিঃসন্দেহে ছোট কাল। কিন্তু বৌটির বানী মনে করে একদিন সে বড় অফিসার হয়ে উঠবে। কর্তব্যে নিষ্ঠা থাকলে সব ইচ্ছাই পূরণ হয়। এমন নজীর তো অনেক আছে।

মধুরা বিশ্বাসের অনেকবার মনে হয়েছে ওদের কষ্টের সংসারে কিছু সাহায্য করে ওদেরই একজন হয়। কিন্তু বলি বলি করে কথাটা আর বলা হয়ে ওঠে না। আর কিছুদিন থাক। আলাপ, আরও ঘনিষ্ঠ অন্তঃসংসার পরিণত হোক। তখন না হয় বলা যাবে মনের সেই প্রেপন ইচ্ছাটি।

বৌটি মাঝে মাঝে বলে—অনেকদিন হয়ে গেল, কাপড়ের দাম বেওয়া হলনা। কথা শেষ না হতেই মধুরা বিশ্বাস বল ওঠে—সে না হয় হবে। বামের জন্ত কি আছে ?

বৌটি বলে তাত কি হয় ? আসছে মাসে ও পুজোর বোনাস পাবে—টাকাটা সেই সময়ে হবে।

মেঘবুদ্ধা নীলাকাশে দুঃখের কালো মেঘ ঘনিয়ে

আমার মত কোলিয়ারির চক্ৰময় কোনে বঠাৎ অশ্রয় হয়ে উঠল। কলকারখানা ঘনি গলবে কর্মমুখরতা নীরব হয়ে গেল। হিকে হিকে শ্রমিক নেতার উদ্ভীষ্ট বক্তৃতার উত্তেজিত হয়ে উঠল শ্রমিকমিত্রের হল। বিচিত্র সব ধ্বনিতে সুবহ হয়ে উঠল কোলিয়ারির আকাশ বাতাস। বর্ষবট। হাঁয়, বর্ষবট কতটুকু শাখাবণ শ্রমিকের হল। কতগুলি নিরুপায় শাখাবণ শ্রমিককে জগাব দেওয়া হয়েছে চাকরি থেকে। কতিয়োর বিভীর্ণ ঘনি অকলে প্রাচ শ' দুই লোকের চাকরি গেছে। তাইই প্রতিবাহে বর্ষবট শুষ্ক হয়েছে। কোলিয়ারির বাস্তার হাঙ্গার শান্তিওকক পুলিশের টহলদার বাহিনী। কার্ফিউ জরুরি জারি হয়ে গেছে।

এই হাঙ্গামার ভক্ত মধুরা বিশ্বাসের ভেতী করা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ভেতী মত, চতুঃপুত্র যেতে না পাওয়ার ভক্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে নন। শুভা কেনমন আছে? কি হয়েছে? এক একটি উষ্মের প্রের উষ্মল হয়ে ওঠে স্ববহ। আর কটা বিনের অপেক্ষা। তারপরেই বন্ধ হয়ে যাবে বর্ষবট। মনকে শাসনা যের মধুরা বিশ্বাস।

হঠাৎ একদিন বৈশ্বের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। রাতের শেষ প্রহরে যখন অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে তখন বেরিয়ে পড়ে মধুরা বিশ্বাস। চতুঃপুত্র পৌঁছতেই হোলের আকাশে অসংখ্য নুর্দোবদেব বং স্কুটে ওঠে। আলোর পারাবাহে

উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আকাশ মাটি। সেই ছোট্ট শবের সামনে এসে পিড়ার মধুরা বিশ্বাস।

—মা—শুভা একবার বাইরে আসুন। পোটি খোঁজ হয় শুভতে পারিনি, তাই আমার ডাকে মধুরা বিশ্বাস। মা, শুভা.....

এবার বাইরে আসে পোটি। বক্তৃতা চলে আছে মধুরা বিশ্বাস।

আপনি?—খীর খির গলার কললে পোটি। এসে ভালই করেছেন। বের চোকে পোটি। যেখানে আসে একটু পরে। কতক সেই মাড়ী।

বলে—মাড়ীটা নিতে পাওলাম না। কিছু মনে করবেন না।

কেন না, কেন? আমি তো মাম.....। বক্তৃতা অহুন্নর মধুরা বিশ্বাসের জিজ্ঞাসায়।

কেনর উত্তর মেই। শুধু আমার দুর্ভাগ্য। আপনি আহন্ন। মিনতি যেন অক্ষ হয়ে স্বরে খোঁটির কথায়।

একটি চতুর্ভুজ বাণির স্বপ্নমৌল লগে পড়ে কার বিরাট আঘাতে। যন্ত্রণার তীব্র অহুর্ভুতি ছড়িয়ে পড়ে শবীরের শিরা উপনিবায়। হঠাৎ কানে এল একটা কথা। কথা নয় যেন কাহ্নার বিশাল এক ডেউ আহুড়ে পড়েছে—আমার স্বামীর চাকরী গেছে।





॥ 'মহিলা'র নববর্ষ ॥

'মহিলা' নূতন বৎসরে পদার্পণ করলো। ছুদিনের বন ঘটায় যেদিন দেশ আজ্য, সেইদিন এর আদির্ভাব। "পথে পথে অপেক্ষে কাল বৈশাখীর আশীর্বাদ। প্রাণ-প্রাণের বস্তুনাথ ॥" কিন্তু, "সেই ভোর ভ্রমের প্রদীপ" এই মন্ত্র অণু করে সে যাত্রা শুরু করেছিলো। তখন প্রাণে ছিল উদ্দীপনা, চোখে ছিল স্বপ্ন। আশ, স্বীকার করতে হয়, সে উদ্দীপনা ভিত্তি হারে এসেছে, স্বপ্ন হয়েছে মণি।

তবু সাধ্যমত সে চেষ্টা করছে বীরপদে লোকের অধিগুণ অগ্রণব হ'তে। স্বাধীনতার ভোরণ উত্তীর্ণ হয়েই বামতে সে চায়নি; কেননা, পথ এখনও অনেক বাকি। বস্তুত: জাতির চলার পথ অন্তরীম। নূতন নূতন অবস্থার মধ্য দিয়ে কেবলই এগোতে হয় তাকে।

বহিঃপঞ্জির বিস্তৃদ্ধ সংগ্রাম শেষ হয়েছে, এগেছে গঠনের দিন। কত উপকরণ, কত আয়োজন, কত অশ্রুত উত্তম আবশ্রক জাতিকে গড়তে। সে বিকে তো আমরা মন বিইনি এককাল। বাইরের বাণা যদিবা 'সংলো', ভিতরের অন্যা বাণা আজ দুর্গম্য হয়ে উঠছে। আলস্য, সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি, আত্মাভিমান, প্রেলোমন পথ রোধ করছে পথে পথে।

মহিলা, সঙ্গুতি এবং আন্তরিক চেষ্টা থাকলে যাহা অনেক বাধাই উত্তীর্ণ হতে পারে। অত্যা বা অনভিজ্ঞতা অগ্রগতিকে অশস্তব ক'রে তোলে না। আন্তরুতি ছাড়া আজ আমাদের কল্যাণ নেই।

সেই কথাই আমরা বলতে চাই। সহকার মিত্রা বা ধূর্গাণা আমাদের বুলি নয়, হল-বিপ্লবের নিবন্ধি প্রাণো বা নিখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা চাই সর্ব-সাধারণের মঙ্গল; তাইই অন্ত সাধ্যমত চোখ বোলা রেখে

আমরা চা'ব বিপ্লবের অবস্থা দেখতে ও দেখাতে চেষ্টা করি। যদি আত্মসচেতন হতে পারি এবং অপরকে আত্মসচেতন করার প্রেবণা বিতে পারি তা হলেই নিজেদের অস্তিত্ব সার্থক বলে আমরা বিবেচনা করবো।

পাঠক-পাঠিকা গ্রাহক-গ্রাহিকাদের নববর্ষের অতিশ্রম জানাই এবং তাঁদের শুভকামনা ও সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

॥ পঁচিশে বৈশাখ ॥

বই প্রকাশের এই তমাবলিটি উপলক্ষ্য করে নাচ গান আলোচনার আসর বসেছে দেশের দর্ভরা। এককিছু থেকে তালোই। দেশের সর্বসাধারণ তাদের প্রতিভাযাম্ কবি এবং অন্ততম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ককে শ্রদ্ধা গড়ে যরণ করেছে, তাঁর কবিতা গান ও অশ্রুত বসনার কিছু উপাধাখনও হয়তো করেছে। কিন্তু আর একটা দিক আছে। যা সজ্ঞার, নির্ভার, সাধনার, তা হয় তো অনেক ক্ষেত্রে কোলা-হলের বস্তুতে পরিণত হচ্ছে! দেশ ছুড়ে আজ বইছে বারোয়ারির হাওয়া। সে হাওয়ার ধূলা উড়ে আসছে প্রচুর। আগুণ, রবীন্দ্র চন্দ্রাবসরকেও আর একটি বারোয়ারির পুতাব অহুর্জান ক'রে না তুলে। শাহরুয়া বারোয়ারি পুতাব যেমন বগুণে প্রতিমা বসিয়ে আমরা দিনেবার গান শুনছি এবং ইতর প্রমোষে মেতে উঠছি, বারো-কনের মিলনের পরিবর্তে বিবাহের পুতনা করছি,—এখানেও যদি তেমনি কবি, তবে জাতীয় স্বীকনের বৈজ্ঞানিক ক্রম: একটু হয়ে উঠবে।

অন্তত: শিক্তি সন্তুষ্টারের মধ্যে আর একটু চেতনার প্রয়োজন। যে-সব কাজে বই-প্রকাশ হাত দিয়েছি, সে-সব অধিকারই তো রয়েছে অপর। 'স্বাধীন শিবা', 'প্রা-সংগঠন'—এ দলের আদর্শ ক'জনকে অহুপ্রদিত করেছে?

যেহেতু শিক্ষালব্ধিতে, সরকারী শিক্ষা-বিভাগে, এমন কি শান্তিনিকেতনে এবং ঐ-নিকেতনেও সে আশংক্যে ভ্রপ দেবার আন্তরিক চেষ্টা করতই স্থা দেখা গিয়েছে? শান্তিনিকেতনে এবং ঐ-নিকেতনে বাই হোক বাবা নিয়মের মধ্য দিয়ে স্বভাবোত্তর, কতকটা অসুস্থতাই চলছে, অস্ত্র সে-বিষয়ে কোনও চিন্তা বা চেষ্টা তো চোখেই পড়ছে না।

এককালে রবীন্দ্রনাথ ভাববিলাসী হ'লে গণ্য হ'তেন; অথচ তাঁর নিবেদন কর্তৃপক্ষের উচ্চল নিবর্ণন অনেক রয়েছে। আনন্দাই সেদিকে দৃষ্টি হিঁদিনি। বাস্তব বস্তুত্ব বলেও কর্তৃপক্ষে তিনি প্রচুর অপেক্ষা করেই পক্ষপাতী ছিলেন। এমন কি শান্তিনিকেতনের কার্যকলাপ সম্বন্ধেও খবরের কাগজে প্রচার তিনি পছন্দ করতেন না। এ বিষয়ে তিনি যাবে যাবে ব'লেছেন প্রচারের আশ্রয় আনাধের বাইরের দিকে টেনে দেয়, সাধারণ নিষিদ্ধ হ'তে ফের না।

সাধারণের কল্যাণ সাধনার যেমন আনন্দ তাঁর অর্পণ অনুভব করে চেষ্টা করিনি, নিজেও স্বাধীন-স্বতন্ত্রও তেমনি তাঁর মত বরাবর হইনি। সংস্কৃতি সম্বন্ধে চোঁচোঁচি হতই কবি, আচার-আচরণে সূক্ষ্মতা বা সংস্কৃতির প্রমাণ আনন্দা কন স্নোকেই দিয়ে থাকি। চিত্তের যে সৌন্দর্য্য সংস্কৃতির প্রেরণা কোণায়, দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, সূক্ষ্মকিত উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিরাও অনেকে তা-থেকে বঞ্চিত।

তাই মনে হয় বাবোয়ারি রবীন্দ্রস্বতি পালন অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় অনুভবন এবং অসুস্থতায় প্রয়োজন আজ অনেক বেশী। আনন্দা ভাবলগত যে মহামূল্য সম্পদ পেয়েছি, তা যেন আনাধের অবহেলায় বার্ষ হয়ে না যায়।

৷ রবীন্দ্র সাহিত্য ৷

রবীন্দ্র-পুঁজা বাড়ছে। অথচ রবীন্দ্র সাহিত্যের সম্যক অনুভবন এখনও বেশী হয়নি। তাঁর দার্শনিক মত, দার্শনিক চিন্তা ইত্যাদি বিবেচনায় স্বভাবোত্তর পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব কয়েকজন, কিন্তু রসিক পাঠক এবং লেখকের সম্মান কম মিলেছে। পাণ্ডিত্যের বাস্তুশালে অনেক সময়ে কাণ্ডের প্রাণ নষ্টেরও ঘটছে।

আনাধের মনে হয়, তর্ক বিচার পাণ্ডিত্যই বড় কথা নয়। শ্রেণময় স্বাভাবিকতাব পালনও বড় নয়। শব্দে প্রাণে

অনাধে। শুদ্ধ মনে বহি রবীন্দ্রসাহিত্য প্রেরণা এবং আনন্দ সত্য করত পড়ে, তা হলে জাতির বিচ্ছিন্ন থেকে সেইটেই বড় লাভ। রবীন্দ্রনাথের ভাবের শিখা অনাধা মনে প্রাণে জালিয়ে বিচ্ছিন্ন, মানন-সীপানি উৎসবে রবীন্দ্র-স্বাভাবিক উদ্ভাসিত হোক।

৷ কলকাতার স্বাভাব্য ৷

কলকাতার স্বাভাব্য দিনের পর দিন স্বাভাবিক দিকে চলছে। লোকের ভিড়, কুখ্যাত, এ সব তো আছেই, পৌর-স্বাভাব্য বিভাগের অসুস্থতাও এ অস্ত্রতম কারণ। এবারকার সংক্রামক কলেরার অনেকের মৃত্যু ঘটেছে। হাসপাতালে রোগীর ভাঙ্গা হয়নি। আশ্চর্যের বিষয়, এই উপলক্ষে পৌরকর্তার জানালেন, তাঁদের আয়ুর্মালাপ সাদি অদিকাল অচল হয়ে পড়ে আছে। প'ড়ে থাকার কত দায়ী কে? পাড়িগুলি না কত পক্ষ? টীকা দেবার ব্যাপক ব্যবস্থা অবশ্য হয়েছে। কিন্তু বিস্তৃত জলে বাবস্থ, মহলা-কেন্দ্রীয় স্ব-ব্যবস্থায় ইত্যাদি না হ'লে শুধু টীকা দিয়ে কি স্বাভাব্য স্বাভাব্য হবে? কতকাল ধরে পথের ধারের হাইড্রোজেন জলে কত লোকের মৃত্যু, পান, দুধ খোঁজা বাদন খোঁজা ইত্যাদি চলছে। আগে বাড়িতে কলের জল মিলত, এখন তা দুর্লভ। মহলা-কেন্দ্রীয় বাড়ির ভিত্তি পথের ধারে স্থানীয়ত আশ্রয়না জমা হচ্ছে। দুর্লভে অনেক স্থলে পথ চলা দায়। পথের পাশের পৌরস্বাভাবিক মূল্য রোগের ভিণ্ডো; যান্ত্রিক কোন-কোনটি পরিত্যক্ত হয় না। এ সবের প্রতিকার হবে কবে?

৷ উড়িষ্যা কংগ্রেস ৷

উড়িষ্যার বিধান সভার কংগ্রেস পক্ষ দুই ভাগে বিভক্ত। কংগ্রেস-সরকার কোনমতে টিক পেছে। কিন্তু টিক পেলেও দে-বে একাত্ত দুর্লভ হয়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। দুর্লভতার কারণ অনুদান এবং প্রতিকার চেষ্টা কংগ্রেস কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। বিবোধী দলগুলি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হাড়াবাব বেলার এক খোট হ'লেও নিষেধা ঐক্যবদ্ধ নয়। কাঁধেই কংগ্রেসকে কোনমতে

হারিয়ে দিলেও তারা কেউ একক বা বৃদ্ধভাবে স্থায়ী মস্তি-
ন্থা গঠন করতে পারবে বলে মনে হয় না।

পঞ্চতন্ত্রে ভোটের ব্যবস্থা। তবু শুধু সাময়িক ভোট-
আধার রাজনৈতিক নেতাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।
যেহা যাহা জনসাধারণের স্থায়ী বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন
করতে পারেন জন-সমর্থন আপনি আসবে। অবশ্য
দেবত্বভী ভোটের চেয়ে কর্তব্য পালনের আনন্দকেই বড়
পুরস্কার বলে মানবেন।

॥ পুলিশ-বিস্তার ও সরকার ॥

জন-প্রাণ-মান রক্ষার ভার পুলিশের হাতে পড়ে দ্বিগুণ
সাধারণ মানুষ নিশ্চিত থাকতে চায়। কিন্তু আল তায়
নিশ্চিত থাকাকারি হয়ে পড়ছে। চোর ডাকাতি-ওগার

উপক্রমের বিষয়ে পূর্বেও আমরা আলোচনা করেছি।
সম্প্রতি কাগজে একটি বসর বেরিয়েছে, যার দৃষ্টান্ত
নির্ধারণে অবধিত হওয়া সরকারের অগ্রস্ত কর্তব্য। বেলেগ
চোরাই-মাল আধিকারের সঙ্গে সঙ্গে নাকি এক পুলিশ
কর্মচারী ছুর্তদেহ মিত্র থেকে ভীতি-প্রদর্শন আর উপহ-
ওয়ালায় কাছ থেকে বন্দীরা আবেশ—একটু এই দুটি
পুঙ্খপাতি লাভ করেছেন।

এ ব্যাপারে কি হয়েছে জানি না; তবে সন্দেহ সন্দেহ
এমন সম্বন্ধের কারণে ঘটেছে যে, সরকার-বিরোধী কার্ণ-
কলাপেও পুলিশের বা এক স্রেষ্ঠ দরকারী কর্মচারীর এগ্রর
বকে। এ রকম হলে শাসনের ভিত্তিমূল ক্রমশঃ ধ্বংস
পড়বে, আমরা পূর্ণ অগাধকর্তার দৃষ্টান্ত দেখে। সে অবস্থা
আতঙ্কজনক।

দি ইন্ডেস্ট্রি়েল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

[১৯৪০ সালে বেজিষ্টারী কৃত]

হেতু অফিস : ২, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১

অনুমোদিত মূলধন	৮,০০,০০,০০০
বিলকৃত ও স্বীকৃত মূলধন	৪,০০,০০,০০০
আদায়িকৃত মূলধন	২,০০,০০,০০০
সংরক্ষিত তহবিল	১,৩৪,০০,০০০

শাখা সমূহ

ভারতে :—সকল শিল্প ও বাণিজ্য প্রধান নগর ও সহর

ব্রহ্মদেশে :—যেদুন, বৌগমিন, আকিয়াব, মান্দালয়, বেসিন

বুত্তুরাজো :—লওন

পাকিস্তানে :—চট্ট বরাচী

মালয়ে :—সিঙ্গাপুর, পেনাং, কুয়ালালামপুর

তাইওয়ান :—হংকং

এজেন্ট

পৃথিবীর সমস্ত দেশে—ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া।

ব্যবসায় ও ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্যাবলী :—

এই ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ, অনুমোদিত জামিনের পরিবার্তে দান দান, বিল ঋদিস, ডাক্ট দান ও তারে টাকপ্রেরণের ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করে। আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক শাখা সমূহ এবং পৃথিবীব্যাপী ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ব্যাঙ্ক সর্ববিধ ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের সুযোগ দান করে।

জি, ডি, বিড়লা

চেয়ারম্যান

এস, টি, সদাশিবন

কেনারেল ম্যানেজার

ଜେଲମେସାଇଲର ଥେଲାଧୁଳା

ସାଙ୍ଗର କୌ ହାତୀମାରି ନା ହୁଏ
ଆଦେଶ ।



ସର୍ବିସାଧ । ଏବେ ସାଥ
କାହା କି ନା ନି ବି
କହାଉ ହେ ପେ ।



ଏହି ଯେ । ଶିଳା ଉଠିବାର କି
ହୁଏ କାହା କାହିଁକି । କମାଳେ
ଆସି ଯାଉ କାହା କାହା
ହୁଏ କାହା ।

କୋରା ଯାଉଛି
କି କି କି କି
କହେ କି କି କି
କହେ କି କି କି
କି କି କି କି
କି କି କି କି



ସାଧୁ, କି କାହା ହେଉଛି । ସାଥୀ ବେଳେ
କି ହେଉଛି କାହା କାହାହିଁ କି । କୋରା
କାହା କାହା କାହା କାହା କାହା କାହା
କାହା କାହା କାହା କାହା କାହା କାହା
କାହା କାହା କାହା କାହା କାହା କାହା
କାହା କାହା କାହା କାହା କାହା କାହା

ଆମ୍ଭକୋ ସାର ୩ ଜୋରାଲେଟ



କି କାହା କାହା କାହା କାହା କାହା କାହା
କାହା କାହା କାହା କାହା କାହା କାହା

ପ୍ରମିଷ୍ଟାଟିକ ଜୋରା କୋହ
କାହା କାହା କାହା କାହା କାହା କାହା



ASCO

আপনার
রক্তনোপকরণে
যে পুষ্টি
চান

হনুমান
বনস্পতি



সাই জেন ইন্ডাস্ট্রিজ

'এ' এবং 'ডি' ভিটামিন দ্বারা সমৃদ্ধ

বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আপনার বৃদ্ধির ক্ষেত্র
৪ পাঃ এবং ১০ পাঃ উন্নত
পাওয়া যায়। ৩৬ পাঃ উন্নত
পাওয়া যায়।

প্রতি বার
১০ মিনিট ইন্টারমিটেন্ট
কালমিহানগর, বিহার

সুখাদাই সুখ ও

স্বাচ্ছন্দ্যের উপাদান

IP. 2504/2/8



একবিংশ বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

দ্বিতীয় সংখ্যা

স্মৃতি-কথা

শ্রীকালদাস রায়

(পূর্বস্মৃতি)

১৯২৬ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে আমি বঙ্গবাণী উপাসনা, উদ্ভা, মানসী মর্ষবাণী ইত্যাদি পত্রিকার বহু পৃষ্ঠকর প্রবন্ধাকারে সমালোচনা করেছিলাম। সেই পত্রিকায় আমার নিবন্ধ হয়েছে। লেখকদের পীড়াপীড়িতেই আমাকে এ পণ্ডন করতে হয়েছিল। এই চক্ষুগন্ধা আমি কোনদিন ত্যাগ করতে পারিনি। আমার বন্ধু কবি বটীন্দ্রনাথ অনায়াসে অগ্নান বহনই বলত—না, আমি পারব না।—মদ্রত স্পষ্টই বলত—আমি লিখলে তা বিশেষ অমূল্য হবে না। তাঁর পরম বন্ধু রিতে কবি বটীন্দ্রনাথের কত বার অমূল্য করেছেন বটীন্দ্রনাথের সমালোচনা লিখবার ক্ষমতা, কিছুতেই বটীন্দ্রনাথ গ্রাহি হ'ত না। আমি কখনও পারব না বলতে পারতাম না। যেদ্ব বইএর সমালোচনা করেছিলাম সে সকলের বেশির ভাগই অস্বীকৃত। এ সমালোচনা বীতিমত ব্যর্থতা—কারণেই কোন বোঝের উল্লেখ না করে শুধু গুণবিশেষকে কীপিয়ে কুলিয়ে বলা ছাড়া আর কিছু নয়।

তখন আমার একটা ব্যাধি ছিল, কোন মত বা মন্তব্য ইত্যাদি অসম্মত মনে হলে আমি কাগজে প্রতিবাদ করতাম। তা নিয়ে অনেক সময় বাধাহুবার হ'ত।

অধিল পালিত নামে এক ব্যক্তি পূর্বাণ সপ্তকে অত্যন্ত গোঁড়ামি দেখিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন—আমি তার প্রতিবাদ করেছিলাম বিবদ সীতে। বিবদাণ পত্রিকার তাঁর সঙ্গে বাধাহুবার চমুতে লাগল—পূর্বাণ থেকে বাধাহুবার শেষে ব্যাকরণে নেমে এস।

আমি সত্যের বোঝন নামে একটি কবিতার কতকগুলি কুসংস্কারকে আঘাত করেছিলাম। তা নিয়ে বেহিন্দীপুর হিষ্টবীর সন্দ্বাহকের সঙ্গে আমার অনেক বাধাহুবার হয়। সত্যবত শর্মা নামে আমি লম্বা বিতাম।

যে উপাসনার প্রারম্ভে আমি লেখক ছিলাম, কালচক্রের পরিবর্তনে সেই উপাসনাতেই আমাকে কোন কোন ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে এই সময় ব্যঙ্গ উপহাস করা হ'ত। সে সব উড়িয়ে দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠত। উপাসনার তাৎপ্রভাব গভী বঙ্গবাণী অতিক্রম করেছিল। কারণেই আশ্চর্যের তত কিছু কিছু লিখতে হয়েছিল। শনিবারের চিঠির কোন মন্তব্যের প্রতিবাদ করে খুব পালাপালি খেয়েছিলাম।

অন্তে বহিষ্ট বন্ধুদের লেখারও প্রতিবাদ করতে ছাড়তাম না। দুর্ভাগ্যবশত, বিবদিতের দানপ্রদার ও তারতম্য

প্রবন্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন ভারতবর্ষে (১৯০২ খ্রিঃ) ।
এটা অবশ্য আপোসেই হয়েছিল। আপোষ বিখ্যাতিকে
তুলিয়ে তার সম্মতি নিয়ে ছাপাতে দিয়েছিলেন। এইরূপ
বাদপ্রতিবাদে আমার বহু সময়ও সামর্থ্যের অসুবিধা অগত্যা
ঘটেছে। প্রতিযোগিতা বৃদ্ধ—কবির এসব অনধিকার
চর্চা কেন? কথাকাটা যে অসম্ভব নয় এখন বুঝতে পারি।

এখনও অব্যাহতই অধ্যাপকতা যা খুশি বলে আমাদের
বর্ষ করছে। একটা কথারও উত্তর দিই না।

উপাশনা এই সময়ে প্রগতির একটা প্রগল্ভ উজ্জ্বল
চমৎকার টিঙ্কনী করেছিল। ১৯০২ সালের প্রাপ্তবয়স্ক
প্রগতি লিখেছিল :
“চৈতন্যপুঞ্জির থেকে।

একখানা মেঘ ধার দিতে পার পোষি সাহায্যের বৃক্ক ?”

যতীন্দ্রনাথের (সেনগুপ্ত) এই দুইটি লাইনের তুলনা
রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য ঋষিরা কোথায় পাওয়া
যাবে না। কিন্তু সেজন্য দুঃখ করে লাভ নেই কারণ,
এ লাইন দুটি divine inspiration সন্মত।

এরকম divine line খুব কম কবিরই আছে, যতীন্দ্র
নাথও এরকম লাইন বুদ্ধি বুদ্ধি সেখেন নাই।

উপাসনার মন্তব্য—

“আমরাও উক্ত মন্তব্যের সমর্থন করিতে বাধ্য হইতেছি।

কারণ, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য ঋষিরাও আমরা ঠিক
এরকম দুইটি লাইন বাহির করিতে পারিলাম না।
তবে এই ক্ষেত্রে মনোনিবেশে পারিলাম—ভগবানও মাঝে
মাঝে ২১০ লাইন কবিতা সেখেন এবং সুযোগ
পাইলেই কোন অসাবধানী কবির কাণের মধ্যে তাহা
ভুঁজিয়া যেন। সংকৃত কাব্যেও আমরা একটি ডিভাইন
লাইনের কথা অবগত আছি।

বেদিকপল্লববৃক্ষ

হা হা হা হা উক্ত লাইন তিনটিতে আমরা পরিচর
পাইতেছি—ভগবান আদ্যকাল কিত্তর বাংলা কবিতা
লেখেন। প্রথমতঃ যেহিঁতে পাই এখনও তিনি অন্ত্যাপদের
সুদৃষ্ট মিল সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। থেকেই সক্ষে
বৃক্কের মিল আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর কবিরও বর্জন করিয়া
চলেন। এই কয় লাইনের মধ্যেই আমরা যে আপোষ-
সাহায্য চৈতন্যপুঞ্জী বিভূত প্রতিভার আভাস পাইতেছি—

আমাকে নিঃসঙ্কোচে বলা যায় তরুণ কবি শ্রীভগবান
যদি আর একটু সতর্ক হ'ন ও উত্তরোত্তর লেখার অভ্যাস
বাড়াইতে পারেন তাহা হইলে তিনি উৎকৃষ্ট কবি বলিয়াই
স্বাভাবিকভাবেই পরিচিন—এমনকি রীতিমত চর্চা রাখিলে
যতীন্দ্রনাথকেও ছাড়াইয়া যাইতে পারেন।”

যাই হোক প্রগতির মন্তব্য পড়ে যতীন্দ্রনাথ বিব্রত
হয়ে পড়লেন—কি শ্রেণীর ভক্তের উপর তাঁর বচনায়
বসবিসার নির্ভর করছে তা ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে
পড়েছিলেন, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করে
তাঁকে আনড়াগাচ্ছে তুলে দেওয়ার তিনি লজ্জাই
পেয়েছিলেন। তিনি শনিবারের চিঠিতে এর একটি সমস
প্রতিবাদও ছেপেছিলেন।

এই দুই লাইনে এমন কিছুই নেই যে মন্ত যতীন্দ্রনাথ
এইরূপ অস্বাভাবিকতার দ্বারা উত্থাপ্ত হতে পারেন। তিনি এর
চেয়ে চেয়ে চেয়ে অশ্রু অস্বাভাবিক লাইন লিখেছেন, সে সবার
কাছে এই লাইন দুটি ভুঙ্খ। প্রগতিবাহীরা ‘কবিতায়
ভৌগোলিক নাম পেয়ে বৃদ্ধ হয়ে যান। এর দৃষ্টান্ত আরো
আছে। আদ্যকালও কোন কোন কবির কবিতার চরণ
বিশেষ নিয়ে খুব মাতামাতি চলে। কলে, এইসব কবি
কয়েকটি চরণের কবি হয়ে থাকেন।

অতিভক্তদের মন্তব্য আশেও এক ধারাতেই চলছে।
এইরূপ ব্যাপার বেধে এবং বেশের লোকের কাব্যবিচার
বোধের দুর্ভাষা বেধে হানিই পায়। অতিভক্তদের
অতুল্যভক্তি একালের লেখকরা বেশ যেমানুষ হলেন
কোন বেধে থিতিত হই।

এই শ্রেণীর চরণ কোন মহাপুরুষের কণ্ঠে উদ্বীড়িত
হলে অশ্রুগতদের মন্তব্য লাভ করে তা ডিভাইন হয়ে
ভটে। হার ভক্তের হাতে কবিরের কি দুর্ভাষাই না ঘটে।

বড় কবিরের কবিতার মধ্যে অনেক শক্তি স্তম্ভাবিত
থাকে সেগুলি মুখে উৎকলন করা চলে। কিন্তু এইরূপ
চরণের উপর নির্ভর করে কোন কবিতার বা কোন
কবির বিচার করা চলে না। তা বললে গোপ সব চেয়ে
বড় কবি বলে স্বাভাবিক হতেন।

এই সময় আমার বহু কবি বসন্তরূপার চটোপাধ্যায়
পড়ে পড়ে দুই হাতে লেখনী চালনা করতেন। তিনি

দুর্ভাগ্য নিষ্ঠাচাণ্ড্য নামে অস্ত্রের লেখা নিয়ে খুব বড় বদিকতা করতেন।

বসুধাবার তাগিদে আমি গল্প লিখতে শুরু করেছিলাম। বন্ধু বিশ্বপতি বললেন,—‘গল্পের আট আপনার জানা নেই, ওগুব গল্প হচ্ছে না’, কাজেই গল্প লেখা ছেড়ে বিলাস।

১৯২৮ সালে মণিলাল গদ্যোপাখ্যানের অকাল হত্যা হয়। তিনি অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রাত্মা ছিলেন ও ঠাকুর বাক্তোবাই পরিজন ছিলেন। মণিলাল একটু aristocratic বহুপের ছিলেন দেহজ্ঞ তাঁর সঙ্গে বড়ই হুগনি। ইন্সটিটিউটের বন্ধুতা মণিলাল চাপচাপনেত্র অস্ত্র তাঁর নামোন্মেষ করে ব্যঙ্গপরিহাস করত। ধুলে পড়ে আমি মণিলালকে সম্বন্ধে একটা ব্যঙ্গ কবিতা একটা পত্রিকার ছেপে ছিলাম। এর ষষ্ঠ পেরে আমি বড় অশ্রুতপ্ত হয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় পর দেখলাম,—মণিলাল অতি গজ্ঞ, দিত্তভাষী, মিষ্টভাষী ও সুরকটম্পন্ন ব্যক্তি।

ইনি ভারতীয় অজ্ঞতম সম্প্রদায় ছিলেন। ঐক্য দেহজ্ঞ স্ববেই ভারতীয় সাহিত্যঃগোষ্ঠী সঙ্গে উঠেছিল। এই গোষ্ঠীতে ক্রিষ্ণেন্দ্রনাথর বাগটি, চাক্র বংশোপাখ্যান, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, প্রেমোদ্র, মোহিতলাল ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় ‘গঙ্গাঈদের পরিবেশ মণ্ডলের’ সৃষ্টি করেছিলেন। বলা বাহুল্য, গঙ্গাঈদ বয়স হবীন্দ্রনাথ।

আমার যখন ছাত্রশ্রম উত্তীর্ণ হইনি তখনই মণিলাল আমার বহু কবিতা ভারতীতে ছেপেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন হবীন্দ্রনিগপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। কবিতা নির্বাচনে মণিলাল সত্যেন্দ্রনাথের সহায়তা গ্রহণ করতেন। আমার যে সকল কবিতা ভারতীতে প্রকাশিত হ’ত সেগুলি সত্যেন্দ্রনাথেরই অনুমোদিত।

আমি প্রথম জীবনে ব্রজলীলা ও গুলীকীবন নিয়ে বেশ কবিতা লিখতাম। ভারতী ও প্রবাসী সোজা আমার সেপথ লেখার আধার করেনি—ভারতী বা প্রবাসীতে ঐ সকল কবিতার একটিও ছাপা হয়নি। এই দুই বিষয় বহু ছাড়া অস্ত্র বে সব কবিতা লিখেছিলেন—ভারতী, প্রবাসীতে সেইগুলিই ছাপা হ’ত।

মণিলাল যৌবনেই তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে হারান।—

তারপর থেকে তাঁর দেহমনের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়।

মণিলাল হাত বড় মিঠে ছিল। শিশুসাহিত্যে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর আপানী কাহ্নল সেকালের প্রত্যেক ছেলেমেয়ের আধরের বই ছিল। তিনি অনেকগুলি গল্পও লিখেছিলেন। তাঁর ভারতীয় বিদ্বানী গ্রন্থানি তাঁর ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক সাহিত্য পাঠের ফল। টিরদিন এই গ্রন্থের মধ্যমা অঙ্গুর থাকবে। মৃত্যুকাল ও অভিনয়বিজ্ঞান উৎকর্ষ গাধনে তাঁর অবদান ছিল যথেষ্ট।

হবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে তিনি চর্যকার অভিনয় করতেন। মোড়ারাকোর তাঁর অভিনয় অনেকবারে ঘেখেছিলেন। মণিলালকে Culture personified বলা যেতে পারত। এতপ Cultured লোক এতুপে খুশ কম চোখে পড়ে।

এই সময়ে আমার লেখার কিছু-কিছু বিতরণ সমাধাচনা হ’ত—সেসব নির্বর্ণন কিছু-কিছু তুলে দিই—বলা বাহুল্য প্রশংসে ভাবগুণি তুলে আত্মপ্রচার করব না। তবে আমার গল্প সম্বন্ধেও মাঝে-মাঝে পেতান। যেমন—

সোম (বহুমতী)—.....কালিদাস যাবু একটা দুর্দাম রটেছে যে তিনি কবিতায় বহু দুঃখ ও অগ্রসলিত শব্দ ব্যবহার করিয়া রচনাকে দুর্গোষ এমন কি অগাঠ্য করিয়া তোলেন। কিন্তু শব্দের দুঃখতা যৌব আপেক্ষিক মাত্র। একই শব্দ কাহারও কাছে দুঃখ কাহারও কাছে সুপরিচিত। আব অগ্রসলিত শব্দ ব্যবহার মাত্রই মোঘের নয়, যদি সেই স্থানে সেই শব্দ বিবহবস্তর পক্ষে যৌবপযোগী হয় (বহুমতী)

বর্ধাঙ্গ (বহুমতী) কবিশেখরের কোন কোন কবিতা-পাঠের সময় অভিধান কাছে রাখিতে হয়। অনেক সময় আবার সাধারণ অভিধানে ফুলায় না— গুণীত স্বরূপ

১। কবি বর গনে ফুলায় তান উল্লাস বরগার।

২। বিন্ধ্যালিকার লীলাশালিকার

বলাকামালিকা ফুলে।

উল্লাস শব্দ কবি কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন? হামকমলের প্রকৃতিবাহে যেখিলাম বিশেষণ উল্লাস শব্দের অর্থ বোদ্ধল্যমান। বোদ্ধল্যমান বহবা আবার কি?

শালিকা কি শালিকা ? শালিক ময়না কি বর্ষার পাখী ?
পক্ষিতত্ত্ববিৎ সাহা মহাশয় কি বলেন ? দীপা শব্দের
সার্থকতা কি ? শুধু কি অহুগ্রাম অলঙ্কারের খাতিরে
এই সমস্ত শব্দ বোঝনা ? যেহেতুই অহুগ্রাম অলঙ্কারের
প্রাচুর্যের গুরুত্বের কবিতা স্রষ্টার আসলরপটি চাপা
পড়িলেও অলঙ্কার শিল্পীরা (১) প্রবণ মধুর। (মানসী বর্নবাণী)
বলা বাহুল্য—শিল্পীরাও অর্ধ ধর্ম্মের ছিল। শিল্প
নয়।

হিম্মতু—কবির উপর দিয়া সংস্কৃত সাহিত্যগম্য
প্রবল বক্তা চলিয়াছে। সমালোচনার ঐক্যবস্ত পথ রোধ
করিয়া ধাঁড়াইলে সঙ্গলনীতে নাত্তানাবু হইতে হইবে
মনে হয়। তিনি যে নূতন যোগে পুণাতন মধু ঢালিয়া
এমন মূল্য হতে বিতরণ করিতেছেন, কৈ এতদিনে
কাহারও ত নেশা বটিল না কেন ?

কুমকুঁড়া... পুত্ৰকথানিতে ভাবানুক্রমে সাধাইবার
মৃৎমা দৃষ্ট হয় না।.....কবি পান্ডী হইতে অনুদিত
কবিতায় কবি পান্ডী আবহাওয়ার স্রষ্টা করিতে পারেন
নাই। ... (মানসী)

রসকদম্ব...—হানে হানে বস একটু তলস হইয়াছে
কিন্তু কোথাও গীতিয়া যায় নাই।...

১৯২৮ সালে ভবানীপুরে সাহিত্য সম্মেলন হয়। বহুদূর
মনে হয়...এই সম্মেলনই শেষ সম্মেলন। এর পর আর
সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল বলে মনে পড়ে না। অত্যাধুনা
পন্থিত্যের সভাপতি ছিলেন বরীষর বিপিনচন্দ্র পাল।
স্বর্নজুবাবী দেবী ছিলেন মূল সভানেত্রী। বরীষরনাথ তাঁর
অভিভাবন পাঠিয়েছিলেন। এ সম্মেলনে বহু বুদ্ধ সাহিত্যিক
যোগ দিয়াছিলেন। মনে পড়ে, একজন প্রৌঢ় কবি
বলেছিলেন...যত যাঁদের মড়া একত্র করছে...এর মধ্যে
আমরা আর কি করব ? ভাগলপুরের সুহৃৎক সুহৃৎনাথ
মজুমদারের গানের মজলিস বলেছিল...মকের উপর।

দর্শনশাখার সভাপতি ছিলেন...হীবেশনাথ বসু। সেই
সভায় ডাঃ সুব্রহ্মনাথ হাশগুপ্তের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম।
হীবেশ বাবুর অভিভাবন ছিল...যোগ হয় ব্যবহারিক
জীবনে বোঝাতার প্রয়োগ। তাঁর অভিভাবন পাঠ হবার পর
ডাঃ হাশগুপ্ত ধাঁড়িয়ে উঠে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়

এবংয়ের প্রত্যেক উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করে বেরিয়ে
চলে গেলেন। আমরা অবজ্ঞা তাঁর সঙ্গে বেরুলাম না।
হীবেশবাবু অত্যন্ত শাস্তমুখে বিনয় ভাষায় আশ্বস্ত
সমর্থন করলেন।

সম্মেলনের এই ঘটনাটির কথা বেশ মনে আছে।

এই সম্মেলনের সময় সন্ধ্যার পত্রিকায় আমি করেছি
প্রত্যয়ের বিবেচনা সম্মেলন পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ
করেছিলাম—

১। ব্যয়সাপেক্ষ বলে মঞ্চসলের সাহিত্যসেবীরা
সম্মেলনকে আকর্ষণ করতে পারে না...সম্প্রদায় বংশধর
বংশধর সম্মেলন আহ্বতই হয় না। যে বংশধর কোন
আলোচক কোটে না সে বংশধর সাহিত্য পঠিত্বের
কর্তৃপক্ষের উচিত কলিকাতায় সম্মেলনকে আহ্বান করা।
কলিকাতায় অর্থের অভাব হবে না। তাছাড়া অধিকাংশ
ডেলিগেট ত কলিকাতায়।

২। সম্মেলনকে বহু শাখায় বিভক্ত করে প্রবন্ধ পাঠের
প্রথা উঠিয়ে দিয়ে মানসিকের সাহিত্য সম্ভা, ঐতিহাসিক
ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও দার্শনিক প্রশ্ন নিয়ে মূল সভায়
২০ দিন ধরে আলোচনা চালানোই উচিত। বর্তমান
ব্যবস্থায় কোন কোন শাখায় স্রোতাই কোটে না। প্রবন্ধ
বীরে স্রষ্টার মাসিকে পড়াই ভালো।

৩। সারা বংশের খর ভিন্ন ভিন্ন শাখায় কে কি কাম
করেছেন...তার হিসাব নিকাশ সম্মেলন নিতে পারেন...
এবং একত্র উৎসাহ, উপদেশ ইত্যাদি দিতে পারেন। সারা
বংশের কোন সাময়িক পত্র যদি অন্যায়, অবিচার, কুৎসা
প্রচার, অসীলতার প্রচণ্ড এবং সমাজের অকল্যাণকর
আচরণ করে থাকে তবে সাহিত্য সম্মেলনে সেইসব পত্রিকার
কার্যের নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত।

৪। যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অগ্রগণ্য সাহি-
ত্যিকের গুরুত্বের দৃষ্টিতে দিয়ে সম্মানিত করে না, আর সরকার
২১০ জন বিত্তীয় বা কৃত্রিম প্রণীত সাহিত্যিককে হেতু-
কনস্টেবলের লত্যা তার হাথে উপাধি দিয়ে বঙ্গ সাহিত্যকে
যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হ'ল মনে করে সে দেশে সাহিত্য
সম্মেলন থেকে সুযোগ্য সাহিত্যিকদের উপাধি দান করা
উচিত।

৬। সাহিত্যসৃষ্টি ছাড়া...শুধু সাহিত্যের উদ্ধার, প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনা, সাহিত্যের আলোচনা, সমালোচনা, অনুবাদ, সংকলন, সংগ্রহ, প্ৰবেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহ দান করা চলতে পারে।

* * *

সীতারাম ছুটীয়ে বদখাসের সময় একবার আমি খুব পীড়িত হয়ে পড়ি। ক্ষুধার্ত পহিপ্রম চলছিল...২৪টা টিউননী ওঠার দাঁড়িয়েছিল। সপ্তাহে তিনদিন স্থলের ছুটির পর যেহালাব রায়বের বাড়ীর একটি ছেলেকে পড়াশুনা। ছেলেকী তখন বি এ পড়ত। বহুবাচ্যে কাজ ছিল। একদিন চাকার প্রশপত্র রচনা করতে করতে মাথা খুব পড়লাম কাগজের উপর।

ডাক্তার এসে, বসুলে হাটের দুর্বলতা খুব। মাথারগাছি খুঁই টালমাটাসে পেল। তারপর কয়েকদিন চলতে গেলেই মাথা বৃহত। বেওরাল ঘরে ঘরে বাতাস্যাত কহতাম।

ব্যাপিটার ভাড়াভাইকে বললাম, “আমাকে আপনাদের মালুল ডাঃ নলিনী সেন গুপ্তের কাছে নিয়ে চলুন।”

ভাড়াভাই বললেন...নিরেখেতে পাতি, আমি নিয়ে গেলে কী নেবে না...অবচ তাঁর অর্থহানি হবে তাতে সে বিরক্ত হতেও পারে। আমি কোন আত্মীয়বন্ধকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই না।

আমি বললাম, আপনি নিয়ে ত চলুন—কী বিতে হয় হবে। কী আমি নিয়ে যাব। তা ছাড়া আমার নিজেব একটা হাবি ত আছে?

ডাঃ গুপ্ত—তোমার আবার কি হাবি আছে?

আমি—প্রথম হাবী গরীব, স্বভাতি, ভুল মাঠার। দ্বিতীয় হাবী আমি আপনাদের পশ্চিমবঙ্গ বৈজ্ঞানিকজনের মধ্যে একজন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক। আপনি শুধু সেইটাই বলবেন, আর বলবেন কী বোঝো।

ডাঃ গুপ্ত ইতস্ততঃ করে স্বীকৃত হলেন।

তখন নলিনীবাবু মানিকতলা ট্রাটে ধাবতেন। তাঁর চেঁচাবে যেতেই নলিনী বাবুর হাফা অবনী বাবু এগিরে এসে বললেন—এই যে কালিদাস বাবু কি ধবর? নলিনী একে জানো? ইনি কবিশেষর কালিদাস রায়।

সঙ্গে সঙ্গে নলিনীবাবু আনুগত্য কহতে লাগলেন—

নন্দপুরচন্দ্র বিনা বলাবন অন্ধকার। চলেন। চল মন্দানি... ইত্যাদি।

ডাঃ গুপ্তের রানমুখে দাঁদি থেবা বিল। তিনি দাড়া পথ অবশিষ্ট ভোগ করছিলেন। তিনি নিশ্চিত হলেন।

ডাঃ গুপ্তের বোব নেই—তিনি চেয়েছিলেন একজন ডাক্তার কি আর কবি টিবিয় মধ্যা বাববে? কিন্তু তিনি এক বিষয়ে ভুল করেছিলেন—তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত “নন্দপুর চন্দ্র” নামক এক ব্যক্তির পবনকাক্য যে বৈজ্ঞানিক লাত করেচে, সে কখনো গেনিরা হতে পারে না।

তা ছাড়া তিনি জানতেন না যে একজন বাঙালী কবিতা লেখকের বেশে কোন প্রতিষ্ঠা থাকতে পারে।

সেই নলিনীবাবু আজ আমার বোবাই, ভাড়া ভাইএর নামা মাত্র নহেন। তবু বোবাই মরতে না পড়লে তাঁকে বিরক্ত করি না। এখন তাঁর ভাষাতা (আমার স্বর্গত ভামাতাভা লাভা) আমার পুত্রেরও অধিক। তাকে অনুন্নয়ন কহতে হয় না,—আবেশই যথেষ্ট।

আবার কুমারসন্তন আমার কৃতজ্ঞতার মিহর্পনস্বত্বপ পন্ন ভাগবত ঐ প্রাপ্যভার্ষেব করে নিবেদন করেছি।

যাই হোক, তাঁর ব্যাবস্থা নিয়ে চলে গেলাম বদখার। সেখান থেকে গেলাম গয়ায়। সেখানে আমার এক উপভালক Cousin-in-law তখন এদিকটি সার্জন তাঁর পত্নী আমার স্বীকৃত উপভগিনী (মাগছুতো বোন)।

ছুটা ‘উপ’ নিলে দ্ব্যধটা যেন নবুং, তেমনি নিবিত্ত। এখানে কবিন ঘরে পেড়া ভঙ্গ ক’রে নানাব্যবনে ভ্রমণ করে শরীফটা সেয়ে গেল। এই ডাক্তারগৃহিণীর পিতার আশ্রয়ে মধুপুরে গিয়ে একদিন ছাত্রজীবনে বোগদুত হয়ে কিয়ে এসেছিলাম। এখন আবার তাঁরই বৌদ্বিতীয় (আমার পুত্রবধূ) নিতা সেগ লাভ করে টিকে আছি।

বুধ গয়া বর্শন করে ডিকটোর নিদ্রায় হল।

এই বঙ্গবহই শ্রীতকালে ভ্রমণ তুফা প্রাণ হয়ে উঠল। এক ভাড়ায journey-র সুযোগ ছিল। দিল্লীর টিকেট কিনে কেল্লায়। এদাবাবাদ, কানপুর, আগ্রা, লজৌ, মধুবা, হুআন, তবতপুর, মিরাট, কান্ধী, ভাগলপুর পাটনা মায় বোলপুর শান্তিনিকেতন সব বেড়িয়ে এসে। এ টিক বেড়ানো মর টুর করা।

তদপেক্ষ কথা পরে বলব।

সীতারাম কুটীরে থাকবার সময় আমার সাজগোশ ও ফুফুঁড়া ছাড়া হয়।

চিত্রচিতার কথা আগেই বলেছি। এর প্রকাশক ছিল সত্যীন্দ্র চন্দ্র দত্ত নামে একটি বুক। সে আমাকে পাঁচখানি বই দিয়েছিল। অতঃপর পরেই তার মৃত্যু হয়।

সীতারাম কুটীরে ছাড়তে হ'ল। বাড়ীটা বেশ পছন্দ হয়েছিল কিন্তু বাড়ীর মালিক নোটিশ দিয়ে উঠিয়ে দিলেন।

সীতারাম কুটীর থেকে নিকটেই প্রিন্স গোলাপ নাথবাব হোটে একটা বাড়ীতে এলাম। রমচন্দ্রের বৈঠক এখানে আয়োজনে উঠল। এখানে থাকবার সময় আমি ঐতিহ্যবাহিনীর অনুবাদ করে শব্দ সঙ্কলন এও সলকে কপিরাইট বিক্রয় করি। আমার বহনমুহুরে বন্ধ চাকর তার তার ছবি আঁকেন—চিরে ঐতিহ্যবাহিনী নামে তা মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। আমার কবি বন্ধ ক্রিয়াকর্মী আমাকে অনুযোগ করে বলেন—এত অল্প এমন বই ছাড়লে কেন?

আমি বললাম—তাই, আমি একখানা exercise book ছাড়া কিছু হিহিনি, কত আর হাবি করব? যা বিরুদ্ধে তাও দ্বিতীয় বর্ষে প্রত্যাগ অনুসন্ধান গোষ্ঠী পড়ে খুব সুখ্যাতি লাভ করেছেন। একখানা পাতলা খাতা দিয়ে আর কত চাইব বলো?

কিরণ উত্তর দিলে—দাঁটির পায়ে ঢেলে দিলেও সুখ সুখাই থাকে। সুখের মানই নিতে হবে।

আমি বললাম—বাগালো পাঠকের কাছে সুখের ত ধাম নেই, পাঠটারই ধাম। বই-এর পাতাগুলো সাদা দিলেও ৪ টাকা ধানই বিক্রাবে।

এই পুস্তকখানির তৃতীয় সংস্করণ ছেপে প্রকাশক বইখানাকে বহনমুহুরে ঢেপে রেখেছিলেন। ইংল্যান্ডে নিজ ঘোষ আবার প্রকাশকের পক্ষ থেকে চালাচ্ছেন, যেখানে পাই। বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন—আমার সাহিত্য-সেবার উৎসাহদাতা তার বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ নিজেই নামে।

আমার দুইজন বিশেষ বিতাকাক্ষী অগ্রদূত সাহিত্যিক একই সময়ে ১৯২৭ সালে দেহত্যাগ করেন। একজন কবি রমণীবোহন। তিনি চিল্লাতে উল্লসে অশ্রুত

হয়ে শায়াসুরোপে প্রাণত্যাগ করেন। আর একজন বিশেষজ্ঞাচার্য্য যোগচি একতাবার কবি। ইনি আমাকে খুবই ভালবাসতেন। একতাবার নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ তাঁর প্রকাশিত হয়েছিল। একতাবার অধিকাংশ কবিতা প্রেম কবিতা। এমন উচ্চ ধরনের প্রেম কবিতা দেখলে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ লেখেননি; যিকেন্দ্রবাবু রবীন্দ্রনাথের শিল্পবলের মধ্যে অঙ্গগণ ও রমণীবোহনের পার্শ্ববর্তী ছিলেন। তারতী গোষ্ঠী বিদ্রোহকে আদর্শ বঙ্গ পুরুষ বলে মনে করতেন। কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বর্ধ প্রবন্ধকে অবলম্বন করে একটা বাহাদুরাব হয়। শব্দবাবু ও নরেন্দ্র সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন। বিধ দাধা তার উত্তর দেন। এই প্রবন্ধই তাঁর শেষ রচনা। বিদ্রোহী নিষ্কণ্ড কবিতার প্রচাৰ চাইতেন না, সৃষ্টি করার আনন্দকেই পুণ্ডরাক মনে করতেন। আমি একবার বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম বহনমুহুরে আগে। তাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন দুইখানা বই থাকলেই চলবে। একখানা তোমার কাছে, আর একখানা সত্যেনের কাছে। আর প্রয়োজন নেই।

আমি এই দুইজনদের উপর বই প্রবন্ধ মাননী মর্দহাবীর একই সংখ্যা রেখেছিলাম।

এই সময়ে কালিঘাটে মিলনী নামে একটা সাহিত্য সমিতির উদ্ভব হয়। তাতে আমাকে সম্পাদক করেছিল। এই মিলনীর সংস্কৃতি বৈঠক বলেছিল...রমচন্দ্রের সহজাতা তাতে যোগ দিত।

একটি বৈঠকে ভাগলপুরের বিখ্যাত সঙ্গীতচর্চা সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার ও বঁটা ধরে গান করেন। তাঁর গান প্রথম স্তম্ভি এবং অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল।

আর একটি বৈঠকে ময়ূরীধর বিদ্যারঞ্জন মজুমদার দুই বঁটা ধরে সাহিত্য সঙ্ঘে একটা ভাষণ দেন। এই ভাষণও অপরূপ ও আনন্দকর।

আর একটি বৈঠকে একজন নবতন্ত্রী বলেছিলেন, বর্তমানের স্তম্ভি ছিলেন একজন খার্ডকাস আর্টিষ্ট। এ নিয়ে মহাগোলাযোগ হয় এবং হাতাঘাতের উপক্রম হলে সভা ভেঙে যায়। অল্প কয়েক বৈঠকের কথা মনে পড়ে না।



(পৃথগুহতি)

৪৮

আমিজন চলিয়া যাওয়ার পর আমিরা বহুক্ষণ পর্যন্ত সেইখানেই বসে বসে গাড়াইরা বসিল। বাহিরের এই অচল অবস্থায় ঠিক বিপরীত তাহার মনের অবস্থাটা। সেখানে প্রায়শঃ এক বড় উট্টিয়াছে। নৃতন করিয়া জলিয়াছে এক ভয়ঙ্কর রোববহি। তাহার ঝিক-ঝাকাদী জ্বালা আজ নানা রস-সংসারটাকেই পুড়াইয়া তদ্য করিয়া ফেলিতে চায়। আমিজনদের এই পরাক্রম ও ব্যর্থতা ইয়েরের বিরুদ্ধে আমিদের বিবেকেও কেন নৃতন ইচ্ছনে নবতর তেজে জ্বালাইয়া জ্বলিয়াছে।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল সেই ভাবে একেবারে পাথরের মূর্তির মত গাড়াইরা থাকিয়া অশ্রুটকটে আপন মনেই শুধু কহিল, 'আচ্ছা, আমিই দেখছি।'

তাহার নিম্নের অন্তরের এই আশ্বাসটাই যেম নিম্নে তাহার সকল লক্ষ্যতা কাটাইয়া তাহাকে শুধু সক্রিয় না—চল ও অস্থির করিয়া তুলিল। সে প্রায় দুটিরা নিচে নামিয়া আসিল এবং উদ্ভাস্তের মত সামনেই বাহাকে পাইল বসিয়া প্রসন্ন করিল, 'পেশোয়া—পেশোয়া কোথায় যে?'

সৌভাগ্যক্রমে সে লোকটি গণপৎ পেশোয়ারাই কী একটা কাণ্ডে বাইতেছিল, কাণ্ডেই তাহার ব্যবস্থা। ঠিকঠিকই তাহার জানা ছিল, জবাব দিল, 'মহামাত্র পেশোয়ারা কী তার খান কামবাতাই আছেন।'

'আর কেউ আছে দেখানে?'

'হ্যা—পতিতগী।'

পতিতগী অর্থাৎ তাতা টোপী।

'ঠিক আছে, তুমি যাও।'

আজকাল নানা দুঃখ-ব্যথার মূণ্ডিত, চালচলনই অজ্ঞান কহিতেছেন—স্বতন্ত্রাং বিনা এতদগার খান কামবাত প্রবেশ করা উচিত নয়। তাহা আমিরাও জানে ছিল কিন্তু তাহার তখন এমন ছেলেখেলাতে সময় নষ্ট করার মত মনের অবস্থা নয়। সে অদৃষ্ট তাহা কপাটে সামান্য একটা টোকা দিয়াই বদলাইয়া তিতরে ঢুকিয়া গেল।

নানা ও তাতা দুজনেই যৎপতোনাতি চিত্তকুল ও উবিষ্ট মুখে শুদ্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন, যেরে মধ্যে পদ-শব্দ শুনিয়া প্রথমটা দুজনেই ভকুটি করিয়া তাকাইলেন। কিন্তু আমির্নাকে দেখিয়া দুজনেরই মুখভাব প্রসন্ন হইয়া উঠিল। আমিরা যে সামান্য ব্রীলোক নয়—সে পতিত এতদিনে তাতাও পাইয়াছেন। তিনিও এখন এই মহিলাত বৃদ্ধি লইতে অপমানবোধ করেন না।

নানা খুশি হইয়া কহিলেন, 'এসো এসো হশেনী, বসো। একটা পরামর্শ-চর্চা হাও, আর ত পাতা বাজে না! এইখানে এই কটা লোকের মধ্যে কত শক্তির আর অর্থ নষ্ট করার তা ত বুঝিবা!'

আমিরা একটা চৌকী টানিয়া বসিয়া পড়িল। কহিবনের অনাহার ও অনিয়ম প্রকৃতির ও মানবধীরের

দৃশ্য। আইনে তাহাকে অনেকখানিই দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর গত এক ঘটীর মানসিক উত্তেজনাও কম নয়—কলে এতখানি ছুটিয়া আনিয়া তাহার পা-ছুটি ধরবার করিয়া কাঁপিতেছে। বাড়াইয়া থাকিবার মত অবস্থাও নয়।

কিন্তু কুম্ভ বৈদিক অনুবিধার দ্বিমে তৎকাইবার তাহার অবসর কৈ ? সে বসিয়া পড়িয়া বিনা স্তম্ভিকাতাই কহিল, 'ঐনগরে মাঘেবের মেনে আমাঘেরে এখনে করের আছে না ?'

'হ্যাঁ, আছে। কেন বলো ত ? তাকে ত তোমারই পরামর্শে বাঁচিরে দেখা হ'লো।'

'ঠিকই হয়েছে। এখন তাকেই পাঠান আনাঘের তকে থেকে। হইলারের কাছে। হইলারকে বলে পাঠান যে তারা যদি এখন এলাহাবাদে চলে যেত চায় ত তাহের সনত সুবিধা ক'রে দেওয়া হবে। মার মালগজ আর যা আছে তাও নিয়ে যেতে পারবে। কেবল অস্ত্রশস্ত্র আর চাকাকড়ি আমাঘের থিয়ে যেতে হবে।'

দুহনেই কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মনে হইল কচাটার বাচার্ঘ্যই তাঁহারের দ্বন্দ্বজনন হয় নাই। অবশেষে মনে কতকটা বিমল ভাবেই টোপী করিলেন, 'মিসেস-ঐনগরে !'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি তার কথাই বলছি।' কতকটা অসহিষ্ণু ভাবেই জবাব দেন আনিয়া।

'কিন্তু ঐনগরের মেনে আমাঘের হয়ে বলবেই বা কেন আর হইলারই বা গর কথা শুনবে কেন ?' নানা তপনও হতভম্ব ভাবে প্রশ্ন করেন।

আনিয়া অর্ধেক হমন করিতে নিষেধ টোট নিষেধই কামড়াইয়া বলিল। তাহার পর বরত অভিভাবক মে-ভাবে অবাধ বালকদের সহিত কথা বলে সেই ভাবেই উত্তর দিল, 'ঐনগরের মেনে বাবে এই ক্ষেত্রে যে এই কাজ ঠিক মত করতে পারলে তাহেই সে সূক্তি পাখে, তা নইলে তার মৃত্যু অবধারিত। আর হইলার যদি কান্দন কথা শোনে ত তার পরিত্রিত, বশেষের মাহু-বের কথাই শুনবে। ওয়া এখন লজ্জা মরীয়া হয়ে। না লজ্জাও মরবে কিন্তু সে মৃত্যুতে অপমান, এতে অপমান নেই। আর হরত শেষ পর্যন্ত

দু-একজন বাঁচতেও পারে—এ আশাও আছে তাই লজ্জা। কিন্তু ওদের বুকের বল কমে এগেছে, কমেতে বাধ্য। এখন যদি নিরাপত্তা চলে গেতে পার ত এক মুহূর্তও ইতস্তত করবেনা বলেই আমার বিশ্বাস। মিসেস ঐনগরকে ডেকে পাঠান, তাকে বুঝিয়ে দিন যে এ কাজ যদি সে করে তাহেই তার বাঁচবার আশা আছে নইলে তখনই অপমানকর মৃত্যু লাগে তার অঙ্গুঠে !'

নানা ও তাত্যা হুকমেনই তবু কিছু সন্নিহিত ভাবে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিকটা পরে তাত্যা ঐক্য বাক্যের সুয়েই কহিলেন, 'তারে যদি নিরাপত্তা কিনে যেতেই যেবেন যেমন মাদেবা, তাহ'লে এতদিন ধরে এত কাজ করবার কী প্রয়োজন ছিল ?'

আনিয়ার মুখে এতক্ষণ পরে একটা হাসি দেখা দিল। অমৃত, বিচিত্র-হাসি। কহিল, 'এক কাজ করা হয়েছে ব'লেই হরত এবার ওয়া খুব সহজে কানী কি এলাহাবাদে চলে যেতে রাজী হবে, এখন হরত কোন মতে প্রাণ নিয়ে কিবে যাওয়াটাকেই সৌভাগ্য বলে মনে করবে, তা নইলে ঐ কটা লোকের জন্তে শেষ পর্যন্ত আমাঘের প্রাণ নিয়ে পালাতে হ'ত। আর ছোটো বিন সময় পেলেও ওয়া তারো কাশান আর চাকাকড়ি ছিনিয়ে নিতে পারত আর তাহলে বুঝতেই পারছেন—তাগোর চাকা কোন দিকে ঘুরত ?'

তাহার পর চৌকী ছাড়িয়া একবারে উঠিয়া বাঁকাইয়া মেনে গ্রাফোজানীর মত তক্তাতে কহিল, 'তারপর ওয়া কিবে বাবে কিনা সেটা বিবেচনা করারও চের সময় আছে টোপী জি। আগে যা বলুন তাই করুন।...খবর ত আপনিও পেয়েছেন, মেনাবেল নীপ এলাহাবাদ পর্যন্ত এসে পৌঁছে গেছে, আজ হোক কাল যোক মুশোমুখি লড়াইয়ে নামতেই হবে। সেমজে যদি প্রস্তত থাকতে হয় এই সামান্য শত্রুকে নিয়ে ব্যস্ত কি বিস্ত্রত থাকলে চলবে ?'

ঘরদার টোকায় শব্দ হইল। সামান্য শব্দ নয়—বেশ শোভেই।

'কে ?' টোপী প্রশ্ন করিলেন, 'কী চাই ?'

নিশ্চয়ে কণাট টেঁদিয়া বলে চুকিল মূলতত। সে আত্মমিতত হইয়া পেশোয়া ও তাঁহার মন্ত্রীকে প্রশংসা করিল,

তাঁহার পর আমিনার দিকে কিরিয়া তাঁহার দক্ষ্য
ঝানাইল। 'মৌলবী কি এইভাবে এসে পৌঁচেছেন। তিনি
তোমার সঙ্গে এখনই দেখা করতে চান।'

'চলু আমি যাচ্ছি।' আমিনা নানার দিকে না কিরিয়া,
কোন প্রকার সম্ভাবনামাত্রও না ঝানাইয়া ব্যস্ত ভাবে বাহির
হইয়া গেল।

'মৌলবী কি ?' নানা ক্রুদ্ধটি করিয়া প্রশ্ন করিলেন।

'মৌলবী আমেরউল্লা—কৈলাবাবের। কিন্তু—কিন্তু
তাকে যে আমারও প্রয়োজন।'

তাত্ত্য টোপী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'তাহলে ছশেরীর কথাটা তোমার কি মনে হচ্ছে ?'
নানা কতকটা ছেলেমানুষের মতই প্রশ্ন করেন।

'কথাটা শোনাই দরকার—আর এখনই শোনা দরকার।
বেশব সাংঘাত্য তা যাচ্ছে কথা বলেন না, তাঁর বুদ্ধিও
অকটা।।...আমাদের এ বংশে এখনই মিটিয়ে ফেলা
দরকার পেশোয়ার।'

'তাহলে তুমিই মিসেস ঐনওয়ার সঙ্গে দেখা করো।
কাল সকালেই যদি তাঁকে পাঠাতে পারো সেই চেষ্টা দেখ।'

'দেখছি।' সংক্ষেপে এইটুকু বলিয়াই টোপী বাহির
হইয়া বাইতেছিলেন। নানা পিছন হইতে ডাকিয়া
কহিলেন, 'যেম রাজী বর কিনা আমাকে এখনই জানিয়ে
যেও, বুঝলে ?'

টোপী নিবেদ্য মাত্র একবার মাথা হেলাইয়া ঝানাইয়া
হিলেন যে, মনিবের নির্দেশ তিনি বৃষ্টিতে পারিগাছেন।
তাঁহার পর একটা নমস্কারের ভঙ্গী করিয়া তিনিও বাহির
হইয়া গেলেন।

নানা একাকী ভেতমি ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার
মুখ বেগিয়া তখন মনে হইতেছিল যে পেশোয়ারিতির সাথ
যেন ইতিমধ্যেই তাঁহার অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। তিনি
নিজেকে বড়ই অসহায় ও নিঃসঙ্গ বোধ করিতে শুরু
করিয়াছেন।

বাহিরে রাজি বনাইয়া আসিয়াছে কিন্তু প্রোগ্রামের
বাহিরে বসটা বৃষ্টি ব্যস্ত, পথ প্রান্তর আর্থী জনবিরল হয়
নাই। চারিদিকেই উত্তেজনা, চারিদিকেই কোলাহল।

কিন্তু ইহার তিতর করব্যাক্ততা কৈ ? যথার্থ কর-
ব্যাক্ততা ?

নানাসাহেব উঠিয়া আসিয়া ঝানাসার ঘরে দাঁড়াইলেন।
হোকনিগুলির আলোতে ও মশালে একতর হইতে পাট
কিছুই দেখা যায়না তবু তাঁহার মনে হইল—বোধ করি
এই-ই প্রথম—ইহার। কেহই পেশোয়ার গিংহামন বচনার
জন্ত ব্যস্ত নয়, বেশের জন্ত ইহারের কিছুমাত্র মাথাব্যথা
নাই—এমনকি ইংরাজদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষও ইহারের
এতদূর পর্যন্ত জাপাইয়া রাখিয়াছে কিনা সম্ভব।
কৌতূহল, তামাসা দেখিবার আগ্রহ আর সর্বোপরি
ব্যক্তিগত লোভই ইহারের মূখ্যেগোষে একট। এই
গোলমালের সুযোগে সকলেই নিজেরের কিছু সুবিধা
করিয়া লইবার জন্ত ব্যস্ত।

এইখানে, ইহারের মধ্যে তিনি রাজসীর স্বর্থ
বেধিতেছেন ?

দূরে মধ্যে মধ্যে কাশনের শব্দ হইতেছে—বলুক
ছোঁড়ার শব্দের ত বিবাম নাই। করতিল আপ হইলেও
বলক্ষে ইহাকেই বুদ্ধ বলিয়া কল্পনা করিতে পারিতেন।
কিন্তু আশ্রয় মনস্তটাই অত্যন্ত অকৃতিকর ও ছেলেখেলা
বলিয়া বোধ হইল।

এ সময় আজিমুদ্দীনও যদি কাছে থাকিত ! কেবল
কোথায় যে সে ঘূরিতেছে।

কমালের অভাবে মানব হাতাতেই কপালের ঘন
মুছিয়া নানা আবাকও আসিয়া বসিয়া পড়িলেন।

॥ ৪৯ ॥

অনেকদিন পরে পরিখার অপর পার হইতে একজন
শেভাক মহিলাকে আশিতে বেগিয়া নাচারপড়ের অধিদায়ীরা
প্রথমটা চোখের বিশ্বাস করিতে পারে নাই। বিশেষত
সে মহিলা আবাব নদীর খেত পত্তাক উড়াইয়া
আশিতেছেন—অর্থাৎ সিপাহীরের বলের লোক।

তবু খেত পত্তাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। যে
দিক দিয়া, যে পক্ষের তরফ হইতেই আশুক—বদশিনী
উপর নিবিচারে কেহ গুলি চাপাইত না এটা ঠিক।
এখন সকলেই অস্ত্র নামাইয়া সঙ্গের ভীড় করিয়া আসিয়া

বাড়াইল। খরং হইলার সাহেবও বাধির হইয়া আসিলেন।

বিশ্ব এমনি বতটাই হউক—দুতী কাছে আসিতে তাহা আরও থাকিল। নিসেস ঐনগরে। ঐনগরে সাহেব সিপাহীঘরে একটা স্মারক হইবে তাহা শেষ বিন পর্যন্ত বিবাদ করেন নাই, নাচাৎপড়ে আশ্রয় লইতেও তিনি হাতী ঘন নাই, আর শেষ পর্যন্ত সে নিরুদ্ভিতার মূলা হিরাছেন নিহত হইয়া, এই কথাই শোন। ছিল সকলের। নিসেস ঐনগরে তাহা হইলে বাঁচিয়া আছেন! শুধু বাঁচিয়া নাই, অপর পক্ষের হইয়া কাছক হিতেছেন! হইলারের লস্কাটে ভরুটি বদাইয়া আসিল।

কিন্তু ঐনগরের মেম এপারে আসিতে সকল সন্দেহ দূরীয়া গেল। তাঁহার সমস্ত পরিবারই সমস্ত নিহত হইয়াছে, জনাকয়ককে আগেই তিনি সহাইয়া বিগাহিলেন, হরত তাহার বাঁচিয়া আছেন, হরত বা নাই—তিনি অন্তত কোন ধরতই রাখেন না। তিনিও নিহত হইতেন, নানা-সাহেবের অন্ততম বদনী রক্তিতার পরানর্শেই নাকি তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে—আর সেই প্রাণরক্ষার খাতিরেই আজ তাঁহাকে স্থগিত নক্সাক্ষেত্র তরক হইতে চুতীরূপে আসিতে হইয়াছে। অবশ্য প্রাণের আর এতটা ন্যাস তিনি করেন না এটাও ঠিক,—তিনি যথেষ্টই মরিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহার বেশবাসী বধি দুই একজনও তাঁহার ব্যাধা বক্ষা পায় ত সেই কীবনের মত তাঁহার শেষ সাজনা। সেই কারণেই তিনি উহারের প্রস্তাবে ঢাকী হইয়াছেন।

স্বাং হিউ হইলার নিসেস ঐনগরের বক্তব্যটা নিঃসন্দেহ বীরভাবে বসিয়া শুনিতেছিলেন—নানার প্রস্তাব ও নিসেস ঐনগরের নিষেধ সত্যায়ন কাহিনী—সমস্তই। সব বদা শেষ হইলে আরও কিছুক্ষণ তেননি স্থির ভাবে বসিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, ‘আপনার কি মনে হয়—মানার এ প্রস্তাব আন্তরিক? শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যতা করবে না?’

নিসেস ঐনগরে দুই কাঁধের একটা বিচিত্র ভঙ্গী করিয়া কহিলেন, ‘তা বদা নক্স।’ ওকেই আমি আর কোনদিনই বিশ্বাস করতে পারব না। তবে একটা জিনিস আমি জেনেছি যে—ওয়াও এবার বিব্রত হয়ে পড়েছে আপনাদের নিয়ে। ওরা শুবেছিল খুব সন্দেহেই আপনাদের শেষ

করতে পারবে, তা নইলে বোধ হয় এ চেতীও করতে না। এখন ওদের হয়েছে কতকটা মানের কারা। তা ছাড়া—শুনছি ব্রিটিশ কোর্ট এলাহাবাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তা যদি হয় ত নিশ্চয়ইই আসল লড়াই শুরু হয়ে যাবে, তখন আপনাদের নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। হয়ত সেক্ষেত্রেও কথার ঠিক রাখতে পারে!’

হইলার চিন্তাক্রান্ত মুখে সহকর্মীদের দিকে তাকাইলেন।

‘আপনারা কি বলেন?’

কর্ণেল এওয়ার্ড থাক দাড়িলেন, ‘না। এখব আমি একটুও আর বিশ্বাস করি না। মোনারেল।...বেশির ভাগই ত সেজে, না হয় আমায়ও যাবে। লড়াই করতে করতে মবার্য রোঁবর আছে স্ভাব হিউ।...যদি শেষ পর্যন্ত নিজেদের নিরুদ্ভিতার ক্ষেত্রে নিরস্ত্র মরতে হয় তার চেয়ে লজ্জার কথা বোধ হয় আর কিছু নেই।’

‘আর তাছাড়া’ মুর কহিলেন, ‘যদি সত্যিই ব্রিটিশ কোর্ট এলাহাবাদ পৌঁছে থাকে ত আনাদের স্তব্ধবও ত খুব বেশি বেহি নেই।...এমন কি তারা এখানে পৌঁছবার আগেই হয়ত এরা আমাদের ছাড়তে বাধ্য হবে।’

‘কিন্তু—’ স্ভাব হিউ কতকটা কিংকর্তব্যবিন্দুভাবে কহিলেন, ‘কিন্তু এখানে থেকেই হয়ত দু-একদিন পরে নিরস্ত্র মরতে হবে কর্ণেল এওয়ার্ড।...আপনি ত আনেন টোটা নিঃশেষ, কানানে যেবার মত বাক্স আর কয়েক পাউণ্ড বোধ হয় অবশিষ্ট আছে—খাবার সিকির সিকি মাত্র রেশন করেছি শুও অতিকষ্টে আর দুটি দিন মাত্র চলবে। এক্ষেত্রে মানার প্রস্তাবে রাজি হ’লে একটা পোষ্টেচেল থাকে শুধু সমস্যানে ইচ্ছাবার। ওরা যেদিন বেধবে আমাদের দিকে কামান বন্দুক নিরস্ত্র সেই দিনই কি এসে কাঁপিয়ে পড়বে না আমাদের ওপর? আর সেদিন কি কুহুব-বেড়ালের মতই মরতে হবে না?’

এওয়ার্ড অগ্রহিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, ‘যাদের অবিশ্বাস করা উচিত ছিল তাদের আমবা বিশ্বাস ক’রে ঠেকেছি, যাদের বিশ্বাস করা চলতে পারত তাদের ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি—কলে তাদের চোখেই আমবা চিরকালের মত বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত হয়ে গেছি।...আমরা আগাগোড়াই নির্দোষের মত কাশ করে থাকি

বেনারেল ।...আর বোধ হয় ওসব চেষ্টা না করাই ভাল ।...
আর লড়াই চালিয়ে যেতে না পারি বশুত্বের শেষ স্ত্রী
শেষ হবার আগে সেটা নিবেদনের মুক্কেও ত চালাতে পারি
আমরা ।'

বেনারেল ছইলারের মুখ অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল ।
তিনি ধাত্তে ধাত্তে চলিয়া গেলেন, 'আমরাগোড়াই এখন
নির্ভুক্তিতা করে বাহিনী তখন শেষ পর্যন্তও না হয় তাই
কল্যাণ । আপনি কিবে যান মিসেস ঐনওয়ে, বসুন
তাঁদের প্রভাবে আমবা মোটাফুটি রাণী আছি । তাঁদের মত
পাঠাতে বসুন আর তাঁদের সন্ততার কী আমিন থাকবে
তাও জানতে বসুন । আমাদের এলাহাখার হওনা হবার
ব্যবস্থাও তাঁদেরই ক'রে দিতে হবে ।'

মিসেস ঐনওয়ে কহিলেন, 'হ্যা—তা তাঁরা ঠিক ক'রে
বেনে—আবার আবার কোন কিছুই অস্বাভাবিক হইবে না ।

'ঠিক আছে । আমাদের আর কিছু বক্তব্য নেই ।'

মিসেস ঐনওয়ে উঠিয়া গিয়াছিলেন । যে কয়জন
ইংরাজ অফিসার তাঁহাদের বিরুদ্ধে গিয়া গিয়াছিলেন,
তাঁহাদের মুখের দিকে কেমন একরকম অস্বাভাবিক ভাবে
তাকাইলেন—যেন বেনারেলের এই সিদ্ধান্ত তিনি আশা
করেন নাই, তাঁহার মনের মতও হয় নাই—বরং অস্ত্র উত্তর
পাইলেই তিনি স্থবী হইতেন । কিন্তু তাঁহারা সেখানে
উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মুখ পাথরের মতই ভাবলেশ-
হীন । সে মুখের দিকে চাহিয়া অস্ত্রের ভাব হুঁকিবার
উপায় নাই নাই । মিসেস ঐনওয়ের মনে পড়িল যে এই
লোকগুলির অধিকাংশই সৈনিক—উপরগুলালার আবেশ
নিবিচারে পালন করিতেই অত্যন্ত, প্রতিবাহ করা, এমন
কি নিবেদনের মতামত জানাইতেও বাওয়াও ইহাদের
এলাকাব বাহিরে ।...বীরে বীরে বিজল চোখ ছুটি আবার
ছইলারের মুখে ফিরাইয়া আনিয়া মিসেস ঐনওয়ে একটা
দীর্ঘশ্বাস কেলিয়া কহিলেন, 'তাঁহলে চললাম আমি ।
শ্রুতান্ত ।'

পাশেই গিয়াছিলেন মূর । তিনি মিসেস ঐনওয়ের
অস্বাভাবিক করিতে করিতে বলিলেন, 'আমাদের এমনই
দুর্ভাগ্য যে আভিযোজ্য করার মত কিছুই আর অবশিষ্ট
নেই । এক কাপ চাও আপনাকে দিতে পারিলাম না ।'

মিসেস ঐনওয়ে মূরের মুখের দিকে চাহিয়া কেমন

একপ্রকার অস্বাভাবিক কর্তে উত্তর দিলেন 'আভিযোজ্যতা ।
আপনারা আমাকে তলি ক'রে মারলেই খুশী হইতাম ।
আমি বড়ই কাণ্ডকর—নিজে হাতে মারবার মাহল হ'ল না
কিছুতেই—নইলে তাই হয়ত উচিত ছিল ।'

পরিবার অপর পায়ে মিসেস ঐনওয়ের তুলি গিয়াইয়া
ছিল । মূর সখতে হাত ধরিয়া তাঁহাকে পাচিলটা পার
করাইয়া দিলেন ।

মিসেস ঐনওয়ে প্রাণাঘাত কিরিয়া আসিতে তাঁহাকে
সোজা পেশোয়ার হংসার গৃহে লইয়া যাওয়া হইল ।
সেখানে সকলেই উপস্থিত ছিলেন—পেশোয়া বয়ং, তাহাড়া
আমিনা, আবিমুজা, তাতা, চীকা সিং, মার মনাপত
মৌলবী মাঘের পর্যন্ত । সকলে শত্রুকে তাঁহাদেরই অপেক্ষা
করিতেছিলেন ।

দুই কি সংবাদ লইয়া ফিলিস তাহা তলিবার অস্ত্র
সকলেই যেন একতরফে নিখাদ রোপ করিয়া বসিয়া ছিলেন ;
মিসেস ঐনওয়ের বক্তব্য শেষ হইতে এইবার তাঁহারা একটা
স্বস্তির নিখাদ ফেলিয়া দিয়াছিলেন । নানালাহের খুশি
চাপিতে না পারিয়া একেবারেই বসিয়া বসিলেন, 'যান
মিসেস ঐনওয়ে, সুস্থিত আপনাদের বিদ্রোহী আপনি ঠিক ঠিক
পালন করছেন, কাজ মঙ্গলও করছেন—এবার আপনি
সুস্থ ।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমিনার তীব্র কঠ ফেলিয়া উঠিল,
'কিন্তু মুক্তি নিয়ে উনি যাবেন কোথায় ? শত্রুর পথে
বেরোলে কি উনি এক মিনিটও বাঁচবেন !'

নানা উত্তরভাবে বলিলেন, 'বেশ, উনিই বসুন কী ভাবে
কোথায় তাকে পৌঁছে দিলে উনি খুশী হবেন—আমরা তাই
চিহ্নি ।'

মিসেস ঐনওয়ে উত্তর বিবাহ আগেই আমিনা
কহিল, 'উনি বয়ং গ্যারিসনের লোকসে সঙ্গে এলাহাখারই
চলে যান না ।'

যেন কী একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে নিহবিয়া উঠিয়া
মিসেস ঐনওয়ে কহিলেন 'না না !'

'তবে—কোথায় আপনি যেতে চান ?' নানা বিবিত্ত
হইয়া প্রশ্ন করিলেন ।

'আমাকে বয়ং বিটুরে পাঠিয়ে দিন, আপনার

মায়েদের কাছে। তারপর আমি সুযোগ বুঝে ওখান থেকে চলে যেতে পারব—তবু এই ছতুম হিংসে দিন।’

মানার ললাটে ক্রুদ্ধটি ঘেঁষা ছিল। কিছুদিন ধরিয়াই স্বর্ণত বাকীরাওব বিংশবারে সমিত তাঁহার মনস্তর চলিতেছে। এই স্ত্রীলোক দুইটির হৃদয়ে উত্তাক্ত হইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের একবকর মজবব্বী কথিতেই বাধ্য হইয়াছেন। তবু কহিলেন, ‘অজ্ঞা, তাই হবে। মজবব্বর, তুমি ত শুনেছ নব, তুমি নিজে সঙ্গে করে তাঁকে বিটুরে পৌছে দাও, আর আমাধের ছতুম আনিবে দাও যে যেদিন খুশী, যখন খুশী উনি চলে যেতে পারবেন।’

তাহার পর—অর্থাৎ দ্বিমে প্রথমবারেই লইয়া মজবব্বর নিজের হইলে মানাসাধের উপস্থিত সকলের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, ‘তারপর?’

তত্য়ই যেন সকলের হইয়া জবাব দিলেন, ‘তারপর আর কি! আজিযুগ্মা চলে যান—ওদের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে ফেলুন সে—বলুন যে ওদের কামান বন্দুক অস্ত্রের আর টাকাকড়ি বা ওখানে আছে নব আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে এখনই, যদি বিশ্বাস করতে না পারে ত আমরা বরং আমাদের মধ্যে প্রাধান্য স্থলকে আমিন রাখতে রাজী আছি ওদের কাছে। কিন্তু ওদের একবারে নিধন করতে না পারলে আমরা নিশ্চিত হতে পারব না। আজিযুগ্মার সঙ্গে টাকা গিও যান বরং আমি ততক্ষণ নৌকো ভাড়া করার চেষ্টা করি। অনেকগুলোই লাগবে বোধ হয়।’

আমিনা এতক্ষণ চুপ করিয়া তাকাইয়াছিল। সে যেন এই সব ছেলোমানুষী উল্লাসে ইহাদের হৃদয় সঙ্কে হতাপ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মুখভাষা অত্যন্ত সেই বকনই। সে এইবার কথা কহিল, ‘আজিযুগ্মা বা চোঁটা কল্লন যাতে ওরা আজ রাতেই যেতে রাজী হয়।...আপনিও পণ্ডিতজী সেই ভাবে নৌকোর ব্যবস্থা রাখুন। হ্যাঁ—ভাড়া কতবেশ না, একবারে কিনে নিন।’

‘কিনে যেন? কেন বলুন ত?’ সবিবরে প্রশ্ন করেন তাত্য়। টোপী, ‘নিছিনিছি কতকগুলো টাকা। বেশি খরচ করার ব্যবস্থা কি? এখানেই ত বজ্জা সব ব্যবহার মত পাওয়া যায়ে না, ভিজি-নৌকো ছাইয়ে নিতে হবে। তাতেই অনেক বাড়তি খরচ হয়ে যাবে।’

আমিনা তীব্র স্বরের সুরে কহিল, ‘নৌকোগুলো কি তাহলে শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তেই এলাহাধারে পৌছবে—আপনারা কি এই বশোবস্তই করছেন নাকি?’

অকস্মাৎ যেন ঘরের মধ্যেই বস্ত্রপাত হইল।

কিছুক্ষণ সকলেই ত্তিত এবং হতবাক হইয়া আমিনার হৃৎকের দিকে তাকাইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে মানাসাধের কহিলেন, ‘তা—তার মানে?’

আমিনারও এবার বিস্মিত হইবার পালা। সে বলিল, ‘আপনারা কি ওদের সত্যি-সত্যিই ছেড়ে দিতে চান না কি? আমি ত বরাবরই আনি যে এটা একটা ছল মাত্র—ওদের নিরস্ত্র করার এবং গড় থেকে দূর করার।’

আবারও কিছুক্ষণ সকলে হতবাক। এমন কি বরং আজিযুগ্মাও যেন এতটর মস্ত প্রস্তত ছিলেন না। শেষে নানাই পুনশ্চ কহিলেন, ‘কিন্তু আমরা কথা দিচ্ছি,—রাখার ততক্ষণ থেকে কথা দেওয়া হয়ে গেছে—যুদ্ধেরও একটা আইন আছে ত! দূত পাঠিয়ে কথা দেওয়া হয়েছে—এখন এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করলে শোকে বলবে কি?’

‘যুদ্ধের আইন!’ আমিনা যেন গম্ভীরা উঠিল, ‘ওদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ কি? আর বিশ্বাসঘাতকতা? ওরাই বরং বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমাদের সঙ্গে চিরকাল, বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই এদেশের সাম্রাজ্য পেরেছে ওরা। আমরা ওদেরই পদ্ধতি, ওদের ক্রিয়াকে দিচ্ছি মাত্র।...আর—যুদ্ধের আইন বলছিলেন না পেশোরা? আজিযুগ্মা বা নিশ্চরই আনেন—ওদেরই বেশে প্রাধান্য আছে, প্রেম ও যুদ্ধে কিছুতেই অস্ত্রায় হয় না।’

তবুও সকলেই চুপ করিয়া থাকেন। এতখানি অস্ত্রায়, এতখানি বিশ্বাসঘাতকতার কাছাকাছি মনই যেন সার রেহ না টিক।

তীব্র মুহূর্ত্তী আমিনা ঘরের দাওয়া টেব পাশ, সে একটু-খানি নিরব থাকিয়াই পুনশ্চ বলে, ‘কার সঙ্গে কী আচরণ করতে যাচ্ছেন পেশোরা সৈন্ত ও যুদ্ধে যেকোন।...এদের ক্ষতে আমাদের কতগুলি প্রাণক্ষয় হয়েছে তা একবার মনে করে

দেখেছেন ?...ওদেরও স্বপ্ন লোক হবে নি। এখন এরা নাচার—একবার নিরাপত্তা হ'তে পারলে ওদের এই কষ্ট, এই সব অকালমৃত্যুর কী ভয়ঙ্কর শোণ তুলবে তা কি ভেবে দেখেছেন ?...এই ত মৌলবী সাহেব পুঁজি বিক্রেতা কালই এসে পৌঁছেছেন। ঘেনায়েল নীল কানী আর এলাহাবাদে কী কাজ করেছেন—এই মুখ থেকেই শুধুন না !'

মৌলবী এতক্ষণ চুপ করিয়া নত মুখে বসিয়াছিলেন, তিনি এবার মুখ তুলিলেন। কহিলেন, 'কানী থেকে শুদ্ধ করে এলাহাবাদ পর্যন্ত পথের দু'দিকে একটি কোথান সোকাও আর জীবিত নেই—তবে তা'দের ভেত্রে একটাও গুলি খরচ করেনি ওরা, দু'দিকে হত পাহা আছে আর সে সব পাহা হত ডাল আছে...সবগুলিই আজ কাঁদিকঠা। যোল থেকে ষাট বছর বয়সের কেউ সে পথিখান থেকে অব্যাহতি পায়নি। জীলোকের সম্রাণ ও ইচ্ছিত কথার কথা...কিন্তু শুধু যদি তাই হ'ত ! যতবার আগেও এক একজন যে অস্বাভাবিকতার মধ্য করেছে...তা আপনারা করনা করতে পারবেন না। ক্রোশের পর ক্রোশ রাজ্য বুকে ইটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—পথের কাঁকরে তাদের বুকের চামড়া ছিঁড়ে মাংস করে হাড় খেরিয়ে পড়েছে—পিঠ চানুকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত—তারও পর তাদের হয়ে কানী কাঠে কোলানো হয়েছে। স্বামীর সামনে স্ত্রী, বাপের সামনে কন্যাদের বেইজ্ঞ্য করা হয়েছে—মায়ের কোল থেকে সম্রাণ ছিনিয়ে নিয়ে তাদের বধ করা হয়েছে। এসেব মনে আপনি ওস্তাদ ব্যবহার করতে চান পেশোয়া ?'

পেশোয়া নত মুখে বসিয়া থাকেন। তাতাটোপী

বিস্তৃত বোণ করেন। অবতুত্বরোবে আবিমুখ্যার কপালের শিরা ওলা মুগিয়া মুগিয়া ওঠে।

অবশেষে তাতা বলে, 'কিন্তু ওরা খত নিচে নেমেছে, আমা'দেরও কি শুভটা নামতে বলেন মৌলবী ! তাহাড়া যুদ্ধের ফলাফল আজও অনিশ্চিত—এই বিধানখাতকতা—এই হত্যার খবর আবার ওদের কানে পৌঁছলে ওরা আরও কত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে তা ভেবে দেখেছেন ? যদি ওদের হাতেই আবার বেশ কিছু দায় ?'

'কখনও না !' আদিবার দুই চোপ হইতে আগুন বর্ষণ হইতে থাকে—'দেশ বিধে দেশেও দেশদাসী যাবে না। তেমন ছুঁনি যদি আসে ও তার আগে আমরা রাজপুতদের মত মহাব্রত করব। কিন্তু ওদের কমা করব না পণ্ডিতদ্বী, আপনারা যদি ভয় পান, আমা'দের যদি বুক কাঁপে ত আপনারা সরে দাঁড়ান। অ'ম'ব'ই এর ভাব নিছি। রক্তবীজের ফড়ি ওরা—হেলো বুড়া ব্রীলোক কেউ কম নয়। এমন কাণ্ড করব, এমন শোণ তুলব এ'বে ওপর দিয়ে, যে সমস্ত ইংরেজ লাভ নিউরে উঠলে, ভয় পেয়ে ওরা এদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা ত্যাগ করবে। শত্রু নাশ করব, ইংরেজ ধ্বংস করব—এই আমা'দের ব্রত, যেমন ক'রে বোকা, যে পথে বোকা। কমা নেই, মহিফুতা নেই, স্ত্রায় স্ত্রায় বিচার নেই।...আমুন আবিমুখ্যার বা, বা ব্যবস্থা করবে আমরাই কহি। মহামাত্র পেশোয়া ও পণ্ডিতদ্বী'র মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, ভীত ক্রীলোকের মত কাঁপছেন ওরা।...ওরা ব'লে কয়েকদিন বিগ্রাম কতন।'

(তম)



জীবনের ক্রমবিকাশ

জীবনমল দে

[পূর্বাহ্নভিত্তি]

বিশেষ পরীক্ষার প্রকাশ পাইয়াছে যে একটি শিশু, কোনো নিষিদ্ধ অথবা নিষিদ্ধ আকারের পশুভীতি নাই। পাঁচ মাস ছুই সপ্তাহ বয়সের একটি শিশুর কাছে একটি কাল বিড়াল, একটি কপোত, একটি শূকর, একটি নাগা ইঁদুর এবং একটি বড় সুস্থুর নিয়া দেখা গিয়াছে যে শিশুটি আকারের ছোট পশুগুলিকে ধরিতে চেষ্টা করে এবং বড় সুস্থুরটিকে দ্বিগুণ ভয়ানক ভুলিতে তাকাইয়া থাকে। ইহার এক সপ্তাহ পরে এই শিশুটিকেই একটি পশুশালায় লইয়া যাইয়া উট, তরু, জেবরা প্রভৃতি আনোয়ারের কাছে নেওয়া হইল। কিন্তু এই সন্তপ্ত পশু দেখিয়া শিশুটি একটুও ভীত হইল না। এমন কি যখন একটি বানর শিশুটির দিকে ভীতিগ্রস্ত মুখভঙ্গি করিল তখনও শিশুটি একটুও ভয় পাইল না। সাত মাস ছুই সপ্তাহের একটি শিশুকে লইয়া এইরূপ পরীক্ষার একই কল প্রকাশ পাইল। এই একই উপায় দেখা গিয়াছে যে শিশুদের আঙনের ভয়ও নাই। ইহাদের বিদ্যালয়ের বাচ্চার মত বিশেষ কোনো দৃষ্টান্তে ধৈর্য্য অথবা মাদিবার সহজ প্রবৃত্তিও নাই। কোন বস্তুকে ভয় করিতে হইবে, কোন বস্তুকে দূরে রাখিতে হইবে তাহা মনুষ্য-শিশুর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তির দ্বারা শিক্ষা লাভ করিতে হয়। প্রত্যেক শিশুই যাহা কিছু হাতের কাছে পাইবে, তাহাই ধরিয়া মুখে ধিবার লস্কর প্রবৃত্তি লইয়া লক্ষ্যগ্রহণ করে। কোনো কিছু দেখিলেই শিশু তাহা ধরিতে চেষ্টা করিবে। ধরিতে পারিলে তাহা টানিয়া লইয়া মুখে ধিবে। এইরূপে মুখে ধিবার পর বস্তুটি যদি কোনো যন্ত্রণাদায়ক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তবে শিশুটির ভিতর ঐ বস্তুটি সম্বন্ধে একটি বৃত্তাবধি (selective inhibition) সৃষ্টি হইবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বৃত্তাবধি সৃষ্টি হইতে অনেক সময় প্রয়োজন হয়।

Watson একটি পাঁচ মাস বয়সের শিশুর কাছে একটি নোন আলাইয়া নিয়া দেখিলেন শিশুটি আলোর দিকে চাহিয়া দেখিল, একখানা হাত আলোর দিকে এসাহিত করিল এবং যখন হাতের কোনো একটি আঙ্গুল আঙনের সংস্পর্শে আসিল তখনই হাতখানা প্রতিবর্তী ভাবে সরাইয়া লইল এবং এই প্রতিবর্তীক্রিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পাদন করিল যে শিশুটির আঙ্গুল পুড়িবার সময় পায় নাই। শিশুটি একটুও কাঁদে নাই। ইহা হইতেই বোঝা গিয়াছে যে শিশুটির দেখে যন্ত্রণাদায়ক কোনো প্রতিক্রিয়া হয় নাই। যদি শিশুটির আঙ্গুল এমন কাছে নেওয়া যায় যাংগতে আঙ্গুলটি সম্পূর্ণরূপে আঙনের সংস্পর্শে আসিবে না অথচ আঙনের উত্তাপ আঙ্গুলে লাগিবে তাহা হইলে দেখা যাইবে শিশুটি সমস্ত হাতখানা সরাইয়া লইতেছে না, কেবলমাত্র যে আঙ্গুল উত্তাপ লাগিতেছে সেই আঙ্গুল ঝিকাইয়া আঙনের উত্তাপের আগুতার বাহিরে লইয়া যাইতেছে। প্রথম পরীক্ষার শিশুটির আঙ্গুল পচিববার আঙনের আগুতার ভিতর নেওয়া হইল এবং পঁচিশ বারই দেখা গেল যে শিশুটি আঙ্গুল ঝিকাইয়া আঙনের উত্তাপের বাহিরে লইয়া যাইতেছে। ইহার এক সপ্তাহ পরে এবং আবার দুই সপ্তাহ পরে এই একই প্রকার পরীক্ষা করা হইল কিন্তু কোনো বারই আঙনের শিথ্য সম্বন্ধে কোনো বৃত্তাবধি দেখা গেল না।

আবও পনের দিন পর, শিশুটির বয়স যখন ছয় মাস হইল, তখন দেখা গেল শিশুটির ভিতর প্রতিবর্তের পরিবর্তন দেখা গিয়াছে। এইবার দেখা গেল শিশুটি কোনো কোনো বার আঙনের শিথ্য কিছুটা দূরে হাত নিয়াই আবার হাত ঝিকাইয়া আনিতেছে। কোনো কোনো বার আর মোটেই হাত না ঝিকাইয়া নিলে

স্থূপে আত্মল দিয়া চুম্বিতে আবদ্ধ করিল। কোনোধার
আবার পূর্বের মতই আত্মলের খুব কাছে আগুন নিয়া
জাপ লাগিলে পর আত্মল সরাইয়া লইল। আরও
দুইশতাংশ পরে দেখা গেল শিশুটি কেবলমাত্র একবার
পূর্বের অনপেক্ষ (unconditioned) অঙ্গস্বাৰ মত হস্ত
প্রসারিত করিয়া আর একবারও হাত বাড়াইল না।
এই পরীক্ষার শিশুটির আগুনকে আঁকড়াইয়া থাংবার যে
সহজ প্রকৃতি তাহার উপর বাধ স্থাপন করিতে প্রায়
ষেড়শতাব্দে শিশুটিকে আগুনের বহুপাখারক প্রতিক্রিয়া
অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া অঙ্গস্বাৰ হইতে হইয়াছে। তবে
এই ক্ষেত্রে মাছের স্বাভাবিক মম্ব বোধ হয়ত শিশুটিকে
সম্পূর্ণরূপে আগুনের বহুপাখারক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া
অঙ্গস্বাৰ হইতে দেয় নাই। তাহা বহি সঙ্গ হইত তাহা
হইলে হয়ত দেখা যাইত যে শিশুটির ভিতর এই বাধ
পঠন করিতে অনেক অল্প সংখ্যকবার অভিজ্ঞতার
প্রয়োজন হইত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মানব শিশু
সহজাত ভাবে কেবল মাত্র স্বল্প শব্দ এবং অবলম্বন
সহায়ী লগ্যাকে ভয় করে। কিন্তু মানব শিশুর এই
সহজ প্রকৃতিগত ভয়কে তিতি করিয়া তাহাকে যে কোনো
ভিন্নিবে প্রক্তি ভয়ভূর করিয়া তোলা যায়। এইভাবে
অনপেক্ষ প্রতিক্রিয়াকে অবলম্বন করিয়া সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া
গড়িয়া তোলা যায়। গ্যার্টসন একটি শিশুকে একটি
লোমশ খেলনা-পত্রে রাখাইল এবং সেই সময় গ্যার্টসনের
সহকারী একটি লৌহযন্ত্রে আঘাত করিয়া একটি ভয়ানক
শব্দ করিল। এই শব্দে শিশুটি চমকাইয়া উঠিল।
ইহার পর এইরূপ আরও একবার করা হইল।
এইরূপ করার পর দেখা গেল যে, শিশুটির ভিতর, লোমশ
খেলনা-পত্রে অঙ্গস্বাৰ করিয়া একটি সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া
গড়িয়া উঠিল। এই সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া শব্দের সহিত
Pavlov-এর কুকুরটির সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া কোনো
প্রভেদ নাই। শিশুটি এখন ঐ লোমশ খেলনা-পত্রে
কেবিলেই ভয়ে চমকাইয়া ওঠে। বর্তমানে দোহরও
আঘাত করিয়া শব্দ করিবার প্রয়োজন হয় না; শিশুটির
ভয় উৎপাদন করিবার মাত্র লোমশ খেলনা-পত্রে
উপস্থিতিই যথেষ্ট। আরও আশ্চর্যের বিষয় শিশুটির

ভিতর, টিক ঐ pavlov এর কুকুরটির মতই, যে
কোনো বস্তু যাহা ঐ লোমশ খেলনা-পত্রে মত দেখায়
পূর্বকথিত ভাবে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিতে
সমর্থ। অতঃপর কোনো লোমশ পত্রে এমন কি এক মৌল
মাছের লোমযুক্ত চামড়া যাহা তৈরী কর্তৃক বেহিমাও
বর্তমানে শিশুটি চমকাইয়া ওঠে। এই সমস্ত নৃপ্তই এখন
শিশুটির মার্কটরে লৌহযন্ত্রে আঘাতজনিত বিকট শব্দের
প্রতিক্রিয়া বহুপ তর্যাহর শিবরণ জাগার। এইভাবে
শিশুটির মানসিক গঠনে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত
হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকারের সাপেক্ষ আবেগ
(conditioned impulse) আবার বিশপেক্ষ (decondi-
tioned) করা যায়। শিশুটির লোমশ পত্রে ভয়ভূপ
সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া দূর করিয়া শিশুটির মানসিক কাঠামোকে
আগার স্বাভাবিক অবস্থায় নেওয়া যায়। গ্যার্টসন একটি
শিশুর ভিতর এক পাত্র সুবর্ণ বর্ণের ছোট মাছের সাপেক্ষ
ভয় সৃষ্টি করিয়া আবার তাহার কি ভানে দূর করিয়াছিলেন
তাহা লিখিলে ভিন্নিষ্ট হয়ত কিছুটা দুঃখিত সহজ হইবে।

আঠার মাসের শিশুটির ভিতর সুবর্ণ বর্ণের মাছগুলির
সহিত একটি বহুপাখারক আবেগের সাপেক্ষ সম্পর্ক স্থাপন
করা হইল। ইহার পর হইতে শিশুটি ঐ মাছগুলি
দেখিলেই—আমাকে কামড়াইস—আমাকে কামড়াইস
বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত এবং নিজেকে মাছগুলি
হইতে অন্ততঃ কিছুটা দূরে সরাইয়া নিয়া তবে শান্ত হইত।
গ্যার্টসনের নিবেদ ভাষার বটনাটি বলা বাটস :—যদি আমি
শিশুটিকে ঘোর করিয়া নিয়া মাছের পাখারটির কাছে বসাইয়া
বিত্যম তাহা হইলে শিশুটি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিত
এবং ঘোর করিয়া ঐ স্থান হইতে দৌড়াইয়া পালাইতে
চাষিত। কোনো মনঃসমীক্ষকই, যত বুদ্ধিমান ব্যক্তি
জানীই তিনি হউন না কেন, তাহার এই ভয় দূর করিতে
সমর্থ নহে। যত বুদ্ধিই তাহাকে যেহান হউক না কেন,
যতই তাহাকে বল না কেন—দেখ মাছগুলি কি সুন্দর—
কি সুন্দর এদের বৎ, কি সুন্দর এরা গাটার কাটে—এবং
কি কখন কাউকে কামড়াবে?—এবং বিজ্ঞানই ভাল, টিক
তোমার মত ভাল। এই সমস্ত কথা যতই বলা হউক না
কেন, শিশুটির ভয় ইহাতে একটুও দূর হইবে না। মাছগুলির

অসুপস্থিতিতে হঠাৎ তুমি শিশুটিকে দ্বিগুণ বলাইতেও পারিবে—ভাল মাহ—সুন্দর মাহ—মাহ কানড়াক্ষে না এবং আরও সব বৃদ্ধিমানের মন্ত কথা কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি তাহার সামনে মাহের পাজ্রটি আনিবে অমনি তাহার মনস্ত বৃদ্ধি এবং বুদ্ধিমান কথা এক মুহূর্তে দুই হইয়া থাকিবে এবং সে ভয়ে চিন্তাকার করিয়া ঐ স্থান হইতে পালাইতে চেষ্টা করিবে। অল্প উপায় অবলম্বন করিয়া যেন—তাহার চার বছরের বড় ছাড়াটিকে আনিয়া তাহাকে শিশুটির সামনে নাহগুলি ধরিতে বল, তাহার লম্বাটি ধারা উহার কাছে বলা হউক—“এই যেন লম্বী বোন মাহগুলি কি ভাল, আমি কি বকম এদের নিয়ে খেলা করছি—এরা আবার ভালবাসে” যেখানে পাইবে ইহার পরও শিশুটির ভয় একদিকশূন্য হইয়া যায় নাই। আরও অপর একটি উপায় অবলম্বন কর—শিশুটির এই তরুণত্বের চক্ষু তাহাকে লক্ষ্য হিতে চেষ্টা কর। তাহাকে বল—“তুমি এতটুকুই সামান্য মাহ যেন ভয়ে চিন্তাকার কর, তোমাকে দিয়ে এ পুথিবীতে কি হবে? তোমার মতাই ভাল।” ইহাতেও যেনিবে শিশুর মন হইতে ভয় একটুও যায় নাই। সে পূর্বের মত ভয়ে চিন্তাকার করে এবং ঠোঁড়াইয়া পালাইতে যায়। এইবার সর্বমুখী অবলম্বন করিয়া যেন বাড়ুক—একটি ঘন কিম্বা বার হুট লম্বা টেবল বানান হইল। টেবলটির একপ্রান্তে শিশুটিকে ঝাওয়াইতে বসান হইল। টেবলটির অপর প্রান্তে একখানা তোয়ালে দ্বারা ঢাকিয়া মাহের পাজ্রটি রাখা হইল। শিশুটির সামনে থাকারের বেকাণি রাখিয়া মাহের পাজ্রটির উপর হইতে তোয়ালের আচ্ছাদন উঠাইয়া ফেলা হউক। ইহাতে যদি শিশুটি ভয়ে চিন্তাকার করিয়া ওঠে তাহা হইলে আরও কিছু দূরে স্থাপন করা হইল। এইবার শিশুটি ভয় পাইল না। নিরবে বসিল এবং যেন সে শিশুটির হৃদয় ক্রিয়ায় কোন অসুবিধা হয় নাই। ইহার পরের দিনও শিশুটিকে পূর্ব কথিত পদ্ধতিতে ঝাওয়াইতে বসান হইল। কিন্তু এই দিন মাহের পাজ্রটি পূর্ব দিন হইতে শিশুটির দিকে একটু সরাইয়া আসা হইল। এই দিনও শিশুটির ঝাওয়া অথবা হঠাৎ কোনো ব্যতিক্রম ঘটিল

না। এই একই উপায় অবলম্বন করিয়া চার-পাঁচ দিনের মধ্যে মাহের পাজ্রটি শিশুটির ঝাইবার বেকাণির কাছে গিয়া আসা হইল এবং যেন সে শিশুটি একটুও ভয় পাইতেছে না। সে নিরবে ঝাইয়া উঠিল।

শিশুটির ভিতর যে ভয় রোপণ করা হইয়াছিল তাহা এইভাবে উৎপাটিত করা হইল। তাহার নার্সতর এখন আর মাহের পাজ্রটি দেখিয়া ভয়ের শিহরণে বৈশা। আগাইয়া তোলে না। শিশুটির কাছে এখন হইতে ঝাইবার সময় ঐ মাহের পাজ্রটি রাখা হইল। কিছুদিন পর যেন সে শিশুটিকে টেবিলের উপর বসাইয়া তাহার কাছে মাহের পাজ্রটি রাখাইয়া যদি থাকাতারের বেকাণি আসা না হয় তবে শিশুটি থাকারের লক্ষ্য ব্যস্ত হইয়া ওঠে এবং তাহার দ্বিত লালসার তদ্বিদ্ভা যায়। এই ভাবে যে পাজ্রটি একদিন শিশুটির মনে ভয়ের শিহরণ আগাইয়া, সেই পাজ্রটিই এখন শিশুটিকে অরণ্য করাইয়া দিতেছে সুখাচ্ছাদনের মধুর স্মৃতি এবং এই স্মৃতির শিহরণে তাহার লালাপ্রস্রাব পর্যন্ত চকল হইয়া উঠিয়াছে।

এখন মিলাইয়া দেখুন প্যান্টভের তরুণত্বের সহিত এই আচরণের কোথায় অনিল আছে। এই প্রকারের মন মন সাপেক্ষ অবশেষের Conditioned impulse সৃষ্টি এবং আবার তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া মানুষের বুদ্ধি বয়সেও চলিতে পারে। আমরা বাছারা পশুশালায় বাইরা স্মৃতিসংগের গৃহে গিয়াছি তাহারা নিশ্চয়ই দেখিয়াছি যতবার একটি শাপ উহার পেটিকার শক্ত কাচের বেয়ালে, বর্শকবিশের দিকে ছোবল দিতেছে, ততবারই বর্শকবুদ্ধ ভয়ে চোখের পাতা ফেলিতেছে এবং একটু পেছনে হট্টা আসিতেছে। অথচ বর্শকবিশের প্রত্যেককেই শক্ত কাচের বেয়ালের কথা জানে এবং বিশ্বাস করে যে ঐ শাপটি ঐ কাচের বেয়ালে ছোবল দিয়া ভাবিবার ক্ষমতা নাই। ইহার মূলে বুদ্ধিগত তাহারের যেরের স্বতন্ত্রিত্ব নার্সতর। Automatic nervous system—ইহার কান হইতেছে হট্টাৎ বিপদের মূখ হইতে যেরের স্বতন্ত্রিত্ব উপর নির্ভর করে না। পূর্ব কথিত বর্শকবুদ্ধের ঐক্য ভাবে চোখে টিপ দেওয়া এবং পেছনে হট্টা আগা একটি স্বতন্ত্রিত্ব প্রতিক্রিয়া

(automatic reflex) উদাহরণ এবং ইহা মানুষের দেহের স্বতঃক্রিয়া নার্তত্ত্বেরই কাজ। কিন্তু মানুষের স্বতঃক্রিয়া প্রতিবর্তের উপরও বাধ (inhibition) সৃষ্টি করা যায়। একটি মানুষের সামনে এমন একটি বস্তু স্থাপন করা হইল যাহাতে রক্তের মধ্যস্থতায় একটি কার্টের হাতুড়ি যায়। একখণ্ড বড় কাচের উপর ইহা করিলেই অনবরত আঘাত করা যায়। প্রথমতঃ প্রত্যেকটি আঘাতের সাধে সাধেই লোকটির চোখের পাতা মিটমিট করিতে লাগিল এবং দেহের স্নায়ুও প্রতিবোধ প্রতিবর্ত প্রভৃতি শিহরণ এবং সংকুচন দেখা দিল। কিন্তু বতই সময় যাইতে লাগিল ততই স্বাভাবিক পেল যে লোকটি চোখের পাতা মিটমিট করা এবং দেহের শিহরণ ও সংকুচন কমিয়া আসিয়াছে। এইভাবে কিছু সময় কাচের উপর হাতুড়ি যায় আঘাত করিবার পর লোকটির দেহবস্ত্র বন্ধন দেখিল যে হাতুড়ির আঘাত তাহার কোনই ক্ষতি করিতেছে না। তখন লোকটির চোখ মিটমিট করা এবং দেহবস্ত্রের শিহরণ এবং সংকুচন সম্পূর্ণরূপে চলিয়া গেল। যদ্যপি এই লোকটির এই আচরণের সহিত শিশুর ন্যায়ের পাজি দেখিয়া ভয় পায়। এবং তাহার উপর দাবকল্পি করিয়া তাহার দূর কথার সাধে মূলধন কোন প্রেতের আছে কি? বাস্তবিক পক্ষে যেখানে গেল ওয়াটসন এবং তাহার সঙ্গীরা মনোবিজ্ঞানকে এক নতুন পথ দেখাইয়াছেন।

সাধারণ প্রতিবর্ত ক্রিয়া এবং তাহার উপর বাধ সৃষ্টির ভিত্তর দিয়া আমরা যেখানে পাই মানুষের মন কি প্রকার কমনীয়। নরম মাটি দ্বারা পুতুল বানাইবার মত ইহা দ্বারাও নতুন নতুন প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সৃষ্টি এবং আবার তাহার বিশেষ সাধন করা যায়। জ্ঞানের এই নব বিকাশের ভিতর দিয়া আমরা আলোচনাতে পাইয়াছি। মানব জীবনের যে সমস্ত আচরণকে আমরা তাহারে চরিত্রগত সহজপ্রবৃত্তি বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহার মূল বহিয়াছে সাধারণ প্রতিবর্ত। উহা নিরন্তর অভিজ্ঞতা ছাড়া মনের পর্দা পইয়া ভ্রমপ্রবণ করে এবং নিশ্চিই প্রতিবর্তে একটি শিশুমন বাহা গ্রহণ অথবা বর্জন করিতে সক্ষম তাহা প্রত্যেক শিশুমনেই গ্রহণ অথবা বর্জন করিতে সক্ষম। ওয়াটসন বলেন যে, মানব শিশুর ভিতর তাহার

পিতা অথবা মাতার শারীরিক কিংবা মানসিক বৃত্তির কিছুই বর্তাইতে পারে না। এইভাবে তিনি বিভিন্ন মানুষের আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন পথার্থে ব্যক্তিগত বিভিন্নতা যে থাকিতে পারে তাহাই পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন। ওয়াটসন বিশ্বাস করেন না যে কোনো বিশেষ গোষ্ঠির কোনো বিশেষ ভগ্ন থাকিতে পারে বাহা সেই গোষ্ঠির প্রত্যেক শিশু লব্ধ হইতেই পইয়া ভ্রমপ্রবণ করে। ওয়াটসন বলেন যে ভগ্নভাবিক প্রতিবর্তের সমস্ত তথ্য পাইলে এবং প্রতিবর্তকে নিয়ন্ত্রণ করিলে পারিলে যে কোনো শিশুকে যে কোনো ভাবে গড়িয়া তোলা হইতে পারে। তিনি দাবী করেন যে, তিনি যে কোনো শিশুকে তাহার ইচ্ছামত চোব, লাধু, কবি, শরীর অথবা বড়লোক করিয়া গড়িয়া তুলিতে সমর্থ, তিনি দাবী করেন যে উপরোক্ত দৃষ্টান্তি সমস্ত পূরণ করিতে পারিলে একঝোড়া গোগণ নর ও নারীর দ্বারা জন্মান একটি শিশু দ্বারা আইনষ্টাইনের অপেক্ষাকৃত নিচু প ভাবে লিখাইতে পারেন। ওয়াটসনের এই দাবী অসম্ভিত ভাবেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। যেহেতু প্রতিবর্ত এবং তৎপ্রভৃতি অভিজ্ঞতা মানুষের শারীরিক জীবন গড়িয়া দেয় সেইহেতু ইহা প্রমাণিত হয় না যে মানব শিশুর জীবনের উপর তাহার পিতা অথবা মাতার জীবনের কোনো চিহ্নই থাকে না। এককবার বলিতে গেলে ওয়াটসনের মতবাদের পিছনে যে যুক্তি আমরা যেখানে পাই তাহা দ্বারা বংশগতি (heredity) অপ্রমাণিত হয় না অথবা ইহাও প্রমাণিত হয় না যে জীবন গঠনে বংশগতি (heredity) কত প্রয়োজনীয়। প্যান্থগত এই অস্বাভাবিক মতবাদের সমর্থন করেন না। বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে মানুষের নার্তত্ত্বের ইকমকেব, মস্তিষ্কের প্রে ম্যাট্রিকের পরিমাণ এবং জ্যোতিষগতীয় গুণগতত্বা মনব চরিত্র গঠনে অনেকখানি সাহায্য করে। এই বিষয় এত জটিল এবং বিতর্ক যে কোনো একবার বড় পুস্তকের ইহাই একমাত্র বিষয় বহু হইতে পারে। এইখানে বিষয়টির ক্ষুদ্রাকার চূর্ণক হিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। মনঃসমীক্ষণ : —এক টুকরা শাখা কাগজের মত কলকরী মনের উপর জীবন পথের অভিজ্ঞতা, সামাজিক শিক্ষা, বিধিনিষেধ

খাচরের উপর খাঁচর কাটায়া শাপেক প্রতিবর্তের চটল
আত্মাং সৃষ্টি করে—তাহার বিচার এক বিশ্বের বস।
প্রতিবেশের চাপে ইহার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আত্মার মনে
বে তরঙ্গলোহার সৃষ্টি করে তাহার বহিঃপ্রকাশ ও অবস্থান
মানুষের জীবনের এক বিরাট দিক প্রকাশ করিয়াছে।

মনঃসমীক্ষণ মানুষের জীবনের এক বিরাট আবিষ্কার।
মানুষের মনের অন্তরতরঙ্গে অবস্থিত বাসনাংশি অন্য
হইতে হইতে যে বিরাট আশ্চর্যবিধি সৃষ্টি করে। তাহার
অরিবর্ণন কহে, কখন কি ক্ষুদ্র আঘাতে যে আরম্ভ হইবে
তাহা কে জানে। এই অরিবর্ণন যে মানুষের জীবনের কি
অদৃশ্য অস্তিত্ব পাওয়া বসিত হয়, এই অগ্নি উৎপাতের
ফলে কত সুন্দর জীবন যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে কে জানে।
মানুষের জীবনের এই ভীষণতম অস্তিত্ব মাত্র একমত
বহুর পূর্ণও আত্মার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।
আত্মার জীবনের কামনা বাসনাগুলি প্রতিদিনের আত্মার
সুস্বাদিক জীবনের সহিত সংঘাতে বহিঃপ্রকাশের পথ না
পাইয়া আত্মার মনের অন্তর্জ্ঞান (sub-conscious)
প্রায়ে স্থিত হইয়া ধ্বনিত অসত্ত্বাবে স্থিতি। বহিঃপ্রকাশের
পথ সৃজিত থাকে। তারপর দ্রুত একদিন কোনো এক
অনন্তর হুর্দে অন্তর্জ্ঞান মন হইতে লক্ষ্যাত মনে চলিয়া
আনিয়া মনের সমস্ত বাহ্য জ্ঞানকে ফেলে। তখনই আত্মা
জ্ঞানিক ব্যাবিক্রম হই। জ্ঞান ভগতের এই নতুন আবিষ্কার
এই অস্বাভাবিক অবস্থার বিশ্লেষণ এবং চিকিৎসাকেই
ব্যাখ্যানে মনঃসমীক্ষণ (psycho-analysis) এবং
অস্বাভাবিকবিজ্ঞান (psycho-pathology) বলা হয়।
বিষয়টির সম্বন্ধে আত্মার জ্ঞানের অপূর্ণতার ভিত্তি হটক
অথবা মস্ত যে কারণেই হটক এই বিদ্যে অন্তর্যায় কিছু
প্রকাশ করা বড়ই দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হয়। অথচ এই
পুঙ্খক এই বিষয় একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া আর কিছুই
নহে। মনঃসমীক্ষণ বিচার ইতিহাস বিচার করিলে উনবিংশ
শতকের শেষের দিকে ব্রুয়ার (Breuer) দ্বারা অস্তিস্কেটের
(Aberaction) আবিষ্কারকেই ইহার প্রথম অধ্যায়
বিস্তৃত হয়। ইহার পূর্বে এই সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানকে
কোনো প্রকার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করা সম্ভব
নহে। গত মহাযুদ্ধের সময় বাত (shell-shock) দ্বারা

স্বাভাবিক অবস্থার প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক সম্ভবন (hypnotism)
দ্বারা চিকিৎসা করা হইত এবং কোনো ক্ষেত্রে কৃতকর্ম
হইত। যখন পরিচার ভাবে বোঝা গেল যে বৈজ্ঞানিক
স্বাভাবিক অস্বভাব তাহার কোনো জ্ঞান অথবা স্মৃতি
স্বত্বকে নিরোধ (suppression) করিবার ক্ষমতা মানসিক
বিশেষ ফলেই হইয়া থাকে, তখন তাহাকে সবেদন
(hypnotism) করিয়া পূর্ণ স্মৃতি ফিরাইয়া আনার চেষ্টা
করা হয়। হারান স্মৃতি ফিরাইয়া আনার পথে কখন বা
ভয়ানক বাধার সৃষ্টি হয়, কখনও বা মোটেই সম্ভব হয়
না। কিন্তু এই হারান স্মৃতি যদি অস্বভাবিত মনের পরমা
ঠেলিয়া একবার সংজ্ঞান মনে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হয় তবে
বেশা বার বৈজ্ঞানিক রোগের লক্ষণ বীরে বীরে লগ্ন হইয়া
যাইয়া মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরা আসিয়াছে। হারান
স্মৃতির স্মৃতিমালাতে রোগীর মার্কত্রে যে ভয়ানক আঘাত
লাগে তাহা দ্বারা তাহার রোগের কারণ এবং লক্ষণ দুই
দূর হইয়া যায়। এই যে নিরুদ্ধ স্মৃতির স্মৃতিমালাতে
রোগের কারণ এবং লক্ষণ—দুই দূর হইয়া থাকে—
ইহাকেই অস্তিস্কেট বলা হয়। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা
প্রকাশ পাইল যে পূর করিবার এই প্রণালী রোগের
সর্ব ক্ষেত্রে এবং সর্বস্থানেই প্রযোজ্য নহে। ইহার
প্রয়োগ স্থান সীমাবদ্ধ। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সিগমুন্ড ফ্রয়েড,
ক্রুয়ারের সহিত আনিয়া যোগ দিলেন অস্তিস্কেটের
প্রয়োগ স্থান বাড়াইবার মস্ত। ইহার পর ফ্রয়েড
স্বয়ং অস্তিস্কেট লইয়া গবেষণা করিয়া দেখিলেন
যে ইহা দ্বারা রোগের চিকিৎসা ভাল ভাবে সম্ভব
নহে। ইহার পরে তিনি যে পথ আবিষ্কার করিলেন
তাহাকে বলা হয় মনোবিশ্লেষণ অথবা মনঃসমীক্ষণ
(psycho-analysis)। তিনি প্রথম যে পথ অবলম্বন
করিলেন তাহাকে বলা হয় অস্বাভাবিকসংযোগ (free
association-method)। এই পদ্ধতি অনুসারে রোগীকে
প্রথমত তাহার মনটিকে বসন্ত সম্ভব চিন্তাবীন এবং লগ্ন
করিতে বলা হয়। তাহার পর বৈজ্ঞানিক তাহার ভক্তির
কাজে, মনের চিন্তাধারাকে ক্রমাগত হবহ বলিয়া ধাইতে
হইবে, এই বসন্ত স্মৃতি চিন্তাধারা তাহাকে যে স্থানেই লইয়া
যাউক না কেন। প্রায় সমস্ত রোগীকেই বেশা ধাইত,

বতবারই এই অবাধ্যতাবাহুসে পদ্ধতি গ্রহণ করা যাউক না কেন, তাহাযেব চিন্তাব্যবাস্য প্রত্যেক ব্যবহী একটি নির্দিষ্ট পথ বহিরা চলিয়াছে। চিন্তাব্যবাস্য পথ অতুপপন করিয়া বেধা বাইত চিন্তাব্যবাস্য নির্দিষ্ট পথ বহিয়া চলিতে চলিতে আৰ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। চিন্তাব্যবাস্য এক শক্তিশালী প্রতিবন্ধকের সামনে আসিয়া আৰ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বতবার মন্থন করিয়া চিন্তাব্যবাস্যটিকে চালু করা যাউক না কেন, চিন্তাব্যবাস্য স্রোত ঐ একই স্থানে আসিয়া বামিয়া বাইতেছে। এক বিরাট বাধা ঐ একই স্থানে মাথা খাড়া করিয়া ঠাঁড়াইয়া চিন্তাস্রোতকে আৰ অগ্রসর হইতে দিতেছে না।

ফ্রেড্ সর্বপ্রথম বলিলেন এই প্রতিবন্ধকের কারণ হইতেছে রোষ্টার জীবনে কোনো অভিযাত অবধা ভীত কামনা বাসনাকে মনের অন্তর্ভুক্তি প্রবেশে নিষেধ করিয়া রাখা। ফ্রেড্ বলেন রোষ্টারকে বার বার অবাধ্য তাবাহু-বাসের পথে উৎসাহিত করিয়া ক্রমে ক্রমে বেধা যায়, চিন্তাব্যবাস্য পথের প্রতিবন্ধক দূর হইয়া যায় এবং অভিযোজকের উপস্থিতি দ্বারা রোষ্টার সংবিৎ কিরিয়া আসে। রোষ্টার কাছে যোগের কারণ প্রতিভাত হয়। এইরূপে রোষ্টার আত্মবিশ্লেষণের ভিত্তি দ্বারা সংবিৎ কিরিয়া পায় এবং নিবেকে সংবরণ করিতে সক্ষম হয়। এর পথে ফ্রেড্ অবাধ্য তাবাহুসে পদ্ধতি রোষ্টার দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ করিতেও প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক রোষ্টারকে বেধা যায় যে বসন ব্যক্তে ঘুমাইবার কষ্ট পূরন করিয়াছিল তখন তাহার যোগের কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই। রাজে ঘুমাইয়া সে এমন একটি দ্বন্দ্ব বেধিল দ্বারা হইতেই মনোবিকলন বেধা দিল। ফ্রেড্ কিছুদিনের মধ্যেই তাহার অবাধ্যতাবাহুসে পদ্ধতি এবং ইহার শিখনে বে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বর্তমান তাহার প্রস্তুত উন্নতি সাধন করিলেন। ইহার প্রয়োগ স্থানের ও দ্বন্দ্বকে জীবনের একটি অন্তঃসূচী ঘটনা বলিয়া মনে করিতেন এবং ইহাকে তবিত্ত জীবনের কোনো একটি বিশেষ ঘটনার ঘটনা বলিয়া মনে করিতেন। ফ্রেডের পূর্ব পর্বত মনোবিৎগণ মানব জীবনে যত্নের বে বিশেষ কোনো দৃষ্ট্য নাই তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাবপন ফ্রেডের কাছ

হইতেই প্রথম আদর। দ্বন্দ্ব সংবন্ধ মন্থন ব্যাধ্যা শুনিতে পাই। ফ্রেডই প্রথম যত্নের লাক্ষণিক (Symptomatic) ব্যাধ্যা আদরের কাছে উপস্থিত করেন। মনোবিৎগণের মতে মন্থন জীবন্ত অতুপপন কোনো মন্থরেই সম্পূর্ণরূপে ঘুমা না এবং কোনো মন্থরেই সম্পূর্ণরূপে আগ্রত থাকে না। আমরা বসন ঘুমাই তখনও আমাদের সংবিৎ শক্তি কিছুটা আগ্রত থাকে, আবার আমরা বসন আগ্রত থাকি, তখনও আমাদের সংবিৎের কিছুটা ঘুমাইয়া থাকে। মন্থনের অচেতন মনের অবস্থানিত কামনা বাসনাগুলি, দ্বারা আমাদের মনে আনিতে শাধন পায় না, তাহা কোনো কোনো মন্থর সংবিৎ শক্তির এক বিশেষ অর্থ আগ্রত অর্থ মন্থর অবস্থার চোবের মত আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বসনই সংবিৎ শক্তি সন্ধান হইয়া ওঠে তখনই অবস্থানিত অবস্থার অচেতন মনে বাইয়া ঠাই লয়। এই বে অর্থ আগ্রত এবং অর্থ মন্থর অবস্থার অবস্থানিত কামনা বাসনাগুলির সচেতন মনে চলিয়া আসা, ইহাকেই ফ্রেড্ দ্বন্দ্ব নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু কামনা বাসনাগুলি অনেক মন্থর সম্পূর্ণরূপে দ্বন্দ্ব লইয়া উপস্থিত হইতে শাধন পায় না। তাই নানা প্রকারের প্রতীকের (Symbol) ভিত্তি দ্বারা উহারা নিবেকের প্রকাশ করে। অনেক মন্থর অবস্থানিত বাসনাগুলি বিস্তৃত অবস্থার এবং অনেক মন্থর দ্বন্দ্ববেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। অবস্থানিত বাসনাগুলির সচেতন মনে স্থান পাইবার উত্তর বাসনা এবং মন্থরের শিক্ষা এবং মন্থর দ্বারা প্রভাবিত সচেতন মনের উদাহরণকে অবস্থানিত মনে ঠেসিয়া দিবার ঐকান্তিক চেষ্টা, ইহাওই বে মন্থর দ্বন্দ্বের সচেতন মনে অনেক মন্থর এত বেধা পেবিত হয় দ্বারা অনেক মন্থর দ্বাত্তাবিক সচেতন মনের সূচ শক্তির বাহিরে চলিয়া যায়। ইহার কলস্করণ মন্থর মন তাহার দ্বাত্তাবিক অবস্থা দ্বারা ইয়া বেলে।

উত্তির ও চেষ্টিত :- প্রাষ্ট এবং উত্তিরের চেষ্টিত ভিত্তি আমরা বে প্রস্তের বেধিতে পাই তাহা হইতেছে ইহাদের প্রাথমিক অবস্থা হইতে জীব অভিযোজিত (organic evolution) পথের বিস্তারিত দ্বন্দ্ব। আমরা অনেক সংবরণপ্রদে মন্থর এবং উত্তিরের সাক্ষ্য দ্বন্দ্ব প্রবন্ধ বেধিতে পাই। এই মন্থর প্রবন্ধ

উদ্ভিদের মাহুকেরই মত স্পন্দনশীল জংখিও, আনাদেরই মত আবেগবাহী নার্ভতন্ত্র আছে ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হয়। ইহাতে আবণ্ড চেষ্টা করা হয় যে উদ্ভিদের যে কোনো প্রাণীর মত কৃত্তিকার প্রায়শঃনিকের সম্পর্ক বৈজ্ঞানিক কীপিতে থাকে। এবং অনেক সময় শুকাইয়া নদিয়া যায়। এই সমস্ত প্রবন্ধ সাধারণতঃ আনাদের পরীক্ষণের বহুর প্রতিভাষিত অতিক্রিয়া (experiment) ক্রমিক অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়া থাকে। আনরা পূর্বে অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে জীবের চেতনের প্রধান তিনটি ভাগ, আদিম প্রোটোপ্লাজমের ভিতরেই বর্তমান ছিল। এবং যেহেতু জীবজগৎ এই আদিম প্রোটোপ্লাজম হইতেই ক্রমবিকাশের অনিবার্য ফলস্বরূপ সৃষ্টি হইয়াছে, সেইহেতু ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে উদ্ভিদের ভিতরেও এই জগৎবদী যে কোনো অবস্থায় হউক বর্তমান আছে উদ্ভিদের ভিতর যে উত্তেজিত (irritability) বর্তমান তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। এমন কি দু'একটি অতিক্রিয়ার উদ্ভিদের দেখে এ্যামিবার দেখের মত ধীরে ধীরে গতিতে আবেগ সঞ্চারিত হইবার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কোনো কোনো উদ্ভিদের ভিতর আবার গমনইলতার (movement) প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সময় বিশেষে পুষ্পের পাপড়ি উন্মূল করিয়া রাখা আবার কখনও বন্ধ করিয়া রাখা, পাতাগুলিকে আলোর দিকে ঘুরাইয়া রাখা প্রকৃতি উল্লেখযোগ্য। উদ্ভিদের দেহের আনন্দ যে সংকেতন বৈশিষ্ট্যে পাই তাহা বান্ধিক উপায়েই সম্পাদিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদের দেহের এই ক্ষমতির আধার হইতেছে ইহাদের তন্তুগুলি। এই বান্ধিক ক্ষমতার আধি হইতেছে, আদিম প্রোটোপ্লাজমের সংকেতন ক্ষমতা।

উদ্ভিদের দেহের এই তন্তুগুলিকে মেকানিক টিউব বলা হয়। প্রাণীদেহের তন্তুর সংকেতন ক্ষমতা এবং উদ্ভিদের দেহের তন্তুর সংকেতন ক্ষমতার আধি যদিও এক, তবুও ইহাদের মধ্যে প্রভেদ বর্তমান। এই বিভিন্নতার কারণ হইতেছে ক্রমবিকাশের পথের বিভিন্নতা। উদ্ভিদের দেহের এই সংকেতন ক্ষমতার উৎপত্তি কতগুলি সেলের সমষ্টি দ্বারা আর কিছুই নহে। এই বিশেষ সেল সমষ্টি শোষণ করিয়া ক্ষীণ এবং লব্ধ

হইবার ক্ষমতা রাখে। সেল পুঞ্জের এইরূপ ক্ষমতি হইতেই উদ্ভিদের দেহের সংকেতন দেখা যায়। উপরোক্ত বিবরণগুলিতে কেবলমাত্র উদ্ভিদের চেতনের সাথে আমাদের চেতনের মিল দেখা যায়। কিন্তু তাহাও এ্যামিবার সাথে এই সব বিষয়ে আনাদের ঘট্টা মিল উদ্ভিদের সাথেও আনাদের মিল সেইমাত্রা ছাড়াইয়া যায় নাই। কারণই যে সমস্ত লেখক আন্তর্জাতিক কিছু লিখিবার প্রস্তাবনে এই সামান্য সৌপাণ্ডুরকে কেনাইয়া এবং অতিরিক্ত করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন তাহাদের প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে অসঙ্গত কারণ বিজ্ঞানের কাজ সত্য বিশ্লেষণ করা সত্যের অপব্যাপ্য নহে। বৈজ্ঞানিক অতিক্রিয়ার প্রকাশ পাইয়াছে যে উদ্ভিদের ভিতর এ্যামিবার দেহের মত অতি তুল্যভাবে আবেগ সঞ্চারন হয়। এই সত্যকে যদি এই বলিয়া প্রকাশ করা হয়—উদ্ভিদেরও আনাদেরই মত আবেগবাহী নার্ভতন্ত্র আছে, তবে তাহা বিজ্ঞানের কতি ছাড়া উপকার একটুও করিবে না। আচার্য্য পরীক্ষণ বহুর আর একটি অতিক্রিয়ার প্রকাশ পাইয়াছে যে উদ্ভিৎকণ্ডের অন্তঃস্থ কলাব (intrastelar tissue) ভিতরে অতি ক্ষুদ্র ছন্দস স্পন্দন rhythmic pulsation বর্তমান এবং এই স্পন্দনের দ্বারাই উদ্ভিদের তাহাদের তুল্য দ্বারা যে রূপ আবেগ করে তাহা উদ্ভিদেই হইয়া উদ্ভিদের সমস্ত দেহে সঞ্চারিত হয়। কোনো কোনো উদ্ভিদেও উদ্ভিৎকণ্ডের অন্তঃস্থ কলাব এই ছন্দস স্পন্দনের কথা অস্বীকার করেন। যদি পরীক্ষাও লওয়া যায় যে বৃক্ষকণ্ডে এই স্পন্দন বর্তমান তবুও সেই স্পন্দনকে বাহ্যিকের দৃশ্যস্পন্দনের সহিত তুলনা করা কোনো প্রকারেই বৈজ্ঞানিক হইবে না। তাহাতে হয়ত অজ্ঞাত শক্তির বিস্তারক, মহিমার ধারী কীর্জন হইতে পারে, অথবা তাব প্রবণতার বোঝার যোগ্য হইতে পারে কিন্তু তাহাতে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রকাশ করা হইবে না। এলি বিভিন্ন অতিব্যক্তি বলিতে সাধারণত আমরা সৃষ্টি প্রাণী-জগতের ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে হইতে মানব মস্তিষ্কে চরম উৎকর্ষ লাভ করা। কিন্তু আনাদের মনে রাখিতে হইবে প্রাণীজগতের অতিব্যক্তির সাথে সাথে, সেই একই আণুবীক্ষণিক উৎপত্তি হইতে, বিভিন্ন পথ বহিয়া

সদৌৎপত্তির ক্রমবিকাশ হইতেছে। উদ্ভিদের জীব অভিযাজি এক প্রকারের সমুদ্র কেনার মত জীবন বিম্ব (life speck) হইতে আরম্ভ করিয়া শেওলা, মগ, কার্ন, চবল টেইল, বাস, পুশ প্রভৃতি গুণ অভিভূত করিয়া আধুনিক রূপে আদিয়া শেষ হইয়াছে। তাবপর ক্রমোন্নতির পথে অগ্রগত হইতে হইতে বৃক্ষের কাণ্ড, শল্ল এবং লোহা হইল। মূল, পত্র এবং কাণ্ডবালীর গঠন ঘটিলতর এবং অভিকর্তর কার্যকর হইতে আরম্ভ করিল এবং খাদ্য সংগ্রহের এবং বটনের মত পদ্ধতি গ্রহণ করিল। কিন্তু এই ক্রম-বিকাশের পথে উদ্ভিদের পেশী ও নার্ভতন্ত্রের কোনই উন্নতি হইতেছিল না। কিন্তু প্রাণিবিশ্বের ক্রম-বিকাশ আবার এই পথেই বিশেষভাবে প্রকটিত হইতে আরম্ভ করিল। আদিম প্রোটোপ্লাজমের যে সমস্ত গুণ ক্রমবিকাশের পথে উন্নতি লাভ করিতে করিতে এক নিম্নরকম অবস্থায় আদিয়া উপনীত হইয়াছে তাহাই উদ্ভিদ জীবনে আদিম অপ্রকটিত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত ক্ষমতার মধ্যে সংবেদন (Sensation), আবেগ পরিবহন (conduction of impulse) এবং প্রতিবেশের দ্ব্যন্তপ্রতিবাদের প্রতিক্রিয়া—সর্বপ্রধান। সম্ভবতঃ প্রকৃতির এমন এক বিশেষ আবেষ্টনীতে ইহার অভিযাজি আরম্ভ হয় বাহ্যতে ইহাদের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ঐ সমস্ত গুণবালীর সমুদায়নের প্রয়োজন হয় নাই।

এই ক্ষমতাই হয়ত ইহাদের অভিযাজি প্রাণিবিশ্বের অভিযাজির পথ হইতে বহুলাংশে পৃথক। উদ্ভিদ জগতের সক্রিয়তার লক্ষণ বিনিশ্চারক বিচলন মত। তাহা হইতেছে উদ্ভিদবিশেষ বিনিশ্চারক বৃদ্ধি (discriminating growth)। ইহারা ইহাদের পাতা সূর্য্যের দিকে ফুলিয়া ধরে এবং মূল মাটির ভিতর প্রবেশ করাইয়া খাদ্য সংগ্রহ করে। এই দিক দিয়া উদ্ভিদের সহিত আমাদের চেষ্টিতর বহুলাংশে মিল দেখা যায়। একটি ক্ষুদ্র পোক যে ক্ষপ চলিতে চলিতে উহার পথের মধ্যে কোনো বাধা বিদ্য দেখিলে, সতিপরিবর্তন করিয়া ভিন্ন পথে চলিতে আরম্ভ করে। উদ্ভিদও সেইরূপ উহার বৃদ্ধির পথে চলিতে চলিতে কোনো বাধার সম্মুখীন হইলে মূলপ্রাণের গতি পরিবর্তন করিয়া দেয়। এই সময়ে বাধার অভ্যন্তরীণ চলিত

(speeded up film) দেখিয়াছেন তাহাদের বিধগতি বৃদ্ধিতে পূর্ব মতক হইল। একটি চলচ্চিত্র নিম্নলিখিত ভাবে তোলা হইয়াছে—জ্যাস্টারটিয়াস নামক একপ্রকার উদ্ভিদের মূলপ্রাণের স্তব্ধকাল আলোকচিত্র ১০ মিনিট পর পর তোলা হইল। এই ছবিগুলিকে ক্রমান্বয়ে ছোড়্য লাগান হইল। এই ছোড়্য লাগান ছবিগুলির চলচ্চিত্র গ্রহণ করিয়া তাহা স্বাভাবিক চলচ্চিত্র দেখাইবার সময় যে সতিতে (প্রতি সেকণ্ডে ১০টি ছবি) দেখান হয়, সেই সতিতে একটি পংখ্যের উপর প্রতিফলিত করান হইল। এইভাবে উদ্ভিদটির মূলপ্রাণের গতি চলচ্চিত্রে তের হাজার গুণ বাড়াইয়া দেওয়া হইল। এইবার আবার যখন চলচ্চিত্রটি দেখিলাম তখন মনে হইল যেন একটি উই পোকা বাধাবির এড়াইয়া একবার একটু বায়ে একবার একটু ডাইনে যাকিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে মনস স্থানের মত। প্রাণিবিশ্বের অভিযাজির প্রধান লক্ষণ হইতেছে সন্ধানী বিচলন (Directional movement) এবং ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই প্রাণিবিশ্বের জীব অভিযাজি হইয়াছে। তাই আজ আমাদের ভিতর এত ঘটিল প্রতি-বেদনশীল নার্ভতন্ত্র দেখিতে পাই। অতরিকে উদ্ভিদ জগতের অভিযাজির প্রধান লক্ষণ হইতেছে সন্ধানী বৃদ্ধি (directional growth) ও তাহার অনুরূপ জীব অভিযাজি। প্রাণিবিশ্বের ইহার পেশীসমূহ, নার্ভতন্ত্র এবং মস্তিষ্ক দ্বারা বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ হইলেও তাহাদের সক্রিয়তা সম্পূর্ণরূপেই উদ্ভিদ জগতের মতই বাহিরের প্রভাব দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে।

পতঙ্গ ও অজ্ঞাত অমরকণ্ড প্রাণীর চেষ্টিত :—
মায়ালিয়া প্রজাতির দ্বীপ স্থানে অধীষ্ট মানব এবং বিংটি পতঙ্গ সমাজ তাহার দাঁড়ি, পিঙ্গলিকা এবং উই পোকা হইতেছে এই সমাজের প্রকৃতির দ্বীপের এবং সর্বপ্রাণী নিদর্শন। এই দুই অপসৃত (divergent) প্রজাতির বিভিন্নতা, ইহাদের শরীর বৃত্তীয় এবং শরীরের বাসস্থানের মাত্রিক বিভিন্নতা হইতেছে ইহাদের সমাজ প্রকৃতির মাত্রিক বিভিন্নতার কারণ। পতঙ্গ সমাজের বিশেষ প্রকারের শরীর বৃত্ত এবং বায়বিক মাত্রার পরিমাণ ইহাদের শরীর হইতে প্রচুর পরিমাণে কাইটিন (chitin) বাহির করিয়া

তাহাদের শরীরে উপরের শক্ত আবরণ তৈরী করিয়া
করিয়া দেয়—অপর দিকে মেসোবস্ত্রী প্রাণীহিণের শরীরে বৃত্ত
এবং শরীরের বাহ্যিক নিকের পরিমাণের বিশিষ্টতা হইতেছে
তাৎকালিক কলাভঙ্গির (tissue) কারণ এমন পরি-
মাণের এবং এমন প্রকারের হইয়া থাকে যাহা যাহা
তাহাদের শরীরের অঙ্গ এবং কোমলাঙ্গি (cartilage)
গড়িয়া উঠে। এই অঙ্গি এবং কোমলাঙ্গি গড়িয়া যাহাই
আমাদের শরীরের কাঠান তৈরী হয়, তাহার উপর
মাংসল বেষণ গড়িয়া ওঠে। এই ছুইটি প্রজাতির ভিতর
আরও অনেক প্রকারের বর্তমান কিন্তু কেবলমাত্র অপর
একটি বিশিষ্টতা আমাদের জন্য এই স্থানে প্রয়োজন—
সে হইতেছে এই স্থল মেসোবস্ত্রী প্রাণীহুল স্তন্যপূর্ণ
যাহা বাতাস গ্রহণ করিয়া থাকে। অপর দিকে পতঙ্গ
শ্রেণী বায়ুনল (air tube) যাহা বাতাস গ্রহণ করে।
ছুই শ্রেণীর ভিতর এই বিশিষ্টতার অন্তর্ভুক্তি ম্যামেলিয়ার
শরীর বৃত্ত হইয়াছে এবং পতঙ্গ শ্রেণীর দেহ এত ক্ষুদ্র
হইয়াছে। পতঙ্গ শ্রেণীর দেহের এই ক্ষুদ্রতার অন্তর্ভুক্তি
উহাদের মস্তিষ্ক এত অল্প সংখ্যক সেল যাহা গঠিত
হয়। আবার মস্তিষ্কের এই ক্ষুদ্রতাই উহাঙ্গিহণের মস্তিষ্ক
অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তি পঠন করিতে সাহায্য
করিতেছে না। এই অন্তর্ভুক্তি আমাদের মস্তিষ্কের মত
উহাদের মস্তিষ্কে বিভিন্ন কার্যকারিতা লইয়া বিভিন্ন অংশ
গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। অপরদিকে মেসোবস্ত্রী প্রাণী
স্বল্প এমন মাংস গড়িয়া উঠিল তাহাতে উহাদের মস্তিষ্ক
বেশ বৃদ্ধ হইয়া গড়িয়া উঠিতে সমর্থ হইল এবং উহাদের
মস্তিষ্কের পরিমাণ নিম্ন জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা
লাভ করিয়া জীবন তাহা চেষ্টিত গড়িয়া উঠিতে সমর্থ
করিয়া ফুলিল। অপরদিকে পতঙ্গ শ্রেণীর চেষ্টিতর
কোনো বকম পরিবর্তন সম্পূর্ণ ভ্রূপেই উহাঙ্গিহণের জার্ম-
প্রাণবৎ অতি নম্র পরিবর্তনের উপর নির্ভর করিল।
প্রায় সমস্ত মেসোবস্ত্রী প্রাণী পতঙ্গ শ্রেণী হইতে অনেক
সহস্র ভাগ বৃদ্ধ। মেসোবস্ত্রী প্রাণীর দেহের ইচ্ছাকৃত অন্ত
ইহাঙ্গিহণের শরীর সম্পূর্ণরূপে বর্ধিত হইতে অনেক সময়
প্রয়োজন হয়। কাজে কাজেই উহারা বেশী সময় ব্যাতিয়া
থাকে এবং এই বেশী সময় ব্যাতিয়া থাকার অন্ত নিম্নের

জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ প্রায়
প্রায়। অপর দিকে পতঙ্গ শ্রেণীর দেহের ক্ষুদ্রতা এবং
জীবনের সময়ের অল্পতা উহাঙ্গিহণকে জীবনের অভিজ্ঞতা
হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া কাজে লাগাইতে মোটেই
সাহায্য করেন। পতঙ্গ শ্রেণীর এবং মেসোবস্ত্রীহিণের মধ্যে
এই প্রভেদের অন্তর্ভুক্তি এই ছুই শ্রেণীর মানসিক জীবন
বিভিন্ন পথে গড়িয়া উঠিল। তাই কাইটিন (chitin)
যাহা তৈরী ঘেঁষাবড় এবং বায়ুনল স্থল পতঙ্গ শ্রেণীর
মানসিক জীবন সহায় প্রায়ভিতে সীমাবদ্ধ। অপরদিকে
মেসোবস্ত্রী প্রাণী বৃহৎ দেহ, দীর্ঘ জীবন, স্থলস্থল, শৈথিল্য
এবং ন্যূনতর স্থল হইয়া নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা যাহা
বুদ্ধিবৃত্তি গড়িয়া ফুলিল। মনুষ্য প্রজাতির সহায় প্রায়ভি
প্রায় নাই বলিলেই চলে। আমরা যখন আমাদের সহায়
প্রায়ভির কথা বলি তখন আমরা ভুল করিয়া অভ্যাস অথবা
সহায়তর (instinct) কথাই বলি। অথচ এই সহায়ত
অথবা অভ্যাস ছুটিই মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের
অভিজ্ঞতা যাহা অর্জিত প্রাপ্তি। আমরা উন্নততর কোনো
পতঙ্গের শু কোনো মানস জীবনের কথা ভাবিতে পারি
না। একটি পতঙ্গের জীবন আলোচনা করিলে আমরা
দেখিতে পাই উহারা কিন্তু একটি ক্ষুদ্র যন্ত্রের মত নির্দিষ্ট
প্রতিবেশে প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিতেছে এবং নির্মূল
ভাবে নিজের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট রাখিয়া কাজ করিয়া
বাইতেছে। অথচ নির্দিষ্ট প্রতিবেশের একটু ব্যতিরেকে চলিয়া
যেলেই কিন্তু সমস্ত ওলট পালট হইয়া বাইতেছে।
আমরা দেখিতে পাইতেছি অসংখ্য ব্রহ্মের পতঙ্গ তাহাদের
সহায় প্রায়ভি লক্ষ যন্ত্র না পাইলে কিন্তু তাহা না বাইয়া
শুকাইয়া মরিয়া বাইতেছে অথচ উহাদের পার্শ্বেই যন্ত্র
উহাদের জীবনের পক্ষে পরম উপকারী যন্ত্র রাখিয়া
গিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই এক প্রকারের বোলতা
ডিম পাড়িবার সময় পাইলে, কেবলমাত্র নির্দিষ্ট এক
প্রকারের উর্বনাত দেখিলেই তাহাকে আক্রমণ করিবে এবং
নির্দিষ্ট প্রকারে নির্দিষ্ট স্থানে বসেন করিয়া উর্বনাতটিকে
অসাড় করিয়া একটি ডিমের সহিত উহাকে একপ্রকার
লালাযাওয়া খেঁটন করিয়া কেনিবে।

বৃষ্টি এলো

কৰ্ণধৰ্মা

ভিজল সলিল, সাধা বেহ বিয়ে ভিজল।

তরা বর্ষার নবীন কনশ্চিতি যেমন কামল মেঘের নীল মেঘের বুঁধ হয়ে ভেঙ্গে, মুক্ত হতে চায় না বর্ষপুষ্পের আকাশের আলিঙ্গন থেকে নিখির আশ্রয়ে পালিয়ে, টিক তেমনি পথ ঘাটীতে অবিস্রাজ্ঞ বৃষ্টি উপেক্ষা করে দিল হতে লাগল। দীর্ঘ চুল বেয়ে অক্লান্ত ধাবার বল পড়ে ধারান্নান চলছিল অনেকক্ষণ থেকে, পান্নাঝী গায়ের সংসে পেটে পাকবের হাড়গুলির তাঁল পর্বত দেখা যাচ্ছে, বৃষ্টি-খানার কোথাও শুক ছিল কিনা সন্দেহ, অন্তর্ধানেরও সেই ধশ। তবু নড়লনা, পাড়িয়ে রইল তিজুকের মত একমুঠে চেয়ে, শান্ত অকশিত আশ্রয়।

কোণের বড় বাড়ী শম্ভুধনিত মন্ত্রিত, আবাহনে নয় স্তত বিহারে। বেবাক মোড়া বাড়ীর সামনে হুঁশানা মোটর ঠাড়িয়ে, অহরাধা চলে যাচ্ছে। বেশ বেথোলে, রক্তাখর বেনারসীতে ঝিকঝিকি ছরির কাছে আর কপোলের পজ্জেশ্বর; মাথা নত, নির্ধমৌরখানা উজ্জল হয়ে রয়েছে দীরকের বর্ণালি সমারোহে। সলিল জানে ওর আধা অবগুঠনের অন্তরালে মিটি সুখানিতে দলজ্ঞ হানির বেশ। না, সলিলের ভক্ত নয়, হমানাথ বা অপর কারো ভক্তই নয়, পানের ঐ ব্যাক্ত্রাশ চুল হুজী লোকটিকে কেন্দ্র করে, ও ভাব্যবান। আশ্র মনে হচ্ছেনা অহরাধা স্থল হাড়ার পর ৩৫ বছর কলেজে কাটিয়েছে, বছর দুই পড়িয়েছে—বহুগুণে সন্দোহ-অনভিজ্ঞা বাড়েনি, হুর্বে পানে চেয়ে সন্ত-মুখ-ভাড়া কমলকলি। ওদের বাড়ী বাবাখার পানে হেলিং বেরা হালান বেরা যায়, যেখণ্ডে সলিল এক বণ্টা থবে, একবার বিশ্রাম করেনি ভিতরে যায়নি, বিহারের প্রতিটি অমুঠানে সে অনাবৃত সাক্ষ্য। যেখেছে সারাক্ষণ কেমন করে প্রাপপ্রাচুর্ঘ্যর শূন্যর নবনারীর মিলন মেঘপ্রমে প্রপাশিত হতে চলেছে। ওরা নীড় বাধবে। আহুদিক দরত তৈরীই আছে,

সম্মিলিত জীবনের প্রতীক্ষা কেবল। ফ্রাট ভাড়া নেবে ওপর তলার সার রাস্তায়, যে রাস্তায় হাত নিয়ন সাইটেব হীপ্তিতে নীল্যত হয়ে। বিস্তার করে আকাশের বাসর আসে, ধবিন আনন্দের বর্ডিন শাদি সরিরে দিয়ে হস্তি সমুজের আতঙ্ক সমীর ভীক্স পথক্ষেপে প্রবেশ করে অহরাধার পোশালী চুলগুলো কেবলি উড়িয়ে এনে যেসে কোদল আননে। সামনে টেবলে রজনীগন্ধা ওজ। ভালবাসে অহরাধা। ওদের ছোট বাগানের সামনে দিয়ে বাওয়া-আসার সময় কতদিন মূহু হুবাশ বুকভরে নিরেছিল নিখালে, চেনে সলিল রজনীগন্ধা। কিন্তু পাবে কোথায় ওরা রজনীগন্ধা ফ্রাট-বাড়ীতে! না, অহরাধা ও-বাড়ীতে থাকতে পারবে না। লজার কেয়ারি করা ছোট বাগান না-হলে থাকার অসম্ভব। বিকেলে লনে বেড়াবে না, সন্ধ্যায় বেড়া হুঁই সন্ধ্যাক চরন করে পড়বার টেবিলে রাখবে না! একই বাগান না হলে ওকে ঘানায় না, ছটাং শবে সোহার পেট ফুলে যেহিরে না এলে সে অহরাধাই নয়, মদ্যগত অভ্যাস ত্যাস করলে অহরাধার অহরিত হবে, তীব্র কষ্ট হবে—দে পারবে না। হ্যাঁ, সহৎলীর নিম্নমে, অবিজ্ঞিত কোলাহলমুখর গভী ছাড়িয়ে বলা নেওয়ারই প্রশস্ত, মরীর ধার হলে আরও ভাল, বেড়িয়ে বেড়াবে ভিলে মাটিতে পা কেলে কেলে, যেমন বেখেছে ওকের বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ছোট ভাইটির সংগে মাথা দুসিরে গল্প করত। তবে মরীর ধারে বেড়াবে কার সংগে, নৌঁকার শুভত ইচ্ছে হবে নিচর, গাঁতার না জানলে চড়া বিপক্ষমত, বোসেবের বাড়ীর ছুটনা মনে হলে গারে কাঁটা দিয়ে ওটে। তবে সলিল থাকতে আর তার কি।

উলু-উলু-উলু উলুধনি আর শাঁখের শব্দ সামনে পান্না দিতে লাগল। রুটর বেগ বেশ কয়ে গেছে, ছোট আর নেই, টুপটাপ এক আধ ঠোটা পড়ছে মাঝে মাঝে। গাঁটছড়া বাধা হয়ে নাহে নববশ্চিতি, শিছনে অহরাধা

ওর সামনে হুতী হুবকট। দুজনের গলায় মালা হুলছে
হুলগুলি হাসছে যেন, এত শুভ হুল। অহুবাধ মনে মনে
নিশ্চয় খুশি, সবাই মুখই হাসি হাসি দেখছে সলিল, দেখতে
পাচ্ছে। কি আশ্চর্য মেয়ে চলে যাচ্ছে। ওহেব চক্ষে
দুঃখ নেই, অহুবাধার মতো যোগে। এই তো গাড়ীতে
উঠল, বোনারসীখানা ভাঙী, সামলাতে পারছে না, কেমন
অবস্থি হতে লাগল সলিলের, এঃ ঘামাটা একেবারে ভিজে
সপু সপু করছে। টেনে খুলে ফেলল। নঃ, সাপা গিলনের
সাড়ীই শুকে মানার ভাল। ও কাঁছে নাকি, বদনীৰ ভাঙ্গা
ভাঙ্গা মুখখানি একবারে দেখাও গেল না! কেন কাঁধে!
ও কি জানে রামগিহির বিরহী হাক্কর আকুল অকাজ্জা
বক্ষে নিয়ে পথের এপারে ডায়নও মেনের অজ্যাত অনতি-
জাত এক তরুণের রম্যস্তিক অবস্থা। তা কি কঃ হবে,
কি আবেগ-তাবেগ ভাবঃ, নিজের প্রতি ভাগ হয়।
অবুধ্য ছ'খানা স্বকমকে মোটাও সরবে সকলকে সচকিত
করে বেবিয় পেল, সলিল ধাক্কায় থাকে পথের পানে চেয়ে,
সন্ধ্যার অন্ধকারে ভিজে পথে পড়েছে হুশ্শট চাকার বাগ,
দেখা যায় না।

দীত দীত করতে লাগল। ট্রিক বুঝতে পারছে না
সক্তি ঠাটা লাগছে না নিহরণ, অনেক সময় দুটোই এক
মনে হয়। যেহি প্রথম বেথে ওকে, অহুবাধাকে,—না খুব
ভাল লাগেনি। আরও পরে একদিন, হন হন করে আসতে
সাহায্যে বড় বাড়ীটার বাক ফিরেছে, বাজা লাগে আর কি,
ত্রস্তপথে সরে গিয়েছিল সলিল হাতে বই তরুণীর ত্রুটি
পরিহার করতে বলে, বয়ত শুভবে চাপা। গগার 'আহাশক'
'চোখে কম দেখে' কিন্তু সেসব কিছুই না। তাকিয়েছিল
পিছন কিয়ে—একটি মিঠি মুখে স্থিত হাসির বেশ। হুঙ্ক
না হয়ে পাবে নি, কেউ পাবে না, ও অবস্থায় স্থান কালের
জ্ঞান থাকেনা। অবস্থা বিবরণ হয়ে যায়—যেখ কি
সলিলের। হাসি এত নুর হয়, অন্যভাবে তরুণী হুহরের
সন্মানবিত সৌন্দর্য। বাগা ছিল না ওর, নাম-না-জানা
একটা তীব্র অল্পভূতির শিহরণ সাধা শরীরে, অভিজ্ঞত
হয়ে পড়েছিল। হুটে উঠল বিহ্বল জীবনের রক্তবাপ অপারক
অন্তরে অবধা আলোড়ন সৃষ্টি করে। বয়ত হাতে এই যুগ-
মহির চোখেই চেয়েছিল রূপসী বিয়েজিকেকে, নিঃসত্য

বেধনা ভুলে। মাঝে মাঝে ধাক্কা হাখে বিয়েজিকের
চলার পথে, সলিল বাবাখায়। চেনা মেয়ে যে, নাই বা
থাকল আলাপ। আলাপ মানে হুহের আলাপ, সমাধ ও
বিস্তেব বেসাতি। ওর তা নেই, কিছুই নেই, কি পরিচয়ে
অভিহিত করবে নিজেকে, তরুণের বেকার—শিকিত
অশিকিতের কথা পরে। সে অস্বীকার সন্ধ্যার সমাধ সুযোগের
সম্মত্বহার করে নি, বাধা ওর অস্বপ্নত সঞ্চিত, কিছু না-
থাকার লজ্জা। অথচ মেয়েই রমানাধ অন্যায়সে মিশতে
পেরেছে ওহেব বাড়ীর সংগে, হাউসটন কোম্পানীর
মালবাহু রমানাধ।

জানলেন সলিলবাহু, কাল ভোরে যাচ্ছি আমরা বন-
তোষনে।

অফিসের কাছের চাপে নিবাস নেবার হুহরণ নেই
বলছিলেন না, সেদিনের কথা বলে সলিল।

ছুটি পাওয়া মুশ্কিল, আবার অহুবাধা নিয়ে অহুবাধা
করেছে, উপেক্ষা করি কি করে?

জিজ্ঞাসিত করতে থাকে সলিলের হুকের ভিতর।
আপনার ছোট সাহেব খেলমালা করবে না?

ভেলেছাটা তো কাঁই হয়েই আছে কিন্তু জীবনের
দুর্গত সুযোগ হেলায় হারাণ।

তা বিলম্ব জানে সলিল, নিজের অক্ষমতার সে বহি
না অবহেলা করতো তা-হলে কি আর মোটা রমানাধ
আসব অনিন্দে বসতো!

নতুন পরম্প্রাতি হয়েছিল আপনাব, উপবেশের বেশ কটে
এনে ভাণে শোকাটা নিরুত হবে কি?

কাছের লোকের আবার ভগ্নটা ফিলের মশায়, সব
হকম কাছ জানি, কিছু না হয় দালালি করলেও মালে
২৫-৩০-০০টা আনার মারে কে?

নানা কলি ফিকিরের কিত্রিতি শুনে শুনে অন্তত ওর
অর্থ উপার্জনের স্বমতায় নিঃশব্দে।

যেপ কেটেছিল রমানাধের দুর্গত হুহুওগুলি, ওর উজ্জ্বলে
জার আভাস। বিনোদা কম্পানী বিহুখ। সলিল হুতিকাঠা
শুভতে শুভতে আকাশ-কুসুম বচনা করেছিল শুখ। আরও
অনেকবার শুভ অবলর এসেছে, জাম্মিত হারেছে রমানাধ
সিনেমার অভিনয়ে উৎসব আপ্যায়নে, সলিলকে সবিভারে

ব্যাখ্য করিতে। ক্রীম বস্ত্রের বেরনের হাওড়াইয়ান পবে
 বেল্লেশেই বোঝা যেত রমানাথের পত্তব্যবহুল। অল্প রমানাথ
 বলেই তা পারতো। অস্ত্র কেউ কি পারে। বাজার থেকে
 এক বুদ্ধি 'হিন্দুসংঘ' আর আনান্দ কিনে নিয়ে দিয়ে
 বলতো বেশ পেকে এলো। সলিলের কোন উত্থান
 সাধেব নেই—বেমানাম হার নামে পল্লবচিহ্নের চূর্ণ
 সোহাগ পেটওয়ারা লাল বাড়ীতে গিয়ে উঠবে। বিনিময়ে
 গর লাভের অস্ত্র কি কনা হয়েছিল সলিল সে খবর রাখেনি,
 তবু ঐ মিষ্টি হাসির সান্নিধ্য তো পেত, তাই বা কম কি।
 সেই স্বপ্নীয় সত্যার রমণীয় সান্নিধ্য এখনো ভরে আছে
 তখন, নিতৃত নিখাদে নিশে থাকে পুষ্পদাহের বৃহৎ
 সুরতি। কিন্তু মুহুর্তেও থাকে ডাটবিদের পচা পঙ্ক,
 কুম্বণ্ড হর কীটময়। যেদিন বাটনখালের বস্ত্র-
 গোলাপের মতই মুখে উল্লাসের পরিমা মেখে রমানাথ
 বললে—অহুহাথার উপহার। পরিয়ে দিয়েছে কিনা
 বলেনি। একটি নীরব স্বীকৃতি বাবির হয়ে এসেছিল
 অস্ত্র থেকে, অথবা যেখনি, অথবা বিস্তে পারেনি। ব্রিটিশ
 কেটেছিল অস্বাভাবিক অস্বস্তিতে, উঠে পাইচারি করে
 বেড়িয়েছে, সকাল থেকে বাতান্দার বেড়িয়ে প্রতীক্ষা করেছে
 অহুহাথার অর্থাৎ বাড়ী থেকে বাসে চক্রার স্থান অবধি ওকে
 দেখার। তারপর আশঙ্ক হয়েছিল—এ মেয়ে কুল বিস্তে
 পারেনা, রমানাথকে তো নই।

সোম্য চুকেছিল গর ঘরে, এ অদন্তব।

বিস্তৃত রমানাথের বৃষ্টিতে অহুহাথার বয়েছিল কিছু,
 কিছু না বলে চলে আগন্তেও পা বাড়িয়েছিল। সলিলবাবু
 তখন, আপনাদের সঙ্গে একটু গোপনীয় পরামর্শ আছে।

বসন্তে হর অদন্ত্য।

একটু বৃষ্টি বিন না, বিধান মাহুৎ আপনাতা।

আন্তে আন্তে ও উত্তর বিল, বহু।

কাছে বেসে এসেছে রমানাথ, অহুহাথার অমাগ
 ভালবাসে, বিনা কৃতিকার বলে।

জয়নিক জোরে হাসি পায় সলিলের, হেসেও ফলে
 অন্ন। পিতার মৃত্যুর পর বসন্তে সেই প্রথম। ক্ষুদ্র হয়
 রমানাথ। তৃতীয় ব্যক্তির কাছে তরুণ তরুণীর প্রেম সব
 সময়ই ছেলেমানুষী হাস্যাত্মক, মুখ ভার করে বলে।

বেশত, বিয়ে করে কেন্দ্র না, আপনাদের আপত্তি নিশ্চয়
 নেই।

যে যে, সহরে একথানা বাড়ী সে পর্যন্ত না তুলতি,
 অহুহাথাকে বাসা বাড়ীতে তো আনা যায় না।

‘আনা যায় না’ সলিলের বিমত নেই, অহুহাথার বিয়ে
 করবে এই গবেষ্টাৎকে, কিছু পরমা করছেতো হাত
 বাড়িয়ে আকাশের চাঁদ চাইছে।

মানে আপনি আপাততঃ কিছু করতে চান এই তো ?
 আচ্ছা ভেবে বলব, শেখ না করে উঠে পড়ে সলিল।

লোকটা একেবারে পাগল, তাগে রমানাথ, পড়ে পড়ে
 মাথা ঘুলিয়ে গেছে।

মাথা ঘুলোবার আর কোথ কি, কিছুতে কিছু করে
 উঠতে পারছেন। সংসারে মাহুৎগুলো যেম বৎ পণ
 প্রতিশ্রুতির দেবেছে, বস আক্রোশ বেচারা সলিলের
 ওপর। জিয়নাথ কাকার ছোট চিঠিটা উঠে পাগে
 যেছিল—কিছু আশা যদি মেলে। না, পরিবার যত্নে
 তিনি দুঃখিত, সলিলের ডিভিদনটা ভাল নয়, ওখানে
 করেকখন ফার্ট’ ক্লাস থাকায় তাগের উপেক্ষা করার উপায়
 নেই। সর্বস্থানেই ফার্ট’ ক্লাস, এত ছেলে প্রথম শ্রেণীতে
 উত্তীর্ণ হয়, সলিল চিন্তা করে, আচ্ছা, তাহলে অহুহাথার
 কোথায়। সকলে কি তার নত বেকার নিরাশ্রয় ? পাশের
 ঘরে রমানাথ তো কোন শ্রেণীর তোরগাই রাখেনা, ওতো
 আছে বেশ, এই-ই বা হয় কেনন করে! অহুহাথার কোন
 ক্লাস কে জানে, রমানাথ খবর রেবেছে নিশ্চয়। দুনিয়ার
 খবর ওর কাছে। আচ্ছা, হঠাৎ মনে হয় সলিলের,
 রমানাথকে বলে দেখলে হয় না, ওদের অধিনে—না, বড়
 অবাস্তব কথা বলে, স্রষ্টাভাবে কাছ অদন্তব, ঢাক পেটাবে
 শুধু। অহুহাথার সংগে বনিমিত্য করে বেশ। সন্তি
 হয়তো নয় ওর সব কথা, এক আশংকার হোসে কথা বলেছে
 তো গলে গেছে লোকটা। অহুহাথার, অহুহাথার, তারি
 মিষ্টি নাম। মধু ছেলে দিয়েছে যেন। শুভ্রহর লম্বলত,
 আকাশ-নীল দিগন্ত সাজী এমন চন্দ্রকান্ত মনোর!
 আইনপরিষদের একজনকে প্রায়ই আগন্তে দেখে, রমানাথ
 বলছিল মামা হন, আচ্ছা তাঁকে বললে হয় না!

চলে গেল অহুহাথার। কল্পনাপোত গড়ে তুলেছিল

সলিল, আঙ্গ ভূমিমাং। রমানাথ কিছুদিন আগে থেকেই অগ্রিমভাণে আরম্ভ করেছিল, বোধহয় বিবাহের সম্ভাবনায়। মাফোবেগিদের ধবং-খাটপই আসাধা সলিলবাসু, আমার আপনায় হৃদিশ পাওয়া তার।

কার কথা বলছেন? বুঝতে না পেয়ে জিজ্ঞাস করে।
বিশেষ বিরক্তি মুখে এনে বলে, কার আবার, লাল বাড়ী মশায়, আপনায় অহুবাধা।

যতদূর সম্ভব সমাহুত্বের স্বরে বলে, বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে শুনলাম।

আরে ছোট ছোট ও আবার বিয়ে, নীলাম নীলাম।
এরাই হিন্দু সমাজটাকে দশাতলে ফেলে।
মনে পড়ায় ঈষৎ হাসে সলিল, রমানাথটার মাথা ধরাপ।

শীত শীত করছে, আরে, দুটিটা একবারে ভিয়ে।
অহুবাধা অহুবাধা,—আবরণহীন বাগিন্দে মাথা গৌড়ে,
স্বতির বোম্বন্ধন চলছে।

অহুবাধা বিশেষ করে কারো হয়ে বাবে ভাবতে পারা যায় না, বৌবনের দাতন্য দিয়ে গড়া চিরন্তন নাগী।

বৌদ্ধমুগ থেকে চলে আসছে এরা, গোপা মায়া। মাধবী উপাসী অহুবাধা। কোন দেশের রাজ প্রাসাদের প্রবাল-কুঠীম ওর নুহুরে বিনিবিধিতে স্নানিত হত কে জানে। জাবন্তী কাশী তক্ষশীলা মালম্বা পৌত্তুর্ধন, কোথাকার রাজকন্যা ছিল, হরত নুহুর অহুবাধাপুত্র, নিশ্চরই অহুবাধাপুত্রের মহাবিধাবে আলোর নিরেছিল তথাগতের চরণে। প্রভুগ্যা গ্রহণ করবে কেন, কিসের ছুৎ ওর, সংমিত্রা এসেছিলেন কি অহুবাধাপুত্র-রাজের আশ্রয়কাননে অথবা তরুণ মহেশ্বরের হীপার্ক-বাগে...না না তাই কখনো হয়! অসম্ভব কি? হরত সগিদই যথেষ্ট। না, তা নয়। অস্ত্র কেউ, অস্ত্র কেউ। রাজপ্রাসাদের বৈভবে নিশ্চিন্ত মুখে থাকে আশান করা যায় না, দুর্লি-দুসর পথে নেমে তাকে সমর্পণ করতে হয় তদ্রূপ। তাই করেছিল অহুবাধা, পথের দুয়ার পড়েছিল ওর কেদুর হুতুল বলর মণিহাট, আর নুহুর ছাড়া ওকে নানায় না।

কিন্তু কোন ধ্যানমগ্ন ভ্রমণকে, আনন্দলোকের অধিবাসী কোন আনন্দের জয়মন্ডিতে অতিসার, রাজকুমারী

অহুবাধার অপেক্ষাট আশ্রয়বিবেকন, অহুহেলার উপেক্ষা করেছিল কোন বুদ্ধশিত্র! অর্থা অহুহর অশ্রুজল কিছুই সম্বলচ্যুত করতে সক্ষম হয়নি। টেনেই সক্ষম শরণে গচ্ছাশি পণ।

কত্থায়েহে আশ্রয় বিবেছিলেন বিবাহের মহাহুতির অহুবাধাকে, রাজপ্রাসাদের বিশাল প্রাচীরের মধ্যে লাগিত যেরঙ সে নাগী বৈজ্ঞান্য স্বীকার করে আশাসনাধ্য অহু-শাসন—ক নে! আবহক আকাঙ্ক্ষার বেথেছিল ধ্যান গভীর বুকের প্রশান্ত মুখস্থবি হুচরিতা মুখাত, বার বার পৃথিবীতে আগতে হঠেছে কর্ককল খণ্ডনে। শেষ হয়ে এলো মাটির মলিন তৃকা, সংস্কার বেদনার মরণশীল আকর্ষণ টেনে এনেছে বার বার—তাও শেষ হয়ে এলো।

শেষ হয়ে এলো শাসিত বুকের নিশাশ্রুতি বাহার উপগন্যে, কিরে ঢলেছে ভিক্ষুণী অহুবাধা। যেথা হয়েছিল নিশ্চর মহাবিধাবের নিভৃত অনিলে, তরুণ ভ্রমণ মহাহুতির কাছে ভাবচক্রের পাঠ সাজ করে ফিরছিল। পুষ্কারিণীর পানে চেয়ে হু হু হাসল।

ভগবানের দুহর স্মৃতি কি অধকাল ভিক্ষুণীরে করতলগত, সহস্র বসিকতা করলে শিকারী।

আর কতদিন আশ্রয় অপেক্ষা করতে হবে সলিলবহু, পুঁথির ভারে নিশ্লেষণ করবে কত দিন?

স্বাম্যজ্ঞতহীন উত্তর শুনে নয়, ওর চোখে অক্ষ বেথে বিব্রত হয় সলিলবহু।

বলেছি তো অহুবাধা, সলোয় বর্ষ করতে সম্যাস গ্রহণ করিনি।

কিন্তু কেন? সম্যাসের সময় তো চিরকাল থাকবে। থাকবে না কেবল আমায়ের ছবর অহুবাধা।

তুমি কি বলছো ভিক্ষুণী, নিভৃত আশাপের তাগা মহাহুতির কানে পৌঁছে যেবার লোক আছে জান?

বাশ্যাপ্রুত কর্তৃ শোনা যায় অহুবাধার, আমি গ্রাহ্য করি না সুভিতমন্তক, জ্বর কাশা—

শোনা যায় না শেষটা নিষ্ঠুর একটি অটহাদিতে, আবার গোপন অভিযার।

মনমন শেষে অর্ধাপাত পকপ্রদীপ হতচ্যুত হয়েছে, কালো কালো ছায়া এগিয়ে আসছে না। কি চায়? মহা-

দ্বিবিয়ের নিকট উপস্থিত করতে চায়, প্রতিযোগিতার পূর্ণতা। টানছে কেন, পীড়ন করছে অহুতাকে। মনোমুগ্ধতার আনন্দ মিলি, কিছু শোনা যায় না। কে এ দুর্জন, এবে বমানাধ, না না বমানাধ নয়। আজই বেতন, সুখী মুখে বীনদেশ চন্দা, আকুল অহুতাকে মনোমুগ্ধতার চলেছে কোথায়! পদাশীনা অতিক্রম করে মিলি হস্তস্থিত ত্রিপিটকখান: ছুড়ে মাঝে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। হেট হয়ে কুড়িয়ে মের বোধহয়। তিস্তুরী পক্ষপাত সবেমাত্র নিক্ষেপ করে

আবার, আবার, বাব বাব, উপহাসের হাসি লক্ষ্য করে। প্রাণপণ বুদ্ধিতে পাকে; অসংলগ্ন নিম্নের শব্দ, কে করছে আফ্রান, প্রচণ্ড বিজনে ছুটে যায়, বাধা পায় পরাক্রান্ত শত্রুর কাছে, মাথায় আঘাত পেয়ে পড়ে যায় মাটিতে।

মলিনবাসু মলিনবাসু কি করছেন আপনি, হরভাটা খুলুন—বমানাধের ভীতি-বিজয় বট।

মাথার দিকে গড়িয়ে বিশেষ দৃষ্টিব জলে।

বাইরে আবার কপ কপ বৃষ্টি এলো।



এমন কিছু কঠিন নয়

ছোট ছেলের সঙ্গের সমুদ্র যদি ঠিকমতো
হাঁকিয়ে দেওয়া যায়



আপনার সক্ষমতায়
আপনার পুণ্যের কর্ম-জীবনের
সাফল্য বিনোদনভাবে
সূচিত করবে।



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪নং ব্রাইড ষাট স্ট্রিট, কলিকাতা-১

কথিত গল্প

মায়ানির্জন্ম

পরিমল চক্রবর্তী

কোথায় তৃষ্ণার শেষ ? ছবয়ে তো ব্যর্থতার স্মর
বেদনার গানে গানে শুধু করে ছাতনাবিধুর ।
কোথায় তৃপ্তির নীড়, যেখানে কান্নার হ'বে শেষ ?
বহুদূর পাড় হয়ে কিংবা পেয়ে স্বপ্নময় বেশ ।

চেতনা অকুল হ'বে ? তাহ'লে তো আবেগকল্প
একটি মায়ারী ছবি এ-মনের ঝড়-পটে একে,
বার বার চুপি চুপি কানে কানে তাকে ডেকে
বলবো 'না, হতাশার দরো নাকো রোমন-অরুণা'

হয়তো সে সাড়া দেবে ; অথবা সে গোপ্লির রঙে
প্রাণের আকাশ আছা, অন্তরীম মোহময় চণ্ডে
অথবাই ভ'বে দেবে ! এ-বুকের অন্তল গভীরে
কত কুঁড়ি ফুল হয়ে চোখ মেলে তাই তাকে খিরে ।

ছব্বকে ভরে দিয়ে বেদনার প্লাব অক্ষরলে ;
দিনরাত্তি তার মায়ারী আছো আছো কতো কথা বলে !!

স্বর্ণ-সন্ধ্যার সাধ

শ্রীম্মীর গুণ

বহু-প্রোত। মহাকাল-কালিন্দীর কূলে
বহু-ব্রহ্ম-বৃন্দাবনে গঢ়িয়া বাসর
যাপিল বাসন্তী-বেলা ! যুগল অন্তর
মধু-পানে মত্ত ছিলো এতি মূমতুলে ।

অনন্দ-মন্দির-মালা তব কালো চুলে
ছলিয়ে সোহাগে—সুখে করেছি অমর
পলাতক পলগুলি । সার্থক—সুন্দর ।
সেীবন রোমাঞ্চিত গুঠে মর্ম্ম-বলে ।

স্বর্ণ-সন্ধ্যা বীরে বীরে অজকারে ঢাকে ;—
সেীবন অন্তর্মিত,—কিহিবে না আর ;
মধু-হৃত মহাকাল-কালিন্দীর বাকে
কোথায় ভাসিয়া গেলো তবুকে ছিন্নির !

তবু ভাবি,—মব প্রেম যেন মনে রাখে
এ বাসরে প্রেম-সীলা ফুল আছাব ।

আবহমান

—বিকাশ দাশ

অদৃশ্য কান্দে ঘন,—গগনগর্ভে এই রোদ্‌ধু
আহিগন্ত পৃথিবীর বুক পুড়ে আগুনে ছুপুরে ।
মাঠ-বন নদী সর্বত্র পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়—
স্রাস্তি নামে গাছের ছায়ায়,
ঝড় ওঠে, ঘূর্ণী ফড়,
কত লক্ষ জনগণ ঘরে যায়—মমির নগর ।
কীবনের মৃত্যু নেই—মৃত্যু নেই তবু পৃথিবীর,
সার্বাঙ্গে আশ্চর্য রঙ তবু মাথের নদীর শরীর
নিশির-সকালে আর ছায়া-ছায়া করুণ বিকেলে,
সব মৃত্যু মানি, তাপ একটি নিমেষে মুছে ফেলে ।

যাশসের কড়িঙের ছািমিরের মিঠে জাপ তবু ভেসে আসে,
কিঁ কিঁ ডাকে । নির্জন আকাশে
ভাঙা কোটে । স্বপ্ন-ছোঁয়া আকুলের বন,
সদন্ত শরীরে আনে বেতস ফুলের মত
একটি বিচিত্র শিহরণ ।

নির্জন মনের বীণে বারবার আশ্চর্য নতুন
তবু আসে ফুলের ফাঙ্কন—
তবু আসে লঘুপঙ্ক এক ঝাঁক স্বপ্নের নৌমাছি ;
মৃত্যাহীন পৃথিবীর আমি যে একান্ত কাছাকাছি ।
আনি তবু আমি যাব অবে,
মৃত্যু-কণ্টকিত কোনো বিবীর্ণ গ্রন্থে ।
তবু হবে হাস, ক্লেশ, শিশির বোদ্ধর ভালোবাসা,
অন্যথা ফলের জাপ, কুয়াশা-ভূহিন আর আকাশ-পিপাসা ।

আসবে নতুন প্রাণ—দেখবে আশ্চর্য দুটি চোখ
মুগের বিকেলে কেবল কাঁঠ-বিড়ালীটা সেজ মাড়ে,
ধমধমে সোনা-রোহ চুপ করে থাকে কেদা ঝাড়ে ।
বল্লব পাভারা করে,
টুপ করে ;
একটি নিঃশব্দ গান বনের ভিতরে—
যে গানের মৃত্যু নেই—এক ছুই তিন চার হাজার বছরে ।

একটি ভীত প্রার্থনা

শঙ্কুনাথ শুক্লাচার্য

করুণ রাতের প্রহরগুলি সকল হল দেখা :
নীংব হলো মনের বীণা লুকালো তার রেশম ।
ঐশ্বর্য হবে আলাতে আমি পাবিনি বীণপ্রেমণা,
অনেক ভয়ে স্রাস্তি আমি—এবার তুমি এসো !

পেরেছি আলা অটল—সে তো ভোমারের করে ধাবী ।
অতল ব্যথা বিছানো যদি আশার ধূ ধূ গাড়ে
ক্রমশ কেন কুরাতে গেছি, এখন তাই জাতি ;
এখনো তুমি নাগাল দিলে আমার ভর ভাঙে ।

কেন যে তুমি বোঝ না অহা একেলা আমি কত !
ফুলের বেধে শিথিল ঘেন শোণিত করে অবে !
শোণিত শত ব্যাধার পরে এ মন বিকৃত !
এবার কিছু অস্তর হাত আমার হাত ধরে !

এখনি যদি তোমার গান আমার গান বামে,
নতুন ঘর ঐশ্বর্য সাধ হবে তো জানি শেষও ।
আকাশ দিয়ে দেখছে কালো ঐশ্বর্য কত নামে !
অনেক ভয়ে স্রাস্তি আমি—এবার তুমি এসো !

আমরা উই প্রদেশের সৈন্যরা

অসীমজিৎ মুখোপাধ্যায়

[একটা চীনা কবিতার অনুবাদ । লেখক অজ্ঞাত । কাল—চৌ রাজবংশ ; ১০৮৩—৪০৩ খ্রীষ্টপূর্ব অব্দ]

যুদ্ধের গামামা বেলে উঠল ;
তার নজ্জ উঠল সাধ সাধ বব ;
অন্ন করেকজন পড়ে রইল
কেলা মেহামতের কাছে ;
আব
আমরা সার বেঁধে চললুম
হকিং দিকে
শত্রুর সন্ধানে ।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে ;
তবুও
কেহবা নামটি নেই এখনও কর্তায়ের ।
অনেক লোক আহত হয়েছে ;
আরও অনেক গিয়েছে মরে ;
ঘোড়া মরেছে আরও অনেক ।
বনের মধ্যে পড়ে রয়েছে তারা,
হাস আর মাটিতে
ক্রমে তারা পড়ছে চাপা ।

যখন আমি
প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলুম আমরা
আমাদের স্রীষের সমুখে
বিশ্বাস-হীন করব না কোনওদিন ;
হাতে হাত বেঁধে বলেছিলুম
দু'জনে বেঁচে থাকব
বাৎসর্য শেষ পর্যন্ত
এক প্রাণ এক মন ।

আজ গভীর ছুঃখে বলতে হচ্ছে
সে প্রতিজ্ঞা আমরা রক্ষা করতে পারিনি ।

প্রথম বর্ষায় সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

হৃষ্টির ধীপে মুখোমুখি হয়ে শুধাই আঘকে তোমার ঠিকানা,
মেঘের বাউল ছিঁড়ে বিরে গায় বারবার শুধু মননের খেই,
দূর থেকে যেন শুনি মনে প্রাণে কার বাখানীল

স্ববের আকৃতি,

এক পশলার বর্ধা-বংশে একি অমাহত বেদনার বেশ !!
এ-সময় শুধু মনে পড়ে তুমি মিশে গেছ কোন দূর কান্নায়,
পুথোপো স্থতির প্রস্তর থেকে উদ্যাদীন হাওয়া

ভেসে এসে এসে

পাতাকরা গানে বজ্রন করে চিন্তামুখীন আবার ছয়ত,
দে-ছয়ত করে ভেঙে গেছে ঝড়ে, যুছে গেছে ঝাব

সেই-সুখ-প্রেম,

দূর থেকে যেন শুনি কান্নায়—ভেঙা তার সুর,

তারই স্নান সুর।

কে যেন এখানে কেমিল বাতাসে, আবার-সুফর বক্রিম মেঘে,
মনের খাতার পাতায় পাতায় লিখে যায়

শুধু প্রেমের কবিতা।



ছেলে সতীর নয়

আশা গঙ্গোপাধ্যায়

হামীকে কর্পোরেশন অফিসের সামনে পৌঁছে দিয়ে গাড়ীখানা নিয়ে সতী একেবারে মিউমার্কেটের দক্ষিণে লিওনে স্ট্রীটের উপরে পার্ক করল। গাড়ীর কাঁচওলি বন্ধ কোরে হরভায় ঢাবি দিয়ে হাওগ্যাংটা নিয়ে সোজাহুজি গিয়ে চুকল মার্কেটের ভিতরে কলের হোকানে।

ভীড় এ সংস্রটার বিশেষ থাকে না। ষ্টিক অফিসের সময় পুরুষরা বাইরে গেলেও মেয়েরা দোকান-বাড়ার করবার জন্ত অত দ্রুত প্রস্তুত হতে পারে না। সন্ধ্যার কাল শুঁড়িয়ে। ভীড় অনেক বেলা বায়োটার পর থেকে। সতী তাই একেবারে হামীর সঙ্গেই তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ে কেনা-কাটা করবার জন্ত।

তাছাড়া হামী সুরজনকে অফিসে পৌঁছে দেওয়া ওর একটা বিলাস। নিজে ট্রায়ারীও বলে পাশে ওকে বসিয়ে গাড়ী চালানোর মধ্যে বেশ একটা নাচকতা আছে।

নানা ধরণের বিলাসিতা—যা মেয়েদের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায়—সতীর তা কোনওটাই নেই বলেই হয়। ওর মনে-প্রাণে যে তিনি উদ্বাহন। আগায় তার মধ্যে একটা-না একটা নতুনত্ব থাকবেই।

জোব কোরে পথের দুঃখ দুর্ভাগ্যকে নিজের ভেত্রে ধিনেও পর ধিনে মনমরা হয়ে থাকটা এবং সাধনত তার প্রতিকার করাটার ভিত্তর সত্যি সত্যিই ও একটা অসুখ আনন্দ পায়।

সাধারণ উৎসব অয়োজনে ও যোগ দেয় বটে—তবে ধিনেও শেষে ও যখন ওর সারাদিনের কর্মজালিকার হিসাব নিতে বসে নলে মনে—তখন ওই আপাতসুখের চমকপ্রদ প্রাকভবকতর্য উৎসবটিকে ওর যেন কি দমন অসার আর দ্বাস্তকর মনে হয়।

এটা অবশ্য ওর একান্ত নিজস্ব চিন্তা। এ চিন্তার নির্দেশ দ্বিতীয় ব্যক্তি টের পায় না কোনও ধিনে, এমন কি ওর সব চেয়ে আপনজন ওর হামী সুরজনও নয়।

অলংকার-বস্ত্র বা সত্যিই সার নয় তার প্রতি মোহ ওর নেই, মোহ ওর আরও নেই অন্তের সংগে পাল্লা দিয়ে অথবা অর্থব্যয় কোরে নিজেই আকর্ষণীয় কোরে তোলায় প্রতি। হামী গৃহিণী হলেও প্রাসার অট্টালিকা হাসানাদী-ভোজন বিলাস সৌখীন ত্রা কিস্তুই ওকে ধরে রাখতে পারে না।

মনে মনে ও যে স্বর্গ-রচনা কোরে রেখেছে তাতে অর্থের বিশেষ স্থান নেই—আছে বরফতরা যেহেতু কতগুলি খাঁটি প্রাণের, যারা ওকে নিছক আনন্দ দিয়ে তারে তুলবে, পরিপূর্ণ কোরে তুলবে ওর হীনের শূন্য পেরাদাটুকু।

হামীমনোচিত একটি বাসন ওর আছে—সেটা হচ্ছে হামীকে পাশে বসিয়ে নিজে গাড়ী চালিয়ে অফিসে পৌঁছে দেওয়া—আবার ষ্টিক পাঁচটার পর কর্মজাল মাসুখটিকে চালিয়ে এনে বাড়ীতে তোলা।

এ দেশটা প্রায় ওকে মাতাল কোরে কেলেছে বলা যায়। সুরজন বহু আপত্তি জুলেছে—কলকাতার কর্মগন্ত বাসবাহনবহুল রাস্তাঘাটে মোটর ড্রাইভিং একটা বিপজ্জনক কাৰ্য্য সন্দেহ নেই। তবু নানা তর্কবিতর্কের পর সতী কোয়েছে জরলাত—সুরজনকে নিত্যন্ত সুখে বাসকেব মত স্ত্রীর পাশটতে ছুটি বেলা বসে থাকতে দেখা গেছে। প্রথম প্রথম ওর মাথা ঝিন্ ঝিন্ কহত, বুক করত দুক দুক, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসত, পিঠের শিংগাড়া শির শিরিয়ে নিউরে উঠত। চোখ দুটি মাঝে মাঝে বন্ধ কোরে ও সতীর কাঁধের পাশে হাত রেখে মুঠি মুঠি শক্ত কোরে বসে থাকত কোনও রকমে।

ক্রমশঃ অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন মনে হয় সতী যদি মোটর হেন্সিও কখনও যোগ দেয়—জরমালা পেতে খুব বেশী বেগ পেতে হবে না। এখন স্ত্রীর পাশে বসে বুকখানা ওর দশহাত হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে।

চোঁমাখার মোড়ে বিভিন্ন গাড়ীর ঠাসনুনান জাল ভেদ

কোরে কোরে যখন সতী তার পত্ন্য স্থলের বিকে অগ্রসর হয় তখন মাকে মাঝে আনন্দে তার পাশে রাখা হাতগানা আলিঙ্গনোন্মুখ হয়ে ওঠে। আর সতীকে আরক্ত মুখে উত্তেজিত হয়ে বৃদ্ধবরে বলতে হয়—ইস্ কি হচ্ছে—নামনে গিছনে ছাঝার চোখ দেখতে পান্দ না ?

স্ববন্ধন উচ্ছসিত ও প্রশংসিত কর্তে কৌতুক কোরে বলে—কই, না ত !

এর অন্তর্গত সতীর এত সাধনা। এই সময়টিতেই সতীর হাতায়—চারিদিকে স্তম্ভ স্তম্ভক গুটিটুই আবেগ-সুর্জনায় মগ্ন হয়ে আসে। এব একটা মাদকতা আছে বই কি ? এটুকু বিলাস সতী না কোরে বাঁচতে পারে না।

থরে থরে সাধানো রয়েছে আপেল বেহানা। আনদানী হয়েছে কামীর, কাবুল পেণোয়ার থেকে। আঙুরের টস্টেসে শুদ্ধগুলি বেন ফলভারে পত্নোন্মুখ হয়ে আছে। এগতির স্তম্ভ সতী কিনস কিছু আপেল, বেহানা আর আঙুর।

এগতি আর মাপ ছুই যাবৎ শয্যাপত্ত। বস্ত্রশূভ্রতা ওর অনেকগুলি ব্যাবির মধ্যে অন্ততম।

দিনে দিনে দুর্গ হয়ে পড়ছে; ডাক্তার কোরে উঠতে পারেনি কিছুই। চিকিৎসা যে চিকিৎসকের সাধের বাইরে একেবারে তা ঠিক নয় তবে সাধের বাইরে পরিতোষের, এগতির স্বামী। তার মানে খুবই স্পষ্ট। বয়সে বলা যায় পরিতোষের পক্ষে নিভাস্তই ব্যাধাধা।

স্ত্রামখাভার অকলে একটি কাপড়ের বোকানে সেলসুয়ান বে। সংসারের অন্তর অন্তরনে সে যে খুব বেশী কাছিল নয় সেটা ভাল কোরে বুঝতে পারা যায় তার স্ত্রামগ্রহননের অদ্বুত ক্ষমতা দেখলে।

ছয়টি সন্তানের গ্নয় দ্বিগে পরিতোষ কাবু হয়ে না পড়লেও এগতির দ্বাবনীশক্তিকে সে প্রায় নিশেষে কোরে কেলেছে। তাইই অনিবার্য ও অপরিহার্য বল বস্ত্রশূভ্রতা এবং শয্যালীনতা।

এখন এখন তাৎ-ব্যবহারে, আকার-ইংগিতে, পরে প্রাঞ্জল কথারমণুর বাক্যবাহে প্রিয়ভাবিষ্ট চতুর্থা সতী তার জামাইবাবুকে অসংখ্যবার সতর্ক করেছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব কিছু হয়েছে বুঝা।

সতীর প্রয়োজনীয় পরামর্শকে সে উপেক্ষা করেছে। তার প্রবণতায়কে বেবেছে অসাড় কোরে। কিন্তু সেই একই সময়ে এগতিক বুদ্ধবস্তে ও কোয়েছে প্রচুর ফলস্বান। এ বিষয়ে সে তার শক্তিমত্তার পবিত্র, পৌরুষের প্রমাণ দিতে পিন্ধাজ্য কর্তব্য করেনি।

ফলস্বতী হয়েও এগতি আর তাই সর্বস্বারা নিঃস্ব।

দ্বিধির হাতে শক্তিকে অরোহণ্য পথে নিয়ে যাবার স্তম্ভ সতী তাই মাঝে মাঝে করে বার্ষ চেষ্টা।

বিগ্রহের। স্বয়ংমি আকাশের বৃকে প্রবস্তন হয়ে অসছে। ফলের টুকরি নিয়ে পাড়ী চালিয়ে সে চমস এগতির গৃহপানে। শুধু ফলই নয়—টুকরিতে আছে বট্টন ছবির বই, মানা বকম সংবেষণের খেলনা, বিভিন্ন মাপের শাট, ফ্রক, পেনি ইত্যাদি আর আছে ষোড়ার অন্তে একছোড়া দানী মল্লা পাড় তাঁতের শাড়ী।

কালীঘাট অকলে একটি অখ্যাত অগ্রগন্ত গণির প্রান্তে এসে পাড়ী ধামাল সে। নামনে একখানি চুটুরি—ভিতর থেকে বন্ধ। বরজার কড়া নাড়তেই একটি বছর নাতেকেব বেয়ে এসে খুলে দিল।

কোলে তার একটি বছর বানেকের স্তম্ভ স্তম্ভকায় শিশু।

মীরা, আর তোর স্তম্ভ নেই ?

সতী বিজ্ঞাসা করল বালিকাটিকে—জিনিষগুলি সে একে একে ধরে তুলতে সাগল।

না মাদি,—

মীরা লগাব দিলে।

মায়ের শরীর আর সকাল থেকে বজত খাণ্ডন হয়েছ— তাই আমি আর তুলে যাইনি ছাভ।

বালিকাটি বেশ বিজ্ঞের মত গল্পের ভাবে উত্তর করল— যেন মায়ের অস্থব কোরলে ওইই গৃহিণীপদটি পানার যোগ্যতা আছে। ছেলেমাণ্ড !

মনে মনে হেসে সতী প্রস্ব করল—

মদি, টুই শুভা সব কোবার ?

মদি, টুই আর সৌতন স্থল গেছে। সীতা বুনায়ে মায়ের কাছে। আর বুছটা যে কী জালানন করছে মাদি, তোমাকে কি বলগো।

—একটিবার দ্বিধা মুক্ত হুটি খুঁজব অপাংগে বুলিয়ে নিয়ে য়োবা বলল—আমাকে কোন কাজ করতে দিচ্ছে না।

আর খুঁজ—সতী দুই হাত বাড়িয়ে ছিল। আমার কোলে অয়। তোমার কাজে কেমন রতীন কামা আর মল্লার খেলনা এমনছি বেশ।

ক'ণ বিয়ে খুঁজ গিয়ে মাসির বুক পড়ল নিবিবাসে।

একে স্বাহো সৌন্দর্যে মাসি কলমল কোথছে বিভলী-বাতির মত, তার উপরে খেলনা কামার হাতছানি। এতগুলি আকর্ষণীয় বস্তুকে পেরিয়ে খুঁজ মন কোনোও মতেই বেশী দূরে যেতে পারে না। শুই ঠিক বুঝতে পেরেছে যে বিশেষ ক্ষেত্রে মায়ের চেয়ে মাসীর দরজা ঢের বেশী ঢের সোভনীয়। খুঁজমনি তাই সতীর নহন বুক চুপচাপ পড়ে বইল।

শুভ বুদ্ধিমানা ভরে গেল এক নিমিষে। পরপর ছুটি সন্তানকে হারিয়ে সতী কিছুদিন ঘরে বেড়িয়েছে উমাধিনীর মত।

স্বামী স্বপ্নান নানা বেশ বেড়িয়েছে ওকে সংগে কোবে, কিন্তু ওকে বাস্তবিক ভাবে ফিরে পায়নি আর। লোকের আখ্যাত সতীর কোনও প্রেলেপেই শাস্ত্রমিষ্ট নিরাময় হতে পারে নি।

বাড়ীপাড়ী, লোকঘন, আমোদ-প্রমোদ, গলংকার-লজ্জা, বাসন-বিলাস কিছুই অস্ত্রমনা কোবতে পারেনি—ওকে হিতে পারেনি সান্বনা।

লক্ষ্য করেছে স্বপ্নান—একবার নয়, একাদিকবার, বং একটি বিশেষ স্থানে এসেই সতী এক মুহুর্তে তার নিভেকে ফিরিয়ে পায়। অজ্ঞাতসারে চলে যায় তার পূর্বাবস্থায়।

সদাশাস্ত্রময়ী, চকলা নারী—বুশির আনন্দে লতাবাণী নিষ্ঠাবিশীর্ণ মত স্বরে গলে উপচে পড়ে যেন।

সেই অত্যন্তর্ঘ পরমপ্রিয় স্থানটি ঝঞ্জে তার দ্বিধা প্রণতির অখ্যাত অতি সামান্য গুঁথেকাণ্টুই।

বিশেষ সমস্ত মধু আছে ওখানে সঞ্চিত আর সেই হুর্গত বহুটিব সন্ধান দতী হাড়া কেউ পায় নি—পাবেও না কোনও দিন।

ওর এই ভাবান্তর স্বপ্নানের দুটি আকর্ষণ কোরেছে বেশ কিছুদিন কাটবার পর। এই পরামান্দর্ঘকর ঘটনাটুকুকে আবিষ্কার করবার পর বাণা দেখে নি আর স্বপ্নান—বাণা হিতে পারে নি সে।

তাই যখন-তখন যেভাবে প্রাণ চায় সতী ছুটে এসেছে প্রণতির সাহায্যের দ্বার। ঘন, ঐর্ষ্য, ঘনপরিজন, এমন কি নিষেধ কারিক পরিশ্রমটুকু সর্বত্র বিয়ে সে ওয়ের সমস্ত অস্বাভ, সকল তুচ্ছ মিটিয়ে হিতে চেয়েছে। তার পরিবর্তে নিজেও নিয়েছে আকর্ষণ পিপাসা মিটিয়ে।

ঠৈ-হয়্যা কোরে সুল থেকে ছেলেহা ফিরে এল।

—মা ভয়ানক বিয়ে,—

—মা খাবার দাও শীগ্গিরই—

মা সো, কি খাব?

জঠরের জ্বালাতে তারা আধার করে নানাহুরে।

প্রণতিরকণ্ড জ্বালা কম শইতে হয় না।

ক্রমকর্মে শয্যা হতে উত্তর হয়ে—

ওই যে হুঁড়ি আছে টিনের কোঁটার, তার পাশেই বিশিতে বাতাসা আছে। হেত য়োবা, তাইবের ভাগ কোরে ছুটি-ছুটি।

মুহুর্তে প্রলয় ঘটে গেল ঘরের মধ্যে।

: ইস, বাবে না হুঁড়ি—

: শুকুনো হুঁড়ি বৃত্তি যোগ যোগ খাওয়া যায় ?—

: আমার পল্লার মধ্যে ব্যাধ করে হুঁড়ি চিবোতে গেলে—

বইখাতা ছুঁড়ে কেলে লানাকাপড় ছড়িয়ে পেলাসবাটি গড়িয়ে দিয়ে সবচেয়ে ছোট ছেলে গৌতম নিজেও জুই-শয্যা নিয়ে হাত পা ছুড়তে লাগল বিভিন্ন হুরে।

প্রণতি ওপাশ ফিরে কাঠ হয়ে পড়ে বইল।

ঐর্ষ্যশালিনী কনিষ্ঠার চোখের দিকে ও আর লজ্জার ক্ষোভে চোখ তুলে তাকাতাই পারল না।

চোখের ললটুকুও শুবিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রয়েছে শুই তীব্র একটা জ্বালা, অজ্ঞাতের, অপমানের আর সেই সংগে সমস্ত লগনের উপর একটা হাল্কা অভিমানেব জ্বালা।

কিন্তু চোখের পাতা ফেটে কোঁটার কোঁটার জ্বল করে পড়ল সতীর।

তার সম্মা বাখবাই বা আরগা কোথায় ?

নিজের ঘরে খেতে খেতে ফলমিষ্টি, মাখনজেনি, কুটি কুটি নষ্ট করে যাচ্ছে ফ্রিজের মধ্যে, মিটপেকের পেপারের পথে।
কৃত্যপরিজনহেতু মাঝে মাঝে ঘরে অস্বস্তি—ওহু যথারীতি আসে খণ্ডপ্রব। কেনাকাটার নাই বিদ্যাম—একে ওকে বিলিয়ে দিয়েও শেষ কোরে উঠতে পারে না সতী।

আর এ সংসারে ?

চোখের জলের ফোঁটা অবশেষে মুক্তি বস্তা এনে দিল।

কোনও দিকে না তাকিয়ে শোজা গাড়ীতে বসে স্টার্ট দিল—জুত চালিয়ে গেল নিকটতম খাবারের বোকামে।
দিয়ে এল এক বোকা বাহার।

শিগ্গের সুখ মিটল—ছুটি বোনও উপভোগ করল সে আনন্দের অঙ্গে।

সবকটিকে পরিষ্কার কোরে খুঁয়ে মুছিয়ে পাটিয়ে দিল হীরায়ে দিয়ে সামনের খোলা মাঠে—কর্পোরেশনের সাধারণ পার্কে—সবুজ পাতায় থেঁতা সহজে মল্লকুমির বুকে সরল স্ত্রীমানের ছবিখানি।

হেঁদে—

ছোট বোনের গভীর কণ্ঠস্বর অকস্মৎ আশ্চর্য বোধ করল প্রণতি।

প্রথম বুলি মেলে তাকাল সতীর আরক্ত উত্তেজিত মুখের দিকে। ভিতরের ঘন চেপে রাখতে চেষ্টা করছে সতী।

বিবি, তোমার ছুটি পারে পড়ি—

সে কি যে ?—নিশ্চিত সুরে বিজ্ঞাপা করল প্রণতি,—
কি বলবি, বল না সতী ?

বিবি তোমার ছুটি পারে পড়ি—পুনরাবৃত্তি করল সতী, গৌতমকে আমাকে হাও। কাছে রেখে মাহুদ করব, ডব্ব দুব্বপনা শাস্ত করব, শাসন করব ওকে। ভালবাসব তোমার মত কোরে। তোমার কাছে আমার আদার এই একটি মাত্র বিবি, ওকে আমাকে পালন করতে হাও সস্তীটি।

কাতক-মিনতি বেন গলে গলে পড়তে লাগল এই অজাগিনী গুস্তানবিধুরা নারীর কণ্ঠ থেকে। বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

প্রণতি একটা প্রচণ্ড ব্যাথা সামলে নিল। বোনের ব্যাকুলতার ও কম বিচলিত হয় নি—

তবু বাধা না দিয়ে পাঠল না—মায়েদ মন !

কি যে বলিদ—জুই-ই ত সবকিছু করছিল—বসন তখন ভিন্নিপত্র, টাকাকড়ি, গুহুপত্র দিয়ে ধাঁড়িয়ে বেঁধেছিল শুভোরাই এধের সবকটাকে।

না না, সে কথা নয়, সে কথা বলছি না—

ইতস্ততঃ কোরে আবার বলল সতী,

সে ত আছেই—বদাংই থাকবে—ওহু আমি গৌতমকে আমার নিজের মনের মত কোরে মাহুদ করব, বড় কোরে তুলব—বিলেত পাঠাব, কত কি করব ওকে নিয়ে।

বিবি, তুমি 'না' কোরো: না তাই, সস্তী বিবি আমার—ওকে আমার নিয়ে যেতে হাও আমার কাছে।

আজ্ঞা, আজ্ঞা, সে কথা হবে'খন—তোব লামাইবাখু আশুন।—

কৌশলে এই অপ্রতিরোধ্য প্রস্তাবটাকে এড়িয়ে যেতে চাইল প্রণতি।

সহোদরা—তবু সহোদরাই নয়—খন-নানে, স্বভাবে, দৌলতের অতুলনীয়। ওর ছোট মণোরটিও ঘর্ষহৃদয় দণ্ডিত বেন—সুখকর পরিবেশ একটা। ওহু—ওহু সন্তানকে পদ কোরে দিতে হবে—ভাবতেই প্রণতির ইঁদুর কুখানা শত শত হয়ে ভেঙ্গে পড়তে চাইল।

আজ্ঞা তাই হবে, শুভ কণ্ঠে মলিনমুখে হৃদয়ের বলস সতী, লামাইবাখুকে বলে তুমি কিন্তু বিবি ঠিক হাও করাবে।

আদার কোরে আবার বলল,—আমি কিন্তু কোনও কথায় শুদব না আর। তুমি ভাবছ কেন বিবি ?—

কাছে গিয়ে বিবির জ্ঞান মুখখানি চুহাতে ধরে আতব কোরে বললে—তোমার বোম নিয়ে আসব ওকে তোমার কাছে—তোমার ছেলে তো আমি নিছি না তিরবিনের মত—

ঘাউ ঘাউ—বাধা দিয়ে বললে প্রণতি, ঠাকুমা বিবিয়ার মত চমকে উঠল অন্তরে অজ্ঞেব—

তাই কি বলছি বে—তোরা কাছে থাকা আর আমার কাছে থাকা একই কথা।

আমার ছেলে কি তোরা ছেলে নয় ?

দুতবৎসা সহোদরার কাতর মুখানা ঘোঁটাকে বিচলিত কয় করেনি।

* * *

এবপৰন্ত বছরিন চোখের জল ফেলতে হয়েছে ; অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে এই প্রস্তাবটিকে ফলবান করতে।

অনেক আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্কের পর প্রণতিতে শেষ পর্বন্ত বাধী হ'তে হয়েছে ভরীর মূখ চেয়ে। দু'টি পুরুষকতার অননী হয়ে সন্তানহারা সতীকে একটি হান করতে আপত্তি করতে পারেনি।

গৌতম এসেছে মাসীর প্রাসাদোপন অটালিকায়। চারবছরের শিশুনাথ।

সতী তার ছোট মা। মা বলতে সতী শেখারনি।

অন্তরেব নিহতে এই ক্ষনিতুই শোনবার যে বাহুল্যতা তা তাকে লয়েত কোরে রাখতে হয়েছে সবতে।

তাই সে 'মা' কথাটির পূর্বে 'ছোট' কথাটুকু বসিয়ে ফলাও কোরে ডাকতে শিখিয়েছে গৌতমকে। দাই বোকে—এখন আর সে মাসী নয়—যার দরব মারের চেয়ে বেশী হলেই সাধারণের চোখে সে হয় নিম্ননীয়।

তাই সে গৌতমের ছোট মা।

সুন্দর, ছটপুট শিশু—মাখাভরা কালো মিশমিশে বোকা বোকা চুল, ভ্রমরের মত চকল দুই নিতরা দুটি নিবিড় চোখ, —হেঁচলেই বুক ভড়িয়ে রাখতে ইচ্ছে করে।

এর পর কেটে গেছে দুই তিন বছর।

গৌতম এখন নামকরা ছুলে পড়ে—ক্রাসে সে 'কার্ট' বর' নামে পরিচিত।

ছোট মা-ই গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যায় নিয়ে আসে। ভাল ভাল পোষাক বহুতে তৈরী করে সতী ছেলের জন্য। তার দ্ব্যভাবিক শিরশৈলী এই সপ্তমবর্ষীয় শিশুর পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্য দিয়েই ছুটির জুলে অনেক পায় সে। নিজের হাতে খাওয়ায় ; পড়ায়, বেড়াতে নিয়ে যায়।

হাতে শূন্য বুকখানা তরে নিয়ে নিজে যায় গৌতমকে

কোলে নিয়ে। মারের দুর্লভ মেহ বা গৌতমের অকুণ্টে ক্ষমাবদি কোটেটিন এখানে এসে সে দেটা অপর্ণাশ্রয় পায়। আদরবন্তে পরিবেষ্টিত থেকে সে তার ভাইগোনের কাছ থেকে ক্রমে ক্রমে দূরে সরে এসেছে—মন হয় তার শিশু মন থেকে মারের ছবিখানিও বৃষ্টি আপনা হয়ে এসেছে।

ঐশ্বৰ্যের চাকচিক্য কতদিনই বাহারিমালাজিত শৈশবের স্মৃতিকে না ঢেকে পাগোব ?

গেহিন সতীর গৃহে উৎসবের লমায়োহ।

গৌতমের কল্পত্বি উপলক্ষে সতী করছে এই আনন্দের আয়োজন। নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে সতীর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন।

প্রণতিও এসেছে তার সন্তানহানীকে সংগে নিয়ে। গৌতমকে বাহ দিলেও পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সে এসেছে তার পুরের কল্পত্বিবি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে কনিষ্ঠ ভরীর গৃহে।

অভ্যাগতরা বিদায় নিয়েছেন।

ভোজনান্তে দুই বোন একটু বিশ্রাম গ্রহণ করবার আশার শরনকে এসে উপস্থিত হল।

বিদ্বি—সতী বলল, তুমি উপহারগুলি গুছিয়ে তোলা ত ততক্ষণ। ডাইভার বিবে এসে তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে কেমন ?

সতী নিশ্চয় এগিয়ে এসে বিদ্বিছে সাহায্য করতে লাগল সেই সংগে।

প্রণতি শুকনুখে উপহারসম্ভার সবতে জুলে রাখছে, এমন সময় কোথা থেকে চকল হরিণের মত ছুটে এল গৌতম।

এসে একেবারে ছুটি হাত দিয়ে মারের কণ্ঠ বেঁটন করে গালে গালে বেঁচে চুপি চুপি বলল আশ্বয়ের সুরে—

মা, মাগো, আমি তোমার সংগে বাড়ী বাব মা।

একটি নুহুর্ড। সতীর সমস্ত শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে যেন তুহারশিশুর জল হয়ে বরক হয়ে গেল।

অপাণে সে চাইল মা-ছেলের স্মৃতির দিকে স্পর্শকেন্দ্র কর্ত—পরে মেঝেতে বসল মুখখানা নত কোরে পানের পরঞ্জায় নিয়ে।

গৌতম কিন্তু নাছোড়বান্দা। মারের কোলে মুখ গুঁজে

একই আখ্যার কোরে চলল, মা আমি তোমার সংগে যাব মা!

গৌতম,—

এগতি ভাড়া ভাড়া গলার অশ্পষ্টবরে কাণ আপত্তি মনাল—

না বাবা, আজ থাক। কালকে তোমাকে আমি নিয়ে যাব। তোমার বাবা কাল হোকান থেকে কেবংবার সময় তোমাকে নিয়ে যাবেন, কেমন? আজ তুমি সস্ত্রী ছেলে হয়ে শুয়ে পড়।

এবলবেগে মাথা ছুলিয়ে আপত্তি খানাল গৌতম। আরও কষ্টিন্তর আলিঙ্গনে মাতাকে বেঠন কোরে বলল—না, আমি তোমার কাছে আশ শোব মা।

বুকের মধ্যে সহস্য কে যেন আঘাত হানল ছুঁকি দিয়ে।

সতী বধাপূর্ব পান সেজে যেতে লাগল একমনে।

বিপদগ্রস্ত মা নিরুপায় হয়ে বললেন,—বেশ, তোমার ছোটমাকে বিজ্ঞাসা কর।

লগাটে শুভচক্রে তিলক, কণ্ঠে পুষ্পমালা, পরণে শান্তিপুরী দ্বিত, গায়ে শিকের পাঝানো, সব একত্বহুর্ভে তছনছ, কোরে ফেলল গৌতম।

ছোটমাকে বিজ্ঞাসা করলে যে কি স্থূল বলবে সেটুকু উপলব্ধি করতে এই সাতবছরের শিশুর একটুও বিলম্ব হয়নি।

মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুনরুজ্জ্বল করতে লাগল সে—তুমি বিজ্ঞাসা কর, আমি তোমার কাছে শোব মা আশ।

বিস্মৃত এগতি অগত্যা ডাক দিল—সতী!

মাড়া নেই।

সতী, শোন,—গৌতম কিছুতেই শুনছে না রে? আমার সংগে যেতে চাইছে বাড়ী—

বিধার সংগে ভড়িয়ে ভড়িয়ে ছেলের আখ্যারটুকু নিতান্ত অনিচ্ছার সংগে পেশ করল গৌতমের মা—সতী, কিরে যাযে?

বেশ ত, আমাকে আর বিজ্ঞাসা করা কেন, নিয়ে যাও মা?

সারা বরখানার বুকের উপর একখানি পুরু অতিমানের পর্বা বুলতে লাগল যেন। বধবন্দ্য করতে লাগল আবহাওয়া।

মা মা—

হাফস হুঁহা সংগে বলল এগতি—ও কিছুতেই ছাড়ছে না। আমি নিয়ে যেতে চাইছি না একটুও—দেখতে পাচ্ছিও তুই?

তাই ত! এগতি এমন আতঙ্কিত নয় সে নিজের ছেলেকে নিয়ে কাছ একটি হাতের তক্তা নিয়ে মাঝার তক্তা অনগতে হাফসের প্রস্তাব ধরবে!

এগতি ছেলেকে কোলে তুলে নিল। বুড়িয়ে বলল আবার,—ছি গোনা, ছোটমার যে কষ্ট হবে—তুমি থাক আশ। ছোটমা তোমাকে কত ভালবাসে, তার মনে ব্যথা দেওয়া কি উচিত? তার চোরে আশ ছোটমাৎ কাছে শোও, কাল আমি নিয়ে এসে তোকেসো তোমাকে নিয়ে যাব।

ছেলের মাঝার বাহবার হাত বুলিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করল এগতি।

অজাগা বালক মায়ের বক্ষিত কোলের পোতটুকু সে মাজের মত কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারল না।

হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কুলে কুলে উঠতে লাগল তার মাথা ঘেঁষে। ক্ষুদ্র হাত দুটি দিয়ে মুখখানি তেকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল চাপা কানায়। আর আখ্যার করল না বিতীরবার।

মায়ের চোখের মেঘ এথার হল হয়ে যেনে এস। যোনের পাশে বসে দুই হাতে তাকে ঘড়িয়ে অক্ষরসা চোখে কল্প মিনতি খানাল—

সতী, বোন, শুধু আশকেব বাউটুকু। তুই তাগ কবিস না রে! ওর ভাই-বোনরা এসেছে দেখাই, ও তাহেৎ ছেড়ে আজ একলা কিছুতেই এখানে থাকতে পারছে না। শুধু একটি হাতের তক্তা তুই আমাকে কিহিয়ে রে সতী—

চোখের বল আঁচলে মুছে নিয়ে এগতি কাতবকটে অকুরোণ করল—শুধু কয়েক ঘণ্টা মাত্র।

একটু চুপ করতে হল তাকে উজ্জ্বলিত জন্মদেবগণে হমন করবার ক্ষমতা; ক্ষণপরে বলল, কাগকেই তোরা ছেলে শুকে কিহিয়ে দিয়ে যাব রে—তোরা ছেলে তোরাই কোলঝোড়া হয়ে বেঁচে থাকবে।

না না, ছেলে আমার নয়—আমার কোনওদিনই হতে পারবে না ও। তোমার কিনি তোমাই থাক কিহি—কাল নেই—কাল নেই আখ্যার পরের কিনিবে শোভ কোরে—আর কাগার গুটিয়ে ভেঙে পড়ল সতী।

নিঃসন্তান অতাপিনী কনিষ্ঠাকে মাফনা দেবার মত কোন ভাষাই যোগাল না এগতির মুখে।

আর্থিক প্রসঙ্গ

শতরশ্মির অভিযান

১. দ্বিতীয় আর্থিক নির্মাণ শিল্প কেন্দ্রের অবস্থান।

ভারতের অর্থনীতিতে এক বড় দুর্বলতা এই যে এরূপে উপযুক্ত আর্থিক নির্মাণ শিল্প কেন্দ্র এখনও গড়ে ওঠেনি। বিশাখাপত্তনের আর্থিক নির্মাণ কেন্দ্র দেশের চাহিদা এক ভরসেও মিটাতে পারে না। এর ফলে দেশের চাহিদা মিটার ভারত ভারতকে বিদেশ থেকে অনেক আর্থিক কিনতে হয় এবং সে ক্ষেত্রে ভারতের প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। ভারত সরকার দেশের অর্থনৈতিক এই দুর্বলতা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে সচেতন হয়েছেন। তারা দেশে আর একটি আর্থিক নির্মাণ শিল্প কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত বছর কলকাতা পরিষদের আন্তর্জাতিক একটি বৃষ্টি আর্থিক নির্মাণ শিল্প হল তদন্ত প্রণয়ন করেন। এই হলের কাজ ছিল নতুন আর্থিক নির্মাণ শিল্প কেন্দ্র স্থাপনের অবস্থান স্থল ও তার নির্মাণের পরিকল্পনা ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দিয়ে সজ্জিত করা সম্পর্কে ভারত সরকারকে পরামর্শ দেওয়া এবং ঐ আর্থিক নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপনের সুনিয়মি ব্যয় তার সম্পর্কে একটি আনুমানিক হিসাব দেওয়া ও ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য একটি রিপোর্ট রচনা করা। সম্মতি তাঁরা তাঁদের রিপোর্ট ভারত সরকারের কাছে পেশ করেছেন। রিপোর্টে তাঁরা কেরালার এরনাকুলমের নিকটস্থ স্থানটিকে দ্বিতীয় আর্থিক নির্মাণ শিল্প স্থাপনের পর্যাপ্ত স্থান বলে সুপারিশ করেছেন। এরনাকুলম ছাড়া আরও চারটি স্থানের নাম চ'ল কাম্বা, ট্রুয়ে, পেরোঁবালা (কলকাতার কাছে) ও মাঝাপন (বম্বেতে)। কিন্তু তাঁদের দ্বারা পরিকল্পিত অস্ত্রা স্থান থেকে এরনাকুলমের উন্নয়নের সম্ভাবনা অনেক বেশী। এরনাকুলমের পরিকল্পিত আর্থিক

নির্মাণ কেন্দ্রের একটি নকশাও তাঁরা রিপোর্টের সঙ্গে পেশ করেছেন।

এই আর্থিক নির্মাণ শিল্প হল কোন আর্থিক আর্থিক নির্মাণের উপযোগিতা বিবেচনার জন্য কয়েকটি ন্যূনতম ও আবশ্যকীয় নীতি রচনা করেন। হলের গভীরতা ও ঘোরারের পরিধীমা নির্মিত বৃহত্তম আর্থিক নির্মাণের জন্য ভাণ্ডারের পক্ষে উপযোগী হওয়া চাই। শুল্ক বা মোহনা থেকে ভাল মূল্যবানী থাকা চাই। স্বল্প থেকে স্থানটি রক্ষিত হওয়া চাই এবং স্থানটির আয়তন ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও সম্ভাব্যতার জন্য পর্যাপ্তী অঞ্চলের আয়তনও যথেষ্ট হওয়া চাই। স্থানটি কোন বর্তমান কিংবা পরিকল্পিত বড় বন্দর ও শিল্পীয় সম্ভাবনামূলক পথের নিকটবর্তী হওয়া চাই। এসব ছাড়া বিদ্যুৎশক্তি, রাস্তাঘাট, রেলপথ প্রভৃতির প্রাপ্যতা থাকা চাই। এই সকল নীতি প্রয়োগ করে বৃষ্টি স্থানটি বিভিন্ন স্থান পরীক্ষা করেন। তাঁদের মতে পরীক্ষিত কোন স্থানেই আর্থিক নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপনের পক্ষে সবকিছু থেকে উপযুক্ত নয়। তাহলেও ঐ পাঁচটি স্থান সম্পর্কে বিবেচনা করা চলতে পারে।

এরনাকুলমের নিকটস্থ কোচিনের দ্বিতীয় আর্থিক নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপনের স্বপক্ষে কয়েকটি সুবিধা আছে। কোচিন একটি সম্ভাব্যমান বন্দর, আর্থিক শিল্পের সম্ভাব্য অনেকগুলি শিল্প এখানে বর্তমান আছে, রেলপথে ও অস্ত্রা ব্যবস্থার পরিবহনের সুযোগও আছে এবং এখানে শিল্পীয় কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত শ্রমিক শক্তির সরবরাহ আছে। কোচিনের একটি অসুবিধা হচ্ছে এই যে এখানে অদ্যাবধি ইঞ্জিনিয়ারিং খুব উন্নত নয়। কিন্তু

এই সমস্ত অমতিক্রম। নয় বলে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে।

মাঝাপন জাহাজ মেঝামতেব কেন্দ্র বলে খ্যাতিলাভ করেছে এবং এখানে ১২০০০ টনের জাহাজ নির্মাণোপযোগী জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপন করা সবচেয়ে সম্ভব, কিন্তু এ বকম জাহাজ এখানে রয়েছে ৪ খানার বেশী তৈরী হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় জাহাজ নির্মাণকেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা প্রথমে ৬০,০০০ টন ও পরে ৮০,০০০ টন পর্যন্ত বাড়ানোর মত হওয়া চাই। কাজেই মাঝাপনে দ্বিতীয় বাস্তব অনুবিধা আছে।

কাম্বালতে জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রধান অনুবিধা হচ্ছে এ স্থানটি শিল্পের এলাকা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। এখানে কারিগর ও যুগ্ম শ্রমিকের কর্মে নিয়োগ ও বহাল রাখা কঠিন হবে। ট্রেড অসামরিক ইক্লিনিয়ামিং এর দিক থেকে সুবিধাজনক ছিল, কিন্তু গোডাউনের সম্ভবভাগের কর্তব্যক্ষমতাটি কাটা ও ঐ স্থানটির সঙ্গে সাযোগ্যকারী একটি ভাল কাটা প্রয়োজন হবে বলে যায় তার অত্যন্ত বেশী পড়বে। তাছাড়া প্রতি বছর ঐ কর্তব্য কাটাওয়ার জন্য চালু রাখার খরচ ও অত্যন্ত বেশী। কলকাতার নিকটবর্তী ডায়মণ্ড হাউস ও পেরোথালির মধ্যে পেরোথালি স্থানটিও অপেক্ষাকৃত ভাল। এই স্থানটি ইম্পাত উৎপাদনকারী এলাকার নিকটবর্তী, কিন্তু হুগলী নদী নির্ভরযোগ্য নয়। ক্রমাগত জলব সাহায্যে কর্তব্য কাটা কাটা হলে কোন এক সময়ে হরত জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রের ভিত্তি বিপর্যয় হয়ে পড়তে পারে।

এই বৃষ্টিপ পলটি উপরের পাঁচটি স্থানে জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থার অনুমান করেছেন :—কোচিন— ১২১৬ কোটি টাকা, কাম্বালা—২.০৩ কোটি টাকা, ট্রেড ১৭৩৬ কোটি টাকা এবং পেরোথালি—২.০৮ কোটি টাকা। আর মাঝাপনের ভিন্নরূপ পরিকল্পনার জন্য খরচ পড়বে ১.৪ কোটি টাকা। বিদেশ থেকে বহুপাতি কিনবার জন্য ২.৭৫ কোটি টাকার গৈরমিক মুদ্রা প্রয়োজন হবে, তবে মাঝাপনের জন্য প্রয়োজন হবে মাত্র ১.৩ কোটি টাকা।

এই রিপোর্ট সম্পর্কে ভারত সরকার তার দ্বিভাষ

এখনও প্রকাশ করেন নি। তবে শোনা যায় যে বেহেতু ভারতের পূর্ব উপকূলে একটি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র অবস্থিত আছে, সুতরাং দ্বিতীয় কেন্দ্রটি পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত হয় এরকম ইচ্ছা তাঁরা পোষণ করেছেন। যা হোক এ বিষয়ে সরকারের বিলম্ব না করে দিচ্চা পৌছানো প্রকার।

১. সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা।

ভারতবর্ষের বৈচিত্র্য ভাগ লোকই বাস করে এখানে। অর্থাৎ এই গ্রামগুলির বাস্তু, শিল্প ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি এতদিন বিশেষ কোন দৃষ্টি না দেওয়ার তাগের অস্থায়ী অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি তাঁরা দিতে আরম্ভ করেছেন। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রদায় সেবা সংস্থা গ্রামীন ভারতবর্ষের জীবনকে আরও সুস্থ ও পরিপূর্ণ করে তুলবার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার পল্লী অঞ্চলের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর সমস্ত বকম প্রয়াস ও সেবাদানকারী জীবন-যাত্রার মাম উন্নত করার মধ্য মধ্যে জনসাধারণের মধ্যে আরও ভাল উপায়ে বাস করার প্রয়াসী সম্পর্কে জ্ঞান বাড়িয়ে তুলবার প্রয়াস মেওয়া হয়েছে। কাজেই যে সমস্ত অঞ্চলে এই পরিকল্পনা ব্যাপ্ত হবে সেখানে জনসাধারণ ও সরকার স্বভাবতঃই বেহেতু উন্নতি বোধের আশা করবেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ২৭৬ লক্ষটি গ্রামকে এই পরিকল্পনার মধ্যে আনা হবে এবং তাতে ১৫ কোটি লোক উপকৃত হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ২০০ কোটি টাকা সমাজ উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়েছে এবং এখন দু'বছরে ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়ে গিয়েছে। চলতি সাগে (১৯৫৮-৫৯) ৩৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলাফল টাকার হিসাবে নির্ণয় করা যায় না। গ্রামীন ভারতবর্ষ দ্রুত আধুনিক আর্থনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয় ও তাকে গ্রহণ করে তার উপর ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে। তাছাড়া জনসাধারণ খাতে পরিকল্পনার সঙ্গে তাগের জীবনের একটা অর্থ ও সমৃদ্ধি খুঁজে বের করতে পারে সে বিচিত্র

খুব শুভকর। পল্লীর জনসাধারণকে নিম্নলিখিতসংখ্যারাজস্ব ও হলারসিপূর্ণ জীবন থেকে মুক্ত করে প্রগতিশীল করে তুলতে হবে। এছাড়া প্রথমেই প্রয়োজন পল্লীর কৃষি প্রণালীকে প্রাচীন পদ্ধতি থেকে টেনে তোলা।

কৃষির উন্নয়নের অনেকটা নির্ভর করে সার ও ভাল বীজের উপর। কিন্তু অনেক সমাজ উন্নয়ন অফিসেই ভাল বীজ ও সারি প্রয়োজন মত পাওয়া যায় না। সারের ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকেরা ক্রমেই বেশী আগ্রহান্বিত হচ্ছে এবং সারের সরবরাহ দিতে প্রত্যেকটি সমাজ উন্নয়ন কার্যালয়ের মাধ্যমে কৃষকদের বিকট পৌছানো যার সেহিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ভাল বীজ সম্পর্কেও একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

পরিচালনা মূল্য-নিরূপণ সংস্থা তার প্রথম মূল্য-নিরূপণ বিপোর্টে বলেছে যে অর্ধের যোগান ও সারের সরবরাহের সঙ্গে উন্নত কৃষি প্রণালীর প্রবর্তনের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। অবিকাশ কৃষকেরা এসব সুযোগ বন্ধ করলেও ভাল বীজের ব্যবহার চালিয়ে যাবে। সত্যতঃ অর্থ শক্তির কৃষকেরা এরকম পছন্দ করে এবং তার কারণ এই মস্ত উৎপাদন বেশী লাভজনক। এরকম হলে দেখানো আরও ভাল কৃষি প্রণালী প্রবর্তনের বিশেষ কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে না। কৃষিক্রমের মূল্য স্তরও আধুনিক প্রণালী সম্প্রদায়ের প্রভাব বিস্তার করে। কৃষিক্রম মূল্য সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত নীতি কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর পক্ষে খুব সহকারী। আধুনিক কৃষি প্রণালী সম্পর্কে যেখানে গিয়েছে যে যারের অতিরিক্ত আয়তন বৃদ্ধি উদ্দেশ্যে এই নতুন প্রণালী প্রবর্তনের ব্যাপারে সহজে এগিয়ে আসেন। বীজ, সার, ও অর্ধের প্রাপ্যতার অভাব ছাড়া আর একটি কারণে সাধারণ গৃহস্থেরা নতুন প্রণালীর প্রবর্তন করে উৎপাদন বাড়াতে পারেন না। এই কারণটি হচ্ছে কৃষি উন্নয়ন পরিচালনার সম্পর্কে অজ্ঞতা। কাজেই আরও গভীর শিক্ষার প্রয়োজনের প্রয়োজন রয়েছে।

সার সম্পর্কে দু'রকমের মতব্য শোনা যায়। প্রথমতঃ ক্রমাগত অধিক সংখ্যক শোঁক সারের ব্যবহার করছেন। অপর পক্ষে আবার শোঁক যার সার ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা কমে গিয়েছে। অসন্তোষের কারণ সম্পর্কে কান্দা যার সার ব্যবহার করে আশাহতরূপে হল পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় এই অসন্তোষের কারণ সম্পর্কে তত্ত্ব করা

সরকার। এই তত্ত্বের যদি দেখা যায় যে খারাপ সার সরবরাহ করা হয়েছে তাহলে ব্যবস্থা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সমাজ উন্নয়ন পরিচালনা সম্পর্কে একটি অভিযোগ শোনা যায় যে বেশের ভাল ও খারাপ সমস্ত অফিসের প্রতি সমান দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। যে সমস্ত অফিসে যথেষ্ট সুবিধা হয় কিংবা পূর্ণ থেকেই মেচ ব্যবস্থা আছে সেখানেই সমাজ উন্নয়ন পরিচালনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ভাল অফিসগুলির উৎপাদন আরও ভাল হচ্ছে, কিন্তু খারাপ অফিসগুলির উৎপাদন ভাল হচ্ছে না। ফলে খারাপ অফিসগুলি আগের মতই খারাপ পড়ে থাকছে। অল্প ভাল অফিসগুলির পক্ষে উন্নত কৃষি প্রণালী গ্রহণ করা খারাপ অফিসগুলি থেকে সহজ। উন্নয়ন কমিশনারের বৈঠকে অনুমান করা হয়েছিল যে ভাল অফিস ও খারাপ অফিসে সমাজ উন্নয়ন পরিচালনাকে প্রয়োগ করে তা থেকে ৫০ ও ৩০ এই অনুপাতে ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা দেখে মনে হয় খারাপ অফিসের ফলাফল আরও খারাপ হবে।

পরিচালনা মূল্য নিরূপণ সংস্থা আর একটি শুভকরপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে এই যে কৃষির সমস্ত সমাধানের ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা হিসাবে নিয়ে দেখা গিয়েছে কোন অফিসের দুই তৃতীয়াংশ পরিবার ভাল বীজের ব্যবহার করেন। সার ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু এক মণে ভাল বীজ ও সার ব্যবহারকারী ও উন্নত পদ্ধতিতে চাষকারী পরিবারের সংখ্যা মাত্র এক তৃতীয়াংশ। এর থেকে এই বোঝা যায় যে এই বিভিন্ন উপায়গুলিকে একই পরিচালনার অধিক্ষেত্রে আন হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে না। এই ব্যবস্থাগুলি পরস্পর একে অন্যের সম্পূরক। এর সব ক'টি এক সঙ্গে প্রয়োগ করলে তবেই সব থেকে বেশী ফল পাওয়া যাবে। কাজেই সমাজ উন্নয়ন পরিচালনার কর্তৃপক্ষগণের এ বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। একত্রিক বেশের ভাল মঞ্চ সমস্ত এসকালেই এই পরিচালনার সুযোগ বিস্তৃত করা এবং অন্যত্রিক একই মণে ভাল বীজ, সার ও উন্নত পদ্ধতিতে চাষ প্রকৃতি ব্যবস্থা প্রয়োগ করা এই দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভর করছে সমাজ উন্নয়ন পরিচালনার সাক্ষ্য।

ভারতীয় নাটক

আধুনিক তেলেগু নাটক

শ্রী এ. রামকৃষ্ণ রাও

আধুনিক তেলেগু নাটক কোন নির্দিষ্ট ও বিনিষ্ট পাত্রা
অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। ইহার মূল মূল
অভীভাৱের সংস্কৃত ঐতিহ্যের মধ্যেও নিহিত নহে। ইহাকে
একশ্রেণে এখন মূলের ইটোপীর্ণ ঔপনিবেশিকদের হান
বলা ঘাইতে পারে। ঐ ঔপনিবেশিকগণ আমোহ
প্লাম্বেরের মত ভিক্টোরিয়া মূলের অমৃত রুচি অম্বাসী সাধ
পোষাক সম্বন্ধিত হইয়া পুংডান কালের কতকগুলি
মিলনাত্মক নাটক রচনা করে অভিনয় করিত। এই অবস্থায়
না ছিল প্রাচীন ঐতিহ্যের সংস্পর্শ, না ছিল উৎকৃষ্ট পাশ্চাত্য
নাটকের শক্তি সকারী বনিষ্ট সাহিত্য। এইরূপ
পরিধিস্থিতে অভিনেতা নাট্যকার ঐক্যকর্মাদর্শ নাটকে
নতুন সুর যোজনায় মত্ত কঠোর পরিশ্রম করেন। তিনি
বিশ্বাশনীরও অধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শুধুমাত্র
ছয়খানি পঞ্চাশ বৎসরকাল তেলেগু নাট্যমোহীনের প্রিয়
হইয়া বহিয়াছে। ঐক্যকর্মাদর্শ নিজে সংস্কৃত ও তেলেগু
ভাষা ও সাহিত্যে প্রগতি পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত
নাটকের অঙ্কুরণে কয়েকখানি নাটক লিখেন এবং
সেগুলিতে বঙ্গদেশের গান সংযোগ করেন। তিনি নিজে
অভিনেতা বলিয়া তাঁহার পক্ষে নাটকগুলি রচনা
উপযোগী করা সম্ভব ছিল। তাঁহার রচিত “বিধায়
নায়ক” তেলেগু ভাষার প্রথম শোকাবল নাটক।

কোলচলম্ ঐনিবাস রাও তাঁহার সমাবলিক ছিলেন।
তাঁহার রচিত একখানি নাটকে বিনয়নগরের পতন বর্ণনা
করা হইয়াছে। এই নাটকখানিও তেলেগু রচনা
অন্য হইয়াছে। “চিলা কাথার বিন্দু গুণোপাখ্যানম্”
নাটকটিও বিভিন্ন স্থানে ও বিস্তৃত অঞ্চলে অভিনীত
হইয়াছে। পাণ্ডুরাজিক রচনাবলী বিস্তৃত রসের মত্ত
বিখ্যাত। তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে “কল্যাণম্” বিশেষ
আমোহজনক সামাজিক নাটক। মহাপণ্ডিত বেব

ভেট্টারায়্য শাস্ত্রী লিখিত “প্রতাপরুদ্রায়ম্” একখানি
আধা-ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকও খুব জনপ্রিয়।
এই নাটকের “গুণম্বর” চরিত্রটির সহিত ভাস্কর প্রতিজ্ঞা
মৌগল্যরায় চরিত্রের সাদৃশ্য আছে। তবে এই নাটক
রচনার সময় ভাস্কর কোন নাটক আবিস্কৃত হয় নাই।
গুণম্বালা আলোয়াও লিখিত কল্যাণম্ একখানি
সামাজিক মিলনাত্মক নাটক। আজও এই নাটকটির
অভিনয় দেখিতে বর্ষকল্প বিশেষ আকৃষ্ট হয়।
আলোয়াও-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সাধারণ বক্তৃতা
হইতে কাব্যিক বক্তৃতা করিয়া বাধিয়াছিলেন।

বিনয়নগর, বাম্বাশ্রমী, গুট্টর প্রভৃতি স্থানের নাট্য-
সম্প্রদায়ের নিজ নিজ নাটক-রচয়িতা ছিলেন। তাঁহাদের
অধিকাংশ নাটক লোকের প্রশংসা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু
সাহিত্যিক ঐতিহ্য লাভ করিতে পারে নাই। আবার
এমন কয়েকজন গ্রন্থকার ছিলেন যাহাদের নাটক জনপ্রিয়
হইয়াছিল, তবে অভিনেতা প্রভৃতি ঐ নাটকগুলি রচনা
উপযোগী করিবার জন্য কাট ছাঁট করিয়াছিলেন। তাহেই
নাটক-রচয়িতা ও রচয়কর্মদের শ্রমের মধ্যে একটা
ফলপ্রসূ যোগাযোগ ছিল না বলা যায়।

এখন শত শত নাটক রচিত হইতেছে, বহু মঞ্চের নাট্য-
সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। তেলেগু রচয়ক ও নাট্য-
পরিচর ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে কিন্তু এই পরিচর
রুচি মানে অন্তর্ভুক্ত গভীরতা মর।

অধিকাংশ দেশে নাটক একটা অস্থায়ী হিমায়েত
হয় এবং সামাজিক মৌলভ্যের আশ্রয় অংশ হিসাবে
বিস্তারিত হয়। সকল মূলে প্রশংসা প্রদান নাটক উৎকৃষ্ট
কাব্য বিশেষ। শিল্পের যান্ত্রিকীকরণ ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনে
কলে নাটক বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানে গিয়া
স্থান লাভ করিয়াছে।

আধুনিক পাজীবী নাটক

শ্রীগুরুবচন সিং জালি

টিক নাটক বলতে আমরা যা বুঝি—অর্থাৎ যাতে একটা সতি ও সজীবতা আছে আর যা মজের দ্রষ্টাই দেখা হয়েছে পাজীবী সাহিত্যে তার পুরূপাত হয়েছে মাত্র ত্রিশ বছর আগে। কয়েকজন পাজীবী ভাষাব্যবহারী এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সকল প্রকার অনুবিহার মধ্যেও অভিনয়োপযোগী রসোত্তীর্ণ নাটক দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন। পেনিন পাজীবী সাহিত্যে সৃষ্ট প্রকাশভঙ্গী ছিল না। তার উপর ভাল অভিনয়ের আর নাটোৎসাহীর অভাবও ছিলই। এদিক থেকে পাজীবী ভাষা অন্তর্গত ভারতীয় ভাষা থেকে আসাধা। পাজীবী ভাষা অকলে অন্তর্গত ভাষাব্যবহারী অকলের মত ঐতিহ্যবিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চ আর নাচ গান ও স্ট্রিটনাট্যের চর্চা ছিল না। পাজীবীর ঐতিহ্য হচ্ছে লোক শিল্পের। কিন্তু সেটা বিবর্তনের পরিচালনার পক্ষে ঠাট্টেনি। গ্রামে আর সহরে চিত্তবিনোদের অবলম্বন ছিল, রামলীলা, মহত কৃষ্ণাংকুরী জীবনী অবলম্বনে নৃত্য অভিনয় বা পেশাব্যবহারী ভাষার মূল অঙ্গভঙ্গী। ঐতিহ্যে মজিত ক্রটির ছাপ কতিং দেখা যেত। তবে শিল্পের বর্ধনকালে ক্রাশিক্যাল সঙ্গীতের একটা গায় বজায় ছিল কিন্তু কোন নাটক ছিল না।

আগেই বলেছি বর্তমান পাজীবী শিল্পের শতকের শেষের দিকে পাজীবী সাহিত্যে চসনসই নাটকর আবির্ভাব হয়েছিল। পবিত্রত্ব হলেন লাহোর সহকারী কলেজের অধ্যাপক দ্বন্দ্বচন্দ্র মল। আনন্দের বিষয় যে তিনি এখনও সক্রিয় আছেন। তাঁর সাময়িক ট্রাঙ্কো-কমেডি 'মুতজা' কলেজের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়ার আগে আগে একটা সাক্ষাৎ এনে দেয়। এক বিশু বিবহার দ্বন্দ্ব চর্চণার কাহিনী এতে বৃত্ত হয়ে উঠেছে। নাটক হিসেবে এটা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বহু স্থানে অভিনীত হয়। বঙ্গাল পলাপ আর মাঝে মাঝে কল্পন রঙ্গের অবতারণার জন্য 'মুতজা' নাটক পাজীবীয়ের জয় অয় করেছে। পাজীবী সাহিত্যে এ শুধু এখন সৃষ্টি নয়, মজের দর্বাণিক

সাধন্যমজিত নাটক হিসাবে আজও এর স্থান বজায় আছে।

বর্তমান পাজীবী চতুর্থ শতকে দুটি কারণে নাট্য-সাহিত্যে সৃষ্টিতে উৎসাহ দেখা দিল। একটা কারণ হল লাহোর বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারের উপযোগী নাটকের চাহিদা। আর একটা কারণ হল রাক্ষসনৈতিক ও সংস্কার-মূলক প্রচারকার্য চালানোর জন্য নাটক অভিনয়ের উপযোগিতা স্বীকার। আজ পাজীবী ভাষার বেতার নাটকের ভাষার যথেষ্ট সমৃদ্ধ। যদিও এতে মজের অভিনয়োপযোগী ভাল নাটকের অভাব নেটেনি। তবে নাটক রচনার ভাল শিক্ষাক্ষেত্র এটা। আর রাক্ষসনৈতিক ও সংস্কারমূলক প্রচারকার্য চালানোর জন্য নাটক সাধারণ মজের অভিনীত হয়—তাতে শিল্পকলা বিকাশের তাৎপর্য ঘটে। কিন্তু এ সমস্ত থেকেই নাট্যকার শিক্ষা লাভ করতে পারেন।

শেষবিভাগের পর বহু বুদ্ধিমান মজিত ক্রটি বিবিত্ত পাজীবী বিজ্ঞীতে স্থায়ীভাবে বাস করেছেন। গত দশ বছরে পৌরীন নাট্য সম্ভার কর্তৃক নাটক মজুত করার প্রচেষ্টা পরিচালিত হয়েছে। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িয়ে আছে হরচন্দ্র সিং আর জুবাইয়ান সিং খোশনার নাম। হরচন্দ্র সিং এতদূর লিখতে পারেন, খুব উৎসাহী পত্রমাধ্যমকও বটে। পাজীবী নাটককে জনপ্রিয় করার জন্য তিনি অনেক কিছু করেছেন। তবে উৎকর্ষের দিক থেকে তাঁর প্রচেষ্টা পবিত্রত্বের প্রচেষ্টা মাত্র। জুবাইয়ান সিং কয়েকটি নাটক রচনা করেছেন—আর গঠন সৃষ্টি করেছেন একটি নাট্য সম্প্রদায়। তবে এই হলটি এখন লোপ পেতে বসেছে। কিন্তু এই অংকান চিত্রকাল উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে। দিনমাতে অধ্যাপক অনুপ সিং আর শ্রীবি, এম, বাবার পরিচালনার কয়েকটি নাটক অল্প সাফল্যের সঙ্গে মজুত হয়েছে।

পাজীবী রঙ্গমঞ্চ আজও পড়ে ঠাট্টেনি কিন্তু নাট্য রচনার

বিক থেকে পাক্সানী সাহিত্য দীর্ঘ দীর্ঘ সময় উঠছে। ১৯৪০ সালের পরে বিভিন্ন নাটকগুলি যথেষ্ট সফল এবং ভাষা মৌলিক সমস্তা সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা যায়। বঙ্গবন্ধু গণগাঁ কয়েকটি অপূর্ণ নাটক রচনা করেছেন। মক সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় সেই নাটকগুলিতে পাওয়া যায়। কণ্ডার সিং মৃগশল্যের রচনায় সুস্মিগ্ধা আবেগ দেখে ছুটেছে। তাঁর রচনা সেটা সাহিত্যের মর্যাদা ধারী করতে পারে।

সাহিত্যের দিক থেকে বিচার করলে তাঁর আসন দখল

আছে। তিনি ডি. এস. এমিটের অনুকরণে আধুনিক নাটকের রচনা, রূপক আবেগে ছন্দ নিয়ে পটীকা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁর 'পুন্নিমী সোভর্ন' ভাষ্যের যে কোন ভাষ্যে গবেষণা। অধ্যাপক অনুক দিয়ে রচনা একটা বিবর্তনের পরিচয় পাই। মন্ত সিং শেখন আর একজন ভাল লেখক কিন্তু একটা স্থায়ী মক গড়ে না উঠলে নাট্যরচনায় স্থানীয় শক্তির সম্যক বিকাশ হবে না আর হকের চাহিদা উপলব্ধি করা নাট্যকারের পক্ষে কঠিন হবে।

ইনকব্রেন্সন পুরোহিত সৌজতে

আধুনিক ধরনের রুচিসম্মত ও কারুকার্যময় নানা প্রকার চায়ের সরঞ্জাম, ডিনার সেট, কাপ, ডিস, প্রভৃতি ক্রয় করিবার সময় বেঙ্গল পটারীর তৈয়ারী শ্রব্যাদিই ক্রয় করিবেন।

ইহা ভারতের পক্ষে প্রকৃতই গৌরবের বিষয় যে, বেঙ্গল পটারী বর্তমানে যে সকল শ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছে, ইহা তুলনায়, কি কারুশিল্পে কি গঠনবৈচিত্র্য বা সৌন্দর্য্যে, পৃথিবীর যে কোনও দেশের তৈয়ারী শ্রব্যাদির সমকক্ষ।

বেঙ্গল পটারীজ লিমিটেড

৪৫ নং টেম্পরা রোড, কলিকাতা।

সোল সেলিং এজেন্ট : এলায়েড ডিস্ট্রিবিউটর্স এন্ড কোঃ ২২, জাবোর্ণ রোড,

কলিকাতা।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার বাচনপদ্ধতি ও প্রবচনের সাদৃশ্য

শ্রীএম. সত্যনারায়ণ, এম. পি.

ভারতবর্ষে বহু ভাষাভাষী লোকের বাস। অনেকের ধারণা আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বন্ধ। কেন্দ্রে বহু ভাষা কথিত ও ব্যবহৃত হয় যদিও এদেশে একা দ্বাপনে অনতিক্রম্য ভাষা সৃষ্টি হইয়াছে। একথা অনেকটা সত্য এই কারণে যে, অনেকবার ভারতের বিভিন্ন ভাষার তারতম্য পরিস্ফুটন হয় এবং সেগুলির শব্দসম্মান, ব্যাকরণ, বাচনপদ্ধতি ও উচ্চারণের ভিত্তিতে সতন্ত্র অস্তিত্ব স্থির করবার ক্ষমতা হইয়াছিল।

ভারতে ভাষা সমীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, এদেশে ১৭২টি ভাষা এবং ৪৪৪টি কথ্য ভাষা প্রচলিত আছে। কথ্য ভাষাভাষীদের সংখ্যা খুবই কম। এই কথ্য ভাষাগুলির অনেকগুলি ভারতের পূর্ব ও মধ্য অঞ্চল এবং হিমালয়াক্ষেপে প্রচলিত। তবে কয়েকটিতে এক সময় মদ্রু সাহিত্য ছিল। এক একটি ভাষা এক একটি অঞ্চলের লোকে বিশেষ ভাষার মাধ্যমে ক্রম সংহতির পথে চলিয়াছে। এবং কথ্য ভাষার প্রচলন ক্রমশই লোপ পাইতেছে।

ভারতবর্ষে গত ৫০০-৬০০ বৎসরে সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি ও অজ্ঞাত কেন্দ্রে যে সকল আন্দোলন হইয়াছিল সেগুলির ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাগুলির মধ্যে সংঘর্ষ সাধন সম্ভব হইয়াছে। এবং উভাধের শব্দসম্মান বর্ধিত ও সাহিত্য সম্ভারিত হইয়াছে। সুতরাং আবিষ্কারের ফলে বর্তমানে ভারতের ভাষাসমূহের একটি মান নিহিত করা সম্ভব হইয়াছে। লোকের অক্ষয়জ্ঞান বাড়িয়াছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইভাবে এক ভাষা অল্প ভাষার প্রচলিত শব্দ ব্যাকপদ্ধতি ও প্রবচন গ্রহণ করিতেছে।

প্রত্যেক ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দপ্রকরণ এমনভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং সঠিকপদ্ধতি এমন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে যে বর্তমান যুগে ভারতীয় ভাষা একটি নিহিত রূপ লাভ করিয়াছে বলা যায়। বিভিন্ন

শিক্ষা কেন্দ্রে প্রবর্তিত শিল্পপদ্ধতি ছাড়াও সংবাদপত্র বিভিন্ন শব্দ সম্মান করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। এই সকল শব্দ এক সময় হ্রস্ব প্রচলিত ছিল বা নতুন গঠিত হইয়াছে বা নিকটবর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষা বা সংস্কৃত ও বিদেশী ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

প্রত্যেক অঞ্চলের স্বাক্ষরতা বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য করিলে ভারতীয় ভাষার মদ্রু পরিমাপ করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া লেখাপড়া জানা লোক চলতি সমস্তার সহিত সম্পর্ক রাখিয়া নিজ নিজ ভাষার সাহিত্যের উন্নতিতে কতখানি আগ্রহবান তাহাও জানা যাইতে পারে।

সমৃদ্ধ বিষয়বস্তু

যেদূর শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের জন-সাধারণ এমন কি নিম্নস্তর ব্যক্তিগণও নিজ নিজ ভাষায় মহাকাব্য ভিত্তিতে বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়া আসিয়াছে। ভারতীয় ভাষার কোন কোন মহাকাব্য ভারতীয় কথ্য ভাষার রচিত হইয়াছিল, কোন কোন মহাকাব্য আঞ্চলিক ভাষায়ও লিখিত হইয়াছিল। কোন কোন শব্দ ও বাক্যাংশ পুরাতন হইলেও সেগুলি সমৃদ্ধতা দেখে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। তেলেগু এবং কান্নড়ী ভাষায় সহস্রাব্দিক বৎসর পূর্বে মহাকাব্যের আকারে যে সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আজও ঐ দুই ভাষাভাষী লোকের কাছে অতি প্রিয় হইয়া রহিয়াছে। বিস্তৃত ভারতে ১৪টি ভাষা এবং তদুপর্যায় সংবিধানে ৮৮৩ উপভাষা পরিচিতি হইয়াছে। ১৯৪১ সালের লোক গণনার সময়ও এই ১৪টি ভাষার প্রচলনের কথাই বলা হইয়াছে। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থা ভাষার উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। একটা নদীর কথা এই যে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চল সমুদ্রোপকূল অবস্থিত, সেদিক এগুলিকে উপকূলাকুলীয় ভাষা বলা যায়। সংখ্যার দিক হইতে বিচার করিলে বিক্ষী ভাষাভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং

ভারতের মধ্যাঞ্চলের প্রায় ২-৪১ লক্ষ বর্গমাইল জুড়িয়া এই ভাষার প্রচলন।

উর্দু, হিন্দুস্থানী এবং পাক্কাবীর সহিত হিন্দী ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য বহিরাছে বলিয়া এই তিন ভাষা হিন্দীর সমপর্যায়ভূক্ত হইয়াছে। প্রায় ১৬ কোটি ভারতবাসী অর্থাৎ ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪২ ভাগ এই ত্রিভাষাগুলি ব্যবহার করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অসমীয়া ভাষা ব্যবহৃত হয় বলিয়া উহাকে সংবিধানে স্থানে বেতরা হইয়াছে। দিল্লী এই ভাষাভাষীর সংখ্যা ২০ লক্ষের অধিক হইবে না। কান্দোয়ী ভাষাভাষীর সংখ্যাও এই অল্পপাণ্ডে কম।

এই ১৬টি ভারতীয় ভাষার সংস্কৃত ও উর্দু ভাষা স্থান লাভ করিয়াছে। এই দুই ভাষার প্রতি সাহিত্য এবং ব্যবহার হইতে ঠিক কত সংখ্যক লোক এই দুই ভাষা ব্যবহার করিতেছে তাহা নিধারণ করা কঠিন। অসমীয়া, কান্দোয়ী, হিন্দী, উর্দু, পাক্কাবী এবং সংস্কৃত ভাষা বীর বিলে বাকী আটটি ভাষাই উপকূলাকুলীয় ভাষা। তন্মধ্যে জঙ্গরাটি, মারাঠি, কানাড়া এবং মালয়ালম পশ্চিম উপকূলে এবং বাকী চারটি পূর্ব উপকূলাকূলে প্রচলিত। পশ্চিম উপকূলের ভাষাগুলি ২-৭৭ লক্ষ বর্গমাইল এবং পূর্ব উপকূলভাগের ভাষাগুলি অর্থাৎ তামিল, তেলগু, ওড়িয়া এবং বাংলা ভাষা ২-৪ লক্ষ বর্গমাইল স্থানে কথিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হিন্দী এবং মনগোজীর ভাষাগুলি মোট বর্গমাইলের ৪০ ভাগ অকূলে এবং জঙ্গা আটটি সদৃশ ভাষা প্রায় সম পরিমাণ স্থানে প্রচলিত।

ভাষাবিদগণ স্বর্ণযাত্রীত কাল হইতেই নিজেদের সুবিধার দৃষ্ট ভাবতকৈ দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন—আবিড় ও আবিড়পণ। আবিড় ও আবিড়পণ যে ভাষা ব্যবহার করিতেন তাহা পৃথকভাবে দেখাইবার অজুই এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। আবিড়ী ভারতের ভাষাগুলির মধ্যে ক্রিয়া, ক্রিয়ার বিশেষণ এবং গাভুরূপ বহুসাংখ্যেই একরূপ। আবিড় ভারতের ভাষাগুলির ক্ষেত্রেও একথা সত্য। ভাষা-বিদ্যেব মতে আবিড়ী ভারতে প্রধানতঃ চারিটি ভাষা কথিত হয়। সেগুলি হইল তামিল, তেলগু, কানাড়া এবং মালয়ালম। বিদ্যা অকূলের দক্ষিণভাগ ভাষার ভিত্তিতে যে চারটি অকূলে ভাগ করা হইয়াছে তাহা

প্রধানতঃ ভৌগোলিক কারণেই হইয়াছে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা দক্ষিণ ভারতকে বিভক্ত করিয়া মালয়ালম হইতে তামিলকে এবং কানাড়া হইতে তেলগুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। কানাড়া এবং তেলগু ভাষা মারাঠি ভাষার উপর বহুসাংখ্য এবং জঙ্গরাটি ভাষার উপর কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত বঙ্গদেশ মধ্যভারতে যে একটি মাত্র ভাষাই (যদিও কথ্য ভাষা পৃথক) চালু বহিরাছে তাহা কারণ এখানে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগে কোন বাধার কঠি হয় নাই। এখানে কোন পর্বতমালা নাই। কাজেই একথা পছন্দ্য বোধ্য যাহা যে, ভৌগোলিক কারণই ভারতের ভাষাভিত্তিক বিভিন্নতার মূল কারণ। একজন আবেকজন হইতে স্বতন্ত্র থাকিবার উদ্দেশ্যে এই পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।

বিজ্ঞান আজ এই প্রাকৃতিক বাধাকে মন করিতে সমর্থ হইয়াছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই সহজ হওয়ার দ্বারা জনগণের মধ্যে একোত্র ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রত্যেক প্রত্যেকের ভাষা বলিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে। দেশে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বিভিন্ন পর্বতের সংঘর্ষের কাজ পুত্রাধনে চলিয়াছে। এক অকূলের ভাষা অপর অকূলের ভাষার রূপান্তার সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। অদ্যাবধি মধ্যম ভাষার এই পরিচর্য গঠিতেছে। কলে ভারতীয় ভাষাগুলিতে বিভিন্ন অকূলে প্রচলিত বাচনপদ্ধতি, শব্দ অঙ্গপ্রবেশ করিতেছে। সামাজিক রীতি, বর্ষাবর্ণ এবং ভারতীয় কীর্তনের মূল ধারা পারস্পরিক যোগাযোগ এবং উন্নতিতে সাহায্য করিতেছে। চিন্তাশারা, ভাবন্যাপন প্রণালী এবং আচার ব্যবহারের সামঞ্জস্য বিধানের মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন অকূলের সাহিত্যে গৃহীত ও প্রচলিত হইতে আরম্ভ করিবে। ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ভারতের সংহতি সাধন

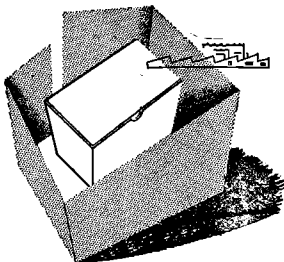
ভারতীয় ভাষাসমূহের সংহতি সাধনের উদ্দেশ্যে ভাষা অকূলভাগকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম এবং মূল বিভাগটি হইল সামাজিক যোগাযোগ। দ্বিতীয়টি

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ; তাহা হইল কৃষ্টিগত যোগাযোগ এবং
কৃত্রিমটি বাস্তবনীতি এবং সামান্যতাহিক। ভারত হিন্দু
এবং কৃত্রিমটির ক্ষেত্রে ক্রমবৃত্তিতে অগ্রসর হইতেছে।
ভারতীয় ভাষাসমূহের শতকরা ৬০ ভাগ শব্দ গ্রন্থে দ্রব
ভাষাতেই রহিয়াছে। ইহাদের মূল দ্রব সংস্কৃত বিধা
আর্য্যবী, পার্শী বা ইংরাজী। এইরূপ সমগ্র শব্দের
ব্যবহার ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। এইভাবে এমন একদিন
আসিবে যখন কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতি সকলেই ভাষাগত
অসুবিধা ভোগ না করিয়া ভারতের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে
পারিবেন। ভারতীয় ভাষাসমূহের বর্ণমালা যদি এক হইত
তাহা হইলে পরস্পরের শব্দভাণ্ডার এবং বাচনপদ্ধতিতে
সামঞ্জস্য বিধান হইবে সম্ভব হইত। ভারতের শিকিত
যান্ত্রিকের ৯০ ভাগ এখনও একরূপ ধ্বনিবিশিষ্ট বর্ণমালা

ব্যবহার করিয়া থাকেন। শুধুমাত্র বর্ণমালায় রূপ ভিন্ন।
এই অসুবিধা দূর করা সম্ভব নহে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু
সর্বভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি মাত্রিভিন্ন সমগ্র বর্ণমালা সৃষ্টি
করা যাইতে পারে। যেমন রূপে বাংলার একটা প্রবচন
আছে 'হুই মোকাত পা বেগরা'। যো নাও পর প্যার
রাখনা' ইহাও সহিত বাংলা প্রবচনের যথেষ্ট মিল আছে।
অ.ব.বা. বাংলাতে আছে 'বেগরালের কান আছে'
হিন্দীতে বলা হয় 'বিগরার কে তি কান হোতে হায়'।
তেলেগুতে একে বলে 'গোড়ানাহু চেতুন্ন উনুতাই'।
তামিলেও এই প্রবচনটি একরূপভাবেই বলা হয়।
এইভাবে অনেক মিল বুঝিয়া বাহির করা সম্ভব। ভারতীয়
ভাষাসমূহের অন্ততম আত্ম আবিষ্কার করিতে হইলে
মনে আসে সর্বভারতীয় হইয়া উঠিতে হইবে।



factory freshness preserved



with

★ **POLYBOARD**
★ **POLYKRAFT**

packaging

Acid, alkali and moisture resistant polythene-coated POLYBOARD and POLYKRAFT help to preserve the factory-freshness of your products, whether they be confectionary, tea, biscuits or chemicals.

These new, revolutionary packaging materials are several times stronger than ordinary board or paper and prevent damage to your products even when they are subjected to rough handling. And the eye-appeal of your products is enhanced considerably because of the glossy finish on POLYBOARD and POLYKRAFT.

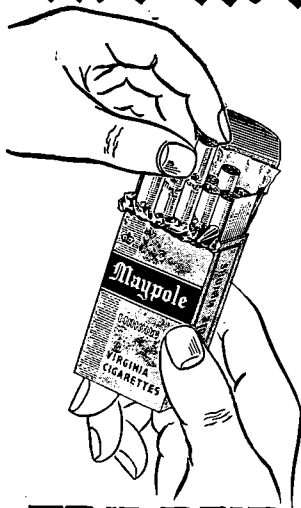


CHANGE TO
★ **POLYBOARD POLYKRAFT**
PACKAGING FOR INCREASED SALES

ORIENT PAPER MILLS LTD., CALCUTTA.

OPP-104

অতি... স্নোপোল



সব চেয়ে ভাল

১/০ আনার ১০টি, ১১/০ আনার ৫০টি

পুস্তক পরিচয়

জীবনের কল্পাপাত্তা : সবলা দেবী চৌধুরাণী । সাহিত্য
সংসদ । ৩২ এ আপার মার্জার রোড, কলিকাতা ৯ ।
মূল্য ৪. ।

বালা আত্মচরিত সাহিত্যে এবং সামাজিক ইতিবৃত্তে
আর একখানি মূল্যবান গ্রন্থ সংযোজিত হ'লো ।

স্বর্ধকুমারী দেবীর কল্পা, স্বরীক্ষনাথের ভাগিনেয়ী
সবলা দেবী চৌধুরাণীর নাম বেশবাসীর সুপরিচিত ।
কেবল পারিবারিক গৌরবের মত তাঁর খ্যাতি নয়, খ্যাতি
তাঁর নিম্ন ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার মত । 'ভারতী'
সম্পাদনার, স্বদেশী গান রচনার যেমন তাঁর সাহিত্যিক
স্বপ্নের চূড়ান্ত মিলেছে, তেমনি তাত্ত্বিক কৰ্মে স্বাধীনতার
সংগ্রামে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাঁর সাহসের ও দেশ-
প্রেমের । স্বদেশী যুগে 'বীরাষ্ট্রনী' উৎসব তাঁরই প্রবর্তিত ।
যেদের ছেলেমেয়েরা বীর হোক, মেয়ে মনে সবল হোক,
এই ছিল তাঁর কাব্য । দেশ জুড়ে শরীর চর্চার আনন্ড
প্রতিষ্ঠার ছিল তাঁর প্রবল উৎসাহ । নানা বিষয়ে তাঁর
উদার স্বাধীন মস্তের নিদর্শন এ গ্রন্থে অনেক আছে ।

শুশ্রূষা সবল ভাবায় তিনি নিজের জীবন কথা লিপিবদ্ধ
করেছেন । ছেলেবেলাকার ছোট ছোট স্বপ্ন দুঃখের স্বাভি,
স্বাভাবিক সন্তানসম্ভাষণ, স্বাধীন জীবিকাকর্মে চেষ্টা,
বিবাহ প্রসঙ্গ এ সবের সঙ্গে ঠাকুর বাড়ীর পুরোনো দিনের
অনেক কথা, তখনকার সমাজের অবস্থা, দেশী বিদেশী
খ্যাতিমান লেখকদের কাহিনী—নিপুণভাবে তিনি বর্ণনা
করে গেছেন । সে যুগকে ঝাঁপ আনতে চান এবং মানুষকে
অন্তরের দিক থেকে উপলব্ধি করান চান, তাঁদের কাছে এ
গ্রন্থ পরম উপভোগ্য মনে হবে । বইখানির প্রচ্ছদপট
এবং বহিঃশঙ্কাও মনোহর ।

বাছুরী : মমত বোশ । সোমপ্রকাশন । প্রান্তিধাম—
অভয়াশ্রম, কলেব ট্রাষ্ট মার্কেট, কলিকাতা ১২ ।
মূল্য ১. ।

অভিমান : হীরেন্দ্রনাথ বসু । প্রান্তিধাম—সদ্যাব সুলভ ।
কলিকাতা ৩৩ । মূল্য ১.০ ।

ছ'খানিই নবীন কবির কবিতার বই । কিন্তু কবিতা-
গুলি এখানকার অধিকাংশ কবিতার মত দুর্বেধ্য নয় ।

বিতীর্ণখানির রচনা কতকটা গীতাঞ্জলি-যুগের ঐতিহাসিক,
প্রথমখানি অনেকাংশে স্বতন্ত্র । কবিদের দিক থেকে
প্রথমখানি চিত্তাকর্ষক । যে 'বাছুরী' চিরদিন রূপ-
মুদ্রের চোখ তুলিয়ে, মন তুলিয়ে এসেছেন, তাইই উৎসাহ
গান গেয়েছেন কবি । "বাছুরী তুমি অনেক বিচ্ছেদ,
হাঙনি স্মরণ", এ খেঁদার হৃৎ বেজেছে সকল কবিই
কণ্ঠে । কল্পনা-বাছুরী শুধু স্বপ্নকাল মেলে দেয় । "তোমার
হৃৎগোষে স্বপ্ন সুস্বাদু নাকো ।"

"তুমি কি কেবল জীবনে মরণে চিরযুদ্ধের রাণী,
পাছাড়ের সাথে মোংঘর ক'নাকানি ?"
যে হৃদয় অঙ্গুষ্ঠিত, বৃক্ষাশ্রয়ী—রোমান্টিক কবিতার
প্রাণ, এ কাব্যে তাঁর অঙ্গবদনই ।

পলাশীর প্রান্তরে : হরিশচন্দ্র মজুমদার । সংস্কৃত লাইব্রেরী
৩২, আপার মার্জার রোড, কলিকাতা ৯ ।
মূল্য ১ট।. ৫০ ন. প. ।

যেদের ছেলেমেয়েদের কাছে মনোজ্ঞ করে ইতিহাসের
কথা বলবার প্রয়োজন অপরিণীত । কিন্তু তেমন করে বলবার
লোক বেশী নেই । হরিশচন্দ্রবাবুর বলবার ভঙ্গীটি বড়
মনোহর । মনে হয় গল্পই বলে যাচ্ছেন ; অথচ মনগড়া

কথা নয়, ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের সমালোচিত ইতিহাসের কথা। সিংহাসনের ঘোষ ছিল না এমন নয়, কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা তাঁর ঘোষগুলোকে বড় করে দেখিয়েছেন। সে সম নিঃসন করেছেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ মনীষীরা। হরিয়াসবাবু সিংহাসকে ঘোষণা দিয়ে বখাখবতাবে ঘোষার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা বিধায় নিয়েছিলেন, সে ঘটনার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতে ও সেক্ষেত্র তরুণ মনে যেমন নক্সার করতে এয়াস পেয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য বহুলাংশে সার্থক হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

মুগ্ধসন্ধি : বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। ১০, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলিকাতা ১২। মূল্য ২ টা, ৫০ ন. প।

মুগ্ধসন্ধির জীবন নিয়ে 'বনকুল' নাটক লিখেছেন। আরও দু'একখানি নাটক তারপর রচিত হয়েছে। তবু এ নাটকখানি নিরর্থক নয়। মুগ্ধসন্ধিকে বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে যে বিপুল আলোড়ন এগিয়েছিলো। এছকার বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা সূক্ষ্ম কৃষ্টিয়ে তুলেছেন এবং সেই সঙ্গে মুগ্ধসন্ধির প্রতিভা ও যুগের প্রতিিনিবদ্ধ কবিতার শক্তিরও পরিচয় দিয়েছেন। বহু উপাধান অবলম্বনে নাট্যকার তাঁর 'মুগ্ধসন্ধি'র সৃষ্টি রচনা করেছেন, কিন্তু রচনাটি উপাধান-ভূগু হয়নি, পূর্ণাঙ্গ সজীব আকারে দেখা দিয়েছে।

সোনার হরিশ : শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা প্রকাশনী। ২ বি, ব্রহ্মাবন পাল লেন, কলিকাতা ৩। মূল্য ১০।

নমিতা মুখোপাধ্যায় ছদ্ম নামে এছকার এতদিন বিভিন্ন কাগজে কবিতা লিখে আসছিলেন, এবারে স্বনামে আত্মপ্রকাশ করলেন। 'সন্ধি'তেও তাঁর কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তখনই তাঁর বৈদিত্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। জীবনের স্রষ্টাশ্রুতকে

কোমল মহাহৃদয়ের রূপে সঙ্গ করে তিনি তাকে মনোজ কবিতারূপে উপস্থিত করেছেন। তাঁর কবিতা আকাশ-ব্রহ্মও নয়, বস্তুভারে ভারাক্রান্তও নয়, প্রতিদিনের হাসি-অশ্রুই সার্থক রূপায়ন। কল্পনার আলোর বহিন হয়ে উঠেছে স্বরস্বার, পঞ্চাট, বৈদিত্য। 'স্বাভিনিকতনে পঙ্খা' 'যুগুজালা ছাড়িয়ে রাতি', 'রাত বারোটার কাণ', 'কলকাতা', 'হাদপাতালে'—একাত্তরে কবির বাস্তবস্থিতি ও কল্পনা কুলতার পরিচয় দেয়।

অবাধ্য শিশু ও শিকা সমস্তা : বিত্তরঞ্জন গুহ। সংস্কৃতি লাইব্রেরী। ৩২ আপার মার্জার রোড, কলিকাতা-১। মূল্য ৩।

ঔরুত বিত্তরঞ্জন গুহ স্বর্শন শাস্ত্রের প্রদীপ অধ্যাপক। শিকার বিভিন্ন বিষ্ নিয়ে তিনি দীর্ঘকাল ধরে জগৎপ্রাচী আলোচনা করে আসছেন। শিকার-শিকারীর কাছে তাঁর রচনা সমাবৃত। সাধারণ পাঠকও পড়লে উপকৃত হবেন। অবাধ্য শিশুকে মানুষ করা—আজ অনেকের ধরেই বাস্তব সমস্তা; বিভ্রাটের তো বটেই। কিতাবে তাকে সুপথে নেওয়া যায় তা বীরভাবে তিস্তবীর। প্রশ্র দিয়েও নয়, বৈধ হারিয়েও নয়, লক্ষ্য স্থির রেখে সধিক্ততার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। এছকার বহু লেখকের মতামত বিচার করে অবাধ্য শিশুর মনোবিজ্ঞানের চেষ্টা করেছেন, তাঁর শিক্ষাসমস্তার সমাবলম্বনও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

কেবল 'অবাধ্য শিশু'ই এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। 'মানসিক স্বাস্থ্য' 'অধঃকারের আশ্রয়', 'নতুন মা', 'রবার্ট ওয়েনের শিশু বিভ্রাট', 'দেবদেবীর যুগে ইউরোপে কেমুইটের বিভ্রাট', 'নতুন শিক্ষানীতির ইঙ্গিত', 'ইংল্যান্ডে ব্রিটিশ ও অমিকের সম্মানদেব শিক্ষাব্যবস্থা', 'মাধ্যমিক শিক্ষাসংস্কার পরিচালনা' ইত্যাদি বহু বিষয় তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

যেমন বিষয় স্তপে, তেমনই রচনাস্তপে বইখানি মূল্যবান। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সুখপাঠ্য, তথ্যপূর্ণ এবং অতিমিবেশযোগ্য।

—দী।

দি ইন্টার্নেটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

[১৯৪৩ সালে রেজিস্টারী কৃত]

হেড অফিস : ২, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১

অমুমোদিত মূলধন	৮,০০,০০,০০০
বিলকৃত ও স্বীকৃত মূলধন	৪,০০,০০,০০০
আদায়িকৃত মূলধন	২,০০,০০,০০০
সংরক্ষিত ভহবিল	১,৩৪,০০,০০০

শাখা সমূহ

ভারতে :—সকল শিল্প ও বাণিজ্য প্রধান নগর ও সহর

ব্রহ্মদেশে :—রেঙ্গুন, মোলমিন, আকিয়াব, মাম্বালয়, বেসিন

যুক্তরাজ্যে :—লণ্ডন

পাকিস্তানে :—চট্ট করাচী

মালয়ে :—সিঙ্গাপুর, পেনাং, কুয়ালালামপুর

তাছাড়া :—হংকং

এজেন্ট

পৃথিবীর সমস্ত দেশে—ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া

ব্যবসায় ও ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্যাবলী :—

এই ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ, অমুমোদিত জামিনের পরিবর্তে দানন দান, বিল খরিদ, ডাক্ট দান ও তারে টাকপ্রেরণের ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করে। আন্তর্দেশীয় ও বৈদেশিক শাখা সমূহ এবং পৃথিবীব্যাপী ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ব্যাঙ্ক সর্ববিধ ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের সুযোগ দান করে।

জি, ডি, বিড়লা

চেয়ারম্যান

এস, টি, সদাশিবন

জেনারেল ম্যানেজার

ছবি-নাটক-জলসা

রয়েন চৌধুরী

ছবির বাজার অর্থাৎ তার কাঁচা মালের বাজার অর্থাৎ হয়ে উঠেছে। বিহারী বহুরের পোড়ার দিকে এটা আদর্শ কেউ একবার ভেবে দেখিনি। অত্যা কিছু এক সংশ্লিষ্ট ভাববার মতো উপায়ও নেই; সমস্তা তো একটা নয়, রয়েছে অগুণ্টি। নববর্ষ শুরু হওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট পথ বাট ঘোষের তাতে পলানো শিল্প হয়ে উঠেছে তবু কালপৈশাখীর বেষ্টা যেনন একবারে পাওয়া যাচ্ছেনা, অধিকল সেই অবস্থা হচ্ছে ছায়াছবির প্রবেশককর। তাঁরা চাতকপাণির মতো তাকিয়ে রয়েছেন কখন নেপেটিং এবং পণ্ডিত কিম্বা পাবেন ছবির কাণ শেষ করবার ক্ষেত্রে। কেউ স্মৃতিং করতে করতে হাত গুটিয়ে বসে আছেন, কেউ প্রাণিক কাণ দারা করে চলচ্চিত্রবিত্ত হয়েছেন। আনো কানাচে ঝাঁক ঘোরাতুরি করছিলেন, 'নামতো কি নাম:বা না' ঝাঁকের কনক কথ্য ছিলো—সকলেই একসঙ্গে শুধু। শেষের হলয় কথ্য বতর, তাঁহেত স্মৃতি সামাজ্যই হচ্ছে, কিন্তু এখন ও বিতীর পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলির দুর্গম শেষ নেই। ট্যাকসি ভাড়া করে বসনা হয়ে বিতীর দিনে 'নদী নয়, কানীতলা'র ঝাঁক আটক হয়ে পড়ে না হোক অর্থাৎ বিতে বাগা হন (কাণ নিটার চানু হলো তার গতিক তো আর বিতীতে আটকাত পারবে না, তার ক্ষেত্রে অর্থাৎ বকর) ছবি নির্মাতাদেরও অবস্থা তাঁহের মতো। শিল্পী কলাকুশলী প্রকৃতি সকলের পাওয়ার নিটারে টাকার অর্থ বড়ি বড়ি বেড়ে চলেছে, কর্তৃপক্ষ বর্ষাব বিনেও এই ট্যাক্সির সোয়াইর মতো আড়ষ্ট হয়ে একবার বাজার হল, একবার পকেটের ব্যাগের দিকে ব্যাঙ্গ বুলীপাত করছেন।

ইতিমধ্যে বরাণ-বাহবা চানু হয়েছে। কিন্তু তাকে সমস্তা সমাধান ট্রিক মতো হচ্ছেনা বলে খবর পাওয়া

গেছে। এ ব্যবস্থার ক্ষেত্র বিভাগ থাকার অনেক এখনো ছাড়পত্র পাননি, ফলে অবস্থা হয়েছে তাঁহের ত্রিশছুর মতো। কর্তৃপক্ষ-প্রাণ সেই সকল প্রবেশককে সমাধুত্বিত্তি জানাচ্ছে।

আর এক ক্যামাথ বেবেছে—এখন আবার পণ্ডিত পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে ছবি তোলা গেলেও ছবিটা কেমন হয়েছে তা পরীক্ষা করবার উপায় নেই। এ ধরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হতে বাগা যদি না বেশে ফিখ তৈরিব কারখানা অবিলম্বে চালু হয়। পরের দুখ চেয়ে চিরকাল চল না এবং চলা উচিতও নয়। কিন্তু তাই বলে যথাবিহিত ব্যবস্থা না করে বাইবে থেকে কাঁচা মাল আনার অত্যধিক বিধিনিষেধ প্রয়োগ করার প্রচেষ্টার অবস্থা ঘোরালো হয়। সে বিষয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষের বুলী সমাণ রাখতে বিশেষভাবে অগ্রগোষ জানাচ্ছে।

সর্বশেষ ধরণে একশাণ unexposed film আমদানির পরিমাণ কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। তার মানে শতকরা চল্লিশ ভাগ বণিত হয়ে বাট তাগে প্যাড়িয়েছে। এই দুইটি ফলে সমস্তা কিছুটা মিটেবে।



বাঙলা ছবি বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাফ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। একটা কিছু করে নাকল্যাতের পর চূপচাপ বসে থাকার মত মনোত্বিত্তি আকাল অন্তত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। খুব বেশি না হলেও দু চারজনকে সমায় সমালীন অবস্থান্তেও আমরা একত্রে দেখতে পাচ্ছি। 'পরের পাঁচালী'র পর এই তিন চার বছরে আট বর্ষ থানাও তো নতুন ঝাঁচের ছবি দেখা গেছে আর সে ছবি বেশে এবং বেশিরে বহু-বাইবে বহু বার্ষবা মিলেছে। সর্বশেষ প্রচেষ্টা

আপাতত 'ডাক হরকরা'। বর্ষক সাধারণ এ ছবিকে খুবই পৃষ্ঠপোষকতা করছেন, বলতে বাধ্য নেই সেটা খুবই উপযুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই সংশে এটাও হল হরকার যে পাঁচ বছর আগে এ পরেই ছবি তৈরি করতে কোনো প্রয়োজক সাংস করতেন না আর দুঃসাহসী কেউ মতীয়া হয়ে করে কেগলেও তাঁকে মরিয়া যেতে হতো। তিনি চিত্ররঙ্গ থেকে চিব-বিদ্যার নিতেন। উদাহরণ-কল্প 'ছিরবুল' ছবির নাম করা যেতে পারে—সর্বপ্রথম তারতীয় চবির আন্তর্জাতিক সম্মানপ্রাপ্তি হয়েছিলো এ ব্যাং, কিন্তু তার বেশি আর কিছু পাননি কর্তৃপক্ষ। নির্বাণলাভ করেছিলো ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে।

আর একটি দুঃসাহসী পরিচালককে আমরা দেখতে পেয়েছি বর্তমান সময়ে—ইনি 'যাক্সী'র কাহিনীকার পরিচালক সংচিধ্যানন্দ সেন মজুমদার। পুত্র বছর পশ্চিম-বঙ্গ-সংস্কার প্রযোজিত 'তারত বর্ষক' ট্রেপে বেরিয়েছিলেন শুধু বর্ষকের উদ্দেশ্যে। কিন্তু নিজে দেখেই আত্ম হসেন না, এ বছর আবার তিনি বেরুলেন বিরাট হলবল নিয়ে। তারা তারতের প্রায় চল্লিশটি বিখ্যাত ব্যারগার স্তাটিং করে ফিরে এসেছেন। সম্পূর্ণ অভিনয় তাঁর ছবির বিষয়বস্তু। এর ছবির আঙ্গিক প্রকৃতি সবকিছুই নতুন, শিল্পী-কলাকুশলীরাও তাই। অর্থাৎ পরিচালক শ্রী সেন মজুমদারের দুঃসাহস অপরিমেয়। নতুন-কিছু করতে এই যে সর্বকণ করে অভিযাত্রা, এর প্রতি আমাদের সকলের সমাহুত্বিত স্বতঃ-উৎসাহিত। 'যাক্সী'র ব্যাং সার্বক বোক অধুও গুণিত্যে।

সময় প্রায় আমাদের কোনো বিরাট কাছ খুব সম্ভবে সম্পন্ন করতে পারি। কথার বলে 'বুকের খ্যাতি একের বোকা'। বাঙলা দেশে বিশেষ করে Capital shy হয়ে পড়েছে। একজনকে পকে সব সময় সজব নয় মোটা টাকা লরি করা। তাই আমরা চ্যাপ্লিন কো-অপারেটিভ ফিল্ম-সোসাইটির উদ্যোক্তাদের স্বাগত জানাচ্ছি। যশে মিলে কাছ করতে এঁরা সমবেত হয়েছেন এবং সেই উপলক্ষে আমাদের দুঃসাহসী ডাঃ বিধানচন্দ্র বায়ের উপস্থিতিতে এঁদের সংকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন।

উপস্থিত দুঃসাহসী ছবি তুলবেন, তার প্রথম খানির নাম 'মোহন-ভাঙার মিল'। সুরেশ সেনগুপ্ত রচিত কাহিনীর পরিচালনা করবেন ললিত চক্রবর্তী। 'প্রাচীর' এঁদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। কিশোরবন্দ ছবি সাধারণত হয় না বলেই এঁরা যে অত্যন্ত নোচেন ত্রুটি। মনোজ ভট্টাচার্য পরিচালনা করছেন। ছবিটি রচনা শান্তি গুপ্তের।

পর পর করে কখনো সার্বক ছবি তৈরি করে এইচ, এন, সি, প্রোডাকশন এখানে তুলছেন অতিভাঙ্গুমাংসের 'ইন্দ্রাণী'। সেলুলয়েডের ভিত্তার প্রথম সূচীত হতে চলছে অতিভাঙ্গু রচনা। প্রযোজক হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্ত প্রমাণ্য হাবী রাখে। সূচিত্রা-উত্তম তারকারিত 'ইন্দ্রাণী'র পরিচালক নীরেন শাহিড়ী বর্তমানে চিত্রগ্রহণে ব্যাপৃত।

শ্রী চিত্রমেহর 'কজা' অমিত সেনের অধিনায়কত্বে যথার্থিতি সামলস্কার নিয়োজিত।

'নীল আকাশের নীচে'—হেনস্ত-বেলা প্রোডাকশনের নির্মলমান ছবিটি এবার সাড়বৎ চিত্রাচিত্র হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যেই বর্ষককুল ছবিটির মুক্তির দিন গুণছেন—প্রযোজকের পক্ষে এটা বিশেষ কামনা।

অধিক ঘটক পরিচালিত 'অধ্যাতিক'-এর স্তম মুক্তি হয়ে গেছে। এল, বি ছিহম ইন্টারন্যাশনালের সর্বাধুনিক প্রচেষ্টা এটি। স্রেষ্ঠাংশে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছেন আর আছে তাঁর ভাড়াচোরা গ্যাফিটি। এ-ও একটি দুঃসাহসিক প্রয়াস। বাঙলার ছবিওয়ালারা নতুন প্রচেষ্টা করতে পারলে ছেড়ে কথা ক'ন না—যার বাব তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আগামী সাংখ্যার এ সম্বন্ধে আলোচনা করাব ইচ্ছা রইলো।

আর, ডি, বনসল-প্রযোজিত 'শশীবাবু সংসার'-এর দেখা সর্বাধাংগে মিলবে অতিবে—তারি সর্বশেষ প্রকৃতিতে ব্যাপৃত রয়েছেন পরিচালক হুবীর মুখার্জি। বাঙলার

অধিকাংশ ডাককেই নেয়া হয়েছে 'মন্দিরবাবু সংসারে', কাজেই সবার বাহবা তাঁদের আশাতিবিক্ত প্রাপ্তি ঘটবে।

ডাক-হরকরা (সমালোচনা)

নেবে কি মেবে না এই তিক্ত অসুস্থতির অংশমান ঘটেছে। সত্যি সত্যিই যাওয়া দেশের বর্ষক 'ডাক-হরকরা' -কে তাঁদের আন্তরিক ঐতিহ্যে দিচ্ছে তাহলে টেনে নিয়েছেন। আর একবার প্রমাণ হোলো ভালো ভিনিস গেলে এখনও সবাই এগিয়ে আসতে আনন্দিত নন। অর্থাৎ যেখা যাচ্ছে হাতাধের দিক থেকে। তাঁরা এখনও ছক-বাঁধা বস্তাপচা মাল নিয়ে চিবাচচিত্ত প্রকার পেতলের ওপর মিনের কাছ করে তাঁওতা ঘেঁষে টাকার বিষ্টি আশা করছেন। অবশ্য এটাও ঠিক, অর্থ হুঃখ একেবারে পাশাপাশি বিরাগ করে। এইমাত্র দেখা গেল ডাক-হরকরার বিরাট লাইন, ঠিক সেই মুহূর্তে যেখা যাচ্ছে ঠিক উল্টো দরপের আর একটি ছবি বর্ষনেজ্জের অবিচ্ছিন্ন লাইনের বহর। সত্যিই এটা বিচিত্র দেশ। তাহলেও আশাঘের দিক থেকে প্রতিনিহত চেষ্টা করা উচিত সকলের কৃতি পরিবর্তনের। চারদিকে এ প্রয়াস হতে থাকলে স্বকল হতে বাধ্য। কোনো একটা বিশেষ দৃষ্টের প্রোথাক্ত ঘটতে যেওনাও উচিত নয়।

কোনো কালে এমনটি দেখা যায়নি এবং যেখা যাচ্ছে না, এ দরপের মন্তব্য না করেও মোর গলায় আমরা অগ্রগামী'

গোষ্ঠীকে সাধও সন্তোষ আনানি। তাঁদের বৃষ্টির প্রসারতা সত্যিকারের এ প্রসংসার যোগ্য। বারা আশকের প্রাণহীন শমাধে পরিভ্যক্ত, নিগূহীত অর্থ তাহের ভাঙিয়ে খেতে শমাধের জীবরা মোটেই পদ্মাত্মক নয়, সেই 'বোনের কাছে তুঘন মাঝে' আশাঘের বাঁচিয়ে রাখার মানুশদের একজনকে ছায়াছবির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন বাঁরা, তাঁদের হস্তে অনেকের মত আশাও পরিভ্যক্ত।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আসোচনা করলে অনেক ভিনিসেরই কৃতি ধরা যায়। সে প্রচেষ্টার বিরত থাকে গেল। আশাঘের বাঁধা সামান্য খুঁটু বিচ্যুতি পরিচালনার মাঝে আছে অসুস্থবিস্তপে পরিচালক-গোষ্ঠী সহজেই তা থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

শিল্পীদের মধ্যে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত গাঙ্গুলী, শান্তিধের বোম্ব, সাফিক্রী চ্যাটার্জি ও শোভা সেন এক কথায় চমৎকার। কালীবাবু এই একটি চরিত্রের (নাম ভূমিকা) ক্ষেত্রে চিরমুগ্ধ হয়ে থাকবেন। বোলপুরের পতিতা বাসবীরূপে সাফিক্রীর চলন বলন বিবেশিনী যে কোনো চরিত্রশিল্পীর সমপরিধারিত। নবাগত অজিত গাঙ্গুলীর আবির্ভাব (নিতাই চরিত্রে) প্রকৃতই বিস্ময়কর। এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। শান্তিধেরবাবু বাস্তবায়ন গাউলকে অপকল্প ভাবে চিত্রিত করেছেন। মাস্তুরগিনী শোভা সেন ডাক-হরকরার শোভা বৃদ্ধি করেছেন।

এই সংগে সংগীত পরিচালক সুনীল দাসওগুকে আগত আনানি—তাঁর কৃতিত্ব মনে রাখবার মত।





আচার্য যদুনাথ সরকার

গত এই বৈশাখ, ১৯শে মে, সোমবার, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথের বহালত ঘটেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স প্রায় ৯০ বৎসরের কাছাকাছি গিয়েছিল। উনিশ শতকের যে সকল মনীষী বাংলার তথা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন, একে একে তাঁরা বিহার নিয়ে চলেছেন। বিশ শতাব্দীর বাঙালী বা ভারতবাসীদের মধ্যে তাঁদের সমকক্ষ প্রতিভা বা মনীষার সাক্ষাৎ মিলছেনা।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর রাঙ্গলাহী বেঙ্গার নাটোর থেকে দশ মাইল দূরে কবছাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি বরাবরই ভালো ছাত্র ছিলেন। বি, এ, পরীক্ষায় ইংরাজী ও ইতিহাসে অনার্স পেয়ে তিনি পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন; এম, এতে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। রিপন, বিজাপান্ড ও প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং পরে পাটনার বহু বৎসর তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। অর্থনীতি এবং ইতিহাসের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল। বিশেষ করে' মোঙ্গলগুণ সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করে তিনি বিশ্ব-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। জীবনের শেষ বিন পর্বন্ত তিনি লেখা পড়ার গভীর ভাবে মনোনিবেশ করেছেন।

দেশের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, কিন্তু তারবিলাগিতার বা অসার উত্তেজনার শক্তির অপচয় তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল, স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী নিজ নিজ কর্মে নিরত থেকেই অমরা দেশের সভ্যতার সেবা করতে পারি। বেশকি নানাবিক থেকে অধ্যবসায় ও নিষ্ঠাপনকারে গড়ে' তোলাই দেশপ্রেমিকের কর্তব্য; শুধু বাচ্চাচুর্বে কিংবা কোথ প্রকাশে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হবে না, তাঁর এ ধারণা অত্যন্ত দৃঢ় ছিল।

কোন আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব গঠেন নি, কিন্তু গঠনমূলক কাজ থেকে সরে' থাকেন নি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, স্বাধীন সাহিত্য পরিষদ ও হয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির তিনি অনুরাগ কর্তী ও সদস্য ছিলেন।

আমাদের মনে হয়, তাঁর জীবন থেকে একটি শিক্ষা বিশেষ ভাবে আমাদের গ্রহণ করবার আছে। আর বহু প্রতিভাবান ব্যক্তিকে দেখছি আপন স্বাভাবিক কাজ উপেক্ষা করে' রাজনীতি নিয়ে নাত্যমতি করতে। তাঁদের এতদূর 'স্বার্থ' ত্যাগ বোধহয় দেশের পক্ষে কল্যাণকর নয়। তাঁরা স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে বা দিতে পারতেন তা থেকে বেশকি ব্যক্তি করায় দেশ উপকৃত নয়, করিগ্রস্তই হয়।

ভারত ও পাকিস্তান

এক দেশ দু'ভাগে বিভক্ত হ'লো, অনেক আশা করলেন, এতে বিরোধের সমাপ্তি হবে, কিন্তু তা হয় নি। যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা দেশ-বিরোধের কারণ' তা এক শ্রেণীর পাকিস্তানী নেতার মনে শিকড় খেঁচে বসেছে এবং ভারত বিধেবের সব নব ইচ্ছা গোপাচ্ছে। পাকিস্তানের শাসনপ্রণালী হয়তো অনেক বিধেবপরাধ নয়, কিন্তু তারা নীরব বর্ষক মাত্র। বর্তমান পাকিস্তানের কর্তব্যের পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব। তাঁদের শাসনে হিন্দুগণ' তা' বিপন্নই, পূর্বপাকিস্তানের মুসলমানগণও অসুখী; তা'রা বেশকি, সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও তা'রা শুধু হুকুমবাহক; জলটুকু, কাঁটাটুকু তাদের ভোগে, আর দুখটুকু মাছটুকু অন্তরে।

ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার তো পাকিস্তানের অন্ততম মূল নীতি বটেই, তা ছাড়া নানাস্থানে নীমান্ত লঙ্ঘন করে' ভারতবাসীদের উপর আক্রমণও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

নিবীৰ্ণ ভারতীয় প্রজা মরছে এবং সীমান্তবাসীরা আতঙ্কিত হচ্ছে। পাকিস্তান-কর্তৃপক্ষের কাছে ভারত অস্ত্রবোম আনচ্ছে, যথেষ্ট মতো উত্তর সরকারের প্রতিনির্দিষ্টের শৈঠক হচ্ছে, পাকিস্তান প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে—আর এরপর হবে না, পরে দিনের কাগজেই প্রতিশ্রুতি তুলে ধরবে কেউ। আসাম-সীমান্তে বন বন আক্রমণের কথা আসামের মুখ্যমন্ত্রী বহুবীর উল্লেখ করেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলেছেন।

অপরাধের গুরু নিয়ে দারুণ অপরাধ করে, তাহের কলঙ্ক দালিল ছানানোই কি প্রতিকারের প্রকৃষ্ট উপায়? শহীদুত্তা যত বড় ওগই হোক, জাতির জীবনকে উপেক্ষা করে, সে ওগের পরিচর যেওনা চলে না। আদামে, কান্দীরে হান/হারহের ঐক্যতা যাতে প্রেরণ না পায় এবং আমাধের রাষ্ট্রে বিধেই শৈঠক যাতে চুকতে না পারে তার ব্যবস্থা অবলম্বন অপরিহার্য প্রয়োজন।

৪ উত্তর খান সাহেব ৪

'লড়কে লোকে' নীতির উপরে পাকিস্তানের ভিত্তি। আত্মসম্মতি ব্যাপারেও অহংকার সেই নীতির প্রয়োগ দেখছি। রাষ্ট্রের কর্তৃক বলায় তো বটেই, চাকরি-বাকরি, সুযোগ-সুবিধা সব-কিছুর বেদান্তেই তাই।

জটিল পদ্ধতায় কর্তব্য নীতি উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত নেতা উত্তর খান সাহেবকে তাঁর গৃহে হত্যা করেছে। উত্তর খান সাহেব প্রবীণ, বহু লোকের প্রভাভাবন, দীক্ষণ নেতা। তাঁর একমুখী অপরূপ অপ্রত্যাশিত। বর্তমান পাকিস্তানের জাগান্নিহতাধের একজন বলেই লোকে তাঁকে জানত। কাগজতিকে আশা দাম্পত্যিক ভাবাপন্ন নেতাদের সঙ্গে এক ঘোষে চললেও তিনি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিলেন; এক সময়ে তিনি অস্ত্র ভারতে উদার আদাম্যিক কংগ্রেস নেতার দর্পণ পেয়েছিলেন। তাঁর ভাই সীমান্তবাসী খান আবদুল গব্বুর খান আমও সেই উদার মনোভাব পোষণ করেন বলে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের সম্মতভাষন।

হাই হোক, উত্তর খান সাহেবের হত্যাকে পাকিস্তান একজন শক্তিময় নেতাকে হারালো। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলির কোনও প্রভাব আছে

কিনা জানি না। যে উল্লেখ্যে যে-ই হত্যা করে থাকুক, সে কেবল একজন মানুষের হত্যাকারী নয়, মানবধর্মের হত্যাকারী, সুতরাং মধ্য মানব সমাজের কাছেই অপরাধী।

৫ বাংলা ও বাঙালী ৫

বাঙালীর জীবনসমস্তা ক্রমশঃ উন্নয়ন আকার ধারণ করেছে। শক্তি বাংলায় যেটুকু ভারতের অন্তর্ভুক্ত, তাতে লোকের চাপ অস্বাভাবিক বসন বেশী, জীবিকার সংস্থান হ্রাসাপ্য। তার উপর নানাকারণে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আশা বাঙালীর স্থান নেই। বাংলার কল-কারখানা অধিকাংশ অবাঙালীর হাতে। বাঙালী সম্বন্ধে সেখানে প্রবেশের অধিকার পায় না। সরকারের নানা বিভাগেও যারা অধিকর্তা বা পরিচালক তাঁরা অনেক বাঙালী নয়। সেখানেও বাঙালীর প্রবেশপথ সংকীর্ণ। শিক্ষাবৃত্তি এবং চূড়ান্ত বেত্রে চলছে, তার প্রধান কাড়ন জীবিকাক্ষেত্রে বাঙালীর নিষ্ফলতা ও দৈন্যতা। যারা শিক্ষার অথবা চূড়ান্ত অবলম্বনে নারাজ তাহের ক্ষেত্রে খোলা আছে দুইয়ার পথ। অপবৃত্তা ও অকলম্বুতার দ্বার দ্রুতবর্ধমান।

বাংলার বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান নেই, এ নিয়ে অভিযোগ করলে কেউ কেউ মনে করেন, তার পিছনে 'প্রাথমিকতা' নিহিত আছে। বস্তুতঃ তা নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কর্তৃস্থানীয় কোনও কোনও ব্যক্তির প্রাথমিক সংকীর্ণতার ফলেই বাঙালী তার স্বাভাব্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত। তার বিচারের দাবি এবং প্রাথমিকতা এক বস্তু নয়। অস্ত্রান্ত দায়ে সেখানকার লোকদের দাবি সর্বপ্রায়ে বিবেচিত হয়; এখানে বাঙালীর দাবি সংক্ষেপে বিবেচিত হবে এ কি সমীচীন? অবশ্য এই নিয়ে কোনও বিরোধ সৃষ্টি আদমরা চাই না, তবে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকারের সুবিবেচনা, সতর্কতা ও সুব্যবস্থা আদমরা আশা করি।

৬ ডক-বর্ষট ৬

১৪ই জুন ময়রাজি থেকে বর্ষটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ডক-কর্তৃপক্ষীরা। কিছুদিন বাবৎ বর্ষট প্রায়

নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবনৈতিক দ্বন্দ্ববস্থা এর ফলে, সম্ভব নেই। অবিকাল লোকের বর্তমান আর বর্তমান কীবনযাত্রার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তা ছাড়া মানুষের চাহিদাও বড়ছে। আগে সাধারণ মানুষ যাতে সন্তুষ্ট থাকত, আজ তাতে সন্তুষ্ট নয়। নতুন নতুন ভোগ্যবস্তু আর প্রয়োজনীয় সামগ্রী বলে গণ্য হচ্ছে। সাবান, পাউডার, পোষাক এবং সিনেমা মা' চ'লে গরীব লোকেরও চলেনা; অর্থ তার ব্যাহার পক্ষে যা বেশী ব্যবহারী ছিল—সেই উপযুক্ত খাদ্য ও বাসস্থান সংগ্রহ করা তার ক্ষমতার বাইরে। অস্বাস্থ্য এবং অসন্তোষ তাই ব্যাপক। প্রতীকার মহৎসাধ্য নয়। বহু লোকের বহুল পরিমাণ আর-বৃত্তিতেও এ সমস্যার আশ্রয় দেখান। কেননা, আর-বৃত্তি হ'লেই তো হবেনা, টাকা বিয়ে কিনিব পাওয়া চাই। সকলের উপযুক্ত বস্বেষ্ট কিনিব বাজারে নেই। বেশী লোক বেশী টাকা নিয়ে কম নিমিষ কিনিতে গেলে কিনিবের দাম উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে। কাজেই আর বৃত্তি শূন্যও অনেকেরই চর্শণ ঘূর্ণন। কিনিবের উৎপাদন মা' বাড়তে পারলে অবস্থার উন্নতি হবেনা। ঘনঘন ধর্মঘটে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই, উৎপাদন হ্রাসের আশঙ্কা। ফল, হারিজোর বৃত্তি। তা ছাড়া কোথাও কাজ বন্ধ হ'লেই দর্শনাচার্যের নানা অসুবিধা ভোগ করতে হয়। এ সব কথা ধর্মঘটকারীদের চিন্তনীয়। অপর পক্ষে, কি করে, কর্তব্যবাহীদের খাওয়া পরা, ছেলেপুলে মানুষ করে বা ভদ্রভাবে কীবন ব্যাপের সুযোগ দেওয়া যায়, আরও কতটা শৌক্য বা সমাজসুষ্ঠি প্রকাশ করা যায়, সেদিকেও বুদ্ধি রাখা কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। অধা-উপগ্রব-কারীদের দমন করতে হবে সম্ভব নেই, কিন্তু তার প্রকট পন্থা সাধারণ কর্মীদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করা। এ ক্ষেত্রে সরকার ডক-বর্ষট অর্থেই বলে যোগ্য করেছেন। কর্তব্যচােয়া নিষ্ঠ হবেন কিনা জানিনা। তবে বেশের বর্তমান অবস্থার আপোষ মীমাংসাই বাঞ্ছনীয়। কেননা,

আসেই বলেছি, কেবলই কাক-বড়ে উৎপাদন প্যাহত হয়, দেশের চর্শতি বাড়ি।

৥ ট্রেনের সময় ॥

লোকাল ট্রেনগুলি ঠিক সময়ে কলকাতার আসেনা এবং কলকাতা থেকে ছাড়েনা, তা নিয়ে যাত্রীদের অভিযোগ মধ্যে মধ্যে মাতামাতিতে পরিণত হচ্ছে। রেল-কর্মীদের বিচ্ থেকে বাতায়তে দিলেই কতকগুলি কারণ প্ররশিত হয়েছে; প্রচণ্ড গ্রীষ্ম বহু কর্মীর অসুস্থতা। কার্শত কর্মীদের শারীরিক ক্রান্তি, মলে অভ্যাদিক লবণ বৃদ্ধির ফলে এক্রমে গোলযোগ, দিনা বেরামতে অর্ধবিদল অবস্থার কতকগুলি এক্রিমের ব্যাহার ইত্যাদি অন্যে উল্লেখযোগ্য। দস্তবত তাঁহের উক্তি ভিত্তিহীন নয়। অজ্ঞানিক, যাত্রীদের অবস্থাও চিন্তনীয়। কলকাতার লোকের ধ্যানাত্যব। অনেকের বাইরে থেকে ডেইলি পরলক্ষ্য করিতে হয়। কর্মস্থলে হাজিরা দিতে বিলম্ব হলে চাহবি হারানোর আশঙ্কা। গাড়ী-সেবি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালে ঐ অজুহাতের সুযোগ হয়তো অনেকের নিতে চাইবেন। দর্শন কাকর্মে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। অদমিত বিলুখলার অন্ত নেই, তার উপর আরও বিশৃঙ্খলা ঘটলে দেশের কালকর্ষ চলবে কি করে? তা ছাড়া যাত্রীদের মানসিক অশান্তি বা ক্রোধ তো দেখা দেবেই। অন্যের মনে হয়, রেলওয়ে পক্ষ থেকে যে কারণগুলি দেখানো হয়েছে সেগুলি ছাড়া আর একটি কারণও আছে— পরিকালকবর্গের নৈশিল্য। কেবল রেল-বিভাগে নয়, সরকারি বিভাগে পরিকালকবর্গের নৈশিল্য আজ প্রকট। বিশেষ কর্মরক্তাও অনলস দৃষ্টি যে লুপ্ত-রক্ত প্রাণ উপাধ, সে কথা তাঁহের বোঝা ব্যবহার।

অবশ্য ট্রেনের বিলম্ব নিয়ে যাত্রা মাতামাতি কয়েকদিন তাঁহের প্রতি আমাদের সমাজসুষ্ঠি নেই। দুখময়ী এই বিলম্বের প্রতীকারে হয় যেমন বলেছেন, প্রতীকার হ'লেই অমরা পুশী হয়।

শ্রীবরষতী প্রেস লিমিটেড ৩২ নং অপর দাহুলার রোড হইতে শ্রীঅনর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং

'মহিরা' কার্যালয় ৩২ নং অপর দাহুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

বাংলার কিশোরকিশোরীদের জন্য লেখা

রণজিৎকুমার সেনের

অববদ্য সাহিত্যসৃষ্টি

নানা ফুলের সাজি ৩০ টাকা

অল্প ছড়া ও কবিতা, নবাব মাজার গল্প, বহু মনোহর কীর্তনী, একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, এবং শিশুসাহিত্য ও গ্রন্থবিষয়ক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সমৃদ্ধ।

নানারঙের চিত্র, নানারঙের প্রচ্ছদপট

প্রত্যেক শিশুর হাতে কুপে দেবার মতো। এবং প্রত্যেক গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করবার মতো। বই। এক কথায় শিশুসাহিত্যের সেরা বই। সর্বত্র উল্লেখযোগ্য।

মুগাশ্রুতী :- “আমাদের মধ্যকার শিক্ষা না ঘটিলে সে শিক্ষা খাঁটি শিক্ষা হয় না। ‘নানা ফুলের সাজি’র প্রতিটি পৃষ্ঠায় কিশোর কীর্তনের সেই আনন্দ মিশে আছে। অসুখ চিত্রণও নানা রাজনার প্রচ্ছদপটে সমৃদ্ধ এবং গ্রন্থাবলীর আকারে প্রকাশিত এই গ্রন্থে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস ‘সদ্যাবাগী’ আটটি সার্বক কীর্তনী, যথা—ব্রজবান্ধব, কেশবচন্দ্র সেন, অম্বিনীকুমার দত্ত, চারণ কবি মুহূর্ত হাস, রামেন্দ্রসুন্দর জিবেরী, আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও বিনয়কুমার সরকার; এছাড়াও একটি তথ্যবহুল নিবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এমন একখানি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য লেখক ও প্রকাশক উভয়েই অতিনন্দনবোধ। অসীম কাহিনীর ব্যাপ্ত প্রলেপ দিয়ে গ্রন্থের তরুণতম পাঠকের বয়স বাড়িয়ে রাখার দিন যে অতিবাহিত, আলোচ্য গ্রন্থখানি তার উজ্জ্বল প্রমাণ।”

বহুমুখী :- “রণজিৎ কুমার নানাবিধ রচনার পারদর্শী। পরিণতবয়স্ক গল্প, উপন্যাস ও কবিতা ছাড়া, শিশু ও কিশোরের জন্যও তিনি নানা রচনাসমগ্র পরিবেশন করেছেন। এই গ্রন্থখানির মধ্যে তাঁর শেখোজ রচনারই বহুবিধ নিদর্শন সন্ধানিত হয়েছে। এর মধ্যে উপন্যাস পর্যায়ে ‘সদ্যাবাগী’ নামক উপন্যাস আছে একখানি। কীর্তনী পর্যায়ে—ব্রজবান্ধব কেশবচন্দ্র সেন, অম্বিনীকুমার দত্ত, চারণ কবি মুহূর্ত হাস, রামেন্দ্রসুন্দর জিবেরী, আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও বিনয়কুমার সরকারের জীবন-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ছড়া ও কবিতা পর্যায়ে—শেখোজবোধক ও নানা রসের কবিতা আছে এছাড়া। গল্প পর্যায়ে—মন্টু বোঁবি, পটল দা ও দীপাবিতা নামক তিনটি উৎকৃষ্ট সংগ্রহ গল্প আছে, আর শেষ নিবন্ধ পর্যায়ে আছে শিশুসাহিত্য ও শিশুসাহিত্যগুরু সম্বন্ধে একটি আলোচনা। প্রত্যেকটি রচনার মধ্যেই লেখকের বৈশিষ্ট্য বরা পড়ে।”

মৌচাক :- “গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা ও কীর্তনীর একত্র সম্মেলন এই বইখানি তথ্যবাহুর শিশুসাহিত্য রচনার একটি বিশেষ নিদর্শন। তিনি ছোটদের জন্য নানা রকমের যে রচনাগুলি এখানে সংগৃহীত, তা থেকে উপযুক্ত কতকগুলি সংগ্রহ করে এই বইখানি প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষভাবে এত কবিতাগুলি আমাদের যেমন আকৃষ্ট করেছে, তেমনই কীর্তনীগুলি পড়েও আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। এ ছাড়া ‘সদ্যাবাগী’ নামক আদর্শমূলক উপন্যাসখানিও লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। সমগ্রতা এই উপন্যাসের এমন একটি চিত্রে যা রচনার উপর ছাপ রেখে যায়। গল্প কয়েকটিও পড়ে সকলে আনন্দ পাব। বইখানির সাধনক্ষা মনোহর।”

সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা-১২

অভিধ—০২, আপান্ন সাকুলার রোড, কলিকাতা-৯

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সৌন্দর্যের জন্য

অবশ্যই যত্ন রাখা ও বহুবার বর্ষনে
অধিকার। মঙ্গল স্বভূতে ব্যবহারের
উপযোগী মনোহর গন্ধযুক্ত আদর্শ সাবান।

মার্গো সোপ



নির্য টেল ইহতে প্রস্তুত

দি কালফাটা কেমিক্যাল কোং. লিঃ, কলিকাতা-২৩

প্রকাশিত হল

নগেন দত্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ

হে মহানগর

যন্ত্রজটিল এক নাগরিক জীবনের মানস-যন্ত্রণার
উন্মোচন

বোর্ড বাধাই

দাম দেড় টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

মন্দিরা কার্যালয়

৩২, আপার সাকুলার রোড,

কলিকাতা-৯

উভয় বাংলার বক্তৃতাশিল্পে

বিজয়-বৈজয়ন্তীবাহী

মোহিতী মিলস লিমিটেড

(স্থাপিত ১৯০৮)

১ নং ফিল

কুষ্টিয়া (পূর্ব বাংলা)

২ নং ফিল

বেলঘাতিয়া (পশ্চিম বাংলা)

ম্যানেজিং এজেন্টস

চক্রবর্তী সঙ্গ ও কোং

২২, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা

বিপ্লবের পদচিহ্ন

৪০৫

[বিপ্লব যুগের উজ্জ্বল ইতিহাস]

ত্ৰীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

বিভিন্ন সংবাদপত্রের দ্ব্যতমত

"Amrita Bazar Patrika".

—“This is a graphic and intimate account of the revolutionary movement in Bengal when the Bengalee youths rose in revolt against the mighty British Raj. The full story of the movement is still to be unfolded in all its glory. From the very few accounts which have made their appearance uptil now the hearts of Bengalees are filled with pride. Freedom-loving people all over the world will also cherish these accounts as priceless contributions of a nation in revolt against an alien and tyrannical rule”

—“Those who want to know about the immortal youths of Bengal in all their glory and of whom Rabindranath sang and gave adequate expression will do well to go through this book. This book will also help future historians who may undertake the task of writing a full and authentic account of Bengal's revolutionary movement. We know how the Bengalee youths, forgetful of their personal safety and promises of earthly riches mounted gallows in such a cheerful way that even their executioners were surprised. We should know the history of this period of Bengal.”

“দেখ”

...“ত্ৰীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত বাঙালার বিপ্লবী সংঘ ‘কুপাস্তর’ পার্টির অকৃতম স্তম্ভ। ‘বকসা ক্যাম্প’ নামক গ্রন্থে তাঁহার এইরূপ একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র-পটচিত্রের দাফাং পাওয়া যায়,—“যে অকৃতম ব্যক্তিগণ পড়াশুনা খুব বেশী বলিয়া ফেলেন ব্যাতি ছিল, কুপেনবাবু তাঁহাদেরই একজন। কুপেনবাবু ছাত্র হিসাবে ব্যাতিসম্পন্ন ছিলেন, ইংরেজী ভালো লিখিতে পারেন বলিয়া বন্ধুসমূহে স্বীকৃত। তেজ, বুদ্ধি, ব্যক্তির ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের সংশ্লিষ্ট কুপেনবাবুর দে চিত্রিত পণ্ডিত হইয়াছে, তাহাতে অনায়াসে বিপ্লব আন্দোলনের মন্তব্য তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন। এই ক্ষতিমান পুরুষ ভবিষ্যতে দেশের স্বাধীনতাতে কি অংশ গ্রহণ করিবেন, বকসা ক্যাম্প বহবার এই কথা আবার মনে আশ্রিত হইয়াছে। ‘বিপ্লবের পদচিহ্ন’ তাঁহারই ফেলকৌবনের কাহিনী। ইহা নিছক তাঁহার আশ্বকৌবনী নহে, ইহাকে বাঙালার বিপ্লব যুগেরও কাহিনী বা ইতিহাস বলা চলে।”

...“গ্রন্থে স্তম্ভচক্র, বাঙালোপায় নৃপোপাধ্যায়, অকৃতম স্তম্ভ প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের সাতখানি ফটো মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙালার বিপ্লবের অধিনায়ক যতীন মুখার্জিও ‘সেহাবসান’-এর (বালেশ্বর) যে অগ্রকাশিত ফটোখানি গ্রন্থে অগ্রকাশিত হইয়াছে, তাহা গ্রন্থের মর্দাফাও পৌঁছাই বুদ্ধি করে নাই, ইহা বাঙালার একটি অবিদ্যমান সম্পদরূপে গ্রন্থের হান বলিয়া বিবেচিত হইবে। শুধু এই ফটোখানিও ভুলই কুপেনবাবুর বাঙালীর জনসাধারণ সন্তোষ প্রসূত হইয়াছে। ‘বিপ্লবের পদচিহ্ন’ শুধু গ্রন্থকারেরই নহে গ্রন্থে বর্ণিত বহু বিপ্লবীকেই স্বকীয় করিয়া রাখিবে। যাহাদের প্রাণদানে ও সাধোনে দেশের স্বাধীনতার প্রশংসিত হইয়াছে, তাঁহাদেরই কাহিনী এই ‘বিপ্লবের পদচিহ্ন’ এবং বাঙালীর বুক এই পদচিহ্নে গহবিন অন্ধান ও স্পষ্ট চহিবে, ততদিন বাঙালীর মুক্তা নাই—ইহাই হইল গ্রন্থের মর্দবাণী।”

সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা-১২

অক্টোবর-০২, আগার সার্কুলার রোড

কলিকাতা-১

ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা

মায়ের কী হান্সামাই না হ'ত
আগে!



সর্বশেষ! এখন যদি
আগে জাতি দি দি
করতে পারে যে।



সবুজে, কি আর হয়েছে। নারী হেলসে
ও বসব এতটুকু ভাল লাগেই না। খোঁসে
লাগান আগে বেঁচে কেনন টুইনটু বসবের
করে বেশে দিই। আর সত্যি এতটা লাগান
সব দেই না কানক কানক দায়।



এই যে! লীলা হুস্টার কি
করতে পারে লাগিয়েছে। কপালে
আজ যদি করে আছে
বলুই আছে।

হোমলে স্টাইল
যা কি অসুখ
তবেই পুঁটল
কীভাবেই আছে
ও ওলা কানক
পরে এসে।

অ্যাস্কো বার ও টাবলেট



কম দরতে টুইপটু পরিষ্কার হক

গ্রিনিয়াটিক সোপ কোং
কলিকাতা-১

আপনার
রক্তনোপকরণে
যে পুষ্টি
চান

হনুমান
বনস্পতি



সাহ কের টেবলেট

'এ' এক 'ডি' ভিটামিন দ্বারা সমৃদ্ধ

বৈজ্ঞানিক উপায়
আপনার পুষ্টির অভাব
৪ পাঃ এবং ১০ পাঃ দিনে
পান করুন। ৩৬ পাঃ দিনেও
পাওয়া যায়।

এরত কারক
বোর্ডেস ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
কালকিনিয়নগর, বিহার

সুখাদাই সুখ ও

স্বাচ্ছন্দ্যের উপাদান

12. 11. 1958



একবিংশ বর্ষ

আবাহ, ১৩৩৫

তৃতীয় সংখ্যা

ভারতীয় ভাষায় বৈদেশিক প্রভাব

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ আজ ছটি বাবীন বেশে ভাগ হয়ে পেরেও
 ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ দেশ।
 আদিত ভারত উপমহাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে জাতি,
 ভাষা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য থাকলেও তারা একজাতি।
 জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতিগত মৌলিক পার্থক্যগুলি ক্রমে
 ক্রমে গিয়ে একীভূত হয়েছে বা। সাধারণ এক মানে এনে
 দাঁড়িয়েছে—যাকে নিঃসন্দেহে ভারতীয় বলা যায়। এই
 পরিবর্তন ঘটেছে হাজার হাজার বছর ধরে জাতি ভাষা
 আর সংস্কৃতির মূলভূমি ও ব্যাপক সংমিশ্রণের ফলে। যেদিন
 থেকে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও ভাষা গোষ্ঠী উপলব্ধি
 করেছে যে তাদের এখানে দবার সঙ্গে মিলে মিশে বাস
 করতে হবে সেদিন থেকেই এই সংমিশ্রণ চলেছে। জাতির
 কথা ছেড়ে দিলে—ভাষা ও সংস্কৃতির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের
 কাছে এবং কখনও কখনও দূরের কাছে যা আড়ালে পড়ে
 যায়—আমরা দেখতে পাই ইতিহাসের প্রাচীন যুগ
 থেকে এই চারটি স্বতন্ত্র ভাষাবর্গ বিভ্রম—প্রত্যেকটিই
 নিজস্ব বীভিন্নতা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ আছে—
 (১) অস্ট্রো-এশীয় মুণ্ডা বা কোলদের মধ্যে যার প্রচলন,

(২) ডোট-চীনা, প্রধানত তিব্বতি ও বর্মীদের মধ্যে যা
 প্রচলিত, (৩) আরিড় এবং (৪) ইন্দো-ইউরোপীয়—যার
 পাশ্চাত্য বা প্রচলিত। প্রতিটি বর্গের অন্তর্গত ভাষাগুলির
 মধ্যে গোড়ার দিকে যেমি ত্রুশতক শব্দপ্রকরণ ও শব্দ
 আকারের দিক থেকে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু দিন
 হাজার বা তার চেয়ে বেশি বছর ধরে এই ভাষাভাষীর
 পাশাপাশি বাস ও মেলামেল করা ফলে যে পারস্পরিক
 প্রভাব পড়ে তাতে এই চারটি ভাষাবর্গের মধ্যে যেমি, গঠন,
 শব্দ ও শব্দপ্রকরণের দিক থেকে ক্রমশই একটা দাবু
 বেধা হিতে থাকে। এতে মধ্যে এমন একটা সাধারণ
 বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয় যাকে দ্ব্যর্থভারতীয় ভাষা দেওয়া যেতে
 পারে।

ভাষা বিষয়ে ভারতবর্ষ চিরদিন বৈদেশিক প্রভাবের
 একটা প্রতিক্রিয়া বেধা দিয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন
 ভাষা থেকে যেমন শব্দ ও নাম ভারতীয় ভাষায় প্রবণ করা
 হয়েছে সেগুলির উচ্চারণকালে ইংরাজী ও অন্যান্য
 ইউরোপীয় ভাষার স্বরানুগ বর্ণ ট ও ড এমন কি ইটালির
 গুচ্ছ স্বর বর্ণ ত, ব ভারতীয় ভাষায় স্বর্যা বর্ণ ট, ড হয়ে

সিদ্ধেছে। যেমন ইংরাজীতে টিকেট, টেকা, মোটর, ডেক, ডক, ব্যাডমিন্টন, ফ্যানী ভাষায় মেডিসন ছপ্পে, ইটালিয়তে ম্যাডেন্টা, গ্যাংগেন্ডা, রুশ ভাষায় সোভিয়েট, ভডকা, উটসকি, জার্মান ভাষায় গ্যোট হিটলার প্রভৃতি শব্দগুলি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সব সময়ই মূৰ্খা ধানিট, ড হয়েচে কখনও দস্তা ও ন হয়নি।

ভারতের বিভিন্ন ভাষার উপর বৈদেশিক ভাষার প্রভাব পর্যালোচনা করা ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের একটি চিতাকর্ষক দিক। ভারতীয় সংস্কৃতির উপর বিশেষের প্রভাব কতটা তা এ থেকেই বোঝা যায়। আর্থবা আসার পরে ভারতীয় ধর্মসাধারণ পুরোপুরি ভারতীয়ত্ব অর্জন করে। আর আর্থ ম্যানেই ভারতীয় মনন ও সংস্কৃতির পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে। ভারতের প্রাচীনতম বিবরণ বা আনন্ড সেই সময়ের প্রামাণ্য পত্রে বা পরবর্তী যুগের পাণ্ডুলিপিতে পাই নই ভাষার রচিত—যেমন অশোকের অশ্বশাসন, বেদ, ব্রাহ্মণ, মহাভারত পুণ্য ইত্যাদি। হরঙ্গা ও মহেশ্বরাচার্যের প্রাপ্ত মোহরগুলিতে ভারতের যে প্রাচীনতম বিবরণ রয়েছে তার প্রয়োজ্য করা আজও সম্ভব হয়নি। সেই ভাষার লিপি আর্থ আবিষ্কৃত বা অজ্ঞ কিছু কিনা তা আজও গবেষণার বিষয়। তবে খুব সম্ভব এটা আবিষ্কার অসম্ভব কোন কিছু হতে পারে।

বেদে বিদেশী শব্দ—

ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদে ভারতের বহু শব্দ বেদতে পাই। খুঁটী অস্বাভাব এক হাজার বছর আগে আর্থগণ ভারতে আসবার পথে হ্যাগিদির-ব্যাবিলনীয় ও অন্ত্যস্ত যাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের থেকে ঐ শব্দগুলি বিধেছিলেন। এ ধরনের একটি শব্দের মূল সেমীয় এবং এটি হ্যাগিদির-ব্যাবিলনীয় ও হিব্রুতেও দেখা যায়। শব্দটি অধিকাংশ আধুনিক ভারতীয় ভাষায় টিকে আছে। আছে। শব্দটি হল 'মণ', ইংরেজী রূপ ম্যান্ড বৈদিক সংস্কৃতে মণ, হ্যাগিদির-ব্যাবিলনীয়তে মানাহ্ আর মিনাহ্। এই শব্দটি ছাড়া আর কোন বিদেশী শব্দ ভারতীয় ভাষায় বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে নি।

হুন্স-পাণ্ডব যুগ—

ভারতের জাতীয় মহাকাব্য সংস্কৃত মহাভারতে কীতিত কৌরব ও পাণ্ডবদেব যুগের পর থেকে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি হতে (বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদগণ সি, ই গারগিটার, হেনসল্ল রাহ চৌধুরী ও এন, ডি, বার্ণেট বিভিন্ন পদ্ধতিতে পত্তীক্ষা করে নবাই এই সময়টাই স্থির করেছেন) ভারতের প্রামাণ্য ইতিহাসের যুগ হুন্স হয়েচে বলা যেতে পারে। এই কৌরব-পাণ্ডব যুগেই চারিটি বৈদ্য শাস্ত্র লিখিত হয়েছিল এবং সম্ভবত ব্যাসদেব প্রথম সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করেন। ব্যাসদেব প্রাচীন কাহিনী ও ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম করেন। পরে তা পুণ্য নামে পরিচিত হয়। এই সময় থেকেই ভারতবর্ষ বিদেশী জাতিদের সংস্পর্শে আসতে থাকে। তারা কেউ এসেছিল যোদ্ধার বেশে, কেউ বা এসেছিল দুর্নামবানিক বণিকরূপে। যেমন হ্যাগিদিরো, হ্যাগিদিরোয় পারসিকেরা, আলেকজান্ডার ও তাঁহার পরবর্তী দেব নেতৃত্বে গ্রীকগণ, শকবের মত বিভিন্ন পারসিক জাতি, হিন্দী গ্রীক বণিকগণ, অর্থাৎ আর ছন্দবের মত তুর্কী জাতি, মুসলমান, ধর্মাবলম্বী আরবী, তুর্কী ও পারসিকগণ, বৃষ্টান ও আরবেনীয় বণিকগণ আর দগর পরে আসে পর্তুগীজ, ইংরাজ, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি, তারা ভারতে নবযুগের সূচনা করে। এইসব জাতি ভারতের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। তাদের ভাষা থেকে যে দশ শব্দ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় চলে এসেছে তাদের মধ্যেই রয়ে গেছে তাদের চিহ্ন।

এই বৈদেশিক শব্দগুলি আমাদের ভাষায় দ্রুতবে প্রবেশ করেছে। প্রথমত ভারতীয়গণ বিদেশীদের সংস্পর্শে এসে নিজেদের কথা ভাষায় তাদের শব্দ প্রয়োগ করতে থাকে। দ্বিতীয়ত সাংস্কৃতিক শব্দ, বিজ্ঞান ও কলাক্ষেত্রে প্রয়োজ্য শব্দগুলি শিকিত লোকেরা আয়ত্ত করে শিকিত লোকের ভাষা সংস্কৃতে ভাষার রুচি করেন। প্রথম পর্যায়ের শব্দগুলি কথ্যভাষার মাধ্যমেই হোক বা সংস্কৃতের মাধ্যমে হোক খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে শব্দগুলি কোন বকমে কথ্য ভাষার স্থান পেয়েছিল। যেমন জনপ্রিয় গ্রীক শব্দ 'সিহিংগ' মল, সুবন) 'জায়েম' (মুজা) 'সেমিহানিদ' (ময়দা) প্রাচীন পারসিক শব্দ

‘আদারী’র (‘অদারী’) মুদ্রা (মিশরীয় পা চেন্টা মোহর), মধ্যযুগের পারসিক শব্দ ‘পোস্ত’ (লেখবার যন্ত্র নৈব চর্চ) ‘মিত্কা-কারা’ (খাত্তোতে খোদাইকার), ‘মানক’ (মুদ্রা) ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রহীত হয়। এগুলি আবার প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগের মধ্য দিয়ে আধুনিক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রবেশ লাভ করেছে। যেমন হিন্দী ও বাংলায় ‘মুদ্রণে’ ‘মান’ ‘মওয়ার বা সোওয়ার’ মুদ্রি (আংটি) ‘পোখা’ বা পুখি (পাতুলিপি), বাংলা ‘সেকরা’ পাক্সারী ‘মানক’। আবার জ্যোতির্বিজ্ঞানের সংস্কৃত ধোরা ‘কেন্দ্র’ ত্রেক্কন ‘জো’ কিং’ প্রভৃতি শব্দ গ্রীক থেকে গ্রহীত হয়েছে কিন্তু এগুলি আধুনিক ভারতের সাধারণ কথা ভাষায় টিকে থাকতে পারেনি। তবে কয়েকটি শব্দ যেমন ‘ঘোরা’ (ঘটী) এবং ‘কেন্দ্র’ অবিকাশে ভারতীয় ভাষাতেই প্রবেশ লাভ করেছে।

গ্রীক শব্দ—

ভারতীয় ভাষায় সেড়ার দিকে যে সমস্ত বৈদেশিক শব্দের আগমন হয়েছে সেগুলির মধ্যে অবিকাশেই হল প্রাচীন গ্রীক এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের পারসিক শব্দ। গ্রীক আঠারশ বছর আগে আমিলপণ গ্রীক বাণিক্যের সংস্পর্শে আসে এবং জাতিগত ভাষায় বিশেষজ্ঞ ডাঃ কামিল মেনেভিন শব্দ যুগের প্রাচীন তামিলে অন্তত একটা গ্রীক শব্দের সম্মান পেয়েছেন। শব্দটি হল ‘মাসটিক্স’—‘মাস্’তিগা’ (চাবুক), প্রাচীন তামিলে ‘মাস্তিকাই’। কিন্তু এই শব্দটি কালের সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন বিদেশী শব্দ প্রচলিত। বাংলায় তাদের সংখ্যা শতাধিক। পোর্চুগীজদের রীতি নীতি, তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি আমরা পেয়েছি। কয়েকটি গুসন্দার ও ফণাদী শব্দ সোমাস্থি ঐ ভাষাগুলি থেকে চলে এসেছে। তবে ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে ভারতীয় ভাষায় গ্রহীত ইংরাজী শব্দের সংখ্যাই সর্বাধিক।

ইংরেজেরা ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু তাদের ভাষাকে অপসারিত করলে আমাদের শাসন ব্যবস্থা, বিজ্ঞান ও উচ্চ শিক্ষার দিক থেকে যথেষ্ট ক্ষতি হবে। জ্ঞান লাভের

পথই হোল ইংরাজী ভাষা, স্বল্পমূল্যক আধুনিক চিন্তাধারা বিকাশের উপায় যথেষ্ট যা কিছু মহান কাজ হয়েছে, যা কিছু বড় কথা বলা হয়েছে তার চাবিকাঠি হয়েছে এই ভাষারই মধ্যে। তা ছাড়া আমাদের মত বিভিন্ন ভাষাভাষী দেশে প্রশাসনিক বস্তুতা বন্ধার দ্বাংতে হলে, বুদ্ধিবীর্ষদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ সাধন কঠোর হলে, দেশের অগ্রগতি লাভ করতে হলে ইংরাজী ভাষাকে টিকিয়ে রাখতেই হবে। ভাষার দিক থেকে সে বিস্তারের সৃষ্টি হচ্ছে তা বোধ করতে হলে ইংরাজীকরণ সাধ্যা নিতে হবে। ভারতের ভৌগোলিক আর সাংস্কৃতিক ঐক্যের ফলে যে সাম্প্রতিক ঐক্য গড়ে উঠেছে তা আরও পঁতশাদী হয়েছে ইংরাজীকরণ মতই, আর তা বজায় রাখতে হলে এ ভাষাকেও রাখতে হবে। এ হল ‘নিগতির বিধান’। কয়েকজন গোড়ো ভারতীয়ভাষা ইংরাজী শব্দ দু’ বা তিনবার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করার মত বত চীৎকারেই কখন না কেন তারা আগতেই থাকবে। শুণ্ড কারিগরি আর বিজ্ঞানে কেজ্জেই নয়, বাসনীতি ও সাধারণ সাংস্কৃতিক দিবারে মিত্য নতুন ইংরাজী শব্দের সংযোগন হচ্ছে এবং সকল ধর্মের লোকেরাই তা ব্যবহার করছেন। স্বদেশী হস্তবুদ্ধি হয়ে পড়েছি—আমরা সংস্কৃত বা প্রাচীন তামিল বা আরবিক থেকে নতুন শব্দ সৃষ্টির মত চেষ্টাই করি না কেন ইংরাজী শব্দ এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই।

আমাদের জীবন ও চিন্তাধারার সকল ক্ষেত্রে দৃষ্টিক শব্দ যেওয়া ছাড়াও ইংরাজী আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিকে অবিকতার ভাবব্যবহা করে তুলছে। তাহলে আধুনিক জাতিদের নামগুলি বিশেষ থেকেই থাকবে। যেমন পারসিক যখন, রোমক, পার্শ্ব, চীনা, সুনিকা, কুস্তানা, কু’স, কবিক প্রভৃতি।

তামিলে মুসলমান বোঝাতে ‘কুস্তান’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এটি উত্তর ভারত থেকে এসেছে। এ সংস্কৃত রূপ হল ‘কুস্তক’ (কুর্কী)। প্রাচীন চীনা ও কুর্কী থেকেও কয়েকটি শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাচীন চীনা শব্দ ‘ত’শিরে’ (কাগজ) সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে সংস্কৃত ‘সরা’ হয়েছিল। কিন্তু শব্দটির প্রচলন এখন নেই। উত্তর

ভারতের 'ঠাকুর' শব্দটি প্রাচীন তুর্কী 'তেজিন' 'তেজির' (প্রহু) থেকে এসেছে।

মুসলমান প্রভাব—

গত সাত আটশ বছর ধরে ভারতে সবচেয়ে বেশী বৈবেশিক শব্দের আগমন হয়েছে। এই সময় মুসলমানেরাই ভারতে প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁদের সহকারী ও সাংস্কৃতিক ভাষা ছিল পারসিক, হার্বের ভাষা ছিল আরবিক তুর্কীরাই প্রথম উদ্ভূত ভারত ছাড় কহেন। তাঁরাই পারসিক ভাষা নিয়ে আসেন। এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, পারসিকের তুলনায় অনেক কম তুর্কী শব্দ ভারতীয় ভাষায় স্থান পেয়েছে (হিন্দুস্থানীতে আশীটি আর বাংলায় চল্লিশটি)। গত কয় শতাব্দী ধরে ভারতে পারসিক ভাষার বর্ধের প্রভাব পড়ে। আর পারসিক ভাষায় বহু আরবিক শব্দ থাকায় এই আরবিক শব্দগুলিও ভারতীয় ভাষায় প্রবেশ লাভ করেছে। হিন্দুস্থানী আবার কতকগুলি পারসিক শব্দ দক্ষিণ ভারতের মারাঠি, তেলুগু, কানাড়ী, তামিল ও মালয়ালী ভাষাগুলিতে চাচ্ করে দিয়েছে। এই শব্দগুলি সাধারণত প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আইন, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রচলিত। এই পারসিক শব্দগুলি (ভারতের প্রায় সর্বত্র ছ'হতে তিন হাজারের বেশী দেখা যায়—হিন্দুস্থানীতে আরও বেশী) ভারতের সকল ভাষার মধ্যে একটি যোগদাত স্থাপন করেছে।

ইউরোপীয় প্রভাব—

ইউরোপ থেকে পাওয়া শব্দগুলিতে একটা সর্গভারতীয় বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় দু'শ পোর্ডুইজ পর্যায় নিয়ে আসছে। এদিক থেকে ইংরাজী ভাষার যে প্রভাব পড়েছে তাকে অস্বীকার করা যায় না। বাচন যৌতি, প্রকাশ তত্ত্বী এমন কি চিন্তাধারায় দিক থেকে আদর্শ স্থাপন করে ইংরাজী ভাষা ভারতীয় ভাষাগুলির গোপন শক্তিকে ভাগ্যতে সাহায্য করছে। এইভাবে ইংরাজী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতীয় মনোভাবকে আধুনিক করে তুলছে, ভারতীয় চিন্তাধারা ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক জগতের সংঘতি সাধন করছে। ইংরাজী তা করতে পারে। কারণ আধুনিক জগতের সংস্কৃতির শক্তিশালী বাহনই হল এই ভাষা। আর ভারতের চিরকালের আদর্শ সাংস্কৃতিক মিলন আল এই ভাষারই সাহায্যে ঘূড়তর হচ্ছে। সংস্কৃতের পর ইংরাজীই সমস্ত ভারতীয় ভাষাকে পাশাপাশি দাঁড় করাতে পেয়েছে এবং তাদের মধ্যে আধুনিক ভারতের সংস্কৃতি ও মনোভাবের প্রতিচ্ছবি হয়েছে। আধুনিক ভারত উপলব্ধি করছে সংস্কৃত ও ইংরাজী সমানভাবে অপরিহার্য। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আধুনিক ও উন্নত স্বাধীন ভারতের একটা একা বন্ধন স্থাপি করে ইংরাজী বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার ঐক্যতানকে আরও জোরালো করে তুলছে।

প্রেস ইনকরমেনশন ব্যুরোর সৌজন্যে

শিক্ষার হের ফের

নগেন দত্ত

সম্প্রতি স্থল কাইনাল পরীক্ষার কণ বাধা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে শিক্ষাবিৎ বাধে সাধারণ দেশবাসীর উদ্বিগ্ন হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। ইতিপূর্বে 'মুদাত্ত' পত্রিকার ডক্টর বি. বি. দত্ত যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পড়িয়া বুঝিলাম যে, শিক্ষা জগতে তিন শ্রেণীর কুলীন সৃষ্টি হইতেছে—বাহার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার্য্য সর্বশ্রেষ্ঠ নৈক্য কুলীন; বিত্তীয় অপাতো ক্রাশ-গুণালাভ্য চলনসই কুলীন; আর অষ্টম শ্রেণী-গুণালাভ্য একেবারেই তত্ত্ব সমাধ। জীবনের শিক্ষা-স্থলে বাহা কিছু সুবিধা তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্তগণের মত্ত স্তম্ভ থাকিল, আর বাকী দুইটি শ্রেণী—এপাতো এবং অষ্টম শ্রেণী—কটির বহিঃপাণ চৰ্ণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন। ইতিপূর্বে শিক্ষাজগতে এমন তেজবুলক শ্রেণীচেননার আর সৃষ্টি হয় নাই। 'তোমাদের আর অবিকার নাই' এমন কথা জোর করিয়া বলা হয় নাই।

সে যাহাই হোক, আমরা সাধারণ মানুষেরা সন্তান সন্ততি লইয়া বিপন্ন বোধ করিতেছি। আমাদের ছেলে-পুলেরা লেখাপড়া করেনা এই মন্তব্য সর্বত্র শুনিয়া থাকি। স্থল কাইনাল পরীক্ষার এক লক্ষের উপর ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিল এবং তাহার অর্ধেক মধ্যমিকা পর্বৎ বাত্তিল করিয়া দিলেন। শুধু যে বাত্তিল করিয়া দিলেন এমন নহে। ছাত্র-ছাত্রীরা যখন স্থলে স্থলে টেট পরীক্ষা দিল তখনও তাহাদের পরিকাৰ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইলনা যে, ও-পরীক্ষা পরীক্ষা নহে। আমাদের নিযুক্ত পরীক্ষক-গণই পরীক্ষক। তাঁহাদের সমুদে তোমাদের উপবুদ্ধতা প্রমাণ করিতে হইবে। যদি এ সমুদ বাকটা মধ্যমিকা পর্বৎ ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের বুঝাইয়া দেন তবে নির্ধাচিত পাঠ্য ভালিকা হইতে বৎসময় পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেই চলে। স্থলে স্থলে এ জাতীয় টেট পরীক্ষার অর্থ কি? এবং শুধু পরীক্ষা কেন? টেট পেপারের ব্যবসায়ী,

মোট ব্যবসায়ী ইত্যাদি সবার খেচা বহন করিয়া বিপন্ন অভিভাবক বয়সান হইয়া পড়েন।

স্থলে বাধা পড়াগুনা হয় সে সমুদ মন্তব্য নিস্তরায়জন। তাহার কারণ, শুধু এক পক্ষকে যোগ দিয়া সমস্তই সমাধান সম্ভব নয়। আমাদের মনে হয় পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এমন একটি পক্ষ বহিয়াছে যার কলে বহু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীরা অকৃতকার্য হইতেছে। আর এক ক্যান্সাস, শিক্ষা জগতের কর্তৃপক্ষের মনে বহুল খাবণ হইয়াছে যে, পরীক্ষা পাশ করিয়া ইংলান্ড চাকুরীর মত্ত ছুটিবে মতএব—। শিক্ষার সমুদ অর্ধের যোগ ইতিপূর্বেও ছিল, এখনও বহিয়াছে। জীবন ধারণের উপাধান হিসাবে যখন পাশ-করা বা না-করাকে বড় করিয়া দেখানো হইতেছে তখন ছাত্র-ছাত্রীরা পাশ করার উপরই বিশেষ জোর দিবে। সেই জোরটা ছাত্র-ছাত্রী মহলে এত বেধে হইয়াছে যে, মোট সমুদ বহন করিয়া তাহার বিব পান করিতে স্তম্ভ করিয়াছে। সবাই সমুদ পছা ও sure success দেখাইতেছেন।

ইতিপূর্বে বাঙ্গালীর পরিবার ছিল। এবং তাহা ছোটখাট রাষ্ট্রের মত কাৰ করিয়াছে। বিত্ত ছিল, খাভের ব্যবস্থা তিন মাস হইতে ছ মাস প্রায় সবাইই ঐ বিত্ত হইতে সংস্থান হইত। বাহ্যার্য্য বিত্তহীন ছিলেন তাঁহাদের আভিগত ব্যবসা, আর বাকি বাহ্যার্য্য ছিলেন জমিকদার বাটুনিদার। গ্রামাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। সমাজের উচ্চবিত্ততা চাকুরী করিয়া, প্রবদ ইংরেজি শিখিলেন, তখন সেটা আভিজাত্যের রূপ, মধ্যবিত্তেরা ইংরেজি শেখা ও চাকুরী দুইটির সুযোগ লইয়া একটি অকৃত প্রকৃতির আভিজাত্য ও সম্পদ বড়িতে লাগিলেন। ইংরেজের আইন পাশ করিয়া বৃত্তকে মোটামুটি তীক্ষ্ণ করিয়া লইলেন। ওকালতিটা তখনকার কালে বহুল আয়ের পথ ছিল বলিয়া এবং ইহাতে বৃত্তি

বেলায় যথেষ্ট সুযোগ ছিল বলিয়া। বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের একটা বৃহৎ অংশ আইনজীবী হয়েছিলেন। ইহা বাবে শিক্ষাগত স্বাধীন ব্যবসাভেদেও যথেষ্ট প্রবণতা ছিল। বিস্তৃত বনিয়াদে উপর শিক্ষার বহন সুযোগ ছিল শুধন শিক্ষাটাই সর্বত্র হইয়া উঠে নাই। কিন্তু যেদিন বিতরণে হইল পারিবারিক চার্টার নিয়ন্ত্রণতা অপসৃত হইল সেদিন শিক্ষাই একান্ত অর্থহীন অবলম্বন হইয়া উঠিল। ইহার সঙ্গে যোগ হইল শিল্প বিপ্লব। পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু আপোচনা হওয়া স্বাভাবিক। স্কুল কাইনাল পরীক্ষার পূর্বে ইংরেজী ভাষাকে বস্তু করিবার ক্ষমতা ছাত্রছাত্রীদের কঠোর এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ পরিচয় করিতে হয়। যে-ভাষায় উপযোগী পারিপার্শ্বিক আশাযের সমাজ-জীবনে নাই, সেই ভাষায় প্রতিজ্ঞা করি বড় গুরুত্ব আরোপ করিয়া ছেলে মেয়েদের মস্তিষ্ক বিনাশে কাহাদের স্মরণ করিতেছে? গড়পড়তা একটি ইংরেজ ছেলেকে যদি বাঙ্গালা দেশের স্কুল কাইনাল পরীক্ষা দিয়া পাশ করিতে হয় তবে আশাযের ছেলে মেয়েদের মত বাঙ্গালা ভাষায় সেও অসুস্থতাপ্রাপ্ত হইবে। তবে ইংরেজ ছেলেটির পক্ষে একটি কারণ সত্ত্বেও এই যে সেখানেকার শিক্ষার শোড়ায় বনিয়াদ পাকা করিয়া তৈরী করিতে হয়। কাজেই সেই মানসিক নিয়ন্ত্রণ শৃঙ্খলা যেখানে তৈরী হইয়াছে সেখানে কোন কিছু গ্রহণ করিতে বাধ্য নাই। অবশ্য ইংরেজের শিক্ষার সঙ্গে আমাদের সুলভা চলেনা এই কারণে, সেখানেকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বভাবের। কাজেই তুলনা ঠিক চলেনা। তবু একজনকে বিশেষী ভাষা শিক্ষা ও তাহাতে কৃতিত্ব যেখানে যেখানে, ইহাতে গৌরবের কিছু আছে বই কি? এবং আমাদের স্কুল কাইনাল পরীক্ষার প্রতিবাদই একটি-না-একটি ছেলে বিশেষী ভাষায় বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু বিশেষী ভাষা শিক্ষার গড়পড়তা বান নির বলিয়া দুই একটি তারা জল জল করে। কিন্তু মানব সমাজে তার সৌর মণ্ডল নহে যে, একটি সূর্য্য উজ্জল থাকিলে সব ঠিক হইয়া বাইবে। অবিকালে ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে আদ্য এই বিশেষী ভাষাই বাগাধার হইয়া থাকাইয়াছে। এই বাগা আদ্য এত বিবন হইয়াছে যে তাহাদের প্রতিভা না থাকুক

তাহাদের ক্ষমতার পুরোপুরি সম্যকভাবে এক ভাষার কারণেই হইতেছেনা। মাতৃভাষাও আদ্য একবারে বহিষ্কৃত নয়। কাজেই ইংরেজি ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে চাইবে। ইংরেজিকে তিন পত্র না করিয়া ইহার কিছুটা ঐচ্ছিক ও কিছুটা আবশ্যিক করিলে কিরূপ হয়? তাহাদের ভাষা শিক্ষা করিবার প্রবল ইচ্ছা তাহারা ইহার পরেও পড়িবার সুযোগ বাছাতে পারা তাহাদের ক্ষমতা প্রকৃতির সুল বা রূপ করা বাইতে পারে। কিন্তু যে দেশের অধিকাংশ যুবক যুবতী ইংরেজের মুখ দেখিবেনা তাহাদের বিশেষভাবে শুধু নাম একটি বিশেষী ভাষার এক আটকাইয়া রাখিয়া লাভ কি?

এখানে একটি বড় প্রশ্ন আসিয়া পড়িতেছে। যদি ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান না থাকে তবে বিশ্বের বিভিন্ন জ্ঞানরাশি কোন্ ভাষার মাধ্যমে শিখিবে? এবং বিশ্বের এমন কোন বিষয় নাই যথা ইংরেজি ভাষায় বড় একটা পাওয়া যায় না। কাজেই ইংরেজি ভাষার সঙ্গে যোগ থাকার অর্থ বহিঃবিশ্বের সঙ্গে যোগ রাখা। এই কথাটার মধ্যে কিছু ভীক আছে। যদি মাতৃভাষার বর্তমান উন্নতিক্রমে একটি স্থিত অবস্থা বলিয়া নাগিয়া লই, তবে এই কথাটা সত্যতা স্বীকার করা যায়। মাতৃভাষার উন্নতির অর্থই হইতেছে সর্বাঙ্গীন উন্নতি। আদ্য ইংরেজ ভাষার ভাষার উন্নতি করিয়াই অসুস্থতা নাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের কাছে বিভিন্ন বিষয় উপহার দিতেছে। অবস্থান্তরে যথাসম্ভব ইংরেজি ভাষাকে আমাদের ভাষার মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া লইলে বাঙ্গালা নাহিত্যের দীনতা হুঁচিয়া বাইবে। এবং ইহা বাবে সরকারের উচিত বিভিন্ন ভাষার সুপরিচিত জাকিয়া বাঙ্গালা ভাষার তাহাদের চিন্তা ও নাহিত্য অসুস্থতা করানো।

দশের হইয়া কিছুমাত্র লোক বিশেষী ভাষার পাণ্ডিত্য অর্জন করিলেই চলিবে। তাহারা সরকার কর্তৃক প্রবৃত্ত অর্থ এই কাজ করিবেন। কালক্রমে আমাদের নাহিত্যে এমন একটা অবস্থা আসিবে যখন ভাষা আপনায় নিজস্ব ক্ষমতার বিশ্বের সব ভাষার সমকক্ষ হইবে। কাজেই মাতৃভাষাকে ইংরেজি ভাষার সমকক্ষ করিবার প্রচেষ্টা যদি এখন হইতে শুরু না হয় ত আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যেও আমাদের মাতৃভাষা থাকাইবে না। আদ্য একটা কথা।

ইংরেজি ভাষার প্রভাব ইতিপূর্বে বাধা ছিল তাহাও ক্রমে হ্রাস পাইবে। ভাষার কারণ, ইংরেজের সাম্রাজ্য আদ্য নষ্ট হইবার পথে! এখানে ভারত ও চীন প্রভাবশালী হইলে ইহাদের ভাষা প্রচায়েন হুড়াইয়া পড়িতে বাধ্য। এমনকি পণ্ডিতগণ তাবিয়া দেখিবেন।

এখানে পরীক্ষার প্রশ্ন আসা যাউক। এক লক্ষের উপর ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিল, ইহার অর্ধেকের বেশী মকলতা অর্জন করিতে পারিল না ইহার অল্প আমাদের কর্তৃপক্ষের কোন উৎসে বোধ নাই। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-দপ্তর নিরুৎসাহিতে কাল কাটাইতেছেন। আমাদের যুবক-যুবতীরা চাকরী-বাকরী চায় তাই বলিয়া সবকার গোলা করিয়া থাকেন। কোন চাকরী পাইবার আশায় বেশী লোক ভীড় করিলে লাঠি-পেটা করিয়া থাকেন। কারণ যুবকেরা উচ্ছৃঙ্খল। এই জাতীয় ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় যে, যুবকেরা আমাদের দেশের কেউ নহে। ইহাদের প্রতি রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব নাই। রাজা বিদ্যা মিছিল বাহির করিলে, যুবকেরা উচ্ছৃঙ্খল হইলে, গুলি করিয়া তবে বিধয়ের নিশাচি। কিন্তু এইসবের পশ্চাতে গভীর কারণগুলি কেহ খুঁজিয়া দেখিয়াছেন কি? ভাল স্কুল শিক্ষার অবকাশ ছেলপুলেরা পাইবে না। বঙ্গদেশী মধ্যমিত্ত পরিবারের নৈরুদ্ভট ভাবিয়া দেওয়া হইয়াছে—সেখানকার নৈতিক ধ্যান আদ্য আর শ্রেণ্য হ্রাস নহে। আমাদের প্রজ্ঞাহীনদেরা আদর্শ ব্যবহার ও ত্যাগ দ্বারা আমাদের উদ্ধৃত্ত করিতে সমর্থ হইবেন না, উচ্চবিত্ত সমাজের মধ্যে ব্যতিক্রম, সামাজিক ক্রিয়াকলাপের প্রাণশা, বিলাসিতার স্রোত এবং সর্বোপরি ছাত্রাভিমানের অবস্থিত প্রভাব—এইসব মিলিয়া তরুণ সমাজের উপর এক ভয়াবহ প্রভাব সৃষ্টি করিতেছে। সংস্কৃতির নামে অতি খেলা নৃত্য, নাট্য, সঙ্গীত যুবক-যুবতীর মনে অবস্থিত আশায় সৃষ্টি করিতেছে, আমাদের অতি আধুনিক সাহিত্যে বাস্তবতার নামে অলঙ্কৃত চিত্তাণুসার তথাকথিত সাহিত্যিক বিশ্লেষণ তরুণ মনকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। কোমলমতি তরুণ বরেন এইসব সাহিত্যের যে কি প্রভাব হইতে পারে তাহাও অসুস্থমান হওয়া স্বকারণ। আমাদের তরুণ-তরুণীরা উচ্ছৃঙ্খল, না আমরা তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল মন সৃষ্টি করিতে

পরিবেশ রচনা করিতেছি? চিত্র অভিনেতাধের বেশভূষা হাফভাপ আমাদের তরুণদের আচার-ব্যবহারকে নিরস্ত্রিত করিতেছে। সংস্কারপত্রের বিজ্ঞাপনে মারীয়েদের মৌলধের নামে নানাবিধ ভাববলি আমাদের অনতিজ্ঞ তরুণ-তরুণীরা মনে কি ভাবের সৃষ্টি করিতেছে? আমাদের দৃষ্টান-সম্পত্তিরা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায়, কিন্তু কেন এইরূপ ঘটতেছে, এ সম্বন্ধে ব্যাপক অসুস্থমান কার্য চালানো হয় নাই। এবং তাহা হইয়াছে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। প্রতিবিধান কি হইতে পারে সে বিষয়ে নেতৃত্ব সহচর নহেন। যদি সেরূপ কোন চেষ্টা হইত তবে পরীক্ষা ও অন্ত্যস্ত বিষয়ের মধ্যে তাহা প্রতিবন্ধিত হইত।

দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা চালিয়া সাক্ষিবার পূর্বে আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সামাজিক পরিবেশের কথা ভাবিয়া দেখা স্বকারণ। দেশের মানুষ পূর্বের তুলনায় বিলাসপ্রিয় ব্যবহারে বেশী অর্থ ব্যয় করিতেছে, এবং এই বিলাসিতা সৃষ্টিতে ব্যয়কের কর্তৃত্ব অনেক বেশী। সব বিষয়ে যখন মুনাকা এবং হইয়া উঠিয়াছে তখন সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক ব্যাপারে নয় কেন? কানেই বিভ্রামান, বিভ্রা অর্জন কতকগুলি ব্যবসায়িক মনোহস্তির মধ্যে বিষয় আশ্রয়প্রাপ্ত করিতেছে। বিংশটি আগে স্পষ্টভাবে আগেচর হইবার অপেক্ষা রাখে। এদেশের গ্রন্থকার, প্রকাশক, শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানী-জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে কোন সংযোগিতা নাই। ফলে সাহিত্য শিল্প ও অন্ত্যস্ত সংস্কৃতিমূলক কাজকর্ম সবই একটা বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মত হইতেছে। ইহার মধ্যে ব্যঙ্গ্যার বৃদ্ধি এবং ব্যঙ্গ্যার ফলে জ্ঞানবাহো তও তপস্বীর আবির্ভাব হইয়াছে।

ইহার সমষ্টিগত ফল, সমাজের উপর, বিশেষ করিয়া শিক্ষার্থী যুবক-যুবতীকে উপর বিষমরূপে দেখা যাইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক পরিবেশ রচনার এবং ইহার অর্থ হিসাবে পারিবারিক পরিবেশ রচনার, বর্তমান অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার একটা বড়কর্মের ভূমিকা রহিয়াছে। এই মৌলিক কারণটি সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষাওপ্তের নেতারা ঠিক অবস্থিত হইতে চাহেন না। তরুণ-তরুণীদের একটা সর্ব আদর্শগতর মধ্যে গড়িয়া তোলাই শিক্ষার মূল্য উদ্বেগ

হওয়া উচিত। এই আখ্যায়িকা অনুসরণ করিতে হইলে বর্তমানের অনেক কিছু ছাটাই করিতে হইবে, দুঃখপূর্ণ বাস্তবায়ন চিত্রকপতে খেলো সাহিত্যের প্রভাব। গ্রামে ও শহরে ছাত্রাবাস গঠন করা এবং সেই ছাত্রাবাসে কঠোর নিয়মাবলীভার প্রবর্তন, ভবিষ্যৎ জীবনে বাহ্যতে তরুণ তরুণীরা নিয়মনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে, সে বিষয় সত্যক দৃষ্টি রাখা, গ্রামে-গ্রামে ছাত্রাবাস গঠনের আন্দোলন করিয়ানুতন চেতনায় সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহার অর্থনৈতিক দিকটা কিছু সরকার কিছু পরিবার উত্তরকেই বহন করিতে হইবে। এই ছাত্রাবাসে এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে হইবে যাতে তরুণ-তরুণীরা ভাবিতে পারে যে, আমরা জাতির একটা অপরিহার্য অঙ্গ। কোন জাতিকে নিয়মনিষ্ঠ করিতে হইলে সম্ভবতঃ পূর্বে ডিস করাইলে চলে না। বিশেষ সময় বিশেষভাবে ক্রমাগত বহুদিন অভ্যাসের ফলেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। এবং তাহা একইস্থানে কেন্দ্রীভূত অবস্থায়, তাহা না হইলে সম্ভব নহে। সেইজন্যই গ্রামে বিশেষ প্রকৃতির ছাত্রাবাস গঠনের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্টিগোচর। বর্তমানে গ্রামে গ্রামে যে কম্যুনিটি হল গ্রন্থাগার ইত্যাদি গঠন করা হইতেছে ইহার সহিত ছাত্রাবাস গঠনকার্য অনান্যসেই চলিতে পারে। শিক্ষক ও ছাত্রদের সাধারণে থাকিয়া নিজেদের ব্যবহার স্বাভাৱ ছাত্রদের স্বভাব গঠন করিতে পারেন। আজ যেমন সাধারণ মানুষ কর্মস্থল কেন্দ্র করিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, তেমনি শিক্ষাকেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রছাত্রীরা কেন্দ্রীভূত হইতে পারেন। এবং একটা কেন্দ্রীভূত অবস্থাতেই শিক্ষাবীক্ষা সম্ভব।

আখ্যায়িকের অভিতাবকণের যে অংশ তাহাতে আর কিছু দিনের মধ্যে অনেকই সম্ভব-সম্ভবিত্ব শিক্ষাবীক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না। কাজেই বহুর অর্থ সংগ্রহ পরিচর সম্ভব মানুষ করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর আদিয়া পড়িতেছে। যাহারা অর্থহীন তাহাদের সম্ভবতঃই উচ্চ সরকারী চাকুরী পাইবেন। আধুনিক ধনী গৃহের সম্ভবতঃই সেই শিক্ষাই পাইতেছেন। একটা কথাকে খুব বাড়ুধরে প্রচার করা হইয়া থাকে যে ‘মেধাবী’ ছাত্রের উচ্চশিক্ষা পাইতে বাধ্য নাই। এবং ‘মেধাবী’ ছাত্ররাই বিশেষ সুবিধা পাইবে। এক লক্ষ করেক হাজার পরীক্ষার্থী হইতে ছোট কত মাত্র এক হাজার ও কয়েকশত ‘মেধাবী’ ছাত্র পাওয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রের উচিত এই ‘মেধাবী’ ছাত্রদের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশের সম্ভবতঃ এবং অল্পতরুণ ছাত্রদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সম্ভবতঃ লওয়া। এই দুয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিলেই—কার কত মেধার মোর আছে বোকা হইবে। এবং কি কি কারণের দ্বারা মেধা ও মেধাবিশিষ্ট হয় তাহার অধ্যয়নের ফল অনুসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে। এবং সেখানে যদি কিছু সমাধান উপস্থাপিত করা হইয়া থাকে তবে সেই সমাধান অনুসাধারণকে মানিয়া চিন্তিতে বাধ্য করা উচিত। রাষ্ট্র যদি তাহার ভবিষ্যৎ সাংগঠনিকের একটা বৃহৎ অংশকে পুঙ্খবহুৎ অগোছালা গোছায়া মত দেখে— তবে আশাই হোক, বা কালই হোক তাহা সর্বগ্রাসী হইবে। তখন শ্রেষ্ঠ বিশেষের ‘মুনিষ্কিত’ ‘মেধাবী’ সম্ভবতঃ সমাজকে রক্ষা করিতে পারিবে না।



জীবনের ক্রমবিকাশ

বিমল ঘো
(পুণ্যহুতি)

এইরূপ ভিত্তি হইতে যে পত্তন বাহির হইবে, তাহার আকরণ কাটিয়া বাহিরে না আসা পর্যন্ত যে আধাঘের প্রয়োজন হয়, উপরোক্ত উর্ণনাভ হইতে তাহার সংস্থান হইয়া থাকে। কিন্তু মাতা বোপতাটি এই কাজ হইয়া গেলে এই ভিঘের দিকে আর একটুও দৃষ্টি দেয় না। সবল প্রত্টিব দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতংগে যখন এত স্থলর ভাণে এত সব কাল নিভুল ভাণে করিয়া যায় তখন আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় না। একটি পতংগ যখন এইরূপ ভাবে কাজ করিয়া যায় তখন উহার ভিতর কিরূপ অস্তুভূতি ভাণে সেই সম্বন্ধে আমাদের কোনই ধারণা নাই। তবে এই পর্ব্বত বলা বাইতে পারে যে উহার অস্তুভূতি খুব প্রসারিত নহে। খুব সস্তম্ভ পতংগ সৌন্দর্য্য চিত্তাশক্তি নাই বলিলেই চলে। নিম্নেই একপ্রকারের বস্তু একটি পতংগের মনে একটি অবস্থা একাধিক সম্বন্ধ প্রত্টিভি আশ্রিত করে কিন্তু অল্প অনেক দৃষ্ট হইয়া উহার মনে কোনো প্রত্টিভি উদ্ভব করে না। ঠিক যেমন নাকি নিম্নেই মাপের আলোকতরঙ্গ আমাদের অক্ষিপটে আঘাত করিলে আমাদের নার্ভতন্ত্রে যে স্পন্দন ওঠে এবং যে স্পন্দনের সঙ্গে আমরা সেই লাল রং সংবেদন (Sensation of Red) বলিয়া অল্প পূর্ব কথিত মাপের একটু দীর্ঘ আলোক তরঙ্গকে আমরা আলো বলিয়াই চিনিতে পারি না। পতংগের সবল প্রত্টিভি, তাহা হইতেই অস্বাভাবিক হটক না কেন, তাহা প্রতিবর্ত্ত ক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার এই অল্পপক্ষ প্রতিবর্ত্তগুলি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। ইহার এই সম্বন্ধ প্রত্টিভিগত প্রতিবর্ত্ত-গুলি বাহিরে বাইতে পারে না। ঠিক যেমন নাকি একটি 'হারমনিয়ম' কেবল মাত্র নিম্নেই কতগুলি সুর ছাড়া অল্প কোন সুর হিতে পারে না এবং হারমনিয়মটি

কি প্রকারের কয়টি সুর দিবে তাহা তৈয়ার করিবার সম্বন্ধই নিম্নেই করিয়া দেওয়া হয়। যেহেতু ইহারেই জন্ম হইতেই ইহার সীমানা প্রতিবর্ত্তগুলি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে এবং যেহেতু এই প্রতিবর্ত্ত ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে সেইহেতু ইহার এই প্রতিবর্ত্ত ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করিতে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন হয় না। ঠিক যেমন নাকি একটি শিশু যখন আঙনের সম্পর্ক হইতে আঙ্গুল সরাইয়া দয় অবস্থা যেমন আমাদের হস্তের ভিতর নিম্নেই একাধারে স্তম্ভ আমাদের অঙ্গাঙ্গের স্তম্ভ ক্রিয়া উদ্ভব করে। পতংগ জীবনের অস্ত্রাস্ত্র শাখার ভিতরেও বেগা যায় ঐ একই প্রকারের সংকীর্ণতা, ঐ একই প্রকারে বাণা ধরা পথে চলা। পতংগ সৌন্দর্য্য প্রবণ শক্তি সম্বন্ধে এই কথা সত্য। উন্নততর বেক্তবত্তী প্রাণীরেই প্রবণত্মীয় সাধারণত বড় বয়েসেই হইয়া ওঠে। উহারেই চারিবিধে ্যা অসংখ্য শব্দ হয় তাহা হইতে উহার উহারেই প্রয়োজনীয় শব্দগুলিকে বাছিয়া লয়। পতংগবিধের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকেরই প্রবণত্মীয় আছে। উহার কেবলমাত্র নিম্নেরেই সমাজের অস্ত্রাস্ত্র প্রাণীতারা প্রকাশিত নিম্নেই একাধারে সম্বন্ধ বুদ্ধিতে পারে। পৃথিবীর অগণিত শব্দে মধ্যে উহার কেবল মাত্র দু'একটি বুদ্ধিতে পারে।

সবদিক বিচার করিয়া আমরা বলিতে পারি যে পতংগ প্রজাতির আমাদের মত কোন বুদ্ধিপূর্ণ চিত্তাশক্তি নাই। উহার উহারেই কোনো কামনা পূর্ব কথিতে না পারিলে সন্তোষ প্রকাশ করে অথবা ঐ পথে কেবল অথবা অল্প কোনো বস্তু বাণার হঠাৎ করিলে সেই ব্যক্তি অথবা বস্তুর উপর রাগ প্রকাশ করে। ইহার ইহারেই নিজের হেঁসিলে উত্তেজনার ভাব প্রকাশ করে। ইহার ইহারেই সাধীকে হেঁসিলেও উত্তেজনা প্রকাশ করে এবং কামনা

পূর্ণ হইলে সাময়িক ভাবে পরিচোষ প্রকাশ করে। এক কথায় বলিতে গেলে সহজ প্রকৃতি উদাহরণকে যে প্রকার চেষ্টিত সম্পাদন করিতে উদ্বুদ্ধ করে তাহাই কথিত হয়। ইহাঙ্গের ক্ষুদ্র জীবনের অস্তিত্বতা ইহাঙ্গের কোনই কাণে গাণে না। অস্তিত্বতা হয়ত ইহাঙ্গের সহজ প্রকৃতিগুলিকে নানিত করিতে পারে কিন্তু অস্তিত্বতা উদাহরণের জীবনে নতুন কোনো প্রতিবর্ত আনয়নী করিতে পারে না। প্যাতলভর ভাবায় বলিতে গেলে ইহাঙ্গের জীবনে মাপেক প্রতিবর্তের কোনো স্থান নাই। ইহাঙ্গের প্রতিবর্ত ত্রিগুণগুলি সম্পূর্ণরূপেই প্রত্যাহৃত সহজ প্রকৃতিপ্রসূত।

পতঙ্গ এবং নেত্রবর্তী প্রাণীজিগের মধ্যে বিভিন্নতা আনয়ন অস্তর্য্যবেগে ঘটিতে পাই। নন ও চেষ্টিত শারীরিক পটন এবং শরীরে বিভিন্ন রাসায়নিকের মাত্রা এ সবই নির্ধারিত হইয়াছে প্রতিবেশের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিয়া। আনয়ন জ্ঞানেন্দ্রিয় যাহাযাহা প্রতিনিষ্ঠিত বিধের নতুন নতুন বিময়কর সব সত্য উদ্ঘাটিত হইতেছে তাহাও প্রতিবেশকে বাহ দিয়া সম্বল হয় নাই। কোনো প্রাণীরই এমন কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই যাহা যাহা সে বলিতে পারে কোন একটি বৈজ্ঞানিক ভাবে বিদ্যুৎ বর্তমান কিনা। অথচ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি এই অক্ষমতার অল্প অনেক সময় আনয়নের জীবন পর্বত বিপর হয়। ইহার একমাত্র কারণ হইতেছে এই যে আনয়ন আনয়নের প্রাকৃতিক প্রতিবেশে কোন শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ঘটনা ঘটিতে পাই না। একমাত্র প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক ঘটনা যাহা আনয়ন মাঝে মাঝে ঘটিতে পাইয়াছে তাহা হইতেছে মেঘের ভিতরে বিদ্যুৎের বসক। জীবনের স্বাভাবিক প্রতিবেশে বিদ্যুৎকে আনয়ন ঘটিতে পাইতেছি মতবিৎ, পৃথিবীতে জীবনের আগমনের ইতিহাসে তাহার স্থান বিস্ময়, হয়ত আনয়নের ঠাকুরদাধাণাই ডাইনামো যাহা উৎপন্ন বিদ্যুৎ চোখে ঘেঁষিয়া যান নাই। আনয়ন নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি—জীব-অভিব্যক্তি আধুনিকাল হইতে যদি উদাহরণ বাদস্থানের চারিপাশে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহাইয়া বাইত এবং ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহ যদি জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া প্রমাণিত হইত তবে জীবদেহে নিশ্চয়ই

এমন জ্ঞানেন্দ্রিয় গড়িয়া উঠিত যাহা যাহা আনয়ন কোন বৈজ্ঞানিক ভাবে বিদ্যুৎ আছে কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বলিয়া দিতে পারিতাম। জীবদেহকে আনয়ন উদাহরণ প্রতিবেশকে বাহ দিয়া বিচার করিতে গেলে মোটেই বিচার করিতে সমর্থ হইব না; বরং পক্ষে প্রতিবেশকে বাহদিয়া জীবনের কোনো অর্থই হয় না। প্রত্যেকটি জীবদেহকেই সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টিতে হইলে উদাহরণ প্রতিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে উদাহরণ বিচার করিতে হইবে। প্রকৃতির কোন বস্তুই বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘেঁষিতে গেলে সম্পূর্ণরূপে ঘেঁষা হইবে না। এমন কি উদাহরণে আনয়ন বিচার করিতে সমর্থই হইব না। প্রকৃতির প্রত্যেকটি বস্তু প্রত্যেকটি ঘটনা, একটি অপরটির সহিত গুণগোষ্ঠিতভাবে বন্ধিত। একটি বিরাট সূক্ষ্ম সৃষ্টির প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া অস্তিত্বজীবন মালা গাঁবিয়া বর্তমানে আসিয়া পৌঁছাইয়া তবিল্যভের অল্প প্রসূত হইয়া আছে। বিংশ শতকের একটি সত্যমানকে তাহার শরীরভূতকে সম্পূর্ণরূপে বিচার করিতে হইলে, আনয়নকে সৃষ্টির সেই আধিক্যে, বস্তু ইলেকট্রন প্রোটনে যেহি প্রথম স্পন্দন আসিয়াছিল সেইদিন হইতে বিচার করিতে হইবে। অস্তিত্বজীবন সূক্ষ্মের একটি গ্রন্থি যদি আনয়ন বাহ ঘেঁই তখনই আনয়ন আনয়নের জীবনের অর্থ বাহাইয়া কেনিব। মানব জীবন এবং তাহার সাময়িক জীবন ইতিহাসের সমর্থন পায় না। স্নেহের স্বপ্ন মনের স্বপ্ন এবং মনোবিকারের কারণ হিসাবে যৌন আবেগ অবধমন করাকেই প্রধান বলিয়া প্রচাণ করিতেছিলেন তখন তাহারই সহকারী এ্যাডল্ফার বলিয়া বলিলেন, মানব মনের স্বপ্নের পেছনে প্রধান কারণ যৌন ক্ষুধার অবধমন নহে, ইহার পেছনে রহিয়াছে আত্মপ্রতিষ্ঠা (will to power) করিবার উগ্র বাসনা এবং তাহার অবধমন। এ্যাডল্ফার এইখানে এনিবুপলিমের সমর্থন পান। সাময়িক মানবের জীবনে যে কেবল স্বতঃস্ফূর্ত যৌনকেই ক্ষুধার্ত ভাবে ধাক্কিতে হয় তাহাই নহে। সাময়িক মানব তাহার স্বাধীনতা হারাইয়া কেলিয়াছে। জীবনের অনশ্বা বিবিনিবেশ সর্বদা তাহার আশ্রয়ভেদনকে আশ্রয় করিয়া মনের অবচেতন মনের অল্প শুধাকে অবধমিত

অন্যভাবে ভবিষ্য দিতেছে। এ্যাডলার বলেন সামাজিক মানুষ যে সর্বদা অবস্থান করিতেছে, তাহার ফলে অনেককে মনোবিকার রোগে ভুগিতে হইতেছে, তাহা যৌন সূক্ষ্ম নহে, তাহা হইতেছে মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার অবস্থান।

প্রকৃতি অথবা আত্মমানুষ্যঃ—এ্যাডলার বলেন, এই আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রকৃতির অর্থনৈতিক মানুষের মানসিক জন্মের প্রধান কারণ এবং এই জন্ম হইতেই মানুষের মনোবিকলন দেখা দেয়। তাহার মতে যৌন অহুইলন একপ্রকারের আত্মমানুষ্য (self-assertion) ছাড়া আর কিছুই নহে। আমরা যেখানিছি ক্রমত তাহার লেখার কামশক্তি (Libido) কথাটি ব্যবহার করেন। কামশক্তি (Libido) কথাটি আমরা সাধারণতঃ যৌন সূক্ষ্ম বলিতে বাহা বুঝি, তাহা হইতে অনেক ব্যাপক ওপার্শ্ব ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিক পক্ষে যেখানে গেসে ক্রমত এক এ্যাডলারের ভিত্তর আপাতঃ দৃষ্টিতে আমরা যে প্রভেদ দেখিতে পাই তাহা পরিভাষাগত প্রভেদ ছাড়া আর কিছুই নহে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ভাতিগত বিভিন্নতার ওস্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রমডের মতবাহ বেশী প্রযোজ্য, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ্যাডলারের মতবাহ বেশী প্রযোজ্য। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন যে ক্রমড বক্তৃতি রোগী পরীক্ষা করিয়াছেন তাহার প্রায় সমস্তই বনৌদ্বিগের ভিতর হইতে আসিয়াছে। আবার মনে হয় এই ব্যাপার হইতে এইপ্রকার একটা সিদ্ধান্তে যাওয়া যুক্তিসহ নহে। যেহেতু ক্রমডের প্রায় সমস্ত রোগী ইহরী সম্প্রদায় হইতে আসিয়াছে, সেই হেতু যদি আমরা এই সিদ্ধান্তে বাই যে ইহরী ভাতিগত ভাবে কামশক্তি প্রবল এবং তাহারের ঐ শক্তি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণ পরিতেষ লাভ করিতে পারেনা বলিয়া তাহারের এই প্রতিক্রিয়া অবস্থান করিতে হয় এবং সেইজন্যই তাহারের ভিতর মনোবিকার রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী; তাহা হইলে কি আমাদের এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত হইবে? ক্রমডের বেশীর ভাগ রোগীই যে ইহরী সম্প্রদায় হইতে আসিয়াছে তাহা অল্প অনেক কারণেই হইতে পারে। ক্রমডের কর্মজীবনের বেশীর ভাগ সময়ই তিনি ভিন্নের কাটায়াছেন। ভিন্নেরা শুধন ইহরী

সম্প্রদায়েই বনৌ ছিল। এই চিন্তা বহু ব্যাঙ্গপেক্ষ ছিল এবং তখন পর্য্যন্ত এই চিন্তাধার বহুল প্রচলন হয় নাই বলিয়া গরীব শ্রেণী এবং দুঃবৃত্ত স্থানের লোকের পক্ষে হ্রস্ত ভিন্নের বাইরা চিন্তাধা করা সম্ভব হয় নাই। বিশেষ করিয়া ইহরী ভাতিগ যৌনপ্রবৃত্তিদি অত্যন্ত ভাতি হইতে অধিকতর ক্ষয়শীল ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। আবার মনে হয় এ্যাডলারের আত্ম-মানুষ্য (self-assertion) ক্রমডের কামশক্তির (Libido) আত্মীকৃত রূপ ছাড়া আর কিছুই নহে।

ইহার পর আসেন জাংগ (Jung)। তিনি এ্যাডলার হইতেও কিছুটা বেশী অগ্রগত হইলেন। তিনি বলিলেন, অসচেতন মন যে কেবল মানসিক জন্ম এবং অবস্থানিত বাসনাগুলিরই বাসস্থান তাহাই নহে, অসচেতন মন মানুষের জীবনের উদ্ভাস এবং প্রধান আবেগগুলিরও উৎস। তিনি ক্রমডকে উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন—অসচেতন মনের একদিক হইতেছে মানসিক জন্ম এবং অবস্থানিত যৌন সূক্ষ্মের আত্মীকৃত এবং অপর দিক হইতেছে মানুষের উচ্চ আদর্শ, উচ্চ ভাবধারা এবং আবেগের পবিত্র উৎস। ক্রমডের কাছে কেবল প্রবলতাটাই বহা পড়িয়াছে; অপরটি তাহার দৃষ্টির অন্তরালে বহিয়া গিয়াছে। অল্পকাল বলিতে গেসে অসচেতন মন কেবল অবস্থানিত যৌন সূক্ষ্মের ভোঝা নহে। ইহা আরও অনেক কিছু। জাংগ-এর অসচেতন মন ক্রমডের অসচেতন মন হইতে ব্যাপ্তিতে অনেক বড়। বিখ্যটি আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা বাউক। গোড়া ক্রমড-বাহীরের মতে প্রত্যেক মানুষ জীবনের প্রথমে এমন একটা সময়ের মধ্য দিয়া কিছুদিন কাটায়ে যাহাকে বলা হয় শিশু যৌনতা (infantile sexuality)। এই সময়ে শিশুর প্রত্যেকটি সংবেদন পরিবৃত্তি, (sensory gratification) তাহা স্বকৃত্তিই হউক আর শুভ পেখন করা হইক, মূলতঃ কামম। ক্রমডবাহীর আরও বলেন যে বাস্তবিকভাবে আমাদের প্রত্যেকের ভিতর, ছোটো বয়সে 'ইডিপাস গুঁড়ো' (Oedipus complex) পড়িয়া গুঠে। এই 'ইডিপাস গুঁড়ো'র সহিত গ্রীসদেশীয় পুরাণগ্রন্থের একটি গল্পের সম্পর্ক আছে। তাই গল্পটি এখানে অতি সংক্ষেপে বলা হইল। গ্রীসদেশের কোন এক গ্রহণে

লেয়ান নামক (Laius) নামক এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাণী জোকাস্টা যখন গর্ভবতী হইলেন তখন একদিন দৈববাণী হইল রাণীর এই গর্ভে যে সন্তান হইবে, সে রাজাকে হত্যা করিবে। রাজা লেয়ান এই বিপদের হাত হইতে বন্ধা পাইবার জন্য সন্তান হইবামাত্র তাহাকে বহুব্রী এক পর্বতের উপর ফেলিয়া দিয়া আদিলেন। এই সন্তানটি ছিল একটি পুত্রসন্তান। দৈবক্রমে এক মেঘচরক এই সন্তানটিকে পাইয়া তাহার বাড়ি লইয়া গিয়া নিজেই সন্তানের মত মেঘে পালন করিতে আরম্ভ করিল। মেঘপালক এই ছেলটির নাম রাখিল ইডিপাস (Oedipus)। ইডিপাস বীরে বীরে মেঘপালকের গৃহে ভরানক দুর্গত হইয়া বাড়িয়া উঠিল। বীরে বীরে ইডিপাস পাহাড়ের অধিবাসীদিগকে লইয়া এক দৈত্যহল গঠন করিল এবং সেই দৈত্যহলের সাহায্যে ইডিপাস বেশ জয় করিয়া লইল। ইডিপাস কিন্তু জানিত না যে লেয়ান তাহার পিতা। তখন ঐদগ্ধে প্রথা ছিল—যদি কোনো যোদ্ধা কোনো দেশ জয় করে, তবে সেই দেশের রাণীকে সে বিবাহ করিবে। ইহা পূর্ব শৌরবের ছিল। ইডিপাস এই প্রথা অনুসারে তাহারই মাতা Jocastaকে বিবাহ করিয়া ঐখানেই রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল। কিছুদিনের মধ্যে জোকাস্টা গর্ভবতী হইল। এই সময়ে ইডিপাসের কাছে দৈববাণী হইল যে, জোকাস্টা তাহারই মাতা। এইভাবে ইডিপাস পূর্বের ঘটনা সমস্ত জানিতে পারিল। এই ব্যাপার জানিতে পারার পর ইডিপাসের মানসিক অবস্থা এমন হইয়া পড়িয়াছিল যে সে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইল। এই গল্পটির ব্যাখ্যা এবং অনেক লোকের স্বীকারোক্তির দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে মা এবং ছেলের ভিতর যে সম্পর্ক তাহার ভিতর অতিপ্রাকৃত কিছু নাই। মা-এর সম্বন্ধে আমরা যে সচেতন ভাবে যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু ভাবিতে পারি না তাহা আমাদের সচেতন মনের সত্ত্বাবের জন্য, যে সচেতন মন আমাদের প্রতিবেশ, আমাদের সমাজ, শিক্ষা এবং

বিবি নিষেধ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আছে। ইডিপাস যত সময় পর্যন্ত জানিত না যে জোকাস্টা তাহার মাতা, তত সময় জোকাস্টার উপর ইডিপাসের যৌন আকর্ষণ সচেতন ভাবেই ছিল এবং সে তাহা স্বাভাবিক ভাবেই চরিতার্থ করিয়াছে কিন্তু যেদিন সে জানিতে পারিল জোকাস্টা তাহার মাতা সেই মুহূর্তে সমাজ, ধর্ম, বিদিনিষেধ, সংসার সমস্ত তাহার সচেতন মনে আদিয়া পড়ি করিয়া পড়িয়াছিল এবং ইহাদের ভয়ে তাহার মনের উপর যে আকর্ষণ তাহা অবহমিত হইয়া অবচেতন মনে পাইয়া স্থান পাইল।

এইখানেই ইহার শেষ হইল না তাহার অবচেতন মনের অবহমিত কামনা এবং চেতনা ও মনের শিক্ষা সত্ত্বাবের ভিতর যে দ্বন্দ্ব তাহার ফলে ইডিপাসের মনোবিকলন অবস্থা দেখা গেল এবং সে এই রোগের কল স্বপ্ন আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইল। মানুষ যে এই প্রকারের বাসনাগুলিকে অবহমিত অবস্থায় অবচেতন মনে রাখিতে বাধ্য হয় এবং সেই সমস্ত বাসনাগুলি যে সর্বদা চেতন মনে বাহির হইয়া আনিতে সর্বদা চেষ্টা করিতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক মানসিক রোগগ্রস্ত রোগীর স্বপ্ন সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি দ্বারা ফ্রয়ডবাবীরা ইডিপাস গৃহে গৃহে সম্বন্ধ বলেন যে প্রত্যেক বালকেই জীবনে একটি সময় আসে যখন তাহার মন তাহার মাতার প্রতি যৌন আকর্ষণে আকোচিত হয়। এই সময় স্বাভাবিক ভাবেই বালকের পিতার উপর যৌন ঈর্ষা দেখা দেয়। ইহার কারণ হইতেছে এই যে বালক তখন তাহার পিতাকে তাহার যৌন জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখিতে আরম্ভ করে। অপর দিকে প্রত্যেক মেয়ের বাল্য জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন সে তাহার পিতার উপর যৌন আকর্ষণ অনুভব করে এবং সে তাহার মাকে তাহার যৌন-জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখে। ফ্রয়ড বলেন ব্যক্তিগত জীবনে এই ভাবকালের সময় বকম ক্ষেত্র হইতে পারে কিন্তু তাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত সত্যের কিছু আসে যায় না। শিশু-মনে তখন হইতেই সর্বদা একটা দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। একদিকে তাহার প্রতিবেশের নব অভিজ্ঞতার শিক্ষা তাহাকে মা এবং বাবাকে যেভাবে আসনে বসাইয়া শিক্ষা দিতে আন্তরিক করিয়াছে। অপর

দিকে তাহার নব-জাগ্রত মর্জিত্ত্ব এবং গ্রহিণমূহ সৌন্দর্য্য-আকর্ষণে চকল হইয়া উঠিয়াছে।

এই যে জীবনের স্বব আনন্দ হইল এই বন্দেহ কলসেই তাহার নবোন্মূখ সৌন্দর্য্যে গৌন ক্ষুধার অসহন্যের প্রোত্ত্ব। বালক বয়সের এই সময়ের স্বব মনের উপর যে দাপ কাটিয়া দেয় সেই দাপ সমস্ত জীবনকে প্রভাবিত করে। ভরুণ মনের পরদায় যে পতীর দাপ কাটিয়া দেয় তাহাও চির সমস্ত জীবন মনে পর্বদায় জল জল করিতে থাকে। মানব-জীবনের এই প্রথম বন্দ হইতেই, স্বাভাবিক মানুষ বাহির হইয়া আসে। এই বন্দে লক্ষ্যাক্ত করিতে না পারিলে সেই জীবনে লম্বাচার (incest) এবং মাতা অপবা পিতাকে দত্ত্য কদিবার সম্ভাবনা বেধা দেয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে ঋণভাবাধী মনে করেন যে মানুষের নির্জান মন তাহার প্রতিবেশের সব কিছুই প্রতীক রূপ (symbolical image) ঘেঁষিতে লক্ষ্যাক্ত। মানুষের সংজ্ঞান মন হস্ত তাহার প্রতিবেশের বিভিন্নতার লক্ষ একই বস্তুর বিভিন্ন বৃত্তিভগণিতে ঘেঁষিতে পারে কিন্তু মানুষের নির্জান মন পূর্ববির সমস্ত কিছুই যে প্রতীক রূপ ঘেঁষিতে পায়, তাহা প্রায় সবার কাছেই সমান। তাহার কতগুলি বিনিমের তালিকা বিদ্যাহেঁন তাহার প্রত্যেকটিকেই আমাদের নির্জান মন যৌন অংশ অথবা যৌন ক্রিয়ায় প্রতীক হিচাবে গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে নির্জান চুড়া হইতে ললম্রোত পর্গাত অনেক কিছুই স্থান পাইয়াছে। ঋণভাবাধীযের এই প্রতীক অভিধানের (dictionary of symbol) সাহায্যে বাহু যোগগ্রস্ত যৌনবিঃগের বন্ধ বিবরণ করিয়া তাহাযের যোগ দূর করিতে পারা যায়। ঋণভাবাধী বাহুরোগের (Psychoneurosis) চিকিৎসকযের ইহাই দায়ণ। ঋণভাবাধীযের এই দায়ণার মধ্যে কিছুটা সত্য আছে সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার ঋণভাবের এই চিকিৎসা পদ্ধতির উপর এত বেশী শোর যেন এবং এত বেশী আস্থা স্থাপন করেন যাহা অতিরিক্ত বলিয়াই মনে হয়। ঋণভাবের শেষ জীবনের দেখায় মানস ক্রিয়ায় ব্যাখ্যার উপর একটু বেশী ঝোক বেধা যায়। তিনি সম্পূর্ণ মানস ক্রিয়াকে অয়স্ (id) অয়স (ego) এবং অধিশাস্তা (superego), এই তিন ভাগে ভাগ করেন। ঋণভাব বলেন অয়স হইতেছে

মানব জীবনের সমস্ত আবেগজনিত প্রতিক্রিয়ায় (impulsive reaction) আশ্রয়, অয়স (ego) হইতেছে অয়স্-এর বাহু ভ্রম। অয়স্-এর এই অংশই সংজ্ঞান ভাবে মানুষের জীবনের বাস্তবতার দৃষ্টান্ত সম্পর্শে আসে এবং অধিশাস্তা শু অয়স্ হইতেই লক্ষ্যাক্ত করে। ইহা কেবল মাত্র মানব জীবনেই বেধা যায়। অধিশাস্তা মানব জীবনের অব্যবহিত প্রতিক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়া বলা হইতে পারে এবং ইহা অয়স্-এর উপর প্রভুত্ব করে। মানব জীবনে ইতিপাস গুটীয়ার আবির্ভাবে যে মানসিক বন্দ আরম্ভ হয় তাহাই লক্ষ্যাক্ত আমাদের মানস-ক্রিয়া হইতে অধিশাস্তা লক্ষ্যাক্ত করে এবং প্রথম বয়ের লক্ষ্যাক্ত প্রভুত্ব স্থাপন করে। এ্যাডলাব মনঃসংস্করণ বিজ্ঞানের একটু নতুন দিক বেধায়াছেন। তিনি বলিলেন প্রত্যেক মানুষই ছোটো বয়সে হীনতাভাব (inferiority complex) হইতে মানসিক কষ্ট পায়। কিন্তু ছোটো বয়সের এই হীনতা ভাবের লক্ষ্য যে কষ্ট তাহার লক্ষ্যই বড় হইলে মানুষ, ছোটো বয়সের ভ্রমের কতিপূর্ণ কবিবার লক্ষ্য, ভ্রমাক্ত ক্ষমতাগ্রহ, আনন্দভেদন এবং নিম্নের জীবনের বিভিন্ন গুণাবলীর উৎকর্ষ বিধান কবিবার লক্ষ্য বিশেষ ভাবে উৎকর্ষ হইয়া ওঠে। অলেকেন্দে জীবনে এই উৎকর্ষ। এত উৎকর্ষবে বেধা দেয় বাহাকে জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা বলা চলে না। বালক বয়সে মানুষকে স্বাভাবিক ভাবেই তাহাযের অভিজ্ঞাযের কড়া বৃত্তির অধীনে নিম্নের ভেতমাকে সংকীর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। সর্বা তাহাযের নানা প্রকার বিনিমিযের অধীনে থাকিতে হয় এবং অনেক সময় পিতা-মাতার লক্ষ্য এবং অয়স্-পূর্ণ শিক্ষা শাধনের লক্ষ্য শিক্তের স্বাভাবিকভাবে যে প্রকারের মানসিক অয়স্ গঠিত হওয়া উচিত, তাহা হইতে পারে না। তাহাযের সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়া মনের লয়দে লুপ্তে স্থান না পাইয়া নির্জান মনে বাইরা স্থান লয়। নিম্নের ব্যক্তিয প্রকারের পথ না পাওয়ার লক্ষ্য তাহার ভিতর হীনতা ভাব আদিদা পড়ে। শিক্ত বয়সের এই হীনতা ভাবের লক্ষ্য বড় হইলে সে নিম্ন লক্ষ্যে অতিক্রমভাবে লচেতন হইয়াপড়ে—নিম্নের স্থবিত সর্বাৎ লক্ষ্য হইয়া ওঠে এবং শিক্ত বয়সের অব্যবহিত আনন্দজ্ঞান এবং মনের লক্ষ্য অয়স-জনিত সর্বাৎ

মনের অবস্ তরে আশিয়া, উহার পাওনা স্রব সনেত মাধ্যম করিয়া নিতে চেষ্টা করে।

অনেক সুবক ঘাঘাঘের আনন্দ উত্তমঙ্গল এবং গরীমান বলিয়া মনে করি তাহারা অনেকই ছোটো বয়সের গঠিত হইনতা। তাবের প্রতিক্রিয়া রূপেই এইরূপ হইয়া থাকে।

ছোটো বয়সে নিম্নে সর্বদা সবার নিচে এবং বড়দের কড়া শাসনের তলে রাখিতে রাখিতে নিজের সম্বন্ধে যে ছোটো ভাব হইয়া গিয়াছে, নিজ সম্বন্ধে সমাজজনক এই হীনতা গোপন করিবার প্রয়াসে সে নিজের অভাব প্রচার এবং প্রতিষ্ঠিত করিতে এত বেশী সচেতন হইয়া উঠে। এই ভীত বাদনা কার্ণে পরিণত করিবার ক্ষমতা সে তাহার

সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, তাই সে জীবনে উন্নতি লাভ করিয়া নাম অর্জন করে এবং এই সুনামের আবরণে সে তাহার ছোটো বয়সের হীনতা ভাব গোপন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। 'বাংগ' ফ্রেড অবগা এ্যাডলার হইতে অনেক বেশী চেষ্টা করিয়াছেন মানুষের মনের গুটিকাকে বিশ্লেষণ করিতে। এ্যাডলারের মতে জীবনের ক্রমবিকাশের মূলে বহিরাগত জীবনের স্বাভাবিক তাগিদ, যাহা জীবনকে ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া যায়। জীবনের ক্রমবিকাশের মূলে ফ্রেডের কর্ণক্তি (Libido) অথবা এ্যাডলারের আত্মদাপুৰ্ণ্য (self assertion) নবে ইহাই বাগ্ম্যের মন্ত।

[ক্রমশঃ]



কাজু বাদাম



এক কাগজ কবির সঙ্গে কিছুটা কাজুবাদাম মিলিলে যে কৃষ্টি পাওয়া যায় এমন আর কোন মিলিলে নয়। কিন্তু প্রতি বৎসর এই কাজু বাদাম চালাশ দিয়া ভারতের প্রায় ১০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। ইহার অধিকাংশই পাওয়া যায় আমেরিকা হইতে। তবে একথা হয়ত অনেকেই জানেন না যে, কাজুবাদাম গাছের উৎপত্তি ভারতে নয়।

কাজু বাদাম ব্রেজিলের গাছ। প্রধানতঃ উপকূল ভাগের মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করার জন্যই যেতুপ্ত মতাকীতে উদ্ভা ভারতে আনিয়া বপন করা হয়। ভারতের আবহাওয়ার কাজুবাদাম গাছ বেশ নিজেসব মানাইয়া লইয়াছে। কাজু বাদামের উৎপাদনও হ্রাস পায় নাই। বরং বাড়িয়াছে বলা চলে। তাই বেশের চারিধিক ইহার সমাধার দেখা বিগাছে। কৃষিকারীরা কাজু বাদামের চাষ চাষ পছন্দ করে। কারণ নির্দিষ্ট ক্ষমিতেও ইহা আবাদ করা চলে। যে সব ক্ষমিয়ার গ্রামাকলে থাকেন না, তাঁহারা কাজু বাদামের চাষ পছন্দ করেন। কারণ বেশী বেশী ধর না লইলেও কাজু বাদামের চাষের ক্ষতি হয় না। বিদেশের বাজারে ইহার চড়া দাম বলিয়া, ব্যবসায়ীরা ইহা পছন্দ করে। কাজু বাদাম বেশী ভারী নয়, অথচ বিক্রী করিয়া বেশ লাভ পাওয়া যায় বলিয়া কেরিওয়ালারা ইহা মাথায় করিয়া ধারে ধারে বিক্রয় করিতে পছন্দ করে। আর ইহার সাহায্যে যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সুবিধা হয় বলিয়া সরকারও ইহার আবাদ পছন্দ করেন।

এখন কস্তাকুমারী হইতে বোম্বাই পর্যন্ত পশ্চিম উপকূলে এবং বহরমপুর পর্যন্ত পূর্ব উপকূলে বিভিন্ন জলবায়ু ও বিবিধ মৃত্তিকায় কাজু বাদামের চাষ বেশী হয়। ভারতে মোট ২ লক্ষ একর ক্ষমিতে কাজু বাদামের চাষ হয় এবং বৎসরে ৮০ হাজার টন কাজু বাদাম উৎপন্ন হয়। কেবল বাম্বাই কাজু বাদামের চাষ ও উৎপাদন সমধিক।

ভারতে ১৫-টির অধিক কাজু বাদামের কারখানা আছে। এই কারখানাগুলি সর্বমুখ চালাইতে প্রতি বৎসর ১,৭০,০০০ টন কাজু বাদাম কল বরকার হয়। কাজু ই বাটতির পরিমাণ ২০ হাজার টন। আনন্দ্য বস্তুমানে বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকা হইতে আমাধেও উৎপাদনের প্রায় সম পরিমাণ কাজু বাদাম আমদানি করিয়া আমাধেও বাটতি পুরণ করিতেছি। পূর্ব আফ্রিকা প্রকৃতি জকলের শ্রমিকেরা কাজু বাদামের শাঁশ ছাড়াইবার সময় অনেক মই করিয়া ফেলে, সেজন্য আনন্দ্য বিশেষ হইতে এত কাজু আমদানি করিতে পারি। আশা যে আমদ্য বিশেষ বাজারে কাজু বাদামের যথার্থতঃ একচেটিয়া ব্যবসা করি ইহাতে আমাধের নারী শ্রমিকের মিশুণ হস্তের অবদান বড় কন নয়।

বর্তমানে যে পরিমাণ কাজু বাদাম আমদানি হয় তাহার দ্বারা কারখানাগুলি দ্বারা বৎসর ডাঙ্গু দাখা সন্তব হয় না, আর আমদানি মানেই বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়—যদিও সৌভাগ্যক্রমে দুর্দান্ত মুদ্রা ক্ষতি হয় নাই। বর্তমান অবস্থায় একমাত্র কংগ্রেস হইল উন্নত ব্যবস্থায় ও অধিক চাষ করিয়া কাজু বাদামের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

সুসংবদ্ধ গবেষণা—

কাজু বাদামের গাছ বেশ শক্ত। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ইহার এলোমেলোভাবে আবাদ করা হইত। এখন জানা গেল যে, কাজু বাদামের সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণে উল্লার অর্জন সম্ভব, শুধন হইতে ইহার উপর মনোযোগ দেওয়া হইতে থাকে। ১৯২৫ সালে ম্যাসাচুসেটের মিকটে কোর্টেহার নামক স্থানে কেরার কাজু বাদাম ব্যবস্থা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সেই সময় হইতে এই শক্তের বিভিন্ন রিপ সম্পর্কে গবেষণা চলিতে থাকে। এখন কেরাঙ্গার কোট্টারাব্যায়, অভ্যপ্রদেশের বাণাংশায় ও বোম্বাইয়ের

বঙ্গদেশে কাছ বাধানের আকস্মিক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। অবিকল্পিত অল্পকালের মধ্যে যে সব ওখা জানা গিয়াছে তাহাতে অধিকতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ও অধিকতর সত্যজনকভাবে কাছ বাধানের আবারে সহায়তা হইবে। তিন ইঞ্চি মাটির নিচে বীজ বসাইলে অল্পের ভাঙ্গতাবে বাহির হয়। দুইটি গাছের মধ্যে অন্ততঃ ২০ ফুট ব্যবধান রাখা প্রকার।

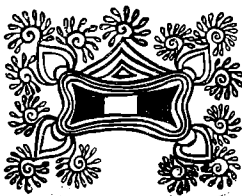
মুক্তিকা কল্প রোধ—

বিশীর্ণ পঞ্চাবধিক পত্রিকল্পনার ১,২০,০০০ একর অতিদ্রুত ভ্রমিতে কাছ বাধান আশাধের লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে। কেন্দ্র হইতে আধিক শাখায়া পাণ্ডার বর্তমান পত্রিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন রাজ্য প্রান্ত একর ক্রমি ভ্রমিতে কাছ বাধান চেষ্টা করিবার প্রায় ১৫ টাকা করিয়া ধন্য পায়। অধ্যয়নকালে এই সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব বিবেচনায়ীন রাখিয়াছে। এই পত্রিকল্পনা অনুসারে ৩০ হাজার একর অতিদ্রুত ভ্রমিতে কাছ বাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। কয়েকটি রাজ্য কাছ বাধান আবেশক

তাহাদের মুক্তি। কল্প নিষেধ পত্রিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। কাছ চাষার অভ্যাসাদি শাখা-প্রশাখা বাহির হয় এবং পাতার ঢাকিয়া যায়। ফলে বাতাসে বায়ুকা উপরে উঠিতে পারে না। সেজন্য বায়ু কামের অকালে রেল লাইনের ধারে বাধান গাছ বসাইয়া দেখা গিয়াছে যে, বায়ুকা বেশী দূর উঠিতে পারে না। গত তিন বৎসরে প্রায় প্রায়ে এইরূপ চেষ্টা চালানিয়া মুফল পাওয়া গিয়াছে এবং রেল লাইন বক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় কমিয়া গিয়াছে।

কাছ বাধানের ব্যবহার—

কাছ বাধানের শুধু শীতটাই যে বিক্রয় করা চলে তাহা নয়। বারি নিরোধক বস্ত্র, রং প্রভৃতি উৎপাদন কাছ বাধানের খোসার তৈল উত্তমরূপে ব্যবহার করা যায়। কাছ বাধানের উল্লিখিত ক্রমালোচন হইলে যে আপেলটি থাকে তাহা হইতে খুব সুবাস্ত্র নয় বটে, তবে ইহা হইতে কয়েক প্রকার খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করা যায় ইহা মহাশূন্যস্থিত খাদ্য গবেষণাগার হইতে জানা গিয়াছে।



স্মৃতিকথা

ঐকালিন্যাস রায়

(পূর্বাধুয়তি)

এই সময়ে শনিবারের চিঠির প্রকাশের দিন চলছিল। আমরা আগ্রহভরে শনিবারের চিঠি পড়তাম—তা অনেকটা উটের কাঁটা গাছ খাওয়া। উটের কাঁটাগাছ প্রায় খাল—কাঁটার মুখ হিঁড়ে রক্ত পড়ে, তবু সে ছাড়তে পারে না। শনিবারের চিঠির ব্যঙ্গবিজ্ঞপের খাঁচ প্রায়ই আমাদের অনেকের বিশেষ করে রসচক্রেয় গায়ে লাগত। অনেক পরিকাতেও ঐ মেশা স্ফুরিত হয়েছিল। উপাসনাও ব্যঙ্গসিকতা কবুত—কিন্তু ওদের ব্যঙ্গরস বেশ ক্ষুদ্রতম। একবার উপাসনা এ বিষয়ে শনিবারের চিঠিকে টোকা দিয়েছিল। কবি যতীন্দ্রনাথ তাঁর মেঘাচা বদিকতার শনিবারের চিঠির একটা মন্তব্যের উত্তর দিয়েছিল। ১৯৩৯ সালের উপাসনার প্রথম সংখ্যার (বৈশাখ) বৈশাখ নামে যতীন্দ্রনাথের একটি কবিতা বেয়োর—কবিত্বের চেয়ে আলস্যবিক চাফুড়ি ছিল খুব বেশী। শনিবারের চিঠিতে কবিতাটার সম্বন্ধে কই মন্তব্য প্রকাশিত হয়। যতীন ভাঙে খুব বিচলিত হয়। বিচলিত হবারই কথা—যতীনের লেখার কখনও কোন বিদ্রূপ আলোচনা কোন পরিকার বেয়োরনি। তা ছাড়া, সে শনিবারের চিঠির একজন প্রধান লেখক ছিল এবং তরু ও অত্যন্ত অল্পবয়স্ক পাঠক ছিল। সে সম্পাদকের নামে পত্রাকারে তার স্বভাবগিষ্ঠ শাবিত রেবের ভাষায় একটা লবাব দেয়।

যতীন আমাকে বলেছিল তোমার বাড়ীতে বহিবারের মলগিসে আর আমি যাবনা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? যতীন বললে—রসচক্রেয় উপর শনিবারের চিঠির ব্যঙ্গ আছে। আমি তোমার রসচক্রে বাই ব'লে আমাকে আক্রমণ করেছে—নইলে আমাকে ত চিঠির আক্রমণ করবার কথা নয়। আমি তো ওদেরই দলের একজন। তা ছাড়া, সম্পাদক আমাকে খুব ভক্তি করে—আমার লেখার সে খুবই তরু।

এরূপ আক্রমণের কথা নয়। তোমার বাড়ীতে আমি অন্তরিন আসব। যতীন তারপর থেকে বহিবারের বৈঠকে আমার বাড়ীতে আসত না। তবে রসচক্রেয় বাৎসরিক উৎসবে বহাবর যোগ দিত।

১৯৩২ সালে তিনজন আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সাহায্যকের মৃত্যু হয়।

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ইনি যখন গদ্যর থাকতেন, তখন পত্রযোগে এর সঙ্গে আমার আলাপ। ইনি আমাকে ছোট ভাইএর মতোই ভালবাসতেন। ইনি গদ্যর ব্যাবিষ্টাইবি ছেড়ে কলকাতা এসে মামলীর সম্পাদক হয়ে। তখন তাঁর সঙ্গে গাফুর আলাপ হ'লো। কলকাতার তার অবলম্বন হ'ল—আইন কলেজের অধ্যাপকের পদ। মামলী সম্পাদক হিসাবে ইনি কি পেতেন আমি না—মামলী প্রেসের মোতালার ইনি থাকতেন। নাটোর মহা-বাজেব মলগিসে এর সঙ্গে দেখা হ'ত। এর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হলে এর বাবার যেতে হ'ত। বঙ্গপুরে থাকতে মামলীর সুবাদে এর সঙ্গে নিয়মিত পত্রবিনিময় চলত। ইনি গদ্য লিখবার ভক্ত আমাকে পীড়াপীড়ি করতেন—ওঁর অল্পবয়সে খাটটা গদ্য প্রবন্ধ মামলীতে দিয়েছিলাম। গদ্য লেখাতে তখন আমার মন বসতনা।

ইনি আমাকে Burnsএর Works উপহার দেন এবং Burnsএর কবিতার অনুবাদ করতে উপদেশ দেন। ২০২৪টা কবিতার অনুবাদ করেও ছিলাম। মামলীতে কিছু কিছু বেরিয়েছিল। আমি বলতাম—লালা হাইকোটে প্রভাত্য যাবনা কেন? সেখানে বার লাইব্রেরীতে বসলে—লেখার অনেক ষোয়াসক পাবে—কেন তো মহাংগ কিছু কিছু জুটিয়ে বেবেন।

যাযা বললেন—৭,৭৭, ২৪ দিন গিয়েছিলাম—বেখলাম লাভ কিছু হয়না। ব্যাবিষ্টাইবা মরুত্রই একশ্রেণীর খাঁ,

তার কথার্থ্যের আলাপ আসোচনার কিছুটা বৈচিত্র্য নেই। তার কথার্থ্যভেদে কোন বস্তুই নেই—কেবলই সাধেই আদ্য কাহ্নার গল্প। কোন কাহ্না না করে সারাদিন আঁটা পোষাকে চেঁচাবে বলে থেকেই ক্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরতাম। মনে হ'ত খুঁজি এটা বড় বড় কেস করে কিরে এসাম। ছুখু বেসা বাগিষে ভর দিয়ে লিখে যে আরাম—আঁটা পোষাকে চেঁচাবে বলে কি তা পাওয়া যায়? ছেলে ছোট পাশ ক'রে বেড়ালেই নিশ্চিন্তি।

প্রত্যন্ত দালা আমাকে মুভাভিত্তিকতাগোপার ও শাক্তবংশভিত্তি—বই দুখানা কিনে পড়তে বলেছিলেন। বই দুখানা হতে আমি খুব উপকার পেয়েছি। প্রত্যন্ত-দালা তাঁর প্রত্যন্ত বইখানা নিজ হাতে উপহার লিখে আমাকে দিয়েছিলেন।

কলন ধরলে কলনের মুখে কত রস বহত। মুখে কিত কখনও বসিকতা করতেন না—খুব গম্ভীর হয়ে থাকতেন। বোধ হয় বীরা লেখার বসিকতার দানসত্তা খোলে, তাঁর মুখে তার অপব্যয় করেন না। রাজশেখর বাবু, বিতুতি (মুখ্যে), পন্নিমল গোস্বামী—এরা সবাই গম্ভীর। কেবল প্রেমভক্তারা ব্যতিক্রম। অন্তঃকালও অগ্নি মুখের কথায় খুব দালাতেন।

২। কিরণের চট্টোপাধ্যায়। কিরণের বাড়ী ছিল উত্তরপাড়। তার কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে আমি তার সঙ্গে আলাপ করবার লজ্জা উত্তরপাড়। গিয়েছিলাম। কিরণের স্বভাববাড়ী ছিল চাকুবিয়া। নৃত্যকার অবস্থায় চাকুবিয়ার শনি রবিবারে এসে সে থাকত। যৌবনেই কিরণের স্ত্রী বিয়োগ হয়েছিল। তার ছেলেছাত্র তাই বিধিবার কাছেই থাকত। কিরণ চাকুবিয়ার যখন থাকত তখন রসসঞ্চে আসত। সব সময়েই সে পান চিবাত। কিরণ ডবল এম-এ ছিল—বি-এলও ছিল। কবির পক্ষে ওকালতি করা কঠিন—কাজেই অধ্যাপক হয়েছিল। খরসে সন্তষ্ট কবির এতেই বেশ চলে যেত—চাইবাও ছিল সকলে মুগ্ধকিত।

কিরণ কবিতা খুব কম লিখত, কিন্তু বা লিখত তাই অপূর্ণ। আমি Perfect dictionএব খুব পক্ষ-

পাতী। তার রচনার চাতুর্ঘ্য আমাকে মুগ্ধ করত, মুগ্ধ ক'রে রাখতে ইচ্ছা হ'ত তার কবিতা। তা ছাড়া, আসল কবিতার যে গুণ, মনেব আবেগের গভীরতা ও আন্তরিকতা, তার কবিতায় তার অভাব ছিল না। নির্ভূত রচনা পাবি-পাটের সঙ্গে সংযত ছন্দগবেষণার আন্তরিকতা—এর বেশি আর কি চাই আসল কবিতায়? আজকাল আমাদের অল্পেব কবিতায় একটা বিশিষ্ট নতবাধ বোঝেন। এই মতবাধ আমার লেখাতেও নেই—তার লেখাতেও ছিলনা। ছন্দগবেষণার সর্বস্বসুন্দর অভিব্যক্তিকেই কিরণ প্রের্ত কবিতা মনে করত। কিরণ নাম যশের দাবি রাখত না—লিখলে তার ছন্দয়ের তার লক্ষ্য হ'তো তাই লিখত। এই কিরণ কত বড় কবি তা একালের পাঠকরা জানেন না। এত বড় কবি ও শিল্পী কখনো চিত্রিনি অখ্যাত অবস্থায় হয়ে থাকতে পারে না। একদিন কোন বসিক পাঠক তার 'নতুন ষাভাত' অনান্যভা বোশে প্রচার করবেই। প্রত্যন্ত বড় ভিনিগকেই ছোট ক'রে বোশার খুণ এখন চলছে—তাই কিরণের কবিতার স্বাধোপাধ্য মধ্যাণা হচ্ছে না। তা ছাড়া, ছোট ভিনিগকে খুণ খুণিয়ে কাঁপিয়ে প্রকাশ ক'রে প্রচার করবার প্রচণ্ড চেষ্টা গেলে—এ চেষ্টাও একদিন ক্রান্ত হয়ে পড়বে। সত্যিকার ভাল কবিতার বোধ হবেই। তখন কিরণের কবিতার ডাক পড়বে।

কিরণকে আশ্রয় করে বলতে ইচ্ছা হয়—বহু ভূমিত বশ দান গাওনি—অন্তরে অতৃপ্তি নিয়ে বিধার গ্রহণ করোনি। আমি তোমার স্বত্তি বন্ধে করে আশো বৈতে আছি। তোমার অনবদ্য কবিতাভক্তি অবদ্য মানে মানে পড়ি আর অগভিতে কাতব হয়ে ভাবি এমন অপূর্ণ রচনাকে পত্রার জলে ভাসিয়ে দিতে চায় অর্বাচীনের হল?

আমি তার নতুন ষাভাত উদ্দেশে একটা পান লিখেছিলাম। সেটা এই—

তোমার তাই—নতুন ষাভাত—নতুন পাতা

কম্বজের ডাণে ডালে।

আলোতে—নাচছে কিবা, কোন উদাসী

বেগুং তানের তালে তালে।

বেদনার—তরুণ কতি তরুণ বৈটার

তব প্রেম—করণ স্ততি শিউলি ফোটার,

শিশিরে—খোঁত যে গ্রেন, ঘিড় যে গ্রেন

যেখোঁ যেখোঁ কালে কালে ।

ঝোড়ের এ—বহির লগৎ, ভাগছে হেবার

কতই এহ উপগ্রহ,

ভাবাতি—ভাবার পানে চায় যে তরু,

চায় বুক তায় অহবধ ।

শবডের—চাঁদ ভাগে, তার কোণরা নাবি,

বহিরে—ভক্তিরে মাখার রাণি,

তারকা—কিহণ তব জুড়ায় আঁধি...

গভীর-প্রাণেব বহর লহ ।

কিরণবন্ধ বলে তার লেখার সবচেয়ে আমি অত্যাঁক
কবছি না । ভালো লেখার মজাই যে আমার বন্ধ হয়েছে ।

কিরণের ছোট ছেলে বিলম্ব বেশ কবিতা লেখে—
দে অজান্ত কবিরের ছেলের মতো নয় । ছেলের মতো
নয় । তাকে আমি নিছের তাইপো বলেই মনে করি ।

বেশ দিন কিরণকে হসকে পাইনি । অকালে তার
তার বহু হল । ভারতীগেলি তাকে অনেক দিন
পেরেছিল । অবিকারে কবিতা ভারতী আর বহবাণীতে
বেরিয়েছিল ।

আর একজন বন্ধু সতীশ চন্দ্র ঘটক । এই কথা আগে
বলেছি—আরো ২০টি বলি ।

সতীশদার হৃত্যুতে আমি খুবই আশাত পেরেছি ।
সতীশদার কথা আগে লিখেছি সতীশ দাৰ্জনা এম-এ
পাস করেছিলেন—উকিল ছিলেন, ওকালতি করেন নি ।
আইন পাস-করা অবিকারে সাহিত্যিকই ওকালতি করেন
নি । বহবাণীক ওকালতি করতেন, কিন্তু পশাং হয়নি ।
মকল এলে তাকে গান পেয়ে শোনাতেন । সতীশদার
নানা শাস্ত্রে জ্ঞান ছিল—বিজ্ঞান, অলঙ্কার ইতিহাস, সনাত
শাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি সব বিষয়েই তার অহুয়াগ ও অবিকার
ছিল । নানা বিষয়ে অহুয়াগ থাকায় তিনি সাহিত্যের
একনিষ্ঠ সাধক হয়ে উঠতে পারেন নি । তিনি লিখতেন
ছোটবেলা থেকেই, কিন্তু লেখা ছাপার মজা মাসিকে পাঠাতে
তার উৎসাহ ছিল না । এ বিষয়ে তার ঠোঁড় ও আলত
ছিল অসামান্য । বিচিত্রা প্রকাশের পর তাঁর বন্ধ উপেন
বাবুর তাগিদে বিচিত্রায় লেখা দিতে সূহ করেন ।

এমব চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হলে তিনি সতীশ দাৰ্জনা
শক্তির পরিচয় পেয়ে লেখা ছাপার মজা উৎসাহিত করেন ।
তার ফলে সবুজপত্রের তাঁর লেখা প্রকাশ হতে থাকল ।
এমব বাবুর চাহিদাশে যে সাহিত্যপ্রাণী গড়ে উঠেছিল,
তাঁরা সকলেই সতীশ দাৰ্জনা লেখার অহুয়াগ হয়ে
পড়লেন ।

আমাদের বক্তাব, কারো লেখা ভালো লাগলেও সাহস
ক'রে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করি না—যাঁর মতামতের
উপর আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তিনি একবার দার দিলে
তখন আমরা তার লক্ষ্যনি বুজি ।

যাঁর লেখার সবচেয়ে ভক্তরা বহাবর ঠোঁড়ান ছিল—
মোহিতলাল যেমনি তাঁর স্মৃতি কহলেন অমনি
মোহিতোবা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগল ।

সতীশদার সবচেয়ে তাই হয়েছিল । কিন্তু তাদের
সংখ্যাও ছিল অল্প । এমব বাবুর প্রশংসাবাদে সতীশদার
আশ্বসিতেন হয়ে উঠেছিলেন ।

সতীশদা ছোটগল্প লিখতেন চন্দ্রকার কিন্তু কোন
মাসিকে পাঠাতেন না । আমাদের ভবানীপুত্রের পাশ্চিক
পত্র সন্নিধানীর সম্পাদক তাঁর গল্পের খাতখানি সংগ্রহ ক'রে
একে একে তাতেই ছাপাতেন । ৩০-এরেকের সন্নিধানীর
দ্বারা সেগুলির প্রচার হয়নি—গল্পের বইও বেরোয়নি ।

শেখরীন্দ্র সতীশদা নাটক লিখতে সূহ করেছিলেন—
বলা বাহুল্য, যে সব নাটক সাহিত্যপ্রাণে উৎকৃষ্ট হ'ল—কিন্তু
বহাবরের কর্তৃত্বা সে সব পছন্দ করল না । তখন তাঁর
বহাবী নাটিকা—লিখে তিনি বহাবরে প্রবেশ করেন ।
অর্থেই মজা তিনি হলের আশ্রকে সূহ করেছিলেন । তাঁর
উদ্দেশ্য ছিল একবার মাথা নীচু করে বহাবুর হৃদয়ে
প্রবেশ করতে পারলে তাঁর ভালো ভালো নাটকের দৃশ্যতি
করা সম্ভব হবে । হু ও ব্যাং ও লাগিকাওয়ের কথা আগে
বলেছি । সতীশদার দ্বাশির নামের বইয়ের নাম ছিল
স্বলক ।

সতীশদা বালাভাষা সবচেয়ে অনেক প্রশংসা লিখেছেন—
সেগুলি পুস্তকাকারে বের হয় নি । প্রবাসী সাহিত্য
সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে কোরানার বহাবাণ্যায়
সতীশদার প্রশংসগুলি থেকে অনেক অংশ উৎকলন করেন ।

সতীশবা অসফলতার বইও লিখেছেন তাত অসফল থেকে সেল। তাঁর দুহুর পর পূর্ণবিহেটোর হলে তাঁর বিয়েপে শোক প্রকাশের ক্ষত একটা পোতা হয়। অতুল গুপ্ত সভাপতি ছিলেন। আমি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। আমি আরো ২টা প্রবন্ধ লিখেছিলাম একটা উপাসনায়, অজুটা নানসীতে ছাপা হয়—আর কেউ কিছু লেখেন নি। আমি বরাবর চেয়েছি—গত্যাকার গুণী লোকদের আদর হোক। এজন্য আমি আমার লেখনীকে কত যে খাটোরছি, তার ইয়ত্তা নেই। যারা মেকী তাদের আদর করবার লোকের বেশে অভাব নেই। কিন্তু গুণীলোকদের ভক্ত বৃত্তিময়। এখানে কত গুণীলোক যে শ্রুয়োগ শ্রুবিধা ও উৎসাহ না পেয়ে দীর্ঘ ঋণ ত্যাগ করে বিহার নিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এক একটা জনবল্লভ সামগ্রিক পত্রিকার পোষকতা পেয়ে কত মেকী মণ্ডোরে যে জীবন কাটিয়েছে এবং কাটান্ধে—তা তো দীর্ঘ জীবনে যেখলায়।

তাঁর দুহুর হ'লে পূর্ণ বিহেটোর হলে একটা লোক সভা হয়—তাত আমি একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম সভাপতি ছিলেন গুণীঅতুল গুপ্ত। আমি একটা-পান লিখেছিলাম—সে পানটা এই—

আজি—কথিত ক্ষয় কত বিগলিত হতবল

তোমারি বিরহে মিতা তিতায়ছে বহাতল।

প্রাণ ভরে ভালবাসি,

ফিলে হরহর রাশি,

বিনিময়ে তার্য শুধু—চালে আজি আঁধি-মল।

সার্যটি জীবন ধরি ফিলে হাসি অধিঃ।

অদম্যে অকারণে

হাসদুখামার বনে

তেতে চুরে হৃদিস্ত আনিলে ব্যথার চল।

কারো গুত্র, কারো সাধী, কারো সখা বসময়,

জ্ঞানে গুণে গানে প্রেমে কহিলে ক্ষয় নয়।

শুধু ভয় কবি বীর

শেষ হ'লো ব্রতটীর

বহিলে না হৃদিতে ক্ষয়-বিষয়ের বল।

প্রিন্স গোপাল নাহরুয় রোডের বাড়ীতে অনেক অস্থিবিধা ছিল। উঠে সেলান এই ১০ নম্বর লোক রোডে। এই

বাড়ীর ভাড়া ছিল ৬০০ টাকা—বেশ ভরপোছের যোতলা বাড়ী। বাইরের ঘরটি ছোট। বসন্তের বসার পক্ষে অস্থিবিধা হ'ত, কিন্তু গমচক্ৰ তখন খুব ভয়জনক।

বড়িশা স্থলের কথতোপের এগারো বছর কয়েকমাল হয়ে গেল। এই বারো বছরে যে মাইনে বেড়েছিল—দ্বিগুণ করলে তা বছরে ১ টাকা ক'রেও হবে না। Aided School এর Assistant Headmaster-এর দশা ছিল এই। তবু অল্পকোথাও চেষ্টা করিনি—রাগহর্ষী আসার প্রতীক্ষা করিনি, একটা গোপাড়ী অন্ততঃ আদবে নিতে কোথাও থেকে, এ প্রত্যাশাটা ছিল। উলিপুর ছাড়ার পর ১১ বছর ২ মাস অপেক্ষা করতে হ'ল। শেষে একখানা পোক্তর গাড়ী এসে, গাড়োরান কালিকলমের সম্প্রদায় স্থলীভব বস্তু।

মুহুরী এসে বললে, ভ্রামাঙ্গণাব মিত্র ইনস্টিটিউশনে আপনাকে নিতে চান, যাবেন ?

আমি—তা যেতে পারি। ক্রমে বয়স বড়ে, আর ছুটো-ছুটি করতে পারি না। তবে এখানে আমি ইংরাজি পড়াই সেমস্ত টিউশনী পাই, তোমাদের ওখানে গেলে ত বাংলা পড়াতে হবে। তাহলে টুইইসনি পাও না, বাংলা শিক্ষককে কে আর ছেলে পড়াতে ডাকবে ?

মুহুরী—আপনি ইংরাজী বাংলা দুইই পড়বেন।

আমি—যেখো তাই, কথিতা শেষায় জন্য আমার ডিষ্ট্রিক্টনে পাশকরা বি-এ ডিগ্রীটা ডুবে না যায়, কতাদের যোলে। আমি কয়েক বছর বেড মাস্টার ও ছিলাম, যে পরীক্ষার জন্য ছেলেদের পড়াতে হবে...সে পরীক্ষার আমি দয়াকরী বৃত্তি পেয়েছিলাম।

মুহুরী—এখানে টুইইসনী ত পাবেনই, বরং টুইইসনীর পারিস্রমিকের হার এখানে চেঁর বেশি।

ছদ্দিন পরে মুহুরী এসে বললে, "কাল সন্ধ্যায় সময় ভ্রামাঙ্গণাবের সঙ্গে যেখা করবেন...তিনি আপনার জন্য প্রতীক্ষা করবেন।"

ঐদিন University Instituteএ কি একটা meeting ছিল—আমি বৈকালে সেখানেই গেলাম। ইতিমধ্যে আমার নতিপরিবর্তন হয়ে গেছে। ভ্রামাঙ্গণাবের সঙ্গে যেখা করবার আর উৎসাহ ছিল না। সভায় গিয়ে

যেখি সেখানে মুরলী। মুরলী বললে—এক “আপনি এখানে? আপনার যে ক্রমাগতসেবক মনে দেখা করবার কথা। Engagement রয়েছে।”

আমি—না ভাই, কাজ নেই। সুনাম এক অধ্যাপক বন্ধু হলে এ পথের প্রার্থী। এ চাকরি নিলে বন্ধুত্বের ঘটে যাবে।

মুরলী—না না, এ পথ সে পথ নয়। এটা আপনাকে কষ্টেই ক্রিয়েট করা হয়েছে। এর চেয়ে চের কম নাহিন। সেটার এ পথ ছিলই না—এই মস্ত অস্ত্রের প্রার্থী হবার কথা নয়। এটা নতুন creation, specially for you.

মুরলী আমাকে ধরে নিয়ে গেল। বৃন্দাবনের কবি পক্ষে মুরলীর তান উপেক্ষা করা চলে না। ৮০ টাকা মাহিনাতে মিত্র স্কুলের শিক্ষকই হলান। প্রথমবার (ডঃ ব্যানার্জী) ছিলেন ক্রমাগতসেবক পাশে বসে। তিনি বললেন—তবে এই সামান্য মাহিনাতে একটা মাটিকারি মেওয়ার মত ডাকা কেন? ক্রমাগতসেবক বললেন—আপাততঃ এতেই আনুন। কাছাকাছি না এসে অস্ত্র কিছু করার সুবিধা হবে না।

অস্ত্র কিছুই মস্ত কোনদিন প্রার্থনাও করিনি—অস্ত্র কিছু হয়নি। অস্ত্র কি আর যে হতে পারে তা আমি ভেবেও পাইনি। বঙ্গবানীর হয়ে আমি সুপরিচিতই ছিলাম। আমার জীবনের মহাভারতে উজোগপর্বাটাই নেই। উজোগিনং পুরুষগিবেমুপতি লক্ষীঃ। সুগু সিংহের মূখ বৃশ প্রবেশ করে না। ছিলাম হেডমাষ্টার, নেমে হ’লাম এডিটর হেডমাষ্টার, এইবার নেমে হলাম সাধারণ একজন শিক্ষক। বয়সের সঙ্গে লেখকের পরোহিত হয়, আমার ক্রমে অযোগ্যতাই হ’ল। নিয়তি ও পুরুষকার দুইই দারী। ২২ বৎসর সেবা করেছি এই স্কুলকে, সেই সাধারণ এক শিক্ষক হয়েই Retire করেছি। পরীক্ষায় পেতাম ১০০, মগের উপকর্মে ২২ পর্বত উঠেছিল—নগরের মধ্যে মাহিনা হ’ল ৮০ টাকা। এই পদ গ্রহণ করার আমার অধ্যাপক বন্ধুটি কিন্তু বিরগ হলেন। তিনি ভাবতে পারলেন না—ভগবান বা করেন মঙ্গলের অস্ত্র, তাঁর ছেলে একবারে অধ্যাপকই হ’লেন। আজ তিনি ১ম শ্রেণীর কলেজের

Vice Principal. অনেকেই আমার যোগ্যতা বি-এর মাপকাঠি দিয়েই মেনেছে—তার অতিরিক্ত কিছুই ভাঙতে পারেনি। বন্ধুতেও না শত্রুতেও না। আমার এসব অনর্থকারই কথা। কিন্তু আজ জীবনশ্রুতি লিখতে বসে যোগ্যন করতে চাই না।

হেডমাষ্টার ম’শায় আমাকে class এ class এ introduce করলেন—‘ইনি বি-এর পরীক্ষক’ বলে আর কিছু বললেন না। ছেলেরা তার চের বেশি আমার মধ্যস্থে জানত।

সত্য যোগ্যন করবনা—আমি কি কি না, সেজন্য নীচে class এ ইংরাজি কবিতা প্রথম প্রথম পড়াতে বেগুয়া হ’ত। তাহপরি সম্পূর্ণ বাংলায় তাইই আমার হাতে পড়েছিল। অস্ত্র কোম বিষয় পড়ানোর সুযোগ ঘটেনি। বাংলার শিক্ষক বলে ২২ বছরে ঐ স্থানের একটা ছেলেও আমাকে private tutor রাখেনি।

আমি ভাতেরও দূষিত নই। মাহিনা কম ছিল—মাহিনা বৃদ্ধি হ’তনা—দূষিত হইনি, কারণ মাহিনার উপর আর আমি নির্ভর করতাম না। আমার পাঠ্য পুস্তক তখন বেশ চলছিল। সেকালের প্রকাশকরা ঠিক মত পাওনাও দিত। পরাবীন বাংলায় পাওনা অধারে বিশেষ অনুবিধা ছিল না। শিক্ষা বিভাগের একটা যে কোন খুঁটোর আমার হরকার ছিল। মাহিত্যিক জীবনটাকে ফুটিয়ে রাখবার মত একটা বোটার বৎকার ছিল, তা সে বোটার বতই কাটা বাত্ক।

শিক্ষক বিদ্যাবে অনেকের নীচে ছিলাম, ভাতেরও দূষিত নই—তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ-এ, বি,এ অনার্সেই প্রথম ২০না করেছি খাতাও বেছেছি।

স্কুলের ছেলের টাইমনী পাইনি, কিন্তু অস্ত্রাঙ্গ বৃশ ও কলেজের ছেলেমেয়েরা আমাকে নয়, বাংলায় মস্ত ও অস্ত্রাঙ্গ বিষয়ের মস্ত প্রাইভেট টিউটর রাখত; আমি বতঃ বা ছিল কাল তা ক্রমে ছেড়ে দিচ্ছিলাম।

কেবল বাংলা পড়াতে হস্ত, ভাতেরও দূষিত নই—কারণ বাংলার Status ক্রমেই বাড়ছিল। পাঁচ পিয়ার্ড ক্রটিনের মস্তও দূষিত হইনি—কারণ, পড়াতে আমার ভালোই লাগত।

১ম শ্রেণীতে ২টা সেকশন ছিল—একটি স্নুহং—অটটি ছোট। ছোট সেকশনে বাছাবাছা ভালো ছেলে থাকত। স্নুহং সেকশনটিতে অনেক চুঁচু ছেলে থাকত। তাইবের সামনে বেঁচে পড়ানো খুবই ক্রমবর্ধমান হ'ত। কিন্তু ছোট সেকশনটিতে এসে আরাম নেতান—প্রাথমিক বিদ্যে তাইবের পড়াতান—প্রত্যেকেই খুব মন দিয়ে পাঠ শুনত—

“প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাৎকালিক পদ্ধতিতে হত বর্ণে।” এমন সুবোধ মন্দির তত্ত্ব ও বিভাগ হাত অত দুই স্থলে পাইনি। পঞ্চাশত্রে এ স্থলের দুই সেকশনের কতক স্থলি ছেলের মত উচ্ছ্বাস উদ্ভূত ছেলে অত দুই স্থলে পাইনি। উপপুরে মূলমান ছেলেরা ছিল অত্যন্ত শক্ত, —বড়িশার খুঁটান ছেলেরা ছিল ততোধিক শক্ত। ছোট সেকশনের ছেলেরা সবসময়ই বেশ বড় বড় কাৰ্য্যকর করে, গণ্যমান্য ও অনেক হয়েছিল। কিন্তু কাউকে পাঠকগণ চিনবেন না—চিনবেন একজনকে। তার নাম বিকাশ দাস। বিকাশ ছেলে খুব ভালো ছিল—বাংলায় ভি পেয়েছিল।

একটি সভায় আমি সভাপতি ছিলাম—বিকাশ ছিল বক্তা। বিকাশ বল্লে—“আমার গুরুত্ব সামনে আমি কি বলব? আমি এখন একজন আটটি হয়েছি, ঐ গুরুত্ব পায়বল্লেই আমার যা কিছু সম্বল তা সবই পাওয়া। বিকাশ যে ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করেছে—সে ক্ষেত্রে আমার দান কিছুই নেই।” আমার মনে হ'ল গুরুত্ব এমনি করেই বাড়ানো হয়, এমনি বড় ক'রে বেঁধে দেওয়া হয়, সে শিক্ষাটা হঠক দিয়েছিল। আশীর্বাদ করি সে জীবনে অনন্তসংগঠন সাফল্য লাভ করুক। বড় সেকশনের একজনকে পাঠকগণ চিনবেন। তার নাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বিখ্যাত গীতপীঠী। তার মধ্যে যে অসামান্য শক্তি সঞ্জন করতে তার পরিচয় তখন পাইনি। কি কথা বোকে কি কথা এসে পড়ল।

এখন এই পর্য্যন্ত ঋণশূন্য—পরে এই শিক্ষকজীবনের কথা ভালো ক'রে বলব।

একটা পরম স্নাত হ'ল মিত্র স্থলে এসে স্থলে বাতায়তে আর ছুটোছুটি করতে হ'ত না। বীণে গুহে জাগ্রাসাওয়া করতাম।

এ বাসায় আদার পর এবং বড়িশা ত্যাগের পর প্রধান ঘটনা ঘটেছিল কস্তার বিবাহ। ১৪ বৎসর বয়স হওয়া মাত্র তার বিয়ে বেওয়ার কথার উঠল। আমি বাসাবিবাহের বড়ই বিরোধী ছিলাম—সুখ বয়স কম ব'লে নয়, ঐ বয়সেই তখন আমাদের সমাজে মেয়ের বিয়ে হ'ত, মেয়ের স্বাধীনতাকে খারাবি ভাল ছিলনা, বেঁচে পুষ্টি ছিলনা, পরিপাকশক্তি কী। তারপর বিয়ের কথা শুনে অবধি আরো শুকিয়ে যাচ্ছিল। যেখানে কথা হচ্ছিল সে স্থানও অনেক দূর—কটক। পাত্রের মামা আশীর্বাদ করতে এসে আমি বললাম—আপনি প্রতীক করুন, আমি আদার ডাক্তার মহিৎ মোহনকে ডাকি, সে যদি বিয়ে বেওয়ার অমুমতি দেয় তবেই বিয়ে হবে। পাত্রের মামা অতি বিবেচক সম্মত ব্যক্তি। তিনি বললেন—এ মুক্তি খুব ভালো। ডাক্তার এলেন—ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে বললেন—কোন রোগ নেই, অনায়াসে বিবাহ হওয়া যেতে পারে। বিবাহের দিন স্থির হ'ল। পাত্রটি খুবই গুণবান—বি, এম, সি বিন্ধু গাশ করে কটকে সরকারী শিক্ষাবিভাগে চাকরি করত, ভূমিস্বত্ব ছিল, ভালো sportsman ছিল, সঙ্গীতে ও কবিতা রচনার দক্ষ ছিল, গল্পও লিখত, তাছাড়া ভালো চিত্রকর ছিল।

বিবাহ খুব খুব করেই বেওয়া হয়েছিল। সেদিন ছিল পুণ্য দিন। হরীপ্রসাদের অমৃত্তি। কিন্তু আমার কস্তার পক্ষে পুণ্যতিথি হয়নি। কয়েক বৎসর পরেই যে বয়সে এখন সকল মেয়ের বিয়েই হয় না সেই বয়সেই সে বিবাহ হ'ল। থাক, সে কথা পরে হবে, বসন্তের সময়সঙ্গ বিবাহের পরিচালনার অত্যন্ত পত্রিকায় আমাকে মারোদ্ধার ক'রে ছিল।

বসন্তের সময় পুষ্টি হতে লাগল, তাতে এক ঠাঁয়ে থাকে স্থাবর করে রাখলে চল না। বিশেষতঃ আমার বাইরের দ্বারে স্থানান্তর। সেদিন মলিনী সরকার বা কাকী মজলুম এসে গান শরত, সেদিন রাত্তিরে বহলোককে ধাক্কিয়ে গুনতে হ'তো। এইরকম একে জন্ম করে তোলা হ'ল। এক একজন সময় এক এক বিবাহের আনন্দ প্রকটতেন। দক্ষিণ কলকাতার কোন সভাপতিত্ব অধিবশন হ'লেও বসন্ত আমন্ত্রিত হ'তো।

এই বাড়ীটিতে অল্প কোন ভাড়াটিয়া বা বাড়ীর মালিকের সঙ্গে ভাগ্যভাগি করে থাকতে হ'তনা। কিন্তু এ বাড়ীও ত্যাগ করতে হ'লো। বাড়ীর মালিক নোটিশ দিলেন।

এইভাবে এক-বাড়ী থেকে অল্প বাড়ীতে তরীয়াড়া শুটিয়ে যেতে হ'ত। সেমস্ত নিম্নেই খুব বিপন্ন বোধ হ'ত না কোন বাস হুংগু হ'তনা। মনে হ'ত শহরে বাড়ীতো অনেক আছে—অল্প বাড়ী খুঁজে নেওয়ার অল্প স্রেশ বীকার করতে হবে বৈত নয়। তাছাড়া, যেমালিক সে যদি উঠিয়ে দিতে চায়, তাতে বাস হুংগুর কাংখই বা কি আছে?

সেদিন আর নেই। এখন স্বাধীন বাংলায় ভাড়াটিয়াই একরূপ বাড়ীর মালিক হয়ে উঠেছে। উঠাবার তো উপায় নেইই, টাকার দাম ৪৫ গুণ কমে সেলেও ভাড়া বাড়ারই উপায় নেই। কত লোক নিজেরা বাড়ী তৈরি ক'রে তাতে বাস করেনা, উচ্চ ধারে ভাড়াটিয়াকে ভাড়া দেয়, নিজেরা অল্প পুখুরো ভাড়ার পরেই বাড়ীতে বাস করে। বাড়ীতে কিন্তুই অসুবিধা থাকলে ভাড়াটিয়া চোব রাগায়। বাড়ীর মালিকরা নিরুপায় হয়েও সন্মতি উদ্ধারের চেষ্টায় আত্মপতনের আশ্রয় নেয় এবং বহু ব্যয় ক'রে শেষে মামলায় ধারে।

এতে নতুন বাড়ী তৈরি করার উৎসাহ কমে আসছে। যে সব ভাড়াটিয়া পূর্বের অল্প ভাড়ার আছে তারা সন্মতি থাকলেও বাড়ী তৈরি করতে চায় না। বাড়ীর মালিকরাও বাড়ী তৈরি করতে উৎসাহিত হয় না।

যে বাড়ীর অংশই মালিক বাস করেনা নানা কারণে সে বাড়ীর ভাড়াটিয়াকে সংস্কার প্রয়োজন হতে পারে। ১। নিম্নের বাসের বা কামের অল্প প্রয়োজন হতে পারে। ২। পরিজনবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হতে পারে। ৩। বাড়ীটার নতুন রূপ দেওয়ার জন্য বা অক্ষয়বল করার জন্য প্রয়োজন হতে পারে। ৪। রিক্সা করার জন্য প্রয়োজন হতে পারে। ৫। ভাইয়ে ভাইয়ে ভিন্ন ধরার জন্য প্রয়োজন হতে পারে। ৬। বাড়ীর উপাধিকার অবদর গ্রহণে বা মৃত্যুতে বাড়ীর মালিকের আর্থিক অবনতির কলে প্রয়োজন হতে পারে। ৭। ভাড়াটিয়া

বা তার পরিজনদের আচরণ চরিত্র গতিবিধি ইত্যাদি অব্যাহতীয় হলেও প্রয়োজন হতে পারে।

বাড়ীর অংশ হতে লম্ব ভাড়ার পরিমাণ দেখান-সমস্ত সমাধানের একটা অল্প মনে করা উচিত।

এসব কথা চিন্তা করে মনে হয়—একটা অন্ততঃ নেয়ায় থাকা উচিত—(তা স্বয়ং বহুবিধ হতে পারে) যে নেয়া দেব সেবে বাড়ীর মালিক বাড়ীর স্থল পাবে—ইচ্ছামত বাড়ীর পুনর্গঠন করা। আর ভাড়া নির্দেশ করে যেওরা উচিত টাকার বর্তমান মূল্য, ট্যাক্সের পরিমাণ, বাড়ীর অবস্থার সঙ্গে সন্মতি দেখে। ধনী ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে অল্প ব্যবস্থা করা হয় হোক। দখাবিত, নিরদয়বিত বাড়ীর মালিকদের স্বার্থ না বেখলে রাক্ষস অবিসার হয়। কত লোক ছীবনের সন্মতির সর্ব্ব বিধে এমন কি হেনা ক'রে মাথাগুঁজবার জন্য একটা বাড়ী করে—কিছু অংশ ভাড়া দেয় অন্ততঃ ট্যাক্স ও সাগানো টাকার দুইটা ভুলে দেওয়ার জন্য।

সরকারের ভুলে যাওয়া উচিত নয়, এই সব নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়ীর মালিকরা সরকারের শাসনপ্রণালী, তথা পৌর-প্রতিষ্ঠানের চায় দেয় উচ্চহারে, তাহাও সরকারের দক্ষণীয়, তাহেবও ভোট আছে।

ভাড়াটিয়া ও মালিকদের মধ্যে অধিকতর মনোমালিন্য চলে এবং শহরের আবহাওয়া তাতে বিকৃত হয়—এটা কি বাহনীয়? অবিরত ভাড়াটিয়াই সঙ্গে বাড়ী নিয়ে মামলা মকদ্দমা চলবে—এও কি বাহনীয়? ছোট ছোট বাড়ীর মালিকদের মনে সরকারের বিধানে একটা অদৃষ্ট মনো-ভাবে সৃষ্টি হচ্ছে—তাও কি বাহনীয়? সাপও না মরে লাঠিও না তাতে এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া ধরকার নয় কি?

আপে একমাসের নোটিশই যথেষ্ট ছিল, সে স্থলে ২৪ বছরের নোটিশের প্রবর্তন তো করা যেতে পারে। টাকার মূল্য হ্রাসের কথা চিন্তা করে ভাড়া ৪৫ গুণ না হোক হ্রাস-পূর্ব্ব কালের আড়াই গুণত হতে পারে। থাক, অনেক অশাস্তব কথা বলে কেসলায়।

স্বাধীন কলকাতা বোম্বের একটা বাড়ীতে উঠে পেরান। তখন এই বাড়ীই একরূপ শহরের দক্ষিণ প্রান্তের শেষে

অবস্থিত তখন Lake area শহরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গড়ে
উঠেছিল। সেখানে মশার উপত্যক ছিল খুব বেশী।

এ বাড়ীতে আসার পর আমার একটি একবৎসর
বয়সের পুত্রের মৃত্যু হয়।

এখানে রসচক্রে শরৎচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব হয় এবং
বছর দুই নতুন সাহিত্যিক আসা যাওয়া করেতেন।

এখানে থাকার সময় দুইজন সাহিত্যিককে প্রতিবেশী-
রূপে লাভ করি। একজন শ্রীমান সুব্রহ্মণ্য বিদ্যাস।
বার-এট-ল। সুব্রহ্মণ্য একজন উচ্চশ্রেণীর কবি। তার
কবিতার পূর্বসূরী পরমীচৌরন ও পরমীপ্রকৃতি অপূর্ব রূপ
লাভ করেছে। সুব্রহ্মণ্য লাগবত থেকে যে সকল কবিতা
লিখত—সেগুলি উপাধের। সুব্রহ্মণ্য মলকম কোটের
জন্ম হয়েছিল—এখন অবসর গ্রহণ করেছে। জন্ম হওয়ার

পর দে দেখা ছেড়ে দিয়েছে। তার কবিতা আমার খুব
ভালো লাগত।

আর একজন কালীচরণ ঘোষ। কালীচরণ বেশের
নিম্ন বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্বন্ধে সাবগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করে।
কালীচরণ ইংরাজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই লেখে। তার
লেখা থেকে অনেক কিছু শিখবার আছে।

এই বাড়ীতে থাকার সময় আমার অংকন, বৈদ্যুতিক,
সাহিত্য প্রসঙ্গ ইত্যাদি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

৮ ফেব্রুয়ারি বন্ধোপাখ্যায় লগ্নতাবিনী পত্রক পেলে
আমরা রসচক্রে থেকে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলাম।

এই বাড়ীতে থাকার সময় আমার স্ত্রী ও আমার
দুইজন বই পিতৃবিদ্রোপ হয়। আমার পিতৃবিদ্রোপ ৮৬ বৎসর
বয়সে এই বাড়ীতে বেহ ত্যাগ করেন।



ভারতীয় মুদ্রার কথা

(পঞ্চম অধ্যায়)

ঐশ্বৰ্য্যের চক্র ঘুরে

পূর্বসূচি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাকালে :—

আমরা যেখানি নানাকারনে ভারত থেকে ধৰ্ম্ম বিদেশে রপ্তানী হচ্ছিল। যুদ্ধের প্রাকালেও সে অংশ বজায় রইল। মূল্যমান বিশ্বব্যাপ্তি মন্ডার পর থেকেই কম ছিল। ফলে ভারতীয় মুদ্রার অবস্থাও অনিশ্চিত ছিল। দেশরক্ষারী মহল থেকে মুদ্রামান হ্রাসের (devaluation) দাবী দিন দিনই বেশী হতে লাগল। দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন দেখা দিল। যুদ্ধ পূর্বের দাবী সম্বন্ধে মুদ্রাকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হ'ল। যুদ্ধের আগে টাকার বিনিময় মান > নি. ৬ পে. ছিল বেশী (overvalued) কিন্তু যুদ্ধকালে এ বিনিময়মান বৰ্ধাবধ মনে হ'ল। ১৯৩৯ সালের শেষার্ধ্বে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য প্রচুর বিস্তৃতি লাভ করে সঙ্গে সঙ্গে আমদানীর পরিমাণ কমে যায়। ফলে বাণিজ্যের গতি ভারতের অগ্রসূলে যায়। টাকার বিনিময় মূল্য > নি. ৬ পে. থাকায় ইংলণ্ড থেকে মাল আমদানী করতে যায় হ'ত কম আর রপ্তানী করে পাওয়া যেত বেশী। অর্থাৎ ইংলণ্ডে দিন দিন যথেষ্ট ঠালিং ভারতের হিচাবে (account) সমুত্তে থাকে।

যুদ্ধকালে :—যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া অর্ডিন্যান্স (ভারতরক্ষা আইন) প্রণয়ন করা হয় এবং মুদ্রাব্যবস্থার উপর বিদার্ত ব্যাংকের সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। কিছুদিন মধ্যেই বিদার্ত ব্যাংক বিনিময়-নির্ধারক নীতি (Exchange control policy) প্রণয়ন করে। এর মূল কথা ছিল :—

- (১) বিদেশী মুদ্রা ক্রয়ে বাধ্য নিষেধ ;
- (২) দেশে পাওয়া যায় এমন বিদেশী মুদ্রা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ক্রয়ের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা ;
- (৩) সিকিউরিটি ক্রয়, বিক্রয় ও বিনিময়ে বাধ্য নিষেধ ;

(৪) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিদেশী সিকিউরিটি ক্রয়ের ব্যবস্থা।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশের মুদ্রা ব্যাপারে কোনও বাধ্যনিষেধ রাখা হয়নি। অস্ত্রান্ত দেশের মুদ্রার সেমধেন একমাত্র বিদার্ত ব্যাংকের অধীনস্থিত ব্যক্তিগণ করবে এমন ব্যবস্থা করা হয়। বিনিময় নির্ধারক ব্যবস্থা তদারককের মত বিদার্ত ব্যাংক বিনিময় নিয়ন্ত্রক বিভাগ (Exchange control Deptt.) খোলে। যুদ্ধের প্রথমাবস্থার বিনিময়ের কড়াকড়ি খুব বেশী ছিলনা, কিন্তু দিন দিন কড়াকড়ি খুব বেশী হ'তে থাকে। কতকগুলি দেশের সংস্কার ঠালিং বিনিময় ব্যাপারে বিধিনিষেধ ছিলনা—এদের মুক্ত ঠালিং এলাকা (Free Sterling area) বলা হ'ত। বিশেষ রপ্তানী করে মূল্য বিদেশী মুদ্রায় পেলে তা বিদার্ত ব্যাংকে গমা দিয়ে বেশী মুদ্রা গ্রহণ করতে হ'ত। রপ্তানী ও আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রক কতকগুলি অবস্থার বলে বিদেশী মুদ্রাভোগ সম্পর্কে বিদার্ত ব্যাংকের কর্তৃত্ব বাড়িয়ে দেওয়া হয়। একমাত্র অপরিহার্য সামগ্রী ছাড়া বিশেষ কিছু আমদানীর লাইসেন্স দেওয়া হ'তনা। ডলার ব্যয় সম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড়ি করা হয়। ভ্রমণ, ব্যক্তিগত দান ইত্যাদি বধ্যসাধ্য কমানো হয়। ডলার অকলে মাল রপ্তানী করে রপ্তানীকারীগণ ডলার বিদার্ত ব্যাংকে দিয়ে টাকা নিতে বাধ্য হ'ল। এ সমস্ত ব্যবস্থা পত্রও দেখা গেল বিদেশে ভারতীয় মুদ্রা, বিদেশ করে খাটুয়া (coins) ও অলংকার ইত্যাদির রপ্তানী কমানো সংকল্প। তাই ১৯৪০ সালের একটা নিয়মের বলে কেউ বিদার্ত ব্যাংকের অধুমতি ছাড়া এ সমস্ত বাইরে নিতে বা পাঠাতে পারতনা। বর্ণের রপ্তানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়। এতদিন লন-নাথারনের দাবী সত্ত্বেও ইংরেজ সরকার স্বর্ণ রপ্তানী কমানো প্রস্তোজন মনে করেনি এখন যুদ্ধের চাপেও স্বর্ণনিষ্কাশ প্রেরণার যেচ্ছায়ই তারা স্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ করে দেয়।

ব্রহ্মদেশীয় চীনদেশীয় ও মালয়ী মুদ্রা বাত্রে অচল হয় সেজন্য ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪১ সালে সমস্ত কাগানী কোম্পানীর সম্পত্তি Custodian of Enemy Property নামে এক অফিসারের অধীনে নিয়ে আনা হয়।

বিশেষ ব্যবসায়ীগণ ভারতে অধিক লভ্যাংশ এনমাত্র মুক্ত ট্রাফিক অফল ছাড়া অল্প কোথাও পাঠাতে পারতেন। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত বাত্রে বিশেষী মুদ্রা ব্যয় না হয় সে উদ্দেশ্যে বিশেষে ব্রহ্মদেশীয়ের পক্ষে বিল্ডার্ড ব্যাংক থেকে একটা অফিসিয়াল বেলগ্য বাধ্যতামূলক করা হয়।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষী মুদ্রা সংরক্ষণের প্রতি প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়, এ সমস্ত ব্যবস্থা তাইই প্রমাণ। যেনে মুদ্রার কি অবস্থা তা পর্যালোচনা করা হয়কার।

যুদ্ধকালে যেনে মুদ্রা সম্প্রসারণ (expansion)—

যুদ্ধকালীন যে বিপুল মুদ্রা সংরক্ষণ ভারতের অর্থনীতিতে বিপর্যয় এনেছিল তা উল্লেখযোগ্য। মুদ্রার চাহিদা ও সংরক্ষণ বেড়ে যায়। মুদ্রা সংরক্ষণ যুদ্ধের প্রাকালে বিল্ডার্ড ব্যাংক কর্তৃক ইন্ডিয়ান নোট, সরকারী ১ টাকার নোট, ১ টাকার বাত্তু মুদ্রা: এবং স্ক্রু মুদ্রা (আধুনিক, সিকি ইত্যাদি) প্রভৃতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ শুরু হবার আগের মাসে বাজারে চালু মুদ্রার পরিমাণ ছিল ১৭৯ কোটি টাকা। এই মুদ্রার পরিমাণ ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের সময় সাধারণ আর্থিক লেন দেন বেড়ে যায়, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বেশী মুদ্রা প্রয়োজন হয়—অর্থাৎ স্বাভাবিক আর্থিক লেন দেন এবং যুদ্ধের বৃদ্ধিই মুদ্রা সম্প্রসারণের কারণ স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। মুদ্রা সম্প্রসারণ নিয়মিত ও প্রণালীবদ্ধ নিয়মে হয়নি। নীচের তালিকা থেকে মুদ্রা সম্প্রসারণের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়:—

সাল	মুদ্রার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১৯৩৯	১৭৯
১৯৪০	২২৯
১৯৪১	২৭৭
১৯৪২	৪৭৪
১৯৪৩	৭৪৪
১৯৪৪	১২৭
১৯৪৫	১,৭৫২

যেবেই বিকের ক'বছর প্রায় প্রতি বছর ২০০ কোটি টাকা হিসাবে মুদ্রার পরিমাণ বেড়েছে। এই পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অজান্তেই মুদ্রা সকালীনও (velocity) বেড়েছে। বিল্ডার্ড ব্যাংক কর্তৃক ইন্ডিয়ান নোট এই বৃদ্ধির প্রধান উপায়। ভারতে ও ইংলণ্ডে সম্পত্তির বা ইংলণ্ডে ট্রাফিকের বহলে বিল্ডার্ড ব্যাংক নোট ইন্ডিয়ান নোট হিস্টন ইয়ং কমিশন ১ টাকার নোট ছাপবার পরামর্শ দেয়—যুদ্ধের সময় প্রমাণিত হয় যে এ নোট কত জনপ্রিয়। বিল্ডার্ড ব্যাংক এ নোট ১ টাকার বাত্তুমুদ্রার সমান বলে স্বীকৃতি দেয়। যুদ্ধের সময় শুধু নোটই বেশী ছাপা হয় এরূপ ব্যবস্থা করার কারণ নেই। ১ টাকার ও তার চেয়ে নিম্ন মানের বাত্তু মুদ্রায় প্রচলনও বহুগুণ বেড়ে যায়, নিচের তালিকা থেকে এর একটি মোটামুটি ছবি পাওয়া যায়:—

(কোটি টাকার হিসাবে)

সাল	১ টাকার বাত্তু মুদ্রা	১ টাকার নিম্নমানের বাত্তু মুদ্রা
১৯৩৯-৪০	১২.৪৫	২.৬০
১৯৪০-৪১	৩০.২০	৪.১০
১৯৪১-৪২	৭.২০	৪.১০
১৯৪২-৪৩	৪৫.০০	১২.০০
১৯৪৩-৪৪	২০.২০	১৯.০০
১৯৪৪-৪৫	১০.০০	১৯.০০

যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই দেখা যায় ১ টাকার বাত্তু মুদ্রা ধমিয়ে (hoarding) রাখবার দিকে ঝোঁক বেধে ফিরেছে। এরূপ করবার উদ্দেশ্যে রৌপ্যের দ্বারা টাকা পরিচালিত করে বেশী হান পাওয়া। ১৯৪০ সালে তাই আইন বলে ঘোষণা করা হয় ব্যক্তিগত প্রয়োজনের বেশী বেশী এরূপ টাকা ধমিয়ে রাখলে আইনভুক্ত হওয়ার অপরাধ হবে। আস্তে আস্তে মহাবাণ্ট্রি ডিক্টোরিয়া, সপ্তম এডওয়ার্ড পঞ্চম ও বর্তমানের প্রতিষ্ঠিত অর্থিক ১ টাকা ও অর্থ টাকার মুদ্রাগুলি বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়। বহলে কম পরিমাণ রৌপ্য দিয়ে নির্মিত টাকা বাজারে ছাড়া হয়। ১৯৪২ সালে বিল্ডার্ড ব্যাংক ২ টাকার নোট চালু করে। ঐ বছরই অর্থ আনা, এক আনার নতুন মুদ্রা ও নতুন এক

পয়সা চালু করা হয়। ১৯৪৫ সালে মধ্যে মোট প্রায় ১৪ কোটি ১ টাকার মুদ্রা এবং ৬০ কোটি টাকার আনি, মিকি, আখুদি ইত্যাদি চালু করা হয়।

মুদ্রা সম্প্রদায়ের ব্যাংকগুলিও উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে। ব্যাংকগুলি ১৯৩৯ সাল থেকে ১-৪৫ সাল পর্যন্ত আদানত ভরব পত্রিকার যে পরিমাণ টাকা (চেক) ইস্যু করে তার মোটামুটি হিচাব নীচে দেওয়া হল :—

সাল	পরিমাণ (কোটি টাকার হিসাবে)
১৯৩৯	১৩০
১৯৪০	১৩৭
১৯৪১	১৬৯
১৯৪২	২১৭
১৯৪৩	৩৪৪
১৯৪৪	৫২৬

মুদ্রানীতির জ্ঞান থেকে জানা গেল যে মুদ্রা মুদ্রার পরিমাণ জ্ঞান থেকে হ'লে মুদ্রার পরিবাহক মুদ্রা সঞ্চালন দিয়ে গুণ করে নিতে হয় (quantity of money multiplied by velocity of circulation) ১৯৪৫ সালে মোট মুদ্রার পরিমাণ ছিল প্রায় ১৯২০ কোটি টাকা—কিন্তু একে চালু মুদ্রা বলা চলেনা কারণ চালু মুদ্রা বলতে প্রতিটি মুদ্রার সঞ্চালন হ'য়েছে বোঝায়—ঐ সময় এরকম হয়নি। অর্থাৎ চালু মুদ্রার পরিমাণ (quantity of money in circulation) ১৯২০ কোটি টাকার কম ছিল। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত মুদ্রার পরিমাণ খুবই বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করা গেছে যে সঞ্চালনের পরিমাণ গিয়েছে কমে। এর কারণ স্বল্প বলা যায় কন্ট্রোল ও রেশনিং প্রথা কিছু পরিমাণে ব্যবস্থা ধরনের পথ বন্ধ করেছে; অন্য সাধারণের অর্থ জমিয়ে রাখার (hoarding) অভ্যাসবশত; কিছু টাকা এরা ধরে রেখেছে, মুদ্রাসঞ্চালন বিনিময়ের অভাবে এরা হতাশবশত; যতটা জমিয়ে রাখত তার চেয়ে বেশী জমিয়ে রেখেছে। মুদ্রা সঞ্চালন (velocity) কমেছিল বলেই মুদ্রানীতির কিছুটা গতিরোধ হয়—নইলে যতটা ভীতিজনক মুদ্রানীতি প্রবেশ হয়েছিল তার চেয়ে

অনেক বেশী ভয়ানক হতে পারত। জমিয়ে রাখার সূচনা অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে অসুচিত কিন্তু গত দুই বছর সময় এ সূচনাই শাপে বর হ'য়ে আমাদের প্রচণ্ডতম মুদ্রানীতির হতে থেকে আশঙ্কিত তাকে রক্ষা করেছে। মুদ্রা বাণ্যের সঙ্গেই সমস্ত জীবনের ধান ছ ছ করে বেড়ে ওঠে, মুদ্রার সঞ্চালন সীমাবদ্ধ না থাকলে মূল্য বৃদ্ধির অভিভাবতার ভীততা আরও বেঁধে হ'ত।

মুদ্রার প্রয়োজনে বিনিময়প্রণালীর সহযোগিতা চাইবার সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে পারেনি এবং বেশী পরিমাণে মুদ্রা প্রচলিত হওয়ায় সাধারণ মূল্যমান অত্যন্ত বেড়ে যায়। মূল্যবৃদ্ধির প্রথমদিকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জরীপনামার কোন কারণ দেখা যায়নি—কারণ ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। মন্ডার সময় কৃষিপণ্যের দাম অত্যন্ত কমে গিয়েছিল এতে কৃষকের ক্ষতি হয়েছিল খুব বেশী। মূল্যবৃদ্ধির শুরুতে একেই খুব সুবিধে দেখা দেয় কিন্তু ১৯৪২ সাল থেকে মূল্যমান এত বেশী হারে বেড়ে চলে যে প্রকারণের ক্রমকণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্য ও গির্নি, তৈল ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের হুপ্রাণ হ'য়ে ওঠে—সেইজন্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং (Control rationing) এর দাবী দেখা দেয়। ১৯৪৩ সালে নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিংপ্রথা চালু হয় এবং অব্যমূল্যমানে কিছুটা কন্ট্রোল লক্ষণ দেখা দেয়। অবশ্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং প্রথা আংশিকভাবে প্রযুক্তি বস্তুর মূল্যমানের উপর এর প্রভাব খুব বেশী ছিল না। তা ছাড়া শ্রমের বিস্তারী অঙ্গসত্তা ও চূর্ণীতির দ্বন্দ্ব এ প্রথা যতটুকু প্রভাব বিস্তার করবে তাশা করা হয়েছিল ততটাও হয়নি। দেশের সাধারণ মানুষের চর্যায় বিদেশী সংকল্পের বেশী মাথা ঘামানোর লক্ষণ দেখা যায়নি। নেহাও একটা কিছু লোকসংখ্যানে গোছের নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু করেই কর্তব্য সমাধানের মত মনোভাব শাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল ছিল বলে মনে হয়। আর নিয়ন্ত্রিত জীবনধারার অগ্রসূরতার জ্বলন্ত নিয়ে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী মনোবিশেষের দোড়ে কালোবাজারী শুরু করে দেয়—এতে সহায়তা করে এক-শ্রেণীর কর্তারগোষ্ঠী; ফলে নিয়ন্ত্রণ প্রথার সাহায্য যা তা ভারতবাসী ভোগ করছে পারেনি। তবে একথা আগেই বলা হয়েছে যে মূল্যমান কিছুটা কন্ট্রোল দিকে ছিল।

যুদ্ধের কয়েকবছরে মুসলমানের পত্তি ক্রিষ্টপ ছিল তা মোটামুটি ভাবে ধারণা হল :—

সাল	কলিকাতার সাধারণ	সরকারী হিসাব
মুদ্রামান		
১৯০৯ (আগষ্ট)	১.০০	১.০০
১৯০৯ (ডিসেম্বর)	১.০৭	১.০৮
১৯১০ ...	১.২১	১.১২
১৯১১	১.৪১	১.৪০
১৯১২	১.৯২	১.৪০
১৯১৩ ...	৩.০৪	২.৪১
১৯১৪ ...	২.৯৭	২.০৪
১৯১৪ ...	৩.০৬	২.৪৮

সরকারী হিসাব নতাই দেখা যাচ্ছে :১৯০৯ সালের আগষ্ট মাসের জুলাই ১৯১৪ সালে মুদ্রামান ১৪৮% বৃদ্ধি পায়। নানানরূপ শিথিলতা সত্ত্বেও নিরস্ত্রিত জবাবদিহী মুসলমান বেড়েছিল এর চেয়ে কম। মুদ্রার পরিমাণ ও মুদ্রামানের বৃদ্ধির দ্বারা কিসে বেড়ে যায় আমদানি সাধারণতাবে তা আলোচনা করলাম। মহাযুদ্ধের অর্থসংস্থান হয় কি তাহা, তার সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনাও প্রয়োজন—কারণ অর্থসংস্থানের পদ্ধতিতে মুদ্রাসংরক্ষককেও কাজে লাগানো হয়েছিল।

মহাযুদ্ধের অর্থসংস্থান (War Finance) :—

ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী যুদ্ধে সরাসরি ভাবে কোনও পক্ষ ছিল না। শাসকের চক্রান্তে ইছন হ'য়ে শাসিত ভারত মুক্ত ভারতবাসী যে বিপুল বোঝা ব'য়ে বেহিয়েছে তার হিসাব বলিতে যেমত সময় ও সুযোগ আশ্রয় অলোচ্য প্রবন্ধে পড়েনা—স্বাধীন ভারতের ঐতিহাসিক ইতিহাসের সেই দুর্ভাগ্যময় ছবি জুলে ধরেন। আমরা সীমাবদ্ধ গভীর মধ্যে থেকে শুধু যেমত আর্থিক দিক থেকে ভারতবাসী পড় যুদ্ধে কি পেল আর হারালোই বা কি। মুদ্রাসংরক্ষণ, মুদ্রাসংরক্ষণের অস্থিরতা, টাকার ক্লাসিক, মুদ্রাসংরক্ষণের প্রত্যেকটির একটি প্রধান কারণ পত্ত মহাযুদ্ধ। মহাযুদ্ধে কোনও পক্ষ না হ'লেও ভারত কি কি দ্বারা পালন হয়েছে এবং কি নীতিতে চলছে তা জানা প্রকার।

যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকার ভারত

সরকারের সঙ্গে একটি আর্থিক চুক্তি (Financial Agreement) করে—যুদ্ধে ব্যয়ের পরিমাণ ও ব্যয়ের প্রকৃতি ঐ চুক্তিতেই উল্লেখ থাকে। চুক্তিবলে দ্বিধা হয় ব্রিটিশ সরকার ভারতের মুদ্রাসংরক্ষণের উন্নয়নের জন্য ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করবে; ভারত তার সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয়, জবাবদারী বৃদ্ধি ফলে উদ্ভূত অতিরিক্ত ব্যয়, ভারতের মাটিতে সংঘটিত যুদ্ধব্যয় ও ভারতের বাইরে ব্যয়ের জন্য ১ কোটি টাকা ব্যয় করবে। চুক্তির দ্বারা লক্ষ্য করলে যেমত ব্যয় ইংরেজ তার রাজ্য ও প্রধান রক্ষার যুদ্ধে ভারতের উপর একটা বিরাট দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়। ভারতীয় সৈন্য-বাহিনী বিশেষের ভূমিতে যুদ্ধ করলে ভারতসরকারি এ পেনাবাহিনীর জন্য যে ব্যয় করবে ব্রিটিশসরকার সে পরিমাণ দায় পরে ভারতকে শোধ হবে এ ব্যবস্থা। চুক্তিতে থাকার ভারতের পক্ষে কিছুটা সুবিধা হয়। ১৯১২ সালে ব্রহ্মদেশ তথা পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধ শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকার বলতে শুরু করে যে এ যুদ্ধে ভারত বিপদের আশংকা বেশী সুতরাং এ যুদ্ধে ব্যয় ভারত বহন করবে। অবশেষে পূর্বোক্ত চুক্তি সংশোধন করে ভারতের উপর প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ভার বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধ শুরু থেকে কিসে ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যয় বেড়ে চলে তার একটা সাধারণ হিসাব দেওয়া হল :—

সাল	ব্যয়ের পরিমাণ
১৯০৭-০৮	৪৭.২২ কোটি টাকা
১৯০৮-০৯	৪৬.১২ "
১৯০৯-১০	৪৯.৪৪ "
১৯১০-১১	৭০.৬১ "
১৯১১-১২	১০০.২০ "
১৯১২-১৩	২৮৭.১০ "
১৯১৩-১৪	৩৯৪.৮৬ "
১৯১৪-১৫	৪৪৮.৩২ "
১৯১৫-১৬	৩৯৪.০২ "

যুদ্ধের পূর্বকার জুলাই প্রতিরক্ষা ব্যয় যুদ্ধের শেষের দিকে কি ভাবে বেড়েছে তার হিসাব উপরে তালিকার পাওয়া যায়। এই ত পেল প্রতিরক্ষাব্যয়ের কথা। যুদ্ধের সময় সাধারণ শাসনব্যয়ও বহুপরিমাণে বেড়ে যায়।

অল্প সময় প্রতিনিয়ত কায়ের একটা বিরাট অংশ ইংলও ভারতের কাছে ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করে এবং মুদ্রাস্ফীতকালে ভারত সরকার সে প্রাপ্য বুঝে নিচ্ছে। কিন্তু মুদ্রের সমগ্র অর্থ যোগানের জন্য ভারতবাণী যে বাস্তব ত্যাগ (real sacrifice) করেছে তার হিসাব তো স্বপ্নের পরিমাণের মধ্যে ধরা হয়নি। মুদ্রের আর্থিক ব্যয় মিটাওয়ার জন্য ভারত সরকার অতিরিক্ত মোট ছাপাতে বাধ্য হয়। ক'র, অন্তর্দেশী ঋণ, ইত্যাদির বাত্রে যে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তাতে এত বিরাট ব্যয় মিটানো অসম্ভব বলে এব্যবস্থা করতে হয়। আর মাল উৎপাদন ও সংরক্ষণের সঙ্গে সমতা রাখা না করে মোট ছাপানোর পরিমাণে যে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তা আমলও ভারতবাণী ডোলেনি।

এরূপ মোট ছাপানোর জন্য এরূপ ব্যবস্থা হ'ল যে দুটি স সরকার ট্রান্সিএর হিসাবে ইংলও ঋণ শোধ করবে আর তাইই বলে ডিফার্ড ব্যাংক টাকার পরিমাণ বাড়াবে। অর্থাৎ টুটেনে গচ্ছিত ঋণের পরিধিতে ভারতে মুদ্রাস্ফীতগ্রহণ হবে। টুটেনে মুদ্রাব্যয়ের যে অংশ ঋণ হিসাবে ভারতের কাছে বোমা থাকে তার পরিমাণ ১৯৪০ সালে ৩৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৫৫ সালে ৩১৫ কোটিতে দাঁড়ায়। সমগ্র—মুদ্রাংশে মোট এরূপ ব্যয়ের পরিমাণ হয় প্রায় ১০৩৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে ভারতের টুটেনের নিকট এই পরিমাণ টাকা পাওনা থাকে।

মোট ছাপানো ছাড়া ক'র, ঋণ, স্বল্পসকর ইত্যাদি থেকে যে টাকা পাওয়া যায় এখানে আমরা তার মোটামুটিভাবে আলোচনা করব। মুদ্রের গুরু থেকেই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ করহার বাড়ানো হয়। আরকর, অতিরিক্ত মুদ্রাকর উপর কর (Excess Profits Tax) সুপার টাক্স প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর কেন্দ্রীয় রাজকোষে প্রচুর অর্থ যোগাতে থাকে। বেশে উৎপাদিত প্রায় প্রতিটি জ্বায়ের উপর শুদ্ধ (Excise) ধার্য করা হয়—কাপড়, চিনি, কেরোসিন, সুপারি, তামাক, বিদ্যামপাই, মোটরটানায়, চা, ককি প্রভৃতির উপর উৎপাদনশুল্ক ব'রা হয়। ডাক-তথ্য বিভাগে বিভিন্ন বিনিময়ের মূল্য বাড়ানো হয়, রেলের খাজানাভাড়া ও মালের ভাড়া বাড়িয়ে বেওয়া হয়। ১৯৪০—৪৪ সালে এশব মূল্য থেকে মোট প্রাপ্তির পরিমাণ ৮২৭ কোটি টাকার

দাঁড়ায়। ক'র বাত্রে অগ্রসূতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চল ঋণগ্রহণ। সরকারী ঋণপত্র ক্রয় ক'রবার জন্য ঋণ প্রচার চালানো হয়।

মুদ্রাকালে অধিকতর সঞ্চয় করে দেশেকার বান্ধিবস্বত্ব সে সঞ্চয় সরকারী ঋণপত্রে বিনিয়োগ ক'রবার জন্য আবেদন করা হয়। শতকরা তিন টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক সুদে বিভিন্ন মেয়াদের ঋণপত্র বাজারে ছাড়া হয়। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এরূপ সরকারী ঋণের পরিমাণ প্রায় ৮৮৫ কোটি টাকার পৌছায়। মুদ্রা বাজারে চলতি নগদ টাকা অভাবভর্যই কম সুদে যোগাড় করা যায়—সরকারী নগর সেবিকে পড়ে এবং ১৯৪৩ সাল মধ্যে এরূপ অর্থ-যোগানের পরিমাণ হয় ৮৭ কোটি টাকা। ১৯৪৫ সালের শেষে ভারত সরকারের অন্তর্দেশী ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ১০৩৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ মুদ্রের পূর্বেই চেয়ে প্রায় ১২২৭ কোটি টাকা বেশী।

ঋণপত্র সাগরমতঃ ধীরেই কিন্ত; তাই অগ্রপরিমাণ টাকাও বাত্রে সরকারী ঋণ হিসাবে বেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে স্বল্পসকর পরিকল্পনা করা হয়। নিঃশেষের উৎসূক্ত টাকা খাটানোর পথ স্বরূপ ক্যান সার্টিফিকেট স্বল্পসকর দেয়ালী প্রতিরক্ষা সঞ্চয় সার্টিফিকেট (Defence Saving Certificate), পোষ্ট অফিস প্রতিরক্ষা সঞ্চয় সার্টিফিকেট প্রভৃতি পরিকল্পনা ১৯৪১ সালে মধ্যমই কার্যকরী করা হয়। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্যবশতঃ অন্তঃরূপ সঞ্চিত অর্থের উপর আরকর রহিত করা হয়। এ সমস্ত উপায় ছাড়া সরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মুদ্রের আরও অনেক বেশী বাড়ি। ১৯৪৫ সালে এরূপ আয় ছিল প্রায় সমগ্র সরকারী আয়ের ১০%। ভারতীয় ডিফার্ড ব্যাংক মুদ্রা ও মুদ্রাহাপা (Currency & minting) বাত্রে আর বাড়িয়ে ১৯৪৫ সালে প্রায় ১৭ কোটি টাকা লাভ করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় অর্থ উপায়ের বতরকম পথ থাকা সম্ভব তা কার্যকরী করা হয়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরও আরকরের হাত থেকে বেওয়াই ছিলনা। অপ্রত্যক্ষকর ধার্যের ফলে প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় অপরিহার্য জ্বায়ের হাম বেড়ে যায়, তার উপর মুদ্রা-সম্প্রদায়ের অন্য নিম্নপত্র ক্রয় করা গাথাবল লোকের

নাগালের বাইরে চলে যায়। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীরা
উপাচার্যবাদের ও কৃষকদের ক্রোধের প্রতিকার
করে যায়। জনসাধারণের ক্ষুণ্ণতার দামা থাকে না। এক
কথায় সুভদ্র বয়সে যাতে গিয়ে ভারতীয় জনসাধারণ
অর্থহীন ও অসুস্থ থাকতে পারে হয়—বিশেষতঃ স্বার্থের
বৈধিকরণে দেশের স্বার্থ উল্লঙ্ঘন হওয়ায় এর চোর
অন্য দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় বেশী দেখা
যায় না।

বর্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাগারগুলোর অল্প নিম্নলিখিত
পুস্তকগুলির সংগ্রহ করা হয়েছে :—

(১) A School History of Indian
Currency.

(২) The Falling Rupee,

(৩) Finance of Indian Govt. since 1935,

(৪) Reserve Bank Report of Currency
& Finance.

(৫) History of Indian Currency.



এমন কিছু কঠিন নয়

ছোট ছেলের সঙ্গেও সম্ভব যদি চিকিৎসা
বিনিমে দেওয়া যায়



আপনার সমস্যা
আপনার পুষ্টির কর্ম-জীবনের
সাফল্য বিনোদন
সুচি কবে।



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

মেম্বার অফিস : ৪নং লাইট হাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

হেডমাস্টার

(একাঙ্কিকা)

শ্রীমদ্বিক্রমার মুখোপাধ্যায়, এন্. এ. ডি. ফিল ।

বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষকের কক্ষ।
দামনে অরুণ টেনল, প্রধান শিক্ষকের বাবহারোপযোগী
কিনিষ পত্র, সেখণার সহকারী। ঐ বিবেকর হেওয়াল বেং
১০।১৫টি চেয়ার, শিক্ষকের, সম্ভবতঃ ম্যানেজিং কমিটির
মিটিং এইখানেই হয়। ডান পাশে আদায় কেয়ারা,
ইলেক্ট্রিক বড় বথের মোড়, পাশে জলচৌকি, বইয়ের
আলমারি। হেওয়ালের উপবিভাগে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান—
প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের মনীষীদের। পুরাণে বথের
হেওয়াল বড়িতে নটা বেজে পনের।

পদবা উঠতে প্রধান শিক্ষককে দেখা যায় মাথা নত
করে চিঠি পড়ছেন, কিছু সংশোধনও চলছে। ইতিহাস
শিক্ষক রমেশ পাশে বইয়ের পাতা ওলটাজে, গির্সের কথা
চলছে উভয়ের মধ্যে। এবার প্রধান শিক্ষক মাথা তুলতে
দেখা গেল তাঁকে : বয়স ৫৫-৬০, দুচকরাবাক প্রাণল মুখ
কাঁচাপাকা গৌরু চিত্রক গর্ভাঙ্গ বিস্তৃত, মাথার অন্ন টাক
চোখে পাঁশনে, বাঁধাটা লং কোট, পকেট বাড়ি থেকে ছপার
চেন বিলবিত। রমেশ ২৮০০, পৌর, ব্যাকত্রাণ চূপ,
হেঁচে বা ভাঙরণে বাহুল্য নেই।

রমেশ : ওজস্ব হুঁছে না কি ? অপরাধ ওদের এই প্রধান,
ষ্টিক অপরাধ—মানে, ডেবে চিত্তে সুপরিচ্ছিন্ন
অপরাধের পর্যায়ে ফেলা যায় না, আর ব্যক্তিগত
বিষয়ে নয়, সুলের কথা নিয়ে বচসা হয়েছিল।

প্রধান শিক্ষক : তুমি কি বলছ রমেশ, ছুধনে মিলে একটি
নিঃসহায় ছেলেকে প্রহার করে পা ডেডে হেওয়াল লম্ব
অপরাধ। কাল ঘরি ওরা কারো বাড়ী থেকে জলজার
অর্থ অপহরণ করে এনে কিছু টাকা দান করে ধৈর্য বা
সহ্যভোগে ব্যয় করে, তাকে বহুশী ডাক্তারি বলে
সমর্থন করবে ? কোর্ট ছেড়ে কথা কইবে না কিন্তু
তোমরা মালা পছিয়ে অভিনন্দন জানাবে, পাটরি সভ্য

করে নেবে ? না রমেশ, বিচারদান আদায়ের তেমন
শিক্ষা যেন নি। [হেওয়ালে খোলায় ছবির বিকে
চেয়ে অধিক নীরব] সহপাঠী ত্রিবেশ 'বেগ ইওর
পার্ডন' না বলার ভিন বিন ক্রাশে বসবার অসুখতি
পায়নি।

রমেশ : কিন্তু স্তার বিচারদানের যুগ পার হয়ে গেছে।
ধর্মনীতির প্রাধান্য এ-যুগে থাকছে না। এটা ক্রমশে
ক্রমশে পেস্টলটসির যুগ। যে শাস্তির নির্দমতা
মাজুরের মনে জাগিয়ে তোলে প্রতিশোধমুগ্ধতা, বিচার
করবার বিবেক যের না, অহুতাপের অবসর যের না,
তার মূল্য কতটুকু ?

প্রধান শিক্ষক : দুইদে বড় না-হেওয়াল যু এলে পোছে
বুঝি ? আল ওদের শাস্তি না বিসে ওরা বাইটোরা
হবে, স্বীকার করবে না সামাজিক দীর্ঘনীতি, বর্ধ,
অভিভা, পারিবারিক বন্ধন হয়ে দাঁড়ানে উপহাসের বস্ত।
বিচারদান প্রাণতোষব্যবুর শিক্ষা চিত্তাবাদা এখানে
এখনো চলছে বেশ, আদায় ছাত্র জুমে সে শিক্ষাকে
অবিস্বাস করতে পার না, আদায় সমর্থন কর।

রমেশ : আপনায় বিচারের বিরুদ্ধতা করছি না। বলছি
তথু বড় একটু বেশী মাত্রায় হয়ে যাচ্ছে নাকি। (অগ্রহ
বতে) তাছাড়া এরা টিমের সেবা বোলোয়ড হিসেবে,
সংগতি সম্পন্ন বদের ছেলে হিসেবে, ছাত্রমহলে বেশ
প্রভাবশালী।

প্রধান শিক্ষক : বিপদ কলেজে যুধেন বাঁড়জের কাছে
পড়েছি। স্তার বিচারে বহি কোন মহলকে ভয় করে
চলতে হয় তবে হেডমাস্টারী ছেড়ে এরাইন্স অফিসে
কাজ নেওয়া উচিত। আর আদায় তো ওদের
'ট্রান্সফার' দিচ্ছি, ওরা সরকারী সুলে ভক্তি হতে
পারে। এখনে নয়।

রমেশ : তাহলে...

প্রধান শিক্ষক : হ্যাঁ তোমার ক্লাসের সময় হলো।

প্রিয়নাথবাবু : একটু পাঠিয়ে দিও।

রমেশ : না, আমি বসছিলাম, আপনার মত পরিবর্তন...

প্রধান শিক্ষক : তুমি ছাত্রমহলে প্রিয়, তোমার কর্তব্য কতই; আমার হাতে স্থলের মর্যাদা, ছাত্রদের চরিত্রগঠনের ভার, আমার কর্তব্য আমার কণ্ঠে থাকে।

[ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রমেশের প্রস্থান। প্রধান শিক্ষক পাশের দ্বার থেকে 'এডুকেশন কোড' নিলেন, চিহ্নিত একটি বিশেষ পাতা খেঁবে কিছু মন্তব্য হলো।

"ওক সো" বলে উঠলেন, 'রমেশ রমেশ', 'বেঙ্গাল'

[সাতকড়ি ঘোরাতে প্রবেশ]

প্রধান শিক্ষক : রমেশ বাবুকে ডাক।

[ঘোরাবার প্রস্থান]

[রমেশের প্রবেশ]

প্রধান শিক্ষক : তোমার একটা কথা বলা হয়নি। বাক, ডেলিগেশনের ব্যাপারটা শেষ হয়েছে তো ?

রমেশ : (হাতে কোড দেখে) আপনি বড় বিয়ে ফেলেছেন এখন কোড থেকে সমর্থন খুঁজছেন।

প্রধান শিক্ষক (দীর্ঘ শ্বাস) : তোমার উদ্দেশ্য লক্ষ্য করছি। তবে তোমাকে ডাকলান ব্যক্তিগত ব্যাপারে, আইনের নথির জ্ঞানে নয়। মৈত্রেয়ী আজ তোমার চাপানের আদর্শ প্রাণিয়েছে, নিশিগমন না এডিনবরা সেটাও একটু আলোচনা করা যাবে। কুপে না বাই বলে বইগানায় চিহ্ন রেখে দিতেছিল।

অসহ ?

রমেশ : নিমন্ত্রণ সব সময়েই সোভার্ন, বিশেষতঃ মৈত্রেয়ী ঘোঁর আয়োজনে নতুনব বাক। (একটু ভেবে) আজ ছেলেরা মিটিং করতে বলে রেখেছে।

প্র, শি : মেয়েরা পরিবেশন করে তুই, তাদের এ-মুখ থেকে বঞ্চিত করি কেন, তুমি মৈত্রেয়ীর প্রধান অভিযা।

[রমেশের মুখ লক্ষ্যাক্ষণ হয়ে এল]

আর হ্যাঁ, তুমি নিশিগমনে আপত্তি করছ ? সোমিও-

শক্তি ওপানকার ভগ্ন বিখ্যাত নাকি, ডঃ বে আবার আনিচ্ছেন।

রমেশ : প্রথম বছরে প্রায় ২০০ ছাত্রের শরত। এডিনবরাও ওর অর্শেক লাগে। শ্বপের বোঝা বাড়বে কেবল।

প্র, শি : মৈত্রেয়ী আমার একমাত্র মেয়ে। সব শোধ হয়ে যাবে একদিন। চিন্তা করো না।

[রমেশের প্রস্থান]

রমেশ আর মৈত্রেয়ী—দেখ। কেবল আমার সংগেই বসে বিচার। কে ও, আমুন।

[প্রিয়নার সোমের প্রবেশ, প্রাণী শিক্ষক]

প্রিয় : আপনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

প্র, শি : গতকাল আপনি স্ত্রীর অন্তঃসত্ত্বা কথা বলছিলেন না, কেনন আছেন এখন ?

প্রিয় : ক্রমিক বক্তৃতা, দু'একদিন আর ইতর বিশেষ কি হবে, তবে বাবু পরিবর্তনের আশ্র প্রয়োজন।

প্র, শি : আমি বলি আপনি মাস দুই ছুটি নিয়ে বাইরে নিয়ে যান, আপনি রাজি থাকলে প্রতিভেন্টে বক্তৃতাভ্যাসের ব্যবস্থাটা পাঠিয়ে দিই ম্যানেজারের কাছে।

প্রিয় : আপনার অসীম অশ্রুগ্রহ। আমার অশ্রুপ্ৰতিভাতে পড়াবার ব্যবস্থা, মানে নবম্বরবার এতগুলি ক্লাস নিচ্ছেন তার ওপর আমার—ছেলেদের কাইনাল পরীক্ষা এসে পড়ল।

প্র, শি : অনুসন্ধানের কাল বৃষাক্রমের মত, খামে না। আমি আর রমেশ চালিয়ে দেব, এ-অবস্থায় আপনাকে আটকানো অমার্জিতকতা।

প্রিয় : রমেশবাবু মানে আপনার অর্থাৎ ইতিহাসের শিক্ষক। এমনিই ছাত্রসংখ্যার অশ্রুপ্ৰতিভা শিক্ষক কম বলে অশ্রুযোগ উঠেছে তরুণ শিক্ষক মহলে, অজ্ঞাত্য নয় হস্ত—খাগ বাড়বে নাভো ? এক-কর মানের লক্ষ্য নতুন লোক...

প্র, শি : সে তার আমার, আপনার বিধায় প্রয়োজন নেই। যেভাবে যেক চালিয়ে নিতে হবে। আপনি জানেন ম্যানেজার নতুন লোক রাখার আপত্তি করবেন,

হুলের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। আপনাদের অর্থের
বেতন কেটে লোক নিযুক্ত করার আমার আপত্তি
আছে। আমরা বিবেকানন্দ বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা
একই পরিবারভুক্ত, পরস্পরকে নামাক্ত সাহায্য করতে
যদি অপারক হই, তাহলে শিক্ষাকৃতি ছেড়ে কোন হীন-
রুতি গ্রহণ করা উচিত।

প্রিয় : বলিনি আপনাকে আপনাদের বেতনের খুঁটি হতেছিল
সেদিন এই বিষয় নিয়ে। নতুন টিচারেরা সেট
নিজের বেতনটামের অধিক পড়তে অনিচ্ছুক—তুল
কমিটি লোক নিযুক্ত করুক।

প্র, শি : হুলের আর্থিক অবস্থা উৎকর্ষ-অজানা নয়।

প্রিয় : তাঁরা বলছেন তাঁদের স্বাস্থ্যের অবস্থা, আর্থিক
সম্পত্তি হুলের অজানা নয়। ইউনিয়নের ক্ষুদ্রপাত
হবার এও অন্ততম কারণ।

প্র, শি : ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে শিক্ষকদের স্বার্থের কি
সম্বন্ধ ?

প্রিয় : সভাপতি যত চলেছেন একজন শিক্ষক,
কোষাধ্যক্ষ শিক্ষক, পরামর্শ ব্যবস্থাপনা শিক্ষকদের
হাতে, আর পাঁচশত ছেলের ইউনিয়ন শিক্ষকের স্বার্থ
নিয়ে তুল কমিটির সঙ্গে লড়বে না।

প্র, শি : কোন্ কোন্ শিক্ষক এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ?

প্রিয় : আমি না। অন্যদের পুরোধাদের পরামর্শ
চায় কে ?

প্র, শি : সভাপতি কাকে করবে বলে মনে হয় ?

প্রিয় : বলা যায় না,—যেমন অপবেশ সুনির্ভল।

[প্রধান শিক্ষক চিন্তাবিত।

প্র, শি : বহু, আপনি কিছু গোপন করছেন না।

[রাইয়ের থেকে “আসতে পারি তার” ১০ম শ্রেণীর ছাত্র
নরেনের মুখ দেখা গেল]

প্র, শি : এস।

[নরেনের প্রবেশ, প্রিয়নাথকে দেখে ইতস্ততঃ]

নরেন : আপনার পাঠান খাম পেয়েছি, কিন্তু...

প্র, শি : উল্লেখ নিশ্চয়োচন, পরীক্ষার বিষয় জানা
করে দিও।

নরেন : আমি ছাত্র-সাধারণ-তহবিল থেকে সাহায্য
চেয়েছিলাম, আপনি কৃতিত্ব অর্থ পাঠিয়েছেন।

প্র, শি : প্রাধান শিক্ষকের হারিষ কতকটা পিতার মত,
তুমি তিসনাত্ত বিধা কোবনা। ছাত্র তহবিল থেকে
এ-বছরের সাহায্যের নিয়ম নেই।

আর কিছু বলবে ?

নরেন : কমা করুন, এ সাহায্য দেওয়া সম্ভব নয়।

প্র, শি (আশ্চর্যবিত) : কেন নরেন, পরীক্ষা আসন্ন প্রায়,
এ-সময়ে অর্থ চিন্তার অনর্থক ছুটোছুটি করতে না-হয়
তা-বেশার অধিকার আমার হবে না ? তুমি পাঁচ
বছর পড়ছ এখানে, কোন বিনিমিতা জন্মায়নি,
আত্মীয়তার কোন বন্ধন নেই তোমার ?

নরেন : তা নয় স্যার, আপনি পিতার মত। কিন্তু
সম্মম লোকের ধান গ্রহণ হীনতার পরিচয়।

প্র, শি : এ-শিক্ষা কোথাকার, তামাষের তো নয়। বিময়
নেই, উদারতা নেই, শ্রদ্ধা নেই, বুদ্ধ চৈতন্তের বেলে
কে বেথাল উদ্ভত মনের এই অহঙ্কার ? বর্জন কর
পরিভ্রমণ কর বিদেশী ভাব [নরেনকে নীরব রেখে]
তুমি কি নহ্ন ছিলে নরেন।

নরেন : আপনি কষ্ট পাওয়ার আমি হুঃষিত।

প্র, শি : “দুঃখবিত” বলে স্বর্ভগ্য শেষ। “অানবনে বুদ্ধ”
তোমরা অভিনয় করেছিলেন না ? মনে পড়েনা
অধিপালীর উদারতা, অনাখ্যপণ্ড বানের উপহৃত
মনে করেছিলেন কাকে ! অন্ততঃ ষণ হিসেবে গ্রহণ
করতে তোমার আপত্তি থাকে উচিত নয়।

নরেন : আপনি ভাববেন না, কিন্তু ভোগাড় হয়ে যাচ্ছে,
আমার হাঁটাইটি করতে হবে না।

প্র, শি : বতকণ না ধানতে পারছি তুমি সংপথে থেকে
সংগ্রহ করেছ ততকণ আশ্রয় হতে পাচ্ছি কৈ ! বল,
কোথা থেকে পাচ্ছ।

[নরেন নিস্তব্ধ, প্রধান শিক্ষক তার দিকে চেয়ে রইলেন।]

প্রিয়তোষ : লজ্জা কি নরেন, তোমাংগে ইউনিয়নের ফাও
খুলেছে, তাই না ? [নরেন অশ্রুবহন]

প্র, শি : তুমিও আছ ইউনিয়নের শিখনে ?

নরেন : ছাত্র সমিতি সমস্ত ছাত্রকে নিয়ে স্তর।

এ, সি : কার বিরুদ্ধে তোমরা সংগঠিত হচ্ছে তেবে পাইনা।

নরেন : সংগ করে বিরুদ্ধে গড়া হয় না। সমবেতভাবে আমাদের মিলন ধুন, শৃঙ্খলাবিকাশ হবে।

প্রিয়তমঃ আমরা এতদিনে শিখিয়ে পড়িয়ে যা পাঠিনি, বছর বানিকের ভিতর ছাত্রদের বেশ উন্নতি হয়েছে।

এ, সি : উন্নতি!

প্রিয় : কেন, সভা সমিতি করতে শিখেছে, ছাত্রসংঘ তৈরি হচ্ছে। শৃঙ্খলা স্বাবলম্বন ব্যক্তিও চর্চা বিভাগ শিক্ষার সঙ্গে চরিত্রগঠন হচ্ছে।

[নরেন একটু এদিক ওদিক ঘেঁষল]

আমিও তাহলে...

এ, সি : নরেন, যে শিক্ষার মানুষ বিনয়ী হতে শেষে না তাতে আর বাই বোক ভাবের ঐতিহ্য নেই। আমবাও তাই স্বাবলম্বী হয়ে উঠে দেশের সুখ্যাঙ্কল-কারী সম্মান হও। তবে মনুষ্য সবচেয়ে বড়, শিক্ষার চেয়ে, পৌত্রের চেয়ে, সম্পদের চেয়ে। বল, তোমার আশ্রয়ে গুরুজন-শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা কতটুকু?

[নরেন নিরুত্তর]

চুপ করে থাকলে চলবে না, উত্তর দাও।

নরেন : আপনিতো যেখাননি কোথায় অপ্রজ্ঞা করেছে।

এ, সি : গোপনে সাধারণ পাঠিয়েছিলেন, কেবং হিরে জারির করে দিলে। শুধু প্রয়োজন নয়, এখানে সম্মান শ্রদ্ধা বেহে সবাইই স্থান আছে।

নরেন : মনঃস্থর অবস্থা আপনি হয়েছেন কিন্তু আমি নিরুপায়। অপরাধ বা হয়েছে আনিচ্ছাকৃত বলে মার্জনা করুন। বিভাব স্বপ্ন বড় কম নয় আবার অর্ধেক ভাবে তাকে বিভ্রান্ত করতে পারব না।

প্রিয় : সাবান, বেশ বলতে শিখেছ।

[প্রধানকে] বলছিলেন না ছাত্রেরা মধ্যম পুনের সুখচোরা নিরীহ ছেলেবেলা আর নেই। ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে বেঁচে আছেন, ভাল ভাল ছেলেদের ডেকে কথা বলে দেখুন, সহজেই দুঃখের পারদর্শন পরিবর্তন।

নরেন : কোন পরিবর্তনের কথা আপনরা আলোচনা করছেন শুধু, ক্লাসে ক্লাসে ডিবেট আদিত ৫ ঘণ্টা বটে, সেতো আপনরাই প্রবর্তন করেছেন।

প্রিয় : আমি অশূল পরিবর্তনের কথা বলছি বাবা। কিংবা ধর্মের পাকা বাস্তবের মধ্যম ধারে ধীরে এগিয়ে আসছে যে! দেখ না পাকা ইনারও উঠছে, টিউবওয়েল বসছে, স্টেশনে সেই পুখো টমটমে টেমি আর মেই এখন বিদ্যুৎ বাতির রোশনাই, হাকরা বাবুদের বাড়ী রেডিওতে গান হয় অন্যতম পাও নিশ্চয়। আমরা আর কবির, তারপর স্থলে রেডিও বসবে। তোমরা বললেন না কেন, এতো স্তর ইমিত।

নরেন : রমেশদার কাছে শুনেছি রেডিও আজকাল শিক্ষার বাহন হয়ে উঠেছে। দেশবিদেশের খবর ছাড়াও অনেক সময় নানাব্যবস্থা, মনীষীদের মূল্যবান কথা শোনান হয়। স্থলে রেডিও থাকলে কতি কি?

প্রিয় : কিছু না কিছু না। তাই তো তোমাদেরই বক্তৃতা শেখান হচ্ছে। গণতন্ত্রের সুপ কিনা, সবাই সমান। যেমন দেখছি শিক্ষকদেরই এবার ছাত্রদের সমীহ করে চলতে হবে।

নরেন : সমীহ শ্রদ্ধা এগুলো একতরফা হয় না। আপনাদের ঝিক থেকে...

[প্রধান শিক্ষক কাগজপত্র দেখছিলেন, সুখ ভুললেন]

এ, সি : সে আলোচনা তোমার সঙ্গে নয়, তা আমরাই বিবেচনা করব। তুমি এখন এস।

খাম টেবলে রেখে নরেনের প্রার্থন। কিছুক্ষণ পরপর দিকে চেয়ে বললেন :

আপনি বলেছেন ঠিক। প্রকাশ্যবাসু সেদিন বলছিলেন একটা সিনেমা প্রোজেক্টর হলে নাকি বিজ্ঞানের পাঠ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, ছাত্রদের সুবিধাও হয়। ম্যানুয়াল কমিটিতে কথাটা তোলাবার ইদিত করলেন।

প্রিয় : কেন আমরা কি বিজ্ঞান শিখিনি, না এমনকার ছেলেদের চেয়ে পড়াশোনা খাওয়া হয়েছে—আমাদের সময় এসব কোথায়?

এ, সি : আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম কলেজের বিলাপ

এখানে চলবে না। আমাদের আধিকসঙ্গতি নেই
মনেও সঙ্গতি নেই।

প্রিয় : প্রকাশনার ও ঠিক বজরা সকলে এক ঘোঁটে,
মুনীলকৃত পড়াতে যাবে তো বাঙলা, তার মত বই পস্তর
নিরে এমন আভূষক করে যেন মনে হয় স্টোরে অতিমম
করছে। অপেক্ষে ভূগোল পড়ান বনম ও বনম শ্রেণীতে,
তা সে প্রোব ম্যাপ নিয়ে পড়ান শেষ হয় না, এক
একদিন ছাত্রদের নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে মাঠে
যাটে। বনের ধারে আবার কি পড়ান হয় বুদ্ধি না।

প্র, শি : দেখেছি। ট্রেনিং কলেজের মেড না কি।
বলছিল কেবল বই মুখ কবাব চেয়ে ছাড়ে কলনের
শিক্ষা মনে থাকে বেশী—আমিও হয় বানিকটা—বছ
গবেষণায় স্থির হয়েছে না কি।

[বাইরে চং চং শব্দ]

প্রিয় : আমার ক্লাস আছে উঠি।

ট্রেনিং আনয় পড়িনি, বলতেও পারি না।

[প্রস্থান]

প্র, শি : কলন পরিচরিত। জুল কাইনালের কলাকল
যেবে বোঝা যাবে কার কতখানি কৃতিত্ব।

(বিনয় বাবুর মুখ দেখা গেল পর্দার ওপাশে, অপর
কেউ নেই দেখে সন্তর্পণে প্রবেশ)।

প্র, শি : আনুন। কেমন চলছে ? ছেলেরা গোলমাল
করে না তো ?

বিনয় : হেঁ হেঁ। সব ছরত করা বি'ছি, লাঠোঁখনি
বুইলেন না। আপনি ঘোমন বলছিলেন, যেনে আর
পর্যবেক্ষণ বার করা। দিলাম ক্লাসের থিকা। কালও
হুকতে বিই নাই আকও না, পিছনের বেকের ৭৮টা
ছেলেকে এয়েলা ব্যাডাইলাম, সব ঠাণ্ডা।

প্র, শি : আর সব ভালই করেছেন তবে ছোট ছেলের
প্রহারটা উচিত হয়নি। ওর বেধালেই চলত।—
অভিযোগ এসেছে।

বিনয় : আইজা, সবার বাবু হেলা মার্কি উকলের
ছেলেকে তো কিছু কই নাই।

প্র, শি : অজায় হয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে সবাই সমান,
আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাই নিয়ে। শিক্ষাবিত্ত

শান্তি হিসাবে খেজাখাত পছন্দ করেনা, অবশ্য আমি
আপনাকে সন্মতি করেছি, কিন্তু গোল বেবেছে হাকিম
আর উকিল সাহেবের পুত্রদের অব্যাহতি দেওয়ায়।

বিনয় : কেহোলা ভাকু নিমাই বতাইয়ের সাথে, অরগো,
বাস্ত মারি কি একারে।

[নত প্রবেশ]

প্র, শি : যে একারে অজবের শান্তি মিলেন।

বিনয় : সবারা বাবু হেলা বিনাকক। অজ নবনী
জায়, আখাত করা উঠিন।

প্র, শি : যেখান পঠিত মশার, আপনি জ্বলের মত যথেষ্ট
পরিচয় করেন বটে তবে আপনি অত্যন্ত পুরাতন পদী,
আমার চেয়েও। বাৎখার আপনাকে বলা হয়েছে
জ্বলের ভিতর ইতর বিশেষ কববেন না, এখানে সব
ছাত্র সমান, অভিজাতের পদবী বা ঐশ্বর্য নিয়ে
কাউকে ঘাচাই করা হয় না—আপনার স্বপ্ন থাকে না।

[বিনয়বাবুর শিক্ষিত বনের বিকে ধোঁবে]

তারপর, শিক্ষকের বিরুদ্ধে এ-অভিযোগ অত্যন্ত
অপোহবের, আপনি মন দিয়ে পড়ুন না।

বিনয় : আপনাকে লাগাইছে কে, অপবেশটা বুঝি ?

আমার পানে চাইয়া বস্তুবিশিষ্ট করে কান ?

প্র, শি : ক্লাসে মিডা দেওয়াটা।...

বিনয় : সঠিক মিথ্যা। মিথ্যা কইছে। কখনো কখনো
তত্ত্বা লাগিয়া যায় বটে তবে মিডা, কখনো না।

প্র, শি : নজটা ক্লাস পড়াবার সময় গ্রহণ করলে আপনার
পড়াবার ব্যাখ্যাত হয় আর ছেলেরাও হাঙ্গামা করে।

বিনয় : দুমপানটা অজায় নয়, লগাবাবু যে সিগারেট
পোড়াইয়া বান ক্রমাগত !

প্র, শি : আমি একথা চিন্তা করেছি, উপায় পাইনি।
সিগারেট ওরা পরিভাষণ করে না, রিচার্জমেন্ট
সিগার ধরেন। আপনি না হয় ওদের মত ক্লাসের
বাইরে নত নেবেন।

বিনয় : আপনি বা বলেন, তবে বাবু ওই। দেশ। আর
তাও বলি এতদিন কখনো আপনি উঠে নাই আজ
লব্য ছোকরার আশ্রয় ছেলের বল ক্ষেপে—এত
কেন বাবু।

প্র, শি : কারা ক্ষেপাচ্ছে তার বিষয় বিবরণ করতে পারেন না।

বিনয় : আপনি আবেশ করলেই পারি। এখনই কইতে পারি। প্রকাশ অপরাধ সুনীলকণ্ঠ (হমেশ, বলতে দিয়ে ঘাসলেন) মানে হলো চুপিচুপি মিটিং করছে রাস নাইন টেনে দু'বে ছাত্রদের নিয়ে। কয়েকদিন যাবৎ শুকশুক সুগন্ধ লেগেই বইছে।

প্র, শি : পেয়েছাপিবি আমার বিবেকসম্মত নয়, তবু এত্র ক'ি, কি আলোচনা চলে জানেন ?

বিনয় : বিশেষ জানি নাই।

প্র, শি : তবু, আপত্তি না থাকে যদি—

বিনয় : আজ্ঞা না না। তবে কিনা রমেশবাবু আছেন কিনা [দুই হাসলেন], হয়ত হেডমাষ্টার হয়ে বসবেন কিছু দিনে।

প্র, শি : তত দিনে আপনি অবসর গ্রহণ করবেন।

বিনয় : ছাত্রপরিষদ—না—কিন্তু নিমিঃ হইতেছে ঘন ঘন, পরিষদ যদি ছাত্রদের, ছাত্রেরা থাকিলেই ভাল হয় সেখানে লব্ধ শিক্ষকেরা সার তিয়া বলেন ক্যান। উনাপত্তিবাবুর আকলটা ভাবেন, তুই তো লব্ধশিক্ষক নোং, চলে পাক হয়েছে, তোরা ঊখানে হরকাইটা কি।

প্র, শি : ইউনিয়ন আরম্ভ হয়েছে নাকি, আমি কোন খবর পাই নি। না জানিয়েই আরম্ভ করল ?

[বাইবে, 'আসতে পারি তার']

এল।

[৮ম শ্রেণীর গোপাল ও বাগবের প্রবেশ]

গোপাল : আমরা আজ ছুটি চাইতে এসেছি তার।

আমাদের বাড়ী আজ একটু উৎসব আছে, বাগব ও আমার বিশেষ হরকাই।

প্র, শি : রাস টিচারের কাছে ছুটি নিলেন কেন ?

গোপাল : (ইতস্ততঃ) বলেন না তিনি।

প্র, শি : বলেন না, কে তোমাদের রাস টিচার ?

গোপাল : প্রকাশবাবু। তিনি একটু বিদগ্ধ আমাদের প্রতি।

প্র, শি : তুমি হয়ত ভুল বুঝেছ, ছাত্র শিক্ষকের দলকে দেখেছ, বিদগ্ধতার কোন কারণ নেই।

গোপাল : সত্য, বাগবের বাবার সম্বন্ধে রাসে সবায় সামনে একদিন কুকথা বলার আমি প্রতিবাদ করি।

সেই থেকে তিনি কথার কথার ঠাট্টা করেন।

প্র, শি : আজ্ঞা তোমরা যাও, আমি দেখছি।

গোপাল : আমরা তাহলে বাড়ী যাব ?

প্র, শি : বেও টিকিনের পর।

[উভয়ের প্রস্থান]

সাতকড়ি, প্রকাশ বাবুকে ডাক।

বিনয় : ম্যানেজারের তাইপোরে চটাইয়া কি ফুল হয় বুঝি না।

প্র, শি : আবার আপনি বিশ্বস্ত হচ্ছেন, ম্যানেজারের তাইপো, দৌ বাবদারীর পুত্র বাগব হাকিম উকিল সবায় ছেলের মর্ধ্যা এখানে সমান।

বিনয় : সরকারী নির্দেশে তাই থাকে বটে তবে বলেন ছাধি ম্যানেজার সাহেবের বাড়ী যাবিরা হিতে হয় ক্যান। সত্য ম্যানেজার আর নশীদশার বলেন উচ্চলনে, ওনারের ছেলেরা গাড়ী করিরা আইসে। কাগজ-কলমের গালতরা কথা কখন মানে।

[সাতকড়ির প্রবেশ।

সাতকড়ি : প্রকাশবাবু মাষ্টারমশায় এখন আগতে পাববেন না।

প্র, শি (রাগতস্বরে) : পারবেন না। আমি ডাকছি কলছিলি ?

সাত : এজে, কইলাম হেডমাষ্টার মশায় ডাকছেন।

প্র, শি : আজ্ঞা, বা।

[প্রস্থান।

বিনয় : বেখলেন ? ভাবেন। এই হইল লব্যবিধান। এনারা কলেকের পাশ করা টিচার।

প্র, শি : শিক্ষকরা কুলের নিয়ম যেন না চলছে ছাত্রদের লুখলু দেখাবে কে ?

বিনয় : ইউনিয়ন বাবু, ইউনিয়ন। অন্যতে অন্যতে কান কাপালা হইয়া পেল, ইউনিয়ন হইলে ছাত্রেরা নাকি এক একজন বিনেকান্দ আন্ততঃ হইয়া উঠবে ? আর তাবনা নাই, এখন আমরা মান লইয়া সইয়া পড়লে হয়।

প্র, শি : সহরে অনেক সময় অধ্যক্ষ এবং ছাত্রের সংলগ্ন সংঘর্ষ ঘনোমান্বিত হয়। আমি কড়া শাস্তির হেতু-মাষ্টার হলেও ছাত্ররা সকলে আমার বশে। সহরের কলেজ থেকে পাশ করে ফিরে প্রত্যেকে প্রণাম করে যায়। বিজ্ঞান বিলাস নেই আমার, শিখিয়েছি শিষ্টাচার। অমির সোম বড় অফিসের বরেন্দ্রে, এগুণ দিয়ে গেলেই দেখা করে। আপনাদের মনে আছে দেখেই ছেলে বসির উদ্দিনকে, সে এখন একটা প্রতিষ্ঠানের কর্তা, গড় হয়ে প্রণাম করে দেখা হলে। মাহুশ করিনি ছেলেদের আনন্ড, না বিনয় সভ্যতা শিষ্টাচার কিছু কম শিখিয়েছি।

বিনয় : সহস্রবার, সহস্রবার। অ'রা নিজে মানে সভ্যতা করে কর। বলে, পণ্ডিতমশায়ের পর ক্রাশে প্রবেশ করা ভার।

প্র, শি : কেন ?

বিনয় : ক্যান আবার পণ্ডিতমশায় নাকি বোঝা, ক্রাশ অপরিচ্ছন্ন কইরা বাঁধ। [সংঘর্ষে] দু'বেলা অহঙ্কি না করা বলপ্রবণ করি না।

[প্রকাশ বাবু প্রবেশ, সভা পাশকরা হুঙ্কার]

চলনে বলনে প্রতিভাত]

প্রকাশ : হুপ্রভাত প্রভ। নমস্কার পণ্ডিত মশায়।

প্র, শি (প্রতিনমস্কারান্তে) : প্রকাশবাবু আপনাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র, আমি শুধু গ্রাজুয়েট, তাও পুরাতো আমলের। ভাষ্যক্রমে বখন এখানে বেগছি, এখানে শিক্ষকের প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করেন কেন ?

প্রকাশ বিনয়ের দুঃশ্রুতানে চেয়ে অশোভন উল্লাস লক্ষ্য করল।

প্রকাশ : সেই যুগুর্ভে না আসার আপনি ক্ষম হয়েছেন যৌব বয়, পড়াচ্ছিলাম, আমি কি করে ? টেবলের উপর বসপাতি ছড়ান, ছাত্রের ম্যাক্সিমাম—মিনিমাম থার্ডে মিটারের তারতম্য বোঝাচ্ছিলাম। ক্রাশ শেষ হতে এলাম।

প্র, শি : ধানেন বিনয়বাবু, রিচার্জলন একবার আমার

বাড়ী থেকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, শ্রীতের রাত, শরীর অসুস্থ, তবু এসাম, চার মাইল পথ হেটে এলাম। বিনয় : আমবা ট্রেনিং কলেজের শিক্ষা পাই নাই।

প্র, শি : আর ইউনিফর্ম তৈরী করিনি সুস্থায়মতি ছাত্রদের নিয়ে।

প্রকাশ : প্রাত, আপনি আমার হেড। ব্যক্তিগত আলোচনার তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি নিম্নপ্রায়জন।

বিনয় : আমি উঠি এখন। [নিজস্ব]

প্র, শি : ঠিক ব্যক্তিগত নয়। ধোপাল, মানে ম্যানেজারের ভাইপো এসেছিল ছুটির তত্ত্বে, আপনিই দিয়ে দিতে পারতেন, এত ছোটখাটো বিষয় আমার প্রবেশ কতটা শোভন --

প্রকাশ : শোভন নয়, উপযুক্ত নয়। আমার অভিযোগ আমি ছুটি দিতে অস্বীকার করেছি, আপনি তা নাকচ করে ওকে বন্ধ করে বাড়ী যেতে বিলেন।

প্র, শি : আমার অবিকারের কথা ভুলছিনা। ওতো দেখা ছেলে, বোঝাবার কিছু করেনি তো।

প্রকাশ : সেবা ছেলে কিনা দে-বিষয় সম্বন্ধের অবকাশ আছে। সাধা ক্রাশকে নিয়ে ম্যাটিমি শোভে সিনেমা যাবে, সাধা ক্রাশ ছুটি করে দিতে হবে ম্যানেজারের ভাইপোর আবেদন, বনীর ছেলে বাসব বসে সিনেমার যা তা। হিমি গান পাইবে টেবল চাপড়ে—সম্মানীম অতিক্রম করে ওবেদ চাল চলনে।

প্র, শি : তা আমি জানি না, ও আমার অজ্ঞ কথা বললে। ক্রাশে প্রতিবার প্রথম হয়ে ওঠে, অবিশ্বাস করি কি করে ?

প্রকাশ : ভাষ্যব লাগে ওর প্রথম হওয়ায়, কি করে এত দিন সম্ভব হতো সে এক প্রথেষ্টিক।

প্র, শি : আস্তা সেই আপনাদের আমায়ের পড়ামে, পঠীকা ব্যবহার, শিক্ষা প্রণালী ভুল আমায়ের ?

প্রকাশ : উত্তরই, সেরা সমায় বলবো। কেবল আমার আপনাদের নয়, নীচ থেকে উপর পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রমাদ্যক। তবে এখানে সে কথা নয়। আমি যেখেনি অনেক ছাত্রের প্রতি কোন কোন শিক্ষকের

সেই প্রয়োজনের দীর্ঘ ছাড়িয়ে পক্ষপাতের কোঠায় পড়ে। স্বল যোগ্য ছাত্রেরা স্বাক পড়ে—কালক্রমের একধিক অতিরিক্ত তার চাপালে অস্তিত্বিক লক্ষ্য, এত জানা কথা।

প্র, কি : আপনি প্রবীণ শিক্ষকের সম্বন্ধে অসম্মানজনক কথা ব্যবহার করেছেন, আমাকেও...এবং...এর সংগে আমিও জড়িত।

প্রকাশ : সেজন্য আপনার উচিত সূতহস্তে এখানকার দৃষ্টিত আচারের ন্যূনতম করা। পাল কবাব যোগ্যতা শব্দকলমক, অর্থ প্রথম হয়ে উঠছে, পিতা। হন, অত এই সমস্ত শিক্ষক তটস্থ—এর মানে কি স্তার! শিক্ষক দুটি ধোবার প্রয়োজন মনে করেননি, হেডের কাছে ব্যবহার করতে আসার সাহস পায় কোথায়?

প্র, নি : কৈফিয়ৎ দাবী করছেন আপনি?

প্রকাশ : আমি নাগিন নিয়ে আসিনি।

প্র, নি : আপনারা উচ্চশিক্ষিত, ট্রেড, চিরকাল থাকবেন না, কেন এলেন আমাদের অপরাধের হলে?

প্রকাশ : প্রবীণ শিক্ষাবিদ আপনি, অথবা আত্মত্যাগ করেছেন না, বহুতর সমালোচনা সব স্বতন্ত্র।

প্র, নি : স্থলের ঠাকুর থেকে তার ব্যবস্থাকে বলছেন মন, মতীর্ষ শিক্ষকের বলাছেন মিথ্যাচারী, হেডকে বলাছেন অসহিষ্ণু!

প্রকাশ : আলোচনার অধীনে হয়ে উঠেছেন কেন, চিন্তা করে রেখুন, আমি অস্তায় বলিনি।

প্র, নি : কে আপনাকে আলোচনার ডেকেছে, স্থলস্থান ব্যবস্থা করবেন কমিটি। তবে এসেছেন আপনি, কতদূর কি জানেন?

প্রকাশ : তবে কেন চাপরাধিকে দিয়ে তলব পাঠিয়েছিলেন?

[প্রথম শিক্ষকের মুখ আতঙ্কিত হয়ে উঠল]

প্র, নি : হ্যাঁ তলব পাঠিয়েছিলেন, সে অধিকার আমার আছে আশা করি।

প্রকাশ (অসহিষ্ণুভাবে) : কিন্তু কেন?

প্র, নি (সরবে) : হেডমাস্টার বিগবে আপনার কাছে কৈফিয়ৎ চাই।

প্রকাশ : কৈফিয়ৎ। কিসের কৈফিয়ৎ, কোন কৈফিয়ৎ আমি দেব না।

প্র, নি : আলস্য দিতে হবে। [টেবলে হুটবোত]
বসন্ত কচেং গেলান পড়ে চুরমার।

প্রকাশ : উত্তেজনার বেশ করছেন কি? আচরণ আপনার সমাজিত।

প্র, নি : চুপ করুন। জুলে যাবেন না হেডের দিকে কথা বলছেন।

প্রকাশ : আপনি স্থির না হলে কোন কথাই সম্ভব নয়। আমি উঠলাম।

[উঠলেন, ঘাড়ের দিকে গেলেন]

প্র, নি : শুধু, আপনার কৈফিয়ৎ?

প্রকাশ : আপনার বা অভিযোগ লিখিত ভাবে পাঠাবেন আশা করছি। [নিজস্ব]

প্রথম শিক্ষক করেকমিটি চেয়ে রইলেন একদুট্টে। নাথার হাত দিয়ে রইলেন, তারপর 'বেরারা' হাঁক বিলেন। মাতৃকড়ির প্রবেশ।

এক মাস হল, এটা ভেঙে গেছে।

[ভাঙা টুকরাগুলি ছড়িয়ে মাতৃকড়ি নিঃশব্দে নিজস্ব।
চোরার হতে উঠে উক মন্তকে পাইচারি করতে লাগলেন।
পর্দা সরিয়ে বঠ শ্রেণীর মানিক ও নুপেনকে আসতে দেখা গেল।]

আসতে পারি স্তার?

[চিন্তাময় প্রথম শিক্ষকের কানে পৌঁছল না]

ভিতরে আসতে পারি স্তার?

প্র, নি (অকস্মৎ ছিন্ন হওয়ার চমক) : না না, এখন বাঙ।

মানিক : আসতে অস্বস্তি আপনার।

[চেয়ে বেরলেন]

প্র, নি : ও আচ্ছা তোমরা বেশ এস।

[আসন গ্রহণ করে]

: তোমরা আগে নিয়মিত আসতে এখন আসো না কেন, কোন থবৎও বাও না। পড়াশুনা ভাল চলছে?

নুপেন : ভালই চলছে স্তার।

মানিক : রমেশবাবু এঁরা চমৎকার পড়ান।

আশামীয়ারে শেষ হবে



বাহি-বন্যা

গজেন্দ্র কুমার মিত্র

(পূর্ণাহারিক)

॥ ৫০ ॥

অবহাষের ভিতরে বাহিরে কামান বন্ধকের অগ্নিশ্রাম
শব্দ ধামিয়াছে, নাচাবগড়ের অবিধানীমের মধ্যে
নামিয়াছে অবদার। পাহারা যায় নাই কিন্তু আগের মত
নিঃস্র নিঃস্রবদও নাই। কুহা হইতে ঘনুজ্ঞ জল তোলা
বাইতেছে, ধপ করিয়া জোলের শব্দ করিতেও বাধা নাই—
আগের মত সূৰ্য সূৰ্যে ধমধূতের পাখার পালকের হাওয়া
লাগে না পায়। এক কথায় এত দিন পর এই প্রথম একটু
অবদার মিলিয়াছে কিছুটা আশ্বাস হওয়ার—বা আশ্বাসিত্তা
করায়।

তবে সে চিন্তাটা খুব সুখের নয়—আনন্দের ত নয়ই।
অবদার বেহের চেয়ে মনে বেশি। এই ধমধূই হইতে বহিবা
বন্ধা পাওয়া যায় সত্য সত্যই, অনেকেরই আপনজনকে
এখানে বাধিয়া বাইতে হইবে। বাহাষের আপনজন কেহ
হিন্দু—তাহাষের বিরহ বেদনা কম নয়। দুবিনের সঙ্গী
কত বহিয়া সেল এখানে। বড় দুদিন—এমন দুদিন মানুষের
জীবনে বুকি আসে না। বৃত্তা অবতরণাবী কিন্তু সাধারণ মরণ
হইলে এতটা লাগিতনা—কী শোচনীয় অবস্থার মধ্যে কী
মর্দান্তিক বৃত্তা! ঐশ্বর নাই, পথ্য নাই, এক বিন্দু
জলও শেষ সময় বয়ত বৃত্তা-পথ্যজাতীর হিম শুক ওঠাধরে
তুলিয়া দিতে পারা যায় নাই। এমন কি শেষের দিকে
কতস্থান বাহিবাব মত একটুছু স্নানভাও ভোটে
নাই।...সে কথা মনে পড়িলে এ মুক্তির কোন অর্থ বুঝিয়া
পাওয়া যায়না। মনে হয় এমন মুক্তিতে প্রবেশন নাই।
এতগুলো লোকের যা হইল আমাধেরও না হয় তাহাই

হইত, এ মুক্তির পাখাতে চিরজীবনের মত যে স্বস্তির ভার
চাপিয়া বহিল, তাহাতে বাকী জীবনটা কি চিরকালের
মতই বিভবিত হইয়া গেল না? আমলের পূর্ণপাত্র আসিল
বটে—কিন্তু পাত্রটা যেন নিম কাঠের, পান করিতে গেলেই
ওঠে ও বদলার সেই ভিত্ততা মাগিবে প্রবন। জীবনের
স্বাধ যেন চিরজীবনের মতই বিধাইয়া গেল। এই একুশ
বিনের স্বস্তি কী নিজা কী জাগরণে দুঃখের মত জগদল
বোঝা হইয়া বুক চাপিয়া বহিবে।

হুইলার সেহিন বাকী সময়টা বিন্দুমাত্র স্থির হইতে
হইতে পারিলেন না। সারাজ্যে তাঁহার গোখের
পাতার এতটুকু তত্ত্বা নাছিল না। কথাটা হিয়া
কেলিয়াছেন যৌকের মাধার—দেহত, বৃষ প্রকাশ না
করিলেও, মনে মনে অসুস্থতাপের শেষ নাই। এক-
বারে ছেলমাছুষের মতই এক একবার আশা করিতেছেন
যে, মানাই হয়ত শেষ পর্যন্ত কথার বেলাপ করিবে—
আশ্বসনদর্পনের অগোবব হইতে তাঁহারো বন্ধা পাইবেন।
একটা অসন্তব আশাও মনে মাগিতেছে, হয়ত এমনি করিয়া
কথাবার্ডা চালাগিল হইতে হইতেই ছুটা তিনটা বিন
কাটিয়া যাইবে—আর ইত্যবশরে কলিকাতা হইতে সাহায্য
আসিয়া পৌছিবে। ঈশ্বর কি এত কঠোর পণ্ড শেষ
মুহুর্তে মূখ তুলিয়া চাহিবেন না?

কিন্তু কিছুই হইলনা। ২৬শে জুন ভোর বেলাই
বেতপতাকা উড়াইয়া আবিষ্কার ও অোগালাপ্রসার আসিয়া
উপস্থিত হইলেন। মোটা কথাটা হইয়া গিয়াছে বটে—কিন্তু

অশ্রুসমর্পণের পদ্ধতি ও সত্যদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সচিব একটা দলিদ বাড়ী ক'রা দবকার। ক্রান্ত বসন্তস্থ হইলার মুখভাঙাকে যতদূর সম্ভব সহ্য করিয়া আসিয়া টেবিলে বসিলেন। অজিয়ুনা প্রাথমিক সৌন্দর্য্য হিসাবে কুশল-প্রদর্শিত পরই কালের কথা পাড়িলেন। অবশেষে আকস্মিক হঠাৎ হইবে, ছোট বড় কামান, অপর ব্যক্তিগত এবং নগর টাকাকড়ি বা আছে সবই নানাদায়েবের ভাব-প্রাপ্ত কর্তব্যবোধে বুঝাইয়া দিতে হইবে—সাহেবরা কেবল ব্যক্তিগত বহাতি, এক একটি বন্ধু এবং ঘাটটি করিয়া টোটা সঙ্গে লইতে পারিবেন। নানাদায়েব হ্রীদোক, আহত এবং ক্রমের দ্বারা এখান হইতে ঘাট পর্যন্ত মাইবার খনি-বাহনাদি বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। ঘাটে অবশ্রুতমত নৌকা থাকিবে। ব্যাঙ খাবার এখনই তাঁহারা কিছু পাঠাইবেন। নৌকাতেও চার পাঁচ দিনের ব্যবস্থা থাকিবে।

হইলার স্থির ভাবে সব শুনিলেন। তারপর তাঁহার পিছনে ও দু পাশে যে সব অফিসাররা গাড়ীয়াছিল তাহাদের তিরে তাকাইয়া ঈষৎ বিমূঢ়ভাবে প্রস্থ করিলেন, 'আপনাত কি বলেন ?'

প্রথমটা সকলেই চুপ করিয়া বহিলেন, গত কল্যাণের তিরে অভিভূতা কেহই তুলেন নাই। তাঁহাদের যদি নিঃশব্দে ছুটু তামিল করিতে হয় ত করিবেন—সেটা মিলিটারী আইন, তাহাতে বোঝ নাই—কিন্তু মতানুস্তান হইতে গিয়া দিচ্ছি। গাল বাড়াইয়া চড় খাইলেন কেন ?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, বোধ করি বা সহকর্মীদের মনোভাব বুঝিয়াই, হইলার আবার কঠিন হইয়া উঠিলেন। প্রস্তাবের ধরন এবং তাহা দুই-ই বদলাইয়া কহিলেন, 'মিঃ হুই কী বলেন ? পারবেন আজই রওনা হতে ?'

বৃদ্ধ হুইভাবে বাড় বাড়িয়া কহিলেন, 'আজ অসম্ভব। খুব তাড়াতাড়ি হলেও কাল সকালের আগে নয়।'

অজিয়ুনা যেন একটু ঈষৎ করিয়াই কহিলেন, 'কিন্তু আপনাদের ভাঙে অশ্রুবিধা কি ? আমরা যদি এখানে সব গোলাগুলি করে দিই ?'

'সব অশ্রুবিধা সকলকে বোঝানো যায় না বা সাহেব।' হুই নিঃশব্দে কঠোর উত্তর দিলেন।...

অসম্ভব। অজিয়ুনা ও বোয়ালপ্রদর্শনকে তখনকার মত বিচার লইতে হইল। কিন্তু অর্থ গ্রহণ অতীত হইবার আগেই আগিল আর একজন দূত—নানা সেদিনটাও সময় দিতে রাজী হইয়াছেন, তবে কামান বন্ধু বাড়তি গোলাগুলি এবং টাকাকড়ি বা আছে—সেইদিন দুর্ভাগ্যের পূর্বেই সমর্পণ করিতে হইবে।

আবারও হইলার বিপর বোধ করিলেন।

একমাত্র পুত্রকে ডাইনের হাতে সমর্পণ করিবার মতই শোনাইল না কি কথটা ?

এবার একটু ইতস্তত করিয়া তার হিট খোলাখুলি ভাবেই সহকর্মীদের মত চাহিলেন।

হুই, ডিলাফোস্, টমসন,—ইহারা কী বলেন ?

হুই কহিলেন, 'আমরা অনেক দূর এগিয়েছি তার—বলতে গেলে নিকেরের ধাঁধা দিয়ে বলে আছি। এখন আর মতুন ক'রে ভেবে লাভ নেই।'

'তাহাড়া', টমসন কহিলেন, 'আজ বিশেষ দিতে হবে, কাল সকালে বিশেষ তাই—তারপর ত সেই নিঃশব্দ অবস্থা। ওদের দ্বারা ওপরই নির্ভর।...তার চেয়ে রাজী হওয়াই ভাল। বরং দু চার জন আমিনদার চান ওদের বল থেকে—যারা আমাদের মধ্যে এসে থাকবে আরকের হাতটা, কাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘাট পর্যন্ত যাবে। নৌকায় চাপলে তাহাদের ছুটি।'

সেই কথাই জানাইলেন হইলার দূতকে।

দূত সম্ভবত এই উত্তরের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। সে কহিল, 'বেশ তাহলে আপনাদের মধ্যে কেউ চমক—মহামাত্র পে.শ্যার নানা মুদ্রণদ্বারা সঙ্গে করণা করে একটা চুক্তি ক'রে ফেলবেন। একটা হলিল তৈরী করে নিয়ে চলুন।'

নানা মুদ্রণদ্বারা। আবার নানা-সাহেবের মুখ দেখিতে হইবে। ঐ লোকটার সহিত সামান্য-সামান্য গাড়ীয়া হয়ত বা পেশোয়া বগিয়াই অভিযান করিতে হইবে।

দ্বারা অনেকেরই মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল। দুই একজনকে অন্তরে একটা আশঙ্কা ও সন্দেহও যে না আগিল তা নয়। অবশেষে টড্ নামে একজন তরুণ অফিসার আগাইয়া আগিল, 'আমি রাজী আছি বোনোয়েল। এত

দূরে এসে এই সামান্যটুকুর অল্প পিছিয়ে যাওয়া চলে না।... যদি আর কিয়ে না আমি—আমার মাকে দয়া করে খবরটা জানিয়ে দেনেন।'

তার হিউ উট্টিয়া টডের সহিত কথামর্মণ করিলেন। তখনই একটা হসিলের শব্দটা তৈরী হইল, টড সেই দূতের সহিত রওনা হইয়া গেল। অবশিষ্ট ইংরেজরা ক্রম নিঃশব্দে বসিয়া তাঁহার প্রত্যাগমনের প্রহর গণিতে লাগিলেন।

কিন্তু সকল আশঙ্কা ব্যর্থ করিয়া টড ঘটাব্যমেকের মধ্যেই কিরিয়া আসিল। হসিল সহি হইয়া গিয়াছে। নানা বহু যেন একটু লজ্জার সহিতই টডের সহিত বেশ দূর ও সমস্ত ব্যাখ্যার করিয়াছেন। কানে কানে এ কথাও একবার শুনাইয়া বিয়াছেন, 'আমি শু শুনায়েল হইলারকে আসেই সাবধান করে বিরোধিলাম।... আমার ঘটনা নাথ্য আমি করেছি। তবে লক্ষ লক্ষ লোকের ইজ্জার বিরুদ্ধে—আমি আর কতটুকু ?'

সে বাহা হউক—নানা তাঁহার বিক হইতে শর্তাধিষ্টক ঠিক পালন করিয়াছেন। শুধু হসিলই আসে নাই—টডের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বপ মোরালপ্রাধা ও অপর দুইজন সেনাপতি আসিয়াছে। তাহারা এইখানেই থাকিবে কাল সকাল পর্যন্ত। এ ছাড়া তিনটা ব্যেল গাড়ী বোম্বাই বিয়া নানা সাহেব বহু খাজ ও পাঠাইয়াছেন। আটা, হাপ, মাংস, বি—এমন কি এক বৃদ্ধি 'বনেবী' আমত। আর কিছু জালানী কাঠ।

অনেকদিন পরে নাজাব-গড়ের চুল্লিতে আগুন পড়িল। গলিত নরমাংসের দুর্গন্ধ ঢাকিয়া স্মৃণাতের স্মরণ উট্টিল। কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া অবশিষ্ট অধিনায় এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ বিনিময়পত্র গোছাচ্ছ করিতে বসিলেন।

সন্ধ্যার কিছু আগে চীকা সিং আসিয়া কামান ও বাড়তি বশুকগুলির দখল লইলেন। এ পক্ষেও টার্বার, ডিলাফোল এবং গোল্ডক কয়েকজন নিগাহী সঙ্গে বিয়া খাটটা বুঝাইয়া আদা হইল। নৌকা অনেকগুলোই ঘাটে জড়ো হইয়াছে বটে—তবে অবিক্রমেই ডিদি নৌকা, মাথার আচ্ছাদন নাই। সে অভাব বড় ও বাঁশের সাহায্যে পূরণ করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি নৌকা ছাওয়া

শেষ হইয়া গিয়াছে, বাকীগুলিতেও কাল চলিতেছে। আজিহুয়া অস্তর বিলেন, রাত্রের মধ্যে হৈ-তাকা বেওয়ার কাল শেষ হইয়া যাইবে এবং রাত্রেরই প্রান্তি নৌকার পানীর জলের সুরাই, কিছু খাবার এবং ফল বাখিবার ব্যবস্থাও হইয়া যাইবে।

যেটুকু সন্ধ্যা ইহাদের মনে এখনও ছিল—নৌকাগুলি বেহিয়া সেটুকু চলিয়া গেল। অধিনায় তিনজন হাদি-হাদি মুখেই কিরো আসিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসার পর নাজাবগড়ে আল অনেকদিন পরে আলো জালিল। আল আর আলো লক্ষ্য করিয়া কামান হাপিবার ভর নাই। মেন সাহেব যে কয়জন আছেন, তাঁহারা সামান্য বা বিনিময়পত্র অবশিষ্ট আছে শুধাইতে বসিলেন। সাহেবরা প্রোগ্রামের কাগজপত্র শুধাইয়া জুলিয়া বাকী বাখে কাগজ ও পত্রাধি 'ছি'ড়িয়া কেলিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বহুশে ধীর পত্রও লিখিতে বসিলেন।

এক কথার ব্যাঘ্র তোড়লোড় শুরু হইয়া গেল।

|| ৫১ ||

আমিনাও আল অনেকদিন পরে ভাল করিয়া হান করিল। তাহার পর মুসহৎক ডাকিয়া এটা ওটা চাহিয়া লইয়া বেশ একটু খটা করিয়াই প্রসাধন করিতে বসিল। চুলে ওট পাকাইয়া গিয়াছে—মূলগে তেল ও কাকিং সাহায্যে বন্ধ করিয়া সে ওটা ছাড়াইতে লাগিল। মুসহৎ তাহার ভাব গতিক বেহিয়া বিদ্যর ও কোঁতুল চাপিতে পারিল না, প্রশ্ন করিল—'হঠাৎ যে এ নতিগতি ?'

'এমনি। এত বড় একটা জহলাত হ'ল পেশোয়ার—তাই।'

বলিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাদিল।

প্রসাধন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, মুসহৎ আদিত্য সাহায্য দিল, আজিহুয়া ঐ সাহেব বর্ণনাধী।

বোম্বাই তেলের হালুকা ওডনাটা সাহায্য প্যরে টানিয়া বিয়া আদিত্য করিল, 'আসুতে বল—এখানেই।'

বোম্বাই বেগমসাহেবের প্রসাধনের অস্ত্র—আদিত্য দুপাশের পাছ-বাড়িহানে সবকটি বাতি জালা হইয়াছিল।

শুধু তাহাই নয়, নাথার উপরে কাটমাসের বহুদূর
ঝাড়টাও পূর্ণ গৌরবে প্রজলিত—কলে হয়ে প্রায় দিবা-
লোকের মতই আলো। হাংগের অন্ধকার হইতে নগ্না
একটা আলোর মধ্যে আশিয়া পড়ার আবিষ্কার চোখ
ছুটা দেন বাঁধিয়া গেল।

কিন্তু সে কী শুধু মাত্র এই মাঝবের স্ট্র আলোতেই ?

চোখের সামনে বিহাতার স্ট্র যে আলো আশ
আবার পূর্ণগৌরবে অগ্নিরা উঠিয়াছে—চোখ বাঁধানোর কি
সে-ও একটা কারণ নয় ? এমনিতেই ত—যে কোন বেশে
যে কোন প্রসাধনেই এই নারী তাঁহার কামা, তাঁহার
উপাস্ত : এমন কি স্তম্ভ করতিন বে সে কক্ষ কেশ উদ্ভাসের
মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, তাহাতেও ত অরণের পিপাসা
কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই—বৎ ঐ ভবের অন্তরালে
যে বহি আছে, তাহার বিকেই তাঁহার অন্তর-পতক দুই
পাখা মেলিয়া ছুটিয়া বাইতে চাহিয়াছে। স্তম্ভ্যে আর
প্রজলিত শিখার মত এই রূপ যে সে পতককে আরও
চকল, আরও বিকল, আরও উন্নত করিয়া তুলিবে—
তাহাতে আর শঙ্ক কি ?

আবিষ্কার কী বলিতে আসিয়াছিলেন ওহা ছুঁদিয়া
সেলেন। যেন প্রস্তুত আলো হইতে আড়াল করিবার
তকিতে ডান হাতটা চোখের কাছাকাছি তুলিয়া মুড়
বিজল বুটিতে তাকাইয়া রহিলেন।

আমিনার ত্র দুইটা ঈষৎ স্ক্রুজিত হইতে গিয়াও যেন
প্রাণপণ চেষ্টায় প্রসন্ন হাসির ভকীতে বিভারিত হইল।

আমিনা কহিল, 'কী হ'ল সাহেব—এমন করে চেরে
আছেন যে ?

'চেরে আর থাকতে পারছি কৈ বেশমসাহেব—সেখ
কলসে গেছে যে !' হালুকাভাবে বলিতে চেষ্টা করিলেও
আবিষ্কার কর্তব্য অস্বাভাবিক পাড় ও বিকৃত শোনার।

'তাই নাকি ?' বিজ্ঞপ্তি ভীত হইয়া গুঠে আমিনার
কণ্ঠে, 'বেশবেন—চোখ কলসানো ওহু ভাল, তাতে
প্রাণটা থাকে। নিজে হুড় পুড়ে নরবেন না।'

'পুড়ে মরতেই যে সাধ যাচ্ছে হুঙ্গেরী বেশম। পতক
না কেনে আঙনে স্বর্গপিয়ে পুড়ে মরে, আমার যে কেনে-
ওনেই মরতে ইচ্ছে করছে।

অকস্মাৎ আমিনার দুই চোখ অগ্নিরা গুঠে, সাপের
মতই হিম্‌হিম্‌ করিয়া গুঠে কর্তব্য, 'কিন্তু এ বড় সাংঘাতিক
আঙন ঐ সাহেব। একটা সামান্য পতককে পোড়বার ভক্ত
গুণ্য এ আঙন জ্বলেন নি—বহু কীব, সমগ্র একটা আতি
কী বেশ পোড়বার ভক্ত জ্বলেন। তোমারই মত কোন
পতক—না তোমার চেরে চেরে ছোট, চেরে গুণ্য এক পতক
পাখার হাওয়ার এ আঙন জ্বলছিল, খেলাজ্বলে—
সেই খেঁচে জ্বলছেই। জ্বলছে ও আসাচ্ছে—প্রসাধিত
হচ্ছে দিকে দিকে, বহু পতককে না পুড়িয়ে নিভবে না।
সামান্য অপমানের শোধ।'

বলিতে বলিতেই হুঙ্গেরীর বেহ বেন কী এক নিরুদ্ধ
আবেগে বধব্য করিয়া কাঁপিয়া গুঠে—ললাট বেহ-
বালিতে ভরিয়া যায়। চোখের জলস্ত বুটটা ক্রমশ
হইয়া উঠে ভয়াবহ। সে বুটের সামনে বোধ করি আবিষ্কারও
ভীত হইয়া গুঠেন। তিনি একলাফে সামনে আসিয়া উঠাকে
ধরিয়া ফেলিয়া কোর করিয়া একটা চৌকীতে বসাইয়া দেন।
'বেগম সাহেবা। বেগম সাহেবা, থির হও।'

আমিনা দেই স্পর্শে যেমন সঙ্কটভিত্তে হয়—তেমনি
উঠা তাহাকে প্রকৃতি হইতেও সাহায্য করে। প্রাণপণ
চেষ্টাকে সে একটু হাসিও টানিয়া আনে মুখে।

'বড় বেশী নাটকীয় হয়ে পড়ল বুশাটা—না বাঁসায়েব ?'

'নাটকীয় ? তা হয়ত হবে। কিন্তু সব ভকীতে সব
অবস্থাতেই তোমাকে ভাল বেশার বেশম সাহেবা ! কাছেই
স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক—সংকট কি নাটকীয় লক্ষ্য
করবারও সময় পাইনা !'

'এবার আপনাই নাটকীয় হয়ে উঠছেন আবিষ্কার ঐ।
...কী বেন বলতে এসেছিলেন ? নিচুই শুধু আমার
রূপেরই প্রশংসা করতে আসেন নি—ও কাণটা বহুবার
নাড়া হয়ে গেছে।'

'বলছি। কিন্তু বেশমসাহেবা তোমার পূর্ণ ইতিহাসের
একটা চমক মাত্র দিয়েই থেমে গেল—কৌতুকল হচ্ছে যে !
কে সে পতকট—যার পাখার হাওয়ার এতবড় আঙন
জ্বল ?—সে কি—ঐ—ঐ পুছগ ?'

'সে একান্তই আমার ব্যক্তিগত ইতিহাস ঐ সাহেব।
নগণ্য এক নারীর সামান্য বৃত্তান্ত।—সে সব আলোচনার

সময় এ নয়।...কাজ শেষ হলে এতদিনের সাধনার
পুঙ্খতার যখন তাগীতাদি করে ভোগ করব—তখনকার
নিকৃত অবসরের ভিত্তি তোলা থাক না; কথাগুলো।’

মুচকি হাসির সঘনিঃ কটাক্ষ। আভিযুক্তার সাধা কেহ
যেন বিদ্যুৎ বেলিগা যায়। সঙ্গে সঙ্গে আনিয়ার কথা
ভুলিতে ভবিষ্যতের যে ছবি স্ট্রিটা গুঠে, সে ছবি মনসমুদ্রে
যেখানে যেখানে বাহিরের সৃষ্টিটাও পোতাচর হয়।

আমিমা কিন্তু বৈষ্ণব সে বিবাহের অবসরও যেন না।
সাধনের আর একটা চৌকী দেখাইয়া দিয়া বলে, ‘বহন।
বলুন ত কী ধর।’

তাহার এই একেবারে বাস্তব প্রবেশ ও বাস্তবিক
কর্তব্যের আভিযুক্তাও যেন অপ্রত্যাশিত হইতে ঝড় বাতাসে
নাড়িয়া আসিলেন। তাহার মুখ পতীত হইয়া উঠিল।
কহিলেন, ‘বেগমসাহেব, এদিকে বুঝ বিপদ। আপনার
হুঁমু তামিল করা কঠিন হয়ে উঠছে।’

‘কেন, কী বিপদ?’ নিম্নে গোচ্য হইয়া বসে
আমিমা।

‘কীক। সিং আপনার নির্দেশমত সতীচৌর্য ঘাটের
ঝোপের মধ্যে কামান সাধারণত হুঁমু দিয়েছিল—আর
সেই সঙ্গে সিপাহীরা কোথায় কোথায় প্রভুত হয়ে গাড়ির
ধাক্কা—সে নির্দেশও ছিল। কিন্তু সিপাহীরা একেবারে
বৈকি গাড়িয়েছে। তারা বলছে যে তারা মুক্ত করতেই
শিখেছে, খুন করতে নয়। নানাসাহেব ইংরেজদের অবন
দিয়েছেন—নিরাপত্তে এলাহাবাদ পর্যন্ত যেতে যেবেন, এখন
এইভাবে আত্মা থেকে নিরস্ত ও নিশ্চিত লোকের ওপর
গুলিগোলানো শুধু খুন করা নয়—চন্দ্র বিশ্বাসঘাতকতাও।
তাতে তারা রাজী নয়।’

যেবে আমিয়ার মুখ বসন্ত হইয়া উঠিয়া ক্রমশ
বেতবর্ণ ধারণ করিল। সে কহিল, ‘ইস! এত নীতি-
বোধ তাবের এল কোথা থেকে? গত ষেড় মাসে তারা
কি নিরস্ত ইংরেজ একটাও মারেন? না কি গুট-তরাগই
করেনি?’

‘হ্যাঁ, সে কথাও তাবের বলতে গিয়েছিলাম। তারা
বললে, হ্যাঁ—মুদ্র যখন বেগেছে তখন নিরস্ত শত্রু সামনে
পড়লেও মারব বৈ কি। কিন্তু কথা দিয়ে—শত্রু যখন সরল

বিশ্বাসে আমার হাত ধরে আমাকেই আশ্রয় করেছে
তখন তাকে মাথা আলাদা কথা।...আরও কি হয়েছে
জানেন, তাতা চৌকী আনাঘের এক কাজ সমর্থন করেছেন
না। সমস্ত তিনই এই নীতিবোধটা চুকিয়ে দিয়েছেন
ওদের মাঝার! চৌকী ব্রাহ্মণ—সিপাহীদের মধ্যে ঠিক
খাতির বেশি।’

অসম্ভব ক্রোধে, নিজেব অধর নিজে ধ্বংস করিয়া
অন্তর্বিষ্মত করিয়া ছুটিল আমিমা। সেই মুহুর্তে তাতা
চৌকীকে সামনে পাইলে হস্ত সে তাহার মুণ্ডটা নিজে
হাতে গড় হইতে ছিঁড়িয়া লইল।

কিছুক্ষণ পরে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অসম্ভব
তাড়নই সে প্রশ্ন করিল, ‘এখন উপায়?’

‘উপায় ত কিছু দেখছি না।...মুসলমান সিপাহীরা
আছে হটে—কিন্তু তারা যে আলাদা করে কিছু করতে
রাবী হবে, তা মনে হয় না।’

আমিমা আভিযুক্তার মুখ হইতে স্পষ্ট সবাইয়া লইল।
তাহাতে কিছুনা জড়িয়া প্রকাশ পাইল কিনা ইখর
জানেন কিন্তু আভিযুক্তা এতটুকু হইয়া গেলেন। এই নারীর
অসম্মানীয় ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতার সামনে নিষেধে যেন বড়
অপর্যায় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সামনের আয়নার প্রতিফলিত নিষেধ প্রতিবিম্বের
দিকে শূন্য সৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে অসম্মানে
মহোই আমিয়ার আরত চোখে আবার বহিঃ জলিল। সে
উঠিয়া গাড়িয়া কহিল, ‘ঠিক হয়েছে। পায়ে কাঁটা স্ট্রিপে
কাঁটা দিয়েই তা ভুলতে হয়। ব্রাহ্মণের বিদ ব্রাহ্মণকে
দিয়েই উঠবে। নানা ধর্মপন্থ ও ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ এবং বাবা।
আপনি একটা ইত্তাহার দিবে নিয়ে যান—পেশোয়ার
নামেই লিখে নিয়ে যান, যেন পেশোয়ার লিখে পাঠিয়ে-
ছেন। পেশোয়ার সেই ইত্তাহারে সিপাহীসব কাছে
জানাবেন যে তিনি ব্রাহ্মণ এবং বাবা। তিনি বা হুঁমু
দিয়েছেন তা বুঝাই দিচ্ছেন। কোন পাণ হবে না ওতে।
শায়ে লেখাই আছে যে বিদ্যা শত্রু দকে বিশ্বাস-
ঘাতকতার কোন অস্ত্র নয়। বরং রামচন্দ্র ইন্দ্রবিৎকে
বধ করতে একদকম বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয়ই
নিয়ন্ত্রিলেন। আর যদি কোন পাণ হয় ত তা নয়

পেশোয়া তাহের হয়ে বহন করবেন। তিনি হুজুম করছেন, হারিখ তাঁরই। বান—এখনই ভাল করে লিখে নিয়ে নিপাহীলের পক্ষে শোনান। হাত গভীর হয়ে আসছে—আর সময় নেই!’

‘ঐ যে কী বললেন—সামরুল না কি—ওটা ইস্তাহার দেখা কি ঠিক হবে? যদি কোন ভুলটুল হয় তা ওটা ক্ষেপে উঠবে আরও!’

‘কিছু ভুল হয়নি। হিন্দু পুত্রণ আমি ভাল করেই পড়েছি। ওটা যদি শুছিয়ে লিখে দিতে পারেন ও ভাল কলই হবে বরং। শত্রু বধ করতে তিনি যা করেছিলেন তা অভায় নয় নিশ্চয়!’

আবিনা কিস্ত তবু ইতস্তত করিতে থাকেন।

‘কিস্ত—কিস্ত বেগমগাহেবা—সুদং পেশোয়ার নামে ইস্তাহার চালাব—সে ত ভাল! যদি এবপর পেশোয়া অধীকার করেন? তাহলে নিপাহীরা অন্যাকে টুকুরা টুকুরা করে ফেলবে। পেশোয়া নিজেও শান্তি দিতে পারেন—তাঁর নাম ভাল করার অপরাধে।... তাঁর কানে উঠতেও ত ঘেরি হবে না। তাওয়া চৌদ্দী বধন শুনবেন তখন তিনিই ছুটে যাবেন পেশোয়ার কাছে।’

‘তারও আগে আমিই শোনাও পেশোয়াকে। তাঁর নাম ভাল করার হারিখ আমিই নেব আমার মাথার। তাঁকে বলব তাঁর নাম করে সে ইস্তাহার আমি দিয়েছি আপনাব হাতে। শান্তি পেতে হয় আমিই পাও—আপনাকে জড়াব না ধী সাহেব!’

‘কিস্ত আপনাব যদি কোন অনিষ্ট হয়—সেটা কি নিজেও শান্তি পাওয়ার চেয়ে কিছু কম বাজবে অন্যাকে?’

আবিনা হাসিল। কহিল, ‘ভর নেই, সে আঘাত আপনাকে পেতে হবে না। আমি আপনাব পেশোয়াকে তিনি। নিজের ক্ষমতাও জানি। অত সবলে আমার ভুল হয় না ধী সাহেব। আপনি নিশ্চিত হয়ে কাজে যান। আমি এখনই পেশোয়ার কাছে যাবি।’

সে হাসি, সে চাহনি, সে কটাক্ষের লজ্জা মাথুব বদলে আস্তে আস্তে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে—অন্তত আবিনার

সেই মুহূর্তে তাই মনে হইল—সাম্যক বিপদের সম্ভাবনা ত তুচ্ছ বস্তু।

তিনি উঠিয়া গাড়াইলেন। আর একবার ঐ বহি-শিখাকে স্পর্শ করিবার, অন্তত একবার ঐ দুখানি বেব-দুর্গত হাত ধরিবার অরম্য আশা-ক্সা প্রাণপণে হমন করিতে হইল। আবিনাকে এতদিনে তিনি চিনিয়াছেন—সে চেষ্টা করিতে গেলে আর একবার অপমানিতই হইতে হইবে শুধু। একটা মিথ্যাস কেলিয়া নিজেও সমরণ করিয়া লইয়া কহিলেন, ‘আপনাব হুজুম এখনই ডানিল হবে বেগম সাহেবা।’

আবপার একটা অভিযান করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তাঁহার সেই অপশ্রিয়ান হৃতির দিকে চাহিয়া মুহূর্ত-কয়েক স্থিরভাবে গাড়াইয়া বহিল আবিনা। ক্রমশঃ শুধু তাম্বিল্য নয়—যেন নিম্নাক্রম একটা কুণাই সূটয়া উঠিল সুখেচোখে। কিস্ত আর অবসর মাই, সেটা মনে পড়িয়া যেন কতকটা ছোর করিয়াই নিজেও প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল। সে আবার আরম্ভের নামে আসিয়া বসিল। প্রসাথনের সাম্যক দুই একটা কাজ তখনও বাকি ছিল, সমস্ত ও সমরণে সেটুকু সারিয়া, চারু সলাটের উপর কেশের রেবাটি ঠিক আছে কিনা হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া, অক্ষিপন্নবে সূর্য্যার কাঠিট আর একবার গভীর ভাবে টানিয়া দিয়া সে উঠিয়া গাড়াইল।... এই সমস্ত চেষ্টার পরে দর্পনে সে চেয়ারটা প্রতিকলিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার দিকে চাহিয়া একটা বিচিত্র বানি সূটয়া উঠিল আবিনার মুখে। বিচিত্র ও দুর্জের। কিস্ত বিজয়িনীর হাসি তাহা নয়। বরং তাহার মনে হইল অসংখ্য বাতির তাহা নয়। বরং তাহার মনে হইল অসংখ্য বাতির উজ্জল আলোতে সে বাশির আঁড়ালে কোথায় যেন একটা পরাক্রমের ছায়াই উঁকি মারিতেছে। সে শিখরীয়া উঠিয়া সুখের উপর ওড়নাটা টানিয়া দিয়া ত্যাগাত্তি বধ হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

হার মানিলে চলিবে না তাহার—কিছুতেই হার মানিবে না সে।

প্রয়োজন হইত বিশ্বের সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সে লড়াই করিবে।

পিতরি

মৃত্যুদণ্ড

রাত্রি বেবেছে গভীর হয়ে। বায়কপুর ট্রাক গোল্ডেন
কালো চকচকে পীচের রাস্তাটা নিখর হয়ে পা এগিয়ে পড়ে
আছে। ঘন বকবকে অন্ধকারকে ধরপস দিয়ে, বাঙা
কাপিয়ে এক একটা হাইলোভেড ট্রাক চলে যাচ্ছে।
মুখচোবের কাছে কোড়া গীর্জার নীচে তাঁবু ফেলেছে
বহুদায়। হিরন্মল মাথারের হল। শক্ত হিলহিলে কালো
চেহারা পুঙ্খবশলোর। ছোট ছোট চোখে সাপের মত
দৃষ্টি। এবেব ঘেরেরা কেউ ইট দিয়ে তোলা উদানে বাহা
চাপিয়েছে, কেউ পারে মসের তেল মালিশ করছে। দুই
কুকুড়ার নীচে আধিম শুককায়ে নিজেদের মিশিয়ে অটুট
স্বাভ্যের সাবণো উজ্জল এবেবই দলের কতগুলো তরুণী
ঘেরে বহবার নতুন জলের আছাঝের মত কলরপ করছে।
কি যে গুদের ঘোঁষিকা, তা কেউ বলতে পারে না। কেউ
কেউ বলে, ওরা তেলেকানার অধিবাসী। বাকি সবুজের
জলে হাওয়ার সন্ধ্যাভিত্তে গুয়ের অপরাধ মাখ। কয়েক
বছর আগে সেই কুকুড়ার, ঘেশের চারিদিকে ছড়িয়ে
কালো ছায়া নেমেছিল। মঠের জালায় পাগল হয়ে
তাদের অনেকেই কলকাতায়, কি তার অপাশে শিন্নাকলে
এসেছিল ঘোঁষিকার সন্ধ্যা। কিন্তু এরা কোন মিলে কি
কাঁঠরীতে কাঙ্ক করে না।

এবেব দলের মাতঙ্গর শ্রিরঙ্গনাথন গীর্জার নীচে একটা
পাথরের মূর্তির মত বসে আছে। তীক্ষ্ণ, তীব্র একটা
দৃষ্টিভঙ্গি ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে তার হৃৎপিণ্ডটা। হঠাৎ
উঠে ধাড়িয়ে হেঁকে ডাকল—মহুভনম এখানে আর—
মহুভনম এগিয়ে এল। তার কানে কিম্বদন্তিগে চাপা
গলায় কতগুলো কথা বলল শ্রিরঙ্গনাথন। তার চোখমুখ
এবেব উত্তেজনার জ্বলেছে। মহুভনমের ভ্রুটো কাঁকড়া-
বিছের মত কূচকে উঠল। বলল—কাল সকালেই গমায়
ওপারে শ্রিয়ামপুরে বেতে হবে ?

—হ্যাঁ, স্রাভাবগুলো সব ভর্তি আছে তো ?

—বেথতে হবে। নিশাঘে সন্ধ্যার মত মাটিতে

বুক বেঁধে তুম্বোরের খোয়ারের মত নীচু একটা তাঁবুর
ভেতরে জনাট শুককায়ে অস্থির হয়ে বেল মহুভনম।
স্রাভার ইলেকটিক আলোর নীচে বসে বুকী সবুজী কচু-
পানার শুকনো শিকড়ের মত চুলগুলোর ভেতরে জাঙুল
চ দিয়ে উজ্জল নারছিল টিপে টিপে।

—এই নানী ? গর্জন করে ডাকল শ্রিরঙ্গনাথন।

—কি বলছিল রে ?

—কাল সকালে তালকে কে কে বাবে ওপারে ? তার
পেলে কিন্তু চলবে না—

—না, না তার পাবো কেন ? এমনিও মংছি, না ঘর
ভেল বেটেই মংচো—বুকীর মুখের হিমবিগ্নি বেথকালো
কটিন হয়ে উঠল। বলল—আনি বাবো, মীরা, লম্বী,
পদ্রও বাবে।

—আর কলকাতা থেকে আমাদের মেসোয়ালী যে
ছুঁড়িতা আমাদের বলে এসে ছুটেছে, সে বাবে না ?

—তাকে তুমি বলা বাপু। আমি বলতে পারবো
না—

অশৌম বিব্রঙ্কিতে ঝাঁকিয়ে ওঠে বুকী—অমন ভাগর
বহরের বেয়ে ! কিন্তু মুখে হাসি নেই—

—বলে বলে বাঙা চলেবে না—উগ্র ক্রোধে জ্বলে ওঠে
শ্রিরঙ্গনাথন। কর্কশ গলায় বলে—আর কিছুদিন বেথবো,
তারপর বেথো তাড়িয়ে চুলেবে মূর্তি হবে—

তোদের ঝিঝিকি হাওয়ার সোহাগে মর্দিত হয়ে
উঠছে কুকুড়ার পাতা। আবছায়া অন্ধকারের ভেতরে
মাথায় ঝাঁক। মিয়ে সারি সারি হেঁটে চলেছে বেথেরা।
ঝাঁকায় আলু, কপি, দিন, বহুবিধ গুণ।

শ্রিয়ামপুরে গমায় ওপরে একটা বটগাছের আড়াল
থেকে নীল জুতি আর গহরকোট পরা একটা লোক বেথিয়ে
আসে। তার পাদের কাছে ঝাঁকগুলো তারা নামিয়ে
রাখে।

ক্ষিপ্রহাস্তে লোকটি অলু কপি বেতনের খুপের ভেতরে

থেকে ছুটবল ব্রাডারগুলো নিয়ে একটা রাস্তায় ভরিয়ে
বেলে। করবরে কতগুলো নোটের গোছা হাতে নিয়ে
তীব্র আনন্দে বৎখরিয়ে কাঁপে বুড়ী সরমতী।

বাংলাকণ্ঠ টাক বোড়ের ধারে সেই ঘোছাড়া হলটার
লোকের চোখেখুঁচ ভেগেছে উল্লাহের জিকিঝিকি। শেষ
বাতের অন্ধকার দিকে হয়ে এসেই প্রতি যিনই
কতকগুলো ছুটবল ব্রাডার গলার ওপারে চলে যায়।

সেদিনও মিশিরাতের অন্ধকার ঘন হয়ে বতছিল
বাংলাকণ্ঠ টাক বোড়ের ওপারে। স্তায়ের খোয়াদের মত
ঐ তাঁবুগুলোর দিকে নিঃশব্দ পদকাত্রে এগিয়ে আসছিল
আবদারী পুলিশের লোক। সেপাই রামসংঘ বলল—
কি রে নাকু, আক কয় নখর 'কেস' করপি? কোন কথা
বলল না নাকু। ভর নাম নাকিকার। সবাই ওকে নাকু
বলে। মাংকটার গড়নও অদ্ভুত। শহুনিং বাঁকা ঠোঁটের
মত সোজা। নেমে এসে বুসে পড়েছে নাকটা নামনের দিকে।
পাছাড়ের মত মন্থন কালো। দেহে অশ্বরের মত শক্তি।
হরিয়া বলল—কি রে, কালাপালাড়, হাঁটতে হাঁটতে
খুনাখুনি না কি, না বাল-বাচ্চার কথা ভাবছিল?

চমক উঠল নাকিকার। বুকের তেতরে বক্তুর ভেট
তোলাপাড় করে উঠল। তার গলার তেতর থেকে জ্বর
একটা শব্দ ধ্বনিত হলো—গর—ব—ব—বুবেগে গেলে
সে কথা বলতে পারে না। ঐ হিরাশ শব্দটা বেরিয়ে
আসে।

—এক করে বলছি আমি, ওর সঙ্গে ওর দেশের গর
করিল না—চমকে ওঠে অমাধার, শিউরে ওঠে অমাধার
শিউরন। মুহূর্তে নীহব হয়ে যায় সেপাইয়ের হলটা।
নাকিকারের চেতনার তেতরে সোনার আলো ছড়িয়ে পড়ে।
সংগের বাহুবল্লব আশ্রয় করে তার মন ভেসে চলে বহু
দূরে। বাহিবল্লব আছে মিলি হায়াব নীচে ঐরাম একটি
গৃহদান তার ছিল, ছিল পাথরে খোঁচাইকরা দেবমূর্তির মত
এক শিল্পকর্ম। কেমন আঘো আঘো ভাবার বলতো, বাবা!
তাক একটা হাওরার খলক এল। তার খোঁচাইই কতি
কতি হাতের নমন, মিলি স্পর্শের মত তার উত্তর আলগা
মুখে আছড়ে পড়ল ব্যতাস।

—হুট। হঠাৎ বিসময় কাঁপিয়ে তাঁৎকার করে উঠল

অমাধার শিউরন। গাঢ় অন্ধকারে ছোট ছোট তাঁবুগুলো
যেন বজ্রমস্তুর মত ভাঁড়ি ঘেরে বসে আছে। অতিকার
হানবের মত নাকিকারের মূর্তিটা উত্তেজনায় কাঁপলে লাগল
বত বত করে।

বিস্ত্র গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে—এই বেইমানের বাচ্চারা
বেরিয়ে আর ঈদগীর—

—কে? ছুটে বাইরে এস ঐরামনাথন। ছায়া ছায়া
অন্ধকারে আবগারী পুলিশের হলকে বেধে ভয়ানক
গলায় চেঁচিয়ে উঠল—না, না, মাঝারের এখানে মর গাছা
কিছু নেই ছুট—

চুপ কর। পর্জন করে উঠল অমাধার—আর আমাধের
সঙ্গে তল্লাশী করতে হবে। তোমের সেনানামের ডেকে
তোল—ডাকতে আর হলো না। পরম নিশ্চিতের বুকে
আজ্ঞে তাঁবুতে তাঁবুতে হায্যকার পড়ে গেছে। শিল্পের
কান্নার মেয়েদের আড়কলবব শেখাতের শুভ্রতা শিউরে
শিউরে উঠছে। রামসংঘ, হরিয়া সব সেপাইরা সেই তাঁবু-
গুলোর তেতরে হানাতাঁড়ি দিয়ে চুকে তর তর করে 'পর্ট'
করছে। আর উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠছে—বাহাংগাবাহু!
প্রত্যেক ব্রাডারের তেতরে বেশী নয়। বিশাল একটা গরুর
পাখীর মত তাঁবুতে তাঁবুতে কাঁপিয়ে পড়েছে নাকিকার।
তার মাথার রক্তে আশ্রয় ধরে গেছে। তাঁবুর তেতরে
থড়ের বিছানার নীচে থেকে রাশি রাশি ব্রাডার
বের করে আনছে, আর মুখে বাগছে সেই বিস্ত্র
শব্দ—গর—ব—ব—

এই তাঁবুটা কার? কঠিন গলায় প্রতিটি তাঁবুর সামনে
দাঁড়িয়ে দিচ্ছিল করছে অমাধার।

—ছুট, বুড়ী সরমতীর তাঁবু ওটা—

—আর ওটা?

—লম্বীর। তবে কাঁপতে কাঁপতে বলভরা চোখে
অশ্রুট গলার বলে চলেছে ঐরামনাথন।

—বে-আইনী তোলাই মনের আলামীদের বাড় করে
হয়ে নিয়ে এসে রাস্তার ধারে রাখছে নাকিকার।

ঐ তাঁবুটা তো নাচ কড়া থলো না—তাঁতা হালালের
আড়ালে একটা ছোট তাঁবুর দিকে নির্দেশ করে বলল—
বান্দরন।

তাই তো। মাতলা একটা ঝড়ের মত পৌ পৌ করে ছুটল সেই নাকিকার সেই তাঁবুর দিকে। তাঁবুর ভেতরে বুকচাপা অন্ধকারে এক কোড়া শিশল চোখ জ্বলছে স্বপ্ন স্বপ্ন করে। চাঁৎকার করে উঠল নাকিকার—বেরিয়ে আর হলি—

আশুন চকচকে দৃষ্টিটা কেঁপে উঠল। কাগজের আর্দ্র গলায় বলল—আমার তাঁবুতে কিছু নেই, বিশ্রাম কর—এন অন্ধকারে পঙ্কিমের দেখা যায় না কিছু। নাকিকারের মনে ফুকের কাছে ডানদিকে ঝাঁপাত দিয়ে কাগজের পুঁটলীর কি একটা ভড়িয়ে ধরে আছে সে—

—তোব ফুকের কাছে ওটা কি ?

—না, না কিছু নয়, জুপি ওটা নিও না। উৎসাহ গলায় চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি। ধূসর সন্ধ্যার ছায়া পড়ল নাকিকারের মনে। তার বছরের চাকরীর জীবনে অনেক ঘেঁষে সে। নিশ্চয়ই কে-আইমী মফের যোতল! লোহুণ উল্লাসে তার বিশাল হাতের হিংস্র খাবাটা এগিয়ে এস পুঁটলীটার দিকে। নাঃ এত হাডা মনে হচ্ছে। যোতল তো নয়। নাকিকারের পায়েব কাছে আকোব কাগজের ভেঁষে পড়ল মেয়েটি। কাগজ অশ্রুট গলায় দিনতি ছুটল—আমাকে জেলে হাও। কিন্তু পুঁটলীটা নিও না—নাকিকারের যান্ত্র, উৎসাহিত হাতের টেনোনিতে পুঁটলীর শক্ত গিট খুলে যায়। বেরিয়ে পড়ে একটা কাগজের মোড়ক। নিশ্চয়ই গোরাই আঁকিং! তার খন্দীকে মাতিয়ে মাতিয়ে ধরে চলল বস্ত্রের উজ্জ্বল। কিন্তু—

কিন্তু কাগজের মোড়কটা খুলতেই টুপ করে ধরের বিছানার ওপর গড়িয়ে পড়ল একটা পীচ বোর্ডের মত কি বেন। স্বপ্নে উঠল নাকিকারের হাতে আট ব্যাটারীর চর্চ। সঙ্গে সঙ্গে শুধু হয়ে গেল তার জ্বরস্পন্দন। এ কী! কেঁপে উঠল। তীব্র উত্তেজনার, বিষয়ে গলা গিরে চাঁৎকার করে উঠল—কার ছবি!

অসাড় হয়ে বাসে তার চেতনা। টর্চের ঝাঁঝালো আলোর হস্তের ডোলায় মত ছুটো চোখ তীব্র বিস্ময়িত দৃষ্টি ছুটিয়ে দেখছে ছবিটা। একমাথা কৌকড়ানো চুল। হাসি হাসি মুখের এক শূন্য বলিষ্ঠ শিশু। তার বহু

বিনিময় হাতের স্বপ্ন—তার বোকা! ককিয়ে চাঁৎকার করে উঠল নাকিকার, কোথায় পেগি তুই এই ফটো? কে তুই? টর্চের তীব্র ঝাঁঝালো আলো কাগজ পরে পরে মেয়েটির মুখের ওপর এসে পড়ল বস্তুকের গুদীর মত। নাকিকারের মাথার ভেতরে ঝলকে ঝলকে কেটে পড়ছে বস্ত্রের উজ্জ্বল। হাওড়া স্টেশনের রিকিউভির তীক্ষে সে হাবিয়ে গিয়েছিল। বছরের পর বছর তাগে চোখ দুটো আকুল হয়ে খুঁজেছে যাকে কলকাতার অগ্নিতে গলিতে তার সেই অদৃশ্য দুঃখের স্মৃতিটা তারই গায়ের কাছে গড়িয়ে গুমে গুমে কাঁপছে!

—জুপি তাহলে বেঁচে আছে।

—হ্যাঁ হঠাৎ চাকরীটা পেয়েছি বলে বেঁচে আছে।

—তোমার সঙ্গে দেখা হলো কেন—তীব্র চাঁৎকারে চাবিরিকের কাঁপিয়ে সে বলল—না যেতে পেরে তোমার বোকা মারা গেছে।

আমার বোকা নেই। ফটোটা বুক চেপে ধরে পাগলের মত আর্দ্রনাথ করে উঠল নাকিকার। আঙনের একটা হলকার জালায় ঘেন ছুটে তাঁবুর বাইরে এস। শেষ রাতে তারায় শুভ্র আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘেন কোন অবশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রোশে কেটে পড়ল—হাস্তস্বপ্নান কী পাগ করেছি আমি।

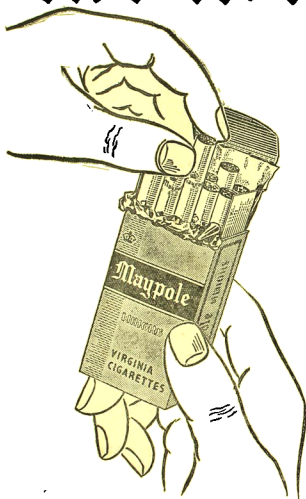
বহু উন্মাদের মত মাটিতে অস্ত্র কিল ঢুক মাতে লাগল।

—কি রে? এই নাকিকার কি হয়েছে তোব? ছুটে এস জমাখার শিউরণ। পেপাইরা বলল—নকাবেলা শিউরি শব্দত খেয়েছিল—

—হুগী ব্যাঘ্রাম ট্যাঘ্রাম আছে বোব হয়—বলল রামশরণ।

কাতো কথাই শুনেতে পেল না নাকিকার। সে তার ফুকের নীচে ময়লা ছেঁড়া সেই কোটোটা নিয়ে ফুলেয়ে গুটির ছুটিয়ে কাঁপছে। ফটোর দিকে তো কাতো নজর পড়ে না। পেপাইরা তার মাথায় ঠাণ্ডা জলের স্ফাপটা বেধাব ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে ছুটল। আর নিশ্রাণ একটা শিলীকৃত স্মৃতির মত বসে বসে নাকিকারের পায়েব কাছে কে-আইমী চোশাই মফের সেই নির্দোষ অপামী।

অতি... সোপোল



সব চেয়ে ভাল

দি ইন্ডেপেন্ডেন্ট কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

[১৯৪৩ সালে রেজিষ্টারী কৃত]

হেড অফিস : ২, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

অমুমোদিত মূলধন	৮,০০,০০,০০০
বিলকৃত ও স্বীকৃত মূলধন	৪,০০,০০,০০০
আদায়িকৃত মূলধন	২,০০,০০,০০০
সংরক্ষিত তহবিল	১,৩৪,০০,০০০

শাখা সমূহ

ভারতে :—সকল শিল্প ও বাণিজ্য প্রধান নগর ও সহর

ব্রহ্মদেশে :—রেহুন, মৌলমিন, আকিয়াব, মান্দালয়, বেসিন

বুজুরাজ্যে :—লণ্ডন

পাকিস্তানে :—চট্ট করাচী

মালয়ে :—সিঙ্গাপুর, পেনাং, কুয়ালালামপুর

তাহাড়া :—হংকং

এজেন্ট

পৃথিবীর সমস্ত দেশে—ইউরোপ আমেরিকা, আফ্রিকা এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া।

ব্যবসায় ও ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্যাবলী :—

এই ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ, অমুমোদিত জামিনের পরিবর্তে দানন দান, বিপণন, ড্রাক ট দান ও তারে টাকা প্রেরণের ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করে। আন্তর্দেশীয় ও বৈদেশিক শাখা সমূহ এবং পৃথিবীব্যাপী ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ব্যাঙ্ক সর্ববিধ ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের সুযোগ দান করে।

জি, ডি, বিড়লা

চেয়ারম্যান

এস, টি, সদাশিবন

জেনারেল ম্যানেজার

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কথা

শ্রীমতী উমা দে

গান্যং পরতরং নহি

গান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। শব্দময় ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি, অনাধিকালের অনাহত তত্ত্বোক্তে প্রথম ঈকান্তের অল্পবয়সের মাঝে সাধক লীন হইয়া যান; ইহাই তাঁহার সাধনা, ইহাই তাঁহার সিদ্ধি।

নাম—

যেহ যন্ত্রে নাথের আবির্ভাব ও প্রকাশ। প্রাণবাহুতে ইচ্ছাশক্তির সত্যাবের ফলে নাথের অভিব্যক্তি। শব্দ-তাত্ত্বিক বলেন “ন”-কার প্রাণ বাচক (breath) ও “ব”-কার অগ্নি বাচক (energy), অর্থাৎ মনোগোচর—বাক্যের অতীত, মনের অতীত, সেই রূপাতীত ব্রহ্ম ধরা যেন শব্দরূপে। শব্দ করেকটি অক্ষর বা বর্ণের সমষ্টি। বর্ণ আসে নাথ হইতে। অক্ষর হইতে পদ, পদ লইয়া ভাষা এবং ভাষাই ভাবের বাহন। ভাব ছাড়া জগৎ নাই আর নাথ ছাড়া ভাবের প্রকাশ নাই। শাস্ত্রোক্তা যেন জগৎ নাথাবীন।

অনাহত নাম—

নেম নেহুর অধরে শুভ শুভ গর্জন, নটিনী তটিনীর হুহু হুহু কলতান, স্বপ্নমুখে প্রকৃত উপলে নিষ্করিত নৃপের নিষ্কণ—তাবনারী প্রকৃতির ভাবের অন্ত নাই; বিচিত্র রূপে, বিচিত্র ক্ষমিতে তাহার বিচিত্র ব্যঞ্জন। ক্ষমিময়ী প্রকৃতির এইরূপ অনাহত নাথের আশ্রয়প্রাপ্তের প্রথম ইঙ্গিত, ইন্দ্রিয়সীমার উত্তরণের প্রথম সঙ্কেত। ইহাতে ক্ষনি আছে, শব্দ নাই; ব্যঞ্জন আছে, অর্থ নাই। অনাহত নাথের বাণ্য ছাড়াইয়া আহত নাথের বাণ্যসীমার প্রথম পর্যায়, যেন কল-কোলাহল সুবিস্তৃত শিত-কণ্ঠের প্রথম কাকলী।

শব্দ-সিদ্ধিতে প্রথম ভাবে কবে উঠিয়াছিল জানি না। সেই আদি গুরুদেব সংখ্যাত কত সূত্র বৃথং তরসেব সৃষ্টি হইয়াছে কে বলিবে? সীমিত প্রাণের উপকূল

যতক্ষণ না সে ভরস্ব আদিয়া আখ্যাত করে, ততক্ষণ তাহা অজানাই থাকিয়া যায়। বাহার প্রাণে আদিগ না, তাহার কাছে সেই শব্দ অক্ষত কিন্তু তাই বলিয়া তাহার অস্তিত্ব উড়াইয়া দেওয়া হোয়া যায় না। কল্পনার বাণ্যে বাহার অস্তিত্ব, ইন্দ্রিয়ে বাহার অল্পভূতি নাই, সেই অতীন্দ্রিয় শব্দ-সত্যই অনাহত নাথ রূপে নিত্য বিস্তারমান। ইহার আদি নাই অন্তও নাই। প্রবণগোচর নয় বলিয়া উহার অস্তিত্ব শ্রোতৃ নিরপেক্ষ।

আহত নাম—

অনাহত নাথের স্রোতা নাই, আহত নাথের কিন্তু স্রোতা চাই। স্রোতার প্রবণ-সীমার অনাহত নাথের শেষ ভরস্বটির প্রথম বৃদ্ধ আখ্যাত সঙ্গীতের সন্তাবনা। তরঙ্গ আগাইয়া চলে, ক্রমে সমগ্র প্রবণক্ষেত্রকে প্রাবিত করিয়া আবার তাহা অনাহত শব্দ-সিদ্ধিতে বিলীন হইয়া যায়। যতটুকু সময় সে প্রবণ-সীমার মধ্যে থাকে, ততটুকু সময়ই আহত নাথ রূপে তাহার বিকাশ। অনাহত নাথ যখন আহত নাথ রূপে প্রথম ধরা দেয়, তখনই তাহার অভিব্যক্তি ক্ষনিময়ী প্রকৃতির বিচিত্র শব্দসত্তাবে প্রকাশিত হয়।

ক্রমে বেগ বাড়ে, তরঙ্গ উত্তাল হয়, তারঙ্গধ্বকব সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অতিভাবের বাণ্য ছাড়াইয়া আবার কখন সেই অনন্ত অক্ষত অনাহত নাথে লীন হইয়া যায়। আহত নাথের আদি কোথায় থিত্তে পাইনা, অন্ত কোথায় বৃত্তিতে পাই না। আহত নাথের ক্ষুদ্র সঙ্গীতে যন্ত্র ও বর্গসঙ্গীতের উত্তর ও প্রকাশ। আহত নাথের ক্ষনি ব্যঞ্জন, অর্থ সবই আছে। ক্ষনি যাত্রাই সঙ্গীতের উপযোগী নয়। সঙ্গীত মনোব্রঞ্জনার বিজ্ঞা; যে ক্ষনি মনো-ব্রঞ্জে সমর্থ, তাহাই সঙ্গীতোপযোগী।

আহত নাথের ভেদ—

ভাতি, রূপ, উপলব্ধিমান এবং কাহারও কাহারও হতে বিয়ান এই চারিটা নাথের বিশিষ্ট প্রকার।

শ্রুতি তেজ—(Timbre)—কণ্ঠ সঙ্গীত ও বস্ত্র সঙ্গীত ।

রূপ তেজ (Magnitude)—নাথ চড়া বা খাচ
হইতে পারে ।

স্বরের ভিন্নতা মূলক—উচ্চতা, মধ্যতা ও তলতা । ইচ্ছা
যে কোন মূলক হইতেই নাথ উদ্ভিত হইতে পারে । এই
উৎপত্তিস্থান বিচারে নাথের স্থান তেজ (Pitch) নির্ণীত
হয় ।

বিবামভেদে (Prolongation বা Pause)—নাথের
স্থায়িত্ব অনুযায়ী বিবাম ভেদে নিরূপিত হয় ।

শ্রুতি—

সা রে গা মা পা বা মি এই সাতটি শুদ্ধ স্বর ।
রে গা মা পা মি এই পাঁচটি স্বর বিকৃত অর্থাৎ ঝড়ি বা
কোমল হইতে পারে । শুদ্ধ ও বিকৃত লইয়া মোট বাবটি
স্বরই পরবর্তীকালে সঙ্গীতের উপভোজ্য ।

এই বাবটি স্বর আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ
বিতক্ত । অংশগুলির নাম শ্রুতি । শ্রুতি মোট সাইশটি ।
যথা—১। তীত্ৰা ২। ক্রুদ্রবতী ৩। মন্দা ৪। ছন্দোবতী
৫। দয়াবতী ৬। বঙ্গনী ৭। রজ্জিকা ৮। রোজী
৯। জোবী ১০। বত্রিকা ১১। প্রসারিণী ১২। ঐতি
১৩। মার্জনী ১৪। ক্ষিতি ১৫। বজ্রা ১৬। সন্ধিপনী
১৭। আলাপনী ১৮। মধবী ১৯। রোহিণী ২০। বন্যা
২১। উগ্রা ২২। কোভিনী ।

শ্রুতি আর স্বর যেন মূল আর মালা ; মূলের পরে
মূল গাঁবিয়া মালায় রচনা, মালাকেই তখন দেখি, মূল-
ভঙ্গিকে আলাপ করিয়া দেখি না । ঠিক স্তেমনি উপরোক্ত
স্বরগুলি যেন কতকগুলি শ্রুতির এক এক গাঁবি মালা ।
এই শ্রুতি বিয়াই হয় স্বরের বৈবোধ্য গাথনা, স্বরের প্রকৃতি
নির্ধারণ । কয়েকটি শ্রুতিকে আশ্রয় করিয়া এক একটি
স্বরের বিকাশ হয় । কোনটি কোন্ স্বর তাহা বুঝিবার রক্ত
বিশিষ্ট শ্রুতির নির্দেশ আছে ; সাতটি শুদ্ধ স্বরের শ্রুতি
ভেদে যথাক্রমে—

প্রথম শ্রুতি তীত্ৰার উপর শুদ্ধ সা বা বজ্জ, পঞ্চম
শ্রুতি দয়াবতীর উপর শুদ্ধ রে বা 'গবত, অষ্টম শ্রুতি
রোজীর উপর শুদ্ধ গা বা গান্ধার, দশম শ্রুতি বত্রিকার
উপর শুদ্ধ মা বা মধ্যম, চতুর্দশ শ্রুতি ক্ষিতির উপর শুদ্ধ পা

বা পঞ্চম, অষ্টাদশ শ্রুতি মধবীর উপর শুদ্ধ বা বা বৈবত,
এক বিংশ শ্রুতি উগ্রার উপর শুদ্ধ মি বা মিথার । পাঁচটি
বিকৃত স্বরের শ্রুতিভেদে নিম্নে দেখিয়া হইল—

তৃতীয় শ্রুতি মন্দার উপর কোমল রে বা গবত
মধ্যম শ্রুতি রজ্জিকার উপর কোমল গা বা গান্ধার
দ্বাদশ শ্রুতি ঐতির উপর তীত্ৰা ধী বা মধ্যম
ষোড়শ শ্রুতি সন্ধিপনীর উপর কোমল পা বা বৈবত
বিংশ শ্রুতি বন্যার উপর কোমল মি বা মিথার

শ্রুতিসংখ্যা—

বিভিন্ন স্বরের শ্রুতি সংখ্যা বিভিন্ন রূপে হইয়া থাকে
যথা—যড়কে চার শ্রুতি

ও স্বরে তিন শ্রুতি
গান্ধারে দুই শ্রুতি
মধ্যমে চার শ্রুতি
পঞ্চমে চার শ্রুতি
বৈবতে তিন শ্রুতি
মিথারে দুই শ্রুতি

‘ক’ চিহ্নিত তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	শ্রুতির নাম	শুদ্ধ স্বর	কোমল ও তীত্ৰ স্বর
১	তীত্ৰা	(১) সা শুদ্ধ	
২	ক্রুদ্রবতী		
৩	মন্দা	(২) রে কোমল	
৪	ছন্দোবতী		
৫	দয়াবতী	(৩) রে শুদ্ধ	
৬	বঙ্গনী		
৭	রজ্জিকা	(৪) গা কোমল	
৮	রোজী	(৫) গা শুদ্ধ	
৯	জোবী		
১০	বত্রিকা	(৬) মা শুদ্ধ	
১১	প্রসারিণী		
১২	ঐতি	(৭) ধী তীত্ৰ	
১৩	মার্জনী		
১৪	ক্ষিতি	(৮) পা শুদ্ধ	
১৫	বজ্রা		
১৬	সন্ধিপনী	(৯) বা কোমল	
১৭	আলাপনী		
১৮	মধবী	(১০) বা শুদ্ধ,	
১৯	রোহিণী		
২০	বন্যা	(১১) মি কোমল	
২১	উগ্রা	(১২) মি শুদ্ধ	
২২	কোভিনী		

সুজ্বর—

ভীত্রা, হৃদযাবর্তী, মৌত্রী, বক্রিকা, ক্ষিত্তি, মদরী ও উগ্রা এই সাতটি ক্রান্তির উপর যথাক্রমে সা, বে, গা, না, পা ও নি এই সাতটি স্বরের প্রতীক: হইলে তাহাদিগকে সুজ্বর বলা হয়। সাতটি সুজ্বরের শাস্ত্রীয় নাম—বড়জ্ব, মধ্যজ, গাঢ়জ, মধ্যম, পকম, শৈবত ও নিষাধ।

বিকৃত স্বর—

বিকৃত স্বর দুই প্রকার—কোমল ও ভীত্র। সে ক্রান্তিতে যে স্বরের স্বাভাবিক স্থান তাহার ব্যতিক্রম হইলেই উক্ত স্বর বিকৃত বহেত। স্বর স্বাভাবিক স্থান হইতে পূর্ববর্তী যে কোনও ক্রান্তিতে সরিয়া আসিলে কোমল এবং পরবর্তী কোনও ক্রান্তিতে আগাইয়া গেলে ভীত্র হয়। যেমন শুভ রে'র স্বাভাবিক ক্রান্তি পকম অর্থাৎ হৃদযাবর্তী কিন্তু যে যখন গিছাইয়া আসিয়া তৃতীয় ক্রান্তির মধ্য উপর প্রতিষ্ঠিত হইল তখন উহা হইল কোমল রে। আর শুভ না'র স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা স্থান মধ্যম ক্রান্তি বক্রিকা। যখন ক্রান্তি ঐতিহ্যে আগাইয়া আসিলে ইহাই আসিলে ইহাই ভীত্র না হইয়া গাঢ়জ। শুভ স্বরগুলি কোন কোন ক্রান্তিতে আসিয়া কোমল বা ভীত্ররূপে প্রকাশ পায় তাহা 'ক' চিহ্নিত তালিকা হইতে বোঝা যাইবে। এখানে বলার প্রয়োজন যে কেহ কেহ শুভ না কে কোমল না বলে।

অচল স্বর—

বড়জ্ব ও পকম কখনও কখনও বিকৃত হয় না, সেইজন্য ইহাদিগকে অচল স্বর বলে।

গ্রাম—

এইবার গ্রামের কথা বলিব। গ্রাম বলিতে চক্কর উপর ভাসিয়া গুঠে বগ জননীৰ ঘোষাকপাশ্রিত ছায়া স্নানিগুণ শান্তির নীড় কয়েকটি পল্লীর দ্বিচ্ছ ভ্রামল ছবি। কয়েকটি গৃহস্থ পরিবার লইয়া এক একটি গ্রাম। ভৌগোলিক গ্রাম ও স্বরগ্রাম এক না হইলেও উভয়ের মধ্যে বেশ কিছুটা সাদৃশ্য আছে। সা বা বড়জ্ব হইতে নি বা নিষাধ পর্যন্ত সাতটি স্বরের পরস্পরক্রমে কোথায় অবস্থান কোথায় প্রতিষ্ঠা তাহা অনুধাবন করিয়া গ্রাম নির্ধিত হয়। সাতটি স্বর বেন সাতটি গৃহস্থ, একই গ্রামে বাস করিতেছে। ইহাধের মধ্যে সা বা বড়জ্ব নেতৃস্থানীয়, বাকী ছয়টি তাহার অনুগামী। সৰ্ব্বোত্তর গ্রাম মোট তিনটি। বড়জ্ব, মধ্যম ও গাঢ়জ। বর্তমানে সৰ্ব্বোত্তর বড়জ্ব গ্রামেই সচরাচর বাস কর্তৃত্ব হয়। বড়জ্ব গ্রামের গাঢ়জকে বড়জ্ব বলিয়া স্থির করিলে তাহাকে গাঢ়জ গ্রাম বলা হয়—এইরূপ বড়জ্ব গ্রামের মধ্যমকে বড়জ্ব বলিয়া স্থির করিলে তাহার পরিচয় মধ্যম গ্রাম।

ক্রম—

গ্রামের মানুসেব যেমন একটি নিম্ন স্বমুখা আছে, উহা নিচু তেজ আছে, স্বর গ্রামের স্বরগুলিরও ভেদনি একটি স্বমুখা দেখা যায়। নেতৃস্থানীয় স্বর প্রথম স্থান পায়, তার পর স্বরগুলি নিম্ন নিম্ন গুরুত্ব অনুযায়ী স্থান পাইয়া থাকে।

যদি দেখা যায় সা বা বড়জ্ব হইতে স্বরের গতি নি বা নিষাধের দিকে তবে ঐ স্থানবিক্রাস স্বভাবিক ভাবেই হইয়াছে বুঝিতে হইবে কিন্তু নি বা নিষাধ হইতে বিপরীত গতিতে সা বা বড়জ্বের দিকে স্বরলব্ধী স্বখন চুটীয়া চলে তখন সেটা বিপরীত হাঁতি। স্বরের এই যে পারস্পরিক অবস্থান হাঁতি ইহারই নাম ক্রম; স্বাভাবিক হাঁতি স্বাভাবিক ক্রম, বিপরীত হাঁতি বিপরীত ক্রম।

আরোহী ও অবরোহী—

সা হইতে স্বর উন্নিত হইয়া বে, গা, না, পা, বা, নি ক্রমে বহুই আগাইয়া চলে ততই তাহার উচ্চতা ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। এই ক্রমবৰ্দ্ধমান উচ্চতাহেতু স্বরের স্বাভাবিক ক্রমের অগ্রগতিকের আরোহীগতি বলে। পক্ষান্তরে নি হইতে বিপরীত ক্রমে প্রাথমিক সুরধারা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয় বলিয়া এই নিম্নাভিমুখী গতির নাম অবরোহী গতি।

মূর্ছনা—

এতদূর ক্রান্তি বলিয়াছি, স্বর বলিয়াছি, আরোহী ও অবরোহী গতিও বলিয়াছি। এইবার মূর্ছনা বলিবার চেষ্টা করিব।

চোখের বিষয় রূপ, কানের বিষয় শব্দ। চোখ দিয়া শব্দ আর কান দিয়া রূপ বোঝাও যায় না, বুঝানোও যায় না, কিন্তু ধামিকটা আত্মনে দর তো দেখা যায়। স্বর ও ক্রান্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ আগেই বিশ্লেষণ করিয়াছি। বাইশটি ক্রান্তির, মধ্যেষ ব্যাচটির উপর ব্যাচটি স্বরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু বাকী দশটি ক্রান্তির কী হইল? এই দশটি ক্রান্তি পূর্ণোক্ত ব্যাচটির সহিত একযোগে পরস্পর পরি-পূরকের কাম করিয়া থাকে। বহুতঃ সার্বক স্বরদ্বয়ী করিতে হইলে এতোকটি ক্রান্তিরই সাহায্য লইতে হয়। এক স্বর হইতে অল্প স্বরের মধ্যবর্তী ক্রান্তিগুলিকে ছুইয়া ছুইয়া যাইতে হয়। এই এতটুকু ছোয়া কণিকের এই স্পর্শটুকু স্বরিক বলিয়াই ভুজ্জ নয়, এতটুকু বলিয়াই সামান্য নয়। এই ছুইয়া ছুইয়া যাওয়াতেই রচিত স্বর বৃদ্ধির ইন্দ্রজাল—তা সে আরোহী গতিতেই ছুইয়া যাক্ বা

অবরোধী গতিতেই স্পর্শ করুক। সঙ্গীতশাস্ত্রীগণ এতদূর
প্রকাশ মুর্ছনার কথা বলিয়াছেন। মুর্ছানার পথেই চলে
সংগীতের আধোহীন ও অবরোধন। ক্রম ভঙ্গ না করিয়া

যে কোন অবস্থান হইতে উৎখিত হইবে আধোহীন বা
আবরোধ গতি প্রকাশেই মুর্ছনার পতিত। এই স্থলে বড়ল
গ্রামের মুর্ছনাগুলির গতিপথের মন্তা দেওয়া হইল :—

আধোহীন	অবরোধন
সা, বে, গা, মা, পা, ধা, নি	নি, ধা, পা, মা, গা, বে, সা
রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা	সা, নি, ধা, পা, মা, গা, বে
গা, মা, পা, ধা, নি, সা, রে	রে, সা, নি, ধা, পা, মা, গা
মা, পা, ধা, নি, সা, রে, গা	গা, বে, সা, নি, ধা, পা, মা
পা, ধা, নি, সা, রে, গা, মা	মা, গা, রে, সা, নি, ধা, পা
ধা, নি, সা, রে, গা, মা, পা	পা, মা, গা, বে, সা, নি, ধা
নি, সা, রে, গা, মা, পা, ধা	ধা, পা, মা, গা, বে, সা, নি

সঙ্গক—

বিশুদ্ধ বর্ণের সংখ্যা সাতটি, সাতটি ছাড়া যেমন বে
নাই, ঠিক তেমনি বড়ল স্বতঃ গাছা, মধ্যম, পঞ্চম, ষৈবত
নির্ধার অর্থাৎ সা, বে, গা, মা, পা, ধা, নি ছাড়াও কোন
কোন স্বর নাই। নারদগীত্রে এই সঙ্গরূপে প্রকাশই
সঙ্গীত শাস্ত্রের মূল কথা। নার ব্রহ্ম যখন সঙ্গ স্বরের বন্ধন
স্বীকার করেন, অঙ্গল যখন রূপের দ্বারাও আপনাকে বিস্তার
করিয়া যেন, তখনই মূল হয় বহু বৈচিত্র্যবাহু সুরলব্ধীর
বর্গাচা মনোবলম্ব। সঙ্গরূপে নারের প্রকাশ বহু বিভিন্ন
রীতিতে। মুর্ছনার পথ বহিরা নিরু হইতে ক্রমশঃ উর্ধ্ব
দিকে আবার বন্ধনও বা উর্ধ্ব হইতে নিম্নাতিমুখী যে কখনও
ক্রম, কখনও বিপরীত ফলস্বরূপে অবস্থান গতিতে আনন্দ
নিরুদিগার ত্রায় অনুমানকে উল্লেখ করিয়া প্রাবিত করিয়া
বহিরা চলে। এই সাতটি স্বরের একটি সঙ্গক। সাতটি
সঙ্গ ও পাঁচটি বিকৃত স্বর লইয়াই স্বরসঙ্গক।

মন্ত্র, মধ্য ও তার সঙ্গক—

সাধারণ নারসঙ্গ সঙ্গরূপে স্বতঃস্বিনী ভাবে স্বর নিষ্কপ
কর অর্থাৎ কথা বলে, সেইরূপ কোরে স্বর-কলি উৎখিত
হইলে এই সঙ্গক মধ্য সঙ্গক নামে পরিচিত হয়। ইহা
অপেক্ষা কম কোর অর্থাৎ স্বরে যে স্বরসঙ্গক উৎখিত হয়
তাহার নাম মন্ত্র সঙ্গক। কিন্তু স্বতঃস্বিনী অপেক্ষা বেশী
কোর অর্থাৎ চড়া স্বরকলি উৎখিত ও প্রকাশ হইলে, উক্ত
সঙ্গকে তার সঙ্গক বলা হয়। মোটামুটি চড়া ও খার
বিচারে স্বরসঙ্গক উক্ত তিন প্রকারের হইতে পারে।
চলিত কথায় মন্ত্র সঙ্গক উচ্চা, মধ্য সঙ্গক মূঢ়া এবং
তারসঙ্গক তার নামে পরিচিত।

একটি সঙ্গক আছে কিন্তু উহা এত উপায়ে কেবল বাদ
যাইতে উহা বলা পড়ে। এই সঙ্গকটির নাম অতি-তার।
‘নার ব্রহ্ম স্বর সঙ্গকের বন্ধনে বদা দেয়’—এইটাই একটু
পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। বিখ্যাত ও শব্দ তরঙ্গে



পরিপূর্ণ হইয়া আছে। নিত্য বর্ধমান নিঃশব্দিত শব্দ
তৎস্বের অসীম সত্তাকে উপলব্ধি ও প্রকাশ করা কী
সীমান্বিত ইন্দ্রিয় শক্তির দ্বারা সম্ভবপর? বধনই এই ত্রি-
বিভিন্ন অক্ষর অক্ষর বংশধরী আনন্দেব ইন্দ্রিয় গোর
হয়, বধনই ইন্দ্রিয়ের সহিত বিশ্ববাসী অনাহত নাহের স্ত
সংযোগ ঘটে তখনই হয় অশব্দ নাহত্বের শব্দ প্রকাশ,
সদ্যোক্তের প্রথম উল্লেখ—আহত নাহের বেলোচুঁমিতে হয়
অনাহত নাহের আশ্রয়প্রকাশ। শব্দটি শব্দের বাণ পথ
বহিয়া সে চলিতে থাকে আর আপন অঙ্গে মাথিয়া যায়
মানব দেহের স্রোতে বেগু, আলোর সঙ্গে যেন তাপ, শব্দের
সঙ্গে তেননি স্রব। আলো আর শব্দ বৈজ্ঞানিকের মতে
উভয়ে দীর্ঘা (Ether) তরঙ্গের (আকাশ) কম্পন।
(Vibration) কম্পন কল্পনে শব্দ বা আলোর উদ্ভব।
কাজেই মূলতঃ বিচারে বলা যায় শব্দ ও আলো উভয়েই এক
কাজের। আলোর বৈচিত্র্য রঙে, শব্দের বৈচিত্র্য সঙ্গীতে।
সঙ্গীতশাস্ত্রীরা তাই অনেক সময় রঙের উপমা দিয়া সঙ্গ
শব্দ বুঝাইয়াছেন। আবার কেহ কেহ পতঙ্গসংসার শব্দ
সহায় স্বসংগত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ঠাট—

আলোর দাঙা, রঙের দাঙা সূর্য্যদেব, শব্দটি অশ তাঁর
দান। গানের যেসব সঙ্গীত সঙ্গীতীও তেননি চলেন
শব্দটি শব্দের সঙ্গত শব্দটি। শব্দটি শব্দ যেন শব্দটি বোঝা
—বধন ঠিক ঠিক চল তখন তারা শুদ্ধ। কিন্তু মাঝে
মাঝে কোন কোন শব্দ কখন একটু তেন চল কখনও বা
বুহু, কোনল। শব্দের গতি তাহাতে ব্যাহত হয় না—বরং
অপতন শ্রবণ শ্রুতি হয়, শব্দসংসার উপলব্ধিতে
সঙ্গীতিত হয় গতি বৈচিত্র্য আনন্দ। বসি ঠাট, শাস্ত্রীরা বলেন
ধাট বা মেস। চলার গতি নির হইতে উপলব্ধি
আবোধী। ধাপে ধাপে ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, কখনও
লম্বুপদ সকারে, কখনও শুষ্কপদ নিষ্কম্পে। উপরেই উঠে,
নীচে নামে না। আরোহণই বেন লম্বা, অবরোহণ জানে
না, সঙ্গীত বসিকল্পন বোধিয়াছেন এই অপতন গতি ভঙ্গি
যত বিভিন্নই হোক না কেন যেটামুটি শব্দটি ঠাটে ইহাকে
ভাগ করা যায়। অঙ্গগতির যে সোপানে স্বাভাবিক চরণ-
পাত তাহাতে উঠিত হয় শুদ্ধ শব্দ, চটল চরণে বাহাকে

হুইয়া যান, কোমল শব্দে সে সাদা দিগ্ধ উঠে আর শুষ্ক
পদক্ষেপে বাহাকে অতিক্রম করেন তাহা হইতে নির্গত হয়
ভীতশব্দ। এই কোমল ও ভীত শব্দগুলি যাকীও শুদ্ধ শব্দ-
গুলির সহিত নানাভাবে মিশিত হইয়া নানা বাণ বাগিনীর
সৃষ্টি করে। কেবল শুদ্ধ শব্দের মাধ্যমেও বাণ বাগিনীর
বৈচিত্র্য সাধিত হইতে পারে। সাধারণতঃ সঙ্গীত সঙ্গীতী
চলেন শব্দটি ঠাটে, তাই এই শব্দটি ঠাটের পরিচয়েই সমগ্র
রাগরাগিনীর পরিচয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে ঠাটেই
সংখ্যা লইয়া বিস্তর মত বিরোধ আছে। কেবল বলেন ঠাট
শব্দটি, কেহ বলেন বাহাটা আবার ষাণ্টী মতে বাহাণ্ডগতি।
ঠাট বিচার—

একটি প্রকার এই স্থানে মীমাংসা করা দরকার। এক
একটি ঠাটের অন্তর্গত বহুবিধ রাগরাগিনীর কথা আমরা
জানি, কিন্তু ঠাটের যে সব বিশিষ্ট লক্ষণ আছে তাহা কি
তখন ঠাটের অন্তর্গত সকল রাগরাগিনীতেই বিস্তারিত? ঠাটে
শব্দটি শব্দই থাকে, কোনও শব্দ বন্ধিত হয় না। প্রতি
ঠাটেই গতি আবোধী, অববোধী নয় এবং ঠাটে শব্দের
ক্রম শুদ্ধ হইবে না। যদি যেহি কোন রাগে কোন শব্দ
বন্ধিত হইয়াছে, তবে তাহাকে ঠাট বলিয়া ডিহিত
করি কিন্তু এখানে মালকোথকে আনন্দ বলি আশাবরী ঠাটের
অন্তর্গত, কিন্তু মালকোথ ও পা বন্ধিত শব্দ, তবে
উহা ঠাটে আসিলে কেনন করিয়া? আশাবরী ঠাটের শব্দ
বিভাগ নিয়ন্ত্রণ—

সা, বে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা

মালকোথের আবোধী শব্দ বিভাগ—

সা, গা, মা, ধা, নি, সা—

এই দুইটী ভুলনা কথিলে দেখা যায় :

(১) ঠাটেই বে ও পা, রাগ বন্ধিত হইয়াছে।

(২) ঠাটের বিকৃত পা, ধা, এবং নি রাগেও
বিকৃত বহিয়াছে। অতএব ঠাটের শুদ্ধ শব্দ রাগে
বন্ধিত হইলেও উল্লক্ষেত্রে একই বিকৃত শব্দের
অভিধা থাকায় মালকোথ রাগকে আশাবরী
ঠাটের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। এই উদাহরণ
হইতে এইরূপ বলা অদ্বন্দ্ব হইবে না যে, রাগ রাগিনীর
ঠাট বিভাগে বিকৃত শব্দের অভিধাই প্রধান সহায়। রাগ

বাদ্যযন্ত্রে দুই একটা শুদ্ধ অথবা বিকৃত স্বর যদি বজিত হয় তথাপি ঠাটের সহিত রাগ রাগিণীর স্বর বিভ্রাণে নোড়া মুট ঐক্য লক্ষ্য করিয়া রাগ রাগিণীর ঠাট নির্ণয় করা হয়।

দশটি ঠাটের স্বর বিভ্রাণ নিম্নের তালিকাধর প্রদর্শিত হইল।

১। কল্যাণ ঠাট	সা, রে, গা, ধা, পা, ধা, নি
২। বিলাবল ঠাট	সা, রে, গা, না, পা, ধা, নি
৩। ঝাঝাল ঠাট	সা, রে, গা, না, পা, ধা, নি
৪। ফাকী ঠাট	সা, রে, গা, না, পা, ধা, নি
৫। আশাবরী ঠাট	সা, রে, গা, না, পা, ধা, নি
৬। ভৈরবী ঠাট	সা, রে, গা, না, পা, ধা, নি
৭। ভৈরব ঠাট	সা, রে, গা, না, পা, ধা, নি
৮। পূরবী ঠাট	সা, রে, গা, না, পা, ধা, নি
৯। মারবা ঠাট	সা, রে, গা, না, পা, ধা, নি
১০। চৌকী ঠাট	সা, রে, গা, না, পা, ধা, নি

১। কল্যাণ ঠাট—না' তীব্র অস্ত্রান্ত স্বরগুলি শুদ্ধ—

কল্যাণ ঠাটের কয়েকটি রাগ রাগিণী—

শুদ্ধ কল্যাণ, কামোদ, কেদার, গৌড় সাং, ছায়াটা, ময়ং কল্যাণ, জাম কল্যাণ, সাহসী কল্যাণ, বেগাণ, মানজী ইমান, হাধীর, হিমাল, ভূপালী ইত্যাদি।

২। বিলাবল ঠাট—সব শুদ্ধ স্বর।

বিলাবল ঠাটের কয়েকটি রাগ রাগিণী :—

শুদ্ধ বিলাবল, দেশকার পাহাড়ী সত্বা, আলোগিয়া দুর্গ, দেবগিরি হংস ধানি, লঙ্কানাথ, নট বিলাবল, ললহর কেদার, নহা, বেগাণ হেমকল্যাণ, গুণকলী গুরু বিলাবল, শাবনী কল্যাণ।

৩। ঝাঝাল ঠাট—নি কোমল অস্ত্রান্ত স্বর শুদ্ধ।

ঝাঝাল ঠাটের কয়েকটি রাগ রাগিণী :—

ঝাঝাল, কলাবর্তী, গারা, গৌরব, কল্যাণ, তিলং, ময় ময়তী, কি'কোতী, তিলক কামোদ, দেশ, নারায়ণী, বাপেজী, ঝাঝাতী, দুর্গ।

৪। ফাকী ঠাট—গা ও নি কোমল, অস্ত্রান্ত স্বরগুলি শুদ্ধ।

ফাকী ঠাটের কয়েকটি রাগ রাগিণী :—

ফাকী, শানী, শানীজী, গৌড়মল্লার, নট মল্লার, মিকো-কি-মল্লার, মেঘ মল্লার, রামধানী মল্লার, শুদ্ধ মল্লার, পট মল্লারী, পিণ্ড, প্রবীণ কি বাহার, বারোয়া, বড় হংসপাং, রুমাবনী সাবল, মধ্যপাং সাবল, মিকোজী সাবল, শানান্ত মারল, শুদ্ধ সাং, বাপেজী, ভীম পলানী, মালভরী, সাহান, নায়েকী কানোড়া, মুহা কানোড়া, মুনগ্রাই কানোড়া, ধুপেনী কানোড়া, সিমুর, হংস কতিনী।

৫। আশাবরী ঠাট—গা, ধা, নি কোমল, অস্ত্রান্ত স্বরগুলি শুদ্ধ।

আশাবরী ঠাটের কতকগুলি রাগ রাগিণী—

আশাবরী, ভৌনপূরী, কৌশিক, নট, গাঝারী, হরবরী কানোড়া, বেবগাঝার কৌশী ভোড়ী, পিছ ভৈরবী, মালকোষ।

৬। ভৈরবী ঠাট—রে, গা, ধা, নি কোমল, অস্ত্রান্ত স্বরগুলি শুদ্ধ—

ভৈরবী ঠাটের কয়েকটি রাগ রাগিণী :—

ভৈরবী, আশাবরী, (কোমল রে, দুর্গ) বিলাবলানি, ভোড়ী, বদন্তমুখারী, ভূপাল ভোড়ী।

ভৈরব ঠাট—রে ও ধা কোমল, অস্ত্রান্ত স্বরগুলি শুদ্ধ—

ভৈরব ঠাটের কতকগুলি রাগ রাগিণী :—

ভৈরব, আদীর ভৈরব, মানন ভৈরব, কোশী ভৈরব, বাঝাল ভৈরব, শিবদত্ত ভৈরব, কালোজী, গুণকরী, রামকলী, ললিত পঙ্কম, বিভ্রাণ, ধোগিয়া, মেঘরজনী, মেঘরজনী, মেঘরজনী, গৌরী শাবেরী, প্রভাত, গুণকরী, মিনয়।

৮। পূরবী ঠাট :—রে ও ধা কোমল এবং না তীব্র, অস্ত্রান্ত স্বরগুলি শুদ্ধ।

পূরবী ঠাটের কয়েকটি রাগ রাগিণী :—

পূরবী, গৌরী, জয়ন্তী, চংকী, দীপক, পুরীয়া ধানজী, বদন্ত, জিবেদী, পবন, মানবী, বেবা, জী।

৯। মারবা ঠাট :—রে কোমল ও না তীব্র, অন্যান্য স্বরগুলি শুদ্ধ।

মারবা ঠাটের কতকগুলি রাগ রাগিণী :—

মারবা, ধেত, পুরীয়া, পুঠে কল্যাণ, ভল্লার, শাংগিরি, মালীসোবা, শোবিনী, বরাতী।

১০। তোড়ীঠাট—রেখা ও গা কোমল এবং যা
তীক্ষ্ণ, অন্যান্য বস্তুগুলি শুদ্ধ।

তোড়ী ঠাটের কয়েকটি, রাগ রাগিণী :-

তোড়ী গুর্জরী তোড়ী, মধুযন্ত্রী, মূলতানী।

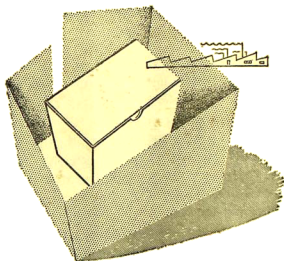
বর্ণ—

একই ঠাটের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাগ রাগিণীর মধ্যে
স্বরবিন্যাসে—একটি সানুজ পাওয়া যায় এই সানুজ

বা মিলনই রাগ রাগিণী মেল বন্ধনের কাবণ।
বিভিন্ন ঠাটের অথবা একই ঠাটে বিভিন্ন রাগ
রাগিণীর মধ্যে প্রকৃতিগত সানুজ লক্ষ্য কিরূপ সমীচ-
শাস্ত্রীগণ এক এক বর্ণ করনা করিয়াছেন। এইরূপে
অষ্টোদশ কানাড়া, ত্রয়োদশ তোড়ী বাঘল মন্ডার
নবমট ও নব সাত বর্ণ পরবর্তী যুগে কল্পিত হইয়াছে।
বর্ণভুক্ত রাগ রাগিণীর বিস্তৃত তালিকা নিম্নে দেওয়া
হইল :-

কানাড়া	তোড়ী	সানুজ	মন্ডার	নবমট
(১) স্বরযন্ত্রী—কানাড়া	(১) তোড়ী	(১) সানুজ	(১) মন্ডার	(১) নট
(২) নায়কী—কানাড়া	(২) দ্বৈত তোড়ী	(২) হৃদয়বানী সানুজ	(২) বিক্রান্ত	(২) ছাত্রানট
(৩) স্বরযন্ত্রী—কানাড়া	(৩) বাহাদুরী তোড়ী	(৩) মধ্যমায় "	(৩) মেঘমন্ডার	(৩) বাঘির নট
(৪) মুক্তিক—কানাড়া	(৪) গুর্জরী তোড়ী	(৪) সামন্ত "	(৪) গৌড় "	(৪) বেহাগ নট
(৫) হৃদয়বানী—কানাড়া	(৫) বরাটী তোড়ী	(৫) বিক্রান্ত	(৫) সুরধ্বনি "	(৫) বেলাবন নট
(৬) কে শিকী কানাড়া	(৬) হৃদয়বানী তোড়ী	(৬) বড়হংস "	(৬) মৌর্যাবানী "	(৬) নট নায়ক
(৭) সুরা কানাড়া	(৭) ভৈরবগুরী	(৭) লক্ষ্য স্বরন "	(৭) চর্চকী "	(৭) কেয়ার নট
(৮) সাধাবান	(৮) বিলাস বানী তোড়ী	(৮) গৌড় সানুজ	(৮) বাঘধ্বনি "	(৮) কামোদ নট
(৯) আত্মনা	(৯) লাক্ষ্মী তোড়ী	(৯) শুদ্ধ সানুজ	(৯) ধূম্রা "	(৯) মন্ডার নট
(১০) বাগেশ্বরী	(১০) লক্ষ্মী তোড়ী		(১০) বহির্বাণী "	
(১১) বাহার	(১১) গাছারী তোড়ী		(১১) নট "	
(১২) বেবসার	(১২) জুগাল তোড়ী		(১২) যোগ "	
(১৩) কাফী কানাড়া	(১৩) বিক্রান্তী তোড়ী			
(১৪) গায় কানাড়া				
(১৫) নায়কানি				
(১৬) ভ্রাম কানাড়া				
(১৭) মঙ্গল কানাড়া				
(১৮) টকা কানাড়া				

factory freshness preserved



with

★ **POLYBOARD**
★ **POLYKRAFT**

packaging

Acid, alkali and moisture resistant polythene-coated POLYBOARD and POLYKRAFT help to preserve the factory-freshness of your products, whether they be confectionery, tea, biscuits or chemicals.

These new, revolutionary packaging materials are several times stronger than ordinary board or paper and prevent damage to your products even when they are subjected to rough handling. And the eye-appeal of your products is enhanced considerably because of the glossy finish on POLYBOARD and POLYKRAFT.



**CHANGE TO
POLYBOARD POLYKRAFT
PACKAGING FOR INCREASED SALES**

ORIENT PAPER MILLS LTD., CALCUTTA.

মহামনীষী গ্যেটে

মনি বাগচি

ঊনবিংশ শতকের ইউরোপ আধুনিকতার পথে এখন পর্য্যবেশ করলো। তখনকার মন-নাহী সবাই মনেপ্রাণে আধুনিকতার দীক্ষিত। আজকের দিনের মতো সেদিনের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে প্রচলিত বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা প্রবল বিতৃষ্ণার ভাব বেধে ছিল। তারা সবাই চাইলো পুরাতন পৃথিবীর পরিবর্তে এমন একটা নতুন যুগ সৃষ্টি করতে যার মধ্যে তারা পরিপূর্ণ তৃষ্ণার সঙ্গে বাস করতে পারবে। জর্গ যুগ-২রা শব্দ আজ সেই শব্দজের প্রাণহীন অঙ্গশাশন তাদের কাছে শুধু অর্থহীন বলেই মনে হলো না, তারা চাইলো পুরাতন যুগের মতো সেগুলো বজায় করতে। ফরাসী দেশে এই আধুনিকতা বাধনোচিত রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশে, বিশেষ করে জার্মানিতে ট্র্যাডিশনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহটা ছিল মিছক ইন্টেলেকচুয়াল। সেদিন জার্মানীর মানুষ সে-বিপ্লব বেধে দিয়েছিল, সেই বিপ্লবের দৈন্তেরা তাদের আভিত্য পুরাতন আধুনিকতাকে একবার বর্জন করতে চাইলো। কিন্তু শুনাতন বাধনৈতিক আধুনিকতা পুরাতন রাষ্ট্রশাসন ব্যস্থা—এই দুইয়ের কোনটাই তারা পরিহার করল না। তাদের বিপ্লবটা ছিল মঙ্গলবর, তার অবলম্বন ছিল কলম, গুত্রবায়ী নয়। আভিত্য নৃশ্মলিত মানসিকতাকে তারা সূজিত ছিল। স্বাধীন চিন্তার নব অঙ্গশাশনকে জার্মানদের মনের অঙ্গবায়ী সরে পেল। এই বিপ্লবীদের বিশ্বাস ছিল একমাত্র চিন্তার ওপর, কার্যের ওপর নয়। এরাই ছিল ঊনবিংশ শতকের প্রাচীনপন্থী ব্যাডিক্যাল।

এই বুদ্ধিবায়ী বিপ্লবীদের নায়ক ছিলেন ফোখান্ উলক্কাৎ কন্স গ্যেটে। মাত্র ছ বছর বয়সে ইনি তৎপবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। সাত বছর বয়সের সময় তিনি মাতৃবর স্তায়বিচারের ওপর সন্ধিৎ হয়ে উঠলেন। আট বছর বয়সে তিনি একটি প্রবন্ধ রচনা করলেন এবং সেই প্রবন্ধে তিনি পৌত্তলিক ও ক্রিষ্টানদের

ধর্মবক্তের তুলনা করেন। এগার বছর বয়সে তিনি সাতটি ভাব্যত্র একখনো বিশ্বজনীন উপক্কাৎ রচনা করেন। ষার বছর বয়সে তিনি একটি বৈবধে জরলাত করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি সাংঘাতিক প্রেম পেড়েন—জীবনে সেই তাঁর প্রথম প্রেম; আর শেষবার তিনি প্রেম পেড়েন যখন তাঁর বয়স চুয়াত্তর বছর। বিদ্যায়ী বছর বয়সে তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'ফাউস্ট'-এর দ্বিতীয় বক্ত লিখে শেষ করেন।

১৭৮৯ জুলাইয়ের ২৮শে আগষ্ট, সূর্য যখন মধ্যাহ্ন আকাশে, ঠিক সেই সময় গ্যেটের জন্ম হয়। ফরাসী স্বাধুনিক তৎপবনের মত গ্যেটেও প্রায় অর্ধমৃত ভাবে জন্ম গ্রহণ করেন; কিন্তু তৎপবনের ভাগ্যে যা ঘটেমি গ্যেটের ভাগ্যে তাই ঘটেছিল—স্বাভাভাভল সূর্য্য পদমাতৃ দিয়ে বিলম্বা গ্যেটকে পৃথিবীতে পাটিয়েছিলেন। তাঁর সূর্য্য তিরাশী বছরে জীবনে তিনি মাত্র তিনবার গুস্তুর ভাবে অসুস্থ হয়েছিলেন। একটি সূর্য্যিত খৌশমকান্তি ঘেহের আধাবে একটি পরিপূর্ণ মন—এই ছিলেন গ্যেটে।

আজকের দিনে গ্যেটকে ঠিক মত বুঝতে হলে, সকলের আগে হিট্টোবায়ী বৃগের শিলাস্ত শক্তা ও দারদার বাইবে এমন উকৎ দীর্ঘ করতে হবে। ইউরোপের ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হলেন গ্যেটে। কার্গাইল বলেছেন যে, পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহালে গ্যেটের মতো একটি প্রতিভার আবির্ভাব কতিং ঘটে থাকে। গ্যেটের সাগিত্যিক প্রতিভার একমাত্র উত্তরা-বিকারী টমাস ম্যান তাঁর সূত্রিত "নাথত গ্যেটে" (Permanent Goethe) বইতে লিখেছেন: "Goethe was alive at every pore of his skin and received ever impression in a sort of undistracted leisure, which makes the movement of his mental machinery one of the most extra-ordinary exhibitions which this

planet can never have witnessed" এবং এই উক্তি থেকেই গোটার প্রতিভার মূল স্রষ্টি সহজেই ধরা যায়। ইতালির দার্শনিকশ্রেষ্ঠ জোসেফে পলেন—গোটে একটি প্ৰমোদৰ্শ প্রতিভা—"an amazing genius"—কথাটা যে অত্যুক্তি নয়, গোটার পাঠকমাত্রেই সেটা বুঝবেন। গোটার প্রতিভার চেয়ে বড় দিগ্গ তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তার চেয়েও বড় ছিল তাঁর জীবন। মহাকাব্যের পরিমাণ সে বিরাট, বর্ষাবল্ল, ঘটনাবল্ল জীবনের প্রতিটি অধ্যায় বোকাপামান। স্বয়ং বিধাতাও বোধ হয় এমন একটি সমগ্র মানুষের (সিওনার্ণো বা ভিকি ও বক্সেনাথ নামে) কল্পনা করেন নি।

গোটে সর্বজনীন কবি এবং সর্বকালের কবি—গোটে সম্পর্কে এই ধারণা যেমন সংকীর্ণ তেমনি হাস্যকর। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর সৃষ্টিকে পৃথক না ভেবে যদি যুগপৎ আলোচনা করা যায়, তাহলে গোটে প্রতিভার উপাদান-বৈচিত্র্যে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর সুবীৰ্য জীবনের বিভিন্ন পর্বের উপাদানগুলি যদি আমরা সত্ত্বের আবিষ্কার কবি, তবুই আমরা সন্দেহভাবে গোটেকে বুঝতে পারবো—বুঝতে পারবো মানুষ গোটেকে, দৌলতের পূজারী গোটেকে, শিল্পী গোটেকে এবং ঐতিহাসিক গোটেকে। যে বিপুল ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে তিনি অষ্টাবধ শতকের ইউরোপের চিন্তা-জগতের স্বীকৃত অবিচার কয়েকটিকে, সেই অভিজ্ঞতার নিরিখেই উপলব্ধি করতে যেন গোটার সাহিত্য-সৃষ্টি। মানুষ বা শিল্পী হিসেবে সেম্পীরর মার্জাজেন, বেশিবে বা হাতের পাশে গোটে অবশ্য খুব উজ্জ্বল নয়। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি বিষয়কর। এখন সর্বভাষা প্রতিভা নিয়ে ইউরোপের সাহিত্যে আর বিতর কোন শিল্পীর আবির্ভাব হয় নি। একমাত্র বক্সেনাথের সঙ্গে তাঁর তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় এই দিক দিয়ে। কবি গোটে, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক গোটে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গোটে, সিপিকার গোটে—মলাপী গোটে এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রনেতা গোটে, একাধারে এই যে তাঁর অন্তর্ভুক্তি সত্তা, এর প্রত্যেকটা ভাবেই তিনি নিবৃত্ত, অদ্বন্দ্ব এবং সম্পূর্ণ। তাঁর আত্ম-জীবনী ("Truth and Poetry from My Own Life"—আত্মজীবনী সাহিত্য বা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে

বীজত) পৃষ্ঠায় গোটে তাঁর এই বহুভঙ্গি জীবনের ইতিহাস সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। গোটে এক জীবন কি না ছিলেন এবং কত বিষয়েই না একজন বিদ্বৎ পণ্ডিত ছিলেন। শিল্পের চেয়ে জীবনের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং আকর্ষণ ছিল তীব্র ও আত্মস্থিক। জীবনকে যাব বিয়ে বা বর্জন করে কাব্যের নিম্নলোকে গোটে বাণ করেন নি কোনও দিন।

গোটে মানুষী সংস্কৃতিতে পূর্ণ প্রতীক আর সেই সংস্কৃতির পূর্ণতা যেমন তেমনি তাঁর পরিণতি। এককথার বলা যেতে পারে যে গোটে মানুষের সেই চেতনা যার মধ্যে আছে ক্রমগতি ও ক্রমবৃদ্ধি। অকৃত্রিম জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, অকৃত্রিম চলবার আকাঙ্ক্ষা—এই হলো গোটের মানস-প্রতিভা। তাঁর সৃষ্টি কাটোই সেই প্রতিভারই পরিণত রূপ। এই আর্দ্র মনোবীর মধ্যে আরো লক্ষ্য করি একটা অনির্বাণ আশ্রয়, নিত্যসহিত্তি অগ্নি। তাঁর প্রতিভার শিবহ্রদে থেকে যে মানস অংশে বিজুড়িত তার মধ্যে আছে প্রবীণ বুদ্ধি আর পরিচ্ছন্ন চিন্তা। গোটে-প্রতিভার প্রথম ও প্রধান কথা হলো বুদ্ধি। এমন বুদ্ধি প্রাচুর্য নিয়ে ইউরোপ আর বিতর কোন সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয় নি। বুদ্ধি-বীণ সেই জীবনে তাই প্রাচুর্য পেয়েছিল সমাল ও রাষ্ট্র এবং এই সমাল ও রাষ্ট্রের সংস্কার সাধনে তাঁর জীবনের অনেকদিন ব্যয়িত হয়েছে। মানুষ এবং সমাল সম্পর্কে তাঁর বুদ্ধি ও চিন্তা এত বদ্ধ ছিল যে পুণঃপুনঃ প্রথা এবং প্রাণবীর অশ্রুশাসনকে তিনি বিগঠিত হতে আশঙ্কিত করেছেন মানুষের জীবনের চারদিকের পরিবেশকে সুস্থ এবং প্রাণিযুক্ত করার মতং সংকল্পে। আগে মানুষ, তার সুস্থ এবং সুস্থর জীবন এবং সেই জীবনের উপর তার নিবন্ধন অবিচার—এই গোটে। তাঁর জীবন-বর্ণনের শার কথাই হলো—“মানুষকে সর্বাঙ্গ দিয়ে, হেঁহের আবেগ দিয়ে প্রকৃতিকে আগলন করতে হবে, নতুবা মানুষের পূর্ণতা লাভ হবে না। মানুষের ভোগান্তনেই তেঁর ক্রম গ্রহণ করে নৃত্য হয়ে প্রকাশ পায় তার স্বভাবের সামর্থ্য ও সার্থকতা। সম্যক ভোগ ছাড়া জীবন নেই, জীবনের সঙ্গে ব্যাহিত নয় যে চেতনা তা শুধু পত্রের মত, বড় ছোর পুঁথির পাতার মত।”

"Grey, my dear friend, is all theory,
And green the golden tree of life"

(Faust)

বলেছি, মানুষী প্রতিভার সমগ্রতার প্রতীক গোটে।
তিনি মানুষের উল্লসিত আশা আকাজক অশ্রুধার
আবেগ। কিন্তু গোটের মধ্যে একটি তিনিই বিংশ ও
—মানুষীতাবের অতিক্রমণ। মানুষকে নিয়ে আছে
নিষ্কৃতির যে একটা পাশ, মানুষ তাকে কেটে পার হয়ে
বেতে পারে অর্থাৎ "নিষ্কৃতি লভিতে হবে অমৃত্যু পৌরুষে"
এমন কথা গোটে বলতে পারেন নি কিন্তু তাঁর মৌন্যনার
মধ্যে এই সত্য কখনও বলা হয়নি। মনঃচেতনার
চিন্তাভাবের পরকথা প্রকাশন করেই তাঁর প্রতিভা শেষ
হয়েছে। গোটে দিয়েছেন মানুষের চির-অনুভূতির ইতিহাস।
মানুষ চার আলো, শক্তি, আনন্দ। মানুষ চার অনন্তকে
অধিকার করেছে। কিন্তু কোথায় কি বন্ধন হবে এই
চিরদীপ্ত আশ্রয় চরিতার্থতা, পতিপূর্ণতা ?—তার সন্ধান
গোটে দিতে পারেন নি। বুদ্ধি পথে সাধারণ মানুষের
বত্বানি প্রদার বা পবিত্রীকৃতি হতে পারে, মানবীয় মানসিক
চেতনাকে বিয়ে তাকে বরে বত্বদূর বহনিকে এগিয়ে চলা
যায় এবং সেভাবে যা কিছু লভ্য কাম্য অধিগত করা যায়,
গোটে দিয়েছেন তাঁর চিত্র। কিন্তু সাধারণ জ্ঞান বা
তর্কবুদ্ধির অতীত যে জীবন, সৌন্দর্যের সন্ধান তিনি
দিতে পারেন নি। তাই গোটে-প্রতিভা ব্যর্থ নয়—
এ-প্রতিভাও ভগবানের বিকৃতি এবং মানবদস্যতার
বিকাসের ক্ষেত্রে এই রকম একটি প্রতিভার প্রয়োজন
ছিল।

কিন্তু গোটের জীবনেও ট্র্যাজেডি আছে। সুদীর্ঘ আত্ম
এবং দীর্ঘ ও সুস্থ সাহিত্যিক জীবন যথেষ্ট জাতির
নিবন্ধিত সমাধার লাভ তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। তাঁর বহু
শিল্পকে তাঁর বেশবানী মাঝার ভুলে নিয়েছিল। শিল্পের
অনগ্রন্থতার একাংশও গোটের ভাগ্যে ঘোটেনি। গোটের
মৃত্যুর পর এক শতাব্দীর উপর কেটে গেছে। এখনও

তিনি অনগ্রন্থ হতে পারেন না। কিন্তু যশ তিনি
আজীবন পেয়েছিলেন স্বদেশ-বিদেশে—নব দেশে।
নেপোলিয়ন তাঁকে দেখে বলেছিলেন, একটা মানুষ ঘটে।
এই যশ তাঁকে মঙ্গলদায়ক পর্বতের গ্রীক দেবতাদের সঙ্গে
আমের করেছে। আরেকোনা কার্যনি সাহিত্যিক
এম্যানুয়াল লাভ করেন নি। দায়ে ও সেক্সপীয়ারের
পরকথা ও টমস্টের পূর্ববর্তী আরেকোনা ইউরোপীয়
সাহিত্যিক তাঁর সঙ্গে একসারিতে বসবার যোগ্য নন।
ইউরোপের বাইরে এককালে একমাত্র স্বীকৃতি লাভ
হুলা। হাজার বছর সারা পৃথিবীতে যে পাঠকন অমর
সাহিত্যিক পৃথিবীতে অন্তর্গত হয়েছেন গোটে তাঁদের
মধ্যস্থি। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'কাউন্ট', শ্রেষ্ঠ উপজান
'ভিল্‌হেল্ম মাইষ্টার' ও অগ্র প্রেমের কথিত। বিশ্বসাহিত্যে
চিরস্বর্গীয়।

গোটে চিরস্বর্গীয় হয়ে আছেন তাঁর জীবন বর্ণনের
ভিত্তি। মানুষের প্রতি তিনি অত্যন্ত প্রাণীল। মানুষকে
তিনি দেখেছিলেন বাইরে থেকে, তেতর থেকে। জীবনকে
তিনি দেখেছিলেন মানুষের চোখে, প্রকৃতির চোখে, স্বর্গতার
চোখে। তাঁর যশ উচ্চ শ্রেণীতে, কিন্তু বিবাহ নির শ্রেণীতে।
যশ অভিজাত হয়েও জনপণের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ
যোগাযোগ। স্বয়ং ছিল আন্তিগ্রেম, তাই আন্তিগ্রেম
তিনি মানতেন না। মানুষে মানুষে হিন্দায়ে একধনের
ভিত্তি ও তাঁর মনে তাই পারিনি। কি ব্যক্তিগত জীবন, কি
সমষ্টিগত জীবন, গোটে ছিলেন অস্বস্তিক। বহু অত্যাচার
তাঁর জীবনশ্রায় ঘটেছে এবং তাই অন্তে তিনি যথেষ্ট বেদনা-
বোধও করেছেন, তবু মানুষকে ভুগা করেন নি তার ক্ষেত্রে।
মানবিকতার এক ব্যাপক বৃষ্টি দিয়েই গোটে তাই লাভ
করেছেন ঐতিহাসিক মর্যাদা। তাঁর মানবিকতার মধ্যে
এমন স্পর্শ আছে যা যাকে মানুষের বৃষ্টি তেমনি ভাবে
জ্যাকুই হয়নি। তা যদি হতো, তাহলে একালের সভ্যতার
সংকটে গোটের মানবিকতা মানুষের পথ আশ্রয়ের যোগ্য
বলে বিবেচিত হতে পারতো।

আর্থিক প্রসঙ্গ

শ্রীমদ্র প্রগতি ভট্টাচার্য

॥ রি-ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ॥

ভারতীয় শিল্পে এতদিন পর্যন্ত ন্যতিরীর্ণ মেয়াদে অর্থ বিনিয়োগের কোন ব্যবস্থা ছিল না। শিল্পে দীর্ঘ মেয়াদে ও বর মেয়াদে ঋণ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান খোঁজে আছে, কিন্তু ন্যতিরীর্ণ মেয়াদের ঋণ দেওয়ার মত কোন প্রতিষ্ঠান এতদিন এদেশে ছিলনা। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ মেয়াদে, ও তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ বর মেয়াদে শিল্পকে ঋণ দেয়। অবশ্য ব্যাঙ্কের এই বরকাপীন ঋণকে ক্রমাগত রিনিউ করে তা থেকে অনেক সময় ন্যতি-দীর্ণ ঋণের সুবিধা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক কখনও খোলাখুলিভাবে ন্যতিরীর্ণ মেয়াদের ঋণ দিলে তার অর্থকে আটকিয়ে রাখবার কুঁকি নিতে পারে না। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য অল্প কিছুদিন আগে 'রি-ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ফর ইণ্ডাস্ট্রিজ (প্রাইভেট)' নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। এই সংস্থা মাঝারি শিল্পকে মধ্য মেয়াদে ঋণ দেবার সুযোগ করে দেবে।

এই কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন ২৫ কোটি টাকা। প্রথমে এর বিলিভৃত মূলধন হবে ১২.৫ কোটি টাকা এবং তা যোগাবে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, জীবন বীমা কর্পোরেশনও পনেরটি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কগুলির নাম ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, পেন্ড্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, পাঞ্জাব প্রাশনাল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব বরোদা, প্রাশনাল ওভারসীস এন্ড গ্রীণলেস ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, মার্কাইটাল ব্যাঙ্ক, পয়েন্টু ব্যাঙ্ক, এম্বাহাব ব্যাঙ্ক, সার্ভিস ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বেসকন নামাজী ব্যাংকিং কোঃ ও ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব হায়দরাবাদ। ঐ মূলধনের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অংশ হবে ৫ কোটি টাকা, জীবন বীমা কর্পোরেশনের হবে ২.৫ কোটি টাকা, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ২.৫ কোটি টাকা, আর বাকি সমস্ত ব্যাঙ্কগুলির অংশ হবে ২.৫ কোটি টাকা। এই মূলধনের সঙ্গে আরও ২৬ কোটি টাকা যোগ হবে আমেরিকান কাউন্টার পার্ট তহবিল থেকে। ১৯৪৬ সালে ভারত সরকার ও আমেরিকা সরকারের মধ্যে কৃষি ঋণের যে চুক্তি হয় তাতে আমেরিকা ভারত তহবিলের থেকে ২৬ কোটি টাকা শিল্প পুনর্নির্মাণ করতে বলে স্বীকার করেছিল। কাজেই রি-ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের হাতে মোট ৩৮.৫ কোটি টাকার মংস্থান থাকবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর, জীবনবীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, ষ্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সমিষ্ট ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের নিয়ে (মোট ৭ জন) এই রি-ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের বোর্ড গঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর হলেন চেয়ারম্যান।

মাঝারি শিল্পক ন্যতিরীর্ণ মেয়াদে ঋণ দেবার পদ্ধতি একটু অজ্ঞেয়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত এই রি-ফাইন্যান্স কর্পোরেশন মোকাস্তরি শিল্পকে ঋণ দেবে না। কর্পোরেশনের প্রয়োজন মত ভারত সরকার তাকে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে বিনী করবার জন্য সুখে টাকা

অণু ধোবে এবং আমেরিকান কাউন্টার পাট তহবিল থেকে বহুসংখ্যক ঐ টাকা তুলে নেবে। ব্যাকসমূহ আবার তাদের নিজেদের তহবিল থেকে শিল্পকে অণু দিয়ে ঐ পরিমাণ টাকা কর্পোরেশনের কাছ থেকে তুলে নেবে। এতে ব্যাকসমূহ শিল্পের অণু গ্রহণের যোগ্যতা সম্পর্কে স্ক্রু'কি ও হার্ডিও মিডে বাধ্য হবে। ঐ ৩৮-এ কোটি টাকা, ব্যাকসমূহের মধ্যে একটা বরাদ্দ করে দেওয়া হবে। এই বরাদ্দের পরিমাণ এখনও ঘোষণা করা হয়নি, তবে ব্যাকসমূহের আয়তনের উপর নির্ভর কোরেই এই বরাদ্দ করা হবে বলে অনুমান করা যায়। ব্যাকসমূহের প্রধানতঃ দ্বিতীয় পুরুষাবিকার পরিকল্পনার এবং পরবর্তী পরিকল্পনার অন্তর্গত শিল্পের উৎপাদন হ্রাসের অণু অণু ধোবে। কিন্তু এই অণু কেবলমাত্র সেই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানই পেতে পারবে যাদের মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল (কব কিংবা অস্বল্পের অণু সংরক্ষিত তহবিল বাফে) একত্রে ২-এ কোটি টাকার বেশী নয়। কোন ক্ষেত্রেই অণুর পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকার বেশী হতে পারবে না এবং অণুর মেয়াদ নির পক্ষে তিন বছর ও উর্দ্ধপক্ষে সাত বছরও বেশী হতে পারবে না।

ব্যাক কত দূর জুড়ে শিল্পসমূহকে অণু ধোবে এবং কর্পোরেশনেরই বা ব্যাকসমূহকে কত দূর জুড়ে অণু ধোবে তা এখনও ঠিক হয়নি। আমেরিকান কাউন্টার পাট তহবিল থেকে যে টাকা কর্পোরেশন সরকারের মাধ্যমে অণু তরবে তার উপর তাকে অণু দিতে হবে। কাজেই ব্যাকসমূহকে যে দূর জুড়ে অণু ধোয়া হবে তা থেকে কর্পোরেশনের কিছু লাভ থাকে প্রয়োজন। অপর পক্ষে শত এক বছরের টাকার বাজারের অবস্থার বিবেচনা করে বেশতে হবে। অমার উপর জুড়ের দূর অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ার ও ব্যাকসমূহের উপর অণু সংক্রান্ত কড়াকড়ি ব্যবস্থা চালিয়ে যেওয়ার তাড়ের লাভের পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছে। নানির্দোষ নোয়াবের অণু থেকে তাড়ের লাভ তাড়ের অত্যন্ত অণুর লাভ থেকে কম হওয়া বহুত উচিত নয়। তবে বেশের বহুতর স্বার্থের খাতিরে এই নূতন প্রচেষ্টাটিকে কেবলমাত্র লাভের দিক থেকে বিবেচনা করা কার্যকর উচিত হবে না।

॥ ১৯৫৭-৫৮ সালে কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন ॥

কোম্পানী আইন শাসন অধিদপ্তর থেকে মন্ত্রিত ১৯৫৭-৫৮ সালের কোম্পানী রেজিস্ট্রেশনের একটি পরি-সংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে। এই বছর ২৬১টি কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন হয়। এদের মোট অধুমোহিত মূলধন ১০০ কোটি টাকা। ১৯৫৬-৫৭ সালে নূতন কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল ৮৪৮টি এবং তাড়ের অধুমোহিত মূলধন ছিল ২১১ কোটি টাকা। ১৯৫৭-৫৮ সালের রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানীগুলির মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগের অধুমোহিত মূলধন ১ লক্ষ টাকার নিচে এবং শতকরা ৪০ ভাগের অধুমোহিত মূলধন ১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে। অল্পকথায় ১৯৫৭-৫৮ সালের ২৬১টি কোম্পানীর মধ্যে ৬০৫টি কোম্পানীর অধুমোহিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে। এই দুইটি বিভাগের মধ্যে ৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা মূলধনের বিভাগটিকে যোগ দিলে শতকরা ৮৭ ভাগ হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে এর পরিমাণ ছিল ৮৩ ভাগ। ১০ লক্ষ টাকার বেশী মূলধন নিয়ে রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানীর মধ্যে ১৯৫৭-৫৮ সালে হয়েছে ১২৭। তার মধ্যে প্রাইভেট ৯৬ ও পাব্লিক ৩১। ১৯৫৬-৫৭ সালে এর সংখ্যা ছিল (১১০ প্রাইভেট ২৫ ও পাব্লিক ৪৫) ১৯৫৭-৫৮ সালে ২৮টি বড় কোম্পানী রেজিস্ট্রী হয়েছে। এদের মোট অধুমোহিত মূলধন ৬৬ কোটি টাকা। ১৯৫৬-৫৭ সালে বড় কোম্পানীর মধ্যে একই ছিল কিন্তু তাড়ের অধুমোহিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৭০.৫ কোটি টাকা।

১৯৫৭-৫৮ সালে রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানীর মধ্যে ১৮টি সরকারী মহলে। এদের মোট অধুমোহিত মূলধন ২৬১টি কোম্পানীর শতকরা ৮-এ ভাগ। এই কোম্পানীগুলির নাম, এক্সপোর্ট ডিক্লু ইনফার্মেশন কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড, তাম্রনাথ ইনষ্ট্রুমেন্টস প্রাইভেট লিঃ, মাইনোর ফ্রুট প্রোডাক্টস লিঃ, মনুহন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিঃ, কটক আরবণ এণ্ড সীল প্রোডাক্টস প্রাঃ লিঃ, কলিক সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রাঃ লিঃ, স্পার্ক হার্ডফ্যাক্টারি ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, কোমার্ক প্রেসিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, উদ্ভিদা বোট বিল্ডার প্রাঃ লিঃ, উৎকল ফ্রুট প্রোডাক্টস প্রাঃ লিঃ, হাউসকো ফ্রুট প্রোডাক্টস প্রাঃ লিঃ, কলিক

কলিঙ্গ স্ট্রট প্রোডাক্টস্ প্রাঃ লিঃ, কলিঙ্গ কাউন্সরী প্রাঃ লিঃ, কলিঙ্গ অ্যান্ড ওয়ার্কস্ প্রাঃ লিঃ, উড়িষ্যা কাউন্সরী কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, উড়িষ্যা ইলেকট্রিক্যাল ম্যাচুকাইজারি প্রাঃ লিঃ, বেঙ্গল সাইক্ল্ প্রাঃ লিঃ এবং বরবটি স্ট্রট প্রোডাক্টস্ প্রাঃ লিঃ।

১৯৪৭-৪৮ সালের রেজিষ্ট্রিকৃত কোম্পানীগুলির মধ্যে ১১টি পাব্লিক কোম্পানী ও ৪টি প্রাইভেট কোম্পানীর পরিচালনায় আছেন ম্যানেজিং এজেন্ট একটি প্রাইভেট কোম্পানীতে আছেন ম্যানেজার, একটি প্রাইভেট কোম্পানীতে সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ এবং ২১টি প্রাইভেট ও ১৪টি পাব্লিক কোম্পানীতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর্স্। আর ৬৭৮টি প্রাইভেট ও ৩৯টি পাব্লিক কোম্পানী পরিচালনায় আছেন কেবলমাত্র ডিরেক্টরগণ।

বিগত বৎসরের তুলনায় ১৯৪৭-৪৮ সাল নূতন কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশনের দিক থেকে বিশেষ উন্নতি করেছে তা বলা যায় না। সংখ্যার বেশী কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন হলও, তাহের মূলধন বিগত বৎসরের তুলনায় অনেক কম। 'পেড আপ' মূলধন ও গত বৎসর মাত্র ২৩ কোটি টাকা বেড়েছে, অথচ তার পূর্ববর্তী ৩ বছরে নূতন 'পেড আপ' মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১৪ কোটি টাকা অর্থাৎ গড়ে ৩৮ কোটি টাকা। বর্তমানে সমস্ত কোম্পানীর মোট 'পেড আপ' মূলধনের পরিমাণ ১১০৭ কোটি টাকা।

৪. জমির রাজস্ব ৪

জমিকে অন্তরীক্ষিত রাজস্ব আদায় করবার একটি ভাল উৎস বলে ক্রমে ক্রমে রাজ্য সরকারসমূহ গ্রহণ করতে মুরু করেছেন। উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনাগুলিকে কার্যকরী করবার জন্যই এই অন্তরীক্ষিত রাজস্বের প্রয়োজন এবং এই পরিকল্পনাগুলির অধিকাংশই পল্লী অঞ্চলের লোকস্বের উপকারের জন্য। গত দু বৎসর রাজ্য সরকার গৃহস্থের করনীতিতে জমি ও জমির উৎপন্ন আয়ের উপর নানাবিধ করারোপ করা হয়েছে। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৪৮-৪৯

সালের বাজেটের তুলনা করলে দেখা যাবে যে পশ্চিম-বঙ্গ ও অঙ্গ প্রদেশ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত রাজ্যসরকারের বিচিত্র কর থেকে জমির রাজস্ব শতকরা ১৮-৮০ ভাগ বেড়ে গিয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ কৃষি আয়কর ও সেচ কর ১৪৪ ও ১৪২ ভাগ থেকে বেড়ে যথাক্রমে ১৪০ ও ২১২ ভাগ হয়েছে।

১৯৪৭-৪৮ সালে ভূদা, বাঘম ও লসার উপর কর আরোপ করা হয়েছিল এবং পান্ডুবের সেপসু এলাকার জমির 'সার-চার্জের' দফে আর একটি বিশেষ 'সার-চার্জ' কৃষি আয়কর হিসাবে আরোপ করা হয়। রাজস্থানে কৃষি আয়কর, সেচকর ও উন্নয়ন কর আরোপ করা হয়। উত্তর প্রদেশে কিছু সংশোধন করে কৃষি আয়কর বাড়ানো হয়। বিহারে জমির উপর শিকারকর ও উন্নয়ন কর আরোপ করা হয় এবং কৃষি সম্পদের উপর করারোপ ও কৃষির আয়ের উপর অন্তরীক্ষিত 'মুগাব ট্যাক্স' আরোপ করা হয়।

১৯৪৮-৪৯ সালেও কৃষির উপর করারোপের নীতির উপর কোনও বৈষ্ণব হয়েছে। চাষ, পম, ভাল এজুতি খাজ আয়ের উপর বিক্রয় কর চাপানো হয়েছে, রাজস্থানে সেচ কবের পুনর্বিজ্ঞাপন করাও হার বাড়ানো হয়েছে, মধ্য-প্রদেশে উন্নয়ন কর বদানো হয়েছে, মহীশূরে উন্নয়ন কর ও বলকর আরোপ করা হয়েছে, উড়িষ্যায় যে সমস্ত জমি কারখানার কাছে অবস্থিত, তার বজ্র কর থেকে মুক্ত ছিল তাহের উপর করারোপ করা হয়েছে এবং মাদ্রাজে সমস্ত জমির উপর কৃষি আয়কর আরোপ করা হয়েছে।

কোন কোন রাজ্যে দেখানো কোন নূতন করারোপ করা হয়নি, সেখানেও জমির সাধারণ রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৪৮-৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ ও অঙ্গ প্রদেশে এই বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে ৪৬ লক্ষ ও ৭৬ লক্ষ টাকা হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

পুস্তক পরিচয়

সমিতি :—ঐশ্বর্য তট্টাচার্য। ১৭এ মনোহরপুর
রোড, কলিকাতা ২৬ হইতে ঐশ্বর্যমার হস্ত কর্তৃক
প্রকাশিত। দ্বিতীয় ১২।

সাহিত্যের নানা রূপ, নানা রীতি। কোথাও তাকে
এক পলকে ডিনে নেওয়া যায়, কোথাও সময় লাগে।
আধুনিক বাংলা সাহিত্য বহু নব নব পদাঙ্কার পথে চলেছে।
নূতন স্বাদ এনে দেওয়া কোন কোন বস্তুচিত্তে অতিপ্রায়।
সে স্বাদ পেতে হলে পাঠককেও প্রস্তুত হতে হবে, স্টো
করতে হবে।

সময়বান্ধু মননশীল লেখক এবং আগ্রহশীল পাঠক।
উভয়ে রচনাও বহুবান্ধী—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ। প্রায় সব
রচনাতেই তাঁর অধ্যয়ন ও নিঃস্বপ্ন চিন্তার ছাপ পড়েছে।

আলোচ্য কবিতাগুলি অনায়াসযোগ্য নয়। কিন্তু পাঠক
হয় করলে বসান্ধারে বসিত হবেন না, লক্ষ্য করবেন,
আপন সম্বন্ধে কবি উপলব্ধি করেছেন বিশাল ভাবলোকে ;
তাই কালান্তিক্রমী ইতিহাসের ব্যাঘাত তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচার ;
অবশ্য যে ভূমি, যে পরিবেশ তাঁর মানস জীবনের নির্মাণ
তাকে উপেক্ষা করেন নি,—ত্রিপুরা ঐক্যের স্বপ্ন এবং
বর্তমান কালের অভিজ্ঞতা কবিতার প্রেরণা ছুঁয়েছে।
মানবতিহাসের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত, প্রকৃতির রূপ রূপান্তর তাঁর
কল্পনায় ব্যাঘাত যে ভাবতরঙ্গ তুলেছে তাইই ধর্মি পাই
কবিতাগুলিতে। তাই গুঢ়স্বাদ, তাই প্রকাশ একটু

অস্পষ্ট মনে হয়, কতকটা যেন সাত্ত্বিক। ব্যাঘাত মর্মে
প্রবেশ করবেন। তাঁরা মানুষের সম্মান পাবেন।

মুদ্রণ : বৈদ্যাসিক কবিতাপত্র। বটবর্ষ, প্রথম সংখ্যা,
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫। দম্পাটক, প্রকাশক : সময়
চক্রবর্তী। ২০.১ চক্রবেড়ে বোড় সাউথ, কলিকাতা ২৫।
প্রতি সংখ্যা পঞ্চাশ নম্বর পর্যন্ত। বার্ষিক তিন টাকা, পঞ্চাশ
নম্বর পর্যন্ত।

কবিতাপত্র ‘নবু’ ছ’ বছর চলছে—সামান্ত কথা নয়।
অবশ্য মাঝে মাঝে তাকে ধমকে গাঁড়িতে হয়েছে, কিন্তু সে
ধামেনি। উদ্বেগভাষ্যের মনোবল এবং নিষ্ঠাই একে
সচল রেখেছে।

বর্তমান সংখ্যায় যে-ক’টি কবিতা বেরিয়েছে তা থেকে
নতুন কবিতার সাধনা ও স্বপ্নের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা
সবাই অবোধ বা দুর্বোধ ছড়া লেখেন না, তাও প্রত্যক্ষ
করা যায়। রামলক্ষ্মী দেবীর কবিতা দু’টি আধুনিক
জীবনের স্বপ্নের ভাব-চিত্র। রেহাকর তট্টাচার্য ডাইলন
টমাসের কবিতার সাবলীল অনুবাদ করেছেন। যুগ্ম
জগৎ সাক্ষ্যের কবিতার ভাবানুবাদও উল্লেখযোগ্য। যেই
বিবেশী কাব্যের বিভিন্ন গাথার সঙ্গে যে এ ছেঁব যোগ আছে,
এটা আশার কথা, কেননা সমগ্র সমাজী মন না থাকলে
কবির কল্পনা অনেক সময়ে বৈচিত্র্যহীন সংকীর্ণ গভীর
হয়ে পড়ে।

—বি।



॥ পরলা আঘাত ॥

“আঘাত প্রথম বিবশে” কবি কালিদাস-কবিত্ত দেবদূত বিরহী শঙ্কর বেদনার বাস্তি বহন করে' নিয়েছিল অলপার পানে। নূতন বর্ধ-সমাগমের দিন বলে' দিনটি প্রসিদ্ধ। কিন্তু এবারে আঘাতের প্রথম দিন শ্রাম সমারোহ নিয়ে আসেনি, বহতাপ নিয়েই এসেছিল।

এবার ঐম বত কাঁপছারী ও ক্লেশকর হয়ে থেথা দিয়েছিল, নিকট অতীতে তেমন দিয়েছিল বলে মনে পড়েনা। মিথ্যে প্রোয়াকো বহু লোকের নৃত্য বহুকে, বাংলা-বেশেও কোথাও কোথাও লোক মাথা দিয়েছে। প্রকৃতি-রাজ্যে পরিবর্তন ঘটছে, বেশের আবহাওয়া ক্রমশঃ বদলাচ্ছে নানাভাবে তার আভাস পাচ্ছি।

সম্রাতি বোম্বাইয়ের অবিশ্রান্ত বর্ধার পথবাট ভুবে গিয়েছে, মাদরাহন বহু, অনেক বাড়ীতে ঘল ঢুকেছে, পাঁচজন লোক অলে ভুবে মারা গিয়েছে। কলকাতার তাপ কমেছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামছে। কোন কোন রাজ্যে এখনও বর্ধার বেথা নেই, প্রোমের প্রকৃত চলছে।

॥ দেশবন্ধু ও প্রকুরচন্দ্র ॥

পরলা আঘাতের সঙ্গে আমাদের ছ'জন মহাপুরুষের চিত্র-বিহার-স্বত্ব অধিকৃত : একজন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আর একজন আচার্য প্রকুরচন্দ্র। মুখ বার্ষিক করে' দেশের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাই তাঁরা দেশবাসীর দ্বারা চিরদিন ঐতি ও প্রচার আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন। আম চারদিকে বহন নৈতিক শৈথিল্য এবং স্বার্থের চক্রান্ত তখন বিশেষ করে' এই সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তির আদর্শ অবশ্যই।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত যেন যে আদর্শ-নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত দেখেছি, আজ তা প্রত্ন-বিশীর্ণমান। সর্বত্র তাৎপল্য ছলনা চিত্তবিকার। মহত্ত্বের স্বত্ব দাঁড়ি আমাদের মোহমুক্ত হবে, মহত্ত্ব অসু-প্রাপিত হবে, তবেই বেশ স্বতঃস্ফূর্তি অতিক্রম করতে পারবে। নইলে পূর্বগামিগণের তপস্বীভিত্তি স্বাধীনতা আপন অন্তঃস্বাদশ্রুতায় ক্রমশঃ বিবর্ধ ও হ্রিমান্য হয়ে পড়বে।

॥ শিক্ষার কথা ॥

মুল কাইনাল এবং ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। উত্তর পরীক্ষাতেই প্রায় অর্ধেক উত্তীর্ণ আর অর্ধেক ব্যর্থ। এ ব্যর্থতা হুতো তত শোচনীয় মনে হ'ত না, যদি সকলের মস্ত নানাবিধ উপার্জনের পথ বাংলা থাকত। এখানে পাস করেও অনেক বেকার থাকে সংস্কার নেই, কিন্তু পাস না করলে হোজপাংগের পথ আর ও সংকীর্ণ। চারবাল ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীর মন বেগুয়া উচিত—হলি বটে, কিন্তু সে কথা কেউই প্রায় শোনে না। সবাই একটা নির্দিষ্ট আরের পথ ধোঁকে।

পরীক্ষার এত ছাত্রছাত্রীর ব্যর্থতার কারণ কি, অনেক তার বিচার করতে যখন। কেউ যোগ্য যেন শিক্ষক হবে, কেউ ছাত্রছাত্রীর কেউবা সরকারী শিক্ষাব্যবস্থাকে। সম্ভবতঃ কেউ যোগ্য নহ, আবার এককভাবে কেউ যোগ্য নহ। শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে বাঁধের যোগ নেই এমন অনেককে বেশ উদ্বাহ সঙ্গে বলতে শুনেছি শিক্ষকরা কেউ কিছু 'করে' না, করেন' না বলে সম্মান বেহেতও তাঁরা নাহান্ন। কোন কোন শিক্ষক লম্বাচে সে কথা মত বলেও শব্দলের লম্বাচে নয়। তা ছাড়া আরও অনেক কথা ভাবণ

আছে। শিক্ষক নির্বাচনের হাতিয়ার হিসেবে তাঁর কিস্তি সব সময় যোগ্য শিক্ষক নির্বাচন করেন ? করলে তাঁকে গ্রামাঙ্ঘ্রাধন সম্পর্কে নিশ্চিত রাখেন ? মন দিয়ে পড়াবার উপযুক্ত পরিবেশের ব্যবস্থা করেন ? বোঝা যাবে এরা কিছুই করেন না। ঋতু শিক্ষা দীক্ষা ক্রটি প্রকৃতি দূরীকৃত্যন করবার উপযুক্ত, যাঁহে পড়ে যিনি শিক্ষক পথপ্রার্থী হয়েছেন তাঁকে শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত করলে কি ফল আশা করা যায় ? যোগ্য শিক্ষক সামান্য বেতনে চূর্ণিত ; যদিও পাওর্য্য বাধ গ্রামাঙ্ঘ্রাধনের চেষ্টায় অল্প ছুটোছুটি করতে ছলে তিনি স্কুলের কাজে পুরোপুরি মন দিতে পারেন না। তা'ছাড়া ষাট শতকটি ছাত্রের ক্লাসে (তার মধ্যে হয়তো বঙ্গ-বাংলাটি নষ্টচরিত্র বেপয়োয়া ছেলে ; অথচ তাঁদের শাসন করবার উপায় নেই, কর্তৃপক্ষ তাঁদের খাতির কিংবা ভয় করে চলেন) —বেচারি শিক্ষক কতটুকু শেখাতে পারবেন ? শিক্ষক সাধ্যমত চেষ্টা করেও প্রাথমিক পাঠ্যেন না কারও, ছাত্র-গড়ার কাজে সহযোগিতা পাঠ্যেন না স্কুল কর্তৃপক্ষের, অভিভাবকদের কিংবা সমাজ-নেতাদের, শিক্ষার পাত্র হয়ে থাকবেন ঐতিহাসিক প্রচলিত অন্ধকার কোণস্থিত। বিষয়বৃত্তি সমগ্র শিক্ষক হস্তেও আসল কাজে ঈর্ষিকি দিয়েও কর্তব্যের এবং অভিভাবকদের মন দুঃখের মিলিত কণা বলে কিছু ধন-মান আহার করে' নেবেন, শুধু কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি তা পারবেন না।

শিক্ষার মান নেনে গেছে। এত ছাত্র ভেল কতে, এটাই আশ্চর্য নয় ; পরীক্ষকেরা অনেক সময় বিধিত মন এত ছাত্র পাশ করে দেখে। ডিগ্রী পরীক্ষার্থী শতকরা বিশজন ছাত্র 'বিশুদ্ধ' বোঝাবার জন্য লেখে 'Childs' 'বুদ্ধেরা' বোঝাবার জন্য 'Olds', বানানের বা অর্থের জ্ঞান অধিকাংশের নেই ; বাংলা চর্চা কথারও বানান বা অর্থ অনেক আদেন। তবু তা'রা অনেক পাশ করে। আশ্চর্য নয় ?

কলেজে এশে বানান শিক্ষা বা ভাষাশিক্ষার সুযোগ নেই। স্কুলের গোড়া থেকে তৈরি হয়ে না উঠলে ছাত্র বহাবর কাগা থেকে যায়। অথচ আনন্দের আশা কতি, তারা উচ্চতর পরীক্ষারও পাশ কবে, বাস্তব হয়ে, উপার্জন করবে, বিভিন্ন কর্তব্যক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় দেবে।

তা কি সম্ভব ? জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বৈজ্ঞানিক সর্বত্র প্রকট হয়ে ওঠে।

শিক্ষার বনিয়াদ পাকা করা স্বরকার। বনিয়াদি শিক্ষার বুলি আওড়ানোর লাভ হবেনা। ঐরা সাতবারের চেষ্টায় স্কুল কাইনাল বা পাঁচবারে ইন্টারমিডিয়েট পাশ কয়েছেন তাঁদের উপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার দিয়ে যদি ভাবি, শিক্ষাবিত্তার করছি, তবে অবশ্যই পত্তাতে হবে। ঐরা স্কুল করবেননা, স্কুল শেখাবেননা, সব কবে' শেখাতে পারবেন, শিক্ষাকার্যে মন দিতে পারবেন, প্রাথমিক শিক্ষার জন্যও তেমন শিক্ষক চাই এবং তাঁকে অসুস্থ পরিবেশের সুযোগ দিতে হবে। বড় বড় পরিকল্পনা রচনা নয়, তার চেয়ে বড় কথা এবং বড় প্রয়োজন—যারা বিজ্ঞানে ভিত্তি হচ্ছে তারা পড়তে আসছে কিনা, বিজ্ঞানে বিজ্ঞার আবহাওয়া আছে কিনা, শিক্ষকেরা শিক্ষা দিতে পারছেন কিনা—এইগুলি দেখা। আর কেবল বাইরের ঠাট নিয়ে আমর্য্য ব্যস্ত ; এই মনোভাব ছাড়তে হবে। দেখ, ক্লাস রুমীতেই আনন্দের কত বই, কত বিষয় পড়াই,—বিজ্ঞার কি ধন, জিনিষের কাছে এইটে জাহির করাই যেন শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাজ। আমাদের বিধান, বই এবং বিষয় কমিয়ে, নীচের দিকে শুধু কিছু ভাষা আর অল্প দিখিয়ে উপর দিকে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বিষয় আনলে ভালো হয়। ভাষা শেখানোর জন্যও বইয়ের চাপ বেশি না দিয়ে, রচনার বেশি মন দেওয়া উচিত। আগেরকার প্রাথমিক পরীক্ষার ইংরেজি ও বাংলা প্রশ্নপত্রে প্রাধান্য অসুস্থ এবং রচনা থাকত। তাতে ছাত্রেরা সুস্থের খোঁজে পাশ করতনা ; স্বাধীন ভাবে ইংরেজী বাংলা লিখতে লিখত। শেখাবার ব্যবস্থা থাকলে যোগ্য হয় সেই পদ্ধতিই ভালো। শিক্ষা পরিচালকেরা বাস্তব অবস্থা সখেই অভিজ্ঞতা একর না কবে বড় বড় কেতারী বুলির রঙিন চশমা চোখে এটে আছেন, তাঁদের প্রযত্নিত বিদ্যাব্যবস্থা প্রায়ই অকল্যাণ হয়ে পড়ছে। অল্প কৃষ্টি নিয়ে চললে নতুন পথে এগোনোর আশঙ্কি নেই ; তা না হলে হিতে বিশরীত ঘটবার আশঙ্কি। বহু পুর্বানো পথে চোখ মেলে চলা ভালো। স্কুলে বঙ্গ বহুহর কোর্গ রাশেলও কতি হ'তনা, যদি পড়া দেবার এবং নেবার সুব্যবস্থা থাকত।

শ্রামাগ্রসার স্মৃতি—

২০শে জুন ৮ই আষাঢ় ৮শ্রামাগ্রসার স্মরণার্থ্যের দৃষ্ট্যাবলীকে গিলেছি। তাঁর কর্ণশক্তি, বেশজ্ঞতি, নির্ভীকতা এবং স্বাধীনচিন্তা তাঁকে সকলের প্রচার পাত্র করে তুলেছিল। কি বিবিস্তারলয়ে কি পার্লামেন্টে তিনি অসামান্য ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতা কখনও ভাবোদ্ধাপনাত্মক হয়নি। যুক্তিতে অকাটা, তথ্যে সমৃদ্ধ, আবেগে পরিপূর্ণ তাঁর পার্লামেন্টের বক্তৃতাবলী আদর্শরূপে গৃহীত বংগর যোগ্য। শৌখিন নেতৃত্বের অভিলাবী তিনি ছিলেন না; প্রাণ দিয়ে আপন বিশ্বাসের পরিচয় দিয়ে গেছেন। বাংলা-বেশ আজ সর্বক্ষেত্রে হরিত্র। মানুষের মত মানুষ বা নৃজিশালী নেতা তার কেউ নেই। শ্রামাগ্রসার ছিলেন এমন একজন নেতা যার ব্যক্তিত্বকে অলীকার কংগার ক্ষমতা কারও ছিল না।

হুদুলা সরাসাই—

ঐনতী হুদুলা সরাসাইকে সম্মতি কংগ্রেস-সমস্তগণ থেকে পাঁচগছের মস্ত নিচুত করা হয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি শেষ আবহুতাকে সমর্থন করে, কান্নার সরকার তথা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য করে আসছেন। যেহেতু কি, তা আমরা জানি না। এ উদ্দেশ্যে অর্থব্যয়ও তিনি অনেক করেছেন। কান্নার সরকারও এবিধের ভারত-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শুধু এতদিন তিনি কংগ্রেস সংসদ কি করে থেকে গিয়েছেন, অভাবদগি তাঁকে নিরস্ত কংগার অথবা হুদুলানের ব্যবস্থা কেন করা হয়নি,

তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তাঁর কাল কি বেশজ্ঞতিভার পর্যায়ে পড়ে না?

ডক-কর্নফট প্রত্যাহার

ডক-কর্নফটের প্রতিনিধিগণ প্রধান মন্ত্রী শ্রীমন্ত নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করে' কর্ণফট প্রত্যাহার করেছেন। শ্রীমন্ত নেহরু তাঁদের বক্তব্য সহানুভূতির সঙ্গে শুনেছেন এবং সে সম্পর্কে বিবেচনা করবেন, আশাস দিয়েছেন। দেশের বর্তমান অবস্থার যাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের নিষ্পত্তি হয়, তাই বাঞ্ছনীয়। পণ্য উৎপাদনের ও বেশ-গঠনের কাজে এখনও আমরা অনেক পিছিয়ে আছি, সে কথা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। অনলস কর্ণ ব্যতীত দেশের উৎসাহাধিত্য ঘোষণার উপায় নেই।

হালেবীরী অস্ত্রবিরোধ

হালেবীরী প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ইমরে নাদি এবং তাঁর সহকর্মীদের প্রাণরোধের সংঘর্ষে বিভিন্ন দেশের শান্তিকামিগণ স্বেচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সে-দেশের আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই, গত্য বটে, শুধু এ ধরনের হত্যাকাণ্ড আমাদের বিরুদ্ধে আঘাত করে। চোর নন, গুণ্ডা নন, বেশজ্ঞাহী নন, নাদিও সাম্যবাদী কর্মী এবং দেশনেতা ছিলেন, মতবৈষম্যের অপরাধে তাঁকে প্রাণ হারাতে হ'লো, এ ঘটনা শোচনীয়। রাষ্ট্রনীতির অন্তরালে মানুষের কত হীন প্রবৃত্তি লুকিয়ে থাকে, তার দৃষ্টান্তে অজীভের ইতিহাস বোঝাই হয়ে আছে; আলেক্সার ইতিহাসও তা-থেকে মুক্ত হতে পারলো না; বোধহয় ক্রমশঃ আগের চেয়েও কলঙ্কিত এবং তারাজ্ঞিত হয়ে উঠছে।

বাংলার কিশোরকিশোরীদের জন্য লেখা

রণজিৎকুমার সেনের

অনবদ্য সাহিত্যস্রষ্ট

নানা ফুলের সাজি ৩০ টাকা

অগ্ৰস্ত ছড়া ও কবিতা, মগার মগার গল্প, বহু নবীনীর জীবনী, একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, এবং শিশুসাহিত্য ও গ্রন্থবিষয়ক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সমৃদ্ধ।

নানারঙের চিত্র, নানারঙের প্রচ্ছদপট

প্রত্যেক শিশুর হাতে তুলে দেবার মতো এবং প্রত্যেক গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করার মতো বই। এটি কথায় শিশুসাহিত্যের সেরা বই। সর্বত্র উচ্চপ্রশংসিত।

যুগান্তর :—‘আনন্দের মহাচিহ্নে শিক্ষা না ঘটিলে সে শিক্ষা খাটি শিক্ষা হয় না। “নানা ফুলের সাজি”র প্রতিটি পৃষ্ঠার কিশোর জীবনের সেই আনন্দ মিলে আছে। অপূর্ব চিত্রণ ও নানা ব্যঙ্গনার প্রচ্ছদপটে সমৃদ্ধ এবং গ্রন্থাবলীর অত্যন্ত প্রাণবন্ত এই গ্রন্থে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস “সদ্যমালী” আটটি সার্থক জীবনী, যথা—ব্রজবান্ধব, কেশবচন্দ্র সেন, অম্বিনীকুমার দত্ত, চারণ কবি মুকুন্দ দাস, বামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী, আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র দাস, বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও বিনয়কুমার সরকার; এছাড়া ভারীদ্রব্যবোধক ও হাল্কাভাব্যক কবিতা ও ছড়া; চারিটি গল্প এবং শিশু সাহিত্য ও শিশু সাহিত্য গত্র বিষয়ক একটি তথ্যবহুল নিবন্ধ সংযোজন হয়েছে। এমন একখানি গ্রন্থ অকালের জন্য লেখক ও প্রকাশক উভয়েই অতিনিশ্চয়যোগ্য। অসীম কাহিনীর বার্ষ প্রেলোপ দিয়ে এখানেও তরুণতম নাগরিকের ঘুম পাড়িয়ে রাখার দিন যে অতিবাহিত, আলোচ্য গ্রন্থখানি তার উজ্জ্বল প্রমাণ।”

বনুমতী :—“রণজিৎ কুমার নানাবিধ রচনার পারদম। পরিণতবয়স্ক গল্প, উপন্যাস ও কবিতা ছাড়া, শিশু ও কিশোরদের জন্যও তিনি নানা রচনাসম্ভার পরিবেশন করেছেন। এই গ্রন্থখানির মধ্যে তাঁর শৈশবের রচনারই বহুবিধ নিদর্শন সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে উপন্যাস পর্বাণে ‘সদ্যমালী’ নামক উপন্যাস আছে একখানি। জীবনী পর্বাণে—ব্রজবান্ধব কেশবচন্দ্র সেন, অম্বিনীকুমার দত্ত, চারণ কবি মুকুন্দ দাস, বামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী, আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র দাস, বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও বিনয়কুমার সরকারের জীবন-বাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ছড়া ও কবিতা পর্বাণে—কেশববোধক ও নানা রসের কবিতা আছে একশটি। গল্প পর্বাণে—মটর ঘোড়ি, পটল ঘা ও হীপাহিত্য নামক তিনটি উৎকৃষ্ট বয়সের গল্প আছে, আর শেষ নিবন্ধ পর্বাণে আছে শিশুসাহিত্য ও শিশুসাহিত্যগত্র সম্বন্ধে একটি আলোচনা। প্রত্যেকটি রচনার মধ্যেই লেখকের বৈনিষ্ঠ্য বরা পড়ে।”

মৌচাক :—“গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা ও জীবনীর একত্র সম্বলন এই বইখানি রণজিৎবাবুর শিশুসাহিত্য রচনার একটি বিশেষ নিদর্শন। তিনি ছোটবেলায় গল্প নানা রকমের যে রচনাগুলি এতদবৎ লিখেছেন, তা থেকে উপযুক্ত কতকগুলি সংগ্রহ করে এই বইখানি প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষভাবে এর কবিতাগুলি আমাদের যেমন আকৃষ্ট করেছে, তেমনি জীবনীগুলি পড়েও আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। এ ছাড়া ‘সদ্যমালী’ নামক আকর্ষণীয় উপন্যাসখানিও লেখকের সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দেয়। শব্দবলী এই উপন্যাসের এমন একটি চরিত্র যা মনেও উপর ছাপ রেখে যায়। গল্প কয়েকটিও পড়ে সকলে আনন্দ পাবে। বইখানির মাগমজা মনোহর।”

সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা-১২

খরিদ—৩২, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা-৯

ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা



মাগের কী হাসানাই না হ'ত
আগে !



মর্জনাথ ! এদের মরি
করে ক'থা ব'লি কি
করতে হবে যে ।



এই যে ! শীঘ্র ফকীর কি
করবে ক'থা লিখেছে । ম'ল
আজ মরি করে আছো
ক'নি করে ।

তোমার লিখেছে
বা কি আছো
ক'নি করে
ক'নি করে
ক'নি করে
ক'নি করে
ক'নি করে



ম'ল, কি আর হবে । মাঠে খেললে
ক'রবে এছ'লি ক'রা ল'গেই ত । ভ'লো
স'খার আগে কো'র কো'র ক'নি করে
ক'র কো'র কি । আজ মরি একটা স'খার
ক'র কো'র বা ক'র ক'রা ক'র ।

অ্যাস্কো

বার ৩ টাবলেট



ক'র ফ'ল টিপট প'রিকার ক'র

এসিয়াটিক ড্রাগ কোং

কলিকাতা-১



ASCO

আপনার
রক্তনোপকরণে
যে পুষ্টি
চান

হমুমান

বনস্পতি



সাহিত্য উদ্যোগ

'এ' এক 'ডি' ভিটামিন দ্বারা সমৃদ্ধ

বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আপনার হৃদযাত্রা
৪ পাঃ এমঃ ১০ পাঃ সিনে
প্যাক করা। ৩০ পাঃ সিনেও
পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক
ব্রোডার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

কালমিহানপুর, বিহার

সুখাদাই সুখ ও

স্বাচ্ছন্দ্যের উপাদান

IP 500V 279



একবিংশ বর্ষ

শ্রাবণ, ১৩৩০

চতুর্থ সংখ্যা

স্মৃতিকথা

শ্রীকামিনাস রায়

এইবার আমার পিতার কথা লিখব।

আমার পিতা গণ্যমান্ত ব্যক্তি ছিলেন না। সে বিলাসে তাঁহার জীবনকথা বিবৃত করার যোগ্য নয়। তবু যে বিবৃত করছি তা কেবল—সেকালে লোক কেমন ছিলেন এবং সে কালের আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল তা আমার পিতার জীবন অঙ্গলখনে বলবার বস্তু।

আমার পিতা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৮৪৭ সালে সিপাহী যুদ্ধের পূর্বে জন্মেছিলেন এবং ৮৬ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। তাঁর এই বীর্ণজীবন সান্তের সঙ্গে তাঁর অভ্যাস ও নিত্যকৃত্যের কোনো সংঘর্ষ আছে কিনা জানি না। যদিই থাকে তবে সে কথাটা আগে বলার প্রয়োজন আছে মনে করি। তিনি বালা কৈশোরে গ্রামে থেকে গ্রাম্য জীবনের উপযোগী ব্যায়াম করতেন। যেমন—সতরঙ্গ, অম্বাবোহণ ও গ্রাম্য ক্রীড়া-কৌতুক। কয়েক বৎসর যুদ্ধের ছিলেন—বাকি জীবনের কিছুকাল গ্রামে এবং অবিক্রান্ত সময় কেটেছিল কামিনীবাগের ও বরহমপুরের সৈর্য্যবাহে।

কামিনীবাগের আদৌ স্বাস্থ্যকর স্থান ছিলনা। কামিনী বাগেই হারুণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল, কিন্তু তিনি

ম্যালেরিয়াকে ভয় করেছিলেন। কি করে এই অস্বাভাবিক শয্যন করেছিলেন তা জানি না। কামিনীবাগে থাকতে কাটি গড়ার ও সৈর্য্যবাহে থাকতে খটি গড়ার প্রত্যাহ অবগাহন স্থান করতেন খুব ভাল করে তৈল মর্দন করে। বরাবর অন্ন বিস্তর বৈদিক শ্রম করতেন, প্রত্যাহ ওঠে মাইল বেড়াতেন। শরীরে তিতরে যখন বাস করতেন—তখন প্রাতে উঠে শরীরে প্রত্যেক আদৌরত বাড়ীতে বৌদ্ধ-ধর্ম নিয়ে আসতেন। তখন অনেকটা বেড়ানো হ'ত। প্রাতে কিছুই খেতেন না, কখনও চা খাননি। তামাক খেতেন, শেষ বয়সে তাও ছেড়ে দেন—পজাশের পর আড়িন খা'য়েছিলেন। প্রত্যাহ কিছুকাল বাবা-পাশা খেলতেন। দিনের বেলায় তা'ত এবং সন্ধ্যায় আগেই স্তম্ভিত ও দুঃখ খেতেন। অত্যন্ত ছিল অত্যন্ত পরিমিত। দিনে দু'বার স্নান আর কোন কিছুই অত্যন্ত করতেন না। মাংস, ডিম, পেঁচোক ইত্যাদি কখনো খাননি। সামান্য মাছ খেতেন। প্রত্যাহ শাক ও টক খেতেন। টক ছিল তাঁর অভ্যস্ত প্রিয়। আহারের সময়ে মনো ব্যস্তনে সামান্যে পাত পড়ান করতেন, কিন্তু খেতেন যৎসামান্য। খুব ভোরে উঠতেন। ৪৬ বছর বৈশি নিম্না খেতেন না।

Constipation থাকলে একবারেই খেতেন না। আমার এক আশ্রয় ডাক্তার বলেছিলেন—এরূপ অভ্যাসই দীর্ঘ জীবনের পক্ষে অনুকূল।

প্রথম জীবনে তিনি দুই একবার কঠিন ব্যাধিতে ভুগেছিলেন,—পক্ষাশয়ের পর মানস্ক বাত ছাড়া তাঁর কোন ব্যাধি ছিল না।

তিনি অত্যন্ত কষ্টদীক্ষু ছিলেন। যেহেতু ক্রেশকে কখনও ক্রেশ বোধ করতেন না। যা অনেক সময় গ্রামের বাড়ীতে থাকতেন—তিনি দুইবেলা বেঁধে খেতেন। মা কাশিমবাগারে থাকলেও বাবা দিনের বেলায় নিজে রীংতেন। খুব ভালো রাগতে পারতেন এবং রীংতে খুব ভালো হাসতেন; বাতে কাতর হয়েও তিনি নিজে টেং খেয়ে কাছারি যেতেন। ব'সে ব'সে দুইবার কার্ফোল Operation করিয়েছিলেন! কাশিমবাগার থেকে আমাদের গ্রাম ৪৮ মাইল। একবার আমার সাংঘাতিক অম্বুশের সংবাহ পেয়ে তিনি দুই দিনে কাশিমবাগার থেকে হেঁটে বাড়ী গিয়েছিলেন। বহুবার তিনি হস্তগুণ্টে এই ৪৮ মাইল গিয়েছিলেন। তিনি যা কিছু করতেন তা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গেই করতেন। টিয়ে বা ময়ূর লোকদের তিনি তিরস্কার করতেন।

বাবা যখন পাঁচ বছরের শিশু তখন খেয়া নৌকা থেকে বর্ষার অলহের ঘলে পড়ে গিয়েছিলেন। একটি ১৮১৬ বছরের আশ্রয় বালক ঘলে ঝাঁপ দিয়ে তাঁকে বাঁচায়। পরে এই ছেলেটি বাবার ভগিনীপতি হ'ন। তিনি চিরদিন এমত তাঁর কাছে দ্রুত ছিলেন।

বাবার বাবা শোহর বেলায় এক নীলকুঠির হেওরান ছিলেন। তাঁর দাস্য কৈশোর খুব সুখেই কেটেছিল। পিতামহ পায়দীনবিশ ছিলেন—উদ্ভৃতে কথা বলতে পারতেন। সাহেবি কুঠিতে তাতেই তাঁর কাজ চলে যেত।

বাবা গ্রামের পাঠশালায় ও কিছুদিন টোলে পড়েন। ইংরাজি শিক্ষার সুবিধা তাঁর হয় নি। পিতামহ ভালো চাকরি করলেও কিছুই বেবে যেতে পারেন নি। তাঁর প্রতিপাল্য ছিল অনেক, বাড়ীতে বহু আশ্রয় যখন বাস করত, তাঁকে বহু বাগিকার বিবাহ দিতে হয়েছিল এবং বহু নিধবায়ে তীর্থার্থ করাতে হয়েছিল। তাঁর শোহরদের

বাসাতেও বিশদন লোক দুইবেলা খেত। পিতামহ তাহের নিধের গ্রাম থেকে নিয়ে গিয়ে চাকরি ক'রে দিয়েছিলেন।

সেকালে বিবাহে বহু ব্যয় হত না—শ্রাদ্ধ হ'ত খুব ঘট। ক'রে। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনি বহুব্যয় করতেন। পিতামহ যশোহর হতে পাখীর ডাক বসিয়ে বাড়ী আসতেন। তাঁর বহু সংকর্ষ ছিল। কিছু সঞ্চয় করায় যে প্রয়োজন তা সেকালের লোকে ভাবতেন না। সঞ্চয়ের অর্থ বহু ব্যয়ে ব্যথতে হত। ডাকাতের ভয়ে তা রাখা নিরাপদ কেউই মনে করতেন না। যে যা উপার্জন করত তার সম্বন্ধেই ব্যয় করে ফেলত।

পিতামহ অবসর গ্রহণ ক'রে এসে অনেকদিন জীবিত ছিলেন। তাঁর যখন মৃত্যু হয় তখন বাবা মূল্যে বায় বাহাদুর অগ্রহাংশদা হায়ের কুঠিতে চাকরী করতেন। পিতামহ পিতার বাড়ি কিছু ৪৭০ বেবে গিয়েছিলেন। পিতামহ অবসর গ্রহণ করলে ১০ বছর বয়সেই বাবাকে চাকরিতে প্রবেশ করতে হয়েছিল। তাঁর প্রথম চাকরি গ্রামের এক ভমিয়ার বাড়ীতে। মাহিনা পাঁচ টাকা। এই ভমিয়ার পরিবার এখন মৃত্যবন্ত নির্বংশ। তাহের প্রকাণ্ড মোতলা বাড়ী বাল্যকালে আমহাও বেবেছি। এখন তাহের হালান কোঠার ইট নরসী গ্রামের পোকের কাঁচা বাড়ীর পৈঠা হাওয়ার অঙ্গীভূত। এই ভমিয়ার বাড়ীর গল বাবার কাছে শুনেছিলাম—ভমিয়াররা ছিলেন ভিন ভাই—সেকালের ভমিয়ারদের দেশব মোহণ থাকত—তাঁদের দেশবই ছিল। সেকালের প্রধামত এরা লাঠিয়াল প্রতিপালন করতেন—হাফা-হাফুয়া লেগেই থাকত এবং নানা প্রকারের মামলা মকদ্দমা প্রতিযোগী ভমিয়ার পরিবারদের সঙ্গে সারা বছর খ'য়েই চলত। এরা শাস্ত ছিলেন—নবনী পুন্ডার দিন বলির রক্ত নর্দমা দিয়ে প্রবাহিত হ'ত। এত দুর্গন্ধ হ'ত বাড়ীতে যে ৭৮ দিন লোকজনের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ চলত না। পূর্ণিমার পর খাওয়াখাওয়ার ঘট। শূন্য হ'ত। শাস্ত হ'লেও এঁদের বাড়ীতে হাল, হোল, সূপন ইত্যাদি দলক বৈক্য উৎসব হ'ত। এঁদের প্রধান সংকর্ষ ছিল গ্রামের লোককে নানা উপলক্ষে খাওয়ানো এবং মহাল থেকে আশত বিবিধ দ্রব্য বাড়ী বাড়ী বণ্টন।

তা ছাড়া, মাঝ বছরে খাজা, কীর্তন, কলকতা, পাঁচানী—ইত্যাদি হত।

১৪ বছর বয়সে বাবার প্রথম বিবাহ হয় গ্রামেই। দশ-বছর পরে তিনি বিশালীন হ'ন। তাঁর প্রথম পত্নের কোন সন্তান নেই। বাবার কাছে শুনেছি, সেই বিবাহে বরযাত্রীকেই চিড়া খাই খাওয়ানো হয়েছিল। যদিও তাঁর শত্রু ছিলেন সঙ্গতিপন্ন। সেকালে গৃহিণীরা বেওয়ারিশ ছিল না।

বাবার দ্বিতীয় চাকরি পার্শ্ববর্তী গ্রামে তাঁর জ্যাঠা-শওরের কর্মদারীতে। চাকরি ছিল বহু জ্যাঠাশওরের (মহামহোপাধ্যায় পণনাথ সেনের মাতামহ) সঙ্গে বাবাখেলা। অল্প কাল বিশেষ কিছু করতে হত না।

তাঁর জ্যাঠাশওর ছিলেন খামবেয়াসী লোক। কোন কাজের জন্য মজুর রাখলে কাজ শেষ হলেও তিনি ছুটি দিবেতন না। তিনি বলতেন—এখনো অনেক বেলা আছে কাজ নেই তাতে কি ? বাকি সময়টা এই নারকেল গাছে গুঁঠ আর নাগ, তবে পুঁচা মজুরি পাবি।

এই গ্রামের নাম বাঁধুড়া, দানববি দাতের অগ্রহূনি। দাত দাতের তখন মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু গ্রামে তাঁর গান তখন প্রবলভাবে চলছিল। বাবা দাতের বহু গান প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত পাইতেন। তিনি গ্রামের বাবাই-গোষ্ঠীহলেরে গান নিজে বেঁধেও দিতেন। সঙ্গীতে তাঁর অল্পব্যাপ ছিল। তাঁর বালাকালের গ্রাম্য জীবন সংসর্কে অনেক কথাই শুনেছিলাম। তরুণ্য ছুই একটির উল্লেখ করি। তখন কোন বছর কৃষ্ণির অস্তাব হতনা ; প্রচুর শত্রু হ'ত—লোক সব কর্মির চাইই করতনা। গ্রামে অনাবাহী ডহর গোচর কর্মি খুব বেশি ছিল। তখন আবার চাষের চেয়ে বোনা চাষ ছিল বেশি। আগের ও রবিশস্তের চাষ ছিল এখনকার চেয়ে বেশি। পান্থর চাষ তখনও প্রবর্তিত হয়নি। যশোবর থেকে আমাদের বাড়ীতে যে অগ্নি আস্ত, তা ছিল আঠালো এবং তার বাধ ছিল ঈষৎ তিক্ত। গ্রামে জুহের অস্তাব ছিল না—গোস্তাগুলি তখনও ছাপল হয়ে যায়নি—বেশ সুপুঁই ও বরষাকার ছিল।

উল্লোকেয়া ভায়া জুতা ব্যবহার করত না—ভিন্ন গ্রামে গেলে খাড়ে একটা চাষর দিত। সাকি মাটি দিয়ে

কাপড় কাটা হ'ত। বিদ্যাতী কাপড়ের আমদানী খুব বেশি হয়নিই, লোকে গাঁয়ের তাঁতীর বোনা চান তাঁতী কাপড় পরত। চরগা তখনও চলছিল। বিবাহ চন্দ্রকর হুতা কেটে কিছু খোজগার করত। ভ্রমজ্ঞাতির লোকের মধ্যেও কেউ কেউ নিমস্কর ছিল। ভ্রাম্মণ্যগণের কেউ কেউ বিশেষ পাচকের কাজ করত। ভ্রমজ্ঞাতির লোকদের অনেকে ক্রুৎকাপ বুননের সঙ্গে মাঠের কাজও করত। আপনার ক্ষেত্রে খাটাতে কেউ হীনব্রতি মনে করত না। অনেক নিজেমাই ফেওয়াল রাখত ও ঘর ছাইত। নিম্র-শ্রমীর লোকদের সঙ্গে ভ্রমজ্ঞাতির লোকদের খুব বেশি তত্ত্বাৎ ছিলনা।

গ্রামের বাহ্য অপেক্ষাকৃত ভালোই ছিল। তবে চৈত্রমাসে বছর বছর কলেরা হত। আমাদের বংশের পূর্ণপুরুষদের মৃত্যু দ্বিবদী সব চৈত্র মাসে। কারণ, মনলেই কলেরার মৃত। মালেরিয়া কুটিং স্বপ্ননো হ'ত। পিতামহকে তাঁর মায়েব একশিশি সুইনির্নিং দিয়েছিলেন। পিতামহ সেই সুইনির্নিং এনে গ্রামে তার গুণের পরীক্ষা করেন। প্রয়োগ জানতেন না—অতিরিক্ত তিক্ত বলে দ্বিবদ্যাতীর ঔষধ মনে করেছিলেন। ভয়ে ভয়ে অতি সামান্য সেবন করলেই জ্বর বন্ধ হয়ে যেত। কবিরাজবা তো অব্যাক। গ্রামে ডাক্তারী চিকিৎসক একবারেই ছিল না। জ্বর বিকারেও বহু লোক মারা-যেত। একালের জুলনার সেকালে লোক বেশিদিন বাঁচত না। প্রগাম কারণ, চিকিৎসার অভাব।

আমাদের একখানা প্রকাণ্ড বৈঠকখানা ছিল। আমি যখন কলেজের ছাত্র তখন সেই জীব বৈঠকখানাকে ভাঙতে চেয়েছিলাম। বাবা বিরোধী হলেন—তিনি বলেন, এই বৈঠকখানার রমেশ বড় (কাটোয়ার এস. ডি. ও তখন) একজাম্বি বাদ করে গিয়েছেন। এই বৈঠকখানার অন্ততঃ একশোটা নান্দীমুখ হয়েছে। এর বেওয়ারিস বংশধার বাপ। যারা ব্রুবর্তী গ্রামে বিয়ে দিতে গিয়েছে তারা এই গ্রাম দিয়ে বাবার সময় ঐ বৈঠকখানায় মাতামা পেয়েছে। ওখানেই নান্দীমুখ হয়েছে। পর পুড়ে গেলে দুধছাড়ার এখানে অভয় পেয়েছে। এর বাওরায় পাঠশালা বসত। এখানে গাঁয়ের বাবাই-মাতা ইত্যাদির হলের আশো

মহড়া হয়। এ পৈঠকখানা আপনা হতে পড়ে না গেলে তা'হ' চলবেনা।”

অ'নি মনে মনে বললান—A question of sentiment not of discretion, কারণ তখন বলেছে পড়ি।

এই চণ্ডীমতপকে বরণ করে একটা কবিতা লিখেছিলেন।

বড় এ বরখানা কাহার ভাবি,
হে'রি যে এই ঘরে সবাগ্নি ধাবি।
শ্রান্ত পাব নে দণ্ড তরে
বৈঠে যায় এর পৈঠা 'পরে।
মাঘের পূণ্য হয় শবৎ এসে,
গাঁয়ের নরনারী হেথার মেলে।
সেবাবে অঞ্জলি হেথার সঁপে
প্রবীণ প্রবীণরা মন্ত্র ধরে।
হেথায় ভাগবত কথক পড়ে
শতক লোক শুনে পাতক হয়ে।
ঘরোয়া পাঠশালা হেথার বসে
পড়'রা হেথা যোগ-বিয়োগ করে।
গাঁয়ের নাটশালা ইছাই গাঁজে,
বাক্স-মহড়াতে বেহালা বাজে।
কৌর্ডনিরা হল এ গাঁয় এসে,
এখানে বাসা লয় নানুর মেলে।
হুংবদ সব যায় করতে বিরে
বাক্সনা বাজাইল এ গ্রাম দিগে,
এ ঘরে হয় তার নাকীমুখ
বইছে বদ্রগারা ইছাই বুক।
সেবার পুড়ে গেল বাগ্মীপাড়া
পাইল হেথা ভেড়া বাঘঘারা।
বাউল হংবেশ মেগিয়া কাঁধা
হেথায় বর্গার বাঁচায় মাথা।
গাঁয়ের মোড়লেরা হেথায় মিলি
নাশিল শুনে করে নাশিল বিলি।
হিথান করে হেথা পকারেৎ
কাঝা বা অধিনানা কাণো বা বেত।

কপোতকুল কুঞ্জে মধুর কোল,
রয় না খালি কতু ইহার কোল।
কঠোরো প্রতিমার বাওরায় থাকে,
ছয়াব নেই এর সথায়ে ডাকে।
চণ্ডীমতপ-এ পথের গায়ে
যেহ না আশ্রয় ব'ল না করে ?
চণ্ডীমার কোলে সবারি ঠাই
চণ্ডীমতপ নাম যে তাই।

বাবার তদিনিপতি ভৈরবনাথ দ্বাট কাসিমবাগারে
রায় বাহাদুর অন্নপ্রাঙ্গণ্য রায়ের অমিহারীতে চাকরি
করতেন। তিনি বাবাকে নিয়ে গিয়ে ঐ অমিহারের বাড়ীতে
চাকরি করে ছিলেন। বাবা রায় বাহাদুরের Personal
Assistant ছিলেন। তিনি অবিকাল সময় তাঁর কুঞ্জেবের
করণচৌর্য্য হুগিতে থাকতেন। বাবাকেও কুঞ্জে থাকতে
হতো। বাবার কাছে শুনেছি রায় বাহাদুর অন্নপ্রাঙ্গণ্যসেই খুব
চুলকায় হয়েছিলেন। তিনি পাতলা খুঁটি পরতেন—
পায়ের উপর বিকে চুলকাতো কাপড় তোলা অদ্যত্যা বলে
কাপড় কাটিয়ে গা চুলকাতেন।

একবার শ্রীতকালে রায় বাহাদুরের বহু টাকার
নোটের একটা বাউল হারিয়ে যায়। অনেক খোঁজা-
খুঁজিতে পাওয়া যায় না। একজন চাকরকে সম্বোধন করে
বরখাস্ত করা হয়। ভাঙ্গনসে রায় বাহাদুরের শ্রীতের
কাপড় তোছে বেওয়া হয়। বাবাকে তার বেওয়া হয়—
সেগুলিকে বাস্তবে শুদ্ধিয়ে তুলবার। বাবা একটা গভাব-
কোটের পকেটে হাত তরে সেই নোটের বাউলটা পান।
লোভ ঘনন করে তিনি রায় বাহাদুরকে বাউলটা
দিলে—রায় বাহাদুর বাবাকে ছুশো টাকা বকসিস দেন
এবং বাবার নাহিনা বাড়িয়ে দেন। বরখাস্ত চাকরটিকে
বেশ থেকে আনিয় তাকে ছ'মাসের নাহিনা ও ১০০
টাকা ক্ষতিপূরণ বেওয়া হয়। এরপর রায়বাহাদুর বেশি
দিন বাঁচেননি।

এর মৃত্যুর পর সম্পত্তি কোট অব ওয়ার্ডসে যায়। পুত্র
রাজা আন্তোব নাথের বরণ তখন এক বছর। মজুন আমলে
বাবার চাকরি থাকল না। তখন রাণী অনারীকালা (রায়
বাহাদুরের পত্নী) মহাবান্ধি পৰ্বমহীকে ব'লে তাঁর এষ্টেটে

চাকরি করে যেন। ৭২ বৎসর বয়স পর্যন্ত বাবা ঐ এজেন্টেই চাকরি করেছিলেন। আমার জ্ঞান যতবার পথ থেকে ঠাকৈ একই মাহিনার চাকরি করতে দেখেছি। পূর্বে নিশ্চর আরো কম ছিল। আগেকার ভবিষ্যৎ মাহিনা বাড়ানোর পক্ষপাতী ছিলেন না।

বাবার এই চাকরির জীবন ছিল অনবদ্য। তিনি কখনও কানাই করতেন না—একদিনও উপস্থিতিতে ঘেরি করতেন না, আফিসে গিয়ে বিশ্রাম করতেন না। তাঁহার পতের নাম ছিল মৌরুমুদী। সেবার তাঁর মূলিয়ানা ছিল। মহাবাহু মনোহর পয়োয়ানা সহি করবার সময় বলতেন—“অবিকশেইত আপনার সেবা। আপনার অধীনে যে ২৭ জন লোক দিয়েছি, তারা কি করে? আপনার পান চিবানো ইংরেজী মণীষ বাবু কি করে?”

বাবা বলতেন—“মুদাবিবা ক’রে দিলে তবে তারা লিখতে পারে। মুদাবিবা ই বরি ক’রে দিতে হয়—তবে একবারে গিবে ফেলতেই বা কতক্ষণ? তারা লিখলে আমার ভুলচুক কাটতে হয়। তবে তারা ব’লে থাকে না—নকল রাখে, হিলাব রাখে, নমীর বার করে—আরো খুঁটিনাটি অনেক কিছু করে।”

মহাবাহু—“না, আপনি বাটরে নিতে জানেন না। Control করতে পারেন না—নিজেই বাটতে পারেন। আপনার অভাব হ’লে কি হবে বলুন। লোক তৈরী করুন।”

বাবা—“কেন? পূর্বদান ত তৈরী হয়েছে। সে বেশ লেখে।” মহাবাহু—এক আশ্বিনার কি হবে?

মোট কথা, বাবা ছিলেন ক্ষিপ্রতার পক্ষপাতী। তিনি মন্থরতা মোটে পছন্দ করতেন না। অস্তের ঘেরি হ’ত বলে নিজেই বেশির ভাগ লিখতেন।

ক্রম কলম চালানোর শক্তিটা আমার উত্তরাধিকার হস্তে পাওয়া।

বাবা তেজের সঙ্গেই চাকরি করতেন—একত্র মহাবাহুর সঙ্গে অনেক সময় তাঁর বাবাহুবাধ হ’ত, মহাবাহু বলতেন—যেহে ক’বিবা যদি আছে ব’লে আপনার এত তেজ, নয়? একবার কি মহাবাহুর একটা হুজুম নিয়ে এমন বাবাহুবাধ হয়—বাবা কিছুতেই পরোয়ানা ধারি করতে

হাবী হ’ত না। বাবা বলেন, হুজুর, এতে ভবিষ্যতির আশেবে বড় কতি হলে।

মহাবাহু—হয় হবে, এ কি আপনার বাবার সম্পত্তি? কতি হয় আমার হবে।

বাবা বীরভাবে লবাব হিলেন—হুজুর, এ সম্পত্তি কারো বাবার নয়। এ সম্পত্তি হ’তে আপনি যেমন প্রতিপালিত হচ্ছেন, আমারও তেমন প্রতিপালিত হচ্ছে। আপনার চেয়ে আমারেই বড় করুন।

মহাবাহু তাঁর নাভুলানী স্বর্ণদরী রিবর পেয়েছিলেন।

এই কথা বলেই বাবা ভাবলেন আজই যোগ বর চাকরির শেষ দিন। কিন্তু কল হ’ল অস্ত্রতপ।

পতীর মহাবাহু হেপে কলে বললেন—“ট্রিক বলেছেন রায় মশায়। আপনি বিচকল লোক। এজেন্টের পুত্রানো কর্তব্যী, আপনার কথাই থাক। জানেন তো আমি মেহী মানুষ। কতি হবে বুঝেও ভেদ করছিলাম। আপনি কিছুতেই হুজুম তামিল করছিলেন না বলে ভেদ বেড়ে যাচ্ছিল। যান, যেন কিছু করবেন না।

মহাবাহুর প্রতি বাবার শ্রদ্ধা যেমন বেড়ে গেল, মহাবাহুরও এতে বাবার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। ভবিষ্যতে বাবা আসক্তি করলে মহাবাহু অনেক সময় হুজুম কিবিরে নিতেন। বাড়ীতে উৎসব বা পারিবারিক অহুষ্ঠান হ’লে মহাবাহু অত্যন্ত রাগিবপূর্ণ বিশ্বস্ততার কর্তব্য হিতেন বাবাকে।

মহাবাহু একবার বাবাকে বলেছিলেন “কই রায় মশায় আপনি ত কখনো কিছু প্রার্থনা করেন না—সকলেই ত কোন না কোন অহুষ্ঠাতে মাধ্যম প্রার্থনা করে।”

বাবা বলেছিলেন—“হুজুর, আমার কল্লা নেই—কল্লা থাকলে কল্লাবারেই কল্লা মাধ্যম চাইতে হ’ত। আর মাইনে আপনি যা যেন তাতেই ত বেশ কুলিয়ে যায়। বিনা তাড়ায় বাড়ীতে আছি, বিনা পয়সার ভাঙ্গার গুহুং পাচ্ছি, আর ছেলে ত বিনা মাইনেতেই আপনার কলেজে পড়ছে—হুজুরের বাড়ীতে বাবুবাড়ীতে ছেলেদের সঙ্গে কলেজ বাতায়নাত করছে। কেন আপনাকে অথবা বিরক্ত করব বলুন।”

বাবা বাড়ীতে এসে একথা বললেন, তাতে আমি বলেছিলাম—“বেশ কুলিয়ে হচ্ছে, বললেন? এই কি

হুদানো? খাওয়া-পরা হলোই হয়ে গেল? এক পরমা নকর নেই, বাড়ীতে একটা কানিয়ার নেই,—আরানে থাকবার কোন ব্যবস্থা নেই—”

বাবা বললেন—“আরে পাপল। সত্য কববার ভক্ত কখনো কি কেউ তিন্কা চায়? বাবুয়ান কব্বার ভক্ত কখনও প্রার্থনা চলে? বিপন্ন না হলে কেউ কখনো প্রার্থনা করে?”

খাওয়া-পরা ছাড়া আর টাকার কি প্রয়োজন আমিও তখনও ঠিক জানতাম না। আমকাল খাওয়া-পরা যৌগ হয়ে গিয়েছে—সেকালে তা ছিল না। একালে সহস্রবিধ ব্যয় খাওয়া-পরাতে গৌণ করে তুলেছে।

মহারাজের একটি একটি সম্ভান ও ভাষাতার অকাল মৃত্যু হ'তো আর বাবা নিজের বাড়ীতে ব'লে অশ্রুপাত করতেন। আমি বলতাম—“এতে আপনার এত লোক হচ্ছে কেন? কত লোকেই তো সম্ভান বিরোগ হচ্ছে।”

তিনি বলতেন—এক-একটা স্বড়ে শত শত কলাগাছ পেরেপাহাড় পড়ে যায়, কিন্তু বহি একটা বট অশ্বথের বিরাট বেরটা উপড়ে পড়ে যায়—তবে একটা বিক ঝাঁঝ করে। পথিক যেতে যেতে ঘেঁষে আশা বলে বন্ধুকে দাঁড়ায় কেন?”

রাজ-নগসারের প্রতি বাবার কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। কলেজের ছাত্র আমি বলতাম,—“বাবা, এতে কৃতজ্ঞতার কি আছে? আপনি প্রাণপাত ক'রে বাটছেন—তার পারিভ্রমিক বোল আনার আয়গার হচ্ছে ৩২।৮০। এতে আবার কৃতজ্ঞতা কি আছে?”

বাবা—সে কিতো? অন্নভাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকবে না?

আমি—যার গৃহে বাটতেম সেই অন্ন বিত। বসিয়ে বসিয়ে ও অন্ন দিচ্ছেন না মহারাজ?

বাব—এক ব্যপের হবে না জন্মালে আর এক ব্যপের হবে জন্ম হ'ত। এতে ব্যপের প্রতি ভক্তি আবার কিসে? তোমার এ বুদ্ধি সেই ব্যবহার।

বাবার বয়স তখন ৭২ বৎসর আমি তখন মহারাজেরই একটা স্কুলের হেডমাষ্টার। আমি পীড়াপীড়ি করে বাবাকে বিটায়ার করালাম। মহারাজ কিছুতেই বাবাকে ছাড়তে চান না বল্লেন—আপনি হলেন প্রাচীনতম

কর্মচারী, Living Record. এগুটের পুরানো কথা কাকে মিস্রাসা কবে? আপনাকে কাল করতে হবে না, শুধু প্রত্যাহ এসে সেবেস্তার বদবেম। কিন্তু বাবা আর কিছুতেই থাকতে রাজী হলেন না। বল্লেন—“ছেলে কিছুতেই কাল করতে হবে না। আমি কি করব? বলুন। সে বড় লজ্জা পাচ্ছে।”

মহারাজ বল্লেন—“আপনার ছেলে বেশ লিখিয়ে হয়েছে। সেই এসে আপনার আয়গার বন্ধক, সে দুই উত্তরবাহের গ্রামের স্কুলে যে মাইনে পাও তাই তাকে দেব। তা হলে আপনাকে ছেলের কাছে থাকতে হবে, তখন প্রয়োজন হলেই আপনাকে পাব।”

আমি শিক্ষাবিতাণ ছাড়তে চাইলাম না। মহারাজ বিতর্ক হলেন, আমিও কিছুদিন পরে তাঁর স্কুল ছেড়ে চলে এলাম।

সেকলে লোক হলো বাবার কতকগুলি উদার ভাব ছিল। আমাকে মিশনারী স্কুলে ভর্তি করতে কেউ কেউ নিষেধ করেছিল—পুটান স্কুলে পড়লে পুটান হয়ে যেতে পারি। বাবা উত্তর করেছিলেন—এত বৎসর মিশনারী স্কুল হয়েছে কটা পুটান হয়েছে? সাধেবদের কাছে পড়লে ভালো ইংরাজি শিখবে, মিশনারী স্কুলেই ভর্তি করতে হবে।

বিলাতফেরতার বাড়ীতে আমার বিবাহ সম্বন্ধ এলে তিনি সাগ্রহে সম্মতি দেন। সেকলে বিলাত ফেরতার মঙ্গল বর্ধনীয় ছিল। কোন কোন আত্মীয় আপত্তি করার কাফা, অপরান্ধা কি করেছেন? আর এখানে ব'লে অকারণে গল্প শুনব যাচ্ছে কতজন তাতে লোভ হয় না?

এমত বাবাকে অবশ্য খুব ভূপতে হয়েছিল। বাবের সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন—ভাড়াও বিবাহে যোগ দেয়নি। ভাবের এন্তোকেব বাড়ীতে এখন একাধিক বিলাতফেরতা! কলকাতার বিবাহ হয়। গ্রামের আত্মীয়েরা বিবাহ দিতে আসার বাবা আশঙ্ক হ'ন। কিন্তু বিবাহের পর গ্রামে গিয়ে মৌতাতের দিন দেখলেন—গ্রামের আত্মীয়েরাও বঁকে বসেছে। তাহের বুদ্ধি—মহরের ইংরাজি শিক্ষিত আত্মীয়েরাই এখন বিবাহে যোগ দিল না তখন আমরা গল্পীবাণী কি করে যোগ দিই?

আমি বললাম—আপনারা তো বিলাতবৈরতার বাড়ীতেই কলকাতায় খেয়ে এলেন।

ডাক্তারবুজি—‘সে তো ভাত নয়, মুচি। সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত করলেই চলবে।’ আমি বললাম—‘বৌভাতে যোগ দিও মুচিটার প্রায়শ্চিত্ত এক সঙ্গেই করলেই তো হবে।

শেষ পর্যন্ত কেউ কেউ এলেন, কেউ কেউ এলেন না। গাঁয়ের বাসীদের ডেকে উদ্ধৃত আচার্য খাওয়ায়ে দেওয়া হ’ল। এ ব্যাপারে আমি ব্যস্ত বিব্রত ছইনি। মনে মনে যেয়ে-ছিলাম। জানতাম, এটা সাময়িক একটা হজুখ মাত্র। চির বাবা তা ভাবতে পারেননি। তার উপরে মা অত্যন্ত অসহ্য হয়ে সেই সময়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। বাবার সেই সময়ের হস্তবৃত্তি ভাবের কথা মনে পড়লে আমার আশ্রয় চোখে বল আসে। যাই হউক না চির বিদায় নিয়ে এ সমস্তার সমাধান করে চলে গেলেন। বৌট আর থাকল না। কিন্তু বাবার বুকের পাঁজর চির বিনয়ের ক্ষত ভেঙ্গে পেল।

সেকালে গ্রামে ভোজন ব্যাপারে বৌট লেগেই থাকত। যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণ ক’রে পাঁচজনকে খাওয়াত সে চোখের দ্বারে বসে পড়ত। লোকের যত আভিমান্য স্তিতিতে সম্ভার অভিমান, ও আক্কেশ কুটুপগুণে ভোজননের সময়। আমাদের বাড়ীতে বাবা যখনই সমাজবৈর খাওয়াতেন তখনই দুই দলে বৌট বেধে যেত। একদল বাবার হস্ত-বাড়ীর, আর একদল কাকার হস্ত-বাড়ীর। প্রথম দল দ্বিতীয় দলকে জাত্যাংশে হীনতর মনে করত। দুই দলের মধ্যে খাওয়া খাওয়ার সম্পর্ক ছিল না। আমরা মধ্যবর্তী আমাদের বাড়ীতেই দুই দল এক সঙ্গে নিমন্ত্রিত হ’ত। প্রথম দল বৌজ নিত দ্বিতীয় দলের কোন জীলোক পাক করছে কিনা। যদি কোন চর বায়ানবরে দ্বিতীয় দলের কোন জীলোককে আদা দাওয়া করতে দেখত—সে কথা প্রথম দলকে জানালে ১৫ দলের লোকেরা বাপাগনি করতে আসত, কিন্তু খেত না। দুই দলের মধ্যে পঞ্জিক্তভোজনও ছিলনা বছরদিন। বাবাকে বহাবর এই হাঙ্গামা গোহাতে হয়েছিল। আমরা দুইদলের মধ্যে sandwiched হয়ে থাকতাম।

বাবা লোকজন খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন প্রত্যেক ক্রিয়া কর্ণে বহুলোককে নিমন্ত্রণ করতেন। বাবা বাড়ী

এলে একদিন সমাজবৈর নিমন্ত্রণ ক’রে খাওয়াতেন। কাকা পানীয়া স্থানীয় standard অনুসারেই আয়োজন করতেন, বাবা standard টাকে একটু শব্দে করবার পক্ষপাতী ছিলেন। একবার নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে খেতে বসে আয়োজন মনোমত হরনি দেখে কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন—আমার সম্মানে কোন অভাব নেই—তবু এই খাওয়াব ব্যবস্থা? ভক্তলোকদের বাড়ীতে ডেকে এনে একি কষ্ট দেওয়া? সেবার আর একদিন বাবার উপদেশ অনুসারে ভোজননের আয়োজন করতে হয়েছিল।

কাকা বড় সজ্জিত হলেন। আমি তখন কলেজে পড়ি—বলেছিলাম—“standard স্থানীয় ধর্মের গ্রন্থাই ত উচিত, বাবা, কাকা ঠিকই করেন। উঁচু কলে তাব অনুকরণ হবে এবং তাতে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ধারা তাঁদের ব্যয় বেশি পড়ে যাবে। সে বৃত্তি তিনি শোবেন নি। তিনি বলতেন “আমরা শহরে থাকি, আমাদের বাড়ীর আয়োজন ভাল না হলে বাড়ীর মান থাকবে কেন? আমারও ভূগুণি হবে না।” আমার ভাই রাধেশ বাবার মতের অনুগামী ছিল। সে খুব বটা ক’রে খাওয়াতে ভালবাসত।

কান্নামবাজারে আমাদের নিজেদের একটা দোতলা বাড়ী ছিল। বাবা সেটা বিক্রি করে গ্রামে জমিদারগা কিনবার ইচ্ছা করেছিলেন। বাড়ীর লোকের ইচ্ছা হল একটা পুকুর কাটানোর। এই ব্যাপার নিয়ে বাবাহুবাচ চলছিল। একজন কাহাড় কোথাও মন্তব্য করেছিল—“রায়েরা পুকুর কাটাতে? তাইই হয়েছে। বড় দারবাহি কাটাতে চায়, ছোট দার বাবা পেয়েই।”

একথা কানে আসনা মাত্র দমস্তার সমাধান হয়ে গেল। আতবা কাহাড়ই সমাধান করে দিল। পানীয় জলের পুকুরই কাটানো ঠিক হ’ল। যে পুকুর থেকে আমাদের কোন লাভই হয়নি ২৫ বিঘা জমি তাতে কেনা যেতে পারত। লাভ যে কিছু হবে না, তা বাবাও জানতেন কিন্তু গাঁয়ে একটা পানীয় জলের পুকুরের নালিক হওয়া একটা গ্রাম্য মর্গ্যহার মধ্যে গণ্য হতো। গাঁয়ের লোক স্থান করে—জল পান করে কাণের পুকুরে?—না রায়েদের পুকুরে। এতেই আত্মপ্রসাদ লাভ। সেকালে তার দাম ছিল অনেক।

আমরা এখন হিসেবী লোক, গ্রাম্য মর্যাদার লোভও আমাদের নেই, কাজেই পুঙ্খবটাকে হস্তান্তরিত করেছি।

বাধা কাটা জীবনে কখনো মামলা মকদ্দমা করেননি, সোলমাল বাবলে আপোশ মীমাংসা করে নিতেন ত্যাগ স্বীকার করে। কখনও কারো সঙ্গে বিবাহ করেননি, অপমান নিগ্রহ উপভব সব সহ্য করে গিয়েছেন। তাঁদের এই বৈশিষ্ট্য। আমার দেহের রক্ত ও কলমেই কালিতেও সকারিত হয়েছে।

একজন প্রতিবেশী মাছীর এড়াই মর খেয়ে মাতাল হয়ে বাবা কাকাকে খুব গালাগালি করত। এখন প্রকৃতিস্থ থাকত, তখন এনে পায়ের ধূলা নিয়ে জোড়হাত করে কথা বলত। এক একদিন অসহ্য হলে পাড়ার যুবকরা প্রতিকার করতে চাইত। বাবা বলতেন—“ওত প্রকৃতিস্থ অবস্থায় কখনো গাল দেয়না—খুবই শ্রদ্ধা করে, মর খেলে ওর জ্ঞান থাকে না। বাতুল বা মাতালের কথা রূপ করতে নেই। মর ওকে অনুগ্রহ করে তোলে। নইলে লোকটা মানুষ ব্যাথা নয়।”

একবার আমাদের মরিচ ছুটো একজনের আশে চারা বেয়ে তার কিছু তছরূপ করে। তাতে লোকটার গৈরীচ্যুতি হয়—সে বংশবোনাতি অপমানবৃত্তক কথা বলে। একজন মাছীর যুবক বলে ছিলেন—“পিসেমশায়, আমাকে হতুম বিন, আমি এর প্রতিকার করি। আমি আর সহ করতে পারছি না।” বাধা বলেন—“না বাবা, কিছু বোলো না, আমাদেরই অপরাধ হয়েছে। মোকটার বড়ই ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিপূরণ কি বিতে হবে যেহে এনে ওর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করো। আমি এখন ক্ষতিপূরণ দেব। ও যদি মান্ত আমি ক্ষতিপূরণ দেব, তা’হলে এতটা অপমান করত না। ভবিষ্যতে আমাদের মোক্কা মোশ কারো ক্ষতি না করে সে বিষয়েই সাবধান হতে হবে। অনির্দিষ্ট গ্রাম্য লোক যা করে এ অবস্থায় তাই সে করেছে।”

অল্প বয়স হতেই বাবা বোপীর সেবা করতেন। বয়স বোপী হলে তিনি বলতেন—“আমি বাংলা টিকে নিয়েছি—আমার কিছু হবেনা।”

বহু বয়সবোপীর সেবা করেছিলেন, মতাই তাঁর কিছুই হয়নি।

কারো মৃত্যু হলে সংবাদ পাওয়ামাত্র ষাট বছর বয়সেও গামছা বাড়ে করে বেড়াতেন। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত যুবকদের সঙ্গে হুত ব্যক্তির সংস্কার করে তিনজা কাপড়ে বাড়ী কিংতেন। যুবকরা তাঁকে নিষেধ করত। তিনি বলতেন—“ওহে আমি একশোটা বড়া পুড়িয়েছি। একজন অতিথি লোক সঙ্গে থাক ভালো। তা ছাড়া, মাঝে মাঝে মশানে যেতে হয়, তা’হলে মনের কুপ্রভুতিগুলো অনেকটা মমেন থাকে।”

পূজার সময় একমাসের অল্প কদিনমহাশয়ার বা গৈরাবাহ হ’তে বাড়ী যেতেন। তখন কাটোয়া পর্যন্ত স্টীমার চলত। স্টীমারে গেলে একদিন আগে পৌঁছানো যেত। কিন্তু কিছুতেই তিনি স্টীমারে চড়ে বাড়ী যেতেন না। যেতেন নৌকা ভাড়া করে—নৌকার নিষেধ রেখে গবাইকে ষাওয়াতেন। তিনি বলতেন—“স্বাধীনভাবে যাওয়াত করাই ভালো।

একবার পূজার সময় বাড়ী বাওয়ার মোট পুঁটলি বাধা হয়েছে, বাবা বোড়ার গাড়ী ডাকতে গিয়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁর কামাটা সরাতে গিয়ে পকেটের বড়িটা আমার হাত থেকে পড়ে বিকল হয়ে পেল। বাবা ফিরে এসে বড়ির অবস্থা দেখে রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করলেন না, শুধু বললেন—“না আর আর যাওয়া হ’ল না। বড়ি না সারিয়ে বড়ী যাওয়া চলে না পূজার সময়। ভগবান যা করেন মঙ্গলই হয়।”

আমি ত ভেবেছিলাম—বংশবোনাতি তিরস্কার আছে আমার ভাগ্যে। কিন্তু তিনি কিছুই না বলে বড়িটা নিয়ে ভেঁকে-আনা গাড়ীতে বাগড়া চলে গেলেন বৈকালে বড়ি সারিয়ে কিংলেন। বৈকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হল নারা হাতই বৃষ্টি পড়তে লাগল। তিনি বললেন—বেশলি। ভগবান যা করেন ভালোর অস্ত। বড়িটা নষ্ট হয়ে আমাদের অনেক দুর্গতি হ’তে বাটিয়ে দিল। পরদিন বেলা ষটার পর ঘোষ উঠল, আমাদের নৌকাখাড়া নিরুপদ্রব হ’ল।

[ক্রমশ]

বাঙলা দেশের শিক্ষা সমস্যার একদিক

ডাঃ বিনোদ বিহারী মল্ল, এম্-এ, এম্, এম্ বি, পি, এম্-ডি

বাঙলা দেশের বর্তমান শিক্ষাসমস্যার একটা দিক মাত্র আলোচনা করিব। আমাদের শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা বিশ জন। এইবার পাঁচগুণ হইলে তবে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন হইবে। বারোটা প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ, তাহার কতক অংশ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করিবেই। অর্থাৎ বর্তমানে স্কুল কলেজের সংখ্যা যেখান শুধু পূর্বদিকে নয়, বাহায়া আশ্রয়ন শিক্ষাক্রম, বাহায়া শিক্ষার পরিচালক তাঁহারাও আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রতি বৎসর স্কুল কান্টিনাল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা পনের বিশ হাজার কথিয়া বাড়িতেছে। এই বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সোয়া লক্ষের অধিক হইয়াছিল—পাশ করিয়াছে ষাট হাজারের উর্দ্ধ। সকলেই যে কলেজে পড়িতে যাইবে তাহা নহে। অনেক আর পড়িতে পারিবে না—চাকরীর অনুলন্ধান ঘুরিবে। অনেক টেকনিক্যাল ট্রেনিং স্কুলে যাইবে। ইহাও বহু সংখ্যা সামান্য কয়েক হাজার মাত্র হইবে। ইচ্ছা থাকিলেও, দুই-তিনে গিয়া হোটেলে থাকিয়া অনেকেরই এই সমস্ত কারিগরী বা বৃত্তিকরী (professional) স্কুলে পড়িবার সামর্থ্য হইবে না। বাহাযের লাম্বী আছে, তাহাও বহু সংখ্যা শতকরা ১৫ জনের স্থান হইবে না। এই সম্পর্কে এই কথাও মনে রাখা ভাল, এই সব স্কুল হইতে বাহায়া পাশ করিয়া বাবির বর, তাহাও বহু চাকরী ঘোণাড় করিতে কম বেগ পাইতে হয় না। অনেককেই অন্ততঃ দুই দুই বছর বেকার থাকিতে হয়। যদিও বা শেষকালে কোন কালের ঘোণাড় হয়, তাহাতে যা মাঝিনা বেগুনা বর তাহা বারো সংখ্যার নির্বাহ হওয়া, কেবল আমি তাঁহা খোঁজা-খোঁজাটা মনে করি। মোট কথা, বাহায়া পড়িতে চায় এবং তাহাও বহু সংখ্যাই বুঝে বেশি—তাহাও বহু লোককেই কলেজে ছুটিতে হয়। এইটি বাঙলা দেশ। শিক্ষাই আমাদের উচ্চ-

লোকদের একমাত্র industry বা ব্যবসা। না পড়াইয়া ছেলেদের টাকার পেছনে পেছনে ঘুরিয়া বেড়ান আমরা পছন্দ করি না। টাকার পেছনে পেছনে যারা ঘুরিয়া বেড়ায়—না পরজাতীর বিশেষ দার দার না—তাঁহারা আর যাই বোক, আমাদের মতে ভয়লোক হয় না। শিক্ষাই উচ্চ-লোকদের মাপকাটি। না বাইয়াও আমরা ছেলে পড়াই, আরকাল মেয়েও পড়াই। এই পরিস্থিতিতে স্কুল কলেজের সংখ্যা কমানো আমি ভাবিতেই পারি না। বরং বাড়ান ছাড়া উপায় নাই। বাহাযের হাতে শিক্ষা পরিচালনাও তার, তাঁহারা এই কথাটা অবশ্যকার কঠিনে মাথাব্যস্ত হইবে।

অর্থাৎ এই স্কুল শুধু সরকারের নহে, আমাদের শিক্ষাক্রমী মহলেও অনেকের ব্যয়, সাধারণ শিক্ষার উন্নয়ন দ্বারা আমরা বেগার সমস্ত আরও তীব্র করিয়া তুলিতেছি। আমি বহু বছর কলেজ পরিদর্শক ছিলাম। আমার সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাভাব—এই বাঙলা দেশে বারটি কলেজ স্থাপিত হয়। কলিকাতায় ছাত্রদের ভিত্তি অন্ততঃ বেশি হইয়াছে—হাজার হাজার ছেলে এক এক কলেজে টেনাটেনি করে। ইহা স্থাপনার অসুস্থল নহে। কলিকাতার বাহিরে এই সব কলেজ স্থাপন করিলে মধ্যস্থলের ছেলে মধ্যস্থলেই থাকিবে—কলিকাতার ভিত্তি কমিবে, এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্ত কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হয়। এইগুলিকে নাম দিয়াছিল Dispersal College, যদিও এই নামের কোন সার্থকতা নাই। কারণ কলিকাতার ছেলে দুই মধ্যস্থল গিয়া পড়িবে না। কিন্তু বাঙলা দেশের শিক্ষিত মহলে, বিশেষতঃ কলিকাতা কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপক মহলে বৈ চৈ পড়িয়া যায়। তাঁহারা এই পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা

এবং সমালোচনা করেন। তাঁহারের দ্বন্দ্ব মনে মনে
আপত্তা ছিল, তাঁহারের ভাব মাথা ঘাইবে। অর্থাৎ এই
রেশের শিক্ষার চাহিদা সম্বন্ধে তাঁহারেরও স্পষ্ট ধারণা
ছিল না। এই আপনোপন ধামাইতে আমাকে কি উপায়
অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, তাহা এই স্থানে বলিবার
প্রয়োজন নাই। যাহা হউক তাহা কয়েক মাস পরে
ধামিয়া গিয়াছিল।

আমি তাহািলান, বাউক লাভি হইল। কিন্তু বেহাই
হইল না। এই নূতন কলেজগুলি তখন কাজ আরম্ভ
করিয়া বিচ্ছিন্ন। তাহার কয়েক মাস পরে হঠাৎ একদিন
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সর্বোচ্চ প্রধান সদস্য
আমাকে বলিয়া বলিলেন ‘দেখ পর্যন্ত, ডাঃ হস্ত, আপনাকে
এই কলেজগুলির সুপারিশ করিলেন, আপনাদের কাছে
এইটা আশা করিনি।’ তাঁহার কাছ হইতে এই বকম প্রস্ত
উদ্ভূত পাবে, আমি আশাও করি নাই। কারণ তিনি
আন্তর্জাতিকের রাজত্বের লোক। স্বাভাবিকভাবেই
চালনা এবং অসুগ্রেবণায় স্থল কলেজের মজুরী দিতে
বিশ্ববিদ্যালয় কাহারো বাধা বা আপত্তি প্রাপ্ত করে নাই।
সারা ভারতে এই পৌরবের কাহিনীর নজির মিলিবে না।
অবশ্য তাঁহারই ভাবের ধারক-বাহকের মুখে এই প্রস্ত।
বলিলাম, ‘আপনি আমার বলতে পারেন, রাজনৈতিক
উদ্দেশ্যে স্থাপিত হাজিসিং কলেজ, সেভী ব্র্যাবোর্গ কলেজ
এবং ইসলামিয়া কলেজ—হালের এই তিনটি কলেজ ছাড়া
এমন কোন স্থল বা কলেজ আছে, যার প্রতিষ্ঠার সরকার
এক পয়সা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন? এমন কি প্রেসিডেন্সী
কলেজও ত সরকার প্রতিষ্ঠা করে নাই। আর আপনাদের
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন স্থল বা কলেজের প্রতিষ্ঠার্থে বা
পরিচালনার্থে কোন দিন এক পয়সা এই পর্যন্ত দিয়াছেন
কি? বেহার কল্লনাও আপনাদের আছে কি? শুধু
মজুরীর বেলা লম্বা চণ্ডা সর্ব দিয়াছেন এইটা চাই, ওটা
চাই। আর এই নূতন কলেজ করটার টাকাত দিচ্ছে
কেন্দ্রীয় সরকার, যাহাতে মকদ্দমে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা
হয়, দুই দুই জেলার ছেলেরা কলিকাতা সমুদ্রে আনিয়া
ভানিয়া ভুগিয়া না যায়। যে কোন কারণে যেকোন
টাকাত কলিকাতার কলেজগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার যেন

না। তাহা হইলে এই লক্ষ লক্ষ টাকা গ্রহণ না করিলে
বা কেন্দ্র দিলে বেশ বুদ্ধিমানের কাজ হইত? শিক্ষার
কথা ছাড়িয়া দিও, আমি বুদ্ধি আমার বাঙলা দেশে বাহির
হইতে প্রায় কোটিখানেক টাকা আনিব, আনিব। আসলে
আপনাদের আপত্তা হইয়াছে, বড় বড় কলেজগুলির কথা
কি হইবে? তাহারের ছাত্রসংখ্যাও কমিবে না। সরকারের
অভিপ্রের্ত Dispersal হইবে না। এই সুযোগে বাঙলা
দেশে কয়েকটি কলেজ সরকারী ব্যয়ে স্থাপিত হইল,
সরকারী খরচে পরিচালিত হইবে, মন্দই বা কি?

মনে করিলাম কাঁড়া কাটিল। কিন্তু আমার কর্তব্য ত
একজন নহেন। বহুদখানেক পরে, ১৯৪০ সালে, যাবৎপূর
বিষয়গড় কলেজে একটি অস্থান হইয়াছিল। আমি
সভাপতি এবং আমারই অধ্যাপক একজন প্রধান অতিথি।
তিনিও তখন শিক্ষা বিভাগের একজন বড় বর্তা।
কলেজের শিক্ষার তদারক করিবার ভার তাঁহার উপর
এক কালে ছিল—তিনি কিন্তু তখন প্রাথমিক শিক্ষা
বিভাগের কাছে নিরুত ছিলেন—বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষার
মধ্যে। কিরিয়ার সময় তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে
ডাকিয়া নিলেন। পথে বলিলেন, বিনোদ ভূমি ত যেখানে
সেখানে কলেজের affiliation ছিল, কলেজ চলিবে কি?
উত্তর দিতে গিয়া যথার্থ শিষ্টতা বক্ষা করিতে পারিলাম
না। মুখ বিরা বাহির হইল, ‘আপনাদের কাকটা আপনি
ঘরি ভাল করিয়া করিতে পারেন, আমার কলেজের ভাবনা
ভাবিতে হইবে না। ১৯৬২ সালের মধ্যে শিক্ষা সার্বজনীন
করিতে হইবে না, শিক্ষিতের হার ঘরি শতকরা আর পাঁচ
বাড়ীহইতে পারেন, আমার কলেজে স্থান হইবে না। আমি
ত মাত্র চল্লিশটি কলেজের affiliation বিয়াছি, এব
চারগুণ বাড়ীহইতে হইবে। আমি ত কট্টোলাই ছিলাম,
আমার মত অন্ততঃ ছয় জন কট্টোলাই হইলে তবে
বাঙলার চাহিদা মিটিবে।’

আমার কথা সত্য হইয়াছে কিনা, আপনাবাই দেখুন।
তবুও এই সহজ কথাটা শিক্ষাবিষয়গের বোধগম্য
হইতে চায় না। আমার অবসর গ্রহণের অল্প কয়েক মাস
পূর্বে আমারই ভাইসচেন্সেলর মধ্যায় আমাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, ডাঃ হস্ত, এত কলেজে কি হবে? আবার

সেই প্রশ্ন। তাঁহাকে বলিলাম আর কিছু হোক না হোক
canalisation of our youth's energy and
partial solution of unemployment হইবে।
(অর্থাৎ যুবকবৃন্দের উৎসাহ উত্তান খাতে প্রবাহিত হইবে
এবং কয়েক বছরের মত বেকারী ঠেকান দাইবে।)
এতগুলি মূল ফাইনাল পাশ হেলে মেয়েদের ৩৪ বছরের
মত কলেজে আটকান গেল—এই ৩৪ বছরের মত ও
তাঁহারা চাকরীর বাজারে ভিড় করবে না। আর ৩৪ বছর
ও বাড়ি ছেঁড়া বঁড়ের মত বাঙলা দেশ জোপপাড় করবে না
—এইটুকুই কি কম লাভ ?

তিনি বললেন, “Technical lineএ গেলেও ত সে
কাজ হয়। বললাম, হয়। কিন্তু এমন কোন্ Techni-
cal school আছে যেখানে একশত ছাত্রের স্থান থাকিলে,
অন্ততঃ হাজার জন গিয়া বসল। আটকাইরা গাঁড়ায় না ?
নয় শত জন ও গলা থাকা খাইরা কিরিয়া আসে। এই
বেধানো হতভাগারা যাবে কোথায় ?

“এই সব পড়িয়া কি হইবে ?”

“না পড়িয়া কি হইবে, তাহাই বলুন। আমরাও ত
সুকেসেই ঠক—পাঁচশত টাকা মাহিনা পায়, তার মোটর না
হইলে চলে না। কালেই আমাঘের ঘুং বেতে ছত, সোক
ঠকাইতে হয়। আমার কথা হলো, আনাঘের সফর হুঁচি
নাই। যে টাকা ছেলে মেয়েদের শিক্ষার খরচ করিতাম,
যাবুয়ানার খরচ হইয়া বাইবে। বস্তান, আমার সফর হুঁচি
আছে। একটা ছেলেসেক এন্ এ পাশ করাইতে আমার
ছয় হাজার টাকা খরচ হইবে—এই ছয় হাজার টাকা আমি
সমাশিলাম। বোয়ান ছেলেটাকে ছয় বছর বসাইয়া রাখিয়া
তার হাতে ছয় হাজার টাকা দিলে তার কোন্ ইহকাল
পরকাল উদ্ধার হইবে ? ছয় বছর একটা যুবক বেকার
বসিয়া থাকিলে সে মানুষ থাকিবে কি ? কেবল ম্যাজিক
পাশ করিয়া বড় জোর কত মাহিনা পর্য্যন্ত পেতে পারে ?

“তা ছাড়া, আপনাঘের আলপ কথাটাই আমি মানি
না। ঐরকম Technical শিক্ষার দ্বারা উৎসাহের
সংস্থান হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভারতের পৌরব বিশেষ
বাড়িবে না। তাহারা ভারতের পৌরব বর্ধন করিতে
পারে, এমন মেথাবী ছাত্রদের হাবাইয়া বাবা ঠিক হইবে

না। আর humanities অর্থাৎ মানসিক শিক্ষাকে
অবজ্ঞা করিলে মানস দৃষ্টি হইবে মাত্র। আমরাও মানব
হইতেছি—তা না হইলে ঘুং খাইব কেন ? তাহাই সব
—ঐরকম পুড়িই একমাত্র লক্ষ্য—বড় সামাজিক কথা।
না খাইয়া মানুষ থাকে না মৃত্যু—কিন্তু খাওয়াটাই মানুষের
সব নথি এই কথা ভুজিবেও ভুলিলে চলিবে না। বহু
যে দিন ভুজি, সেইদিনই মানুষের চরম অধঃপতন হইবে
—মানুষ হইবে পশু। আমরা চাইয়াছিও তাই।”

ইহারও তিন বছর পরে—আমি তখন অদূর গ্রহণ
করিয়াছি—শিক্ষা বিভাগের একজন বড় কর্মী আমার
আমার অভিযোগ করিলেন “আপনার কি ? আপনিও
গাছ তলায়ও কলেজ বন্ধের বিরুদ্ধেছেন।” আমার এই
বহনাম কি কোনদিন গাইবে না ? উত্তর করিলাম,
“কলেজ বন্ধিয়েছি যেন আপনার চাকরী আছে। তা
না হলে আপনি কতএম কি ? কোন্ গাছ তলায় ?
এখন একবার দেখে আসুন ত ?

“জানাঘের ছিঁড়ে কেলে দিলে। আমরা টাকা দিলাম,
তবে ত হোল।”

“আপনাঘের টাকা বেগাই ত কাজ। টাকাও
আপনার মত। যাঘের টাকা, তাহেই ছেলে মেয়েদের
শিক্ষার লক্ষ বিচ্ছেদ। আপনাঘের কি টাকা ?”

আমি বলি, তাহারা কলেজ পড়িতে যায়, তাহাঘের
মধ্যে অনেকটাই উচ্চ শিক্ষার যোগ্য নাহ। তাহারা হয়ত
কোন কারিগরী শিক্ষা পাইলে ভাল হইত। কিন্তু
কারিগরী শিক্ষার অতো বন্ধোবস্ত ত নাই। কারিগরী
শিক্ষার আয়োজন আরও বিগত তিনগুন বাড়াইলেও
কলেজের ভিড় কমিবে না—এই বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।
যাহারা এই বৃকম মাশা পোষণ করেন, ইচ্ছা করেন, তাঁহাঘের
ইচ্ছা হুজিসমত হইলেও পানিলে তাহা হইবে না। কারণ
এখনও শতকরা আশি জন নিরক্ষর এই বাঙলা দেশে।
আর কারিগরী শিক্ষার পাশ করা ছেলের চাকরীর সুযোগও
এই দেশে এখনও এত নাই। সহকার, স্বাক্ষরাতিক নেতা
—সকলেই একযোগে এই বিষয় অবহিত হওয়া বরকার।
বাঙলায় চাকরীতে বাঙালীই বাবী অগ্রগণ্য। তাহারা
মনে করিতেছেন, একারণ স্ট্রের মূল করিয়া এই
যৌবনজালতরঙ্গ রোপ করিতে পারিবেন, তাহারা ভ্রান্ত।
আর তাহারা ভাবিতেছেন, বাঙলা দেশে বাঙালীকে বেশি
দিন ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন, তাহারা অজ্ঞ।
বাঙালী যুবক বেশিবে বক্ষ্য নাই। নেতাঘের অসুযোগ
করি, আমাঘের যুবকদের কাজ করিতে দেখান, কাজ
করিবার সুযোগ করিয়া দি। আমরা পড়িব, করিব,
বাজিব।

মিলিটারী সাহিত্যিকের ডায়েরী

শ্রীঅবনীনাথ রায়

দিল্লী

১৯২৬ সালে আমি নিচাট থেকে দিল্লী বদলী হয়ে আসি। দিল্লী সহরে নয়, নিউ ক্যান্টনমেন্টে—এখন নাম হয়েছে দিল্লী ক্যান্টনমেন্ট। এ একটি আশ্রয় সহর—দিল্লী থেকে ১২ মাইল দূর, শুধু দৈনন্দিনের থাকবার জন্য ব্যাবাক, হাসপাতাল, পোস্টাফিস, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি আছে কিন্তু একেবারে নির্জন—সিভিল পপুলেশন বা বাসিন্দা নেই নেই বললেই হয়। সহরের মাঝখানে একটি ছোট বাগার—সেখানে পেঁয়াজ, আলু, আর মাংস ছাড়া আর কিছু পাওয়া যেত বলে মনে পড়ে না। পবিত্রের পবিত্রের দীর্ঘ রাস্তা ধু ধু করছে—কিন্তু পথচারী নেই। দৈনন্দিনের কুচ-কাওয়াজ, দিউগেলের ধ্বনি, মোটরের হর্ন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই—পোষাক কেবল খাকি, খাকি, খাকি—শাকিব সমাহার। চারিদিকে ছোট ছোট বাগান গাছ—স্থানটি স্বাস্থ্যকর বলতে হবে। গৃহস্থালীর অবিকানে জিনিষ দিল্লী সহর থেকে আনতে হত।

এ ছেন জনবিরল সহরে আমার মত অভাবাজ লোকের দিন কাটে না। আগুন তো উপলব্ধ—তার সম্বন্ধ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ত মনেই বসব চাই। এক ছিলেন সান্যাল মশায়—সত্যেন্দ্র নাথ সান্যাল—পাণ্ডার হাউসের এন্ট্রি, ডি, ডি। তাঁর তাস খেলার (ত্রিখ খেলার) ছিল দুইয় ব্যতিক—বোঝ না বেশে পেটের ভাত হদ্য হত না। সেখানে এসে ছুটতেন ক্যাপটেন মিত্র, ক্যাপটেন বোস এবং লেফটেন্যান্ট রাও। কোন দিন খেড়ু কম গড়সে আনি শূন্য স্থান অবিকার করতুম। কিন্তু সুবিধা হ'ত না। বেলায় আমার ভুল হত। সান্যাল মশায় চটে যেতেন।

সুতরাং আমাকে নতুন রস সংগ্রহ করতে হত দিল্লী সহর থেকে। সহরের সঙ্গে ক্যান্টনমেন্টের যোগ ছিল ট্রেন ব্যবস্থা কিন্তু ট্রেনের সংখ্যা ছিল কম। ইচ্ছে করলেই বাগরা যেত না। অতএব আমি সাইকেল যোগেই এই

১২ মাইল পথ যেরে বিড়ম্ব। অভ্যাসে আরে আবার ১২ মাইল পথ অতিবাহন করে রাখে। বগুহে প্রত্যাহর্তন। এখন এই ব্যসে বিগত দিনগুলির দিকে তারিখে মনে হয় দৈনিক ২৪ মাইল সাইকেল চটা কি করে গেয়েছিলাম।

দিল্লী সহরের ক্যান্টনমেন্টের মাঝখানে আর একটি ষ্টেশন আছে—তার নাম সেতাই রোহিলা। এই ষ্টেশনে নেমে আনন্দ পর্যন্তের উপর চড়লেই পাওয়া যেত রামধন কলেজ। এই কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ডাঃ সুহুমার দত্ত, ইনি বহিঃশিল্পের বেশবিস্তৃত জনস্বাক্ষর অধিনীতুমার হস্তের ভাইপো। বিপণ কলেজে আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম। আনন্দের সেই স্মৃতি অজুহ ছিল। আমি মাঝে মাঝে সুহুমার বাবু বসায় ধান্য হিলাম। সেখানে বাগার জন্য সাইকেলের পথ ছিল না। আমি পাখাড় অর্জিতকম করে যেতুম। সুহুমার বাবু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, ওবনী (উনি আমার নাম ঐরকম উচ্চারণ করেছেন), তুমি পাখাড় স্তেজে এসে, সাপ পোক-মাকড় আছে না? আমি সুহুমারী বীরের মত বলতাম, আছে নিশ্চয়ই—তবে আমি তাদের পরোয়া করি না।

সুহুমার বাবু সেই যে দিল্লী এসেছিলেন এখনো দেখােনেই রয়ে পেলেন। কলেজের চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন—বহিঃশিল্প এখন পাঠ্যস্থান। সুতরাং দিল্লীই ভাল।

দিল্লী সহর তখন মন্দ মন্দ করছে—বাঙালীরাই ধারণ প্রতিলিপি। ইণ্ডিয়া গবর্নমেন্টে তখন বাঙালীরাই বড় বড় পোষ্ট অবিকার করে আছেন এবং দিল্লী সিমলা করছেন। মার ভূপঞ্জনাথ মিত্র তখন তাইদহরের কাউন্সিলের মেম্বর। ডাক্তার বলতে তখন বাঙালীরাই এখান—অনাধের মধ্যে ডাঃ আনুগারি এবং হাকিম আবদুল বাখ্যাতনামা। ডাঃ আনুগারির সহকারী ছিলেন ডাঃ সুব্রজ

হুমার সেন। ইনি মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োগবিশেষের সময় তাঁর স্বাস্থ্যের প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষক ছিলেন। আর একজন সহকারী ছিলেন ডাঃ শৈলেন্দ্র হুমার সেন। ইনি টি, সি, বোগের বিশেষজ্ঞ—পরে ভরপুরে চলে যান। মেজব অবস্থিক দায় চৌধুরীও ছিলেন টি, সি, বোগের বিশেষজ্ঞ। ডাঃ খে, কে, সেন, ক্যাপ্টেন ইয়ুতোষ মিজ, ডাঃ এ, সি, সেন (রায় বাবু), ডাঃ এইচ, পি, সেন, ডাঃ অতুল বোস, ডাঃ বি, সি, সেন, ডাঃ ষপেন বোশ, ডাঃ বে, পি, পঃশুদী, ডাঃ টি, এন, বোশ, ডাঃ আই, এম, রায় প্রভৃতি। ষ্টেশনের কাছে কোয়ার্টার গুল্লের বড় হোকান এইচ, সি সেন এণ্ড কোং—সেখানে ২জন ডাক্তার ছিলেন—একজন এলোপ্যাথিক, নাম নিবারণ সেন শুণ্ড এবং আর একজন হোমিওপ্যাথিক, তাঁর নাম বীরেন্দ্র শুণ্ড।

সংখ্যা অল্পপাতে ডাক্তারদের পরেই স্থান ছিল অধ্যাপকদের। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক সুব্রহ্ম হুমার সেন (ডাঃ সুবীর হুমারের অগ্রজ), অধ্যাপক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক চাক্রক মিজ, অধ্যাপক সুবোধক্ল সেন শুণ্ড, (পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে) অধ্যাপক কেশবচন্দ্র নাপ, অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, অধ্যাপক অম্বিনীহুমার মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি। সেন্ট ফীকেনের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন প্রফেসার মুখার্জি।

উকিল ছিলেন অক্ষয় হুমার বহু—(বরিশাথয়ে) এবং সময়েজ নাথ বহু (বরিশা)।

কোলিয়ারিও স্বাবিকারী ছিলেন সূতাপোপাল ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক ছিলেন যামিনীকান্ত সোম। চিকিৎসার সাহায্যেজ উকিল, বরদা চরণ উকিল এবং বরদা চরণ উকিল।

এইচ, সি সেন কোলানৌর স্বাবিকারী রাসবিহারী সেন এক বিচিত্র মানুষ। তিনি আছ বাবু নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। বৃহৎ কাককর্মে আশ্রয় আণ্যায়নের তার নিতে তিনি শিঙ-হস্ত। কংগ্রেসের এবং নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সংমেলনের প্রতিনিধিদের বিল্লী অধিবশনে তিনিই খাওয়ানো খাওয়ানো এবং বাজ্জা বিবানের তার নিরেছিলেন। অতুতকথা—বাড়ি খর চুরার সব ছেড়ে দিনের পর দিন ক্যাম্পে পড়ে

থেকেছেন। বিল্লীতে এমন কোন বাঙালীর মৃতদেহ নেই যার পেলে থাকে আছ বাবু কাঁধ যেন নি।

বিল্লীর সঙ্গে আমার সাহিত্য জীবনে প্রবেশের একটা অতুত যোগ আছে। একবার বাঙালী ক্লাবে বরীজনাথের “কাজুনী” নাটক অভিনীত হবে স্থির হল। পানডলির দ্বয় আন্তর করে নিতে মনুষ্য সেন বিল্লী থেকে শান্তি-নিকেতনে গেলেন এবং সেখানে একমাস থাকলেন। চিত্র শিল্পী সারদা উকিল তিন দিন ঘুরে ঘুরে একখানি বাঁকা আনের ডাল সংগ্রহ করে আনলেন—সুচীর সাজান হবে। অধ্যাপক সুব্রহ্মহুমার সেন (তিনিই বেঙ্গল ক্লাবের সেক্রেটারী ছিলেন) এতদ্বা কলেন যে অভিনয়ের দিন যে প্রোগ্রাম বর্ণকথের মতে বিলি করা হবে তার গোড়ার থাকবে “কাজুনী”র সম্বন্ধে একটা আলোচনাপূর্ণ নিবন্ধ। অকস্ম-কোডের সেক্সপীয়ারের নাটক অভিনয়ের সময় নাকি প্রোগ্রামে এই রকম থাকে। সেবার তার পড়ল আমার উপর। নিখলান এবং সেটা ছাপাও হল। অধ্যাপক সুব্রহ্মহুমারের সেখাটি এক ভালো লাগলো যে তিনি সেটা কোন মাদিকপজে ছাপানোর নির্দেশ দিলেন। পাঠান হল কাশী থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালীঘের কাগজ উত্তরায়। সুব্রহ্ম বাবু সেটা কিবিয়ে দিলেন। বিল্লীর বহুরা বনলেন না। পাঠালেন “দবুতপজ” সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর কাছে। বীরবল সেটা যে ছাপলেন তাই নয়—তার গোড়ার বিল্লীর প্রবাসী বাঙালীঘের বাঙলা আবার প্রশস্তি করলেন এবং ফরাসী বৈশের কোন পত্রিকা থেকে স্তম্ভমা করে দেখালেন যে “কাজুনী”র সম্বন্ধে বিল্লীর ভাবধারা এবং প্যারিসের ভাবধারা হবহ এক। সেদিন আমার বহুবুর যে কী আনন্দ তা না দেখলে হোতাম যাবে যাবে না। তাঁরা সেদিন আর কোন কাজই কলেন না—কেবল এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি চা পাটী ক’রে বেড়ালেন। এই ঘটনার ফলে আদহা নিধের উপর একটা আত্মবিধান জমাল।

ডাঃ সুব্রহ্মহুমার সেন, ইন্ডিনিয়ার সূতাপোপাল ভট্টাচার্য, ডাঃ বীরেন্দ্র শুণ্ড এবং আমি ছিলাম অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বহু। বীরকাজ আছ হৈতে নেই।

কলিকাতার প্রাচীন ঐতিহ্য

ঐতিহ্যবাহী মুখোপাধ্যায়

“জগৎতর দেহা বাহন নগরী”র অন্ততম কলিকাতা।

কিন্তু তাহার ঐতিহ্য ততটা প্রাচীন নয়। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সাম্রাজ্যের মল্লিক গণের ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ বণিকগণ ভারতবর্ষে প্রথম স্থায়ীভাবে এসে আসন্ন গ্রহণ করে। তাহার কিছু পরে তাহার সুতাহারের মল্লিকগণ কলিকাতা গোবিন্দপুর গ্রামে বসবাস করিয়া লয় ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার বাংলায় স্থায়ীভাবে স্থায়ীভাবে আসন্ন গ্রহণ করে। তাহার কিছু পরে তাহার সুতাহারের মল্লিকগণ কলিকাতা গোবিন্দপুর গ্রামে বসবাস করিয়া লয় ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার বাংলায় স্থায়ীভাবে স্থায়ীভাবে আসন্ন গ্রহণ করে। তাহার কিছু পরে তাহার সুতাহারের মল্লিকগণ কলিকাতা গোবিন্দপুর গ্রামে বসবাস করিয়া লয় ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার বাংলায় স্থায়ীভাবে স্থায়ীভাবে আসন্ন গ্রহণ করে।

এই ইতিহাস সকলেই জানা আছে। কিন্তু ইংরাজ আমলের ইতিহাস দেখে অবিকার্য লোকেরা অস্পষ্ট বা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। তাহার মনে করেন ইংরাজদের আগমনের পূর্বে কলিকাতার আর্থিক কোন ঐতিহ্য ছিল না। কিন্তু প্রকৃত সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। ইংরাজদের আগমনের আগে কলিকাতা মহানগরীর নগরী লোক ছিল না। কিন্তু তখনও তাহা বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট স্থান বলিয়াই স্বীকৃত হইত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে মহাশয় কলিকাতা এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছিল এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে ইংরাজদের আগমন পর্যন্ত এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ ছিল। এ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে সেগুলি উল্লেখ আশেচনা করিব।

“সিদ্ধ ইন্দু বৈষ্ণব মণী” অর্থাৎ ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্রদাস পিপলাই নামক জনৈক কবি একখানি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তিনি ঠিক মহানগরের সমুদ্রতীরের বৈষ্ণব বিদ্যাধেন, তাহার মধ্যে ‘কলিকাতা’র উল্লেখ আছে—

পূর্ব হ্রদ বাহিনী এড়ার কলিকাতা।

যেতুড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাণো মহাবন।

ইহাই কলিকাতার প্রাচীনতম উল্লেখ।

ইহার কিছু পরে, ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে গুরু নানক কলিকাতার পরিদর্শন করেন। ঐ সময় তিনি পরবর্ত্তে পরবর্ত্তে ভারতে প্রথম ও ধর্মপ্রচার করিতেছিলেন। কলিকাতার একজন ভক্ত ভিত্তি তিনি কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই স্থানটি বর্ত্তমানে হাবিদন বোড বা মহাত্মা গান্ধী বোডের উপর অবস্থিত। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবের গুরু তেগ্‌বাহাদুর স্থানীয় ভক্তদের নিষ্ঠা হইতে এই স্থানটি ক্রয় করিয়া এখানে একটি গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠা করেন। পার্শ্ববর্তী তাহার লেখা গুরু নানকের জীবনী গ্রন্থে এই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। গুরু তেগ্‌বাহাদুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গুরুদ্বারের ভবনটি ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অগ্নি বর্ত্তমান ছিল। অত্যন্ত ধীরে ধীরে পড়ায় বর্ত্তমানে উহাকে ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে এবং তাহার স্থলে একটি নতুন ভবন নির্মাণ করা হইতেছে। এই গুরুদ্বারটি বড় শিব শক্তি গুরুদ্বার নামে পরিচিত।

ইহারপরে, ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত আবুল ফজলের আইন ই আকবরীতে ‘কলিকাতা’র উল্লেখ পাওয়া গাইতেছে। আবুল ফজল লিখিয়াছেন, আকবরের রাজত্ব-কালে বাংলা সুবা কয়েকটি সরকারে বিভক্ত ছিল, প্রত্যেকটি সরকার আবার কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত ছিল। এই সমস্ত সরকারের মধ্যে অন্যতম ছিল সাতগাঁও এবং তাহার অন্তর্গত অন্যতম পরগণা ছিল কলিকাতা।

মনে হয় এই সময়েই কলিকাতা একটি বিশিষ্ট জনপদ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে রচিত মুহম্মদানের চতুর্থমুদ্রণে অবশ্য ‘কলিকাতা’র উল্লেখ পাই দুই জায়গায়। এক জায়গায় আছে,

খালিপাড়া মহাশয় কলিকাতা চুচিনা দুইকুলে

বসাইয়া বাট।

পাথানে রচিত ষাট ছুঁলে বাতী মট কিঞ্চরে

বশায় নানা ষাট।

এই অংশটি অবিক্রাংশ পুথিতেই পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাকে প্রকৃষ্ট বলিবার উপায় নাই। ১৬৪২ শকাব্দ বা ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একটি পুথিতেও অনুরূপ এই অংশটি পাইয়াছি। সেখানে এই পাঠ দেখা যায়,

কাশীঘাটা মহাশয়ান কলিকাতা কুচিনাম ছইকুপে

বসাইল ষাট

পাথানে রচিত ষাট ছুঁলে বাতী মট কিঞ্চরে

বেগায় নানা বাট।

মুকুন্দরামের চতৌদশকের অপর যে আত্মপ্রায় 'কলিকাতা'র উল্লেখ আছে, তাহা ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের পুথিতে পাই নাই কিন্তু অল্পকৃত পুথিতে ও মুদ্রিত গ্রন্থে পাইয়াছি। সেই অংশটি এই,

কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ায় বাংলা।

বেতজুতে উত্তবিল অবনাম বেলা।

বেতাই চণ্ডিকা পূজা কৈল সাবনানে।

দশম গ্রামস্থানী শাধু এড়াইল বামে।

এই সময়ে বা ইহার অব্যবহিত পরবর্তীকালে কলিকাতার ইউরোপীয় বণিকেরা আসিতে আরম্ভ করে। ইহার মধ্যে আর্মেনিয়ানরা সত্তবন্তঃ সর্বপ্রথম আসিয়াছিল। কলিকাতার আর্মেনিয়ান গির্জার সংলগ্ন গোরস্থানের একটি সমাধির কলকের লিপি হইতে জানা যায়—ঐ সমাধি মুকিয়ান নামক ঈদেক আর্মেনিয়ান বণিকের পত্নী দেবাবীয়ার এবং ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সমাধিকলক উৎকর্ষ হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিক কলিকাতা স্থান হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল, নতুবা এক হ্রস্ব হইতে বিদেশী বণিকেরা আসিয়া এখানে বস করিত না।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলিকাতার গুরুত্ব এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সন্নিকটবর্তী অঙ্গুলের লোকেরা কলিকাতার উল্লেখ করিয়া নিজেরদের বাসভূমির পরিচয় দিতেন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে কলিকাতা দ্বীপ নামক ঈদেক কবি একখানি কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। ঐ সময়ে ভারতের সম্রাট ছিলেন ঔরঙ্গজেব এবং বাংলার

সুবেদার ছিলেন শায়েস্তা খাঁ। একথা কলিকাতা নিজেই বলিয়াছেন,

অবং শাহা ক্ষিতিপাল বিপুল উপরে কাল রামরাজা

দর্শনেন বলে।

নবাব শায়েস্তা খাঁ অবিকারী সাতগাঁ। বহু সতকার

কহতলে ॥

শায়েস্তা খাঁ ছইবার বাংলায় সুবেদারী করিয়াছিলেন; প্রথমবার ১৬৬৪ হইতে ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দ এবং দ্বিতীয়বার ১৬৭২ হইতে ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

এই কলিকাতা দ্বীপ কালিকামঙ্গলে আত্মপরিচয় প্রদান উপলক্ষে বলিয়াছেন,

অতি পুণ্যময় খাম সংকার সপ্তগ্রাম কলিকাতা

পতঙ্গা শুভ

বরদী নাহিক জুল লাকবীর পূর্বকুল নিমিত্ত। নামেতে

গ্রাম যায় ॥

অল্পকৃত কলিকাতা লিখিয়াছেন,

ভাগীরথীর পূর্বতীর অপকুল নাম।

কলিকাতা বলিহু নিমিত্ত। অমৃ স্থান ॥

১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে কান্ডেন্স ব্রোক নামে ঈদেক বণিক এই যেনের একখানি মানচিত্র আঁকিয়াছিলেন। তাহাতে ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীরে Calcutta বন্দরের নাম লিপ্যঙ্কনে লিখিত হইয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলিকাতার প্রাণান্ত সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে সনাতন ঘোষাল বিভাগীশ নামে একজন বাঙ্গালী কবি ভাগবতের প্রথম নয় স্কন্ধ বাৎসর্য অল্পবার করেন। দ্বিতীয় স্কন্ধের অল্পবারের শেষে তিনি লিখিয়াছেন “যোগেশ ঘোড়শ শাকে তৈব শেষ হৈতে” অর্থাৎ ১৬১৬ শকাব্দের পৌষ মাসের শেষে বা ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসের ঐ স্কন্ধের অল্পবার সম্পূর্ণ হয়।

এই সনাতন ঘোষাল বিভাগীশ নবম স্কন্ধের অল্পবারের শেষে লিখিয়াছেন যে তাঁহার পিতামহ কলিকাতা কলিকাতা ঘোষাল বংশের সন্তান ছিলেন,

কলিকাতা ঘোষাল বংশে কলিকাতা।

উঁয় পুত্র জ্বন বিধিত রামচন্দ্র ॥

তাঁহার মধ্যম পুত্র করি শিশুসীমা।

ভাষাভাষ্যত বিজ্ঞানীগণ রচিল।।

সনাতন যোগাল যখন সপ্তরশ শতাব্দীর শেষ দশকে বর্তমান ছিলেন, তখন তাঁহার পিতামহ কৃষ্ণানন্দেব ভাবকাল সপ্তরশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরবর্তী নয়। ঐ সময়ের মধ্যেই কলিকাতা এতখানি প্রাচুর্য লাভ করিয়াছিল যে যোগাল বাণেশ্বর সঙ্গে তাঁহার নামটি যুক্ত হইয়া গিয়াছে। ইংল্যান্ড বঙ্গের ইংরাজদের আগমনের আগে কলিকাতায় অণু-কার্যেই বাস ছিল না, সনাতন যোগালের ইচ্ছা তাঁহারের ত্রাণি অপনোদন করিবে।

হুতরাং ইংরাজের আগমনের আগেও যে কলিকাতা একটা মধ্যম জায়গা ছিল না এবং তাঁহার ঐতিহ্য যে অস্বস্তি প্ৰচলিত বঙ্গদেশের পুরাতন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতে পারা যায়, বর্তমান কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত কয়েকটি স্থানের প্রসিদ্ধি অচ্যুত

প্রাচীন। তীর্থস্থান হিসাবে কালীঘাট বহু শতাব্দী ধরিয়াই বিখ্যাত। বরাহনগরে স্বয়ং চৈতন্যচরণ পদার্পণ করিয়াছিলেন, একথা বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়। পাইকপাড়া প্রাচীনকালে 'পল্লবপল্লী' নামে পরিচিত ছিল। এখানে ষোড়শ শতাব্দীতে এক রাজপরিবার বাস করিতেন। এখানকার রাজা মহানারায়ণ কবি গোবিন্দ দাস কবিরাজের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। দেবীভাগবত হইতে জানা যায় অগেকার দিনে বেহালা হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত অঞ্চল কালীক্ষেত্র নামে পরিচিত ছিল এবং তাহা কান্দীর মত পূজ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য হইত। এই অঞ্চলের কেন্দ্র ছিল কলিকাতা, কাজেই তাহার যে তখনকার দিনেও প্রাচুর্য থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই।

প্রাচীন কলিকাতার সীমা ছিল এখনকার বৌদ্ধন স্ট্রীট হইতে শুরু করিয়া বর্তমান স্ট্রীট পর্যন্ত। ইহার উত্তরে ছিল হুতাহুতি এবং দক্ষিণে গোবিন্দপুর।



হেডমাস্টার

(একাঙ্কিকা)

শ্রীমহিরকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ. ডি. ফিল

(পূর্ণাহুতি)

প্র, শিঃ অপবেশবাবু হুনীন্দবাবু এঁরা সকলেই নতুন
টিচার, যরেনবাবু প্রিন্সতোষবাবুর মত অভিজ্ঞ শিক্ষকদের
মত কি আর পড়তে পারবেন ?—কি বল ?

মানিক : আমাদের বেশ ভালই লাগছে। বাঙলা ভূখণ্ড
এগুলো নতুন ধরণে পড়ান হচ্ছে।

প্র, শিঃ কি বকব ?

নূপেন : যেমন ব্যাকরণের বিভক্তি ধাতুত্বপ এখন আর
কর্তৃক করতে হয় না। আধুনিক পদ্ধতিতে যুগপৎ
করা নেই। বাঙলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভারতের
অন্য ভাষার নাম শিখছি, আয়ত্তি করার কার্যনা নির্ধারে
বেগুলা হচ্ছে, প্রাচীন কাব্য থেকে মাঝে মাঝে আয়ত্তি
করে শোনান মাস্টার মশায়।

প্র, শিঃ বেশ খুশি হলো। তা বলে পুরাণো শিক্ষকদের
অন্তর্ভুক্ত করবে কেন ?

মানিক : না স্তার কণ্ঠনো নয়।

প্র, শিঃ তোমরা হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে গাড়িয়ে অধীকার
করছ, আর ক্লাসে বসে প্রবীণ শিক্ষকদের চেহারা,
পোষাক, শাটের উপর মুতিপরা নিয়ে মন্তব্য কর।
অনেক সময় অন্তর রকমের মন্তব্য হয়, বিখ্যাপ করতাম
না, কিন্তু নিজেব কানে শুনেছি।

নূপেন : কিছু অগত্য ছেলে লব সময়ই থাকে, সবাই
সেরকম নয়।

প্র, শিঃ বেশ মাননীয়। কিন্তু বল যেখি পুরাণো শিক্ষকদের
বেলাই এ-ধরণের অনভ্যুত্যা হয়, বেছে বেছে নামকরণ
করা হয়েছে—এর তাৎপর্য কি ? তোমরা ইউনিয়নের
ভিতর নেই তো ?

[ছাত্রদের মুখ চাওয়া-চাওয়া কবল]

মানিক : স্তার, বসেনবাবু বলেন ছাত্রদের একটা নিজস্ব

প্রতিষ্ঠান থাকা ভাল। এখন থেকেই আমরা ভবিষ্যৎ
কৌশলের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠব।

প্র, শিঃ আমি বুঝতে পারি না তোমাদের কথা। গত
বিশ বছর ধরে এই স্কুল থেকে শত শত ছাত্র পাশ করে
গেছে, তারা উন্নতি করতে পারেনি ভাংবোন !

নূপেন : অস্ত সব স্কুলে এ-ধরণের ছাত্র-শংসব হয়েছে এখন-
কার সরকারি স্কুল, বঙ্গব্রহ্মপুত্র, গীতম, বিলগঞ্জ,
আমরা তো নতুন কিছু করছি না।

প্র, শিঃ ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক বিষয় হয়ে
উঠবে, তোমাদের কাছে এ ক্ষতি কিছুই নয় ?
বিলগঞ্জে ছেলেরা বর্ষব্যট করল, কত ছাত্রকে স্কুল
ছেড়ে দিতে হল, গীতমের স্কুলের পরীক্ষার ফল কি
শোচনীয় হচ্ছে কয়েক বছর ধরে।

মানিক : (সবিস্ময়ে) 'বিষয় হয়ে উঠবে কেন ? ছাত্র-
শিক্ষক সম্বন্ধ দিন দিন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। আপনি
যেথেকেই অপবেশদা আমাদের সঙ্গে স্কটল খেলেন,
প্রকাশবাবু পড়ার বিষয় ছাত্রাও অনেক কিছু বলেন,
বুঝিয়ে যেন, বমেখদার কাছে আমরা নিরক্ষিত যাওয়া
আসা করি—সম্বন্ধ তো ভালই হয়ে উঠছে। বিলগঞ্জে
শিক্ষক-ছাত্রের কোনকালেই সম্বন্ধ নেই।

প্র, শিঃ তোমরা ছেলেমানুষ, তোমাদের সব দখ কথা
আলোচনা করা যায় না। এটা বুঝতে পারছ না।
টিচারদের মধ্যে ভাগাভাগি হলোবলি বটী হচ্ছে।
কয়েকজন নতুন শিক্ষক ৪০০ ছাত্র নিয়ে বিবেকানন্দ
বিভাগ্যবিশ্ব ভাঙবে ?

নূপেন : বমেখদা বলেন আমরা এ-স্কুলকে কলেজ করব।

প্র, শিঃ কলেজ করবে, তাই ইউনিয়ন করে তার গোড়া-
পত্তন। প্রবীণ শিক্ষকদের আর পছন্দ হচ্ছে না,

হেডমাস্টার মশায় বুড়ো হয়ে পড়েছেন, পড়ান ঠিক হচ্ছে না। কেমন! আর কি কি করবে তোমরা ?

[ছাত্রঘরকে নির্ধাক দেখে]

বল, উত্তর দিচ্ছো কেন ? বলবে না, আম্মা তবে আমার কথা শোন : ইউনিয়ানই বল আর ছাত্র সংসদই নাম হাও, আমি ওসব করতে অস্বীকার হিতে পারি না।

যাও বলে হাও সকলকে।

সুপেন ও মাদিক : কিন্তু স্তার আমাদের সব ঠিক হয়ে গেছে। উৎসাহনের তারিখ অনুষ্ঠান পর্যন্ত, কার্ড ছাপতে চলে গেছে।

এ, শি : কী, আমায় না জানিয়ে, কোন অস্বীকার অংকনা না করে। বলছিলাম না শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক বিময় করে তুলেছে তোমরা, বেশ তার লাজলো পুঁঠায়।

মাদিক : আপনাবই উৎসাহন করার কথা।

এ, শি : নো, নেভার। কখনো না। যাও যাও বোষণা করে হাও কিছু হবে না।

সুপেন : এত আয়োজন আমাদের পত্ত !

এ, শি : যাও, গোট আউট।

[অল্পপরে ছাত্রঘরের প্রস্থান। কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ নীরবতা বড়ির টক টক ভিন্ন আর কোন শব্দ নেই। হেডমাস্টার চেয়ার ছেড়ে উঠে খানিক পাইচাচি করলেন, মুষ্টিবদ্ধ হাত পিছনদিকে, সাতকড়ি মল বেঁধে গেছে—পান করলেন সমস্ত জল। বা বাবে বিবেকানন্দের ছবির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে বসিলেন, পাশের বিচার্ডসনের প্রতিচ্ছবির দিকে কয়েকবার তাকালেন। তারপর কি ভেবে পরহার নিকট এলেন।]

[সেই মুহূর্তে একঘল ছাত্র প্রবেশ করছিল]

এ, শি : তোমরা.....কি ব্যাপার ?

[অবিনাশ এগিয়ে এল]

অবিনাশ : স্তার আপনামি সোমবার ২৩শে আমাদের ছাত্র-সংসদের প্রথম অধিবেশনে, আপনাকে উৎসাহন করার আকান জানাতে এসেছি।

এ, শি : তোমাদের আয়োজন বার্ষ হওয়ার আমি দুঃখিত। যা বা বরত ইতিহাসে করেছ তার তালিকা দিয়ে বেগ আমি পূরণ করে দেব। আমার না-জানিয়ে এ-ব্যবহার তারিখজানহীন কাজে আর হাত দিও না।

[ছাত্রেরা প্রথমটা ব্যাকস্মৃতিহীন। সামান্য অস্বুট শুধন]

অবিনাশ : আপনাব কথা বুঝছি না, কিসের কতিপূর্ণ ?

এ, শি : মাদিক সুপেনের সঙ্গে কথা হয়নি ? ইউনিয়ন

সংঘে আমার নিষেধের কথা বলেছে নিন্তর।

তোমাদের আয়োজন পত্ত হওয়ার আমি দুঃখিত।

পরিমল : আমরা তো কোন ইউনিয়ান প্রতিষ্ঠা করছি না।

সুপেন সমস্ত ছাত্র একত্রিত হবার, একসঙ্গে অনুষ্ঠানে কোন ব্যবস্থা নেই, আমাদের উত্তোপ সেইমতে। ছাত্র-সংঘের গান প্রবন্ধপাঠ কবিতা ছোটখাট বক্তৃতা এইসব হবে, এতে আপনাব সম্পূর্ণ সমর্থন পাব বলেই আমরা ধরে নিয়েছি।

এ, শি : ইউনিয়ন আমি নিষিদ্ধ করেছি, এর কোন কিন্তু নেই, কোন কৈফিয়ত নেই। তোমরা উচ্চাঙ্গের ছাত্র, কেউ কয়েক মাল পরে কেউ বছর খানেক পরে চলে যাবে, তোমাদের খোয়াল চরিতার্থ করতে আমি সারা স্তূলকে, অস্বুমাংসমতি বালকদের মঠ হতে দিতে পারি না। আমি চাই আমরা যেমন সজ্জা করেছি আমাদের শিক্ষকদের, যেমন প্রাণচালা ঐতি পেরেছি ঠিক সেইরকম আত্মীয়তার বন্ধনে ছেলেরা মাথুখ খোক, শৃঙ্খলানিষ্ঠ কর্তব্যবোধের ভিত্তির দ্বিগে স্তূলব হয়ে উঠুক তাহেব মন।

[মাথা টিপে ধরলেন, ঘরগা সুখে প্রকাশ পেল]

যাও তোমরা, আম্মা বোধী বলতে আমি অক্ষম।

পরিমল : পরম্পরের মধ্যে পরিচয়, সংযোগের অন্তই আমাদের পরিচয়, আপনাকে বেউ অকারণে উত্তোষিত করেছে, তুল বুঝিয়েছে—আপনি একই চিন্তা করে বেখুন। এখন আমরা বাকি, দুটিই আপে আমার আসব।

এ, শি : (অকস্মাৎ অত্যন্ত বেগে) : গত ১৫ বছর ধরে আমি হেডমাস্টার, আমার অকারণে উত্তোষিত করে, তোমাদের স্মরণী সীমা নেই। রাগটিকেট করে যেন, জান।

অবিনাশ : তা আপনি পাবেন না স্তার, আমরা কোন স্তায় করিনি। আপনি অপরাধের শাস্তি দিতে পাবেন, সংগ্রহেটো হমন করতে পাবেন না, কোন ঘরগা কাজই অপপ্রচারে বদ্ধ হয় না।

এ, শি : কী বললে, অপপ্রচার।

[অবিনাশকে চক্ৰ মারলেন]

আমি তোমাদের সংগ্রহেই যখন করছি ! বুর্খ, হেড-মাষ্টারের সঙ্গে কথা বলতে দেখনি, তোমাদের পিতার থেকে হলেন বড় ছব বোঝায়।

[করেকখন পিছনের দিকে গিয়ে চলে দেল, সামনে এগিয়ে এল ছ'একজন।

অবিনাশ : পিতাও যদি অন্তর কিছু করেন পুত্রের সম্পূর্ণ অধিকার আছে প্রতিবাদ করবার, সংশোধন করে যেবার।

[পরিমল কিছু বলতে যাচ্ছিল হেডমাষ্টার বাধা দিলেন]

এ, শি : (সববে) : না, আর কোন কথা নয় বেহিয়ে যাও। আমার আদেশ, অবিলম্বে নিজের নিজের রূপে ব'সে গিয়ে। যাও।

[ছাত্রলগে ঢাকল্য। ইতস্তত করতে লাগল অনেক, কারো কারো প্রস্থানোত্তম, দ্বিবে গাভাল পহিমল।

পরিমল : আপনাকে আশ্বাস করতে এসেছিলাম...

[পিছন থেকে কেউ পরিমলকে টেনে নিল]

"চলুন তো চলবে না" বব আসতে লাগল। সকলে নিস্তাভ।

এ, শি : সাতকড়ি, সাতকড়ি।

[সাতকড়ির প্রবেশ

কেন এত ছেলেকে একসঙ্গে আসতে দিয়েছিলে ?

সাত : একে.....

এ, শি : যাও, যে ছেলেরা রূপে বল কিনা। আর উপেনবাবু রমেশ থাকে পাণ্ড পাট্টিয়ে যাও।

[প্রস্থান

পনের বছর হেডমাষ্টারি কবলাম আজ করেকটা হেডমাষ্টার উপদেশ দেবে। (করেক মিনিট চিন্তা করলেন) উ'হ, ছেলেরের কাল নয়, প্রকাশ আর অপপ্রচার ক্ষেপিয়ে তুলেছে ইউনিয়ন।

[হাঁপাতে হাঁপাতে সাতকড়ির প্রবেশ

সাত : একে, ছেলেরা সব কেলাস ছাইড়া বার হইলেন,

মিটিন না কি কইরলেন।

এ, শি : মিটিং, কিসের মিটিং।

সাত : তাহো জানি না একে, আমারে মাংসে আইলেন।

[উপেনবাবু অপপ্রচার খুনীল প্রতি শিক্ষকের প্রবেশ

এ, শি : আপনারা কি চান ? চল্লিশ বছরের স্কুলটাকে জুড়িয়ে যেবেন ?

অপপ্রচার : আমরা আপনার সহকারী শিক্ষক, অধিষ্ঠার কবলেন না। স্কুলের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে আমাদেরও বার্ষিক জড়িত। আমরা বিপদে মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করা থাক।

এ, শি : বিপদ, কিসের বিপদ ?

উপেন : খবর পাননি, ছেলের বল উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

এ, শি : মিটিং করছে, পেতো করেকখন শিক্ষকের প্রত্যা-চনার—তার সামলান। আমি হিপোর্ট পাট্টিয়ে দিচ্ছি ইন্সপেক্টরের কাছে।

উপেন : সাধারণ মিটিং নয়, বর্ষকট করবে বলছে। রূপে কেউ বাগে না কাউকে যেতে হবে না। অর্থাৎ হাবী পূরণ না-হওয়া পর্যন্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

[প্রধান শিক্ষক ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেয়ে বিহুভাবে চেয়ে বইলেন]

খুনীল : ছাত্রদের চরম পথ অবলম্বন করা উচিত হয়নি।

অপপ্রচার : বলছে করেকখন নাকি অপমানিত হয়েছে, জুলুম হচ্ছে। ওদের রোগান তুলেছ ?

খুনীল (নিরব) : চূপ, চূপ, এখানে ও-আলোচনা নয়।

এ, শি : জুলুম ? কে জুলুম করেছে ? ছাত্রেরা, স্কুলের ছাত্ররা বর্ষকট করছে ?

কুপন : কল্পনাতীত, বিবেকানন্দ বিভাষতনের ছেলেরা এমন করবে।

এ, শি : (সুপ্রোখিতের মত) : কি বললেন, আমাদের ছেলেরা বর্ষকট করেছে, কার বিরুদ্ধে কি হাবী প্রবেশ ?

[কারো মুখে কথা নেই। বাইরে থেকে নায়ে নায়ে উত্তেজিত ছাত্রদের টুকরো টুকরো ধ্বনি ভেদে আসছে।] উপেনবাবু, বর্ষকট করেছে ছাত্ররা এবে অবিস্বাস্ত।

উপেন : তখনতে পাচ্ছেন না কিছু, জানলার কাছে গাভাল একবার।

প্র, শি : জানলার নিকটে গির দাঁড়ালেন। মাঝে মাঝে নানা আকারের পাঁচদশনি ধ্বনি “সুবিয়াং চাই” “ছুম্ চলে যা” “ছাত্র-সংসর্গ কিস্যাবা ইত্যাদি” শ্রুত হতে লাগল। জানলা বন্ধ করে দিয়ে চেয়ারে বসলেন এসে ধর্মধর্ম মুখমণ্ডল, দুইই অভিযানে নিকল জোষ ঢাকা পড়ে গেছে।

প্র, শি : আবার ছাত্ররা বঁধট করেছে, আমি ছুন্দবাহ ! বেশ কাটকে বাখবোনা, দুই গড়ব চেয়ে শূত্র গোয়াল চাল। এঃঃঃ আমি দস্তানের মত ঘেঁষ করেছি।

উপেন : আপনি উত্তরা হচ্ছেন কেন, ভাবের ভেঁকে একটা নিটমার করে ফেলা যাক। আপনাকে কম শ্রদ্ধা করেনা, নিশ্চয়ই আপনার কথা শুনেবে।

প্র, শি : নিটমার ! আমি কি কোম্পানীর ডাইরেক্টর ? ছাত্ররা কি কারখানার শ্রমিক, বনির মদুর ? বাঃ চমৎকার, কাকে দেখাব, কে শুনেবে ! বিচারগনের আস্থা এসোনা এখানে, ভক্ত শিষ্যের যে নির্বিড় সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে, আশ্রমবাসীরা আজ বঁধট করেছে ওরফে অহুসানদের বিরুদ্ধে। আকাশ থেকে চেয়ে বেশ আকর্ষিত, তোমার তাইরা কারখানার মজুরের মত বঁধট করেছে, আগে শুয়ে থাকবার আর কেউ নেই, বিশেষ সমুজের জলে সব ভেসে গেছে, ছুন ছুন।

অপবেদ : কিন্তু আমরা শিক্ষকরাও সম্পূর্ণ নির্দোষ নই।

প্র, শি : আপনারা যারা বিদেশী ভাবের উপাসক, কলুষিত করেছেন মনঃবল্লব এই স্থলটির শান্তি স্বাচ্ছন্দ্য, সম্পূর্ণ হারী এর ভক্ত। প্রয়ত্তির নুলে ইছন বৃগির আত্মপ্রসারী করেছেন, লক্ষ্যশক্তি শেষ করেছেন—বড়বেগ বিরুদ্ধতায় সম্মান বাড়ছে না, সম্মানিতকে সম্মানের দ্বারা এক ব্যক্তিত্বী শক্তি, কিংবা এসে নিজেদেরি বৃকে বাজে একদিন, তৈরী থাকবেন সেদিনের মত।

অপবেদ : আমরা আপনার অথবা যোবারোপের তীব্র প্রতিবাদ করছি। আপনার অববহত্তিই ছাত্রমহলে বিক্ষোভ জাগিয়েছে।

প্র, শি : সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর এই স্থলে আমি অপবেরবাহু, আজ প্রথম শুনিছি আমি ছুন্দবাহ, আমার অববহত্তিতে ছাত্ররা বিরুদ্ধ। [বামিলেন]

আবারছাত্রাটো দাঁড়িয়ে বিচারগন বসলেন প্রত্যয় তোমাঘের বেশের প্লোটোর আঘর্ষণ গড়ে তোল ছাত্রদের, ওরা মানুষ হোক। বিধান পণ্ডিত বড় চাকুরে নেতা ছোট বড় সব স্থল থেকেই বেরচ্ছে, তুমি শুধু মানুষ হটি কর। বেশকালের কৃত্রিম নীমা তের করে বে মানুষ বিশ্বজনকে কেবলই আপনায় করবে, মহামানবের মিলন তীর্থ করে তুলবে ভারতভূমিকে। ভারতের ন্যতিতে মিশে রয়েছে মহামিলনের বীজ। এখানে সাম্রাজ্যলোভী রাষ্ট্রনায়ক অম্মারনি, জনশব্দে সম্মান পায়নি দুর্বে বর্ণনায়ক, এবেশ প্রেম সাধনার সম্মানভক্তি বিনয়ের, কবীর হাচ্চ মীরা চন্ডিহাল নামক তুকারাম একনাথ আলোয়ার এধামকার রাসা। মুক্তির চেয়ে মনঃ ব্যানের চেয়ে নির্বিড় মহত্তর সাধনার পীঠস্থান হয়ে উঠুক তোমার স্থল।

[বামিলেন। বৃষ্টি জানলার বাইরে দুর্বিগন্তে প্রসারিত। মনের তম্বর-বিষর ভাব ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত মুখমণ্ডলে। আপনা থেকেই দুই করতল কৃত্তান্তবিন্দু হয়ে এসেছে। (ধীরে ধীরে) তাঁর পেছ কণা, নাই বা ব'ল বশবন কৃত্তী ছাত্র বিশজন শনাম-খ্যাত পুরুষ, লক্ষ্যজনের মধ্যে একজনের মনেও যদি সেই সাধনার নেপা লাগে,—হ্যাঁ, সার্থক সার্থক সার্থক।

দুর্নীল : আপনিই কি তা পেয়েছেন ?...

প্র, শি : না।

যদি পাবতাম তাহলে আপনাঘের স্থান হতো না এখানে।

[অবিনাশ নৃপেন হাবিক পরিমল নরেনের প্রবেশ, লগে রবেশ।

প্র, শি : আমি তোমাঘের সাথে কোন আলোচনা করবনা, চলে যাও। তোমাঘের তের বৃত্তিতে আমার সম্মতি নেই, যা ইচ্ছে কর।

রবেশ : শ্রাব কণা আছে। ওঘের আবেদনটা শুনুন। পরিমল : সর্গের প্রথম দফা, আপনায় ছাত্র পরিষদ বীকার করে নিতে হবে। বিভীষ, শান্তিদুলক ব্যবহা প্রত্যাহার করতে হবে। কৃত্তর, শিক্ষকের বৈধম্য-মূলক অচরণ ও অজ্ঞায় শান্তি নির্বিড় করবেন।

এ, শি : কিছু সুন যোনা, তোমরা ছবিনিত।

পরিদর্শ : ইন্সপেক্টরের কথা এগেছি আমরা সমস্ত ছাত্রের
প্রতিনিধি হয়ে।

এ, শি : ইন্সপেক্টর। তিনি বংগ পেলেন কখন ?

রমেশ : এতের প্রতিনিধিগণ তাঁর কাছে ছাত্র-পরিদর্শ
স্থাপনের অসুবিধার আবেদন পাঠিয়েছিল, মজুর
হয়েছে।

অনিদা : আপনি সভাপতি মনোমরন করবেন ঠাক
থেকে।

[হেডমাস্টার কাঁপছিলেন পরামর্শের স্বোভা, অশ্রু
ভরে বেনার মুখমণ্ডল আবেগিত, বগে পড়লেন]

এ, শি : রমেশ, তুমি রচনা করেছ এ-আবেদন, এ-প্রাণে
সত্যার।

রমেশ : কিছু সংশোধন করে দিয়েছি মাস্টার। উত্তর
পক্ষেই যাতে সমান বজায় থাকে, যীমাংগা হয়, তার
প্রয়াস করেছি।

এ, শি : রমেশ, তুমিও আমার পাশে পাড়ালেন।

রমেশ : সমস্ত স্বপ্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ করে বিল, আনন্ড
সবাই আপনায় মূগ্ধ চেয়ে আছে। আপনায় শরীর
হুই নয়, রাডপ্রেশার বেড়ে উঠবে পোলামালে।

এ, শি (অভিমানহত, কণ্ঠস্বর আবেগে ভারাক্রান্ত) শেষ
করেই বিদ্বি রমেশ তুমিও আর তোমার পুত্রো
শিক্ষকের ঘেহের জের টেনে চলোনা, আমরা, আমি
আর মৈত্রেরী একাই চলতে পারব।

[রমেশ অস্ত্র বিকে মূগ্ধ কিরিয়ে রইল। এ, শি,
ছাত্রের দিকে কিরিলেন]

এ-বিভাগরতন বিবেকানন্দ ভক্ত মনোবী বিচার্জন
প্রতিষ্ঠিত, ভারতের সাধনা স্বপ্নের আশ্রম-আধর্ষ গুপ্ত-
শিক্ষের চিত্তরতন স্নেহের সঙ্ঘ এখানে অটুট হয়ে থাকবে
এই ছিল তাঁর একান্ত আশা। আমি সেই সাধনকে
অগ্রসর করে তোলবার চেষ্টায় সমস্ত জীবন তোমাদের
সাথে কাটিয়েছি তোমাদের অভিভাবকতা জেনে।
হল একান্তবর্তী পরিবার বলেই আমার ব্যবস্থা, গুপ্ত-
শিক্ষা তাই তাইয়ের মধ্যে স্বতন্ত্র একটা ইউনিয়ন
গুপ্ত বিভাগই স্থাপন করবে [প্রতিবাদের স্বর]—

আমায় শেষ করতে বাস্তব—তোমরা মজুর শিক্ষকের
নিয়ম ইউনিয়ন কর, রাষ্ট্রনীতি কর বৈঠক কর, যা
ইচ্ছে তাই কর, কিন্তু আমি তা দেখতে পারিনি,
শিক্ষিত মত হেডমাস্টারী আমার থাকতে নেই। আমি
মজুরবাক, আমার নীতি চতুর্নীতি। বেশ আমি
চললাম, আমি পরিত্যাগ করছি। তোমাদের আধুনিক
নীতিতে যদি উন্নতি হয় দূর থেকে আমি খুশি হব।
তোমাদের মজুর আধর্ষ মজুর ব্যবস্থাপনায় চলুক।

[পড়ে বাঙ্কিলেন, রমেশ ধরল]

শিক্ষকেরা (সম্মুখে) আপনি আপনি, থাকবেন না।

এ, শি : আমার গতে হচ্ছে। দ্বিতীয় সভ্যতার প্রভাব
এসে পৌঁছেছে জন-প্রিয় শিক্ষকদের রূপ হয়ে প্রিয়নাথ-
বাবু, আমাদের বিন শেষ। অস্ত্রকরণ আর কেউ
যেখানে বাইরের আরও সবাইকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে,
আমি চললাম। আপনারা পাবেন আপোষ করুন,
স্বীকার করে নিব যদিও কৃষ্টির অগ্রবর্তী। ছাত্র
শিক্ষকের দৌহার্য বির হবে মর্ত্ত দিয়ে কর্ত্তব্য লাভি
করে। আমি এতে নেই।

রমেশ : এত ভাড়াভাড়ি এখন একটা গুরুত্ব দ্বিতীয়
করলেন ?

এ, শি : আমার প্রয়োজন শেষ। আমাদের শাস্ত্রকারেরা
এ বয়সে বাণপ্রস্থ নেবার পরামর্শ মিছে ধেননি।
মতের মিল হয় না হতে পারে না। সাতকড়ি, সাহেবের
ছবিখানা নামিয়ে নে বেগলাল থেকে। নিজের পরিবেশ
চিনতে পারছি না, সবই অপরিস্ফুট, শেষে নিজেকে
হারিয়ে ফেলব।

রমেশ : বাড়ী পৌঁছে বেই আপনাকে।

এ, শি : না, তুমি নয়, সাতকড়ি বিচ্ছেদ।

[সাতকড়ি এসে বসতে রমেশ ছেড়ে বিল।

এখানকার সবই ছেড়ে বিদ্বি তখন আর তোমার
কেম..... ! ওঃ ওঃ !

টিলতে টিলতে প্রস্থান। ছাত্র-শিক্ষক সকলে হতভম্ব
হয়ে থাকের দিকে চেয়ে রইল।

কেরাণী বাবুর কৈবল্য প্রাপ্তি

অন্তিম চেষ্টা

[রূপ থেকে অনুদিত]

অনুবাদক : সঞ্জিল ঘোষ

নন্দনজিওরাম একটি রাতে অনিশ্চিন্তের চেতনাবাহু আইতান বিমিশ্রিত চেতনাবাহু স্টেলের দ্বিতীয় স্তরে আপন আদম গ্রহণ করে, চোখে অপেরা গ্লাস লাগিয়ে "কবিতার ক্লাস" দেখতে লাগল। বহুক্ষেত্র দিকে চেয়ে তার মনে হল মৃত্যুহারা এ সংসারে তার ভুল্য সুখী মানুষ বুদ্ধি বা আর কেউ নেই। এমন সময় হঠাৎ ঘেন... এই "হঠাৎ ঘেন" কথাটি বড় একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। তবু কোথাও রেহাই পাবেন এমন পথ নেই, তারুন তো জীবনের সমস্ত প্রাপ্তি ছেয়ে এই "হঠাৎ ঘেন" বাঁকাটির কেমন বিধম উৎপাত, তাই তো লেখকের বাধ্য হয়েই এ কথাটা লিখতে হয়। আর এমন আকস্মিক ভাঙেই ওর মুখখানি সংকুচিত হয়ে এল, চোখে অলকার হোসা লাগল আর শ্বাস প্রশ্বাসেও সহজ শ্বাস বহিত হয়ে এস—অপেরা গ্লাসটি চোখ থেকে সরিয়ে নিজ আসনে ফেঁথান। বিজ্ঞপ্তি করে সামনের দিকে স্ক্রীকে পড়ল সে, তাৎপর্য—এ—এ—হ্যাঁজো। ব্যাপারটা বুঝলেন তো!—সে হাঁচল। অবশিষ্ট, হাঁচবার বাধা কারো নেই এবং স্বতন্ত্র গুণী আপনি হাঁচতে পারেন। চার্ঘী, হারোপা এমনকি প্রিন্ট কাউন্সিলের সমস্ত হলও হাঁচতে হয়। আঘাত হাঁচি, আপনার হাঁচন—নবাই তো হাঁচে। চেম্বার্সাক্ষেত্রও তাই বিদ্বিত বোধ করার কিই-বা ছিল। স্তমালখানা নাসিকার বুলোতে বুলোতে দেখতে লাগল কারো কোন ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন কিনা। যা দেখলেন তাতে চক্ষু চড়কগাছ! কেমনা, সামনের সারিতে একজন খণ্ডাকৃতি বৃত্তকে তার চোখে পড়ল—হাতেঃ বস্তানা বিরে শূট টেকো ব্রহ্মভাগু ও বাড় মুহুর্তে মুহুর্তে বিড়বিড় করে একটা কিছু ঘেন বলছেন। চেম্বার্সাক্ষেত্র দেখে চিনলেন যে বৃত্তা ভ্রমলোকটি পরিবহন বিভাগের বেসামরিক কর্মকর্তা সেনাবেল ত্রিবারক।

চেম্বার্সাক্ষেত্র ভাবলেন, "এই যে, ওনার মাথা ওপরেই কি হাঁচলান! যদিও উনি আমার বড়সাহেব নন, তবু কাছটা বিলক্ষণ খারাপ হয়ে গেছে। স্ক্রমা চাইতেই হবে।"

একটু কেসে একবারে সামনের দিকে স্ক্রীকে ঘেনাবেলের কানের কাছে অশ্রুই হয়ে বললেন।

"স্তার আমাকে মাগ করে ঘেঘেন স্তার, আমি হেঁচেছিলাম...নানে স্তার, মাসে, আমি ইচ্ছে করে হাঁচিনি স্তার....."

"ঠিক আছে।"

"মাগ করে দিন স্তার আমি...আমি কোন মতলব নিয়ে হাঁচিনি স্তার।"

"অনেক হয়েছে, আপনি এখন চুপ করবেন কি। অন্যতে দিন আমার।"

অসামান্য বিশ্ববিমুদ্রের মতো বোকার হাসি ঘেসে মকের দিকে দৃষ্টি চেম্বার্সাক্ষেত্র চেষ্টা করল চেম্বার্সাক্ষেত্র। অভিনেতাদের প্রবেশ ও প্রস্থান দেখতে লাগল, কিন্তু আর ঘেন স্তার ঘন এমন ভাবনার সার দিতে পারল না যে মৃত্যুহারা এ সংসারের সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি সে। অহুতাপের চোরাবালিতে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। বিভ্রমের সমস্ত সেনাবেল ত্রিবারকের কাছে একটু একটু করে আগের সময় কুঠার হাণ্ডার মতো নিঃশব্দ বোধ করতে লাগল। অবশেষে দিবা ও জীতি ঘর করে দিন-দিনে স্তরে বসল :

"আপনার অন্তর্বিধে রয়েছে স্তার হেঁচে, মাগ করে দিন স্তার...বিধাপ করুন স্তার..আমি ইচ্ছে করে এমন করিনি স্তার।"

"ও, তাই বুদ্ধি...ভুলেই গিয়েছিলাম। তা আপনি কি এবার স্তার ঘেঘেন না?" অবশিষ্ট তারে নির্দেশ টোটাট ক্রীপে উঠল তাঁর।

চেবভিয়ারক কিস্ত আখত না হয়ে আড়চোখে
 ঘেন্নারেলের বিকে চেয়ে ভাবল, “বেশ তো উনি বলে
 দিলেন যে উনি ভুলেই গেছেন ব্যাপারটা, কিন্তু ঠিক
 যেখে আমার ঘেন্না ভাল ঠেকছে না। না, উনি যে আমার
 সঙ্গে কথা বলতেই নারাজ। উহু”, ভাল করে ওনারে
 বুঝিয়ে বলতে হবে যে আমি ইচ্ছে করে এমনটি কিনি...
 অর্থাৎ এটা প্রকৃতির নিয়ম, মইলে উনি সুস্থিগা ভেবে যেন
 আমি তাঁর মাথার ওপর থুথু ফেলতে চেয়েছিলাম। যদি
 এমনটি এখন নাও ভাবেন, কে জানে পরেও তো এমন
 ভাবতে পারেন!...”

বাড়ী কিংবা চেবভিয়ারক জীব কাছে তার অগ্র
 ব্যবহারের ইতিহাস সব বলে বলল। তবু মনে হল তার
 জী যেন এ ব্যাপারে বড় একটা গা করল না। প্রথমটায়
 অবশ্য তার জী একটু খাড়ে গিয়েছিল, কিন্তু যখন শুনেল যে
 এই ত্রিভাষক ভক্তলোকটি তার স্বামীর বড় গাংব নম
 অমনি একবারে নিশ্চিন্ত।

তবু স্বামীকে উদ্বেগ করে বলল :

“আমার কিস্ত মনে হয় তবু তোমার তাঁর সঙ্গে
 একবারটি দেখা করে কমা চাওয়া দরকার, মইলে উনি হয়
 তো মনে করবেন, তুমি যোগ হয় সভা সমাবেশে যেননা
 করার সুপ্তি নও।”

“আরে ঠিক কথা তো! আমি যে কমা চাইতে গি-
 ছিলাম, কিন্তু কেমন ঘেন্না অসহ্য মনে হল ওনারে। ভাল
 করে একটা কথা পরখ বললেন না। তা ছাড়া, কথা বলার
 সময় ছিল না।”

পরদিন চেবভিয়ারক চুল ছোট ছোট বরণের একখানা
 কোট গায়ে চড়িয়ে বড়লোকের উদ্দেশ্যে বসনা হলেন তাঁর
 দুর্ব্যবহারের জবাব দিতে। ঘেন্নারেলের বসতি গুরুত্ব
 প্রাপ্তিদের ভীড়ে গিচ্-গিচ্ করছে—ঘেন্নারেল শরীরে
 উপস্থিত থেকে বরখাস্ত গ্রহণ করছেন। অন্যতম
 ঘর্নাবীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর উনি চেবভিয়ারকের
 বিকে চোখ মেলে তাকালেন।

কেন্দ্রী বাবু বললে স্পষ্ট করে দিল :

“জাবের হয় তো মনে আছে কাল রাতে আর্কাডিয়া
 বিয়েটাবে আ—মি, আমি হেঁচেকিলাম, মানে জার, হাঁচতে

বাধ্য হয়েছিলাম—আমার স্কেন শেষ নেই জার...”

ঘেন্নারেল বললেন, “তারি আশঙ্ক দেখছি!” এই
 বক্তব্যের অবশ্যে তিনি পংক্তী লোকটিকে উদ্বেগ করে
 হাঁকলেন, আপনায় কি দরকার?

চেবভিয়ারকের বিপরীত বিপরীত মুখখানায় উৎকর্ষা ভবে
 উঠল, ভাবল, “উনি তাহলে আমার কথা শুনবেন না
 দেখছি। তার মানে উনি আমার ওপর চটে আছেন...
 তাহলে তো ব্যাপারটার সুরাখা না করে আর নড়ছি না...
 ওকে আমার বুঝিয়ে বলতেই হবে...”

একবারে শেষ ঘর্নাবীর কাছ থেকে বরখাস্তটি নিয়ে
 ঘেন্নারেল নিজেই যাবের উদ্দেশ্যে গা বাড়িয়েছেন এমন সময়
 চেবভিয়ারক পেছন থেকে এসে নিরকর্ষে বলতে লাগল,
 “মাগ করে দিন জার। অস্তরের অস্ত্রগুলি থেকে অকৃতান্তের
 বোমা অসহ্য মনে হচ্ছে বলছি জারকে বিরক্ত করার সাধ
 পাচ্ছি...”

ঘেন্নারেল এমন দৃষ্টিতে চেবভিয়ারকের বিকে
 তাকালেন যেন একুশি উনি ভীষণ গর্জন করে উঠবেন।
 হাত ভুলে ইশারা করলেন তাকে যে থেকে যেখানে যেতে
 তারপর শোকা তার সামনে বরখাস্তা ঠাস করে বসে
 যোয়ার মুহুর্তে বললেন,—

“আমাকে নিয়ে নম্বর বেশ মজা করছেন তো!”

“মজা!”—চেবভিয়ারকের অগাধ মনে হতে লাগল।

আমি এতে উপহাসের তো কিছুই বোধ না। উনি একজন
 ঘেন্নারেল, অথচ এই সামান্য ব্যাপারটা বোঝেন না। বেশ,
 তা হলে ওনারে আর কখনো বিরক্ত করবো না। হত সব
 আপদ। আমি আর আসছি না ওনার কাছে, একটা চিঠি
 লিখে ছেড়ে দেব, ব্যাপ! আর নয়, এখানেই ইতি।”

বাড়ী কেন্দ্রী বাবু সময় চেবভিয়ারকের অসহ্যুতিকে
 আশঙ্ক করে এমনই সব চিত্রা খুঁটপাক খাচ্ছিল তার মনে।
 চিঠি লেখা আর হয়ে উঠল না। তেবে কিছুতেই তাঁর
 করতে পারলে না কেমন করে চিঠিখানি শুছিয়ে লিখবে।
 তাই পরদিন আর একবার ঘেন্নারেলের কাছে ছুটতে হল
 ব্যাপারটার সহজ সুরাখা তাগিদে।

এবার ঘেন্নারেল অসহ্য কোঁকুলে তার বিকে
 তাকালেন যেন কিছু বিজ্ঞাপন করবেন, কিন্তু চেবভিয়ারকের
 বলতে লাগলেন।

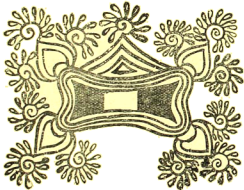
“কাল তার আপনাকে একটু বিবর্তন করতে এসেছিলাম কিন্তু তার, আপনি যে বলেছিলেন আমি মজা করতে এসেছিলাম, ওটা ঠিক নয় তার। আমি হেঁচে আপনাকে যে ব্যাঘাত ঘটিয়েছি তার মত মাপ চাইতেই এসেছিলাম তার ...আপনার সঙ্গে মজা করবার কথা যা বলেছেন তা আমি জাবতেও পারছি না তার। একবার লোকের সঙ্গে মজা করতে শুরু করে মান সম্মত হারিয়ে ফেললে গতি কি হবে ...তাহলে তো আমাদের ওপরের অকিসারদের প্রতি তুলি প্রচার মতো। কর্তব্যক্ষমতাই পর্বত নষ্ট হয়ে যা:ব...

বিকৃত কাকাকশে মুখে ঘোনায়েল ঝাঁপতে ঝাঁপতে হাজার বিয়ে উঠলেন, “গেট আউট! বিয়ের হও বলছি এখান থেকে!”

ভীত সমস্ত চেরভিয়াকক বোকার মত বলে উঠল, “তবে তবে স্যার কমা করলেন না?”

পা দিয়ে মাটির ওপর গোল্ডা হুঁকে ঘোনায়েল আবার পর্বত করে বললেন, “হলি থেট আউট!”

চেরভিয়াককের মনে হতে লাগল যেন ওর শরীরের কোন একটা কল বিগড়ে গেল। হাজার বিকে পেছন ফেরার সময় তার কান দুটো বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল, চোখের জ্যোতি আস্পা হয়ে এল—যব থেকে বেরিয়ে রাস্তার নেনে এসে এলোপাতাড়ি পথ চলতে শুরু করে দিল। অবসর স্রাতিতে অভিজ্ঞত হয়ে হোচট খাওয়ার টেলা সামলাতে সামলাতে চেরভিয়াকক বাড়ী ফিরে এল, অকিসের কোটখানা যেমন পরনে ছিল তেমনিই রইল, তারপর গোল্ডার ওপর গ: এলিয়ে শুয়ে পড়লো এবং মাদা গেল।



মেচ

অগ্নি স্নান

মেচেরা আসাম অঞ্চল থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। তাদের অপর একটি নাম বোড়া। মেচেরা ভাষা "মেচভাষা"—এটি তিস্তা চীন ভাষাপোষীরা আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। মেচেরা মঙ্গোলয়েড জাতির অন্তর্গত।

জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য অংশ গভীর বনের মধ্যে এবং তার আশে-পাশে মেচেরা বাস। তাদের গ্রামগুলি কাছাকাছি অবস্থিত, কিন্তু রাতারাতি বৈশিষ্ট্য ভাগ সময় বড় দুর্গম ও বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। জলপাইগুড়ির এই পার্বত্য অংশ দিয়ে অনেকগুলি ছোট বড় নদী প্রবাহিত। বর্ষায় নদীগুলি ফুলে ফেঁপে গ্রামগুলিকে ভাসিয়ে দিয়ে নানারকমে বিলুপ্ত করে তুলে। পাহাড় নদীগুলিতে তখন নৌকা চালান অসম্ভব। বর্ষার দিনে জলপথে যাত্রার কোন উপায় না থাকায় মেচেরা অধিকাংশ সময় বহিষ্কৃত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয়।

এই সব গভীর অঞ্চলে নানারকমের অস্ত্র আনোয়ার এমন কি বাঘ ও বড় হস্তী পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। হস্তী ও গজাবেরা সুবিধা পেলেই আশেপাশের ক্ষেত বেয়ে ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে দেয়। এই সমস্ত অস্ত্র আনোয়ারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মেচেরা সব সময় সজ্জিত হয়ে থাকতে হয়। জঙ্গলের মধ্যে নানারকমের সুন্দর সুন্দর পানীও দেখা যায়।

মেচেরা মধ্যে সকলেই একরকমের চাষ করে না,—সেইজন্য বিভিন্ন মেচ পরিবারকে পর্যায়ক্রমে সুখপেক্ষ হয়ে থাকতে হ'ত। কিন্তু এক সঙ্গে জঙ্গল সাক্ষ করে হ'ত এবং নেপালী, ভুটানি ও অন্তর্জাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে এক যোগে হুঁড় করে হ'ত।

মেচেরা সর্গার অন্তর্গত পরাক্রমশালী এবং সকলে তাকে ঘেঁষে চলে। সর্গারকে বলা হয় "কারিরা"। সর্গারের পরেই হ'ল গুরোহিত। তার কাছ ভূতপ্রাণের একোপ

থেকে গ্রামকে রক্ষা করা। গ্রামের এই গুরোহিতকে বলা হয় "বেগী"।

'সুন চাষ' ছিল মেচেরা প্রধান উপজীবিকা। তাছাড়া তারা হতা কাটত, কাপড় বুনতো ও মাছ ধরতে গিয়েছিল।

জলপাইগুড়িতে চা-নিষ্কাশন কর্মসূচি হওয়ার 'সুন চাষ' বন্ধ হয়ে লাকল চাষ সুরু হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্যের পক্ষে এইভাবে চাষ করা সম্ভবপর হয়ে উঠল না। কাহারও হয়ত মূলধনের অভাব এবং কেউ হয়ত চাষের কাজে দক্ষ নয়। তাই তারা কারিরা বলে ক'বে নিয়ে জোতদারদের কাছে গোলাসী করতে লাগল। অনেক আবার চা-বাগানের কাজে লেগে গেল। তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন চাষে কৃতকার্য হয়ে বনী এবং জোতদার হ'ল বটে কিন্তু বৈশিষ্ট্যভাগ মেচেরাই দুর্ভাগ্যবান সীমা ছিল না—জোতদারদের অধীনে কৃতদাসের মতন জীবন কাটাতে হ'ত। এই অবস্থা সহ্য করতে না পেরে মেচেরা বসে বসে বেশ ছেড়ে পূর্বদিকে চলে গেল। ১৮৯১ সালে পশ্চিম বঙ্গপ্রদেশে মেচেরা সংখ্যা ছিল ২৬৬১৮। কিন্তু পূর্বে অতিথানের ফলে ১৯১৪ সালের আদম শুমারি অনুসারে দেখা গেল যে মেচ সংখ্যা ১০৭৮৭। যারা থেকে গেল তাদের মধ্যে দুটো হল হ'ল। একজন হ'ল বনী জোতদার—তারের সংখ্যা খুঁই অল্প এবং অপর হল নিঃশেষে।

এখন মেচেরা মধ্যে কিছু কিছু হিন্দুভাবাপন্ন জোতদার আছে। বনী জোতদারেরা হিন্দু অঙ্গুষ্ঠের আদর্শে বৌদ্ধ দিয়ে কস্তার বিবাহ দিয়েছে। যারা বড়ি তাদের এখনও কস্তাপন বোঝার চেষ্টা আছে।

মেচেরা মধ্যে চার রকমের বিয়ে প্রচলিত ছিল :—

- (১) ভাবী জামাইকে কয়েক বছর যত্ন গৃহে চাকরী করতে হ'ত।
- (২) বলপূর্বক বিবাহ
- (৩) পরাম্পর দিয়ে বিবাহ
- (৪) নিজের পরিবার ও দেবতাকে পরিত্যাগ

ক'রে ভারী বধুর পরিবার ভুক্ত হওয়া এবং তাহের বেবতাকে মানা। শেষোক্ত গ্রন্থটি 'হারপুন' নামে প্রচলিত। মেচেরের মধ্যে এরকমও দেখা যায় যে বাড়ীর গৃহিণী বিধবা হবার পর পুনঃবিবাহ করে ক'রে নতুন স্বামী ও প্রথম পক্ষের ছেলপুলে নিয়ে একত্র বাস করে। মেচেরের মধ্যে কিন্তু অগবর্ণ বিবাহের প্রচলন নেই।

আগে মেচেরা প্রথম প্রকার বিবাহের পক্ষপাতী ছিল। এখন কিন্তু তাহের মধ্যে কস্তার পিতাকে পণ দিগে বিবাহ করাই বেশী প্রচলিত। হিন্দুর সংস্পর্শে এসে প্রথম তারা হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। অনেক গোত্র পাণ্ডে হিন্দুর অনুকরণে গোত্রের নাম পরিবর্তন করেছিল। হিন্দুর কাস্তপ-গোত্রের অনুকরণে নারজিনারি গোত্র এবং তৎপাল গোত্রের অনুকরণে ঈশ্বরী গোত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু সামাজিক ব্যাপারে নয়, অস্ত্রপ্রকার আচার বিচারেও তারা হিন্দু গ্রন্থ গ্রহণ করেছিল।

এককাল মেচের বিশ্বাস যে 'বাখো' দেবতাই হচ্ছেন হিন্দুদেব শিব এবং তাঁর পত্নী 'মহমাও'কে কেহ বা দুর্গা কেহ বা লক্ষ্মী ব'লে ডাকতে লাগল। হিন্দুদের মত ত্রাস্ত্রপুত্রোচিত দিগে পূজা করাতে লাগল। কিন্তু এভাবে

তাহের মধ্যে বেশী দিন রইল না। অর্থনৈতিক ও রাজ-নৈতিক চাপে তারা এসব ছেড়ে দিয়ে নিজেদের পুরাতন গোত্র এবং পুরাতন দেবতার দ্বিগে এসেছে। এখন তারা হিন্দু গোত্রের নাম পরিভাষ্য ক'রে উপমাতীয় গোত্র গ্রহণ করেছে এবং হিন্দু দেবদেবী পরিভাষ্য ক'রে উপমাতীয় দেবদেবীর পূজা শুরু করেছে। সিদ্ধ দ্বাহকে তারা 'বাখো' দেবতার প্রতীক ব'লে পূজা করে। এছাড়া অন্ত দেবতারও উপাসনা করে। নাচ গান ও খেলার মধ্য দিগে তারা দেবতার পূজা করে। গ্রামের যুবকদের মধ্যে মাইবং নাচ রীতিমতভাবে শিক্ষা বেগুনা হয়।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এখন তাহের মধ্যে শিক্ষার প্রভাব দেখা দিগেছে। বন বারজন মেচ এখন নিরপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে। একজন হাজিলি হ'তে বি. এ. পাশ ক'রে একটি উচ্চবিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপকের কাজ করছে। একজন এল. এম. এক পাশ করে একটি চাবাগানে ডাক্তারী করছে।

১৯৪১ সালের আদম শুমারি অনুসারে জলপাই-গুড়িতে—১০০৭ জন, কোচবিহারে ৫৬, হাজিঙে—১২৪ জন মেচ বাস করে। জলপাইগুড়িতেই তাহের বসতি—জলপাইগুড়ির আদিবাসী বলা যেতে পারে।



ভারতীয় মুদ্রার কথা

ঐক্যবোধচক্ৰ দত্ত

(৪ষ্ঠ পর্ধ্যায়)

ষ্টালিং ও মুদ্রাস্ফীতি :—পূর্ববর্তী পর্ধ্যায়ে আমরা বলেছি মুদ্রাকালীন মুদ্রাস্ফীতি ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোকে এক বিপর্যয়ের মুখে নিয়ে আসে। ভারতের পাওনা ষ্টালিং কি করে এ মুদ্রাস্ফীতির একটা প্রধান কারণ হ'য়ে দেখা দেয় তা আলোচনা করে দেখা যাক। যুদ্ধের সময় ভারত যুদ্ধের উপকরণ, বন্দন ইত্যাদি বহু দ্রব্যাদি মিত্রপক্ষ তথা বৃটেনকে জোগায়। বৃটেন ও মিত্রপক্ষ এক চুক্তিবলে স্থির করে এসময় সরবরাহ-ব্যবস্ত ভারতের পাওনা টাকা। তারা নিজেদের মুদ্রায় শোধ দেবে আর সে মুদ্রার হিসাব থাকবে ইংলণ্ডের মূল ব্যাংক ভারতের নামে ষ্টালিং অর্থাৎ হিসাবে। অধীন ভারতের পক্ষে এক্ষণ চুক্তি না হ'লে উপায় ছিল না; আর সে সুযোগ গ্রহণ করে মিত্রপক্ষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজেদের মুদ্রায় যোগাড় করে নেয়। এক্ষণ ব্যবস্থা হ'ল যে ষ্টালিং প্রাপ্যের হিসাব লভনে বেঁচে ভারতীয় বিদ্যার্জ ব্যাংক ঐ ষ্টালিংকে বিদ্যার্জ হিসাবে করে নোট ছাপবে—হ'লও তাই। ভারতে খনির সমস্ত দ্রব্যাদি ও যুদ্ধোপকরণের দাম মিত্রপক্ষ ভারতীয় নোটছাপা সম্প্রদায়ের সাহায্যে শোধ করে। এর ফলে নোটের প্রচলন অত্যন্ত বেড়ে যায়। ১৯৩৯ সালে মোট চালু নোটের পরিমাণ ছিল ২১৬ কোটি টাকার সমান আর ১৯৪২ সালে তা প্রায় ১১৪০ কোটি হ'য়ে যায়। চালু নোটের পরিমাণের বৃদ্ধির হারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং মুদ্রাকালীন উৎপাদনের অনুবিধা স্বত্ব করে বলা যায় মিত্রপক্ষীয় চাহিদা মিটাতে গিয়ে ভারত যে চুক্তি মেনে নেয় তা ভারতবাসীকে মুদ্রাস্ফীতির কবলে ঠেপে দেয়। বিদেশী শাসকের স্বার্থপরতা করতে গিয়ে ভারত তার নিজে অর্থনৈতিক দীর্ঘমেয়াদে প্রচণ্ড আঘাত হানে।

মুদ্রা সম্প্রদায়ের একটা দাখল গণনা নীচের তালিকায় দেওয়া হ'ল।

সাল	মোট নোট	কোটি টাকা।
১৯৩৯	২২১	
১৯৪০	২৪৭	"
১৯৪১	২৯০	"
১৯৪২	৪৮৭	"
১৯৪৩	৭৬৬	"
১৯৪৪	৯৪৫	"
১৯৪৫	১১৩৭	"

পূর্বদীর্ঘমেয়াদে যুদ্ধ ব্যাধার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের যুদ্ধের প্রত্যেক দিন দিন বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে। উপরে তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যায় ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর নোট ছাপার হার অস্বাভাবিক ভাবে বেড়েছে। কল্পের বল ভারত কিনে পয়সা কিনে যুদ্ধের জোগান দিয়ে চলেছে আর ভারতীয়রা করেছে তীব্র আর্থিক যন্ত্রণাবোধ। যুদ্ধের সহকায়েই হয়নি যুদ্ধের অভাব, হয়নি তার সৈন্য সংগ্রহে বিপত্তি; ভারতবাসী দলব সংগ্রহ করে ইংরেজের সৈন্যের উদ্বৃত্ত পুষ্টি করিয়েছে; জোখা পোখা উৎপাদন উপেক্ষা করে সম্ভাব্যপকরণ উৎপাদন বাড়িয়েছে, জোখাপোখার বিরাট অংশ সৈন্যের ভোগে বিলিয়েছে আর নিজে প্রত্যেকভাবে মর্জিত হ'য়েছে মুদ্রাস্ফীতির ফলে উদ্ভূত অস্বস্তি—তার স্বাস্থ্য, তার জোখাপোখা হ'য়েছে অধিশূন্য; সরবরাহ বাড়েনি বলে তার দল সমগ্র জাতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আর চুক্তির ফলাফল হুঁতু হুঁতু হ'য়েছে তাকে সমস্ত করে বেখেছে। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী যা অগ্র যা অগ্র করে অনাহারে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। মুদ্রাস্ফীতির

নিষ্কাশন আশ্রিত ভাবভীরের অর্থ নৈতিক প্রাণ সম্বন্ধেতে
পারেনি। সাধারণতঃ অমরহানির চেয়ে বহানীর দৃশ্য
বেশী হ'লে বাড়তি প্রাণ। অধ্যাদানী, স্বর্গ, যৌগ ও
সিকিটহিট রূপে গ্রহণ করা হয়। ভারতও যুদ্ধের অঙ্গে
বাড়তি প্রাণ। স্বাভাবিক নিয়মেই গ্রহণ করেছে। যুদ্ধের
সময় অমরহানী অত্যন্ত কমে যায়; অমরহানী অর্থাৎ প্রাণমতঃ
যুদ্ধের উল্লেখই এখানে—নিত্যপ্রয়োজনীয় অর্থাৎ যি
নাগরিকের আধিক উপকারে আসে সেজন্য অমরহানী
একরকম ছিল না বলা চলে। স্বর্গ, যৌগ ও সিকিটহিট
অমরহানী নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে অবস্থা ঠাণ্ডার এই—
ভারত নিজের কষ্ট উপেক্ষা করেও যুদ্ধ বাড়িয়ে মিত্রপক্ষের
সুবিধা করে দেয়। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার
—মিত্রপক্ষ ও যুদ্ধের ভারত অর্থাৎ যুদ্ধে সুবিধা
দাওয়া ভারতেরও লাভ হ'ত যদি মন্দার বাতাব চলত।
কারণ মন্দার সময় ক্ষেত্রের অভাব ঘটে এবং অধ্যাদানী
কমে গিয়ে পট্টনানে বেকার সম্ভা ঘটায়। এজন্য সময়
ক্ষেত্র পাওয়াই একমাত্র মন্দা কাটিয়ে উঠার উপায়। কিন্তু
ভারতে যুদ্ধের সময় মন্দার কোনো লক্ষ্যই বর্তমান ছিল
না। তিন্মপত্রের উৎপাদন কমে যায়, ভোগ্যপণ্যের চেয়ে
হুতপণ্যের উৎপাদনের দিকে বেশী মনোযোগ দেয়া হয়, যুদ্ধের
উল্লেখ পণ্যাদি সাধারণ নাগরিকের নাগালের বাইরে চলে
যায়, বিশেষ বেসিক ভোগ্যপণ্য অমরহানী কমে যায়, নতুন
উৎপাদনক্ষেত্রের অভাব ঘটে, পুষ্কান্ত বহুপাতি পরিবর্তন
করে সম্ভবতঃ হয়নি—এজন্য অবস্থার উন্নয়ন ক্ষমতা
ভারতেরই হানে অভাবভীরের হাতে চলে যায়, আর যদি
ভারতবাসী প্রাণধারণের নিম্নতম প্রয়োজনও মিটাতে পারে
না। ফলে ভারতবাসী অভাবেরই প্রতিচ্ছবি নির্মলভাবে
দেখা দেয় ১৯৪০ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষরূপে। যুদ্ধ প্রত্যেক
দায়রূপে প্রকৃতপক্ষে ভারতের যে অংশ গ্রহণ করার কথা
তা বণ ও কর আদায় থেকে প্রাপ্ত অর্থেই সংকুলান করা
সম্ভব হ'ত, যুদ্ধেও মিত্রপক্ষের দায় মিটাতে গিয়ে ভারত
যুদ্ধ-সম্প্রদায়, যুদ্ধাশ্রিত ও দুর্ভিক্ষের কসলে পড়ে। যুদ্ধের
পরও যে দুঃখের যুদ্ধ এনে দিয়ে গেছে তা শেষ হয়নি।
স্বাধীন ভারত সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মনো দিয়ে
এবং যুদ্ধ সম্বন্ধে ত্রুটি হ'য়ে যুদ্ধকালে স্তম্ভ বিপদের বিরুদ্ধে

অনেকদিনে সার্থক হ'য়েছে। স্বাধীন সরকারের অসুস্থত
যুদ্ধানীতি আলোচনা কালে আমরা বিস্তৃত বিবরণ জানতে
পারব। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যুদ্ধের
প্রাকালে যুদ্ধা শকালন যে হারে হ'ত, ১৯২২-৪৫ সালেও
সে হার বন্ধার থাকলে যুদ্ধাশ্রিতের উন্নয়নরূপে আরও প্রকৃত
হ'ত—এরূপ মহাযুদ্ধের সময় ও কিছু পরেই আধুনিক
যুদ্ধাশ্রিত হ'য়েছিল ভারতেরও সেজন্য হ'ত। মনোর
ভাল এই যে ১৯৪২-৪৫ সালে যুদ্ধাশকালন (velocity)
অপেক্ষাকৃত কম ছিল। যুদ্ধাশকালন ১৯০৯ সালে ১৫;
১৯৪০ সালে ১৬; ১৯৪২ সালে ১৩; ১৯৪৪ সালে ৯ এবং
১৯৪৫ সালে ৯ ছিল—অর্থাৎ ১৯০৯ সালে যুদ্ধার হার-বহল
১৫ হার বহল ১৯৪৫ সালে এজন্য হার-বহল ঠাণ্ডার ৯।
এতে যুদ্ধাসম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধাশ্রিতের পরিমাণ বৃদ্ধির হার
কিছু কম থাকে অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ততা কিছু কমে।

পণ্যমূল্য বৃদ্ধি :—

ভারতীয় সরকারী মহলে একটা আশ্চর্য্যের ভাব
প্রত্যেকবার পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে প্রত্যাব বিস্তার করে।
পণ্যমূল্য বাড়তে শুরু করলেই এর ব্যাখ্যা করা হয় এজন্য
ভাব যে এতে কৃষকের তথা গ্রামীন সাধারণের স্বার্থ রক্ষা
হয়। এ ব্যর্থতার উৎপত্তি যুদ্ধের পূর্বকার মন্দার অসুখ
থেকে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় এ ধারণা যে কত নিঃসার
পূর্বকার করেক বছরের মূল্যবৃদ্ধির ফলাফল লক্ষ্য করলেই
তা বোঝা যায়। কোনও গ্রাম বা কোনও কৃষকই সম্পূর্ণ-
রূপে আত্মনির্ভরশীল নয়—এটা হ'তেও পারে না।
প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিষই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষ
উৎপাদন করে নিজেদের বা নিজেদের চাহিদা মিটাতে পারে
না। ফলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধিতে সাধারণের লাভের চেয়ে
ক্ষতিই বেশী—অবশ্য একটা নিম্নতম মূল্যমানের পরে মূল্য
বৃদ্ধি ঘটলেই একথা প্রযোজ্য। সেজন্য নিম্নতম মূল্যমান
১৯৪০ সালেই স্থির হ'য়ে আছে। যা হোক, আশ্চর্য্যের
আলোচনা আমাদের লক্ষ্য নয়। যুদ্ধের সময় এজন্য মনো-
ভাব এবং ফলতঃ যে নিষ্ক্রিয়তা দেখা দেয় তার ফলাফল
আলোচনা করা দরকার।

১৯০৯ সালে যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গেই প্রাণমূল্য বাড়তে

থাকে, যুদ্ধের প্রথমদিকে মূল্যবৃদ্ধিতে বৈঠক উদ্বিগ্ন হয়নি, একে একটা গুস্তমুচনা মনে করেছিল। কয়েক বছর আগে বিশ্বব্যাপী যে মন্দা দেখা দিয়েছিল কৃষিপ্রধান দেশ বলে ভারতের উপর তার অন্তর প্রভাব শিরপ্রধান পাক্ষাত্য দেশগুলির চেয়ে বেশী প্রচণ্ডভাবে পড়ে। ভারতে মূল্যমান খুব বেশী নমে যায়। তাই বিত্তীয় যুদ্ধের প্রথমদিকের মূল্যবৃদ্ধিকে গুস্তমুচকরূপেই গণ্য করা হয়। দ্বিতীয় ২১০ বছরের মধ্যেই মূল্যমান অত্যন্ত বেড়ে যায়—১৯৩৯ সালকে ১০০ ধরে ১৯৪২ সালে মূল মানের সূচক সংখ্যা ১৬১.১ পাঁড়ায় (সরকারী মতে)। তখন প্রথমতঃ বেসরকারী ও পরে সরকারী মণ্ডলে আন্তে আন্তে চিন্তা দেখা দেয়। সকলেই স্বীকার করে মুদ্রাস্ফীতির আশংকা দেখা দিয়েছে এবং যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সরকার। সরকারী মণ্ডল চিরায়ত প্রথা অনুযায়ী নিক্ষেপ থাকে। দেশের অমণ্ডলের ছায়া অর্থনীতিবিদদের চিন্তাশ্রান্ত করে তোলে এবং ১৯৪৬ সালে কয়েকজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ সরকারের কাছে একটি আরকপত্রে দেশে মুদ্রাস্ফীতাবৃত্তমিত (currency induced) মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে একথা জানিয়ে অনতিবিলম্বে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার অঙ্গবোধ জানান। ভারতের দুর্ভাগ্য পরাধীন সরকার যেজ্ঞা-প্রণোদিত হয়ে দেশের কোনও আর্থিক বিপদগ্ন সম্পর্কে বেশবাপীকে সতর্ক করেনি, নিজেরা সতর্ক হয়নি বা সতর্কভাষুলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেনি। অধিকতর চুৎকরণক অবস্থা এই যে অর্থনৈতিক বিপদগ্নের সরকারী মণ্ডলের একটা প্রধান অংশ প্রথমদিকে স্বীকার করতে চায়—অন্তঃনিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের মত শোনার তাষের স্বীকৃতি এবং স্বর্থনীতির মূল নীতিগুলির কাছে শেষ পর্যন্ত তাষের নতি স্বীকার না করে উপায় থাকেনা। যুদ্ধের মাফামাকি সময়ে একজন জুজীয়াবই সরকারী মণ্ডলে আমদা লক্ষ্য করেছি। অর্থনীতিবিদদের আরকপত্রের পরও সরকার চুপ করেই বইলো। ১৯৪০ সালের বাৎসর আলোচনাকালে অর্থনৈতিবি (Finance Member) মুদ্রাস্ফীতি নেই বলে ঘোর দলার ঘোষণা করেন। চনমত তথা নিশ্চিত মধ্যবিত্ত সনাজের চাপে ঐ বছরই সরকার সমস্ত অর্থনৈতিক অবস্থা পরীক্ষা করে দেখে রিপোর্ট দেবার

মন্ত্র একজন স্পেশ্যাল অফিসার নিয়োগ করে। তার উপর বিশেষভাবে মূদ্রাসম্পাদন ও মুদ্রাস্ফীতির আলোচনার ভার দেওয়া হয়। মুদ্রাস্ফীতি ঘটে থাকলে তা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা ও স্থপারিশের ভারও তাঁর উপর পড়ে। বিভিন্ন কোম্পানীর বার্ষিক বিবরণীতে মুদ্রাস্ফীতির উল্লেখ থাকে এবং রিজার্ভ ব্যাংকের রিপোর্টেও বলা হয় মুদ্রাস্ফীতি বর্তমান। এক বছর পর বাৎসর বক্তৃতার অর্থনৈতিবি আর বাস্তব সত্য উপেক্ষা করতে পারলেননা। ১৯৪৪ সালে তিনি স্বীকার করলেন মিত্রপক্ষীয় ব্যয়ভাব বহন করে ভারতে মুদ্রাসম্পাদন হয়েছে এবং বলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে।

মুদ্রাসম্পাদনের সঙ্গে উৎপাদন তাল বেধে চলেনি একথা আমরা বলেছি। জু'রেন মধ্যে সাময়িক থাকলে মুদ্রাস্ফীতি খটার সম্ভাবনা থাকতনা। উৎপাদন এবং উৎপাদন ও চাহিবার সাময়িক বিধানের মত কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় সন্মুখের তা আলোচনা করে দেখা যাক, কারণ মুদ্রাব্যবহার আলোচনার সঙ্গে এগুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এগুলি আলোচনা করলে স্পষ্ট হোকা যাবে মুদ্রাসম্পাদন—জাতির জীবনে বা আশীর্বাধের মত কাজ করতে পারত—সমগ্রজাতিকে কিভাবে জতিগ্রস্ত করে। মদার কিছুকাল পরেই যুদ্ধ শুরু হয়, দেশের সম্পদ ও জনবল নিরোধের একত্র সুবিধা—অনুযত আর্থিক নীতির বলে জাতি ভোগ করতে পারেনি। উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতি উপযুক্ত বৃষ্টি বিলে এ অবস্থা হ'তনা। যুদ্ধ শুরু হবার কিছুকাল পরেই হোকা যায় কৃষি উৎপাদন বাড়ানো শক্ত, কারণ প্রাচীনপন্থী কৃষিকর্ম যতটা উৎপাদন করতে সক্ষম ততটা প্রায় উৎপাদন হচ্ছিল, উৎপাদন বাড়াতে হলে প্রয়োজন ছিল উন্নত সরঞ্জাম কৃষি-যন্ত্রপাতি, সাব, বীজ ইত্যাদি প্রয়োগ করা। ব্রহ্মদেশ ও ক'হকটি পূর্বসীমান্তবর্তী অঞ্চল যুদ্ধে বিলম্ব হবার পর জাতিশত্রু আঘাতানী বহু হয়ে যায় এবং ভারতে উপগ্র জাতিশত্রু চা'হি। মিটতে অক্ষম থাকার বেশবাপী চুক্তির ছায়া দেখা দেয়। শিরাজবোর উৎপাদন ক্ষমতা থাকেনি, তবে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ছিল তা সাধ্যমত নিয়োগ করে ঐ অবস্থার কাম্যতম (optimum under existing circumstances)

উৎপাদন পর্ষায় নিয়ে যাওয়া হয়। ইউরোপে যুদ্ধের শুরু ইউরোপীয় দেশগুলি থেকে যন্ত্রপাতি আমদানী করা বন্ধ হয় আর দুটন যন্ত্রপাতি বা শিল্পজাত জরাজামদ্যী কিছুই ভারতে বহানী করেনা। যন্ত্রপাতির ক্ষয় ভাঙত আগা-গোড়াই বিধেদের উপর নির্ভরশীল—তাই শিল্পব্যবস্থারও সম্প্রদায় সম্ভব হয়নি—ফলতঃ যুদ্ধের চাহিদা মিটিয়ে তারপর যা অবশিষ্ট থাকে তাতে দেশবাসীর চাহিদা সংকুলান হয়না। যোগাযোগ ও মালপত্রচলাচলের সুবিধাগুলি প্রথম যুদ্ধের উল্লেখ্যে কাজে লাগিয়ে পরে যা অবশিষ্ট থাকত তাতে সাধারণের ব্যবহার্য মালপত্র চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, কাজেই দুঃস্থ অঞ্চলগুলি (depressed areas) এক সমস্যাই সম্মুখীন হয়। যুদ্ধের সময় পাশ্চাত্য দেশগুলি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং যুদ্ধের পূর্বেই তুলনায় এদের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়; আর ভারতে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নতুন ব্যবস্থা তো অবলম্বন করা হয়ইনি, বরং যন্ত্রপাতিগুলিকে কমতা-তিবিক্ষণ কাজে লাগিয়ে এদের উৎপাদিকার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়া হয় আর এভাবে যেটুকু উৎপাদন বাড়ে তাও অকিঞ্চিৎকর। 'বেন তেন প্রক্যারেন' যুদ্ধের প্রয়োজন মিটানোই বেগে হয় এমন নীতির পক্ষান্তরে প্রভাব বিস্তার করে।

কৃষিজন্মের মধ্যে চাউলের উৎপাদন কিছু বাড়ে, আখের উৎপাদনও বেশ বাড়ে। কাঁচা লোহা, ইস্পাত, চিনি প্রভৃতি শিল্পজন্মের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে। ১৯০৯ সালের তুলনায় কৃষি উৎপাদন মোট ১১% এবং শিল্পোৎপাদন প্রায় ২৫% বাড়ে। আমেরিকা, যুক্তন, ক্যানাডা প্রভৃতি যেখানে এমন উৎপাদন বরাক্রমে ৪০ থেকে ৪০% ও ২০০ থেকে ২৪০% বাড়ে। ভারতে উৎপাদন সম্পর্কে একটি তালিকা দেওয়া হল :—

জন্ম মূলবছর (base year) ১৯৪২-৪৩ ১৯৪৩-৪৪			
চাউল	১৯০৯	১৯২৬	১৯২৭
	মুঠক সংখ্যা		
	১০০ বরে	১১০.	১৭.৩
গম	"	১৬৮.	১৬০.২
আখ	"	৬৬.	৭০.
তুলা	"	১২০.	১২৪.৫
ইস্পাত	"	১৫০.১	১৫০.৫
চিনি	"	১৪০.	১৬০.
বিল্পশালী	"	১০০.	১০০.

১৯০৯ সালের মুঠকসংখ্যা ১০০ বরে ১৯৪৩-৪৪ সালে কৃষি-উৎপাদন পড়ে ১১১.৩ এবং শিল্পোৎপাদন পড়ে ১২৫.৩ হয়। যুদ্ধের কথা মনে রেখে এ উৎপাদন বৃদ্ধি উৎসাহজনক নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদন অসহ্য: দ্বিগুণ হওয়া উচিত ছিল। উৎপাদন বৃদ্ধি ও মুদ্রাসংক্রান্তদের হার লক্ষ্য করলে স্পষ্টই যেমত। যার শেষোক্তটির হার প্রথমটির হারের চেয়ে অনেক বেশী ছিল এবং ফলে মুদ্রা-ক্ষতি অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং বিনিয়োগের দান সাধারণ লোকের ক্ষয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। ১৯৪৫ সালের মধ্যে সংকট বহু উপায়ে মূলা-বৃদ্ধি রেখের চেষ্টা করে—মূল্যনিয়ন্ত্রণ তার মধ্যে প্রধান। ঐ সময়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত জন্মের প্রায় আড়াইগুণ এবং অনিয়ন্ত্রিত জন্মের মূল্য চার পাঁচগুণ বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের গতির সঙ্গে সাংগঠন রেখে মূল্যচাপিতকারী হল বিনিয়োগের কৃত্রিম অত্যাচার সৃষ্টি করে, কালোবাজারীর নির্লক্ষ্য রূপ ভারতের ভারতের সমাজও অর্থনীতি ব্রুদিত পর্ষায় নিয়ে আসে। সবথার নিয়ন্ত্রণপ্রথা চালু করে প্রাদেশিক সরকার-সবুহকে এপ্রথা কার্যকরী করার ক্ষমতা দেয়। এক একটি প্রদেশ নিজের খুশীমত ব্যবস্থা অবলম্বন করে। সবথার ভারতে এ নীতির কোনও সামঞ্জস্য ছিলনা। নিয়ন্ত্রণ প্রথা কার্যকরী করতে হলে অপর প্রয়োজন প্রতিটি নিত্য-ব্যবহার্য বস্তু উপর নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন, ভারতে তা হয়নি। অধিক খাজ ফলাও আন্দোলনে সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে অকৃতকার্য হয়। মালপত্রের আন্তঃপ্রাদেশিক চলাচলের উপর নানা বিধিনিষেধ ভারতব্যাপী যে একটি মূল্যমান (Price level) ছিল তা নষ্ট করে ফেলে। ভারতীয় বাজার বলতে কিছু হইল না, বিভিন্ন আঞ্চলিক বাজার (regional markets) ভারতীয় বাজারের (Indian market) স্থান গ্রহণ করে। ফলে অর্থ-নৈতিক নীতি ও ব্যবস্থার অবলম্বনে অশেষ অনুবিধা দেখা দেয়। নিয়ন্ত্রণ প্রথা সার্বভৌমতা প্রদানতঃ নির্ভর করে উৎপাদন, ও বণ্টনের হুমদামকলোয় উপর। ভারতে এটাই হইল বৈশিষ্ট্য। এছাড়া প্রয়োজন বস ও সং কর্তৃ-চাষীর। যুদ্ধকালীন ভারতে এছাড়াই অত্যাচার নিয়ন্ত্রণ

ব্যবস্থার অক্ষতকার্যভাব লক্ষ্য বহুলাংশে হারান। এমনতর কারণে মূল্যমান দিন দিন বেড়েই চলে এবং অজ্ঞাত দেশ বন্দন নিয়ন্ত্রণ ও বেশিমাং প্রাধার অর্থনৈতিক স্থিতি ও বর্ধার বটনব্যবস্থা পাক করে নেয় ভারতে তখন এটাইই অজ্ঞাব দেখা দেয়। মুজার সময় প্রতি বছর পড়ে মূল্যমান ৩০ থেকে ৩৫ পর্যন্ত বেড়েছে। অনিয়ন্ত্রিত অব্যবহিত হিন্দে এটাই আরও বেশী। ১৯৩৯ সালের পাইকারী মূল্যমানের গড় সূচক-সংখ্যা ১০০ ধরে ১৯৪৩, ৪৪ ও ৪৫ সালে এলংখ্যা বর্ধাক্রমে ১৫৭, ২১১, ও ২২০তে পৌঁছে।

অর্থ ও মুজার উৎপাদনব্যবস্থা সন্তোষজনক ছিলনা, মুজারসম্প্রদায়ের সঙ্গে এর বা মূল্যমানের সাম্যজন্য দ্বন্দ্বের ঠেটা কৃতকার্য হয়নি এবং নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অক্ষতকার্য হয়। ফলে মুজারসম্প্রদায়ের বোঝা ঠিকই ভারতবাসী বহন করেছে কিন্তু এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি।

মুজারসম্প্রদায়, উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণনীতির সক্ষম আলোচনার পর আমরা দেখেছি মুজারীতি উৎকর্ষপাই বর্তমান ছিল। মুজারীতির ফলে কি কি ফল দেখা দেয় তা আলোচনা করে দেখা যাক।

সামাজিক ন্যায় যোগ্য (Social Justice) প্রতি লক্ষ্য রাখা অর্থনৈতিক নীতির একটা অঙ্গ। বিত্তীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতে সেদিকে নজর দেওয়া হয়নি। হরিত্রসমাজ দিন দিন আরও হরিত্র হয়েছে আর বিত্তশাসী প্রাচুর্যের স্বাদ গ্রহণ করছে। মুজার মিটাতে হলে অর্থ-নীতিবিষয় প্রাধান্য কত, স্বয়ং, বাধ্যতামূলক সঙ্কর প্রভৃতির উপর লক্ষ্য রাখতে বলেন। ইউরোপীয় দেশগুলিও এগুলির দিকে বেশী নুঁক পড়ে। ভারত তা করেনি। মুজারসম্প্রদায়ের সবক'পথ অমূল্যবৎ ভারত সরকারের প্রাধান্য দক্ষ্য ছিল। কংগ্রেসবাহার পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু এতে আমূল্যপরিবর্তন কিছু হয়নি বা খুব বেশী Progressive হয়নি অপরপক্ষে regressive দিকটাই দেখা গিয়াছে। বিত্তশাসীদের বাধ্যতামূলক সঙ্করের আওতায় আনবার অপরিকল্পিতনীতি অমূল্যবৎ হয়নি। ঠিকাদার, ব্যবসায়ী, কৃষিকার, ও শিল্পপতিগণ মুজার কখনো প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করে না—ভারা তাই মুজার আর্থিক বোঝা বেশী বহন

করে; এটাই উন্নতদেশে নিয়ম। ভারতে এটা কোন দায়ই বহন করেনি বরং মূল্যবৃদ্ধি ও অতিবিক্রম চাহিয়া ও আনবানী বন্ধের সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের ঐশ্বর্য বাড়িয়েছে। স্থির আর উপার্জনকারীদের কথা, চাকুরিয়া, শিক্ষক, মজুর প্রভৃতির আর মূল্যবৃদ্ধির যোগে বাড়েনি; তাই এদের দ্রবস্থার সীমা থাকে না। তাছাড়া মুজার প্রত্যক্ষ দায় এদেরই বহন করতে হয়েছে। মুজার দ্বারা জীবন ছিল তাহাই আর্থিক দায়ও বেশী বহন করে—এ আর্থবর্ধনক নীতি পৃথিবীর অজ্ঞাত দেশে দেখা যায়না। কৃষকের অবস্থার উন্নতি হয় বলে যে দাবী দেখা যায় তা ভিত্তিহীন। বড় বড় ভোক্তাদারদের কৃষিক্রয় বিক্রয়ের ক্ষমতা আছে আর তাহেবই লাভ হয়েছে মূল্যবৃদ্ধিতে। মাধারণ কৃষক দুবেলা মিলের অন্নগ্রহণ করতেই বাতিদ্যস্ত, মূল্য-বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে সে কৃষিক্রয় বিক্রয় করবে পারেনি বরং অজ্ঞাত নিত্যপ্রয়োজনীয় জর্যাবিক্রয়ের ক্ষমতাও তার কমে যায়। ভূমিহীন কৃষক ও নিম্ন আর উপার্জনকারী মাধারণ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটিয়েছে। সহজ কথায় গত মহাযুদ্ধ তেনা মাধার তেল ছুঁয়েছে আর সর্বব্যস্ত করেছে হরিত্রমাধারকে। এরপ অবস্থা কি অপরিসার ছিল? বিবেচনী সরকার অবশ্য মুজার সঙ্কটের মোহাই দিয়ে পল্লত. এছাড়া তাহের পথ ছিল না—আমরা সেরপ মনে করি।

মুজার ভারতের প্রত্যক্ষ দায়ের লক্ষ্য ভারতপকারের ব্যয় করা উচিত ছিল; মুজারসম্প্রদায়ের সঙ্কলপে না গিয়ে অর্থ ও প্রত্যক্ষ করের প্রতি বেশী নজর দেওয়া, ঠাণ্ডি প্রাণা থেকে ভারতে বিবেচনী মূল্যনে চালিত শিল্পসংস্থাগুলি ভারতীয়করণ, বিদেশ থেকে বস্ত্রপাতি আমদানী না হওয়া পর্বত আভ্যন্তরীণ চাহিদাকে প্রাধান্য স্থান দেওয়া, যে মনস্ত দেশে বস্ত্রপাতি পাওয়া যেত তাহেব সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এগুলি আমদানী করা, উন্নত উপায়ে কৃষিকার্য পরিচালনা, দেশে প্রাপ্য অনিয়োজিত ধন উৎপাদনে নিয়োগ করা (employment of unemployed resources), অপরিসার জর্যাবিক্রয় কিছু কিছু আমদানী, মূল্য, মজুরী, মূল্য প্রভৃতির সর্বোচ্চ সীমা বেধে দেওয়া, নির্বাচিত নিয়ন্ত্রণের স্থান (Selective Control) মাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রাণা, এবং বুটেন ও মিজপক্ষকে ভারতে শ্রমিক প্রাধার

একটা বিশেষ অংশ তাহের বেশ বোকে মালপত্র পাঠিয়ে
 শোধকরাব তত্ত্ব বাধ্য করা প্রকৃতির উপায় অবলম্বন করুন।
 মুম্বাফীতির উদাহরণ। এত বেশী হত না। অর্থাৎ এরূপ
 ব্যবস্থার অর্থ হ'ত তাহের মীনাংক তাহে দুইদর পর
 গ্রহণ করবে। পরামর্শ হোশে এটা হবার পথ ছিল না।
 'মানেকং শরণং ত্রুত', মিচের কথা পরে তাহবে, টটিশ খা'র
 বকাই হোমার প্রধান কর্তব্য—টটিশদেরকা'রে এ মানা-
 তাহ চা'লেক করার শক্তি তাহে'তর ছিলনা, তাই তাহে'ত
 দুর্গমের অতলে তলিয়ে গেল; দু'ত তা'র এতাক দায় এবং

হায়বহনের ক্ষমতা (Capacity to bear) হিশাব করে
 বেখপনা কেউ। অপরূপে ইংলণ্ডের দায় ঠাণ্ডিএ মিটিয়ে
 ইংলণ্ডে দুজা'ফীতি হোমের ব্যবস্থা করা হ'ল। তাহতীয়
 জনসাধারণের মনে টটিশদেরকার এখাংগা প্রচার করতে
 থাকে যে বুড়ের সময় ত্যাগ স্বীকার না-করে উপায় নেই।
 শাসিত তাহতবামী ত্যাগের পরিমাণ (quantum) দখল
 সচেতন হ'লেও প্রায় কর্তার অধিকার ছিল না তাহ।
 ইংরেজের স্বার্থহকা দুই জীবন দিয়ে আর ধরে উপোস
 থেকেও তা'র করতে হবে—সে তা-ই করল।



এমন কিছু কঠিন নয়

ছোট ছেলের সঙ্গেও সম্ভব যদি ঠিকমতো
 ব্যয়িত দেওয়া যায়



আপনার সম্ভ্রমণে
 আপনার পুণ্ডের কর্ম-জীবনের
 সাফল্য বিমোক্ষভাবে
 সূচিত করবে।



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ফ্রেম অফিস : ৪নং ব্রাইট ষাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

কবির গুরু হরুঠাকুর

ঐহরিশখ চক্রবর্তী

[ক]

হরুঠাকুরকে আমি আমার চিনি না, নামটোও অপরচিত মনে হয়। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠকগণ জানেন যে কিকিৎসিক ১২৫ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা দেশে বিশেষ কবিতা কলিকাতার বাঙ্গালী সমাজে হরু-ঠাকুরকে না জানিত এমন লোক বেশ হয় একটিও পাওয়া যায় না। রাক্ষাসমহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া পথের ঘুঁটেন্দ্র পর্যন্ত সেদিন তাঁহাকে জানিত, চিনিত, সম্বোধন করিত। এমন সর্বজন-সমাদৃত একজন ব্যক্তি এত অল্প সময়ের মধ্যে কেমন কবিতা এমনভাবে বিস্তারিত অন্তরালে লুপ্ত হইতে পারেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু চকল পৃথিবীতে মানুষের কোন নিঃশেষক পরিচয় বা অস্তিত্ব নাই। হানে ও কালে কোন বিশেষ কার্যের মধ্যে ও সাহচর্যে আমরা বাঁচি ও মরি। ভাবীকালের অনাগত মানুষের কাছে আমাদের ঐতিহ্যের নির্ভর করে সেই বিশেষ কাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা ও স্বীকৃতির উপরে, আশিকার স্বীকৃতির উপরে নহে। সমগ্র জীবন একান্তভাবে বর্ধমানশ্রম। অতীতের যে ব্যাট আশিকার প্রয়োজন পিপাসা মিটাইতে পারে না, তাহার কোন মূল্য আশিকার সমস্ত মানুষের কাছে নাই; আশিকার চোখে দে হৃত।

হরুঠাকুর ছিলেন কবিগোলা, কবিগোলাদিগের মধ্যে অন্ততম শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য। কবিগানের কাছে আশিকার বাঙ্গালী, বিশেষ কবিতা শিক্ষিত বাঙ্গালী কোন আনন্দের স্বপ্ন স্বীকার করে না; আধুনিক বাঙ্গালীর আনন্দেও বিচিত্র পথ্যশালায় কবিগানের কোন স্থান ও স্থান নাই। ইহা হইতেছে সাধারণ বাঙ্গালীর কথা, যে বাঙ্গালীর অতীতের সম্বন্ধে কোন ঐতর্য্য নাই, অন্তরে নাই শির জিজ্ঞাসা, নিঃশেষের সামগ্রিক ও ধারাবাহিক পরিচয় গ্রহণের কোন মহত্ত্বের প্রেরণা বাহার অন্তরকে উত্তেজিত করে না। কিন্তু এমন স্ত্রীমের লোকও দুর্লভ নয়, কোন দিন কোন

সমাজেই হয় না, গাছের মনে নানা প্রকারের সঙ্গে একসাথে না আসে যে একশত-বহুশত বৎসর আগে বাঙ্গালী জনগণ কিতাবে চিত্তবিনোদন করিত? কাহার ছিলেন সেদিনকার কবি, গায়ক, নট? কি সুরে, কি কথায় ও ভঙ্গীতে সেদিনকার আসন্ন ভবিত? সাহিত্যের দস কোন বস্তু আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিত? এই জাতীয় পাঠকদের কাছে হরুঠাকুরের পরিচয় নন্দ লাগিলে না।

[খ]

হরুঠাকুরের পুরা নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী বা দীর্ঘাঙ্গী। ডাক নাম হরু এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া ঠাকুর। বাঙ্গালা ১১৪৫ [ইং ১৭০৮] সালে কলিকাতা সিমুলিয়ার হরুঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী বোধহয় খুব গণ্যস্তম্য ছিলেন না। কাজেই তৈরবৎসর সরকারের পাঠশালা হইতে যখন হরু নিরমিত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কল্যাণচন্দ্র বিশেষ নম্র বিরাহিলেন বা খুব কড়া হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। হরু পুত্রকর্ষাদিষ্ট বাগ্‌বেবোকে কাকি বিয়াছেন বটে, কিন্তু বীণাপাণির প্রতি তাঁহার অস্বস্তিক কতদূর হ্রাস পায় নাই। বস্ত্রত গান গাইবার ও সেই সঙ্গে কিছু কিছু ছড়া কাটিবার ষৌক্য বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সংগঠ ছিল, এবং তৈরব সরকারের স্তম্ভকটীর শাসন পাশ কাটাইবার অন্ততম কাবণও ছিল ইহাই।

হরুকে ১১ বৎসরের বোধি কল্যাণচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিলেন। কাজেই সোনাম শোষণা হইল, বই পুঁথির সঙ্গে সম্বন্ধ একবারেই ঘূড়িয়া গেল। হরু এবার খোল আনা উচ্ছ্বাস হইলেন। কিছুদিন পর কতগুলি ভবঘুরেকে লইয়া হরু একটি সন্দের কবির দল পঠন করিলেন। এই বিষয়ে তাঁহাকে রচিত শিশু নিঃসৃত ও সাধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন তখনকার বিখ্যাত কবি-

ডালা বঘুনাথ হ'ল ওরফে বঘুতাড়ী। বঘুনাথের সাগরেবী করিয়া বহু জীবনে নাম কিনিয়াছিলেন এবং এই স্বপ্ন তিনি কোন দিন জুসেন নাই। পরবর্তীকালে তিনি নিজের নাম গোপন করিয়া ওস্তাধ বঘুনাথের ভনিতার অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন।

পরে বাবা নবকৃষ্ণের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতার হক্কে পেয়াহারী কবির হল খোলেন। বাবা নবকৃষ্ণ ছিলেন তখনকার দিনে দাবতীয় জনজ্ঞানস্ব ধারার ও সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বাবার সঙ্গে বহুঠাকুরের মৌজত বহু সখ্যে একটি চন্দ্রকার কবিতা প্রচলিত আছে। একথা বহু বখন আসরে গান করিতে ছিলেন, বাবা তখন খুব সস্তর হইয়া তাঁহাকে একখানা মূল্যবান শাল বকশিস দেন। তখনও সাধের কবিওয়ালা, কাছেই এই ছাতির বংশিনে অপমানিত বোধ করিয়া শাল ছোড়া চুনির মজকে জড়াইয়া দিলেন। ইহাতে বাবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কেবল জ্ঞাপন বলিয়া সেদিন বহুকে কিছু বলিলেন না। কিন্তু পরে ইহার কারণ জানিয়া এই উক্ত কবিওয়ালার নিন্দা ও নাহস দেওয়া বাবা তাঁহাকে অত্যন্ত সন্মান দেখাইয়াছিলেন। বাবা নবকৃষ্ণই উভোগী হইয়া বহুকে পেয়াহারী হল করিয়া দেন। তাঁহাধের এই মৌজত বীর্ষমায়ী হইয়া বহু অহুগ্রহীতের দীর্ঘা উল্লেখ করিয়াছিল। এই সখ্যে একটি চন্দ্রকার গল্প প্রচলিত আছে। বহুঠাকুরের কবিত্বশক্তি ও প্রভুত্বপন্নতি যে অসাধারণ তাহা দেখাইবার জন্য বাবা সভাসময়ের ডাকিয়া এক পাণ্ড কবিতার পাণ্ডপূরণ করিতে বলিলেন। পাণ্ডটি এই—‘ইড়নী গিলেছে ঘেন চাধে’। সমস্ত পতিত ও সভাকবিরা বখন হিমসিম খাইয়া গেলেন, তখন বাবা বহুকে ডলব দিয়া পাইক পাঠাইলেন বহুঠাকুরের কাছে। ঠাকুর জ্ঞান করিতে গঙ্গার চলিয়াছিলেন, গানছা কঁপেই বাজ ধবধাবে ছাডির হইলেন এবং পাণ্ড পূরণ করিলেন—“একদিন শ্রীহরি নৃত্তিকা ভোজন করি, ধূপার পড়িয়া বড় কঁপে। রাণী অঙ্গুলি বেলায়ে ঘিরে নৃত্তিকা বাধিও করে, ইড়নী গিলেছে ঘেন চাধে।” যাযা যোক, বাবা বাগছুরের মৃত্যুর পর বহু হল ভাঙিয়া ও গান ছাড়িয়া বিয়াছিলেন এবং আর কাহারও অহুবেদেই তিনি হল গঠন করেন নাই।

ইংরাজী ১৮২৪ সালের ৬ই আগষ্ট [বাং ১২৩১, ২৩শ শ্রাবণ] শুক্রবার ৮৬ বৎসর বয়সে বহুঠাকুর দেহত্যাগ করেন।

[প]

বালাকালে পাঠশালা পণ্ডিত হইতে বাহ্যিক কবিত্বগানের সাগরেবি ক্ষুদ্র এবং জীবনকাল বাহ্যিক ৮৬ বৎসর, কবিত্বজ্ঞের সংখ্যা যে তাঁহার অনেকগুলি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও বহুঠাকুরের অধিক গীত আমাদের হাতে পৌঁছে নাই। ইহার অল্পতম কাণ্ড এই যে কবিত্বগান সাধারণতঃ লোকের কর্ণধা হকিত, এবং মুদ্রিত কবিত্বের মত জনকচিত্র সংঘর্ষ ইহার পশ্চাতে ছিল না। কাছেই বহু গান অবিরাম পড়িয়া গিয়াছে। বহু গান খণ্ডিত ও বিকৃতভাবে পাইতেছি। একের গান অন্যের নামে চলিতেছে। অল্পতম কবিত্বগানের সহিত সংগ্রহ করিয়া দীর্ঘবস্ত্র বহুঠাকুরের ৪৫টি গান প্রকাশ করেন। ইহাই আদি ও বৃহত্তম সংগ্রহ। ইহার পর কবিওয়ালার গীত সংগ্রহ, গুণবস্ত্রোদ্ধার, প্রাচীন কবি সংগ্রহ, ওস্তাধী কবিত্বগান, ঐতিহাসিক, বালালীর গান, মদ্যোদয়ার সংগ্রহ, প্রভৃতি গ্রন্থে বহুঠাকুরের গান সংগ্রহ করা হইয়াছে কিন্তু অধিকাংশ গীতই গুণকবির সংগ্রহ হইতে গৃহীত। কোন কোন সংগ্রহে কিছু কিছু নূতন গীতও যোগদান করা হইয়াছে এবং এমনও অনেক গীত আছে যেগুলির সঙ্গে একাধিক কবি ওস্তালীর স্বাক্ষর যোগদানিত।

কবিত্বগানে কতগুলি সুনির্দিষ্ট বিষয় থাকিত এবং সেগুলির অহুগ্রহ হইয়াই কবিত্বওয়ালার গীত রচনা করিতে হইত। এই বিষয়গুলির মধ্যে ভাবানী বিষয়ক বা আগমনী, সুবী-সংবাদ, বিবাহ, খেউড় ও লহর প্রধান। সকল কবিওয়ালাই উক্ত বিষয়গুলি লইয়া গীত রচনা করিতেন, কেননা আগম বৃত্তি এবং প্রোতাহের মজিত তাঁহাদের গান পারিতে হইত। দীর্ঘবস্ত্র বলিচ্চেন, “বিশিষ্টমনেতা ভক্তগানে, আর ইতরমনেতা খেউড় গানে ভুট হইত।” বহুঠাকুরও উক্ত বিষয়গুলি লইয়া গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বহুঠাকুরের মৃত্যুর নানাবিক ৪০ বৎসর পর গীত সংগ্রহ করিয়াও গুণকবি তদ্রূপিত কোন আগমনী বা ভাবানীবিষয়ক গান তাঁহার

সংগ্রেহে উল্লেখ করিতে প্রাৰেন নাই। অপর তিনিই বলিগ্রাছেন যে, সখীসংখ্যার ও বিরহ গীতের মত হরঠাকুর চমৎকার আগমনী ও তথানী-বিষয়ক গান রচনা করিতেন। জিন্নহুসাল মিশ্র সংকলিত বটতলার ছাপা প্রাচীন গুজাদি কবির গান (১৩০০ খ্রিঃ সাল) গ্রন্থে হরঠাকুরের একটি তথানী-বিষয়ক ও একটি আগমনী গীত দেওয়া হইয়াছে।

খেউড় ও লহর ইত্যর অনেক গীত হইত। বাক-চাতুর্ঘ্য, অলঙ্কার, উদ্ভট উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রভৃতির অল্প তথানীস্থান শিক্ষিত ও বদিক ভঙ্গগণ পৰ্ব্বত মানসে ও সাংগ্রেহে খেউড় ও লহর শুনিতেন। কিন্তু কৃত্রিম পরিবর্তন হইবার সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি ক্রমে দোষ পাইয়া আসিল। শুদ্ধকবি কবিগান সংগ্রেহে খেউড় বা লহর গানগুলিকে স্থান দেন নাই। কারণ এইগুলি শুদ্ধকবির ভাব্য অতি অল্প অতি স্তম্ভিত, অতি অশ্রাণ্য, অবাচ্য শব্দে পুত্রিত হইত, এই কারণে তারা কোন প্রকারেই প্রকাশ করা বিধেয় নহে। সখীসংখ্যার ও বিরহ বিষয়ক গান সম্বন্ধেই হরঠাকুরের সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল, বিশেষ করিয়া সখী সংখ্যার।

হরঠাকুরের সখীসংখ্যার ছিল শুৎকালে সর্বাধিক জন-প্রিয় কবিগান। কাছেই সখীসংখ্যার আলোচনা করিলেই ঘোটাঘুটিভাবে হরঠাকুরের কবি-পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আলোচনার প্রবৃত্তি হইবার পূর্বে কয়েকটি বিধেয় আদ্যের সতর্ক হইতে হইবে। প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে যে কাব্য ও কবিগান এক বস্তু নয়, কাছেই সমালোচনার আদর্শও ভিন্ন বস্তু হইতে বাধ্য। বিভীষিতঃ স্থান, কাল ও পারিপার্শ্বিকের পটভূমিকার উপর আদ্যের অখলিত সৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৃতীয়তঃ মনে রাখিতে হইবে যে শূর সংস্কৃতিগণ ছাড়া অর্থাৎ সখীতরুণ ছাড়া কবিগানের কোন বস্তুর কাব্যরূপ অর্থাৎ কথা বা গানের কোন নিরূপক মধ্যমা ছিল না। অথচ আদ্যের বর্তমান আলোচ্য বিষয় হইতেছে কেবল কথাগুলি সূতরাং বাহ্যিক হরঠাকুরের কণ্ঠে বা অল্প কোন কবিগানের কাছে হরঠাকুরের গান শুনিয়া তারিক করিয়াছেন, তাহাদের সহিত আদ্যের মতৈক্য না হইলে বসিবার কিছু নাই। পক্ষান্তরে উল্লেখ্যে কাব্যরূপ না পাইয়া বাহ্যিক এইগুলিকে

একবারে বাহ্যে বসিয়া দূরে বেশিয়া দিয়াছেন তাহাদের সঙ্গেও মতামৈক্য হইবার সম্ভাবনা আছে।

সখীসংখ্যার কথাই প্রসঙ্গিত অর্থ মাথুব। ঐক্যক মধুরা গদন করিলে, হৃদাসখী দূতীকরণে যে শব্দে মধুরাতে লইয়া গিয়াছিল, তাহাই সখীসংখ্যার বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু কবিগানের মধ্যে ইহা ব্যাপকতম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐক্যকথাবা বিষয়ক যান্ত্রীয় গীতাবলীই কবির গানে সখীসংখ্যার। অক্ষয়সংখ্যার, জিন্নতীর পূর্ণিমা, মিলন, মান, বিহে সবগুলিতেই সখীসংখ্যারের বৃহত্তর ঐক্যমিশ্র মধ্যে বেলা হইয়াছে। পরবর্তী কবিগণ যেখোঁচ ও মহাভারত বা পুংগেব নানা বিষয় লইয়া গীত রচনা করিয়াছেন, তাহাও এই সখীসংখ্যারের অন্তর্গত। কারণ যেই বিষয়ক বা বিরহ বিষয়ক কোনটির মধ্যেই ইহা দেওয়া যায় না অথচ সূতনকোন শাখার উদ্ভগও হয় নাই। এইখানে উল্লেখযোগ্য এই যে কবিগানের আনন্দকল্প মিত্র মহাশয় এই সম্বন্ধে সত্বর মত পোষণ করেন। তাহার মতে মাদনী, সখীসংখ্যার, পোষ্ঠ ও কবি—এই চার ভাগে কবিগান বিভক্ত; এবং নায়ক নায়িকার স্তম্ভরূপের আলোচনা যে গীতের বিষয় তাহাগুলিকে সখীসংখ্যার বলে। বসন্ত, বিরহ, ভেব প্রভৃতি গানগুলিকে সখীসংখ্যারের অন্তর্গত করা গেল। কিন্তু ইহা মিত্র মহাশয়ের নিজস্ব মত এবং তথানীস্থান অল্প কোন সমালোচক ইহা গ্রহণ করেন নাই। বসন্তঃ ইহা ঐতিহাসিক নহে ও সৃষ্টিবিরুদ্ধ। একটা প্রথান সৃষ্টি এই যে কবিগানে বিরহ নামে একটি বিশিষ্ট ব্যাবার কথা মিত্র মহাশয় অস্বীকার করিয়াছেন, অথচ বিরহ শাখার ছাত্তরা ও গোঁব সবধন-বিস্তৃত। মোট কথা এই যে শুধু যেই বিষয়ক ও বিরহ বার বিশে কক্ষ ও পুরাণাদি বিষয়ক যান্ত্রীয় বিষয়ই সাধারণভাবে সখীসংখ্যারের অন্তর্গত। অবশ্য হরঠাকুর সম্বন্ধে আদ্যঃ সখীসংখ্যারের সখীর্ণ সীমায়ই বিচরণ করিতে চেষ্টা করিব।

শুদ্ধকবি সংগৃহীত হরঠাকুরের গীতসমূহের মধ্যে ৩৪টি মাত্র সখীসংখ্যার। ইহাদের মধ্যে ২৪টি গীত অসঙ্গত কোন না কোন সংগ্রেহ ছাড়া হরঠাকুরের আরও ১৮টি সখীসংখ্যার অসঙ্গত সংগ্রেহ গ্রন্থে দেখা যায়, কিন্তু যুসুকিল এই যে দুইজন লেখক কবিতা এইগুলি সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন,

অধিকন্তু কেহ কেহ কোন কোন গীতকে অস্বাভাবিক বহিঃ
বচন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই মোটামুটি তাহা
সংসারপ্রভাতের প্রকাশিত গীতগুলিকেই গ্রহণাণী
হয় ত্রিক।

হরঠাকুর শব্দসংযোগে পূর্বরাগ, সুবলী, এসে দুগাং,
মান, বগু, আকপ, বিজ্ঞান, বজিতা, বিপ্রলক্ষ্য, অকুংসংযোগ,
নাথুং, প্রভৃতি মানা বসের ও বিবাদের গীত বচন
করিয়াছেন। মোটামুটি তাহা ত্রিবাংলার প্রেমদীপার
এক সকল প্রাধান্য সত্ত্বেও বর্ণনাই ইহাতে আছে। কিন্তু
সকল সত্ত্বেও ও বসের গীতে হরঠাকুর সমান হৃদয়
যোগাইতে পারেন নাই। বচনায় এই তারতম্যের সুপ
বিচারেই কবিত্রিতার আসল রূপটি বরা পড়িয়া যায়।
হরঠাকুরের শব্দসংযোগগুলি মধ্যে পূর্বরাগ, সুবলী, আকপ,
বদোলপাং, নাথুং দে সত্ত্বেও বচনা, বজিতা, বিপ্রলক্ষ্য, মান
প্রমুখ বচনাগুলি সেই সত্ত্বেও উজ্জীর্ণ হয় নাই। লক্ষ্য করিয়া
হেঁসিলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে উহাদের মর্মবাণী আশা।
কারণ রূপবৃত্তা, আশ্বিনবেশনে উৎসৃষ্ট, উত্তরভাগ্যবেশে
অদৌরাৎ বরা আরা বজিতা, মানিনী, বিপ্রলক্ষ্য, সুবলী
বাংলা এক নহেন। অসংকার শাস্ত্রে মুদ্রা ও প্রগল্ভা
নাট্যকালে যে পার্থক্য এই দুই বাগার পার্থক্য অনেকটা
সেই প্রকার। হরঠাকুরের সুবলী হইতে অধোঃ বাগার চিত্র
অধিকতর মনুং, মানিনী হইতে মুদ্রার চিত্র বেশী ঘোর।
ইহাৎ প্রাধান্য কারণ হরঠাকুর কোনসংপ্রাণ কবি, তিনি
নে কখনো কঠিন হইতে পারেন নাই। অকুংসংযোগে ও
বৃন্দাবতী সংযোগে এই পার্থক্য বিভ্রম। কিছু দৃষ্টান্ত
হেঁচকা বাউক।

বাক্যবিনীততা বাহা বাক্য শুনিয়া পাগল হইয়াছেন।
নিম্নের অঙ্কনে একরাতে প্রিয়াকে পাইয়া বলিলেন—

ভ্রাম তিলেক ধাঁড়াও হেরি চিকণ কালো বদন
ভ্রাম তিলেক ধাঁড়াও, এ অধোনির মনের বদন পূর্বো।
নির্ভনে এমন না পাব বদন, যায় নিশি থাক,

আজুক শুভজন,

তাহাতে নহি বেদিত, স্তন ওবে ব্রহ্মনাথ,
ও বংশীর স্তন কত বিশেষ শুনাও।

কোন রক্ত পূরে ধনি কুলবতীর মন।
কুল সহিতে যে করিলে হরণ,
কোন রক্ত পূরে ধনি বাগার কর উদানিনী
নাশাতে বাজাও শুনি, আনার মাথা বাও।

সান্ত্র জগতরা চোখের একটি গভীর আকৃতি ইহার
মধ্যে রূপময় হইয়া উঠে নাই কি? কক্ষ-প্রেমবিদ্যা বাগা
বলিতেছেন :—

আমারে সখি ধরো ধরো
বাগার বাবিত কে আছে আমার
পথপ্রান্তে নহি মো কাঁতার
জুয়ে নবদন দলিতাজনবরণ উইয়ে অবন শরীর।
অক বরধর কাঁপিলে আমার, আর না চলে চরণ
দেই ভ্রাম-প্রেম-ভরে পুলক-অন্তরে,

সখরা যে তার অবন।

হায় সে যে কটাক্ষের অপাগ ভক্তিমা
বয়ান করে তা কি কলো।
লেগেছে বাহারে প্রবেশি অন্তরে

সেই সে বুঝেছে তাহা।

কুল নীল ভর লক্ষ্য তার যায়, না বাধে জীবন আশা,
তার কলে বা কলে বা অন্তরীক্ষে কিবা
সন্বেদ নাহি মরিবারো।

ইহার শব্দ-চিত্র সম্পদ ও বাচন-ভঙ্গীর সৌন্দর্য অল্পপম।
কিন্তু তাহা বাহ বিলেও সঙ্গীতটির মধ্যে যে গভীর আবেগ
ও তীব্র রসাবেশ আচ্ছাদিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা শুধু
কবিত্রিগল্যদের মধ্যে কেন, বৈকুণ্ঠ পদ্যাবলীর মধ্যেও উচ্চ
স্থানের অধিকার পাইতে পারে। এই সব গানের পাশে—

“সখি ভ্রামটাং কর মানা

কোন ছলে যেন এসে না কখন তলে”—

প্রভৃতি মানের লঘু গান; অথবা—

“এগেছ ভ্রাম কোথা নিশি আশিরে” প্রমুখ বক্তিতার
সর্বোৎকর্ষ গুলি খুবই কিকে মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে হরঠাকুরের বিবহ সঙ্গীতগুলি কথ্য বল।
যায়। শুধু কবিত্রি ১০টি বিবহ গীতের ছয়টি গীতই প্রেমের
স্বপ্ন নিৰ্ভর ও প্রেমনিবেশন মূলক। বাকি সাতটির মধ্যে

নানা ভাবের বিচিত্র স্বেচ্ছাক গান আছে : কিন্তু এক প্রেমিকা গদন আক্ষেপ করিতেছে :

নমসেই ভাষারের ভাবতমা বোকা যার।

প্রেম সধকে হরঠাকুরের চিরনীওলি বেশ মনে ও মগুর।

“পীরতি নাহি গোপন থাকে

শুনলো নন্দনি বলি তোমাকে

তুনেছ কখনো অলস আস্তন বসনে বহন যাবে ?”

গোপন প্রেম যে কি আশ্চর্য উপায়ে প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহা বোকা ছুনাথ।

“হায় পীরতির কিবা পৌরহ আছে

সে পৌরহ মন অঙ্গে হয়

কলঙ্ক পবনে লইয়ে সে বাণ ব্যাপিলো অগতঃ।”

উৎসেপ ছদয়াবেগের এমন সংঘত প্রকাশের দৃষ্টান্ত বোধহয় সকল সাধিতেই বিরল।

মোটকথা হরঠাকুর চড়া কঠোর কবি ছিলেন না। রামবহুর সঙ্গে তাঁহার সবচেয়ে বড় পার্থক্য এইখানে। রামবহুর নাবকনাটিকা যেখানে জীত্র শ্রেষ ও শাসিত বিজ্ঞপের চাবুক পরস্পরকে ঘায়েল করিয়াছে, হরঠাকুরের নাবকনাটিকা সেখানে হয় হতবাক হইয়াছে, নতুবা কড়া কথাও চোখের জলে ভারি করিয়া থলিয়াছে। কাবণ হরঠাকুরের ছবরে ততখানি নিষ্ঠুরতা স্থান পায় নাই। ব্যর্থ

“দিক দিক তার কীমন গৌরন

এমন প্রেমের সাধ করে যেই জন,”—

তখন তাহার গদবা প্রেম ব্যাপন পর্য্যন্ত নহে—

সখি পিতৃতি পদম ধন ভগতেদি পার

হুওনে কুণনে হলে হয় ছায়ে থাকে।”

হরঠাকুর শান্ত প্রেমের কবি, মুক্ত প্রেমের কবি। তাঁহার

মধ্যে প্রেমের দুই গুণন আছে, অ-উচ্চ গোবনা নাই ; অশুদ্ধ

আত্মমর্ষণ আছে, তাঁর বাকপটুতা নাই। কবির দলে

চিতেনটি খুব উচ্চ পর্যায়ে গাহিতে হয়। তারপরই অত্যাচার

ধায়ে গলা নাড়িয়া আসে এবং উচ্চ গ্রাম হইতে নিঃশ্রান্ত

সম্মা সুর সকারণের মাধুর্য প্রোতাদিপকে মুক্ত করে।

হরঠাকুর মুকঠ ও নিপুণ গায়ক হিলাবে মর্ষশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

বসন্ত রক্ত ও গায়ক এই দুয়েই অপরূপ মনোর ছিপ তাঁহার

খ্যাতির মূল বসন্ত। কাণেই সব পর্যাতেই যে তিনি

পারদর্শী ছিলেন মনে হয় নাই। তবু তাঁহার রচনা পড়িয়া

মনে হয় অত্যাচার মুক্ত গুণন তাঁহার কঠোর খেদন মদুপ্রাণী

হইত, হয়ত চিত্তনের চড়া সুর ততটা হইত না। বলা

বাছল্য ইহা একান্তই অসম্ভব। কাবণ গায়ন হরঠাকুর ও

বাঁদনদার হরঠাকুর এক ধোঁহে দুই ব্যক্তিও হইতে পারেন।

কিন্তু যদি রক্ত ও গায়ক একধর্মাই হইয়া থাকেন তাহা

এই অসম্ভব অর্থার্থ বলিয়া মনে হয় না।



কথিত গুচ্ছ

বিটপী-বোধিকায়

শ্রীমধীর শুভ

আজিকে এসো মন বিটপী-বোধিকায়,
কোকিল-কলাপ মলয়ে হুবছায় ;
কোমল কিশলয়ে গোলাপী রকি-কর
আঁকিছে রূপ-রাগ কত যে মনোহর ;
বকুল-বাসে হার সুবাস্তি সমীরণ ;...
বিটপী-বোধিকায় আজিকে এসো মন ।

বলাকা ভেসে যায় অনাবি নীলিমায়,
বল মেঘমালা মাধুরী তেলে ষায়ে,
বৎস-সুবনায় দরবী দিবাকর
সাজিয়ে করে তা'রে কিবা সে মনোহর ;
মায়াবী ছায়া তা'র স্রুজে শোভা পায় ;—
আজিকে এসো মন বিটপী বোধিকায় ।

বিটপী-বোধিকায় ছায়াটী মমতাব,—
মধুর মাধবীতে নহে তা' তুলিবার ।
কোমল গালিচার লহন তুগদল
রেখেছে সেবা পেতে ; কাছেই দীর্ঘ-জল
সহস্র স্মৃতিতল পানীয় পিপাসায় ;—
এসো গো এসো মন বিটপী-বোধিকায় ।

বিবাহ, অবসাদ, বেদনা, গুরু-ভাব
বোধিক। স্মৃতি-স্মৃতি স্মৃতি তুলিবার ;
পবন প্রকৃতির সত্যিতে পরিচয়,
অমৃত-অমৃত-সত্যিতে যদি হয়,
মানস-পুরুষের অন্তরে নিকেতন,—
বিটপী-বোধিকায় এসো গো এসো মন ।

শ্রুত এসেছে শান্তনিল দান

শব্দ বহু করে চলছিল বেশ : হঠাৎ ধামলো বৃষ্টি
কলধানি। কই, এতক্ষণ ওদিক পাই নেকো কিছু খুঁজি
কী যে হ'ল ভাব—অদম্যে এ তো ধামবার কথা নয় :
হম কমে গেছে ? তাই হবে নিশ্চয়।

হম দিতে বাই, হম ত্যাগে না : এ যে হ'ল বড় দার !
চূপ করে থাকি আনন্দা হয়ে, ভাবি, হবে কী উপার।
হঠাৎ আকাশে চোখ পড়ে যায়—বৈদ্য, ভেদে ভেদে চলে
সারা সাধা মেখে হেলে তুলে ধরে ধলে।

চেয়ে চেয়ে দেখি : তারি ভাল লাগে, তারি খুশি হয় মন ;
নীল আকাশের পায়ে কলাকার সান্নিধ্য করে বিচরণ ;
খেরাল খুশির হাওয়ার নেতাহে, ছুটি ছুটি মনে হয়—
আবকের হাওয়া ছুটির খবর হয়।

মাটির পানেতে চেয়ে দেখি, এ কি ! শিউলী ফুলের মেলা,
কাশ ফুল ফুলে প্রান্তর ছাওয়া, করে ঢেউ ঢেউ খেলা ;
কল থেমে গেছে কেন যে, হিসাব নিলো এতক্ষণে :
শব্দ এগেছে আকাশে বাতাসে মনে।

আর কত কাল প্রভাকর মাঝি

আর কত কাল বিধব মন নিয়ে
সবাই ছুতে ঘোঁষনেব অঞ্জলি ?
অতবিক্ত অবস্থা সজীন,
তুকনো হোয়েছে গোলাপের মতো ভাল !

এখানে ঈর্ষা, ওখানে বিভ্রম,
মাঝে ব্যর্থতা সন্দেহ সংশয়।
আগিলে 'স্তব্ধ' মন বেখে কথা বলা,
কল্পনাস্রাব সন্ধ্যানে বেগে রয়।

আকাশ দেখিনি কত কাল চোখ তুলে ;
'পূর্ণিমা-চাঁদ কলসানো কুটি' নাকি ?
হয়তো মিথ্যা, কিংবা মিথ্যা নয়—
ছন্দের হাতে আমরা বেঁধেছি বাঁধী।

কত কাল আঁধা, শুনিনি বরের পাশে
ছোট-থেকে চেনা গল্পে পাখির গান।
দেখিনি, মুক্তা গুলো ছুঁয়ে গলে :
বৈশাখ বুকের হিসেবেই হৃদয়ান।

তবু তুলে নেত পানি এ বয়সেই,
একটি মেয়ে ভালবাসা বহি পাই।

একটি বিষম কবিতা বিকাশ দাস

অর্ধেক শাড়ীতে মোড়া বাঁকা-ভুরু রূপসী নারীর
যেথেকে ধাঁধানো রূপ,—টাম-বাস সাংস্কৃতিক ভিড় !
কাডিস্যাক্, হলকে বাড়ি, নৈশ স্নানে চটুল মেয়ের
বোরা-কেদা, রেস্তোরাঁয় আতর্ষ চতুর সুবকের
বাধা বুলি, ‘তালো স্কব’ ‘জনবুল তুখোড় চা’লিগাং’
‘আস্তে জিহ্বা অঘিষ্ঠীঃ,’ ‘হেমিঙেরে নিভাওই বাগে,’
‘কবে এলে তু’ কি কবে তু’ সন্তায় কর্দে হিম্মাং’
ইত্যাদি অনেক শুনে, স্নাত্ত বড়ো শৌখিন সমাজে !

(অবশ্য অনেক গুণে স্বামী ।)

পেরেছি বেসের বোড়া, মধ-মেয়ে পুষ্পদার কত,
তবু কি লক্ষ্যের কথা মন ভরে না ত !
এখনো বক্তের শ্রোতে বাস-পাখি, সবুজ পাহাড়,
নিশিবেব জলে তান্দা প্রান্তরের কঙ্কণ কান্নার
শব্দ আসে, সকালের চড়ুই তাকায় নিম্ননিধ,
ছয়কে ডাকে আরো মাঠ আদ মাঠের শালিক !!

পালঞ্চ কাহিনী শ্রীমতীমাপন কর্মকার

সবুজ ডানায় মেখে বাঘের হোঁচর
যেমন পাখীর আসে
প্রাণ নিয়ে হাসি নিয়ে আর নিয়ে পান,
ভেমনিভো এসেছিলে তুমি ।
পাখী আসে উড়ে যায়, স্বরা পাখা রেখে যায়,
জল-ভরা নদী কূলে কূলে,
তুমি এসে রেখে গেলে—
সময়ের বাসুদেবে—তোমার সবুজ-একদিন ।
পাখীর পালক ভেসে যায়,
শ্রোতের আঘাত লেগে লেগে,
তোমার সবুজ বিন তবু থেকে যায়
আমার ছয়বে বাস্য বেঁধে ।.....
পালক হারিয়ে যায়—তার সাথে যায় যত পান,
তীরের সবুজ বাস হলুহাত হয়,
তোমার স্মৃতির রেখা মোছে নাক’ তবুঃ
আমার মনের কূলে—আরও গাঢ় হয় ।

দ্বিগন্তের নারী অলোক মুখোপাধ্যায়

দ্বিগন্তের পারে বসে বেন এক নারী
এলো চুল বেলে দিয়ে আকাশের গায়
মেঘের আঁচলখানি বাতালে ওড়ায় ।

দিনের আলোক তার আশ্বিনের হাসি
রাতের আঁধার বৃষ্টি ব্যাধার প্রকাশ,
জ্যোৎস্নায় কোটে তার দ্বিগ চাহনি
কলনের পঙ্ক তার দেহের হৃদয় ।

জানিনা সে নারী কেন তবু অক্ষয়নী,
বুকে তার কেন বর ব্যাধার ধ্বনা—
প্রাণে থারায় সেই অক্ষর করে পড়ে,
তাই বৃষ্টি মাগরের জল এত লোনা ।

সন্ধ্যাবর শ্রীশ্রব চট্টোপাধ্যায়

চেটে তুলে তুলে আধোনিমেছুর সকাল বেলা
হাওয়া বা বসছে,—এনা পেলি এক আভব খেলা ।
তোমার বুকের তিতরে বা কিছু লুকানো আছে,
তুলে নিয়ে আসি এখন আমার ডোখের কাছে ।
—ছায়া গড়ে উঠে ছায়া বেড়ে গেলো, অতল হিম
সুনিবিড় জলে হাওয়া শুধু এলো হতশে যুগে ।
গীতাত পাতার রোর হাওয়া হলো আবর্তিত
প্রত্যাহ্বাত বৃন্দপুং ।

বিকেলের দিকে মেঘের ঘেরেবা কবরী বাঁধে
এই আয়নার মুখ বেধে বেধে, বানিক বাঁধে
জাবার মাসাবী সেই ছায়া অনে অতল মল ।
বস্ত্রমৌলি সন্ধ্যার প্রেমে বন্ধতল
ব্যথা পেয়ে তবু ভালবাসে সেই স্বচ্ছতাকে ।
বিগলিত রাজ্য ভুলেবের মতো মধুকর
হয়ে গেলে 'পব গভীর জলের নিবিড় ডাকে
হাওয়ার বেহনা তীব্রতর ।

রাত নেমে গেলে সেই ছায়াধের শিথিলতর
অন্তরালে সোহাগ-আকুপি, অপবিতর
কঁকে কঁকে দূর জলের গভীরে হুতলুসীম
কালার বেধ গড়ে ওঠে, আর হুতলি
আনত শরীরে হাওয়া নীচে নামে শুষ্ক হাতে ।
বিস্ত্রস্ত সে বিবশ তখন বুকের কোণে
কুমারীর সাধ,—গানে গেয়ে সেই ছায়াব মাঝে
হাওয়া মিশে গেলো পূর্বদনে ।



নীল দ্বীপ বিভূতি ভট্টাচার্য

সুবেছি আকাশে

ওই পাশে

নীল দ্বীপ আছে বুঝি কোনো ;

সেখানে আমার মন,

ঘূড়ির মতন

উড়ে যায় কখনো কখনো ।

হলুৎ মধুর মত রোদ
সারা গায়ে মাখানো যে তার,
জ্যোৎস্নার গিনি গলা হাতে
মহাবৃত্তে সে ধের সীতার ।
দেখের খাপরা পরা দেশ,
মিষ্টতার মধু পবিবেশে,
যন নীল চেষ্টার আড়ালে
ঝিহুৎকর বৃক্ষে ওঠে ভেসে ।

জীবনের অনেক খেলাতে,
কতবার হিসেব মেলাতে,
হাল ভাঙা জাহাজে মাটির,
যখন পার না বুঝে তীর,
আশ্চর্য সোনার কাঠি ছুঁচোখে হুলিয়ে
নীল দ্বীপ চোখে নামে সব সাধ নিয়ে ।



মানভূমির ইতিহাস ও বিবর্তন

ঐতিহাসিক পাল বয়স

প্রাচীনতমের কথা নয়, প্রাচীনকালের কথা। মানভূম ছিল বাংলায়ই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বেহের গঙ্গে হাত-পায়ে আত্মীয়তার মত বাংলার সঙ্গে মানভূম জড়িত ছিল। অনেকের কাছে এই উক্তি হয়ত মনগড়া বলে মনে হবে। তবে গুপ্ত বংশের আমল হতে বৃষ্টি আমল পর্যন্ত ইতিহাসের পাড়া কয়টা যদি কেউ পর্যালোচনা করে, তা'হলে সে স্পষ্টই জানতে পারবে যে মানভূম বাংলায়ই অঙ্গতম ভূভাগ। যেমন একই পল্লীর দু'টি পাড়া। যুটি পাড়া আর বামন পাড়া। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে পৎস্পার পৃথক হয়ে থাকলেও পল্লীর পূজা-পার্বণ ও উৎসবাবিধি দুই পাড়ার লোকই যোগ দেয়। সেইরূপ মানভূম ও বাংলার বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় ঐক্যের ধারা বহন করে চলেছে। মানভূমের পূজা-পার্বণ ও উৎসবাবিধির কথা আলোচনা করলে মনে হবে যেম বাংলার কথাই বলা হচ্ছে। সুতরাং মানভূমের ইতিহাস বাংলার ইতিহাসেই এক অধ্যায়।

হাযোমের ও সুবর্ণরেখা বেষ্টিত এবং কংলাবতী বিধৌত মানভূমের অধ্যায় ও পর্যটনস্থল প্রকৃতি। ভূমি রূপ ও কর্ণ। কিন্তু এর অন্তরালে অসংসীল। ক্ষমত মত বাংলার সংস্কৃতি ধারা প্রবাহিত। বাংলার কীর্তন ও বাউল গান মানভূমের গ্রামে গ্রামে। কথ্য ভাষার মধ্যেও বাংলা শব্দের যথেষ্ট প্রাচুর্য। আই মনে হয় মানভূমের প্রাচীন বাংলা পুঁথির পঠোড়ার এবং পুরাজ্ঞত্বের নিবন্ধনাথিৎ অঙ্গলক্ষন ও বিচার বিশ্লেষণ করলে অনেক লুপ্ত বিবরণও হয়ত সন্ধান দিলতে পারে।

গুপ্ত যুগে বাংলাদেশ করেকটি ভূজিতে বিভক্ত ছিল। মানভূম ছিল সেই ভূক্তির মধ্যে বহমান ভূক্তির অন্তর্গত। সমগ্র হাযোমের উপত্যকাকে অন্তর্ভুক্ত করে এই বর্ধমান

ভুক্তি উত্তরে মহাবাকী হতে দক্ষিণে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এবপর পাল বংশের আমলে বাংলায় অশেষ ঐতিহ্য হটে। বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রসার দেখা যায়। কিন্তু পরে বৌদ্ধ ধর্ম তাত্ত্বিকতায় রূপান্তরিত হয়। বাংলার সমাজজীবনে নিপর্ধ্য বনিয়ে উঠে। নানাঞ্জে জ্ঞানন হয়ে। চূর্নান্তি ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে সেন বংশের আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান। মানভূমের ইতিহাসেও আমরা ঠিক এই ঘটনাই ঘটতে দেখি। বাংলাদেশের মত মানভূমেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের আড়ালে আত্মগোপন করে। ফলে বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তি ও মন্দিরাবি হিন্দব দেব-দেবীর মূর্তি ও মন্দিরাবিধিতে রূপান্তরিত হয়।

পাল বংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশ বংগপ্রী, বল, পুণ্ড্র, রাঢ় প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। জৈন শাস্ত্র আচাৰ্য্যাল সংজ্ঞেও আমরা রাঢ় দেশের উল্লেখ পাই। এই রাঢ় দেশের বজ্রভূমিতে ধর্মপ্রচারার্থে স্বয়ং মহাবীর ও অজ্ঞাত তীর্থযাত্রীরা এসে বিশেষভাবে লাহিত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকগণের মতে সে যুগে মানভূম এই বজ্রভূমির অন্তর্গত ছিল। অধুনাকালের ভূমিগণ ঐ বজ্রভূমিরই অধিবাসীদের বংশধর।

পাঠান যুগে অর্থাৎ ১১৮৮ খৃষ্টাব্দে বক্তিত্বাবে মিসলীর বল আক্রমণের সময়ও রাট, বাগড়ী, বল, মিথিলা প্রভৃতি বাংলায় জনপদ সমূহের উল্লেখ দেখি।

আকবরের রাজত্বকালে বাংলাদেশ পুণিয়া, মহারূপ প্রভৃতি ১২টি সবকার বা মুখায় বিভক্ত ছিল। এই মহারূপ সহকারের অন্তর্ভুক্ত মহালগুলির নান ছিল বঙ্গভূম, শিঙ্গু, শিখরভূম প্রভৃতি। সাঁওতালীতে পঞ্চকোটের

অন্ততঃ মান শিখরত্বন। বাংলার পানিহাটি, বাগড়ী, নগলবাট প্রভৃতি মহালয় সঙ্গে একতল অঙ্গাঙ্গিতাবে ভুক্ত ছিল। আইন-ই-আকবরীতে এ বিহরের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।

পঞ্চোকাট চূর্ণের কাল নির্ণয় হুত্রে মানভূম ডিউট্ট গেমেরিয়াবে জানা যায় যে উক্ত চূর্ণের দৃষ্টি তোষণ “হুয়াব বাব” ও “খড়িবাড়ী” শিলা দিগিতে বাংলা হরফে ঐশ্বর্য হামীর ও ১০৪৭ সনৎ অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের উল্লেখ আছে। বীর হামীর অর্ধে বিজুপুর রাজ বীর হামীরকেই যে উদ্দেশ্য করা হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ইউন আনলেও মানভূম বাংলায়ই অংশ ছিল। গ্র্যান্ডের হিপোট বৃষ্টে জানা যায় যে পাচটে বাংলার পশ্চিম প্রান্তের অংশ ছিল। এই অংশ হুব বিহারের চুটিয়া নাগপুর (হাঁচী বেলা) ও বানগড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

১৮০৪ সালের ১৮নং বেঙলেশন অস্থায়ী মঙ্গল মহল বেলা গঠিত হয় এবং মানভূমকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮০৩ সালের ১০নং বেঙলেশন অস্থায়ী উক্ত মঙ্গল মহল বেলে সাউব ওয়াটে ক্রটিয়ার এবেলী গঠন করা হয়। ঐ বেঙলেশন অস্থায়ীই মানভূম তখন একটি স্বতন্ত্র বেলা রূপে পরিচিত হয় এবং মানবাঙ্গারে বেলায় প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়। এই নূতন মানভূম বেলা বাঁহুড়া বেলায় হুপুর, রাইপুর, অধিকানগর, শিমলাপাল, বেলডিবা, মূলহুগনা, ভামহুগর প্রভৃতি; নেহনীপুর বেলায় বলুদ পরগণা; বর্ধমান বেলায় শেরগড় পরগণা, এবং বর্ধমান মানভূমের এলাকা লইয়া গঠিত হয়। তাৎপর্য ১৮০৬ সালে মানভূম বেলায় প্রধান কার্যালয় মানবাঙ্গার হতে পুন্ডলিয়ায় স্থানান্তরিত হয়।

১৮৪৬ সালে বলুদ পরগণা মানভূম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিষেদুন বেলায় সঙ্গে যুক্ত হয়। ঐ সালে চৌধানী, চেলিয়াশ, মালিচন্দ, বনগড়ী, বড়পাড়া, পাড়া, বনচাণ প্রভৃতি মানভূমের অঙ্গলগুলির শালনকার্যের সুবিধার লক্ষে কৌমারী বিচার ব্যবস্থা বাঁহুড়ায় অধীন করা হয়। তা’ ছাড়াও মানভূমের ছাতনা, সৌরাতি, চাষ ও পাচটেব শালন সক্রান্ত অনেক বিষয় বাঁহুড়ায় অধীন ছিল।

১৮৪৪ সালের ২০নং বেঙলেশন অস্থায়ী ছোটনাগপুর বিভাগের দৃষ্টি হয় এবং এই অঙ্গল বাংলার লেকটনেট গভর্নরের অধীনে থাকে। এই বেঙলেশন অস্থায়ী ক্রটিয়ার এবেলী বেলে যায় এবং মানভূম ছোটনাগপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭১ সালে মানভূমের কৌমারী আদালত পুন্ডলিয়া স্থানান্তরিত হয়। ঐ সালে শেরগড় ও পাঁড়য়া পরগণায় কিয়ৎংশ বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৭২ সালে হুপুর, রাইপুর, অধিকানগর প্রভৃতি বাঁহুড়ার অঙ্গলগুলি মানভূম হতে পুনরায় বাঁহুড়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু ১৯১০ সাল পর্যন্ত মানভূমের বেওয়ানী বিচার ও আদালত সন্দর্কে বাঁহুড়ার দায়িত্ব ও বেলা মন্ত্রের অধীন ছিল। ১৯১০ সালে মানভূম, সিংছুম ও মলপুর নিয়ে একটি স্বতন্ত্র বেলা মন্ত্রের আদালত পুন্ডলিয়ায় স্থাপিত হয়।

১৯০৪ সালে বহুভঙ্গ আন্দোলনের ফলে বাংলা বেশকিছু ভাগে ভাগ করবার কার্যক্রম পবিকল্পনা বাতিল হয়। কিন্তু তার পেরে খরপ ১৯১১ সালে বিদেশী শালনকার্যের সুবিধাঅস্থায়ী এবং বিশেষভাবে প্রতিশোধ স্বরূপ পুরাতন বাংলাদেশকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। ফলে আসাম, বাংলা, বিহার, ছোটনাগপুর উদ্ভিধ্য এই তিনটি প্রদেশ গঠিত হয়। নামের সংক্ষেপে মানসে খেখোক্ত প্রদেশটিকে বিহার ও উদ্ভিধ্য বলা হত। পুরাতন বাংলা বেশকিছুকো টুকরো টুকরো করে এই নূতন প্রদেশগুলির গঠন করার ফলে মানভূম, বলুদ, চুকা, ভামতাড়া, কিষাণপল প্রভৃতি বাংলাভাবী অঙ্গলগুলি বিহার ও উদ্ভিধ্য প্রদেশে এবং কাছাড়, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি বাংলাভাবী অঙ্গল নূতন আসাম প্রদেশে যুক্ত হয়। বাংলাভাবী অঙ্গলগুলিকে অঙ্গাঙ্গিতাবে বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করার বাংলা দেশে ও বিচ্ছিন্ন অঙ্গলগুলিতে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। ফলে ১৯১২ সালে হিল্লীর তৎবানীতন সম্রাট পঞ্চম অর্ধ অস্থায়ী ভবিষ্যতে বাংলাভাবী অঙ্গলগুলি বাংলায় কিরিয়ে হেবেন বলে আশাস হেন। মানভূমের জনসাধারণও সেই সময় ইংরাজ রাজত্বের আমলে এবিষয় নিয়ে বহু আন্দোলন করেছিলেন। স্বাভাবিক সংগ্রামের পরফারও তাবাতিভিক নীতি অস্থায়ী প্রদেশ বটনের প্রতিশ্রুতি হেন। কিন্তু

যেশের নামাবিধ গোপযোগ ও সমগ্রার চাপে কংগ্রেস তাঁর
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে যেহি করেছিলেন। ফলে সশ
আন্দোলন বেধা দেয়। কংগ্রেস পরকার তখন তাঁর
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন।

লোকসংখ্যা ও আয়তনের বিবর্তন :—

১৯০১ সালে মানকুম	আয়তন	লোকসংখ্যা
যখন বাংলায় ছিল (খানবাহ সহ)	৪১১২ বর্গমাইল	১০০১২৬৪
১৯১১ সালে মানকুম বিহারের অন্তর্ভুক্ত হলে (খানবাহ সহ)	৪১১২ বর্গমাইল	১৪৪৭৬৭৬

১৯১১ সালে মানকুম

(খানবাহ সহ)

৪১১২ বর্গমাইল ২২৭২২৪২

১৯৪৫ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের

মুপারিশ (খানবাহ ও চাব, তারমণ্য

চন্দনকিয়ারী বানা বাহ ৩০০১ বর্গমাইল ১০৭২৪৭৬

১লা নভেম্বর ১৯৪৬ সাল, মানকুম

যখন বাংলার সঙ্গে আবার যুক্ত হল।

ভারত গভর্ণমেন্ট কর্তৃক দিহাত ও

আইন পাশ। (খানবাহ, চাব, চন্দনকিয়ারী, চাঙিল,

ইচাপড়, পাটমণা বানা বাহ) ২৪০৭ বর্গমাইল ১১৬৭৬৬৭



আর্থিক প্রসঙ্গ

শ্রীমন্তর প্রসাদ ভট্টাচার্য

৥ বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্কট ॥

গত বৎসর থেকে ভারতে বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্কট বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছে। এ বছর গত জুন মাসের শেষ সপ্তাহে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ২১৭.৭০ কোটি টাকাতে নেমে এসেছে। এ ছাড়া ভারতের ১১৭.৭৬ কোটি টাকার স্বর্ণ ও স্বর্ণ-পিণ্ড আছে। এই নিয়ে ভারতের মোট বৈদেশিক ভাণ্ডার ৩৩৫.৬৬ কোটি টাকাতে আছে। এই ভাণ্ডারকে কোন দেশের পক্ষেই নিঃশেষ করা উচিত নয়। ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাংকও সতর্কতাসূচক ব্যবস্থা হিসাবে স্থির করেছেন যে স্বর্ণ ভাণ্ডারে হাত দেওয়া হবেনা এবং বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে অত্যন্তপক্ষে ২০০ কোটি টাকা রাখা হবে। এই নীতি বেনে চলতে গেলে সাধারণের অবজ্ঞাই লক্ষিত হবার কারণ রয়েছে। কারণ তা হলে ব্যয় করার মত মাত্র ১৮ কোটি টাকাও পাওয়া যাবে না। অথচ গত কয়েক মাসে গড়ে আমদানের ২৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা পেয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য বিশেষে এখন ৮০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ শিল্পব্যবসার অর্ডার দেওয়া আছে। আগামী নয় মাসেই ভারতকে তার বৈদেশিক প্রতিক্রিয়া রক্ষা করার মত ২৫০ কোটি থেকে ২৮০ কোটি টাকা সংগ্রহ করতে হবে। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের টাকা নিলে এর পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকা হাঁড়াবে।

দু'বছরের কিছু আগে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হবার পর থেকে ভারত এ পর্যন্ত বিশেষ থেকে ৮০২ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছে কিংবা পাবার সুমুখিত প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। তার মধ্যে আমদানিকার মুদ্রাটাই থেকে পাওয়া দিয়েছে ৩০৪ কোটি টাকা, বিন ব্যাংক থেকে ১০১ কোটি টাকা, রাশিয়া থেকে ১২০ কোটি

টাকা, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার থেকে ২৫ কোটি টাকা, কানাডা থেকে ৩১ কোটি টাকা, এবং বাকি ১০৬ কোটি টাকা অগ্রান্ত হোল থেকে। দেখা যায় ভারত এ পর্যন্ত বিশেষ থেকে খুব কম টাকা সাহায্য সংগ্রহ করেনি। বর্তমানের সঙ্কট দূর করার মত বিশেষ থেকে আরও স্বত টাকা পাওয়া সম্ভব তা চিন্তার বিষয়। কেবলমাত্র বর্তমান সঙ্কটই নয়, আগামী কয়েক বছর পর্যন্ত ভারতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন অব্যাহত থাকবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পরেও সরকারকে বর্তমানের আবহ কাল সম্পূর্ণ করার মত তৃতীয় পরিকল্পনার হাত দিতে হবে এবং তাতে পরিকল্পনার পরিমাণের উপর নির্ভর করে ১৫০০ কোটি টাকা থেকে ২০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ভারতকে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের মত সুচিন্তিত পদা অবলম্বন করতে হবে।

বর্তমান সঙ্কট কি করে কাটান যায়? মোটামুটি চারটি উপায় আছে :—(১) উন্নয়ন পরিকল্পনা কেটে বাধ দেওয়া (২) আমদানীর পরিমাণ হ্রাস করা (৩) রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং (৪) বিশেষ থেকে আরও সাহায্য সংগ্রহ করা। উন্নয়ন পরিকল্পনা কেটে বাধ দেওয়ার ঐশ্বর্য পরিকল্পনা কমিশন ও সরকার চিন্তা করে দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে কতকগুলি পরিকল্পনার কাজ এতটা এগিয়ে গিয়েছে যে এখন তা বন্ধ করার অর্থ বহু অর্থ ও শ্রমের অপচয়। এ বাধে আর পরিকল্পনার কেবলমাত্র মূল অংশটিকে কার্যকরী করা হবে বলে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই মূল অংশটির লক্ষ্যই মূল্যপক্ষে ৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা প্রকার।

আমদানীর পরিমাণ কমিয়ে খুব সহজেই বৈদেশিক

মুজার প্রয়োজন কমান যায়। গত দু'বছর থেকে সরকার আমদানীর পরিমাণ ক্রমাগত কমাতে চেষ্টা করছেন।

এই আমদানী কমানোরও একটি সীমা আছে যার থেকে আরও কমানোর চেষ্টা করার অর্থ নিত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে নিজেদের বঞ্চিত করা ও মুদ্রাস্ফীতি ঘটানো সাহায্য করা। সুনির্মাণ শিল্পের আমদানী করতেই হবে—তাকে বাধ দেওয়া চলবে না। ভোগ্যবস্তুর আমদানীও আর কমানো সম্ভব নয়। শিল্পের কাঁচা মালও বিদেশ থেকে বড়টা আমদানী না করে পাড়া যায় তার চেষ্টা চলছে। আগে যেখানে পাকিস্তান থেকে ভারতীয় কারখানার দ্রব্য ১৮ কোটি টাকার কাঁচা পাট কেনা হত, সেখানে গত বছর মাত্র ৬ কোটি টাকার কাঁচা পাট কেনা হয়েছে। ভারতের আমদানীর আর একটি বিশেষ অমুবিধা আছে। তা হচ্ছে এই যে দেশে ঋণ উৎপাদনের কোন নিশ্চয়তা না থাকায় মাঝে মাঝে প্রচুর পরিমাণে ঋণ আমদানীর দ্রব্য বহু বৈদেশিক মুজার প্রয়োজন হয়। ১৯৫১-৫২ সালে ঋণ আমদানীর দ্রব্য ব্যয় হয়েছিল ২২৮ কোটি টাকা, ১৯৫২-৫৬ সালে দেশে ঋণ উৎপাদন ভাল হওয়ায় ব্যয় হয়েছিল মাত্র ২৯ কোটি টাকা। আবার ১৯৫৭-৫৮ সালে দেশে ঋণের উৎপাদন ব্যাপক হওয়ায় বিদেশ থেকে ঋণ আমদানীর দ্রব্য ব্যয় হয়েছে ১৫২ কোটি টাকা। দেশে ঋণের উৎপাদন বাড়ানো পাইলে, বৈদেশিক সেনা দেশে ভাল গতির আশা করা যায়। কাজেই দেশে ঋণের উৎপাদন বাড়ানোর দ্রব্য সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করা সরকার।

অতিরিক্ত আমদানীর মূল্য যোগাবার দ্রব্য সব থেকে ভাল উপায় হল রপ্তানীর পরিমাণ বাড়ান। কিন্তু আমদানের বেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা এত বেড়ে চলেছে যে তা মিটিয়ে যা উত্তম হয় তা থেকে খুব বেশী বৈদেশিক মুদ্রা আশা করা যায় না। কিংবা আমদানের দিক থেকে তা মোটেই লাভজনক হয় না। বেশের জনসাধারণকে কম ভোগ করবার পরামর্শ দিয়ে বিশেষ লাভ নেই। এমনতেই বিভিন্ন করের চাপে তাদের ক্রয়শক্তি অনেক কমে গিয়েছে, তা সত্ত্বেও তারা বা ভোগ করে তা একান্ত আবশ্যকীয়। এর থেকে কম ভোগ করতে বলা চলে না। রপ্তানী

বাড়ানো হলে উৎপাদন বাড়ানো হবে, বিশেষ করে সেইসব দ্রব্যের যাদের বিদেশে চাহিদা আছে।

ভারতের অসুখের বৈদেশিক সাহায্যের কথা। বৈদেশিক সাহায্যে ভারত এপর্যন্ত প্রচুর পেয়েছে। তা সত্ত্বেও বিদেশ থেকে আরও সাহায্য পাওয়া সম্ভব। আমেরিকা ভারতকে ঋণ দেবার কথা চিন্তা করছে। শ্রীলঙ্কা আবার নিউ ইয়র্ক সহরে ভারতের বৈদেশিক ঋণদাতারা ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্কট সমাধান কিস্তিতে করা যায় তা স্থির করবার দ্রব্য একত্রিত হচ্ছেন। ভারতের অর্থনীতি যে স্ফূট তিতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে যে তার সমস্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর, তাই বৈদেশিকদের ভারতে অর্থ নিয়োগ করতে উৎসাহিত করে। ভারত যদি স্থিতিস্থাপকভাবে তার অর্থনীতি চালিয়ে যায় এবং বিদেশ থেকে পাওয়া টাকা উপযুক্তভাবে উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করে তা'হলে তার সঙ্কট কাটাবার মত অর্থ এখনও বিদেশ থেকে পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

৥ ম্যাক্রিক ব্যবস্থা ॥

গত ১লা জুলাই থেকে পাট শিল্পে মেক্রিক ব্যবস্থার ওজন ও মাপের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। আগামী ১লা অক্টোবর থেকে জম্মু কাশ্মীর রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল ক'টি ছাড়া ভারতের সর্বত্র অক্টোবর মাস ১৯৬০ পর্যন্ত থেকে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। বর্তমান ওজন ও মাপের মানবস্তুকে আরও দু'বছর পর্যন্ত, অর্থাৎ পাটশিল্পে ১লা জুলাই ১৯৬০ পর্যন্ত ও অক্টোবর শিল্পে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬০ পর্যন্ত চলতে দেওয়া হবে। কাজেই ১৯৬০ সালের মধ্যেই সমস্ত দেশে এই ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ১লা অক্টোবর থেকে সমস্ত এলাকা এই ব্যবস্থার বাইরে থাকবে সেখানে তাকে প্রবর্তিত করা। মেক্রিক ব্যবস্থা চালু করার দ্রব্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার সহৃদয় প্রায় ৭৯ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

১৯৫৬ সালের ওজন ও মাপের মান-আইনে বৈধ্য, ক্ষেত্রবল, আরতন এবং পরিমাণ মাপার প্রচলিত মানের ভাষায় নতুন মানের প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। এই আইন অনুসারে বর্তমানের বৈধ্য পরিমাপের মান গণের

আয়তন মিটার প্রায় ১০০ হইবে। এক মিটার ১০০ পদের সমান। দুই পদ পরিমাপের একক মান হইবে কিলোমিটার (১০০০)। এক কিলোমিটার ১০০০ মাইলের সমান। জমির ক্ষেত্রফল পরিমাপের একক মান হইবে হেক্টর (১০,০০০ বর্গ মিটার) ২৪৭ একরের সমান। পাউণ্ড ও সেরের পরিমাপে কিলোগ্রামের সাহায্যে গণনা দেওয়া হইবে। এক কিলোগ্রাম ২২ পাউন্ডের এবং ১৭ লেবের সমান। যে সকল স্থানে মনের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়, সেখানে কুইন্টাল (১০০ কিলোগ্রাম ব্যবহার করা হইবে। পুঁজু অথবা জিনিষ পরিমাপের ক্ষেত্রে গ্রাম (১১০০০ কিলোগ্রাম) ব্যবহার করা হইবে—এক গ্রাম ১১০০০ তোলা সমান। স্থানীয় পাথর প্রভৃতি কাবারিটের সাহায্যে পরিমাপ করা হইবে। এক কাবারিট (১৫ গ্রাম) ১১১৭ তোলা সমান।

ভারত সরকার গণনা ও মাপের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে যোগদান করেছেন এবং এই ব্যবস্থার সহায়তায় একটি কিলোগ্রাম ও একটি মিটার কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কিলোগ্রাম ও মিটার জাতীয় পরিমাপের মানবৃত্ত হিসাবে জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান কার্যালয়ে সংরক্ষিত হইবে। রাজ্য সরকার ও পটীক্ষকের ব্যবহারের ক্ষেত্রে গণনা ও পরিমাপের একক কলকাতা ও বোম্বাই মিটে প্রযুক্ত করা হয়েছে। দেশের অন্যান্যদের চাহিদা মেটাবার ক্ষেত্রে প্রযুক্তকারকের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। নুনোনিও প্রযুক্তকারকের রাজ্য সরকারসহ লাইসেন্স প্রদান করবেন। এনব ব্যবস্থা গ্রহণ করবার পথেও আরও অনেক কিছু করবার আছে। বর্তমান ব্যবস্থা থেকে মেট্রিক ব্যবস্থায় চলে যাওয়া এক মিলিয়ন ব্যাপার যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে দেশের মধ্যে সমাধি-বিপর্যয় কার্যকলাপ দেখা দেবে। এই পরিবর্তন সম্পর্কে জনসাধারণকে পরিচিত করবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে এবং বহুল পরিমাণে পোষ্টার ও স্ট্রাস্টারের বিভিন্ন ভাষায় সহজ হিসাব বিবরণের ব্যবস্থাও প্রস্তুত করা হইবে। নতুন ব্যবস্থার পুরোপুরিভাবে অভ্যস্ত জনসাধারণকে কিছু কষ্ট স্বীকার করতে হইবে। অনেক দিনের একটি ব্যবস্থাকে একদিনেই মন থেকে মুছে ফেলা

সম্ভব না। এখন থেকে চৌদ্দ চল্লিশ নতুন ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে চালু হইতে ৫ থেকে ১০ বছর সময় লাগবে। দেশে প্রশাসনিক মুদ্রার লেন-দেন অনেকটা স্বাভাবিক হইবে। এখন প্রশাসনিক গণনা ও প্রশাসনিক মাপের প্রচলন হইলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এবং দেশের বাইরে ব্যবসায়ের বিলাস নিষ্কাশন অনেক সহজ হইবে।

৥ বোনাস ও প্রশাসনিক-মাসিক সম্পর্ক ॥

প্রশাসনিক-মাসিক সম্পর্ক শাসিতপূর্ণ থাকার শিল্পের অধিকতর উৎপাদনের পক্ষে অপরিহার্য। এ বিষয়ে সরকারী শিল্প-সমূহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের আদর্শ হওয়া উচিত। সমস্ত হিন্দুস্তান এয়ার ক্রাফট লিমিটেড ও হিন্দুস্তান মেশিন টুলস এই সরকারী প্রতিষ্ঠান দুটি এমিক দিয়ে দুটি নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। হিন্দুস্তান এয়ার ক্রাফট তার কর্মচারীদের বাৎসরিক উপাধানের উপর বোনাস দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেছে আর হিন্দুস্তান মেশিন টুলস তার পরিচালনের ক্ষেত্রে কর্মচারীদের নিয়ে একটি নতুন পরিচালনের পদ্ধতি করেছে।

প্রতি বছর হিন্দুস্তান এয়ার ক্রাফট বর্ষব্যয় ও লক্ষ-আউট করার পর কর্মচারীদের অনেকগুলি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, যেমন দুর্গু ভাতা, বৃত্তি, বাসস্থানের ভাড়া ভাণ্ডার, রাজস্বের কাল করবার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভাতা ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমান বোনাসের ব্যবস্থা আরও উন্নতযোগ্য। এই নব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিচালকবর্গকে বছরে ২০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে। ১২,০০০ কর্মচারীর মধ্যে ১০,০০০ কর্মচারী বোনাসের সুবিধা পাবে। যাদের মাসিক মাইনে ৫০০ টাকার মধ্যে তারা সকলেই বোনাস পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে বোনাসের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা হইবে। উৎপাদন যদি মূল্যপক্ষে ৭০ পয়েন্ট হয় তবেই বোনাস দেওয়া হইবে। ৭০ থেকে ৭২ পয়েন্ট উৎপাদন হলে ৮০ টাকা বোনাস দেওয়া হইবে। ৮০ থেকে ৮২ পয়েন্ট উৎপাদন হলে বোনাস ৮০ টাকা হইবে। ৮২ থেকে ৮৪ পয়েন্ট উৎপাদন হলে বোনাস ৮৫ টাকা হইবে। ৮৫ থেকে ৮৭ পয়েন্ট উৎপাদন হলে বোনাস ৯০ টাকা হইবে। ৮৭ থেকে ৮৯ পয়েন্ট উৎপাদন হলে বোনাস ৯৫ টাকা হইবে। ৮৯ থেকে ৯১ পয়েন্ট উৎপাদন হলে বোনাস ১০০ টাকা হইবে। ১০০ পয়েন্টের উপরে উৎপাদন হলে বোনাস দেওয়া হইবে ১০৫

টাকা। এ পর্যন্ত উৎপাদন ৬০ থেকে ৮০ পরের মধ্য বিন্দুতে মেশিন টুলস্‌ অমিক-মালিক সম্পর্ক প্রতিপূর্ণ উঠানো করেছে। ১৯৫৭ সালে উৎপাদন হয়েছে মাত্র ৭৫ পরের মধ্য।

উৎপাদনের উপর বোনাস দেওয়ার যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। তাতে উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্য কর্মচারীদের একটা চেষ্টা থাকে। তবে এর আবার খরচও আছে। যদি কখনও উৎপাদন কমানোর প্রয়োজন হয় তখন কর্মচারীরা তা সহজে যেন নেবে কিনা। তবে বিন্দুমান এয়ারক্রাফটকে যে অদৃশ্যবিশ্বাসে যে সমস্তার শুল্কবীন হতে হবে না তা সন্দেহই বলা চলে।

বিন্দুমান মেশিন টুলস্‌ অমিক-মালিক সম্পর্ক প্রতিপূর্ণ করার মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। বর্তমানে প্রমিকদের পরিচালনা ব্যবস্থার মধ্যে নেওয়াতে সেই সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে বলে আশা করা যায়। প্রমিক প্রতিদ্বন্দ্বি মধ্যে যদি অর্থনীতি ও কাঁচিপদী জ্ঞান থাকে তা'হলে এই ব্যবস্থা থেকে ভাল ফল অবশ্যই আশা করা যায়। আবার সেবকম প্রতিদ্বন্দ্বি পরিবর্তে যদি শিল্পের সমস্তা সম্পর্কে অজ্ঞ ও দুঃস্থি হীন এবং রাজনীতি প্রভাবান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বি এই পরিচালক পরিষদে আসেন, তা'হলে বিশেষ গুণ ফল আশা করা যায় না।

অম সংশোধন

- ১। গত সংখ্যার (আবার) "পিতৃ" নামক গল্পটির লেখকের নাম ভুলবশতঃ স্ত্রী মজুমদার ছাপা হয়েছে। লেখকের নাম স্ত্রী মজুমদার হবে।
- ২। বৈচিত্র্য সংখ্যার প্রকাশিত "একটি ভীত প্রার্থনা" শিরীষ কবিতাটির লেখকের নাম শঙ্কুনাথ চট্টোপাধ্যায় হবে।

জীবনের ক্রমবিকাশ

ঐবিমল দে

(পূর্বাশ্রয়)

ক্রমভাবাদীদের মত ভ্রম মনে করেন না যে প্রাপ্ত বয়সের মানসিক স্বন্দেহ মূলে বহিরাছে কেবলমাত্র জীবনের পূর্ণ অবস্থার কামনার অবস্থান। তাঁহার মতে অবস্থান কতকগুলি কারণের একটি হইতে পারে মাত্র। অবস্থান বাহ্যে আরও অনেক কারণ বহিরাছে মানসিক স্বন্দেহ। তাঁহার মতে একবার যদি একটি অবস্থানিত বাসনা মনের অঙ্গ স্তর হইতে বিজ্ঞোহী হইয়া অহুত্বের আদিয়া মাথা তুলিয়া পীড়ায় তবে উহার মাথের মাথের অন্তঃস্থ অবস্থানিত বসনা-গুলিও সুযোগ বুঝিয়া বিজ্ঞোহী অবস্থানিত বাসনার হাতে হাত নিলাইয়া মনের অহুত্ব স্তরে চলিয়া আসে। এইভাবে উহার উদ্দেশ্যের বিজ্ঞোহের নেতার ক্ষতি বৃদ্ধি করে। ভ্রম বলেন—অনেক সময় আমাদের জীবনের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা, পুরাতন অভিজ্ঞতাগুলিকে নতুন ভাবে চিত্রিত করিয়া দেয়। তিনি বলেন অনেক সময় প্রাপ্ত বয়সের অবস্থানিত যৌন জুগ প্রকৃষ্ট হইয়া মানুষের জীবনের শিশু অবস্থার কতগুলি ঘটনার স্মৃতিতে যৌন রূপ দিয়া থাকে। আরহতে কিন্তু বালা বয়সের সেই সমস্ত ঘটনাগুলিও অজানা এবং নিবিষ্ট বস্তুর প্রতি শিশু মূলত কোতুহল ছাড়া আর কিছুই নহে। যৌন জুগ বাতাবিক পরিভূতির না পাইয়া অনেক সময় পতাজুর্ধ্বনশীল (retrospective) হইয়া বালক বয়সের ইতিপাস গৃঢ়ভাবে যৌনরূপ দেয়। আবার অনেক সময় ইহা বালক কালের পিতার বৃহৎ আকার এবং এবং অগণ্যাকৃত অধিক শক্তির উপর যে বাতাবিক দীর্ঘ ভাব্যকেই যৌনরূপ দিয়া যৌন দীর্ঘ্য পরিণত করে। ক্রমভাবাদীরা অনেক সময় মনোবিকার রোগগ্রস্ত রোগীদের রোগের কারণ খুঁজিতে খুঁজিতে শৈশবকালীন কোনো গৃঢ়বার পিয়া পৌঁছান। আরহতে বয়ত এই গৃঢ়বার রোগীর জীবনের পরিণত বয়সেই গঠিত হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণে ভ্রম ক্রমভাবাদী মনোবিকারের প্রস্ত রোগীদের অবাধ

আবস্থাসংগে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করিতে বাইয়া রোগের কারণের ভ্রম। রোগীদের কেবল মাত্র শিশু বয়সের বিবেক অহুদ্বান করাকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। ভ্রম বলেন—রোগীর বর্তমান খুঁজিতে হইলে তাহার গতজীবন জানা হইবার সন্দেহ নাই কিন্তু রোগীর ভবিষ্যৎ মনের স্মৃতির জন্ত তাহার চিকিৎসা বর্তমান জীবনের পরি প্রেক্ষিতেই করা প্রয়োজন। ভ্রম বলেন প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত নার্ততন্ত্রের সহনশীলতা সমান নহে। তাই মনোবিশ্লেষণের পূর্বে রোগীর শরীর হস্ত সঞ্চদে বিশেষ ভাবে অবাধিত হওয়া প্রয়োজন। শরীর হস্তীয় সহনশীলতার তারতম্যের ভ্রম এবং প্রতিবেশের বিভিন্নতার ভ্রম একই প্রকারের মানস অভিঘাত (mental shock) বিভিন্ন স্নোকেব নার্ততন্ত্রে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া করিবে। তাই মনোবিশ্লেষণ এবং মনোবিকারগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসায় সময় সর্বা। ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিগত চিন্তাধারা এবং অহুত্বের বিভিন্নতা মনে রাখা প্রয়োজন। একটি রোগীকে চিকিৎসা করিতে বাইয়া রোগীর জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর মতই তাহার ব্যক্তিগত শরীর হস্ত সঞ্চদে বোধ লওয়া প্রয়োজন। মন সঞ্চদে ভ্রম অনেকটা কবালী নিসর্গবাদী (naturalist) লামার্কের মত মনে করেন যে জীবের মনের পথবার তাহার পূর্ব পুরুষের অভিজ্ঞতার ছাপ প্রত্যেক জীবের ব্যক্তিগত যায়। তিনি বঙ্গ সঞ্চদে বলেন যে মানুষের যে বস্তুগুলির প্রতীক রূপ দেখে তাহা তাহার পূর্ব পুরুষের অভিজ্ঞতা হইতে প্রাপ্ত। ভ্রম এই প্রতীক-ব নাম দিয়াছেন মূল্যবর্ণ। তাঁহার মতে বঙ্গবর্ণনের মূলে বহিরাছে এই মূল্যবর্ণ। মনো-বিশ্লেষণ বিভাগ ভিত্তর এই সমস্ত মতবিরোধ লইয়া বিভিন্ন হল গড়িয়া উঠিয়াছে ইহাযের হলগত বগড়া বিজ্ঞানের এই মূল্যবান অধ্যায়ের অনেকখানি অহুমান স্পষ্ট

করিয়াছে। অনেক সময় অপরিপক্ক বিজ্ঞানীদের হাতে পড়িয়া এই মূল্যবান বিজ্ঞান ইত্যাদির উপকরণ হইয়া পড়িয়াছে। অনেক ফ্রয়ডবাদী ভাষ্যকে উল্লেখ্য ভীষণ বলিয়া উপহাস করেন। তাহার কারণ—ভাষ্য মৌলিকতার সত্য রূপ দেখিয়া সংস্কার বশতঃ আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই তিনি নিত্যন্ত অবজ্ঞার মত সত্যকে নানাপ্রকার কুসূক্তি এবং সুখোপদেশে অন্তরালে রাখিয়া লোকচক্ষুকে ঝাঁক দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ্যাডলবারের কথা তাহার কারণে যে একজন উচ্চাভিলাষী ইহুদীর কাছ হইতে আত্মদাম্পত্য এবং স্বমতান্ত্রিগণ দ্বারা আর কি সন্নিবেশ আশা করিতে পারি? অপর দিকে ভাষ্য ফ্রয়ডের সত্যকল্পের মধ্যেই মৌলিকতার লক্ষণ দেখাকে, তাহার আতিপত বৈশিষ্ট্য বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। এই সমস্ত কথাগুলি বিভিন্ন চিন্তাশীলের মনোবিশ্লেষণ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে একজন চিন্তাশীলের মনোবিশ্লেষণ তাহার চিন্তাধারার মূল্য কমান্বিত্ত পারে না। ফ্রয়ডের মনোবিশ্লেষণ একবস্ত এবং ফ্রয়ডের চিন্তাধারা এক বস্তু। এই স্থানে আমাদের সম্পর্ক হইতেছে ফ্রয়ডের চিন্তাধারার সহিত। তাহার মানসিক অবস্থার কারণের সহিত আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই। আমরা ফ্রয়ডের চিন্তাধারাকে বিজ্ঞানের ছকে কেলাইয়া বহি দেখি যে ইহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বর্তমান তবে আমরা ইহাকে গ্রহণ করিব। ফ্রয়ডের এই প্রকারের চিন্তাধারার মূলে যে সত্যই থাকুক না কেন তাহাতে তাহার চিন্তাধারার মূল্য একটুও কমান্বিত্ত পারে না। কি প্রকারের প্রতিবেশে কি প্রকারের পরীক্ষিত লইয়া সম্মুখি হইলে এবং কি প্রকারের শিক্ষা এবং জীবন প্রণালীর মধ্যে মন গঠিত হইয়া উঠিলে ফ্রয়ডের মত মানসিক গঠন এবং স্বভাব লইয়া একটি লোক সম্মুখি হইতে পারে, ফ্রয়ডের মন এবং জীবন বিশ্লেষণ করিলে তাহার হয়ত কোনো বস্তু একটা হৃদয় মিলিতে পারে। কিন্তু তাহা আমাদের বিপর্যয় বস্তু নহে। বহিষ্ঠ বর্তমানে ফ্রয়ড, এ্যাডলবার, ভাষ্য, এবং অন্যান্য মনোবিজ্ঞানের ভিত্তর মস্তভেদ দেখা যায়, কিন্তু আমরা আশা করিতে পারি যে বিজ্ঞানের উন্নতির সাধে এই মতভেদ দূর হইয়া বিজ্ঞানের এই নব অধ্যায়ের সৌখ

পূর্ণাঙ্গ ভাবে বিবরণ করিবে। বর্তমানে ফ্রয়ড, এ্যাডলবার, এবং ভাষ্য হয়ত একই সত্যের বিভিন্ন অংশ লইয়া গবেষণা করিতেছেন। একদিন হয়ত বেধিবে এই বিভিন্ন অংশ যোগযুক্ত হইয়া একই সত্যের বিভিন্ন অংশে স্থান পাইয়াছে। সে দিন আর এই মতবিবোধ থাকিবে না। সর্বশেষে একটি কথা না বলিলে হয়ত অন্তরায় হইবে যে আমরা ফ্রয়ডের চিন্তাধারার মতই সমালোচনা করি না কেন তবুও একথা বলিতে হইবে—মানব জাতির চিন্তাধারার ইতিহাসে ফ্রয়ডের স্থান ডারিউইনের পাশেই দিতে আমরা বাধ্য। ফ্রয়ডের মনোবিশ্লেষণ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে যে এক বিশাল আনিয়াছে সে বিষয় কোনেই সন্দেহ নাই। আমাদের মনোজগতের এক বিশাল অনাবিস্কৃত অংশ তিনি মানুষের জ্ঞানের নীয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই নব আবিষ্কৃত অংশ এবং ইহার বৃত্তনাম রূপ, মানব মস্তিষ্ক, জীব অভি-ব্যক্তির একটি বিষয়কর নিরূপণ। প্রতিবেশের প্রতিটি ক্রিয়ার সহিত প্রতিবেশনশীল এই মন, ইহার অবলম্বন, ইহার অনবধ্য প্রতিবর্তক্রিয়া ইহার বিভিন্ন সূচকতার কথা যখন মনে হয় তখন বিষয়ে অবাক না হইয়া উপায় থাকে না।

অর্থ—বাহ্যকে আমরা পরিচালনা করি:—পূর্ণ অধ্যায়ের অবশিষ্ট সময়ই আমরা অন্তর্গমন এবং জৌলমিক মনোবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে মনকে বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা রূপক ভাবে মনের বিভিন্ন স্তর, সংবিৎ, অগম্য, প্রতিবর্ত ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ, সাপেক্ষ প্রতিবর্ত, প্রতিবর্ত নিরোধ প্রতিরূপ (image) প্রতীক, (Symbol) বস্তু প্রভৃতি লইয়া অতি সূক্ষ্মপে আলোচনা করিয়াছি। ঐক্যপাকনে মানসক্রিয়াগুলিকে আমরা পর পর সাজাইয়া একটির সাধে অপরটির সম্পর্ক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহা সত্ত্বেও আমরা মনে হইতেছে ঠিক আমরাই মত পাঠকগণকেও বিপর্যয় জৌলমিক অস্পষ্টতা এবং তৎপ্রযুক্ত জুল বুদ্ধিবার ভয় সর্বথা মানসিক পীড়া দিতেছে। পাঠকদের মনেও হয়ত ঠিক আমরা মনের প্রস্তর মতই প্রাণ লাগিতেছে—মনোব্যাক্যের এই সহস্র প্রকার সক্রিয়তার মধ্যে ঠিক কোন স্থানে অর্থ (self) আবদ্ধ হইয়া কোন স্থানে শেষ

হইয়াছে? আমরা অহং কি আমার মানসক্রিয়ায় এতটী হুানে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়া আছে অথবা আমার অহং কি মনের ক্ষুদ্র একটি হুানে অবস্থান করিয়া মনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভু করিতেছেন? ঠিক আমার মত এবং প্রত্যেক পাঠকের মত প্রত্যেক বড় বড় মনোবিৎসগ ঠিক এই এক প্রশ্নেরে প্রবেশ পুনরাবৃত্তি হইয়া বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বিভিন্ন প্রকারে মানস ক্রিয়ায় একটি ষাটী ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার পূর্বে আমরা ক্রয়েন্ডের অহং, অঙ্গু এবং অধিশাশ্রা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এই বিষয় বাংলা এক নতুন মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে, সামাজিক পরিবেশে, মানুষের মানস ক্রিয়া, ইহার প্রতিবোধন শক্তি, ইহার ক্ষুদ্রতা এবং দৃষ্টির উপর এক নতুন আলোকপাত করা হইয়াছে। তিনি বলেন আত্মসংবিশ্লষণ মানব জীবনের আবৃত্ত হইয়াছে অহং (ego) সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা এবং এই পুৰিবীতে তাহার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা। সাধারণের ধারণা যে মানব মনের সবটাই হইতেছে অহং (ego)। কিন্তু বর্তমান মনোবিজ্ঞান বলে মানব মনের অনেকটাই সংজ্ঞান অহম এবং আওতার বাহিরে রহিয়াছে। আমরা অনেকই অনুভব করি যে আমাদের মনের একটি অংশ অহংএর আওতার বাহিরে থাকিয়া অহংএর উপর কর্তৃত্ব করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমরা শৈশবকাল হইতেই যেখানিছ অনেক সময় এমন সগ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি হই যাচার উত্তর দিতে বাইরা আমাদের মন মানসিক বশে পড়িয়া যায়। সে যেখিতে পায় তাহার মনের বিভিন্ন অংশ সম্পূর্ণ বিপরিত উত্তর দিতেছে। আমাদের মনের এই বিপরীত মতামত আমাদের অহংয়ের সং এবং অসত্তের ভিতর এক বশে পরিণত হয়। এই বশ যে সে সর্বক্ষেত্রেই আবৃত্ত হয় তাহা নহে অনেক সময় আমরা প্রশ্নের মীমাংসা ইহার পূর্বেই করিয়া ফেলি। আমাদের সং অহং এবং অসং অহংএর ভিতর যে বশ তাহাতে অনেক সময় দেখা যায় আমাদের অসং অহং, সং অহং হইতে অধিক সজ্ঞানালী। মনের ভিতরের বশ এবং প্রতিবেশের সজ্ঞানতা হইতে মানুষের

মনের ভিতর একটি শাসক ঈড়ার। মানুষের সংজ্ঞান অহং এই শাসকের অধীনতা স্বীকার করিয়া লয়। বাংলা বশেন—এই শাসক, অহং এরই একটি অংশ ছাড়া আর কিছুই নহে। মানুষের অহংএর এই বিশেষ অংশ সমস্ত অহংএর উপর প্রভু করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন করে। আমাদের অহংএর বিশেষ এই অংশটুকি? এই প্রশ্নেরই উত্তর বাংলা ভাষার নিম্নের মতে দিয়াছেন। বাংলা অহংএর এই বিশেষ অংশটির নাম দিয়াছেন—পারসোনা (persona)। মনে হয় বাংলায় 'পারসোনা', অনেকাংশে ক্রয়েন্ডের অধিশাশ্রার (super-ego) সমান। তিনি বলেন—'পারসোনা' অহংএর গৃঢ়তা, মানসিক বশের বিপর এবং অসত্তাধের হাত হইতে রক্ষা পাইবার ক্ষমতাসম্পন্ন করে। 'অহং' বলেন—'পারসোনা' পড়িয়া তুলিবার সমিধ আমরা অহংএর বাহিরে অবতেনত মন হইতে সংগ্রহ করি। এই হুানেই বাংলা ক্রয়েন্ড হইতে অনেকখানি দূরে সরিয়া গিয়াছেন। পারসোনা হইতেছে—আমরা সংজ্ঞান ভাবে আমাদের সম্বন্ধে যাচা ধারণা করি অথবা আমাদের আমরা পুৰিবীতে যেভাবে জাহির করিতে চাই। আমাদের এই 'পারসোনা' সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ব সময়েই একই প্রকারে থাকে না। ইহার রূপ স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে পরিণত হয়। ঠিক যেমন নাকি একটি নাটকের অভিনয়; একই অভিনেতা যাবা অভিনীত হইলেও স্থান, কাল এবং প্রোতবর্ণের বিভিন্নতার দ্বিত্ব বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। পারসোনায় সহিত কখনও হয়ত নতুন কিছু যুক্ত হইতেছে আবার কখনও কিছু বাদ পড়িয়া বাইতেছে। আমরা আমাদের মা অথবা বাবার কাছে নিম্নের যে প্রকার জাহির করিতে চাই, আমাদের একটি বস্ত্র অথবা বাছবীর কাছে ঠিক সেইরূপ জাহির করিতে চাই কি? আবার আমাদের পারসোনায় পূর্বোক্ত দুইটি রূপ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ত অনেক বদলাইয়া যায়। স্থান কাল পাত্র তেবে পারসোনায় এই বিভিন্ন রূপ সত্ত্বও মোটামুটি আমরা বলিতে পারি যে পারসোনা হইতেছে আমাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা, যাচা আমরা আমাদের প্রতিবেশের ভিতর প্রকাশ করিতে চাই।

দি ইন্ডোরাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

[১৯৪৩ সালে রেজিষ্টারী কৃত]

হেড অফিস : ২, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	৮,০০,০০,০০০
বিলকৃত ও স্বীকৃত মূলধন	৪,০০,০০,০০০
আদায়কৃত মূলধন	২,০০,০০,০০০
সংরক্ষিত তহবিল	১,৩৪,০০,০০০

শাখা সমূহ

ভারতে :—সকল শিল্প ও বাণিজ্য প্রধান নগর ও সহর

ব্রহ্মদেশে :—যেচুন, মৌসমিন, আকিয়াব, মান্দালয়, বেসিন

বুত্তরাজ্যে :—লণ্ডন

পাকিস্তানে :—চট্ট করাচী

মালয়ে :—সিঙ্গাপুর, পেনাং, কুমালালামপুর

তাইওয়ান :—হংকং

এজেন্ট

পৃথিবীর সমস্ত দেশে—ইউরোপ আমেরিকা, আফ্রিকা এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া।

বাবসাহস ও ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্যাবলী :—

এই ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ, অনুমোদিত জামিনের পরিবর্তে দানন দান, বিল বরিস, ড্রাফ্ট দান ও ভায়ে টাকা প্রেরণের ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করে। আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক শাখা সমূহ এবং পৃথিবীব্যাপী ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ব্যাঙ্ক সর্ববিধ ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের সুযোগ দান করে।

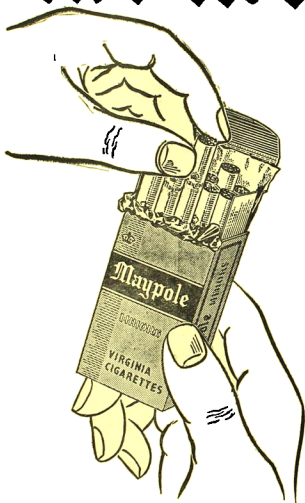
জি, ডি, বিড়লা

চেয়ারম্যান

এস, টি, সদাশিবন

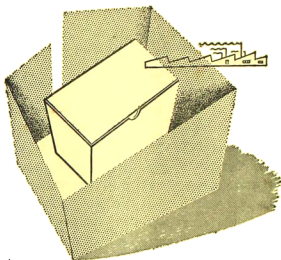
জেনারেল ম্যানেজার

আতি... স্নেহোল



দ্রব চেয়ে ভাল

factory freshness preserved



with

✱ **POLYBOARD**
✱ **POLYKRAFT**

packaging

Acid, alkali and moisture resistant polythene-coated POLYBOARD and POLYKRAFT help to preserve the factory-freshness of your products, whether they be confectionary, tea, biscuits or chemicals.

These new, revolutionary packaging materials are several times stronger than ordinary board or paper and prevent damage to your products even when they are subjected to rough handling. And the eye-appeal of your products is enhanced considerably because of the glossy finish on POLYBOARD and POLYKRAFT.



CHANGE TO
✱ **POLYBOARD** ✱ **POLYKRAFT**
PACKAGING FOR INCREASED SALES

ORIENT PAPER MILLS LTD., CALCUTTA.

ছবি-নাটক-জলসা

রমেন চৌধুরী

চ্যারিতিকে এখন বাঙালার সম্বন্ধকার। সর্ব বিষয়ে বাঙালী চিরদিন নেতৃত্ব করেছে; মাঝে বেশ কিছুদিন বঙ্গোষ হাওয়ায় পদ আবার তুল ফুটেছে। পর পর কতকগুলি বাঙালী ছবি (পর্বে পটাসি, কাবুলিওয়ালা, অপরাধিত প্রকৃতি) বিধে তাৎপর্ষ্য বিহীন সমাজিক মন্তব্য করার এবার এসেছে বালিম থেকে আনন্দ্রণ। সম্মানে চিত্র-প্রদর্শনীতে বিজ্ঞানরূপে নমনীত হয়েছেন অদ্বত-বাঝার পত্রিকার চিত্র-সম্পাদক সর্গদন পতিচিত নির্দলুম্মার ঘোষ (এম, কে, জি)। ঐচ্ছিক ঘোষ নিরিক সাংবাদিক হিসাবে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। কয়েকই তাঁর বিচার যে পক্ষপাতশূন্য হবে এ বিষয়ে আমরা নিঃশঙ্কহ। ইতিপূর্বে মুদ্রাপত্রীর বিচারে জাপানি আদ্যের বাঙালার সুযোগ্য সন্ধান ডক্টর রাঘাবিনোদ পাল অদন রাহেলের পটিকার দ্বিবে বিশ্বাসীকৈ ত্তক করেছিলেন। সে পর্বেও বিষয় কেউই নিশ্চয় বিশ্বত হন নি।

এবার এসেছে ত্রুটিব ক্ষেত্রে মূল্য নিরপণের রাহিষ। কোন্ বেশ কতখানি সার্থকতা অর্জন করেছে তাইই হিসাব নিকাশ হবে। এ হিসাব নিকাশ বহুদিন ধরে ধরে আসছে কিন্তু কোনোদিনই সে সম্ভার ভারতের ডাক পড়েনি। চিত্রসাংবাদিক কাউকে আসে আর ডাক হয় নি। শুধু বিদেশে বলেই নয়, স্বদেশেও তেতা তাঁদের ব্যাপ্য ধোয়ার দাঁতি নেই। হয়তো এবার দেশের লোকের চোখ ফুটেবে। বাইরের লোক বতকণ না ধরেই মাতৃব্যক সম্মানিত করেন ততক্ষণ আমরা থাকি সম্পূর্ণ উদাসীন। বাই হোক আমাদের দেশের চিত্রসাংবাদিকের এই সম্মানে আমরা অতীত ঐতি হয়েছি।...

গতবারে কিছু সম্প্রতিক কাঁচামাল প্রস্তুত সঞ্চদে আলোচনা আমরা করেছিলাম। বর্তমানে সর্বশেষ খবরে জানা গেছে পূর্ব জাতিগীর সংগে আমাদের কথাবর্তী পাঁকা হবার মুখে। এই কাঁচামাল তৈরির কাজে পূর্ব জাতিগীর তাঁদের সর্বাঙ্গক সহযোগিতা করবেন। বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা করা ছাড়াও তাঁরা বিশেষতঃ প্রেরণ এবং আমাদের কর্মীদের হাতে-কলমে শিক্ষা হিতে জাতিগীরে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করবেন। উচিত্তে একত্রে কাজখানা স্থাপিত হবে বলে স্থির হয়েছে। আগামী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম দিকে ভারতের হাটিতে প্রস্তুত কাঁচা শিক্ষার দেখা পাবার প্রত্যাশা আমরা করতে পারি। অন্তর্বর্তীকালীন বিধি-ব্যবস্থা যথাপূর্ব থাকবে। নাশ পড়াঃ।

Quota-র ধোয়ার আবহ ছবি তৈরিব ব্যবস্থা কী মর্দন্তব অবস্থায় এগে পৌঁছেচে। অনেকই স্বরকারের সময় কিছু পাচ্ছেন না। একত্রে তাঁদের কর্তৃপক্ষের দরবারে ছুটোছুটি হাটাহাটির কামাই নেই—অবচ কাকত পদ-বেহনা। মাসের পর মাস এটা নয় সেটা জোগান দিয়ে দিয়ে কালখাম ছুটিমেও তবিকে ভোলাতে পারছে না। এই ভাবে চালালে আগামী এক বছরে বাঙালী ছবিব দেখা আর বিশেষ পাণ্ডা হবে বলে মনে হয় না। তখন বিপ্লি ছবি আগার জািকিরে বদতে ঘেরি করবে না—‘আয়েলাপা’ সংকুতির আবার অরব্যাক্তা স্ত্রু হবে।

বাঙালার প্রোবাজক পরিচালকতুল মানান বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে ক্রমশই এগিয়ে আসছেন। আমরা শুনে খুবই খুশি হয়েছি, পরিচালক পি, এন, চাট্টিজি কমলা কলা মন্দিরের হয়ে ‘কড়ুসংঘ’ তুলতে মনস্থ করেছেন। প্রচেষ্টা তাঁর

বিজ্ঞাট এবং অভিনয়। ছবিতে কলকাতা বোম্বাই-এর প্রখ্যাত শিল্পী সমাবেশ হবে, অশোককুমার, মীনাকুমারী, উত্তমকুমার একত্রে দেখা যেবেন এই প্রথম। এবার উত্তম প্রাণেশ্বর দ্বারী রাখে।

টাকার অভাবে তো মানুষ, আমাদের প্রতিদিনকার ঘোরাকের। গকেট যদি ভাবি থাকে তাহলেই 'হু কুড়ি সাতের' খেলা সার্বক, নইলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শুভবৎ চক্রপঠন কলির ওই জাগ্রত খেবড়াটির উদ্দেশে বলতে হয় 'হার টাকা'। 'সুনি কি আশও বরা যেবে না ? নিউ থিয়েটার' ১২২ ঠুড়িরোর বনবী পরিচালক পশুপতি চাটাজি যে ছবিটির শুভ মহৎ সম্পন্ন করেছেন সেদিন— তার নাম হয়েছে 'হার টাকা !' বাঙালার খেবু-হাসি তাহু বানাজি থাকছেন ছবির পুরোভাগে। কাজেই স্বর্নকৃষের হাসির ব্যবস্থা পাকা হতে বাধ্য।

ঐক্যনিষ্ঠানন্দ মহাপ্রভু আসছেন রূপালি পর্দায়। দেবব্রত রত্ন সুলতা পিকচার্সের হয়ে প্রযুক্তিরত। চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দোষা বাবে অসীম পালকে। কীর্তন কলানিবি রবীন্দ্র শোব নিরেছেন নানব দ্বারিষ। বহু স্বর্ন ব্যারে ছবিটি তোলা হচ্ছে। শ্রুতীববহু বাবু প্রায়দ সাধ্যম্যভিত্ত হোক।

কো-অপারেটর দিচ্ছ সোমাইটির 'প্রাচীর'-এর প্রযুক্তি চন্দ্রহ তৎপরভার সংগে। পরিচালক মনোহ তট্টাচার্য শান্তি দ্বারপুটার এই রচনাটিকে সর্বাংশেস্থব্ব করতে সংগীত পরিচালক কাশোবরূপের সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

নৃত্যের ভালে ভালে সকলেই মন চলে ওঠে। চিত্ররসিকবাও নিচ্ছ আনন্দ-বোহুল মনে প্রতীক্ষার থাকতে প্রস্তুত হয়েছেন। কারণ ? 'নৃত্যের ভালে ভালে' যে ছবিটি শ্রুতীববহু তুলছেন তার নৃত্যব্যবির পরিচালনার তার নিরেছেন 'স্বনক্ স্বনক্ পয়েল বাক'-খ্যাত পোষ্টরক।

সংচিন্তানন্দ সেন মহম্মদার পরিচালক 'ধাত্রী'র সংগীত গ্রহণসার। হয়েছে। প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী মধু শুভার 'কতো গান তো হোলো গাওয়া' গানটি এই ছবিতে শিল্পীকর্তেই শ্রীত হয়েছে। এছাড়া বিজেন মুখার্জি, গীতা মুখার্জি'র কণ্ঠ বরীজনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দ্বিজগোবিন্দর কয়েকখানি গানও শোনা যাবে। কণ্ঠসংগীত পরিচালনা জনপ চাটাজি নিবেদন করছেন নিবন্ধন সেন।

কালামাটি

(সমালোচনা)

তপন সিংহ পরিচালিত টান দ্বিধদের 'কালামাটি' মঞ্চের আশ্রয় ছিলো আমাদের বিশ্লেষণ। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ছবি দেখে পবিত্র হতে পারিনি। 'কাহুলি-ওয়ারা'র যে খ্যাতি তপনবাবু অধিকার করেছেন, 'পৌহ-কপাট' দুষ্ট হয়ে তাকে আমরা গননস্পর্শী হেথতে চেয়েছিলাম স্বতাই। কিন্তু তা হতে পারিনি। এটা ঠিক ছবির ইতস্তত তাঁর কেরামতির আলোর ফলকানি চোখে এসে লেগেছে, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি—এর চেয়ে অনেক বেশি ছিলো আমাদের আশা। কারণ—টনি কাহুলি-ওয়ারার তপন সিংহ বলেই।

গানের দিকে রবিশংকর আমাদের নিরাশ করেছেন। তাঁর কাছে আমাদের চাওয়া-মাত্রা পাওয়ার চেয়ে বেশি থেকে গেছে। এ ছাড়া ক্যামেরার কাজ উল্লেখযোগ্য। অভিনয় বেশ ভালো। ইয়া, শকদেরই।

কালামাটি গতাহুগতিক পরিবেশের ছবি নয়—এ আকর্ষণ আবেশের দিনে অনেকখানি একঘেরে 'গ্রেম-বিবর' খোড়-বড়ি-খড়। ছবির পাতন গিলে সকলের যখন অচঞ্চল হয়ে যেতে বসেছে সেই তিত্ত মুহূর্তে শব্দ থেকে বহু বুঝে কালো হীরের খনির দূক যে মানুষগুলো জীবন বিপন্ন করে দিনের পর দিন কাহ করে আমাদের—শব্দের বাবুভার্যদের বাঁচিয়ে রেখেছে—তারের কথা কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীতে নতুন করে তুলে ধরেছেন। আর সেই বৈচিত্র্যের মধু আহরণ করতে স্বর্নকর্মজিকার সমাবেশ হচ্ছে। এ সমাবেশ দীর্ঘস্থায়ী হলেই আমরা সন্তুষ্ট হবো।

টার থিয়েটারে শব্দ রচনা বাবলস্বর্নীয় লব্ধকমটি আসর বসেছে আদিকাল। বালা-সংসদ ঐক্যস্তেরই মনোব্রত করছেন। সে, এখন তার প্রস্তাব সাংঘ্য অপরিণত। সবাইকেই বাবলস্বর্নী রূপকটাক্ষতে অশুপ্রাণিত করছে। মার্চাকার যেনারাত্রণ শুণ অশাধ্যসাধন করেছেন—তাকে শব্দায়তা করেছেন আশাতীত ভাবে পরিচালক শিশির মল্লিক। প্রবোধক সলিল মিত্র এঁদের মিলিত প্রচেষ্টা সার্বক করতে যথাসাধ্য প্রয়াস পেয়েছেন। যে কাহিনী এতাবৎ পুঁথির পাতার আবহ ছিলো তাকে সার্বক

নাট্যকাৰে পৰিবেশন সম্ভব—এটা এ'টাই সম্ভব কৰে
জুলেছেন। চিত্ৰচিত্ৰণে শিখা দেবী, অপৰা দেবী, গীতা
দে, মিতা চ্যাটাভি, জহর গাঙ্গুলী, জুলগী চক্ৰবৰ্তী, অজিত
ব্যানাভি, অম্বপকুমার, শ্ৰীশঙ্ককুমার অংশগ্ৰহণ কৰেছেন
যোগ্যতাৰ সংগে।

মায়াবুগের পশ্চাৎদ্বাৰেনৰ অন্তীতের বুঠাত থাই থাক,
রক্তমহল কর্তৃপক্ষ কিস্ত বর্তমানে অধেষ্ট লাভমান হ'ছেন।
নীচাব শুভ এ'বের এ পদিকল্পনায় নাফলোর আশাস

জুগিয়েছেন আর বীরেন ভক্ত হুযোগ্য তৎপৰতায় তাকে
সার্থকতামণ্ডিত কৰেছেন।

মায়াবুগের চিত্ৰকন সংগী 'জুগার' পৰিচয় বিশ্বত্ৰপার
পাৰশ্ৰবীপের আলোয় হুগ্ৰকাশ। বিধায়কের সার্থক রচনা
তিনশত বজাৰী গৌরবদীপ হতে চলছে। কর্ণধার
রানবিধাৰী সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় গড়ে-ওঠা এই
নাট্যমঞ্চের পৰিচালনায় রয়েছেন নটমঞ্চের নবোদয় মিত্র।
দুস্তর বাধা তাইতো অপনীত হয়েছে।





॥ ছাত্র বিক্ষোভ ॥

যে কোন ব্যাপার নিয়েই আশ্চর্য ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শন দেখা যায়। কোথায় পুলিশের গুলিতে কে নিহত হল বা কোথায় পুলিশ কার উপর লাঠিচালনা করল, অমনি কলিকাতার ছাত্র সমাজ চকল হয়ে উঠল। নিজের মধ্যকার বা গ্যার্ডে কোথায় কি অনাচার চলছে বা কে কতটা দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে তার খোঁজ রাখবার প্রয়োজন এদের হয় না। কিন্তু তাদের অন্যান্য কোন দেশে বা অঞ্চলে তাদের অজান্তে কোন লোকের উপর দেখানকার সংস্কার কি আচরণ করল তা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠতে এদের প্রেরণা হয় না। Lebanon বা Jordan-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও ইতিহাস সম্বন্ধে ছোট ছোট কেন, বেশ বয়স ছাত্রদেরও জ্ঞান কতটা সে সম্বন্ধে রয়েছে সন্দেহ আছে; কিন্তু তবুও স্থলের ছোট ছোট ছাত্ররা হল বেঁধে হানসা করতে গিয়েছিল আমেরিকা ও ব্রিটেনের সূতাসাদের নামনে। রাজনৈতিক দলগুলি এমনি করে শুধু যে শিকার কেন্দ্রে কল্পিত করেছে তা নয়, এরা ছাত্রদের চরিত্র গঠন ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পথেও অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

কয়েকদিন পূর্বে একটি ছোট্ট শবর কাগজের পৃষ্ঠায় গোবে পড়ল। লাক্ষ্যেতে পুলিশ ছাত্রদের উপর গুলি চালিয়েছে এই মিথ্যা খবরির ফুল টালিগল্প অঞ্চলের ওটি স্থলের ৪০০ ছাত্র নিঃ নিঃ স্থল হাতে বেরিয়ে অস্ত্র একটি স্থলে বায়লা শুরু করল, যাতে এই স্থলের ছাত্রগণও বেরিয়ে আসে। এই স্থলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ যখন এবেব সাংবে বোস দিতে রাজী হ'লনা তখন তারা ইস্ট পাউকেস ছুঁড়ে এই স্থলের বয়সা আনালা কিছু ভেঙে দেয়। পুলিশ এসে উৎপাতকারী ছাত্রদের তড়িৎ করে। এই ঘটনা হাতে

প্রকাশ হয় যে কোন একটি মিথ্যা ছদ্মস্থল স্থলের ছাত্রদের দিয়ে নানা বকম গুণামি কথান সত্ত্ব হয়।

ছাত্রদের অভিভাবক স্থলের কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি শিক্ষা বিভাগ এই প্রকার গুণামিকে যেন কতকটা আত্মবিক বলে ধরে নিয়েছে। বাস্তব অভিভাবকতা হয়তো সব সময় আনতেও পারে না কিন্তু যে বিভাগর বা কলেজ থেকে ছাত্রগণ হল বেঁধে বেরিয়ে যায় তার কর্তৃপক্ষের কাছে তো কোন কিছুই গোপন থাকে না। এই সব ছুঁড়ত ও অস্ত্র আচরণের প্রতিভাওর মস্ত স্থল বা কলেজ কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। স্থল বা কলেজ কর্তৃপক্ষ যদি এ কাজে অগ্রহেলা দেখায় তাহলে সরকারী শিক্ষা বিভাগের উচিত সেই সব স্থল ও কলেজের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা। শিক্ষালয়ের ছাত্রদের মধ্যে পৃথক পৃথক রাষ্ট্রা শিক্ষার একটি বিশেষ দল এবং কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। শিক্ষালয়ের কর্তৃপক্ষ যদি এ দায়িত্ব পালন করতে না পারে তবে সরকারী শিক্ষা বিভাগের উচিত এই সব শিক্ষালয় সম্বন্ধে বধ্যব্যোয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

॥ কর্মাকারী বাঁধ ॥

কয়েকদিন যাবত কর্মাকারী বাঁধ নিয়ে আলোচনা চলছে; গত চার পাঁচ বছর যাবত বেশ জোর আলোচনা চলছে। প্রথম পরিকল্পনার শেষ দিকে এরকম আশা পাওয়া গিয়েছিল যে, ২৪ পঞ্চাবাদিক পরিবহনায় কর্মাকারী বাঁধের কাজ নিশ্চয়ই করা হবে। ২৪ পঞ্চাবাদিক পরিবহনায় গুরু হবার পরেও নানা ভাবে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে যদিও এর জন্য কোন টাকা পরিবহনায় করা হয় নাই তবু এই কাজ এই

পাঁচ বছরের মধ্যে শুরু হবে। কিন্তু কাজ শুরু হওয়া তো দূরের কথা আজ পর্যন্ত নাকি এর কোন survey যা এর গঠিক ও বিস্তারিত পরিকল্পনাও প্রস্তুত হয় নাই।

করাচী বাঁধের উপর পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যত অনেকটা নির্ভর করে। ২৪ পরগণা, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় নদীগুলি একে একে মরে যাচ্ছে। সূর্য্যা, চুপি, ইছামতি, যমুনা, গুমা প্রভৃতি নদী আজ প্রায় বিল ও খালে পরিণত হয়েছে। এর ফলে নদীয়ার ও ২৪ পরগণার উত্তর অংশে সেচের বা জল নিকালের ব্যবস্থা করা প্রায় অসম্ভব হয়েছে। প্রায় ৪-৫০ বৎসর পূর্বে অশোরের নেতা ৮৭তুনাব মহম্মদ মহাশয় মরা যমুনার জন্ত অনেক কাঁধা কেঁদেছিলেন, আজও যমুনার দূতধারায় জীবন সকাবিত হয় নাই। আরও দক্ষিণে নেমে বিজ্ঞানী প্রভৃতি নদী কলকাতার জল নিষ্কাশনের পথ করে দিত, তারাও আজ প্রায় বৃজ এগেছে। তাই সামান্য বৃষ্টি হলেই কলকাতার রাস্তায় জল ঝাঁড়িয়ে যায়; বানবাহনের চলাচল অসম্ভব হয়। আরও শুষ্কতর বিপর্যেণ দিয়েছে কলকাতার বন্দরকে নিয়ে। ভাগীরথীর কীর্ণধারা দিন দিন কীর্ণতর হচ্ছে এবং কলকাতা বন্দরে বড় বড় জাহাজ আসা অভাস্য কঠিন হয়ে উঠেছে। আরও কলিকাতা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বন্দর অসম্ভব; রেলমিনির দিক থেকে। বহি ভাগীরথীর স্রোতধারা অবনতির দিকেই চলতে থাকে তাহলে বন্দর হিসাবে কলকাতার আরব সোপ পাবে। ইতিবাণে এমন চুটাস্তের অভাব নাই। বাংলা দেশে ভাবনামিতি, সঙ্গগ্রাম প্রভৃতি এককালীন বিখ্যাত বন্দর নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে সামান্য পল্লীতে পরিণত হয়েছে। কলকাতার তেমনি অবস্থা হলে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কি হবে তা সহজেই অনুমান করা চলে।

এ বছর আর এক নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। উপর থেকে মিঠা জলের স্রোত বত কমছে সমুদ্র থেকে নোনা জলের দাড়া শুভই তার প্রভাব বিস্তার করছে, কলকাতার জল এবছর অভাস্য লবণাক্ত, তার ফলে রেলের ইঞ্জিন ষ্ট্রিক গতিতে চলতে পারছে না, ট্রেনের প্রায়ই যেনো হচ্ছে; এতে যে শুধু ব্যক্তিগত অসুবিধা হচ্ছে তা নয়;

ইঞ্জিনেরও আত্মকমছে। যে সব ইঞ্জিনের আগানী করেক বছরের মধ্যেও যেনোমতের ব্যবহার হ'ত না তাও এবছরই যেনোমতের জন্ত কারখানায় পাঠাতে হয়েছে। শুনেছি বনগী থেকে জল বহন করে এনে নিয়ন্ত্রণার্থে এখানে যেওয়া হয়। নিয়ন্ত্রণার্থে হাওড়ার খোপাখোপ বিপর্যে উঠাচ্ছে করাচীবাঁধের অভাবে। কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্বন্ধে এত উদারনীতি দেখাচ্ছে কেন? অর্থের অভাবের জন্ত নিশ্চয় নয়—এর মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক প্রশ্নও জড়িত আছে। গঙ্গা থেকে ভাগীরথী যেখানে বেরিয়ে এসেছে তার পরে পল্লার উপর বাঁধ দিয়ে ওখানে জল ধরা হবে, তার পর একটা খাল কেটে ভাগীরথীর সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে যাতে করে পরীপ্ত পরিমাণ জল ভাগীরথীতে আগতে পাবে। বর্তমানে খুব বেশী পরিমাণ জল গঙ্গার মূল খাড়া দিয়ে পূর্ব বাংলার ভিতর চলে যায় এবং এখান থেকে গঙ্গা পল্লা নাম ধারণ করে। করাচীতে গঙ্গার বাঁধ দিয়ে ভাগীরথীতে জল ঢালনা করলে পূর্ব বাংলায় পল্লাতে জলের প্রবাহ কমে যেতে পারে, যে সব নদী ছুই দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তাহলে জল নিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্দ বন্ধ করার জন্ত বারসিলোনার চুক্তি (Barcelona convention) বহুদিন পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। সিদ্ধ ও তার বিভিন্ন শাখা, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রও এদের বিভিন্ন শাখা সবই ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বারসিলোনার চুক্তি সেভাবে মানতে গেলে এর কোন নদীর উপরেই আমরা কোন বাঁধ বসাতে পারিনা। পল্লা ও মেঘনার পূর্ববাংলার যে জলের দাড়া বয়ে আসে তাতে প্রায় বছরেই ওখানে প্লাবনের সৃষ্টি হয়। পূর্ব-বাংলায় প্রয়োজনের জন্ত যে জল পল্লা দিয়ে প্রবাহিত হওয়া হ'ত তা দিয়েও ভাগীরথীতে পরীপ্ত পরিমাণে জল আনা চলে। শুনেছি পূর্ববাংলার বিশেষজ্ঞগণ এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার ভারতবর্ষের সঙ্গে কোন আপস চুক্তিতেই আসতে রাজি নয়। উত্তর পাকিস্তানের মধ্যে সিদ্ধ ও তার শাখানদী সমূহের জলের বর্ধন নিয়ে বিশ্ব-ব্যাপক মধ্যস্থতা সম্মেলন পাকিস্তান কোন চুক্তিতেই রাজি হন নাই। ভারতবর্ষ এখান থেকে

তাদের বল ও বিদ্যায় সবদিকই করে যাচ্ছে; তার বেশী মূল্যবান হয় ছুই কোটি টাকা পাকিস্তানের নিকট পাঠানো হয়েছে। পাকিস্তানের আপত্তি সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে নতুন বাণ বানিয়ে ও খাল কেটে দেগের বল আনার ব্যস্থা করা হচ্ছে। কাজেই কংগ্রেস বাঁধের ব্যাপারে পাকিস্তানের মতামতের ভক্ত হতে উঠিয়ে বলে থাকবার কোন কারণ নেই। পশ্চিমবাংলা সরকার এর গুরুত্ব সঠিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট উপস্থিত করতে পারেন এতদিনে এর বীমাংশা হওয়া উচিত ছিল। এপ্রটো স্মৃতি সহজ। পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যত এই কংগ্রেস বাঁধের উপর নির্ভর করছে; কেন্দ্রীয় সরকার তা উপলব্ধি করলে এই বাঁধের সম্বন্ধে দ্বিধা ছাড়বে এবং এখান করা হবে আশা করি পশ্চিমবাংলা সরকার এর স্পষ্ট জবাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থেকে আশ্বাসের চোঁটা করবে। নানা কথার আবরণ দিয়ে এই গুরুত্বের সবকিছু চেপে রাখা অজ্ঞান।

II জবাব মূল্য II

লোকের নিত্য ব্যবহার্য জিনিষের দাম ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। জিনিষের দাম কতকটা যে বাড়বে তা সহজেই অনুমান করা যায়, কিন্তু উন্নয়ন কালের জন্য কেটে কেটে টাকা প্রতি মাসে খরচ হচ্ছে। যে টাকা জনসাধারণের হাতে থাকে তাতে তাদের ক্রয় শক্তি বাড়ছে কিন্তু সেই পরিমাণে জিনিষের যোগান বাড়ছে না, কাজেই বৃদ্ধির সময় যে অনুহার সৃষ্টি হয়েছিল সেটুকু অংশের কতকটা সৃষ্টি হওয়া এট বিপুল উন্নয়ন যাবার জন্য খুব স্বাভাবিক। হয়তো জন সাধারণ কতকটা মূল্য বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুতও ছিল কিন্তু বর্তমানে তাড়াতাড়ি মূল্য বাড়ছে এর কোন সুজ্ঞানসম্মত কারণ নেই। বাণিজ্যে আরও জটিল হওয়া দেশে হয় এখন সরকারী তরফ থেকে নানা রকম ইন্টারভেন্শন ও বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে জনসাধারণকে আশ্বাস দেয় এবং তাদের আশ্বাস পূরে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এই সব বিজ্ঞপ্তি থেকে এই কথা প্রমাণিত হয় যে এইভাবে মূল্য বৃদ্ধির কোন সুজ্ঞানসম্মত কারণ নেই; শুধু ব্যবসায়ী প্রস্রাব্য জনসাধারণকে ঠকিয়ে অতিবিক্রম মুনাফা করে নিচ্ছে।

এতে সাধারণ জনতারের অনর্থক বৃষ্টি হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা হ'ল সরকারের কথা ও প্রতিশ্রুতির উপর লোকের আস্থা কমে যাচ্ছে, লোকের কাছে সরকারের হের ও হাতাশির হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা মনে করে সরকারের এমন কোন ক্ষমতা নেই যাতে তাদের উপর সরকারের এই সব বিধি নিষেধ চালু হতে পারে, আর জনসাধারণ মনে করে, সরকার বনী ব্যবসায়ীদের ভাবাবার, তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিদণ্ড ব্যবস্থা অবলম্বন করার সাহস সরকারের নেই। সরকারের বিজ্ঞপ্তি ও ইন্টারভেন্শন যে ক্ষমকি ও ক্ষমকি বেঁটা হয় তাতে খোঁজাখোঁজের দাবি বলে লোক মনে করে। এট ভাবেন সরকারের মততা ও সবিকার উপর এবং সরকারের কর্মকর্তার উপর লোকের আস্থা নষ্ট হতে থাকে। সমাজ জীবনে এর ফল ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ।

সরকার থেকে বলা হ'ল, তিনি হস্তানি করা হবে, কিন্তু তার জন্য তিনিই দায় বাড়বার কোন কারণ নেই। সরকার এ ক্ষমকি বিল যে তিনিই দায় বাড়ালে তাহা দেখে নেবে। কেউ তাদের ক্ষমকি ভীত হ'ল না, পেরে এক আনা দাম বেড়ে গেল। কোথায় মধ্যপ্রাচ্যে কি একটু রাজনৈতিক সোশালিস্ট হ'ল; চাল, ডাল, তেল মশলা প্রভৃতি সব জিনিষের দাম বেড়ে গেল। আবার সরকার থেকে ক্ষমকি বিল কিন্তু দাম কমল না। মনে যা... টাকা টাকার বদল হ'ল; কিন্তু সাধারণ জনতারের পক্ষে দাম বেড়ে গেল সেবে ৮০ বা বেঁধী। সরকার নিষিকার তাহে দেখছে, এর কোন প্রতিকার করছে না বা করতে পারছে না। গত বছর সম ও চাল কিছু কম হয়েছে, সেই বাটতি পূরণের জন্য বিশেষ থেকে অনেক খাজ শুল্ক আদায় করা হয়েছে, এখানে এখানে মূল্যের হোকান খোলা হয়েছে ন্যায্য সরকার মতাইক আশ্বাস ছিল, তার নেই, প্রচুর খাজ শুল্ক আদায়ের হাতে আছে—ন্যায্য মূল্যে তা বিক্রয় করা হবে। কিন্তু জন সাধারণ তা পাচ্ছে না; নানা স্থান থেকে ও-সংকে অভিযোগ আসছে। এই অবস্থায় সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে একটা পার্থক্যের প্রাচীর পড়ে উঠছে। সরকারের কথার তাহেব আস্থা নেই—সরকারী কর্মচারীদের মততা উপর বিশ্বাস নেই—এর প্রতিক্রিয়া ভোগ করতে হয় প্রাচীর

সাধারণ কংগ্রেস কর্মীক—সরকার ইচ্ছাযাবে ও বিজ্ঞপ্তিতে বা বলবে অন্ততঃ তা কার্যে পরিণত করা সরকারের পক্ষে একান্ত কর্তব্য; তা যদি না পারে তাহলেও সম্ভব বিজ্ঞপ্তি ও ইচ্ছাযাবে প্রচার করা অত্যন্ত অসুচিত। মিথ্যা ভোক্তা বাক্য না দিয়ে বং সরকার পক্ষ থেকে বলে দেওয়া ভাল যে বিভিন্ন প্রকারের ধান এ ভাবে বাড়বে। মিথ্যা আশা মনে পোষণ করে পরে প্রত্যাশিত ফলকে বিক্ষোভ তাহলে মনে লাগবে না। বাংলার গ্রামে গ্রামে আজ ছুঁড়ীসাতের মত লোকের অশেষ দুঃখ কষ্ট হচ্ছে, এতে সাধারণতঃই সরকারের প্রতি লোকের অসন্তোষ বাড়বে। তাই উপরে আমরা নানা আশঙ্কা ও বাতর্ঘ্য কথার বলে এখন সরকার তা কার্যে পরিণত করতে পারে না তখন লোকের সন আক্ষেপ প্রায় পড়ে সরকারের উপর—একথা সরকারের প্রতিশোধ করা উচিত।

৪ কেরালার অবস্থা

প্রায় ষেড় বৎসর হ'ল কেরালাতে কম্যুনিষ্ট মনোমত প্রচলিত হয়েছে। তাহের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই; ৭৮ জন সতন্ত্র সভ্য নিজেও তাঁহের সংখ্যা পরিচীতা মাত্র ছ'টিতে নীমান্বিত। তাহের মনোমতীয় সতন্ত্র মন্ত্রী আছেন দু'জন। আইন সভায় মাত্র ছ'টি বেসী ভোট নিয়ে তাহের চলতে হচ্ছে—তা সত্ত্বেও গত দুই বছরের ভিতরে মনোমতীয় ভিতরে বা তাহের সম্মিলিত ফলের ভিতরে কোন গোলামাল বা দু'খলার আভাষ দেখা যায়নি। এটা কম্যুনিষ্টদের একটা কৃতিত্বের কথা।

গত কয়েক মাস ধাবৎ কেরালার মধ্যে নানা প্রকার অশান্তি ও দু'খলার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। কংগ্রেস, প্রজা সমাজতান্ত্রিক ও অস্বাভাবিক বিপ্লবী হল কম্যুনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করছে। ইদানিং অবস্থা কিছু গুরুতর

হয়ে উঠেছে। ছাত্রবল কিছুকাল হয়ে সভ্যগ্রহ চালাচ্ছিল; প্রায় মাসমানেক গোলামালের পর কম্যুনিষ্ট মনোমতীয় নীতি স্বীকার করার তা বন্ধ হয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ বড়গত্রে পুলিশের তলি চালাতে হয়—ছুটি শ্রমিক তাতে নিহত হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ফলের মধ্যে কিছু গোলামাল চলছে; একস্থানে বিবোধী হল সত্ত্বেও অসুখ্যমী ও জনলোক অন্তর্ভুক্ত আক্রমণে নিহত হয়। এমনি অনেক রাজনৈতিক মারপিট ও হত্যা নাকি আরও হয়েছে; কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে কোন একাধার পুলিশ নাকি নেয় না। শাসন কার্যের প্রত্যেক বিভাগে কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য দিয়ে গঠিত বিভিন্ন বেদনাকারী কমিটিও আনুমান্যভাবে রাখা হয়েছে। লোকের ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন, স্বয়ং মন্বজ স্বাধীন ব্যাপন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ফলগত গুরুত্বের ভয়ে সকলে দ্বন্দ্ব।

এই হল কম্যুনিষ্ট শাসনের মনুনা। সমালোচনা করবার অবিকার নেই, স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের সুযোগ নেই। শাসন কার্য তাহের ফলের নির্ধন অসুখ্যমী চলিত হবে এই হল প্রথম বাপ। যদি সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীন কেরালার সরকারের শাসন ভাবে এটা একবার পার তাহলে দ্বিতীয় বাপ স্পষ্ট হবে—ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিহ্ন হবে, মুখ ফুটে কথা বলবার উপায় থাকবে না—ফলের প্রাধান্য সর্ব ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করবে—কম্যুনিষ্ট পার্টি গিন্ন আর কোন রাজনৈতিক হল থাকতে পারবেনা। নির্বাচন হয়ে লোকভোলাসন বেলা, কাংগ অপার কোন হল নির্বাচনে ঠাঁজতে পারবেনা। কেরালার সরকার কেরালা সরকারের অন্যতমের বিরুদ্ধে কি প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে তা আমরা জানিমা—কিন্তু জনসাধারণের এবং বিশেষ করে কংগ্রেস কর্মীদের কম্যুনিষ্ট শাসনের মনুনা বৃদ্ধ সত্যক হওয়া সরকার।

ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা

মায়ের কী হাস্যময়ি না হ'ত
আগে।



মহোদয়! এখন যদি
কাছে ক'র'ব তি'হি
ক'ব'বে হুবে যে।



এই যে! মীনা কখনো তি
হক'ব কা'র না'হি'বে। অশ্রু
আ'র যদি কা'ছে আ'র
ক'হ'বি আ'র।

কোনো না'হি'বে
বা তি আ'র
কা'ছে না'হি'বে
ক'হ'বি আ'র
ক'হ'বি আ'র
ক'হ'বি আ'র



কখনো তি আ'র হক'ব। মা'র খেলনা
ও হক'ব একটু কা'র না'হি'বে। আ'র
কা'র আ'র ক'হ'বি কোন হক'ব
ক'হ'বি ক'হ'বি। আ'র ক'হ'বি
ক'হ'বি ক'হ'বি না ক'হ'বি কা'র।

অ্যাস্কো

বায় ৩ টাবলেট



কম মূল্যে চুপচু পরিষ্কার

এসিমাটিক সোল কোং

কলিকাতা-১



ASCO B.C.

আপনার
রক্তনোপকরণে
যে পুষ্টি
চান

হনুমান

বনস্পতি



'এ' এবং 'ডি' ভিটামিন দ্বারা সমৃদ্ধ

বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আপনার সুবিধার জন্য
৫ প্যাঃ এবং ১০ প্যাঃ টিনে
প্যাক করা। ৩৬ প্যাঃ টিনের
সাধনা দায়।

সুখাদাই সুখ ও

স্বাচ্ছন্দ্যের উপাদান

একত কারক
ব্রোমস ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ

মোট চৈত্র টেবালটিক

কালমিহানগর, বিহার

19 MAY 2/8



একবিংশ বর্ষ

ভাদ্র, ১৩৩৫

পঞ্চদশ সংখ্যা

স্মৃতি-কথা

শ্রীকলিদাস রায়

(পূর্বাশ্রয়িত)

তিনি একটি খাতায় পাড়ার প্রত্যেক বাড়ীর ছেলে-বোনের নাম স্মৃতির তারিখ সময় লিখে রাখতেন। বলতেন কিছুকাল পরে অনেক তারিখ চুলে যায়। আমার কাছে হাতেই ছেলে দেবে। তারিখ লিখে রাখা কিছুই কঠিন নয়, তাও অনেকে রাখে না।

সমাজ-আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেয়ে তিনি আহারান্তে রান্নার খুব স্মৃতি রাখতেন। বহুবারে যখন আত্মীয়দের বা পুত্রবৃন্দকে হাতেই রাঁধা খেতেন—তখন প্রত্যেক ব্যক্তির নাম রান্নার উল্লিখিত প্রমাণ রাখতেন। আমরা রান্নার নিশা করলে বা তাঁর প্রশংসার প্রতিবাদ করলে বলতেন—“বল ঘেঁষি বাড়ীর মেয়েবা কত ক্লেশ স্বীকার করে কত বস্তু ক’রে রেঁধে খেতে খাওয়াচ্ছেন। এবার কি ছুঁলে হাড়ী তেলবার কথা? পেটে ছেলে পিটে ছেলে নিয়ে, নিজেদের শরীরের রোগ-ভোগ অগ্রাহ্য ক’রে ছুঁলে রাখছেন। বাড়ী-ভাড়া ছুঁলে পাঞ্জি মালাদেবের ঘরায়। তার আবার নিশা! এঁরা বিনিময়ে কিছুই চান না—বরং ক’রে আদর খেলেই থক

ব’রে যান। প্রশংসা পেলে এঁদের কত উৎসাহ বাড়়ে বল ঘেঁষি। কথাচ রান্নার নিশা কোথেনা—সব সময়ই স্মৃতি রাখবে। মনে রেখ মাইনে-করা ঠাকুরের বেঁধে খাওয়াচ্ছে না। আর এই খাওয়াইত শেষ খাওয়া নয়, পরের বাড়ী একবেলায় ভক্ত নিমন্ত্রণ খাওয়াও নয়।”

কোন নারীর কথা বলতে হলে তিনি সম্ভ্রামচক সর্বনাশ ও জিরা বাতহার করতেন। পুত্রবৃন্দকে কথা বলতেও এতদূর করতেন। সেকালের লোক সকলেই তাই করত—নিজ পরী সংস্কার।

বাবা বড় সমাজভীত ছিলেন। সবজের লোকে নিশা করবে এই ভয়ে অনেক সময় অধরা ব্যয় করতেন। আত্মীয় কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করলে দৌকিততা হিতে ভুলতেন না।

বহুপরিজনবিশিষ্ট কোন কোন পরিবারে নিমন্ত্রণ আস্ত বৎসরে একাবিক বার। প্রত্যেকবারই যথাসাধ্য দৌকিততা হিতেন। আমি বলেছিলাম—আমরা গদী, অ’ম’দের বাড়ীতে বহুকাল কোন কাজ হয়নি—কতকাল পরে ২০১৫

হবে কি হবে না তারও স্থিরতা নেই। কাৰ্কেই আনন্ড। কোন মিন কিছুই কিংবা পাচ্ছি না। বহু টাকা অর্থ সাপেক্ষে। এত বিনিয়োগ নয়, এ বীতিমত নয় যেওনা। এটা বহু করাই ভালো।

তিনি বলেছিলেন—“পরিবর্তনই সমাজে এ মর্যাদা রাখতে হবে। নতুন লোকে মনে করবে, পরিবর্তনই হতে পরেছে না। লৌকিকতা হিতে না পালে নিম্নতম যাওয়াও ঠিক নয়। সমাজে বাস করতে হলে এই ট্যাক্স হিতেই হবে।”

হাতিয়া গোপনেরও একটি নির্ভর দেবালের লোকের ছিল।

তার কৃতজ্ঞতার একটি নিদর্শন বলি,—একটি বনী সমাজে পরিবর্তন প্রতি তাঁর অকপট কৃতজ্ঞতার ভাব ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—“আমরা ত এ পরিবর্তনের কাছে কোন ভাবে ঞ্চী নই, তবে এত কৃতজ্ঞতার অকপট কেন?”

বাবা বা বলেছিলেন—“তাকে আমার চোখ মুটে গেল। তিনি বলেছেন—“অনুকূল দুই ভাইকে স্বপ্নাংগী দূর আত্মীয় বলে ভেবে অনেকদিন প্রতিপালন করে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, ভেবে না করলে আমাদেরই গর্বের জার নিতে হত। ভেবে আমাদেরই অতি নিকট আত্মীয়। আমাদেরই ভাব নেওয়ার কথা। আমাদেরই বড় ভাব ভেবে নিয়েছেন ভেবে বেশ।”

বাবা কখনো টাকা পরমা দিচ্ছে কাছের বাবতেন না। নিজের হাতে ধরত বলতেন না। গ্রামে কাকার হাতে শহরে মাঝ হাতে টাকা পরমা থাকত। কখনো তিনি টাকা পরমা হিন্দা নিতেন না। এঁরা হিন্দা হিতে চাইলে বলতেন—“ব্যাক্তের আনুসার আখার হিন্দা।”

আত্মীয় বাবত বায় চাইলে তিনি বলতেন—“গার বেওয়ার নত টাকা নেই। তবে আমি কিছু সাহায্য হিতে পাচ্ছি।” কখনও প্রার্থী কিয়তেন না। সামান্য যা পারতেন তাই হিতেন।

মাঝে মাঝে বাবত বিক্রয় বলে কাকার হাতে কিছু টাকা জমত। কাকা প্রস্তাব করতেন গ্রামের অনুকূল বিন্দক রেখে বাব চাচ্ছে—হবে কিনা। বাবা নিষেধ

করে বলতেন—“পেছ পর্বত গাঁয়ের লোকের আমি আশঙ্কিত সাহায্যে বহল করতে হবে আর সে নিষেধ হয়ে থাকে। এমন কাক করা না। আমি এমনি ক্রমেতে পাও ত কেনো। আমি বিন্দক রেখে বাব-বে মনে তাকে বাব বেওয়ার লোকের অভাব হবে না। আমরা কেন নিম্নতম ভাগী হই।” শুনেছি পিতামহও ঠিক এই কথা বলতেন। কলে, বহু জন্মবই আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।

সাংসারিক আয় দুইটির কোন প্রস্তাবই তাঁর অনুমোদিত হতেন। একটা কোন নৈতিক অপরাধ তাতে তিনি আঁকড় করতেন।

গ্রামে বা বহুদুগু শহরে কোন আশঙ্কিত কখনও সমাজ ছাড়া অল্প কোন ভক্তজাতির লোককে ব্যয়োচ্ছা হলে প্রণাম করতে যেতেন নি, তিনি কখনো তা প্রত্যাখ্যাত করেন নি। কবিবর যতীন্দ্র মোহন বাগতি বিজ্ঞান্য পরিবর্তন বাবা বলে তাঁকে প্রণাম করলে তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হয়ে পড়তেন। ভাবতেন আমায়েরপূর্বের বনদী জমিদারপরিবারের সম্ভান, তাতে প্রৌঢ় আশঙ্কিত—তিনি আমাকে প্রণাম করলেন পিতৃ সাধন করে, এমন মানুষ ত দেখি নি। বড় বংশের সবই বড়। তিনি বলতেন—যতীন আমার বড় ছেলেরই মতো। গ্রাম থেকে কিছু এলে এমন কি শুদ্ধ বা ভাটা পর্বত, তিনি বলতেন—“বতীকে যেম কিছু পাঠিয়ে বেওয়ার হয়।”

শরচ্ছত্র বনদী আসতেন, তখনই তিনি বাবার সঙ্গে গল্প আনতেন। একটি প্রশ্ন ছিল অধিকনের গুণগান। শব্দে বলতেন—“আমি কালিদাসকে বলি—একটু একটু আকিম পাও। যেহ তোমার বাবা আকিমের ষোরে দীর্ঘকালী হয়েছেন। আপনি ওকে আকিম হতে বলুন।” বাবা বলতেন—“আমি অনেকবার বলেছি, ও বাগে। তুমিই বরং বলো।”

বাবা বলতেন—“বাবা শরৎ, তোমার পরীক্ষা আয় পণ্ডিত বনাই পড়েছি—একবার আমাদেরই গাঁয়ের কথা সব। বহু বহু আমাদের গাঁয়ে কলেজ হয়। পুস্তকের অল্প বিত্ত বাবার কত চেটাই করা গেছে, লোকের শাপ শাপাতাই করেছে—আর বলেছে ওগব কিছু নয়, অল্পই থাকলে কে খতাবে?”

সব অসুটে। অসুটে !!”

বাবা গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি অবশ্বকালে ভাগবত ও পদ্মকল্পক পড়তেন। কিন্তু তীর্থযাত্রার শৌক তাঁর ছিল না। তিনি পুখী ও গিঁঝনাড়পাণ্ডিও হানের ভক্ত গয়া গিয়েছিলেন। বৃন্দাবনে গিরে মা সুবুঁ হ'ন—টেলিগ্রাম পেয়ে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। কুহুবে একবার তাঁকে কামড়ায়—সেজন্য কশ্মি গিয়েছিলেন। কিশোর পথে হরিদ্বার ও কাশী হয়ে আসেন। কানীতে পিতামহী দেহতাগ করেন—সে সময়ে প্রথমবার কাশা যান।

আমার শিক্ষার ভক্ত তাঁকে কোন ব্যয় করতে হয়নি। এই কথাই গুরুদেব গুরুত্র বলতেন। আমি যখন বাসক ভবন তিনি সন্ধ্যাকালে মুখেখে আমাকে অনন্যকোষের কতক অংশ এবং বেবদ্যের বহু গুণ মুখস্থ করিয়েছিলেন। তিনি কখনো আমাকে প্রহার করেন নি, কখনো শাসন করেন নি। তবু তাঁকে আমি খুব ভয় করতাম। মুখের কথায় কখনো তিনি স্নেহভাষিণীও বোধান নি, তিনি আমার ভক্ত বিভবাবী ও বসুমতীর গ্রাহক হয়েছিলেন। প্রবান উদ্ভেদ উপহার প্রদত্তি স্থলতে ক্রয়। ঐদগপ উপহারপ্রদত্তিই আমার ছাত্রোদ্যমের মূল ছিল। তাঁকে কখনো প্রণাম করলে মুখে কিছুই বলতেন না—অসুস্থ করতাম উক অসুস্থ নাবার উপরে। বাবার দশটি সন্তানের মধ্যে আমরা দুই ভাই বৈঁচে ছিলাম।

এক ওকালতি পড়তে অসম্মতি ছাড়া কোন বিবয়ে তাঁর অবাধ্য হই নি, তাঁর অস্মিতিকর কাজ কিছুই করিনি, তবু আজ পিতা হয়ে কেবলি মনে হয়, পিতৃকৃত্য যথোচিত নিশ্চয়ই সম্পাদন করি নি। তিনি কিছুই চান নি, তাঁর কামনার ভক্ত প্রতীক্ষা না করে অনেক কিছুই হস্ত করবার ছিল। তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করো না—তিনিও নিশ্চয়ই কিছু প্রত্যাশা করেন নি। যিনি কখনও কারো কাছে প্রত্যাশা করেন না—তাঁর সম্বন্ধে যে কল্পনাসক্তির প্রয়োগ করার প্রয়োজন, হয়ত তা করা হয় নি। নতুবা এই গিঁঝাবনে আমি এত রেশ পাই কেন? তিনি নিশ্চয়ই অভিপ্ৰাণ বেন নি। প্রায়শ্চিত্ত হতেই পূর্ব পাণের অহমান কর্তে হয়। বর্গ-কলের অনিবার্যতা তা আছে।

চাকরির শেষ বাবো বন্দর বাবা। কাসিনবাচার ভ্যাপ করে সৈন্যবাহে থাকতেন। এখানে থাকার সময় শেরাবের পাড়ীতে কাসিনবাচার যাওয়াত করতে হত। রাণা ছিলেন কাঁটার কাঁটার সমন্বিত—বাকি তিনজনকে তাদ্য দিয়ে পাড়ীতে উঠাতে হত। বাকি তিনজনের ভক্ত মাঝে-মাঝে তাঁর হেরি হত। একজ্ঞ তিনি বড় সন্মিত হতেন। আসুবার সময় তিনি শোণ বিতেন—তাঁর ভক্ত বাকি তিন জনের বাড়ী কিদতে দেবী হত। তিনি দুটির পরও কাজ করতে থাকতেন। তাঁরা বলতেন—আপনি এত হেরি করলে চলবে কেন আর মশায়? বাবা বলতেন—“তোমরা ঠিক লম্বয়ে তৈরি হয়ে থেক আসবার সময়, তাহলে আমার এক মিনিটও হেরি হবে না।” এইভাবে মঙ্গীষের সন্দেশ করে কুলতেন।

আমার মাতৃবিয়োগের দুই বৎসর পরে আমার মেথো ভাইএর মৃত্যু হয়। এতে তিনি বড়ই আঘাত পেয়ে-ছিলেন। আনিও বহুগুরে হসপুয়ে থাকতাম। গৃহ ছিল নিয়ানন্দ। বাবা বাড়ীর বাইরেই বেশী সময় কাটাতেন। প্রাতে উঠে তিনি শহরের সকল আশ্রয়স্থানের বাড়ীর একবার ঘোঁষ নিয়ে আসতেন। প্রাতঃসময়ে দুই কাজ হত। গঙ্গানারের পর মালাধপ আফিকের সদর বেড়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যা হতে প্রায়টো পর্যন্ত ক্ষেত্রনাথ গালের বাড়ীতে বাবা পাশা খেলতেন। বাবা বলতেন—বিনের মধ্যে কিছুক্ষণ আশ্রয়স্থিত থাকার প্রয়োজন। বেলা মনের বাহ্যের ভক্ত চাই।

আমি বলতাম—“আনি ত বেলা ভাল বাসি না—বেলা কখনো করিওনি—ছোট বেলাতেও না।” বাবা বলতেন—“তোমার প্রয়োজন নেই, তুমিত দেখ—ভাতেই আশ্রয়স্থিত হটে। বেলায় ও সেবার একই কাজ হয়।”

ক্ষেত্রনাথবাবু এন্ট্রিটের তিনি পরামর্শবাহা ছিলেন। ক্ষেত্রাবু ল্যাপডাউন রোডের বাবে পূর্ব সত্তার ১৬ কাঠা জায়গা কিনেছিলেন। তিনি বাবাকে ৪ কাঠা জমি দান করতে চেয়েছিলেন। বাবা গ্রহণ করেন নি। তিনি বলে-ছিলেন—কলকাতার জায়গা নিয়ে আমি কি করব? আমার ছেসেপুলে বসবাসপুর ছেড়ে কোথায়ও দাবে না। তুমি বাবা আমাকে একটা হাতগা ডেট দিয়ে হাতী কিনতে বলছ।”

বাবা যে ভুল করেছিলেন—তার মন্ত পংখী ভাবনে তাঁকে অনেক অসুবিধা সহ্য করতে হয়েছিল। বাবার ঘরে শব্দী ও নিশ্চুপতা আদর্শের ব্যবহার শুরু করেছি।

উলিপুর (বংপুর) থেকে আমি কলকাতার চলে এসাম। এক বছর মেসে থাকার পর বাসা বদলান। বাবাকে সহজে বাসায় আনতে পারলাম না। তিনি বললেন—এতকাল গ্রামে থাকতে পাইনি শেব ভাবনটা গ্রামের বাড়ীতেই কাটাও। তোরা কলকাতায় থাক—আমি গ্রামে থাকলে ভোবাও গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক সোপ করতে পারবি না। যাক মাঝে আসতেই হবে।

আমি বললাম—গ্রামের আকর্ষণ কী আছে বাবা? হতভী, অস্বাস্থ্যকর, বিপন্ন গ্রাম, মানুষের মত মানুষ নেই, খাওয়া-পাওয়ার অসুবিধা নেই। তারপর আমরা কেউ থাকি না। আসা যাওয়ার অসুবিধা।

বাবা বলতেন—মানুষের মতো মানুষ কেউ নেই, গ্রাম শু আছে। আমার পিতৃস্মৃতির ভিটে তো আছে। গ্রামে আমি শয্যার নমস্ত—পথ্যমাত্র ব্যক্তি, শয্যে আমি নগ্না রূপার পাত্র। কলকাতায় কোটরে কি আমি থাকতে পারি? গ্রামে অনেক কিছু নেই, কিন্তু আলা আছে, বাতাস আছে, নিজের ঘরবাড়ী আছে—গৃহবেতন আছে।

গ্রামে থাকার সময় তাঁর শিটে একটা মন্ত বড় কার্ণেল হ'ল। সংসার পেয়ে পেলাম, গিরে যেখি আমার মানা শব্দ (পাখবতী গ্রামের কবিরাজ) তেঁতাতা ছুরি দিয়ে দেটাকে চারকলা করে চিরে নিমগাভাটী দিয়ে বৈধে দিয়েছেন। বাবা বললেন—“ভর নেই, শবোষ ব্যবস্থা করেছে।”

আমি বললাম—“প্রশ্নেবে শ্রুগার আছে কিনা দেখা হয় নি। কলকাতা চলুন নইলে অনেকদিন লাগবে যাতে।”

বাবা—“পে আবার কিরে? প্রশ্নেবেব শব্দে কৌড়ার জ্বাবার কি সম্পর্ক? না—না আমি বেশ আছি। শবোষ থাকতে আবার ভাবনা কি?”

মাই হটক শেব পর্যন্ত বাবাকে নাতিনাতনীঘের আকর্ষণে কলিকাতায় আসতেই হ'ল। শারা বছর

থাকতেন না, মাঝে মাঝে বাড়ী যেতেন। কাকার সূচ্যার পর আর যান নি।

আমার এই কাকা বাবার বৃদ্ধত্বতো ভাই। অগ্রাচীনতা তা জানত না—সংসারের চেয়েও তাঁর অধিক ছিলেন। তাঁকে তিনি বাড়ী ছাড়তে হেননি। চিরকাল তিনি মাসে মাসে তাঁর কাছে টাকা পাঠাতেন। সেই মাসিক বরাকট: যাতে যজ্ঞার থাকে সেবন্তও তাঁর গ্রামে থাকার আগ্রহ ছিল।

ক্রমে একে একে কয়েকটি নাতিনাতিনী হ'ল, কলিকাতায় তাঁদের নিয়ে শেব ভাবনটা কাটলেন। ভাবনী-শক্তি তাঁর ছিল অসুন্দর। আমি বছর বয়সে তাঁর চোখ কাটানো হল, তাতে তিনি পূর্ববৃত্তি কিবে পেলেন। তাঁর ভাবনীশক্তির কিছু উত্তরাধিকারী হয়েছি ব'লেই আছো বৈচে আছি এবং ৪৮ বটা নাকীছাড়া অবস্থার পরও বৈচে উঠেছি। পিতৃলোক থেকে বাবাই হয়ত আমাকে বাঁচিয়েছেন। বাবার কতকগুলি উপদেশ—

১। কারো কাছে কিছুই প্রত্যাশা কোরো না। যদি কিছু পাত—তাহলে অপ্রত্যাশিত ব'লে আনন্দ পাবে এবং যার কাছে পাবে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবে। প্রত্যাশা ক'রে না পেলে বাধা পাবে, মানুষের শব্দে অকারণে বিদ্রোপতা অমাবে।

২। শুধু বৃদ্ধত্বতো অ্যাঠত্বতো পিসত্বতো মাগতো মানত্বতো ভাই হলোই আত্মীয় হয় না, ঐ ভাইবের শব্দে বন্ধুত্বও হওয়া চাই। ভাইবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। মাসে মাসে চিঠি লিখবে, মাঝে মাঝে অকারণে হেধা সাক্ষ্য করবে। আত্মীয়বের ছেলে মেয়েবের নাম বনে রাখবে—তাঁদের সবাইকে নাম ব'রে ডাকবে।

৩। বিশেষে কোন আত্মীয় বাহুবের বাড়ীতে সহজে উঠো না। তার যে কত অসুবিধা হতে পারে তা ভেবে দেখবে। যদি নিতাজই উঠতে হয়, আপস থেকে খেনে নেবে তার কোন অসুবিধা হ'বে কিনা। কারো অসুখ বিশ্রুহ আছে কিনা, অস্ত কোন অত্যাগত আগ হতেই আছেন কিনা, বিনা সংবাধে একেবারে হঠাৎ কারো বাড়ী গিয়ে উঠবে না। না কেনে তনে পেসে হয়ত দেখবে তার

বাড়ীতে কারও কোন মাথাটিক পীড়া বা সংক্রামক রোগ হয়েছে। তাতে ছুইয়েরই পক্ষ মূলক।

৪। ভাত না হ'লে চলবে না, এ অভ্যাগত কষাচ করবে না। মাঝে মাঝে ভাত থাকে না। ফল, রুটি, চিড়ে ইত্যাদি থাকে, এ অভ্যাগত থাকলে বিশেষে খুব সুবিধা হবে এবং দ্রুত কোথাও পরের বাড়ী উঠতে হবে না। যে কোন বাড়ী ছলেই যেন চলে যায়। (ইহানীয়ে বাবার এ উপদেশটার মূল্য ভাল করেই বুঝি)।

৫। ধনী লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ যেতে যাবে না। না গেলে কেহ খোঁজ নেবে না। মনে করবে, কখন এসে খেয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই। ধনী লোকের বাড়ীতে কান্ডালের ভোজন কান্ডালী ভোজন ছাড়া কিছু নয়। অবশ্য খাওয়া গেলে খোঁজ নেয় বা নেবে তাহের বাড়ী যাবে।

(কার্শম বাবার বামবাড়ীতে বৎসরের মধ্যে অনেক-দিন নিমন্ত্রণ হত—আমাদের কখনো নিমন্ত্রণে যেতে দিতেন না।)

৬। বরযাত্রী হয়ে গেলে কোন উপজব করবে না। বরং কতাপক্ষকে সর্বপ্রকারে সহায়তা করবে। মনে রাখবে কতাব পিতা বড় দারদ্র—বড় বিপন্ন।

(সেকালে বরযাত্রীরা বিয়ে বাড়ীতে গিয়ে বড় উপজব করত।)

৭। জুজ্বা জিনিষ নিয়ে কখনো কারও সঙ্গে কথাড়া করবে না। (আমাদের শরিকানি পুত্রে মছখরা হল মাছ কুটে ভাপ করা হত। সেই মৎস্ত মশানে গিয়াস জুজ্বের মতো অনেক সময় বিবাহ বাধাত। বাবা নিগেধ করেছিলেন—বাছভাগের সময় আমাদের কেউ যেন উপস্থিত না থাকে। অংত্র এ নিষেধ প্রতিপালিত হয়নি, কারণ তিনি গ্রামে থাকতেন না)।

৮। রাগের সময় কে কি বলে বা করে তা দিয়ে কারো চরিত্র বিচার করবে না। রাগের সময় মানুষ অপ্রকৃতিস্থ হয়।

৯। ঘলে পড়ে কেউ কেউ ভোমার নিশাঘর সার হিতে পায়ে বা নিশাঘর যোগ দিতে পারে—তা শুনে নিশকের প্রতি বিস্ত্রণ হতো না। হলের মধ্যে লহম মানুষ আর একরূপ হয়ে যায়।

১০। খাওয়া ভালো হল না বলে কোনদিন রান্নাবাগি করবে না বা খাবার আয়োজন ভাল নেই বলে বিরক্ত হবে না। মনে রাখবে ওটা শেষ খাওয়া নয়। কয়েক ঘণ্টা পরেই আবার ত থাকে।

১১। পরমা কখনো গুনে নিয়ো না। তাতে ২:১ পরমা কম হয় হবে, পরমার সঙ্গে আত্মগি থাকবে না।

১২। ট্রেনে যাবার সময় দুনি যদি বগতে পাও—আর বৃদ্ধ বা শিশু বা ব্রাহ্মোক্ত বা বোগী পাড়িয়ে থাকে, তবে তৎক্ষণাত্ তাহের ঠাই ছেড়ে পাড়িয়ে যাবে। দেখবে ১৫২০ মিনিটের বেশী পাড়িয়ে থাকতে হবে না, ঠাই হয়ে যাবে।

১৩। গবে যেখা হলে কেউ যদি—কেনম আছে—বাড়ীর সব মঙ্গল ত ৭' ছিজানা করে, তবে দু-কথার জবাব দেবে। বিনিয় বিনিয় বাড়ীর ধন বা নিজেব স্বাস্থ্যের ধনর বলবে না। ঐ ছুটি প্রশ্ন আপ্যায়ন মাত্র। লভাই লোকে বুটিনাটি সব ধরব জানাব দস্ত ব্যস্ত নয়।

১৪। লহজ কারো উপকার নিয়ো না, উপকার নিলে উপকারকের কাছে চিরদিন দ্বন্দ্বল হ'য়ে থাকতে হয়। এমন অনেক লোক আছে, যাদের কাছে উপকার নিলে তাহের হাবির অস্ত থাকে না। চিরদিন হ'য়ে গুন পরিশোধ করতে হয়।

১৫। এক বেলা থাকে তবু গুণ করবে না। যদি বিপন্ন হয়ে গুন করতেই হয়, তাহলে বহু স্রেম স্বীকার কর'বেও সর্বপ্রায়ে গুনযুক্ত হবে।

১৬। আগু যদি না বাড়ে তবে অপচয় ও অপব্যয় যাতে না হয় সেটিকে কড়া নজর রাখবে।

১৭। গৃহে কোন অত্যাগত এসে তাঁর খুব দস্ত করবে, কিছু খাওয়া খাওয়া নিয়ে বাড়ীবাড়ি করবে না। তাতে অত্যাগত লজ্জা পাবে। তোমরা নিজে যা খাও তাই যেতে হবে। বড়ম:হুবি দেখাতে যাবে না।

১৮। বিধাতার ঘরে আহার্য লভাই মাপা আছে—বেশি বেশি খেলে ত্রিশদিন খাওয়া চলবে না। অল্পদিনই সুবিধা যাবে। বৈশ্বদিন বাঁচতে গেলে কম কম খেতে হবে।



বহি-বন্যা গজেন্দ্র কুমার মিত্র

(পূর্বাঙ্গসংগ্রহ)

॥ ৫২ ॥

মুন্সী কালুকাগ্রসার বেঙ্গী দিন কানপুরে বাহির থাকিতে পারেন নাই, কারণ প্রাণতরু যতই বড় হোক, এ শহর তাঁহার কাছে আরও বড়। পুরুষ মানুষের পক্ষে উপার্জনের কেন্দ্র হইতে দূরে থাকার অর্থ, জীবনমৃত হইয়া থাক। আর বহি নবিশাই থাকিতে হয় ত এ বেহ থাকিলেই বা কি, সেলেই বা কি! খাটিতে খাটিতে সকলেই যেন হয়—দূরে কোথাও গিয়া কয়দিন আশ্রয় করিবে, প্রথম ছুই-একদিন সে আশ্রম ভালও লাগে কিন্তু তাহার পরই নিজস্বতাটা বিছার মত কানড়াইতে থাকে। সুশশয্যা কটক-শয্যা হইয়া তাত। বিজ্ঞানের অভাবে আগে নদে হয় অবসর পাইলে ঘুমাইয়া বাঁচিব—কিন্তু বিজ্ঞান লইতে গেলে ঘুম আসে না চোখে একবিন্দুও।

কালুকাগ্রসারও এমন একটা সংকল্প লইয়া বেহাতে গিয়াছিলেন; প্রাণরক্ষাকে প্রাণরক্ষাও হইবে, অন্য দ্বারে পড়িয়া একটা পূর্ণ বিশ্রাম লাভও ঘটবে। কিন্তু দুটা তিনটা দিন যাইতে না যাইতেই হাঁপাইয়া উঠিলেন। আরে ছোট, এমন সব বেশে মানুষে থাকে! উত্তেজনা নাই, চঞ্চল্য নাই, যামসা-বাণিজ্য কিছু নাই, নগর টাকার কলঙ্কনানি শোনা যায় না—এমন কি বাহিরের একটা শব্দও এখানে আসিয়া পৌঁছায় না। এ বেন সমাধির মধ্যে বাস করা।

সবচেয়ে কানপুরের সর্বোদয় যন্ত্রই তাঁহার মনটা বেঁধে ছুঁকটু করিত। এই শহর তাঁহার কর্তব্য-জীবনের সহিত পাকে-পাকে জড়ানো, গ্রহিতে গ্রহিতে বাঁধা। সেই

কানপুরে কত কি কাণ্ড ঘটিতেন—কতই ইতিহাস রচিত হইতেছে মুহূর্তে মুহূর্তে আর তিনি এই—বলিতে গেলে একটা রামচন্দ্রকীর অভিযন্ত, তুলিয়া যাওয়া যায়গা—বদ্রিয়া বদ্রিয়া সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত তামাকু পোড়াইতেছেন। তাও সঙ্গে বেটুকু শবরের ভাল জামাক আনিয়াছেন তা ত সুহাইল বলিয়া—এখন হয়ত এখানকার কড়া দা-কাটা খাইয়া জীবনধারণ করিতে হইবে। এমন জীবনে প্রয়োজন কি?

সুতরাং সাত-আটটা দিন যাইতে না যাইতেই তিনি আবার শহরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তবে নিজের বাড়ী, এমন কি নিজের মহলার বিকেল যাইতে সাহস করেন নাই, পরিচিত বহুলোকেই তাঁরাকে দাঁড়া করে, সে তথ্য তাঁহার অবিহিত নাই—বেঁধিতে পাইলে সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিবার 'নোকর'ও গোয়েন্দা বশিষ্ঠা খরাইয়া দিতে এতটুকু ঘিণা করিবে না। সেইজন্য তিনি একেবারে বিপরীত দিকের একটি বিশাল মহল্লাতে পরিচিত এক বোকানীর বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছিলেন। প্রচণ্ড গরমে যৌতের মধ্যে বাহির হওয়া আরো উচিত নয়—এই অভ্যুহাতে সারা দিনটাই বোকানের পিছন বিকের আলো-বাতাস-বীন ধরে পড়িয়া ছটকটু করিতেন এবং সন্ধ্যার অন্ধকার হওয়া মাত্র টুপির বদলে একটা মোটা কাপড়ের পাগড়ীতে মাথার অনেকখানি, মায় চোখের খানিকটা পর্যন্ত ঢাকিয়া বাহির হইতেন শবদের সংবাদ সংগ্রহ করিতে।

ক্রমে ক্রমে, অর্থাৎ কয়েকদিন বেশ নিয়মপূর্ণ কাটিবার পর অনেকখানি তথ্য বাড়িয়া গেলে তিনি একেবারে

সিপাহীদেবের লাইনেও আনিতে শুরু করিয়াছিলেন এবং 'হুই-পন্ন্য' কামাইবার অভ্যাসটা দীর্ঘকালে অভাবে গাড়াইয়া দিয়াছিল বলিয়া, শেষের করবিন ঐ পরিচিত বোকাটিকে সাননে শিখতী খাড়া করিয়া ফৌজী ব্যাবকে সজী, ফল, বি তেল প্রভৃতি সহযোগে শুরু করিয়াছিলেন। নগর কারাবারে যা হয়, গার-বাকী ছাড়িয়েন না, এই ছিল তাঁহার সংকল্প, তাই বেশী ঘামের জিনিসে ঘেঁষিয়েন না, পাঁচ টাকার সজী অন্যায়সে পনেরো টাকায় বিক্রি হইবে, না হয় ত পড়িবে, তাতে ক্ষতির লগ্গাবনা সামান্য। আর বি তেল ? না বিক্রী হয়, পড়িয়া থাকুক—মিজেরা খাইয়া শেষ করিতে পারিবেন, চাই কি ঘরে হুই বোকানে বেচাও চলিবে।

নাচারপড়ের আশেপাশে ঘোরাচুরি করিয়া এ করবিনে সব খবরই মোটামুটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন সুদী কালুকাপ্রসার। হঠাৎ জলিগোলাবর দশটা সেন খামিয়া গেল, সে কারবটাও তাঁহার অবিকিত ছিল না। আব দখি হইয়াছে এবং সাহেবরা কাল সকাল বেলাই নৌকার চাপিয়া এলাহাবাব রওনা হইবেন, এ খবরটা জানা পর্যন্ত তিনি ছুঁকুঁ করিয়া বেড়াইতেছেন। ২৬শে তারিখ তাঁহার সারাবাত ঘুম হয় নাই।

কারণ ?

তখনকার দিনের কী কারবারী কী সাধারণ লোক—সকলকারই ধারণা ছিল সাহেবরা এক একটা টাকার পাত্ৰ। রোজগার উদ্যোগ দত করে—তাঁহার চেয়ে বেশীও ভয় সাহেবই চের বেশী খরচ করে, অধিকাংশ সাহেবই রূপগ্রস্ত। খুন বেশী উপরি রোজগার করার পথ বাধাধের আছে, অথবা ব্যবসারী সাহেব ছাড়া কেহই বড় একটা কিছু জমাইতে পারে না। যে মাসিক আয় ভারতীয়দের হইল—উপার্জনকারী জমিদারী কিনিতে পারিত, সেই আয়েই মুন্সাইয়া সাহেবদের রূপ করিতে হয়। তবে এই 'নবাবী'র অধিকাংশই ব্যয় হয় ভারতীয়দের মধ্যেই, বখশীশে ও চুক্তিতে—উদ্যোগের বেয়াদব ব্যয় বাবুচি বিশ্বমংগার আব্দার চোপ্কার করা প্রভৃতিরা এক একটা টাকার কুমীর হইয়া শুভে অবিলম্বে; বাজারের টাকায় চৌদ্দ ছটাক বি মাত্র কয়েক পয় আনিয়া যে দেরকরা চৌদ্দশিক

দ্বয়ে পরিণত হয় এবং সেই চৌদ্দ শিকার অধিকাংশ অর্থ যে এই কুমীরদের পেটেই পৌঁছায় তাহা কেনা আসে ? আর এই টাকাই বাবুচি বেয়াদবের দেব-এ জমিয়া এক সময় কলিত মহাজনের নামে আবার রূপ রূপ সাহেবদের দেব-এ চলিয়া আসে এবং এই বাস্তবজ্ঞের ফলে নষ্টই নষ্টই অকটা যে বরিত-কলবর হয়, সে কথার কালুকাপ্রসারের মত সাহেব-দেখা নাহয়দের কাছে অবিকিত নয়।

সুতরাং সাহেব-দারিদ্র্য নামেই টাকা।

টাকা উদ্যোগের চাউপাশে ছড়াইয়া আছে, কুড়াইয়া লইতে পারিলেই হয়।

সেই তারিখেই সমস্ত হাত ব্যাবাকের ধরে বিনিস কাটাইয়া তোর বেলা সাহেবদের মালপত্র চালান শুরু হইতেই কালুকাপ্রসার একটাকে চুকিয়া পড়িয়েন নাচারপড়ের মধ্যে। কী পাইবেন, কী আশার ঘাইতেছেন তা তিনিও স্পষ্ট জানেন না—শুধু একটা অকাংক্ষ আকাংক্ষীন সোতই তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

কিন্তু দেখানে চুকিয়া যে বৃত্ত সোণে পড়িল, তাহা মোটেই আশাশ্রয় নয়। কালুকাপ্রসার দীর্ঘমত হইয়া গেলেন।

খালি স্বরগুলিতে শুধুই হেঁড়া কাগজ-পত্রের ভূপ। কেহ কেহ চিঠি-পত্র পোড়াইয়া দিবারও চেষ্টা করিয়াছেন—কলে এ কোণে ও কোণে অধিকৃত কাগজের পত্র। মালপত্র নাই বলিলেই হয়। হেঁড়া ঘানা এক আখটা, কাঁচ ও কাঁচকড়ার দু-একটা খসন, খালি টিন—এমনিই ছুই-চারিটা বাজে জিনিস এখানে ওখানে পড়িয়া আছে। তা তাঁহার মত লুচু তিথারীর হলও ছুট্রা গিয়াছে ইতিমধ্যেই। সিপাহীরাও কেহ কেহ উঁকি মারিতে শুরু করিয়াছে। পুরানো চোপ্কার আব্দার চোপকারী বেয়াদব বাবুচি—ঘাঘরা প্রাণভরে কাগজের ছাড়িয়া সহরে আন-পোশাক করিয়া ছিল, অথবা ভীড়ে মিশিয়া সাহেব বরাইয়া বিয়া ছই পরমা রোজগারের কিকিরে ছিল এতদিন, তাহার বাজের মধ্যেই আদিয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ পুরানো মনিবের সহিত গল্প জমাইয়া তুলিয়াছে, কেহ বা

তাঁহাদের মালপত্র শুদ্ধাইয়া বহিতে লাগিয়া গিয়াছে। দুই একজন সিপাহীও তাহাদের পুৰাতন মেজব বা ক্যান্টেনের সাহায্যে যে আগাইয়া আসেন নাই তাহা নয়। তাহারা কেহ মালপত্রের জন্ত প্রেরিত বঙ্গেল গাড়ীতে 'পরীং পরোব' ও 'হুজুর'দের মালপত্র শুদ্ধাইয়া তুলিয়া বিতেছে, কেহ বা নিকেরা কঁপে করিয়া ঘাট পর্যন্ত পৌছাইয়া থিবে বলিয়া তৈরী হইয়া পাড়াইয়া আছে।

কালুকাগ্রসাদ টোবান সহিত লক্ষ্য করিলেন, ছিটে-কোঁটা প্রসাদ এবং বন্দীশাহি বা মিলিবার ইহাদেরই অর্থাৎ পুৰাতন সেবক ও সিপাহীদেরই মিলিতেছে। টাকাটা দিকাটা মোহরটা ত বটেই—দুই একজন বানী বাড়ি অথবা মূল্যগান শাল হইতেও বিকৃত হইল না।

মজা মজা নয়! সন্ধ্যাতে—এবং কতকটা স-বিঃস্বঃও কালুকাগ্রসাদ মনে মনে উজ্জ্বল করিলেন, বাহারা জনিষ্ট করিল, তাই-বেরাধারের খুন জবন করিল, তাহাদের বেলগাই উৎসাহের বহাভাষ্য সমুদ্র উল্লিয়া উট্টিল, আর তাঁহাদের মত যে বিষম সেবকরা শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্ত হইল এবং সুহৃৎবন্দের শৌর্য ও ভাগ্যে বিশ্বাস হারাইল না তাহাদের বেলার অবশিষ্ট হইল—কিছু ছেঁড়া কাগজ ও ছাইয়ের গালা!

ইহা-কেই বৃষ্টি বলে ভগবানের সুবিচার। হু হু হাই! এই অশ্রুপূরীতে আসাটাই নিখা হইল!

বৎসরোনাতি বিস্তৃত ও ক্ষুদ্র মুখে কালুকাগ্রসাদ একটা কোশে পাড়াইয়া একবার শেষ বারের মত চারিত্রিক তাকাইয়া বেরিয়া লইতেছেন, আর কোথাও কোন লাভের আশা এখনও আছে কিনা—হঠাৎ কাহার একখানা ভারী হাত তাঁর উপর পড়িল।

হাতখানা একেবারে অপরিচিত নয়।

নানকটাহ।

সঙ্গে সঙ্গে খুঁপিতে উদ্ভাসিত হইয়া উট্টিল কালুকাগ্রসাদের মুখ। তিনি তাহা-লে একা ঠেকেন নাই, নানকটাহের মত বুদ্ধিমান লোকও তাঁহারই মত বুঝা লোভে ছুটিয়া আসিয়াছেন! আঃ, বাঁচা গেল! অমৃত একা দেখু বনিবার ঘুংঘটা আর রহিল না।

'কেমন উকীলগুরুদী, রাম রাম।' কালুকাগ্রসাদ প্রায় পাড়াইয়া বহিতে পেলেন নানকটাহকে, 'কী, খুন আশার-এসেছিলে না? ডেবেছিলে যে সাহেবরা চলে যান্ধে—ছুটার পাঁচ টাকা কি আর এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে থাকবে না? হাঁ হাঁ—অতি বড় বুদ্ধিমানেরও এমনই দুর্ভাগ্য হয়!...সে ভড়ৎ বালি, কী ছিল যে থাকবে? অইহুতা। পড়ে আছে ঐ কতকগুলো ছাই, তাই গাট্টা ছড়িয়ে নিয়ে যাও, আর কি!'

জান হাত মুঠা করিয়া বৃদ্ধাভূট্টাট একটা বিশেষ ভঙ্গীতে তুলিয়া ধরিয়া খুন ঘাসিতে লাগিলেন কালুকাগ্রসাদ। নিরতিশয় তৃপ্তির হাসি।

তাঁহার এই বাক্যস্রোত যতক্ষণ বহিল, নানকটাহ নিঃস্ববে বীরভাবে পাড়াইয়া রহিলেন। বাধা থিবার চেষ্টা করিলেন না, কোনরূপ অসহিষ্ণুতাও প্রকাশ করিলেন না। শুধু তাঁহার শাব্য মুখে ও চোখে একটা অপরিণীম কল্পনার ভাব ছুটিয়া উট্টিল—কালুকাগ্রসাদের কথার ও কথা বলার ভঙ্গীতে।

তারপর কালুকাগ্রসাদ খামিলে তাঁহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া নানকটাহ অদ্রুত একরকমের শান্ত কণ্ঠে করিলেন, 'তুমি টাকা চাও, না? টাকার ওপর বড় লোভ তোমার!'

এতক্ষণে কালুকাগ্রসাদের মনে হইল যে কোথার আংও একটা কি বড় বসমের বেহুবি হইয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া এই ধীর শান্ত লোকটার কাছে বড় ছোট হইয়া গেছেন তিনি।

বড় বেশী লোভ তিনি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন—খুশির আতিশয্যে। তাই লোকটা তাঁহার উপর একঘাত লইবার সুযোগ পাইয়াছে! উহাকে আগে কথা কহিতে বিলেই ভাল হইত!

'কেমন, কেন—এ কথা বলছ কেন?'

ঐযং উত্তর কণ্ঠেই প্রশ্ন করেন কালুকাগ্রসাদ।

সে কথার উত্তর না দিয়া নানকটাহ নিঃস্ববে মুখখানা একেবারে কালুকাগ্রসাদের মুখের কাছে লইয়া আসেন। তাঁহার চোখের দিকে একপ্রকার বিচিত্র স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া, কেমন একরকমের অদ্রুত গলায় বলেন, 'বুঁ, টাকা

চাও তু তিথিরীর মত খালি বাড়ী খাঁট দিতে এসেছ কেন ?
এখানে কি পাবে ? এত সামান্য আশা তোমার ?
তোমার তু অজ্ঞাব নেই—তবে এত নিচে নামো কেন ?
যাও, সাহেবদের পিছু পিছু যাও । এদের বিপদ কেটেছে
বলে আমি মনে করি না । এদের সঙ্গে থাকো গে—তখন
সময় ও সুযোগ এসে যে কটা সাহেবকে পাবে বাঁচাও গে ।’
বেতুকের মতই বিস্ময় ভূষ্টিতে তাকাইয়া কালুকাগ্রদার
বলিলেন, ‘তার মানে ?’

‘মানে—মানসাহেব যতই বলুন, এই সাহেবরা
নিরাপদে প্রাণ নিয়ে শেষ পর্যন্ত এলাহাবাদ পৌঁছতে
পারবে বলে আমি মনে করি না ।...আর এত মনে করি না
যে আরেংজ-রাজ শেষ হয়ে গেল হিন্দুস্থানে । এ বড়
অদ্বুত জ্ঞাত, এই আরেংজরা ঐ স্থবির বাহাদুর খা.
নির্ধাণ নানাসাহেব আর এই কটা জুটেবা সিপাহীর মাথা
নেই যে আরেংজদের কাছ থেকে রাত্তা ছিনিয়ে নেয় ।
এরাই দ্বিতবে শেষ পর্যন্ত । কাজেই যতটা পারো
যে তাবে পারো এদের বাঁচাবার চেষ্টা করো গে—অপেক্ষের
কাজ হবে । তখন পাবে টাকা, বত বুই ! যাও ।’
একরকম তাঁহাকে বাহিরের পথের দিকে চেষ্টা
হিলেন নানকটীর, তাহার পর নিষেধ নিষেধে কোথায়
অবুজ হইয়া গেলেন ।

॥ ৫৩ ॥

২৭শে জুন, ১৮৫৭ ।

এই তারিখটি ইংরাজের কাছের ইতিহাসে চিত্রিত
একটি ভয়াবহ দিন বিপাবে চিত্রিত হইয়া থাকিবে ।
ভয়—ভাষার সহিত বিবেচ, স্থগা, প্রতিবিম্ব—এক
কথায় মানবমনের অনেকগুলি কু-বৃত্তির সহিত চিত্রিত
বিভক্ত থাকিবে এই দিনটি । ইহার পর এক
শতাব্দীরও উপর কাটিয়া গিয়াছে, তবু ঐ দিনের ভয়ঙ্কর
অভিজ্ঞতা ইংরাজ-মান্তির স্মৃতি হইতে একেবারে মুছিয়া
যায় নাই ।

সিপাহী-বিদ্রোহে মোট নবহত্যা বড় কম হয় নাই ।
ইংরাজ সোড়ার মরিয়াছে, পরে মারিয়াছে । নিষ্ঠুর হত্যা,
পৈশাচিক হত্যা, অকারণ হত্যা । ইংরাজ মারিয়াছে

প্রতিশোধ লইতে, বৈব-নির্ধাতন হিসেবে । হিন্দুস্তানী
মারিয়াছে এতও যোবে—হয়ত তাহাকেও বৈবনির্ধাতন
বলা চলে । বহুদিনের বহু অন্তোজ পুত্রীভূত ছিল
তাহাদের মনে ।

কিন্তু সে বতই হটুক, কানপুরের হত্যাকাণ্ড লব
স্মৃতিকই মান করিয়া গিয়াছে—অন্তত ইংরাজের ইতিহাসে ।
সত্যীচৌরা যাও বিবিধ—এই দুটি ঘটনার স্মৃতি জড়ী
নাই । সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে Massacre of
Cawnpore অস্তম্য প্রাধান ঘটনা বিপাবেই চিত্রিত
পরিচিত আছে । কেহ কেহ বা সেদিনের সেই বীতংস
হত্যাকাণ্ডকে শুধু The Massacre এই আখ্যায়
একেবারে সর্বপ্রধান স্থানটিই দিয়া গিয়াছেন ।

২৭শে জুন—১৮৫৭ ।

ইতিহাসে এই দিনটি বিশেষ দিন হিগাবে চিত্রিত
আছে বটে কিন্তু সেদিনের বিশেষ ইতিহাস কি সত্যই
কোথাও পাওয়া যায় ?

সেদিন ঠিক যে কী ঘটয়াছিল তাহা পুরাপুরি কেহই
জানেন না । কোন্ পক্ষের কতটা দারিদ্র তাহাও কেহ
জানেন না । আনিবার উপায়ও নাই ।

নানাসাহেবও আনিতেম না ।

আমিনা আশিষ্মাকে মিথ্যা কথা কহিয়াছিল । রাজে
সে নানাসাহেবের ঘরে গিয়াছিল ঠিকই কিন্তু সে শুধু
নৈশ-বহস্তের রমনীর লালে তাঁহাকে বিভ্রান্ত ও অতিকৃত
করিতে, নর্য-সৌন্দর্য উদ্ভূত উৎসবে তাঁহাকে মাতাইয়া
অচেতন করিয়া একান্ত অস্তম্যত বাহিতে : এক কথায়
বাহিরের ভরক-বিস্কৃত ঘটনাসমুদ্রের গর্জন বাহাতে তাঁহার
কানে না পৌঁছায়, সেইজন্য নানাসাহেব ও বাহিরের
অপত্তের মধ্যে নিজের বদ্বজন-দ্বৈপত্য দোস্তনীর ভণ্ড
দারীয়েহটি দিয়া এক দুর্ভেদ প্রাচীর রচনা করিতে !

সেদিন যেন নিজেকে নৃতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল
আমিনা । তাহার ভণ্ড-দোস্তনের অশৌকিক ক্রূরকে নৃতন
করিয়া যেন মোহিনী মায়ায় প্রলেপ লেপন করিয়াছিল ।
তাহার সমস্ত শিক্ষা বীক্ষা, সমস্ত ছলাকলা-নৈপুণ্য প্রয়োগ
করিয়া সে সেই বিশেষ রাজে নিজেকে এমনই এক ছদ্মবিদ্য
বিশিষ্টাধারণে আলাইয়া তুলিয়াছিল যে সে শিখার পতনের

মত স্বীকারই পড়া ছাড়া নামানাহেবের উপায় ছিল না।...বহুদিন তাহার সহিত কাটাইয়াছেন নামানাহেব—বহু প্রমোদনোন্মত্ত, বহু বিলাস-বিহারের স্মৃতিই প্রায় আছে তাঁহার মনে এই হৃদয়কে কেন্দ্র করিয়া;—তবু যেন সেই পুরাতন লীলাসকিনীটিকেই একবারে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলেন তিনি। এ যেন সে পূর্বপরিচিত ছদ্মনী নর, বাহ্যিক এতকাল অন্তরের অন্তরতম প্রবেশে, রূপ যৌবন লাভ প্রভৃতিতে আলালার অনেক নিচে স্থান দিয়া আশ্রিয়াছেন—এ আর কেহ, সম্পূর্ণ অতিনব, সম্পূর্ণ নূতন। ইহার মোহিনীনাগর নির্মলক বিকসিতা দিয়া, ইহার ঐ বসন্তাংশল ভূলা পারে নিককে স্পিরা দিয়াই জীবন ধর মনে ধর।...

সেদিনের রাত্রি যেন চোখের পলক না ফেলিতে কাটিয়া গেল। নামানাহেবের মনে হইল জীবনে সুখের রাত বড় ছোট, আনন্দের অবসর বড় কম। আরও মনে হইল ছদ্মনী যে এতই অপরাধ এতই কাব্য তাহা ইহার আগে অনুভব করেন নাই কেন?.....

রাত ছোট মনে হইলে মানুষ চুই হাত দিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহ, দিনের প্রান্তে আসিয়াও। নামানাহেবও আজ তাহাই করিলেন। ছদ্মনীর তরফ হইতেও কোন আপত্তি নাই। তাহার আচরণ দেখিলে সন্দেহ হইতে পারিত—চিত্রমৌবনের চরিত্রকে সে এই সুবি প্রথম কাছে পাইয়াছে।...সুতরাং সেদিন নামানাহেবের প্রভাত হইল যখন—তখন প্রভাতের চারদণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর দ্রুত সন্তোষ-বিবিল দেখটাকে টানিয়া তুলিয়া গান প্রান্তঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া পূজার বসিতে বসিতে প্রথম প্রহরও উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

ইংরেজরা চলিয়াযাইবে আত, পরাক্রান্ত আত্মদমনিত শত্রু তাঁহারই অঙ্গপ্রবেশে প্রাণ লইয়া চলিয়া যাইবে—আজ তাঁহার গৌরবের দিন, উৎসবের দিন। সে কথাটা পূজা করিতে করিতে মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদের জন্ত কোত্থলী ও উদ্ভটীষ হইয়া উঠিলেন নামানাহেব। টোপী বা আভিযুজা এতবেলা পর্যন্ত একটা সংবাদ-বিস্তরণ না পাঠানোর জন্য প্রথমটা একটু বিরক্তির বোধ করিলেন। তাহার পরই মনে পড়িল তিনি আজ এখনও পর্যন্ত

অন্তঃপুরের গভীর মধ্যেই আবদ্ধ আছেন। সঙ্গে সঙ্গে মনটা পূর্বযাত্রির স্মৃতি-বোম্বনে প্রায় হইয়া উঠিল, সেই প্রসন্নতা তাঁহার কল্পনাতেও সঞ্চারিত হইল। সব গণ টিক মুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে কল্পনা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিন্তু ভগবান গণপতির চরণে শেষ অর্ঘ্য দিয়া উঠিবার আগেই অনেকগুলি তুলিপোলা-কামানের শব্দ কানে আসিল তাঁর। কোনমতে প্রথমটা করিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিলেন দুই অশ্বকার করিয়া পাড়াইয়া আছেন তাত্য্য টোপী।

‘কী ব্যাপার তাত্য্য—এসব কি?’ উত্তর নানা প্রায় ক্রুদ্ধভাবেই প্রশ্ন করেন।

‘আপনিই ছকুম দিয়েছেন পেশোরা, আপনিই আদেশ এসব কি?’

বিরক্ত শুধু নর, টোপীর কণ্ঠে বিদ্রোহিতাও স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

‘আমি? আমি কি ছকুম দিয়েছি?’ বিবল কণ্ঠে প্রশ্ন করেন নানা।

‘বিশালখাতকতা ক’রে নিরহ ইংরেজদের উপর তুলি চালাতে।’

‘সে কি! আমি ত কিছু জানি না।’

বলেন বটে—কিন্তু যুগপৎ নানা ও টোপীর কণ্ঠে একই সন্দেহ আবছারা রূপ পরিগ্রহ করে।

‘দিশাখীরা ও বিশালখাতকতা করতে অস্বীকার করেছিল কিন্তু আভিযুজা তাবের আপনাব নাম করে ছকুম জানিয়েছে।’ বলেছে যে আপনি হালা এবং ব্রাহ্মণ, এ কাজে যদি কোন পাপ হয় ত সে পাপ আপনি এখন করবেন।’

‘সে কি!...আমাকে না জানিয়ে আমার নাম ক’রে ছকুম জানিয়েছে—আভিযুজার এত দুঃসাধন।...তাকে ডেকে পাঠাও ত।’

‘ছদ্মনী বোধ করি কাছেই-কোথাও ছিল—সে নিশ্চয়ই আশিয়া পাড়াইল।’

‘আভিযুজার যোগ নেই পেশোরাবী। আপনিই তাকে

আপনার নাম ক'রে ঐ আবেশ আনাতে বলেছিলাম, আবার ঘাড়িয়ে !'

'সে কি—তুমি ! তুমি কেন এ কাজ করতে গেল হুশেনী !

'কেন এমন একরকম অসহায় ভাবে প্রশ্ন করেন নানা ।

'আপনি যত সহজে আপনার শত্রুদের ক্ষমা করতে পারেন পেশোয়ারী, আমি পারি না ! ওরা আপনার যে অনিষ্ট করেছে, আপনার কেন—সারা হিন্দুস্থানেরই ভ্রমণ ওরা—আমাদের সকলেরই সর্বনাশ করতে চেষ্টা করেছে ওরা—ওদের এভাবে নিরাপদে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে নিবৃত্তি আর কিছুই হতে পারে না ।...এই কথা ইংরাজ ভেবে দেখুন আপনার কত সৈন্তের মৃত্যুর কারণ হয়েছে, যাদের একান্ত নগণ্য ও অসহায় ভেবেছেন, তাদের কোনোই কী পরিণাম দ্বিত্ব হতে হয়েছে আপনাকে । আবার ওরা যদি বৃহত্তর দলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে তাহলে কি রকম থাকবে ? না আপনি পারবেন সহজে তাদের পরাস্ত করতে ? আপনার মূখ চেয়েই এ দৃষ্টান্ত করছি পেশোয়া—বস্তু হিতে হয় বিন । হাসি মুখেই সে বস্তু দেব !'

'হুশেনীকে বস্তু দেখা ।

'কাল যাত্রের আগেও হয়ত সে কথা ভাবা চলিত কিন্তু এখন আর যায় না ।

'বিনুত ভাবে একবার ভাবার মুখের দিকে চাওয়া নানা নামাইয়া লইলেন পেশোয়া ।

তারপর ভাত্যার দিকে না চাওয়াই কতকটা খসিত কর্তে বলিলেন, 'যা হবার তা ত হয়েই গেছে—অন্তত মেরেছেলে আর ছেলেদেরগুলোকে বাঁচাও ভাত্যা—ছুটে যাও । হোহাই তোমার, আমার ওপর অভিমান করে থেকে সর্বনাশ আর বাড়িও না ।'

ভাত্যা প্রায় ছুটিয়াই চলিয়া গেলেন ।

তাঁহার গতিপথের দিকে চাওয়া আরও কিছুক্ষণ এই ভাবে গাঁড়াইয়া থাকিয়া নানা একটা দীর্ঘবাস ফেলিয়া খসিত কর্তে কহিলেন, 'কেন এ কাজ করলে হুশেনী । আমি যে ওদের কথা বিবেচনা করি ।'

'কথা বিবেচনা করার খেলাটো মারাঠীদের গঞ্জে খুব

নতুন নয় পেশোয়া । পেশোয়া বংশ এ কাজ কি এই প্রথম করলেন ?'

কর্তে তীক্ষ্ণ বিজ্ঞপ আনিয়ার ।

পূজার পরে ভুক্ত পান করা পেশোয়ার নিত্য অভ্যাস ।

ভুক্ত আদিল গমন হুগের 'কটোরা' লইয়া । পেশোয়া ইতিহাসে তাহাকে চলিয়া গাইতে বলিয়া দেই পবিত্র পরিহিত অবস্থাতেই আদিয়া একটা চৌকীতে বসিয়া পড়িলেন । বাহিরে গিয়া অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করা বা কোন নতুন আবেশ দেখা—কিছুতেই আর যেন কোন উৎসাহ বহিল না তাঁহার ।

আমিনা আসিয়া পাশে গাঁড়াইল কিন্তু স্পর্শ করিতে সাহস করিল না । পূজার কাপড় এখনও ছাড়া হয় নাই, তাছাড়া মূখে এখনও একটু বল পড়ে নাই । আমিনাকে স্পর্শ করিলে পুনরায় শ্রান না করা পর্যন্ত আহার করিবেন না, একথাও সে জানে । স্নাতক স্পর্শের অভাবটা কর্তের মারুর্বেই সাহিতে হইল—যতদূর সম্ভব মশুকর্তে অপরাধীর বিধা আনিয়া সে প্রশ্ন করিল, 'আমার ওপর বাগ করলেন পেশোয়া ? কিন্তু এইবার একটা কথা বলি, কথার খেলাপ আপনার ঠিক হয়নি । স্ত্রী ইংরেজই আগে চলিয়েছে নিজে মাঝি-মাস্তানের ওপর—নিপাহীরা শুধু অস্বাভাবিয়েছে যাত্র । আমার সেই নির্দেশই ছিল, আর তাই সন্তোষ হয়নি । আপনি নিশ্চিত থাকুন—আমি খাটি ধবই বলছি । বস্তু এখান আমাকে ক্ষমা করবেন ।'

নানা একটা দীর্ঘবাস ফেলিয়া তাহার দিকে চাছিলেন । প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি কোমল হইয়া আদিল তাঁহার । শ্রান হাসিয়া কহিলেন, 'ক্ষমা ? বাগ ?...না, আমিনা বাগ নয় । ভয় হচ্ছে ।...কোথায় চলছি কে জানে ।...হয়ত এ কাজের এই দস্তব । বিধা বেখে এ সব কাজ হয়না ।...হয়ত তুমিই ঠিক কবেছ ।...কে জানে !'

আর একটা দীর্ঘবাস ফেলিলেন নানা দুঃস্থ ।

॥ ৫৪ ॥

আমিনা নানাসাহেবকে বলিয়াছিল ইংরেজরা প্রথম মাঝি-মাস্তানের উপর স্ত্রী চালাইয়াছে । কথটা হয়ত একেবারে মিথ্যাও নয় । পূর্বেই বলিয়াছি যে—সেইদিনের

সঠিক ঘটনা সম্পূর্ণ জানিবার কোন উপায় নাই। সবসময় সহস্র লোক ঘেঁষানে উপস্থিত, যেখানে অসংখ্য কণ্টা, ঘটনার স্থান ঘেঁষানে বিস্তৃত—যেখানে কেহই সমগ্র ভাবে ধারণা দিতে পারে না।

সেদিনের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, কয়েকটি লোকের জ্ঞানবন্দীর উপর। তাহারা কেহ ছিল ঘাটের ঘাটে সহস্র লোকের জনতার মধ্যে গাঁড়াইয়া—কেহ বা নিরাপত্তা হ্রাসে সঠিক ছিল; জনসম্মুখে সব শুনিয়াছে। কালুকাঙ্গার শেষোক্ত শ্রেণীরই একজন। যদিও কালুকাঙ্গারের সাক্ষ্যের উপরও অনেক ঐতিহাসিক জোর দিয়াছেন।

সেদিন যে ইংরাজ কর্তৃক এলাহাবাদের উদ্দেশ্যে নৌকায় চাপিয়াছিল—তাঁহাদের মধ্যে মাত্র চার জন লোক শেষ অবধি প্রাণে বাঁচিতে পারিয়াছিল। টমসন ও ভিন্সেন্টস্ তাহাদের মধ্যে দুইজন। ইহারাও লিখিত ইতিহাস দাখিয়া গিয়াছেন। বিবাস করিতে হইলে ইহাদের কথাই বিবাস করা উচিত। বর্তমানকালের ঐতিহাসিকগণও ইহাদের কথাই অধিক প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

২৭শে মকাল বলাই পূর্ব-প্রতিক্রিয়ায় আক্রমণ করতগুলি ভুলি, 'বলে গাড়ী'—এমন কি মোলট হাতীও পাঠাইয়াছিলেন, মাথু ও মাল নবীর ঘাটে পৌঁছানোর জন্য। বলা বাহুল্য যে সব লোক সে ভুলি ও হাতীতে বসে নাই। মালগুলি মোলট চাপাইয়া গ্রীষ্মকাল রক্ত ও শিশিরের ভুলি এবং হাতীতে ভাগ্যভাগি করিয়া ভুলিয়া গিয়া সমস্ত পুরুষেরা সকলেই হাঁড়িয়া সত্যোচীয়া ঘাট পর্যন্ত গিয়াছিলেন। অনেক বলেন সব শেষে পড়িয়াছিলেন কর্ণেল এডওয়ার্ড, তাঁহাকে ও তাঁহার বিবিক গাড়ী হইতে নানায়া কাড়িয়া কেনা হয়। হইলার সাহেবও নাকি ভুলি হইতে নামিবার সময় সিপাহীদের তরবারিতে প্রাণ হারান।

কিন্তু হইলার সাহেব আরো ভুলিতে চড়েন নাই, তাঁহার স্ত্রী, ও কস্তার সহিত মোটা পথটাই হাঁড়িয়া আসিয়াছিলেন, ইহার একাধিক বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার

কৃত্য নাকি তাঁহাকে একটা নৌকায় চড়িতেও হেঁচকাছিল। এবং 'নাজাংগ' সব শেষে ছাড়িয়াছিলেন যেমন ভাইবাট, এডওয়ার্ড নয়। ভাইবাট নিরাপত্তা ঘাট অবধি আসিয়া নৌকাতে চড়িয়াছিলেন, তাহার একাধিক প্রমাণ আছে।

যে চার জন শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচাইতে পারিয়াছিলেন * তাঁহাদের অভিজ্ঞতাও অবশ্য ঐ সব পূর্বোক্ত ঐতিহাসিকদের সঙ্গে মেলে না। নিষেধের সহিতও মেলে না। কেবল তাঁহাদের বিবরণ হইতে এইটুকুই বোঝা যায় যে সাহেব মেহরা নৌকায় উঠিবার আগে পর্যন্ত সিপাহীরা সম্পূর্ণ বিস্তৃত আচরণই করিয়াছে, অনেকেই পুরাতন অধিনায়কদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে; তাঁহাদের মালপত্র-বাঁহিয়া ছাড়িয়া গো-গাড়ীতে বোঝাই গিয়াছে—কুশপত্র-বিনিময় প্রভৃতি স্তম্ভভাৱেও অত্যন্ত হয় নাই। এমন কি টমসন ঘাটে যাইতে যাইতে তাঁহার পূর্ব-পরিচিত এক সিপাহীকে প্রাণ করিয়াছিলেন, এলাহাবাদ পর্যন্ত সত্যই তাঁহার নিরাপত্তা যাইতে পারিবেন কিনা—তাঁহার উত্তরে সে নাকি আন্তরিক ভাবেই তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিল।

প্রথম বিষয়স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন পান টমসন—সর্বশেষ ইংরাজ মেহর ভাইবাট নৌকায় উঠিবার পর। তখন সকল ঠিক নটা। সকলের ওঠা হইয়া গেলেই নাকি মাঝি ও মাল্যারা সব ব্রুপরাপ বলে লাফাইয়া পড়িয়া তীব্রবেগে ভীরাভিমুখে ছুটিতে শুরু করে। ভীত, শঙ্কিত সাহেবদের তখন বরপাড়া পোতা অবস্থা—তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গেই ঐ মাঝিদের লক্ষ্য করিয়া এক ঝাঁক গুলি ছোঁড়েন। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আসে পাক্কে প্রতীক্ষমান সিপাহীদের কাছ হইতে; বন্দুক ও কামান একসঙ্গেই গর্জিয়া ওঠে। সাহেবদের গুলি-ছোঁড়াকে তাহারা কুল বুঝিতেও পারে—বলা যায় না। নবীতে পৌঁছিয়া নিরাপত্তা নৌকায় চাপিয়া প্রতীক্ষিত ইচ্ছা তাঁহাদের প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এমন মনে করাও আশ্চর্য নয়।

কিন্তু টমসন বলেন যে মাঝিরা নৌকা ত্যাগ করিবার আগে সোপানে খড়ের ছাউনিগুলিতে আশ্রয় গ্রহণের

বাবু কথারি গিয়াছিল। স্বস্তি বা অসস্তি টিকা কি কঠ-
করলা বহুপূর্ব হইতেই বড়ের মধ্যে লুকানো ছিল। কিন্তু
স্বস্তি তোমার শুভ বড় বাস্তবের গাধার মতই দাঙ্—সামান্য
শূলিকেরই অলিয়া গঠে। স্বস্তির অস্তিত্বের বহুপূর্বের তুলিতে
আশুন বস্তুও বিচিত্র নয়। আবার অনেকের মতে থাকিয়া
নৌকা হইতে নামিয়া পড়িতেই দিপাহীরাও নাকি পড়
হইতে লাকাইয়া পড়িয়া ইংরেজ বস করিতে থাকে।

ইহার পর কী হইল, তাহা টমসন ও ডিলাকোদেরও
জান করিয়া যেন পড়িবার কথা নয়। সমস্ত সন্তা
বুদ্ধিতেও পাবেন নাই। নৌকাতলা অস্তিত্বে, তাহার
সহিত চলিয়াছে তাঁর হইতে অবিরাম স্তম্ভাবধন।
তাড়াতাড়ি পলাইবারও উপায় নাই। চড়িবার সুবিধা
হইবে বলিয়া নৌকাতলিকে যতটা সম্ভব পাড়ের
কাছে রাখা হইয়াছিল, ঐয়ের ভিত্তি গলার পূর্বে
ও কাহার বেশির ভাগ নৌকাই আবদ্ধ, নাকিমাঝার ঠেলার
হয়ত তাহা সহজেই বলে ভাসিত কিন্তু অন্ত্যন্ত ইংরেজ
সৈনিকের কাছ দেউহু কাজও সমস্যা। অনেকই
জলে নামিয়া টানটানি করিয়া নৌকা ভাসাইতে গিয়া
তুলিতে প্রাণ হিলেন।

কেবল মেঘের ভাইবাট যে নৌকার ছিলেন, সেই
নৌকাটি সৌভাগ্যক্রমে বলেই ভাসিতেছিল, তাহাও দুঃ-
লইয়া বাওয়া খুব কষ্টের হইল না। তাহাতে আশুনও লাগে
নাই। আশুনও একটি নৌকা তাহারে পিছু পিছু
আসিতেছিল কিন্তু কামানের গোলা লাগিয়া সেটি ভুগিয়া
যায়। উহার আরোহীদের কাহাকে-কাহাকেও অগ্রবর্তী
নৌকার টানিয়া তোলা যায়। টমসন গাভার কঠিয়া
শেষ পর্যন্ত ঐ নৌকাতেই আসিয়া গঠেন।

তখন কিরিয়া তাকাইবার অবকাশ ছিল না। দূত্ব
মুখোমুখি দাঁড়াইয়া অতি বড় নির্ভীক ও আত্মীয়-বন্ধন প্রা-
প্তের কথা ভাবেন না। টমসনবাও ভাবেন নাই। বাকী
সকলের কি হইল তাহাও জানেন না। যে সব মহিলা
ও শিশু তাঁদের অঙ্গ এবং প্রাণসম্পন্ন নৌকার পড়িয়া
রহিল তাহাদের অনিশ্চিত পরিণাম এবং তাগের উপর
ছাড়িয়া দিয়া তাহারা প্রাণ লইয়া প্রতিকূলত্বের মধ্যে
সহিত লড়াই করিতে করিতে ভাসিয়া চলিলেন। নিশ্চিত

হওয়ার উপায় ছিল না। কারণ শত্রুর গোলা শুভলি
মধ্যে মলেই চলিল। মাঝ গলার পড়ার পর কামানের
গোলা হইতে দক্ষা পাইলেন বটে কিন্তু বহুপূর্বের তুলি
ঠেকাইবে কে? এ ছাড়া অসস্তি তাঁর আসিয়া পড়িতে
লাগিল আসেপাশে অগ্রবর্তী। কতকগুলি নৌকাতে
আশুন লাগাইয়া নৌকাতলি প্রোতে ছাড়িয়া যেওয়া হইল
—ভাসিতে ভাসিতে পলাতক নৌকার কাছে আসিয়া
পড়িলে এ নৌকার বড়ের চালে আশুন লাগিতে আর
কতকণ?

তবু জীবনের নামায় ঐ হতভাগ্যের বল প্রাণপণে
মরণের সহিত লড়িয়াই চলিল। বাহ্যিক মহিল তাহারা
মহিল—তাহাদের পানে কিরিয়া তাকাইবার অবসর রহিল
না। বল ক্রমশই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ হইয়া আসিতে
লাগিল। দাঁড় বেশী নাই—মরাই হইতে উদ্ধার কাঠ ও
বীশ হুড়াইয়া বল কাটিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল।

দুঃখের দ্বায়ে পর হইতে সকলের দিকটা পর্যন্ত একটু
বিশ্রাম পাওয়া গেল কিন্তু নভবপূর্বের কাছাকাছি আসিতে
একটি আনানীর মুখে শোনা গেল যে সেখানকার জনিবার
বিপুল এক বল লইয়া অগেচ্চা করিতেছেন। বেলা দুইটা
নাগাধ নৌকা সেখানে আসিয়া পড়িল। সমস্তই তাঁর
বিপুল একবল লোক দাঁড়াইয়া—তাহাদের সহিত বহু-
ত আছেই, একটা কামানও কোথা হইতে সংগ্রহ
করিয়াছে। ঠিক সেই সময়ই ইংরেজ নৌকাটা গেল
চড়ায় বাধিয়া। তবে ইংরেজ মদীরা হইয়া লড়িতেছে
বলিয়াই যোৎস্না হিন্দুস্থানীরা সুবিধা করিতে পারিল
না। কামান যে উড়িবে সেই মরিয়া গেল। কোমরতে
ওদিকটা সামলাইয়া টানটানি করিয়া নৌকা ভাগানো
হইল ত হোবা গেল কামান হইতে এক-নৌকা দিপাহী
আসিয়া পড়িয়াছে। তবে পলাতকদের ভাগ্যক্রমে সে
নৌকাও চড়ায় বাধিয়া গেল।

লক্ষ্যের মুখে ভাইবাট-এর নৌকা আর এক চড়ায়
লাগিয়াছিল কিন্তু সে বাজার বাজাইয়া দিল বড়। স্বস্তির
দক্ষা বাতাসে নৌকা আবার আপনা হইতেই জলে
ভাসিল।

আরও একটি ব্যত কাটিল।

কিন্তু প্রত্যুত্তর আসে—আমি আসিলাম না হস্তশাখায়েও
এখন, সে ভাষায় বোঝা ছিল আরও হতাশা।

অন্ততঃ পথ ভুল করিয়া ভুল মহা ছাড়িয়া পাশের
একটা বাড়িতে চুকিয়া পড়িয়াছে তাহারা—এখানে নৌকা
চালানোর চেষ্টা করাও ব্যতুলতা।...

পিতৃ হস্তিবারং বা অশ্রুস্রব হওরাও চেষ্টা করার আগেই
সকল আসিয়া পড়িল। তখন নৌকা ছাড়িয়া সকলে
নিচে নামিল। মরিতে হয় ত লড়াই করিয়াই মরিবে।
অশ্রুস্রব উন্নত এচেষ্টার সেই জন-বাহ্যে ইংগিতের
বাহ্যেও সর্বত্র সৈনিকের শক্তি আসিল। সে প্রচণ্ড
বিক্রমের কাছে ঠাড়াইতে পারিল না সিপাহী ও গুলী-
বাহীরা মিলিত হল। অবশেষে এক সময় প্রাণ লইয়া
পলাইল তাহারা।

চন্দনও সেল—সেই সঙ্গে নৌকাটিও যে অন্তহিত।

প্রান্ত স্রব ইংগিতের ক্ষুদ্র হলটি গতাত্তর না
পাইয়া নদীতীরে এক মন্দিরে আশ্রয় লইল। দুইদিনের
অনাহার, অনিদ্রা ও পরিভ্রম। ক্ষুধার পেটে মোচড়
হিঁটেছে, তৃষ্ণার বুক পর্বত দেখে শুকাইয়া। মন্দিরে
না আছে খাদ্য, না আছে জল। অবশেষে হস্তশাখার
হল আবার নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ক্ষুধার অন্ন না
থাক, তৃষ্ণাবীরতলে তৃষ্ণা ত মিটিবে। আর, এখনও হস্ত
সামগ্র্য শক্তি অবশিষ্ট আছে—সীতার কাটিয়া কোথাও
একটা বাওরা চলিতে পারে, পরে হস্ত সে উপায়ও
ব্যর্থ হবে না।

তখন দেখা ঠাড়াইয়াছে মাত্র সাত।

সীতার কাটিতে কাটিতে জলি ঝাইয়া তাহার মধ্যে
হুইজন বাবা গেল। একজন আর সীতার হিতে না-পারিয়া
অবশেষে একটা চড়ার আদিয়া উঠিয়াও চেষ্টা করিল,
কিন্তু ভাল করিয়া জল হইতে উঠিয়াও আগেই এক লাঠি
আদিয়া পড়িল মাথায়। অবশ্য আঘাত—কল সব কলটি
চুকিয়া গেল। বেচারাও আর প্রাণ রাখিতে এই
প্রাণাত্তর চেষ্টাও প্রয়োজন ছিল না।

বাকী চারজন তখনও সীতার কাটিতেছে। তবে
আর যে বেশীক্ষণ পারিবে না—তা তাহারাও জানে।

কিন্তু এইবার বোঝার গুণবান দুখ তুলিয়া চাহিলেন,
সত্তবত স্রব হইয়াই পিছনের হল গিছাইয়া গেল। অবশ্য-
মাত্র চারজনের অস্ত্র মজুরী পোষায় না বলিয়াই ছাড়িয়া
ছিল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত পাশে বা পিছনে শব্দবাহীর হল
না দেখিয়া এই চারজন এইবার বিশ্রামের চেষ্টা দেখিল।
একেবারে তীরে আসিতে তখনও তহনা নাই—দুর্ভাগ্য।
সত্তব নিশ্চয় পাড়ের দিকে আসিয়া প্রায় কোমর-
জলে গলা পর্যন্ত ডুবাইয়া বসিল। অর্থাৎ তেমন সম্ভাবনা-
দেখিলে আবারও নদীতে ভাসা চলিবে।

তখন অনাহার-অনিদ্রার তৃতীয় দিনও প্রায় শেষ হইতে
চলিয়াছে। ২১শে জুনের স্বর্ষ পূর্বাংশে বাকিতেই
তাহারা নৌকায় চড়িয়াছিল, এখন ২২শে জুনের স্বর্ষ
অপরাত্তে চলিয়া পড়িতেছেন।..... (ক্রমশঃ)



শিল্পের চেতনাবোধ

নগেন দত্ত

আমাদের সাধারণ পদ্ধতিগত জীবনে এমন একটা দৃষ্ট চোখে পড়েনা যাকে শিল্পের পর্যায়ে ফেলতে পারি। আমাদের ঘেঁষে পঠনে বাই থাক, কিন্তু ঘেঁষে ঘড়ীর মতো শিল্পরসের উপাদান লুকিয়ে আছে। এই রসের সন্ধান করতে হয় শিল্পী শিল্পকে যখন পড়েন—এখানে বিশেষ করে চিত্র শিল্পী, ভাস্কর এই দুই শ্রেণীর শিল্পীর কথাই বলা যাবে—তখন নিজের মনে পড়েন সাধারণভাবে এই কথাটা: আমারা মনে নিই। কিন্তু মনেও যে পড়ন চাই একথাটা আমাদের ডেবে দেখতে হবে। ঘেঁষে ওঠা দেখলে কান্ডার হাসি পায় কান্ডার পায় কান্ডা, কান্ডার-বা আরও অনেক রকম ভাবের উৎস হতে পারে। এখন কি আমাদের মনোবৃত্তির সব ভাবই তাহের মনে উৎস হতে পারে—মানব ঘেঁষে বহু বিচিত্র ভঙ্গী দেখে। কিন্তু শিল্পীর ভেতরে হবার যে সেই মানব ঘেঁষে ভঙ্গীটা কী নিয়ে এলো। এইটে বুঝতেই শিল্পীকে সন্মত হতে হয়। তার নিকেশ শুধু নয় স্বপ্ন আর ভাবের কলার অটুত রূপায়ণের মধ্য দিয়ে।

শিল্পী যখন তাঁর অন্তরে প্রথম চেতনার সাদা অহতব করেন, তখন তার দৃষ্টি বিশেষভাবে বস্তুর ওপর পড়ে। কিন্তু বস্তু, বস্তু হিসেবে কোথাও থাকে না, তা এই পবিত্রতাময় বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে থেকে লুপ্ত হয়। কাঁচের বস্তু টিক বস্তু নয়। তাহলে পাঁড়াজে বস্তু ও তার অব্যবহিত পারিপার্শ্বিক এবং বস্তুর অবস্থান। বস্তুর অবস্থান স্থান-কাল সংযোগে একটি বিশেষ পারিপার্শ্বিক বস্তু করে থাকে। এখানে কথা সাহিত্যের যে স্বাধীনতা আছে—ভাবের ও স্বপ্নের রূপশিল্পের সে স্বাধীনতা নেই। কেননা কথা সাহিত্যে স্থান-কাল ব্যক্তি ও সমাজ পারিপার্শ্বিককে নিয়ে বস্তু। কিন্তু স্বপ্নকলার, ভাবশিল্পের রূপ ও রেখার মধ্য দিয়ে স্থান-কাল ও পারিপার্শ্বিককে বস্তু করতে হবে। শিল্পীর কাছে প্রকৃতি বৈচিত্র্যময় হলেও বিশেষ ভঙ্গীতে পরিণত।

এই ভঙ্গিমার রূপ ও রস বৃদ্ধিতে হবে। কিন্তু রূপকে পেতে হলে বস্তুর সাধনা হওয়ার প্রয়োজন। এবং শিল্পীর চেতনা বস্তুর সত্যকে উপলব্ধি না করতে পারলে বস্তু নিছক বস্তু হিসেবেই দেখা দেয়।

বস্তু আপনাকে আপনি পড়ে থাকেনা। সে আর্সো আকাশ ও বিশেষ অবস্থান ভঙ্গীর মধ্যে বিভাজ্য করে। এই অবস্থান ভঙ্গীকে আবার সে দেখে—অর্থাৎ শিল্পী যখন ঘেঁষে তখন সেও বিশেষ অবস্থান ভঙ্গীর মধ্যে বাস করে। এ দুয়ের অবস্থিতিই শিল্পের তত্ত্ব। সৃষ্টি করে আমরা যা দেখি তা কী অবস্থাতে দেখি, এবং কোন দৃষ্টি কোণ থেকে তা আমাদের দৃষ্টিপথে আসে। তার সত্যক উপলব্ধি না থাকলে ছবির পরিপ্রেক্ষিত বোঝা যায় না। কিন্তু ভাস্কর্যের পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্ট দ্বিঃ পরিপূরণ করা চলে। কেননা সেখানে বস্তু শুধু রেখা বস্তু নয় বস্তুই আমাদের ভাবের রূপ প্রকাশ করে।

শিল্পীর যে বস্তু সাধনার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে তা এই দৃষ্টি-কোন বিভাজ্য কংলেক্ট করা পড়বে। ঘেঁষে নেওয়া থাক আকাশ থেকে একটা নীল রঙের পলক মাটিতে পড়ছে। এখন এই পালকের গতিবেগ দ্রুততম হতে পারে এবং প্রতিটি গতিবেগ বিশেষভাবে অধিকারী হতে পারে। বস্তুকে ও অননি ঘেঁষলে চলবে না শিল্পীর, সে ঘেঁষবে শুধু বস্তুর ভাব, গতি, আর রূপ। তাহলের সঙ্গে দ্রুতের পরে গতিগত পাখা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল, এবং গতিগত ছিন্ন পালক বাতাসে ভর করে পৃথিবীতে নেমে আসতে লাগল। এই পারিপার্শ্বিক শিল্পী কিভাবে এই সত্য পালককে আঁকতে পারেন তা নির্ভর করছে শিল্পীর বস্তু চেতনা ওপর। কেননা, এই ছিন্ন পালক পৃথিবীর পথে আসতে আসো-বাতাস স্তর তৈরি করে আসছে—এ হল বস্তুর অভিজ্ঞার। আসো-বাতাস মধ্য দিয়ে রূপ নিয়ে আসছে, বাতাসে তার স্পন্দন নিয়ে আসছে। শিল্পী এখানে ভাবের গতি শুধু এই সত্যটাই পেল

যে আকাশ পাখে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জটায়ু বিফল। তার একমাত্র সখল ছিন্নভিন্ন পাখা।

এবারে বরা নেওয়া থাক শিল্পী রাবণের হৃদয় দেখেননি, শুধু কল্পনার পতনশীল পালকের পরিচয় পেয়েছেন। এই পালকের বৃহত্তর সত্তা জটায়ুর পাখা সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বংশীর মূল্য ন্যায়ছে। পালকের এই চলিছু খাদ্য শিল্পের বিষয় হতে পারে কিনা? শিল্পীর চেতনার সমগ্র ধারণাটি অস্বত্ব কহতে পারে কিনা, প্রকৃতই এ সম্ভব। কেননা, শিল্পীর চেতনাবোধ কেবলই করা পালককে দেখবেন। সে গড়ন্ত পালককে দেখবে দুটি দৃষ্টিকোণ দিয়ে এক আলো বাতাস অগম্য সূত্র দুই। তিন, পালকটি বিপর্যস্ত পরাধিত জটায়ুর সমগ্র সংগ্রামে সত্তার একটি বিচ্ছিন্ন খণ্ড মাত্র। এই খণ্ডটি বিপুল থেকে বিচ্ছিন্ন বলেই ব্যাধাত্তর, বিধায়ে মলিন। শিল্পীকে এখানে এক অদিক, দুই আনন্দিত বস্তুর রূপপ্রকাশ করতে হবে। শিল্পীর একমাত্র সখল গুটিকয়েক দেখা, বিভিন্ন বস্তুর সমাবেশ।

এখন প্রশ্ন আসবে যে, শিল্পীর চেতনাবোধ এখানে কেন্দ্র পর্যায়ের অবস্থান করছে যা একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্প সৃষ্টিতে সফল হচ্ছে? চেতনার সত্তা তেজ আছে এটা আমরা যেনে নিজেই বলব যে, শিল্পীর চেতনা পূর্ণতা লাভ করেছে। তার কারণ এখানে ধ্যান ও জ্ঞান সমগ্র প্রাপ্ত হয়েছে। এবারে ধ্যান ও জ্ঞান কি এই কথাটার বিশ্লেষণ হওয়া বরকার। ধ্যান এককথায় ঐকান্তিকতা। জ্ঞান বস্তুর বিশেষ অবস্থা, অবস্থান ও পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি। বুদ্ধি দ্বারা বস্তুর নিরূপণ কার্য সমাধা করা। এই দুয়ের সমগ্র না হলে শিল্পের চেতনা সর্বাঙ্গীন হয়না।

যে পালকের কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে, সে পালককে আলো বাতাসের তরঙ্গের মধ্য দিয়ে নিলিয়ে দেখবার বিষয় আলোচিত হয়নি। যে বস্তুটি আলো বাতাসের তরঙ্গ তেজ করে নীচের দিকে নামছে সে নিশ্চয়ই বিভিন্নরূপের তরঙ্গিত শিল্পীর দৃষ্টিতে বরা ধিয়েছে। এবং সে দৃষ্টিটি কি? কি তার নাম? সম্ভবতঃ এর আর অল্প কোন

নেই—বাহে রূপদৃষ্টি। আমরা সাধারণভাবে বুঝে থাকি 'বেধা' বিশেষভাবে বেধা। কিন্তু ভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রূপ দিয়েও বেধা আছে। তাতে রূপই প্রধান হয়ে ওঠে। জটায়ুর পাখা নিশ্চয়ই একটা বস্তু মণ্ডিত ছিল। এটা বিশেষ অবস্থা। কিন্তু এই বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত বস্তু এখন আলোর তরঙ্গ তেজ করে বাতাসের সঙ্গে গতির ছন্দ নিয়ে আসছে তখন সেই বিশেষ রঙ শিল্পীর চোখে কিরূপে প্রতিভাত হল এইটে রূপদৃষ্টির একটি প্রধানতম বিচার বিষয়। কেননা, বস্তু এখন আলোর সংস্পর্শে আসে তখন তার আদিম বস্তু প্রকাশ করেন। তখন বস্তু ও আলো এ দুইয়ের মিশ্রিত অবস্থা বস্তুর অবস্থা বস্তুতে হবে। এখানে বস্তু প্রকৃত নয় বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতাকে থেকেই আসে রূপদৃষ্টি।

রূপদৃষ্টির পর এলা গতিছন্দ। এ সবই শিল্পের অপরিহার্য অঙ্গ বলে যেনে নেওয়া যেতে পারে। বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখলে সবটাইই মর্গায়া আছে, স্থর আছে আর আছে সমগ্রের সত্তাবনা। আর সত্তাবনা নিজেই শিল্পের বিচার। রূপ স্থির নয় গতির প্রতিভা সেই জটাই রূপকে চেতনার অঙ্গত গতির মধ্য দিয়ে দেখতে হয় তবেইনা ছন্দ মনে আগে। এই ছন্দের নানুরী নিয়ে শিল্পের সীমানা নির্দেশ করা যায়। নটরাজের সৃষ্টি সামনে ঝড়ালে এর গতি কত তীব্র নির্ঘন অস্বত্ব করা যায়। ইতিপূর্বে যে দেখের ভঙ্গিমার কথা বলেছি—এ সেই ভঙ্গিমাই পরিচয়। কিন্তু সবটা সামগ্র্যের সীমারীত বিকাশ—তাই এর সূত্যাছন্দ, গতি সব বস্তুর অঙ্গত থেকে গুঁজে বার করা যেতে পারে। এই সূত্যাছন্দের বিকাশ সব বস্তুতেই সম্ভব হতে পারে, সূত্যান্ধাট—জীবনে, যন্ত্রে নৃত্য হয়ে উঠতে পারে যদি তা আসে বিশেষরূপে। ডক্টর আনন্দকুমার স্বামী "মতে a work of art is great in so far as it expresses its own theme in a form at once rhythmic and passionate : through a definite pattern it must express 'a motif deeply felt.'"

আধুনিক তামিল সাহিত্যের ভূমিকা

মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

সমগ্র মাত্ৰাধ প্রবেশে যে চারটি প্রধান ভাষা প্রচলিত, তামিল তার মধ্যে একটি। প্রবেশের বক্ষিপথের কয়েকটি মেলা নিয়ে তামিলনাথ এবং এই অঞ্চলের দু'কোটি অধিবাসীর মাতৃভাষা তামিল। তাছাড়া শিংলেসেরও কতকংশে এই ভাষার প্রচলন আছে। তামিল একটি অদ্রুত ভাষা, এটি এমন এক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, উত্তর ভারতীয় কোন ভাষার সংগেই যার কিছুমাত্র মিল নেই। এটি হচ্ছে প্রাচীনতম আবিষ্কৃত ভাষা।

তামিল এমন এক সভ্যতার বাহন যার প্রাচীনত্ব আর্থ সভ্যতার চেয়েও প্রাচীনতর, কারণেই এই ভাষার ধারাবাহিক ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট। বিশ্বসভ্যতার স্খাপেক্ষা প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে এই একটিমাত্র ভাষা যা আজো পূর্ণভাবে জীবিত এবং অব্যাহত গতিতে সৃষ্টি করে চলছে সাহিত্য। সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি ভাষার মতো মৃত বা 'ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ'-এর পর্যায়ে এ পড়েনি। আজো বেশি ও বিদেশী পণ্ডিত ও পবেষক এই সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীনতম গ্রীক, হিব্রু, রোমান ও আরবীয় সভ্যতার সঙ্গে সংযোগের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছেন। স্তম্ভগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও তামিল ভাষা বিশ্ব সাহিত্যের ঋতিশ্রের ধারী আনতে পারে। তামিল সাহিত্যের মহাকবি কামবান দ্ব্যন্তের মতোই বিরাট। এর সাহিত্যের শৈব ও বৈষ্ণব মতাবাদের নিষ্ঠিক কবিতা শুভির উচ্চাঙ্গে এবং গীতিকাব্যের উৎকর্ষে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই সাহিত্যের সর্বপ্রথম প্রাচীন কবি হলেন তিরু বাল্লবর। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য প্রতিভার সঙ্গে বহুদিন থেকেই সমগ্র ভারতবর্ষেই তিনি সম্মানিত হয়ে আসছেন এবং তাঁর নাম এই সাহিত্যের সঙ্গে সংযোজিত হওয়ার তামিল কাব্যের স্থান ভারতীয় সাহিত্যের শীর্ষদেশে হওয়া সম্ভব হয়েছে যা বক্ষিপ ভারতের অজ্ঞাত সাহিত্যের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। তাঁর রচনাধর্মী মধ্যে যে প্রগাঢ় জ্ঞান ও প্রতিভার পরিচয়

পাওয়া যায় তা সত্যিই অপূর্ব এবং অনন্যসাধারণ। তাঁর একটি কবিতা নীচে দিচ্ছি : কবিতাটি ডাঃ শনিভূষণ দাশগুপ্ত অনুবাদ করেছেন :

ছুইতি চাহনি নয়নে তাহার,—

কাল-নয়না বাল্য,—

একটি সে বেগ—বিধু বেহনা,—

অপরে নিত্যর আল্য।

মোর পানে ঐষি বাক্যে রাখিস,

চাহিয়া নোয়ালা মাথা—

দিক্‌পুত তাহে প্রেম—অজুতের উপাত্ত ছুটি পাতা।

চাহি তার পানে, চাহে ধরা পানে,

কিরাইয়া নিলে ঐষি,—

সরমে মধুর হাসে বৃহৎ বাসা মোর পানে চাহে থাকি।

নয়নে নয়নে যদি কথা হয়—

বুধি নয়নের বাণী,

অবশ্যের ভাষা কি কথা কহিব—

নীহনে সে থাক রাণী !”

তামিল সাহিত্যের গৌরবময় ইতিহাসের সম্মান প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন যুগেরই প্রাপ্য। তামিল ভাষা এবং সাহিত্যের প্রাচীনতা তামিলনাথের নিঃসন্দেহে গৌরবের বস্তু। সেদিক থেকে সমগ্র ভারতই এই বিরাট ঐতিহ্য এবং গৌরবের অংশীদার বলে দাবী করতে পারে। ভারতের অজ্ঞাত ভাষা এবং সাহিত্যের মধ্যে তামিল সাহিত্যও আজ এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সম্মুখীন হয়েছে। আধুনিক সভ্যতার উপযোগী হয়ে এ-ভাষা যদি নিম্নে পড়ে তুলতে না পারে, তাহলে অজিওই এই প্রাচীনতম ভাষা মৃত হয়ে যাবে। সমস্ত ভারতীয় ভাষার সম্মুখেই আজ এই একই সমস্যার উদ্ভব হলো তামিল সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটি জীবন-মরণের সমস্যা।

আত্মত্বের বিষয় এই যে, তামিল সাহিত্যে 'বৈদেশিক' হস্তক্ষেপ হইতে তিন শতাব্দী আগে। সেই সময় ইউরোপ থেকে বিদেশী সভ্যতার আগমনে তার সংস্কৃত তামিলনাথের সভ্যতা, ধর্মমত এবং সাহিত্যের সংস্পর্শ ঘটে। বস্তুত: স্প্যানিশ মিশনের 'কারার তামিলসংস্কৃত' ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম তামিল ভাষার ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখানা অস্বাভাবিক ভারতীয় সাহিত্যের মতোই তামিলের গল্প-সাহিত্যের সূচনা করে। সেখান থেকে এই ঘটনাকে যুগান্তকারী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যদিও প্রাচীন তামিল ব্যাকরণ থেকে এ প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায় যে, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পূর্বেও গল্পের প্রচলন ছিল, তবু পূর্বে কখনই তার এমন ব্যাপকভাবে চর্চা হয়নি। লেখকরাই ছাপাখানা সৃষ্টি করে গল্প সাহিত্যের পত্তন করেন, যেমন ত্রিহানপুর ছাপাখানা প্রবর্তনের পর কোর্ট উইলিয়াম কলেজের দুই বাংলা গল্প সাহিত্যের জন্ম।

হেয়ারেড হার্ট ডি. নোবিলি (১৮০৮—১৮৪০) ভারতীয় নাম গ্রহণ করে হলেন ধান্ডা বোম্বাখাও, এবং তামিল গল্প সাহিত্যে করলেন নতুন আদান। সাহিত্যের তিনি প্রথম গল্প রচয়িতা। কারার বেসুচিও (১৮৮০—১৯৪২) এই রকম ভারতীয় ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করে তামিল সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ হন। তিনি 'বিরাট মূনি' ছদ্মনামেই সাধারণত পরিচিত। তিনি তামিল সাহিত্যের ক্ষেত্রে গল্প ও গল্প রচনার সুদৃঢ় করে তোলেন। তিনি একটি নতুন ধরনের ব্যাকরণ, তত্ত্ব-বিশাঙ্ক গল্প রচনাবলী এবং পোস্তবিশ্ব-এর ত্রিকার অব অরেকসিড-এর অঙ্কুরণে তামিল ভাষার চমৎকার এক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এরপর পদবর্তী পাকাত্য মিশনারীগণ মানসিক দিয়ে এই ভাষাকে বিশ্বগ্রাহ্য এবং গৃহস্থান করে তোলেন। ডাঃ ক্যারোট প্রথম জ্যামিতি, ডাঃ এম. এক. প্রথম দর্শন, সার্গারী ও জ্যোতিষবিজ্ঞান তামিল ভাষায় রূপান্তরিত করেন। ১৮৩১ সালে এই মিশনারীদের পরিচালনামতেই 'তামিল' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ঘটলো। রেনেসাঁর সূচনা ঘটলো মিশনারীদের আমলে, বলে এই কথাই প্রমাণিত হলো, যে যেকোনো

সংস্কৃতি বৈদেশিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে না এলে উন্নতি-লাভে অসমর্থ হয়। এ কথার প্রমাণ আমরা তেজস্ক্রিয় সাহিত্যেই পেয়েছি যে যথেষ্ট সম্পদ ও সম্ভাবনা থাকে। সংস্কৃত বিদেশী সংস্কৃতির মিত্র সংস্পর্শে না আসায় তার যথোচিত প্রচার না ঘটে কেবলমাত্র প্রাথমিক ভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো, মিশনারীগণ খৃষ্টধর্ম বিস্তারে ও হিন্দুধর্মের ধর্মান্তরিত করার কাজেই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন, ফলে হিন্দুধর্ম উত্তরণের দৃষ্টে সক্ষম হয়ে উঠেছে। আর সেই জন্যই মিশনারীদের যথেষ্ট সাধু উদ্ভেদ থাকে। সংস্কৃত ও তা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

মিশনারীদের এই শ্রম কিছু পরিমাণে সাক্ষ্যলাভে সমর্থ হয়েছে। এবং তাকে আমরা ভালো কলই বলবো। তাঁদের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়েও ইউরোপীয় ভাবধারা গ্রহণ করে জনকয়েক ভারতীয় সাহিত্যিক এক নতুন আদর্শে সাহিত্য সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হন। এই সময় খাড়া ভারী মুসলিমরা সংস্কৃত 'পুস্তকতন্ত্র' তামিলে অনুবাদ করেন। তেহানী সফম গিল্লাই এবং এ. মাধবীরা উপক্ৰান্ত রচনার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ভাবধারাকে অনুসরণ করেন।

আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের রচনায় বেশি করে ছাপ পড়েছে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের। ভারতবর্ষের অস্বাভাবিক প্রাথমিক সাহিত্যের মতোই তামিল সাহিত্যেও রাষ্ট্রনীতি-মূলক সাহিত্যই বেশি প্রাধান্য লাভ করে। জন-মনে দোলা দিয়েছে। 'বৈদেশিকত্ব', 'দেশভক্ত', 'কবি' 'আনন্দভক্ত' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি এই ভাবধারার প্রেরণা প্রদান। স্বাভাবিকই আশঙ্কিত তামিল সাহিত্যে কাব্য অপেক্ষা গল্প রচনাই বহুল পরিমাণে বেড়ে চলেছে। এই সাহিত্যের নব উদ্বেগ, যা শতাব্দীর প্রথমে দেখা দেয়, তা আজ বিশিষ্ট কয়েকজন সাহিত্যরচয়ীর রচনায় মনোনিবেশিত হয়ে পড়তে শুরু করেছে। তামিল সাহিত্যের সব থেকে বড়ো ছদ্মনাম সাহিত্যিক হচ্ছেন ভি, ভি, এম, আরার, যিনি মৌলিক এবং অস্বাভাবিক সাহিত্য বীথ ও আত্মোৎসর্গের পটভূমিতেই রচনা করতে পক্ষপাতী। তামিল সাহিত্যে অস্বাভাবিক চেয়েও নামকরা সাহিত্যিক এবং মনীষী হলেন সুব্রহ্মণ্য ভারতী। ইনি

প্রধানত কবি। কিন্তু গল্প রচনাতেও যথেষ্ট ব্যাতিমান।
এর গল্প সাংবাদিকমূলক বলেই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাষার
সঙ্গে কৌতুকর সামিশ্রণ এর রচনাকে পাঠক মহলের
কৃষ্ণপ্রায়ী করেছে। এর সব চেয়ে বিখ্যাত উপভাষা হলো
‘প্রণবধম’। এই বইটির মধ্যে একটিকে যেমন স্নেহের
মতো ‘ভাষাপদ’ এবং গাভীর অস্তিত্বকে তেমনি আনাড়োল
মুণ্ডার মতো দৃষ্টিভঙ্গি হোয়াচ রয়েছে।

বর্তমান যুগ জনকণ্ঠের উচ্চাকাংক্ষী সাহিত্যিক ও
মনীষীদের দ্বারা নিঃসন্দেহে গর্ব অর্জন করতে পারে। যারা
রচনার যুগে তামিল সাহিত্যিকের সুবীজনগ্রাহ্য করেছিলেন
ঊষের মধ্যে কয়েকজন আজ পরলোক গত। সে যুগে
ঊষের সৃষ্টিমূলক রচনা আশ্চর্যের মতো অনবদ্য না হলেও
ঊষের মতো বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা যে এ বিষয়ে নবোন্নিবেশ
করে যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করে সাহিত্যকে উন্নত করে তোলায়
প্রেরণা দিয়েছিলেন তার দ্বারা আধুনিক তামিল সাহিত্য
ঊষের কাছে বিশেষভাবে ধনী। তামিলনাগের এইরকম
একজন সুযোগ্য সন্তান হলেন চক্রবর্তী বালাগোপালচাঁদী।
তার লেখনী ছোট গল্প, অথবা উপকথা, থেকে শুরু করে
পদার্থবিজ্ঞান পর্যন্ত গতিশীল। এর কয়েকটি ছোট গল্প
বাংলা সাহিত্যে অনূদিত হয়ে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন
করেছে।

এছাড়া ডাঃ টি. এল. এল. রাজন প্রাচীন গদ্যভাষার
অনুবরণে সাহিত্য রচনা করছেন। তাঁর রচিত আত্ম-
জীবনী ‘কালাই মঙ্গল’ তামিল সাহিত্যে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ
প্রচেষ্টা হিসেবেই গ্রহণ হয়েছে। কথাসাহিত্যিকবেশ
মধ্যে অথবা যে কয়েকজন বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন ঊষের
মধ্যে ‘পিচায়ুট’ জিমতী শুভাক্সিয়া, এবং এল. ভি. ভিই

প্রধান। শেখাক্ষরন ইংরেজী ভাষার সাহিত্য রচনার
ব্যর্থকাম হয়ে অবশেষে তামিল সাহিত্যেই ফিরে আসতে
বাধ্য হয়েছেন। এছাড়া, সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে পি,
জি, টি, কে, সি, এবং কে, এল, ভেংকটরমণের নাম
উল্লেখযোগ্য।

তামিল সাহিত্যে কাব্যের স্থান অত্যন্ত সংকুচিত।
কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তামিল সাহিত্য অত্যন্ত ধনী,
তবু যে কয়েকজন সৃষ্টিমূলক কবি আছেন তাঁদের মধ্যে
জিমতী টি, বিশ্বম্ভরস্বামী স্বরণযোগ্য। এখানে তাঁর
একটি কবিতা উদ্ধৃত করে এই মতো প্রবন্ধ শেষ করছি :

“আমাদের স্মরণীয় বস্তুদের উত্থাপ

আলো নিতল হয় নি।

এ প্রেম কি মধু-চক্রিয়ার মধুস্রব ?

না, কি সুই-কপির পূর্ণ বিকাশ ?

আমাদের প্রেম মনেই পরিপূর্ণ হলো।

আমাদের বস্তুদের স্মরণই কি

বিজ্ঞানের তেজোময় দীপ্তি ?

কিংবা, চূর্ণোজ আলোক রেখা ?

কেটে গেছে দিন, ছোট হয়ে নিম্নর মতো।

এ সবই কি মরনের আভি ?

তবে কি আমাদের যুগ

বিনেব ক্ষীণতম স্মৃতি ?

এ সব কি আমাদের সারা জীবনের

প্রেমের সুগন্ধীময় বাস ?

তবে কি এদ্য উজ্জ্বলনয়

ক্সেরা বহো চক্রকিরণের মতো

গভীর প্রেমের নিবর্ধন !

উষ্ণ

খ্রীপকানন চট্টোপাধ্যায়

চারেব ঘল টপ্পু করে ফুটছিলো।

ইঞ্চিটোরে বেহ এদিয়ে ঘিরে শীতের সকালের মিষ্টি বোকাটুই উপভোগ করছিলো শশাঙ্ক। হাতে খৎখৎ কাগজ থাকলেও সেহিকে ভার দুষ্টি নেই। চোখ দুটো মেলে ধরেছে সে সমুখে। সেখানে কাঁকা মাঠে পোঁটাকতক পোঁটু চরছে আর বড়ো পুকুরটার এই কনুকে শীতেও ঝেলেচো ঝেলেছে জাল। পুকুর পাড়ের লামগাছটিতে এইমাত্র একটা টিরা এসে বসেছিলো। শশাঙ্ক দুষ্টিবাসে বিহ্বল হওয়ার ভয়েই সে গেল উড়ে।

কিন্তু শশাঙ্ক কি পানীটার দিকেই চেয়েছিলো ?

সে প্রশ্নের উত্তর বেওয়া কঠিন। সে কোন দিকে চেয়ে আছে অথবা কোনদিকেই চেয়ে নেই সে সমস্তার সন্ধান করা অপর্ণার কৰ্ম নয়। তবু চারের কাপে ছপ ঢালতে ঢালতে সে একবার বললে, কি সো, শুনতে পেলো ?

—হু—সংশ্লিষ্ট উত্তর জেলা শশাঙ্কের মুখ থেকে।

—কি ভাবছো বলো তো ?—কৌতুহলী অপর্ণা প্রশ্ন করলে।

তেননি শূন্য দুষ্টিতে চেয়েই বললে শশাঙ্ক, কই কিছু ভাবিনি তো।

—তবে অমন করে চেয়ে আছো যে ?

—চেয়ে থাকো আর ভাবো কি এক ভিনিষ নাকি ?—

শশাঙ্ক সম্মুখে হেসে উঠলো।

—আমি না আমি। বুদ্ধ একটা স্বভাব ঘিরে বললে অপর্ণা। চারের পেয়ালো ঠুক করে পাশের টিপের ওপরে রেখে মুখ কিরিয়ে সে বললে, পেয়ালোটা ঠুক করে পাশের টিপের ওপরে রেখে মুখ কিরিয়ে সে বললে, চট্ট বেবে গীতিনা। স্বস্তা পারো বলে বলে ভাবো এখার। আমি ঝাংতে চললুম।

অপর্ণার অভিমান হয়েছে সে কথা শশাঙ্কের মুখেতে কষ্ট হল না। প্রকৃতি রবিবারেই তারা এই সময়টার বলে একটু

সরলভব করে। এই সময়টি যাত্রা ঘিনের একটুখানি সময় তারা আনন্দে কাটার প্রতি সম্মত। কিন্তু সে আনন্দে আজ বাধা পড়ে গেল।

তবু শশাঙ্ক একবার অপর্ণাকে ডাকলে, শোন শোন, এখনই বাতায় ঘরে যেতে হবে না। রাঁধবার সময় বধেই আছে।

—হ্যাঁ, সময় বধেই আছে।—আর একবার স্বভাব ঘিরে উঠলো অপর্ণা, শীতের বেলা যেখানে যেখানে গড়িয়ে থাকে। বাতায়-বাওয়া সাহসে বাধ্যবে দুটো। তারপরে একটু শোওয়াও সময় পাবো না।

—রোজই তো শোও। কথাটা বললে বটে শশাঙ্ক কিন্তু সে যেন আবার চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

তার সেই ভাব অপর্ণার দুষ্টি এড়াল না। বদ্বন্দে যুখে সে বললে, বেশ করি শুই। সাবাহিন গাথার মত কথা আর একটু শুনেই কথা শুনতে হবে ?

—তোমার আজ হয়েছে কি ?—মুহূর্তে শশাঙ্ক মুখ ফেরালো অপর্ণার দিকে।

—আমার কিছুই হয়নি। খার হয়েছে শাবা সকালটা সে মুখ সোঁক করে বলে আছে—বলেই ছুঁ ছুঁ করে পা ফেলে চলে গেলো অপর্ণা।

শশাঙ্ক আর কিছু বলবার সময় পেলো না। বোধ করি বলবার কিছু ছিলো না। সে আবার নিশ্চিন্ত হয়ে পড়লো তার দুই চোখের দুষ্টি সম্মুখে উত্তত করে। বেখামে বিচরণশীল গোত্রজন্মের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। মেসেরা আগুে আগুে জাল গুটিয়ে নিচ্ছে। গাছের ডালটা কাঁকা, টিরাপানীটা আর আসেনি।

অবশ্য এই সমস্তই শশাঙ্কের দৃষ্টিবিহীনত বস্তু। সামনে চেয়ে থাকলেও তার দুষ্টি পিছনের দিকে। অতীতের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে সে চোঁটা করছে স্মৃতির দীপনিবাটি আলিয়ে ছুঁতে।

---নিবিড় নিষ্কিন্ন অন্ধকার।

সেই অন্ধকারে সবই হারিয়ে গিয়েছিলো। বিশ্বস্তির কালো সেই পর্দাখানা অপর্ণাই আঁখি সরিয়ে বিয়েছে অকস্মাৎ।

সবে শশাঙ্ক এসে বলেছে আরাম করে ইঞ্জিনেরাখানায়। চোখ থেকে তখনো ঘুমের আনন্দে কঁটেরনি। চায়ের দগ চাপিয়ে অপর্ণা বললে, শুনেছ রাধারাণীর কথা!

নিমিষের মধ্যে শশাঙ্কের মনটা যেন তড়িত্তাহত হল। ধানিক আনন্দা—ধানিক কৌতুহল নিয়ে সে বললে, রাধারাণী?

মনে তখন আরও হয়েছে স্মৃতির সমুদ্র মন্থন।

অপর্ণা বললে, এতদিন পরে সে গলায় ধড়ি দিয়ে মরেছে।

—গলায় ধড়ি?—নিজের অজ্ঞাতমারেই শশাঙ্ক নিউয়ে উঠলো একবার। অপর্ণা তখনো বলছে, কতো কীত্তিই করলে। শেষে মরবার সময়ও একটা কেসেলারী করে গেল। গলায় ধড়ি তো আগে বিলেই হত।

অপর্ণার মুক্তি শশাঙ্ক সমর্থন করতে পারলে না। নিবিড় অন্ধকারের গর্ভে সহসা সে যেন তুলিয়ে গেল একটি উজ্জল বিদ্যুৎ শিখার আবেশে।

—কি চলাচলিই না করলে।—অপর্ণা পদ্মপঙ্ক কহছিলো আপন মনে, আত্মহত্যা'ই যদি করবি তো আগেই করসি না কেন কাশানুখী? তাহলে বেশগুচ্ছ লোক তো হি হি করতে পার তো না, চারদিকে চি চি হত না। এ যে প্রাণও গেল আর মানও গেল।

বকুতে বকুতে হঠাৎ যোগ হয় খেগাল হল, শশাঙ্ক তার কথা শুনেছে না। পতী'র চিন্তার সে আচ্ছন্ন।

—কি গো, রাধারাণীর গলায় ধড়ি বেওয়ার কথা তুমি ছুঁমি যে একেবারে বোঝা হয়ে গেলে?—অপর্ণা তৎক্ষণেই বললে কথাগুলো।

কিন্তু শশাঙ্ক তার স্নেহকে আমল দিলো বলে মনে হল না। শুধু দুই কণ্ঠে বললে, কি যে বলো?

ভাবগর অপর্ণা অনেক চেষ্টা করেছে তার যান তাক্তাব; মিষ্ট হাসি, চুড়ির স্নানস্নান, অল্প প্রসঙ্গের অবতারণা, বাগ, অভ্যমান কোন কিছুতেই সে শশাঙ্ককে বারোণ করতে পারে

নি। অবশেষে করেছে সবোপে প্রস্থান। শশাঙ্ক অপরাধিতই হয়ে গেছে। অপর্ণার নমস্ত আকর্ষণই ব্যর্থ। যে সত্য সত্যই অপর্ণার ব্যর্থ সে সামরিক ভাবে হয়ে পড়লো উপেক্ষার বস্ত। দুই হাসলে শশাঙ্ক। এমন ঘটনা তার জীবনে আগেও ঘটেছে।

অর্থ অপর্ণাকে যোগ বেওয়ার কিছু নেই। সে আর রাধারাণী একই প্রাণের মেয়ে। রাধারাণীর প্রসঙ্গে যে সময় মন্থন সে প্রকাশ করেছে, তার মত যে কোন মেয়েই সেই জাতীয় মন্থন করতে বিরত হত না যদি তার পিছির থাকতো রাধারাণীর জীবনের ঘটনাত্তির সঙ্গে।

একমাত্র সেই মেয়েই রাধারাণীকে সখানুভূতি বা সমবেদনা জানাবে যে তার মত অতুই নিয়ে করেছে।

একটা বীর্ণনিশাণ ফেললে শশাঙ্ক।

—তোমরা পুরুষেরা তো অনেক কিছুই কলে শশাঙ্ক, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে কাজের কোন সম্মতি আমি বুঝে পেলুম না। কতো সমস্তার সমাধান করবার চেষ্টা করলে। তোমাদের কোনও কথা কেবল আমার হেসে মরি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হল বলতে পারো? “পর্বা'তর মূর্খিক প্রদণ” বলে একটা কথা আছে। তোমাদের কথা আর কাজের সঙ্গে এই উপমাটা চন্দকায় খাটে।

—কেন বল বেধি?—সেদিনও ধবের কাগজ পড়তে পড়তে শশাঙ্ক একনুটে চেয়ে বেখেছিলো। সামনে—যেখানে ঠাঁড়িয়েছিলো রাধারাণী।

তার জীবনে তখনো অপর্ণা আবির্ভাব হয় নি।

বালবিধবা রাধারাণী সমুদ্রে ঠাঁড়িয়ে উদ্ধত যৌবন নিয়ে। নিরাত্তর বৈবধ্য তার যৌবনখিকে বৈবধ্যগায় রিক্ততার সেধিন মহিমাঘিষ্ট করতে পারেনি। ত্যাগ ও নিষ্ঠাকে বিজয় করে সেধিন তার যৌবন শুধু যে দুর্ধার হয়ে উঠেছিলো তাই নয় তার বিকে চেয়ে শশাঙ্কের মনে ছিলো, এই যৌবনই সত্য। অন্তঃপ্রাণের ও অর্ধহীন ত্যাগের অভিমানকে এই যৌবন তাসিয়ে নিয়ে যাক।

আমো সে জানেনা, সেধিন কেন সে একথা বেখেছিলো। কিন্তু তার অতঃকরে সোণন কথাটি যে একদিন সত্য হয়ে উঠবে, তাম্ব বিনুমায়ে গারগা করবার শক্তি যদি

ধাকতো তাহলে সনস্ত অস্ত্র বিয়ে বিপরীত কখনাই কি
সে করত না ?

কে জানতো তা, একটা আসন্ন সর্বনাশ দেখিন রাধা-
বানীর ভক্ত প্রতীক্ষা করছিলেন।

বিগাতা তাকে রূপ দিয়েছিলেন। যে সংসারে সে
জন্মেছিল সেখানে ঐশ্বর্যের বাহুল্য না থাকলেও সম্বলতার
অভাব ছিলোনা। তাহের পরিপাটিও ছিলো পাড়ার মধ্যে
বিশিষ্ট। কিন্তু রাধাবানীর ভাবাবেদতা শুধু যে তাকেই
নির্মম পরিহাসে আলিয়ে পুড়িয়ে মারলেন তা নয়, তাহের
পরিবারকেও রেহাই দিলেন না।

কি বিরাক্ত পরিবেশের সৃষ্টিই না হয় ? একটা কাল-
নামিনীর বিব-নিবাসে চারিধিকের আবহাওয়া দূষিত হয়ে
উঠলো। সেই পরিমণ্ডলের মধ্যে বাসা ছিলো তারা সকলেই
জর্জরিত হয়ে গিয়েছিলো কালকূটে।

—আমাদের নিয়ে তোমরা খেলা করো শব্দবা,
তাই না ?

—কে বললে ?—ধবধব কাগজ মূড় রেখে উঠে
বসেছিলো শশাঙ্ক।

—কে আবার বদলে ?—মুচকি হেসে বলেছিলো
রাধাবানী, অঃনিই বলছি।

—বদলার স্বাধীনতা থাকলে মানুষ যা তা বলতে পারে।
কিন্তু যাই বলো না কেন, তার পিছনে যুক্তি থাক। চাই—
কৃত্ত হয়ে উত্তর দিয়েছিলো শশাঙ্ক।

অপকল্প হানি হেসে রাধাবানী বলেছিলো, যতো যুক্তি
সব তো তোমাদের একচেটে। তোমরা যা করো তাই
সাজে। তোমাদের সমালোচনা করবারও অধিকার নেই।
করলেই হাসে একেবারে ফুলে উঠবে।

—উঠবে বৈকি। বাগ করবার সময় কাবণ থাকলে
রাগ করবো না কেন ?

—সেইজন্তাই তো বলছি, তোমাদের যুক্তিও তোমাদের
তৈরী। আমাদের কাছে ওগুলোর কোন অর্থ নেই।
আমরা তো তোমাদের মত অতটা এগোতে পারিনি
শশাঙ্কবা।

—পারোনি তা বুঝতেই পারছি—আবার ধবধব
কাগজে মন দিয়েছিলো শশাঙ্ক। কিন্তু বাধা পেয়ে।

রাধাবানী বলেছিলো, কাগজ না হয় পরেই পড়তে।

—তাতে কি বিশেষ কিছু লাভ হবে ?

—হবে বৈকি।

—বেশ, তাহলে এই তাৎপৰ্য—মত। সত্যই শশাঙ্ক
কাগজখানা পাশে বেবে দিয়েছিলো।

—কি লাভ হবে, বলো ?

—বলি।—রাধাবানীর আয়ত্ত চোখ দুটির গভীরে
কণিকের জন্ত ঘেন্না বিদ্যুৎ ঝিকমিক করে উঠেছিলো।
পরিহাস বিকল্পিত কর্তে নেমেছিলো গাভীর, বিভাগ্যগর
মশায়ের আমলে তোমরা বিংবাধের বিয়ে দেওয়ার
আশ্বোপন সূত্র করেছিলো না ?

অকাল বৈধব্য যে বার্ষ রূপরামিকে পীড়িত করে
নির্মম নিয়তির মত মৃত হয়ে উঠেছিলো তার বিক্রম,
শশাঙ্কের স্তম্ভিত চুটির সম্মুখে অটহাত্তে ত বেন এখনো
প্রতিক্রান্ত হচ্ছে।

আয়গণ্যবরণ করে সে বলেছিলো, বিভাগ্যগর মশায়
নিজেই সেই আশ্বোপনের স্রষ্টা। কিন্তু ও কথা কেন
রাখ ? ও আলোচনা থাক।

—কেন থাকবে শশাঙ্ক বা ?

একটু ইতস্ততঃ করে বলেছিলো শশাঙ্ক, তোমার
অবুজের কথা এখানে তুলছি না। কিন্তু যে পরিবেশের
মধ্যে তোমার বিন কাটে সেখানে এই আতীর আলোচনা
অচল। তোমার পক্ষে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিষেকে
খাপ খাইয়ে নেওয়ার চিন্তা করাই বোধ হয় ভালো।

হঠাৎ সেখানে একটা বোমা কাটলে শশাঙ্ক বোধ করি
এতখানি স্তম্ভিত হত না। রাধাবানীর মূর্তি ঘেঁষে সে
চমকে উঠেছিলো। দলিতা “কদিনী” বলে একটা কথা
আছে। কিন্তু সেও সম্ভবত এত ভয়ঙ্করী নয়।

পূরীভূত আক্রোশে যেন খেঁচি অতুলনীর রূপরামি
উভাল হয়ে উঠেছে, শশাঙ্ক এই দুহুর্ভেদে যেন সেই বৃত্ত
ঘেঁষতে পাচ্ছে।

—এই কি বিপ্লবী শশাঙ্ক মোহনের বাণী নাকি ? যিনি
জীবনপণ করেছেন দেশের স্বাধীনতার জন্তে ? ধীর বড়ো
বড়ো কথা শুনে সভ্যমণ্ডলে ভনতো স্তম্ভিত হয়ে যার ?

রাধাবানীর হিকে আর চেয়ে থাকতে পারেনি শশাঙ্ক।

মুখখানা নাখিয়ে নিয়ে যাবের মেয়েই অভিযোজন সহকারে
কি যেন দেখছিলো তখন। কিন্তু বাগাবানীকে সেদিন
শান্ত করা যায়নি।

—কোন পানিপানিক অবস্থার সঙ্গে বাপ খাইয়ে
মিতে বলছো শশাঙ্ক? যেখানে বিশ্বাসের মত পকখান,
শীতাপাত আর হবিষ্যাহার ব্যবস্থা আছে, সেইখানেই তো
বাস করছি। তাহলে আর বাপ খাইয়ে নেওয়ার কথা
উঠছে কেন?

—সেখানে বাস করে ওই সমস্ত আলোচনা করা চলে
না।

তার কথা শুনে বাগাবানীই যে কি উজ্জ্বলিত হাসি। সেই
হাসি শশাঙ্কর কানে এখনো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। হাসতে
হাসতে সে বলেছিলো, একটা কথা বলি, ইংরেজ সরকার
তোমাকে দিয়ে তো মেলখানায় যানি পূর্ব্ব টানালো;
কিন্তু তুমি কি প্রচলিত শাসনব্যবস্থাকে যেনে মিতে
পেয়েছো?

বাগাবানীর একবার কোন উত্তর শশাঙ্ক দিতে পারেনি
সুখ শুভ হয়ে বসে শুভছিলো ব্যাকুলিত। সে বলেছিলো,
বিবহার বিয়ে দিলে, পণপ্রথা নিবারণ করলে, মেয়েদের
স্বাধীন করলে, কতো কি না তোমরা করেছে। কিন্তু
তোমাদের সমস্ত চেষ্টার ফল আজ কি চোখের সামনে
তোমরা দেখতে পাচ্ছে না? আজকালকার দিনে কটা
বিবহার বিয়ে হয়? ক'জন ছেলে বিনা পণে বিয়ে করে? কটা
মেয়েকে স্বাধীন করতে পেয়েছে তোমরা? তোমরা নাকি
অনেক এগিয়ে গেছো কিন্তু সমাজের দ্বারা কি এতটাই
বলেছে শশাঙ্ক বা?

—আমার একটু কাজ আছে বাপু—অল্পটুকু করতে
শশাঙ্ক বলেছিলো।

তাতো থাকবেই।—আর একবার অষ্টাহার করেছিলো
বাগাবানী, তোমার মত বিদ্রোহীরা কাজ থাকবে না তো
কি থাকবে আমার মত একটা বাল-বিবাহ? বাপের
মনের ভিতরে হাট হাট করে আগুন জ্বললেও তাকে ছাই
চাপা দিয়ে রাখতে হয় শুধু পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে
বাঁপ খাইয়ে নেওয়ার ভয় তাই? ও, কি অসংসারশূন্য
তোমরা? তোমাদের যুগ করতেও লজ্জা হয়।

আজকের অপরাধ মত পেশিন বাগাবানীও ছুঁ ছুঁ করে
চলে গিয়েছিলো।

মুখখানা কালো করে বসেছিলো শশাঙ্ক।

“তোমাদের যুগ করতেও লজ্জা হয়।”

সংগ্রহীত মুখ নিয়ে কথাগুলো বঁধে গিয়েছিলো শশাঙ্কের
মুখে। সে বিদ্রোহ করতেও চেয়েছিলো যোগ হয়।

কিন্তু কোথায় বিদ্রোহ করবে? বাগাবানীর বাবা মনি-
শক্তির বিরুদ্ধে গাঁড়ানোর কথা সে করনা করতেও
পারতো না।

তিনি ছিলেন তার শ্রদ্ধা পাওয়া। তাঁকে সে কাঁকা
বলে ডাকতো। কোন সম্বন্ধ না থাকলেও তিনি মতা
মতাই ছিলেন যেন তার গুরুজন। তাঁর উপদেশ না নিয়ে
শশাঙ্ক কোন কাজ করতে না। এমন কি তার বিপ্লবী
জীবনেরও প্রেরণার উৎস ছিলেন তিনি।

তাঁর মনে কি আঘাত বেওয়া হয়?

প্রাচীন রীতি নীতির প্রতি দাঁতবদ্ধতার আয়া
অসাধারণ। নিষ্ঠাবান ধর্মিক পুরুষ। আত্মীয় শুদ্ধাচারী
নিরামিষ্ট কিন্তু স্বাধীন চেতা। অন্যায় তিনি সহ করতে
পারতেন না। ইংরেজি ও সংস্কৃতে এম,এ। বড়োবড়ো
সরকারী চাকুরী পেয়েছিলেন কিন্তু আচারবৈমত্যা দ্বারা
হওয়ার অশোভন এ জীবনে চাকুরীই করতেন না। অধ্যাপনা
করতেন অবলম্বন।

জীবনে আঘাতও পেয়েছেন অনেক। কিন্তু বিবিকার
জিতে সহ করেছেন সমস্ত। তাঁর অস্তঃকরণ শশাঙ্ক
দেখতে পারিনি, যেহেতু তীক্ষ্ণবৃত্তে আকৃতি ও প্রকৃতি।
পূর্ব্বতের মত অটল সেই গৌরবর্ষেই কোন পরিবর্তনই
নেই। তিন মেয়ে, তিনটিই বাল-বিবাহ। তিনজনের
অগ্রই অন্নানবধনে তিনি বিধান বিবেচন কর্তার কৃষ্ণ
সাধারণ। তাইবের অবস্থায় মত শশাঙ্ক তাঁকে একটি দিনও
আক্শেপ করতে শোনেনি। অপর যখন মনঃকেন্দ্র
প্রকাশ করতে এসেছে তখন দুই ঘণ্টা বলেছেন, কি আর
করা হবে। নিশির বিধান! ও সব নিয়ম কাছন বড়ো
জরুরী। আমরা বুঝতে পারি না।

শশাঙ্ক একবার বলেছিলো, বা আমরা বুঝতে পারি না,
তাকে যেনে মেওয়ার কোন পর্ব্ব হয় কাঁকা?

—হয় বৈ কি—গভীর কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীর সব কিছু কি সৃষ্টি হিঁদে বৃথতে পারা যায়? যায় না। এমন অনেক সমস্যা হুঁত হুঁত, হুঁত বেখানে অচল। এইজন্য সরল বিশ্বাসে এই সব মেনে নেওয়াই ভালো। যিনি যতো বড়ো পণ্ডিতই হোন, সকলেরই জ্ঞান বুদ্ধির একটা সীমা আছে।

শশাঙ্ক জানে সেই সীমাব্যবধি তিনি বিশ্বাস করতেন, তাই নিজে কেমনদিনই পণ্ডিত বলে জাহির করতে চান নি। অথচ কি অপরিণীত পাণ্ডিত্যের অবিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর নির্ভর কোন ক'ক ছিলো না।

তাঁকে আশ্বস্ত করবার কথা মনে উদয় বলে সে নিজেই যেন আহত হত।

কিন্তু বাগ্যবাণী তার মাননে রচনা করে গেল একটা দুর্গাবর্ত।

সেই আবেঁই আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো।

হিন কতক পরে গভীর রাত্রিতে শশাঙ্ক কিয়েছিলো একটা গোপন সভা থেকে। নির্জন পথে সে চলছিলো ক্রমশঃ। বশিষ্ঠের বাড়ীর সামনে সান্ধি আসতে ভাত পা ছুটো যেন নিঃশব্দ অজ্ঞাতসারে গেল যেন।

সবর বড়ো শানিকটা কঁক করে ঝাঁড়িয়ে ছিলো বাগ্যবাণী। উজ্জল জ্যোৎস্নালোকে তার মুখখানা পরিকার বেগা হাঙ্গিলো।

সামনে জুঁই ফুলের গাছটা ফুলে ফুলে তরপুর। এত ফুল গাছ যেন আর ধরে রাখতে পারে না। বাগ্যবাণীর ঘোবনের নতই যেন তার সৌরভও হয়ে উঠেছিলো উজ্জ্বল।

সেই মুহূর্তে শশাঙ্ক কি আশ্চর্যবিশ্বস্ত হয়ে পড়েছিলো? কই মনে পড়ছে না। বরং একথা বেশ মনে আছে, সে কষ্টের কণ্ঠে প্রস্তাব রেখেছিলো, এত রাত্রিতে জুঁই ওখানে ঝাঁড়িয়ে কেন রে?

—তোমার জন্ত—জুঁই অথচ শশি উত্তর।

—আমার জন্ত? জুঁই কি করে জানদি আমি এত রাত্রিতে কিরবো?

—জানতুম।

—মিথ্যে কথা—বেশে উঠেছিলো শশাঙ্ক।

—মিথ্যে তোমরা বলে শশাঙ্ক বা। তোমাদের পুরুষ জাতি। চাক পিট্টে মিথ্যেকে সত্যি বলে জাহির করতে অবিশ্বাসী।

—তাই নাকি? কিন্তু তোমার কথা সত্যি বলে কি হবে বিশ্বাস করি? আমরা না হয় মিথ্যেবাদী অথচ আমার এই সময়ে ফেরার কথা আমি ছাড়া কেউ জানে না।

—আমি জানি। প্রমাণ চাও?

—চাই।

—তোমার ডায়েরীখানার আঙ্গকের তালিকার পাতায় লেখা আছে, “রাত্রি পাড়ে বশিষ্ঠের ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।” তোমার নতুন পুঁধানো সমস্ত ডায়েরীই ডাক্তারের বাড়ী গাওয়ার সাক্ষ্য দেয়। একটু সাবধানে খোঁজা শশাঙ্ক বা। ডাক্তারের সঙ্গে এত ঘন ঘন যোগাযোগ একটা রহস্যময় ব্যাপার। তোমার স্বাস্থ্য ভালোই। ডায়েরীগুলো পড়লে যে কোন মোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। দু'চারজন লোক তোমার বাড়ীর আসে পাসে খোঁজা করা করছে। তাই আমি ডায়েরীগুলো নিরে চলে এসেছি।

বিস্মিত হয়েছিলো শশাঙ্ক। তবু কি ভেবে বলেছিলো, জুঁই তাহলে আমার কাগজ পত্র সব চুঁচু করে দেখি?

—কুণ্ড কাগজপত্র? তোমার সব কিছু চুঁচু করবার অপেক্ষার আমি আছি,—বাগ্যবাণী মূখ টিপে হেসেছিলো।

—কাগজপত্র আর বানকতক বই ছাড়া আমার তো আর কিছু নেই তাহু। আর কি চুঁচু করবি?

—কেন, স্বরূপ?—কণাটা বলবার সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ বহু করে দিয়েছিলো বাগ্যবাণী। গুপ্তিত শশাঙ্ক চোখ চোরে আর প্রগল্ভতা তত্ত্বটিকে বেগতে পার নি।

বেগতে না পেয়ে বোম্ব হয় ভালোই হয়েছিলো। সেই সুরভিত অন্ধকারে অথও নির্জনতার একটা বিচিত্র শিখরণ তার মাথা ঘেঁষে বোমানকিত করে তুলছিলো।

অনেকক্ষণ পরে সে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো।

এর পথের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত।

উত্তম মস্তিষ্কে বাকী দ্বাত্রীত বিমিত্র কাটিয়ে তোলে
সবে একটু তপ্ততা এগেছিলো। এমন সময় কে যেন কোথা
থেকে বললে, পুলিশ।

চুকে উঠেছিলো শশাঙ্ক। জানালায় বাইরে লাল
পাগড়ার সমাহার।

বাইরে থেকে একজন অফিসার বলছিলেন, আসতে
পারি?

—পারেন বৈকি। সোজা চলে আসুন। এ অভিনয়
আর কেন?—চোখ দুটো রগড়াতে রগড়াতে শশাঙ্ক
বলেছিলো।

সাক্ষোপাঙ্গদের নিয়ে ঘরে ঢুকেই অফিসার বলে
উঠেছিলেন, ইস, চোখ দুটো। যে লাল হয়ে উঠেছে।
রাখিতে যুমানি নি?

—কুস্তুরের মত জ্ঞান শক্তি আপনাদের আছে তা জানি
কিন্তু আপনারা যে সাপের মত দৃষ্টিশক্তিরও অধিকারী সে
কথা আজ জানলুম। এখন কি করতে চান বনুন। বাড়ী
সার্চ না রেপ্তার?

—হুই-ই।—অফিসারের মুখ পত্তীর।

সার্চ করে কিছু পাওয়া যায় নি। ডায়েরীগুলো নিয়ে
বাওরার অস্ত্র বাধাবাধিকে মনে মনে বক্তব্য দিচ্ছেছিলো
শশাঙ্ক।

পুলিশের সঙ্গে বাওরার সময় মনিমন্ডরের বাড়ীর দিকে
একবার চোরে ধেবেছিলো সে। বাড়ীর সমস্ত স্বত্তা
জানালো বহু। তবু তার উৎসুক বুট্টি খেঁবেবে আশা হল।
অমলস জুলে পরিপূর্ণ হুই সাইটের পাশ দিয়ে বেতে যেতে
সে ভেবেছিলো, ভোবের তপ্ততা হারতো বাধাবাধীর চেতনা
হরণ করে নিয়েছে।

রাষ্ট্রনৈতিক-জাকাতের অভিযোগে শশাঙ্কের হু'বহর
খেল হয়ে গিয়েছিলো।

যখন সে ফিরলো তখন দেশ থেকে ইংরেজ বিরোধ
নিয়েছে। শশাঙ্কের মনের ভিতরেও ঘটে গেছে বিশৃঙ্খল
পরিবর্তন। সাম্প্রদায়িক হানাদ বস্ত্রসাত ভারতবর্ষ তার
অন্তরে অবগতরাপ করেছিলো এক নতুন প্রবর্তে।

বাড়ী ফিরে এখমেই সে ছুটেছিলো মনিমন্ডরবাড়ীর বাড়ী।

মনিমন্ডর নেই। এক জাতি জাত্য বাড়ীতে বাস
করছিলেন। তিনি দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কানী গেছেন।

—দুই মেয়ে?—শশাঙ্কের অন্তরে প্রচণ্ড কৌতুহল।

—হ্যাঁ, জাতি তাই বলছিলো, বড়ো আর মেঝো।

ছোটমেয়ে যে কীতি করলে।

শাসনরুদ্ধ করে শশাঙ্ক চেয়েছিলো তার দিকে। কোনো
রকমে সে বলতে পেয়েছিলো, কার কথা বলছেন,
রাগরাগার?

—হ্যাঁ, জাতিতাই দীর্ঘনিশ্বাস কেলে বলেছিলো,
হাংগে উঁচু মাথা হেঁট করে দিলে। কেবোকার
কাল-নাগিনী এসে ছুটলো, দশাংবটাই হয়ে গেল ছাদবার।
উত্তমজনার শশাঙ্কর সারাংহে কাঁপছিলো। জাতি তাই
তার অবস্থা লক্ষ্য করেছিলো কিনা জানিনা, তবে বেশ
রসিয়ে রসিয়ে বলেছিলো, আমার বলা উচিত নয়—সোকে
কথাভেই বলে জাতি শত্রু। তবে না বলেও পারি না।
সত্য গোপন কথা অর্থ।

শশাঙ্ক ক্রমেই অশ্রুণ হয়ে উঠেছিলো।

ভূমিকা শেষ হল। সে বলতে লাগলো, যখন ব্যাপেরটা
জানাজানি হয় তখন মেয়েটা না হতে চলেছে। আমরা
হাবাকে পরামর্শ দিগুন গোপনে একটা বাধবা করে
কেলতে। কিছু খণ্ডে কবলেই হয়ে যেত। কিন্তু তিনি
রাখী হলেন না। বললেন “ভ্রমহত্যা মহাপাপ।” এদিকে
মেয়েটাও বদলো বৈকে। সেও ওসব ব্যাপারে মত দিল
না। বললে “আনি বিয়ে করবো।”

—তারপর?

—তারপর আর কি? ও মেয়েকে বিয়ে করবে কে?
দেশে আজকাল আইবুড়া মেয়েদেরই বিয়ে হয় না।
ছেলের বাপেরা বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা চায়। পাটা বেগা
কারবার। মেয়েগুলো চাকরী খুঁজে হরণ হয়ে যাচ্ছে।
এই অবস্থার বিববার বিয়ে হওয়া সোজা কথা?

—যার সম্মান তার গর্ভে ছিলো তার সঙ্গেও তো বিয়ে
দেওয়া যেত?—শশাঙ্ক বলেছিলো।

জাতি তাই উত্তর দিয়েছিলো, বাধাবাধী চেয়েছিলো
তাই কিন্তু সে যার নাম করলে সে পাড়ার হীরের টুকরো
ছেলে। তার গন্ধে ভরকম কাঁপ কথা সত্তর নয়, এই

কথাই সকলে বললে। এবিকে দাবাও ঘোষাস্ত্রী হয়ে
গেলেন। মেয়েটার পক্ষ কেউ নিলে না। সকলে দিলে
চেঁটা কবলে হয়তো একটা কিছু করা যেত। কিন্তু কে
বাবে শুই নোংরা কাজে বাত দিতে?

চুড়তা ভগ্ন করে শয্যায় ভিজাসা করেছিলো, রাধাপ্রাণী
এখন কোথায় ভানেন?

করব হাসি হেসে উত্তর দিয়েছিলো জাতিভাই,
বাগানে, আর কোথায় তার আশ্রয় আছে?

উচ্চ বক্তৃতাতে শশাঙ্কের বেহে টগবগ্ন করে কুটছিলো।

• • • • •

চা খাওনি?

চমকে উঠলো শশাঙ্ক। চেয়ে দেখলে, অপর্যা এসে
দাঁড়িয়েছে। সে কিছু বলবার আগেই অপর্যা বলে উঠলো,
তোমার কি অন্নপ্ন করেছে নাকি? চোখ দুটো যে লাল
টকটক করেছে?

—বোধ হয় আর আসবে। বিছানাটা পেতে দাঁড়,
স্নায় পড়ি।—অপর্যাকে অবলম্বন করে উঠে দাঁড়ালো
শশাঙ্ক।

এখনো কি তার বেহেব ভক্তির উচ্চ বক্তৃতাতে টগবগ্ন
করে কুটছে?



এমন কিছু কঠিন নয়

ছোট ছেলের পক্ষেও সম্ভব যদি ঠিকমতো

বঁরিমে দেওয়া যায়



আপনার সম্বন্ধে
আপনার পুণ্যের কর্ম-জীবনের
সামান্য বিমোহভাবে
সূচিত হবে।



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪নং ব্লাইক থাট স্ট্রিট, কলিকাতা-১

শিক্ষায় বিপ্লব

শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, এম-এ, এল. ল. পি. এচ. ডি.

আজকাল শিক্ষার বিপ্লব চলিতেছে।

সকলেই—কি অজান্ততন্ত্র ছাত্রনেতা, কি স্বয়ংসিদ্ধ প্রমিত নেতা, কি বাস্তবিক বাস্তবিক নেতা, কি শিক্ষাজীবী অধ্যাপক—সকলেই বর্তমান শিক্ষার নিত্য পক্ষপাত। সকলেই এক কথা—ইহা স্বাধীনতার অঙ্গপযোগী, ইহাতে মাত্র তৈজস্বর হয় না, ইহাতে বীজিকার সংগ্রাম হয় না। সকলেই বহন বর্তমান শিক্ষার দমালোচনা করিবার শক্তি রাখেন, তখন সকলেই শিক্ষাবিদ। ফল আর বাধাই হউক, এই শিক্ষার উপর কাহাংয়ে প্রভা নেই, বিধান নাই। ছেলে মেয়েদের না পড়িয়া উপায় নাই, কাজেই তাহারা পড়ে—কিন্তু তেমন আগ্রহ নাই। আবার আনন্ডই আভ্যাস, ছেলে মেয়েরা তেমন পড়াশুনো করে না বলিয়া তাহাদের অপব্যব হইবে। যাকার কথা হইতেছে, বাহ্যিক এই শিক্ষার শিক্ষা করেন, তাহাৎই শিক্ষা, আবার শিক্ষা কি—এই বিষয়ে মুখ খুলিতে কঠিন দেখা যায়। অপর দিকে গভর্ণমেন্ট যেনেব বিশিষ্ট বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নিজে কমিশনের পর কমিশন গঠন করেন। তাহারা এই উপলক্ষে সার্বভৌম হুঁয়ি বেড়ান এবং পণ্ডিতগণের সভায় প্রবেশ করেন। তারপর বিরাট আকারে তাহারা যে রিপোর্ট দাখিল করেন, তাহা আর কেহ গড়িয়া দেখেন বলিয়া মনে হয় না। পড়িয়া দেখিলে, কমিশনের পর কমিশন নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইত না। গড়িলেই বলিতে পারিতেন, দেখ পর্যন্ত তাহাংয়ে বর্তমান শিক্ষার মুখে পাউডার মাখিয়াছেন যাত্র। এই বক্তন তুল কাইনাগে আগে বাহা বাহা পাঠ ছিল, এখনও তাহাই আছে। কেবল শিল্প শিক্ষার উপর বৃত্তিকারী শিক্ষার উপর একটু বিশেষ কোর দেওয়া হইয়াছে মাত্র। আরও যাকার ব্যাপার আছে। এই সমস্ত কমিশন এককাক্যে বর্তমান I. A., I. Sc. তুলে চালাইয়া দিবার কথা বলিয়াছেন এবং দশ বছরের আগার ১২ বছরে এই তুল কাইনাগে শেষ করিতে হইবে স্থাপাদিত করিয়াছেন

—কিন্তু সরকারী কঠিনিক তার উপর বৃত্তি বহন করিয়া তাহা এগার বছরে শেষ করিতে হইবে বলিয়া কতারা কহিয়াছেন। আর অল্পগণ আত্মা—আমাদের বলিবার কি আছে? আমাদের আবার কথা যদি বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে বাস্তবিক কমিশনের রিপোর্টের ১০১ পৃঃ বলিয়া দেখুন। সেইখানে আরো দেখিবেন, যে কোর্স এগার বছরে গণ্যকরণ করিতে হইবে বলিয়া হুঁয় হইয়াছে, যাকার বাস্তবিক কমিশন বার বছরে শেষ করিতে হইবে বলিয়া স্থাপাদিত করিয়াছিলেন, ইংলেতে তাহা শেষ বছরে শেষ করিতে হয়, আর আমেরিকায় ১৪ বছরে শেষ করিতে হয়। আমাদের ছেলেরা নিত্য বিবিধর করিবে।

বাউক, বিপ্লবের কথাই বলি। শিক্ষার বিপ্লবের আর এক প্রমাণ, শিক্ষাকে শিল্পবৃত্তি, বৃত্তিনুলক, বিজ্ঞান ভিত্তিক করিতে হইবে। মানুষ জীব; জৈববর্গ মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। প্রাণধারণ প্রাণী মাত্রেই প্রথম ও প্রধান চিন্তার বিষয়। তাই বলিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে অহুতর করিতে হইবে এমন কি কথা আছে? না সব্বতীকে লক্ষ্য পেরা বাড়ি করিয়া বেড়াইতে হইবে, এইটাই কি কাম্য কথা? বাউক, এই বিষয়ে সময় পাইলে আর একদিন আলোচনা করা যাইবে। এখন উক্ত শিক্ষা সিকার তুলিয়া চাববার কথা বাউক, ছাত্রদের কাজ, কামারের কাজ, রামমিতির কাজ দেখা বাউক। শিক্ষাবিদেরা বেশে চাবী মজুতের চাব কর্তন—বিশ্বসংসারে ভারত স্রাবার শ্রেষ্ঠমান লাভ করিবে। এইগুলি গাহারের পুস্ত্যাত্মকিক কাত বাবসা—তাহারা বাইতে পার কি? কাহাকে প্রাণ করিতেছি।

শিক্ষার বিপ্লব যে চলিতেছে, আরও প্রমাণ আছে। এক তুল সকল করিয়া কি হইবে? বাপ, যে বাপ, এক বাউলা যেনেই সোয়া লাখ ছেলে মেয়ে তুল কাইনাগ

পরীক্ষা দেয়। গ্রামে গ্রামে স্কুল, সহস্রে সহস্রে এমন কি অল্প পাড়াগাঁয়েও কলেজ। এখনও আমাদের দেশে সেন্সাস (Census-এর) মার্ক:মাধ্যম যথাগণিতের সংখ্যা শত করা কুড়ি জন। তাহাতেই এত আশঙ্ক। বিশ্ব আলোচনা আর কহিলাম না। তবে ঘণ্টে তুল বুঝা না হয়, তার জন্য এতটুকু বলিয়া রাখি—আমি নিষ্ঠা শিক্ষা, বাস্তবিক শিক্ষার বিরোধী নহি। তৎসংস্কৃত মাধ্যম শিক্ষার চাহিয়া পূর্ণে কহিতে হইলে আরও স্কুল, কলেজের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

শিক্ষার বিস্তার আরও প্রদান আছে। ইংরাজকে তাড়াইয়াছে, ইংরেজীকেও তাড়াইতে হইবে। স্বাধীন ভারতে পরাধীনতার বুলি চলিবে না। মন্ত্রোচ্চনেও অস্ত্র আর কাহাকে বলে? আমাদের মত প্রাচীন ইংরেজী শিক্ষিত পণ্ডিতগণ যেমন ইংরেজীর মোহ কাটাতে পারি নাই! দুই তিন পেপারের ইংরেজীর পাঠ্যপুস্তক না হইলে আমাদের যেমন কৃষ্টি হয় না, সেইরূপ অধার অত্যাধুনিক স্বাধীন-ভারতীয় শিক্ষাবিৎ এই বিভাতীয় ভাষাকে একেবারে অর্জুচন্দ্র দিয়া বিলাস কহিতে চান। এই দুই মতই নাস্ত্রান্তিরিক্ত (extreme)। ইংরেজী আন্তর্জাতিক ভাষা। ইংরেজী না জানিলে অধুনিক জগতের উপযোগী জ্ঞান অধরণ করা দুঃসাধ্য। আমাদের পক্ষে জগৎ সংকীর্ণ হইয়া প্রায় ভারতের সীমায় আশ্রিত্য টেকে। কিন্তু তাই বলিয়া ইংরেজী ভাষা ভাল অমত কহিতে পারে না বলিয়া কোন ভারতবাসীর উচ্চতম শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হইবে কেন? অর্থাৎ ইংরেজী ভাল না জানিয়াও বি-এ এম-এ পাশ কহিতে পারে না? Composition নিষিদ্ধ হইত হইল। বাহ্যিক ইংরেজীতে বিশেষজ্ঞ হইতে চায়, সর্গভারতীয় পরীক্ষা দিতে চায় তাহারা অতিরিক্ত দুই পেপার ইংরেজী

মিলেই ত হয়। ইংরেজী সাহিত্যের জ্ঞান সকলের মাধ্যম চাপে দেন?

বিস্তার কহিনী এখনও শেষ হয় নাই। সেই Gerundial infinitive, adverbial use of 'the'—ইত্যাকার ইংরেজী ব্যাকরণের মোক্ষম মোক্ষম নিয়ম ত আছেই, তার উপর দাত্তভাষার অপিনিহিত, অতিক্রান্ত, অসুস্পষ্ট ইত্যাদি আশ্রিত্য জুটিয়াছে, তার উপর ক্রম তত্ত্বের কত রকমারি প্রত্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, ব্যাকরণের কত নিয়মের উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে—ইয়ত্তা নাই—আবার সেইগুলি স্কুলের ছেলেমেয়েদের বহুবলম্ব হইতেছে না নিশ্চিত জানিয়া পণ্ডিতেরা বিধান বিধাছেন, বিজ্ঞানের সর্গশাখার অল্প বিস্তার পণ্ডিত হইতে হইবে, ভূগোলের নামে বিবিধতা আদৃত কহিতে হইবে; ইতিহাসের নামে ভাষান্তর ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস, আবার ভারতশাসন পণ্ডিত সবই জানিতে হইবে। আর পক্ষ বর্ষ শ্রেণীতে পৃথিবীর ইতিহাসে পদিপক্ষ হইতে হইবে। আবার এক একটাই সিলেবাদ কি? যেখানে স্বংকল্প বাঁধার উপস্থিত না হয়, তাহার ক্রকের পাটা আছে বটে। আবার প্রশ্ন পত্রের কুট কোটিল্য কতবিধ? সাধে কি কবিত্ত্ব জ্যোতস্বাহিনী লিখিয়াছেন? সেইটি আবার স্কুলের ছেলেদের পাঠ্য হইয়াছে। তাহাদের আশ্রিত্য কি তাহারা যেহুনা।

এতকি আমাদের ছেলেমেয়েদের বহুবলম্ব হইতেছে না নিশ্চিত জানিয়া পণ্ডিতেরা বিধান বিধাছেন, বিজ্ঞানের সর্গশাখার অল্প বিস্তার পণ্ডিত হইতে হইবে, ভূগোলের নামে বিবিধতা আদৃত কহিতে হইবে; ইতিহাসের নামে ভাষান্তর ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস, আবার ভারতশাসন পণ্ডিত সবই জানিতে হইবে। আর পক্ষ বর্ষ শ্রেণীতে পৃথিবীর ইতিহাসে পদিপক্ষ হইতে হইবে। আবার এক একটাই সিলেবাদ কি? যেখানে স্বংকল্প বাঁধার উপস্থিত না হয়, তাহার ক্রকের পাটা আছে বটে। আবার প্রশ্ন পত্রের কুট কোটিল্য কতবিধ? সাধে কি কবিত্ত্ব জ্যোতস্বাহিনী লিখিয়াছেন? সেইটি আবার স্কুলের ছেলেদের পাঠ্য হইয়াছে। তাহাদের আশ্রিত্য কি তাহারা যেহুনা।

বিস্তার জরী হউক। আমাদের বয়স অনেক হইয়াছে, তা নইলে 'ইন্ডিক্লাব শিক্ষাবাদ' বলিতাম।



স্মৃতি গুরু

তার মৃত্যু দিন প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রাণের প্রাণীপ নিতে গেছে তার কালের হাওয়ায় দুঁড়ে ।
তবু স্বপ্নের স্রোতটি মনের তীরে যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে ।
মনে পড়ে তার মুখ ভরা হাসি, হৃৎখানি আয়ত চোখ,
যে ছুটি চোখেতে চোখ বেঁধে মন ভেঁপে যেত স্রবলোক !
তার কথাগুলি কলচকল মনে নবীক মতো
আমার মনের নির্জন মাঠে বয়ে যেত অবিরত ।
কাল শেষে সেই ঘরে কেতা খন, যোমাক হিনগুলি
আল জব্বের গটের উপরে গোলায় ব্যথার তুলি ।

এই তো সেদিন ও ছিল সে এখানে ! বিলাপী বিকেল এলে
প্রদাধন মাল সূক্ষ হতো, তার আদ্যময় মুখ বেলে ।
দাঁড় দাঁড়িটি রঞ্জিত করে, ছুটি হাত ঝোড় করে
কায় কল্যাণে প্রণাম পাঠাতো মনে ব্যাকুলতা ভরে ।
কতো কাল পরে ফিরে এস সেই অকল্পন বিন খানি—
যে দিন সে গেল হাওয়ায় হারিয়ে, তাবাহীন চল বাদী ।
যে গিরেছে চলে যে তো ফিরবে না, তবু মিছে আশাসে
মন অকারণ হয়ে উন্নত ভাবে, যদি ফিরে আসে !

জীবন মার্ঘ্য শ্রীকৃষ্ণের গুণ

তুমি আনো—আমি আনি—চলন্ত জীবন ;—
মুহুর্তে মুহুর্তে তার কত রূপান্তর ।
এ মুহুর্তে যে অন্তরে মুক্ত গুণাধর
সুখ-মত্ত, জ্ঞান তার থাকে কতজন ।
চলন্ত পথের বাকি তার অবর্ণন

নয়নে অঙ্কর আন, তারে তারপরে
মনে রাখা হয়তো বা হয় কষ্টকর
ভিন্ন বাক্যে ;—জাদা-ছবি স্মৃতি-বিশ্ববন ।
এই তো জীবন-মত বসতিস্থ মম,—
তবু প্রতি পর-পাতে বহন্ত বনায় ।

বিদ্যাবৃত্তে জীবনের যাব অল্পম ;
অম-মৃত্যু লক্ষ্যে অলক্ষ্যে মিলায় ।
ভূপ্তি আর অকৃপিতে তবু চিত্ত মম
রূপান্তরে রূপান্তরে অল্পপথে চায় ।

হাসপাতাশের কেবিন অশোক মুখোপাধ্যায়

আমার এ ছোট ঘর
ছোট পরিবার,
কিছুতে কাটে না হার,
এখানে গ্রহর।
ক্লিক-ক্লিক হাওয়া আসে
আলো ঝাঁপে মেড়ে,
চূপচাপ শুয়ে থাকি
ঘন্থে বেড়ে।
দেয়ালের কোণে বসে
টিকটিকি ডাকে,
আকাশের হাতছানি
জানাশার কঁাকে।

মাস'ধের চপাফেরা
চাপা কিস্কাস,
তবে আছে গুরুত্ব
গঞ্জে বাতাস।
কত না সময় যৌর,
কত অবসর!
যদিও কাঁটার তাই
তুচ্ছ—অনড়।
চিং হয়ে বিজ্ঞানায়
শুয়ে সাবাধন
বাহবাগ গৃহে মোর
ছুটে যায় মন।

কতদিন পড়ে আছে,
আর কতদিন
আমারে রাগবে ধবে
এ ছোট কেবিন।

তুর্ণা প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়

আনি ঝর্ণার ঘরা
গিরি চূড়া হতে নাচিতে নাচিতে
চলেছি আশ্রয়ভাঙ্গা।
অজানার পানে যায়
বিশ্বের নাকে বহুস্ত বস্ত
জানিতে দে মন চায়।
অরন্তেরী সে চুড়ে
হুগ হুগ ধবে বন্দী ছিলাম
তার নাগপাশ ছুড়ে।
কাটিল স্বপ্ন বোঝে—
একদিন শেষে হলান বাহির
ছিঁড়ে বন্ধন ডোর।

প্রাণেতে লাগিল সাড়া
দুব জনপথে কবে আমি ওপো
হইব তল্লী ব্যাড়া।
পাসেরে বুক মিলে,
আপনাকে ওবু নাহিক বিলাস
বাব আরো দূর যেনে।
অশেষের শেষ মাঝে
আকাশ বেবায় লাগবে মিশেছে
বিশ্বেরেবের কাছে।
দেখা চলা হবে কান্ত—
বহুস্ত বেথা বন্দ্ব ধরেছে,
দেখা হবে আমি শান্ত।

দার্শনিক শ্রীচৈতন্য

শ্রীরাধাপ্রদান চক্রবর্তী

দেখিম অগম্যাদি মন্দিরের হৈ হৈ কাণ্ড। যত্নে এ কোন
 স্মৃতি:পুস্তকের আবির্ভাব। সখাই বিশ্বের অন্ধকার
 দেখতে লাগল। অগম্যাদি দেখকে বিরে লোকে লোকারণ্য।
 পুণ্যলোভাতুর নয়নারী তপস্বিনীর উদ্দেশ্যে জানাচ্ছে
 প্রণতি। প্রেম মাতোয়ারা আপনভোলা নিমাই চলছেন
 মন্দিরে তপস্বিনীর নিমায়ের এই ভাবান্তর। চলতে
 না পারে গো চাঁদ সৌন্দর্যের—প্রথম বর্ণনাই মহাপ্রভুর
 উদয়। ছুটলেন তিনি বিগ্রহকে প্রেমবন্ধনে বাঁধতে।
 একি যে সে মিলন, এবে মহামিলন; সীমার সঙ্গে অসীমের
 মিলন। তারপরই পতন ও মুক্তি। এতেই বাহল বত
 গগনোল। এ মর অগতে কে কার বোঝ রাখে। পাণ্ডার
 হল এল ছুটে, মার মার কাট কাট করে। এ কি! বামন
 হয়ে চাড়ে হাত। নবীরাচারের খবর তারা আর কি
 রাখে, তারা ভাবে মন্দিরের তারাই হর্তা কর্তা বিহাভ।
 তাদের কি আর অহংভাবের অস্ত্র আছে? তারা যে অগম্যাদি
 বেদের ধাম মহলেব প্রমা। কিন্তু প্রেমের ঠাকুরের গভী
 ত আর মন্দিরেই সীমাবদ্ধ নয়, এবে অস্ত্রের টান; এখানে
 বাগ বিয় সবই বে তুচ্ছ। এদিকে দূরে ধাক্কিয়ে বৈরাগিক
 পণ্ডিত বাহুবল সার্বভৌম সব দেখেছিলেন। পাণ্ডারের
 উপর তাঁর একটু আধিপত্যও ছিল। তিনি এখানে
 আসতেই পাণ্ডারা সনমানে পথ ছেড়ে বিরে ধাক্কা।
 অহরী অহর চেনে—মহাপ্রভুর স্বরূপ বেবেই বুকতে
 পেরেছিলেন, এ নয় সামান্য নয়। তাই মহাপ্রভুর
 নামে গেলে নিঃশব্দ আশ্রমে। ধার্ম্য বর্ণক ছিলেন তাঁরা
 কি দেখিনের স্বতি তুলতে পেরেছিলেন? না কিরে গিরে
 তাঁরা বলেছিলেন—

“দূরে এসাম তারে সই বেবে এসাম তারে

এক অংক এত রূপ নয়নে না হবে ঐ”

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস জীবনের প্রথম অধ্যায়ের মোড়া পতন
 হল এই সর্বভৌমের আশ্রমে। এ শু আর বে সে দারুণ

নয়, যখন সববতীর পীঠস্থান। পণ্ডিতপ্রদয় চূড়ামনি
 বাহুবল সার্বভৌম—সমগ্র বেব তাঁর কর্তা। তিনি ছিলেন
 জানী তপস্বী। জান আচরণের অস্ত্র তিনি জীবনের
 যথার্থবৎ ত্যাগ করেছেন। একদিকে যেমন তিনি শাস্ত্রের
 কূট তর্কমালা ছিন্ন করতে পারতেন, অতি সহজেই তেমনি
 অস্ত্রবিকে তাঁর নিজের মতও প্রতিষ্ঠা করতেম লুচুভাবে।
 এরই শোণ ও যন্ত্র মহাপ্রভুর দীরে দীরে শব্দ হয়ে উঠলেন।
 তারপরই ছুই পুরুষের মিলন। সে এক অপূর্ব দৃষ্ট। এ
 যেন ভক্তি এসে ঘরেছে জানকে আপন কববার অস্ত্র।
 একদিকে জানের গগনশ্রী গিরিশূক অস্ত্রবিকে অস্ত্রের
 অমৃত নিষ্ক। কে শ্রেষ্ঠ তাই নিয়ে বিচার। একজন চায়
 মুক্তি অস্ত্রবলে বেব মুক্তি। সবই প্রভুর সীলা—এসীলা
 যোঝে কার সাধ্য। যিনি এক সমগ্র নবদীপে শাস্ত্রের কাকি
 বিজালা করে পণ্ডিতবের ব্যতিব্যস্ত করতেন একি সেই
 রূপ? এখন ত তিনি মোহা পথ হয়েছেন। তাঁর জীবনের
 মূলমন্ত্র হল তপের চেয়ে স্নেহ হ'বে, হবে তপের চেয়ে
 সখিহু; আর অপত্যকে মান মান করে নিজে মান ত্যাগ
 করবে। তাই তিনি যখন বিনয় সহকারে সার্বভৌমকে
 বললেন—আমি বালক সন্ন্যাসী, আমাকে কিছু উপদেশ
 দিন, তখন অলক্ষ্যে অদৃষ্ট হাঙ্গলেন। মহাপ্রভুর বদই
 এই। সার্বভৌম ছিলেন জানগরিবার উদ্যোগ। তিনি
 ভাবলেন সামান্য বালককে উপদেশ দিব এ আর এমন বেশী
 কথা কি? কিন্তু এখানেই ত বিপদ। গুরু ত আর জানেন
 না, তিনি কোথায় অগ্রদূত হয়েছেন।

আরও হল বিনোদ শিষ্টের সামনে শাস্ত্রের গুরু
 পতীকা। এক আধুনিক নয় সাতবিন ধরে চলল বেবান্ত-
 বাবের ব্যাঘা। যে মুক্তিমালা তিনি সৃষ্টি করলেন তা
 তেজ করে কার সাধ্য। শতবারাচের অবৈতাবারের বিশেষত্ব
 তিনি মানসিক থেকে বিহত করলেন। করলেন ত্রৈলোক্য
 নানা ব্যাঘা। ত্রৈলোক্য সত্য। জীব-অগতির বে বৈচিত্র্য

যেথতে পাই তা আর কিছুই নয় সবই মিথ্যা। এসব
রজ্জ্বে সর্পভ্রম। ব্রহ্ম আবার নিঃসঙ্গিক নিমিষের ও
নিঃসর্গ। মায়া কি? মায়া নামেই ত অজ্ঞান। জীব ত
মায়াতে সব সময়েই আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাই ত মিথ্যা
প্রতীতি। এইভাবে সার্বভৌম সমস্ত বৈদ উপনিষদ গুণগণ
প্রভৃতি মন্থন করে বললেন অনেক বড় বড় কথা, অনেক
জ্ঞানের কথা। জীবের তত্ত্বগত স্বরূপ ধর্ম কি তাও
বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলেন। মূলে জীব ও যা ব্রহ্মও তাই।
মাত্রিক উপাধি দুই করতে পারলে জীবই ব্রহ্ম। জানী-
লোক জ্ঞানের দ্বারা ত মায়াতে দূর করতে পারেন। আলো
দিয়েই ত অন্ধকারকে দূর করতে হয়। তদপরই ত ব্রহ্মের
সঙ্গে জীবের সম্পর্ক হয় এক। চুই আর মূলে পাওয়া যায়
না। তিনি দ্বিতীয়তর। এইভাবে হল অবৈত বাহ্যের
প্রতিষ্ঠা।

এত কথার পরও নিম্ন সুব গুলতে চান না। সার্বভৌম
ত ভাবনার পড়লেন। সত্যতরন হয়ে যে উপবেশ-বারি
বসিত হল তা যে বুঝাই যায়। এ কেনন শিবা? যেহে ত
মনে হয় জ্ঞানসুখা অম্বা, তবে মৌনাপদমন কেন? আর
নিম্ন বহির্ হাঁ না করে তবে তাকে আর কিস্তাবে
বুঝান যায়। এ ত বেগধি বর-লক্ষণ হয়েই আছে। শুষ্ক
বেগ চিহ্নিত হয়ে পড়লেন। কিছু পরেই কিন্তু সব চিত্তার
নিরদন হল।—যে প্রেমেব এক কণা ভুবার পর্বভূবন, তাইই
কিচ্ছিন্ন জ্ঞাতার স্মৃতিত হল তাঁর কণ্ঠে। এ ত আর বান্য,
ভোবা নয়, এবে স্মৃতিস্মরণ। বিনয় হচ্ছে মহাপুরুষের
অজ্ঞের ভূষণ, কন্যাময়গর্ভীরে পক্ষে তাঁহের এখানেই ত
ব্যবধান। নদেই নিবাই আরম্ভ করলেন—প্রভু, আমার
ত কোন পড়াশুনা নেই, আমি যে বুঝ। উত্তর বেশ এমন
কন্যতা কই। শোনা ত সন্ন্যাসীর ধর্ম। আর অত বড় বড়
কথা কিছুই ত বুঝতে পারিনে। সোজা কথায় যেটা সহজ
ভাবে বোঝান যায় তাকে অত ঘোরাগো করেই যা লাভ
মূল কথার উপর বেশী ২০ কলাবার ধরকার বা কি? বৈ
যতঃশিদ্ধ তাকে গ্যাধ্য্য করে ভাবাক্রান্ত কংসার এত
স্টেটাই বা কেন? ব্যাপারের স্তরের যে অর্থ করেছেন সে
ত আলোকের তার স্পষ্ট, তার উপর ক্যান্ডিড ব্যাখ্যা
করলে বুঝা অর্থকে চাপা দিয়ে রাখা হয়। পতিতি ব্যাখ্যা

হেঁদে দিয়ে আমার মতে যেটা সোজা পথ সেইটে গ্রহণ করা
ভাল নয় কি?

“সহজ হবি, সহজ হবি, তবে মন সহজ হবি,

কাছেই জিনিষ দূরে রাখে, তার থেকে চুই দূরে রাবি।”

এবার শুষ্ক শোমনবার পালা। যিনি ছিলেন শ্রোতা
তিনিই এখন বক্তা। মহাপ্রভু ব্রহ্ম জীব ও লগণ প্রভৃতির
স্বরূপ নির্ণয় করতে লাগলেন। যতগুলি সম্ভাব্য দৃষ্টি তর্ক
থাকতে পারে সবই উত্থাপন করলেন। অজ্ঞাত সস্ত্রায়েব
এই বিশ্বের কি কি মত, তার দাববতাই বা কতটুকু তাও
বিস্তারিত আলোচনা করা হল এই প্রসঙ্গে। শব্দর যে
অবৈতবার প্রতিষ্ঠা করে গেলেন তা একরকম থাকে নি।
মূলে মূলে সেই অবৈতবার পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়ে
অন্ত অবস্থার সঙ্গে পৌঁছেছে। সকলের দৃষ্টিকোণ ত আর
সমান নয়। এক পুরুষের নামা যাতে লোকে হল নিচ্ছে।
পূর্ব বিভিন্ন হলেও যেটা নিচ্ছে সেটা হল ছাড়া আর কিছুই
নয়। কিন্তু এই পূর্ব নিয়েই কত মাহামাধি। যত মত,
তত পূর্ব, এর কি আর অন্ত আছে। যেমন রামানুজ
ছিলেন অবৈতবারের পরিপোষক তবুও তিনি এটাকে
নিজের মত অনুসারে কিছুটা অদলবদল করে নিয়েছিলেন।
ব্রহ্ম জীব ও লগণের সম্পর্ক তিনি অন্য প্রকারে প্রতিষ্ঠিত
করেছেন। তাঁর মতে বিশ্ববের স্বরূপের অতিরিক্ত আরও
ছটি বস্তু আছে। এহেৎ বলা হয় জীব ও মায়া। এই দুই
বস্তু বিশিষ্ট স্বরূপই বিশ্ব এবং তিনিই ব্রহ্ম। মাটি দিয়ে
অনেক কিছুই তৈরী হয়। সেজন্য নানারূপ পাতের সঙ্গে
মাটিরও একটা সম্পর্ক আছে। ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও লগণের
সম্বন্ধ এই রকম। জীব ও লগণ ব্রহ্মের বিশেষণ তাই
এই সস্ত্রায়েব মতামতবিরোধ এর নাম ছিলেন বিশিষ্ট
বৈতবার। আবার নির্ধার্ত আচার্য ত ভেদ এবং অভেদ
দুই স্বীকার করে নিয়ে ভেদাত্তেববার মতের প্রতিষ্ঠা
করলেন। কার্য ও কারণ রূপেই ভেদাত্তেবের স্বীকৃত।
কারণরূপে ব্রহ্ম এক কিন্তু কার্যরূপে তিনি বহু। কার্যরূপে
বহু প্রকাশই তাঁর ধর্ম। অজ্ঞানকে বহুভাচার্য সস্ত্রায়েব
মহারাচার্যের মতকে বিশুদ্ধ করতে লেগে গেলেন। ঐহের
মতে ব্রহ্ম সর্ব শক্তিময়, সজ্জাননক, অব্যয় এবং ব্যাপক।
লগণের মত যে স্তর সমস্ত নয় তা প্রমাণ করে ঐহ্য নাম

দিয়েন বিভ্রান্তবৈতবার। মল্লভাষ্য ত অধৈতবারকে
অবীকার করলেন। এই সপ্তাধ্যায়ের মধ্যে ব্রহ্ম ও জীব
দুইই পৃথকতত্ত্ব। জীব ও ব্রহ্মের তেজ প্রমাণই এই
সপ্তাধ্যায়ের উদ্দেশ্য। তাই এর নাম নেওড়া হল বৈতবার।

তা হলে হেথা থাকে নানা যুগির নানা মত। কেউ
প্রমাণ করেছেন ভেদ, কেউ অভেদ; আবার কেউ কেউ
দুয়ের সমন্বয় সাধন করে দেখাচ্ছেন ভেদাভেদ। মহাপ্রভু
তাই পরম্পর বিরোধী নানাতরপ বুদ্ধি তর্কের অবতারণা
করে তা মিছেই ধ্বংস করলেন। তারপর তাঁর নিজস্ব মত
ব্যক্ত করলেন। তাঁরা ভেদবাদীও নন অভেদবাদীও নন।
কেননা ওদম ত তর্কের ব্যাপার। অস্তের বললে যেমন
অনেক দোষ এসে যায় আবার ভেদ বলতেও অনেক ক্ষেত্রে
যাযে। স্রুতিতে ভেদ ও অভেদ দুইয়ের কথাই আছে।
সেজন্য কোনটাকে গ্রহণ করে কোনটাকে ছাড়া যায় তাই ত
এক সমস্তার ব্যাপার। একে বুদ্ধি তর্কস্বারা ধ্বংস করা
যায় না। চিন্তাশক্তি বা বুদ্ধিতর্কের অসম্মা বলেই এ
অচিন্ত্যবী। সেজন্য এর অস্ত নাম দেওয়া উচিত। অচিন্ত্য-
ভেদা ভেদবাদের নাম দেওয়াই বুদ্ধিবৃত্ত। কোন কিছুকে
শক্তিমান বললেই শক্তির কথা এসে পড়ে। শক্তি ছাড়া
শক্তিমানকে কল্পনাই করা যায় না। ছুটোকে ভেদ বল
লে নেওড়া যায় আবার অভেদ বলেও প্রতিপন্ন করা যায়।
একটির অপরটির অংশ, অংশ ও অংশীর মধ্যে যে সম্পর্ক
তা বুদ্ধি তর্কেই ব্যাপার নয়। এটা স্বতঃসিদ্ধ একে স্বীকার
করে নেওয়াই ভাল।

পতিভ্রমর বাহুদেব সার্বভৌম ত স্বাক্ষর করে
স্বনছেন। মাঝে মাঝে মহাপ্রভুর বুদ্ধি ধ্বংস করতে চেষ্টা
করলেন কিন্তু বুঝা চেষ্টা। নিমাইয়ের সেই এক কথা—

“সর্বৈবর্ষ পরিপূর্ণ, যবে ভগবান ;

তাঁর নিয়াকার করি করহ ব্যাখ্যান।”

এর পর মহাপ্রভু আরম্ভ করলেন ব্রহ্মের স্বরূপ সংক্ষেপে
বিব্রাতিত আলোচনা। এই বে বিশ্ব, এ ত ব্রহ্ম থেকেই
সৃষ্টি আবার ব্রহ্মতেই লয় পেয়ে যাযে। সৃষ্টি ও লয়ের দু'প
আছে ব্রহ্মের শক্তি। ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি, তার মধ্যে
আবার ভিন্নটি প্রাধান্য। এদের বলা হয় স্বরূপ শক্তি,
জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। স্বরূপ শক্তিকে অন্তরূপ শক্তি বলা

যেতে পারে। নিজেই ভিতরে শক্তি আছে বলেই, তিনি
শক্তিমান। এই শক্তিকে তিনি তিন অংশে বিভক্ত
করছেন। এর নাম হচ্ছে মৎ, চিত্ত ও আনন্দ। তাই ত
তিনি সচ্চিদানন্দ। এই তিন অংশের আবার ভিন্নরূপ।

“আনন্দাংশে হলাধিনি সর্বশেষ সচ্চিদী ;

চিৎরাংশে সচ্চিদ, যাবে কৃষ্ণজ্ঞান মানি।

এগুলিকে স্বরূপের বলা হয়ে থাকে বুদ্ধি। ভগবান
এই তিন বৃত্তির দ্বারা এই স্বীকার সাধন করে থাকেন।
এক একটি বৃত্তির এক একটি কাজ। হলাধিনি বৃত্তি
দ্বারা একত্রিকে যেমন তিনি আনন্দ লাভ করেন অন্তরীকে
এর সাহায্যে তিনি অপরকে আনন্দমান করতে পারেন।
সচ্চিদী সাহায্যে যেমন তিনি নিজের সত্তাকে ব্রহ্মা করেন
তেনম অপরকে সত্তাকে তিনি এর দ্বারা ব্রহ্মা করেন।
এইভাবে সচ্চিদ বৃত্তির দ্বারা নিকেতে জানতে পারেন ও
অপরকে জানতে চান। স্বরূপ শক্তি প্রকাশের এরা
সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে। এই সব মিলিয়েই ত তিনি
অন্তরূপা শক্তির অধিকারী। কেউ কেউ এই শক্তিকে
চিদান্ত বলা থাকেন।

মায়া শক্তিকে বলা হয়ে থাকে বহিঃরূপা শক্তি। এ
সব সময়েই বাইরের দিকে টানছে। সর্বদাই ভূমিগ্রে ভাষছে।
ভগবানের দিকে চলতে গেলেই দড়ি ধরে বিচ্ছিন্ন এক টান।
আর ওদিকে বাওয়া চলল না। লোভ হেঁচকে ভিহিয়ে
আনছে। টানাটানির কি আর অন্ত আছে। এর আবার
ছুটো বুদ্ধি একটি গুণদ্বারা অপরটি জীবদ্বারা। সত্ত্ব,
রজ, তম এই তিন প্রকৃতিকে বলা হয়ে থাকে গুণদ্বারা।
এর কাঁখে পা দিতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করছে এর
আর একটি বৃত্তি—সে জীবদ্বারা। এটা সব সময়েই স্বীকারের
স্বরূপ শক্তিকে ভুলিয়ে দিয়ে মাত্রিক বস্তুর দিকে টানছে।
তখনই জীবের মনে এসে যায় সংসার। আসল নিমিত্তকে
দূরে রেখে মকলের দিকে ঘুরে ঘুরে ধরান হয়ে পড়ে।
কেউ চায় ইচ্ছাযের দুঃসংসার আবার কেউ কেউ সন্ধান ও
প্রতিপত্তির প্রাণ্যাদী। একে বলা হয়ে থাকে কাম ও অর্থ।
আর এক প্রকৃতির সোকে থেকেতে পাওয়া যায় তাঁরা
ধর্ম অহুস্তান করেন পরবর্তী জীবনে মুখ ভোগ করবার
লক্ষ্য। এর নাম হল ধর্ম। কিন্তু এ ছাড়াও সোকে সাধন

কৰে মোক্ষলাভ বৰণ্যৰ জন্ত। ধৰ্ম অৰ্থ কাম মোক্ষ
প্ৰকৃতিকে বলা হয় থাকে চতুৰ্থৰ্গ। কিন্তু এতেও আনন্দেৰ
বৈচিত্ৰ্য নাই। এই সব লাভেৰ জন্ত মানুহ এত ব্যাহুল
হয়ে ওঠে যাৰ কলে ভগবানকেই ভুলে যায়। কৃত্তিক
মুখেৰে জন্তাই বত মাতামাতি বহিবঙ্গা শক্তিৰ কাৰ্যই
ত এই।

এহিকে জীব কিস্তি ভগবান খেঁচ উলুত। তাই জীব
ভগবানেৰ অংশ। সেজন্ত একে বলা হয় থাকে জীবশক্তি।
এখন এৰ স্বত্বপ ধৰ্ম কি? এৰ আশেই দেখেছি শক্তি।
ভিতৰেৰ অন্তৰ্ঘট বাইবেহ। এই জীবশক্তি তাই কোথাও
স্থান পেল না। মাঝামাঝি জাগৰাৰ বেচ গেল। এৰ
অবস্থা হল দুয়োৰে ভেঁটাৰ নত তাই একে বলা হয়ে থাকে
ভট্টাৰ শক্তি। অন্তৰঙ্গা নন, বহিঃৰঙ্গা নন ইনি হলেন
ভট্টাৰ। ভগবানেৰ অংশ হতে ইনি ভদ্ৰগ্ৰহণ কৰেন বটে
কিন্তু স্বাৰ্ধকৰ্য কৰেন নিজেৰ ইচ্ছায়। তাই ইনি কৰ্ম
অনুযায়ী কলভোগ কৰেন। জীব ভগবানেৰ অংশ সেজন্ত
অংশীৰ সেবা কৰাই অংশেৰ কৰ্তব্য। তাই ভগবানেৰ
নিত্যধাৰ।

বান্ধুমেৰ সাৰ্বভৌম মোহাবিষ্ট হয়ে স্তনহিলেন। আৰও
অশ্ৰুৰ হয়ে পেলেন তখন স্তনহিলেন জান খেঁচ ভক্তি শ্ৰেষ্ঠ।
তাবলেন এ কি কথা—জান না থাকলে ত মানুহ অজ্ঞানেৰ
অন্ধকাৰে ভুগে থাকবে, তাৰ মনৰ কলুণ ত পোনহিনই
নাশ হবে না। জান থাকলেই ত ভাল মন্দৰ বিচাৰ ক্ষমতা
বাড়বে। মহাপ্ৰভু তখন এ সম্বন্ধে বিভাবিত আলোচনা
কৰলেন তখন সাৰ্বভৌমেৰ সব বৃত্তিই অচল ও অগাৰ বলে
এতিপৰ হল। মহাপ্ৰভু বললেন—জান থাকলেই
ঋমিক্য বাড়বে তখনই মানুহ হবে স্বাৰ্পণ্য। তাৰ সেবা
কৰণ্যৰ প্ৰদুৰ্ত্তিই লোপ পাবে। সে ভাবেৰ অন্তৰ্ঘট লোক
খেঁচ সে শ্ৰেষ্ঠ, গৰ্বে তাত বুক কুলে উঠবে। অথচ জীব
কিন্তু স্বৰ্গৰ অনুযায়ী ভগবানেৰ নিত্যধাৰ। সেগাই তাৰ
ধৰ্ম। ভক্তি কৰা মানেই সেবা কৰা। অজুৰ হিলেন
শ্ৰীকৃষ্ণেৰ প্ৰিয়মথ। টাঁকেও স্তনতে ধৰেছে ভক্তিতত্ত্ব।
অনেকেই ত শাৰণ্য কৰেছেন, বাগ বজ কৰেছেন, কিন্তু ভক্তি
না থাকলে সবই বিফল। বাগ বজ কৰে যে বল লাভ
হয় তা অনিত্য। সেজন্ত এমন কিছু চাই বা নিত্য বল

প্ৰধান কৰ্ত্তে সৰ্বৰ হয়, ইহা ভক্তিমাৰ্গপামী তাঁহাই এই
আশাৰ পান। আশাৰ ভক্তিৰ দ্বাৰাই জ্ঞানেৰ অস্বাৰকে
শূণ্য কৰা যায়। অহং ভাবেক দুৰ কৰতে বলে ভেঁটভাৰে
ধমন কৰতে হবে। একেই বলা হয় জ্ঞানশূণ্য ভক্তি।
আৰ ভক্তিভাব গাঢ় হয়েই ত প্ৰেমে পৰিণত হয়। ভক্তিৰ
শ্ৰেষ্ঠৰ সম্বন্ধে তিনি আৰও অনেক কথা বললেন। বললেন
—ভক্তিই পৰম পুণ্যধৰ্ম। জীবেৰ কৰ্ত্তব্যই হল ইহাৰকে
ভক্তিভাবে ভজন্য কৰা। অনেকে মনে কৰেন লোকেৰ
কামনা ব্ৰহ্মানন্দ লাভ। মোক্ষলাভ হলেই ত এই ব্ৰহ্মানন্দ
লাভ কৰা যায়। কিন্তু তাৰ চেয়েও অনেক যোগ আৰ
একটি জিনিষ শ্ৰেষ্ঠ। তা হচ্ছে মাৰ্ঘৰ আশ্বাৰন। কেননা
মাৰ্ঘৰে যে বৈচিত্ৰ্য। লভ্য কৰা য'গ তা ব্ৰহ্মানন্দ নহে।
মাৰ্ঘৰ লাভেৰ একমাত্র উপায় হল প্ৰেম, এই প্ৰেম ভক্তিৰই
ক্ৰপাত্তৰ। তাই বলা ধৰেছে—প্ৰেম মহাধন। কৃষ্ণেৰ
মাৰ্ঘৰ হন কৰণ্যৰ আশ্বাৰন।

তাৰপৰ তিনি বললেন—স্বৰচিত শাপন শায়েৰ দ্বাৰা
যে সব ব্যাখ্যা কৰা হয়ে থাকে সে সব ত কল্পিত। ভগবান
নিজেই বলেছেন যে ঐ সব শায়েৰ দ্বাৰা ভক্তি বিবৃথ কৰা
হয়ে থাকে সেজন্ত এৰ উপৰ বৈশিষ্ট নিৰ্ভৰ কৰা চলে না।
আশাৰ শাস্ত্ৰ এৰ অনেক প্ৰাণ দেখতে পাওঁয়া যায় যে
নিজেৰ সুবিধাৰ জন্ত অনেকে অসৎ শাস্ত্ৰ রচনা কৰেছে।
সাৰ্বভৌম শায়েৰ মোহাই দিয়ে যে ভৰ্ক ক'বছিলেন তাৰ
প্ৰত্যুত্তবে মহাপ্ৰভু অনেক বোম জটী ধৰিয়ে দিয়ে তাঁৰ
নিম্বৰ মত এতিষ্ঠা কৰলেন। সাৰ্বভৌমেৰ অংহা তখন
কন্নাব বাইরে। নিমজ্ঞমান ব্যক্তিৰ তৃণাবলম্বনেৰ চোঁটা
তৃণা পেল। এৰপৰ আৰ কিছু বলবাব নহে। তাঁৰ মনে
অনন্ত বিশ্বৰ বাগা বৈথেছে। ভাবছেন এমন সুগম্য কৰ্ত্ত
ত কোনহিন স্তনিনি। তাঁৰ বাকশক্তি লোপ পেল, কেবলই
স্তনছেন। বত স্তনছেন স্পৃহাও তত বাড়ছে। শায়েৰ
কচকটি ছেড়ে দিয়ে এখন যেন পত্যাৰাহেৰ পথ খুঁজে
পেলেন।

এইদাৰ মহাপ্ৰভু তাঁৰ শেষ কথা বলবাব জন্ত আশ্বাৰাম
লোকটিৰ উপাধন কৰলেন। তিনি অনুযোগ কৰলেন
সাৰ্বভৌমকে এৰ অৰ্থ কৰণ্যৰ জন্ত। সাৰ্বভৌম আৰ কি
কৰেন। শাস্ত্ৰমত সে ব্যাখ্যা হয় তা কৰলেন। কোঁবাও

কোন কিছু কীক থেকে বাবার উপায় নেই। সাধাৎ লোকে ভাববে কি ব্যাখ্যাই না শুনলেন। কিন্তু এতে অস্বস্তির সমর্থন কৈ। মহাপ্রভু শুনে বললেন এ যে স্বয়ং বৃহৎপতি ব্যাখ্যা করলেন এবং প্রতিবাদ করে এমন কথা কার। কিন্তু পতিতি ব্যাখ্যা শুনে লাভ কি। তখন নিজেই এই শ্রোকের আচার প্রকার অর্থ করলেন। যোগ্যটি এই—‘এমনি হরির গুণ যে আত্মারাম ও চন্দ্রগ্রহি নিবৃত্ত হয়েছে এমন মূনি স্বর্গহাও তাঁকে অষ্টৈভুক্ত হক্তি করে থাকেন।’

এই কয়টি কথা শ্রুত হিঙ্গবে হয়ে নিয়ে তিনি প্রত্যেক শব্দকে প্রথমে ভেঙ্গে ভেঙ্গে অর্থ করলেন তারপর তা যোগ করে বেধিয়ে দিলেন। প্রথমেই বললেন আত্মারাম বলতে কি বুঝি। আত্মা বলতে ত অনেক কথাই এসে পড়ে। কেউ বলে বেধ, কেউ বলে মন আবার কেউ কেউ একে বললেন ব্রহ্ম। এই বাক্য আশ্রয় কত কি? রাম কথার অর্থ ত রমণ করা, আত্মাতেই বীর বতি তিনিই ত আত্মারাম। মূনির সন্তো অনেক আছে, কেউ বলে মৌনী, কেউ বা বলেন মননশীল। এই বাক্য প্রতিষ্ঠা করার নানা প্রকার অর্থ হতে পারে। কিন্তু এর ভিতর একটি অর্থ প্রধান বেধতে পাওয়া যায়। সেটা হচ্ছে এই মৌনাবগাধীই যোন বা সমস্ত কাম ক্রোধ মোহ ত্যাগ করেছেন এমন সাধু সন্ন্যাসীই যোন, সকলেই সচ্ছিদানন্দ ব্রহ্মের অষ্টৈভুক্ত হক্তি করে থাকেন। তাই দেখা যায় এই ভক্তি চেষ্টে শ্রেষ্ঠ কি আর আছে। নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই আনন্দ।

এখন ভক্তিতত্ত্ব বলতে কি বুঝি সেইটাই জিজ্ঞাস্য। এর পূর্বে যেবেছি ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভক্তিতেই ভগবান মেলে। প্রেমের এমনি মাত্র।

‘কল্পনা ছহর পলে বীরা ছহ তক্ষরও হর সাধু’ কিন্তু অনেকে শাস্ত্র অশ্রুশ্রবণেও গুয়ে যে ভক্তি চর্চা করেন, তাঁকে বলা হয়ে থাকে বৈমাত্তিক। এতে কিছুটা অসংজ্ঞার খেঁচো যায়। অনেক সময় দেখা যায় কামনা চরিতার্থের অন্ত ও লোকে ভক্তি করতে দেখে। যেমন প্রবের কাহিনী উল্লেখ

করা যেতে পারে। প্রথমে তার মনে ছিল বাহ্যাসক্তের আকাঙ্ক্ষা কিন্তু ভক্তির হোয়াচ এমনই যে মরা বলতে বলতে রাম নাম এসে যায়। ভগবানকে পেয়ে কামনা বাসনা সবই লোপ পেয়ে গেল। তখন একমাত্র ভগবৎভক্তি ছাড়া আর কিছু চাওয়া হল না। ভক্তি ও প্রেমের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনে পাণ্ডিত্যগর্ভী সার্বভৌমের অহমিকা দূরীভূত হল। এতপর কি আর তর্ক করা সাজে। নিজেকে সমর্পণ করে দিলেন মহাপ্রভুর কাছে। সে এক অদ্বুত দৃষ্ট। নদী ও সমুদ্রের মিলন। তখন সার্বভৌম নিজের স্রুত কর্মের অন্ত অদ্বুতাপ করতে লাগলেন ও মহাপ্রভুর সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন কি এই বিবরণ জিজ্ঞাসা করলেন।

নাম সংকীর্তনই ত শ্রেষ্ঠ পথ—বললেন মহাপ্রভু। কালে কালে অনেক কিছু উন্নতি হয়েছে কিন্তু ভক্তিতত্ত্ব প্রচলিত হয়েছে কি? এই ভক্তিরই প্রথম সোপান বল নাম সংকীর্তন। কলিকালে এছাড়া আর কোন গতি নেই। বৈরাগ্য ও ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য ব্রহ্ম ব্রত মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন। তা গ্রহণ করেন করুন। ভক্তিতেই ত মুক্তি। পাঁচ প্রকার মুক্তি বেধতে পাই—

‘মুচ্যপি মুক্তি য় পঞ্চ প্রকার।

সালোক্য-সামীপ্য-সাহচর্য-সাক্ষী-সাহুভ্য আর।”

এই পাঁচ প্রকার মুক্তির মধ্যে প্রথম গািটি ততটা নিশ্চিনীয় নয় কেননা এতে ভগবানের সেবার কোন বাধা জন্মায় না। কিন্তু সাহুভ্যতে ভক্তি লোপ পেয়ে যায় তাই একে পরিহার করাই কর্তব্য। সাহুভ্য বাবেব ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বৈদ্যাস্তিকান্যার বাবেব ব্যাখ্যা। সেজন্য একে গ্রহণ করা যায় না। সব সাধনের শ্রেষ্ঠ সাধনই হচ্ছে ভক্তি।

‘ভক্তি বিনা কোন সাধন বিতে নায়ে কল;

সব কল বেধ ভক্তি পদে প্রবল।”

ভক্তিতেই নাম সংকীর্তন কর তবেই মুক্তি।

সার্বভৌমের হল নবজন্ম। প্রেমের পরশে তিনি ধ্রু হয়ে গেলেন। যিনি আগে ছিলেন মহা তাত্ত্বিক তিনি এখন নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে প্রেমাবেশে নাচতে লাগলেন। এইখানেই হল বৈকুণ্ঠ ধর্মের প্রাপ্তপ্রতিষ্ঠা।

এশিয়ায় যুক্তিকা সম্বন্ধে কৃষি-অর্থনীতিজ্ঞদের বৈঠক

৩

[এশিয়ায় যুক্তিকা সম্বন্ধে এইবার প্রথম আন্তর্জাতিক কৃষি-অর্থনীতিজ্ঞদের সম্মেলন বসিগ্রাছিল। মহীশূরে এই সম্মেলনের দশম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। গত ২৪শে আগষ্ট প্রধান মন্ত্রী উহার উদ্বোধন করিয়াছেন। এই সম্মেলন বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী বিভাগ ও গবেষণাগারে কর্মরত আন্তর্জাতিক ব্যক্তিগণের পেশাগত বৈজ্ঞানিকদের সম্মেলন। ইহার উদ্দেশ্য হইল কৃষি-অর্থনীতি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা ও গবেষণা করা।

ইন্টেনের মিঃ এলু, কে, এলবার্ট এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিয়াছেন। উন্নতিশীল বৎসর পূর্বে এই সম্মেলন স্থাপিত হয়। সেই সময় হইতে মিঃ এলবার্ট এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিয়া আসিয়াছেন। তিনি ১৯২১-২৪ সাল পর্যন্ত স্নাত্তিকভিত্তে গ্রাম পুনর্গঠন প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা ছিলেন। তিনি দ্বিতীয়বার ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।]

আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ইতিহাস

সম্পূর্ণ পরিবর্তনশীল আর্থিক ও নিরবিচ্ছিন্নতার পতিস্থিতির সহিত চাষাবাদ ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করা কৃষি-অর্থনীতিবিদগণের পক্ষে এক বৃহৎ সমস্যা বলা যাইতে পারে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে কৃষি-বিষয়ক অর্থনীতি সম্পূর্ণ উল্লিখিত না হইলেও অপ্রকৃতকৃত অজ্ঞাতই ছিল। এই বিষয়ে গবেষণাও তেমন কিছু হয় নাই। প্রথম মহাসময়ের পূর্বে উন্নততর দেশসমূহে উহা এক প্রকার শৈশবাবস্থা ছিল। সন্মতি অর্থনীতি এই শাখায় আগার মধ্যেই পরিমাণ বিশেষ জ্ঞান সঞ্চার হইয়াছে—কলে এখন কৃষি-অর্থনীতির ১২১৪টি উপবিভাগ দেখা দিয়াছে—যথা ক্ষেতখামার পরিচালনা, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, সমন্বয়, দ্রব্য বিশ্লেষণ, ভূমি-সম্ব্যবহার, গ্রাম গণনা, কল-নির্ধারণ, পরিবহন ইত্যাদি।

গ্রামকলের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে সক্রিয়ভাবে যোগদানকারী ব্যক্তিদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যথোপযুক্ত। চাষিয়া কৃষি অর্থনীতিবিদগণ গতিশীল বিষে অর্থনীতি বিষয়ক সাধারণ কার্যকরী জ্ঞানের উন্নয়ন প্রদার করিতেছেন এবং এইভাবে বৃদ্ধি ভিত্তিতে অর্থনীতির বিবর্তনে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। বিস্তৃত বিজ্ঞান নয়, কলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঠাধাদের বার্থ প্রথম কাজ হইল মানব সমাজে সাধারণ আর্থিক নীতির সামঞ্জস্য বিধান ও প্রয়োগে সহায়তা করা।

আন্তর্জাতিক কৃষি-অর্থনীতিজ্ঞ সম্মেলনের উদ্দেশ্য হইল

—বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণ বাহাতে ঠাধাদের সমস্তগুলির বিষয় অংশ গ্রহণ করিয়া আলোচনা করিতে পারেন, ঠাধাদের কর্মপন্থা উন্নয়ন করিতে পারেন এবং একটা সাধারণ শব্দবিজ্ঞানে সম্মত হইতে পারেন সেজন্য ঠাধাবিধকে সহায়তা করা অর্থাৎ কৃষি-অর্থনীতিবিদগণ ঠাধাদের মতব্য তুলনা করিবার ক্ষমতা, কর্মপন্থা সম্পর্কিত বিষয়গুলি পরীক্ষার ক্ষমতা এবং প্রত্যেকের বাহিত বিশ্লেষণপন্থার বার্থতা বিচারের ক্ষমতা একত্র মিলিত হন।

প্রথম বৈঠক

কৃষি-অর্থনীতিবিদগণ ১৯২৯ সালে প্রথম ইন্টেনের ডেভনশায়ারগে মিলিত হন। তখন বিশ্ব প্রথম মহা-সময়ের জুগ্মবৃত্ত হইতে অনেকটা মুক্ত হইয়াছিল। বিশ্ব-বাণিজ্য পুনরায় চালু হওয়ার লক্ষ্য দেখা যাইতেছিল। সেই সম্মেলনের আলোচনা ও প্রবন্ধে প্রধানতঃ গবেষণার কৌশল ও পদ্ধতি উল্লিখিত ছিল। সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিিনিগণ সেইবার প্রথম ঠাধাদের কর্মপদ্ধতি ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করিবার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৩০ সালে ঠাধারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণেল সহরে একই পদ্ধতি অবলম্বন করেন, যদিও সম্মেলনে সকলে বিশ্বব্যাপী মন্ডার কথাটা মানাভাবে থাক্ত করেন। ১৯৩৪ সালে আর্মস্ট্রং ব্যাড্ অফিলসেন সহরে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন আর্থিক কৃষিক্ষেত্রে প্রবোধ মাহাত্মক কম দ্রব্য হইতে উদ্ধার পাইবার ক্ষমতা

যে প্রচেষ্টা চালাইতেছিল সে বিষয়ে ঐ সম্মেলনে বিশেষভাবে আলোচনা চলে। কেহ কেহ কৃষি সমস্তার মূল হইতে সমাধানের অগ্রহোপ জানান। কৃষি-প্রত্যাকে শুধু কীটিকা অর্জনের উপায় মনে না করিয়া কীবনের গতি বিধায়ে বিবেচনা করা হয়।

চুই বৎসর পরে তাঁহার। ভটল্যাণ্ডে দেন্ট এলুত্র-এ মিলিত হন। সম্মেলনের সহিত কৃষির সম্পর্ক ভূমিগত, ক্ষেত বাসারের সংগঠন, কৃষিজাত জীবের ব্যবহার ও লগধান সমস্তা—সকল কৃষি-নীতির অন্তর্নিহিত এই সকল মৌলিক সমস্তার উপর এই সম্মেলনের গুরুত্ব আরোপ করা হয়—১৯০৮ সালে কানাডার সম্মেলন অঙ্গীকৃত হয়। ঐ বৎসর বিষয়ে আবেগাওরা ছিল স্তম্ভ।

পুষ্টি ও জীবনধারণের মান সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে থাকার সকল লাভি শুধু তাঁহারের কৃষিবিদ্যার-বৃদ্ধি আর্থিক ভিত্তি স্থাপনের জন্য নয়, গ্রামাণ্ড নাগরিক জীবন এবং সাধারণভাবে লন্যদের সমস্তা সমাধানের জন্য সর্বেষ্ঠ হইতে থাকা হন। কৃষিজাত জীবের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বৈদেশিক অনিশ্চয়তায ফলে সকল লাভির সাধারণ সমস্যার দিকে কৃষি-অর্থনীতিবিদ্বের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়।

মুহু ও উৎপন্নবর্তীকালের অবস্থা

১৯০১ সালে হাঙ্গেরীতে বর্ষ সম্মেলন অঙ্গীকৃত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মুহু প্রথমেই হওয়ার ঐ সম্মেলনের অগ্রহান করা সম্ভব হয় নাই। ১৯০৭ সালে উহা ডাট্টিংটনে অঙ্গীকৃত হয়। মুহুভক্ত এই প্রথম ঠেঠেকের কলে সম্মেলনের কাল চালাইয়া যাওয়ার ভিত্তি স্থাপিত হয়। কারণ কৃষি-অর্থনীতি শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে নয়, পরন্তু ক্রমবর্ধমান আর্থিক পরিকল্পনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষত অত্যাবশ্যক ও নিরাপক স্থান লাভ করিতেছে। গত কয়েক বৎসরে সম্মেলনের যে সব বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে সেগুলি আমাদের সমকালীন সামাজিক সমস্তা পরিবর্তনের প্রমাণ। ইহা হইতে সহজে বুঝিতে পায। যার যে, কৃষি-অর্থনীতিবিদগণ সর্বদা সমাগ থাকিয়া বিশ্বের গ্রাম্যকালের অধিবাসীদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া চলিয়াছেন।

১৯০৯ সালে ইতালির ট্রোলা সহরে সপ্তম সম্মেলন

অঙ্গীকৃত হয়। এই সম্মেলনের কৃষি-সমস্যার ও আধুনিক রাষ্ট্র, গ্রাম্যকালে শিল্প প্রসার প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়। ১৯০২ সালে মিচিগান টেট কলেজে অষ্টম সম্মেলন অঙ্গীকৃত হয়। ৪৪টি দেশের ৩৪০ জন সভ্য ও হর্ষক ঐ সম্মেলনে যোগদান করেন। যথিত অগ্রগত অকলসমূহের কতকগুলি সমস্তা চাচি হুফা কর্ণহুচী ও কলমো। পদিকল্পনা ইতিপূর্বেই যোগদান করা হয়, তাহা হইলেও ১৯০৯ সালে অঙ্গীকৃত সম্মেলনের পংবর্তী তিন বৎসরের আশা ও উৎসেপে সম্মেলনে কর্ণহুচী বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। সম্মেলনে আলোচনার সকল সময়েই বিশ্বের বাস্তবসম্পদ, বাস্তব উৎপাদন ও বর্জন প্রভৃতি তৎকালীন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্তার দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়। আবেগ একটি চিন্তাকর্ষক বিষয় আলোচিত হয়—সেটি হইল বাস্তব জনসাধারণের আর্থিক দিক। প্রথম প্রথম নির্ধারিত বিষয়ে অগ্রগত দেশ ও সেদব দেশের সমস্তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১৯০৪ সালে কিনল্যাণ্ডে ঐ সম্মেলনের নবম অধিবেশন অঙ্গীকৃত হয়। ঐ অধিবেশনের আলোচনার সাধারণ বিষয় ছিল—“কৃষিবিদ্যার কারিগরি পরিবর্তনের তাৎপর্য।” উৎপাদনবর্ধক কারিগরি পরিবর্তনই অস্বষ্ট নয়। শুধু যে দুটভাবে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা ও অগ্রিম পরিকল্পনার ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা নয়, উহা মাহুৎসবের প্রাধোষনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চালাইতে হইবে। এখন কোন কোন অঞ্চলে বাস্তব বাস্তবিতা থাকিলেও, বিশ্বের বিরাট অঞ্চলে লোকে অন্যভাবে দিন কাটার, তাহার। মুহুভক্তবে জীবনধারণের সুযোগ পায না। এখনও বহু দেশে বাস্তবসম্পদ ও জনসাধারণ মধ্যে মুহু সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় নাই। মাহুৎসবের প্রচোষনের সহিত বিশ্বের উৎপাদনের সম্পর্ক সংস্থাপন করিতে পাওয়া কঠিন ব্যাপার। ২৪শে আগষ্ট হইতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মহানূরে যে সম্মেলন বসিয়াছিল তাহার মূল বিষয় হইল বিভিন্ন রাষ্ট্রের আর্থিক অগ্রগতিতে পথে কৃষি ও কৃষি-অর্থনীতি কালকর্ষ এবং বিশ্বের বৃদ্ধি আর্থিক কাঠামো গঠন—ইহাব মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের সমস্তা। ৭০টি দেশের প্রায় ২৫০ জন প্রতিনিধি ঐ সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। এখানে শুধু ভারতের নয়, সমগ্র এশিয়ার কৃষি সমস্তা আলোচনা করা হইয়াছে।

জীবনের ক্রমবিকাশ

ত্রিবিমল বে

(পূর্বাহরতি)

অন্যদের এই পারসোনা সর্বদা আমাদের মনের অংশ হইতে প্রতীবেশের সহিত সংগতিহীন অংশ এবং আকাংক্ষাসিক মনের অংগভেদন করে চৈলিয়া দিতেছে। পারসোনা সংগতিহীন এবং গোলমালে প্রতিগুলিকেও সর্বদা অংগভেদন মনে চৈলিয়া পাঠাইয়া দিতেছে। এই সমস্ত অংগমিত অংশ এবং আকাংক্ষাগুলি স্বভাবতই অস্বচ্ছ বিজ্ঞানপূর্ণ এবং অস্বচ্ছ অস্বচ্ছপূর্ণ হয়। এই সমস্ত অংশ এবং আকাংক্ষা চক্কে পূর্ণ চক্কে উপর মসীকৃত মেঘের মত পারসোনাল উপর ঘুরিয়া দেড়ায়। ইহার ঠিক ছায়ার মত সর্বদা পারসোনাল পেছনে পেছনে চলিতে থাকে। ইহার অমানবের মনের পারসোনা যাবে অস্ত সমস্ত কিছু বলা যায়তে পারে। ইহার সর্বদাই অস্বচ্ছ হয় করিবার মত পারসোনাল সহিত বুঝে নিরুক্ত থাকে। কারণ মানবমনের এই নিরুক্ত বিজ্ঞানী সত্তার নাম বিজ্ঞান এ্যানিমা। অস্বচ্ছ এই দুইটি বিচিত্রতাপ নৈতিক বিচিত্রতা নহে। পারসোনা হইলেই যে ভাল হইবে ভাব্য নহে, আবার, এ্যানিমা হইলেই খারাপ হইবে ভাব্য নহে। কারণ বলেন—পারসোনা হইতেছে নামব মনের সুযোগ পরা অংশ এবং আনন্ড আনি এই সুযোগ একজন কঠিন বিচারকের, একজন এককরে অগতিস্থ অথবা অস্ত যে কোনো একপ্রকার জীবের হইতে পারে। অপর দিকে নিরুক্ত (suppressed) বসী এ্যানিমা সবার সর্বদা আমাদের সুযোগদারী অহাটির কাছে প্রার্থনা করিতেছে, আবার কোন সময় হস্ত বিজ্ঞান গোষণা করিতেছে মনের অংশ করে স্থান পাইবার মত। কিন্তু বাস্তবিক এ্যানিমা হইতেছে এমন কতগুলি নিরুক্ত আকাংক্ষা যাহা কেবল মাত্র স্বল্পে তিতর অথবা আমাদের সজ্ঞান মনের কোন অসদৃশ অথবা অসলের অবস্থার অংশের পারসোনাল

আদিয়া উপস্থিত হয়। এই যে এ্যানিমার নিরুক্ত অংশ হইতে বাহির হইয়া আদিয়া অংশের উপর আদিগতা বিস্তার করিবার মত সবার স্বচ্ছ এবং এই এ্যানিমাকে নিরুক্ত করিয়া বাহিবার মত পারসোনাল যে অস্ত চৈলি; ইহারই মত অন্যান্যের মনের উপর অনেক সময় এস্ত বেশী চাপ পড়ে বাহার মতস্বস্ত্য মনের বিকার অংশ প্রাপ্ত হয়। কারণ মনের পুরুষ হইতে মেয়েদের এ্যানিমা অনেক বেশী স্থান জুড়িয়া আছে। তিনি বলেন মেয়েদের সামাজিক জীবন; অর্থনৈতিক অস্বা এবং নারীক পঠন পুরুষ হইতে এস্ত বিচিত্র যে ভাবে হইতে বাস্তবিক ভাবেই মেয়েদের পারসোনা, পুরুষের পারসোনা হইতে ভিন্ন রূপ লইয়া গড়িয়া গঠে। মেয়েদের জীবনে, পুরুষ হইতে, অনেক বেশী বিচার বুঝকে এবং কোনো কিছু করিবার উত্তাপকে বিরোধ করিতে হয়। কাজে কাজেই আমরা যেখিতছি মেয়েদের মনের নিরুক্ত সত্তা বেশী শক্তিশালী। ইহা হইতেই কারণ নিরুক্ত এ্যানিমাছেন যে মেয়েদের এ্যানিমা পুরুষের এ্যানিমা হইতে শক্তিশালী বেশী। কারণ এই নিরুক্তকে অনেককেই কিন্তু যুক্তিহীন বলিয়া মনে করেন না। আমরা ইহার পূর্বে কয়েক এবং এ্যানিমার মতবাহ সত্তা আলোচনার সময়ে যেখিতছি যে কয়েক এবং এ্যানিমার উচ্চতাই মাত্র এবং নিরুক্ত মন এবং উহার উপকরণকে ব্যক্তিগত জীবনের অংগমিত অস্তিত্বতা বলিয়া মনে করেন কিন্তু কারণ বলেন—মানবের মনের নিরুক্ত করে অনেক কিছুই মনগত। কিন্তু কারণ এই মত অনুদরণ করিলে জীবিত্তাকে বিজ্ঞানের সাথে বেশী দূর টানিয়া আনা যায় না। যদিও বিজ্ঞান স্বীকার করেন যে ভাবগত মনগত ভাবে মানব লাভ করিতে পারে, তবুও ইহা আত্ম জীবিত্তা স্বীকার করে যে নির্দিষ্ট প্রকারের চিন্তাপদ্ধতি মনগত হইতে পারে। মানব জীবনে ব্যক্তিগত

মন যখন বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তখন উহার কোনোটি তাহার কাছে গ্রহণীয় হয়। ঠিক তাহার আকার কোনোটি বা তাহার কাছে গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া মনে হয়। এইভাবে মানুষ বিভিন্ন ভাবধারা গ্রহণ করে এবং পরিত্যাগ করে। এই হিসাবে আমরা বলিতে পারি যে মানুষের মন সর্বদাই প্রস্তুত হইয়া আছে তাহার জীবনের উপযোগী ভাবধারাকে গ্রহণ করিবার জন্য এবং অসুপযোগী ভাবধারাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য।

বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যেমন অল্প পরিমাণ বেহসত এবং মস্তিষ্কগত প্রভেদ বর্তমান, ঠিক সেইরূপ বিভিন্ন মানুষের মনের বিভিন্ন ভাবধারাকে গ্রহণ অথবা বর্জন করিবার ক্ষমতা ভিতরেও প্রভেদ খুব অল্প বর্তমান। আগে বলেন—আমাদের এই গ্রহণ অথবা বর্জনক্রিয়ার অনেক সময় আমাদের চেতন মনের চোখে ধুলি দিয়া বিভিন্ন ভাবধারা আমাদের অচেতন মনে বাইরা স্থান লয় এবং সর্বদাই চেতন মনে আসিয়া উঠিবার সুযোগ বৃদ্ধিতে থাকে এবং যখনই মানুষ তাহার চেতনার বাঁধ হারাইয়া ফেলে তখনই অচেতন মনের অবলম্বিত ভাবধারা, কামনা বাসনাগুলি ছড় ছড় করিয়া অচেতন মনের অন্ধ গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া চেতন মনকে ভাসাইয়া দিয়া তাহার সুযোগ ভাসিয়া ফেলিয়া মনের দ্বার সমস্ত বন্ধিত এবং সজ্ঞান চিত্তাবাহাগুলিকে তাৎপশোল পাকইয়া একাকার করিয়া দেয়। আগে বলেন, এই যে মানুষের মনের অচেতন গুহা ইহাতে অনেক কিছু ভগ্নগত ভাবে আসিয়া স্থান লয়।

আগে বলেন—মানুষের এই ভগ্নগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নির্জান মনঃসমুদ্রের উপরে তাহার ব্যক্তিগত অহং উহার 'পারসোনা'-সহ সজ্ঞানতার পূর্ণ আলোকে অবস্থান করিতেছে এবং তাহার ব্যক্তিগত এ্যানিমা মনঃসমুদ্রে তলদলেরে অঙ্ককায়ে অবস্থান করিতেছে। পূর্বেও বলা হইয়াছে এবং আবারও বলিতেছি যে, বিজ্ঞানের এই নব অধ্যায় এখন বাঁট বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর বৈজ্ঞানিক কাঠামো লইয়া ঠাঁড়াইতে পারে নাই। তাই এই বিজ্ঞানের সত্যগুলি প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণরূপেই আমাদের উপর উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। ইহা যখন সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর বৈজ্ঞানিক কাঠামো লইয়া

ঠাঁড়াইবে তখন আমাদের এই বিষয়ের সত্যগুলি প্রকাশ করিতে আর উপরার উপর নির্ভর করিতে হইবে না। তখন এই সমস্ত সত্য সম্পূর্ণরূপেই বৈজ্ঞানিক ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হইবে। তখন হইতে আমরা যেনিতে পাইব আর রূপগতভাবে বিষয়টি আমাদের কাছে যে আকার লইয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে এই সমস্ত রূপ অমেকবাদি অরূপ। সেহি, আর এই রূপগতভাবে প্রকাশ করিবার জন্য সত্যটি যে আবিলম্ব লইয়া আমাদের কাছে আসিতেছে এবং তাহার জন্য এই সমস্তের বাঁট রূপটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না, সেই আবিলম্ব হইয়া সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের গৌরবে আমাদের সামনে অনাবিল উজ্জলতা লইয়া ফুটিয়া উঠিলে। কিন্তু সেইদিন না আসা পর্যন্ত আমরা ইহাকে জীববিজ্ঞানের কোঠার স্থান দিতে পারিব না। সে বাহা হউক, আগে বলেন—এই যে ব্যক্তিগত নির্জান মন, ইহা হইতেই আমরা সাধারণ ভাবে মানুষ-প্রজাতির নির্জান মন সংক্ষেপে একটা ধারণা লাভ করিতে পারি। আগে-এর মতে পূর্ণ জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নির্জান মন ঠিক করিয়া দেয় আমাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য প্রতিবেশ এবং ইহাই উল্লেখ করে আমাদের জীবন পথের কোনো কোনো ভাবধারাকে গ্রহণ করিতে থাকে কোনো কোনো ভাবধারাকে ত্যাগ করিতে। এক কথায় বলিতে গেলে ব্যক্তিগত জীবন, প্রতিবেশের সহিত প্রতিবেশনশীলতার মান এবং রূপ ঠিক করিয়া দেয় মানুষের ঐ নির্জান মন। ঠিক যেমন নাকি বগ এবং মস্তিষ্কের অনুরূপ অনুরূপ দমেরে অঙ্গুলর ব্যাংগালপের মূলে বহিয়াছে ব্যক্তিগত জীবনের অদ্বৈত অবস্থান কামনা-রাশি দ্বারা মনের নির্জান গুহে থাকিয়া সর্বদাই সজ্ঞান মনে আসিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ঠিক সেই প্রকারই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন ভাবধারাকে গ্রহণ অথবা বর্জন এবং আমাদের প্রতিবেশের সহিত প্রতিবেশনশীলতার মূলে বহিয়াছে আমাদের ভগ্নগত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নির্জান মন। আগে আরও বলেন—কাহারও কাহারও জীবনে পারসোনা ফোতি (inflation) লাভ করে। কাহারও কাহারও পারসোনা তাহার জীবনের

অন্যকে ছাড়াইয়া এতদ্ব্য চলিয়া যায় যে সেই ব্যক্তি তখন তাহার ব্যক্তিগত সত্তা হারাইয়া ফেলে। তখন যে তাহার ব্যক্তিগত কর্ণে অথবা নিষেধ জাতি (race) অথবা তাহার কোন প্রিয় হেতুভার সহিত নিজের সম্বন্ধে মিলাইয়া যেবে। তখন তাহার ব্যক্তিগত জীবন বলিয়া কিছু থাকে না। তাহার জীবনের সমস্ত কিছুই মিলাইয়া যায় তাহার জাতিত্ব ভাল মন্দ অথবা তাহার কর্তব্য অথবা তাহার প্রিয় হেতুভার সহিত। এই ব্যক্তিগত জীবনে পারসোনাল ফীতি, তক্তি এবং আত্মবিশ্বস্তির পথে চরম পরিশ্রুতি লাভ করে। ব্যক্তিগত জীবনে পারসোনাল ফীতি না হইলে তথাকথিত স্বর্ণের মদিনা এবং জ্ঞান অথবা ব্যক্তিগত অতিমানবতায় কোঠার পৌছাইয়া যায়। এই দিক দিয়া যেখানে গেলে লগ্নতের সমস্ত মহাপুরুষ ফীতি পারসোনাল (inflated persona) হইতে মানব বলিতে হইবে। এই দিক দিয়া যেখানে যৌত, বুদ্ধ, গান্ধী অথবা রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির এক একজন ফীতি পারসোনাল হইবে। অপরদিকে এ্যানিমাও ক্যাপিয়া উদ্ভিন্না নিষ্কান মনঃশুদ্ধির অধঃপাটিকে ভাসাইয়া দিতে পারে। ফীতির (inflation) ভালর দিকও যথেষ্ট বর্তমান। ইহা ব্যক্তিগত চুঃখ কষ্ট হইতে উদ্ধার পাইবার একটি প্রথম পথ। ব্যক্তিগত সত্তা একট: সুখ জাতিগত সত্তার মধ্যে যে মানুষ বিলাইয়া দিয়াছে তাহার নিষ্করই ব্যক্তিগত সুখ চুঃখের বালাই নাই। পারসোনাল ফীতির স্থান মানুষের বর্ষ জীবনে অনেকখানি। মানুষের প্রকৃতিগত উন্নতির বেলায়ও ইহার স্থান যথেষ্ট বর্তমান। আগে বলেন—সুখ সম্বন্ধে পৃথিবীর সত্যত্ব জাতিগুলির মধ্যে পাইকারি ভাবে পারসোনাল ফীতি বর্তমান।

এই হইতেছে, অতি সংক্ষেপে, আগের মানস সত্তা সম্বন্ধে নতামত। ইহা মনে রাখা যাকার যে আগের এই মতবাদের সন্ধানই বর্তমানে কেবল কল্পনা মাত্র। এই মতবাদ এখনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে নাই এবং এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লওয়া হয় নাই। কিন্তু এই মতবাদের সূত্রগুলিকে যদি আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতায় সহিত মিলাইয়া যৌত তাহা হইলে যেখানে যে আগের মতবাদের সূত্র-

গুলির সাথে তাহা অনেকটা মিলিয়া যায়। আমাদের চাৰিপার্শ্বের অনধঃপের আচরণ যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহা হইলে যেখানে যে আগের মতবাদের সাথে তাহার বহুলাংশের মিল বর্তমান। আমরা এক সময় যে বিষয় লইয়া আলোচনা করিলাম তাহাকে ঠিক বিজ্ঞান অথবা ঠিক সাহিত্য ইহার কোনটাই বলা চলে না। ইহাকে সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের সীমান্ত ঘেঁষের একটা কিছু বলা চলে। জীববিজ্ঞান দিখিতে যাইয়া ইহা দিখিবার অর্থ হইতেছে—এই বিষয়টি এত অধিক অতিভাবীয় (suggestive) যে ইহা মানব মস্তিষ্কের চিত্তাশীলতা এবং মানব মনোভাব এক বিশ্বকর উদাহরণ বলিলেও বেশী বলা হইবে না। ইহারই সাথে যখন মনে হয় সেই আধুনিক প্রোটোপ্রাগম অথবা তাহারও পূর্বে বস্তুগত অজ্ঞা অথবা হইতেই বস্তুগত ক্রমবিকাশের পথে কোটি কোটি বছরের কোটি কোটি প্রকারের নব নব বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া ক্রমে, আগ প্রকৃতি মনোভাব মস্তিষ্ক যাইয়া পৌছিয়াছে, তখন এই সমস্ত বিশ্বকর চিত্তাধারগুলিকে বার দিয়া খেলে মনে হয় যেন জীবলগ্নতের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎকর্ষকেই বার বেওয়া হইল। এইজন্য এই সমস্ত মতবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না পাইলেও, মনে হয় কেবলমাত্র মানব মস্তিষ্কের বিশ্বকর চিত্তনক্ষমতার নিরূপণ হিমায়েত জীববিজ্ঞানের আলোচনার ভিতর স্থান পাইতে পারে। মনোবিশ্লেষণের এই নব পট-ভূমিকায় আমরা মানুষের সমগ্র জীবনের আলোচনা এবং ব্যবহার পরিচালিত করিতে যেখানে পাইতেছি পারসোনালকে। ব্যক্তিগত জীবনে চালচলন এবং ব্যবহারের পরিবর্তন ব্যক্তিগত জীবনের পারসোনাল পরিবর্তনই স্থিতি করে। যখন একজন লোককে শ্রুতন এবং মনঃ ব্যক্তি বলিয়া আখ্যা দেই; আগের মতে তখন সেই লোকটি ভাল এবং পারদর্শী পারসোনাল দ্বারা পরিচালিত হইতেছে ভাল এবং পারদর্শী মানবের যেমন বিত্তগত অথবা বার ঠিক সেইরূপ ভালমন্দের ও মানবের বিত্তগতের মত বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবেশে পারসোনাল ভালমন্দের ও মানবের বিত্তগত আদিত বর্ণ্য। আমরা পারসোনাল আমাকে,

আমার সমাজ জীবনে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবে যাতে আমাদের নির্দিষ্ট সমাজ জীবনের বৃদ্ধিভঞ্জে আমি মহৎ এবং সুজন বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। কিন্তু বাঙ্গালী সমাজের পারসোনা একটি মানুষকে যেভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবে; আফ্রিকার নিগ্রোসমাজের একটি পারসোনা, একজন নিগ্রোকে ঠিক সেই ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিবে না। কারণ বাঙ্গালী সমাজের ভালমন্দের মানবত্ব এবং নিগ্রোসমাজের ভালমন্দ এক নহে, সেই জন্যই নিগ্রো সমাজের মহৎ পারসোনা আর বাঙ্গালী সমাজের মহৎ পারসোনা এক হইবে না। একটি দুর্বল পারসোনার কোনো স্থিতি নাই। তাহা সর্বদাই পরিবর্তনশীল। অপর দিকে যে সমস্ত লোকের আত্মনিয়ামক শক্তি খুব দুর্বল তাহাদের এ্যানিমা খুব শক্তিশালী হয়। মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই এ্যানিমা হইতে উদ্ধৃত আবেগগুলিকে আমাদের পারসোনার সহিত খাপ খাওয়াইয়া গ্রহণ করিতে চায় এবং ইহার জন্য অনেক সময় আমরা আমাদের পারসোনার কিছুটা পরিবর্তন সাধন করি। আমাদের বিজ্ঞানিকা এবং নীতিশিক্ষা আমাদের পারসোনাকে সামাজিক প্রতিবেশের অনুরূপ করিয়া গঠন করিতে চেষ্টা করে। আমাদের মানসিক সমস্ত প্রকার অনুস্থার কারণ, ইতিহাস, নিউরোপ্লেজিমা এবং মানসিক শক্তি সোপ পাওয়া হইতেছে এ্যানিমা এবং পারসোনার বশ। সমস্ত প্রকার মানসিক কনফ্লিক্ট যে এ্যানিমা এবং পারসোনার বশ ততো নহে। অনেক সময় এ্যানিমা এবং পারসোনার নিজেদের ব্যত্যয় ভিতরই বিভিন্ন বিষয় লইয়া কলহ আরম্ভ হয়। এইরূপ ভাবে অনেক সময় পারসোনা এবং এ্যানিমা উভয়ের মধ্যেই অসঙ্গতি (self-contradiction) দেখা যায়। এই হইতেছে অতি সংক্ষেপে ল্যাং-এর মতবাদ। পরিবেশে আবার পাঠকগণকে দ্বন্দ্ব করাওয়া যিতেছি যে তাহারা যেন ইহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া ধরিয়া না যেন। ইহাকে বড়োবো একটি কার্যকরী প্রকল্প (working hypothesis) হিসাবে গ্রহণ করিতে পারা যায়। ইহা একটি সত্যে পৌছাইবার যাত্রাহুল মাত্র। পর পর কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা চেষ্টা, প্রতিবর্তক্রিয়া, সংকীর্ণ এবং

মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারা লইয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি, বর্তমানে আমরা কয়েকটি অধ্যায়ে সেল বিভাজন (cell-division), গ্যামিট (gamet), ক্রোমোসোম (chromosome) এবং ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন দ্বারা যে সমস্ত প্রাণীর জন্ম হয় তাহাদের গৌণ বৈচিত্র্যের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই আলোচনার দ্বারা আমরা খাঁটি প্রাণীবিজ্ঞান অধ্যায়ে বাইরা পৌছাইব।

জীবনের কোষ কি ভাবে বংশ বিস্তার করে :—
প্রত্যেকটি জীবিত কোষ পূর্ববর্তী একটি জীবিত কোষ হইতে উৎপত্তি লাভ করে, প্রত্যেকটি জীবেরই একটি মাত্র ডিম্বকোষের লক্ষ লক্ষবার বিভাজন দ্বারা বহুসৌ ত্বন (multiplication) দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। একটি মাত্র জীবিত ডিম্বকোষ উহার জীবন পূর্বে বিভক্ত হইয়া দুইটি হইয়া যায়। ঐ দুইটি আবার চারটি হইয়া যায়। তারপর আটটি; দোশটি; এই ভাবে বিভক্ত হইতে হইতে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবেরই গঠিত হয়। আমরা যদি একটি জীবিত জীবকোষের বিভাজন ক্রিয়া লক্ষ্য করি তবে দেখিতে পাই যে একটি প্রোটোজোয়া যে ভাবে নিজের বেহকে বিভক্ত করিয়া বংশবিস্তার করে ঠিক সেই ভাবেই একটি জীবিত ডিম্বকোষ নিজেতে ভাগিয়া ভাগিয়া জীবেরই কোষ সৌভিক বড়াইয়া দেয়। বস্তুত পক্ষে একটি জীবেরই কোটি কোটি জীবিত কোষের এক অপূর্ণ সমষ্টির ছাড়া আর কিছু নহে। ঠিক যেমন নাকি একটি বিরাট সৌর লক্ষ লক্ষ ইট দ্বারা তৈরি হয় ঠিক সেইরূপ কোটি কোটি জীবকোষ একটির উপরে একটি বিভিন্ন উপায়ে স্থাপিত হইয়া বিভিন্ন যাপের জীবেরই গঠিত হয়। কোষগুলির বিভক্ত হইবার প্রণালীও অতি বিভিন্ন। আমরা যেখানে পাই এক একটি চলমান প্রোটোজোয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া বাইরা, উহার নিজ বেহ হইতে উৎস্কৃত প্রোটোপ্লাজমের অনুরূপ অণুগুলি নিজের বেহের ভিতর টানিয়া লইতেছে এবং একটি প্রোটোপ্লাজমের গোলাকার পিণ্ডে পরিণত হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় পরিণত হইলেই বৃদ্ধিতে হইবে প্রোটোজোয়ার বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি পূর্ণাঙ্গ প্রোটোজোয়ার পরিণত হইতে বাইতেছে। প্রোটোজোয়ারি বেহের উপবিভাগের পরিবর্তনের মাধ্যমে

সাথে উহার বেহের অভ্যস্তেরও পরিবর্তন হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেলের গঠন সম্বন্ধে পূর্বের একটি অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। কয়েকই এখানে বলার প্রয়োজন নাই। আমরা আনি স্বাভাবিক অবস্থার সত্য একটি কোষের ভিতর সাইটোপ্লাজমের দুর্বল প্রোটের ষ্টিক মাঝখানে গোলাকার একটি নিউক্লিয়াস অবস্থান করিতেছে এবং এই নিউক্লিয়াসের ভিতর ক্ষুদ্রতর একটি অণু একাধিক বীচলমান নিউক্লিয়াস বর্তমান। কোষটি বিধা বিভক্ত হইবার ক্ষুদ্র বহন গোলাকার পিণ্ডে পরিণত হইয়াছে অমনি উহার মহাবৃত্ত নিউক্লিয়াসগুলি এক ঝাঁক ধূসর বর্ণের গ্রেগুলার পরিণত হইয়াছে। ইহার পর আমরা দেখিতে পাইতেছি আণুবীক্ষণিক গ্রেগুলারগুলি একটির গায়ের আর একটি লাগিয়া লাগিয়া কতকগুলি ছোট বড় আণুবীক্ষণিক হত্যার মত পরস্পরে পরিণত হইয়াছে। ইহার পর আমরা দেখিতে পাই এই ক্ষুদ্র হত্যার মত পরস্পরগুলি বাকিয়া মোচড় খাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এইরূপ মোচড় খাইতে খাইতে মনস্ত ক্ষুদ্র হত্যার মত পরস্পরগুলি, তাপপাকান এক ঝাঁক ইল নাহে একটি পেটিকার মধ্যে চলিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে যে প্রকার ঘোষার গ্রেগুলারগুলি ঘাড়া গঠিত ক্ষুদ্র হত্যার মত আণুবীক্ষণিক পরস্পরগুলি, বর্তমানে ষ্টিক সেইরূপ ঘোষাইতেছে। এই পরিবর্তনের পরে আমরা দেখিতে পাইতেছি দীর্ঘকোষের মহাবৃত্ত নিউক্লিয়াসের চৌহদ্দি অস্তিত্ব হইয়াছে এবং ষটপাকান ক্ষুদ্র হত্যার মত পরস্পরগুলি বর্তমানে অপেক্ষাকৃত স্থল ক'একটি 'রড'এ পরিণত হইয়াছে। এই ক'টিকে বলা হয় ক্রোমোসোম। এই ক্ষুদ্র বড়কটিই হইতেছে আমাদের দীর্ঘনের আদি এবং ইহার সংখ্যার বিভিন্নতাই বিভিন্ন প্রজাতির সৃষ্টি করিতেছে এবং এই ক্রোমোসোমের বিভিন্নতাই দীর্ঘের যৌন বিভিন্নতা নিৰ্দিষ্ট করিয়া দিতেছে। এই বিষয়ে পরের ক'একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা যাইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নিউক্লিয়াসের চৌহদ্দি অস্তিত্ব হইয়া সাইটোপ্লাজমের প্রোটের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তারপর আমরা দেখিতে পাইতেছি—দেগদেগের দুই প্রান্তেই সক্রিয়তা ঘোষা বিধাছে এবং এই দুইটি সক্রিয় স্থান দুইটি ক্ষুদ্র ঝিকা গুলব বর্ণের হত্যার মত পরস্পর ঘোষা সংযুক্ত

হইয়াছে। সক্রিয় স্থান দুইটির ভিতর সংযোগ স্থানকারী ক্ষুদ্র হত্যার মত পরস্পর ক্রটির দুইপ্রান্তেই বর্তমানে একত্রিত হইয়া দুইটি ক্ষুদ্র তারকার আকার গ্রহণ করিতেছে। এই তারকার স্থান দুটিকে প্রাণীক বলা হয়। বর্তমানে সেলের ভিতরের ক্রোমোসোম কটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া তারকার স্থান দুটিতে স্থান নিয়াছে। কোষটির ভিতর বিধা বিভক্ত হইবার প্রথম অবস্থা হইতে পূর্ব কথিত অবস্থার আগিতে আট মিনিট নাক্ত সময় লাগে। সেল বিভাজন সম্বন্ধে এত সময় আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা কেবলমাত্র আন্তঃ বিভাজন ক্রিয়ার মতন বলা যাইতে পারে মাত্র। এই মতনই অধ্যায় বলা যাইতে পারে, নিউক্লিয়াসের ভিতরের নিউক্লিয়াসগুলি কতকগুলি গ্রেগুলার পরিণত হইবার পর হইতে পূর্বকথিত অবস্থার আসিয়া পৌঁছান পর্যন্ত। ইহার পথেই আন্তঃ সেল বিভাজন আরম্ভ হয়। বর্তমানে সেলটির ভিতর একযোগে কতকগুলি পরিবর্তন ঘোষা গিয়াছে। সেলটি লম্বা হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সেলটির মধ্যস্থান সরু হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার সাথে সাথেই সেলের ভিতরে ক্রোমোসোম ক্রটি লম্বাঘটি ভাবে দুই ভাগ হইয়া সেলটির দুই প্রান্তেই চলিয়া যাইয়া স্থান লইতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রোমোসোম কটির বিধা বিভক্ত হওয়া এবং দুই প্রান্তেই ঘোষা যাইয়া স্থান লইতে আরও পাঁচ মিনিট সময় লাগে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সেলটি বর্তমানে লম্বা হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রোমোসোমগুলি সম্পূর্ণ ভাবে, প্রত্যেকটি বিধা বিভক্ত হইয়া, সেলের দুই প্রান্তেই ঘোষা যাইয়া স্থান লইবার পর এই বিশ্বকর ঘোষাপূর্ব ভিতর এক অস্বস্ত সক্রিয়তা ঘোষা ঘেয়। দ্রুত স্পন্দনশীল সেলকেই ভিতর বর্তমানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদবুদ ভাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই বুদবুদগুলি ভাগিয়া উঠিয়া অল্প সময় পরেই আবার মিশাইয়া যাইতেছে। এইরূপ বুদবুদের ভাগিয়া ওঠা এবং মিশাইয়া যাওয়া ছয়মিনিট সময় পর্যন্ত চলিতে থাকে এবং এই বুদবুদের ভাগিয়া ওঠা প্রত্যেকবারই উহার পূর্বের বার হইতে দ্রুততর হইতে থাকে। ইহার পর ষট্য প্রলম্বিত সেলটি সরু হইতে আরম্ভ করে এবং সরু কটিবেশের মত স্থানটির দুই বিকির দুই অংশের ভিতর

বিকৰ্ণ ক্রিয়া আরম্ভ হয়। দুইটি অংশের প্রত্যেকটি একটি হইতে অঙ্গঙ্গ হইয়া অপরটির উপর। বিকল্প ক্রিয়া হইতে চার। কিছু সময় পর সৰু কটিদেশটি ছিঁড়িয়া যায় এবং বিতৰ্ক সেলটি দুইটি পূর্ণাঙ্গ সেলে পরিণত হয়। যিথা বিতৰ্ক হইবার মাঝে মাঝে সেলকেই বৃদ্ধি ওঠা এবং কণ্ঠন বদ্ধ হইয়া যায়। এখন এই সেল দুইটি তাৎক্ষণিক নিষ্কল জীবন আরম্ভ করে। সেলটি বিতৰ্ক হইয়া দুইটি সেল হইয়া বাইবার সাপে মাঝে উহার ভিতরও পূৰ্ণ অবস্থায় কিহিয়া যাইবার ক্ষমতা পৰিচরিত আনয়ন হয়। সেলকেই ভিতর কোমোসোম তরুটিতে যিহিয়া একটি পরিণত মণ্ডল উত্তরায় হইয়াছে এবং এই মণ্ডলকে যিহিয়া একটি (membrane) সিল্লী দেখা দিয়াছে। বীরে বীরে কোমোসোমগুলি পূর্ণের মত চটুচটে খোলাটে পরাণে পরিণত হইয়া বিল্লী এবং পরিণত মণ্ডলটিই একটি স্বাভাবিক সেলের নিউক্লিয়াসে পরিণত হইয়াছে। এই প্রকারে একটি মেসোস (metosis) নিউক্লিয়াসের মত অর্ধ বণ্টা সমস্ত বহুকার সময় এবং নিউক্লিয়াসের পূর্ণ অংশ যিহিয়া আসিতে এক বণ্টা হইতে দুই বণ্টা প্রয়োজন হয়। সেলকেই কোমোসোমগুলি আকারে গতিপ্রতা দেখা যায়—কোনোটি হয়ত লম্বা আবার কোনোটি হয়ত অপরাক্রান্ত ছোটো, কোনোটি হয়ত আবার বাক, বহুকেই মত। প্রত্যেকটি সংযোগ স্থাপনকারী তন্তুর টিক মাঝখানে দুইটি করিয়া ক্রুটিক বর্তমান। এই ক্রুটিক

দুইটি প্রত্যেকটি তন্তুর টিক মাঝখানে থাকে এবং উহাকে সেনট্রোসোম (centrosome) বলে। এই ক্রুটিক করটি অঙ্গ ক'এক নির্দিষ্টের মধ্যে সেলের বগটির (spindle) মধ্যে সক্রিয়তা লাগাইয়া তোলে এবং বগটির কোমোসোম গারণকারী প্রান্ততঃ দুইটিতে বাইয়া উপস্থিত হইয়া বিশাভিতৰ্ক কোমোসোমগুলিকে তাৎক্ষণিক স্বাভাবিক আবার বলে প্রেরণ করে। এই সমস্ত সক্রিয়তার যে কি কারণ তাহা এখনও মাঝবিজ্ঞান বলিতে পারে না। আবার এই পর্যন্ত বলা হইতে পারে যে নিউক্লিয়াসের আন্তঃবিলাপ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর সেনট্রোসোম উভূত শক্তি স্বাঃ যিথা বিতৰ্ক কোমোসোম-গুলির স্বাভাবিক স্থান গ্রহণ করা পর্যন্ত সমস্তই জীবনের মত এবং জীব অভিযুক্তিঃ মত নিষ্করই একান্ত প্রয়োজনীয় সক্রিয়তা। একটি সেল বিভাজনের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য-জনক ব্যাপার হইতেছে কোমোসোমগুলির প্রত্যেকটি লম্বালম্বিতাবে ভাগ হইয়া যাওয়া। জীববিজ্ঞান বলে যে এই কোমোসোমগুলিই হইতেছে প্রত্যেক প্রজাতির বংশবৃদ্ধির পক্ষে এবং প্রত্যেক প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য বলায় বাবিস্বার মত অচ্ছেদ্যভাবে প্রয়োজনীয়। ইহাই যদি সত্য হয় তবে আমাদের যিহিয়া লইতে পারি প্রত্যেকটি সেলবিভাজন দ্বারা যে নতুন দুইটি সেল হয়; উহাদের প্রত্যেকটির ভিতর উহাদের মননী সেলটির (mother cell) সম সংখ্যক কোমোসোম থাকিতে বাধ্য।



বেকার

হিরণ্ময়ী বসু

সমস্ত সংসারেটা যেন চেয়ে থাকে চন্দ্রনাথের মুখের দিকে। ছুঁব সম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজন মুখও বংশন; চন্দ্রনাথের বংশের চন্দ্র, ওর ভোগ্যভিভেদেই আনন্দ। উজ্জল। বেশরকারী কোন কার্যের উচ্চপদস্থ অফিসার চন্দ্রনাথ শুধুকে চেনে না পাড়ার বা অফিস মহলে এমন লোক নেই।

পাড়ার বরজ্জর চন্দ্রনাথের কাছে আসে পরামর্শের জন্যে, ছেলের চাকুরির উন্মোচনীতে। পাড়ার ছেলেরা আসে লাইব্রেরী আর সরস্বতী পুস্তকালয় মোটা টাকা চাঁদার জন্যে। মহিলারা আসেন সেলাই ইগুনের ভোনেমান খাতার সহী করতে।

চন্দ্রনাথ কাঁচকে বিমুখ করে না, কমতাহুবারী সাহায্য করে। চন্দ্রনাথের বাবা হবনাথ ও না তারামহৌ বড় ছেলের প্রশংসায় সর্বদাই পল্লবুধ। আরও চারটে ছেলে আছে তাঁদের, কিন্তু বাতের পাঁচ আত্মল তো সমান নয়, তাভাও ভোকপত্তী, কিন্তু চন্দ্রনাথের নত কেও নয়।

বাড়ীতত্ত্ব লোক গর মস্ত্রে সবাই শব্দগত। চন্দ্রনাথ ছদ্ম থেকে উঠেই যাতে বেড়-টি পায় সেদিকে তার স্ত্রী বেগুণ কড়া দৃষ্টি। মানের ভল যোতালার বাথরুমে চাকরকে নিয়ে তুলিয়ে রাখে, তা জলখাবার তাত টিফিন সব কিছু বড়ি করে চন্দ্রনাথের মুখের সামনে এগিয়ে দেয় বেগু। বেশ কিছুদিন বিয়ে হয়েছে অবস্থাপন্ন ধবের মেয়ে, যেখতেও স্ত্রী। চন্দ্রনাথের পরেও ছুই ভাই শিবনাথ ও কালীনাথেরও বিয়ে হয়েছে। শিবনাথের স্ত্রী শত্ৰুতলা মধ্যবিত্ত ধবের মেয়ে, সংসারে বেশ মানিয়ে নিয়েছে, ক্যান না বলে তার এককণ্ঠ চলে না। কালীনাথের বড়ী মৃগাল নিয়মবাহিত ধবের মেয়ে, সংসারের হেঁসেলেই পাটটা জ্বরের পর থেকে তার হাতে। বাওড়া হাওগার কোন ক্রটি হলে অপর ছুই করে মুখ টিপে হাসে। বেগুণ মুখের উপরেই বলে আচ্ছা ও বেচারীর ঘোষ কি? ওসব রান্না আনার বাসের বাড়ীতে হামেনা হয় বলে দললের বাড়ীতেই

যে ধবে তার কি মানে? শত্ৰুতলাকে বলে। আপনার অন্তরায় যার না, মৃগালকে আমোদের তৈরী করে নিতে হবে, বেচারী পটলের দোলমা গড়তে শিবধে কি করে বসুন। ষাওনি, কহেও নি কোনদিন।

তাঁড়ারটা তারামহৌ নিজেই বার করে যেন; তাড়ার পর বলে দেয় বেগু আর শত্ৰুতলা, কিন্তু কুটনো কোটা, নাছ কোটা প্রত্যেকের বাবার সমস্ত মাসিক বেওয়া, পান লালা, সবই প্রায় করতে হয় মৃগালকে।

যোতলায় মাত্র দুখানি ঘর। একটিতে থাকেন কর্তা গিন্নি, অপর দিকের দক্ষিণ-খোলা ঘরটি চন্দ্রনাথের। এক তলার ভাল ঘরখানি শত্ৰুতলার; গিন্দির পাশে ছোট ঘরটি মৃগালের। প্রত্যেকের সবই পাখা আছে, নেই শুধু মৃগালেরটার। একদিন অফিস যার ঘরবার মুখে চন্দ্রনাথ পল্লীটা কেলে আসে উপরে। সামনে কেও ছিল না, কাম্বই চন্দ্রনাথ মৃগালের ঘরবার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ছোট বোমা আমার ব্যাগটা এনে হাও তো চট করে। মৃগাল তাকাতাড়ি বার হয়ে এল ঘর থেকে বর্ধাক্ত কলেবরে। চন্দ্রনাথ ওর মুখের কচি মুখটা সরল রাখা লক্ষ্য করে হুপা এগিয়ে ঘরে ঢুকে গিলি এও দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বেশ—ক্যান নেই। মুখে আর কোন কথা না বলে সেইদিনই অফিস কেবল মৃগালের অন্ত গিলি ক্যান নিয়ে আসে। শত্ৰুতলা ঠাট্টা করে বলে; ও মিছা, মারাত্তত যেন আবার পাখা চালিয়ে শুয়ে না, নিউমোনিয়া ধরে যাবে, অন্তাল নেই তো?

একটা বড় সংসারের স্থপঞ্জিত রূপটা—সকলকে মুগ্ধ করে। ধাপে ধাপে সম্মান আর প্রতাপতির শিবধে শুধু পরিবার অধিষ্ঠিত হয়। সমগ্র ঐশ্বর্য আর আড়ম্বরের তলার মৃগ ধরা মনতলোর কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় না।

বাড়ীতে ছেলেমেয়ের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। বেগুণ

তিনি কতটা বড়। শতুস্তলার ছুটি আর বেচারী দুপালের একটি মাত্র খোকা। একমাত্র এইদিক দিয়ে সংসারের গুর সন্ধানটা বন্ধায় রেখেছিলেন যা বড়ী। বহু কষ্ট নাটিকে কোলে করে বিবৃত করালে বলে গড়গড়া টানেন, বড়-বাড়ব এলে সর্গোরবে নাতির প্রাণলো বধেন, এমন কদ-অম্মা ছেলে নাকি বলে কারো হয়নি। ছেলোটো মস্তাইই কালোনাথ লটারির টাকা পেয়েছে। মোটোহুটি ছেলের ঘোঁলেই দুপালের এমন অনেক প্রতিপত্তি বেড়ে গেছে। গিঁড়ির পাশের ঘর থেকে একেবারে ছাতের চিলে কেটোয় গুর প্রমোশান হয়েছে। কাজ করের চাপ গড়লে তাবোবদী দুপালের সঙ্গে অস্ত্র বোয়োরবও হাত লাগাতে বলেন। কোথা কালিয়া একে দুজি সব কিছুই এখন দুপালের মত কেউ তৈরী করতে পারে না।

বেশ যখন মহন গতিতে সংসারের চাকটি গড়িয়ে চলছিল এখন সময় ক্যালার বাগাল চরনাথ। বিশেষ একটা ব্যাপারে ম্যানেজিং; বোর্ডের এর অস্ত্রভ ভিটেইদের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটতে চাকরিতে বিল ইন্ডাক। বহুনাথ বহুদিন রিটারার করেছেন। পেনসন একটা পান বটে, কিন্তু চরনাথের মোটা আয়টাই ছিল শুধু পরিবারের কংক্রিট পিলার। তিনি তো মাথার হাত দিয়ে বসলেন; এমন দুর্ভতি আমকালকার ছেলেদের। অমন ছেলের মুখ দেখত পাপ।

চরনাথ মনে করেছিল মানবানেকের ভেতরেই চাকরি একটা যোগাড় করতে পারবে কিন্তু ভাষ্য বিরূপ, বল। সংসারে স্থি চাকরের সংখ্যা কমানো হল, মলখাবাদের কল নিষ্টি বার গেল, দুগুরটা ছাড়া ক্যান চালানো নিবিড় হল, এমনিতবো কত কি। তবু ঐ পান না তারাবো। বিরক্তিতে বলেন, গভা কতক মেয়ে তোমার বড় বোমা, তবুওর মুখ চাইবার লোকও একটি অম্মালো না। মেয়েদের ছব একার সানু বালি বিশেল হাত, হু খাওয়ানো আর চলবে না।

শাতড়ার উপর মেলাক দেখাতে পারে না বেগু। সেটা উম্মল করে নেয় চরনাথের উপর। অনেকবার চা খাওয়া অম্মাল ছিল চরনাথের। বেড্টি আর মলখাবাদের পাট উঠে গেছে, সকাল মন্ডো দু কাপ চা, তাত নোট

নেমে গিয়ে খেতে হয়। বাড়তি এক কাপ চা চাইলেই বেগু চাকরির করে ওঠে; কতগুলো চাকরি বাগান অম্মা আছে শুনি? মেজ ঠাকুরপো চা আনে, পনমো দিনের আগে শেষ হলে আর বকে রাখবে না। দুপাল চুপি চুপি এক কাপ চা করে চরনাথের ঘরে দিয়ে যায়। নিষেধ খরচায় চুপ কিনে বেগু কোলের মেয়েকে আর নিষেধ ছেলেকে খাওয়ান। শতুস্তলার অবস্থার চাইতে দুপালের অবস্থাই এখন সংসার ভাল, বিশ ওয়া সেটা জাতির কবত, দুপাল তা পারে না।

একটি একটি করে প্রায় সাত আট মাস কেটে গেল। সংসারে দ্বীতমিত অস্ত্র অবনত। দুপাল বইজার ঠাকুর ছাড়িয়ে রান্নার ভার নিলো নিজে। অবিপ্রান্ত পতিশ্রমেও গুর মুখের হাসি মিলার না। শতুস্তলার আর বেগু সব মন্ডরেই বলে : যেমন ধরে মেয়ে, তাইতেই শইরে নিলে আমবা তো এক পারছি না তাই। আঙনের তাত ছলনের কারোই নহ হয় না। শাতড়ো বুড়া মাথায়, ছুপা রান্না দুপালকেই করতে হয়, সেই সঙ্গে পরিবেশনও। বাস্তাও যা হয় তা না করলেই নয়, সব চাইতে কষ্ট চরনাথের। সেটা বুঝেই অসুস্থ করেই যেন দুপাল আলাদা করে সামান্য বি ভাত্রে ঢেলে দেয়, যেমন করে হোক দু টুকরো ভাতা তার মত্রে করে, নাছের বড় টুকরোটো চরনাথকে দিতে ওর ভুল হয় না। দে মত্রে আবার শতুস্তলার রাগ। বেগুর আড়ালে প্রায়ই বলে, বেজপারী মাথাকে ভাল খাওয়ানো বহু দুপাল, বলছি না যে বড়ঠাকুরকে দিও না, কিন্তু উনি শুয়ে বলে আত্মমে যিন কাটোমেন আর তোমার মেজঠাকুর নাকে মুখে ভেজে নটা পাঁচটা অফিস করেন তাঁর পাঁচটাতেও একটু নম্বর বেওরা বহুকার তো তাই ?

দুপাল যেসে উত্তর দেয় হেঁসেলের রাগা ছাড়াত আপনি তো বিবি মেজঠাকুরের ভিন মাল সবই আলাদা করে নিচ্ছেন বহু। আপনার চুপ যি অ্যাম বেশিও অভাব নেই, তাইতেই ভবিষ্যত আর চোখ বিইনা। হালার যখন যিন ছিল, তখনও তো উনি আলাদা কিছু খাননি, এমন ওঁরটা না দেখলে চলবে কেন? শতুস্তলার ঠাণ্ডাল সুবে উত্তর দেয়, বেশ মুখ বার হয়েছে তো দুপাল তোমার, তবু যদি না লটারির টাকা যোজো।

বড় হে) বেগুণও আফশোষের সীমা নেই, তার মেয়েদের আর নিত্য নতুন ছানা হয় না। নিউমার্কেটের কেক্‌ পেশদ্বিতে আর ঘরের মিটমেক গবে উঠে না, ভুলখানিটা বজানীপথের অভাবে খালি পড়ে থাকে।

চন্দ্রনাথ নিয়মিত ধর্মটায় খাওয়া সেরে কচের চেষ্টায় বাব হয়ে পড়ে। বাব ছুই বেগুণকে বলেছিল এন্টি-উল্ট-ফভের টাকাকড়িগুলো হাতেছাড়া করতে রাজী নয়। বেগু কিছুতেই টাকাকড়িগুলো হাতেছাড়া করতে রাজী নয়। বলে, শনি ঘন একবার ধরছে, তখন ব্যবসায় হাত ধিলেই ডুববে। তারপর তিনটে মেরেক গলায় বেঁধে কি পুতুরে ডুব মরবে? একটা পরগা তুমি পাল্‌ না। এমন কি পাছে কোন সময় চন্দ্রনাথের কথার গলে গিরে দিয়ে ফেলে, তাই টাকাকড়িগুলো বাপের কাছে সরিয়ে রেখেছে বেগু, বলেছে হংকার হলে তোমার কারবায়ে খাটালেও পায়ে তাকে তবু বাড়াবে।

ভায়াসেবী চন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাই প্রায় বলেন না। যদি বলেন তো কেবলই আক্ষেপ অমন চাকির নাকুলে ছাড়ে? কি হাড়হাতাতে ছেলের মস্ত হিরেছিলান কে বাবা, অমন ছেলে থাকে না থাকে সমানে।

হরনাথেরও এতই অবস্থা। চন্দ্রনাথকে প্রতিদিন একবার করে জিজ্ঞাসা করেন; সুবিধা কিছু হল না চন্দ্র? আজকালকার দিনে কে কাকে বলে খাওয়ায় বল? আমার আর সময় কতটুকু? তুমি বরং তোমার শক্তির কারবায়ে ও ভো চুকলে পার?।

চন্দ্রনাথ মাথা হেঁট করে শোনে, উত্তর দেয় না। মানব প্রকৃতির স্বল্প কীটাত্তলি কেবল নীরবে বরষাত্ত করে, মনে মনে ভাবে সল্লাস্তর মত চমৎকার অত্যাশে কীটাত্তলো বেন চকচকে টাকার থাকার স্বাক্ষরগোপনে অন্ত্যস্ত। হাসি পায় ওর, নির্দিষ্ট ভীষনথাক। কি ওকে বার্ষনিক করে তুলেছে? পরিবারে প্রত্যেকের অন্তে ওর হরদী মন অপ্রসন্ন থাকে যেহে অর্ধ ছুই পতিবেশন করেছে। বেগু'র স্বয়ংসের মত বাচ্চাদের সেরা বিনিম কতই না এনেছে। চাকরি খাওয়ার পরেও বাব করে দ্বীপ মনোরঞ্জন করেছে। কিন্তু এখন বাব চাইলেও বন্ধু-বান্ধব ভরসা দেয় না। মুখে বলে তোমাকে যেবে সেভাবে আবার কিন্তু কি আছে? তবে আশ ভাই

কিছুই সঙ্গে নেই কাল বয়ঃ এসে। বাড়ীতে গেলে অনেকই আজকাল বাড়ী নেই বলে, যেথা পর্যন্ত হবে না। যে বন্ধুদের অস্থানে বিশ্বনে চন্দ্রনাথ ছুড়ি পঁচিন টাকা এমনিতেই দিয়েছে, তাহা আবার ওকে বেথলেই অস্ত্র ফুটপাত ধরে।

এত অবস্থা যেন আর শরীরে মনে সহ্য করতে পারে না চন্দ্রনাথ। শরীরটো কেমন অস্থায়ী বোধ হয়। বাস্তবনা কোথাও খুঁজে পায় না। আগের সে স্বাধোচ্ছল চেহারা আর নেই, হানী খাটগুলো প্রায় সব কটাই বেচে ফেলেছে। যদি গেছে, বোতাম গেছে, তবু বেগু বোঝে না হানীর অক্ষমতা। হানীর পর হানী জানায়, কই কথা আর উপহাসে চন্দ্রনাথকে ঈর্ষান্বিত করে তোলে। শেষ পর্যন্ত শরীরের ওজন কমনে থাকে চন্দ্রনাথের। দুপাল ওর মাধ্যমত চন্দ্রনাথের যেথা শোনা করে; মস্তকের চোখের আড়ালে ছেলের দৃষ্ণ থেকে বাঁচিয়ে এক কাপ গরম দুগ এনে ধরে পরিশ্রান্ত চন্দ্রনাথের মুখের কাছে। চন্দ্রনাথ এই আন্তরিক মেহ স্পর্শটুকু অস্বীকার করতে পারে না।

করেকদিন ধরে জর আরম্ভ হল চন্দ্রনাথের। বেগু খবর পাঠাল ওর বাপের বাড়ী। সুধাংশুবাবু এসে জানাইয়ের অবস্থা দেখে তাহ হিলেন টি-বি। মুহূর্তমাত্র বেঠী না করে বেগুকে ও মাতনীরের নিয়ে বাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ভায়াসেবী ভাবলেন, বাব বাক, চাবটের বোঝাক বাঁচবে। হংনাথ একটুকু স্বীণ আপত্তি তুলে বললেন, অল্পখটা সাবলে না হয় থোমা যেত, আপনি মাতনীরের নিয়ে যান। সুধাংশুবাবু মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন, সার্ববে বলে মনে করেন নাকি?

বাপের বাড়ী চলে যাবার আগে বেগু গিরে দাঁড়াল চন্দ্রনাথের কাছে বেশ বানিকটা শুভ্রান্তে। এক মুখ পৌক বাড়ীতে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে কোটরগত চোখ ছুটি। গায়েওর রং আর বস্ত্রান্ত নেই, কেমন ক্যাকাশে, টোট ছুটি পাড়ুর। যেথলে মারা হয়, কিন্তু মেয়েদের কল্যাণের কথা ভেবে মনটা শক্ত করে বেগু বললে, আমি এখন কিছুদিনের মত ও বাড়ী থাকি, বাবা মিছে এগেছেন। তুমি কেমন থাকো মাঝে মাঝে একটু জানিও, চিত্তায় থাকব।

চন্দ্রনাথের বোগ পাড়ুর মুখখানি হান্ডিত উজ্জল হয়ে

উঠল, এক মিনিট তজ্জাগু নৃতীতে বেগু দুখের দিকে চেয়ে থেকে বসল, নিশ্চয়ই স্বপ্ন পাশে, সাধপানে থেক। আমার বৃদ্ধুটুপুনের খর কোরো। আমার এক মিনিট খেনে বসলে, একবার ডাকো না ওরকর বেশি।

রেগু আনতা আমতা করে উত্তর দিল : ওরা—মানে—ওরকর হাঙ্গর পক্ষে পাড়ীতে চড়ে বসেছে। চন্দ্রনাথ একটা ধীরেখান ফেলে বসলে, আমার আশীর্বাদ রইল।

রেগু আর পাড়াল না, সোজা গিয়ে পাড়ীতে চেপে বসল। সত্যাতাত ঘুমোতে পারেনি চন্দ্রনাথ, নাখার অসহ্য ঘরবা আয় ভৌর পিপাসায়। ভোর বাতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল কার সময় পরিচর্যায়।

দুপালের কাজ বাড়ল। একদিকে গলোর, অপর দিকে বোয়ীর সেবা। ডাক্তার আনা হল : বজ্রিণ টাকা ভিজিট দিয়ে, টাকা দিল দুপাল। স্বামীকে বলল সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেও কতি নেই, হাবাকে বাঁচাতে হবে। ডাক্তার অনেক রকম ব্যবস্থা পত্র দিলেন। একত্রে করে দেখা গেল টি-বি নয়, আসলে কোন রোগই নয় অথচ অর আর ছাড়ে না ; উপসর্গ আর কিছুই নেই। শতস্থলার বাপের বাড়ী গিয়ে থাকটা সম্ভবপর নয়, কাজেই সে স্বামীকে পরামর্শ দিল, একথানা বর কোথাও ভাড়া নিয়ে থাকিবে চল, শেখটার সব শুদ্ধ হ'য়ে মজাবে। শিবনাথের কথাটা মনঃপূত হল। ওরাও পুথক হয়ে যাবার জন্তে প্রস্তুত হতে লাগল। দুপাল আপত্তি তুলল, বাবা দিল, কিন্তু কে কার কথা শোনে। শেখ পর্যন্ত ঠিক করল দুপাল, হাসপাতালে চন্দ্রনাথকে ভর্তি করাই সবচেয়ে ভাল, বাড়ীর শাস্তিও বজায় থাকবে সেও শুভ্রা পাবে।

অনেক কষ্টে হাসপাতালে একটি পেইং বেড্ বোগাড় করল কালীনাথ। তারাহেবী সম্বষ্ট হলো, শতস্থলাকে

আত আলাদা বাসায় যেতে হল না। কীলল শুধু দুপাল। চন্দ্রনাথকে হাসপাতালে রেপে কিরে আসবার সময় বাবে বাবে বসল : আপনাকে তাদাতাড়ি গেয়ে দিতে হবে হাব।। চন্দ্রনাথ দুপালের মাথার হেহ স্পর্শ বুদিয়ে বসল, নিশ্চয়ই কিরব। আমার সব যে সেখানে পড়ে রয়েছে বোমা, আমার বৃদ্ধু টুগু নীলু, ওরকর মজ্জাই কিরব।

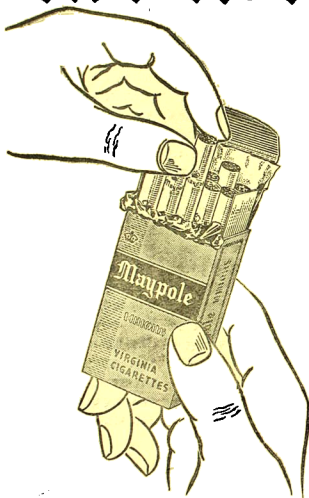
এরপর পুরো দুমান প্রতিদিন হাসপাতালে গেল দুপাল ; প্রতিদিন সাংঘনা দিল, ফলের বদ করে যাওয়ায়। বেগু কিন্তু একদিনও বেথতে এল না, একদিনও মেয়েদের পাঠাল না। ভিজিটিং অফিসারসে, উইরট্রান বৃত্তি মেলে করিডোরের দিকে চেয়ে থাকে চন্দ্রনাথ, দুপালকে হাদি-মুখে আসতে দেখে চোখ থেকে পড়িয়ে আসা জল ছুঁকোটা মুছে ফেলে, কীদ হাদির দেখা হুট্টিয়ে তোলে মুখে।

চন্দ্রনাথের যোগটা কিন্তু খরা পড়ল না। কেউ বসলে গল রাডারের ঘোষ, কেউ বসলে সিডারের, কেউ খার দিলে হাটটা একেবারে গেছে। এমনি করে কীবন আর হুজুর সংগ্রাম চলতে লাগল। একদিকে বৈতে থাকার আশা অপর দিকে সব হারানোর ব্যথ। বেকার কীবনের নির্ধন প্রহলনের শেষ করে চন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত বিহার দিল।

শেষ মুহূর্তে দুপাল কাঁছে ছিল। কোন অভিযোগ করেনি চন্দ্রনাথ, কোন কৈফিয়ত চারনি, কাউকে দেখবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেনি, শুধু কয়েকটা বড় বড় জলের কৌটার নিস্ত হয়ে উঠেছিল ওর ব্যাড্রাংয়ের বেরনারিক্ত পথটি। হুজুর পরে দুপাল স্পষ্ট বেথেছিল যোগপঃপু মুখের সমস্ত কালিমা নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে হুট্টে উঠেছে এক অলক ভূপ্তির হাদি, হোপের নয়, সম্পূর্ণ আরোগ্যের, বেকার কীবনের দুসহ মানি থেকে মুক্তির।



আউট... স্মোল



সব চেয়ে ভাল

সম্প্রতি ভারত সরকার বিশেষ প্রকারের কয়েকটি দুর্ঘটনাত্ত অব্যয় উৎপাদনের ক্ষত ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বৈদেশিক সহযোগিতার তিনটি পত্রিকল্প। অসুযোগন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের মেদার্স রাস্কো সেবটেটরিজ বছরে ৪০০ টন শুদ্ধা দুধ উৎপাদনের ক্ষত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। এই পত্রিকল্পনার খরচ ১৮ লক্ষ টাকা অসুমান করা হয়েছে। তার মধ্যে ১২ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে বিশেষ থেকে কল-কতা আমদানীর ক্ষত এবং এই বৈদেশিক মুদ্রা যোগানের হাতিব মেদার্স রাস্কো সেবটেটরিজ নিয়েছেন।

যুক্ত রাষ্ট্রের মেদার্স হরলিক্স লিমিটেড নিম্নলিখিত অব্যস্ততির উৎপাদনের পত্রিকল্পনা নিয়েছেন :—(১) শুদ্ধা দুধ—প্রতিমাসে ১২ টন হারে (২) মিকোল নিওথাত—প্রতি মাসে ১২ টন হারে (৩) হরলিক্স ততল খাত—প্রতি মাসে ৭৫ টন (৪) বি ও মাগন—প্রতি মাসে ১৭ টন এবং (৫) অক্সাত বাহ্যাকব খাত প্রতি মাসে ৪ টন হারে। প্রথম ১২ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রী করা হবে এবং তার মধ্যে ২ লক্ষ টাকার শেয়ার ভারতীয়দের ক্ষত নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মূল কোম্পানীকে বয়্যাপটি (প্রতীক) বিলাবে বছরে ১০০ টাকা দিতে হবে।

সুইজারল্যান্ডের নেসল্‌স্‌ মেক্টানা কোম্পানী একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে বছরে ৪০০০ টন সুদৃষ্ট ঘন দুধ উৎপাদন করার এক পত্রিকল্পনা নিয়েছেন। এই পত্রিকল্পনা অসুযারী মোট বিক্রী উপর ঐ কোম্পানীকে শতকরা ৫ ভাগ কমিশন দিতে হবে এবং এই

কমিশন নেসল্‌স্‌ গ্রুপের কেন্দ্রীয় মৌলিক গবেষণাগারকে দেওয়া হবে।

কিছুদিন যাবৎ আমদানী নীতির কড়াকড়িৰ ক্ষত দুর্ঘটনাত্ত অব্যয় মূল্য অস্বাভাবিকরূপে বেড়ে গিয়েছে। কলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐদব ত্রয সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। উপরেই পরিপূর্ণতা তিনটি কার্যকরী হলে ত্রায়া মূল্য দুর্ঘটনাত্ত অব্য পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

দেশের শিল্পোন্নয়নের পক্ষে সিমেন্টের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। ১৯৫০-৫১ সালে জানুয়ারী মাসে সিমেন্টের উৎপাদন ছিল ২৭ লক্ষ টন। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পত্রিকল্পনার শেবে এর পরিমাণ ছিল ৪০ লক্ষ টন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পত্রিকল্পনাকালে দেশে সিমেন্টের চাহিদা অনেক বেশী বেড়ে যাবে বলে এই পত্রিকল্পনায় ১৯৬০-৬১ সালের উৎপাদন লক্ষ্য ১০০ লক্ষ টন ঠিক করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম পত্রিকল্পনা থেকে শতকরা ২০২ ভাগ বেশী। আর উৎপাদন ক্ষমতার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে ১৬০ লক্ষ টন। বর্তমানে জানুয়ারী মাসে ২৯টি সিমেন্ট কারখানা আছে এবং এদের উৎপাদন ক্ষমতা ৬৮০ লক্ষ টন। গত বছর সিমেন্টের মোট উৎপাদন হয়েছিল ৫৬ লক্ষ টন। উত্তর প্রদেশের ঢাক ও মহীশূরের তজ্জাবতী ছাড়া সমস্ত কারখানাগুলি বৈ-নবকারী মহলে। উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষত আরও ২২টি নূতন কারখানা স্থাপন ও ২৮টি চালু কারখানা সম্প্রসারণের পত্রিকল্পনা নেওয়া

হয়েছে। এগুলি কার্যকরী হলে সিমেন্ট শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৬৭-৬৯ সালে ১৪৭-৪ লক্ষ টনে বাড়বে।

কিন্তু বর্তমানে যেরকম বৈদেশিক মুদ্রা-সঙ্কট দেখা দিয়েছে এবং অন্তর্দেশীয় অর্থেরও যেরকম অসুবিধা দেখা দিয়েছে তাতে উপরে বর্ণিত পন্থিকল্পনা কার্যকরী হবার পক্ষে সম্ভব আছে।

কারিগরী সহযোগিতা মিশন প্রোগ্রামের আনুভূল্যে বিশেষ ধেকে সিমেন্ট শিল্পের কল-কক্সা আমদানীর ক্ষমতা বৈদেশিক মুদ্রার অসুবিধা কিছু পরিমাণে দূর হয়েছে। এপর্যন্ত মিশন ৭৫ লক্ষ আমেরিকান ডলারের বন্দোবস্ত করেছেন। ১৯৭২ লক্ষ ডলার মূল্যের সিমেন্ট শিল্পের কল-কক্সার ক্ষমতা বাড়ার যেওয়ার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বাকি ২৫-২৮ লক্ষ ডলার শু সিমেন্ট শিল্পের কল-কক্সা আমদানীর ক্ষমতা কাজে লাগানোর প্রস্তাব বর্তমানে বিবেচিত হচ্ছে। আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও তহবিল থেকেও সিমেন্ট শিল্পের কল-কক্সা আমদানীর ক্ষমতা ৫০ লক্ষ ডলার পৃথক করে রাখা হয়েছে।

দীর্ঘকালীন ব্যবহার হিসাবে বিশেষের বাজার হাতে রাখার উদ্দেশ্যে এবং কিছু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের ক্ষমতা কিছু কিছু সিমেন্ট বিশেষে বণ্টনী করা হচ্ছে। গত বছর (১৯৬৭-৬৮) ৩১,০০০ টন সিমেন্ট বিশেষে বণ্টনী হয়েছিল। এ বছর বণ্টনীয় পরিমাণ ২,০০,০০০ টন হির করা হয়েছে। চলতি সালে বেশীর শিল্পকর্তা ও বিশেষ ধেকে আমদানীকৃত সিমেন্ট নিয়ে দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করার বছরের তুলনায় কিছু ভাল আছে। কিন্তু দেশের চাহিদা যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দেশীয় শিল্প আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরোপূর্ণভাবে মেটাতে সক্ষম হবে না। এরকম পরিস্থিতিতে বিশেষের বাজার হাতে রাখার ক্ষমতা এখনই দেশের চাহিদা অসুপূর্ণ রেখে বিশেষ সিমেন্ট বণ্টনীর যৌক্তিকতা কতটা আছে ভাল করে বিবেচনা করা হওয়া উচিত।

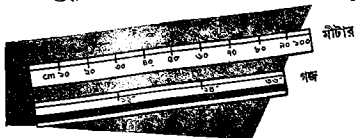
৪. লৌহ কারখানা স্থাপনের খরচ

সরকারী মহলে যে তিনটি লৌহ কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে তার খরচের পরিমাণ প্রাথমিক অনুমান থেকে

অনেক বেড়ে চলেছে বলে কিছুদিন ধাব্য বিষয়টি একটি বিতর্কের বিষয় হিসাবে দেখা দিয়েছে। প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী রাউরকেলার ক্ষমতা ১২৮ কোটি টাকা, ভিলাইবর ক্ষমতা ১১০ কোটি টাকা এবং দুর্গাপুরের কারখানার ক্ষমতা ১১৫ কোটি টাকা ব্যয় হবার কথা ছিল। কিন্তু এই আনুমানিক হিসাবের নগর স্থাপন, খনি ও খনন কার্য, জমি মাল সর্বস্বত্বের উৎপত্তি স্থানের উন্নয়ন, কারখানার এলাকা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ, কার্য নির্বাচনের ক্ষমতা প্রয়োজনীয় কর্মচারীসহ ও তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়, কারখানা এলাকার বাইরের রেলপথের দক্ষণ খরচ, বহিঃক্ষেত্র এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যয়গুলিকে বরা হয়নি। কেবলমাত্র মূল কারখানা স্থাপন করবার ক্ষমতা যে খরচ পড়া সম্ভব তাইই হিসাব বেওয়া হয়েছিল। পরে ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে এই পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব প্রস্তুত করা হয় তাতে রাউরকেলার ক্ষমতা ১৭০ কোটি টাকা, ভিলাইবর ক্ষমতা ১০১ কোটি টাকা এবং দুর্গাপুরের ক্ষমতা ১০৮ কোটি টাকা বরা হয়।

প্রাথমিক ও পরবর্তী হিসাবের মধ্যে এত পার্থক্যের কারণ, প্রথমত পরিকল্পনার অল্প ত্রুটি, দ্বিতীয়তঃ কাঠামোর ক্ষমতা প্রয়োজনীয় ঠিক দেশের অভ্যন্তর থেকে পাওয়া না যাওয়ার বিশেষ ধেকে বেশী ধাম দিয়ে তা ক্রয় করা; তৃতীয়তঃ পরামর্শ দাতাদের কম খরচের হিসাব বেওয়া ও হিসাব বেওয়ার পরে ইউরোপে অধ্যয়ন ত্রুটি পাওয়া এবং চতুর্থতঃ অধ্যয়নিক ইঞ্জিনিয়ার ও কারখানা স্থাপনের অন্যান্য খরচের কম হিসাব বেওয়া। এই হিসাব বৈধতার আরও একটি কারণ আছে। ভিলাই কারখানার ক্রিয়াকর্ম হিসাব প্রস্তুতপক্ষে পরিকল্পনা অনুযায়ী এই বেশ থেকে কল-কক্সা সরবরাহ বেওয়ার সরবরাহকারীর হিসাব ছিল। দুর্গাপুর কারখানার চূড়ান্ত হিসাবে কুল্লারখা থেকে আমদানী অন্তর্ভুক্ত কোন কোন কল-কক্সার অনন্যিক শর্তকরা ৫ তাপ মূল্য বৃদ্ধির সভাবনাও কথার উল্লেখ ছিল। কিন্তু সাধারণতঃ স্থাপন করা, আনুমানিক ইঞ্জিনিয়ারী, মাছাঙ্কে মাল-আমদানী-বণ্টনী এবং পরিবহনের অন্যান্য খরচের অনুমান প্রাথমিক হিসাবে কন্ট্রোলিংপ হয়েছিলেন। এবং তখন তারা বলেছিলেন যে এই সব খরচের বিস্তারিত হিসাব

মোটক পদ্ধতিটা কি?



দৈর্ঘ্য মাপবার মূল একক মিটার থেকে
মোটক পদ্ধতির নামকরণ হয়েছে।
সবচেয়ে বড় মনসনিক পদ্ধতির মতো এই
পদ্ধতিতেও ১০ এর ভিত্তিতে হিসেব
করা হয়। দৈর্ঘ্য, ওজন অথবা
পরিমাপের যে কোন একককে আমরা
একই ১০ সংখ্যা দিয়ে গুণ বা ভাগ
করি।

মোটক পদ্ধতিতে এককের গুণিতক,
ডেকা (১০ গুণ), হেক্টো (১০ × ১০ =
১০০ গুণ), এবং কিলো (১০ × ১০ ×
১০ = ১০০০ গুণ), এই উপগুনগুলি

নিম্নে বোঝানো হয়। এককের অংশ-
গুলি, ডেসি (১/১০), সেন্টি (১/১০০)
এবং মিলি (১/১০০০) এই উপগুন দিয়ে
বোঝানো হয়।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাস
থেকে
মোটক পদ্ধতির ওজন ও
মাপ প্রবর্তিত হচ্ছে।

মোটক
দৈর্ঘ্যগুলি
জেনে
নিব

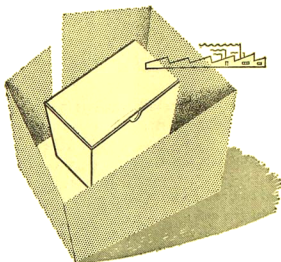
দৈর্ঘ্যের মূল
একক হোল
মিটার
= প্রায় ৪০ ইঞ্চি
১ কিলোমিটার = ৫ ফাল্গ

এককের অংশ
১০ মিলিমিটার = ১ সেন্টিমিটার
১০ সেন্টিমিটার = ১ ডেসিমিটার
১০ ডেসিমিটার = ১ মিটার
গুণিতক
১০ মিটার = ১ ডেকামিটার
১০ ডেকামিটার = ১ হেক্টোমিটার
১০ হেক্টোমিটার = ১ কিলোমিটার

DA-88/109

2

factory freshness preserved



with

✱ **POLYBOARD**
✱ **POLYKRAFT**

packaging

Acid, alkali and moisture resistant polythene-coated POLYBOARD and POLYKRAFT help to preserve the factory-freshness of your products, whether they be confectionary, tea, biscuits or chemicals.

These new, revolutionary packaging materials are several times stronger than ordinary board or paper and prevent damage to your products even when they are subjected to rough handling.

And the eye-appeal of your products is enhanced considerably because of the glossy finish on POLYBOARD and POLYKRAFT.



**CHANGE TO
POLYBOARD POLYKRAFT
PACKAGING FOR INCREASED SALES**

ORIENT PAPER MILLS LTD., CALCUTTA.

পুস্তক পরিচয়

বাংলায় অব্যাস:কৃতি : প্রিঃগেশনল বাল। বিখ্যাত
এছাল। ২ বত্ম চাটুজ্যে ক্রীট, কসিকাতা।
মূল্য ১০ টাকা।

আধুনিক বঃস্ব যা কিছু সৌভবের বস্তু, তাইই হুচনা
উনিশ শতক। অথচ, ঝাঁপা মনুন সমাজ গড়ার কাজে
একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, নব চিন্তার উত্থান
করেছিলেন, তাঁদের আনন্দ প্রায় ভুলতে বসেছি।

গোপেশবাবু অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলায় নব
জাগরণের ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁর অধিকাংশ
একই এই বিষয়ে। বর্তমান প্রথম তাই।

আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারের জন্য উনিশশ শতাব্দীতে
যে সকল বৈদ্য ও বিদেশী চিন্তাবিদ ব্যক্তি সচেতন হয়েছিলেন
তাঁদের এবং তৎকালে প্রতিষ্ঠিত সভা সমিতির বিবরণ
লেখক এখানে সূত্রে সংকলন করেছেন। গোড়ার সমাজ,
কৃষিবোহিনী সভা, বঙ্গভাষাহুবাধক সমাজ, বেগুন সোসাইটি,
কোচবোহিনী সভা, বামাবোহিনী সভা প্রভৃতি বহু
প্রতিষ্ঠানের বিবরণ এতে আলোচিত হয়েছে। লক্ষ্য—
যে, কেবল পুস্তকের নয়, মাতার শিক্ষার জন্যও পেনিন ব্যাপক
আয়োজন হয়েছিল। তা ছাড়া অনেক অল্পবয়সী
করেছিলেন, কেবল পুণিগত শিক্ষাই জীবন গঠনের পক্ষে
পর্যাপ্ত নয়; তাই তাঁরা চাক্র ও কাক্রনিক, ক্রুটি ও উত্তান
রচনা প্রকৃতি শিক্ষাদানের উৎসাহী হয়েছিলেন। দেশের
স্বাধীন উন্নতির স্বপ্ন সেদিনকার শিক্ষিত বাঙালী সমাজকে
বহু আশ্রয়সাধ্য কর্তে ব্যাপ্ত করেছিল।

পূর্বপাতা মহাজনবর্গের পুণ্যকীর্তি স্বপ্ন করিয়ে দিয়ে
বোগেশবাবু শুধু যে সম্রাট কৃতজ্ঞতা ব্যপিয়ে দিয়েছেন তাই
নয়, আমাদের মনে কর্তৃত্বের প্রেরণা সঞ্চারও করেছেন।

এছাড়া বিখ্যাতবীর লোকশিক্ষা প্রমাণের অন্তর্গত।

আমেরিকার নিগ্রো মনীষা : অহুবাধক—কুণালকুমার।
হোমশিখা প্রকাশনী বিভাগ, কলকাতা। মূল্য ২।

ল্যাংটন হিটলের ইয়েরকো বইয়ের সরল সুখপাঠ্য
বঙ্গভাষায়। আমেরিকার সহযোগী জন প্রতিভাশালী নিগ্রো
নরনারীর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা এতে মনোহর গল্পের মত
ক'রে বর্ণনা করা হয়েছে। এঁরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে
অসামান্য মনীষা ও কর্মশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের
অধ্যবসায় ও সাফল্য এ দেশের কিশোর কিশোরীদের উচ্চ
আশর্কে উৎসাহ করুক, আমরা এই কামনা করি।

লক্ষ্যীর কাঁপি : অহুবাধক—বীণা বহু। হোমশিখা
প্রকাশনী বিভাগ, কলকাতা (মহারা)। মূল্য ২।
ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বের “মাস্টার্স ব্যাক অ্যাকাডেমি” গ্রন্থের
বঙ্গভাষায়। একটি দুর্লভ পরিবর্তনের জীবনসংগ্রাম ও
বৈশিষ্ট্যময় স্বপ্নের দ্বারা স্পষ্টীকৃত। অহুবাধক প্রাণ
ও সাবলীল।

বাংলা সাহিত্যের কুসিকা : নবগোপাল সেনগুপ্ত।
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১, জাহাঙ্গীরনগর স্ট্রীট।
কলিকাতা ১২। দাম সাধারণ—৩২৫, বিশেষ ৪০০।
একখানি সরল সরল সুখপাঠ্য বাংলা সাহিত্যের
ইতিহাসের প্রয়োজন আনকই অল্পবয়সী করে থাকেন।
মহাবাবুর বইখানি সে প্রয়োজন অনেকাংশে মিটিয়েছে।
এর প্রথম সংস্করণ বহুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়ে নিঃশেষ
হয়ে গিয়েছিল। নতুন সংস্করণ সম্প্রতি বেরুলো। হিন্দী
ও মারাঠিতে অহুধিত হয়ে বইখানি তাঁর জনপ্রিয়তা
সংগ্রহণ করেছে। লেখকের সাহিত্যিক মনের স্পর্শে
লেখকের সম্পর্কে তাঁর অভিমত ও মন্তব্য সম্বন্ধে-এছাড়া
হয়েছে।

মধুসূদনের কাব্যবৃত্তঃ উক্তির দীর্ঘোজ্জ্বল সিংহদায়। বি,
সরকার এন্ড কোং। ১৪, কলেজ স্ট্রোং, কলিকাতা-
১২। দাম ৩০০ টাকা।

মধুসূদন সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আলোচনা কিছু কিছু
হচ্ছে। যোগীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথের দ্ব্যর্থনাম্নাম্নে পূর্বে
পঞ্চাশমোহন, মোহিতলাল এবং সত্যজিৎ ক্রীতগর্ভীণ ভট্টাচার্য
ঐতিহ্যের সঙ্গত পরিচয় দিয়েছেন। ঐক্যবন্ধন বহু
মধুসূদনের ব্যাটিকে সঙ্গরূপ মনে করতে পারেননি, তাঁর

মতে মধুসূদনের কবিত্বহিমা বাংলা সাহিত্যের 'প্রদীপ্তম'
'কংকণময়ী' মাত্র।

ক্রীতগর্ভীণ সিংহদায় এ গ্রন্থে দ্ব্যর্থনাম্নাম্না, যোগীন্দ্রনাথ
কাব্য, কীর্তননাম্নাম্না এবং চতুর্দশপদ্য কবিত্তাবলী—চারটি
গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তিগত ও কবিত্তের বিচার করেছেন। এ
বিচার মনগড়া তত্ত্বের নাপকাটিতে নয়, বশোপলঙ্ঘিত
সাধারণ্যে। মধুসূদন্য বিচার—এই উক্তিই প্রতিবাদ
ক'রে তিনি তাঁতে আমাদের অন্তরেব দাবী কতকৃৎ ভাবা
পেয়েছে তাই দেখিয়েছেন।

—দী।





৪ ট্রাম-বর্ষঘট ৷

বর্ষঘট আজকাল মানুষের গা-সওয়া হয়ে এগেছে, কেননা, ও রোগ কলকাতা শহরে লেগেই আছে। ঘন ঘন বর্ষঘটে কার কতটা সুবিধা হয় আমরা বুঝতে পারি না। আমাদের বিধাস, এতে উদ্বেগ অনেকাংশে ব্যাহত হয়। হরিদ্রার সৌভাগ্যোৎসব হয় না। নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে কালেত্রে হাতি নিয়ে ঝাড়লে হাতি পূর্ণ হবার যে সম্ভাবনা থাকে, কাজে শৈবিল্য হেবিয় কেন্দ্রই বর্ষঘট করলে সে সম্ভাবনা থাকে না।

কীদিন হবে? এবারে এই বর্ষঘট চলেছে। জানিনা আরও কতদিন চলবে। কতি কাত? জনসাধারণের, অসাধ্য হাজার। ট্রাম-কর্তৃপক্ষ বার-বার হুমকিতে সন্ত্রস্ত: বিস্ত। এবারে না হোক পাকাপাকি বোকাপড়া করে নিতে চান। ভাড়া বাড়ানোর কথা তাঁরা আগেও বলেছেন, এখনও বলেছেন। সন্ত্রস্ত: শের পর্বত ভাড়া বাড়বেও। সাধারণ মানুষ এক ন্যা পয়সা বৃদ্ধিতে আপত্তি করে যাত্রারতের অসহ্য কষ্ট বেশি দিন ভোগ করতে রাজি হবে না। রাষ্ট্রকরণ অবিশেষে সন্ত্রস্ত: হলে না। আর যে পরিবহন রাষ্ট্রায়ত্ত, তার নিয়ম শৃঙ্খলা বা প্রাণবন্ত: সন্ত্রস্ত: সাধারণের উক্ত বারণা নেই। অনেক অকলেই স্টেটবাসের ভাড়া ট্রাম-ভাড়ার বেড়গুণ, বিগুন। সমগ্রা-বস্তিতার বিচ্ দিয়েও স্টেটবাস বেশি নির্ভরযোগ্য নয়। কাজেই ট্রাম কোম্পানি রাষ্ট্রায়ত্ত হলে যিয়ারির বিচ্ দিয়ে বেশেব যে সুবিধাই হোক তাতে সাধারণ সোক খুব উৎসাহ বোধ করছে বলে মনে হয় না। আর বর্তমানের এই বর্ষঘটে প্রকৃতপক্ষে আমরা কি কতিগ্রস্ত নই? ট্রাম-কোম্পানির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার উল্লেখ ফেটুই লাভ হবে, তা সরকারের পক্ষেই তহবিলে অর্থাৎ, যাতে সেই টাকা বি-য় রাষ্ট্রগতকরণের

সময়ে কোম্পানির স্বত্ব কিনে নেওয়া দরজ হয়। বর্ষঘট-আবিতে কোম্পানির লোকদান হলে সন্ত্রস্ত: ঐ তহবিল থেকেই কতিপূরণের সূত আছে। তা হলে এ বর্ষঘটে কোম্পানির লোকদান নেই; কারণ কতিপূরণ করবে আমাদের সরকার অর্থাৎ আমাদের দেশবাসী। যাত্রারতের অনুবিধা ভোগ করছে জনসাধারণ, কতিপূরণ প্রাণ দিচ্ছেও তারা, কতিপূরণও করবে তারা। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কতিপূরণের সুযোগও ক্রমশ: পিছিয়ে যাচ্ছে, কারণ, ঐ উদ্বেগ সংশ্লিষ্ট তহবিলের স্ক্রুটি টাকা বর্ষঘটকালীন কতিপূরণের খোঁজের দিতে ছুটিয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক সমিতি, কোম্পানি-কর্তৃপক্ষ এবং সরকার তিনপক্ষের সুবিধা উন্নয়ন হলে এবং সম্ভাবনাক মীমাংসা হলে সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে।

৫ ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগ ৷

কলেজের অধ্যাপকদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করে গ্রান্টস্ কমিশন বাড়তি খরচের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দিতে রাজি হয়েছেন এবং শোনা যাচ্ছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্রকৃত পশ্চিমবঙ্গী কলেজগুলির জন্য আপন আগের টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাকী পঞ্চাশভাগ বিশ্ববিদ্যালয় রাজস্বসরকার কিংবা কলেজ-কর্তৃপক্ষ বিচ্, গ্রান্টস্ কমিশন এই পরামর্শ দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ মানা সূত আয়োগ করে কার্ণত: বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা প্রায় নিষ্ফল করে দিয়েছেন। কলেজের ছাত্র কমানো ইত্যাদি সাধু উদ্বেগ সন্দেহ নেই, কলেজগুলিও সে উদ্বেগের বিরোধিতা করেনি; তবে ব্যাপারটা সমগ্রাণ এবং ছাত্র-শিক্ষার জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও বরকাদ। অধ্যাপক ও শিক্ষকদের প্রতি সরকারী শিক্ষাবিভাগের আচরণ প্রায়ই

সম্রাট বলে মনে হয় না। এটা হুগ্গের বিষয়। সম্রাতি শোনা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগের নির্দেশ অধ্যাপক-দের কাজ-কর্মের পুরো বিশেষ না নিয়ে কাউকে বদলিভাবে বেতন দেওয়া হবে না। সে হিসেবে নিতে ক'বছর কাটবে, অবশ্য কেউ জানে না। আর, অধ্যাপকদের তরফের দাবী মিনিট বিচার করে' বেতন দেওয়ার প্রস্তাব কিছু অস্বস্ত শোনাগ। অধ্যাপনার সমস্রের হিশাব ক'বখানার খাটুনির সমস্রের হিশাবের সমস্রায়ে পড়তেই পারে না। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা কেউই যোগ্য হয় পড়পড়তা বিনে ছ'তিন বছর বেশি ক্লাস নেননা। শিক্ষাবিশ্ব মাঝেবই জানবার কথা, যে ছ'বছর ক্লাস দেবার প্রস্তাবে উৎসেব অনেক বছর লাগে।

এক্ষেত্রে বিশ্বয়ের বিষয়, গ্রাউন্টস কমিশন অধ্যাপক-দের সম্পর্কে কোনও সর্ভ আরোপ না করলেও পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগ এমন সব সর্ভ আরোপ করেছেন যাতে কোনও কলেজেই নতুন হারে বেতন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ঢেবু প'ড়ে আছে, কিন্তু কলেজ-কর্তৃপক্ষের ছোঁবার অধিকার নেই। বহিও এ সব কথা মুখে মুখে রচিভ, তবু অস্বস্ত মনে হয় না। কাবপ, অভিজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও এই কথাই বলছেন এবং এ-ছাড়া বেতন বৃদ্ধি দীর্ঘদিন স্থগিত থাকবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

সব-প্রস্তাবিত বেতনের হারে প্রাচীন অধ্যাপক-দের বেতন অনুবিভেই বিশেষ বাড়বে না; তরুণ-দের কিছু বাববার সম্ভাবনা ছিল, তাও বাবা পাচ্ছে; বহিও বেতনেব হার ২০০—৫০০। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কৃতী ছাত্র-দের পক্ষে ২০০ খুব শোভনীয় নয়; এবং অভিজ্ঞ সংসারী মাত্রই জানেন বহুপোষ্যপরিভিত একটি সংসার অংকের বিনে ৫০০ চালানোও কত কঠিন। তাছাড়া দীন-যাত্রার একটি উত্তরকর্মের মান রক্ষা না করেও শিবিভ ব্যক্তির উপায় নেই। এক্ষেত্রে তুচ্ছ অস্বস্তিও প্রকাশের অধুহাতে শিকারভী-দের বর্ধাধাহানি নিতান্তই দোষজনক।

৫. তবানীপুর উপনির্বাচন

এই উপনির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে সবাই মনে করত। কংগ্রেস পক্ষ ক'মাস বদেই এর সম্ভ ভোড়লোর করছিল,

খিত্রোবী হলও চূপ করে ছিল না। ত্রিনিদাদ্বার মন্ত্রী পক্ষ ভাগ্য করার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস হল হ'তে এবং বিধান সভা হ'তে পরভাগ করেন। তাঁর পরভাগের পর দেশ কয়েক মাস চলে গেছে; উপস্থিত প্রাচীন বেছে দেবার ও নির্বাচনের যথোপযুক্ত সংগঠন হ'তে তোলার সুযোগ উত্তর পক্ষই পেয়েছে। এই নির্বাচন কেবল মোটামুটি কংগ্রেস অধুবাণী বলেই পরিচিত ছিল, গত বহু নির্বাচনে এখান থেকে কংগ্রেস প্রাচীন ভরী হয়েছিল। গত সাধারণ নির্বাচনে ত্রিনিদাদ্বার কংগ্রেস প্রাচীনরূপে ধাঁড়িয়ে মোট ভোট সংখ্যার শতকরা প্রায় ৫০টি পেয়েছিলেন; ২৬,৯৭২ ভোটের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন ১৩,৬২৯টি ভোট। এবার ত্রিনিদাদ্বার ধাঁড়িয়েছিলেন বহু প্রাচীনরূপে; কিন্তু সমস্ত বিদ্রোহী হল তাঁকে সমর্থন করেছে। কংগ্রেসের তরফ থেকে ধাঁড় করা হয়েছিল ত্রিনিদাদ্বার ব্যানার্জীকে। আর একজন বহু প্রাচীন ছিলেন কেবল নামে মাত্র; তিনি নির্বাচনের সম্ভ কোন প্রচার বা সংগঠন করেন মি, কাছেই নির্বাচনের ফল ছিল প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেস প্রাচীন ত্রিনিদাদ্বার ব্যানার্জী ও ত্রিনিদাদ্বার-দের মধ্যে। এই উপনির্বাচনে ত্রিনিদাদ্বার পেয়েছেন ২০,২২২ ভোট অর্থাৎ গত সাধারণ নির্বাচনে চেয়ে সাড়ে নয় হাজার ভোট তিনি বেশি পেয়েছেন এবং বিশ্ববাবু পেয়েছেন ১২,৬৮৪টি ভোট।

আম্বর্ষের বিষয়, পোলিং হয়ে যাবার পরও ভোটের এতটা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও হারিকর্ষিণ কংগ্রেস নেতৃবর্গ মনে কবেছিলেন অল্প ভোটে কংগ্রেস প্রাচীন ভরী হবেন। এতে বহু বার যে কংগ্রেসের সংগঠন ছিল অত্যন্ত দুর্বল ও নির্ভর্যের অযোগ্য। পোলিং-এর পরও ভোট-এব এতটা পার্থক্য কংগ্রেস নেতারা বুঝতে পারেন মি এবং তাই মিথ্যা আশা পোষণ করেছেন। হয় নীতের কর্মীরা তাঁদের ভুল বুঝিয়েছে, না হয় সবাই মিলে একটি আত্মপ্রত্যাবর্তনাল বিস্তার করেছিল।

৬. এই উপনির্বাচনের শিক্ষা

এই উপনির্বাচনে কংগ্রেস তরফের শিববার অনেক কিছু আছে। কলকাতার ২৬টি বিধান সভার আসনের মধ্যে এইটি নিয়ে ১৯টি বিদ্রোহী হল সম্ভের হাতে গেল।

বাকি ৭টি কেন্দ্রে বাঙ্গালী ভোটারের সংখ্যা কত তার হিসাব নিলে বুঝা যাবে কার ভোটে কংগ্রেস ঐ ৭টি আসন পেয়েছে। একাধিক কারণে এই প্রশ্ন বেখেঁচি,— তবানীপুর নির্বাচন কেন্দ্রে আজ যা চিত্রা কংগ্রেস, সমস্ত পশ্চিম বাংলা কাল তা চিত্রা কংগ্রেস কিনা, কে জানে? হকিম কলিকাতা বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাসস্থান, সেখানকার আসন সবগুলিই কংগ্রেসের হাতের বাইরে চলে গেল; এ থেকে অনুমান করা খুব অসম্ভাব না যে বাংলার শিক্ষিত শ্রেণীর উপর কংগ্রেসের প্রভাব অত্যন্ত কম এবং ক্রমেই তা কমছে। এই উপনির্বাচনে শুধি বাঙ্গালী হিন্দু ভোটার শতকরা ২০টি ভোটার বেশী কংগ্রেস পারিনি; মুসলমানদের মধ্যে (এরা অধিকাংশ আবঙ্গালী) শতকরা ৩০টি ভোট হারতো। কংগ্রেস পেয়েছে। শিবপুরে ভোট আধাআধি হিসাবে প্রায় দুটিকেই ভাগ হয়েছে; জব্বারি, বিহারী, ভড়িরা ভোট কংগ্রেস অনেক বেশী পেয়েছে, প্রায় শতকরা ৬০-৭০টি কংগ্রেসের ব্যকে হয়েছে। এ হিসাব অনেকটা আনুমানিক, তবে মোটামুটি সত্য বলে আমরা মনে করি।

অর্থাৎ বাংলা দেশের কংগ্রেস বাঙ্গালী ভোটার উপর নির্ভর করতে পারে না। বাংলা দেশের কংগ্রেস সবদিকে অনেক অভিযোগ বহুদিন ধাবুই চলেছে—শাসন ব্যবস্থা সবদিকে অস্তিযোগ কম নয়। নিম্নলিভ ভারত কংগ্রেস কমিটি বা কংগ্রেসের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ (Working Committee) এই সব সবদিকে সম্পূর্ণ নির্বিকার ও ভাবানীত অবলম্বন করে আছেন। আজও যদি যে সামসাগার কোন চেষ্টা না হয়, তাহলে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। পশ্চিম বাংলার অন্তর্গত কলিকাতা শহর সমস্ত ভারতের মধ্যে বিশেষ করে ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অবিকার করে। বাংলাদেশে যা কলিকাতায় কংগ্রেসের বিপর্যয় হ'লে, তার প্রতিফলিত ভারতের সমস্ত পূর্বাঞ্চলে দেখা যাবে। তবানীপুরের ভোটারগণ যে কোন বিশেষ বিরোধী দলের সমর্থক, তা বলা যায় না; পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস সংগঠন ও কংগ্রেস শাসনের বিচ্ছিন্নতা ঠাৱা তাহের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এননি তাহে চলেতে ছিলে হারতো কিছুদিন পয গত্যস্তর না

বেধে ঠাৱা সত্যিকার তাহে কোন তথাকথিত বামপন্থীদের সমর্থক হ'রে উঠবেন, কাহেই নয়র থাকতে সতর্ক হওয়া উচিত।

৥ পশ্চিম বাংলার মদের কাটতি ৥

কংগ্রেসের অন্ততম নীতি হ'ল মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা; কোন কোন প্রদেশে এই মর্মে আইনও পাশ হয়েছে। মদ্যপান নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম বাংলার কোন আইন এখনও পাশ হয়নি কিন্তু মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে, এমন কোন অবস্থা অসম্ভাব করা খুব সম্ভব নয়; অথচ তেমনি অবস্থা বর্তমানে পশ্চিম বাংলার দেখা দিয়েছে। বাংলা বিভাগের পূর্বে অবিভক্ত বাংলায় ২ লক্ষ গ্যালন মদের কাটতি হ'ত কিন্তু ১৯৪৭ এপ্রিল থেকে ১৯৪৮ মার্চ পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার এক তৃতীয়াংশ নিয়ে গঠিত পশ্চিম বাংলার মদের কাটতি হয়েছে প্রায় ৮ লক্ষ গ্যালন। মদ্যপান বাড়লে, সরকারি হাফর বৃদ্ধি পায়।

৥ চিনি রপ্তানি ৥

বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের জন্য ভারতগর্বে উৎপন্ন ক্রবোর রপ্তানির একটা চেষ্টা চলছে। এখন পর্যন্ত সে চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। এ বছরের প্রথম ছ'মাসে গত বছরের প্রথম ছ'মাসের রপ্তানির চেয়ে ৫০ কোটি টাকার কম মাল রপ্তানি হয়েছে। এটা আমাদের দেশের অর্থ-নীতির পক্ষে খুবই বিপদজনক; তাই নানা ভাবে রপ্তানি বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। ৫০,০০০ টন চিনি রপ্তানি করবার প্রস্তাবও এসেছে। গত বছরক বছরের মধ্যে চিনির উৎপাদন আমাদের দেশে বিস্তৃত হয়েছে। ১৯৪০ সালে ভারতে চিনির উৎপাদন ছিল ১০ লক্ষ টন; আর ১৯৪৬-৪৭ সালে হয়েছে ২০ লক্ষ টনের বেশী। সবে সবে কাটতিও বেড়েছে। তবু কিছু চিনি বিভিন্ন কারখানায় মজুত আছে যা বিদেশে রপ্তানি করা চলে।

কিন্তু এ বিপদে মুক্তি হ'ল আমাদের এখানে চিনির উচ্চ উৎপাদন থাকা। আমাদের দেশে এক টন চিনির দাম ৭৫০ টাকা আর বিদেশী চিনির দাম হ'ল এক টনে মাত্র ৩০০ টাকা। কাহেই বাইরের বাজারে আমাদের

এব উপৰ কোন টীকা কৰা সম্ভব নহয় ; কিন্তু কয়েকদিন পৰেই আৰ একজন বিখ্যাত পাকিস্থানী নেতা গজনফঃ আদী খাঁ যা বলেছেন তাকেই ঐ উক্তির টীকা হয়েছে। তাৎপৰ্য্যের প্রতি বিষয়ে যান নাহেবও কম জাননা ; কিন্তু বিপদকালে ধৰ্মত্যাগ করে জন ঐক্যবাহ ফকী নিতে তাঁর আপত্তি নেই। তিনি বলেছেন—“সমগ্র আত্ম দেশ ধ্বংস

পাকিস্থানের প্রতি এমন তীব্র বিষয় যে, সেখানে পাকিস্থানীদের উচিত হবে ভারতবাসী বলে পরিচয় দেওয়া।” ইহাবই নাম প্রত্যুত্তি। কারণে অকাংশে জনসাধারণের কাছে তাৎপৰ্য্য বিস্তার বিষয় প্রচার করা হবে ; আর বিশেষ গিয়ে এমন কি মুসলমান সংঘবলী আত্মব দেশ সমুদেও ভারতবাসী বলে পরিচয় দিতে তাৎপৰ্য্য আপত্তি নেই।

মন্দিরা'র শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬৫

আগামী আশ্বিন সংখ্যা মন্দিরা শারদীয়া সংস্করণে প্রকাশিত হইবে। প্রাচীন ও নবীন লেখক-লেখিকা ও চিত্রশিল্পীদের মনোরম গল্প, রচনা ও চিত্রে সুশোভিত হইয়া বর্ধিত আকারে মহালয়ার পূর্বেই বাহির হইবে।

এবারে যাহারা লিখিবেন তাঁহাদের কয়েকজন :—

ঐক্যাদিনাস রায়, শ্রীমজ্জিৎকুমার সেন, শ্রীমঙ্গল রায়, ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, শ্রীহরিনাস চক্রবর্তী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অধ্যাপক বিভূষণ গুহ, শ্রীবি, বিশ্বনাথন, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী, কুমুদচন্দ্র মল্লিক, হরিনাস চক্রবর্তী, ডাঃ রমা চৌধুরী, শ্রীশশীল রায়, শ্রীতাপন রাহা, শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ, শ্রীপ্রভাত দেবসরকার, শ্রীনগেন দত্ত, শ্রীমানবেন্দ্র পাল, শ্রীমুতাব সমাজদার, শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও আমরা গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের সহায়ভূতি কামনা করি।

কর্মাদ্যক্ষ—মন্দিরা

ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা

মাড়ের কী হান্সায়ে না হ'ত
আগে।



সকলকে : এখন ঘর
কাছে আবার বি বি
করতে হবে যে।



এই যে : লীলা ভবতায় কি
হকম বাবা লাগিয়েছে। ফগালে
আমি ঘর কাছে আছি।
অকুনি আছে।

হেনোষ লাগিয়েই
হা কি আন দ্বা
করে পু নী না
হটাংকেত করেই
ক জর্জ জামাট
গার এসে।



বাড়িতে কি আর হয়েছে। বাড়ি বেলায়
ও হকম এসেই বলে লাগিয়েই ক। 'জ্যোতি'
লাগান আছে দেখে তখন ঝুঁপুই বহর
করে কোত বিরে। আর সতি এটা সাধনে
অত খেঁচী না লাগত অতো দাত।

অ্যাস্কো

বার ৩ টাবলেট



কম খরচ ঝুঁপুই পরিকার হক

গ্রন্থিঘাটিক মোপ কোং

কলিকাতা-১



আপনার
রক্তনোপকরণে
যে পুষ্টি
চান

হুম্যান

বনস্পতি



সাহ ফের টেক্সটাইল

'এ' এবং 'ডি' ভিটামিন দ্বারা সমৃদ্ধ

বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আপনার হৃদয়ের ক্ষতি
৫ পাঃ এবং ১০ পাঃ দিনে
প্যাক করা। ৩৬ পাঃ জিবেণ
সাওয়া যায়।

প্রস্তুত কারক

ফোর্টস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিঃ

ভালমিয়ানগর, বিহার

সুখাদ্যই সুখ ও

স্বাচ্ছন্দ্যের উপাদান

19 04V-8/8

মন্দিরা

CENTRAL
LIBRARY

একবিংশ বর্ষ

আশ্বিন ও কাশিক, ১৩৬৩

শাল্লদীক্ষা সংখ্যা

পূজা

ত্রিবিভেক্সনাত্মক মুখোপাধ্যায়

বাঙালী বিন্দু শ্রেষ্ঠ চূর্ণাপূজা। শরতের আসন্নোদয়, শেফালির গন্ধে, আকাশে বাতাসে যেন উৎসবের সাড়া পড়ে যায়। সন্তবন্তঃ বর্ষ-সম্রাট-নিবিশেষঃ সকল বাঙালী এ সময়ে শুভু-পরিবর্তনের মহিমা অমৃত্যব কহেন।

কিন্তু উৎসবের সুরটি অন্তরে ধরবার মাধ্যম আত্ম অনেকেই হারিয়ে ফেলেছি। যে পবিত্র মন মৌল্যকে উপলব্ধি এবং প্রকাশ করতে পারে তার শোচনীয় অভাব হিকে হিকে একটু হয়ে উঠেছে। স্থূল ভূতির বীভৎস বিকার পূজা-প্রাঙ্গণে চেবীর নয়, ডাক্তারী হোমিনীয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ; আর বৈদ্যনিম্ন জীবনের দ্বারিকাকে বিজ্ঞপ্ত করে ইতর আয়োজ-প্রয়োজের সমারোহ যেন নিষ্ঠুর অট্টরাগি ধামছে।

চূর্ণাপূজা সকাম উপাসনা; বৈরাগ্য সাধনা নয়, সাময়িক প্রতিষ্ঠার সাধনা। শক্তি হাও, আত্ম হাও, বিত্ত হাও—এই এর প্রার্থনা। শুধু দৈবিক শক্তি নয়, তার সঙ্গে আত্মিক শক্তি। কেবল আত্মিক বিত্ত নয়, সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক বিত্ত। শুদ্ধ চিন্তে যেন প্রকৃত বীরের মত এ

পৃথিবী ভোগ করতে পারি, শ্রমেও ব্যথা অর্জন করতে পারি, অকুণ্ঠিত চিন্তে হান করতে পারি—এই কামনা নিয়েই কবি শক্তির আবাসন। কিন্তু সেতে মনে যে নিঃশ্ব, সহজে তার অন্তরে থেকে এ মন্ত উজ্জারিত হইল।

নাহে মাঝে লক্ষ্যে চয়, তাহির জীবনে অর কি এর উপযোগিতা আছে? যদি তত্ত্ব বিদ্যাস শক্তি সংঘর্ষে সবই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তবে কি প্রয়োজন অকৃত্যে অতীতের জের টেনে চলবার?

আবার অকৃত্য থেকে ভাবি। প্রকৃতির প্রভাবে, অভ্যাশে, সংস্কারে—স্বভাবতঃ শরতের দিনে বাঙালীর মনে আনন্দের উজ্জলতা জাগে। তাকে রুদ্ধ করলে জাতীয় জীবন কি কতিয়ন্ত হইবে? কেউ কেউ বলেন, পূজা বন্ধ করে অন্তরকম আনন্দ-উৎসবও তো করা যেতে পারে। কিন্তু প্রথমতঃ, ঐতিহ্যকে উড়িয়ে দিয়ে দেশব্যাপী এমন আনন্দোৎসব-প্রবর্তন সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, হৃদিকে কেন্দ্র করে স্বীয়কাল এই শারদোৎসব চলে এসেছে বলে এতে যেটুকু স্মৃতিভার প্রবণতা আছে, হৃদয়বদ্ধিত কোনও

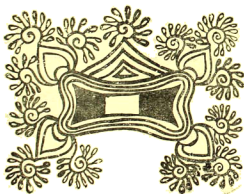
অহুতানে সেটুকুও বন্ধা করা যাবে কিনা সন্দেহ। যদ্যতো সুকৃতি আরও প্রসন্ন পাবে। কারণেই এ উৎসবধারাকে নিরুচ্ছ না করে' সম্ভবতঃ তার সংশোধন করা শ্রেয়ঃ।

পৌরাণিক হিন্দুধর্মের বিকৃতি লক্ষ্য করে একসময়ে ত্রাশ্বপণ পুঁজা-প্রথা রহিত করে সমাজ-সংস্কারে উদ্‌ঘোষী হয়েছিলেন। তাঁরা মনীষী ও দেশের যথার্থ কল্যাণকামী ছিলেন এবং তাঁদের আদর্শ হিন্দুধর্মের উচ্চতরে প্রভাব বিস্তার করেছিল সন্দেহ নেই। তবু তাঁদের উৎকণ্ঠ—সারা দেশের দিক্ থেকে যেখানে—যেখান পর্যন্ত সফল হয়নি। জাতির সৌন্দর্যবোধ, অধ্যাত্ম-অদ্বৈতভূতি এবং আনন্দমূহ্য যে ব্যায় লত লত বংশের চলে এসেছে তা থেকে জনসাধারণের মন বিচ্ছিন্ন হতে চায়নি। বহু বিকার সবেও দেখানে তার আকর্ষণ হয়েছে প্রবল; এবং তার অন্তর্নিহিত মহিমা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনকেও স্পর্শ করেছে।

এক্ষেত্রে মনে হয়, শারদীয় উৎসবের মূলত্বপটী রক্ষা

ক'রে তাকে বিশুদ্ধ ক'রে তোলাবার প্রয়াস বাঞ্ছনীয়। প্রচারে, আয়োচনায়, বিভিন্ন পুঁজাসমিতির কাবনিয়ন্ত্রণে, স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন ক'রে যদি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সেই চেষ্টা করেন তাহলে যদ্যতো উৎকণ্ঠ-সিদ্ধি কঠিন নয়।

কুলসংস্কার বা অদ্বৈতবিশ্বাস থেকে মনকে মুক্ত কববার প্রয়াস অতীতেও দেখা গিয়েছে। "যাত্ত্ব পাবান মাটির ভূতি-ই উপাস্ত নয়, দেবতা তাম্রপ্রসারও বলেছেন। তবে, সাধারণ মন বাইরের অবলম্বন খোঁজে, জপের মধ্য দিয়ে তত্ত্বের সন্ধান করে—তা দেখভূতিই যোক বা অস্ত্র কোন বস্তুয়ের প্রতীকই হোক। তাম্রপ্রসারও মনে মনে মাকৃ-ভূতির কল্পনা করে নিয়েছেন। তা ছাড়া পুঁজাকে আশ্রয় করে' যে বিভিন্ন স্তম্ভমাত্র-কলার এবং সামাজিকতার চর্চা এতদিন ধরে ধরে এসেছে তা উপেক্ষণীয় নয়। বিকার শোধন করে এর ভালো টুকুকে রক্ষা করলে জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধন হবে।



উষা-সূক্ত

ঐন্দ্রীয়াজিৎ যুথোপাধ্যায়

[স্বর্গদেব—সপ্তম মণ্ডল ; পঞ্চমস্তোত্রম সূক্ত । অহংবাণে কিছু পুনরুক্তি লক্ষিত হইবে । মূলেও ঐন্দ্রপ আছে ।]

৩ এই প্রকাশ হচ্ছে উষাধেবী ;

আকাশে তাঁর ধন,

অপূর্ণ তাঁর মহিমা ;

আপনার মহিমার নিম্নে উদ্ভাসিত করে'

তিনি উদিত হচ্ছেন তাঁর বিহিত করে

অঙ্কুরকে বিদূষিত করে,

অঙ্কুরের বস্তুধেবী বিদূষিত করে ।

অদিয়াকুলের শ্রেষ্ঠা তিনি

উষোদিত করেন আমাদের ঐশ্বর্যকে ।

২

হে উষাধেবী !

আমাদের ঐশ্বর্যকে সুবন্দ কর',

সৌভাগ্যসূক্ত কর আমাদের ঐশ্বর্যকে,

হাও আমাদের ধন, হাও কীতি ।

হে মানবহিতা !

আমাদের পুত্র হাও, অন্ন হাও,

দিকে দিকে বিদিত হ'ক আমাদের সৌভাগ্যের বার্তা ।

৩

উদিত হয়েছেন উষাধেবী ;

সূটে উঠেছে তাঁর সৌভাগ্যের রেখা পুত্র

মৃত্যুহীন বিচিত্র আশ্রয় ।

সমস্ত আকাঙ্ক্ষা করে উঠলো তাঁর আলোকে

অনরিতা তিনি সমস্ত বৈবোচিত পূণ্য কর্ণের ।

৪

দূর আকাশ পথে

তিনি তাঁর দণ্ডকে করেছেন অশ্ব-বোজিত ।

উড়ে চলেছে তার গুণ

পক্ষ আভির দেশের উপর দিয়ে ।

মাহুকে তিনি দেখেন কল্যাণ দৃষ্টিতে ;

আকাশের তিনি হুহিতা ;

সমস্ত পৃথিবী তিনি সন্ধানী, কল্যাণ-বিধাত্রী ।

বহু-অন্নদাহিনী এই উষাধেবী,

স্বর্গের তিনি পরী,

অনন্ত তাঁর ঐশ্বর্য,

অবিদ্য করেন তাঁর স্তবগান,

তাঁর ব্যাক্যপথে মিত হয় আমাদের আত্ম ।

৬

বিচিত্র রক্তিম তাঁর বসনধূলি,

বিচিত্রবর্ণ উজ্জল তাঁর রথ,

সর্বত্র তাঁর গতি,

দয়ালু তিনি পরিতুষ্ট করেন আমাদের

তাঁর ধানের অল্পপ্রভার ।

৭

সত্যের কাছে তিনি সত্যবতী,

মহতের কাছে তিনি মহতী,

স্বর্গবর্ণের তিনি দেবী ।

প্রার্থীর ইষ্টবাত্রী

নাশ করেন তিনি গুহার অঙ্কুর ।

গোবনের বাত্রী তিনি ;

তার উদয়ে আনন্দলক্ষণি করে উঠে

সুই গৃহ-পশুহ ।

৮

হে উষাধেবী !

আমাদের গোপন হাও,

আমাদের অখর হ'ক বাহুগতি,

আমাদের পুত্র হ'ক বীর,

অনিশ্চিত হ'ক আমাদের বজ্রকর্ণ,

আমাদের শিরে

নিত্যকাল বহিত হ'ক শুভকর তোমার স্বস্তিগাচন ।

স্বাধীন ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার সম্প্রসারণ অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষার ছুটি ধারা চলছে—একটি স্থল-কলেজের শিক্ষা এবং অষ্টমী চতুষ্পাঠীসমূহের মাধ্যমে শিক্ষা। স্ব স্ব ক্ষেত্রে উভয় বিকাই অগ্রসর হয়েছে কিন্তু উভয়ের নিম্নলিখিত প্রস্তুতির নির্দিষ্ট কোমণ্ডও একা বা সংযুক্ত বিশেষ প্রয়োজনা হয়নি। ফলে দুইটা শিক্ষাই এখনও প্রায় স্বতন্ত্র খাতেই অগ্রসর হচ্ছে। এবং এটিও অবশ্য স্বীকার্য যে চতুষ্পাঠীর সংস্কৃত শিক্ষাকে এমনভাবে অগ্রসর করিয়ে নিতে হবে—যাতে তার স্বাভাবিক ব্যাহত না হয়। সনাতন সংস্কৃত শিক্ষাধারন পদ্ধতির মধ্যে এমন একটী চন্দ্রকান্দিব ও মাপূর্ষ আছে, যা অস্তিত্ব একেবারে হ্রাসিত। এই চুড়ান্ত নিম্নেই আমরা চতুষ্পাঠীর মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষার সম্প্রসারণ বিষয় করে কতিপয় কথা এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

চতুষ্পাঠীর মাধ্যমে যে সংস্কৃত-শিক্ষা চলছে, তারও একটী পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ সর্বসাধারণে সুবিদিত থাকার প্রয়োজন—যেমন স্থল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আছে। আজ-কালকার কঠোর জীবন সংগ্রামের বিনে যথার্থ অর্থসময়ের ব্যবস্থা সকলেরই প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ আমাদের দৃষ্টিতে রাখতেই হবে। এই সকল কারণে—চতুষ্পাঠীসমূহের পাঠ্যক্রমে ও নির্দিষ্ট বর্ষসংখ্যাক্রমে স্থল-কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম ও বর্ষসংখ্যার সঙ্গে একটা মোটামুটি সামঞ্জস্য বিধান আজ সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে আমাদের চতুষ্পাঠীসমূহের শিক্ষার মাপ মোটামুটি ঠিক করে নিয়ে স্থল-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার সঙ্গে আমাদের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা সমান্তরাল করে নিতে হবে। এই দিক থেকেই, এবং বর্তমান যুগোপযোগীভাবে অস্তিত্ব সর্বদিক থেকেই—আমাদের চতুষ্পাঠী-শিক্ষার মাতৃতায়, অক্ষ, ভূগোল,

ইতিহাস প্রভৃতি আধুনিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্তীকরণ আজ একান্ত প্রয়োজন। তবে এ করতে গিয়ে যাতে চতুষ্পাঠী সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কৃত শিক্ষার উচ্চমান থাকে স্বর্গ না হয় সে বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে। স্থল-কলেজের ছাত্রেরা যেমন ত্রি-তন্ত্র দ্বিক থেকে স্ব স্ব গুণপণ্য অগ্রসর হতে পারে—আমাদের চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের ক্ষমতা সে সব দিক খোলা থাকার ব্যবস্থা।

একই শিক্ষাভ্যন্তরনের তেজস্বী ব্যক্তির বেতন বিষয়ে ভারতীয় মতলৈই তা সনালোচনার এবং আপেক্ষিক উচ্চতা নীচতার বিষয়ীভূত হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য মাধ্যমিক শিক্ষা-নিকেন্দ্রন সমূহে নিম্নোক্ত তীর্থ, বা আচার্যোপাধিকারী ব্যক্তি-সমূহের পারিশ্রমিকের মান একটী বিশেষ চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকাল যেমন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক শিক্ষণপদ্ধতি একটী অবশ্য অসুস্থমনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, সংস্কৃত শিক্ষকেরও ক্ষমতা অসুস্থ একটী ব্যস্থা। অচিরে হওয়া প্রয়োজন। এবং প্রয়োজনীয়তাও যেমন আছে, তেমনই সর্বক্ষেত্রে একটা চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম একটী ক্ষেত্রে করতে যাওয়াও কর্তৃপক্ষের পক্ষে হুঁসখ্যা এবং দুর্ঘট হয়ে পড়ে। কিন্তু যতদিন না সংস্কৃত পণ্ডিত মহাশয়ের ক্ষমতা শিক্ষক-শিক্ষণ বিষয়ক পরীক্ষা প্রবর্তিত হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত পণ্ডিত মহাশয়ের বেতন সম্বন্ধে দুই বিষয়ে উপাধিকারী ব্যক্তিকে টেনিংশাশ শিক্ষকের বেতন বেওয়া উচিত, সন্দেহ নেই।

সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন চতুষ্পাঠী শিক্ষার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। পরিবর্তন মহাশয়ের সর্বত্র সংস্কৃত পঠন-পাঠনবি বিষয়ে যেমন, দ্বিগুণ সংরক্ষণবি বিষয়ে এবং আধুনিক বিষয়সমূহের পঠন-পাঠন বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা যেন।

আজকাল সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.ফিল, ডি.লিট প্রভৃতি ডিগ্রী আছে, তেমনই সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রেও মহাতীর্থ বা মহাচার্য পরীক্ষার প্রবর্তন

আবশ্যক। এই সব কারণে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাপন একান্ত কান্য। প্রত্যেক বেলার যে সকল সংস্কৃত কলেজ থাকবে, তারা এই আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থেকে সমস্ত বেলার সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রস্থল রূপে দিয়ার কংগেন। প্রত্যেক বেলার মাধ্যমিক সংস্কৃত তালিকা নিরূপণের জন্য যে সকল চতুশ্চাটী থাকবে—সে সকল চতুশ্চাটীর শিক্ষক ও ছাত্রদের সর্বপ্রকারে, পুস্তকাদি প্রেরণ পূর্বক—সুবিধা এই বেলার সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় সমূহ গ্রহণ করবেন। স্ব স্ব বেলা থেকে হস্ত লিখিত পুঁথিপত্রের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ভার এই মহাবিদ্যালয় সমূহের কর্তৃপক্ষেরা গ্রহণ করলে সংগ্রহাদি কার্য দ্রুত অগ্রসর হবে। স্থানীয় অধ্যাপকেরা এই সকল সংগ্রহের দিকে ব্যাপকতর সংগ্রহে ব্যাপ্ত থাকবেন, জ্ঞানলী হবেন এবং পুঁথি সংরক্ষণ পূর্বক গ্রন্থদলপাঠন, প্রেরণরচন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অবহিত থাকবেন।

আজ দেখিন এসেছে যখন খুব সহজ মূল সংস্কৃত দৈনিক এবং মাসিক পত্রিকা পরিচালিত হতে পারে। আজকের সংবাদপত্র সমূহে প্রচারিত হয়েছে যে সংস্কৃত দৈনিক সমূহের প্রচার যা' পূর্বে ছিল, তার তিন গুণ বেড়েছে। এটা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। অত্যন্ত সকল কাগজেই পূর্বে যা' প্রচার ছিল, তার থেকে সাদাক্ষর প্রচারাদিকা ঘটছে।

আজ সংস্কৃতের বিশিষ্ট বিদ্বৎসমী বীরা, তাঁরা অবহিত হবেন যে সংস্কৃত শিক্ষাকে সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক হতে হবে। বর্তমানকালের বিজ্ঞা আছে, তা' সংস্কৃত ভাষার মধ্যে জানতে

হবে। বাস্তবিক, সর্বপ্রকারের শিল্পবিজ্ঞা—জগতের যেখানে যা' কিছু জ্ঞান আছে, তাকে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল পত্রপুটের ভেতরে যথাযোগ্য সম্মান-স্থান দিতে হবে। আমাদের ভারতীয় সভ্যতা কোনওদিন কোনও প্রকার জ্ঞান উপেক্ষা করেনি। জ্ঞানের পরিধিকে বিশ্বের ভৌগোলিক সীমারেখার বহু বাইরে ভারতবর্ষ চিরকাল অগ্রসরে রেখেছেন—আজও রাখবেন, মনে হবে না।

আজ আর একটা ভিন্‌দের বড়ই গুরুতর প্রয়োজন আমরা অনুভব করি। সেটি হচ্ছে—আমাদের মাতৃভাষা সমূহে যে সকল সংস্কৃত-সভ্যতা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এগুলি আরো সবই সংস্কৃতমূলক। সংস্কৃত বিষয়ক এবং সংস্কৃতি বিষয়ক সমস্ত প্রবন্ধের জৈবদিক বা পঞ্চদশিক একটা বিষয়বস্তু অঞ্চলিক ভাষাসমূহে বিভিন্ন ভারতের পটভূমিকায় প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। মনএ ভারতবর্ষের ভাষাবাদার মধ্যে একটা মতগূঢ় ঐক্য আছে। তার মৌলিক কারণ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য। এতে একটা বিশেষ উপকার এই হবে যে—শুধু ভারতবাসী অনায়াসে বুঝতে পারবেন—আমাদের সত্যিকার প্রাণবস্তুর জীবনের মূল নিদানবস্ত্র কোথায় রয়েছে। বিলাতী শিক্ষার চালনার মধ্য দিয়ে ও যাঁরা ভারতের সভ্যতাকে রেখেন, তাঁরাও বলতে বাধ্য হবেন যে ভারতের সব কছাটা ভাষাই সংস্কৃতের ধন বৌলতেই বেঁটে রয়েছে ও থাকবে এবং সব কছাটা সাহিত্যই সংস্কৃতের আশ্রয়ে সুরক্ষিত। এই সংস্কৃতই ভারতের চিরন্তন শব্দণ এবং ভারতের সংহতি রক্ষণের মৌলিক কারণ।



বিত্ত কৌলীন্য

নারায়ণ চৌধুরী

আমরা বর্তমানে যে সমাজে বাস করছি, তাব ধ্যান-ধারণা মূল্যমান লক্ষণাদি নিরূপণ করবার চেষ্টা করলে মন এক-এক সময় গভীর হতাশায় ডুবে উঠতে চলে। হেথা যাহা এ সমাজে অর্থমূল্যের দ্বারা প্রভাবিত: সব-কিছু নিরূপিত হচ্ছে, নির্মিত হচ্ছে। আমাদের আচার-আচরণ পরম্পরের সঙ্গে ব্যবহার, কর্তব্যগত চরম-বসন ইত্যাদির মূলে যে মনোভাব কাজ করছে তা একান্তভাবে অর্থনীতির দ্বারা শাসিত। অর্থনীতি মিনিসটাই খাবার তা বলি মে, কিন্তু হেখানে অর্থনীতিই সব-কিছু মূল্যমানের নিয়ন্ত্রণে হলে অন্তরের কোমল প্রকাশ না করে পারা যায় না।

উনিশ শতকের বাঙালী সমাজে একমুখী ছিল না। রাজা বামদেহন রাজ, পণ্ডিত বিশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাবিবেকানন্দ ঠাকুর প্রমুখ উনিশ শতকের আদি অধ্যায়ের ভেত্রে যে সকল মহাপুরুষ, তাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার মূলে বিত্তকৌলীন্য কিছু পরিমাণে সহায়তা করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু কেবলমাত্র বিত্তই তাঁদের উপাত্ত ছিল না। তাঁদের প্রত্যেকেরই মনোগঠনের ভিতর আত্মবিশ্বাস একটা বড় ভাঙ্গনা খুঁড়ে ছিল, আর সেই আত্মবিশ্বাসের বিকাশে তাঁদের অস্তিত্ব বিস্তার দ্বারা লক্ষ্য নানা সুযোগ-সুবিধা সহায়ক হয়েছিল মাত্র। বিস্তার লক্ষ্যই বিস্তার অকাঙ্ক্ষা তাঁরা করেন নি। সমাজ-সেবা জাতি-সেবা ইত্যাদি করতে গেলে, বস্তুতঃ যে কোন প্রকার কর্মোচ্চারণে আপনাকে ব্যাপৃত রাখতে গেলেই, কিছুনা-কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়। সেইদিক দিয়েই কেবল অর্থ তাঁদের জীবনে মূল্যবান ছিল। নয় তো অর্থ সাধনা থেকে তাঁদের দূরে থাকতাই কথা ছিল। শ্রুতীর বেশপ্রয় ও মানবহিতের আহবানের দ্বারা যে মন উত্তেজিত সে মনে অর্থসাধনা কখনও পূরণ্যই আদর্শ ধরল করতে পারে না।

কিন্তু এখনকার দ্বারা-বরণ সবই পাশ্চাটে গেছে। এখন অর্থের জন্তেই লোকে অর্থের ভগ্ননা করে। শিক্ষা কিছু

নয়, বিজ্ঞা কিছু নয়, চরিত্রপোষক কিছু নয়, শুধু যেন-তেন প্রকারেই অর্থ সম্পদ কৃত্রিমভাবে করতে পারা নিয়ে কথা। মূল্যমানের এরকম শোচনীয় বিপর্যয় পূর্বে কখনও দেখা যায় নি। মনে হয় এরকম অবস্থা ঘটাবার মূলে গত দুই-দুইটি বিশ্বযুদ্ধের বেশ কিছুটা হাত আছে। যুদ্ধ আমদের নৈতিক জীবনের ভিত্তিটাকেই যেন আলগা করে দিয়ে গেছে। যুদ্ধের দ্বারা-বেরে-আগা মানাধি চূড়ান্ত ও বিপর্যয় আঘাতে সমাজে বাঙালী জীবন এমনভাবে পর্ব্বত হয়েছিল যে তার মেতলভট্টাই যেন বেকে গেছে। হারিত্য ও অর্থহীনতা একটি মহা অভিশাপের মত। হারিত্যকে ঘনিষ্ঠানিত বলে ভাববার মত মন আমাদের নেই সে কথা স্বীকার করব। বহুর শোষণ ও নিঃশেষণের ভিত্তির ওপর যে সমাজের প্রতিষ্ঠা, সেই অশন সমাজের বৃদ্ধি পাড়িয়ে দ্বারা হারিত্যকে idealize করেন, তাঁদের মত বন্ধক আর কেউ নেই। কিন্তু কথা তা নয়। কথা হচ্ছে, হারিত্যকে ঘূচাতে হবে ঠিকই, কিন্তু হারিত্য ঘূচাতে গিয়ে আমরা অসত্য পথের পথিক হব কেন। আর সব-কিছু মূল্যমান বিদর্জন দিয়ে শুধু অর্থ সাধনাকেই আঁকড়ে থাকব কেন। অর্থ বিত্তকেই জীবনের পরমার্থ বলে মানব কেন। এইখানেই আমার মনের ষটকা, এই ষটকা দূর হওয়ার মত পরিবেশ, বর্তমান সমাজে অসুপস্থিত বলে মনে হয়।

আমাদের সমাজে অর্থলোলুপতা প্রায় সর্বব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছে। শুধু যে সাধারণ জীবের মানুষের মধ্যেই এই লিলা সীমাবদ্ধ তা নয়, দ্বারা নিরীক্ষিত জ্ঞানী ওদী বলে পরিচিত, তাঁদের মধ্যেও এই অর্থলিপ্সুর কিছুমাত্র কমতি নেই। বরং তাঁদের মধ্যেই যেন এই লক্ষণ আরও বেশী মাত্রায় প্রকট। জ্ঞানী-ওদী সমাজ অর্থকে ভগ্ননা করেন শক্তির প্রতীক হিসাবে। অর্থের দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি পায়, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে পরিমাণে কথায় মত হয়,

লোকের উপর প্রভাব বিস্তারের আর্থিক প্রতিপত্তি বিশেষ ভাবেই কার্যকর হয়ে থাকে। এই সকল নানা কারণে জ্ঞানী-জ্ঞানীরা আরও যেন বেশী মাত্রায় অর্থের প্রতি আকৃষ্ট হন। জ্ঞানী-জ্ঞানীরা সমাজের সব চেয়ে সচেতন অংশ, তাঁরা বুদ্ধিভীরু নামে খ্যাত। সুতরাং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা তাঁদের মধ্যে সহজাতভাবেই প্রত্যাপিত। সমাজের এমন যে সমাজ পত্রিকার আশ্রয়-সচেতন অংশ, এঁরা অর্থের শক্তি, মার্ককতা ও মর্যাদা সম্পর্কে কোন ক্রমেই অনগ্রসর থাকতে পারেন না। কাজেই বিজ্ঞা বা জ্ঞানের অলুহাসী বা অলুপীলনকারী হয়েও এঁরা অর্থ সম্পর্কে মোটেই নিম্পূর নন। এমন কি সত্য পরিস্থিতি এই যে এঁদের অনেকেরই চোখে বিজ্ঞা বা বুদ্ধির চেয়ে অর্থের মূল্য বেশী। বিজ্ঞার এঁরা কেউ স্বতঃ-অলুহাসী, কেউ বা জীবিকার স্বত্রে বিজ্ঞাচর্চায় নিয়োজিত। কিন্তু প্রায় শতকরা পঁচান্নটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিজ্ঞার চাইতে অর্থ এঁদের নিকট অনেকগুণ বেশী স্পৃহণীয়। বিজ্ঞার শক্তিকে এঁরা অর্থের শক্তির তুলনায় অনেক খাট মনে করেন। এ বকম বিপর্যয় বাস্তবী দীর্ঘমেয়াদে একশো বছরের ইতিহাসে আর সমুদ্রত হয়নি।

সমাজে বনৌ নির্ধন বড় ছোট সকল স্তরের মানুষের মধ্যে এই পার্থক্য কিন্তু ক্রমশঃ প্রচুর লাভ ও শক্তি শস্য করছে, যে ইচ্ছা অর্থবলে খাট, তাঁরা চরিত্রবলেও খাট, গুণগন্যর ক্ষেত্রেও খাট; তাঁদের চরিত্রগুণের দৈহিক আর গুণগন্যর দৈহিকের মজই তাঁদের অর্থের দৈহিক। প্রগতিশাস্ত্রে তাঁদের অর্থদৈহিকই বিশেষ করে প্রমাণ করে তাঁদের চরিত্রগুণকর্ষ ও গুণহীনতা। অপর পক্ষে অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়—এই নজীরেও অনেক অর্থহীন ব্যক্তিকে সম্বন্ধের চক্রে ধরে থাকেন, যদিও এই সম্বন্ধে প্রায় ক্ষেত্রেই অল্পক প্রতিপন্ন হতে দেখা যায়। আমাদের দেশে স্বল্পবিস্তারের সঙ্গে চরিত্রগুণকর্ষকে কোন কালেই এক করে দেখা হয়নি। বরং সৎ ও কল্যাণময় ভাবে ব্যাপিত স্বল্পবিস্তার জীবনের মধ্যেই গুণ ও সোয়াভি, এই ছিল ভারতীয় আদর্শ। ভারতবর্ষীয় সাধকদের চিন্তাধারায় অর্থের অভাবের চেয়েও কালো বর্ণ চিত্রিত হয়েছে—মানবতার অভাব, জ্বরগুণের অভাব। অপরিমিত ও অনিয়ন্ত্রিত শক্তির উপাসনাকে ভারতীয় মন

কোন কালেই প্রসন্ন চিন্তে গ্রহণ করতে পারেনি, কারণ মানবতার অভাব। জ্বরগুণের অভাব এই স্বত্র থেকেই লাত বলে ভারতীয় মনের গাহবা। শক্তি অর্থের স্বত্র থেকেও আসে, শারীরিক বলের থেকেও আসে; কিন্তু যে স্বত্র থেকেই আসুক, শক্তির তুষ্ণীকৃত ও ক্ষেত্রীকৃত শক্তির আধ্বর্ষ্যের প্রতি ভারতীয় মনের অমীমাংসিত। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতের সনাতন মতাবলম্বী, ক্ষত্রকুল ও ব্রাহ্মকুলের উপর ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বে। ব্রাহ্মণ উত্তরীয়মাত্র মূল্য নির্ধন ব্যক্তি হতে পারেন, কিন্তু যেহেতু তিনি শাস্ত্রচর্চাকারী ও ধর্মনিষ্ঠ, সেইহেতু অর্থ ও ক্ষত্রবলে বসলাদী রাজার উপরে ছিল তাঁর মর্যাদার আপদ। 'বিশ্বত্বক নৃপত্বক নৈব জ্ঞান্য কথ্যচন। স্বপ্নে পূজ্যে রাজা বিদ্বান্ দর্শ্য পূজ্যতে।' চারণ্যকথিত এই শ্লোক নিত্যকথ্য কথার কথা নয়, ওটি রাজা ও বিদ্বানের আপেক্ষিক মর্যাদা সম্পর্কে প্রাচীনকালীন ভারতীয় ব্যবহার খাটি প্রকাশ। এই মনোভাব সেদিন পর্যন্ত আমাদের সমাজে বিদ্যমান ছিল। পল্লী অকলের অমিয়ার বহু বসলাদী আর গহাকান্ত হয়েও গ্রামীণ সমাজ-ব্যবহার এক জারগার এসে মাথা নোয়াতে বাধ্য হতেন—সে বিশ্বত্ব বিচার নিকট। গ্রামীণ সমাজে শক্তির মাথা ছাড়িয়েছিল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মাথা। তাঁর বিজ্ঞাচর্চা আর ধর্মগুণতাই ছিল তাঁর কৌশলজ্ঞের শ্রেষ্ঠ নিশানা। তাঁর চরিত্রমাহাত্ম্য প্রকাশ পেত তাঁর পুত্র-নগত অল্পকৃত্ত জীবন ব্যাপন প্রণালী মধ্য দিয়ে; অর্থের শক্তি, শারীরিক বলের অহঙ্কার ওই সহজাত চরিত্রমাহাত্ম্যের পাশে কোন্ ছায়া। অমিয়ার বহু মানুষের দণ্ডগুণে কড়া হয়েও এই চরিত্রমাহাত্ম্যের মজই শাস্ত্রনিষ্ঠ সংব্রাহ্মণকে আত্মমি মত্ত হয়ে প্রণাম করতে ও তাঁর উপদেশ নির্দেশ শিরোধার্য করে নিতে বাধ্য হতেন। শুধু তাই নয়, অমিয়ার অস্তার করলে দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁকে তিরস্কার করবারও ক্ষমতা রাখতেন; সং ব্রাহ্মণের শক্তির উপর অস্ত কোন দৃষ্টি ছিল না।

এখন সে সব কল্পকামিনী বলে মনে হয়। অর্থই এখন সব-কিছু মূল্যমানের নিয়ন্তা। আর অর্থ নেই তার কিছুই নেই। তার অস্তময় গুণগণ্য থেকেও নেই। অর্থ-বিহনে সে মানুষ সমাজে অপাণ্ডিত, পবিত্র। অর্থের

সামাজিক মূল্য নিশ্চয়ই কিছু আছে, তার স্বীকৃতিতেও বেশ নেই, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন অর্ধের মানবজন্মের দ্বারা ই যদি কোন মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিমাপ হতে থাকে, তা হলে তৎক্ষণে শোচনীয় অবস্থা আর কিছু হতে পারে না। অথচ বর্তমান সমাজে এই মানবজন্মই ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করছি। আরও যেটা পরিত্রাণের এবং হার আত্মা আমি পূর্বেই দিয়েছি তা হচ্ছে এই যে, সমাজে ঐরা জ্ঞানভিত্তিক প্রতিপত্তিমান বলে স্বীকৃত তাঁদের মধ্যেও এই জাতীয় অর্থ মনস্তত্ত্ব প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাধারণ মৃত জন অর্ধের পারে গড় কল্পক কতি নেই, কিন্তু বিতরণ ব্যক্তিরা ওই অংশে মনে নেবেন কেন, ওই পথ ধরে চলবেন কেন। তাঁদের চোখে বিরাট কিংবা অস্বাভাবিক গুণগণের ম্যামান কোন দিয়ে অর্ধের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই কি এই অংশের বৃদ্ধি হয় নি? জানি, তাঁরা এটা মুখে স্বীকার করবেন না, কিন্তু তাঁদের আচরণ বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। তাঁরা নিজেরা অন্তরে অন্তরে জানেন অর্ধের দুলামানের প্রতি তারা কতদূর আগন্ত। গুণীজনদের কাছেই যেখানে গুণীজনদের আরও স্বীকৃত নয়, সে হলে অর্ধাবস্থার আদর্শ সমাজে সবকিছুর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে তাতে আর অস্বার্থ্য কি।

অর্ধের আদর্শ কীভাবে যে মানুষের মনকে অধিকার করেছে তা আমাদের সামাজিক সমাজের আচরণ অস্থাবর করলেই কতকটা বোঝা যায়। লেখকেরা তাঁদের লেখার ও ভাবধারিতে উচ্চাধর্ষের কথা বলেন, কিন্তু তাঁদের আচরণ তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অর্ধমূল্যের নিকট এঁদের অধিকারেরই বিবেক বিক্রান্ত। অর্ধসিঙ্গার দ্বারা এঁদের মন এমনই আবিষ্ট ও আচ্ছন্ন হয়ে গেছে যে সাধারণ ভাল-মন্দেও পার্থক্য বোধ পর্বত এঁদের মূগ্ধ হয়ে গেছে বলে মনে হয়। সোকে সন্ধের দ্বারা মানুষের প্রবণতা নিম্নপর্বের চেষ্টা করে। এই চেষ্টার মূলে অনেকখানি সত্য আছে। ইংরেজিতে কথা আছে "A man is known by the company he keeps." রাষ্ট্রনের একটি বিখ্যাত উক্তি হল—"Tell me what you like and I shall tell you what you are." তুমি কী পছন্দ কর আনোকে বল, তুমি মানুষটি কীরকম আমি বলে দেব। এই মানবও দিয়ে যদি সামাজিক লেখকস্বরের বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে এঁদের অধিকারশেই আদর্শব্রিট, চরিত্রব্রিট।

এঁদের কার্যকলাপ মনের ভিতর মোটেই প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্য করে না। এইসব ভ্রষ্টাচারের বলে প্রধান প্রধান লেখকেরাও আছেন। প্রকৃত অর্থ সন্ধের আকর্ষণে এঁরা আশ্রয় একদিকে বৈনিক পত্রিকার বাণিজ্যিক সাহিত্য প্রকাশের সঙ্গে হাতে হাতে মিলিয়েছেন, অল্পদিকে কতকগুলি তৃতীয় শ্রেণীর পত্রিকা (সিনেমা পত্রিকা) লুপ্ত হাতছানিতে সাত্রে পাড়া দিয়ে নিজেদের জাতকুল হুইই হুইয়েছেন। এমন সব পত্রিকার সঙ্গে এখন এঁদের ধর্মম-মহর্ষম, ঘেঙলিও সঙ্গে মিলিষ্ট থাকতে যে-কোন তত্ত্বব্রিট ব্যক্তিই বিধাবোধ করবেন। এইসব সিনেমা-পত্রিকা মনের পর মাগ মাগ সাধারণ পাঠকের মনোব্রহ্মের নাম করে অতি নিরন্তরের সব পাঠ্যবস্তুর পরিবেশন করে যাচ্ছে। সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চটুল ছবি, তাঁদের মঞ্চের নানাবিধ বোম্বপত্র ও গালপত্র, সিনেমা ভগ্নতের নানাবিধ টুকটাকি খবর—এই হল এইসব পত্রিকা নামেরে স্তাকড়-পত্রগুলোর প্রধান উপজীব্য। আর এগুলির সঙ্গেই সহযোগিতা ও সঙ্গ করছেন কিনা বাংলা সাময়িক সাহিত্য ভগ্নতের দেয়া দেয়া বস্ত দিকপাল। বিকপালদের মূল্য এই যে, এই সব কাগজ লেখার স্বল্প ভাল অর্থমূল্য দিয়ে থাকে। তা হরতো হবে। কিন্তু অর্থমূল্যই কি মূল্য? আদর্শনিষ্ঠা কিছু নয়? বিশেষতঃ যে পত্রিকা লেখনব্রিটিতে তাঁরা নিয়োজিত রয়েছেন সেই সাহিত্যব্রিটিতে আদর্শের কোন স্থানই কি থাকবে না? এ তো আর অল্প বসন্ত। স্বীকার মত গত্যাহুপতিক ব্রিটি নর, মনের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও কল্পনাকে সার্থক রূপ দেবার স্বল্পই সাহিত্য। সেই পুণ্যকার্যের মধ্যেই যদি আদর্শের পোষকতা না থাকল, তা হলে ও জিনিষ আর কোথায় আমরা আশা করব? লেখকের কাছে বিবেকের চাহিদার চেয়েও কি অর্ধের চাহিদা বড় হবে? এই ভাবে ক্রমাগত অপকৃষ্ট সন্ধের অস্থূলন করে লেখকেরা নিজেদের কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছেন তা তাঁরা দেখেও দেখছেন না। সমাজের ঐরা সবচেয়ে বিবেকী সন্তোম সূত্রটি মানুষ বলে পরিচিত, তাঁরা অর্ধসিঙ্গার মূল্যে তাঁদের স্বাভাব্য ও বর্ধনাকে বলি প্রধান করতে উজ্জত হয়েছেন। ঐ কলক রাখবার জায়গা নেই। লেখকেরা তাঁদের সম্মিলিত স্তম্ভব্রিট দ্বারা এই কলক অপনোদনের স্বল্প সন্তোম হোন, মাঝে উৎসবের প্রাভাসে তাঁদের নিকট এই আদ্যের সনির্বন্ধ অস্থবোধ।

জ্যোতির্ষ্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

ত্রিযোগেশচন্দ্র বাগল

কি ক্ষেত্রে ঠিক মনে নাই, ১৯২৬ সনে জ্যোতির্ষ্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। বড়ই য়েহ-প্রবণ মহিলা, তিনি আদ্যোদেব সকলের 'বঁহি' ছিলেন। ১৯২৬ সন হইতে ১৯৪৬ সনে দ্বুত্য় পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধা করিতে সমর্থ হই। এই বিংশতি বৎসরের মধ্যে তাঁহার স্ববেশশ্রীতি এবং কর্মকুশলতা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার বিষয় এখানে কিছু লিখি।

জ্যোতির্ষ্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় উচ্চশিক্ষিতা, এম-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ। শেখুন কলে জ কিছুদিন শিক্ষণতা করিয়া কটক রাতেন্স কলেজে অধ্যাপিকা হইয়া যান। সেখানে তিনি আচার্য্য যোগেশচন্দ্র বাগ বিজ্ঞানিতির সংস্পর্শে আসেন। কটক হইতে তিনি সিংহলের একটি মহিলা কলেজের অধ্যাপক হইয়া গিয়াছিলেন, তখন ডক্টর কালিদাস মাপ ছিলেন ঐ অকলেবর একটি কলেজের অধ্যাপক। সেখান হইতে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১৯২০ সনে কলিকাতা স্পেশাল কংগ্রেসের অধিবেশন অন্তে হায়ের উপস্থাপন লালা লক্ষণৎ বলদ্বর কস্তুরমাখিভালয়ের অধ্যাপক পর গ্রহণ করেন। অসহযোগের মরুতনে তিনি কর্মভ্যাগ করিয়া পুনরায় কলিকাতায় আগমন করিলেন। সেভী অবলাবম্বর আগ্রহান্তিময়ে জ্যোতির্ষ্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় ত্রাঙ্ক বাসিকা শিকালয়ের অধ্যাপক হন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার য়েহে বড় বকয়ের আত্মোপচার হয়। ইহার পর অতিরিক্ত পরিশ্রমে অপাঙ্গে হওয়ায় 'তিনি' পরভ্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

জ্যোতির্ষ্ময়ী দেবার সঙ্গে আমার যখন প্রথম আপাপ হয় তখন তিনি সেভী অবলাবম্বর মারী-বিক্ষা-সমিতির অধীনস্থ বিজ্ঞাপনার বাণীতবনের অধ্যাপক। বাণী-তবন বালবিবধা এবং বামী পরিত্যক্তা বৃত্তী মারীদেব একটি শিক্ষাকেন্দ্র। ছাত্রীদেব বিজ্ঞাপিকা ও শিল্প শিক্ষা দুই-ই এখানে দেওয়া হইত। জ্যোতির্ষ্ময়ী শিক্ষাত্রস্ত্রীয়ে দীবন

আরম্ভ করেন। শিক্ষাত্রস্ত্রীর য়ে প্রধান গুণ—ছাত্র-ছাত্রীদেব প্রতি বরহ ও মনতা—তাঁরা তাঁহাতে পূর্ণবাত্রার বিভ্রম ছিল। তিনি পরবর্তী দীবনে রাজনৈতিক কর্মী ও মহিলা নেতৃত্বপে খ্যাতিলাভ করেন, কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদেব প্রতি বরহ তাঁহাতে বরাবর প্রত্যক্ষ করিয়াছি; আর এই ছাত্র-বন্ধু জঃপই তাঁহার দীবনের একপ্রকার অংদান ঘটয়াছে। তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এই ছাত্রবন্ধু হিগাবেই। ১৯২৬ সনে কলিকাতায় একটি ইন্ডেন্ট এমোনিগেশন বা ছাত্র-সভা গঠিত হয়। সভার সভাপতি ছিলেন জ্যোতির্ষ্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, লক্ষ-সভাপতি সুবেশচন্দ্র বাগ (বর্তমানে কলিকাতার শেডিক), সম্পাদক দুর্গাপাথ বাগগুপ্ত। আমি হিগাম মহাবর্তী সম্পাদক। কার্যনির্বাহক সমিতির লবস্ত্রদেব মধ্যে কেহ কেহ দীবনে যেন সাকলা অর্জন করিয়াছেন। ইহানীত্বন কালেব ছাত্র-সভাগণির মধ্যে এটি ছিল আরি। তবে এই ছাত্র-সভাত্রির উদ্দেশ ছিল রাজনীতি-বহির্ভূত। ষত্রিয়-ছাত্রদেব নানাপ্রকারে সাহায্য ধান, বোমী ছাত্রদেব লেব-ওস্ত্রধার ব্যবস্থা এবং ছাত্র-সভায়ে বিবিধ অভাব-অভিযোগ দূরীকরণ ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য ছিল। কলেজের ছাত্রদেবই সভার লবণ্য কতা হইত। লবণ্যদেব মাসিক চাঁরা চারি আনা। আমি তখন এম-এ পড়ি; সভার একটি ভাড়া কতা ঘর ছিল নীতায়ন য়েব স্ট্রীটে। আমি এবং আর একজন ছাত্র এই য়ে বস করিতাম। সভার অধিবেশনত্মিতে সভাবস্ত্রই জ্যোতির্ষ্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতির করিতেন। এই সময় তাঁহার সংগঠনমূলক এবং ছাত্রবন্ধে মনের বিশেষ পরিচয় পাইতে লাগিলাম। ছাত্র-সভার উদ্দেশ্য অমুয্যারী কার্য-সম্পাদন-কলে অর্ধসংগ্রেহের নিমিত্ত আনন্দা ছ' একবার ললদাং আয়োজন করি। এ সময়কার একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলি।

ছাত্র-সভার পক্ষ হইতে আমরা বহু-বিজ্ঞান-মন্দিরে আচার্য ভগবীশচন্দ্র বসুকে একটি বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার আয়োজন করি। সভাপতি জ্যোতির্ষরী এই বক্তৃতার আয়োজনে বিশেষ উৎসাহী হন। বর্তমান লেখক তাঁহার পত্র পাইয়া প্রথমে আচার্য ভগবীশের সঙ্গে দেখা করেন। ইহার পরে অব্যাপক নাগ (বহু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রধান কর্মী নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ) তাহিণ ও সময় ঠিক করিয়া হিলে নিব্বিষ্টহিনে আচার্য ভগবীশচন্দ্র আমায়ের সম্মুখে সরল ইংরেজীতে বক্তৃতা দিলেন। এই উপলক্ষে কয়েকঘণ্টাই আচার্য ভগবীশচন্দ্রের সমিধানে আনাকে বাইতে হইয়াছিল। এখন দিন কি বিতীর দিন মংগ নাই, ভগবীশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "তোমরা ছেলেটা বাতায়তি হরাত লাভ করতে চাও; কিন্তু এক একদিনের বা একবৎসরের কাজ। আমি কতকাল ত্রিশ বৎসরে করেছি এখন তাহলে বিদ্যর লাগে। সংখ্যা চাই, সাধনা চাই, বাতায়তি কোন কাজই হয় না।" এই কথাগুলি তিনি এমন কোর দিয়া বলিলেন যে, এখনও জ্বলন্ত গাঁথা রহিয়াছে। বক্তৃতা-সভার ছাত্র-সদস্যেরা ভিত্তি লম্বাইয়াছিল। দেড়ী বহু সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির মুখে শুনিছি, তিনি এত ছাত্র-সভার খেঁচা বিদ্যর প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ছাত্র-সভা বেক্কাদিন স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার রহস্য মনের বিস্তার পরিচয় পাইলাম।

বিভাগ্যবশত বাণী-সবনে বিভিন্ন জেলা হইতে বাল-বিদ্যবগণ আসিয়া অধ্যয়নরত থাকিতেন। তাঁহারই পরামর্শে ও সহায়তায় আমার এক আত্মীয় বালবিদ্যবকে এই ভবনে ভর্তি করিয়া দি। তখন প্রত্যেক শিক্ষার্থিনীর মাথাপিছু প্রতিমাসে বাবো টাকা ব্যয়গ্রহণ ছিল। এই ব্যয় নির্বাহ হইত বিভিন্ন স্বাতন্ত্র্য লান হইতে। এখানে দুই বৎসর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ছিল। আমার আত্মীয়গণ এখানে দুই বৎসর শিক্ষালাভ করিয়া বাণীভবনেরই সাহায্যে সংস্কৃত ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হন। তিনি পরে শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেন এবং মৌবনে স্বপ্রতিষ্ঠ হন। আজ এই প্রসঙ্গে জ্যোতির্ষরী গাঙ্গুলীর নাম বিশেষভাবে দ্রব করি।

১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার কংগ্রেসের

অধিবেশন হইল। কংগ্রেসের সঙ্গে গাঙ্গুলী পরিবারের যোগ ইহার প্রায় দ্বিগুণ অধিক। জ্যোতির্ষরীর মাতা কাছিনী গাঙ্গুলী সর্বপ্রথম কলিকাতায় কংগ্রেসের একটি প্রকাশ অধিবেশনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। হারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামাভাবে প্রথম যুগের কংগ্রেসের সেবা করিয়া গিয়াছেন। জ্যোতির্ষরী ১৯১৭ সনের কলিকাতা কংগ্রেসে নারী-তলাক্টিয়ার বাহিনীর কাপ্টেন হইয়াছিলেন, ১৯২০ সনের কংগ্রেসেও তিনি একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এখানে, ১৯২৮ সনের কংগ্রেসের তিনি এতজন প্রধান কর্মকর্তা হইলেন। বর্তমানে কলিকাতায় পার্ক সার্কারে যে বিরাট পার্ক খুঁট হয় তাহা তখন পতিত অবস্থায় ছিল। আমি উঁচু নৌচ, কোথাও কোথাও কাঁটা গাছে ভরা। এই সকল পরিষ্কার করিয়া আমি সমান করা হয় এবং এই ভূমিতে কংগ্রেস মণ্ডপ, সর্বমূল সম্মেলন মণ্ডপ ও বিরাট প্রবর্তনীর স্থান করা হইল। আমি প্রকৃতির সময় হইতেই জ্যোতির্ষরী সেখানে রীতিমত বাইতেন, আমিও কখন কখন তাঁহার সঙ্গী হইতাম। শুনিয়াছি, কংগ্রেসী বালকটির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগেছে "অধ্যাক জ্যোতির্ষরীকে" বাণী-ভবনের কর্তৃপক্ষের বিরোধগ্রহণও হইতে হয়। বাহা হউক, সিংহল হইতে আবার একটি কলেক্টর অধ্যাক পদের ক্ষত তাঁহার নিকট আশ্রয় আসে, এবং তিনি বাণী-ভবনের কর্ম ত্যাগ করিয়া সেখানে চলিয়া যান। এই সিংহল যাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার একটি সাক্ষিগত বিবরণ চিত্রপথ 'প্রবর্তী' ও 'মহাভারত'তে প্রকাশিত করি। বলা বাহুল্য, তখন আমি এই পত্রিকা চুইখানির সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মে লিপ্ত হইয়াছিলাম।

মনে হয় বৎসরেক কাল জ্যোতির্ষরী সিংহলে ছিলেন। এই এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের দাননীতি বিশেষ জটিল আকার ধারণ করে। মহাত্মা গান্ধী সভ্যগ্রহ আন্দোলন সুরু করিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত বড়ো যাত্রা অস্তে তিনি কারাক্ষম হন। ভারতবর্ষের সর্বত্র এক অভূতপূর্ব জনজাগরণ দেখা দিল। সভ্য-প্রত্যাপিত জ্যোতির্ষরী গঙ্গোপাধ্যায় আন্দোলনে কারমনে যোগ দিলেন। কলিকাতার নারী সভ্যগ্রহ সমিতির তিনি হইলেন

একজন সহকারী সভাপতি। বাংলার নারী সমাজের দশ
কি উৎসাহ-উদ্বীপন। মহিলাগণ সত্যগ্রহ আরম্ভ করিলেন
জাতীয় পত্রিকাটির একটি শোভাযাত্রা বা মিছিলের
আয়োজন দ্বারা। প্রদ্যানন্দ পার্ক হইতে মিছিল বাহির
হইল। আমবাগাট্ট ষ্ট্রীট, বোম্বার্ডার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট ও
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইয়া হেড্‌ওয়ার (বর্তমান আকাশ হিং
বাগ) আসিয়া শেষ হয়। আনি এই মিছিলের সঙ্গে
আগাগোড়া ছিল। হেথিলাম জ্যোতির্ময়ী গল্পোপাখ্যানের
কি তেজোবুগ্ধ কর্তৃত্বপূর্ণতা। উদ্ভিদা দেবীর একটি
সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর যে ইহার গন্তব্যস্থানে চলিয়া যান।
ইহার পর নারী সভ্যগ্রহ সমিতির কর্তৃকুলতা নান্যভাবে
প্রকাশ পাইতে লাগিল।

জ্যেষ্ঠ মাসে ছুটি লইয়া 'দেশের বাড়ীতে গিয়া-
ছিলাম; কিবিদ্যা দেখি তিনি আইন অন্তর করিয়া
কারাক্ষ হইয়াছেন। সভ্যগ্রহীতা আবার তে অস্ত্রপক্ষ
সমর্থন করিতে ন। একটিনাত্র বিবৃতি পেশ করিয়া
নিজ আদর্শ ব্যক্ত করিতেম। জ্যোতির্ময়ীও একটা
বিবৃতি মাত্র বিব্রাছিলেন। তখন কলিকাতার চৌক
প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট লর্ড সিংহের পুত্র সুনীলকুমার
সিংহ। তিনি জ্যোতির্ময়ীর আদর্শও বটেন। তাঁহার
মুখে শুনিয়াছি, বিবৃতির মুখপত্রে কংগ্রেসের ঐতিহ্য এবং
ইহার সঙ্গে তাঁহার পিতৃকুল ও স্বভাবকুলের যোগাযোগ
সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট সুনীলকুমার
খানিকটা বিপর্যস্ত বোধ করেন; কিন্তু তাঁহার তত্ত্ব
করিতে ভুলেন নাই, জ্যোতির্ময়ীকে তথাকথিত আইন বলে
কাবাগারে নিক্ষেপ করিলেন। ক্রমে বহু মহিলা সভ্যগ্রহী
কাবাগারে আবদ্ধ হন। আমবা কখনও কখনও ভেগে
জ্যোতির্ময়ী দেবীর সঙ্গে দেখা করিয়াছি। শরীর অগাধ
হইলেও মুখে সেই তেজোবুগ্ধ হাসি। বিতীয় সভ্যগ্রহ
আন্দোলনের সময়ও তিনি কাবাগারে করেন।

ইহার পর স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নতুন পর্যায়
প্রবর্তিত হইল। সভ্যগ্রহীতা স্বাভূতপাশন মূলক প্রতিষ্ঠান
সমূহে প্রবেশের অসম্ভবতা পাইলেন। কিন্তু বাংলার
কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এত বড় আন্দোলন সম্বন্ধে অন্তর্ভুক্ত
বিব্রা। জ্যোতির্ময়ী বল-নিষেধে যোগ না দিয়া স্বতন্ত্র

কংগ্রেসী প্রার্থীরাপে কলিকাতা করপোরেশনের সাধারণ
নির্বাচনে অসমর্থ হইলেন। শুনিয়াছি বহীর প্রাথমিক
কংগ্রেস কমিটির কর্তব্যারগণ এইরূপ ত্যাগপূর্ণতা দেখিবার
মনোমুগ্ধ-পত্র অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। জ্যোতির্ময়ীর
উপস্থিত বুদ্ধি ও সজ্জিততার পতিত ইতিপূর্বে একাদিকবার
পাইয়াছি। স্বদেশবাসিন্যের তীন অগঃচেষ্টার বিরুদ্ধে
তাঁহাকে গাঁড়াইতে যেহিরাছি, আবার অবাধ্যতা পুলিসের
সান্ঠি চার্বের সম্মুখেও তাঁহাকে স্যাপাইয়া পড়িয়া বক্তৃত
কলেবর মেরর সুভাষ চন্দ্রকে আগলাইয়া রাখিতে
অতি নিকট হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এজন্য সজ্জিত
আন্তোঙ্গা মহিলাকে যখন জৈনক 'বিপ্লবী' দেখিবার
দ্বারা বিনম্রভাবে চিত্তিত হইতে দেখি তখন বাস্তবিকই
বড় দুঃখ পাই। এজন্য রর সেননী-পরিচালনা যত শীঘ্র
ক্ষান্ত হয় ততই মঙ্গল। জ্যোতির্ময়ী যে সকলেই প্রভা-
কীতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম শুনিবা মাত্র
মনো-ধবিত্ত, আবার নিঃশব্দ বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সকলেই
তাঁহাকে ভোটে হিতে স্বীকৃত হইলেন। এগারকার নির্বাচনে
ধাওয়া বিভিন্ন পক্ষী হইতে নির্বাচিত হন, তাঁহাদের
মধ্যে জ্যোতির্ময়ী সর্বাধিক ভোট পান। এবারে বিতীয়
মহিলা সমস্ত নির্বাচিত হন কুমুদিনী বহ। বিতীয় বার
তিনি কংগ্রেসের সমর্থন পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নানা
কারণে জৈনক প্রার্থীরাপী অবাধিত সমস্তের নিকট তিনি
হারিয়া যান।

জ্যোতির্ময়ী গল্পোপাখ্যান 'বিপ্লবী' বলিতে সাধারণতঃ
আমরা বাবা বুদ্ধি তিনি দ্বয়ত প্রেরণ ছিলেন না। তাই
গান্ধীজীর অধিগম আন্দোলনকালে বিপ্লবী নর-নারীদেব
সম্মানন কর্য্যাকে তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই কিন্তু
সত্যগ্রহ প্রচেষ্টায় তাঁহার ত্যাগবীকার দুঃখবৎ এবং
তেজবিতা-প্রদর্শন বহু বিপ্লবীই অসুহৃদীয় ছিল, একথা
স্বীকার করিতেই হইবে। সভ্যগ্রহ আন্দোলন কালে
যেহিণীপূর্ব মেলায় জনসাধারণের সাহস অহতপূর্ব এবং
বিসমকর। ঐ মেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে বামপন্থকদের
অত্যাচার-নিপীড়নও চরমে উদ্ভিষ্টাছিল। কলিকাতার নারী-
সমিতির পক্ষে অস্ত্র হুইলন মহিলা সহ জ্যোতির্ময়ী যেহিণীপূর্ব
পর্বেতে বাহিব হন। তুমুলের পক্ষী অঞ্চলে লবণ আইন

ভক্তের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। ম্যাক্সট্রেট গেভি এখানে-
সেখানে টঙ্কল করিয়া বেড়াইতেছিলেন সবণ আইন ভঙ্গ-
কারীদের সারেস্বতা করিবার নিমিত্ত। পেড্রি লাট্রি
আবাতে একটি দশ বৎসরের বালক বস্ত্রাক্রম কলেবর হইয়া
অচেষ্টক হইয়া পড়ে। কিন্তু তখনও বালকটির হস্তে শোভা
পাইতেছিল ভাতীয় পতাকা। বালকটিকে তৎক্ষণাৎ
হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তখন জ্যোতিষ্মদী
গঙ্গাপাখ্যার সঙ্গীনের সহ তৎক্ষণাৎ গৌছিয়াছিলেন।
তাঁহারা সব কথা শুনিয়া হতভম্ব হইয়া যান। বালকটিকে
শোয়াইয়া রাখা অবস্থায় তাঁহারা তিনজনে কটো তুলাইবার
ব্যবস্থা করেন। মেহিনীপুর সম্বর অস্ত্রে কলিকাতার আসিয়া
জ্যোতিষ্মদী নেতৃত্বকে এই সব কঠোর অন্যাচারের
কথা বিবৃত করেন। আমাত্য তাঁহার মুখে এই সকল
কথা শুনিলাম। জ্যোতিষ্মদী অদ্বৈত ছিলেন শিক্ষারতী
এবং সাহিত্যিক। তাঁহার বচনা ছিল কাব্যধর্মী। আমার
অনুরোধে তিনি বর্ষস্বর ঘটনাটি লইয়া "The Crucifixion
নামে একটি গ্রন্থ 'মর্জার রিভিউ'র মন্ত লেখেন। লেখার
সঙ্গে উক্ত কোটোটিও ছাপানো হইয়াছিল। এই ঘটনাটি
তখন বেশ চাকল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। জ্যোতিষ্মদী এক-
দিন কথায় কথায় বলেন, সাহু পি, সি, দায় তাঁহাকে
বহিষ্কারে, "তুমি পেড্রি উপর বড় কঠোর হয়েছ, তুমি
এক নিষ্ঠুর হতে পার!" নিত্যকর্তব্য বোধেই ঐতি-
পর্যায় জ্যোতিষ্মদী এক কঠোর ও নিষ্ঠুর হইয়াছিলেন।
মেহিনীপুরের পরবর্তী বিপ্লবাত্মক কারাবন্দী এখন
ইতিহাসের বস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রামনীতি এবং সমাজ-সেবার কঁকে কঁকে জ্যোতিষ্মদীর
ভিতরকার সাহিত্যিক উঁকিঝুঁকি মারিত নাহুৎটিও
বহন স্বেগে গঠিত তখন তিনি প্রাথমিক টালিয়া
সাহিত্য-সেবার প্রবৃত্ত হইতেন। ঐচ্ছিক স্বেচ্ছাচর্য্য
প্রতিষ্ঠিত আর্থন ইন্সতারেল উন্মোচন নামক জীবনবীমা
কোম্পানী তিনি ছিলেন অষ্টম ডিরেক্টর। আবার
তৎসম্পাদিত 'ইন্সতারেল ওয়ার্ল্ড' মাসিক পত্রিকার
নিয়মিত লেখিকা, তিনি "classicus" ছদ্মনামে রাসের
পর মাস জীবনবীমার অগ্রদূতগণের জীবন কাহিনী

সুসলিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচারেন। সূত্বে পূর্বে
তিনি পুনরায় সাহিত্য-সাধনার মন বিছাছিলেন। তাঁহার
একটি বচনা (মনে হয় শেষ বচনা) হিন্দু মহাসভা কর্তৃক
পরিচালিত 'হিন্দুধর্ম' সাম্প্রতিক শাহীরা সংখ্যার
প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

শাহীরা অসুস্থতা নিবন্ধন কিছুকাল তিনি সক্রিয়
রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু
পর্যায়ান্তর নাগণনা ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি কখনও
স্থির থাকিতে পারে নাই। মহাসমর শেষে ভারতবর্ষে মুক্তি-
আন্দোলন অতিমাত্রায় ব্যাপক হইয়া পড়ে। তখন তেজা-
ভের তুলিয়া হিন্দু মুসলমান শিব যুগল সকলেই যেন
একভাবে মরিয়া হইয়া উঠিল। মুছলমান পরিপোষিত
হিন্দু-মুসলমান ভেদনীতি আর যেন বই পাইতেছিল না।
হিন্দীতে আলাহ হিন্দু কোলের বিচার বোম্বাইয়ের
নৌবিরোধ প্রবৃত্তি ও যুব আন্দোলন ভারতের আশ
মুক্তি লাভ প্রচেষ্টার এক একটি স্তর। ধর্মতলা টুটে
ছাত্র-শাণ্ডাভাজনা আটক করা হইয়াছে, সৈন্য মোতায়েন
করা হইল। নিব্বি নীমান অতিক্রম করিলেই গুলি
চলিবে। যুবকগণ কে আগে বুক পাতিয়া গুলি খাইবে
তাঁহা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সমস্ত রাজি ছাত্রগণ রাজ্য।
জ্যোতিষ্মদী গৃহে স্থির থাকিতে পারিলেন না; যুবকদের
পার্শ্বে আসিয়া সমস্তকণ হইলেন।

সমগ্র কলিকাতা নগরীতে ত্রিটিশ বিধেয় জলিয়া
উঠিয়াছে। যেখানেই গোরা সৈন্য সেখানেই ভাড়া
ধাইতেছে। হকিম কলিকাতার অগ্রণ একটি পল্লভনপর
গোরার শিপ গাড়ী জ্যোতিষ্মদীর গাড়ীর পিছন হইতে
অতি জোরে ধাক্কা দেয়। জ্যোতিষ্মদী বাহির হইয়াছিলেন
বিপন্নকে রক্ষার মন্ত। গাড়ী চুম্বার হইল জ্যোতিষ্মদী
অজ্ঞান হইলেন। তাঁহার চেতনা আর ফিহিয়া আসে
নাই। সেইদিনই মারা যান। রবীন্দ্রনাথের কবিতা
পঙ্ক্তি দুইটি আবার স্বরণ করিলাম—

"সাথে কবে এনেছিলে সূত্বেয়ী প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে ধান।"

মুসলমান বৈষ্ণব-কবি

হরেন ঘোষ

বাঙলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই সম্প্রদায় বহু দিন ধরে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। নিজেদের মধ্যে সামাজিক আচার, বিধিনিষেধ, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্তর পার্থক্য, মতের অনিল থাকা সত্ত্বেও দেখা যায়, একটি ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের যোগদ্বয় প্রব্রের অতীত। সে ক্ষেত্রে ছবরের ক্ষেত্রে, ভাবের আহান প্রদানে এ দুটি সম্প্রদায়ের কোন বিভেদ নেই। এখানে ভুক্ত বিষয়, ঈর্ষা, দ্বাদ্যাপাত করতে পারেনি। বাঙলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে মুসলমান সমাজের স্থান অসামান্য। সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে, মুসলমান সমাজের প্রত্যেক ও পরোক্ষ প্রভাবে বাঙলা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি ও অগ্রগতি হয়েছে। মুসলমান নবাবরা বাঙলা সাহিত্যের পোষক ছিলেন। হোমেন সাহের দ্ববাবের কথা মনে পড়ে। সেখানে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ও অনুষ্ঠ সাহায্যে বাঙলা সাহিত্য, সঙ্গীত, সংস্কৃতির প্রচুত উন্নতি হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর তুর্কী আক্রমণের পর বাঙলা সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। গভীরত্ব জীবন থেকে আনত। মুক্ত হতে পেরেছি, চিন্তাধারায় নতুনত্বের স্পর্শ পেয়েছি, মানসিক ব্যক্তি সাধিত হয়েছে। তাছাড়া বাঙলা সাহিত্যের প্রথম ধর্ম সংস্কারমুক্ত পৌকিক প্রণয়নধারা রচনা করবার পৌরব মুসলমান কবিরাই অন্যায়সে অর্জন করতে পারেন। পৌগত কাজী আলগলের নাম এক্ষেত্রে অবগত করা যায়।

চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্য পরবর্তীকালে, চৈতন্য জীবন-নির্ভর রচনা ও বৈষ্ণব পদ্যাবলীর যে বিপুল সৃষ্টি বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, তার মূল্য বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে কম নয়। বৃদ্ধাবনবাস, কুকাবাস কবিরাজ, আর পঞ্চকর্তা হিসেবে পেয়েছি চণ্ডীদাস, বিভাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, এবং আরও অনেককে। বাঙলা-সাহিত্যের অগ্রগতিতে তাই ঐচৈতন্যের স্থান

অনেক উল্লেখ্য। তিনি বহু কিছু সৃষ্টি করেননি, কিন্তু তাঁর জগ্গেই—তাঁর প্রেমধর্ম, তাঁর মানবিকতা। প্রচাবের জগ্গেই এই বিপুল সাহিত্যসম্ভার সৃষ্ট হতে পেরেছে।

এই যে ভাবের বজা, প্রেমধর্মের প্রবাহ—এতে হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সমাজই প্রাবিত হয়েছে। এখানে অন্ততঃ সঙ্গীততা, সৌন্দর্য, ঈর্ষা-বৈষ, কল্ম-ত্যাগনিকতা ও তুচ্ছ সাম্প্রদায়িকতা লুপ্ত হয়ে যায়। মূলতঃ ধারা কবি, শিল্পী, তাঁদের কাছে একটি গোথই বড় হয়ে দেখা দেয়—সেটি মানবতাবোধ, বিশ্বমানবের সঙ্গে একাত্মতাবোধ। সেখানে কোন ধর্ম, সমাজ, সম্প্রদায়ের বিভেদ থাকে না। বরীত্ন নাথের একটি উক্তি বদগত করা যায়—

“এ দেশের অধিকাংশ মুসলমানই বাগমত জাতিতে হিন্দু, ধর্মগত জাতিতে মুসলমান।” স্বভাবতই মুসলমান কবিরাও মূরে থাকতে পারেননি। তাঁরাও অল্প বৈষ্ণব-পদ রচনা করেছেন। এখানে তাই মুসলমান বৈষ্ণব-কবি বলতে এই বোঝাতে চাইছি, যে সমস্ত মুসলমান কবি বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন, তাঁরাও বৈষ্ণব-কবি আখ্যায় চূচিত হতে পারেন। বৈষ্ণবপদ রচনাও জগ্গে ধর্মাত্মিত হবার প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রণয়ন মনে পড়ে বরীত্ননাথ ভাসুসিংহ নামে বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন, মাইকেলও করেছেন ব্রজাঙ্গনা কাব্যরচনা। আর বিভাপতি পৌকিক বৈষ্ণব ছিলেন না, তিনি পঞ্চাপাদক। এ যুগে নওকল ইমলান অল্প জ্ঞানসঙ্গীত রচনা করেছেন। কবির কাছে ধর্ম বা সংস্কার বড় কথা নয়।

বৈষ্ণবকবি ছবর থেকে ছবরে কথা বলতে পারেন না। কবির মনের কথা বলতে হয় রাগাধিকার মাধ্যমে। বৈষ্ণব-কবি সোষ্ট্রিচেনন। স্বভাবতই বিধিনিষেধে বদ্ধ। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস যবার বৈষ্ণবকবি। জ্ঞানদাসের লিখিক মন প্রায়শই আত্মপ্রকাশ করেছে। মুসলমান

বৈষ্ণব-কবিত্বের কাব্যপাঠ করলে দেখা যাবে বৈষ্ণব-মহাজানের পদ ও মনোভাবের সঙ্গে তাঁদের অন্তরে সাম্য পড়িবে ও অকৃত্রিম।

মুসলমানরা একেছন্দপালী, স্বভাবতই বিমিত্ত হতে হয় যে তাঁরা বৈষ্ণবতাবাদপর ধর্মে কি প্রকারে! প্রথমতঃ বাঙালি দেশের মুসলমানরা কয়েক পুরুষ পূর্বে হিন্দু ছিলেন, তাই মূর্তিপূজা ব্রতশালন ইত্যাদি বন্ধ হলেও, সর্বক্ষেত্রে প্রাচীন সংস্কার সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা সম্ভবপর হয়নি। অনেক গ্রামে এখনো দেখা যায়, হিন্দুদের ঘোল চূর্ণাংশে মুসলমানদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে। এমনকি তারা বছরব্যবস্তায়, ভাবে বিচারে হয়ে অঙ্গবিসর্জন করে, পূজা শেষে সন্তুষ্ট হিতে প্রসাদ গ্রহণ করে। আবার কৈতের হরলায় 'নিদ্রি' হেঙ্যা—এই 'নিদ্রি'—হিন্দুধর্মের সত্যানুসারগতক যোগে কবিত্বের দের।

হিন্দুধর্ম সাধারণতঃ সঙ্ঘ দিকটির প্রতি মুসলমান সমাজের আকর্ষণ হয়ে গিয়েছে। ভক্ত-ভগবানের মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কে এঁদের মনকে সহজে আকর্ষণ করতে পেরেছে। শিব, চূর্ণা, কালী, লক্ষী, সংকটীকে স্বীকার না করলেও এঁরা প্রেমিক-প্রেমিকার মূর্ত প্রতীক বাগ্যত্বকে স্বীকার করেছেন। এ কৃষ্ণ গীতার পার্শ্বাবলি, কুটনীতিসম্পন্ন কৃষ্ণ নন, ইনি চিরপ্রেমিক বংশাবতী বাগিকারনয় কৃষ্ণ। রম্যায়ন মহাতারতের পুঙ্খ-বিগ্রহ, ধর্ম, প্রেমকে স্বীকার না করলেও মুসলমান সমাজ চৈতন্যসুন্দর প্রেমের বজ্রকে অস্বীকার করতে পারেন নি। এই প্রেমলীলার বারায় তাঁরাও প্রাণিত হয়েছেন।

বাঙালিদেশের কিছু সংখ্যক মুসলমান স্ত্রীপন্থী। কালী-সাহিত্যে স্ত্রীপন্থী কবিত্ব লায়লা-মজনন, নিবি-কংহার প্রভৃতির প্রেমকাহিনীর নব্য বিরে কীবাঙ্ক-পরমাস্ত্রার প্রেমকুলক সঙ্ঘ ব্যাখ্যা করেছেন। বাঙালী-স্ত্রীপন্থী মুসলমান কবিরা এক্ষেত্রে বাগ্যত্বকে গ্রহণ করেছেন কীবাঙ্ক-পরমাস্ত্রার সঙ্ঘ নিরূপণ করতে। বাঙালির ভাবকাশে বাগ্যত্ব পরিচিত প্রতীক, এখানে লায়লা-মজনন প্রেমশাধিকার সঙ্ঘ নয়।

বৈষ্ণবপদ রচনা করবার উৎসাহ মুসলমান কবিরা পেয়েছেন, আর একটি কারণে, যেটি পূর্বেই উল্লেখ করা

হয়েছে সংক্ষেপে। মনের ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে একটি অবলম্বন বোধে কবিতা। বাগ্যত্বক নিঃসন্দেহে প্রেমভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। মাইকেল, ববীন্দ্রনাথের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাছাড়া সময় ও প্রতিবেশকে অগ্রাহ্য করাও এই সমস্ত কবিত্বের পক্ষে সম্ভব হয় নি। সাংসৃতিক সময়ও একটি বড় কথা। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি, একে অপরকে প্রভাবান্বিত করেছে।

মুসলমান কবিত্বক নামাশ্রেণীর বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন। স্বতন্ত্রভাবে ভাটচাঁদ মহাপুত্র অশ্বর ভ্রম ও যত্নে পদ সংগ্রহ করে কলকাতার বহরচেন। বিস্তৃত বৈষ্ণব কবিতা সঙ্ঘে অ্যালোচনা করা যাক। বিস্তৃত বৈষ্ণবপদ তাকেই বলবো, যেখানে শুধুমাত্র বাগ্যত্বক-লীলা বর্ণিত হয়েছে এবং যেখানে অল্প কোন ভাবের ছায়াপাত নেই। সৈয়দ মজুমদার একটা পদ দেখা যাক।

“পার কর পার কর ঘেরে নাইয়া কানাই।

কানাই মোরে পার কর রে।

× × ×

হইল হাটের বেলা না হইল বিকিকিনি।

মাথার উপরে ঘেঁষে আইল হিনমণি।

এর পাশাপাশি নৈট্রিক বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের একটি পদ দেখা যাক—

“ওহে নাবিক, কে জানে তোমার মন্দিরা।

নাম-মৌকার নিরবধি

পার কর শুভম্বী

তব আগে কি ছাড়া যত্না।”

কবির নাম যদি জানতে না পারি, তবেই কোন পার্শ্বক বুঝি কি? ভুলিই বাগ্য-ত্বক বিবরণ আধ্যাত্মিক পদ।

বানী বিবরণ অল্প বৈষ্ণব পদ পাই। “কেন হতে বাজে বাণী অতি অহংসন”—এর সঙ্গে সহজেই তুলনা করা যেতে পারে চাঁদকাঁড় বাণী বিবরণ পদ।

“চাঁদ কাঁড় বলে, বাণি তনে বুঝে মরি

কীমু না, কীমু না আমি না যেখিলে ঘরি।”

অল্পতঃ সৈয়দ মজুমদারকে বলতে শুনি—

“সৈয়দ মজুমদার কহে শুনি মোর কথা

মন মোর মণি বৈল বানী পুরে যথা।”

কী গভীর আবেশন, অন্তরের আকুল ক্রন্দন।

কবি ইরকান অশুযোগ করেন—

“হৃৎ সর্ব মিলে—নিরুদ্ভা কালার

ভাবিয়া ইৎকানে কর, প্রাণের চরণ বেদন পাই।”

মুসলমান কবির কণ্ঠে সর্বধর্মমতেরই সুব বাতবাত
ধ্বনিত হয়েছে। সাল মাহুর ভক্ত কবি, তিনি মুসলমান
হলেও হরেকৃষ্ণ নাম সার করেছেন জীবনে।

“হিন্দু কিংবা হৌক মুসলমান।

তোমার পক্ষে সবই সমান।

আপন সম্মান লাভির কি বিচার

ভক্ত সকল লাভির শ্রেষ্ঠ, চণ্ডাল কি চান্দ।”

ভক্ত ও ভগবানে একাত্ম সম্পর্ক, সেখানে কি আতি
ধর্মের বিচার আছে ?

শ্রদ্ধে তোমার বলে কালী, কেব বলে বননাগী

কেব খোলা আলা বলি, তোমার ডাকে সাধাধার।”

জীবাত্মা পদমান্বরে রূপক হিসেবে রাধাকৃষ্ণের নাম
ব্যবহার করা হয়েছে, এমন অল্পপর মুসলমান কবিরা
রচনা করেছেন। রাধা ও কাহ্ন, কোথাও জীবাত্মা,
পদমান্বা, কোথাও তনু, বেহ, কাহ্ন, মন, প্রাণ আত্মরূপে
কল্পিত।

“সৈয়দ শাহাহুদে কর ভবকুলে আসি,

রাধার মন্দিরে কাহ্ন আছিলা পরবাসী।” রাধার
মন্দিরে এই বেহ, কাহ্ন অমল আত্মার প্রতীক। হৃদয়গতী
কবীরেব বাই অরণ কালে বেধি, তিনি বলেছেন, ভগবান
নিঃশব্দেই বসেছেন, কোন মন্দির মন্দির তাঁরক্ষেত্রে নয়।

“হাছন হাজার জিজ্ঞাস করে কানাই কোন জন!

ভাবনা চিন্তা করে বেধি কানাই যে হাছন।

এই তো পদম তনু। কানাই ও তিনি একাত্ম, ভিন্ন
নয়। প্রাচীন নৈরবিক মত্রে ধ্বনিত হয়েছে ‘আজ্ঞানং বিজি’
নিজেকে জানলেই ঈশ্বরকে জানা যায়। সেই একই তনু,
সর্ব ধর্মেরই মূল কথা।

রাধাকৃষ্ণের নামের আড়ালে অনন্ত ভগবৎ নির্দেশক
পদম বচিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণকে ইংগিত রূপে ব্যবহার
করা হয়েছে।

“হিন্দুরে বলে তোমার বাধা, আমি বলি খোলা

রাধা বলিয়া ডাকিলে, মুজা মুসলীয়ে বেধে বাধা।

হাছন হাজা বলে, আমি না রাখিব মুজা!

মুজা মুসলী কথা দত, সবলই বেহবা।”

এ ছাড়াও লৌকিক প্রেম প্রদক্ষে রাধাকৃষ্ণের নাম গ্রহণ
করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে একটা আবরণের প্রয়োজন ছিল।
বিভাপতি লৌকিক প্রেম কবিতা রাধাকৃষ্ণ নামের আড়ালে
গেঁথেছেন।

প্রধানতঃ গোরাঙ্গ বিষয়ক পদ আলোচনা করা
প্রয়োজন। চৈতন্ত-সংস্কারিক ও পরবর্তীযুগের বৈষ্ণব
পদকর্তারা গৌরচন্দ্রিকা বিরে পর আবৃত্ত করতেন।
রাধাকৃষ্ণলীলায় সঙ্গে দ্বৈতচিন্তা মুক্ত হ’ল এবং একেও
বৈষ্ণব পন্থের অন্তর্গত করা হ’ল। মৈত্রীক বৈষ্ণবদের
ধারণা যিনি স্বাপনরে কৃষ্ণ হিসেবে তিনিই এই কল্পিতে
ঈশৈতন্ত রূপে ভক্তলাভ করেছেন। তাঁদের মতে “নন্দপুর
ছিল যেই শ্রীপুত্র বৈল সেই।” মুসলমান বৈষ্ণব-
কবিরের মধ্যেও এই বিশ্বাসই সঞ্চারিত হয়েছে। গোরাঙ্গ
বিষয়ক পদে গোবিন্দবাস প্রখ্যাত। তাঁর বিখ্যাত
গৌরচন্দ্রিকার পদ অরণ করা দাক—

“মৌরব নয়নে মৌরব মন দিকান

পুলক মুদুল অবলম্ব

বেধ মকরন্দ বিম্বু বিন্দু চুহত

বিকশিত তাব কবচ

কি পের্থলু মটবর গৌরকিণার।”

এর পাশাপাশি সালনের গোরাঙ্গ বিষয়ক পদ দেখি :—

“আর হেবে বা নুতন তাব এনেছে গোর।

মুড়িয়ে মাথা, গলে কাঁধা, কটিতে কোপীন ধরা।

সোরা শাল ছেড়ে কোপীন পরেছে

আপনি যেতে লগৎ মাতিয়েছে।।

মরি হায় কি লীলা কলিকালে

বেধ বিধি চমৎকার।”

হছন বলেছেন—“গৌরচন্দ্র আমার

তোমার লাগি আমি বরের বার।”

সালমানযুদের একটি পদে পাই—

“সোনার মানুষ নহে এলো যে

তক্ত সন্ধে প্রেম ভরসে ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে।

• • • • •

কত সোহার মানুষ সোনা হ’ল গৌর অবতারে।”

একে কি মৈত্রীক বৈষ্ণব রচিত পদ মনে করা চলে না ?

কবি যে এখানে ভক্ত, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। শ্রীযতীন্দ্র ভট্টাচার্য সংগৃহীত মুসলমান কবি-কৃষ্ণের বৈষ্ণবপন্থা আলোচনা করলে যেখানে পাই মর্য ও সম্রাটের ব্যবস্থানে কবিরাম বাধা পাচ্চি। বাস্তুক ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমসীমায় অনেক ভক্ত কবিই দ্বন্দ্বের দ্বার উন্মোচন করে নিরলুপ চিত্তে পদ রচনা করেছেন। আলোকলের অভিসারের পদের সঙ্গে গোবিন্দহাসের অভিসারের পদে ভাবের পার্থক্য দেখা যায় না। বিহরের পদে ইবকান, ইরপান, আমান, আফস, আবুল হারীর পদের ভাবেও সঙ্গে চর্চা হাদের বিহর পদের ভাবে পার্থক্য কোথায় ? শাহনূর বিহরে ভক্তিতে চিত্তে যেন বাহিকায় রূপান্তরিত হতে বলেছেন—“কত দুঃখ মইব শরীর রে।” বিদ্যাপতি-গোবিন্দহাসের অমৃতবর্ণে ব্রজবুলি ভাষায়ও এঁরা পদ রচনা করেছেন। সালমযুদের নিলন-পদে, নিলনের উচ্চারণ প্রকট হয়ে উঠেছে।

“কেই নাচত তাল বজায়ত

নাচত ভ্রানা শ্রামরে

আনন্দে তরঙ্গিত বহই যদুনা

এ রূপ সখি সখ ধামরে।

নবনাগর কাহু রাধা তরুণী

নব-জলধরে কিয়ে শোভিত দামিনী।”

সেরচাকের দানপীলার পদে দেখি, “কাহুবিদে গতি নাহি আর।” এখানেও মৈত্রীক বৈষ্ণবপন্থাকর্তার সুর স্মরিত হয়েছে।

মুসলমান কবি রচিত প্রতিটি পদ বিশ্লেষণ করলে সুগম্য আনন্দিত ও বিহিত হতে হয়। সমগ্র পদের আলোচনার প্রয়োজন নেই। মৈত্রীক বৈষ্ণব পন্থাকর্তাদের পাশাপাশি মুসলমান কবি রচিত বৈষ্ণবপন্থা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করলে দেখি, হরত সেখানে চণ্ডীহাসের ভাবগভীরতা নেই, বিভাপতির ব্যঙ্গ ও মণ্ডনকলা নেই কিন্তু এঁদের ভক্ত মনোভাব, আত্মবিক্রম, ও স্বচ্ছ কবিরামের প্রকাশ সর্বত্র পরিদৃষ্ট। কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে ধর্মের বৈষম্য কোন ব্যবধান সৃষ্টিত করতে পারে নি। স্বভাবতই বৈষ্ণব-পন্থাবাদীর ক্ষেত্রে মুসলমান কবি-রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর একটি উচ্চ মূল্য রয়েছে। সেখানে ধর্মের পার্থক্য এঁদের অপর্যায়ের করে রাখা উচিত হবে না। মনে হয়, অমু-সলিমের পাঠক ও উৎসাহী গবেষকের দৃষ্টি এতিকে পড়লে, আরো এই শ্রেণীর পদ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে, এটাই পূর্বে থেকে উদ্ভাব করা যাবে। সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদের স্থান অনস্বীকার্য। এঁদের দান প্রভাব সঙ্গে স্মরণ রাখা বাঙালী সাহিত্য পাঠকের পক্ষে কর্তব্য।



শ্রীকান্ত ঊর্ধ্ব পর্ব

কালিদাস রায়

শ্রীকান্তের তৃতীয় পর্ব প্রকাশিত হইলে শব্দচন্দ্রকে বলিয়াছিলাম—

এ কি হলো দাড়া। আপনি শেষে সমাজতান্ত্র গোড়া
হিন্দু লেখকের মতো রাজলক্ষীকে কাশীবাসিনী ক'রে গল্পের
চরণে সমর্পণ করলেন তাকে একেবারে খেয়ালী অধিপালী
বানাদেন। আর শ্রীকান্তকে দিলেন বিহার।

শব্দচন্দ্র বলেছিলেন—আমি তোমাদের বর্ণাশ্রমী হিন্দু
নই, কিন্তু সমাজের বাইরের লোকও নই। শ্রীকান্তের
ভ্রমণ কাহিনী এটা, তোমারাইতে হলো, এটা মাহুলি বর্ণণার
নমুনা নয়। ভ্রমণকাহিনীই বহিঃস্থ, তবে ভ্রমণকাহিনীর
শেষ বেথোতে হয়। (অবশ্য যদি বেঁচে থাকি কিছুদিন)
শেষ বেথোতে, তবে—এখানেই শেষ হ'ল না। তাতে দেখে
আমি কোন্‌ ভেদী হিন্দু।

আমি বলিলাম দাড়া আমার মনে হয়, শ্রীকান্ত নভেলও
নয়, ভ্রমণকাহিনীও নয়। এটা কাব্য—এটা রীতিমত
এপিক কাব্য। এটা যদি না বুঝে থাকি—তবে শ্রীকান্ত
বুঝিনি।

শব্দচন্দ্র—হ্যাঁ যে ভাষা নিম্নমুখে সেটা আর বললাম
না, কাব্যের শেষ পরিচ্ছেদ এখনো লেখা হয়নি।

চতুর্থ পর্ব শ্রীকান্ত শেষ হইলে একখানি বই আমার
মাঝে মেহোপহার শিখিয়া দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—“এই
নাও তোমার শেষপর্ব। এ বই বিশেষ করে তোমার নত
পাঠকের জন্য লেখা। তোমার কথা আনন্দের খুব মনে
ছিল।”

বইখানি পাইয়া সেইদিনই পড়িয়া কেলিলাম—পড়িয়া
পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। আমি যে শ্রীকান্তকে একখানি
মহাকাব্য বলিয়াছিলাম তাহা তিন পর্বে কবিত্বময় চিত্র
পরিচয়ের অন্তর্গত বিশেষ করিয়া, নভেলের সর্বপ্রকারের
ধাবি ইচ্ছাতে পুথাপুথি মিটিতেছে কিনা—সেদিকে লক্ষ্যই
করি নাই। এই পর্বে চিত্রকর শব্দচন্দ্র পুথাপুথি কবি।

তিনপর্বে শ্রীকান্তের জীবনে এমন পরিবর্তিত আসে নাই—
যাহাতে বাংলার পল্লীপ্রকৃতির এমন চমৎকার আবেষ্টনী
এমন স্বাভাবিকভাবে আবির্ভূত হইতে পারে। বৈকুণ্ঠ
বেলায় গোড়ামাটিতে বাংলার এমন স্নান বনশ্রী ছিল না।
শব্দচন্দ্র নিজের অমূল্য অকলংকিত প্রদানন্তঃ চতুর্থ পর্বের
পটভূমিকারূপে সজ্ঞন করিয়াছেন। তাহাও কবিপ্রাণের
মাহুর্ষ এখানকার স্নানস্থলীর প্রকৃতিতে আশ্রয় করিয়া
উৎসাহিত হইয়াছে। এই সকলের পটভূমিকায় শব্দচন্দ্রের
আরও অনেক রচনা আছে—কিন্তু তাহাতে মাহুর্ষের
চূর্ণশার সক্ষে পল্লী প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত নৃতিই প্রকট হইয়া
উঠিয়াছে। এই গ্রন্থেই তাহা কল্যাণময়ী মাহুর্ষের
নৃতিতে অতিমহৎ লাভ করিয়াছে অর্থাৎ এই
গ্রন্থেই পল্লীপ্রকৃতিতে তিনি সম্পূর্ণ কবিত্ব দিয়াই
যেঁরাছেন।

শব্দচন্দ্রের প্রকৃতির আকর্ষণেই কবি গহবরে আবির্ভাব
হইয়াছে। শব্দচন্দ্র গহবরে মধ্যমিকভাষ্যও তাহার
জীবনের পটভূমিকার তাহার কবিত্বটিকে চারিদিকে সঞ্চার
করিয়াছেন। এই গহবর সামান্য দেখেপড়া কানে—পল্লীর
কাহিরে সে কখনো যায় নাই—সে ছত্র-পাঁচালী লিখিতে
পারিত। তাহাকে সভ্যসোকেতা করিই বলিব না। কিন্তু
গহবরে জীবনই যে একখানি কাব্য—জীবন্ত কাব্য, এই
কাব্যই শ্রীকান্ত মহাকাব্যের উপাত্ত পরিচ্ছেদ। গহবর
কবিতা যেমনই লিখুক He lived poetry.

শেষ পর্বের একটি কবিত্বময় চিত্র এখানে উদ্ধৃত
করিতেছি—

সান্নিহাতি অনেকগুলো কাগজের গবে একটুখানি
খোলা রাখিয়া, অল্প মনে হস্ত এটুকু পাঠ হইয়া আসিতাম।
কিন্তু সহসা বহির্মহের বিশ্বস্তপ্রায় পরিচিত ভাবি একটি
মিষ্ট গন্ধে চমক লাগিল—এদিক-ওদিক চাইতেই গোখে
পড়িয়া গেল। বাঃ! এ যে আমারই সেই মশা! বৈকুণ্ঠ

আউশ হুলের গছ। ছেলেবেলার ইহার তরু বশোনার কত উমেহাৱীই না করিয়াছি। এ জাতীয় গাছ এতিকে নিলে না। কি জানি, সে কেবো হইতে আনিয়া তাহার আভিনায় একবারে পুতিয়াছিল। ট্যাংরা বাক। মাটে তরা বুড়ো মানুষের মত তাহার চেহারা—সেহিনের মত আঙও সেই একটি মাত্র সজীব শাখা, এবং উর্ধ্বে গুটিকয়েক নবুণ পাতার মধ্যে তেননি গুটিকয়েক শাখা শাখা হুল। ইহার নীচে ছিল যশোদার স্বামীর সমাধি। বোষ্টম ঠাকুরকে আবার যেহি নাই। আমাদের ঘরের পুর্বেই তিনি সোলোকে বসে হইয়াছিলেন। তাঁহারই ছোট মনোহারী ফোকানটি তখন বিগা চালাইত। ফোকান ত মর একটি ডালার ভরিয়া যশোদা মালা, ঘুনসি, আশি, চিকুণি, আলতা তেলের মশলা, কাঁচের পুতুল, টিনের বাঁশি প্রভৃতি সইয়া ছুপুর বেলায় বাড়ী বাড়ী বিক্রী করিত। আর ছিল তাহার মাছ বিক্রয়ার সামগ্র্যমাছ, বড় বাপার মর, ছোট এক পরগা মূল্যের ডোবকাঁটা। এই কিনিতে যখন তখন তাহার ঘরে গিয়া উৎপাত করিয়াছি। এই আউশ গাছের একটা শুকনো ডালের উপর কালা দিয়া জায়গা করিয়া যশোদা সন্ধ্যাবেলায় প্রার্থণা দিত। হুলের লতা আদ্য উপভব করিলে সে সমাধিটি ঘেঁষাইয়া বলিত, না বাবাঠাকুর, ও আমার বেবতাব হুল, তুললে তিনি রাগ করেন।

বৈকুণ্ঠী নাই, সে কবে মহিরাছে জানি না—হরত, খু বৈদিনি মর। চোখে পড়িল, গাছের একবারে আর একটি মাটির ঢিবি, যোবদর যশোদারই হইবে, খু সন্তন দীর্ঘ প্রার্থনার পরে আক স্বামীর পাসেই একটু স্থান করিয়া লইয়াছে। জুপের খোঁড়া মাটি অধিকন্তর উর্বর হইয়া বিটুটি শু বন চাঁড়ালের গাছে গাছে সমাজ্য হইয়াছে, বর করিবার কেহ নাই।

পথ ছাড়িয়া সেই শৈশবের বুড়ো গাছটির কাছে গিয়া ঝাঁড়াইলান, যেহি সন্ধ্যা বেগা সেই আছে নীচে পড়িয়া এবং তাহারই উপর সেই শুকনো ডালটি আছে আঙও তেননি তেলে কালো হইয়া।

যশোদার ছোট বরতি তখন সম্পূর্ণ ভূমিশাৎ বর নাই সহস্র ছিন্নমর শতধীর সেই বরের চালাখানি বার চাকিয়া ছনড়ি বাইয়া পড়িয়া আঙও প্রাণপণে আগলাইয়া আছে।

ছড়ি পিঠি বঙ্গর পূর্বের কত কথাই মনে পড়িল। ককির বেড়া বেওয়া নিকানো-মুছানো যশোদার উঠান, আর সেই ছোট ঘরখানি। সে আঙ এই হইয়াছে। কিন্তু এর চেয়েও কড়ম বর তখনও যথার বাকি ছিল। অকস্মাৎ চোখে পড়িল সেই বরের মধ্যে হইতে ডাঙা চালের নীচে দিয়া শুড়ি মাথিয়া একটা কলসদার কুহুর বাধির হইয়া আশিল। আমার পায়ের শব্দে চকিত হইয়া সে বোণ করি অননিকার প্রবেশের প্রতিবাধ করিতে চার। কিন্তু কঠ এত ক্ষীণ যে, সে তাহার বর মুখেই বাধিয়া রহিল।

বলিলাম, কিবে, কোন অপরাধ করিদি ত ?

সে আনাত মুখেই হিকে চাহিয়া কি জাবিয়া জানি না, এবার ল্যাগ নাড়িতে লাগিল।

বলিলাম আঙও তুই এখানেই আছিস ?

প্রত্যুত্তরে সে শুধু মলিন চোখ দুইটি মেলিয়া অত্যন্ত নিরুপায়ের মত আমার মুখে পানে চাহিয়া রহিল।

এ যে যশোদার কুহুর তাহাতে সন্দেহ নাই, কুলকাটা বাড়াপাড়ের সেলাই করা থলল এখেনো তাহার গলার। নিঃসন্তান বন্দীর একান্ত মেহের ঘন এই কুহুরটা। একাকী এই পরিত্যক্ত কুটিরের মধ্যে কি খাইয়া সে আঙও বাঁচিয়া আছে, তাহা পাইলাম না। পাড়ার চুকিয়া কাড়িয়া কুড়িয়া খাওয়ার ইহার ধোরণ নাই, অভ্যাগণ নাই, যজ্ঞান্তির সঙ্গে তাব করিয়া লইবার শিক্ষাও পায় নাই—অনমনে অর্ধাশনে এইখানে পড়িয়াই এ বেচারী যোবদর তাহারই পথ চাহিয়া আছে, যে তাহাকে একদিন ভাল বাসিত। হরত ভাবে কোথাও না কোথাও গিয়াছে, ফিরিয়া সে একদিন আনিবেই। মনে মনে বলিলাম এ প্রত্যশা নিঃশেষে মন হইতে মুছিয়া কেলা কি এতই সহজ ?

বাইবার পূর্বে চালের ফাঁক দিয়া ভিতরটার একবার দৃষ্টি দিয়া লইলাম। অন্ধকারে যেখা কিছুই পেল না, শুধু চোখে পড়িল বেওয়ালে সাঁটা পটললি বাবা বাধী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা জাতীয় বেবদেবতার প্রতিমূর্তি মূর্তন কাপড়ের সাঁট হইতে সংগ্রহ করিয়া যশোদা ছবির মত মিটাইত। মনে পড়িল ছেলেবেলার মুহুরকে এগুলি বজ বাব দেখিয়াছি। রত্নির হাঁটে ভিনিয়া বেওয়ালের কাবা মাথিয়া এগুলি আঙও কোনমতে ঠিকিয়া আছে।

আর বহিরাছে পাশের কুহুম্বিতে তেমনি দুর্গশায় পড়িয়া
সেই রঙ করা হাঁড়টি। এর মধ্যে থাকিত তাহার আলতার
বাতি। বেশানদ্রই সে কথা আমার মনে পড়িল।
আহত কি কি যেন এদিকে ওদিকে পড়িয়া আছে, অন্ধকারে
ঠাৱর হইল না। তাহারা সবাই নিশিয়া আমাকে
প্রাণপণে কিসের যেন ইচ্ছিত কহিতে লাগিল, কি সে ভাষা
আমার অজানা। মনে হইল, বাড়ীর এককোণে এ যেন
দুতশিরুর পরিভ্যক্ত গৃহস্থালীর ভাঙা চোরা ভিনিষ বিরা
সমুদ্রে রুচিত তাহার এই ক্ষুদ্র সংলাপটিকে কেদিয়া গিয়াছে
আজ আমারে আরহর নাই, প্রয়োজন নাই, আঁকসা দিয়া
বার বার ঝাড়া মোছা করিবার তাগিদ গিয়াছে, হুংইয়াছে,
পড়িয়া আছে কেবল শুষ্ক অশ্রালগুলো, কেহ মুক্ত করে
নাই বলিয়া।

সেই কুহুম্বটা একটুখানি সবে দূরে আসিয়া গানিল।
বতকণ বেধা গেল বেবিলাম, সে বেচারী এই বিকে একদূরে
চাষিয়া ধাঁড়াইয়া আছে। তাহার সহিত পরিচয়ও এই
প্রথম, শেষও এইখানে। তবু আশ ভাড়াইয়া বিয়ার দিতে
আসিয়াছে।

বাগানটার শেষে সে চোখের আড়ালে পড়িল, কিন্তু
মিনিট পাঁচেকের এই অজাগা সন্ধ্যার অস্ত্র বুকের ভিতরটা
ছটাৎ হুহু করিয়া কাঁষিয়া উঠিল; চোখের বল আর
সামলাইতে পারি না এমন দশা।

আমরা বৈক্যবের আশড়া অনেক দেখিয়াছি—কিন্তু
মুহারীপুত্রেই আশড়ার মতো আশড়া দেখি নাই। মনে হয়
ইহা শবৎস্রের কবি মনেই বৃষ্টি। বোধ হয় একটা আশুয়া
কোণও তিনি পাইয়াছিলেন তিনি তাহাকে আপন মনের
মাধুরী বিরা রঙ দিয়া সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহাও
যেন একখানি কাব্য। কমললতা এই কাব্যের নায়িকা।
কমললতা পুরাণের ভাব বিগ্রহ নয়। বাস্তবতার স্থানে
ইহা প্রকট কমল—দুগল ক্ষেপ পক্ষ ভাবার স্নেহিৎ অঙ্গ
এখন যেন আর বিশ্বদার নাই। প্রথম জীবন তাহার
পক্ষেই স্থাপিত বলিয়াই বোধ হয় শবৎস্র তাহার নাম
দিয়াছেন কমল। কমললতার মুখের বাঈগুলি সবই
কবিতারই পঙ্খপ্ৰকাশ্য।

কমলের জীবনের মতো এমন কাব্যগুণ কবিতা শবৎ
স্র আর কোন প্রেমে রচনা করেন নাই।

এই যে আশড়া ইহা বর্ধপ্রম বলিয়া নয়, অসাধারণের
আশ্রম বলিয়া শবৎস্রের মর্মস্পর্শ করিয়াছে। শ্রীকান্তকে
আশ্রয় করিয়া ইহাকে ভালবাসিয়াছেন।

এখানে প্রগামত্যঃ দ্বান্তবের সাধনা চলে। দিনরাত
সেবার মধ্যে তন্ময় হইয়া দ্বান্তবিশ্রুতি এই সাধনার উপ-
জীব্য। সেবার্ধ্য শবৎস্রের মতে নারীই স্বাভাবিকবর্ধ্য।
আলস বৈক্যবী হইতে হইলে তাহাকে এই বর্ধেই অশু-
শীলন কহিতে হয়। শবৎস্র মনে করিতেন—নারী লালনী
বৃত্তি পাইয়াই অশ্রুগ্রন্থ করে—সেই বৃত্তির অশ্রুশীলনেই
নারীজীবনের চরম সার্থকতা। শবৎস্রের অস্ত্রগ্রন্থে
নারীর সেবার্ধ্য ও লালনী বৃত্তির কথাই উল্লেখ হইয়াছে।
শবৎস্রের রচনার নারীর প্রেম তাহার লালনীবৃত্তির
চরিতার্থতার সাধনাপথ মাত্র। স্বাহার সেই বৃত্তির অশু-
শীলন বাবিনির্যোগের ক্ষেত্র ছুটিল না—তাহার দেহ
বিগ্রহকে অবলম্বন করিয়া ঐ বৃত্তির অশ্রুশীলনেই বর্ধ্য—
তাহাতেও জীবনের আংশিক সাধনাই সম্পাদিত হয়।
শবৎস্রের এই আশড়া সেই সহিষারই এতটা আশ্রয়।

মধুরবের অশ্রুশীলনের ক্ষেত্রও ইহা। কিন্তু বেব-
বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া ইহার অশ্রুশীলন সম্ভব নয়। পতি
প্রেমে ব্যক্তির এই বনের সাধনা কহিতে গেলে তাহার
বস্ত্র মাংসের মাংসের প্রয়োজন। মনের মত মাংস পাইলে
তাহার সহিত ব্রহ্মপোষীর ভাবে আধিষ্ঠা হইয়া প্রেমা-
ভিনয়ের লীলাই এই মধুর বনের সাধনা। ইহা অস্ত্র
আস্ত্রন লইয়া বেলা।

এই লীলার দৈহিক শুভি তাৎকা করা কঠিন। বস্ত্র
সাধনার একপক্ষ নারী—অস্ত্র পক্ষ বেববৃত্তি। এ সাধনা
বুঝি সম্ভব। আর মধুর বনের সাধনার একজন নারী অস্ত্র
পক্ষে বস্ত্রমাংসে পরিবৃত্ত পুরুষ। সেজন্য ইহা অস্ত্রস্ত
কঠিন সাধনার বস্ত্র। এই সাধনার উত্তীর্ণ হওয়া অত্যন্ত
কঠিন। এই সাধনার সর্বমস্ত্রের বৃত্তি চাই—তাহাও
সম্ভাবল্য নয়।

কমললতা মধুরভাবের সাদিকা। সে দ্বান্তভাবের শুভ
অভিগ্রম করিয়াছে। সে শ্রীকান্তকে মনের মাংস না

হইলও মনের নত মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল—
তাহার স্বামীও নামও ঐকান্ত ছিল। এই নষ্টমক্যগত
আকর্ষণটা একটা সংস্কার হইলেও তাহা কমলসত্য
চিত্তকে ঐকান্তের অভিমুখিনা করিয়া তুলিয়াছিল।
ঐকান্তের সঙ্গে কমল প্রেমোত্তীর্ণেরে লীলাই করিতেছিল।
ঐকান্তের পক্ষে ইহা কঠিন পরীক্ষা। কমলসত্য আত্ম
দইয়া খেলা করিতেছিল। সংস্কার প্রেমিক, কিন্তু সে
কমলসত্যের সাধনাব্যস্ত হুঁত্রে পারে নাই।

দুয়ারি পুস্তকের আধিকার সহিত পরিচয় হইতেই জানা
যায়—ঐকান্তের সামাজিক ও ধর্মসম্মারগত মতবাব কি
ছিল অর্থাৎ শতৎসঙ্গে কোন প্রেমীর বিবৃতি ছিলেন।—সর্ব
সংস্কার মুক্ত হইয়াও সে সহজিয়া প্রেমীরে বিবৃতি সত্তব
ঐকান্তে তাহাই দেখিতে পাই বিশেষতঃ এই ঈর্ষ পর্বে।
মন্ডিকের কমলসত্যের ভাববিমল কীর্তন শুনিয়া ঐকান্ত
বলিতেছে—আমারও মনে হইতে লাগিল অল্পবয়সী ঐ
সাম্যের নৃত্তি সত্যই চোখ মেলিয়া চাখিয়া আছে এবং
কণ পাতিয়া কীর্তনের সনত মার্ঘ উপভোগ করিতেছে।

ঐকান্তের এই উক্তি শতৎসঙ্গেই প্রাণেব কথা।

রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে ঐকান্তের বেধা সাক্ষাৎ হওয়ার পর
ঐকান্ত চরিত্রে কোন ক্রমোন্নয়ন হয় নাই—কেবল সংস্কার-
গত বিদ্যা যত্নেব লীলাই চলিয়াছে। তিন পর্বে ঐকান্ত
চরিত্রে বর্ণিত। চতুর্থ পর্বেই ঐ চরিত্র দর্শনপূর্ণাঙ্ক
হইয়াছে।—ঐকান্ত যেন রাজলক্ষ্মীর আশ্রয়ে ক্রমে ভাব
বিব্রোহে পরিণত হইতেছিল—চতুর্থ পর্বে সে সম্পূর্ণ দীর্ঘ
হইয়া উঠিয়াছে। পুঁজুকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার
বাদনা তাহার দীর্ঘনিঃশব্দের পরিচয়—অথচ রাজলক্ষ্মীর
সম্মতি প্রার্থনাও খুবই স্বাভাবিক।

পুঁজুর আবির্ভাবটি প্রেমের পক্ষে বিশেষ গুরুত্ববত।
ঐকান্তের সম্মতিপ্রার্থনা বীতিমত Ultimatum. এই
Ultimatum টি না পাইলে রাজলক্ষ্মীর চৈতন্য হইত
না, প্রেমের নাপদবোলার আকর্ষণও বন্ধ হইত না।
ঐকান্ত একটা দীর্ঘনিঃশব্দের পরিচয় আসে আর যিতে

পারে নাই। ইহাতে ঐকান্তের চরিত্রের একটা অঙ্গহানি
বিদ্রুতি হইয়াছে।

ঐকান্তের চরিত্রের সংস্কার মুক্তিব একটা চরম
পরিচয়ও ঈর্ষ পর্বে পাওয়া যায় সহব ও কমলসত্য প্রমুখে।

ঐকান্তের দীর্ঘনে একটা কঠোর পরীক্ষারও প্রয়োজন
ছিল—দুয়ারি পুস্তকের আধিকার সে পরীক্ষা হইয়া গেল।
এই আধিকারেই রাজলক্ষ্মী ও ঐকান্তের অসামাজিক
বিবাহটার যেন বেয়েটারি করা হইল।

ঐকান্তের আধিকার সঙ্গতির একটা আলোচনারও
প্রয়োজন ছিল। তাহাকে রাজলক্ষ্মীর অগ্রদান হইয়া
থাকিতে হইবে না—ইহার আশা বিদ্যা শতৎসঙ্গে ঐকান্ত
চরিত্রে অসমর্থ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

ঐকান্তের তিন পর্বে শতৎসঙ্গে একটা ঘট পাকাইয়া
রাখিয়াছিলেন—সেই ঘটকে খুলিবার দস্ত এই পর্বের
প্রয়োজন ছিল। সংস্কারমুক্ত ঐকান্তের পক্ষে হস্ত
রাজলক্ষ্মীর অতীত দীর্ঘনিঃশব্দের বিস্তার প্রয়োজন
ছিল—কিন্তু পাঠকদের দস্ত প্রয়োজন ছিল—বহুতমসী
রাজলক্ষ্মীর অতীত দীর্ঘনিঃশব্দের বহুত ভেদ হওয়ার প্রয়োজন
ছিল। মনুষ্য তাহার প্রেমাত্মিক মূল্য চের কমিয়া যায়।

শতৎসঙ্গে আর একদিন আনন্দে বলিয়াছিলেন ঐকান্ত
বইখানা যদি ভ্রমণ কাহিনীই হয়, প্রেমের যে বৈচিত্র্যের
যেন ঐকান্ত রাজলক্ষ্মীর দীর্ঘনিঃশব্দের পর্বেব গাজার মূর্তিপাত
সেই বৈচিত্র্য যেনই তাহের বিরুদ্ধে না আনন্দে কি করে
ভ্রমণ কাহিনীর উপলব্ধির হয়।

সেই সঙ্গে প্রকৃতিয় প্রতি তাঁহার কবিত্বের মনোভাবের
কথাও বলিয়াছিলেন।

রাজলক্ষ্মীর কামিয়ার সুলভত হইত না—তাহা সুলভার
সামগ্রিক প্রকৃতিয় মাত্র—কিন্তু কমলসত্যের স্বাধীনবাস
ছাড়া গত্যন্ত ছিল না।

ঈর্ষ পর্ব অংশ আসে নাই—এই পর্বটি শতৎসঙ্গে
অনেক চিত্তার ধল।

বিদ্রোহী কবিতার ভূমিকা

শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী, ডি. লি.

নবজন্মের অন্তিম পর্বতর হৃদয়ে বিদ্রোহী কবি নবজন্ম। কিন্তু এই পরিচয়ের মূল যেহেতু কোথায়? “বিদ্রোহী” নামক কবিতার কবি, না কবি প্রকৃতিতেই বিদ্রোহী? তখন নবজন্ম নিজের নামের পূর্বে “হাবিলদার” কথাটি জুড়ে দিতেন। হাবিলদার কাকী নবজন্ম বসেই বেশ একটি ঘরোয়া মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর পাঠক ভ্রমী কিন্তু হাবিলদার কথাটি কেটে দিয়ে বিদ্রোহী কথাটি বসিয়ে দিয়েছেন। এখন এই বিদ্রোহী কথাটির মূল ধ্যান তাঁর কবিপ্রকৃতি, না উক্ত নামীয় কবিতা, তা নিয়ে হেঁচকি বিচার না করেও বলা যায় যে বিদ্রোহী কবিতার বচনের সঙ্গে এই ব্যক্তির সম্পর্ক অতি নিবিড়। কয়েকই বিদ্রোহী কবিতার মূল তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

নবজন্মের কাব্যরসিক মাজেই মানেন যে বিদ্রোহী নবজন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা নয়। শূন্য বিশ্লেষণ করে যেখানে এর ভাববৈশিষ্ট্য, অঙ্গলগ্নতা, শিথিল পাশ্চাত্য, অপ্রত্যাশিত পরিণতি প্রকৃতিতে মন পীড়িত হয়ে উঠে। এমন কি বিদ্রোহী নামকরণের বধ্যাধার যুক্তি ঝুঁকতেও কষ্ট হয়। কিন্তু তবু কবিতাটি পাঠ করলে এমন একটা সংস্কারাত্মক তীব্র আনন্দ, একটা সাম্রাজ্যবৎ বদমায়ে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে যায় যে তখন সব চীকা ভাড়া, জেট বিচ্যুতি তুর্ক বাহু হয়ে পড়ে, কিম্বদন্তি পড়া মুণ্ডটাকে সজোরে উল্টে আঁকিত করে টেঙিয়ে উঠতে সাধ হয়,

বল বীর

তির উত্তম ঘম শির।

এর কাছপ এই যাত্রা নয় যে, কবিতাটি আত্মক প্রাণ চকল-গুঁড়ি অন্তিম পাবেগপ্রাচুর্যে উজ্জল। কেননা, নবজন্মের এই ক্ষাত্তর অধিকাংশ কবিতার ধাই অসুস্থত বোঝানোয় বাধা, বাধা ভাঙা ধূনের রসে লবণাক্ত। কিন্তু বিদ্রোহী কবিতার মধ্যে আর একটি ভিন্নিধ আছে যা কবির অস্ত কোম কবিতার মধ্যে নেই, এবং এই বিশেষ

বস্তুটিই বিদ্রোহীকে অনন্ত সাধারণ করে তুলেছে। এই বিশেষ বস্তুটি হচ্ছে আত্মহতুতি। বিদ্রোহী কবিতার মধ্যে নবজন্মের যে আত্মহতুতি প্রকাশ পেয়েছে, সাধনকেই এর নামান্তর আত্মহতুতি।

কথাটি বিচার।

নবজন্ম ব্রহ্মজপুস্তক দিনা, বা সাধন করে তেমন অধিকারী হয়েছিলেন কিনা এই প্রশ্নটি আলোচনা করতে গেলে প্রথম এই কথা বুঝে নেওয়া প্রকার যে ব্রহ্মহতুতি বা আত্মহতুতি আর ব্রাহ্মহিতি এক কথা নয়; দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মহতুতি সাধনসাধ্য নয় অর্থাৎ চেষ্টা বরং কপলেই লাভ করা যায় না, এটা সর্বতোভাবে রূপসাধ্য। ব্রহ্মহতুতি বিচারে মূখ্য প্রশ্ন হল কতি। কঠোপনিষৎ দ্বিতীয় ব্রহ্মার ২৩ সংখ্যক বিখ্যাত স্রুতি এই—

নায়নান্ধা প্রথমেন লভ্যা ন মেধয়া ন বহুনা স্রুতেন।

যেইবৎ বস্তুতে তেন লভ্যত্বৈকম্ আত্ম বিবৃতে তনুং বান্।

এই মূল ভাষণ এই যে বীকে ব্রহ্ম বস্তু করেন বা রূপা করেন, তিনিই মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। আর রূপা অবিভুক্তী হতে বাধা কি? অধিকন্তু উত্তর জীবনে নবজন্মের যে আত্মাধিপতিত্ব লেগেছিল, যে বদমায়ে মুহূর্ত বিকশিত হয়েছিল, তার বীক এখানে অসুস্থস্থান করা যায়।

একটি শাক্য গ্রন্থ করা থাক। জীবনমুক্তি প্রঃ ববীজ্ঞানার্থং লিখেছেন,—“আত্মা জ্বলয়ে ত্বয়ে ত্বয়ে যে একটা বিধায়েব আচ্ছাদন ছিল, তাহা এক নিমিষেই তের করিয়ে আমার সমস্ত ভিতরটাকেই বিশ্বের আলোক একে-বারে বিজ্বলিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই নিজের স্বপ্নলব্ধ কবিতাটি নিজের মতই মনে উৎপাদিত হইয়া বহিরা চলিল।” বিদ্যুৎ সমালোচকগণ ববীজ্ঞানার্থে জীবনের এই ঘটনাটিকে ব্রহ্মহতুতি বলে বীকৃতি দিয়েছেন। কবির নিজের বিবৃতিতেও তার সমর্থন আছে। উক্ত

ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বৎসরব্যিক কাল পরে এই প্রশ্নে
কবি লিখেছেন,—

“আমি এ প্রত্যতে রবির কর,
কেমনে পশিল প্রাণের পর” ইত্যাদি।

এটা হচ্ছে সেদিনের কথা যেদিন অন্ধকার হতে আসে
এল অগ্নিনেত্র। সেদিন চৈতন্য নিষেকে ছাড়িয়ে তুমার
মধ্যে প্রবেশ করল।” [মনন সত্য, প্রবাসী, বৈশাখ,
১৯৪০] এই ভূমাই প্রশ্ন।

নিষ্কবের বসন্তক কবিতা, তা হলে, প্রশ্নাত্মক ও
ব্রাহ্মানন্দের কাব্যময় প্রকাশ। এর প্রতিফলিত কি ?

“আমি ত্যাগিব পাখান কাহা,
আমি ঢালিব করুণা ধারা,
আমি অগৎ প্লাবিতাবেড়াব গাহিয়া
আতুল পাগল পাড়া।”

আর এর চরম লক্ষ্য কোন দিকে ?
সেই সাগরের পানে জ্বর ছুটিতে চায়,
তারি পরপ্রান্তে গিয়ে জীবন ছুটিতে চায় ॥

এবার বিজোহী কবিতার সঙ্গে এর সামিল বিচার করা
যাক। প্রশ্নক্রমে একটা মনোকার সাবুতের কথা বলে
নিই। নিষ্কবের বসন্তক কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন
তার বাইশ বছর বয়সে, বিজোহী কবিতাও বসন্তকের
বাইশ বছরের রচনা।

বিজোহীকে আত্মাত্মক কবিতা বলেছি। কবি
লিখেই লিখেছেন,—“আমি সধা আমারে চিনেছি, আমার
খুলিয়া গিয়াছে সব বাধ।” শুধু সধা নিষেকে চেনা নয়,
চেনার পরে আছে সর্ব বন্ধনমুক্তির আনন্দ। এই আনন্দ
ভূমানন্দ।

বিজোহী কবিতার মূল মন্ত্র ও অবশেষটি হচ্ছে,—

“বল বীর,

চির উন্নত মম শির।”

এটি প্রধান কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিতার মত কথা
মহ। কারণ তা হলে,—

“আমি বন্ধনহারা কুমারীর বেশী তথী নয়নে বহি।

আমি বোড়শীর ছবি-সরসিল প্রেম উদ্যম, আমি বস্ত্র।

আমি উজ্জন মন উদারী,

আমি বিবহার বুক ক্রন্দন খাল,
হাহতান আমি ছতানির।”

—ইত্যাদি কথাগুলির মাত্রা যা হতে পারে ?

“আমি উজ্জন আমি পতন, আমি অচেতন চিত্তে
চেতন,” ইত্যাদি চরণের মধ্যে “পতন” কথাটির ব্যঙ্গনা
কি ? চির উন্নত শির কবি, উজ্জনের কবি আবার পতনের
মধ্যে নিষেকে চিত্তিত করছেন কেন ? এর কারণ কবিতার
মূল প্রেরণাটি সামগ্রিক ও সর্বাঙ্গিক। আমি সব কিছুতে,
আমাকে সব কিছু, এই বোধের নামই তো ব্রাহ্মবর্ণন।

“আমি মূগ, আমি চিরায়,
আমি অজব অদ্বৈত আমি অস্বা।”
একটা চরম লক্ষ্যও আছে বিজোহীর।

“মহাবিজোহী বসন্তক,
আমি সেইবিন হব শান্ত,

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধনিবে না,
অত্যাচারীর বক্তৃতাগণ ভীম বৎসনে রণিবে না,

বিজোহী বসন্তক
আমি সেইবিন হব শান্ত ॥”

রবীন্দ্রনাথ নিষ্কবের বসন্তক কবিতার লিখেছেন,—
“সেই সাগরের পানে জ্বর ছুটিতে চায়,” এবং তারপর বৃদ্ধ
বয়সে এর ব্যাখ্যা প্রশ্নে বলেছেন, “এই সমুদ্রকে নাম
দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান
নিরে তিনি সর্বমনের জ্বরে প্রতীকৃত। তার সঙ্গেই
মিলনের এই ডাক।” অর্থাৎ কিনা আত্মাত্মকতার একটা
বিশেষ অবস্থার, হয়ত শানিওটা তবল অবস্থাতেই, একটা
অভিসুখিতা চায় এবং তা চায় কোন নির্দিষ্টকাল ও
কর্ণের সীমিত চৌধুরি মধ্যেই। অথচ কাল নিরবধি,
কিন্তু তার মধ্যে তুমি আমি কোথায় ? কাছেই তাকে
কেটে ঘিন্টি-খটা-ধিন-মাগে ছোট করে আনতে হয়।
কাছেই অগ্নি অঙ্গণ আকাশ আমাদের চক্ষু-সীমার ধ্বা
ধ্বংস একটি বস্তু-লীল পর্দার রূপ নিয়ে। অনির্বচনীয়কে
বাক্যে প্রকাশ করতে গেলে, অঙ্গণকে রূপ দিতে গেলে,
অগ্নিকে সীমার বাঁধতে গেলে হৃদকালের এঘনি একটি
নির্দিষ্ট রূপ বেধার আবশ্যিকতা অপরিহার্য না হয়ে পারে
না। অবশ্য এ সব ক্ষেত্রে এই দুটি-গোচর সীমাকে

অন্যের ইশারা বা প্রতীক বলেই বুদ্ধি এখন করে থাকে।

তা হলে গাঁড়াল এই যে ব্যক্তিবিশেষের আত্মহতুতি অহতুতির ক্ষেত্রে বড়ই নির্বিষেধ যোক না কেন, প্রকাশের ক্ষেত্রে স্থান কালের সংস্কার, নিজস্ব ব্যান ধারণার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। একই ভাব যেমন বাঙ্গালী, ইংরেজ, চীনা, জার্মান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোকের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় ও রূপে প্রকাশ পায়, আত্মহতুতির প্রকাশও তেমনি অভিজ্ঞতার ও অভিমুখিতার অপেক্ষা রাখে।

রবীন্দ্রনাথের আত্মহতুতিটি নিম্নবৈব প্রতীকাত্মক। স্বর্ণা মাথার যেন নাগরের ডাকে বেহিয়ে পড়ে, মাটির বুকের উপর পাগলের মত নেচে নেচে মৃত্যু দিয়ে শান্ত ঘর, ব্যক্তিচেতনাও তেমনি বিধ চেতনার অপেক্ষা রাখে তার পরিপূর্ণতার ক্ষণ। এই সম্পূর্ণতার কল্পনা বা স্বপ্নটি না থাকলে সমগ্র প্রায়শই যেন শূন্য ও ব্যর্থ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আত্মহতুতির দু'খ প্রকাশ উৎস 'কল্পনা ব্যাধি,' আর এর পরিণতি নির্বিষেধ মানব প্রেম।

নমস্তলের পরিবেশ ও মানস-মণ্ডল স্বতন্ত্র। বুদ্ধি কেবল হাবিলদার, মনে মত্তলোয়ারী জলী তার কানায় কানায় ভরা, এগেই পড়েছেন বিপ্লবী বাঙ্গালী বহুবৈব আভ্যাস। সেই সময়টোতেই মধ্যস্থতা গাড়ী প্রথম গণ-আন্দোলন আরম্ভ করেছেন, বাঙ্গালী তরুণের হৃদয় কটাছে তখন উত্তেজনার খুন টমকণ করে ফুটছে। সেই সময়ে সেই পরিবেশে নমস্তল বিজোহী রচনা করলেন, অথবা ভাবগতবে বলা যায় নমস্তলের আত্মহতুতি প্রকট হল বিজোহী রূপে।

নিম্নবৈব স্বপ্ন ভঙ্গ থেকে বিজোহী রচনার কালগত ব্যবধান প্রায় চল্লিশ বৎসর। ঊনবিংশ শতকের দশদ দশকের উপান্তে ত্রাশ ধর্মের দ্বিত্ব উচ্চল পরিবেশের মধ্যে বাইশ বছরের তাকুণের যে আত্মহতুতি কল্পনাধারা রূপে প্রকাশ পেয়েছিল, চল্লিশ বৎসর পর বিশ শতকের তৃতীয় দশকের প্রারম্ভে সামষ্টনৈতিক ও বৈশ্ববিক পারি-পাষিকের মধ্যে ঐ বাইশ বছরের তাকুণের-ই আশ্রয়েতনা পহিসুট হল ভিন্নতর রূপে, চির বিজোহী বীর রূপে।

ঊনবিংশ বিশ শতকের ইংরেজ কবি হুইনবার্গের 'হার্ভা' কবিতাটির সঙ্গে অনেক বিজোহী কবিতার সম্বন্ধ দেখেছেন। নিম্নবৈব মত হার্ভাও প্রতীক। হুইনবার্গ নমস্তলের মত সরাসরি নিষেধ আত্মহতুতির কথা বলেন নি, হার্ভার মধ্যে বিরূপ বলেছেন।

"All forms of all faces
All works of all hands
In unsearchable places of time-stricken
lands.
All death and all life and all reigns.

"and all ruins drop through me as
sands.
অথবা, "Man, pulse of my centre, and fruit
of my body and seed of my soul
One birth of my bosom
One beam of my eye ;
One topmost blossom
That scales the sky ;

Man, equal and one with me, man
that is made of me, man that is I."

পুনিবীর শ্রেষ্ঠ বিকাশ মানুষ এবং মনস্ত-মত্তাব মধ্যেই পুনিবী আপনাকে সর্বমুখ্য রূপে পেয়েছে, এই বুল হুইটিকে বলে হার্ভা কবিতার বিভিন্ন উদ্ধৃতিটির ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়। কিন্তু হার্ভার মধ্যে যদি হুইনবার্গকে দেখতে চাই, তবে কবির অহতুতির বিস্তার ও গস্তীর্ঘ দেখতে হবে এবং তা দেখলে "Man that is I" কথাটির ধ্বনি স্তম্ভাব্যাক এবং নিম্নবৈব স্বপ্নভবের শাগরের অনেকটা মিলেছে হবে। আর একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে হুইনবার্গের Me বা 'I' এবং বিজোহীর 'আমি' একই প্রেয়সার বিভিন্ন প্রকাশ।

নমস্তলের বিজোহীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ছইটম্যানের "Song of Myself" কবিতাটির চমৎকার সাদৃশ্য আছে।

"I am of old and young, of the
foolish
as much as wise
Regardless of others, ever
regardful of others.
Maternal as well as paternal,
a child as well as man."

রূপোলী মেঘ

শ্রীঅশা গঙ্গোপাধ্যায়

এতদিনে বুঝলাম সত্যিই আমি বুড়ো হয়েছি, বুঝলে
নমিতা ?

ছাড়াটা আলনার গায়ে ঝোলানো ঝোলানো আঁকপ
করলেন বিনয়বাবু।

কর্কশা চোখা—সাবানিদের পরিচয় বেশ অবগত।

বিনয়বাবু অঁকস থেকে গুঁষে কঁরলেন—আর তাঁকে
কাল থেকে কাজে বেঁচে হবে না—অর্থাৎ কর্মজীবন হতে
অবসর গ্রহণ করলেন বিনয়বাবু।

অথচ অবসর !

অনন্ত চিন্তা !!

অবসর সময় !!!

শ্রী নমিতাও বেশ বিব্রত। এতদিন তবু অদৃষ্ট সন্ধ্যার
ঘাজার মধ্যেও একটা শান্তি ছিল, ছিল আশা। মাসের
শেষে নিঃস্বার্থ বোধ করলেও সাগ্রহে প্রতীক্ষা ছিল আগামী
মাসের পরলা তাবিথটির অন্ত।

কিন্তু এখন ?

মাস গেলে মোটে একশ' পঞ্চাশটি টাকা তার স্বামী শ্রী
আর দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এই কলকাতা শহরের কোলে
কোণায় নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেন ছদ্মবেশে কে জানে ?

এ ক'টি টাকার বেয়ে পরে বাড়ী ভাড়া দিয়ে বেঁচে
থাকতে চাওরাটাই শু একটা মন্ত বড় দুঃস্বপ্নের দশা যায়।
বিনয়বাবু উপযুক্ত বয়সেই চাকুরী থেকে বিদায়
লিলেন। যদিও বাট বৎসর বয়স—তবু তাঁকে দেখলে
মনে হয়, বছর চল্লিশ-বেয়াল্লিশের বৈশিষ্ট্য হবে না।

সুন্দর চেহারা—চমৎকার সুবাসনোচিত স্বাস্থ্য—আর
সজীব।

অথচ এই অষ্ট টা স্বাস্থ্যটুকুই তাঁর পক্ষে একটা মন্ত বড়
বোঝা বনে মনে হচ্ছে এখন। নমিতা ভাবলেন—এমন
স্বাস্থ্য, অথচ কাজকর্ম চুকিয়ে পরে বসে থাকবেন এই বা
কি বকম ?

অসম্ভাব্য পুরুষ মানুষ যোজগার করবেন না—সেটা শু
ভাবতেই লজ্জা করছে। যদিও যুখে উনি বলেন,—আর
বেশ বোলায়েন কোয়েই বলেন,

তুমি হতাশ হচ্ছে কেন ? পেশানুভব আছেই। আর
তাছাড়া কোথাও না কোথাও একটা কাজকর্ম বা হোক
কিছু জুটে যাবেই।

না গো না, অন্ত সোজা নয়—

পোষাক ছাড়তে ছাড়তে বলেন বিনয়বাবু—

পেশান বাবা পায়ে তারো কাজ কোরতে অক্ষম এই
ধারণা কোয়েই তাদের কর্মজীবনের অবসান ঘটে।
অতএব তারা আর কার্যকর নেই—থাকতে পারেনা—
বুঝেছ ত ? তাহলে আর কাজটা বেবে কে ?

নমিতা ভ্রূকুটি করলেন—

তার মানে—তুমি আর—মানে তোমার স্বামী আর
যোজগার করা চলবেনা ?

বিনয়বাবু হালুপ অপ্রস্তুত গোপ করলেন গৃহিণীর এই
নির্মম প্রশ্নে।

ভাড়াভাড়ি মানলে নিয়ে অপরাধীর মত বসলেন,

না না, তা কেন ? যোজগার শু আমাকে করতেই
হবে। মাত্র দেড়শ টাকার শু আর সংসার শু চলবে না।
কলকাতার শহরে ছেলেমেয়ে মানুষ করে থাকতে গেলে
কি আর ঐ হাতে গোণা কটি টাকার চল্লিশ ? আমার
শরীরে যতক্ষণ ক্ষমতা আছে আমি জানব বই কি টাকা।
তাছাড়া এ সংসারে আছেই বা কে সে বকম অর্থকর যন্ত্র ?

তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলে ফেলেন—

ছেলেটা শু এখনও একটুখানি। বা ঐ সেবা মা—ওই
একাধারে আমার ছেলে, আমার মেয়ে। যদি আমি
কিমিরে পড়ি, মিছিরে পড়ি, ওই আমারে খাওয়াবে
বুড়ো বয়সে ?

তীব্র এক আর্জনার বেগে আসে নমিতার কণ্ঠ কণ্ঠ হতে।—

কি, কি বললে? মেয়েও বোলগায় ঘিরে পেট ভরাবে তুমি? বাপ হয়ে একথা বলতে পারলে? ক্রটিতে বাধল না তোমার?

অব্যক্ত হয়ে কিছুক্ষণ অর্ধবীণ বৃত্তিতে তাকিয়ে থাকেন বিনয়বাবু। তারপর ধীরে ধীরে বলেন,—

নমিতা, মেয়ের উপায় করা টাকায় কোন বাবা পারেই সোত থাকেনা। কোনও পিতাই সাধ কোরে মেয়েকে উপার্জনের সোতে হাত্তার বাত করে না।

তবে? ক্রোধের মাত্রা কিছু কমছে নেন হল।

যদি সংসার অচল হয়, যদি আমি অক্ষম হয়ে পড়ি, যদি বাবা-মা-ভাই দুবেলা পেট ভরে খেতে না পারে—তাহলে কি দেবা মা আমাদের ষীচাতে পারবে না? ওকে কি আমি এতদিন ঝুঁকি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করলাম?

অবাধ্য বাস্তবের স্তূপের মত নমিতা আবার জলে উঠলেন—

ও, তুমি কি তাহলে এই দ্বার্ষিকিদের মতই মেয়েকে মেয়েকে খটা কোরে দি, এ, পাশ কংলে? ছি ছি, এর চেয়ে নূর্য মেয়েও যে ছিল ভাল।

আর কথা বাড়ালেন না বিনয়বাবু।

বুকের পায়ের শুলা খেন পেড়ে ঠড়িয়ে পড়ছে।

খালি টাকা উপায়ের ব্যয় ব্যতীত তিনি আর কিছু নন।

অবসর প্রাপ্ত তিনি একেবারে নুসারীন।

এ পৃথিবীতে জী-ছেলে-মেয়ে কেউই আপনাব নয়। বতদিন টাকা আনতে পারো, ভত্তদিনই পাবে সম্মান, পাবে সমাদর। যেই তুমি বেকার—অমনি সবলের চক্ষুপুল।

এমন কি জী, যে নাকি সহধর্মিণী, সুখ দুঃখের অংশ ভাগিনী, সেই আদমিণী পরী পর্বত দুখ কেবাবে, কঠোর ব্যাক্য বাণে করবে কতবিকৃত।

না, টাকা তাকে উপার্জন করতেই হবে আরও কিছু।

ভবুত তিনি এখনও পূর্ণাঙ্গ বেকার নন।

মাসের প্রথমে ফেঞ্চ' টাকার একখানা চেক আসবে

যতদিন না চোখ বোলে—এটুকু না থাকলে নমিতা বোণ করি আর এই গৃহের প্রবেশদ্বার রাখত অর্পণবদ্ধ।

অক্ষত শরীর অলম্যন্তে একটা পুত্র কি কোরেই বা বলে বলে খেয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে সময় কাটাবেন তাইলেই জংকশন উপস্থিত হয়।

গৃহীতর দুর্ভাবণ শেষ পর্বত তাঁকে বোণ করি গৃহত্যাগ করিয়ে ছাড়ত।

ওই ন' ফেঞ্চ' টাকা থাকে সন্তোষ তিরস্কারের মাত্রা যে কোনও রিমই কম হবে না, সে তার এই প্রথম দিনের সাহর অভ্যর্থনা থেকেই উপলব্ধি করলেন বিনয়বাবু।

কোনও হতে নীরবে আহার পর্ব সমাধা কোরে উঠে পড়েন তিনি। দক্ষিণের খোলা ছায়ে এসে বসেন ডেক্-চোরাটিতে।

আহারাদির পর এইটি ঠিক একান্ত নিঃশব্দ সময়।

এ সময়টিতে ছেলে মেয়েরা বিশেষ কাছে থাকে না। তারা পড়াশুনার ব্যস্ত থাকে। জীও গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকেন।

তাই বিনয়বাবু নিঃশব্দ ভাবে এই সুযোগে তাঁর চিন্তার রাশকে আলগা কোরে ছেড়ে দেন একবারে।

প্রিন্সিপেট ফাঙ্কের টাকা পেতে ধেরী হবে—কত ধেরী হবে বলা শক্ত।

কয়েক মাসও হতে পারে—আবার কয়েক বছরও হতে পারে।

হাতে নেই একটি অমানো পরমা। যঠাং কারো আপদে বিপদে ঝগ ছাড়া গতি নেই। যেতন ছাড়া গতি নেই। যেতন যা পেতেন মোটামুটি ভাল যেত। ছেলে মেয়েকে দুগ কলেজে পড়িয়ে, প্রাইভেট টিউটর বেখে বাড়ী ভাড়া দিয়ে মাসের শেষে কাঙ্ক্ষনশে চালাতে হত।

হুজ আর তত্র ব্যত্,—

সুত্তরাং সকলের কোনও প্রব্রই ওঠেনি।

আল চারিখিকে অকুল পারাবার—নিশ্চিন্ত অন্ধকার, ঘন তমসাত্মক ভবিষ্যৎ।

বিনয়বাবু চিন্তা কখন বর্তমানে ভিত্তি অতীতে চলে গেছে।

সুখের স্বত্তি রোমন্থন করতে তাঁর ভালই লাগছে।

বেগার সেবা স্থল ফাইনাল পাশ করল,—

মনে পড়ছে বিনয়বাবুর একে একে—

উঁহ এক পরিচিত মৃত ভগ্নস্রোতের দ্বীপে উঁহের বাড়ীতে
কয়েকদিনের জন্য থাকতে এসেছিলেন। তিনি বুঝি
কোনও মেয়েদের স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। সংসারে তাঁর
দুটি শিশু সন্তান ও বৃদ্ধ স্বস্তর থাকত। স্বস্তর যোগে
স্বয়ংগত—একমাত্র উপযুক্ত সন্তানের বৃত্তিতে মৃতপ্রায়
হয়ে আছেন। সেই দুইদিনে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে
শিক্ষিতা পুত্রবধূ টেনে রাখল সংসারের ছিন্ন রাশ; সমস্ত
পরিবারের জোয়ালা নিয়েই কোমল স্বস্ত্রে তুলে নিল
সামনে। দুটি পুত্রকন্তাকে খাত বস্ত্র যোগাধার ভার এবং
মৃত স্বামী অক্ষম পিতামাতার অঙ্গ সংস্থানের যোগাড়
কোরতে সে বিশূন্য ভীত হল না বা বিধা নোণ কোরল
না। নিঃস্বপ্ন দৃষ্টিতে ক্রমশঃ বিয়ে হীণ জালিয়ে পথ
দেখিয়ে চলল অঙ্কুরাঙ্গীনের খাতা পথে।

তাকে দেখে দেবা—তখন ওর কতই বা বয়স হবে—
বছর চোদ্দ-পনের হবে বুঝি—বাগনা ধরল সেও করবে
চাকুরী।

পিতামাতার ও ছোট ভাইটিকে মাথায় কোবে তোলবার
ভার সে নিজেই তুলে নিবে হাতে।

আমি ও ক্লম মাসীয়ার মত চাকরি করব বাবা, আমিও
তোমাদের টাকা রোজগার কোবে লাগাব।

কিশোরী কস্তার কথা শুনে পর্বে যেসে ফেললেন
বিনয়বাবু—

দুব পাগলি মেয়ে, তা কি হয়? আর তার প্রয়োজনই
বা কি আছে? বতকশ আমার হাত দুটো আছে তোদের
দবাগাধ্য সুখেই রাখব—কোনও অভাব হুংব নইতে যোব
না প্রাণ থাকতে।

বা-রে—

মেয়ে ভাবব বিয়েছিল,

ভুনি বুঝি সারা জীবনই আমায়ের জন্য খাটবে?

তোমাকেও ত বিস্রাম দেওয়া দরকার।

কিসের বিস্রাম?—প্রাণ করলেন পিতা। আমকে
বুকখানা দশহাত হয়ে উঠল। হাঁ মেয়ের মত মেয়ে
হয়েছে বটে—পাঁচজনকে শোষাবার মত।

মেয়ে বললে—

দরকারই ত বিস্রামের। আম যদি ভুনি অসুখে পড়।

আমার খুব ভাল স্বাস্থ্য, আমি বেশ খাটতে পারব বাপ।

ও! ভারী খাটিয়ে মেয়ে জুই আনাব। হ্যাঁ, মা—

গরবে বিপ্লবিত সুখে বিনয়বাবু বলেছিলেন,—

জুই ত আমার মেয়ে নয় রে—জুই আমার ছেলে।
আনিব বই কি রোজগার করে লাড়। আমি আপে অবদর
নই। খোকন যে বড্ড বাচ্চা—ওর কথা ছেড়েই দিয়েছি।
তোর উপরেই ত ভরসা করব না—আর কে আছে
আমার?

আজ এতদিন পরে যেহাঙ্গ পিতার চোখ ছলছলিয়ে
স্বাপ্না হয়ে উঠল—সেই পুংখো কথা শুনি মনে কোরে।
এসেছে এবার সেই অনিবার্য অবশ্য—অবশ্যপ্রায়ী
আশ্রিত—স্বাংর জন্য বিনয়বাবু দর্শন থাকতেও একেবারে
নিঃশব্দ, বিস্ত।

কোথায় সেই প্রতিশ্রুতির আশ্রয়?

আরও পিছনে, আরও অতীতে চলে গেলেন বিনয়বাবু।
স্বস্তির লাগবে নিম্ন হয়ে গেলেন একেবারে।

তখন দেবা আপেনি এ পদ্যারে।

মবধু মমিতাকে নিয়ে তিনি সুখে-আনন্দে মাতাল হয়ে
বিন কাটাচ্ছেন। যদিও আর অন্ন—তবু বজ্জল গতিতে
চলছে সংসারের ঢাকা। সমস্তা নেই—নেই দৃষ্টিভ্রম।

মস্ত্র স্বাংপনের উপর দিয়ে ক্রতপতিতে চালিয়ে
হিয়েছেন বুদ্বীকীনের তথ।

ক্রমে কস্তা ভুনিট হল।

প্রথম সন্তানবার ইংগিতে দুজনেই বিহ্বল হয়ে
গিয়েছিলেন।

বিবাবাজ এই স্বপ্নে মশগুল হুগনে।

আলাপ আলোচনা করতে গেলেই আশ্রয়-প্রাণদই এসে
পড়ে।

বিনয়বাবুর ইচ্ছা পুত্র হয়—মমিতার ইচ্ছা কস্তা।

মা হয়ে মেয়েকে শাওকে-সোচ্ছাবে—দত্ত করবে। মেয়েও
সেবা করবে—অঙ্গময়ে বেধবে শুনবে—জাই ভাবী মা তাঁর
গর্ভে মেয়ের স্বপ্ন দেখতে থাকে।

কিন্তু বিনয়বাবু বলেন,—

তুমি বোঝ না,—যেদী বহুসে সন্তান হবে আমার।
প্রথমে হেলে হুগুয়াই ভাল। তাড়াতাড়ি মানুষ করতে
পারব—পারব সেখে শুনে চাকরী কোরে দিতে। আমি
অবসর নেবার আগেই দু'পয়সা বেতগার কোবে আমারে
পারবে। মেয়ে হলে ত শুধু তোমার সুখি।

তারপর দুজনের মতই এক হয়ে যায়—ছেলে-মেয়ে
হাই আনুক কেউ ছুখ পারেন না নেতক—পল্লব পল্লব
কোরে শপথ পর্যন্ত করেন।

বয়সদরে নমিতার স্তম্ভ আকাংক্ষা পূর্ণ কোরে আসে
ফুটফুটে চাঁদের মত একটুকরো মেয়ে।

বিনয়বাবু যে খুব ছুগু পেলেম তা নয়—তবু মনটা
একটু হুড়ে পড়ল।

নন্দিতা জোর করে নতুন পিতার শিহরিত বক শিশুকে
ভুলে দিয়ে বললেন, নাও, ধর ত ঘেঁষি—কেমন মানাচ্ছে
ঘেঁষি আমি।

পরে স্বামীকে পর্যবেক্ষণ কোরে সাহসনার স্তরে
বলেন,—

মন ঝাঝপ কোরো না তুমি—দেখো এ মেয়ে তোমার
ছেলের চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধি ধরবে—আর কালের হবে।
আর ভাবছ কেন—সময়ের এই মেয়েই দেখো বেতগার
কোরে ঝাওয়াবে তোমাকে—তা হলে ত খুঁসে ?

ছুগুনে মিলে যেদিন খুব হেসেছিলেন আনন্দে-উচ্ছ্বাসে।
আর কোবে নানকরণ কোবেছিলেন—সেবা।

নাম অবস্ত ভেবেচিন্তে বিনয়বাবুই বেখেছিলেন।

নামের শুধে মেয়েও হয়ে উঠবে সেবাময়ী।

পাঁচজনের অগম্যে করবে সাহায্য—ছুঃছুঃমের সেবা
করবে—করবে বেশের ও মনের মুখ উজ্জ্বল।

যৌবনের ছেলেমানুষি মনে কোরে এত দুঃখেও হাসি
এল।

নাম রাখলেই কি নামের মর্যাদা দেয় মানুষ।

ভঁর নিষেধ নামও ত বিনয়—উনি কি খুব বিনয়ী ?

নমিতা কি খুব নর—বিনীত ?

যোকনের নাম ত কল্পরূপ—ওকি তা বলে কুজের মত
প্রচণ্ড উগ্র—সজিন্দারী ?

বরং দেখা যাচ্ছে যার যা নাম শুনা ত সবাই তার
বিপরীত প্রকৃতিই ? তবে ?

তবে দেখাই বা কেন হবে সেবাপরায়ণ ?

কেনই বা সে সকলের দুঃখে দুঃখী হবে—বরষতর। মন
নিরে ব্যথার বানী হবে সকলের ?

না—সবই অলৌকিক !

সব আশাই মিলিয়ে গেছে আজ মহাশূন্যে। ওই দ্বিমত
বিশুদ্ধ নক্ষত্রশিত আকাশের উদাহরণকে সব আনন্দ
নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

কষ্টা বড় হয়েছে ক্রমে। বহুদিন কেটে গেছে তারপর।

আই এ এবং বি, এ পাশ কোরেছে সম্মানে। বিনয়
বাবু হাসিমুখে একাকীই বহন কোরেছেন সব কিছু ব্যয়
ভার।

হয়ত অস্তরের নিবৃত্ত প্রবেশে একান্ত গোপনভাবেই
এই আকাংক্ষা পোষণ করছিলেন যে মেয়ে তার উপযুক্ত
শিক্ষা পেয়ে অসময়ে পিতামাতাকে দেখবে। প্রকৃতপক্ষে
ছেলের আশা তিনি কোনও দিনই করেননি।

কল্পসর্বধ পিতা চিরদিনই কষ্টার উপর নির্ভর কোরে
দিন গুণেছেন।

আজও অবসর গ্রহণকালে সেই একটি কথাই বার বার
চিন্তা কোরেছেন—সেবা আছে—আমাদের ভয় কি ?

এ্যাঙ্ক্রেট স্বাস্থ্যবতী মেধাবী সন্তান—হোক না কেন
কস্তা—পিতামাতার পক্ষে সেই ত সঙ্গার সমুদ্রে একমাত্র
কর্ণধার।—বার্ণাকোর সুনিশ্চিত আশ্রয়। সব কেমন গোল
মাল হয়ে গেছে।

বারুগাই উঠে গেছে বিনয়বাবুর। আশা ওস্তাদ শিকড়
ধরে কে যেন নিরুপ কোরে উপড়ে দিয়েছে।

আর অবসর নিয়ে গৃহে এগেছেন—গৃহীণী মিত্রিকটু
বাক্যব্যারা কোরেছেন আবার সম্ভাষণ—আর কষ্টা ও পুত্রের
দর্শন এখনও পর্যন্ত মেলেনি। শুনেছেন তাই গেছে নামার
বাড়ী। আসতে রাত হবে।

কর্ষকীবনের পালা চুকিয়ে দিয়ে একেবারে প্রথমে গৃহে
কিরতে খুঁই সৎকাচ বোধ কোরেছিলেন তিনি।

সহকর্মির কাছ থেকে বিধায় নিয়ে নিজেই কি
রকম যেন হস্তসর্বধ মনে হচ্ছিল।

সব চেয়ে ঝাঝ লাগছিল গর্ভী ও পুত্র কস্তাবেব
শম্মুদীন হতে।

যদিও একথা সর্বজনবিদিত যে তিনি এবার অবসর
গ্রহণ করছেন—তবু গতি-পতিই অবশ্যগ্রাস্ত বিনয়বাবু
যেন কি বকম অকথ্যে অস্ত্র নাহুৎ হয়ে পড়লেন।
অশ্চর্য! নিঃশেষেও পরিবর্তন হলই—আর সকলের দেন
অন্তত ভায়ে রূপান্তর ঘটল কয়েকঘণ্টার মধ্যে।

বসন্ত: বিনয়বাবুর এ ব্যাপার ভুল।

নিজেরই তিনি যেন বেকার-বেকার ভাবতে লাগলেন
নিজেকে।

গভী হরত অন্তরে অন্তরে চিরদিনই তিক কোরে
রেখেছেন উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত পায়ে কস্তাব বিবাহ
হবে—এবং বিনয়বাবুও চিরদিনই অর্থাৎ যতদিন জীবিত
থাকবেন ততদিন অক্ষত দেহে অটুটথাক্য নিয়ে
অর্থোপার্জন কোরবেনই।

যত যতদিন না বিকল হয় ততদিন তার কাছ হতে ত
কাল আধার করতেই হবে।

বিশ্বয় আরও ছিল।

ব্রাজিবেলা সকলে যখন একে একে ল্যাংগ্রেণ কোরেছে
তখন বিনয়বাবুকে আরও বিস্মিত হতে হল।

মানসিক প্রশমনিত ক্রান্তিতে অবগতবয়স বিনয়বাবু
এই মেঘ আঘাতে একেবারে বিধ্বস্ত বিপর্যয় হয়ে
গেলেন।

সেবা কিংবে এল ছোট ভাইটিকে নিয়ে মাতৃশালায়
থেকে। ভাইয়ের ষাওয়া চুকলে মা ও মেয়ে আবারে
বসলেন।

রত্নশালায় মাতা-পুত্রীতে কি বাক্যালাপ হল বিনয়বাবু
তার খোঁজ পেলেন না। আর স্মৃতিও নেই ঠর
জানবার।

যে কস্তা অস্ত্রাভিন পিতার আগমনে উল্লসিত হয়ে
সান্নাধিনের সমাচার নিবেদন করে উজ্জ্বল ভাবে—আজ পে
যেন কিঞ্চিৎ বিবর্ত—বিনয়বাবুর মনে হল। সকলেই
নিঃস্বাধর—ভাবলেন বিনয়বাবু।

উনি কিন্তু শয্যার কটক আর সহ করতে না পেয়ে
কিছুক্ষণের মাত্র বাইরের খোলা বারান্দায় বেরিয়ে এসেন।

নিজের ডেস্ক-চেয়ারটিতে বসে সম্মুখে তাহাত্তা
আকাশের দিকে অর্ধচন্দ্র নৃষ্টি মেনে চিত্তাব শম্মুদ্রে ভুবে
গেলেন।

বাবা—

চমকে উঠলেন বিনয় বাবু।

কস্তা এলে পাশের ছোট বোড়টিতে বসেছে।

পিতার বকে শিহরণ আগল। প্লাবিত হয়ে উঠলেন
তিনি।

তাইত!

সেবা এসেছে জনকের দুশ্চিন্তার তার লম্বু করে দিতে।

এমন না বলে আর সম্ভাবন!

দার্বক ওয় শিক্ষা ও সহবৎ!

বাবা—

আবার ডাক বিল মেবা।

কি মা? ঘুম হচ্ছে না তো?

যেহে আনন্দে গ্রাস করলেন বিনয়বাবু। এই সময়টির
মাত্র—এই বিশেষ শুভমুহূর্তটির মাত্রই তিনি উদ্ভ্রাব হয়ে
ছিলেন সারাবিন।

বাবা, আমি স্ত্রীবি সংগে ভায়োলিন ক্লাসে ভর্তি হব।

নীলাকাশে বজ্রপাত হল মনে হল।

লিভাঙ্গ নৃষ্টিতে তাকালেন বিনয়বাবু—বজ্রাঘাত—
স্তম্ভিত।

কস্তা পড়িকার ভাবে হুসিরে বিল।

স্ত্রী—মানাত বোন, ক্যালকটা কুল অব্ মিউজিকে
ভায়োলিন শেখো। সেবাও আগামী মাস থেকে ভর্তি
হবে। পড়া-শুনা তো শেখ হয়ে গেছে। স্ত্রীর সেই
টাকাটা দিয়ে ও বাজনা শিপবে।

বিনয়বাবু নীরবে শুনে গেলেন।

সম্মতি প্রদানে গুই একটি বাস্তব ক্রান্তে কম কোরে
একশ-পঞ্চাশ টাকা চাই। এবং পরে ভর্তি হবার সময়
আরও মোটা চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা লাগবে।

বিনয় বাবু হাত ফড়ে বাঁচবার শেষ তৃণওটুইও
শ্রোতের টানে ভেঙ্গে গেল।

বিগত বিদ্যুত মহাসম্মুখে তিনি হাবুডুদু খেতে লাগলেন
অন্তরে অন্তরে।

যাইবে কিন্তু নিশ্চয়গে বিকোভরীনা বারিদি।

এ রকম আশাতও তাঁকে সামলে নিতে হল।

কস্তার কাছে পরাজয় তিনি মানবেন কি কোরে ?
বিশেষতঃ যেখানে অর্ধের সম্পর্ক—স্বপ্নেও আভাসটুকু
পৰ্যন্ত নেই—

তবু একবার ভিজ্ঞান্য করলেন—না বলে পারলেন
না—

আর ছুদিন বাবে হয়ত অন্নও জুটবেন: হুংলা।—এখন
কি আর তোমায়েই ঘানবাধনার সময় আছে ?

সেবা আকাশ থেকে পড়ল—

বাঃ, আমি কুন্নি শুধুই বলে বলে থাকব ? তার চেয়ে
এমন-এ পড়া ছিল ভালো !

বলে থাকবার এখন সময় আর নেই—।

গভীর স্বরে জবাব দিলেন বিনয়বাবু।

সংসারে ঢাকা কি মাত্র বেড়ান' টাকার তেলে চলবে ?

পিতার অল্পত উপমায় আশ্চর্য হয়ে বিশ্বর একাশ
করল অ্যাঙ্কুটে কস্তা—তার জন্ত আমি কি করব ?
আনাকে শোনান্ধ কেন ?

শোনাছি না কিছু—

দূত স্বরে বললেন বিনয়বাবু—

শুধু জানাচ্ছি যে টাকা চাই—আবও টাকা। শুধু
ডালভাত আর মোটা কাপড় বোগাতে গেলেও চারটে
প্রাণীর এই সহরে এ কটা টাকার সংকুলান হবে না।

সেবার দুই বাঁকা ভ্রু আরও ব্যক্তিম হয়ে উঠল।

ভীক স্বরে প্রশ্ন করল—

আমি টাকা কোথায় পাব ? আনাকে ছুঁমি কি বলতে
চাও ?

সন্তানবৎসল পিতার কঠে রুদ্ধ হয়ে গেল আদল
কথাটা—অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাটা—উচ্চারণ করতে
দিয়ে।

'তোমাকেই বোঝগার করতে হবে'—এই নির্দিষ্ট অর্থত
সত্য প্রস্তাবটুকু তিনি কোনও মতেই আর বলতে পারলেন
না।

মান্য ভাবে ইংগিত কোরে—থরচের প্রসঙ্গ তুলেও
যখন কন্ডাকে বোঝাতে পারলেন না তিনি কি বলতে

চাইছিলেন—তখন বার্ষপ্রয়াস বিনয়বাবু নীরব হয়ে
গেলেন।

কোনও লাভ নেই। যে এড়াতে চায় তাকে মোত
কোরে বোঝা চাপাবার তাঁর কোনও অধিকার নেই।
দাবী তাঁর জুরিয়ে গেছে অংসর নেবার সংগে সংগে।
শুধু কৰ্মক্ষেত্রে থেকেই তাঁর অবগত হয়নি—স্নেহ-মমতা,
প্রজ্ঞাভক্তি-বাহী-বাণী। সব ক্ষেত্রে থেকেই তিনি বিজ্ঞান
পেয়ে গেছেন চিরদিনের মত।—

সব পাথর হয়ে গেছে কোন এক বাহুকবের মায়াশ্মরণে।
শুধুই মাথা ঠুকতে হবে—প্রাণের পাড়া পাওয়া
যাবে না।

* * *

যে ক'মাস পুরানুত্তি বেতন পেলেন কোনও মতে
চলল। তার পরই দেখা দিল প্রভাবের কবাল রূপ।
সস্তর টাকা বাড়ী ভাড়া দিতে হয় সহবতনীতে থেকেও।
বাকী আশি টাকার মংসারের ব্যবসার ব্যয়।

বাড়ী ভাড়া পড়ল বাকী—যুঁহীং বোকানে—গোয়াল
—ইলেকট্রিক—যোগা—বরজি—সব দিকেই ঝুঁপের বোঝা
কুপীকৃত হতে লাগল।

বাড়ীওয়াল দিলেন নোটশ—দোখানদাররা শেষ কথা
বলে শাসিরে গেল—পাথরে বাস্তায় অপমানের তিরস্কার
সইতে সইতে বিনয়বাবু যেন অশাড় হয়ে গেলেন। শুধু
বৈচে বইলেন কন্যাতের বুকখুঁচুনি নিয়ে—প্রাণমন সব শূন্য
মস্ত হয়ে ধু ধু করতে লাগল।

ছুর্ভাবনার পতিহমে বাস্তা ভেঙে পড়ল—বার্ষকা এসে
কায়েরি হয়ে বদল শরীর জুড়ে।

দাম্ভ্যহীন জরাগ্রস্ত স্বরে পড়লেন ছয় মাসের মধ্যে।

নমিতা এথিকে মেয়ের বিয়ের ষোণাশাড় করতে উঠে-
পড়ে সেগে গেলেন।

শুধু রূপ দেখিবেই কস্তা বিদায় হয় না। রূপেরও
প্রয়োজন হয়।

যেই গুনল সেই এড়িয়ে গেল। ছেলের বাবার স্বর
বাড়ী ভাড়ার মত বা পণ্যের মত হু-হু কোরে বেড়ে
যেতে লাগল কথা পাড়া মাজই।

অদৃশ্যে নমিতাকে ছাড়তে হল হাল।

সেবার ব্যবহারে কোনও পরিবর্তন এল না।

খাওয়া খাওয়া তার বতটুকু জোটে—গুণ গুণ কোরে গান গেয়ে খেড়ায়—সংসারের কালে কর্মে মাকে শ্রাব্য করে—ভাইকে পড়ায় আর বই পড়ে—ক্রস্ ওয়ার্ড সন্তুর্ কোরে সময় কাটিয়ে দেয়।

তৈলাভাবে যে সন্দেহের চাকাত্তে মরচে ধরছে—
জীবনের শিখাও যে জ্বলিত হয়ে এসেছে পিতার—
সেহিকে নেই এতটুকু ক্রক্ষেপ—একেবারে নিবিচার।

সকাল-সন্ধ্যা ছেলে পড়িয়ে কিছু টাকা আরও যোগাড় করেন বিনয় বাবু—দে শামস্তাই।

বেধিন বাস্তব মাথা খুঁবে পড়লেন—আর পাড়ার ছেলেরা ঘরে ঘরে দিয়ে গেল বাড়ীতে, ঠিক সেইদিন বিবেল বেলা বাড়ীতে এসে পৌঁছাল স্বস্তি—বিনয়বাবুর বাস্তবদ্বয় কত।

এসেই সেব্যকে আলিঙ্গন করলে একেবারে—

ইস্-কি শব্দর হয়েছিস্ তুই সেবা। কিরে কি করছিস্ এখন ?

মোসামশাই—আপনার এক শরীর হয়েছে—বিছানা নিয়েছেন বেঘছি।

মাসীমা, মোসামশাইকে বাইরে খোরাপুঁড়ি করতে যেন কেন ? ঘরে শুইয়ে রেখে বেঘেন একেবারে। আমি ত বাবাকে মোটেই কিছু করতে দিই না। এত বছর আমাদের খাইয়ে পহিয়ে মানুষ কোরেছেন এবার আমাদের পালা—কি বল সেবা ?

সেবা চুপ্ !

নীরবে শুক হাসি হাসতে হল শুধু।

পরে প্রের কবল—

তুই যে হঠাৎ ?

আরে আমি কলকাতার এলাম একটা ইন্টারভিউতে।

আসছে মাদ থেকে খুব সস্তাব এ্যাপারেন্টমেন্ট হয়ে যাবে—
বেশ ভাল পোষ্ট—গবর্ণমেন্টের রিসিক্ ডিপার্টমেন্টে।

বাবা-মাকে কিছুদিন পুরীতে থেকে বিজ্ঞান নিতে বলেছি।—আমি ভাবছি কোথাও পেইং স্টেট হয়ে থেকে চাকরী কবব কলকাতায়।—পরে একটা মেঘে শুনে বাড়ী ভাড়া করা যাবে।

সেবার কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে।

মা স্বস্তি, সার্থক তোমার শিখা না। আশীর্বাদ করি
তুমি সুখী হও মা।

—অতি কষ্টে উচ্চারণ করেন বিনয়বাবু।

স্বস্তি ছাঁচাবধিন থেকে চলে যায় বখাওয়ানে। কিন্তু
স্বস্তির স্বস্তিটুকু বেশ গভীরভাবেই ছাপ রেখে যায় সেবার
মনের ভিতরে।

সেবা যেন নিজের ছরয়ের নিবৃত্তে হিসের সন্ধান
করে—গভীর, নিঃশব্দ, মৌনতাপ।

নমিতার গহনার ব্যস্ত শূন্য হয়। শূন্য হয় হাত, গলা।
নিরাভরণ বেহের হিকে তারিণে তারিণে শুধুই নিঃশ্বাস
ফেলা ছাড়া বিনয়বাবুর আর কিছু করার থাকে না।
তার এমন শক্তি নেই উঠে হেঁটে বেড়াবেন—আবার কাজে
যাবেন ছুঁবেলা। যাবানো শক্তি কিবে পেতে বেশ কিছুদিন
সময় লাগবে।

সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয় সাপেক্ষ।

সন্ধ্যার পাড় ছায়া নেন এসেছে সহরের বুকে—বাস্তব
বাস্তব জলে উঠেছে বিজলী বাতির মালা।

ককের ভিতরে তখনও দিনের আলো একেবারে
মিলিয়ে যায় নি।

ফুলসীতলার প্রাণীপ জেলে নমিতা এসে পাখা নিয়ে
বসলেন বিনয়বাবুও শিরে।

খোকম কেতেনি খেলার রাঠ থেকে।

সেবা সেই সকালে বেরিয়েছে, এখনও বাড়ী ফেরে নি।

আজ বিনকতক হল তার আচরণ হয়ে উঠেছে রহস্যময়।
কোনও মতে দুটি ভাত দুখে দিয়ে সকালে যায় বেরিয়ে,
ফেরে দুপুরে বা বিকেলে।

আবার চা খেয়ে যায় চলে—আসে তাম্রি নটীর পর।

কোথায় যায়—কি করে—কি উদ্দেশ্যে, কিছুই জানা
যায় না।

মা প্রের কবল বলে—কাজ আছে। পরে বলব।

পিতা শুধুই বর্ণক।

সেই যে প্রথম দিন অভিমানে অম্লজারিত বাণী বকে

দায়গ কোঁরে বেঁচেছেন—তার পরে আর কোনও দিনই
কোনও কারণে বাক্য ব্যয় করেন নি।

শক্তি যেদিন নিঃশেষ হল যেদিন নিলেম শব্দ—তার
আগে নয়।

শরীরের শেষ রক্ত বিন্দুটিকেও কাছে লাগাবেন তিনি
শপথ গ্রহণ করেছিলেন।

তাই তিনি সব চেয়ে স্থিৎ—অবিচলিত।

কড়ের মত ঝট পিটার বুক পড়ল এসে দেবা—হাতে
বড় একখানা লেফাফা।

বাবা—বাবা—এই দেখ, আমি তোমাকে বাঁচিয়ে
রাখব বাবা। বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই আমি সবাইকে।

উদ্ভূসিত কান্নায় ফুলে উঠল শাবা দেখে। পিতার দুই
চোখেও নাশল অশ্রুধারা।

মা বললেন হবে তুলে কস্তাকে—

কি বে—অমন করছিল কেন? কি হয়েছে, বলনা
ভাল কোরে।

বাবা কঁপন করে বললেন—

নমিতা,—কিছু জানতে চেও না আজ। বুকেছি, আমি
শব বুকেছি মা। আমার মা না হলে এই বুড়ে অন্ধম
ছোশেদেরের ভার কে এমন কোরে বইবে বলত?

বুঝছ না নমিতা, নানকরণ আমার সার্থক হয়েছে।
অগন্যন মূখ তুলে চেয়েছেন।



একই সূত্রে গাঁথা

কানাকী গর ; লেখিকা—অম্বুশমা

অম্বুশমা—নি, বিশ্বনাথ

কানের কাছে এক নাগারে এলাখ বাজছে।
বিরক্তিকর। পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তা
সত্ত্বেও উঠতে ইচ্ছা করছে না। অস্তমনস্ক ভাবে ঠায়
বিছানায় পড়ে আছি। ছ'মিনিট পর্বত ক্রমাপত্ত: বাজতে
থাকার শেষ পর্বত উঠে বোতাম টিপে, বিছানার স্তরে
এপাশ ওপাশ করছি।

শেষ পর্বত হঠাৎ কি ভেবে নীচে পড়ে থাকা একটি
পাখা ছুড়িয়ে নি। সকাল হলেও গরম কম ছিল না।

হাওয়া পাওয়ার স্তম্ভ জানালা বুলি। বাইরের বিকে
দৃষ্টিপাত করি। তখনও সূর্য ওঠেনি। তা সত্ত্বেও অস্পষ্ট
আলোকে অন্ধের ঐ তিনটি বাড়ী দেখা যাচ্ছে। ঐ তিনটি
বাড়ীর মধ্যে কি বিরাট পার্থক্য।

মুঝে ফিরে আবার সেই তিনটি বাড়ীর উপর আবার
দৃষ্টি পড়ছে।

একটি ছিল ছোট একতলা। তার ছিল দোতলা
আর তৃতীয়টি ছিল কুঁড়ে ঘর। এই তিনটি বাড়ির ইতিহাস
কত দীর্ঘ।

ঢং ঢং ঢং...ঘটীর আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে
ভাগ্যাত্মা ভাড়াভাড়ি উঠুন ঘরিয়ে ছ'মিছে। মিনিট দুই
তিন পরে কাঠগলো জলতে লাগলো। ঘোয়ার চোখমুখ
ভরে যাচ্ছে। চোখে জল গড়াচ্ছে আর কাশছে। আধ
ঘটীর মধ্যেই সোবারবসম্, কিছু ভাঙ্গা এবং বেলে বানানো
শেষ করতে হবে...তারপর...তারপর আবার বানীর
আমার খোতাম পরিচি রিতে হবে। ইত্যাদি।

হঠাৎ আবার উঠুনটা নিবে পেল। আবার ছ'মিচে
হল।

'ছি...ছি...হল কি। এত বোঁরা কোথেকে এসে
বলি আমাকে যাওয়া যাওয়া হবে কি না?' গলাধঃকৃত

চিংকার করে মিথ্যা করে, জানার খোতাম পরতে
পরতে।

'বাল্লা হয়ে গেছে শুধু বেড়ে বেওয়া বাকী।' ভাগ্যাত্মা
বলে।

কিন্তু ইতিমধ্যেই আর সময় না থাকার গলাধঃকৃত গল্প
গল্প করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

অসন্ত উনানের বিকে তাকিয়ে ভাগ্যাত্মা ঠায় বসে
থাকে। আগুনের শিখার আলোতে ছায়ামোহনা ভাগ্যাত্মার
ভামাটে চেহারা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। সেই আলোতে
নিজের চেহারা বিকে তাকিয়ে ভাগ্যাত্মার মন স্তম্ভের
উঠছে;...অতীতের কত কিছুর ছবি ভাসছে মানসপটে।
বছরের পর বছর তার উপর দিয়ে যে বিপদের ঝঞ্ঝা চলে
গেছে—স্বাধীন যে অত্যাচারে চলেছে তার উপর সে সমস্ত
কিছুর স্মৃতিই সূত্রে টান পড়েছে আজ।

গরীব পরিবারের মেরে ভাগ্যাত্মা। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে
পাড়া পড়শীরা বলেছিল, 'হয়েছেতো মেয়ে, ছেলে তো আর
নয় যে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।' মা বাবার মনেও
হুস্তিতা চুকলো। সেইদিন থেকেই যেন পনেরো বছর
খাইয়ে পঠিয়ে বড় করে দিয়ে বেওয়ার চিন্তা চুকলো।
হয়ত ভাগ্যাত্মার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল তাই তার পথে কোন
ভাই বোন ছাড়া। তার ঠাকুরদার মতে সন্তান সন্ততি না
হওয়ার কারণ ভাগ্যাত্মা অগাধ। ভাগ্যাত্মা কথটা
শনে মনে মনে কাঁদতো। সাধুনা তাকে কেউ ধিত না।
সহানুভূতির কথাও কেউ শোনাতে না। বহির্জগৎ সম্পর্কে
অল্প বয়স থেকেই স্তম্ভকিংবাল হওয়ার মত পরিবেশ পায়
নি। বরের কাল করবার পর যে সময় থাকতো সেই
সময় তার মা 'পতিব্রত' দেখাতেন। বাবসীতা, শাবিত্রী
সত্যবান প্রভৃতির গল্প ভাগ্যাত্মা খুব মন দিয়ে শুনতো।

এই সমস্ত গল্প শুনিতে ভাগ্যান্ধার মা তাকেও সেই ধরনের গল্পী হওয়ার উপদেশ দিতেন।

একবার মা বাবার মধ্যে ভাগ্যান্ধার বিচ্ছেদ কথাবার্তা হচ্ছিল। ভাগ্যান্ধা সে কথা আড়ি পেতে শুনলো। শুনে তার মন খুশীতে ভরে যায়। শীতাই তার বিয়ে হবে তেবে তার মন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু তার অসুখান মত বিয়েটা তত ত্যাগাতাড়ি হল না। কত লোক এলো, বেখে শুনে চলে গেলো। কিন্তু বোঝা গেল না তার স্বামী কে হবে। কেউ তাকে অগচ্ছ করে চলে গেছে শুনলে তার কান্না পেত। কিন্তু সে কাঁদতো না একান্তে।

শেষ পর্যন্ত এলো গঙ্গাধর। প্রথমবার তাকে দেখতে মন লাগেনি ভাগ্যান্ধার। আনন্দও পেয়েছিলো মনে মনে। চোখে যেন হীরের টুকরোগুলো চিকচিক করছে। কিন্তু দুদিন পরেই জানতে পারে যে তার স্বামী বঙ্গ-মহাভারত লোক। বিয়ের পরেই সে পনের বাকী পাঁচশো টাকা হাতে নাতে না পেলে ভাগ্যান্ধাকে নিয়ে যাওয়ার জো প্রায়ই উঠে না, উপরন্তু সে অল্প কাউকে বিয়ে করে ফেলবে বলে জানিয়ে দেয়।

ভাগ্যার ইচ্ছা করলো তাকে ছুটা বড় কথ শোনাতে। কিন্তু তার না তাকে শিখিয়েছেন, পতিনিন্দা নহাপাপ। তাই সে নিশ্চুপ হয়ে বইলো। নিরুপায় হয়ে ভাগ্যার বাবা হয়েও খটি বাটি সব বিক্রী করে পনের বাকী টাকা পূরণ করেন।

খবর বাড়ীতে আদার পর থেকে যেন ভাগ্যা হল সকাল থেকে রাতি পর্যন্ত ষাটাত মন্থ! স্বামীর ইজিতে চলতে হচ্ছে তাকে পুতুলের মত। তারপর স্বামীর সন্তানবৎস্বাসী হল। ছেলেকে মেরেদেব লাগান পালন করার মধ্য দিয়ে সে নিজের কথা ভুলতে চেষ্টা করে। তা মল্লুও মাঝে মাঝে মন এতটা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, এতটা বহুপাণ্ডব হর যে আশ্চর্য্য করতে ইচ্ছা করে তার। কিন্তু পংকপেই ছেলেদের বেখেতে পেয়ে তার প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হয়। ছেলে মেরেদেব মাহুত করার ধারিষ বোধ লাগে।

বড় ছেলেটি সেধাপড়া ছেড়ে চাহুদী পেয়ে বিয়ে করল। চলে গেল চাহুদীহানে বউ নিয়ে। বাবা মার সঙ্গে সম্পর্ক আর তখনভাবে রাখল না।

আর একটি মেয়ে ছিল। নাম তার কানাকী। সুল আশতাবেই ছুটতে না ছুটতেই তাকে কাঁটার মধ্যে নিক্ষেপ করা হল। সে কাতরভাবে প্রার্থনা করেছিল বিয়ে না হওয়ার জন্যে। সে বিয়ে তখন করতে চায়নি।

আরও পড়াশুনা করতে চেয়েছে। কিন্তু তার চাহিরা মেটেনি। ভাগ্যান্ধা মা হয়েও কোন কথা বলার সাহস পায়নি। বললেই বা তার কণ্ঠের কান হবেই বা কেন তারা। গঙ্গাধরই সর্ব সর্বা। তিনি মেরেটির এই ইচ্ছা কিছুতেই মানতে রাজি হননি। যিনের পর দিন কানাকীর চোখের কোণে অশ্রুধারা বেখে মার মন শুনরে উঠলো। তখনই বিয়ে মা হওয়ার মন্ত ভাগ্যান্ধা স্বামীর কাছে কত কাকুতি মিনতি করে বলল। কিন্তু স্বামী কোন কথা দক্ষা করাকে গঙ্গাধরবাবু চিরকাল অপমানজনক মনে করতেন। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হটেনি।

কানাকীর পড়ার ইচ্ছা সেখানেই ছাইগাণা পড়ল। মাথা মন্ত করে বিয়ে করে স্বামীর বর করতে হল।...

গঙ্গাধর কালে যাওয়ার সময় ভাগ্যা আদালার কাছে গাড়িরে তার দিকে তাকাল। যতক্ষণ তাকে দেখা যায় দেখে আর ভাগে তার নিষ্ঠুরতার ভরা ঘটনাবলীর কথা। স্বামীর উপর তার মনে মনে অভিযোগের হিগাব নেই, সীমা নেই। মনে হয় যেন তার এবং তার মেরের জীবন মটু করার মূল্য সেই...।

গিরের পর মাঝে মাঝে কানাকী এসেছে বাপের বাড়ী। দুর্ভাগ্যকে যেন নিতে পারে না, আবার কি যে স্ববীয় তাও ঠিক করতে পারেনা। কাঁদে। চোখ মোছে। আবার কাঁদে। নাও কাঁদে। চোখ মোছে। আর কি কহবে ঠিক করতে পারে না দুখনে।

তবে একটা কথা ঠিক যে বর্তমানকে যেন নিতে পারছে না তারা। মনুজ জীবনের মন্ত তারা বাএ। কিন্তু জীবনের বাণাওলোকে সন্ততে তারা অদমর্থ। পুরুষ প্রধান সমাজে বা বর্তমান সামাজিক আর্থিক দ্ববস্থার কর্তমান দুর্ভাগ্য পরিবেশে ভাগ্যা যেন একটি পুতুল। বড় অদম্য বোধ করে। তবু মাঝে মাঝে বাঁধার চেষ্টা করে।

বিরাট কোতালি ঘোষান বাড়ী। সামনে মাখন বাগান। উইং ক্রমের বহুদার প্রাকৃতিক বৃক্ষ আঁকা পড়া।

বাড়ীর দিগ্গজী সূতজা আয়নার সামনে বসে আছে। উদাস চোখ, উত্তম কপোল। দীর্ঘ বেশ। বাঘে বাঘে মেন সূতজা নিজের সামগ্রিকরূপ দেখছে আত্মশিত।

চাকরাণী সূতজার চুল বেঁধে বেধে, পাউডার মাখিয়ে চোখে কাগল পরায়। এতক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকার পর সূতজা হঠাৎ চাকরাণীকে জড়িয়ে ধরে হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কঁপতে শুরু করে।

চাকরাণী তাকে না কাঁধের লজ্জা অনেক বোঝায়। তা সত্ত্বেও তার কান্না ধামে না। শেষ পর্যন্ত চাকরাণী সূতজাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। তাকেও তার কান্না ধামেনি।

সূতজার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। ঠিক সেই সময় গায়ের হঠাৎ মহামারী লাগে। তার বাবা মা দুহুপথ বাড়ীঘরের প্রথম মারিতে ছিল। তারপর সূতজা নিজের ছোট ভাই বিত্তকে সঙ্গে করে আত্মীয় স্বজনদের ঘরে ঘরে ঘোরে মাথা গোঁজার স্থান আর চুইয়ে ভরতেই সন্ধান। কিন্তু কেউ সেই মুখের সূতজাকে বাড়ীতে স্থান দিতে রাজী হয়নি। সে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে আত্মীয়স্বজনরা তার কত অপমান। তারপর বাধ্য হয়ে নীবিচার সন্ধান বিত্তকে নিয়ে শহরের দিকে পাড়ি দিতে হয়। মিস কাংখানা থেকে শুরু করে বিভিন্ন আয়দার চাকরীর আবেদন করে বার্থ হয়। বালন মাঝা বা মল তোলায় কাগজ চেয়ে পায় নি। এই চাকরাণীর কাজ না পাওয়ার পেছনে অসুস্থতম কারণ ছিল তার বয়স এবং ভুলপলব্য। তাকে রেখে দিগ্গজী গদ্যবাহী হত প্রথমই। কোথাও কোন কাজ পায়নি। পেটের আগার পথে পথে ভাড়া ঘোরে। বিত্ত তখনও অনেক ছোট। সে যোনের আঁচল ধরে চুপচাপ তাকে অনুসরণ করছিল। তিনদিন কেটে গেছে, একদানা ভাতও পেটে যায়নি। তা সত্ত্বেও সূতজা ভরসা হারাণনি। মাঘ হারাণনি। উপরন্তু এই কঠোর সমাজ ব্যবস্থার নয় ভুল বেঁধে তার গা আরও জালা দিয়ে ওঠে। মনে মনে এই ব্যবস্থার মোকাবিলা করার একটি মনোভাব দান্য রাখে। বাক্স ইচ্ছা নিজের জীবনের সমস্ত কিছু আশা ভরসা জলাঞ্জলি দিয়েও বিত্তকে পড়াবে। শেষ পর্যন্ত তার

একমাত্র খুঁজি শরীরটাকে সমাজের কাছে সমর্পণ করে। গার একদিন তাকে চাকরী চাইতে গেলে বশবাস্ত দুই থেকে তাড়িয়ে দিগ্গজি তার আশ পায়ের ক্ষুভা পরিয়ে দিচ্ছে।

মাঝে মাঝে তার মনে হাজারো প্রশ্ন জাগে। পৃথিবীর সব পুরুষরাই কি এই? একটি মহিলা তার মজ্জা থেকে বন্ধা করে কি জীবিত থাকতে পারেনা আত্মকের দিনে? এই ভাবনেই কি তার সারা জীবন কাটবে? এর থেকে কি কোনদিন নিস্তার পাবে না? নানা কথা চিন্তা করতে করতে তার মাথা ভন্ড ভন্ড করে ঘূরতে থাকে।

বিত্ত বড় হয়েছে। সেগা পড়ার একটা স্তর শেষ করেছে। সামগ্রিক অভ্যাস অবিসারওসো অসুস্থতম করেছে। পড়া শেষ করে চাকরীর সন্ধান খুঁজে। বিশেষ কারণে সাথে মেশার সময় তার একটা মজাট ছিল। সে একটি পতিতার ভাই। শেষ পর্যন্ত বিত্তকে এই নরক জীবন থেকে উদ্ধার করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে সে এক শহর থেকে অন্য শহরে চাকরীর সন্ধান খোঁজে।

বতশ্রম ধরে সে বিছানায় শুয়ে সূতজা এসব ভাবছে সে জানেনা। ইতিমধ্যে “বাবু” এসে ঘরে ঢুকে এমন ভাবে নন্দীর দিকে তাকায় সে সে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সূতজা নন্দীকে বহুবার ডাক দিয়েছে কিন্তু বকশীশ পাওয়ার আশায় নন্দী বাবুর নির্দেশের বিরুদ্ধে যায়নি। কাঁপতে থাকা সূতজাকে বাবু সাহায্য দেয়। সে অগ্নি বৃষ্টি বর্ষণ করে, “সেই ঘান”, বলে চিৎকার করে ওঠে। বিস্কৃত সূতজাকে দেখে বাবুর মনে হলো, সে মেন একটি সুন্দর স্মৃতিস্ত গোলাপকে দেখছে। তার ইচ্ছা করলো সেই সুন্দর ডাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে হাতের মুঠোর রাখে। জ্বালাত বাড়িয়ে তাকে জোড় করে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে। ছটকট করতে করতে সূতজা ভাব, সারাটি দিন ধরে সে যে প্রতিজ্ঞাটি করেছে শেষ পর্যন্ত কি তার এই পরিণতি!

জানাল দিয়ে জোৎস্নার আসলো বাবুর উপর পড়ে। সূতজার ইচ্ছা করল তার মুখের উপর খুঁ খুঁ ঘেলে। কিন্তু তারপর কি হবে। সে খাবে কি? বাঁচবে কি হবে?

বিশ্ব কবে চাকরী পাবে? সে কবে আসবে? এই কুশ্লিষ্ট বৃত্তি থেকে কবে সে মুক্তি পাবে?

বাবু চলে যাওয়ার পর শ্রুতজ্ঞার শরীরে যেন আগুন জ্বলল। তার মন চিন্তার করে ডাক দিচ্ছে—বিশ্ব... বিশ্ব।

ক্যাঙ্কটরীর তেঁ। পড়ছে। কান ঝাপাঝাপা হয়ে যাচ্ছে তার আগুনে। লচিরা চোখ রক্তভেদে ঝগড়াতে হাই তুলে আড়মোড় তেঁকে গুঠার চেষ্টা করছে। উঠে সাড়ীটা কেড়ে নিয়ে চুল ঠিক করে নিয়ে ডাক দেয়, 'কই গুঠনা গো, তেঁ। পড়ে গেছে যে!' সে চেষ্টাকে বাজা দিতে দিতে ডাকে।

পাশের পাঁচটি বাজা ধোপে ওঠে। 'মা কুটি রে' বলে যেন তারা মগজপ ভাবে মিলিত কণ্ঠে ডাক দিচ্ছে। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুর্গন্ধ মুখেই উঠবে কিছু পোষার লজ্জা বাজারা বাত হয়ে পড়ে।

তাকে তুলে রাখা পাতা তাত নাড়িয়ে এক একপাতে কিছুটা বেধে বেতে তারা মোড়ানো কয়েক মুহূর্তে শেব করে কেলে। তার পরেই হড়াক করে বহর। বন্ধ করে লচিরা এবং চেন্না মিলে চলে যায়।

লচিরা পাশে পাশেই চেন্না ঘাঙিল। রাতের আগ সোড়ো বিড়িটা পকেট হাতড়ে খের করে বরায়।

লচিরা এমন বৃত্তিতে চেন্নার দিকে তাকান্ধে যেন বানীর জমন শূন্য চেহারাটা ভেঙ্গে পড়ছে—হিনকে হিন কাঠ হয়ে যাচ্ছে। আর তার করার কিছুই নেই। কালো চেন্নারা। যান করার সময় আরও কালো দেখার তাকে। লচিরা যেন পড়ে হল বছর আগেকার কথা।

কি শূন্য গাঁটগোটা চেহারা ছিল তার। লচিরা তাকে ভালবাসল। বাড়ীর লোক বাবা দিলে তারা দুজনে পালিয়ে যার শহরে। চাকরী তো পেল—তবে যেন নরকে পেল চাকরীটা। অন্নদিনের মধ্যেই ঐ হাড় ভাঙা মেহনত আর মালিকের অত্যাচার অবিচারের ফলে অল্পতে ভেঙা কুটি খেরে ছায়া আর রাখতে পারেনি।

লচিরা তো শূন্যের অীযনের স্বপ্ন আর করনা নিয়ে

চেন্নার সঙ্গে শহরে আসে। --বছর বছর তার পরিবারে এক একজন আগন্তকের সংখ্যা বাড়ল। সাবাহিনের বাড়িভাড়া ষাট্টনিকে লাখ কবার চেষ্টা করত কৃত্রিম প্রয়াসে।

এই কথাই ভাবতে ভাবতে তারা দুজনে পথ চলেছে, যঠাং চেন্না মিলের ভেতরে ঢুকে পড়ে। লচিরাও তেরে ঢুকে বেধে আগের দিনের বিভগ্ন কাজ তুলে রাখা আছে তাহের জগত।

বাত থেকেই লচিরা শরীর রাখা করছিল। বিভগ্ন কাজ বেধে সে একবারে ভেঙে পড়ে। পরকণেই শূণ্য বলে গুঠে, 'খুংতার কাজে নিম্মুচি কবেছে—খুং!'

মালিককে অভিমাণ অবগত দেয়, তবে কাজ না করে উপায় বা কি। বার বার সর্দার এসে তাকে যেন শব্দ কয়িরে দিচ্ছিল, যেন রেখে কাজ না করলে গেটের বাইরে যেতে হবে।

দুপুরে ছুটির সময় পাশের মহিলায় কাছ থেকে পান চেয়ে চিবাতে চিবাতে গেটের কাছে হেলান দিয়ে একটু শুতে না শান্তেই আবার তেঁ। পড়ে।

এরই মধ্যে তার মনে পড়ে তার খের কথা। কুঁড়ে খের হল চুইছে। ছেঁড়া শাড়ীটাকে সেলাই করতে হবে। বাজারের লজ্জা লাগা চাই। বড় ছেলটাকে তুলে ভতি করানোর কথা লোকে বলছে। আবার ভাবে কিন্তু মজুরের ছেলেকে আবার সেখাপড়া সেখান--বিভাহুছি--না--বাক পড়াশুনা ধনীঘের মন্ত তোলা থাক। আবার ছেলেহাত আমাধেই মত মজুর হবে। বেশী কাজ করবে। কম খাবে।...ও! এ মরক ফলগা থেকে কবে যে মুক্তি পাব, ভগবান!

এখানে বিচার কোথায়? ভোর থেকে বাত পর্বন্ত অমাহুতিক পরিশ্রম করলেও কেন আমাধের তালো খাওয়ার কোট মা।--ভাবতে ভাবতে চেন্নার সঙ্গে লচিরা শহরে দিকে কিরছিল। মেলাধ তার খুব শরম হয়ে গেল এই সব কথা ভেবে ভেবে।

এক বিরাট ট্যান্ট্রী হাওয়ার বেধে বাবিত হয়। গুঠা মিলের ম্যানেকায়ের ট্যান্ট্রী। তার ছুটি ছেলে মজুরের দিকে ভাবিরে দিল দিল করে হাসছিল।

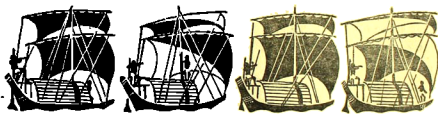
জুন্দের শোখকে বাজাগুলোকে কত অপূর্ণই না দেখাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ লতিয়ার মনে পড়ে যায় ব্যগ্র উদ্ভূত প্রতীক্ষার থাকা বাজাবের কথা। লতিয়া মনে মনে হলে ওঠে, ওদের ছেলে এমন কি পুণ্য করেছে? আর আমার বাজারাই বা কি পাপ করেছে! চেয়ার কাঁপে থাকা দিয়ে দেখায় ঐ ট্যান্ডার দিকে।

চেয়া নীরবে শুধু তাকায়। লতিয়া আবার নিরাশ এবং দুঃখে বলে, ‘স্বাধীন কি আমার এইভাবে থাকতে হবে? কোন দিন কি আমরা মোটা ভাত কাপড় পাবনা।’

লতিয়ার কোন কথার উত্তর না দিয়ে খুঁৎকেলে হাঁটতে থাকে। সে রাস্তা। পা টানতে টানতে হাঁটছে। হুঁড়ে খেয়ে

কাছাকাছি আসতেই তার লক্ষ্যস্থ মুখ ধেবে চেয়া লতিয়ার হাত ধরে বলে, ‘আমাদেরও দিন আসবে। বউ আমারেও দিন আসবে!’ বাবা মাকে ধেয়ে পাঁচটি বাজা বিলবিল করে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে। ঝড়িয়ে ধেয়ে। তাদের গায়ে তাদের কামা কাপড় কিছু নেই। বুকেও পাঁজরা-জ্বলো দেখাচ্ছে। চোখ, নাক অপাচ্ছন্ন।—এত সব থাকা নজুও লতিয়া তাদের কোল তুলে নেয়। ঝড়িয়ে ধরে তাদের। চুমোর চুমোর দুখ ভরে দেয়।

সেখিকা ভাবছে ঐ তিনটি ঘরের ইতিহাস—আলাদা হলেও যেন সমন্বিত বঁাধ। প্রতিটি পরিবার যেন নতুন দিনের স্বর্গোদয়ের উদ্ভূত প্রতীক্ষায়।



অভিষেক

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

অণ্ডাঙ্কের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কালিঙ্গলি মাথা একটা নৃত্তি বেধির এল জঙ্গল থেকে। হাততালি দিঃ লাফাতে শুরু করল।

মিনিট কয়েক, তারপরই যৌবন হয় কমল বোস চিনতে পারল। চিন্তার করে ডাকল, জোসেফ, জোসেফ।

মুহূর্তে ছেলেটির মাচ ঘেমে গেল। এদিক ওদিক চেয়ে পাথরের পাশে এধের বেথতে পেয়ে ছুটি চলে এল এধের কাছে।

কখন ফিরলেন ? ওদিকের কান্না ফতে ? শরতেন্দ্র বাচ্ছা একটাও বেঁচে নেই তো ?

কমল বোস বলল, তোমার কোন কথাটার উত্তর আগে দিই বল তো ? তার চেয়ে তোমার এত উল্লাসের কারণটা কি, সেটাই বল আগে।

জোসেফ আকর্ষ হাঁসল। বীতন্ম যোগল সাধা ধাঁড়ের দার। কামার আঙিনা দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে বলল, অনেক হবে না ? কি রকম জোয়ালো বোমা তৈরী করেছি, তার আওতা নিকের কানেই শুনলেন তো ? পাথর চৌতিং হয়ে এতখানি গর্জ হয়ে গেছে।

ছুটো হাত প্রসারিত করে জোসেফ গর্জের পরিধি দেখাল।

সঙ্গেই লোকটি এবার কথা বলল, এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকটা ঠিক হবে না। কেউ কোথা দিঃ বেথে ফেললেই বিপদ। জোসেফ, আস্তানায় ফেরা যাক।

জোসেফ হাত দিয়ে ঝোপ-ঝাড় দিয়ে এগোতে লাগল। বাকি তিনজন তাকে অহুসরণ করল।

নাইল বানেক, তারপরই আস্তানার সন্ধান নিলল। বাঁশের বেড়া, গোল পাতার ছাউনি। একেবারে পাথরের কোণ বেঁধে। ঘন গাছপালার ঠিক নিচে। এদিক ওদিক থেকে পাতা পাতরাই হুড়িল। বুঝি কাছে না এলে বদতির চিহ্ন বুঝে পাথে না কেউ।

তিনজনেই খুব রাত। কথা না বাড়িয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে চুকল। খড়ের বিছানা বাঁশের মাচার ওপর। তাঁক করা একটা কবল। বাঁশের চোড়া ভর্তি ঘল।

জামা কাপড় না ছেড়েই তিনজন শোঝা শুয়ে গড়ল বিছানায়। জোসেফ ঘেরিয়ে গেল।

জোসেফের ডাকাডাকিতে যখন ঘুম ভাঙল তখন বেশ চনচনে হোথ উঠেছে। অব্যবহারে তাপ এখানে বোধ্য সম্ভব নয়। ঘন পাতা ভেদ করে রোদের একটি কণাও মাটি ছুঁতে পারছে না। কিন্তু পাথরের চুড়োর চুড়োর চড়া রোদের আভাস।

তিনজনে উঠে বলল। একটানা ঘুমের পরে শরীর অনেকটা স্বচ্ছ। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিও আর নেই।

জোসেফের পিছনে আরো দুজন ছোকরা। কার্টের ত্রেকাবিতে ঢাকা বেওয়া ভাত আর তরকারি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সুখার পরিমাণ যে কতটা তা এক একজন বেথে বলে বুঝতে পারল। পরিভার করে সব বেয়ে নিয়ে, তিনজনে গোল হয়ে বলল।

কমল বোসই প্রথম কথা বলল জোসেফের দিকে চেয়ে, জোসেফ আজ বিকেলের খবরের কাগজ কাল সকাল নাগার পেয়ে যাব কি বল ?

সকাল নয়, এখানে কাগজ আসতে প্রায় দুপুর গড়িয়ে পড়ে। অনেকটা ঘুর পথে আসতে হয় কি না।

ঠিক আছে, কাগজটা এলেই আগে একবার আমায়ের এখানে দিঃ বেও। খবরগুলো পড়বার জন্য মন বড় উতলা হয়ে রয়েছে।

ট্রেন জুটনার ব্যাপারটা তো নিম্নের চোখেই বেথে এগেছেন, ও খবর আর নতুন করে কি পড়বেন ?

তা অব্যবহারে দেখছি, কিন্তু বোধীরা কি বলে সেটাও

তো জানা দরকার। আগের দু' একটা ছুটকো ছাটকা গল্পগোশেষ সময় বোঝার লিখেছিল, 'মুটিমেয় বিজ্ঞোহী, যের সাময়িক উৎপাত।' নিষেধ বেশ থেকে পড়ক উদ্ভেদ করার নাম বিজ্ঞোহী।

লুন পে হাসল, এটা যে ওদেরও নিষেধ বেশ। বেশের গভীরে ওদের শিকড় নেমেছে, এদেশের প্রাণরস আত্মরস করে নিষেধের পুষ্টি সাধন করেছে। এদেশবাসী ওদের হাই। লুন পের বলায় শুক্লোতে সগাই হেসে উঠল।

পরের দিন কাগজ এল প্রায় বিকেল নাগাদ। ছাপা কাগজের সঙ্গে টাইপ করা আরো একটা কাগজ এসে পৌঁছিল।

ইংরেজের কাগজে খুব সংক্ষিপ্ত খবর। ঘনকতক বিজ্ঞোহী রেলের লাইনের ওপর বোমা বেগে ঠেঁকের কয়েকটা কানথার ধ্বংস সাধন করেছে। সৌভাগ্যের কথা লোকজন বিশেষ আহত হয়নি। প্রচুর তরি তংকারি বেগুনে আসছিল, সেগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। দিপতে একটু গোলমাল হয়েছে। বাবাকে কমলাসেলু কেনা বেসা নিয়ে বোকানীর সঙ্গে হাতাযাতি হয়েছে কয়েকজন সৈন্তের; এই নিয়ে শব্দে সামান্য একটু উত্তেজনা হয়েছিল। অশ্রুত অবস্থা এখন আরম্ভের মধ্যে।

আসল খবর মিলল পরের কাগজটার।

সারা বেশ জুড়ে গোলমাল সুরু হয়েছে। মরণপণ করে এ দেশের লোক ঝাঁপিয়ে পড়েছে বোম্বোনের ওপর। হুলে বলে, কোশলে শত্রু নিধন চলছে। গাড়ীভর্তি মিলিটারী প্রায় শেষ। দু' একজন বাবের আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। দিপতে সৈন্তদের ছাউনীর ওপর কারা বোমা ছুঁড়েছে। হতাহতের সংখ্যা কম নয়। তাছাড়া এক বছরা সৈন্ত নিয়ে সাগাইং থেকে পাঁচ বছর সময় বজরা ভুবিরে মাঝি পাঁতরে পায়ে চলে এসেছে। গোলাবারুদ শুষ্ক সৈন্তদের সলিল-সম্মি।

মোবিন, পেগু, মাটাবান, মিচিনা, মেমিও সব আগগার এক কাহিনী। সারা দেশ জুড়ে পাড়িয়েছে।

পড়তে পড়তে লুন পে সন্ত্র করে কমল বোসের একটা হাত আঁকড়ে ধরল, আর ভয় নেই। সারা বর্ষা মরণ পণ

করে পাড়িয়েছে। মিচিনা থেকে মৌলমিন এক সুর, এক প্রতিজ্ঞা। বিবেকবীর আর বুদ্ধি নিস্তার নেই।

কমলের হাতে তখনও ইংরেজের খবরের কাগজটা বসা ছিল। এগিষ্ঠ ভগিষ্ঠ খুব মন দিয়ে সে গুটোচ্ছিল, হঠাৎ কোণের বিকে একটা খবর চোখে পড়তেই শব্দ করে হেসে উঠল।

কি হ'ল হাসলেন যে?

হাসির খবর চোখে পড়ল একটা।

হাসির খবর?

তা ছাড়া আর কি। ইংরেজ সম্প্রদায়ক মন্তব্য করেছে এ এই সময় গোলাঘোণের মূলে বর্মীরা মোটেই নেই। তারা শান্তিপ্রিয়, রাক্ষস প্রজা, এসব তারা ধরেও কল্পনা করবে না। পাষাড ডিবিগে, মদী পার হয়ে একঘল ভারতীয় বন্য ছুকেছে এরেশে। তাবাই উত্তেজিত করেছে নিরীহ দেশবাসীদের। পিছন থেকে আক্রমণ করে ইংরেজদের কাবু করার চেষ্টা করেছে। এই মতলবকে ভারতীয়দের কাছ থেকে বুঝে থাকুক এ দেশবাসী। তাদের চক্ষুতে পড়ে নিষেধের সর্বনাশ যেন কেউ ডেকে না যান।

পড়া শেষ হলে কমল ছুটা চোপ খুন্সিয়ে ফেলল। বিড় বিড় করে বলল, আনেন। কোন দর্দহাতকের মুখেও এমন শাস্তির বাণী শোনা যায়নি।

পিছনে শুকনো পাতার থল থল শব্দ হতেই তিনজন ঘিরে চাইল।

সাইকেলে ভর বিরে শেরা বাজান পাড়িয়ে। অজ্ঞ ইংরেজ মিলিটারি পোশাক। চোখে কাল চশমা। হেলমেটটা চোপ পর্যন্ত নামানো।

শেরা। তিনজনেই প্রায় একমুখে চেঁচিয়ে উঠল।

সাইকেল তেঁলে শেরা বাজান এগিয়ে গেলেন। বাঁশের বেড়ার সাইকেলটা কাত করে রেখে ওদের মাফখানে গিয়ে বসলেন।

কাগজের খবর তো খুব শুভ শেরা। সারা বর্ষা এক-যোগে আক্রমণ শুরু করেছে।

তার চেয়েও সুখবর আমি বহন করে এনেছি লুন পে। শেরা বাজান অন্ন হাসলেন। সবলেই উৎসাহ দিয়ে চেয়ে বইল শেরা বাজানের বিকে।

আগামী ২৮শে অক্টোবর আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিব্রোহ ঘোষণা করব। আমাদের রাজ্যে অসুগত্য স্বীকার করব, বিদেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না। ওদের কর দেব না, ওদের আত্মসাৎ এতলাসে বিচারের আশ্রয় মাথা নোচু করে দাঁড়াব না। ৯ই তারিখ থেকে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন।

কিছু আমাদের রাজ্যের অসুগত্য ?

হ্যাঁ কদল, আমাদের রাজ্যে আমরাই ঠিক করব। এমন লোককে রাজ্য সিংহাসনে বসাবো যিনি এদেশের লোকের মনের সিংহাসনে বস্বহীন আগে থেকেই অবিরত আছেন।

তিনি কে শেয়া ?

এস করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও কদলের ঠোঁট এসে গিয়েছিল। তারা দেশের লোক থাকে 'কদা'ই সমান মনে করে, তাঁর একটি অঙ্গুষ্ঠী হেলনে হেঁদবাসীর কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়, শুধু একটি মুখের কথাই শত সহস্র যুবক সৈন্যদল শিখার ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে—এমন লোক এ দেশে একজনই আছেন, তিনি শেয়া বাজান।

তিনি, শেয়া বাজান একটু ইতঃপ্রভুত করলেন তারপর বীর কণ্ঠে বললেন, তাঁর নামের সঙ্গে যরতো। তোমাদের পরিচয় নেই, কারণ তাঁর নামকে তিনি কখনই লোকের সামনে তুলে বরতে চাননি। লোক চন্দ্রের অস্ত্রবলে থেকে তিনি কাঁচ করে গেছেন। চাষীর সঙ্গে মাঠে নেমেছেন, কুলীনের সঙ্গে নোট বয়েছেন পাশাপাশি, মজুতের মধ্যে বিশেষ কল চালিয়েছেন। এ দেশকে ঘেঁষেছেন অতিজ্ঞতা দিয়ে, এ দেশের চুৎসকে বসে করে নিয়েছেন, এ দেশের জালাকে তিল তিল করে পান করে দুত্বজ্ঞো হয়েছেন। তাঁর নাম শেয়া শান।

শেয়া শান ? তিনজনেই আশ্চর্য হয়ে গেল। বর্ধার স্বাধীনতার ইতিহাসে এ নাম অপরিচিত। কোথাও, কারো মুখে এ নাম উচ্চারিত হ'তে কেউ শোনে নি।

শেয়া বাজানের চোখ এড়াল না। তিনি নিঃশব্দ লক্ষ্য করলেন। তিনজনের চোখে মুখে বিশ্বস্তের স্মিতি।

তোমাদের তো আগেই বলেছি এ নামের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় নেই। তবে এটুকু জেনে রাখ যে

এবেশে যা কিছু ঘটছে সব কিছুই পিছনে তাঁর নির্দেশ রয়েছে। এখন কি আমিও তাঁরই আজ্ঞাবহ। আমার প্রতি কাজের মত তাঁর কাছেই কৈফিয়ত দিতে হয়।

তিনি কোথায় থাকেন শেয়া ?

বলা ভারি শক্ত। এ কাজে তারা ব্রতী তারা কে যে কোথায় কখন থাকে তা তারা নিজেরাই জানেন না। তোমাদের নিজেরের কথাই বরো না। আজ যেখানে আছে, কালও যে সেখানে থাকবে তার কোন স্থিরতা আছে ? সকালে যেখানে ছিল, বিকালেও যে সেখানেই থাকবে, এমন কথা কি কোর পলায়ন করতে পারো ? তাঁর অবস্থা তো আরো অনিশ্চিত। তবে একটা কথা জানি, যেখানেই যখন তিনি থাকুন না কেন, তৃণশয্যায় তাঁর শরন, ফলমূল ছাড়া অস্ত্র কিছু তিনি আহার করেন না, কোন বকম বিলাসবাসনে তাঁর অহুবাগ নেই। তাঁর প্রতিজ্ঞা যতদিন না দেশ স্বাধীন হয়, ততদিন চলেই এই ব্রজ সাধন।

অবাক বিশ্বরে সকলে শেয়া বাজানের মুখের দিকে চেয়ে রইল অপমক নেত্রে।

শেয়া বাজান গলা বাড়িয়ে ভোসেফকে ডাকলেন, ভোসেফ এক কাপ চা খাওয়াতে পারো ? ভেটায় গলা শুকিয়ে কাঠ, তাম্র ভগ্নর বিশেষ পোষাকটা খেদ পায়ে সুটছে। অনেকটা বেন কৈফিয়ত দেবার সুরে সকলের দিকে চেয়ে বললেন, এ পোষাকে সুবিধা অনেক আছে। এবেশ চোখে ধুলো দেওয়া যায় কিন্তু তেমনি আবার নিপলও কম নয়, পোষাক বেখে দুই থেকে কেউ হাত বোমা ছুঁড়ে মারলেই যতন।

কথা শেষ করে শেয়া বাজান লগ্নেই ঘেসে উঠলেন।

ভোসেফ চায়ের কাপ হাতে এগিয়ে এসে, তাঁর দিকে চেয়ে শেয়া বাজান লগ্নেই হাসলেন, পোছাঘাছ করে নাও ভোসেফ। তোমার সংসার এবার গোটাতে হবে।

ভোসেফ কোন উত্তর দিল না। শেয়া বাজানের দিকে এক বুটে চেয়ে রইল।

আমরা কাল এখন থেকে সবাই বওনা হব। কাল যাত্রা না করলে আটশ ত্রিংশের মধ্যে শেয়া শানের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারব না।

শেরা শানের কাছে? কমল আর লুপে আর এক মূকে টেঁচিয়ে উঠল।

বিজ্ঞাষ ঘোষণার দিন আমাদের থাকতে হবে বৈ কি। শায়া বর্ষা থেকে ঐতিমিত্রি এসে জড়ো হলে। এমন জুগোপ মানুষের জীবনে বার বার আসে না।

কয়েক পুস্তকও আদে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া, শেরা শানের সামনে ধাঁড়িয়ে আয়োজিতও লগ্ন কংগ্রেসে হলে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে।

একটু ভোর হতেই বাজা শুরু হ'ল। শেরা বাজান মিলিটারি পোষাক ছেড়ে আধ ময়লা এজি আর লুই জড়িয়ে নিলেন। কাঁচেরেঘের পোষাক। বনের মধ্যে তেমন ভয় নেই, কিন্তু একবার লোকাসনে পৌঁছালেই বিপদ। টহলদারী দৈন্ত ঘুরছে, একটু সন্দেহ হলেই ট্রিগার টিপতে বিধা করবে না।

জঙ্গলের শেষ প্রান্তে পৌঁছতে আরও সন্ধ্যা। শাকসব্জী বোঝাই একটা লরী রাস্তার ধারে অপেক্ষা করছিল। সকলে হাতড়ে হাতড়ে তার মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

তারপর একটানা চলা। বিজ্ঞাষ গতিতে। মাঝে মাঝে পথের পাশে দু'একজন পুলিশের সঙ্গে লাক্ষ্য হ'ল, কয়েকটা মিলিটারী। গাড়ী ধামিয়ে তারা টেঁচের বাড়ি ফেলল। কপি, আলু আর পেঁয়াজ চলেছে বস্তানন্দী হয়ে। দু'একজন ধমক দিল, আঙুল চালাতে। বাস, ওই পথ। পথে বড় বকনের বাধা আর তারা পেল না।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে লরী ধাক নিল। সোলা শড়ক ছেড়ে কাঁচা রাস্তায়। জুগোপ বসতির সার। চেহারা বেধে চাবাকুবার আঙুলি বলেই মনে হ'ল।

এসিয়ে অবাকীর্ণ একটা চালাঘরের সামনে লরী থামল। প্রথমে শেরা বাজান মামলেন তারপর ইসরাগার আর সবাইকে সামতে বললেন।

ভেতরের অবস্থা আরো মাঝাক। চামচিকে আর ইজুকের বাকব। কিন্তু গা ঢাকা দিয়ে থাকার পক্ষে স্বর্গ।

অসেসই খাবারের জোপাড় করল। কাছাকাছি কোনো ঘোকান থেকে ভাত আর সিমের বিচিভাল্লা নিয়ে

এল। সঙ্গে বোড়ের ভালনা। জুগোপের পক্ষে রাণকীর ব্যবস্থা।

সাতটা দিন বিশ্রাম। সন্ধ্যা হতে আবার বাজা শুরু। লরীটা এসিয়ে দিয়েছিল, সন্ধ্যার কোঁকে বাড়ীর সামনে এসে গাঁড়াল।

অহুমনে বোঝা পেল বড় কোন শহরের কাছাকাছি এসেছে লরী। রাস্তার দু'পাশে উজ্জল আলো। মিলিটারী দৈনিকদের তৎপরতা, কিছু পরিমাণ লোকের ভিড়।

এক সময়ে বড় শড়ক ছেড়ে লরী মাতিলীর্থ রাস্তায় ঢুকল। লোকের কোলাহল কম। আলোর দীপ্তিও ততটা ভোর নয়।

লরী থামল। অন্ধকারে কিছু দেখা পেল না, শুধু অস্পষ্ট একটা প্যাগোডার কাঠামো।

হাঁটু হুড়ে শেরা বাজান সিকো করলেন। অসুট কঠে বললেন, মিরামিন ডাউন্ড ইয়ো প্যাগোডা। এবেশের সন্ধান ইতিহাসে একদিন এর নাম বর্ণিকরে লেখা থাকবে।

শেরা বাজানের কথায় সকলেই উত্তীর্ণ কি দিল। আরতনে খুব বড় কিন্তু ঐতিহ্যের বিক দিয়ে ব্যাভনামা এমন মনে হ'ল না। বহু অনঃহরে, উপেক্ষার জবাবীর্ণ অবস্থা। থাকে থাকে পাথরদের দাকলী শোনা যাচ্ছে। কোথঃ আলোর সীপ চিরনামিত্ত নেই।

খুব সাবধানে সকলে নেমে গাঁড়াল। একটু পরেই অনেকগুলো বাড়ি দেখা গেল। প্যাগোডার অত্যন্ত থেকে কারা যেন এগিয়ে আসছে।

কাছে আসতেই দেখা গেল, অনেকগুলো ভিক্স, হাতে কেবোসিনের ডিবে।

মায়েরা শেরা।

মাঝারে। সকলে এসে পৌঁছেছে?

দুহের ঝাঁড়া তারা এসে গেছেন, কিন্তু প্রোথ, পেঙ, থাটন থেকে এখনও কেউ আগেন নি।

শেরা এসেছেন? শেরা বাজানের কঠে সন্মের স্বর।

না, তিনি আটশ তারিখ ভোরে বেধে হয় এসে পৌঁছবেন।

সীপ বাড়ির আলো। আলো বেগার বেগে অন্ধকারই

বেন বেই বাড়ায়। পা কেলে কেলে সবাই এগোতে শুরু করল।

সংসার অত্যাধিক পীড়িত ধনে ধনে পড়েছে। বুদো লতা উঠেছে ইঁটের কঁাকে কঁাকে। উঠানটা জাগলায় নতুন।

চব্বার পার হ'য়ে আবারো ভেতরে ঢুকতেই অনেকগুলো কঠোর গুহন শোনা গেল। দুই কঠোর কাহা বেন মন্ত্রাজ্ঞাপন করে চলেছে।

একটু এগোতেই নম্রো পড়ল। এখিকের প্রাথম জুড়ে সার সার অনেকগুলো নুদি বসেছে। সামনে খোলা বই। পালি ভাষার মূর করে বোঝানোর অনন্ত মহিমা কীর্তন করে চলেছে।

একেবারে কোণের ঘরে এসে সকলে থামল। বিরাট হল ঘর। নেকের উপর চাইই পাতা। চাব কোণে চাবটি ঘোরালা সঠিক।

সকলে বসতে শেরা বাজান ভিক্ষুটিকে কাছে ডাকলেন। নিচু মূরে বসলেন, সতীর মধ্যে কিছু কাটা তরকারী আছে, সেগুলো নামাবার বন্দোবস্ত কর।

লুন পে বেন ঘেঁষতে পেল কথগুলো বলায় সময় শেরা বাজানের দুর্তো চোখ চকচক করে উঠল।

সতীতে আগার সময়ই একটু সন্দেহ হ'য়েছিল। ওপরে কপি, পেঁয়াজের বস্তা থাকলেও নিচে যেন অস্ত্র জিনিস। এ পথে অহেতুক কৌতুহল অস্ত্রায়, তাই লুন পে কোন কথা ভিজালা করে নি, কিন্তু শেরা বাজানের কথা বলার স্তরীতে তার সন্দেহ বৃদ্ধ হল।

কিছুক্ষণ পরেই দুই খটা ধানি শোনা গেল। দুই অঘট স্তরী।

একজন ভিক্ষু এসে ঘরজার গোড়ায় দাঁড়াল, আপনাদের আহ্বারের বন্দোবস্ত হ'য়েছে।

অনেক অসিদ্ধ, চব্বার পার হ'য়ে সকলে বিরাট প্রাঙ্গণ এসে উপস্থিত হল।

সার সার আসন। অস্ত্রতঃ বেশ করেই ছাড়া।

কমল দুই লগায় লুন পেকে বসল, ঘেঁষেছেন, কত প্রতিনিধি এসেছে নানাদিক থেকে। আজ মাত্র ছাঙ্গিনে, এই দুইদিনে আরো কত আগবে।

লুন পে অস্বস্ত। তার কথা বলার সামর্থ্য নেই।

বাস্তব নয়, বেন ঘরের টুকরো। অর্ধ-অচেতন মনের সামনে বুদ্ধি নিজের অস্ত্রের গোপন কামনাই রূপ নিচ্ছে।

কীর্ণ পাঁজর প্রকট এক প্যাগোডা। বহু শতাব্দী ধরে একেশ্বর কৃষ্টিকে বহন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে। প্যাগোডার কোথাও বিগ্রহ নেই, অস্ত্রতঃ এখনও পবিত্র একটাও তার চোখে পড়ে নি। ব্যতির অধিকারে গা ঢাকা দিয়ে অস্বপিত মানুষ এলে ছুটেছে। হুগাতের আকাঙ্ক্ষা তাবের বৃক্ষে। এতদিনের সাধনা, এতদিনের প্রাণপাত প্রচেষ্টার মকলরূপ বর্শন মানসে বছরুর থেকে তারা এলে দাঁড়িয়েছে।

আত্মতানিক ভাবে বিবেচনার পরাধীনতার ইতি। পাছোড়ে, পর্বতে, নিরালা পল্লীপ্রান্তে যে যজ্ঞ শুরু হয়েছিল, যে যজ্ঞ এসেবের বহু প্রাণ আহুতি দেওয়া হয়েছিল, বহু অত্যাচার, বহু নিপীড়ন সহ করতে হয়েছিল, আজ সে যজ্ঞ-কল ভাগ করে দেওয়া হবে এ দেশের মানুষের মধ্যে। পরাধীনতার মানির বধনে, মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকার।

ঘটান লুন পের ঘর ভেঙে গেল। সামনে লোপ চর্চ, বর্ষকায় বৃদ্ধ এক ফুসী এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর দু পাশে দুই শিশু। তাঁকে ঘরে রয়েছেন।

চোখ বন্ধ করে বৃদ্ধ স্তোত্র পাঠ করলেন, তারপর চোখ খুলে বললেন, আমি এই বিহারে অধিনায়ক। আজ ঘটে বছরেরও ওপর এখানে বাস করছি, শিশুদের নিয়ে শাস্ত্রাশ্রয়না করছি, শুভাস্তের লীলা বোঝার চেষ্টা করছি। আজ আমি নিজেকে ব্রহ্ম মনে করছি। স্বাধীনতার প্রথম যোগ্য এই বিহার থেকে উচ্চাধিত হবে, এ দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে এই মঠের নাম লিখিত থাকবে। আমার মতন অস্বপিতের বৃদ্ধের কাছে এর মূল্য বে কতখানি তা হয় তো আপনারা বুঝতে পারবেন না।

আবেগে বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ধৈর্যে আবার তিনি বলতে শুরু করলেন, আত্মতানিক ভাবে যে যোগ্য এখানে হবে এ দেশদাসীর প্রত্যেকের তাকে নিঃসন্দেহে ছাড়িয়ে সম্রাতি আছে। অবশ্য যারা এদেশে অস্বপিত করেও বিবেচনা ভাববার পুষ্টি, বিবেচনার রঙে নিজেরের রঙীন পুঙ্খল করে তোলে, বিবেচনের দ্বারা

একমাত্র জ্ঞাপকতা যেন করে তাদের আমি এ বেশখানী বলে গণ্য করি না। তারা এ বেশের শত্রু। বাদশাহর এই সব শত্রুদের সম্মুখীন আমাদের হ'তে হবে, যা'র সাহায্যে বৃত্তি গ্রহণ করেছে। অস্ত্রের আশ্রয়, মহারথ বস্ত্রের সোডে গুলুচবের কাজ করেছে। আমাদের সংসার ওদের শিখিরে ঘিরে আসছে। বেশে বেশে যুগে যুগে তিরদিন এই সব গুলুচবের অস্তিত্ব থাকে। এ বেশে স্বাধীন রাজা বিবকে মাটির ধূলোর নামিয়ে আনতে এরাই সাহায্য করেছে, রাণী সুপারিলাকে লোককে ঘের প্রতিপন্ন করার মূলে এরাই ছিল। বিদেশীদের চেয়েও এরা ভয়ানক, কারণ তাইয়ের মুখোশ পরে এরা কাছে আসে। নির্মম হাতে এদের উচ্ছেদ সাধন করতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বরা নেই, যাত্রা নেই, ক্ষমাও নেই।

আবার বৃদ্ধ বটী জানি। আবেশে চোখ বন্ধ করে মুন পে শুভছিল হঠাৎ চোখ খুলে দেখল সামনে কেউ নেই। অস্বীকৃতির বৃদ্ধ ভিক্ষুও নয়, তার পার্শ্বচরিতাও না।

একটা বম্বধমে নিশ্চলতা। সকলে বসে পড়ল।

শেয়া বাজান খুব আস্তে বললেন, ইনি সুদী উ উগানিকা। বিখ্যাত পণ্ডিত।

আটাশে অক্টোবর, ১৯৩০ সাল।

খুব ভোরে কমল আর মুন পের ঘুম ভেঙে গেল। তখনো আবছা অন্ধকার রয়েছে। ছ' একটা পাখীর ডাক ভেসে আসছে পাতার আড়াল থেকে। বৃদ্ধ শুভ্রন। খুব দীর্ঘ উদাস্ত কর্তে কাছে কোথায় স্তোত্র পাঠ হচ্ছে। অনেকগুলো লোকের চলার শব্দ।

প্রথমে উঠে বসল মুন পে। জানলার ভাঙা গরায়ের মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েই অস্বাভাবিক হয়ে গেল।

ঘলে ঘলে বৌদ্ধ প্রদেবরা নতুন কলনীতে ধল ভরে আনছে। তাদের সঙ্গে নতুন গৈরিক বাস।

হাত দিয়ে ঠোলা দিতেই কমল উঠে বসল।

কি ব্যাপার ?

বাইরে চেয়ে দেখুন না। নতুন দিন শুভ্র হয়েছে। এ বেশের নবজীবন। কমল এবিক ওদিক চেয়ে দেখল

শেয়া বাজান নেই। কখন উঠে বাইরে চলে গেছেন। চটাইয়ের ওপর ইতস্ততঃ কয়েকজন শুধে রয়েছে।

চলুন বাইরে যাই। মুন পে উঠে দাঁড়াল। দুজনে চলে এগে দাঁড়াল। সারাজির্গ প্যাগোডার নতুন সাজ। অনেকটা বুদ্ধের সৌন্দর্য প্রাপ্তির সামিল। বরজার মাথার মাথায় বটীম কাশ:জ্বর শিকল। বেগালের ঠাঁকে ঠাঁকে কাগজের নিশান। চৌকাঠের ছু পাশে সোনালী রঙের ছাতা গোঁজা। কোথাও জাওয়ার চিহ্ন মাত্র নেই। প্রাঙ্গণে সবুজ জড়িত পাভা। প্যাগোডার ধামে ধামে মূল্যবান স্ট্রেসে রাখানো ছবি।

কাছে গিয়ে কমল আর মুন পে দেখল।

হাতে আঁকা ছবি। যোগিস্থের জয়, বুদ্ধসম্মত, মহা পতিনির্বাণ, বারের প্রলোভন প্রভৃতি বিখ্যাত ছবি। এ ছাড়া এ পাশে অস্ত্র ছবিও রয়েছে। অলং করা, মিন ডন মিন, চাম নিটার রাজ্যভিত্তিক। একেবারে কোণের ছবির কাছে গিয়ে দুজনে দাঁড়াল। দ্বিধার রাজসভা। পাত্র নিত্র সভাসদ নিয়ে রাজা আদীন। এক কোণে টুপি হাতে নতমস্তকে বিধেয়ী বণিক। যোগে বয় বাণিজ্যিক অর্থ সুবিধার আবেদন নিয়ে এসেছে চতুর ইয়োর। ছু চোখে সাম্রাজ্যের সিংহ। মহাপুত্রবতার স্বযোগ নিয়ে তিল তিল করে নিজের অতিসম্মিত আস বিস্তার করেছে। সুক্লিগত করেছে সারা দেশের মাটি, কিন্তু দেশের লোকদের অত সহজে করাচি করতে পারে নি। দেশের লোকের যে বশীভূত করতে পারে নি, আজকের দিনই তার অসম্পন্ন প্রমাণ।

শেয়া।

আগস্টে দুজনেই ফিরে দেখল। কমল আর মুন পে।

একজন অশ্রম কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রসারিত হাতে এক ছোড়া সবুজ লুঙ্গী।

জান: করে এগুলো পাবে মিন। একটু পরেই উৎসব আরম্ভ হবে।

মুন পে জিজ্ঞাসা করল, শেয়া বাজান কোথায় বলতে পারেন ?

অন্যটি মাথা নাড়ল, না, এত ভিড়ের মধ্যে কান্নার
বোঁজ বেওয়া সম্ভব নয়।

ক্যুয়েতলার গিয়ে দুজনেই অগতঃ। সার সার লোক
বসেছে। জন ঘনেক সুকী মস্তোজারণ করছে, সেই সঙ্গে
চলেছে জল ঢালায় পর্য্য।

মান শেষ করে সকলে উঠে দাঁড়াল। ভিজে লুণী
ছেড়ে নতুন লুণী পরল। সবুজ রংয়ের। এ বেশের
জাতীয় হয়।

ঘটাপনি শুরু হয়েছে। ময়পাঠ আছে। জোর।
বাইরে অনেকগুলো গাড়ীর ক্যাচকীচ শব্দ। বোঝ হয়
আবো প্রতিনিধিরা এগে পৌঁছেলেন।

লুন পে কমল বোসের কানে কানে কথাটা বলল,
আমি তো দেখা শানের এগে পৌঁছবার কথা?

কমল ষাড় নাড়ল।

চলুন বাইরে গিয়ে একবার দেখার চেষ্টা করি।
তাকে দেখতে বড় কৌতূহল হচ্ছে। বিবর পরবর্তী
মুপতি শেরা শান, মাকশানের কালি মাথা ইতিহাসের
অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি না।

অলিফ, চব্বর, অজুন পাব হয়ে দুজনে বাইরে এগে
দাঁড়াল।

আচ্চর্ষ, বাইরে উৎসবের কোন চিহ্ন নেই। ধপে পড়া
পাঁচিল, শেওলা ধরা মেয়ে, অপরিস্রব প্রাঙ্গণ। কেবল
মাঝে টট চাক। কয়েকটা গরুর গাড়ী এগে দাঁড়াচ্ছে। তার
মধ্য থেকে ধলে ধলে প্রতিনিধি ভিতরে ঢুকছে।

কি ব্যাপার? লুন পে কমল বোসের দিকে চোখ
ফেরাল।

বোধ হয় পথের ওপর কোন চিহ্ন রাখতে চায় না, কি
জানি টেলিফোনি কোন দৈত্যের ঘনি মজরে পড়ে যায়।

কিন্তু এতো একান্তভাবে বিব্রোহ বোধণ। ওদের
মুখোমুখি আমরা দাঁড়াই সশীল উঁচু করে।

তা হয়তো দাঁড়ায়, কিন্তু সে বিব্রোহ শোষণার পর,
স্বাধীনতা শোষণার পর। তার আগে শাদকরের নেক
মজরে পড়ে সব আয়োজন নষ্ট করা বোকাখোর পবিচর।

দুজনে কিংবে এল; চলতে চলতেই লুন পে জিজ্ঞাসা

করল, আমকে ষাওয়া-বাওয়ার ব্যবহার কি হবে। এত
বেলা হল, অবধ এ বিষয়ে কেউ কোন বোঁজ নিচ্ছে না।

পাশ দিয়ে এক শ্রমণ লুণির বস্তা নিয়ে যাচ্ছিল, লুন
পের কথাটা কানে পেতেই দাঁড়িয়ে পড়ে বেগে বলল, আম
উপাশ। উৎসব শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্ন গ্রহণ নিষেধ।

আব ঘটাব বেনী নয়। হঠাৎ একমগ্নে প্যাগোডার
শব্দটা বাজতে শুরু করল। আশ-পাশের সবাই সংচতন
হয়ে উঠল। ভিকুয়া শার বৈগে দাঁড়াল ছ'পাশে।
অত্যাগতদের দিকে চেরে বলল, সময় হয়েছে, আপনারা
আমাদের অনুসরণ করুন।

লুন পে আর কমল দুজনেই চলতে আরম্ভ করল।
বিরাট জনতা। এদিক-ওদিকের ঘর থেকে ধলে ধলে
লোকেরা ঘেরিয়ে এল। একমগ্নে পা ধলে চলতে শুরু
করল।

অনেকগুলো অলিফ আর চব্বর পাব হয়ে সংকীর্ণ
মুড়কের মুখে গিয়ে দাঁড়াল সবাই। ছ'পাশে জ্বালামীর্ণ
বেওয়ার। অনেকগুলো মোমবাতি জলছে, কিন্তু তাত্তেও
অন্ধকার বিশেষ দূর হয়নি।

কমল কথা বলল, প্যাগোডা যে শুধু উপাসনাস্থল
হিসাবেই ব্যবহার হত না, এইসব সংকীর্ণ পথই তার
প্রমাণ। শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য এগুলো
দুর্গ হিসাবে খুব কার্যকরী ছিল। শোয়ে ভাগন প্যাগোডার
বিখ্যাত মুড়কের কথা নিশ্চয় জানেন লুন পে?

ষাড় নেড়ে উত্তর দিতে গিয়েই লুন পে বেগে গেল।

সামনে অব্যাহিত প্রাঙ্গণ। বহুদূর বিস্তৃত। মাটির
ওপর ছোট ছোট আসন। ইতিমধ্যেই প্রচুর লোক
সেখানে দাঁড়িয়ে হয়েছে। কেউ দাঁড়িয়ে জটলা করছে,
কেউ কেউ আসন গ্রহণ করেছে। একবারে ওপাশে
বিরাট মঞ্চ। নকটি প্যাগোডার চাতালের সঙ্গে সংলগ্ন।
আর একটু এগোতেই নজরে পড়ল।

বিরাট বৃহৎ মূর্তি। আরত ছটি চোখে অণার করুণা,
অবরোতে চাপা হাস। একটি হাতে ব্রহ্মাচারের সংকেত।
কিন্তু একি! আর একটি হাত। বাম হাত নিশ্চিহ্ন,
বাম অঙ্গেরও কোন আভাস নেই। মনে হয় বেন কামানের

পোলায় বিগ্রহের একটা দিক চূর্ণবিচূর্ণ। পূর্ব নৃতি নয়, ভয়াশেষ।

একি, এ তাবে এ নৃতি কে ধ্বংস করল! যবের সাবধানতা সত্ত্বেও লুন পের গম্বার আক্রমণ বেশ জোর।

লুন পের কথা কানে ধোতাই এগরে ওখারে ঠাঁড়ান অনেকেই লুন পের বিংক মুখ ফিরিয়ে দেখল। এ প্রহর যেন তাবের মনকেও বিচলিত করেছিল, কিন্তু উত্তর মেলেনি।

একসময়ে সকলে বলল। মকের ওপর একটু ব্যস্ততা। করেকজন কর্মী আসন নিয়ে ছুটছুটি শুরু করল। করেকজন মিলে বিয়াট এক পতাকা এনে রাখল। পাচ সবুজ রঙের পতাকা। ময়ূর-সাহিত্য।

কুড়নিমাণে সকলে চেয়ে বইল মকের বিংক।

শেয়া বাজান এলেন, মকে আরো জন তিনেক। শেয়া বাজানের পরশে বড়ান 'পাশো', অর্থে মর্যাদা এত্রি, মাঝার বহুদল্য বস্ত্রের 'পাউং বাউং'। অস্ত্রাস্ত্রের পরিচ্ছন্ন ও স্বামী।

সমসা ভেঁপু ব শব্দ। জনতা উঠে ঠাঁড়াল। মকের ওপর নাতিবীর্ষ একটি নৃতি। অর্থে পৈত্রিক এত্রি, সবুজ সুদী, হাতে উজ্জ্বল তরবারি। শাস্ত সাধারণ চেহারা, কিন্তু ছুটি চোখে উজ্জ্বল দীপ্তি। বদ্বার আসে সমস্ত জনতার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। হাত জুঁল বপতে বললেন জনতাকে।

সবশেষে প্রবেশ করলেন বৃদ্ধ সুদী উ উগ্রাশিতা। কুস্ত্রাক্ষর মালা হাতে জড়িয়ে দলপাচরূপ করলেন। আশীর্বাদ করলেন মকে উপবিত্ত জননায়কদের।

এবার উঠলেন শেয়া বাজান। দুটু অকল্মিতবার বললেন, এখন এরেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন স্বাধীন মিয়মার একচ্ছত্র সম্রাট শেয়া শান।

জনতার মধ্যে একটা শুঙ্কন। অনেকে মাথা উঁচু করে ঘোঁরা চেষ্টা করল। অনেকে পা মুড়ে নিকো করল, অনেকে শুধু কুতাবলিখুটে নিভ্রঙ্ক হয়ে বসে বইল।

নাতিবীর্ষ নৃতিটি উঠে ঠাঁড়ালেন। এগিয়ে এলেন মকের সামনে।

জলদগম্বীর কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন।

স্বাধীন দেশের নাগরিকগণ, আজ এক মহাসম্মিলনে আমরা মিলিত হয়েছি। সারা দেশ আজ এক প্রতিজ্ঞা পাশে আনছে। বিদেশী শাসনে আমাদের আত্মা নেই, বিদেশী শাসক আমাদের চোখে শুধু পরদাপতারা বস্তু। শুধু দেশকেই শোষণ করে নি, দেশবাসীকে বিবীর্ষ করেছে, তাবের চেতনাকে করেছে নিপেষণ তাবের অত্যাচার সম্বাস্ত্রির সীমা পাবে হয়েছে। আজ কৃষক কল্যাবে নিপীড়িত, তার প্রবলত্ব শস্তের তিন ভাগ রাগের মেটোতে যায়, বাকি একভাগ যায় রাগপুত্রবধের কুটীপাশনে, মধ্যবিত্ত আজ পদ, বিকলাঙ্গ। বিদেশীশাসনা-নীতি তাবের সর্বনাশ করেছে। তাবের সম্মান আজ মিলের মজুত, খেয়াঘাটের মাঝি, হরিজ মসীর্গে। এদেশের শাসনতন্ত্র এমনভাবে তৈরী হয়েছে যে স্বাধীনচেতা কোন বর্মীর পক্ষে দেখানো প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। এদেশ শাসন করছে সাধারণতাবের বোঝীরা আর তাবের পাশে বসিয়েছে তাবেরই অশুভ্রহণুট এমন এক বলকে—যাৎব চিত্রা, ভাবধারা সবই ওদেশমুখী, তারা এ দেশের স্বাভাবিক অস্বীকার করতে পারেনিই সুখী। তাবের একমাত্র কর্তব্য বিদেশীর মনোভুটি করা, এই সারদের-মূলত প্রবৃত্তি নিয়ে তারা এ দেশের কোনদিন মঙ্গল করবে এ কথা মনে করতেই বাতুলতা।

একসময়ে এ দেশের লোকের ধারণা ছিল ইংরাজ অধেষ, অমর। দেশ শাসন করতেই তাবের জন্ম। তাবের বিরুদ্ধে বিরোধ করা মূর্থতা। ফগার কল্যাণে এ চিত্রা আজ দূরীভূত। ইংরেজ যে অমর নয় তার বহু প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তাবের হান্ধিকৃত শরণানিহি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তারা যে অধেষ নয়, তাও শ্রী প্রমাণিত হবে।

একটু থেমে শেয়া শান পাশে বসে একজন ভিক্তকে ইদিত করলেন। ভিক্ত গোটাটো একটি কাগজ তাঁর হাতে ছিল।

শেয়া শান গোটাটো কাগজটি খোলা মাত্র সমস্ত জনতা টান হয়ে ঠাঁড়াল। শেয়া শানের হুঁপাশে মিসিটারী পোশাকে সম্মিত দুজন। কোমরে পিঙ্কল। মাথার হেলমেট খুলে দুহাতের মধ্যে নিল।

শেয়া শান কাগজের হিংস্র চেয়ে ভূত গল্লের উচ্চারণ করলেন।

আরাকান-পেঙ্গ-পাংমাং পর্বতমালা বেষ্টিত, ইয়াবতী-সিটাং-সামুইন বার মেঘলা ত্রপিনী, পদতলচূড়িত অতল নীলাশু, তবাগতর কাঁতি বিধোষিত পক্ষেতুনি, শান-কেয়েন-মংতেং অপ্রাণিত বিরাট ভূগর্ভ কালের চূর্ণর অপ্রিয়ণে কুটনৈতিক অত্যচোরাট হীন-কোণাল এতদিন পরাবীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। এতদিনে অবশ্যম বল তার অবদানকার। আজ আটশে ডিসেম্বর উনিশ শো ত্রিশ সালের এই পূত মুহূর্তে আমাংয়ের সকলের সম্মিলিত হাবীতে এ দেশের প্রতিপূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষিত হল। এই মুহূর্ত থেকে আমরা আর আমাংয়ের দেহ বা আত্মা শততানক বিক্রী করব না, এ দেশকে অতীত ধোঁবে নহিময় করে তুলব, পিতৃপুরুষের পবিত্র স্বত্ব-চিহ্নিত এই দেশকে কলঙ্কযুক্ত রাখতে আদ্যদের শেষ বক্তব্যশু পর্যন্ত ক্ষয় করব।

ঘনতার মণ থেকে চিংকার উঠল, ডো বামা, ডো বামা। বাগ ভাড়া সমুদ্রের কল্লোল দেখানিতে।

শেয়া শান মতে ধাঁড়ানেন। বিকলাঙ্গ মুচ্ছ মূর্তির হিংস্র আজুল দেখিয়ে বললেন, এ মূর্তি একদিন পূর্ণাঙ্গ ছিল। বিদেশী শাসক হুঙ্কারে ভাঙনোতি মন পরিহার করে প্যাংগোডা পর্বত আক্রমণ করেছিল। কামাংয়ের গোলায় বিলম্ব করেছিল দেশের উপায় দেবতাকে। তবাগত আজ অবশ্যম। মানবতা আর দেবতাস্থা ছুইই নিপীড়িত। এই বিকলাঙ্গ মূর্তি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, এ দেশের প্রত্যেকটি মানুষ জীবিত থাকে পর্যন্ত এ অপমানের প্রতিশোধ আমরা দেবই। ততদিন এ মূর্তি এইভাবেই থাকবে বিদেশীর হীন আক্রমণের প্রত্যাক বিপাবে, তার নৃশংসতা, জাত্যব প্রকৃতির অংশটুকু হিমাংবে।

হাঁটু মুড় শেয়া শান মূর্তির পায়স্পর্শ করলেন।

তবল আর যেন ছড়িয়ে পড়ল ঘনতার মধ্যে। বিকোভে চকল হয়ে উঠল সবাই।

লুন পেংও জান নেই। ঘনতার সঙ্গে গুর মিলিয়ে চিংকার করে উঠল, অপমানের প্রতিশোধ চাই। বিদেশীর রক্তে এদেশের পরাবীনতার পাপঅঙ্গন হবে। সোমার বর্ষা আমাংয়ের হবে। ডো বামা।



গৌরমোহন

(৭৪)

প্রান্তান্ত মেঘসরকার

গৌরমোহনের সঙ্গে আর কোনকালে সাক্ষাৎ হবার কথা ছিল না। গৌরমোহন প্রশান্তর আত্মীয় না, বন্ধুও না। কোনকালে সহপাঠী ছিল।

তবু প্রশান্ত রাস্তার মাঝখানে ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছন ফিরে তাকিয়ে অবাক হল। সত্যিই সোচ্চকিত তাকে ডাকছে কিনা সন্দেহ হল, এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে আর কাউকে উদ্বেষ্ট কিনা ডাকটায়। চিনতে যেবি হল।

না, গৌরমোহন প্রশান্তকেই ডাকছে। তার কাছে এসিয়ে আসছে। প্রশান্ত নাকোচ বোধ করলে। হাতের ঘড়ি ঘুরিয়ে দেখলে সময়ও নেই আলাপ করবার। অকিপের সময় কাটায়-কাটায়।

গৌরমোহন সবল মূরে বললে, “অনেক কাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল! তারপর কেমন আছ?”

বেন দেখা হওয়ারটা উভয়ের অতিশ্রুতি ছিল। না-হওয়ারটা ক্ষোভের। প্রশান্ত আড়ষ্ট কর্তে বললে, “ভাল!”

গৌরমোহন কোনদিন তার এত অন্তরঙ্গ ছিল না যে, কাঁধে হাত দিয়ে আলাপ করবে, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বন্ধু দেখাবে। গৌরমোহনের অতিশয় বড়লোক ছিল। গাড়ি করে তখনই স্থলে আসত যে রাস্তার একধার থেকে প্রশান্ত আসত হেঁটে। গৌরমোহনকে ক্রাসে বেঁধেছে, গাড়িতে বেঁধেছে, বাড়িতে বেঁধেছে, কিন্তু কোনকালে মৌখিক আলাপ হয়নি প্রশান্তর সঙ্গে। সাধারণ অবস্থার মাঝারি ছেলে প্রশান্ত কোন দিন গৌরমোহনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি, কিন্তু প্রশান্তর দৃষ্টি গৌরমোহনের প্রতি আকৃষ্ট ছিল বরাবরই। গৌরমোহন সুন্দর, মগ্নতিত, সাধারণের চেয়ে মাগে অনেক বড়, তার উপর বড়লোক। সহপাঠীদের অনেকে গৌরমোহনের অহংকৃত ছিল।

হয়ত ততটা সৌন্দর্য আর নেই, কিন্তু মাগে আরও অনেকটা বড় হয়ে গেছে গৌরমোহন—হুটুবেঙ ওপর।

প্রশান্ত পাঁচ মূট ডিন ইকি! গাফোটা আরো বেন সেই গড়ে। অসমতা।

কাঁধের ওপর গৌরমোহনের হাতটা বড় তার মনে হয় প্রশান্তর। বড় অবহতি!

গৌরমোহন জিজ্ঞেস করলে, “কোবার বাজ? অফিস?” প্রশান্তর কাঁচপোকায় তেলপোকা বরাব মত অবস্থা। মাথা নাড়লে প্রশান্ত।

গৌরমোহন জিজ্ঞেস করলে, “কোন অফিস?” প্রশান্ত অকিপের নাম বললে। তাতেও নিবৃত্ত হয় না গৌরমোহন। আবার প্রশ্ন করলে, “দেখানে কি কর? অফিসার?”

প্রশান্ত তত্ত্বতা দিল্লু, অকিপের নামই ধরেই! এতটা কৌতুহল অশিষ্ট। বড়লোক গৌরমোহনেরা বোধ হয় ধার ধারে না সাধারণ শ্রমজীবীর।

প্রশান্ত উত্তর দিলে না। কাঁধে তার নিয়ে হাঁটতে লাগল।

গৌরমোহন নিজের মনে বললে, “কোট-প্যান্ট পরনি কেন? হুতী-পাঞ্জাবী মানার না!”

কথা বাড়াবার ইচ্ছে না থাকলেও প্রশান্ত বললে, “কেন?”

গৌরমোহন বললে, “অফিসার কেয়ারানার তত্ত্বাৎ থাক চাই!”

প্রশান্ত বললে, “বহু কেদানী আজকাল প্যান্ট পরে!”

গৌরমোহন বললে, “সে দেখলেই চেনা যায়। প্যান্টেও তত্ত্বাৎ আছে। না, না, তুনি প্যান্ট পোহো!”

এতদিন বেন কেউ পরতে বলেনি বলে পরা হয়নি, গৌরমোহন বললে বলেই কোট-প্যান্ট পরা হবে। প্রশান্ত বেন রাজী হয়ে গেছে।

গৌরমোহন বললে, “ভারতবর্ষের সব আয়সায় মূরে

যেখি, কোট-প্যাণ্টের ইচ্ছাই জালাবা! আজকাল দিল্লীতে বড় বড় কারাগার তুমি চুকেই পাবে না গো থাক না বললো। যে কাছেই যাও খুতী-পাজারী তোমার অর্ধেক মাটি করে দেবে। আমি অনেক যেখি, বড় বড় শহরের অফিস-আফালতে ঘুরে যেখি।

প্রশান্ত বললে, “আমাদের অফিস এখন নয়। খুতী-পাজারীর অনাবদ নেই। যে খুশী পরতে পারে। কত আই-সি-এস অফিসার পরছেন!”

গৌরমোহন যেন এই কথার অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে সঙ্গে বললে, “বাঙালীর সেই জন্তে উগ্রতি নেই—এখনো বরো!”

উগ্রতির কথা বলতে কি বোঝার গৌরমোহন সেই জানে; কিন্তু চাকরিতে যবার ব্যাপারে ইচ্ছাটা খুবই স্পষ্ট। চাকরির ক্ষেত্রে বাঙালী গোবর গণেশ, ভাল মানুষ! যেখানে আরম্ভ করে সেইখানেই থাকে চিরকাল! কিন্তু তার কাবগটা যে কোট-প্যাণ্ট প্রশান্ত এই প্রথম শুনলে। গৌরমোহন অনেক বার তাগে গোধর।

প্রশান্ত সন্ধ্যা ভাবে বললে, “তা নয় ঠিক!”

গৌরমোহন বেন মরিচা হ’য়ে উঠেছে বাঙালীর আন্ত-বিশ্বস্তির জন্তে, বললে—তা নয় তো কি! মাস্তুলী, পাজারীঘের যেখা না কি রকম উগ্রতি করছে। মনে কর তরা তোমাদের চেয়ে কাগের লোক? সব জানা আছে।

প্রশান্তর সন্দেহ হয় গৌরমোহন কি চাকরি করে? না হলে এত ওরাকিবহাল হলো কি করে? চাকরির গোলি-বুঁজি-সহ-বাঙা জেনে বলে আছে।

এতক্ষণে প্রশান্ত জিজ্ঞাস করলে, “আপনি কোথায় চাকরি করেন?”

গৌরমোহন বললে, “কোথাও না। চাকরি আমার বরো যোগাতে পারবে?”

সে-কথা সত্য। গৌরমোহনেরা চাকরি করতে যাবে কোন দুঃখে। কলকাতার বাবের পাঁচখানা বাড়ী, একটা চলে বাতাস, দুখান; বন্দকী কারবার তার চাকরি করবে! প্রশান্ত অপ্রস্তুত বোধ করে।

গৌরমোহন হেসে বললে, “চাকরি না করলেও তোমাদের চাকরির সব বস্তু রাবি যে। বল না ব্রিটিশ আমল থেকে

আজ পর্যন্ত চাকরির আবি-অন্ত বলে দিই! গ্রেডেশান, মেক-আপ, কি চাও?”

প্রশান্ত অদ্বায় তাগে বাড়ি বুন দেখলে। আদ নিবাং লেট!

গৌরমোহন বললে, “না না, কারো কথা শুনা না। প্যাণ্ট পরা আরম্ভ করা, বড় ক্রমেই তোমার খুতী-পাজারী! সেক্ষেপেট ভাপ ক’রতে হবে। অফিস যাও না, নেমতগ্রাভি বাড?”

প্রশান্ত মাথা নাড়লে, তথ্য। তবুও গৌরমোহন ছাড়ে না। যেন বেছে বেছে আদ তাকে ধরছে। অধঃপতিত চাকুরি বাঙালী সন্থে তাকে সাবধান করে দেবে। চাকরিতে উগ্রতির কোল নিখিরে বেবে। ছেলেবেলার সহপাঠী প্রশান্ত, ধরতে গেলে বহু।

গৌরমোহন বললে, “আমাদের কি বোধ জান, আমরা সত্যি যা তা জানতে লক্ষ্য পাই। মোটেই আমরা নিজেদের এ্যাসার্ট করতে জানি না। দিল্লীতে আমি যেখি, কত লেদ কেলিবারের লোক হোমরা-চোমরা হ’য়ে বলে আছে। অপরাধ লোকগুলো দিবি করে থাকে। আর বাঙালী কি করছে? ভালমানুষ লেদে স্বপ্ন আর স্বভাবের নিশা করছে। একটা চাকরির জন্তে গিরেছিলাম একজনের জন্তে—মিঃ সেন বলে একজনকে ধরছিলাম—তিনি তো তগে কাটা হয়ে গেলেন। ওরে বাবা, বাঙালীর চাকরি! নিজে চাকরিটাও যাবে। অথচ গোটা সাউথ আর বর্ধ মিলে দিল্লী পেডেটারিয়েট ভাগা-ভাগি করে নিয়েছে। আর কারো ট্যাং-ক’রতে হবে না।”

বাবীনতা লাভের পর সর্বত্র এই ধরনের কথাবার্তার প্রতিক্রিয়া শোনা যাচ্ছে আজকাল। ভাল-মন্দ প্রশান্ত বোকে না। স্পষ্টই স্রুতিকটু, যতই মুখরোচক হোক। তা ছাড়া দিল্লীতে চাকরি ক’রতে যাবার তার কোন সম্ভাবনা নেই। বাংলা দেশে জন্ম কেটে বাবে চাকরিতে। দিল্লীর বিকে মুখ করে পাল পেড়ে লাভ নেই।

গৌরমোহন বললে, “আমি চাকরি করলে দেখিরে দিছুম, কাকে চাকরি বলে। যত সব নারীমুখা হ’য়েচে!”

সাদা ধিয়ে প্রশান্ত বললে, “আপনারা চাকরি করলে ভাল হ’তো সত্যি! করুন না একটা চাকরি!”

নিমগ্নাঙ্গী হ'য়ে গৌরমোহন বললে, “করবো, তার চেষ্টা করছি। কেরানীপিরি নদ, ইক্সিনিয়ারিং।”

গৌরমোহন বড় না, আত্মীয়, না। তবু বয়সে কালে গৌরমোহনের সংগ্রহে প্রশান্ত পেল। বহুকাল একপাড়া ছিল তার। কলেজে পড়া শোনার শেষ পর্যন্ত। গৌরমোহন অভিনায়ী হি-এ। তাও বার দুয়েকে পাশ করেছে, তার আন্তরিকতার বাড়ির সঙ্গে মেলামেলা ছিল। সেই গৌরমোহন ইক্সিনিয়ারিং করবে কি করে? কে জানে পড়াশালা থাকলে বৃত্তি সব সম্ভব হয় আদ্যকাল।

গৌরমোহন বললে, “পড়াশোনা করছি। আর্টসের কোন ধান নেই।”

প্রশান্ত মাথা নাড়লে। সত্যিই তারা খুব ভুল করেছিল সাধারণ ভাবে লেখাপড়া শিখে। যুগের সঙ্গে বাপ খায় না। গৌরমোহনের কল্পনার বৈশিষ্ট্য আছে। চেষ্টা করলে গৌরমোহনরা কিছু করতে পারে। বাঙালীর লজ্জা চাকরির ঢাকা ঘুরিয়ে দিতে পারে।

ঝেরাটা যেন এখনই হলো। রাতটা অফিস-পজালিকা বুঝি নয়, গৌরমোহন বললে, “জুনি এই দিক দিয়ে অফিস যাও নাকি! কি করে?”

প্রশান্ত বললে, “হেঁটে ঘাই উত্তরার্ধ কোর্টের মধ্যে দিয়ে। বড় মেসী হয়ে গেছে ঠিক সময় পৌঁছতে পারবো না।”

ইক্সিউটা গৌরমোহন ধবতে পারলে না। নিবেশ কথার মত হ'য়ে রইল। বললে, “হেঁটে যাও, তা হ'লে খুব কাছে বল তোমার অফিস।”

প্রশান্ত বললে, “খুব কাছে নয়—ট্রায়ে বাসে স্রবিরে হয় না, সেই হাঁটতেই হয় অনেকটা। কালেই বাকিটা হেঁটে পুরন করি। একদিক থেকে বাঁচোরা, টেলিফোন জটোজটো নেই।”

গৌরমোহন বললে, “ওল, তোমার সঙ্গে এক সঙ্গে ঘাই।”

এবার প্রশান্ত মনে মনে প্রমাণ গনলে, মনে করেছিল অফিসের নাম করে বেড়াই পাবে। গৌরমোহনের সঙ্গে একসঙ্গে হাঁটার অর্থটি হুঁতবে। উৎপাত না হ'লেও সঙ্গী হিসাবে গৌরমোহন এগরর অভিজ্ঞত নয়। আরো

গৌরমোহন যেন কল্পনাভীত ব্যাখ্যা করছে। এই উপবাচক সম্ভা। এক প্রকার পীড়নের নানাত্ব।

প্রশান্তর অনেক কথা মনে পড়তে লাগল গৌরমোহনের সম্বন্ধে। পাড়ার মধ্যে বিশিষ্ট ধনী। বাড়ির সামনে অষ্টপ্রহর গাড়ি থোড়ার ডিড় লেগে থাকত, গেটের ভিতর দু'জন রক্ষী বন্দুক হাতে গাড়িরে থাকত, নেকড়ের মত বড় কুকুরটা আর সময় চেষ্টা! গৌরমোহনের বাড়ির সবাই বেশ সুন্দর দেখতে। আগতে যেতে কতবার উঁকি দিয়ে প্রশান্ত দেখেছে—ঠাণ্ডা দিহাতের স্নানকের মত উপরের কোন জানালায় কি বাহ্যিক্য গৌরমোহনের বাড়ির মেয়েদের দেখা পেল। বাড়ি এসে প্রশান্তর মন খারাপ হয়ে যেত—তারের বাড়ির সবাই তেমন সুন্দর নয় কেন। প্রশান্ত নিজেই বড় কালো। গৌরমোহনের বাড়ির কুকুর-বেড়াটা পর্যন্ত কত সুন্দর! একটা নদজোচ সমীহ বোধ করত প্রশান্তর গৌরমোহনেরে দেখে।

ছেলেবেলার সে মনোভাবটা বৃত্তি আরো আছে প্রশান্তর। কিছুতেই বদল হতে পারে না। এককালে পরে গৌরমোহন দেখে তার সঙ্গে আলাপ করেছে, যেতে তার মন নিয়েছে। মনে মনে কোথায় যেন একটু সাধা বোধ করে প্রশান্ত এতদিনের একটা গোপন বাসনা যেন চরিতার্থ হ'ল। তবুও—

প্রশান্ত ভিজেন করলে, “এদিকে কোথায় যাজেন?”
গৌরমোহন খেদাল করলে না প্রশান্তর প্রশ্নে সনাই ভাবটা। দুজনের সংবাদে তারতম্য আছে। গৌরমোহন জুনি বললেও প্রশান্ত আপনি বলছে।

অন্তমনত্ব হয়ে গৌরমোহন বললে, “পুলিশের বড় কর্তার কাছে একটু গাব।”

প্রশান্ত অনেকটা সহজ হ'য়ে বললে, “কিছু চুই-ইরি দেখে নাকি? একেবারে পুলিশের বড় কর্তার কাছে যাজেন।”

হঠাৎ গৌরমোহন কঠিন হয়ে বললে, “চুইবি কিছু বাকি নেই, দর্শন নিয়েচে সোকারগুসা।”

প্রশান্ত ভিজেন করলে, “কবে এমন হ'লো? চুই পেল?”

একটা পার্কের কাছে এসে গৌরমোহন ঘুরে পঁড়াল,

ঘাত-মুখ মেড়ে বললে, “সব কটাক আমি জেলে দেব। এক একটা শরতান তৈরী হ’য়েচে।”

চোরের সন্ধান তা হ’লে পাওয়া গেছে। গৌরমোহন এখন বীভূতিমত ব্যবস্থা করতে চলেছে। বলব’র কিছু নেই।

কৌতূহল হ’লেও প্রশান্ত চুপ করে থাকে। আশ্ব বাবে কাল কি আর কোন কাল গৌরমোহনের সঙ্গে দেখাই হ’বে না হয়তো। ওর বাড়ির চুবি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি।

মিছে থেকে গৌরমোহনই সব কথা ভাঙলে : হাথার ছেলেদের আমি জেলে দেব, এক একটা চোর হ’য়েচে। বাক্স-পেট্রা তেড়ে সব কাগজ চুবি করেছে। পকাশ হাজার টাকার শেরার বগ !

বড় বয়েই কেলেঙ্কার বেটী। এবং কেলেঙ্কারীটা হামেশা ঘটে। অন্তঃশীলা !

কঠিন সুরে গৌরমোহন বললে, “ভাসমানবীর এই হল। বুক দিয়ে ওদের করার এই হল। বাপ মরে যেতে এই পর্য্যই হেথাশোনা করেছে।”

মৌখিক আলাপ না থাকলেও প্রশান্ত পাড়ার থাকাকালীন গৌরমোহনের পারিবারিক গঠনের খবর জানত। দুই ভাই, তিন বোন ছিল ওরা। প্রশান্তরা পাড়া ছাড়ার আগে গৌরমোহনের বাপ মারা গিয়েছিলেন। শ্রাড়ে খুব ধুম-ধাম হ’য়েছিল। হান-মাগর। মনে আছে প্রশান্তর।

তা হলে গৌরমোহনের বড় ভাই-ও মারা গেছেন। ভ্রাতৃলোককে প্রশান্ত দেখেছিল, দ্বিতীয় গৌরমোহন। বয়সে কিছু বড় ছিলেন। বাপের সঙ্গে কারবারে রেহতেন। গৌরমোহন লেখাপড়া করত।

ভায়ের মুহুর্তে আইপোথের অতিভাবকর করাটা বাহাদুরী কিনা প্রশান্ত ভেবে পার না।

গৌরমোহন বললে, “স্বাধা আনোয়ার তৈরী করে গিয়েছিল। শোবেৎ পাল।”

ভায়েরই খুসুখাত। প্রশান্ত চুপ করে রইল, বলবার কিছু নেই। সং পরামর্শ দেবার ইচ্ছে থাকলেও একেত্রে যে তার কোন হল হ’বে না সুনিশ্চিত। ধরে ধরে পুলিশ-কাড়ি করলে যে মান বাচবে না, এ কথা এতবড় লোকের

বোঝাতে বাওয়া বাহুল্য—ছোট মুখে বড় কথা সন্মিল।

গৌরমোহনও বোধ হয় সে পরামর্শ শুনতে চায় না। অন্য কথা পাড়লে। সংকীর্ণক বললে, “কাগজপত্তরে আলকাল তোমার নাম খুব দেখি যে। লেখক হ’য়েছে।”

প্রশান্ত লজ্জার নাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়। সত্যিকারের লেখক সে নয়। গৌরমোহন চুপ করেছে। প্রশান্ত প্রতিবাদ ক’রে বললে, “আমি না, আদ একজন প্রশান্ত।”

গৌরমোহন বিশ্বাস করলেন না। বললে, “সাহিত্য-টাহিত্য পড়ি যে, খোজ-খবরও রাবি। এতে গোপন করার কি আছে, ভাল তো।”

ভাল নিশ্চয়ই, কিন্তু সে-ভাল যে তার প্রাপ্য নয় প্রশান্ত কিছুতেই গৌরমোহনকে বোঝাতে পারলে না। কে জানে বড়লোক গৌরমোহন আদ তার সব সেই কারণে নিয়েছে কিনা।

উদ্ভাঙ্গ কোর্টের মধ্যে এসে গৌরমোহন নিজের করলে, “ছেলে-মেয়ে কটি ? বিয়ে করেছে ?”

প্রশান্ত বললে, “কবে। হ’টি।”

গৌরমোহন আংক উঠল, “কবেচ কি। হাউ ইউ ম্যানেন ?”

প্রশান্ত অপরাধীর মত হাসলে : হ’য়ে যায় কোন মতে।

নিজের কথাও গৌরমোহন জানালে। বিয়ে করেছিল, কিন্তু সে-বৌ ওর বর করে না। অনেককাল ছাড়াছাড়ি। এক রকম ডিভোর্স। কিন্তু—

বুঝি একটু সফোচ বোঝ করে গৌরমোহন। প্রশান্তর মুখের ভাবটা কটাক্ষে লক্ষ্য করে নেয়।

গৌরমোহন বললে, “আর বল কেন ভাই, বৌসে গেচি। বাট আই ডোন্ট মাইন্ড।”

এর মধ্যে কৈসে ঘাওয়া ব্যাপার কি থাকতে পারে প্রশান্ত ভেবে পার না। মনে করার পরতো কাবল থাকতে পারে। কিন্তু বড় লোকের পক্ষে, ভেবে দেখলে ও চুটে কিছুই নয়।

প্রশান্ত বললে, না, “আইগু কবাব কি আছে! আবার বিয়ে করনি?”

এতটুকু সন্ধ্যা আর বোধ কালে না গৌরমোহন। ডাল-ভাতের মত ক’রে বললে, “আরে আমার বড়শাদোক নিয়েই তো কাণ্ডটা! মানে আমার সঙ্গে একটু ইয়ে আর কি—

প্রশান্তর কান ছুটো অকারণেই বড় স্পর্শ কাতর হ’য়ে উঠলো। শুধু বড়লোকই নয় গৌরমোহনরা, তাঁরনে নাটক-নভলের আবার করেছে। বন্দুকধারী গেটওলা বাড়িটা কেমন যেন সমতল হ’য়ে গেছে। সেই পুতুল-পুতুল যৌবিত্তা পথক পথ ছেড়ে একেবারে নরলোকের চোখের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে—নেকড় কুহুরটা আর চোয়াল না গৌরমোহনের বাড়ি।

প্রশান্ত বললে, “ভ্যাত্তে কি হ’য়েচে?”

গৌরমোহন বললে, “আর বল কেন! মহা অপরাধ করে কেসেচি, বাট আই ডোন্ট মাইণ্ড!”

প্রশান্ত আর সন্ধ্যা বোধ করে না। যেন একটা গল্পের গঠন নিয়ে আলোচনা করছে। বললে, “ইন্স-টিউ কিছু হ’য়েচে নাকি?”

গৌরমোহন যেন গর্ব অহুত্ব করে, বললে, “একটি ছেলে। তাকে বস্তুর মত মানুষ করচি! নো লেশ জাম—

প্রশান্ত শেষ ক’রে বললে, “নিজের ছেলেমেয়ের চেয়ে কম নয়। বড় শালীর কেউ আছেন নাকি?”

গৌরমোহন সুংকার দিয়ে বললে, “কে থাকবে! বাল-বিধবা!”

প্রশান্ত চুপ করে পা চালাতে লাগল। বানিক এগিয়ে নিজের কাঁধের সমর্থন চেয়ে যেন গৌরমোহন বললে, “তুমি কি বল, কাণ্ডটা কি খুব খারাপ করেচি?”

প্রশান্ত উত্তর দিলে না।

গৌরমোহন সন্তোষে বললে, “আমি বিয়ে করতে বাজী আছি!”

না করলেও সত্যিই আর বিশেষ কিছু নেই। গৌরমোহন আপন কৃত্রিমত খা কবাব ভাই করেছে।

তবু বুদ্ধি মনে গৌরমোহনের সন্ধ্যা আছে। প্রশান্তর

অকিসের কাছাকাছি এসে বললে, “তোমার তো অনেক লেখ-টেখ, জানও—খুব অস্তায় করেচি, না? কি বল।”

প্রশান্ত ভাড়াভাড়ি অকিসের ঘেটের মধ্যে ঢুক বললে, “না না, অস্তায় কি!”

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে গৌরমোহন আর কি বললে শোনো গেল না।---

তারপর আশা করলেও গৌরমোহনের সঙ্গে আর বোধ্য সাক্ষাৎ হয়নি প্রশান্তর। গৌরমোহন কেমন যেন বৈদ্যুতিক হয়ে উঠেছিল প্রশান্তর কাছে। এতকাল যেন জ্বল করে লোকটার সঙ্গে মেধা হয়নি—বড়লোক, আত্মভবি ভেবে। কত জ্বল ধারণা মাহুঘের লব্ধে। গৌরমোহন বস্তুর মত আধুনিক! বাছ-বিচার নেই। আর একটা কথা গৌরমোহন বাংলা সাহিত্যের খবর রাখে—প্রশান্তকেও একজন কেউবিটু ভাবে, যোগ্য সমাদর দেয়। বড়লোক বলে সাহিত্যকে টেকা মারে না। হর করে না পাঁচটা ভিন্‌বের সঙ্গে। গৌরমোহন উপাধ্যক হয়ে বিশেষ অভিনন্দন জানিয়েছিল প্রশান্তকে সাহিত্যিক বলে। সময় থাকলে মনের কথা আরো বলতো বলতো দেখিন। প্রশান্ত কোনো দিন ভাবতেই পারেনি গৌরমোহনের এমন পরিবর্তন হ’বে। লোহার গেট খুলে রাজ্যের এসে কীবে হাত দিয়ে পানাপানি চলবে বালা সহপাঠীর সঙ্গে। ঘরের লোকের মত কুশল প্রশ্ন করবে, আপন সুখদুঃখের কথা জানাবে! কি ছিল ঐ গৌরমোহনরা, কত দুঃখ-যেন যেন হ’ত ওদের। ভগবান যেন ওদের আশাধা করেই তৈরী করেছিলেন, আশাধা মাহুঘ হ’বে বলে। এক দশে লেখাপড়া করলে কি হ’বে। ওদের খারে কাছে যেতে ভয় করতো প্রশান্তর। শুধু কি বড়লোক, চেঁচাবাটাও কি সুন্দর! যেমন কসাঁ তেমনি লজা! সুখের বংশ ওরা! মনে মনে বিখ্যাতর ওপর প্রশান্তর রাগ ছিল, কেবল কয়েকজন মাহুঘকে তিনি সব কিছু ছেলে যেমন—রূপ, ঐর্ষ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-শ্রদ্ধা। আর পাঁচজনের সঙ্গে জুলনাই চলে না। বড় স্ফোত ছিল প্রশান্তর।

বড় হয়ে সে স্ফোত গেলো কিছুটা বৃদ্ধি ছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখিন গৌরমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ’য়ে প্রশান্তর আর

কেন হইল না। গৌরমোহন কিছুই অস্বাভাব্য নয় !
এই গৌরমোহন !

পাড়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বাড়িটা যেন জরুখ হ'য়ে আছে, কতকাল রক্ত প্যাঁশি হয়নি, খেঁচা ধরেছে পলিপ্তাংগ। বিশেষ ক'রে ভুট্টা পড়ে ছায়া-বকী কেউ নেই, লোহার গেট খুলে কে যেন বাইরে গেছে ভেতর থেকে কেউ আর বন্ধ করেনি। নেকড়ে কুকুরও নেই। চকল পাড়াটার মধ্যে বাড়িটাই কেবল অচকল।

প্রশান্ত ইতস্তত করে। উদ্ভুল খোলা গেট দিয়ে ভিতরের গাড়ীবাদ্যাব্যবস্থা মতো এসে গাড়াল। লোক বলতো গৌরমোহনরা লক্ষপতি, কটিপতি হ'তে আর ক'রিনি মাত্র। একান্ত বড় লোক ! কি হিসেবে, কেন বলতো, সে-কথা কেউ জানতো না। বন্ধুবান্ধবী বন্ধী, কুকুর, গাড়িই বৃষ্টি প্রমাণ ছিল।

আম কিছুই নেই, একটা খোলস যেন নিঃসাড়। গাড়িবাদ্যাব্যবস্থার ওপরে ষানিক অপেক্ষা করলে প্রশান্ত। লোকজন কারো সঙ্গে দেখা হলে গৌরমোহনকে ধরার পাঠাবে, প্রশান্ত এসেছে। গৌরমোহন খুঁসী হ'বে।

কতক্ষণ প্রশান্তর খোলা ছিল না। হঠাৎ কে যেন কোথা থেকে কর্কশ ধরে জিজ্ঞাস করলে, "কাকে চাই ?"

প্রশান্ত এদিক-ওদিক চেয়ে বেগলে। লোকটি গাড়িবাদ্যাব্যবস্থার সামনে চাতালের ওপর ঠাঁড়িয়ে। চেহারাটা এ বাড়ির নত মানামদই নয়। অসুগৃহীত ও আশ্রিত বা কর্জদারী কেউ হ'তে পারে।

প্রশান্ত বললে, "গৌরমোহনবাবুকে চাই ?"

লোকটি মুণ্ডটা যেন কেমন করলে একরকম। বললে, "তিনি এখানে থাকেন না।"

প্রশান্ত বললে, "কোথার থাকেন ?"

লোকটি বললে, "তা বলতে পারবে না।"

প্রশান্ত পিছন ফিরে ছুঁপা দিয়ে আবার ফিরে এসে প্রশ্ন করলে, "কতদিন এখানে তিনি নেই ?"

লোকটি এতক্ষণে সন্দেহ করে, বললে, "কেন বলুন তো ? আপনাব কোন স্বাক্ষর আছে ?"

"না, তেমন কিছু নয়। যেথা কবজুম থাকিগুম এখিকে দিয়ে।" প্রশান্ত অস্বমনস্ত হ'য়ে চোখ ফিরিয়ে বাড়িটার চাংপাশ ঘেঁষে নিলে।

লোকটি বললে, "ও, আপনাব সঙ্গে আলাপ ছিল বৃষ্টি।"

প্রশান্ত মাথা নেড়ে বললে, "হী, না, আলাপ হয়েছিল একদিন।"

হঠাৎ লোকটি উচ্ছাদিত হয়ে বললে, "ছোটবাবু কি আর মাথার ঠিক আছে। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ান, কি করেন, কে জানে। সর্ব্ব্ব খুঁয়ে পাগলের মত হয়ে গেছেন।"

এখনো বৃষ্টি সাতদিনও হয়নি। যেভাবে গৌরমোহন আলাপ করেছিল প্রশান্তর সঙ্গে তাতে মস্তিক বিকৃতির কোন লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। বেশ সহম মানুষই মনে হয়েছিল গৌরমোহনকে।

লোকটি বললে, "কেবল উনিই থাকেন না, আসেন না। আর সবাই আছেন।"

অনাবশ্যক। তবু প্রশান্ত জিজ্ঞাস করলে, "আর সবাই কে ?"

লোকটি বললে, "কুড়ো বা আছেন, বড়বাবু ছেলে-মেয়ে, বোন, ছোটবাবু সবাই।"

প্রশান্ত জিজ্ঞাস করলে, "গৌরমোহনবাবুর স্ত্রী আছেন ?"

লোকটি যেন দুঃখের সঙ্গে হেসে বললে, "তিনি কোথায় যাবেন ও পাগলের সঙ্গে। তা ছাড়া আট-নটি ছেলে-মেয়ে ছোটবাবুর। তাহের মানুষ্য করবে কে ?"

হয়তো প্রশান্ত সব বুঝল, হয়তো বুঝল না। গৌরমোহন তার আত্মীয় না, বন্ধুও না। সহপাঠী ছিল কোনকালে। একান্ত বড়লোকও ছিল গৌরমোহনরা।

রাতের আকাশ

সন্তোষকুমার অধিকারী

সন্ধ্যার সময়টাতেই সেদিন বেশ বিরহিত্তরে বৃষ্টি নেমে এলো। বাদ থেকে নেমে প্রায় ঘোড়িয়ে ঠেপনে আদতে যে সময়টুকু লাগলো, তাতেই তার পাতলা পঃরাবাঁটা ভিজে শপশপে হয়ে উঠলো। কাউন্টার থেকে টিকিটটা কেটে নিয়ে হাতের স্টেকশনটা ঝোলাতে ঝোলাতে পাড়তে এসে উঠলো শ্মশানভন।

ছুটি নেই, কোন উপলক্ষ্যও নেই। কাজেই গাড়ীতেও ভীড় নেই। শ্মশানভন চলেছে একশো মাইল দূরের বেল-ডাঙ্গাতে। ছোট একটা কামরাতে মাত্র দুজন লোক—স্বামীজি ব'লে গল্প করছিলেন। একটু ইতস্ততঃ করে সে ঘরের দরজাতেই হাত রাখলো। ভেতরের দোকটি প্রথমে বিজ্ঞপ্তিভাবেই চাইলো; তারপরে অত্যন্ত খুদী হয়ে ভিতরে উঠে এলো।—আরে, শোভন তুই? কোথায় চললি, বাড়ী?

শ্মশানভন ততক্ষণে উঠে পড়েছে। ওদের সামনে এসেই ত হঠাৎ আবার ধাঁড়িয়ে গেল। তার সামনে উপবিষ্টা তরুণীর চোখে চোখে আটকে গেছে তার। কিন্তু সে পলকেই লজ্জা। সেই ভীষণ দ্রুত ছুচোখের যে করুণ মিনতি আছড়ে পড়লো তার কাছে তাকে উপেক্ষা করতে পারলো না সে। অমনোর বৃষ্টি দিয়ে বললো শ্মশানভন—মৌ দি?

বিমাত্রি বললো—ধাঁড়া। আগে আলপা করিয়ে দিই। বিরহের সময় তুই না আশায় খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। ওর নাম রমা। রমা, ওই আমার শ্মশানভন।

ততক্ষণে বহুধন হ'য়ে উঠেছে রমা। উঠে সজ্জিত হ'য়ে নমস্কার করে বললো—ওঁর মুখে এত বেশী আর কোনও নামই আসে না। শুনে শুনে আপনার সবকিছু ভেবে নিচ্ছে। তারী অস্তায় কিন্তু আপনার, আপনি একদিনও আসেন না।

শ্মশানভন খুদী মুখে চাইলো। একবার বিমাত্রি বিকে

আগ একবার তার নতুন বিরহে কথা গুলি হবার বিকে। না, বিরহ করে বিমাত্রি কোন পর্যবেক্ষণে হঠাৎ বলই মনে হচ্ছে। সেই আগের মতই সবল বোকা বোকা হাসিমুখী আছে। শুধু সামনের বিকে চুপ উঠে টাক দেখা দিয়েছে।

বিমু বললো—কি দেখলি, মাথা? টাক পড়ছে? কত বড় মাথা বসে? একসঙ্গে চাকরী করছিলাম। ও ছিলো আমার চাকরী ক্ষেত্রের কর্মরত। আগল থেকে একদিন বেহোতে বেগী হলো। বেহোবার পর চাউন্টা পেলে। চাউন্টার বোকারে বসে বললো রমা—

—আমরা সত্যিকারের কর্মরত হই না কেন?

—ওমা, কি মিথ্যুক!

রমা গালে হাত দিল। বললো—একদম মিথ্যে কথা বলছে ওঁ। বিবেচন করবেন না ওঁর কথা। আদতেই ওঁ কোর করে হয়ে নিয়ে গেল; তারপর প্রাপ্যেই করলো।

বিমাত্রি উদ্বাহতাবে বললো—ওঁমা তাই শুনে তক্ষুণি গলায় আঁচল ছাড়িয়ে প্রণাম করে বললো—

আজি হ'তে মোর কন্ডে

তোমার চরণে আমি হুটাইয়া

বিমু মম বেড।

—কি মিথ্যুক?

রমা প্রতিবার করে বললো—আমি মত দিয়েছিলান? বাবা না বললে.....

বিমাত্রি গদ্যে কথাটা ছুড়ে দিল—ও টিক টিক, রমা আমার কথা শুনে তক্ষুণি ছুটলো ওঁর বাবার কাছে। বাবার বন্ধ সোহাগী মেরে কিনা।

গাড়ীটা ততক্ষণে স্পিড দিয়েছে। রমা ব্যস্ত হয়ে বললো—ধাঁড়াও, আগে বিদ্যনাটা টিক ক'রে দিই তোমার। হুম না হ'লে ত' আবার মেম্বার বিবিয়ে বাবে।

বিতম্ব বাকের ওপর শ্রদ্ধাশ্রী বিছোতে বিছোতে

বললো হিমাগ্রি—দেখাচ্ছি কি ক'রে ঠিক থাকে শোভন ?
বিরে পড় থেকে কি আমাকে একরাতিবও ঘুমোতে
হিরেছ ত' ?

—কেবল মিথ্যা কথা ভোমার। লজ্জা করে না ?
হমা সক্রোধে ত্রুভি করলো এবার।

শুশোভন এতক্ষণে কথা বললো—ছ'লেন কেবল
কগড়াই করবে না কি ?

হিমাগ্রি টিকিনকেবিয়াবটা টেনে বললে—হেথী, প্রগর
হও। প্রহার প্রকৃত করে।

হমা টিকিনকেবিয়াবটা ধুলে তিনটে বাতিতে বাবার
সাজিয়ে ফেললো। সঙ্গে মলও ছিল। শুধু তা কেনা
হ'লো ট্রেন থেকে। বাওয়া শেখ হ'লে হিমাগ্রি উঠে
পড়লো বাকের ওপর। বললো—খুব অসুবিধে না হ'লে
আমার ডেকোনা। ট্রেন ত' পৌঁছোবে কাল ভোরে।
আজ বখন চালু পেরেছি একটু ঘুমিয়ে নিই।

ততক্ষণে ট্রেন নৈবাতি ছাড়িয়ে গিয়েছে। বাত প্রায়
হুশটার কাছাকাছি। নীচের বেঁকটাতে টান ক'রে
সতরঙ্গটা গেতে বললো হমা—আপনি ঘুমুথেন ত' ?

—না।

শুশোভন বললো—চলতি ট্রেনে ঘুম আসে না আমার।
বিশেষ ক'রে এমন বাতিরের ছবি.....এই মাঠ বন নদী
নাড়িয়ে উড়ে যাওয়ার ছবি দেখতেই ভালো লাগে আমার।

—আমারও।

হমা হাসলো।

—ভূই এখনও গভ্র লিখিস নাকি ?

ঘুম ভঙানো অশ্লষ্ট একটা আওয়াজ এলো ওপর
থেকে। হমাই উত্তর দিল—ঘরেছে। ঘুমি ঘুমোও
এখন।

আন্নার বাইরে চেয়ে থাকা বললো—কত খাড়ী, বর,
বেলার মাঠ আর তাকিয়ে থাকা মাহু...কি অশ্রব দেখতে
লাগে, না ?

শুশোভন খাড় নাড়লো—বললে অপূর্ব।

পুকুরবাট থেকে শাড়ী পরা ভ্রামসী মেয়ে বাসন মেয়ে
ভুলছে, আর হুঁকে পড়া খাড়ীর আন্না থেকে একটা
বউ দেখছে এই ট্রেনের গতিটাকে।...

হমা বিস্তার হয়ে গেল।

শাড়ী ততক্ষণে বাগাখাট ছাড়িয়েছে। চারিখিক
নির্জন হয়ে এসেছে। সবুজ গাছের সার আর মাঠের ছায়া-
ছবির দিকে চেয়ে শুশোভন বললো—সত্যিই ঘুমিয়ে গেল
যিহু। এমন সুন্দর আকাশও চেয়ে দেখলো না।

ওপর থেকে হিমাগ্রির নাকডাকার পর্জন ভেসে
আসছিল। হমা হুহু হেসে বললো—অমনিই। যোগ রাখে
যের উঠেই ঘুম। আমারের বাসাটা শুভলার। বর থেকে
পথিকার আকাশ দেখা যায়। বাতি নিভালে চাঁদের
আলোও। আনারের হাওয়া বোডের ফ্লাট থেকে বসে
বসে আমি সমস্ত বাংলাদেশের আকাশটাকে দেখি।

শুশোভনের বুক হঠাৎ একটা বীর্ঘবাসে স্পন্দিত হয়ে
উঠলো। বললো—হায়রে, আমার বর ত' সেই কবড়াইন
লেনের একতলার। চাঁদও হেথিনা আকাশও হেথিনা।

শুশোভনের চোখের বিষমতা রমার চোখকে আকর্ষ
করলো বৃষ্টি। কিন্তু পলকেই সে হুঁকে পড়লো বাইরের
থিকে।

—নদী...নদী...কি সুন্দর নদী।

ট্রেন তখন নদীর ওপর হিরে চলছে। বহু জলে
চেউয়ের চাকুলো দুলছে অনেক অনেক চাঁদ। হুসছে রমার
মনও। বললো সে—ওটা কি নদী ?

শুশোভন বললো—ওটা চূর্ণী।

হমা—কি সুন্দর ? কিন্তু কুরিয়ে গেল কেন ? ট্রেনটা
ঘেন বাকোস।

শুশোভন—কুরিয়ে বাওয়াটাইত সুন্দর।

কুরিয়ে বাওয়া না থাকলে এ রাতটাকে আবার নতুন
করে পেতাম কি করে ?

হমা আপন মনে চেয়ে বইলো সেই জ্যোৎস্নাতারা
আকাশের থিকে। থেগ হর শুশোভনের কথা তার কানে
সেল না। সে বিস্তার বনে বললো—এই এমন সুন্দর
চাঁদানি রাত আর আর ভই অপূর্ব চূর্ণী নদীটা যদি অনেক
দিন কিবা অনেকক্ষণ ধরে শাড়িয়ে থাকতো। তাহলে—কি
কতি কার হতো ?

শুশোভন মান হাসি হাসলো—হতো বই কি ? চাব

বছর আগেকার এক অন্ধকার ভীতু রাত্রি যদি আজও
অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো...

—আঃ! রমা রাডা হয়ে বললো—আমি বলছি
আজকের কথা।

সুশোভন—জীবনটাই চলমান। না চললে জীবনের
অনেক সত্য মিথ্যে হয়ে যায়। এই ট্রেনটা যদি ট্রেন-
জলোকে পেছনে কেল এগিয়ে না যেত তবে শেগালনা
ট্রেনটাই এর একমাত্র সত্য হত। বাকিগুলো হতো
মিথ্যে।

রমা—হরত হবে।

সুশোভন—হরত কেন? তাই-ই। নইলে... (যদি নীচ
হলো সুশোভনের) চার বছর আগের সেই রাত্রিকে—

রমা—(অর্ডহরে) চুপ করে বলছি।

সুশোভন—যিহু ঘুমিয়ে গেছে। নাকডাকা শুদ্ধো না?
হ্যাঁ। আজকের এই নতুন করে যে পরিচয়, যে আনন্দ
দুধনেই অচেনা দুধনের কাছে—এটা কি গতি হতো
যদি জীবনের ট্রেনে স্পীড না থাকতো?

রমা—আমার ঘুম পড়েছে এবার।

সুশোভন (কণ্ঠস্বর বদলে), বাইরেটা আমার অন্ধকার
হয়ে যাচ্ছে। কি হলো? চোখে করুণা পড়েছে আপনার?

রমা—হয়েছে, আর আপনি বলতে হবে না।

কিন্তু—

গলা হঠাৎ জড়িয়ে গেল তার। চোখের করুণা আর
কবচে ব্যস্ত হয়ে চোখে দেখলো রমা। আর সুশোভন
উদাসিনতায় বাইরের দিকে তাকালো।

সুশোভন—জীবনটা বড় আশ্চর্য। আজকের শিখার
মত প্রতিমুহূর্তে বপ্ বপ্ করে ছলছে। একমুহূর্ত আগে
নিখা ছাড়িয়ে যাচ্ছে পথের মুহূর্তে এমে।

রমা—হ্যাঁ। আর বাওয়ার আগে আগিয়ে বিয়ে যাচ্ছে
সব কিছু।

সুশোভন চকল হলো। বললো—এবারে সময় হলো
নামবার। আমার ট্রেন এমে গেল।

রমা আতুল হয়ে চাইলো, বললো—আজকের রাত
আমার জীবনে সময় হয়ে থাকবে।

সুশোভন হাসলো—কাল সকালেই জুসে যাবে।
ভোরের আকাশ কি রাত্রির অন্ধকারকে ধরে রাখে?

ট্রেন এমে বানলো এবার এতটা ছোট ট্রেনে।
ভাঙপের আবার শুরু করলো চলতে। চোখের করুণা আর
করে রাডা চোখে চেয়ে দেখলো রমা—না, সুশোভন
নেমে গেছে।



উম্মার আক্কেল

অধ্যাপক বিস্তরঞ্জন শুক

গাছী মেলায় বেড়াইবেক কেন্দ্রের মাইক্রোকোম যত্ন।
চীৎকার করিতেছে “উমা বকিত, উমাত! উমা বকিত,
বকিত, তোমার বিবি ও জামাইবাবু তোমার ভগ্নে ‘ফিট-অল’
ঠোরে অপেক্ষা করছেন। তুমি তোলাকে নিয়ে শীগগীর
চলে এসো—যেইন গেটের বকিণের বোকানে। তোমার
বিবি ও জামাইবাবু অনেকক্ষণ ধরে তোমার খুঁজছেন।”

আবার কিছু পরেই ঘোষণা—“টিগের বকীর উম্মাতী
উম্মাতী বকিত—ঐ বিকুপ বকিতের মেয়ে—ঐম্মাতী
উম্মাতী বকিত—ক্রাশ নাইনে পড়ে—ভাষার বিবি ও
জামাইবাবুর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সঙ্গে
পাঁচ বছরের একটি ছোট ছেলে আছে—কেহ বোয়টকে
দেখিলে মেলার মেইন গেটের বকিণে “ফিট-অল” ঠোরে
হুগা করিয়া নিয়া আদিবেন। উমা-বাকী-বকিত।”

শিলচরে গাছী মেলা। ছোট এই সহরের নিস্তরঙ্গ
জীবনে বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভবনা ও আকর্ষণ। গাছী
মেলায় কর্তৃপক্ষ বলেন, “গাছীজীর জীবন ও আদর্শ
জনসাধারণে প্রচার করিবার জন্য স্বদেশী শিল্প ও কৃষিজাত
স্বাভাব্য আকর্ষণীয় সমাবেশ।”

কলেজের এক কচকে ছোকরা প্রেমেন্দ্র বলে “গাছীজীর
শোক ভুলবার জন্যে বৎসরান্তে ‘নিরাপাণ’ বলে চা ও
মাংসের চপের চমৎকার আয়োজন।”

কটিক বলে, “বিনে পরসায় শিনেমা শো।”

আর যে সব রূপের কথা ছেলেছোকরা বলে ভাষা
শুনিলে আপনাদের ভক্তব্যক্তির কান লাগ হইয়া উঠিবে।

ভীড়—ভীড়! হাসি-হাসি, কোলাহল, আলোকসমুদ্র। কত
ঠেল, কত চোখ ভুলানো, মনমাতানো সামগ্রীর সমাবেশ।
কত বিচিত্র চীৎকার—“টক-আল-মিটি কদকাতার
গুয়েলিটনের সাড়ে বত্রিশ ভাঙ্গা।”

“এখিকে আশুন, বেখুন বিবি, ক্যানিকোর নুতন
ডিভাইনের ছাপ শাড়ী ‘হারানো সুখ’ একবারে সেইটেই

বোঝে ডিভাইনের লাইসেন্সের রাউন্স—আশুন রূপদী
ঠোপ।”

“আলো-ছায়া, আলো-ছায়া, আগামী শুক্রবার হইতে
এ বৎসরের শ্রেষ্ঠস্থিতি উত্তম-পুষ্টিভার মধুরভব প্রেম-অভিনয়
‘জীবন-ভুগা’ আশুন, বেখুন, জোড়ায় জোড়ায় আশুন
জীবন ভুগা যেটান।”

প্রাণী অম্ল বাবু গৃহস্থি সন্নিবীকে বলিলেন, “চলো
ওখিকে বাগনের বোকানে, একখানা কামাখ্যার বেলেঘরী
কেমার ইচ্ছে আছে।” হরিপদ বাবু শান্তরী বলিলেন
“ভাব চেয়ে চলো পাথরের বাগনের বোকানে, একখানা
বাঁধা কিনি, তেঁতুল কিনি আগার দিতে সুবিধে।”

অধ্যাপক বসিকবাবু আর উপেনবাবু নুতন অধ্যাপক
বিতাসবাবুকে নিয়া গেলেন মনিপুরী ঠেলে। উপেনবাবু
কিনিলেন জারি লক্স বেডকভার, বসিকবাবু মেয়ের লক্স
টেবিল লক্স আর বিতাসবাবু ভাষার বুদ্ধ পিতার লক্স
কিনিলেন জুতার একটি ‘লাইছাম্পি’। বলিলেন
বিতাসবাবু “বেখুন, মনিপুরী পুতুলগুলি, কি সুন্দর গড়ন—
কতলাল? পাঁচ টাকা বড় খেঁচি।” বসিকবাবু ঠাট্টা
করিয়া বলিলেন “এ বয়সে আবার পুতুল খেলার সব হল
নাকি?” বিতাসবাবু লজ্জা পাইলেন, “না, না, একটি
ছোট ভারী আছে তার লক্সে।”

মাইক্রোকোমের ঘোষণা উম্মার কানে গিয়াছে। কিন্তু
ভাষাতে ভাষার পিত্ত অলিগ গিয়াছে “তোমার বিবি আর
জামাইবাবু তোমার ভগ্নে “ফিট-অল” ঠোরে অপেক্ষা
করছেন” একবারে কৃতার্থ করেছেন আর কি? ভারী
আদর দেখানো হচ্ছে। মেলায় আগিয়াই প্রায় বিবি আর
জামাইবাবু গাছীমকের নীচে উমা ও ছোট ভাই তোলাকে
অপেক্ষা করিতে বলিয়া সেই যে উমা ও হইয়াছেন কয় বকী
হইল কে জানে? আর এখন বলা হচ্ছে, “তোমার বিবি
ও জামাইবাবু অনেকক্ষণ ধরে তোমার খুঁজছেন।” বতো

দব। আর বিবিটাও যেন কী? জানাইবাবু সঙ্গে কী
এত কথা? বিরক্তও লাগে না? হিঃ! সে যখন
বিবাহ করিবে...না, নিবাহই সে করিবে না।

যোগা সন্নিয় উমা বেঈড়ি কিস্তও হইল না—কিউ-
অন্ টোরেব হিকে পা-ও বাড়াইল না। তাহার বহিয়া
গিয়াছে কিউ-অন্ টোরে বিয়া সকলের সামনে অপবস্থ
হইতে! সে কিছু কতি খুঁকী নয় আর বাসার ঢাঙাও সে
চেনে। বাসার গিয়া না ও বাবাকে বলিয়া দিবে আর
দিকিৎ খুব একটোট বহুনী খাওয়াইবে। সেও ছাড়িয়া
দিবে না। ভোলাকে সামলাইতে তার কি কম বেগ
পাইতে হইয়াছে? উমাকে শাখা শূকর খেখাইয়াছে, মধ্য
ভালুক খেখাইয়াছে, কনি জ্যেবর ঠেলে গিয়া একাণ্ড মানকচু
ও বেল খেখাইয়াছে। এমন কি বড় পুতুল মাঝাইয়া সে
ভারতবর্ষের ইতিহাস জীক্স করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা
হইয়াছে তাহাও খেখাইয়াছে; যদিও তাহার নিষেধ সি আর
দাশ মার্কী বুদ্ধবেব এবং আবুল কালাম আবার মনুল
রামকৃষ্ণ হুতি বেবিয়া খুবই হাসি পাইয়াছিল। কিন্তু ভোলা
কি কম পাণ্ডী? কেবল বলে ‘পুতুল ধাও’, ‘বিপুল ধাও’
বাধ্য হইয়া হাতের ছু আনা পরমা দিয়া চিনা বাধ্য ও
বিকৃত কিনিয়া দিয়াছে, তাও দু একটি মায়ে বিবুট খাইতেই
ভোলা চীৎকার সূক্ষ করিয়াছে, ওর সব বিবুট নাকি দিদি
খাইয়া নিল। ওর জন্মই কান্তিাবাবু ‘জেন্ড-বক্স’-এর
খেলাটা ওর খেখা হইল না। বাকু, ভাগ্যিস ‘মুখোতা’
তাই অনিলের সঙ্গে খেখা হইয়াছিল, সে ভোলাকে ‘বাকব
মিটার ভাঙারে’ মিষ্ট খাওয়ারিতে নিয়া গিয়াছে।
উমাকেও বলিয়াছিল কিন্তু ওর ভীষণ লজ্জা করিয়াছে
তাই বায়নাই। কিন্তু লজ্জাই জুগা পাইয়াছে। ওহিকে
‘লাপখালে’র পাড়ে কত খাওয়ার বোকান। ডিমের
মামলেটের ‘বাক’ মিষ্ট পদ্ধ ভাগিয়া আসিতেছে। উমা
কিছুক্ষণ একাই বুঝিয়া বেড়াইল, ক্রান্তের মেয়ে শিশুর সঙ্গে
কিছুক্ষণ গলা করিল। মনোখ চমৎকার লাগ বেলু পাশিণ
কিনিয়াছে, উপরে নাগিসের ছবি! কিন্তু ইচ্ছা-লে ওই
বেল পাশিণ লাগাইয়া গেলে বিবিমণি খাইয়া কেদিলে,
উমাই বা কড়া!

হঠাৎ সে খেয়াল করিল পাড়ার ক’টি বখাটে ছেলে

কাছাকাছি ঘুরিতেছে। তাবাকে একা বেবিয়া একটি
সাহস করিয়া আগাইয়া আসিয়া কপট বিনয়ের সঙ্গে
বলিল, “উমাদিদি” বড় ক্ষিপে পেরেছে—চার আনা পরমা
ধাও। এই আদরা চাহজন নরেশ, বীরেন, স্নানিত ও
আমি চা খাবো—জুমি তো সস্তা মেয়ে!” উমা একটুও
খাবড়াইল না। এতও ধমক দিয়া বলিল, “বোদাবপ্ লজ্জা
করে না?”

আর বলিতে হইল না—চার বীরপুত্রব নিমেষে ধাওয়া
হইয়া গেল। তারপর “চা-গ্রাম্ এ বসিয়া কথেন্সেব
কুশাসনের কলে খেখের যে কী সর্বনাশ হইতেছে—বিশেষতঃ
মেয়েদের চরিত্র যে কী ভয়ানক খারাপ হইতেছে তাহা
লইয়া প্রথম আলোচনা চলিল।

রাত আটটা বাজিয়া গিয়াছে। উমা একই চকল
হইল। বিবি-জানাইবাবু নিশ্চয়ই চলিয়া গিয়াছে। উমার
নিষেধ হাতও খালি। জানাইবাবু বলিয়াছিল যে মেলায়
গিয়া গেট ভরিয়া চপ্ ও পরোটা খাওয়াইবে। পুষ্ণ
মাছবঙলি এমনই অকৃতজ্ঞ। সেদিন এই জানাইবাবুকেই
সে দ্রুতি জ্বাল সেলাই করিয়া দিয়াছে। আচ্ছা সেও
জুগিবে না। ইহাও শোধ সে জুগিবেই। সেদিন ছাত্র
পড়াইবার নাম করিয়া জানাইবাবু দিকিৎ কীকি বিয়া
রমেনবাবুর সঙ্গে সিনেমা দেখিতে ‘গিয়া’ছিল, তাহা সে
দিকিৎ বলিয়া দিবে। তখন মজাটা টের পাইবেন
বাছান।

মাইক্রোফোনের যোগদান উমা তেমন চকল না হইলেও
কেহ কেহ যে চকল হইয়াছেন তাহা বোঝা গেল। ঢাকা
হইতে বাস্তবায়ী এক মহিলা বলিলেন “ও মাগো, যেই
ডরে পাকিস্তান খেঁকিয়া সুখ ছাইয়া পলাইয়া আইলো,
এইখানেও সেই মাইরা চুরি? কই আর বায়ুগো?”

আর এক পশ্চিম বঙ্গীয়া প্রোতা মন্তব্য করিলেন “এ
শেষের মেরঙলাই যেন ক্যানোন্ উঠে! লজ্জা নেই
হারা নেই, ভয়ভর নেই। এ্যাতো বড়ো পোনত-মেয়ে বিবি-
জানাইবাবুর কাছ থেকে হারিয়ে যায়? কি করে?
কাঁটো মাঝে এবেক কপালে!”

উমা সন্নিয়ও কান বেশ নাই। বহু বিবি জানাইবাবুর
উপর রাগ তাহার ক্রমে ক্রমে চড়িয়াছে। অকুত বিবেচনা-

হীন বাহন। আর অন্মিলেই বা কি বুদ্ধি? এতক্ষণেও তোলাকে কিংবাছিয়া দিয়া গেল না। আর সে গাফিলতগ ছইতে বাকী বাইবে সে দিকসার পরসাই বা কোথায়? একবার ফিট্‌ অল্‌ ঠোঁবেই মনোম সুখিয়া আসিল—বিহি আমাইবাবু নাই।

ভগবান বুদ্ধি উনার প্রার্থনা শুনিলেন। উমার মেলা-মসাই রমেশবাবু সেখানে বেধা ছিলেন। উমা তাঁহাকে বলিল, “বিহি আমাইবাবু আমাকে কলে চলে গেছে। তোলাকেও নিতে গেছে অন্মিল মিষ্টর হোকানে। একা আমি এখন কি করি? আমাকে বাসায় পৌঁছে বিন, আর তোলাকে অন্মিল বেন বাসায় দিতে আসে।”

ভাগ্যক্রমে তোলাকেও বেধা গেল আসিতেছে, সেই চার বৌয়ের একজনের কোলে চাপিয়া হাতে তার ছই চোঙা। রমেশবাবুকে দেখিয়া তোলাকে কোল ছইতে নানাছিয়া দিয়া নরেশ বলিল, “অন্মিল তোলাকে আপনার কাছে পৌঁছে দিতে বলোছে।” উমার মনটা একটু প্রশস্ত হইল। হঠাতো ছেলেকুলি তেমন ব্যাপার নয়—একটু বেশী কাজিল, এই বা। বাক্‌ কদক দিয়া সে ভালই করিয়াছে, নছিলে ইহারা প্রশস্ত পায়।

বাসায় পৌঁছিয়া উমা বাবা মার কাছে প্রণত হইল। বিহি ও আনাইবাবু বলিলেন, কতক্ষণ কত আরসার তাঁহার। উমাকে খুঁজিয়া না পাইয়া বেচ্ছানেক কেক্রে দিয়া খবর দিয়াছিলেন। ফিট্‌ অল্‌ ঠোঁবে আরও আবৎকা অপেক্ষা করিয়া তাঁহার। বাসায় আসিয়া-

ছেন। উমা এই বৎকের ঝড়ের মুখে আত্মসমর্পনে কিছু বলিবার সুযোগই পাইলেন। একিকে উমার বিহি তোলায় বাত হইতে চোঙা ছুটি নিয়া বেধিলেন একটার কিছু ভাল-মুট আর একটার করটি চিনা বাহাম। কিন্তু ছই চোঙাতেই ছুটি কাগজ ভাঙ কন্ড, তাহাতে লাল পেন্সিলে লেখা, একটিতে—

‘উমাবাবী চাফবহনী
কাঁধে কেন ছিঃ।
আমাইবাবু খেলে গেছে
আমরা তো আছি।’

দ্বিতীয়টিতে—

‘রাগই চণ্ডাল। সংসার সুখের হয় বহুদীর গুণে।’

এ-লেখা দেখিয়া সকলে উমাকে আর একটাট গালি দিলেন। উমা কাঁদিল, কাটিল, পেখে রাগ করিয়া না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মাঝ রাত্রে তাহার ঘুম তাড়িয়া গেল। কে বেন বড় কড়ক সুবে গাহিতেছে—

“পুৰিহীতে কেউ ভাল তো বাসেন।
এ পুৰিহী ভালো বাসিতে আমেনা।

বেধা আছে শুধু ভালবাসাবাদি
সেখা যেতে প্রাণ চায় মা।

চোখের জলে উমার মাথার বাণিশ আবার ভিকিয়া গেল।

গাছীমক হইতে মহাশয় ইচ্ছানুষ্ঠিত ক্রুটি-কুটিল নেড়ে দীতে তাকাইয়া আছে।



উত্তর-কাল

মানবেন্দ্র পাল

কাজ কর্ব চুকে গেল নিবিয়ে।

যতটা ভয় পেয়েছিল শতাব্দু তার কিছুই ঘটেনি।
পাড়ার লোকে সত্যিই ভাবের তালোবাসে। আর না
বাসবেই বা কেন? তার বাবার মতো অমন সত্যনিষ্ঠ
লোক এ দেশে—এ দেশে কেন এ ধরতে বর্তমানে কখন
আছে? জীবনে তিনি কখনো কারও ক্ষতি করেননি—
জানেন মিথ্যা বলেন নি। এমন কি সর্বনাশের আগের
দিনও—

সত্যবন্ধ কলমটা টেবিলে রেখে দুহাত বুটো করে
বইল। চোখ খুলল। কী ঘেন ভাবতে লাগল—বাধ
হয় মনের সঙ্গে চলল বোঝাপড়া।

—না, তবে বড়ো সেক্টিমেন্টাল আর একত্বের মানুষ।
বড়ো অবুধ। বা নিজের বুদ্ধিমত্তে বিবেকমতে রক্তার
মনে করবে তার সঙ্গে আপোষ করবে না। এরকম মনোভাব
হলে কি এ যুগে বাঁচা চলে।

সত্যবন্ধ চোখ খুললে। সামনেই বাগের বিরাট
অয়েল-পেটিং। উজ্জল তীক্ষ্ণ দুই চোখ খেঁচলেই ঘেন
বুকের ভিতরটা কেমন করে ওঠে—বেশিখন তাকানো
যায়না।

তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল শতাব্দু।

—বাক হাকানো নিবিয়েই মিটে গেল। তবে খরচটা
হয়েছে বড্ড বেশি। তা আর উপায় কি? এই তো
শেষ কাজ। বাবার শ্রাদ্ধ তো আর দুবার হবে না!
অবশ্য এখনো ছোটো দুই তাই আছে সত্যক্রিয় আর
সত্যজিৎ। এদের অতট এম, এ, টা পর্যন্ত পড়াতাই
হবে। বাবা দায়িত্ব চাপিয়েছেন।

সত্যবন্ধ সতর্পণে একটা শীর্ষবাগ ফেলল।

—তবে শ্রাদ্ধ এতটা খরচ হতনা। একটু বাড়াবাড়ি
কবলে অমিতা। হ্যাঁ, বাড়াবাড়িই। ওরা তো পরসা
উপায় করে না, তাই অবধা খরচ করতে বাবেনা। অথচ

কিছু বলবার উপায় নেই। অমনি ঘুম ভাৱী হয়ে উঠবে।
একেবারে বাবার খাত পেয়েছে। অবুধ সেক্টিমেন্টাল।

পায়ের শব্দ পাওয়া গেল এই সময়ে। ঐ যে পর্দার
নীচ দিয়ে যেথা বাজে আসতাপরা দুখানি চকল পা। হ্যাঁ,
এ ধরই আসছে।

অমিতা এসে ঘরে। লাগ পড় শাড়ি। আসতাপরা পা
দুখানি। শিঁধিতে হপ্প হপ্প করে জলছে শিঁধুর। সুখটাও
লাগ হয়েছে উত্তেজনার।

বললে—ঘরের দাম চুকিয়ে দিয়েছ নাকি?

সত্যবন্ধ বললে—না, বিসেব করছি।

অমিতা বললে—ওক পুরো দাম যেবেনা কখনো।

অন্ত করে বললাম বাঁটি গা-দি হওরা চাই বামের জন্তে
ভেব না, তাও ভেদাশ দিয়েছে লম্বাছাড়া!

সত্যবন্ধ ইতস্তত করে বললে—কই, আমার তো
তেমন মনে হলনা। বরক ভালোই মনে হল। সবাই তো
বেশ তৃপ্তি করেই—

অমিতা কঠোর স্বরে বললে—তুমি ধানো তো!
আসল বাঁটি বোঝাবার ক্ষমতা আমার আছে, শুধু নেই
তোমার মতো ব্যবসাহুঁড়ি। বাবার কাজে বাঁটি বিনিম
ব্যবহার করব সে সাধুহুঁড়ি মিটল না, এমনি মানুষ সব।

এই বলে ক্রুদ্ধ আক্রোশ অমিতা ঘর থেকে চলে গেল।
সত্যবন্ধের প্রথমে একটু রাগ হল, তারপর বিবেক যেন
একটু ধংশাল, তারপর হাসি পেল। ইচ্ছে করল প্রাপণে
একবার অটু হাসি হেলে ওঠে। কিন্তু অটুহাসি হাসবার
নিয়ম নেই এ বাড়িতে।

অমিতা কিরে এসে নিজের ঘরে। মনটা তার আজ
বড়ো ভারী হয়ে আছে। বসন্তের হৃদয় আঘাতটা যথিত
বা কর্তব্যের এবং দায়িত্বের চাপে পড়ে জ্বলেছিল, আজ
হঠাৎই আবার সমস্ত মন জ্বকবে কেঁধে উঠল।

তার খণ্ডর ছিলেন বাঁটি মানুষ; জানে কোনোদিন মিথ্যা

বলেননি, ছলনা করেননি, এমন কি পাছে কারও মনে কোনো কথায় লাগে তাই খুব হিসেব করে কথা বলতেন।

সেই যেহেতু। স্বপ্নে চলে গেলেন। তারই আত্মপ্রত্যক্ষ অমিতা পূর্ণ করেছিল, আর কিছু না যোগ বাঁচি নিমিত্তে অতিথি সংস্কার করেছেন। তার ক্ষেত্রে যদি কিছু বেশি খরচ লাগে তাও না হয় ব্যবস্থা করবে। গোটা বেশটা যে আকর্ষণে ভুবে গেল, এক চুট খাটি জিনিসের ক্ষেত্রে তাই আকর্ষণে হাম কেলেক হাত ছোড় করতে হয়।

—যেমন এই সেইদিনের এক টাকার ছাদগার পাঁচ দিকে সেদে কিনতে প্রস্তুত হয়েও এই অমিতাকে গোয়ালার কাছে হাত ছোড় করে মিনতি করে বলতে হয়েছে—বেশি বাবা। রোগা ছেলে শাব্যে, ভালো দুধ দিল।

স্বপ্নমশাই বৈঠকেছিলেন তখন। অমিতার এই আকুলতা দেখে হা-হা করে এমন আটহাসি বেগে উঠেছিলেন যে অনিতা চমকে উঠেছিল। যে নাহুব জোরে কথা বলেন নি কোনো দিন—টাকার করে ধমকান নি—চৈতন্যে হাসি, চৈতন্যে কথা গছন্দ করতে নানা আকর্ষণে তাই গলায় ঐ হাসি শুনে অমিতা চমকে উঠবে বৈকি। সে হাসি শুনে গলাও আর গাড়ায় নি, তবে পাগিয়ে গিয়েছিল। পাশের ঘরে অমিতার রূপন ছেসেটা ডুকরে কেঁদে উঠেছিল।

এই হাসিই হল তাঁর কাল। তাঁর বাবির স্বপ্নপাত। এরকম হাসি জীবনে তিনি এই প্রথম হাসলেন আর এই শেষ।

অমিতা নিশ্চয়ই এসে গাড়াগো নিবের ঘরে। ঘরোয়ার বিল এঁটে গিয়ে।

কাজের বাড়ি। চারদিকে লগভগ। তারই মাঝে এই ঘরটুকু যেন নিখাস ফেলবার ক্ষেত্রে। এই ঘরটি গুলোট-পালোট করতে যেমন অমিতা।

তখন বেলা গিয়েছে। নারকেল গাছের মাথায় স্বর্ষ্যস্ত সজ্জার আলো কেমন একটা বিধারের ঝগনিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

অমিতা এসে গাড়াগো বড়ো টেবিলটার কাছে। একটা বাঁদ কোটো স্বপ্নমশাইয়ের। তারই দিকে এক ফুটে

তাকিয়ে বইল অমিতা। বার বারে কমা চাইতে লাগল মনে মনে,—কমা কতো, কমা কতো, তুমি এই কুৎসিত জগতের অনেক গুণেরও গুণের মাহুত। শাপ-জট দেবতা তুমি। মানুষকে বোঝবার ক্ষেত্রে ছল করে এসেছিলে। তোমার মূল্য জানার দিকে পারিনি।

আজ অনেক কথাই মনে পড়ছে অমিতার। সেই চোখ বছর বয়েসে যখন এ বাড়িতে বৈ হয়ে ও এল।

কী ধুমধাম। আলো বাজনা বাকল। স্বপ্নমশাই নিজে এগিয়ে এসে বৌকে হাত ধরে নামালেন। তারপর তেমনি ভাবেই নিয়ে চললেন পাশের ঘরে।

নাগেশ্বরের স্মৃতি। সেখানে এসে প্রথমে নিজে প্রণাম করলেন। তারপর গভীর স্বরে বললেন—তুমিও প্রণাম করো মা। ইনি আমাদের গৃহ দেবতা।

অমিতা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। তার পর হুৎতে পেল বাড়ির ভিতরে।

স্বপ্নমশাই বললেন—মা, তুমি সাক্ষাৎ কমলা, অল্পপূর্ণ। আমি সব লক্ষণ মিলিয়ে তবে এনেছি এ বাড়ির বৌ করে। দেখো, আমার সে সন্ধান যেন থাকে।

অমিতা বিনীত কণ্ঠে বলেছিল,—আপনি যেমন আদেশ করবেন, তেমনি হবে।

সত্যনাথের দুই চোখ জল জল করে উঠল। উৎসাহিত হয়ে বললেন—হবে ?

—হ্যাঁ, হবে।

—তাহলে আমার ভিক্ষা রইল, আমার ঐ বড়ো ছেসেটাকে তুমি মানুষের মতো করে গড়ে তুলবে। ওর সব ভালো, তবে বড়ো অস্থির। সবুজি ওর মাথায় আসে না মা। তুমি ওর যোগ্য বী হয়ে ওকে চালিয়ে নিয়ে যেও। অস্তিত্ব আমার খুঁজ চেয়ে তোমার এ গারটুকু নিতেই হবে।

অমিতার বুকখানা কেঁপে উঠেছিল। ঘরের প্রথম দিনেই—এ কী সংশয়!

সে রাতে সত্যবন্ধ বীকে বললে—বাবা নিশ্চয়ই তোমার লগা চাওড়া উপদেশ বাণী শুনিয়েছেন ?

অমিতা উত্তর দিল না।

—কী চূপ করে রইলে যে ? মুখটা একটু তোলোই না।

অমিতা এবার পরিত্যক্ত মুখ তুলে তার ছই বীণ চক্ষু মেলে ধল সত্যবন্ধুর পানে।

—বাবা কিছু বলছেন ?

—হ্যাঁ, বলোছেন।

—কী ?

অমিতা স্বপকাল চূপ করে কী জাবল।

—আমার সম্বন্ধে কিছু ?

অমিতা পরিত্যক্ত গলায় বললে—হ্যাঁ, তোমাকে নাহয় করে জুলতে হবে আমার।

হা—হা—করে যেলে উঠতে গিয়ে সত্যবন্ধু ধেসে গেল। মনে পড়ল বাবা এখনো তার ঘুমোয় নি। ভাড়া-ভাড়ি স্বর বহলে বললে—ব্যাপারটা কী জান ? আমি আমার এক বছর নামলায় মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছিলাম। এই আমার অপরাধ। বাবার ধারণা আমি টাকা খেয়েছি। কিন্তু সেটা একেবারে ভুল ধারণা।

অমিতা তেননি পত্নীর স্বহসেই বললে—না, টাকা খাওয়ার কথা বাহা বলেও মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছে এইটেতেই তিনি দুঃখ পেয়েছেন বেশি।

সত্যবন্ধু স্নেহের স্বরে বললে—ও। বাবা তাহলে বলসেই দিয়েছেন ?

অমিতা শান্ত স্বরে শুধু বললে—না।

—তাহলে তুমি আমলে কী করে ?

অমিতা তার উত্তর দিতে পারে নি। সুকব্ধ ভিতরটা তখন গুর কেমন যেম বন্ধ বন্ধ করছিল।

সত্যবন্ধু বাতি জেলে দিয়ে গেল সত্যবন্ধুর ঘরে। এক বাশ কাগজ-গতর ছড়ানো টেবিলের উপরে। দিগ্বরেটের কুচিতে দেখে ভাবি। অজবিন এই সময়ে অমিতা এসে বাবার ছবির সামনে ধূল জেলে দিয়ে যায়। কিন্তু আল এস না।

একটু আশ্চর্য হল সত্যবন্ধু,—এটা রাগ না অভিমান ? না কি মোহ ছুটে থাকে।

কথাটা ভাবতে যেন গোপন দ্বন্দ্বের ভালোই লাগল। হ্যাঁ, মোহ ছুটেছে। না ছুটে উপায় কি ? কবে কে যহা-

পুরুষ ছিলেন তাঁর আশ্রয় যদি কোনো একজনর মনে সব সময়েই যেসে থাকে তাহলে যে সে বাঁচতে পারবে না এ দুনিয়ায় ! যেমন—সেমন পারলেন না বাবা নিজে—

হঠাৎ আবার চমকে উঠল সত্যবন্ধু। বড়ো অস্বস্তি বোধ করছিল। ইচ্ছে করছিল বাবার চিত্রা খেড়ে কেসে উঠে পড়ে। কিন্তু ভাগ জো পারছে না। বাবার ঐ সোখ ছোটো যেন নিঃশেষ তাকেই তিরস্কার করছে।

হ্যাঁ একথা সত্যি, তাঁর বাবার মতো লোক হয় না। সত্যকে তিনি কীবনের সাহ বন্ধ বলে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর নিজের নামের অস্তে তাঁর বাপদায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতার স্বাক্ষর স্বরূপ একে একে তাঁর স্ত্রিন পুত্রের নাম রাখলেন, সত্যবন্ধু, সত্যপ্রিয় আর সত্যজিৎ ! নাতিটায়ও নাম দিয়ে বাবার ইচ্ছে ছিল মনের মতো কিন্তু সময় পেলেন না।

তিনি নিয়ম করেছিলেন, তাঁর ঘরোয়ায় এসে যে হাত পাতাবে সে যেন দৃঢ় হাতে না ধরে।

খুব ভালো কথা। কিছুকাল বেশ চলেছিল। কিন্তু দুভিক্ষের বছর যখন চলল টাকা মণ চাল হল তখন—

দেখিনের মুস্তটা আড়ন্ত সত্যবন্ধু গোখের সামনে ভাসছে।

বাড়ির সামনে লথা সাইন। রাস্তা বন্ধ হয়ে দিয়েছে। ভ্রমণ, শীর্ণ ক্ষুধার্তের হল দু'কতে দু'কতে এসে পাড়িয়েছে। তারা তাদের হাতের প্যাকগুলো তুলে ব্যাভুল জীবকায় করছে। তাদের কাহা কোলে ছেলে—কেউ ঘরে এনেছে বুড়ো মাকে।

—এক মুঠো চাল হাও বাবা ! এক মুঠো চাল !

সে দৃষ্ট বেধে সত্যবন্ধুর সুকের বস্ত্র জল হয়ে গেল। নায়েবমশায়রইও প্রমাণ শুণলেন। বললেন,—হংকোবু, এত লোককে চাল ধোবেন কোথা থেকে ? ছুধিনের শক্রে কি হাত দিতে হবে শেষ পর্যন্ত ?

সত্যবন্ধু সেই অস্বাস্থিত কুপাশ্রাবীদের উপর একটা তীব্র ভীক জ্বলুটি নিক্ষেপ করে বললে—না। এক হুট চালও দেওয়া হবে না।

—কিন্তু কর্তা মশাই—

—আমি যাছি তাঁর কাছে।

এই বলে সত্যবন্ধু ওপরে উঠে গেল। কিন্তু ওপরে উঠতেই সত্যনাথ পাগলের মতো ছুটে এসে ছেলেকে বুকে মড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন—ওরে খোকা, দেখ দেখ, আজ ঠাঁহুর একী হলে আমার পরীক্ষা করতে এগেছেন! নাগেবর আজ যে শত ধান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন পথে ভিক্ষের তুলি নিয়ে! হে, বন্ধু হাতে ওধের তুলি ততি করে হে। বলতে বলতে তাঁর চুচোখ বেয়ে নামল অশ্রুধারা।

সত্যবন্ধু প্রথমে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তারপর নিতকে সামলে নিয়ে ছুট স্বরে বললে—আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন বাবা? চল্লিশ টাকা মন চাল! সেই চাল বলছেন মুঠো মুঠো বিলিয়ে দিতে। আমরা বাব কি?

সত্যনাথ ছেলের গিটে হাত দিয়ে দ্বিভ্র হয়ে বললেন—নগেবরের প্রসাধ।

—সেটা ছুটে কোথা থেকে? একটু ভাঁকু স্বায়েই বললে সত্যবন্ধু।

এ কথা শুনে সত্যনাথ গম্ভীর হয়ে বললেন—সে তোমার ভাবতে হবে না। বাও। আমি মরি নি এখনো।

মাথা নিচু করে সত্যবন্ধুকে নেনে আসতে হয়েছিল।

তখনো সত্যনাথ বলছেন—জোতবের পাগের প্রায়শ্চিত্ত আমিই না হয় কব্ব স্ববাস্তব হয়ে। তার ক্ষতের তরপাই না।

আজ হাসি পার সত্যবন্ধুর।

—পুণ্ডর সেটিমেট! ওরকম মনোবিকার নিয়ে এ যুগে বাঁচা যায় না। সে বছর চাল-বিলিৎ জ্বড়ে বে ক্ষতি হয়েছিল তার ঘের চলেছিল অনেক দিন। অুৎস তার আঁচ দাবার গায়ে লাগেনি এতটুকু।

কিন্তু এমনি এক একটা ছল—এমনি এক একটা পাগলামো যে সত্যবন্ধুর সম্মান কত নীচে নামিয়ে দেয় তা বুদ্ধ কিছুরতই বুঝতেন না—বুঝতে চাইতেন না।

এইতো সেদিনের কথা। হঠাৎ একদিন রাত্তার ভিড় জমে গেল—ছেলে থেকে বুড়ো। তারা হাসছে—হাত-তালি দিচ্ছে—খাচা করছে।

—কী ব্যাপার। শবর এল সত্যবন্ধুর কাছে।

—শিগ্গিরি যান হাংহাবু, আপনি সামদান দে। নারেব বললে বাস্তব হয়ে।

ছুটল সত্যবন্ধু। গিয়ে বেঁচে অবাক কাও!

বাবা মাক্স রাষ্ট্রার বগে ভালা কাচ কুড়োছেন একটি একটি করে।

সত্যবন্ধু গিয়ে বললে—একী করছেন আপনি!

দীর শাস্ত্রবরে সত্যনাথ বললেন—রাষ্ট্রার একটা বোতল-ভালা পড়েছিল, কার পায়ে লাগবে তাই কাচগুলো কেলে দিছি।

একবার ভিড় থেকে আবার একবার হাদিরি বলা উঠল। সত্যবন্ধুর দুকান গরম হয়ে উঠল। কিন্তু সত্যনাথের হাত চলতে লাগল টিক আগের মতোই।

মনে পড়ছে সত্যবন্ধুর আর এক দিনের কথা। উনিশশো ছেত্তিশ লা। বাবা। চলছে। প্রতিদিন দুই পক্ষেব কত নিষ্ঠুর কার্যকলাপ। স্ববের কাগজের পাতার পাতার উত্তেজনা। প্রতিদিন বিকেলে সাএহ কোতুবল—কোন্ ব্যক্তিতে আস্তন লাগল?

এই নিয়ে একদিন সত্যবন্ধু তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে গিয়েছেন বাবার কাছে আলোচনা করতে।—একটা বস্তি নাকি নিৰ্ম্মণ হয়েছে আজ দুপুরে। কারার ব্রিগেড গিয়েছিল উদ্ধার করতে। কিন্তু পাড়ার ছেলেরা এ্যাকটিভ। তারা ভাতবিন ইত্যাদি দিয়ে গণ আটকে রেখেছিল।

অনেক আশা করে গিয়েছিল সত্যবন্ধু। কিন্তু ববলা টেলতেই চমকে উঠল। বিছানার ওপরে স্ববের কাগজ পড়ে রয়েছে। আর সত্যনাথ কোলের ওপর দুহাত বোদ্ধ করে চোখ বুজিয়ে অশ্রুধারা আসছেন।

এ যেথো সত্যবন্ধুর সখার অবাক হয়ে বললে—কী ব্যাপার?

সত্যবন্ধু গম্ভীর হয়ে বললে—তুলিস সেটিমেট। চল, নীচে যাই। ওঁর সঙ্গে কথা বলে আবার পাওয়া যাবে না।

অনিভা আর হাঁড়িরে থাকতে পারছিল না। সারা দিনের পরিশ্রম—তার ওপর কেমন যেন মনটা ভারী হয়ে আছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল বাটের দিকে। ইয়া,

এই খাটটা শব্দবন্দাই লব্ব করে তৈরী করে দিয়েছিলেন।
এই তো সেহিন।

অমিতা শুনে পড়ল বিছানায়। কি এসেছিল আলো
বিলে। অমিতা বজা খোলে নি। বাইরেই বেধে গিয়েছে
লঠনটা। বর অন্ধকার। আজ আর খুণ জাপা হল
না। না হোক। প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন থাকবে।
কেবল আজকের দিনটা বার থাক। আজকের দিন বিশেষ
দিন। এমনি করে তাঁকে শরণ করা আর তো কখনো
হবে না। যে চলে যায় সে যে এমনি করেছে নিশ্চিন্তভাবেই
চলে যায়। মানুষ কি চিরদিন তাকে সমানভাবে ভাবতে
পারে? ডাকতে পারে? প্রতিদিনের প্রয়োজন—প্রতি
মুহূর্তের নূতন নূতন সমস্তা যে সংসারীকে ঘিরে রাখবে।
তার বলবে—অতীতকে ভোলো। বর্তমানই সত্য। প্রস্তুত
হও অনাগত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্যে।

একদিন শব্দবন্দাই এলেন চুপি চুপি—অপরায়ী
মতো। হ্যাঁ, এই যত্নেই।

অমিতা সেলাই করছিল। হঠাৎ শব্দরক অসমর
এ ঘরে বেধে তাড়াতাড়ি মাথাধ কাপড় টেনে সংবত হয়ে
বসল।

—বোঁমা!

—বাবা!

—তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলান।

অমিতা লক্ষ্য করল বুকের ঢকল ঘুম। বীরে শান্তবরে
বললে—আপনি বসুন এখানে।

সত্যনাথ বললেন না। গাড়িরে গাড়িরে বললেন,

—ভাবছি নাগেশ্বরের পূজা-বন্দ করে দেব।

অমিতা চমকে উঠল।—সে কী কথা বাবা!

—হ্যাঁ, কী হবে মিথো পূজা করে! এ পাণের যুগে
পাথর পাথরই থাকেন—প্রাণ পান না।

এই বলে তার বিশাল রক্তাক্ত দুই চোখ মেলে ধরলেন
অমিতার মুখের 'পরে।

—দিনে দিনে ঘেঁষের কী অবস্থা হচ্ছে দেখছ তো মা!

অমিতা মাথা নিচু করল।

সত্যনাথ আবার বলতে লাগলেন,—বেশ থেকে খাটি
মানুষ চলে গেল। স্বার্থনর্ঘব মানুষ আর স্বার্থের লোভে

কী না করছে। ঘূষের জোরে মিথ্যার দর হচ্ছে—অপরায়ী
ওস্ত হতে না। চোরা-কাবরারির হল রাত্তা-রাত্তি লাল হয়ে
হয়ে উঠছে। দিনের আলোয় ঢলছে তামের চুরি! কেউ
বাধা দিচ্ছে না। কেউ না—

সত্যনাথ বামলেন একটু। সামনে একটা মোড়া ছিল।
সেইটে টেনে নিয়ে বসলেন।

—আজ খাতের ভেতরে তেজাল ঢগছে। বিব! বিব!
সেই বিবে ভিল ভিল করে মাহুদ মংবে। তারপর একদিন
এই বাংলা দেশ অশান হয়ে যাবে!

বলতে বলতে সত্যনাথের দুই চোখ জলে উঠল।

—কিন্তু সেদিন পর্যন্ত আখ্যায় যেন বেঁচে থাকতে না হয়
মা! হঠাৎ বুকের দু'চোখ বেয়ে অক্ষররা নামল।

অমিতা বললে—এদিন থাকবে না বাবা। আপনি
মনে জোড় রাখুন। স্বহিন আপনেষ্ট।

সত্যনাথ উঠে গাড়িরে বিজ্ঞেদের সুরে বললেন—গ্যগল
হয়েছ মা! যেহিন থেকে নাগেশ্বর আদ্যর সঙ্গে কথা বলা
বন্ধ করেছেন সেহিন থেকেই বুকেছি সর্বনাশ ঘনিরে
আগছে। ও পাথর আর আমি পূজা করব না মা! যে
যেবতা মানুষকে পত্ত করে সে যেবতা আমার নয়।

অমিতা বললে—এটা ঠিক কথা হল না বাবা। নাগেশ্বর
দুগ্ধযুক্তবের। তাঁর কি কোনো পরিমাণ আছে? কত
ডটা-পড়া কত জালা-গড়া গোখের সামনে দিয়ে হয়ে থাকে
তাঁর, তুমি শুধু তাঁর পাথরের গারে সেই ইতিহাস জড়িয়ে
রাখছেন নামোপবীর হতে। আপনি সত্যান পূজা করেন
বলেই—মা-পাওগার বাবা এত লাগে।

—কিন্তু—দু'চোখ বুজিয়ে স্বপকাল সত্যনাথ কী
ভাবলেন।—কিন্তু তা বলে তাঁরুরের কাছে কোনো
প্রার্থনাই করব না? বলব না, আদ্যের মাহুদ ভয় শার্ক
করে—আদ্যের মহুদ্যকে অমন করে হু'গারে মাড়িয়ে
যেও না?

অমিতা হেসে বললে—দেয়ে বাথাকে প্রণাম করে
এইটিই শুভ। কিন্তু সে যখন আশীংখ্য দাবী করে শুখন
সব জুতো।

সত্যনাথ চুপ করে রইলেন।

অমিতা বললে—এবার আপনি নিশ্চয় করুন যে বাবা, সত্য তাই হবে না। সুদিন আশ্বাসেই।

বুড় উঠলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন—না-না, ও তোমার স্তোকবাক্য না। আমি চোখের শাননে দেখতে পাচ্ছি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে গোটা দেশটা দখল হয়ে যাবে—খু—খু দখল! সে দখল সব পুড়ছে—কেউ রক্ষা পাবে না। আমার সত্যাবস্থা নয়—সত্যপ্রিয় নয়—সত্যভিৎও নয়। কিন্তু সে সূত্র দেখবার আগে যেন আমি মনতে পারি। আশ থেকে নাগেখের কাছে কেবল এই হবে আমার প্রার্থনা।

আশ্বাস এই মানুষ। বোধহয় সংসারে সত্য চিন্তা নেই বলেই কেবল ঐ এক চিন্তা। শুধু নিজে নয়—নিজের বাড়ি নয় গোটা দেশটা গেল এই ঠাঁয় ভাবনা। সোকে মিথ্যা বলাকে গোঁবে মনে করে—স্বার্থকে বড় করে দেখে—কথার কথার ডাকবাঁধি করে—আইনকে ভয় পায় না—যুধ হিংসে বড়ো বড়ো মহাধর্মীকেও টলাতে পারে। এই তো সেদিন বেশ বড় রকমের একটা ডাকডাঙি হয়ে গেল। অবশ্য পুলিশ ছিল সামনে। তারা হাসতে লাগল। এ খবর যখন সত্যাবস্থা পেলেন তখন তাঁর ঐ কীল ঘেঁষটা অগ্নিনিবার মতো লক্ লক্ করে জলে উঠেছিল। একবার বোমহস্ত ইচ্ছে করেছিল হংকং দিয়ে উঠতে, কিন্তু কাকে ধন্যক বেবেদ।

সেদিন পাশের বাড়ির একটি ছেলেকে দেখতে এসে ডাক্তার বার্ষ হয়ে ফিরে গেলেন। যে বঁটা ইন্ডেশন করেন সবগুলিই ঝাল। হতাশ হয়ে বললেন—এমন একটা যোকান আজ এখানে নেই যে আমাকে এই ওষুধটা খাটি বিতে পারে। ওষুধ মিলল না। ছেলটি মারা গেল।

সেদিন সত্যাবস্থার কী কান্না। ছুটে এসে আত্মল হয়ে ঠাঁয় নবজাত নাটিটিকে বুকে চেপে ধরতে লাগলেন। দু'হাত নুঠো করে বার বার বলতে লাগলেন একটা অবস্থা হল রে! তোরা বাঁচবি কী করে?

কয়েকটা দিন চুপচাপ রইলেন। হঠাৎ কথা বলা বন্ধ করেছেন সবার সঙ্গে। রাতদিন শুন্ম হয়ে থাকেন। তারপর হঠাৎ একদিন অমিতাকে কাছে ডেকে বললেন—আমি কি ভাবছি জান মা? চরিত্রের কথা। চরিত্রবল

যে আভির নেই, সে আভি কোনোদিন উন্নতি করতে পারবে না। আমার এই চরিত্রের সাধক হচ্ছে বাম্বার মেয়েরা। কিন্তু—আমার মনে হচ্ছে বাঙালী মেয়েরা সে চরিত্রবলও হারাচ্ছে। ইয়া হারাচ্ছে। তার মূল কারণ সত্যাব—হারিত্র্য। মানুষের গড়া দুটি—মানুষের গড়া দুই—মানুষের গড়া বাবা যে আশ সাধারণ মানুষকে কাহার—জুড়িয়ে দিলে। এই যেহেতু খবর। বলে সত্যাবাস সেদিনের খবরের কাগজের একটা। সত্যাবাস সত্যাবাসে দেখিয়ে দিলে। অমিতা পড়লে সংবোধিত। নতুন কিছু নয়, একটি উৎসাহী আত্মবিক্রয়ের বক্তৃতা কাহিনী।

—যেহেতু মা! বলতে বলতে সত্যাবাস বিচলিত হয়ে উঠলেন।

—সব যাবে—সব যাবে, এ আমি বলে রাখলাম। কিন্তু তার আগে আমি যাব—যেহেতু বীরের মতো যাব।

বলতে বলতে শিশুর মতো ছোট পালিয়ে গেলেন সত্যাবাস।

তারপর দিনে দিনে তার মানসিক অবস্থার অংশপতন শুরু হল। আপন মনেই বলল—সব যাবে।

ছেলেকে ঢেকে সাবধান করতে গেলেন। বললেন, এখনো যদি বাঁচতে চান, তাহলে সত্যাবাসে চল। চুরি ক'বি না—লোককে ঠকাবি না, টাকাবার লোভে মিথ্যা সাক্ষী দিবি—চরিত্র হারাবি—বল আমার পা ছুঁয়ে—বল—তোমার ব্যাটার মাথার হাত দিয়ে বল। নইলে মরাবি—

ছেলে ‘পাগল’ উদ্ভাষ বলে উপহাস করে বাপকে শেকল জুগে রাখলে।

সেদিন অমিতা ঘরে বসে গল্প করছিল অংশেকের সঙ্গে। সত্যাবস্থার অকৃত্রিম বন্ধ অংশেক। প্রায়ই আসে। নিচেই বলত। আশ উঠে এগেছে গুণবে—যৌধি, চা বাগান।

অমিতা তাকাতাড়ি চা করে দিলে। চা পেতে যেতে গল্প হচ্ছিল। ঘরে তখন আর কেউ ছিল না। হঠাৎ এই লম্বা অমিতার চোখ পড়ল বাইরের দিকে। চমকে উঠল—কে ওখানে?

খোঁজা খোঁজা বাড়িভরা একটা শিথিলচর্ম মুখ—জুই

জলন্ত চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অমন আত্মপোষণ করে কে দেখছে ?

চোখাচোখী হতেই সরে গেল মুখখানা। সঙ্গে সঙ্গেই হুপ ধাপ করে পাথর শব্দ।

অমিতা ছুটে বেরিয়ে এসে দেখে খন্তরনশাই। ছুট নিষেধ করে লুকেই হড়ান করে বিল বন্ধ করে দিলে। এ কখিন হাড়ি না কখিনে মুখখানা চিনতেই পারা যায়ছিল না।

এর পর সেই সেধিনকরে ব্যাপার। অমিতা কোড় হাত করে গোরালকে বললে—হাম বেশি মিস, কিন্তু বেশি দুষ্ট। ঘেন খাটি হয়। বোগা ছেলে খাবে।

সত্যনাথ এই প্রথম অট্টহাসি হেসে উঠলেন। সে হাসিতে অমিতা চমকে উঠল, চমকে উঠল অমিতার শিশুপুত্র, গোরাল পালানো ভয়ে।

এরকম হাসি সত্যনাথ এই প্রথম হাসলেন আর ঐ শেষ।

ছহিন পরে—রাত তখন নটা। মশা ঘরছিল বলে মশারি টাঙিয়ে দিয়ে নিষে চোরাংরে বলে গল্পের বই পড়বার চেষ্টা করছিল। খোকা ঘুমোচ্ছিল ভিতরে। অশোক ছিল এককণ। চা খেয়ে চলে গেল এইমাত্র। ঠিক এমনি সময় বাজ হয়ে গবে চুপলেন সত্যনাথ। দুগোথ স্তম্ভার্ত্ত। ব্যাকুল ভাবে বললেন—সত্যবন্ধ কোথায় বোমা—সত্যবন্ধ ? অমিতা ভাড়াভাড়ি সংঘত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, এখনো কেবন নিতো।

এখনো কেবে নি। ঘরে কে ছিল তবে ?

—অশোক।

সত্যনাথ হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

ভারপর একটু নামলে নিয়ে বললেন—খোকা কই ? খোকা ? আমার সত্যকল্যাণ ?

‘সত্যকল্যাণ’ এই প্রথম ডাকলেন ঐ নামে।

অমিতা বললে—ঘুমোচ্ছে।

—হাত, একবার আমার কোলে দাও।

অমিতা কিছু দূরতে পারলে না। ভাড়াভাড়ি মশারি বেঁকে ঘুমন্ত শিশুকে তুলে এনে বিতে গেল সত্যনাথের কোলে। সত্যনাথ হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ঠিক

এই সময়ে হরিকেনের আলোটা এসে পড়ল খোকার মুখে।

সত্যনাথ ঘেন চমকে উঠে দু পা দিড়িয়ে গেলেন।

—কী হল ? গিনিত অমিতা জিজ্ঞেস করলে।

কিন কিন করে চাপা গলায় সত্যনাথ বললেন—আলোটা ভাপো করে গর দিকি।

অমিতা আলো ধরল ছেলের মুখে। শ্রাব্যিষ্ট দৃষ্টি নিশাপ চোখ—মুখখানি টাপার মতো দ্বিত।

কিন্তু সত্যনাথ সে রাতে সেই ঘোলাটে আলোর তাঁর প্রবীণ দৃষ্টিতে ঐ মুখের ওপর কী দেখা পড়লেন—কী গোপন স্বাক্ষর উজ্জ্বল করলেন কে জানে ?

দাঁতে দাঁত চেপে অমিতার দিকে অরি দৃষ্টি বর্ষণ করে বলে উঠলেন—সর্বনাশী ! আমার আগে তুই মরলি ! উহ তা হতে হবে না। বাবা নাগেবর শাকী আমি যে তাঁর মাথা ছুরে মগধ করেছি।

এই বলে আবার ছুটেতে ছুটেতে গিয়ে নিষেধ ঘরে বিল দিলেন। অমিতা শুদ্ধ বিষয়ে হাহুং মতো ঝড়িয়ে হইল। সে রাতেটা কাটল অমিতার দারুণ অস্বস্তিতে। প্রতি মুহূর্ত্তে কেমন ঘেন ভয় ভয় করতে লাগল। প্রতিক্ষণেই মনে হতে লাগল কোথায় ঘেন কিদের শব্দ হচ্ছে।

একবার বুদ্ধি সত্যবন্ধকেও সচেতন করে বিঃদ্বিঃ। কিন্তু সত্যবন্ধ কেবলমাত্র সাড়া দিয়েই পাশ ফিরে গিয়ে হইল।

না, ঘুম এল না।

—হঠাৎ মনে হল শব্দের কথা। দুঃসাহস—বিচুহিন ঘরে শরীর মন ঘেন কেমন হয়ে গেছে। কী কথংঘন এখন ? হঠাৎ কোনো অসুখ কখনে তো ?

একবার অমিতা তাবদ হারিকেনটা নিয়ে উঠে গিয়ে খবর নিয়ে আসে।

কিন্তু পরক্ষণেই কেমন ভয় ভয় করল। মনকে বুঝালো থাক না, ঘুমোচ্ছেন ঘুম। শুধু শুধু ব্যাভাত করে লাভ কী ?

কিন্তু আর হঠাৎ তাকে সর্বনাশী বললেন ? কী দেখলেন তার শিশুপুত্রের মুখে ?

এই রাতের অন্ধকারেও অমিতার মুখখানা ঘেন পাংড

বর্ণ যয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বাগিষে মুখ গুঁজে চোখ বুজিয়ে ঘুমের কোলে আত্মসমর্পণ করবার চেষ্টা করল।

পরের দিন ভোরের আলো নুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অমিতা উঠে গিয়ে বস্ত্রের বহোজার করাঘাত করল।

—বাবা—

শাড়ী পাগড়ী গেলনা।

অমিতা পুনরায় ডাকল—বাবা—

এবারও কোনো উত্তর এল না।

তখন উন্নতের মতো অমিতা আঘাত করতে লাগল ঘরোয়ার। কিন্তু ক্রম ঘরোয়া খুললনা কেউ।

অবশেষে ঘরোয়া ভাঙতে হল। মড়্ মড়্ করে সেতালের পুঁইগো ঘরকা ভেঙ্গে পড়ল। বাইরে তখন বহুজনের ত্রিড়—সত্তর সায়েহ দুটি নিঃশব্দ হল ঘরের ভিতরে।

হ্যাঁ, যা শুধু করেছিল তাই।

অমিতা ছুঁচোখ আঁচল চাপা দিয়ে ভুতরে কেঁপে উঠল—বাবা গো।

যবাসনয়ে পুঁদিল এস। তারা উদ্ধার করলে এক ইকরো ছিন্ন পত্র... সব নথয়ে—তিল তিল করে নিরুপায় অপমৃত্যু এগিরে আসছে! ইতিমধ্যেই সে মারণবজ্র গুপ্ত হয়েছে ঘরে ঘরে। আদি ভীত, তাই পালিয়ে বাঁচলান। সত্যমেব জয়তে!

সত্যবদ্ধ অনেক হিসেব করে যেখল, অমিতার কথা শুনে এক বিয়েরই খচো পড়তো হুশো টাকার ওপত। সেটা গোয়ালার সঙ্গে বড়বস্ত্র করে নামিয়েছে বেড়শো টাকার। কম টাকা বাঁচল না! অথচ সবাই ঘেনে পেল খাটি বিয়েরই সূঁচি ভাঙা হয়েছিল।

সত্যবদ্ধ একটা সুখের আলিঙ্গি ভেঙ্গে উঠে ঝাড়াগো। অমিতাকে একটু তোলালানো বরকার। ও খোখ হয় মনে মনে সন্দেহ করেছে তাকে।

অশ্বত্থের দিকে এগিরে চলল সত্যবদ্ধ বিলাসী নাগকেব মতো।



মনোহারিণী

অশ্বিল রায়

লাল সুরকির রাজা রাজা লবা হয়ে চলে গিয়েছে।
নিধির সিঁদুর-বেধার মত অনেকটা বেধেছে।

সোজা রাজা। এব এক বাবে সরকারি ইংসপাতাল,
অন্ত পাবে মোহনলালের মনোহারি বোকান।

এটা শহরের একটা মনোহারি দিক। বেশ ছিমছমে
পরিভার পরিষ্কার, আর খুব নিরিবিদিশ।

কিন্তু শহরের আসল চেহারাটা একটু তফাতে।
মোহনলালের বোকানের দ্বা দিয়ে পাথরে-বীধানো রাজা
গিয়েছে পস্তার দিকে। এই রাজার উপরে বোকানের
মোলা।—বুঁধিখানা, পানবিড়ি-সিগারেট, রেস্তোরাঁ; আর,
এই রাজার উপরেই মোটরগাড়ির বুকিং অফিস; এবং
একটু এদিয়ে গেলেই বাজার। সোকে সোকাবাণ্য এই
দিকটা, যেমন বিজি, তেমনই মোটো, এবং কোলাহলও
সেই অল্পপাতে। টম্‌টম্‌ আর পালকি গাড়ি হুড়হুড় শব্দে
চলাফেরা করে, রাজার পাথরের সঙ্গে ঢাকাব লোহার
ঠোকাঠুঁকিতে ভয়ংকর আওয়াজ বেব হয়। সেই সঙ্গে
পাল্লা দিয়ে বেগে ওঠে মোটরের বর্ণ।

শহরের এ একটা কিছু নতুন রূপ নয়।

বেকোনো শহরই অবিকল এমনি। এব আসাধা
বর্ণনা দিয়েও অস্ত কোন শহর থেকে একে আলাপা করা
যাবে না।

অথচ, হার টান থাকার তার থাকেই। কেন টান,
কিসের টান—ভাত হয়তো বুকিয়ে বলাব সাধ্য থাকে না।

নন্দনগাছির মেয়ে বনলতার টান এই শহরের উপর।
এ-টান আজকের নয়। দে বখন একেবারে ছোট, তখন
তার মেধবা একবার রঙনা হল এই বোতালিয়া শহরে।
সেদিন সে বায়না হয়েছিল, আমি যাব। ছোট সে, তাই
সেদিন তাকে বন্ধ দিয়ে থামানো হয়েছিল।

কিন্তু এখন ? এখন বনলতা আর ছোট নেই। তেইশ
বছর পার করেছে সে গত ফাল্গুনে।

বনলতা একটু বাক্য মেয়ে। জোথ একটু টগারা,
মেধবা একটু চড়া।

চোখের লজ্জা তত নয়, শতটা তার মেধাবের খাতিরে।
এখন তাকে ভোগাণ্য করে চলতে হয়।

বহুত ছহ-শাত হয়ে, বাবুদেবপুত্রের অনঙ্গ তলাপাত্রের
সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। অনেকটা নরম মাহুথ, একটু
রদিক।

বলে, অনঙ্গ কথার মানে জানো ?

—কি ?

—মদন।

বনলতা সোমাস্ত্রিক অনঙ্গর বিকে তাকায়, কিন্তু বনে
হয়, সে বুকি চেয়ে আছে ঐ মদনে পাছটার বিকে,
বিজ্ঞান্য করে, মদন কথার মানে বলে বাও।

ছহ-শাত বছর হল বিয়ে হয়েছে, কিন্তু বাক্য-কাজ
হয়নি এখনো। কাড়াঝাপটা মাহুথ। এইলজ্জা বনলতার
আখ্যার সেগেই আছে।

বলে, বীরসুন্দর বেলার চলো, নাটোবে দিয়ে থব
বেধব।

কখনো বলে, চলো বাই মালকী—ওখানে সোনার
নিভাই গৌর বেধে আসি চল।

বাওয়ার উপর উবু হয়ে বসে তুলো হাঁকায় তামাক
টানে আর হাসে অনঙ্গ। বলে, এক কাল করি চল ; চল,
চলে বাই পুরীধানে খটি রূপ বেধে আসি গিয়ে।

বনলতা বুকি একপায়ে ঝাড়া, তাং, বুকি সত্যিসত্যিই
বলছে অনঙ্গ। লজ্জাগাছে বল বিদিশ, মোদা হয়ে ষাড়িয়ে
বলল, চল। সত্যি, সত্যি, সত্যি ? তিন সত্যি কর।

অনঙ্গ হাঁকোটা ষাড় করিয়ে বেধে বলল, থং। আমার
বাবুদেবপুত্রই ভালো। এ-আয়গা হেড়ে কেউ কি কোথাও
যায় ?

বাবুদেবপুত্রের ত্রিটে থবে পড়ে বাহুক অনঙ্গ। কিন্তু

নন্দনগাছিত মেয়ের এমন কী দার পড়েছে যে, তাকেও
আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে এই ভিত্তি ?

—বাকের হবে না বুঝি ?

বনলতা তার ধামীর হিকেই চেয়ে গীড়াই, কিন্তু মনে
হয় বুঝি না সে তাকিয়ে আছে ঐ হাঁকোটার দিকে। তার
চোখের এই চাইনিটা যেন বড় যত্ন লাগে অনঙ্গর।

একটু একটু হাসে অনঙ্গ, বলে, আমার ঘরের লক্ষী।
বিয়ে করার পরেই পাঁচ বছরের মামলার কেমন রফা হয়ে
গেল, চকের ভটিটা বিলপুল পেয়ে গেলান।

ভেতে উঠল বুঝি বনলতা। বুট্টীটা কেমন এলোনেলো
জ্বায়ে নড়ে উঠল। বলল, বাক।

—বাকবে কেন ? লোক বলে না, ঘরে লক্ষী টাংরা
এলে ঘরে লক্ষী আসেন।

তল বিছিন্ন লজা-গাছে, হাতের খট্টা উঠোনের
মাটির উপর ছুঁ করে ছুঁড়ে কেলল বনলতা, বটির গলা
দিয়ে তল ছিটকে দিয়ে পড়ল অনঙ্গর চোখে-মুখে। লাক
দিয়ে উঠে ধাঁড়াল সে, বলল, একী করলি লতা ?

ছুঁ ছুঁ করে পা-কেলে সে বলল, কিছু করি নি।
ঐ খটি মাখ-নাই করে ছুঁতে পাবলে গায়ের ব্যথা যেত।

অনঙ্গ বসিকতা জানে, রসজ্ঞান তার কম না। কিন্তু
আচমকা বনলতার কথা ঐ শুনে তার সব রস-কল বুঝি
গুরিয়ে গেল।

উঠোন থেকে উঠে বাগারের পার হয়ে ঘরের মধ্যে ঢলে
গেল বনলতা। বে লজা-গাছে জল বিছিন্ন সে, হঠাৎ
বেন হয়ে উঠল সেই লজার মতই লাল।

এখন শুকে নিয়ে কি করা যায় এই এক সমস্যার পড়ল
অনঙ্গ তলাপাত্র।

কিন্তু রমণীর পাত্র সে নয়। ছোট-খাট এমনি ছ-
একটা স্নুস্কিতে অবেকধিন অনেক অধিকার হয়েছিল
এ-সংসারে। কিন্তু সংসারটা যে ছ বৎসাবে যায় নি, তার
অন্তে অনঙ্গই বুঝি বাহাদুরি আছে একটু।

আন্তনকে বাড়তে হিতে নেই। বোঁরা যখন শুন্নরতে
থাকে তখন তাতে হুঁ বিতে নেই। অনঙ্গর কাছে এই
হচ্ছে বুঝি একটা নত মহামন্ত্র। এবং এই নরটাই বুঝি
তার বশ্যকবচ।

সকাল পড়িয়ে গেল। ভেতে বোঁর উঠল আকাশে।
সন্নে পাছের ডালে বলে ডেকে উঠল পাখিরা। সেই
ডাকে কান পেতে ঐ পাখির ডাকের কথাটা মনে মনে
আঁতড়াতে লাগল অনঙ্গ তলাপাত্র। আসল কথা, অনঙ্গর
মল লাগে না এই মোকাবেলা। একটু আঁচ না হলে
শরীরের কিম্ব কাঁচের কেন। সবই যদি ঠাণ্ডা হয়ে থাকে
চাষগারেব, তাহলে শরীর তো কমে শক্ত হয়ে যাবে।

জাঁকী তোহ উঠে ত্রিভুবন যখন কলগে হেম, শুখনই
তো ডেকে গুঠে গুই পাখিরা। শুখনই সাড়া আসে তাহের
আঁশে, শুখনই অরীর হয়ে গুঠে তাহের আঁশের শিপাশ,
শুখনই তারা—

উঠে ধাঁড়াল অনঙ্গ, হঠাৎ দিয়ে উঁকি বিল ঘরে, আস্তে
বলল, বোঁ, বাঁধবি না ?

এই উত্তরে কোনো কথা বলে না অনঙ্গর বোঁ।

কিন্তু হাস ছাড়ার পাত্র নয় অনঙ্গ তলাপাত্র।

আবার বলে, কি হল ? বোঁরা হয়ে গেল নাকি। বোঁ,
কথা ক'বি না ?

সন্নে গাছ থেকে উড়ে গিয়ে তখন ঐ পাখিটা বসেছে
আম ডালে। সেখানে বলে একটানা ডাকছে সে। সেই
ডাক শুধান থেকেও ভেঙ্গে আসছে এখানে—অনঙ্গর এই
বাগ্যায় এবং অনঙ্গর কানে।

অনঙ্গ এবার একটু বেন বেগেই বলল, উঠবি নে তো।
তবে, হাটে চললান আমি। হাটে বসেই কলার খেয়ে
আসব।

তবু কোনো উত্তর বিল না বনলতা।

এততেও কোনো কথা না বলার অনঙ্গ বেন বুঝতে
পারল ব্যাপারটা খুব খোঁজা না। তাই হাটে গেল না সে।
ঘরে চুকে পাশে দিয়ে বলল সে বনলতার। তার
গারে হাত বুলিয়ে দেখার অন্তে হাত একটু বাড়তে
দিয়েছে অমনি বেন কোঁপ করে উঠল একটা কেউটে।

বনলতা বলল হুঁ !

—কি হল বে তোর লতা, হল কি তোর ?

কী যে তার হয়েছে তা সে বলতে চায় না। কিছুতে
বলবে না সে। তার এই চোখ নিয়ে এক কথা শুনেতে সে
চায় না। এই চোখ-দুটোই হয়েছে বেন সকলের চক্ষুশূল।

কেন, টারার মাহুণ কি আর নাই সংলাপে ? এই চোখ যদি ভালো করে লেগে না থাকে, তাহলে দাক কথা তাকে বলে হিলেই হয়, যেখানে দু-চোখ থাকে তার সেই-খানে বলে থাকে সে ।

বনলতার এবারের এ-রাস বেতে ছিন ছুই লেগে গেল।
তাক্ষর হয়ে গেছে অনঙ্গ। তার এই লগা বিবাহিত জীবনে
বনলতার এমন যেতাজ হেথল সে এই প্রথম।

রাতে শুয়ে অন্ধ বলতে লাগল কত কথা। এই
অন্ধকারের মধ্যেই ফিসফিস করে এ সব কথা বলা যায়।
হিনের আলোর বলা শব্দ। তবু, কুণ্ডলিতে মাটির এ
দীপের ছোট শিখাটা মাঝে-মাঝেই কেঁপে কেঁপে উঠতে
লাগল। সেখিকে চোখ ক্রিয়ের চেয়ে অন্ধকার বৃদ্ধি সংকট
হতে লাগল একটু।

অনন্ত বলল, কথার খেলাপ হবে না। এবার ঠিক
নিয়ে যাব বোয়ালিয়ায়।

কথাটা শুনেই বললতার শরীর কেমন কঁপে উঠল।
সেই শব্দের কথা বলছে অন্যত্র ? যে শব্দ দেবার লক্ষ্যে
সেই কবেকার ছোট বলা থেকে সে পাশল ?

কিন্তু ছোটবেলায় কথা থাকুক। আরো যখন বড় হলে, তখন এই শহরের উপর টান যেন আধো বাতুল তার। কেন? এ কেনর উত্তর দিতে পারছি না বনলতা। শুধু তার শরীরটা কেমন কঁপে-কঁপে কঁপে-কঁপে উঠেচাচ্ছে।

সেখানে আছে নাকি একটা নদী কিনার, সেখানে
আছে নাকি একটা মত্ত বাজার, সেখানে আছে নাকি বড়ো-
টুকটুকে লম্বা গুরুবির সড়ক।

আব আব আব, সেখানে আছে নাকি—

ସ୍ବପିୟେ କେହେ ଓଠଜ ବନଜତା ।

উপুড় হয়ে পড়ল তার মুখের উপর অনঙ্গ, বলল, হি হি
হি, কঁপে না। আর কখনো বলব না ঐ চোখের কথা।
আমার চোখের দ্বিবি।

বিস্তৃত কেন কঁপল বনলতা, তার এ কাগ্নার মানে কি—
তা বহির্ভূত বলবে এমন সাধা তার নেই।

সে কাঁধতে লাগল। অনঙ্গ তাকে দড়ই প্রবেশে বিচ্ছে
কান্না যেন তড়ই উপচে উঠছে তার বুক ঠেলে।

নন্দনগাছির যের বনলতা তার ফেলে আশা জীবনের
ছোট-কোনো গুণটিনায় আর নষ্টন করে অর্থহীন হয়ে বসি ।

ହୁବେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ, ନା, ନା, ନା । ଆମି
ସାବ ନା ।

মাথায় হাত বুলায়ে অনঙ্গ বলল, ছি, আর রাগতে
নেই। নিশে মাথ আমি। বেচিগে নিগে আসবই ঐ
মহর। ভোর একটিকিনের সখ।

সে শহরে এসেছে অনঙ্গ তুলাপাত্র তার পোকে নিয়ে।
 দানী বাজারের হোটেলসে উঠেছে ওরা।

লাল চওড়া-পেড়ে শাড়ি প'বে, কপাল পর্বত অ'লো
সোমটা টেনে শহর বেগছে ও ঘুরে ঘুরে ।

চাণা গলায় বসলতা বলল, এ কী শব্দ গো! এতো
আনাহেব নমনগাছির বাঘবাড়িতেই আছে, এমন বাঙা
বাঙা অনেক বেবেছি। জাংলান, কত লোক, কত
হট্টগোল কত কী!

মোহনশালের মনোহারি বোকাবটী স্বস্ত্র বেথার
 বিনিস। এত বড় বোকাবটী নিয়ে মানুষের করে কী। এত
 কমেবের বিনিস মানুষের কেনে কাণে লাগে? কিছুই
 ভেবে পায় না বনলতা। কেবল তাকাত্তে থাকে এঁক-
 গুদিকে। হঠাৎ বেথা হয়ে যায় কিনা কোনো চেনা পোকের
 সঙ্গে, নমুনগাছির কোনো মানুষ আছে কিনা এখানে—এই
 শয়রে।

কিন্তু যেখানে না কাটকে। তার এই আশে ঘোমটার
আড়ালে তারা চাপা পড়ে যায় কিনা কে জানে।

কিছু লম্বা সময়ে হুস ভাবল সেই দিনই। বাঙা-
রাজ্য ছেড়ে পাথুরে পর্বতের ইঁট: দিল শুধা। ওমা, এত
ভিড়, এত শোকান। এত নিমিস কেনে কারা গো ?
এখানকার বাহুবল্য সব হাঙ্গল নাকি ? এমন হলা কয়ে
কেন। টমটমে গাজোয়ানরা অমন চিলেছে কেন ?

বাণীর এলাকার দ্বারা বাণীর বসে গিয়েছে। লাল
পেড়ে শাড়ির আড়ালে ঐ সুবটী দেখার ক্ষেত্রে সকলের
চোখে কেমন একটা লোভের চাটুর্নি। ছুরি করে হায়ে
বনলতা, ছুরি করে তাকায় চারদিকে। অন্দর ঘরের
দিকেও চায় একটু।

তার ঐ চোখের দুটিটা বৃষ্টি ছড়িয়ে যায় এদিক ওদিক ।
মাহুবওশো হাঁ করে তাকায় ঐ মেয়েটার দিকে ।

অনঙ্গ ভিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগছে তোমার এ শহর ?
দ্বিবি । তোমার কেমন লাগছে গো ?

এ কথাই উত্তর দেবার সুদৃশ্য পেলে না অনঙ্গ । তরুণের
চোখাঙ্কে ওই হাওয়াগাড়ির লোকেরা, হাত ইশারা করে
ডাকছে তাহের, বলছে, এস এস । চলে গাড়ি গোঃগাড়ি ।
যাবে নাকি গো ?

অনঙ্গ তত বৌকে বৃষ্টি এমনিই ভিজ্ঞাসা করল, কি
যাবে ?

—কেঃখায় ?

—ঐ যে ডাকছে ।

চোখ তুলে তাকাল বনলতা । তারের দুটিটা তার চোখ
থেকে ঠিকই কোন দিকে চলে গেল বৃষ্টিতে পাইল না
সে । কিন্তু হঠাৎ বেধতে পেল সে কাকে ।

ধনক ঈড়াল বনলতা । বাজবাড়ির নায়েববাবুর
ছেলেটা না ওটা ? সেই পরিচোষ না ?

হাওয়াগাড়ির লোকটা ডাকতে লাগল তাহের, বলতে
লাগল, চলে গাড়ি গোঃগাড়ি । যাবে তো চলে এস চট
করে ।

বনলতার পা চুটো কঁপে উঠল । অনঙ্গর হাত চেপে
বলল সে এই দিনের আলোয়, এই বাজারের ভিড়ে । বলল,
ভয় করছে ?

কাক ভয় তা সে জানে না । জানলেও সে তা খুলে
বলবে কেমন করে ? সে যে ভীষণ কথা, আর তরুণের
কথা । নন্দনগাছির কেউ কেউ হয়তো জানে । কিন্তু
অনঙ্গকে সে কথা সে বলবে কেমন করে । হর্ণ মারতে
আরম্ভ করেছে হাওয়াগাড়ি, প্যাক-প্যাক প্যাক-প্যাক শব্দ
করছে । তাহের নন্দনগাছির বাজবাড়ির দ্বিবিতে এমনি
শব্দ করে ডাকতে রাজহাঁস । সেই শব্দ কথা মনে পড়ছে
বনলতার ।

দেই শব্দকথার সঙ্গে আরো অনেক কথাই মনে পড়ে

যাচ্ছে তার । নায়েববাবুর ঐ ছেলেটার কথাও । এই
শহরের কত কত গল্প কত সে । তার কথা শুনে মনে
হত পড়িয়ে বৃষ্টি এটা একটা খপ্পর ঘেঁষ । কত আনন্দ
এখানে, কত সুখ, কেমন রাজার হালে থাকা ।

নায়েববাবুর সেই ছেলেটার চেহারা এখন কেমন হয়েছে
এখন ! সে এখন এ' কী হয়েছে ? সে হয়েছে হাওয়াগাড়ির
গাড়োগান ?

অনঙ্গর হাত ধরে টানল বনলতা, বলল, চল ।

—কি, যাবে গোঃগাড়ি যেতে ?

—না, না, না । আমি বাড়ি যাব ।

—বাড়ি কোন্‌দিক এখানে ?

বনলতা বলল, গাড়ি ভাড়া কর । বাবুবাবুকে চল ।

পাগল হল নাকি তার বৌ । এমন মজির আর এমন
মেজাজের মেরে মাহুব নিয়ে রাস্তা চলাই যে যায় । নন্দন-
গাছির সব ঘোররাই কি এমনি । না, শুধু অনঙ্গের বরাতেই
এমনটা ছুটেছে ।

ওরা রাস্তার ওপারে গিয়ে ঈড়াল । বনলতার এক
কথা । আর ছোট্টোলে না, এখান থেকেই নিজে হবে
গাড়ি । বাবীবাবুর হয়ে নিয়ে হাওয়া হবে গাড়িটা ।

পৌটোলা-পুটলি তুলে নেওয়া হবে দেখান থেকে ।

—কন, হঠাৎ কি হল, বল তো লতা ?

বনলতা বলল, বাড়ি দ্বিবি । বলব ।

ওরা টমটম নিল একটা । ঘোড়ার গলার ঝুমঝুমি
উঠল বেধে । পাথরের রাস্তার ছোট চলল গাড়ি । লাগামের
বাঁট ঢাকায় বাজিয়ে দিত দিয়ে শব্দ করে খোড়াকে
জাতিয়ে তুলতে লাগল জোয়ান গাড়োগান ।

বাসুএর পা-দানিতে পা দিয়ে শিব দিচ্ছে পরিতোষ,
একচোখ ছোট করে সে বলে উঠল জাইজাইকে, পাখী
পালল ভাই পিঁজরা ভেঙে ।

—কানু পাখি রে ?

—গোঃগাড়ি চ', বলব অমন । লতা গল্প রে । বড়
মজার ।

কিছুই বলা যায় না

(গল্প)

ভার্মাপদ রাহা

মনোজ বখন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সিনেমা থেকে বেরল তখন আটটা বেজে গেছে। বাড়ি যেতে তার সুইছিল না মনোজের। সুখবরটা এখনও তার রক্তির কাছে পৌঁছে দিতে পারে নি সে। খবরটা যথেষ্ট স্তম্ভাব্য ওকত মন তার ছটকট করছিল, তার আগল নাম কিম্ব রক্তি মন,—সীমা।

মনোজ নামের সঙ্গে সজ্জিত হক। করতে কখনও কখনও আবার করে তাকে ঐ নাম ডাকে, আবার কখনও ডাকে না। আমোলাসে কেউ না থাকলে এবং আবারের এবল ইচ্ছা আগলে লাটা আতও বিস্তারিত হয়ে পাড়ায় লা-লা- 'মাই লাভ।' সীমা এতে আপত্তি করে না, কিন্তু হতে নামটা সে কিছুতেই বরখাস্ত করতে পারে না। পারে না তার কারণও অবশ্য আছে। সে কথা এখন থাক।

সেদিন কলেজে এসেই সে শুনলে অধ্যাপকের পঠিত টাকা জেনারেল ইনক্রিমেন্ট হয়েছে। অপ্রত্যাশিত শুভ-সংবাদ। ঠিক সেই সময়ই একটা চড়ুই মৃদু করে উড়ে গিয়ে বসল আর একটা চড়ুইয়ের পাশে। মনোজেরও ইচ্ছা করছিল এমনি উড়ে যেতে, উড়ে গিয়ে হাসিমুখে বসবে সে সীমার পাশে : একটা সুখবর আছে।

কি ? প্রথমে বলতে চাইবে না সে : 'হাট গেট্‌'।

কিন্তু সেই যাওয়া হচ্ছে তার রাত্রি সাড়ে আটটার পরে, বাড়ি যেতে যেতে সোয়া নটা বেজে যাবে। কি করতে, উপায় ছিল না। ইনক্রিমেন্টের কথা শুনে বন্ধু ব্যস্তদের মাঝে হেঁটে পড়ে গেল। অধ্যাপনার শেষে আজ্ঞা বদল, তারপর তাইই মত ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মাঝে যাবের বয়স, তারা সব হল বেঁধে কচি হাউসে গিয়ে বসল, তারপর সেখানে কক্ষির সঙ্গে কাজ বাহান চিত্তে চিন্তে ঠিক হ'ল আজ সব একসঙ্গে সিনেমা দেখা যাক। 'লেট্‌ আস্‌ জুইলো'।

সেই সিনেমা ভাঙল এককণে। মনোজ সেদিন ভাল

করে দেখতেও পারে নি কিছু, মন দিতে পারে নি,—হেঁচটা সিনেমা খবে থাকলেও মনটা পড়ে ছিল তার সীমার কাছে। সিনেমা খর থেকে বেরতেই একটা প্লেনের ছটকটানি শুনলে সে আকাশে। প্লেনখানা তাইই বাড়ীর দিকে ছুটে চলেছে।

ঠিক তখনই একখানা বাস এসে পাড়াল বাসীপঞ্জের। মনোজ বন্ধুদের কাছে ভাল করে বিদায় না নিয়েই উঠে পড়ল তাতে। বদবার জায়গা ছিল না, না থাক,—মনোজ পাড়িয়ে পাড়িয়েই যাবে, তার হরকার ঈশ্বর বাড়ি যাওয়া। বাড়িটা বেঁধে নিলে সে একবার, আটটা চলিশ। আতও পরত্যাগিন মিনিট।

প্রায় সাড়ে নটার বাড়ি পৌঁছল মনোজ। বাজা দুটি ঘুমিয়ে পড়েছে। অজানি ওবা ঘুমে সীমা : এতক্ষণ গান গাইত, কিংবা গিটার বাজাত। মনোজ গ্লান করে এসেছিল—সীমা গান গাইতে থাকলে ছুপি ছুপি গিরে পিছন থেকে তার দুই চোখ বন্ধ করে ধরে, কিন্তু এসে দেখে বাড়ি একেবারে দুহুবে মত নিশ্চয় : ব্যাপারটা—তেমন ভাল লাগল না মনোজের। ধীরে ধীরে উপরে উঠে পোর্ট কলিওটা টেবিলের উপরে রেখে ডাকলে,—সীমা।

কোন সাড়া পেল না। মনে হ'ল একটু অভিমান হয়েছে,—কিন্তু একটু ব্যক্তি হয়েছে তু ! মনোজ হ বহর আগের বিয়ের পরের দিনগুলি মত মধুর। খর আবার ডাকলে,—সীমা ?

সীমা একবার চোখ মেলে তাকালে, কথা বললে না। মনোজের মনে হ'ল সীমা : মুখখানা যেন একটু ক্যাকাশে যেখানে। সে বিছানার এক পাশে বসে সীমার কপালে সংঘে হাত রেখে বললে,—কি শরীফটা ভাল নেই ?—হাস্তটাও হয় নি ত'—সকালে একেবার বমি করতে দেখে গিয়েছিলাম ?

লীলা শুভ্র কোম কথা বললে না, স্বামীর মুখের দিকে কেননৈব্যাংকিত, নিঃশব্দ, নিঃশব্দ উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। মনোজ বুঝলে লীলা কি যেন একটা নিষাক্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রাবে,—শারীরিক অসুস্থতা নয়। সে পদম স্নেহে তার মাথার চুলের মাঝে আঙুল ঢালাতে ঢালাতে কাতর কণ্ঠে বললে, বাগ করছে আমার উপর,—দেখি করে এসেছি বলে ?... আজ একটা ব্যাপার ঘটেছে,—বড় বাছবরের পান্নায় পড়ে তাই একটু অসুস্থ হয়ে পেল, শুভা কিছুতেই ছাড়লে না, জোর করে সিনেমার নিয়ে পেল।

লীলা কোন কিছু না বলে ঠিক তেমন করে মনোজের দিকে চেয়ে রইল। মনোজ নিজের অপরাধ জ্ঞান করবার দ্রষ্টা বললে, সব কথা শুনে তুমি ওদের বা আমার কারোই ঘেঁষে দিতে পারবে না। যামে—কলোকে গিয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা সুখের পাওয়া গেল; আমাদের সবাইই পঁচিশ টাকা ইনক্রিমেন্ট হয়েছে।

মনোজ ভেবেছিল একবার লীলার মুখে একটু হাসি ফুটে উঠবে,—কিন্তু সে মনের কিছুই হল না, লীলার দৃষ্টি সেই আগেকার মতই নিরাসক্ত, নিঃশব্দ। ঘেঁষে এগার ঐতিমত ভয় পেয়ে গেল মনোজ। শ্রীর দুইখানা হাত নিজে হাতের মাঝে টেনে ব্যস্ত কণ্ঠে মে বলে উঠল, কি হয়েছে তোমার গো,—কথা বলছ না কেন, এমন একটা সুখের তোমার দিলাম,—আমাদের দুজনে ঠাণ্ডা পঁচিশ টাকা ইনক্রিমেন্ট একটা কম কথা নয়,—শুভ্র একটা কথা বললে না ?—কি অপরাধ করছি আমি ?—না শবীর খারাপ লাগছে ?—বলো,—কথা বলো।

লীলা একদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে তেমন করে চেয়ে রইল, দু'চোখের কোণ বেয়ে শুধু দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল। মনোজ আর থাকতে পারলে না, উঠে গিয়ে লীলার মাথাটা নিজের বুক টেনে নিয়ে বললে,—কি হয়েছে তোমার বলো,—তোমার এমন দুখ তার আর চোখের জল গুইতে পারি না আমি।

লীলা এখার স্বামীর মুখের তিস্তর মুখ দেখে দু'পায়ে কেঁদে উঠল : শত্রু আসছে আবার।

মনোজ তার মুখের কাছে মুখ এনে কাতর কণ্ঠে বললে

কি, কি বললে,—শত্রু আসছে আবার,—সে কি ?—খুলে বলা লজ্জা।

লীলা একটু বিরক্তির সঙ্গে বললে, জ্ঞান নেই না। জ্ঞানি আমি বরাবর করতে পারি না।

মনোজ একটু ধমতম খেয়ে একটু তেবে নিলে, ব্যাপারটা শুধুই গভীর হবার পেল তার কাছে,—দুঃখ দেখে দৃষ্টিতে মে মনে। আলিসন শিথিল করে ফুৎফুৎ পে বললে, এই একটি ব্যাপার নিয়ে বড় দুঃখ হাও তুমি আমার মনে, লীলা। যদি আমার কেউ আসেই,—সে কি তোমার শত্রু—এই বাবু আর মিছা কি তোমার শত্রু—ছি, ছি,—দুঃখ সবচেয়ে এমন কথা মুখে উচ্চারণ করতে নেই।

লীলা সেকালের কতকগুলি ভুলে সংস্কার গড়া মেয়ে নয়, বন্ধিমোত্তর বদীশ্রুতের শিক্তি মেয়ে। নি, এ শাসন করেছে সে, ইকনমিক্স পড়েছে, আই-এতে গভীর পড়েছে, নিজের জীবনের স্বপ্ন আছে, সাধ আছে তার—এবং সে প্রদর্শনও তার দৃষ্টির উপরে প্রতিষ্ঠিত। স্বামীর কথার উত্তরে সেই দৃষ্টি সমুদ্র অঙ্গ মনোজ অসুস্থ গুঠে,—বাড়াবাড়ি করতে গেলেই গুঠে বিধ।

লীলার কথায় যেন একটু প্রসঙ্গ তিরোদেব সুখ শুনেতে পেল মনোজ,—আত্মমর্গ্যায় আঘাত লাগল। তাই লীলার বেরনার কথা ভুলে গিয়ে সে আত্মপক্ষ সমর্থনে বললে, বাড়াবাড়ি এমনও কিছু হয়নি, দুটি এগেছে, যদি আর একটিই আসে, তাও এমন কিছু বাড়াবাড়ি হয় না।

লীলাও এবার উত্তেজিত হয়ে বললে,—হাঁ হর, আলবৎ হয় : বিয়ে হয়েছে আমারে ছ'বৎসর, এর মাঝে তিনটি এলে তা বাড়াবাড়ি হয়,—ঐচ্ছিক থাকলে—সবত জীবন ক্ষুদ্র। এই হারে আমাতে ক্ষুদ্র কলে আরও কটা আসবে, একবার হিসাব করে দেখ না,—লেন্থাপড়া ত শিবেছ।

ঠাণ্ডা কোম উত্তর দিতে না পেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলে মনোজ। তারপর বললে, কি করব বলো,—এ ত মানুষের হাত নয়...

উত্তেজিত হয়ে এবার উঠে বলল লীলা : কি বললে, মানুষের হাত নয়—কোন দুগে রয়েছে তুমি ? লজ্জা করল না বলতে ? আমারও বড় বাছব আছে, তাহেবও বিয়ে

হয়েছে, স্বামী আছে, তাহের কথার তাহের স্বামী বুঝে যুঝে চল....।

মনোজ বিজলের মত চেয়ে হইল স্রীষ সুখের বিকে, লীলা বলে চলল,—বেলায় কিছুই হয়নি এখনও, একটুও না,—সে বলেই, প্রথম দশ খাতা বছর ওপর কিছুই চাইনে তাই,—স্বামীকে নিয়েই থাকতে চাই,—ছুটিছাড়া পেলে ঠিক নিয়ে বেশ বিশেষে সুখ, সিনেমা থিয়েটার দেখা, গল্প করব—কিছুদিন ত এমন কাটুক, তারপর ভেবে দেখা যাবে—চাইলেও একটি ছুটির বেশি নয়, এখুণে মাহুত করবাইই ক্ষমতা থাকে না ; অথচ ওর স্বামী তোমার চেয়ে ঢের বেশি মাইনে পায়। সীতার বিয়ের চার বছর পরে মাত্র একটি হয়েছে,—কলে, আর বছর দশেক পরে আর একটি,—বাস্। অথচ—

মনোজ এবার উত্তর দিলে,—কেন,—তোমার বন্ধ ইচ্ছিকার,—কটি হ'ল ইচ্ছিকার ?—

লীলা অমনি বলে উঠল,—ও 'ম্যাট অব্ সিক্রিৎ'—মানে না,—আমাদেরই মত পদ্মাবে।

মনোজ একটু চুপ করে বলে ভাবতে লাগল, একটি সুখবর নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল সে, মনে করছিল সীলার সুখে হাসি দেখবে সে,—কিন্তু ছুটেছে তার মুখ থেকে ভিরকারের তুফা। লীলা যে জীবন বাপন করতে বলে তাকে,—তা তার মোটেই ভাল লাগে না,—'ম্যাটবিশিয়াল' কোন কিছুই ভাল নয়,—অথচ—। হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে সে সীলাকে বলে উঠল, দেখ সীলা,—মাহুতের ভাগ্যবিধাতা বলে কেউ আছেন,—তুমি বিয়ল না করলেও আমি কবি,—একটা অবুজ শক্তি—তা না হলে যেদিন তুমি আবার শত্রু আদহে বলে চিত্তিত হয়ে পড়েছ,—সেইদিনই কলেজে গিয়ে শুনলাম, আমার পঁচিশ টাকা মাইনে বেড়েছে,—বিনি শত্রু পাঠাচ্ছেন তিনিই সেই শত্রু পুখার টাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখলেন।

ওনে সীলা স্বামীর সুখের বিকে অতি চুঃখ শুখ মান হাসি হাসলে : একে খাবারতে খাওয়া বুঝা। বললে, এখন এ সব কথা থাক,—পরে হবে। হাতমুখ ধুয়ে নাও, তোমার খেতে দিই।

খেতে বসেও মনোজ মাঝে মাঝে নিজের মত সমর্থন

করেই নানা সুখের কথা বলতে লাগল,—সীলা তার একটিরও উত্তর দিলে না। রাজে স্বামী ঘুমিয়ে পড়বার পরেও সে ভেগে থেকে—সে নিজের জীবনের কথা ভাবতে লাগল,—নিজের জীবনের স্বপ্ন,—সে স্বপ্ন তার সকল হবে না, তার স্বামী অবুঝ।

চাওয়ার ছিল তার খুব বেশি নয়, খুব সামান্যই। স্বামীর ভালবাসা,—মিছে অভিযোগ করবে না, তা অবশ্য সে পেয়েছে,—এর সঙ্গে ছিল সহনশীলতা ছোট একখানা বাড়ি, একটু সুখের বাপান, একটা অর্গান, একটা ছোট ক্যামিলা লাইব্রেরী, পড়াশুনা আর গানবাঁজনার লস্ক কিছুটা অবসর, স্বামীর ছুটিতে কিছু বেশ ভ্রমণ, আয় বয়স হলে একটি বা দুটি সন্তান। কিন্তু সব তার তথুপ করে দিল স্বামীর অবিবেচনা। যেমন করে গুঃ আসতে শুরু করছে তাতে কোন আশাই ওর পূর্ণ হবে না।

যথা সময়ে শত্রুর আদির্ভাল হ'ল। শত্রু পুরুষ। কিন্তু সুখখানা বড় সুন্দর,—অনেকটা মনোজের মত। বৃচ সংকল্পে এবার মন বাঁগলে সীলা,—স্বার না। কিছুতেই না। মনোজের সঙ্গে অনেক আলোচনা হ'ল এ নিয়ে। মনোজ কথায় দিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাবতে পারলে না, তার ভয় প্রতাপ্তি প্রতিশোধ নেবে, কতদিন কিছুই ভাল নয়।

চতুর্থটি আসবার পর সীলা আর অসুযোগ উপরোধ করে নি স্বামীর কাছে, অসুযোগের বেংছে। এবার শুখ ভাগ্যের কাছে 'কমপ্লিট মারোভার।' ভাগ্যও অসুগত জন্মের লস্ক বঝাযোগ্য জবিস্ত বচনা করতে আচ্ছন্নিয়েগ করেছে।

সুখশান্তি অবসর একে একে বিহার দিল সীলার জীবন থেকে, কারণ নিবিষ্ট সময়ে পর পর আরও তিনটি এসেছে তার জীবনে। গান ছেড়েছে সে,—গাইবে তার সময় কই, ছেলপিলে মাহুত করা আছে,—তাহের একটু পড়াশুনা দেখিয়ে দেওয়া আছে। বই পড়াও ছেড়েছে,—খবরের কাগজ পড়বারই সময় পায় না। লাগোজের পরমা নেই। সামাজিক আমরণ নিমন্ত্রণ খাওয়াও ছেড়েছে সে,—একবার এক বিশিষ্ট বক্তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ বন্ধা করতে যাওয়ার পর। বন্ধ বেবা দিজে পঁয়ত্রিশ বৎসর

বয়সে বিয়ে করল,—তার বাড়ীতে যাবার পর। সেখানে বেলা এসেছিল—তার স্বামীকে নিয়ে,—সাক্ষ্যে গেল চাল-চলন দেখে মনে হয় এই মাস কয়েক আগে ওদের বিয়ে হয়েছে,—মীরা এসেছিল তার আট মাস বছরেও ছেলে নিয়ে। আপনসের মত লাগতে গেল,—স্বামী পোষাক পরা যেন একটা ভুল। ওদের দু'জনেই স্নেহ নিয়েও অবস্থা তুলনা করে ও যেন মরমে মরে গেল, সেই থেকে বন্ধুত্ববোধের বাড়ীতে নিঃস্বপ্নে যাওয়া ছেড়েই হয়েছে। হাওয়ায় নগ্নে পিয়েছে কাছে কাঁধবোরে শুধু নিজের বাপের বাড়ি, যেখানে নিজের সন্তানের অশুভ বৈধ সামান্য পরিষ্কারে স্তুতি করে যাবার ইচ্ছা না থাকলেও যেতে হয়।

এর পর দীর্ঘকাল কেটে গেছে। স্মৃতির পটিন বৎসর ঘরে ভাগ্যবিধাতা—তার অসুস্থতা বংশবধ ওস্তেদ তাগ্য হুচনা করেছেন।

কাল বৈশাখী মরাতাণ্ডব অনেক কাল ধেনে গেছে,—প্রচুর বর্ষণে ভূমি উর্বর করে ফসল ফলিয়ে বিহার নিয়েছে সে, এখন ফসল বেধার পালা।

মিহু হুন্দরী, গ্রাজুয়েট,—তা ছাড়া মায়ের কাছে গান শিখেছে সে, গলা বড় ভাল, তাই বিয়ে হয়েছে তার আরও ভাল, জানাই তিনটে এন, এ পাণ করা হলেও প্রায় ক্রোড়-পতি। দুই চুটী মোহাব কাঁধবান, তিনটে ইটখোলা এবং একটা কটন মিলের মালিক সে। বড় ছেলে বাবলু, ভাল মান স্বয়ংক্রিয়, হাওয়ার বেডের মাইনের চাকরি করে—তার ভগ্নপিত্রই শুধানে, ডেভলপমেন্ট অফিসার। মেজ প্রকোষার হয়েছে সেও শ'হুয়েক পাণ, টিউশনীতে আরও শ'হুয়েক।

মিহুর স্বামী শান্ত্রীর বড় ভক্ত, কোন ঠাঁয়ে মিহুর হুঁধে শান্ত্রীর আশা আকাঙ্ক্ষার কথা জানতে পেরে হেডেট পার্কে শান্ত্রীর মনেই বিবাহবন্ধ একখানা বাড়ি করে দিয়েছে। সামনে তার স্কুলের বাগান,—একপাশে লন। পিছনে 'কিচেন গার্ডেন'।

স্বামী এখনও চাকরি করেন,—বাড়িতে বাড়িতে শেষ পর্যন্ত শ'চারেক হয়েছে—বইয়ের আর শ'হুয়েক, বড় ছেলের বেড় হাওয়ার, মোজার শ'চারেক, নিজের বাড়ি। লীলার হুঁধে থেকে দু'চিহ্নার বেধা কেটে দিয়ে,—এখন মেজ মনেছে,—

চক্চক্ করে। গানের দিষ্টা মিহুই ডোমাস্টিক থেমে একটা অর্থান কিনে গুচ্চ বস্ত্রিগা দিয়েছে। এখন বি-চাকর টাকুর আছে, হাতে অবসর এসেছে। লীলা এখন সেই অর্থান বাড়ির ছোট মেয়ে লগাকে গান শেখায়, মনে মনে ভাবে মেয়েই বা কম কিসে, মিহুর বেলায় ত দেখলাম।

লীলা এখন খুশি,—বেশ খুশি। মাঝে মাঝে একটা কথা মনে পড়ে হাসি পায়। হাসিরই কথা। স্বামীকে বলবে কি ? না এখন থাক, লজ্জাও করে।

সত্যিই সন্তানেরা আনন্দ দিয়ে তার কম নয়। এই পরে আরও আনন্দের কারণ ছিল তার।—চতুর্থ সন্তান তৃতীয় পুত্র অমিত্যত দিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করলে,—শুধু পাশ নয় বিত্তীয় স্থান অধিকার করলে সে। বক্তব্য স্বামী তারতের পক্ষাবলম্বী পরিকল্পনাকে। পানের পরই চাকরি মিলে গেল তার, বেশ ভাল চাকরি। মাস চারেক পরেই এল বিয়ের প্রস্তাব। অমিত্যতের 'বসু'-এর একমাত্র মেয়ে গোবী। গোবী হুন্দরী, স্বাভাবিক। প্রেনিডেন্টোতে বি, এ পড়ে, আর অবসর সময়ে বসিপ্রশিক্ষিত পায়। গোবীর বাবা মিঃ চৌধুরীর অবস্থাত ভাল। বুকেলে বিয়ে দুয়েক জীবির উপরে বাড়ি,—পাশ রয়েছে আরও বন বিধে। যৌতুকে এর দুই বিধে গোবীর বহু পাণে,—আর পাণে বাট জরি সোনা, হাওয়ার পাঁচেক টাকা, বাট পাগড়, বেড়িও, অর্থান, আরও কত কি।

মিঃ চৌধুরী লীলার গ্রিমেট পার্কের বাড়িতে এসে সব কিছুই খুলে বললেন। লোকটি বেশ হাসিখুশি, অমায়িকও হটেন, প্রথম দিনের দেখাতেই লীলাকে বেদান এবং মনোজকে বেদায়ী বলে সন্ধান করে গেলেন। এঁরাও মেয়ে দেখে এলেন। মেয়ে দেখে দু'জনেই খুব পছন্দ। বিয়ে ঠিক হয়ে গেল,—কাজনে বিয়ে।

জানাইয়ের বাড়িতে করে মনোজ অ্যাক্টর স্বজন আর নিজের বন্ধু বান্ধবের নিয়ন্ত্রণ করে এলেন,—এর পরে লীলা বেকুল নিজের বন্ধুদের নিয়ন্ত্রণ করতে। আর কারও ক্ষেত্রে ভাবছিল না লীলা, বুক ঝাঁপছিল তার বেধা, বেলা, আর মায়ার বাড়িতে যেতে। ওরা তিনজনেই জীবনে হিলাব করে চলেছে।

লীলা ফিরে এসে শৈশব স্মৃতিস্রোত বাক্য করে। মনোজ্ঞ স্মৃতিস্রোত হৈ হৈ করে ঘুরেছেন, স্রোত হয়ে ছিলেন তিনি, তাই সকাল সকাল থেকেই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। লীলা বাড়ি এসে তাই স্বামীকে আর আগাল না। ঘরে এসে একবারে খাওয়া খাওয়া গেল। বরফা বস্ত্র কবচার লেগেই মনোজ্ঞের ঘুম ভেঙে গেল : কি,—কখন এলে ?

হুঁ মৌল আলো জলছিল। লীলা একটু হাসল। মনোজ্ঞের তত্ত্বাভিজ্ঞতা চোখে সে হাসি বড় মধুর লাগল। মনে হল বরফ ঘন তাড়ের ত্রিশ বছর পেরিয়ে গেছে। লীলা বললে, এই একটু আগে, তুমি ঘুমিয়ে দেখে আর আর ভাকিনি।

বেশ করেছে,—এখন কাছে এসে দেখি, সব শুনি।

লীলা কাছে গিয়ে হাসিমুখে নিজের বিশাল বৈশ্বাত্মিক গায়ে এলিয়ে দিল। বেশ একটা চাপ লাগতে লাগল মনোজ্ঞের, তবুও বাধা দিলো না মনোজ্ঞ, বললেন,—তারপর খবর—কি বলো, দেখা হল সবাই সঙ্গে,—আগে ত সবাই ?

লীলা মুখখানা বধা মস্তব গভীর করবার চেষ্টা করে বললে,—আমি ত বাববার বলে এলাম,—কি কবে, সবাই আগবে কিনা বলতে পারবে না।

কেন আসতে বাধা কি ?

বাধা অনেক,—এক একজনকে—এক এক বাধা।

কি বস্তু ?

লীলা এবার স্বামীর গা থেকে গা উঠিয়ে মুখখানা যথাসম্ভব বিষম করবার চেষ্টা করে বললে,—এক এক জনের কাছে যাই আর সে তার দুঃখের কথা বলতে শুরু করে,—শেষ আর হতে চায় না, আমিই বা কি করে উঠি !

কেন, কার কি দুঃখ ?

সে আর বলা না। মৌরার সেই 'ডলের' মত ছোট্টো বড় হয়ে একবারে বকে গেছে,—এক ছেলে হয়ে বড় বেশি আশার পেয়েছিল কিনা, লেখাপড়া হ'ল না, তা ছাড়া,—বা'ক সে সব অনেক কথা, পরে শুনে।

আর হলে-পিলে হয় নি ?

হয়েছে, আর একটা মেয়ে—আজকে পেয়ে সেও অবতার, —পরে শুনে।

বেলা, বেশার খবর কি, প্রথম দশ বছর ত বছরিন কেটে গেছে,—এখন কী ?

বেলা তার প্রতিজ্ঞা বেধেছিল,—দশ ব্রহ্মসংসার পূর্ণবৈ তার ছেলে হয়,—আর বছর সাতেক পরে আর একটা। বড়ই দুঃখের কথা আজ বছর তিনেক হ'ল—বড়টী মাঝা পেছে,—ছেলেটির বয়স এখন বছর সাতেক, ওদের স্বামী-স্ত্রীর দিন রাত তাবনা,—ছেলেকে তাদা মানুষ করে যেতে পারবে না।

হুঁ—গলে একটা মিথস্রব ফেলে মনোজ্ঞ বললো,—কেন ?—কেন মিথস্রবের কি দরকার ?

বেগার খবর আরও গুরুতর,—বিয়েই দরলে সে ত পরিত্রি। বছর সাতেক পরে একটা সন্তান পেতে এল,—কিন্তু জৈন্তারীর সময় হৌল হ'ল বিপদ, দিন পেরিয়ে গেছে, অর্থাৎ... শেষে অপারেশন করতে হল। ডাক্তার বললেন,—আমি দুটিকে ঝাঙাতে পারব না,—কেননা স্বামীর জৈন্তারী দরলে, অপারেশন করে চান বুলু।

স্বামী কি বললেন ?

যা স্বাভাবিক তাই বললেন, যাকে কোনদিন দেখেন নি, তার চেয়ে যাকে ভালবেদে নিয়ে কবেছেন তার উপরই মাসা খা'ক স্বাভাবিক,—বললেন, আপনি যা হয় করুন,—কেননা স্বাভাবিক।

তারপর আর হয় নি ?

কি করে আর হবে,—সুখ হতেই হুঁ এক বছর কেটে গেল,—তারপর প্রকৃতি নোটিশ দিলে।

মানে ?

স্বাক্স সেজ না। মেয়েটা তিরকালই মা হতে পারে,—না ? নোটিশ কারো একটু আগে আগে, কারো—পরে।

এইবার বুঝলেন মনোজ্ঞ,—বুড়ে স্বামীর হাত হবে তার মুখের দিকে চেয়ে বড় হেসে বললেন, তা হ'ল তুমিই জিতছে বলা ?

লীলার কৃত্রিম বিধাঘের মুখের গলে গিয়ে মুখে কৃত্রিম আর বিষয়ের হাসি মুটে উঠল।

মনোজ্ঞ প্রকৃত বয়সের দুটামির হাসি খেলে বললো,—তা হলে আমি ভাব করে যে তোমাকে ওদের অশ্রুপণ করতে দিই নি,—তা ভালই হয়েছে বলা ?

লীলা তার মধ্যবয়স বিশাল বৈশ্বাত্মিক স্বামীর বেধে বেধে গুরুতর বয়সের মতই স্বামীর মুখে মুখ ভাজে বললে, আমি না,—বাগ !—বুড়ো হ'লে তবু ছুটুক বাগেল না।

মানুষের সাধ্য

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সনৎবাণুর এই ঘটনা-পাণ্ডুর গুরুদেবটি ক্রমশ পাড়ার একমাত্র আলোচ্য হয়ে উঠল।

অথচ গুরুদেবও ঠিক নয়। সনৎবাণুরের কুলগুরু আছে, তাঁর কাছ থেকে হীকাত ওঁরা নিয়েছিলেন এর আগে। তাই হীকাত নেবার আর প্রসঙ্গ ছিল না। সনৎ বাণু অক্লান্ত নাকি বোকার মত প্রশ্নাব করতে গিয়েছিলেন যে সে হীকাত বিষ্ণুপেয়ে লিখে গঙ্গার তীরে দিয়ে নতুন ক'রে হীকাত নেবেন। কিন্তু ইনি লিখ কেটে বলেছেন, 'ধাপ্পে তাই কখনও হয়। গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভগে, সে পাণ্ডী নরকে মজে! ও কাল করতে আঁম কেব না কিছুতেই।'

সনৎবাণু আর কল্যাণ বাড়াতে সাহস করেন নি, চূপ ক'রে গিয়েছিলেন।

তিনি বোধ হয় গুরু কেন—সাক্ষাৎ ঈশ্বরের মতই দেখতেন এই সন্ন্যাসীটিকে! ভয়ও কতেন খুঁ বেণী।

সনৎবাণুর মীথনে এই গুরুদেবটি ছোটবার ইতিহাস বড় বিচিত্র।

সনৎবাণু এক-পুরুষে বড়লোক। এই গুলিতে বধন তিনি প্রধান আসেন তখন মণ্ডলপুর একখানা বর ভাড়া করে থাকতেন। সনৎবাণু, তাঁর না, ছোট তাই এবং স্বী। ডকে কাছ করতেন সামান্য বেতনে, কোনমতে মাথা শুঁজে থাকত। নাকে ও তাইকে গুতো হ'ত উঠানের দ্বারের এক-কালি রকে, সারা বাড়ীর সাথারিয়েন ফেলা পটা আবর্জনার মধ্যে। তাও বৃষ্টি এসে দুর্গশার শেষ থাকত না। ছেলে-বোকে ডেকে ঘোর খুলিয়ে এক ঘরের মধ্যে কোনমতে চুকতে হ'ত।

কথার বলে ক্রীভাগ্যে বন। সনৎবাণুরও তাই হ'ল। ধার্ড্রাস পর্বত বিজ্ঞা—কুলী ব চাকরি বলতে গেলে—বিয়ে করাও তাঁর উচিত হয়নি। তবু মার নির্বাক্তিঃবোই কাজটা করতে হয়েছিল এবং ক'রে ঠকেন নি। নতুন বো এতটা হাতিয়ে অভ্যস্ত নয়, মোটামুটি মাঝারি ধরনের

যে—নিভাত হঠাৎ কী একটা ভাল চোখে বেঁধে ফেলেছিলেন ওর বাবা তাই কারো কোন কথা না শুনে এই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন—কিন্তু বো মালতী কখনও একটি কথাও বলে নি। রান্না করা বাসন মাঝা সবই করেছে সে হাদিনুখে। শ্যুভী কিছু করতে চাইলেও সে করতে দেয় নি—'আপনি কি চিরকালই খাটবেন? তাহলে আমাকে আনলেন কেন? আমায় কি করব?' সে বাই হোক, যে বুদ্ধ এখানকার মালতীর ঠিকানা করে দিয়েছিলেন তিনি নাকি বলেছিলেন, 'এ ছেলে রাজরানী হবে। যে ঘরে ঘাবে সোনা উৎসে উঠবে। লক্ষ্যের অংশ এর জন্য।' সেই দুষ্টিই মালতীর বাবা দিয়েছিলেন ওর বিয়ের সময়—'গরীবের ঘরে পড়ল ত কী হল? ওর কপাল কললে ঐ ঘরই ওর দাঙপ্রাণার হবে!'

আর হলও তাই, মালতীর কপালই ফলল।

কী করে যে কী হল তা কেউ জানে না। সনৎবাণু হঠাৎ ঘেন কুলে কেঁপে উঠলেন। সামান্য টালিফোর্ক থেকে ক্রমশঃ একেবারে টিভেডোর হলেন। তাঁর পুরনো বাসা-বাড়ীর শাশের বড়ীটা কিনে এই বিরাট প্রাসাদ তুললেন, পরে আবার পুর্বনো বাড়ীটাও কিনে নিলেন। বহুবান্ধবরা অনেকে অহুযোগ করেছিল যে, 'এত পরণাই বধন থরচ করছে তখন এ গলির মধ্যে থাকবার ধরকার কি, বাগিচা বড় হাওয়া ওপর লম্বি কেনো। একে ত এই গলাগলিতে জীবন কাটানো, তার ওপর এখানের লোক কি কখনও ভুলতে পারবে তোমরা কী অবস্থার ছিলে? চিরদিন আনন্দ দিয়ে বেধাবে, লোকটা ঐ ও বাড়ীর একখানা ঘরে ভাড়া থাকত আপে—এত গরীব ছিল!'

সনৎবাণু হেসে বলতেন—'ভুল যে ঘর সেটা আশায়ও ইচ্ছে নয়।...মনে থাকবে বলছি এখানে থাক।'

পুরনো বাড়ীটা কিনে সেটাকেও এই প্রাসাদের অঙ্গীভূত করে নিলেন বটে কিন্তু এখন বৌশলই কলেন যে,

ওঁর সেই পুথনে তিনদিক-চাপা ছোট্ট ঘরটুকু অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়ে পেল। সেই ঘর আর তার সামনের চাপা চলনটা ছাড়া সবই ভাল, সবই বদলা—সবু পট্টক রইল ঐটুকু।

সনৎবাবু স্ত্রীও বলতেন, 'বাপু'র ঐ ঘরটুকুই যে আমার লক্ষ্মী।'

তিনি এ বাড়ী কেনবার পর ঐ ঘরটাই ঠাকুর ঘরে পরিণত করেছিলেন। অর্থাৎ লক্ষ্মী পেতেছিলেন ঐ ঘরেই।

তবু চিরচকলা লক্ষ্মী একসময়ে ঢকল হয়ে উঠলেন বৈকি।

নানারকম ভাগ্য-বিপর্যয়ে সনৎবাবু এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেন যে হারিডাই তখন আর একমাত্র আশা হইল না। আরও নানা রকমের সম্ভাবনা তারের অঙ্ককার মুখ ব্যাখ্যান করে সামনে এসে গাঁড়াল। বাড়ীটা স্ত্রীর নামে কিনেছিলেন—কিন্তু সেটুকুও বাঁচাতে পারবেন কিনা সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠল। এতটা বিষয় পিতৃগ্রন্থ স্ত্রীজন থেকে কেনা, গ্রহণ করা বাবে কি?

ঠিক সেই-সময়টুকুতেই এই সম্মানীকরণ বোঝা পেয়েছিলেন সনৎবাবু।

একদিন জোরবেলা উঠে দেখেন তাঁরই ফটকের বাইরে তাঁর গাড়ির ভিজেছেন লালকাপড়-পরা এক সম্মানী। মাথায় কটা নেই, মাথা কানানোও নয়, ঘোঁষ চুল ও গোঁফ বাড়ী। পায়ে একটা চাবর শেঁটা ভিজে লেপটে গেছে ঘেঁহের স্নেহ, তারই মধ্য দিয়ে বেগা বাচ্ছে সলাব কালো কালো সোলাকার কি এক পথার্থের মালা—সম্ভবত পদ্মবীতিয়।

অন্ত ভোরে কেউ ওঠেনি তখনও, সনৎবাবু হুস্তিয়ার সারসাত খুম হয়নি—ভোরাই-বাড়াসে একটু ছায়ে বেড়াবেন বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

হঠাৎ কী হল—সনৎবাবু নিচ্ছেই সব্ব হরহা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলে সম্মানীকে সম্ভাষণ করলেন, 'ভিজছেন কেন বাম্বীকি, ভেতরে আনুন না।'

সম্মানী খুশি ক্রিয়ায় চাইলেন ওঁর দিকে। শান্ত কিন্তু

কেমন যেন বহুস্তম্র চাখনি। শান্ত কণ্ঠেই বললেন, 'আমাকে ডাকছেন?—আজ্ঞা চপুন বাড়ি।'

স্তম্ভতরে এনে নিচের বৈঠকখানাটাতে বসলেন সনৎ বাবু, একটু ইতস্তত করে বললেন, 'কাপড়-চাষরটা ছাড়বেন? কিন্তু আমার ত সেসব্ব নেই।'

'না না ব্যস্ত হবেন না—ও এখনই শুকিয়ে যাবে।... হল হচ্ছে এখানটায়, তাই ভাবছেন?—আজ্ঞা আমি নিজে মিছে।'

সম্মানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভেতরের দিকে তাকিয়ে নিলেন একবার, তারপর উঠোনের ধারে গিয়ে কাপড়-চাষর কাঠ-করে নিজে নিজে একমাত্র যে কাঠের টুলটি বদলার পালে ছিল, সেইটি এনে আবার স্তম্ভতরে বসলেন।

সনৎবাবু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এইবার একটা কথা মনে পড়ল তাঁর। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা অমন করে ভিজছিলেনই বা কেন, সামনের বাড়ীর রকটার উঠে গাঁড়ালে ত পারতেন।'

'তা পারতুম। কিন্তু চলে যেতেও ত পারতুম।'— এই বলে একটু হাসলেন সম্মানী। বহুস্তম্র হাঙ্গি। তারপর বললেন, 'এইখানটায় এসে কী যে একটা আকর্ষণ অনুভব করলুম, মনে হল কে যেন আমাকে টেনে ধরেছে— তাই গাড়িয়ে ভাবছিলাম, আমাকে দিয়ে আবার কার কি হকায় পড়ল।'

সনৎবাবু অজ্ঞ কথা পড়লেন। 'ধাকেন কোথায়?'

'বেগানে আশ্রয় মেলে। মনে যে থাকতে বের।'

'আশ্রম টাশ্রম নেই?'

'আশ্রম? আশ্রম খুলে ত ঘর ছাড়লুম কেন?'

তারপর একটু হেসে বললেন, 'ঘুরে ঘুরেই বেড়াই। যখন খুঁজি অসুবিধা হয় ওস্তর কাছে গিয়ে উঠি। তিনি থাকেন কাশীতে।'

'এখানে আছেন কোথায়?'

'কেন—এই বাড়ীতে।' আবারও হাসলেন। তারপর একটু ধেমে বললেন, 'ভোরবেলায় শিগালঘর বেনেছি, কালোগাট যাবো বলেই চলতে শুরু করেছি—কে যেন টেনেই নিয়ে এল এই পসি:ত। পায়ে পায়ে এখানে এসে

কেন যে চুকলুম তা জানিনা। তাৎপর্য আবার টেনে ধরেই রাখল।

তবু এবং বিপজ্জনক ভণ্ড বলেই মনে হবার কথা—
একবার মনে হ'ল সনৎবাবুর কিছু কিছু বললেন না। কেন
কেন জানে বৎ একেবারে প্রেরণ করে বললেন, 'একটু চা
করতে বলি। চা খান ত'।

'সব খাই আমি।'

চা শুধু নয়। সকাল বেলাতে আবার চা ও গল-
খাবার। দুপুরে দুধা-তোজনেবও ব্যাপ্ত হ'ল।

বাড়ীস্থল লোক অথাক। জী সন্ধ্যা, ছেলেরা রুই।
চাকরবাকরও। আহারের পর একটু ঘেসে সন্ধ্যাসী
বললেন, 'একটা শুভ সন্ধ্যাসীকে খবর এনে চোকালেন,
তবু কবছে না? আর সবাই ত তবু পেয়ে গেছে!'

সনৎবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তবু
পাবার মত বিশেষ কিছু আর নেই স্বামীজী। আমি
জুবেই গেছি বন্ধন—সমুদ্রে যাব শব্দ্য, শিশিরে তার কী
ভয়?'

'কী বন্ধন, কী বন্ধন! মনে হচ্ছে আপনাই কাকে
লাগাবার অস্ত্র ভগবান এখানে আটকে ছিলেন।...যদি
আপত্তি না থাকে—বলুন না কী বিপদ।'

এত ছুঃখের হাসি পেল সনৎবাবুর, লোকটার খুঁততা
যেবে। তবু—কী যে মনে হল তাঁর, কাগজটা আঁক
বুঁজে পান না মনের মধ্যে—বিপদের কাবশ এবং পূর্ব
ইতিহাস সব খুঁজেই বললেন সাধুকে।

নীরবে বসে সব শুনলেন সন্ধ্যাসী। সনৎবাবুর বিস্মৃতি
শেষ হলে বললেন, 'এ আপনায় অতি-লোকেরই শাস্তি।
নিঃস্বপ্ন হওয়াই উচিত আপনায়, তবু কোন কারণে হেঁসছি
আপনার ওপর বৈষম্যসম। সম্ভবত পেটা আপনায়
সহধর্মীরাই স্তুতি। না, আপনায় বিপদ কেটে যাবে।'

এই বলে একটু বেদে বললেন, 'আজ্ঞা, আপনি এইটে
ক'রে দেখুন ত'।

অতঃপর তিনি গুটিকতক কর্মপন্থা বাংলায় সনৎ-
বাবুকে। কোন আধ্যাত্মিক পন্থা নয়—নিত্যস্বয়
ব্যবহারিক।

সনৎবাবু লাগিয়ে উঠলেন একেবারে। আশ্চর্য, এই

সোজা কথাগুলো মনে হয়নি তাঁর। শুধু তিনি কেন—
এক বড় বড় উকীল ব্যাবিষ্টারভাণ্ডার কি নূর্ব। আইনের
এক বড় ঝাঁকটা তারের চোখে পড়েনি!

তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে একেবারে স্বপ্নবৎ সন্ধ্যাসী
পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, 'শুভাই ভগবানের রূপান্তরে আপনি
এগেছেন আশ আমাকে ঝাঁকতে।'

সন্ধ্যাসী মুখে তেমনি বহুসময় হাসি, এখানে বাধা
হিলেন না বটে, কিন্তু মুখে বললেন, 'এর মধ্যে এমন কিছু
ভগবৎ-রূপা নেই, সোজাশুদ্ধি সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার।'

সেই যে সন্ধ্যাসী পা জড়িয়ে ধরলেন সনৎবাবু, আর
ছাড়লেন না।

তিনি ঐ সন্ধ্যাসীর পরামর্শই ঝাঁকলেন। তাঁর কথামত
ঠিক ঠিক চলে শুধু যে সেই ভয়বৎ আশ্রয় সর্বশেষ থেকে
ঝাঁকলেন তাই নয়—তাঁর পায়ে এতটুকু আঁড়ও লাগল
না। যারা এসব ভেতরের কথা জানেন না—তারা অথাক
হয়ে তাৎক্ষণিক কবতে লাগল সনৎবাবুর স্মরণীয় বুদ্ধির। ইয়া
—এ বন্ধন বুদ্ধি না বলে আর এত পরশা কবতে পারে!

সেই থেকেই ঐ সন্ধ্যাসী বা সনৎবাবুর নবলঙ্ঘ্য 'জগৎ-
ধেব'র প্রতিষ্ঠা এ বাড়ীতে!

শুভস্বপ্নকে আশ্রয় করে দিতে চেয়েছিলেন সনৎবাবু,
বাড়ী, মন্দির—সব কিছু। কিন্তু তিনি কিছুই নিলেন না।
যখন থাকেন এখানে তখন বেশ থাকেন—হঠাৎ মাঝে
মাঝে চলে যান কোথায়। কোথা যান তা বলনও না।
যেমন নিজেই যান তেমন নিজেই এসে ছাড়েন হন।

সনৎবাবু দরত বললেন, 'ঠিকানাটা একটু যদি জানাতেন
প্রভু—কোন বিপদে আপদে পড়লে বাসতে—'

'ভয় নেই। কোন বিপদ আপদ হবে না। আর
তেমন প্রয়োজন বলে আমি নিজেই আসব। তুমি আমাকে
ত্যাগ না করলে আমি তোমাকে ত্যাগ কবব না।'

'আমি আপনাকে ত্যাগ কবব—কী যে বলেন!'

জবাব যেন না শুভস্বপ্ন, মুচকী হাসেন।

তিনি যখন এখানে থাকেন—উৎসব-সমারোহের অস্ত
থাকে না। জলের মত পরশা বহত করেন সনৎবাবু।
কীওন ভজন ধোম পূজা—শুভস্বপ্ন মুখে কথা ধন্যতে না

থলাতে সনৎবাবু সব গ্যাব্বা করে যেন। ব্যক্তিগত আদায় বা সেবাকণ্ড ক্রটি নেই। লাশরক্তে ছুপিয়ে-আনা উৎকৃষ্ট মুশিলাবার গরমের কাপড় ছাড়া পতন না। পায়ে যেন হামী কাক লেদারের চটি।...শীতকালে যারে যেন গালকের লেপ। রবাবের গদী উঠলে দর্বাগ্রে গুরুদেবের ক্ষেত্রে কিনে এনেছেন সনৎবাবু।

এই গুরুদেবটির আকস্মিক আবির্ভাব এবং তাঁকে নিয়ে এ যেন মাতানান্তি শুরু হওয়ার পাড়াতে ঘটনা কল্পনার অন্ত থাকে না। বড় লোকের গুরু—হুচাবলন বড়লোক শিষ্যও ছোট। বেশ ক্যান্সানেবল গুরুই হয়ে উঠতে পারতেন উনি, যদি না মাঝে মাঝে অমন সর্বজন-অপোহর হয়ে উঠতেন, অর্থাৎ ডুব মারতেন। দিনরাত গুরুদেবকে উপলক্ষ করে নিজেদের দেখাতে না পারলে ক্যান্সন-দুঃখ শিষ্যদের চলে না যে।

কিন্তু শিষ্য যা ছুটল তা সবই তিনপাড়ার লোক। এ পাড়ার লোকরা—সন্তবত অভিশয় নৈকট্যে হেডুই, সন্দিগ্ধ হয়েই বইল। বং বলা উচিত তাহের বিশ্বাস হল—উল্টো দিক দিয়ে। অতি-বুদ্ধির গলার হুড়ো, এই প্রবণটি সমস্তে কান্ডের শেষের মাত্র বইল না। যে যতবড় বুদ্ধিমানই যোক, তাকে ঠকাবারও লোক পাওয়া যায়। আর এ হওয়াই উচিত—সনৎবাবুর পাণের পরমা প্রারক্তিতে বার হওয়াই স্বাভাবিক।

শুধু পাড়ার নয়, কেমন করে এই মতটা সনৎবাবুর বাড়ীতেও মূল বিস্তার করছিল। সনৎবাবুর সাংঘাতিক বিপর এবং সে বিপর থেকে উদ্ধারের আত্মপুথিক ইতিহাস শুধু জানতেন মালতী। তিনিও সন্ন্যাসীকে সাক্ষ্য গুণবানের মতই ভক্তি করতেন। কিন্তু সে ইতিহাস সনৎবাবুকে ছোট না করে কাউকে বলা যায় না বলেই বলতে পারেন নি। তাই তাঁর এই ভক্তি বাড়াবাড়িত বোকামি বলেই মনে হত ছেলেদেরদের কাছে। তাই তারা অন্তর্য বিবেকের চোখে দেখত গুরুদেব নামক এই জীবটিকে। বিশেষত সনৎবাবুর মেক ছেলে বিমল—সে এই বিবেকে গোপন করবারও চেষ্টা করত না। বাপ মায়ের একটু বেশী আদরের ছেলে, চিরদিন সব ব্যাপারে প্রভুর পেয়ে পেয়ে বিবেচনা করে কথা বলতে দেখেনি। সে গুরুদেবকে

ভনিগে ভনিয়েই বলত, 'বাটা! আন্ত ভণ্ড, ছোজোর!... যেমন বোকা পেয়েছে আমার বাবা-মাকে! কী বলব, ভণ্ডেই বাটা, ভণ্ডেই টাকা—নইলে উচিত শিক্ষা দিতে আমি পারতুম! হাত নিশ্চিন্ত করে বাটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দিতে!'

কোন কোন দিন বৈধব্য এই ধরনের কোন মনস্তত্ত্ব সনৎবাবু বা মালতীর কানে গেলে তারা বনক দিতেন, ছেলেকে বেশী শাসন করতে না পেয়ে নিজেরা নিজেদের কান মলতেন—এমন মন কথা শোনবার প্রারক্তিত্ব স্বরূপ। কিন্তু ভণ্ডের কানে যেত বৈধব্যই। প্রায় প্রত্যাহই বীর কানে যেত সেই গুরুদেব শুধু হাসতেন। এমন কি সনৎবাবু বা মালতীর কাছেও কখনও অসুযোগ করতেন না।

বিমল দাঁত কিড়মিড় করে বলত, 'ছুকান-কাটা বেহাগ! এত অপমানের পরও দাঁত বার ক'রে হাসে কী ক'রে? আশ্চর্য!'

বছর দশেক কেটে গেছে ইতিমধ্যে—সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের পর থেকে। গুরুদেবটি ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে উঠেছেন বাড়ীমুখ সকলের কাছেই। ঢাকহাকদের বাড়ীমুখের অন্ত থাকে না উনি থাকলে, স্তব্ধতা তাহের রাগ হওয়া স্বাভাবিক। ছেলেদেরদের রাগ অপের মত টাকা ধরত হয় বলে—যে টাকা তাহেরই একদিন পাবার কথা। কিন্তু সনৎবাবুর সে মনোভাব হরত চোখে পড়ে না—আর সন্ন্যাসী তা প্রত্যাহ করেন না।

এরই মধ্যে একদিন এক অঘটন ঘটে গেল।

বিমলের মলে ভিগে ম্যাড দেখে খুব জ্বর এস। প্রবল জ্বর।

সনৎবাবু তখন কলকাতাতে নেই। বিমলের ঈর্ষা বা গর ভাইবোনরাও কেউ নেই। আছেন শুধু মালতী।

সনৎবাবু এখন আর শুধু স্ট্রিডোয়ের বাৎসাব মধ্যে আটকে নেই—তার অসংখ্য কাবের মারা ভারতে বিস্তার লাভ করেছে। শিল্পপতি ঠিক মন—কাবের কল-কাবখানা উনি যোগেন না, কবেমগনি—কিন্তু বনকুদের বলা যায়। স্তব্ধতা সর্বত্রই কর্কটাকার প্রয়োজন। বড় ছেলে থাকে যেখানে, সেখানের অফিস সে চালান। সেখানেই দিল্লীর

অক্লিষ ঘেবে, ছোট ছেলে কানপুরের। জামাইদেরও টেনে নিয়েছেন সনৎবারু নিজের কাছেই। একজন থাকে কটকে একজন মাজাঙ্গে। আর সনৎবারু পালা করে সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। সেই কারণেই বিমলকে এখানকার অক্লিষ নিয়ে আটকে থাকতে হয়। শালাহান যে কারণে ঘরকে দিল্লীতে রাখতেন—সেই কারণেই সনৎবারু সন্তপ্ত বিমলকে কলকাতার বড় অক্লিষের কাছ দিয়ে বেধেছিলেন। সেখানি বিশ্বাস, কোনটা বেশি কে জানে!

সনৎবারু সে সময়টা বোঝে অক্লিষে ছিলেন। বিমলের স্ত্রী নীলিমা গিয়েছিল খত্তের সঙ্গে বেড়াতে। বড় ভায়েক সঙ্গে গর খুব ভাব, সে টান ত ছিলই, তা ছাড়া বিমল কলকাতাতে স্থায়ী হয়ে থাকে অল গর কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় না—এবার সে একরকম রাগারাগি করেই খত্তের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল।

কেউই নেই—মালতীর একটু বিপন্ন বোধ করবার কথা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দৃষ্টিমান আশা সর্ব মত গুরুদেব ঠিক সেইদিনই কোথা থেকে এসে হাজির হলেন।

মালতী নিশ্চিন্ত হলেন।

‘গুরুদেব যেখান ত—ডাক্তার ডাকতে হবে কিনা!’

গুরুদেব বিমলের শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, ‘হরকার নেই মা! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো!’

বিমল সে সময় ঘুমোচ্ছিল। সে শুনেতে পেলে না কথাটা, তাই বলা।

মালতী কিন্তু নিশ্চিন্তই হলেন।...

পরের দিন বিমলের জ্বর আরও বাড়ল।

বিকলের দিকে কেমন যেন অভিভূত আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ডাকলে আর সাড়া পাওয়া যায় না। সাড়া যদি বা পাওয়া যায়—চোখ খোলে না একবারও। নিঃশ্বাসে কেমন একটা বড়বড় আগুয়াল।

মালতী একটু গর পেলেন। কিন্তু সে অশেষ প্রকাশ করতও ভয়-সঙ্কোচ বড় কম নয়। গুরুদেব যে আশাস দিয়েছেন।

তবু তাঁর অশেষ সনকোচ কঠে একবার জ্বললেন

কথাটা, ‘কী করব বলুন ত গুরুদেব? ডাক্তারকে কি খবর পাঠাব? ওকেও ত কথাটা জানানো হরকার!’

দ্বিধা মেয়ে মালতীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, গুরুদেব, ‘ডাক্তার ডাকার সত্যিই হরকার নেই মা। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। সাক্ষাৎ লক্ষীর অংশে তোমার জ্বর; শোক কখনও তুমি পাবে না। ইষ্টের নাম শরণ করে তুমি গর গারে মাথার হাত বুলিয়ে দাও—তা-ই যথেষ্ট।... তবে হ্যাঁ, সনৎকে একটা খবর দেওয়া হরকার বটে! গর অক্লিষের ক্ষতি হচ্ছে। বং এক কাজ করো—টেলিফোন করে দাও, নাইটু প্লেনে চলে আসতে পারে!’

এরপর মালতী আর ডাক্তার ডাকতে পারলেন না।

এবার টেলিফোনের লাইন পেতে পেতে অনেক রাত হয়ে গেল। রাতের প্লেনের সময় বইল না! পরের দিন সকালের প্লেন ধরে যখন ওঁরা এগে পৌঁছিলেন—তখন অপরাহ্নও গড়িয়ে এসেছে।

সনৎবারু ছুটে ছুটে এসে বোগীর ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলেন তিনি। নীলিমা পিছনে ছিল, সে আর্ন্তকায়ীটা চাপবার জন্ত প্রাণপণে ঘুরে আসল পুরে দিলে—তবু একটা অস্পষ্ট অব্যক্ত শব্দ বেরিয়ে এল।

অমন স্থূহ শব্দ বোগরান ছেলে সনৎবারুর—দুঃখিনে এ কী শব্দ! হয়েছে তাই!

মাত্র তিনটি দিন—তাঁতেই যেন পাঁচ হয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। অজান অঁতেন্ত নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে, একবারে মৃতবৎ। নিঃশ্বাসের সঙ্গে কেমন একটা বড়বড় আগুয়াল হচ্ছে, বীতিমত শ্বাসকষ্ট হচ্ছে—সেটা বুঝতে বেরি হয় না।

সনৎবারুও যেন একটা অব্যক্ত আর্ন্তনার ক’রে উঠলেন, তারপরই স্ত্রী দিকে ফিরে বললেন, ‘এ কি কাণ্ড!... কোন ডাক্তার দেখছে, কী শুধু রয়েছে! ডাক্তার ঝগে নেই কেন?... আমাকে সেইদিনই খবর লাগনি কেন!’

মালতী অপরাধীর মত মাথা নত করে বললেন, ‘ডাক্তার ত ডাকা হয় নি!’

‘ডাক্তার ডাকা হয় নি! কী বলছ পাগলের মত যা তা?’

সনৎবারুর কণ্ঠের বীতিমত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

‘গুরুদেব যে বললেন, কোন ভয় নেই। ডাক্তার ডাকতে হবে না।’

‘আর তুমি তাই ডাক্তার ডাকলে না!...হেলেটার বিকে গোখ তুলে ডাকতেও কি সময় হয়নি তোমার? বেগতে পাতনি কী অবস্থা হয়েছে?...গুরুদেব বললেন! এমম ব্যাপারে গুরুদেব কি বোঝেন? আর ভয় না থাকলেই বা ডাক্তার ডাকতে বাধা কি ছিল? এত কি পরনার অজ্ঞাব হয়েছিল আমার!’

তখনই টেলিফোন তুলে ডাক্তারকে ডাকলেন—সনৎবাণু।

তারপর পাগলের মত ধরমর পাঁচচারি করতে লাগলেন। কাঁদছেন না তিনি এটা ঠিকই—কিন্তু দুই চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়িয়ে পড়ছে।

নৌলিমা মাটিতে পড়ে নিঃশব্দে জুলে জুলে কাঁদছে।

গুরুদেব কখন এলে ধাঁড়িয়েছেন হবে—কেউই টের পারনি।

তিনি তাঁর অত্যন্ত শান্তভাবেই বললেন, ‘কেম ব্যস্ত হচ্ছে সনৎ, আমি এখনও বসছি, কিছু ভয় নেই।’

সনৎবাণু যেন হিম্মতভাবে ঘুরে দাঁড়াছেন—গুরুদেব বিকে মুখ করে। প্রাণপনে মনোভাব চাপবার চেষ্টা করা সবেও অন্তরের বিরক্তি কণ্ঠে চাপা রইল না। বললেন, ‘না গুরুদেব, এ সব ক্ষেত্রে আপনার মাক-গলানো উচিত হয় নি। যোগ হলে ডাক্তার ডাকতে হয়—পাঁচ বছরের শিশুও তা জানে। আপনি কেন তাতে বাধা দিতে গেলেন! আমাদের তবু সান্ত্বনা থাকত...এ আপনি কি করলেন!...আত্ম-অহমিকার একটা সীমা থাকা ত দরকার!’

এইবার নৌলিমা মুখ তুললে, নিরুদ্ধ গর্জনের মত শোনাল তার কথাগুলো, ‘আসলে উনি যা তা বলতেন, সেই রাগেই শোধ নিলেন আপনি ওকে মেরে ফেলে। এ সবই আপনার চক্রান্ত, অজ্ঞোশ!...পেরেছেন মাকে ভালোমামুখ বোকা—তাই এমন করে সর্বনাশটি পাকিয়ে তুলতে পেরেছেন!...এইবার আপনার স্বরূপ বোঝা গেছে।’

মালতী চুই হাত কান চাপা দিয়ে বললেন, ‘ছি বোঁমা, কী যা তা বলছ!’

‘না না। আপনার মত সত্য তত্ত্বি আমার নেই। আর তা ছাড়া সর্বনাশ হলে ত আমারই হবে না। আপনার আরও অনেক আছে, আমার ঐ এক। এখন সব দায়িত্ব আপনারও নয় না—সেটা আপনার বোঝা উচিত ছিল।’

মালতী মগ্ন ছেড়ে কতকটা ছুটে পাগিয়ে গেলেন।

সনৎবাণু কিন্তু একটা কথাও কইলেন না, নৌলিমা কে শাসন করবার চেষ্টা-মাত্র দেখা গেল না তাঁর!

গুরুদেব স্থির শান্তভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন, মুখে তার তেমনই বহুতমর হাসি।

ডাক্তারবাণুও ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলেন।

‘এ কী কাণ্ড!’ অস্বুটবে এই কথা কটা বলেই তিনি ব্যস্ত হয়ে টেবোতোপ খাব করলেন।

পরীক্ষা করতে করতেই নুখ তাঁর আরও গভীর হয়ে উঠল। কান থেকে বলটা দখিয়ে থলটা চাপবার দৃষ্টি চেষ্টা করতে করতে আবারও বললেন, ‘এ কী কাণ্ড! এতটা বাড়াবাড়ি হ’ল, আমাকে একটা খবরও ত বেরনি। কে ধেবছিল? হোমিওপ্যাথি করছিলেন নাকি?’ বলতে বলতেই অস্বাস্থ্য একবার সন্ন্যাসীর বিকে তাকিয়ে একটু ব্যস্তের সুরে বললেন, ‘না কি বৈব চমছিল!’

অনহিমুভাবে সনৎবাণু বলে উঠলেন, ‘হ্যাঁ কতকটা তাই। ইন ক্যাক্ট বৈবও হয়নি! উনি বলেছেন ভয় নেই, সেই ভয়সাতে আমার হ্রীও চুপ করে বসেছিলেন!...কিন্তু কী হয়েছে তাই বলুন না!’

‘হয়েছে ডবল নিয়ামিরা—both side-ই একধম ধবম!...আমার ত—sory—আমার ত মনে হচ্ছে আর কোন ঠিকিৎসা না করাই ভাল! It is too late!’

কথাটা খুব কিসকিস্ করে বললেও নৌলিমার কান এড়ায়নি। সে এবার জুকের কঁপে উঠে পাগলের মত মেজেতে মাথা ঠুকতে লাগল।

সনৎবাণুও যেন জ্ঞান হারালেন। তাঁর এতদিনের অছ বিশ্বাস ও তত্ত্বি কোথায় চলে গেল, হস্তক্ষেপ করে গুরুদেবের সামনে এলে ধাঁড়িয়ে কেমন একধকম ক্রবকর্থে

বললেন, 'টিকই বলেছে বৌমা, আপনি এইভাবে ওর ওপর শোধ তুলতে চেয়েছিলেন। এতদিন উপেক্ষার ভাব বেধাতেন—সেটা হলমাত্র। আপলে সমস্ত রাগ পুখে রেখেছিলেন। উঃ, কী সাংঘাতিক লোক আপনি! এই আপনার পরামর্শ!...মনের মধ্যে এত হিংসা রেখে-
ছিলেন? কেন, কেন এ সর্বনাশ করতে গেলেন!...এত বয়ে রেখেছিলেন আমি আপনাকে, সে কথাটাও ভুলে গেলেন। আমি কি তাহলে এতদিন খর খুঁকত মধ্যে সাপই পুছেছি!'

ডাক্তারও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, 'It's a criminal offence, ঘেসে বেওয়া উচিত এসব লোককে!'

একবার মাত্র শুঁকি কী কী হয়েছিল শুদ্ধমতের?... কোনকালেও কেউ তা লক্ষ্য করেনি।

শুঁকি তাঁর সেই আত্মবিশ্বাস কণ্ঠে কেনন একরকমের আবেশের স্রব ফুটে উঠল। তিনি বলে উঠলেন, 'দাঁড়াও ডাক্তার! তোমাকে একটা কথা প্রায় কবি, আগে খবর দিয়ে তোমাকে ডাকলে তুমি বাঁচাতে পারত?'

'কেন পারতুম না! নিনোনিয়ার শু এখন অব্যর্থ ওষুণ বেবিরেছে প্রায়। এখন শু সবল হয়ে গেছে চিকিৎসা!'

'হ্যাঁ। তবুও প্রায়। শু শব্দটাকে বাহ দিতে পার না। প্রায় অব্যর্থ—কিন্তু একেবারে অব্যর্থ নয়। তোমার ছেলের গা সদম বেখে এসেছে না বেবোবার সদম? তাকে বাঁচাতে পারবে?...এই ত হুচনা তার। বরং বাবার সদমই আরও বড় ডাক্তার কাটকে ডেকে নিয়ে বেও।...মহুখে মাথা কতটুকু ডাক্তার!...আত্ম-অহমিকার কথা বলছিলে না সদম, বড় বড় ডাক্তারের হাতে অকস্মে লোক প্রতিদিন মরছে বেবেও তারা মাহুকে বাঁচাবার কথা মুখে আনে—এমন আত্ম-অহমিকা বেখেছ কোথায়?'

তারপর একটু পেনে নীলিয়ার বিকে চেয়ে বসলেন, 'বৌমা—আমি ইষ্টের নাম করে বলছি, তোমার স্বামীর ওপর কোন আক্রোশ কি কোন নিষেধ আমি রাখিনি। আমি এখনও বলছি ও বাঁচবে। তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি বড় ডাক্তার কাটকে ডাকো, নগর তাঁকেই বলাওষুণ

ইনসেকশন্স দিতে।...এই মধ্যে হাল ছেড়ে দেবার মত কিছু হয়নি।...ডাক্তার, স্ত্রী—আর একটিবার শুকে দাখো ত!'

তাঁর সেই কণ্ঠস্বর কী ছিল—ডাক্তার যেন কতকটা অন্তর্ভুক্তের মতই আবার গিয়ে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসলেন। মলটা কানে লাগালেন আবার কতকটা অনিচ্ছাভরেই—যেন মল কী হবে বলাবার আগেই তা তিনি আনেন—কিন্তু বেধতে বেধতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর মুখের ভাব বহলাতে শুরু করল। বিমিত্ত অর্ধ-মুট কণ্ঠে বাব দুই বলে উঠলেন, 'স্ট্রেঞ্জ! স্ট্রেঞ্জ!!'

তারপরেই নল নামিয়ে ব্যাগ খুলে ইনসেকশন্সের সবস্বাম চার করলেন।

ছুটে এলেন সদস্যবাবু, 'কী দেখলেন, কী দেখলেন ডাক্তারবাবু? আশা আছে কি কিছু?'

'সত্যিই বড় আত্মবিশ্বাসের ত মশাই। এই দু'মিনিট আগেই দেখলেন—এত তুল হ'ল আবার? এখন কিন্তু সত্যিই অতটা ব্যাথা লাগছে না, অস্ত্র হাল ছেড়ে দেবার মত নয়। আমি একটা স্কোকা-কোরামিন দিয়ে দিছি এখনই। আপনি একজন কাটকে রেডি থাকতে বলুন। এটা বেওয়া হলেই আমি কটা ওষুণ লিখে দেব—ছুটে গিয়ে কিনে আনবে। বরং গাড়ী করেই দাক!'

শুনতে শুনতেই এদিকে ডাকিয়ে ছিলেন সদস্যবাবু কিন্তু শুদ্ধমতের ততক্ষণে বেবিরে গেছেন কখন নিঃশব্দে। তাঁকে আর দেখা গেল না।

তাঁকে আর এ বাড়ীতে দেখা গেল না কোনদিনই।

যেন উবে গেলেন তিনি। কেউই বেধতে পারনি কখন তিনি গেলেন।

অনেক বৌমাখুঁচি করলেন সদস্যবাবু। সমস্ত শুদ্ধ-মতাইকেই খবর দিলেন। কিন্তু কেউই আর তাঁর বোঝ পেল না। কোন স্থায়ী পাঠ্যও জানা নেই তাঁর—কোথায়ই বা বোঝ নেবে।

শেষে সদস্যবাবু খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। ডাক্তার কোন মল হল না।

এখন মনে হচ্ছে, এ জীবনে বোধহয় আর কখনও গুরুদেবের দেখা পাবেন না তিনি।

অথচ প্রয়োজন যে অসুত্ব!

একবার ছুঁপায়ে লুটিয়ে পড়ে কমা প্রার্থনায়ও যদি অবদর পেতেন!

কিন্তু পাবেন না যে সে অবদর, তাও বোধহয়। তিনিই ত্যাগ করেছেন গুরুদেবকে। সেদিন যেটা অধিবাস্ত মনে হয়েছিল, তাই ঘটল। গুরুদেবের সেদিনকার হৃৎকম্প বাসিত অর্ধটা আঁক পরিত্যক্ত হয়েছে।

প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী ছিল সেই ডাক্তারের। তাঁর ছেলেকে দতিাই তিনি বাঁচাতে পাবলেন না। নিমোনিয়া

রোগেই মারা গেল খেজুরী। অনেক বড় বড় ডাক্তারই ত তিনি ডাকলেন—কিন্তু কোন কল হল না।

কতকটা তাঁরই নির্বন্ধাভিমুখ্যে স্ববরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন সনৎসাবু। ডাক্তারের মনে হয়েছিল তাঁর কমা পেলে ছেলেটা বাঁচবে।

সেটা জ্ঞাত সম্ভব হল না। দেখা পেলে হয়ত কমা পেতেন। দেখাই পেলেন না সে!

শুধু বিনলই এখনও বলে, 'বোমাসু! ভাল হয়েছে লোকটা! খেছে। বৈচিহ্নি জানবা। অলৌকিক শক্তি না আরও কিছু! হানবাগ। চিকিৎসা হয়েছে বৈত পেছি। ডাক্তারের কেন? শুটা কোইনপিলেন্স মাত্র। ঘটনা লেগে গেছে।'



এমন কিছু কঠিন নয়

ছোট ছেলের সঞ্চেও সম্ভব যদি ঠিকমতো
খঁবিয়ে দেওয়া যায়



আপনার সম্ভ্রম
আপনার পুত্রের কর্ম-জীবনের
সাফল্য বিনোদভাবে
সুচিত করবে।



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪নং লাইভ বাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

উত্তর পুরুষ

স্বভাব সমাজদার

আকাশে সোহেব বেধা মেগেছে। ছায়া ছায়া অন্ধকার
জমে আছে বড় নলিকপুত্রে বড়ো বটগাছের নীচে। পূবে
আদিত্যপ্রশার শানকাটা ধু ধু ঝাঁকা নাঠের তল
অন্ধকারের তেতরে বনকাণো ছায়া স্মৃতিঃ নত হলে হলে
আসছে, বাজবংশী সাওতাল, উদাওদেং মেরে পুরুষো।
তাঁদের সকলের চোখে মুখে মেগেছে উল্লাসেং ঝিকিমিকি।
আজ চৈত্র সংক্রান্তি। বড় নলিকপুত্রে বটগাছের নীচে
চড়কের উৎসব হবে। শুধু তাই নয়। তিনদিন ধরে
আদোমলমল লোকগমগন জনজমাটি মেলা বগবে এখানে।
বোজা, পতিহান, পোড়ামবিল, দৈবপুত্র, বাসপুত্র আর অশ-
পানের আরও দশটা গ্রামের মানুষ মোমাছির নত ঝাঁকে
ঝাঁকে ছুটে আসবে মেলায়। আর—

আর বেলার সব চেয়ে বড় আকর্ষণ বসন্তভূমির
আহিমতন বাদিনা রাজবংশীর চড়কের বিভিন্ন অমুঠান।

কাঁচা সোনার নত হোথ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকের
বিপুলব্যস্ত প্রান্তরে। অর বুড়া শিবের অর! জনতার
অরলানিতে কৈপ উঠল আকাশ। কববহাট সাধা চুলে
হাত বুলিয়ে পুবেবিত ঠাকুর মাভারণ ভটাচাঁব বসল, মংলু
কুষ্ঠে সেলু রে? চল ভূত কুঁড়িঃ পুরুষোত্ত, তোক চান
করবা হবে—বুড়া শিবের বানের পাশে বলিষ্ঠ বিশাল
বেহটা এলিয়ে গিয়ে বসেছিল মংলু, তার বস্তুর ডোলার
নত ছুটো চোখে উল্লাস ভূষ্টি। যেন কোন অজানা
অদৃষ্টভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে তার চেতনা। মাভারণ
ভটচাল আবার হেকে বসলেন—মংলু!

—কি কছেন? হাঁড়ির তেতরে বৃষ গিয়ে কথা বলায়
নত মংলুঃ গলায় বহটা গম গম করে উঠল। চড়কের
অজ্ঞাত ভক্তবা তাকে চক্রাকায়ে ঘিরে বরল। তার কানের
কাছে বৃষ নিয়ে গিয়ে চৌচিরে বসল—তোক চান কববা
হবি রে। মংলুঃ বিশাল বেহটার ভীঃ একটা শিবরণ

তরংগিত হয়ে বয়ে গেল। অদহ একটা অস্থিরতার পেশী-
বহল কাঁধ ছুটো ঝাঁকিয়ে বৃষ অশুটগলায় বিড় বিড় কবে
বলল,—মোর পিঠোত স্তূড়স্তুড়ি লাগছো রে! বশেই
পাগলের মত নিমের দিকে নিজেই এলোপাছাড়ি কিল চড়
যাতে লাগল।—বেধিছু, চড়কের বাশোত উঠবার আগেই
অর ঝোঁক আসি গেছে রে—বাপু!

অর বাবা বুড়াশিবের অর। জনতা উল্লসিত হয়ে
চৌচিরে উঠল। চার পাঁচজন শক্ত চেহাযার মোয়ান মংলুকে
আগটে ধরে পুতুর বেকে লান করিয়ে নিয়ে এল। বুড়া
শিবের নগুণে ঝাড়ালো মংলু। তারে ছুটো বস্ত্রচোখে
দুরায়ত বৃষ্টি। ধরধর করে কাঁপছে তার থাবড়া নাকের
ডগাটা। তার কপালে বস্ত্রচন্দনের কঁটা পরিয়ে ছিল
পুরুষমশায়। এবল শবে ডাক বেজে উঠল। মংলুঃ বস্ত্র
ভক্ত ভক্ত ঝড়ে মেঘের ডাক উঠল। কাতর গলায়
বলল—হাও হাও মোর পিঠোত কল হুঁড়ে হাও—মেলায়
প্রতিটি মেঘেপুরুষের বৃকের ওপর ঘিরে যেন রেলপাড়ার
ঢাক। চলেছে ভক্তভক্ত ধনি তুলে। ভীঃ কৌতুহলে
সকলের চোখ বিস্ময়িত হয়ে উঠেছে। মংলুঃ পিঠের
দিকে নজর পড়তেই সকলে আতঙ্কে শিউরে উঠল। তার
পিঠের এখানে সেখানে ঝয়ের কাণো ঝগ, কোন কোন বা
এখনও শুকোরানি—বগবন করছে, কোথাও ঝোলা পড়েছে।
নাছি উড়ছে, পুঁঃ পড়ছে—বহরের পর বহর চড়কের ঝড়নী
বিঁদিয়ে বিঁদিয়ে অতবিস্কৃত হয়ে গেছে মংলুঃ পিঠটা।
মগুপের সামনে উঠোনে আকাশ হোয়া শক্ত একটা বাশের
মুটির সঙ্গে কামা গিয়ে আর একটা লখা বাশ আড়াআড়ি
ভাবে আটকানো রয়েছে। এই বাশটা চারিদিকে বনবন
কবে ঘুরানো যায়। সেই বাশের সঙ্গে মোটা পাকানো
হাড়ির সঙ্গে কুলানো রয়েছে। প্রায় আধহাত লখা ভীঃ
একটা ঝড়নী। রাজবংশী পাড়ায় মোড়ল পূর্ণ টীংলার

করে উঠল, আরো ভোরে অরুণোদয়ে বাড়ি ধাওয়ে—
নারায়ণ ঠাকুর বৈষ্ণবীটা মংলুর গভীর বারের পথের চুকিয়ে
দিল। বাঁতে বাঁতে চোপে সমস্ত ঘেঁষে এবল একটা কাকি
দিয়ে ধর ধর করে উঠল মংলু। তার চেতনায় মিলি একটা
অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়ল বিন্দু বিন্দু মধুর রত। চোখ বুঁজে
পরিভ্রমণ পলায় বলল—ভূউব আশ্রয় লাগেছে রে ! এতক্ষণ
মোর পিঠটা শুলাছিল। মাটির সঙ্গে পমাত্তরাস সেই
বিশটোর ভড়িত সঙ্গে মংলুকে সুলিয়ে দিল পূর্ণ মোড়ল।
বোঁ বোঁ করে ঘুরিয়ে দিল বিশটা। তীব্র গতিতে চক্রাকার
বিশটা ঘুরতে লাগল। জুড়ুল হয়ে উঠল অরুণোদয়ের বাকনা,
এবল শব্দে অরুণবিন দিয়ে উঠল জনতা—অর বাবা বুড়ো
শিবের অর ! অর মংলু বর্ধনের অর !!!

তীক্ষ্ণবার বৈষ্ণবী মংলুর পিঠের চামড়াটা বখাঃঃ মত
টেনে ধরেছে। দুব থেকে তাকে একটা বাহুর মত
মন হচ্ছে।

বুড়ো শিব অর ভিত্তি ভব না করলি বাপু এবক্যা
বস্ত্রনা কেউ লু কববা পারে ! মেলার লোকের ভেতরে
অন্ধন হুটল। সবাই হাত তুলে প্রশ্নাম করল মংলুকে।
কিছুক্ষণ পরেই চাকের বাহন্য ভ্রমিত হয়ে এল। মংলু
মাটিতে নামামাত্র তার চারদিকে ভীড় করে এল লোক।
মংলুর মুখের ভূইপাশ দিয়ে সাবা গ্যাঙ্গলা গড়িয়ে পড়ছে।
পিঠে বৈষ্ণবী বহানোর আয়নাটা থেকে কৌটা কৌটা
কালো রক্ত ঝরছে। পূর্ণ মোড়ল তার হাত ধরে বুড়ো
শিবের খানের কাছে বসিয়ে দিল।

চৈত্রে উঠল নারায়ণ ঠাকুর। ভাইমব বাতাল ছাড়ে
হাও—সবে ঝাঁড়াও। লোকের ভীড় পাওয়া হয়ে গেল।
সবাই বলল বুড়ো শিবের বাঁটি ভক্ত বাপু—তা না হলি
চক্রের কাঠিত উঠে এবক্যা কষ্ট কববা পারে ! মংলুর
প্রতি বিষয়ে প্রহার অগাধ হয়ে ওঠে ওদের চোখ।
হুঁ একজন বুড়ী এসে মংলুর পায়ের ধূলা নিয়ে বলল—
হামবের মাখাত হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন বাপু !

বুড়ী মা,—হাঁপাতে হাঁপাতে মংলু বলল,—মুই বৈবতা
নও। মুই কি আশীর্বাদ করবু।

ওরিকে মেলা মনে উঠেছে। ছোট ছেলেদের লগ কেনা
বিশীর ভীড় শব্দে, ঘোষানবাদের হাঁকডাকে আর অন্ধ

মাছুষের অন্ধন যেন দুব মনুষ্যের গর্জনের মত বাতালে
কাপতে কাপতে দুবে মিলিয়ে বাছে। একদল শিক্তির
সরবত খেয়ে মংলু শিবের খানে যা এলিয়ে দিয়ে গুরে পড়ল।

বাক্সির ছারা মেঘেছে বুড়ো শিবের মণ্ডলের চারদিকে।
মেলার লোকজন প্রায় নেই বললেই হয়। হুঁ একজন
ঘোষানবীর টেমি জালিয়ে তহবিল মেলাজে, ভিনিসপত্র
বাধাছাড়া করছে। খড় মড় করে ঘুম তেজে উঠে বলল
মংলু। মেলার মাঠ ছাড়িয়ে খাদপুতের কাঁচা মাটির বাস্তার
নামল। বাস্তার হুপাশে বিকচিছবীন অন্ধকারের সমুদ্র
রপ করে জলে উঠেছে এক একটা আলোয়ান আলো।
হু হু হাওয়ায় এখনও চৈত্রে উত্তাপের বেগ। দুবে মোহ-
পুতের অন্ধকার গারে মেঘে ঝাড়িয়ে থাকা ভাঙবাঁধী পাড়ার
বাড়ীগুলোকে অস্বীয় ছায়ার মত মনে হল মংলু।
মোর পায়ের সে মোহপুতের দিকে ইটতে লাগল। গাড়
নিষ্কলভ্যর হয়ে আছে মোহপুত গ্রাম। বেলেপড়া একটা
বাড়ীর মাটির দেয়ালে তিনটে টোকা দিল, চাপা পলায়
ডাকল—সুঝো—সুঝো—সুভবা পাছো ? মংলুর বুক
ভয়ের ধুকুপুহু। নিঃশব্দে একটা ভাঙ্গা খুল গেল।
ঘরের ভেতরে ঘন অন্ধকারে একটি ঘন বিদ্রুতি বেধা স্পষ্ট
হয়ে উঠল। কাতর পলায় মংলু বলল—আর, সুঝো তোঁর
সাথে কবা আছে—

কি কথা ? মাপের মত হিনিয়ে উঠল সুঝোবালা।
কৌলকৌল করে বলল—তুনি মাংসাই ই ওলাটের নামকরা
চড়কের ভক্ত হইছেন। কতাপনের চার কুড়ি টাকা
জোটাখা পায়েছেন না, চোখ ঘেঁটে মল এল সুঝোবাপার।
চড়কের শ্রেষ্ঠ ভক্ত মংলুর মুখে বাবার ছায়া নামল।
বলল—তিনি কুড়ি টাকা তো খানের শিব আর ভীতলমাহ
থেচে জমাইছি সুঝো। কিন্তু তোঁর কতল বাপটা আরও
এককুড়ি টাকা না হলি—

—পরাম্পুরের লগ্নাসুদের কানবাড়ী ঝাঙানের ব্যাটার
সাথে বাবা মোর বিয়া লাগাবার তালে যোগেছে—

—তুই তো আমাক ভালবাসিস—তুই মোর সাথে
চলে আসেকনা সুঝো, আকুলিত আবেধন সরল মংলুর
পলায়। এই গাঁও ছাড়ে তিন গাঁয়ে ; অংগ গাঁয়ে কি
চল্লিতপুতের হামরা ধর বাঁধু—হুহাতে খাটু, খাটু—অং

নেমে আসে মন্থর চোখে। না—না, তা মুই পারবু না—
 রান বিবর গলায় বলল সুবোধালী—মুই রাকবৎসীর বেটী।
 বরম খোয়াবা পারবু না। মুহুর্তে মন্থর যেন মাটির
 সঙ্গে নিশে গেল। হং হং শুকনো কাশির আওয়াজ শোনা
 গেল।—পলাও! পলাও! বাবার নিশ্চ ভাঙ্গে গেল
 সাক্ষাৎ হবি! সপক্ষে জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল।
 অদৃশ একটা দ্বারকে মাঝার ভেতরে নিয়ে রক্তাক্ত নামল
 মন্থর। তীব্র আক্রোশে দলটা পুড়ে যেতে লাগল।

গোলাডাঙ্গার প্রান্তরে ঐ ঐ করতে গিগি বাত।
 আলপব ধরে নিঃশব্দে ঘুরে ঘুরে মত চলছে মন্থর।
 আশ্চর্য! হুটটা গ্রামের লোক যাকে একডুকে চেয়ে,
 চড়কের শুভ্র বলে শ্রদ্ধা করে—শুধু শিখের নাম উচ্চারণ
 করেই যে ভীত হারালো ঐকুশি নিজের পিঠে ধিঁধিয়ে নিয়ে
 অমায়ুষিক যন্ত্রণাকে গৃহ করতে পারে, হারিয়েছে কাছে
 কত অসহায়। কিন্তু—কিন্তু সবই তার ছিল একদিন।
 শুধু তার নয় প্রত্যেকটি রাজবংশীর ঘরে ঘরে জীবনের
 উৎসব স্বরধারার মধ্যে যেত বাতোমানসের তের পার্শ্বনে।
 এই তো উত্তর পাখার দক্ষিণে বেলতলীর পাখার
 ভাঙ্গে আখিনে এই সব প্রান্তরের নীমায়ে নীমার উপচে
 পড়তো গোমার ধানের মঞ্জরী! জিনিসকর, আতপ, কাটাঠী
 ভোগ—কত সুগন্ধী চাল মান্য গাঁয়ের ঘেঁষে ঘেঁষে চালান
 দিয়েছে তারা। তার যেন, মাগের লজ্জা কিনেছে পাড়ি,
 হালের বলদ—আরও কত কি! আর আর? কোথায়
 গেল সে সব দিন? আজ টাকার অভাবে নিজে একটা
 চাল করতে পারে না। ঘরে বৈ আনতে পারে
 না। পালকের ভেতর থেকে ভালা ভালা নিখাস
 বেরিয়ে এস।

—কে? ভয়ানক গলায় চেঁচিয়ে উঠল মন্থর। ফাঁকা
 মাঠের তবল অন্ধকারে একঝোড়া গিল্পল চোখের দৃষ্টি
 মন্থর মুখের ওপর আছড়ে পড়ল। চাপা গলায় মন্থর
 বলল—তুই কখন না? চুরি কংবা বাছো নর? কখন
 মাঝা নীচু করে নব দিয়ে মাটি বুঁটতে বুঁটতে নিরু নিচু
 গলায় বলল—কি আর কইনু কহেক। ব্যাটার গারিক
 জর। বোঁটার স্তম্ভিকার ব্যাধায়, গলায় ঘমে ভটা ব্যাধার
 উলান তেলে সে আর কিছু বলতে পারল না। সেই মধ্য-

রায়ে নির্জন মাঠের বন তবল অন্ধকারে ছোঁড়ো চোখে
 দৃষ্টিতে কি যেন এক অর্থহীন ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠল।

—তুই খুশি সুবোধালীর কাছে গেলু, লর?

—হয় গেছলু পরমা না থাকলি, মনের মাছুষও
 ক্যাংগার না তাই, মন্থর কথার কান্নার আভাষ মুটে ভেঁটে।
 চকচকে টিনের একটা বিশাল বাতীর দিকে তাকিয়ে
 হঠাৎ বুঝা বাথের মত কণিশ আলোর জলে উঠল কঁধনের
 চোখ দুটো। হিংস্র গলায় বলল—ঐ শালা মংহের
 খোবেহ বাতীতে ডাকাতি করলে কেমন হয় মন্থর?
 হামাহের বীচনের ধান খায়ে খায়ে শালা অস্ত্র ব্যাকা
 কোঁকের মত মোটা হইছে—

ডাকাতি! ধক করে জলে উঠল মন্থর চোখদুটো।
 হঠাৎ যেন দু'থেকে তার কানে ভেসে উঠল তার বাবার
 কথাতুলো : ডাকাতির বেশ হামরা। রাজা মহীপালের
 সাথে হামাহের পূর্বপুরুষ অম্বুধল বরম বৃত্ত করিছে
 দিব্যকের সঙ্গে হাত মিলায়ে। নহণা যেন বহ বহ শতাব্দীর
 আগের সেই বুড়োমাম্বা সাদা ছিল তার রক্ত রক্তে।
 কান দুটো ঐ ঐ করতে লাগল। কিন্তু—

কিন্তু বুড়োশিখের মূখধানা মনে পড়তেই মুহুর্তে
 কেমন আচ্ছন্ন। বিংশ হয়ে গেল তার চেতনা। বলল—
 কখন, মুই চড়কের শুভ্র। বুড়োশিখের কোণ পড়বি
 মোর ওপরে—বুড়োশিখ! ঘুরার বিড়ার জল কঁধনের
 চোখে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—বুড়োশিখ তোমাক ছুঁবা
 খালা চাছে? তোমার সুবোধালীর রক্ত মাখাত নিচু
 দিয়ে তাক বৈ করবার হাউপ পূর্ব করিছে? কঁধনের
 রক্তজল দৃষ্টো চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন পুত
 নিশ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মন্থর। ছাড়া ছাড়া গলায়
 বলল : হেথ কখন, বুড়োশিখের যা ইচ্ছা হবি তা
 কেউ রুখবা পারবে না—

—বেশ, তুমি তোমার বুড়োশিখ নিয়েই থাকো।
 রাজির অত্যাচার অন্ধকার চোখের পলকে ছায়ার মতন
 মিলিয়ে গেল কখন।

দুপুংহর রোহ শিবপুংহরের জলে তবল অগ্রিমার মত
 জলছে। আশ্চর্যবীর নিবিড় অরণ্যের ঘরে একটা মোড়ার
 বলে মাছ বরছেন মথেন্ন খোব। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের

প্রেসিডেন্ট। দ্বিতীয় স্তরের কারাবাসী। তার চকচকে
 টিনের বিশাল বাড়ীটা নৈমপুত্র, বাসপুত্র, দুর্গতপুত্র ও আরও
 দশটা গ্রামের ব্রাত্য, হারিত্যাকীর্ণ মানুষগণের বুকের
 ভেতরে একটি ছোয়ার মতই বিধে আছে। অশ্লীল
 চোখে বৈদ্যুতিক ক্ষতনার দিকে তাকিয়ে আছে মহেন্দ্র বোম্ব।
 নিঃশব্দ পায়ে মংলু তার নামনে এসে দাঁড়াল। বলল—বাবু
 মোর একটা কথা শুনিবিন ?

—কি কথা বাবা, শিবের চ্যালা ? মহেন্দ্রবাবুর বন্ধু,
 অমির বন্ধু চোখদুটো নাচিয়ে বললেন। তিনি মহেন্দ্র
 বোম্বের পরিচালিত নারীমহল আশ্রমের শিক্ষক। বিচিত্র
 মানুষ এই অমির বোম্ব। সমাজ সেবার প্রেরণা যেন
 লোকটার রক্ত রক্তে আগুন ঘরিরে ঘিরেছে। কবে
 কোথার থেকে এরশে এসেছে তা কেউ জানে না। তবে
 বেশভাষের পর থেকেই তাঁকে এখানে স্থায়ীভাবে বাস
 করতে দেখা যাচ্ছে। তিনি স্বেচ্ছায় বিনা মাইনের আশ্রমের
 ঘেরেঘেরে পড়ানোর ভার নিয়েছেন। বোম্বমশাই বলল—
 কি কথা বে মংলু ?

—আমাকে এক কুড়ি টাকা দাও দেখা যাবে।

—দাও তুই শোব কববি কি করে ?

—তোমার বাড়ীতে ব্যাগাং খাটে শোব করবু বাবু।

—না বাবু, ব্যাগাং খাটেতে পারবো না। বিনা
 পরসার খাটালেই তোরা হল পাকাবি। বেজাগার মত
 আন্দোলন করবি।

মাথা নীচু করে চলে আসছিল মংলু।

অমির বলল—আশ্রমের গোরুর পাজীর গাড়োয়ানটা
 আজ করবিন হলো আসছে না। ওকে গাড়োয়ানের
 চাকরীটা দিয়ে বিন না বোম্বমশাই—কিছুক্ষণ পরামর্শ
 চলল—ভাবের হুঁপুনের ভেতরে। মংলু গাড়োয়ানের
 চাকরীতে বহাল হোলো। চোখ দুটো বিস্ময়িত করে
 অমিরনাথ বলল—খুব কঠিন কাজ কিন্তু—পারবি তো ?
 প্রায়ই বায়ো কিছু পাজী নিয়ে এক গ্রাম থেকে আরেক এক
 গ্রামে গুরুরা নিয়ে বেতে হবে।

—মাইনে পারি মানে বশ টাকা। বলল—বোম্ব
 মশাই।

বোম্ব পায়ে মংলু চলেছে বাড়ীর দিকে। লম্বুহে

পারাবত্তের মত মনটা বিপুল উল্লাসে আকাশে উড়ে উড়ে
 যেতে চায়। সুবোবালা! বর্ষাকের মিশকীর প্রান্তরে
 আম-মাম গাছের ছায়ায় ছায়ায় বসন্তের মতই তাবের
 নিবিড় ভালগালা সেই স্নেহ বৈশব থেকে বেড়ে
 উঠেছিল। বর্ষার রাতে স্নেহের পারাবের ঝল ঝল
 আর আম কুড়াবার সেই উচ্ছল বর্ষার স্মৃতিয়া মোহাচ্ছিন্ন
 মত শুন শুন করে উঠল তার মনের ভেতরে।

বেলাশেষের রোষ ঝাঁক হতে পড়েছে সুবোবালাবের
 বাড়ীর বউ-বুড়ানী আমগাছের মাথার। সুবোবালা তার
 বাবার ব্যস্ততার পায়ে তেল মালিশ করছে অশ্লীল
 মনোযোগে। মংলু এসে দাঁড়াল। বলল—ম্যাঠা, দুই
 চাকরী পাইছি। চাকরুড়ি টাকাই দিবা পাতলু এবার—

ওই মুখোত কতবার কত কথাই বি বললু মংলু!
 তাক্সিলোর ভগ্নাত্তে বুড়ো বোলো বর্ষনের মুখখানা বিস্ময়
 হয়ে উঠল। কিন্তু মংলু কাতর গলায় বলল, তোমার
 কতাপনের চাকরুড়ি টাকা আর দুই মাস পরে দিবি। তুমি
 কিন্তু ঈশ্বরের ব্যাটার সাথে বিয়া বিও না—

কি ? কি বললু ? বেতো পাহাটো নিয়ে বর বর
 করে কাপতে কাপতে উঠে দাঁড়ালো। চীৎকার করে
 বলল—দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা শুনুন কৃষকার। তোরা
 তনকে যেটার বিয়া না দিয়ে বসে থাকে জাত শোয়াবু!

তীক্ষ্ণ অপমানে মংলু বুকটা খেন ছিঁড়ে গেল। মাথা
 নীচু করে বেরিয়ে আসার সময় হেঁদল, সুবোবালা চোখ
 দুটো ফিট বোঁজুক শোনাগার মত অলসে। হতাশায়
 পাখের হয়ে গেল মংলুর মন।

সন্ধ্যার সময় ভারী মন নিয়ে মংলু কর্ণহলে বসনা
 হলো। আশ্রমটা ডাঙাতে। ডাটী গ্রামটা 'বর্ডার' থেকে
 চার মাইল দূরে। রামনগর মহকুমা শহর ছাড়িয়ে আরো
 দশ মাইল পর তাকে যেতে হবে। কিন্তু স্নেহের সীমানায়
 গিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। মন বলল—কি ভয়—কার
 ভয়—কার ভয় টাকা রোজগার করতে যাচ্ছে সে! বাস্তব
 কালভাটের ওপরে বসে পড়ল। সুবোবালা সেই মাসিটা
 যেন তার রক্তে আগুন ঘিরে দিগ। হঠাৎ বহুল গাছের
 আড়ালে মাঝেমাঝে স্নেহের মত একটা কিসকিল হাসিতে
 ছন্দোময়ভিত্তি হয়ে উঠল বাতাস। বর্ষা তথা বৈশাখী সুদিয়ে

হাসিতে হাসিতে ভেঙে পড়ে সুরোবালা সামনে এসে দাঁড়াল। বলল তোক হওবৎ কংবা অসম্ভব।

—চলে যা তুই—বড়শোকেব বেটীর সাথের মোর কোন সাধ নাই। তার দিকে একবারও না তাকিয়ে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল মংলু। আকুল গলায় চেঁচিয়ে ডাকল, শোন শোন হাস না মংলু!

মংলু দাঁড়াল। তার হাত দুটো ধরে কেমন ভিজে ভিজে, কান্না ভরা গলায় বলল সুরোবালা, এত মাথতে কোন বুড়িই নাই। এই আশ মাইল রাস্তা হাঁটে যেথা কংবা কি এমনি আসিছি? নরম হয়ে এস মংলুর চোখের দৃষ্টি। কক্ষণ বিধগ্ন গলায় বলল আবার সুরো, গাভ্রনের সময় শিরেও মাথতে হাত দিয়ে তোক মোর—

—থাক—থাক—আর কিছু বলনা হবি না সুরো, ব্যগ্র দুটো হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের ভেতরে টেনে নিল মংলু। উৎসাহিত অস্থির গলায় বলল—এই তিনকুড়ি টাকা তুই কাছে রাখ-সুরো। আর দুইটা মাস সবুৎ কং—আর এক কুড়ি টাকা আমে তোর কক্কণ বাপটার পায়ের গোড়াত্ত র্ননাৎ করে বেলে দিয়ে তোক নিয়ে চলে যাবু—

বেগতে বেগতে একমাপ বকেটে যার। ডাক্তার মারী-মঙ্গল আশ্রমের পাড়োয়ান হয়ে অমিরবাবু নির্দেশে মহকুমার নানা গ্রাম থেকে অনাথা মেয়েদের পাড়ীতে করে নিয়ে আসে মংলু। সেদিন আশ্রম বেগতে এলেন মহেন্দ্র ঘোষ। মংলুকে এক মাসের মাইনে ২৫ টাকা দিলেন। তারপরই হাঁক দিলেন—অমির এদিকে আসো ত—

বাই খোষ মশাই, আশ্রমের দিকে অমিরবাবু এসে দাঁড়ালেন।

গীতা, ছদ্মা, বেলাঘের গুল কাইজাল পরীক্ষার কি ব্যবস্থা কংবেছো?

—ওদের তো পরীক্ষার মন্ত ভাল করে ভেড়ী কংবেছি। পরীক্ষার কিও জমা দিগেছি।

—বেশ! পরম তুস্তির একটা হাসি সুটল মহেন্দ্র ঘোষের মুখে। অমিরকে বলল—তুমি বেগতে পাবে। আর জ্যোতিষকে ভেতক দিয়ে যাও।

জ্যোতিষ এল। লম্বা দিল হিলে সাপের মন্ত চেছারা।

গলায় তুলসীকাটির মালা। কপালে চন্দনের তিলক। ঘোষ মশাই বললেন—কি হে বটক, মালতীর আর গৌরীর বিয়ের চোটা কতদূর কংবেল?

—বামদগদের প্রণামতি অকিমে দিগেছিলাম। একজন কয়িহু আর একজন বামনের ছেলে আছে। ছুগনেই ব্যবসারী এবং ঘোষবরে।

—বেশ তো ব্যবস্থা করে ফেল না?

—কিন্তু ণাতে যে মিলছে না—

—আহা! বিস্তর হয়ে ঘোষমশাই বলল, কে তাহের ণাত বসতে বাচ্ছে! তারা বিনে পণে বিয়ে করবে কি না—এটাই ভাববার কথা।

হ্যাঁ কংবে। তারা দুইজনই মালতী ও গৌরীকে বেগে গেছে। পছন্দ হয়েছে—

—আগে গৌরীর বিয়ের ব্যবস্থা করে। ঘোষমশাই উঠে দাঁড়াতেই তার নজরে পড়ল, আশ্রমের রান আলোয় ভরা বরশোলায় জানালায় জানালায় কংকে কোড়া কোতুংসী অঙ্গললে চোখ উঁকি দিচ্ছে। ওদিকে শোনা গেল আত্মীয় সমাধ সেবক অমিরনাথের গলায় স্বর। পড়ো—চারিধিকে জল দিয়ে দেবা স্থপতাপকে ঘাঁপ বলে। মেরেবের পড়োচ্ছে অমিরনাথ।

পোস্তয়েক সিংহাংটে ধরিয়ে বাইবে এলেন হরেন ঘোষ। টোটে বিনয়ের হাসি কুলিয়ে জ্যোতিষও তাকে এগিয়ে দিতে এল। মাথা চুলকে বলল—তার একটা কথা—

—কি?

—গৌরীকে যে পছন্দ কংবেছে, সেই ছেলে এখানে আসতে চাহ না।

—বেশ, মেগে তুলে নিয়ে তার বাড়ীতে বিয়ে বেবে।

—গৌরীর সঙ্গে কে যাবে স্তার?

—তুমিই যাবে। অমিরকেও বলবে ও যদি বেগতে পাবে তাহলে ভাল হয়।

তিনদিন পর। ডাক্তার রাস্তায় দুই পাশে রাত্রি মেমেছে গভীর হয়ে।

মদ্যরাত্রির শুভতার বুকে ঠুং-ঠুং বড়ীর বৃহ নন্দ তুলে নারীমঙ্গল আশ্রমের পাড়ী চালিয়ে চলেছে মংলু রানীদগড়ের দিকে। গাড়ী এখন ঘরনবাটীর কাছে এল, ওখন গৌরী

হুঁচ পলার জ্যোতিষকে বলল—রানীমদর কোনদিকে—এ কোথায় নিয়ে চলেছেন ?

—এই তো আর তিন মাইল বাকী আছে গৌরী। বিয়ে হবে ওনলেই মেয়েরা অস্থির হয়ে ওঠে। আর একটু সবু কর।

—না আমার কেমন ভয় ভয় করছে।

মংলু গোরু দুটোর পেটে শুভো মেঝে নিশ্চেষ্ট গাড়ী চালাচ্ছে আর নিরাক্রম একটা অস্থির যেন ভুবপুনের মত কালা কালা করে বিচ্ছে তার চেতনাকে। রানীমদর তো এদিকে নয়। ক্রমশই যে পারিক্রান্তের সীমানার চলেছে তারা। উজ্জ্বলিত কাল্লাও তেমে পড়ল গৌরী। জ্যোতিষের ঘাত দুটো ধরে বলল—বলুন কোথায় নিয়ে চলেছেন আপনি ?

—খন্দাও গাড়ী। বাত্রির শুদ্ধতা বিকট একটা চীৎকারে চনকে উঠল। আজাইয়ের খাল—কানিয়াডাঙ্গার কাছে আসতেই দুখন অস্বাভাবী যুবক ঝাঁপিয়ে এল বাড়ীর সামনে। গাড়ী থেকে লাফিয়ে নামল জ্যোতিষ। একজন যুবক তার হাতে কবচের কলঙলো নোট ভঁজে বিচ্ছে। গৌরী আকুলপলার চীৎকার করে উঠল—মংলু আমাকে বাঁচাও বাঁচাও—

মুহুর্তে গৌরীকে পাঁজাকাল করে তুলে নিয়ে রাস্তার অন্ধকারে তীব্র বেগে অদৃষ্ট হয়ে গেল মংলু।

—ধব—ধব আমার মেয়েকে নিয়ে পালাচ্ছে, চোঁড়ের উঠল জ্যোতিষ। বালের এপারে সীমান্ত বকীবেগ তাঁহু থেকে ঝলসে উঠল টর্চের আলো। সেই ছুটি যুবক আর জ্যোতিষ চারিদিকে হস্তে হয়ে বুঁকল। কিন্তু কোথাও মংলু কি গৌরীকে পাওয়া গেল না।

শেষহাতের অন্ধকার ভিকে হয়ে আসছে। রানীমদর—কানিয়াডাঙ্গার সড়কের ধূপার ওপরে টানতে টানতে বসে পড়ল গৌরী।

—তোমার কেউ নেই দ্বিধামনি ?

—পতিব্রাহ্মণোষ্ঠ অক্ষিপের পিওন আমার দূর সম্পর্কের ভাই হয় মংলু। কোন কথা বলল না মংলু। তখনো তার ইঞ্জিরে ইঞ্জিরে ঝড়ের তীব্র হয়ে চলেছে। কোথায় থেকে যেন কি হয়ে গেল। এর আগেও সে অজস্রের দু-

একটি মেয়েকে গাড়ীতে করে নিয়ে নিয়ে ছেলের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছে। প্রত্যেকবারই এই জ্যোতিষই তার সঙ্গে ছিল। কিন্তু এবার গৌরীর বেলায় তার কি দৃষ্টি হলো। কে এই ছুটি যুবক। ভয়ের সঙ্গে জ্যোতিষের আগে থেকেই কি কোন বশোবস্ত ছিল। বহিঃকর মধ্যম সড়ক রাস-বন্দী মংলুর চেতনাটা কেমন বিশৃঙ্খল হয়ে আসে। সে কিছু বুঝতে পারে না।

—কি ভাবছো—মংলু। গৌরীর কথায় যেন বাধা ঘেঁরে যুন থেকে ভেগে উঠল মংলু। গৌরী বলল—তুমি আর ভয়ে আমার ভাই হিসে। তুমি আমার ইচ্ছা ব্যতিরেকে মংলু।

—পতিব্রাহ্মণ তোমার বাবার বাড়ীতে গেইল তোমাক নিয়ে তো দ্বিধামনি ?

—না নিলেও যেতেই হবে মংলু।

—আশ্রমোত্তর চলে না ক্যান ?

—না। ওখানে যাবো না মংলু।

হাড়বিভিন্নের দুর্বল বেহটকে একটা ঘামপাছের শুদ্ধিতে ঠেস দিয়ে বুঁকতে লাগল গৌরী। মংলু গেল গাড়ী বুঁকতে। একটা গাড়োয়ান যেতে রাঙা হল পতিব্রাহ্মণ। কুড়ি মাইল দাড়া। হন টাকা ভাড়া হাঁকল। মংলু বললো গৌরীকে, দ্বিধামনি তোমার কাছে টাকাকড়ি কিছু আছে ?

—না ভাই—একটি পরলোও নেই।

গাড়োয়ান বলল—হনটাকার এক পাইলার কম হলে সুই পতিব্রাহ্মণ বাবা পারেন না।

—মংলু, তোমার কাছে যদি হনটা টাকা থাকে তাহলে দাও মংলু। আমাকে বাঁচাও—

হনটাকা! হঠেন ঘোঁরে ঘোঁরা একমাসের মাইনে তার কোমরে পৌঁছা আছে। হন টাকা। মংলুর বুঁকর তেতরে তীব্র একটা বাধা পাক দিয়ে উঠল। তার মুরোবালা। তার জীবনের স্বপ্নেরা পানে মাথা একটি মোহন বাধনা। না—না এটাকা সে খবর করতে পারবে না। সোদপুংর রাকবংশীপাড়ার মোটের ঘরের আড়াল থেকে নীড়ের স্বপ্ন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আরও একমাস। আরও হনটাকা!

—মুহুর্তে আমাকে হশটা টাকা খার দাও—মুহুর্তে
এলে—

মুহুর্তে প্রথমে একটা উত্তেজনা ভাবিত হয়ে গেল তার
হৃদয়ে রক্তে। চড়কের ভক্ত সে। হশটা গ্রাম তাকে
এক ডাকে চান। জাতে সে রাজবংশ—বিবাকের সঙ্গে
হাত মিলিয়ে রাজ মন্ত্রীপালের বিজ্ঞে সমস্ত শোখিত
মন্ত্রিত্বের হয়ে বিজ্ঞানের আগুন জ্বলিয়ে ছিল তাৎপর্ষ্যই
উত্তপ্তকরণ। তাৎপর্ষ্যই অতীত পুত্রের বীজের আর
উদ্বারতা যেন তার হৃদয়ে রক্তে, হৃদয়ে হৃদয়ে
পাড়া কাগিরে তুলল। মুহুর্তে মরণ ও উদ্বার একটা
আবেগ যেন তাকে মাটি থেকে অনেক—অনেক উচ্চতায়
নিষ্কাশিল। বঙ্গল—গাড়োয়ান—তোমাকে হশ টাকাই
দিয়ে—

পূর্বের আকাশে রক্ত পলালের বড় ধরল। সুরো-

বাল্যের হাদি হাদি মুখখানা যেন ছুঁবির মত বিঁধে গেছে
মংগুরে বুদ্ধের তেতরে। সেই কতদূর থেকে যেন অবিরল
ধারায় বসন্ত বহছে। কিন্তু কদিন শপথের ইজিতে কলমে
ওঠে তার চোখবুটো। বহুসংসার, ভালবাসার মানুষ তার
জীবনকে মধুর করতে পারবে না, পারবে না—অসম্ভব—
যতদিন ঐ কট্যমুহুর্তের কারখানী যন্ত্রে খেঁচ খেঁচ আর কপট
সাপু কোট্যমুহুর্তের মত নরপিশাচরা থাকবে। সমাজে শুধা
আছে বলেই হিংস্র ধারিত্র্য। তাইবের কুবে কুবে খেঁচ
ফেলছে। আর অত্যাচারের লজ্জাই গুণের নির্দেশ সমাজ
নিষ্ঠুর পাণের কাজ তাইবের করতে হচ্ছে। ওইবেরকে
সমাজের বুক থেকে নিষ্কাশ করে মুছে ফেলতে হবে!
হাতের আঙুলগুলো মুঠো পাকিয়ে কি মনে শুঁড়ে। শুঁড়ে
কবে ভেঙ্গে ফেলতে চায় সে! কবে—কতদিন পরে
আগবে সেদিন!

শারদাসংসারের

আনন্দ মুখের

দ্বিধা

পরিপূর্ণভাবে যোগ দিতে হ'লে

চাই প্রসাধন পরিপাটি।

বোরোলীন

আপনার কান্দি উন্নত করে তুলুক।

কুবুদ শ্রমকে শুদ্ধ এই অনবদ্য প্রসাধনী

সৌন্দর্য সৃষ্টিতে অমূল্য।

পরিবেশক : দি. দত্ত এণ্ড কোং

১৬, বনভিট লেন, কলিকাতা-১



স্মৃতি কণ্টক

শক্তিপদ রায়চন্দ্র

বাড়ীতে একটা স্তম্ভতা নেমে এসেছে, বীর্ণ পন্থের। বছর পর বসন্ত বাড়ী কিংকে হাসপাতাল থেকে। সাড়া, চাকলা, আনন্দ উজ্জ্বল, কিছুই আগেনি, পনের বৎসর পর বহাচুত কোন এক অতিথি যেন এসে উভয় হৃদে তাদের সংসারে; সহজেই সে দখল করবে কর্তৃবের আসন, যোগ্যতা থাক বা না থাক তাকে মানতে হবে। বড়ছেলে সমীরের মনে পড়ে বাবাকে অন্ন অন্ন; একটা বেবনাথারক স্মৃতি; হিমবাত বন্দী অত্যাচার কোণের ঘরে চাঁৎকার করতো, মাঝে মাঝে বের হয়ে আসতো ঘোর করে উত্তম অধউল্লস অত্যাচার; সমীর বুলা মমিতা চাঁৎকার করতো গরু মাতের তরে; না ছুটে গিয়ে ঘরে খিল দিত। বসন্তের রাগটা ছিল ওর উপরেই বর্ধ, বা তা বলতো তাকে। সংগ্রহই মনে মনে কি একটা শব্দ ছিল মালার সংগ্রহ। চাঁৎকার করতো উদ্ভাষ বসন্ত।

—তুইই আমাকে পাগল করেছিল, তোর সাধ যাতে মেটে তার লক্ষ্যই।

হাঁক-ডাক-কান্নাকাটি গর্জনের শব্দে পানের বাড়ীর বিপিন বাবুর হাবোয়ানরা ছুটে আসতো—কখনও বিপিন বাবুও।

বসন্ত চুপ করে যেতো—বেধ দিকনি বিপিন কি বয়োবয় ছেলেমেয়ে, কোন কথা বলবার আগেই নড়াকান্না ছুড়ে।

সাব্যবহ দাখু বয়ে গেছে সে। কিন্তু আড়চোখে চেয়ে থাকতো বিপিনবাবুর দিকে। হোঁচকারী হৃদয় চেহারা, বড় বাবুসার মালিক, অন্ন বয়েসেই যাত্র একটী সন্তান অন্বেষ পড়ই ব্রীকে হারিয়েছেন। তারপর আর বিয়ে থাও করেনি। কল করে বসন্ত বলে ওঠে—

—তা তোমার এত ঘর কেন হে?

—থাকবে তুমি? বিপিনবাবুকে ভয় হয় তার হাটোয়ানদের লক্ষ্য। বিশেষ করে ওই রামচাঁদ চৌককে;

বিষম বস্তা লোকটা, বেলায় মারে। হুড়হুড় করে ঘরে গিয়ে চুকসো।

—কেও যদি এমন দেখি টিক রীতিতে পাঠাবো তোমায়।

মালা ঘরে কীংকো; আশেপাশে ঘিরে রয়েছে ছেলে মেয়েরা; চোখকার করতে একমাত্র ওই বসন্তই; সেই আশ উদ্ভাষ হয়ে উঠেছে।

—রোজ লড়ায়েলার বাসু কোথায় গেছে জে?

—আঃ ছেলেমেয়েরা রয়েছে। মালা স্বামীরে ধামাধার চেঁচা করে।

—লক্ষ্য! বসন্ত কল করে মালার কৈকড়ান একহাল চুলকে বুঠো করে খেতে এক হৈচর্য তাকে মেয়েতে কেসে ছমছম প্রহার করে চলে! আবার সেই আর্ডমার! অন্ধকার হুঁড়ে সেই কান্না।

সে এক বৈয়াক্য আতঙ্কজনক স্মৃতি! বাহা বসন্তে কোন শব্দ বরা নির্ভর তাপা বুঝে পানি; একটা আতঙ্ক!

আবার কিত্তে আগছে বসন্ত—হাসপাতাল থেকে বীর্ণ পনের বছর পর। মমিতা তখন ছোট, বাবাকে মনে পড়লে তার কান্না আসে। বসন্ত কালো, বুলা করসা হয়েছে। একদিন চুপি চুপি এসে দোলনা থেকে তাকে তুলে ছিত্তে কেসে বিরছিল মেয়েতে। সে আশ্বস্তের রাগ আশও নিলোয়নি বুলায় কপাল থেকে—লম্বা রাগটা আজও ছুটে রয়েছে।

মালার বয়স হয়েছে আজ, সেই প্রথম কালো কৈকড়ান চুলে পাক করেছে। নিটোল মোদের গুড়ুলের মুখে ঠাই ঠাই ভাজ পড়েছে। এককালে জপদী ছিল। হুঁইঅলতার গোলা বং তুলি আঁকা চোখ; ভবপূর স্বাস্থ্য। বসন্ত ভালবাসতো অন্ধের মত; বঠাৎ একদিন কোথায় যেন দখ গোলামাল হয়ে গেল তার মনে।

—আমাকে বেঁচে হাসছো ?

—মা ! অথাক হয়ে যায় মালাওর কথার—চাহনিতে।

—নিশ্চয়ই। আমি কালো স্তম্ভিত কিনা। রূপ—

রূপের বোমাক ! পাড়ায় তাই দেখিঃ দুই বেড়ান হয়।

যনে ঘরে না তো বেরিয়ে গেলেই পারো !

বুলা তখন কোলে !

—কি বলছো যা তা পাগলের মত। মালা অপমানে
চাঁৎকার করে ওঠে।

—পাগল। আমি পাগল ! বিড় বিড় করছে বসন্ত।
মিক মিক আঙুন লেগেছে শুকনো ঝড় পাবার। হঠাৎ
ধপ্ করে অলে ওঠে। মালায় গালে এক চড় ক'সে দেয়।

—উঃ ! আত্মনাশ করে উঠে মালা। চোখে তার
ঘৃণা—বসন্ত হিঃ বৃষ্টিতে ওর ঘৃণা ভরা চোখের দিকে চেয়ে
আছে। রাগে অপমানে কাঁপছে মালা—হুমি মারলে ?

কি যেন একটা ঝড় উঠেছে বসন্তের মনে ; ওই রূপদী
দম্পিলকে পাথের নীচে ঠেলে রাখবার মহৌষধ সে আশ্চর্য
করছে ; উদ্দাম অনৈশ্ব ঠা টা করে হাসতে থাকে
বরষার।

সেই প্রথম সূত্রপাত। কি এক যৈতোর ভ্রগ্ৰহুর তার
মনে ভয় নিল। তার শেষ পরিণতি ওই হাসপাতালে।
তারপর মাঝে মাঝে গিরেছিল দেখতে—কিন্তু আরো তাকে
সহ করতে পারতো না বসন্ত। চাঁৎকার করতে—আবার
এখানেও এসেছিল তুই।

ডাক্তার একদিন বলে মালাকে—আপাততঃ আসা বন্ধ
রাখুন। আমকা চিঠি দিয়ে জানাবো।

বেশ ! মালা ছোট্ট অব্যব দেয়।

বসন্তের উপর প্রেম-ঐতি যে ছিল না তার তা নয়, কিন্তু
বেহিন বসন্ত সংসারের বাইরে সরে এল—নিহাররূপ অভাব,
কষ্টের চাপে পড়ে মালা সেই সম্পর্কটুকুও বাহ্যিক বলেই
মনে করে। সন্নী-বুলা-নমিতা ওদের মন্ত ভাবনার মন
জুড়ে থাকে—নিজের কথাও ভাবে সে।

বিগিনবাবুই সাহায্য করেন, বসন্তের কথাগুলো মনে
পড়ে, বিগিনের উদ্দেশে যা তা বলতো তাকে ভড়িয়ে।
সোকজন অনেকগুলো শুনেছে সে কথা। তাই বিগিনবাবুর
কথার মাথা নামিয়ে অব্যব দেয়—সোকে কি ভাবে।

শাড়ীর আঁচলটা বুটেছে আঁচল দিয়ে ; বিগিনবাবু অব্যব
দেয়—যে যাই বলুক নোঠান যা সত্য তা সত্যই থাকবে।
তোমার ভাবনার কিছু নেই ! বসন্ত আমার খাল্যবন্ধ,
আমার একটা কর্তব্য আছে তো।

মালায় চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে—হতাশার
অন্ধকার। সন্নীতের পড়ার খরচ, বুলাকে স্কুল পাঠাচ্ছে
তার পোষাক-আশাক খরচ ; তিনটি শিশু আর স্ন—এক
ছত্তর নবীর তীরে তারের পরিত্যাগ করে যেন মিত্রদশ
হয়ে গেছে বসন্ত।

বিগিনকে ঠিক অবিখ্যল করতে পারেনি মালা। একটি
মাত্র সহান বুলাও, ও যেন এতের স্নঃ মিশে গেছে।
সন্নীতের চেয়ে ছ'একবৎসরের ছোট, ঠিক ছুটি যেন ভাই।
বিগিনবাবু আগে বসন্ত থাকতে মাঝে মাঝে এ বাড়ীতে
আসতো—কিন্তু বসন্তকে হাসপাতালে পাঠাবার পর এ
বাড়ীতে আর আসে না। সহকারমশাইএর মারকৎ সব
কিছুর ব্যবস্থা হয়। মালা দেখিন কি দরকারে ওর
বাড়ীতেই গেছে।

—আপনি।

মালা মাথার কাপড়টা একটু টেনে বলে—এত খরচ
করে সন্নীতকে না পড়িয়ে একটা টাকারী ব্যবস্থা
করে যিন।

ম্যাট্রিক পাশ করেছে সন্নীত ; মালা আর ওর দর
নিত চায় না।

কথাটা শুনে বিগিনবাবু হাসেন—অন্ততঃ বি এন্স সি
পাশ করুক বোঠান। তারপর না হয় সন্নীতই মালে মালে
আমাকে কিছু করে দেবে।

মালা কথা কইল না। বিগিন আবার কায়ে মন দেয়।
আগে আগে নেমে এলো মালা। বই এ পড়েছে শুনেছেও
এর তার মুখে এমনি করেই যেরে বাহুথকে বশ করে
দোক ; তারপর একদিন অন্তর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত
করে দেয়। কিন্তু বিগিন কোন ঘাতের মালুম ঠিক বুঝতে
পায়েনা। এত বড় বাড়ী গাড়ী, টাকাকড়ি, তবু মনের
দিক বেকে কেমন একক নিঃব। এই শূন্যতার খবর আর
কেউ না লামুক—মালা খেমে কেলেছে।

বুলাও কলেজে পড়ছে। বুলাও বলে ওঠে—যেখো, ওদের টুকরো হাঁসি—কথাবার্তাগুলো শোনে; মারা মনে যেন কলেজে গিয়ে আবার অস্ত পড়া না শুরু হয়।

—মানে? বুলা বেশীটা খুলছিল, বাত দিয়ে চুলের ফিতোটা ধরা; চোখ দুটো ভাবের করে ঞ্জর করে তাকে। মালাও আবার মুটে উঠেছে ঘুং; তেমনি ঞ্জর সাধা আর বং পেয়েছে বুলা। বুলাও ওর দিকে চেয়ে অবাক হয়ে— এই সস্ত টুট আর কি!

—বাং! লক্ষ্য রাখা হয়ে ওঠে বুলা। মাঝে মাঝে বুলাও কি সব কথা বলে; একটু সামলে নিয়ে ঞ্জর করে বুলা—তোমাদের কলেজে ভই সব পড়ান হয় খুঁজি?

—এক আখুট! বুলাও সস্তার ভাবে অবাক হয়ে।

মালা আবার আসে। যেখে। যে মিথিষ্ক অঙ্কুর ধীরে এগেছিল চারদিক বীরে বীরে তা পরে বাজে, সকালের আলো আবারির মত। সন্ধ্যার বি, এ পশ করে বিপিনবাবুর ঘাড়েই কাঁধ করেছে। মটিনেও মোটামুটি মন্ড নয়। ওদের ছোট্ট শরীরে চলে বাবার পকে বসেই। নমিতাকে নিয়েই একটু বিপদে পড়ে মালা।

এ সময়ের থেকে সে একটু স্বস্তি। কালো কালো চেহারা, চোখের তারায় মাঝে মাঝে একটু তঁত্র চাহনি জেলে ওঠে; নব্বাই যেমন কিসের সন্ধান করেছে। মনে একটা চিরন্তন অজুগু ওর।

—এই লামা খুঁজি পরে? বুলাও কেন র.উল শাড়ী বেশী হামের আসে? আমায়?

মালা থমকে ওঠে—বা পেয়েছি এনেছি, এর বেশী নেই।

নমিতা মায়ের দিকে ঞেয়ে থাকে উৎসাহ চাউনিতে; মাথার একরাশ চুলে তেল পড়েনি; ওর দিকে চেয়ে চমকে ওঠে মালা; এই চাহনির মর্ম সে বোঝে। এমনি করে চাইতো বসন্তও তার দিকে—একটা আতঙ্কিত অহুত্ব। সামলিয়ে থমক দেয় মেয়েকে—পড়াশোনা নেই? এক ক্রাশে দুবার ফেল করেছিল!

স্বস্তিক থেকেই নমিতা ওদের থেকে আলাদা। নমিতার সাবা মনে অপরায় জালা, কেউ স্ত্রীকে দেখতে পাবেনা। বুলা হাসিতে ফেটে পড়ে বুলাওর নামনে; বুলাওকে কেমন বললে যায় ওর কাছে। বুঝ থেকে নমিতা

ওদের টুকরো হাঁসি—কথাবার্তাগুলো শোনে; মারা মনে একটা অহুত্ব বুঝে। বীরে বীরে বেগে উঠেছে। বুলাও উপর বিকাতীর বুলাওর মন বিধিয়ে ওঠে।

বুলাও চলে গেছে—বুলাওর গুণগুণ করে গান পাইছে; পড়াশোনার বহাবরই সে ভাগে। বুলাওকেও কেমন যেন ভাগে লাগে, একটা মিশ্রণ মনের সাহচর্য কামনা।

—তোমার লক্ষ্য লাগেনা বুলা?

বুলা নমিতার কথায় ফিরে চাইল। নমিতা বলে ওঠে—এত বড় ছেলের সামনে হি বি হাদি; এত কথা শুনেও বুলা কাস, কি বলিগ থস তো?

পাকা বুড়ীর মত শাসন করেছে নমিতা। বুলাওর কথার জবাব দিল না—চেয়ে থাকে ওর চোখের দিকে; কি যেন শরত্নির ছাপ নাথাকেনা নিষ্ঠুর সেই মুষ্টি। নমিতা বই টেনে নিয়ে পড়তে বসলো।

বুলাওর অবাক হয়ে গেছে ওর ব্যবহারে; বুলাওর সেদিন কলেজ থেকে তখনও ফেরেনি, লম্বা অ ফলে। বুলাওর হয়ে চুকে ওকে না দেখে বের হয়ে আসেছে, নমিতার কথায় ফিরে চাইল। চলে যাচ্ছে।

—এমনি!

—বুলাও নেই বলে কি আর কারো সঙ্গে কথাও বলা যায় না? বলা।

নমিতার কালো মুখ—ওই চোখের দিকে চেয়ে থাকে বুলাও। হঠাৎ একটা হাতই বেরে ফেলে নমিতা—বলবেনা?

চমকে ওঠে বুলাও। এমনি স্পর্শ কোনদিনই অহুত্ব করেনি। মালা সস্তার একটা শিহরণ বেগে যায়, বুলাওর সঙ্গে এতদিন মিশেছে যেভাবেও খেছে দুজনে; কিন্তু এমনি আলোড়ন তার পায়ে মনে কোনদিনই আসেনি। নমিতা এগিয়ে এসেছে, লুটির পড়েছে এসোমেসো চুলের রাশ—দুচোখে অহুত্ব কামনার জালা—বুকের কাপড় খসে গেছে; দুহাত দিয়ে মিথিষ্ক করে জড়িয়ে ধরতে যায় বুলাওকে—বুলাও চকিতের মধ্যে পরে গেল। গালে কে যেন লম্বা এক চড় মেয়েছে নমিতার; থমকে দাঁড়াল নমিতা। বুলাও দীর্ঘে নেমে চলেছে; ধরতার কাছে হঠাৎ মাকে এগিয়ে আসতে ফেলে চমক ভাঙে তার। মালাও নমিতার

হিকে চেয়ে থাকে। কথা বললো না নমিতা—ওপাশের ঘরে গিয়ে বার বার করে কেঁদে কেল বুক ভরা হাস আর জটিলানে। বুলাব উপরেই পড়ে হত আক্রোশ; দু'গালও বাধ দার না।

কহিন বুলাব আসেনি। মালা সেহিন বুলাকেই জিজ্ঞাসা করে—বুলাব ক'হিন আসেনি কেন রে ?

—কাঁকাবাবুও অনুপ, তাই নিশ্চই বাস্ত।

অনুপ !

মালা কি যেন ভাবছে।

মালা সেহিন বৈকালে ওদের বাড়ী চুকে একটু অংক হয়ে যায়; লোকটার অনুপ, বাড়ীতে কি চাকর যেন কেউ নেই। পায়ে পায়ে উপরে উঠে গেল। সিঁড়ির পাশে টবে পান্যাহুগোলের বস্ত্রের অভাবে শুকিয়ে গেছে। হাওয়ার পাখীটা ট্যা ট্যা করছে। বিপিনবাবুর লুটি চারিদিকে; ক'হিন এহিকে নজর দেবার কেউ নেই, পাখীটাও বোধ হয়, ছোলা চাতু পারিনি। ঘরে চুকে থমকে দাঁড়াল। দেহবিনী কাঠের খাটে শুয়ে আছে বিপিনবাবু, বোব হয় ঘুন্নুহু। কি ভেবে এগিয়ে গেল মালা।

নীরব, বসন্তে ঘরানা। জানলার খড়খড়ির কঁক জিরে একফালি বোব আঁচা অন্ধকার ঘরানার উঁকি মারছে। শিউ হুগের গন্ধ বসন্তগন্ধার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। মালা চেয়ে থাকে বিপিনবাবুর কঁক; হুগুগুহু হুগুগু চেহারা—বুখে চোখে একটা শুক প্রসাদিত ছায়া তাকে সকলের মাঝে আপন করে রেখেছে। ওর হিকে চেয়ে থাকে মালা—স্বামীকে মনে পড়না; মনে করতে চায়না সে একটা আতঙ্ক-বিভাদিকা। একটি বাহুর নীরবে ঘিরে গেল সব, ঘিনিময়ে চায়নি কিছুই, হুবেই সরিয়ে রেখেছে সন্ধ্যাপনে। জীবনে প্রেমপ্রীতির কোন স্পর্শই পারিনি সে। আত্ম মনে হয় বসন্তকে অবাচিত ভাবে অনেক কিছু ফিরেছে মালা যা তার প্রাপ্য নয়। বসন্ত নিরাক্রম ভাবে ঠিকিয়েছে তাকে।

হঠাৎ হাত লেগে টিপটীটা সপনে নীচে নেমেতে পড়ে যেতেই বহনক করে উঠে বসলো বিপিনবাবু। একি। চমকে ওঠে। মালা এসেছে তার ঘরে! নিবিড় উদ্বেগনার আঘাত বোমটা পেছে বলে, চোখে নিবিড় নিবর চায়নি।

আবণ রূপ তার অসুস্থ, ^১সেইনর সমাহুতি চোখের নিমিত্তা মেখে সমীর হয়ে উঠেছে।

—খোঁসান, তুমি ?

মালা কাঁপছে—খবো পড়ে গেছে তার মনের অন্তলের শব্দ।

কখন আসছেন ? শুভলাল অনুপ—বহরও ঘেননি। মালা বলে ওঠে।

—চিরকালই তো অনুপ, আপনাদের আবার বিব্রত করি কেন ? এরা সব গেল কোথায় ?

বিপিনবাবু যেন একা এই পরিবেশে মালাকে ঘেঁষে একটু বিব্রত হয়েছেন। মালা অথব বেরনা। নীরবে মাথা নামাল।

অপরাধ বোলা—কোথায় ভাবছে ক্রান্ত পানী; বাগান থেকে তেলে আসে খবো বহুলের সৌরভ। ডাণ্ডর ছু চোখ তুলে বলে ওঠে মালা,—আসি।

নীরবে বের হয়ে এল মালা—জীবন যে কত বড় বকনা করেছে তার সঙ্গে, তা ক্রমশঃ বুঝতে পারে। যা চায়নি কোনদিন তাই পেয়েছে এতকাল। একটি উষ্ম অপরাধ বোলা বিধায় বিন কেঁদে ওঠে তলে যাবার বেরনার—শেষ যৌবনও তার কাঁদে ব্যর্থ পাওয়ার দুখে। এ দুঃখ গভীর, অন্তলম্পর্শ এ বেরনা—অন্তর মন বাঁধের তুলে—তবু প্রকাশ করে যাঁকা ধবং উপায় নেই।

হাঁকা হাসিও শেষ থমকে দাঁড়াল। বুলাব আর বুলা হাসছে পড়ার ঘরে; একটি মুহূর্ত—মালা চকিতের মধ্যে নিঃসর ব্যর্থ অতীতকে প্রত্যক্ষ করে ওর হাসিতে। নীরব সূত্রে এল সেখানে থেকে।

—বাড়ী বেলে কে কোথায় গিয়েছিলে ? নমিতা যেন থমকান্ধে। চমকে উঠে মালা—যাযাক্ষার দাঁড়িয়ে নমিতা, ছু চোখে ওর হাওয়ার অন্তর্ভুক্তি—অবিদ্য। কি যেন বলতে গিয়ে বামল মালা। নমিতা বলে চলেছে।

—বুলা চলে গেল বুলালের সঙ্গে। তুমি কিছু বলবেনা, এই সন্ধ্যেলার টো টো করে বেড়াতে যাবেন ? বিব্রত হয়ে ওঠে মালা ওর কথায়। যাব যা খুঁচি কল্পকণে; ছুই নিজের কান করণে।

—আনি ইলাকে তুমি কোন্‌মোহিনী শাসন করবেন না।

চমকে ওঠে মালা ওর কথায়; হঠাৎ সত্যি, বৃন্দা—একটা ভাল পাছ মাথা চাড়া দিয়ে আকাশে উঠেছে।
চোখে মুখে সে বেথে তার অতীতকে—হাটোনে সেই
মোহিতিক। সে আজ ব্যর্থ বক্তিত হয়েছে—বৃন্দা খুঁধি
হোক। সুখী হোক। বাধা সে নেবে না।

—এমনি বিনে স্বপ্নটা এস। চিত্রিখানা এনে সমীর
বলে ওঠে—বাবা ফিরছে।

মালা শেলাই করছিল, ওর মুখের বিকে চাইলো, যেন
চমকে উঠেছে সে। সমীরও বেশ যেন খুঁধি হয়নি। বৃন্দাও
বলে ওঠে।

—সেইর পেছে নিশ্চয়!

সমীর জবাব দেয়—তাঁইতো সিঁধেছেন ডাক্তার।

মালা কথা কইলোনা—কি যেন ভাবছে। কোন
কাজেই আর লাগবেনা বসন্ত। পুত্রবন্দ্যাত্ব, পদসাও
বোজকার কবতে পারবেনা, ওদের বোজকারে ভাগ বসাবে
আর মাথার উপর কারও অকারণে স্ববহারি করবে। তাও
সহ করা যায় কিন্তু ছেলেকেওরো কাছে অপরিচিত
অজ্ঞাত একটি লোককে স্বামী বলে মেনে নিতে হবে—
এ যেন হুগল লক্ষ্যবোধ হয় তার।

ওর স্বপ্নখানা সাক্ষাতেরা করে ফেলি না। কথা
কইল নমিতাই। সেই উঠে পড়ে লেগেছে। বৃন্দার বিকে
চাইল কুহ ব্যঙ্গ ভরা দুটিতে। কি যেন বিকল্প কুটে ওঠে
ভাতে। বাড়ীতে এইবার শৃঙ্খলা দেখা যাবে। নিজেই
বলে, একজন মাথা বাক্য ভাল, বাড়ীর আত্ম থাকে।
না বলে ছিঃ ছিঃ।

সমীর ধমক দিয়ে ওঠে—তোকে বুড়ামি করতে
হবেনা—যা বিকি।

নমিতাকে কেউ দেখতে পারেনা তার ভই স্বভাবের
জন্ত। নমিতাই আর প্রাণান্ত পেতে তার।

অপরিচিত একটি লোক এসে বিকৃপা থেকে নামলো—
টেশনে গিয়েছিল বৃন্দাল আর বৃন্দা, কিন্তু কেউ চেয়ে না—
এদিক গুদিক দেখছে। বসন্ত বেহ হয়ে একটা বিকৃপা নিয়ে
এসেছে। টাম-বাসে উঠতে কেমন ভয় হয়, যদি পা ভস্কে
যায়।

অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে। কাঁকা মঠি পুত্রও যা ছিল
সব ভরাট হয়ে বাড়ী উঠেছে। তারের বাড়ীর সামনে

—এমো।
চুপ বাড়িগুলো কবিন কামোনা হয়নি, টেশনর বকলে
জামা কাপড়ও বদলা হয়ে গেছে। মালার বিকে চেয়ে
থাকে আবহা অতীত থেকে স্বপ্নের স্বপ্ন আলো
আপছে। কালো কুকিত কেনে আর দুচার পাছি সাদা
চাপ—মুখ চোখে একটা উত্তাপ। পাশে বাড়িরে আছে
বলিষ্ট সুপুত্র একটা শূক। এগিয়ে এসে প্রণাম করলো।
সমীরকে ঠিক চিনতে পারেনা যেন বসন্ত। মুখ চোখের
আবল বলে গেছে। চারিদিক অবাক হয়ে দেখছে বসন্ত।
মালা বলে ওঠে, সমীরই বাড়ীটাকে বদল করেছে।

—হাঁ। গুদিকে কানলাগুলো যেন বড় বড় দেখছি।
চমকে ওঠে মালা—সমীর বিকে চেয়ে থাকে।
বিপিনবাবুর বাগানের বিকে ভূটা জালনা কুটিয়েছে সমীর,
নাহলে স্বপ্নখানা খোলতাই হ'তল না। বৃন্দার কথার
জবাব দিল না মালা—কিন্তু অহুমান করে, দীর্ঘশ্বাসের বসন্ত
পবও ওর মনের সেই স্তম্ভ তেমনিই খুঁট রয়ে গেছে।
নমিতা এর মধ্যেই বেশ অগন করে নিচ্ছে বাবাকে।
দৌড়ে গিয়ে হাত মুখ খোবার ব্যবস্থা করে—তা খাবার এনে
ছাড়ির করে। ঘর থেকে টেবিল ফ্যানটা এনে বের্ত
করলো।

—বসন্ত গরম না বাবা ?

হাসে বসন্ত—না, অমাবের ওখান থেকে গরম এখানে
টের কম। বাঃ বেশ হালুখাটা হয়েছে। বিবি ? তা কে
আরও একটু।
হঠাৎ বৃন্দা আর বৃন্দালকে চুকে বসে প্লেটখানা
নামিরে রেখে মুখ ভুলে চাইল। বৃন্দাল ধমকে ঠাঁড়িয়েছে
ওর তীব্র চাহনির সামনে, বৃন্দাও। নমিতাই বলে
ওঠে—এতক্ষণ ছিলি কোথায় ?

বৃন্দাল জবাব দেয়, উঃ পুরা টেশন চলে বেড়ালাম।
চিনিনা—তা খুঁজবে কি করে।

—আগে পেটা মনে ছিল না ? নমিতা জবাব দেয়।

বদন্ত কিছুটা আঁচ করে নেয়; দুপালের বা গালে সেই তিসটা তেমনমিই রয়েছে, স্বপ্নের বংএ কাশা তিসটা, বংএ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বুলাব সঙ্গে এত ভাব! দুজন গাড়ী নিয়ে গিড়েছিল ঝৈমেন। কেমন যেন মাথা ঘূরছে বদন্তর।...গ্রেটখানা নামিয়ে উঠে পড়ল। এগিয়ে আসে নমিতা—কই খেলনা বাবা?

—মা।...উঠে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

হঠাৎ এই পরিবর্তন পালেরই চোখে পড়ে। নমিতা জুই বুটতে চেয়ে থাকে বুলা দুপালের দিকে। দুপালও সেই সজ্জাব ঘটনার পর থেকে নমিতার দল এড়িয়ে চলেছে।

—আপনার কলম নেই? দুপালও উদ্বেগে কথটা বলল নমিতা। মালা বনক দিয়ে গুঠে, ভুই বাধ দিকি। সেই ঘর; খাটখানাতো বিছানা পাতা। বেওয়ার্সে সেই কথানা ছবি আঁজও রয়েছে। পনের বছরের কোন পরিবর্তনই এখানে সাপেনি।

মালাব যৌবনকালের সেই ছবিখানা আঁজও ঠিক তেমনি হাঙ্গির আঙন জেলে তার দিকে চেয়ে আছে। তারের বিয়ের, সমরকার ছবিখানায় একটা মালা ফুলছে। ফুলগুলো বিবর্ণ শুকনো হয়ে আছে গেছে; ফুলছে ময়লা স্নাতোটা। চমকে ওঠে বদন্ত। গুহের দুকনের মনেও সব দৌলখ দৌলত মুছ গেছে নিঃশেষে—অংশেব পড়ে আছে ওই সান্নাভিক বদন্তটুকু। হঠাৎ চমকে ওঠে—বাগানের দিকে দৃষ্টি যেতেই।

এ ঘরে কোন জানলা ওদিকে ছিলনা—তাকে হাসপাতালে সরিয়ে বদন্তের নিযুক্ত ঘরখানার আঁক মুড়িয়েছে মালা ওই বিপিনবাবুর বাগানের দিকে জানলা কুটিয়ে। ওর বৃষ্টিও সামনে নিছকে তুলে বরছে বার বার। বাগানে পায়চারী করছে বিপিন! সর্বাক জালা করে ওঠে বদন্তের। উঠে গিয়ে সন্ধ্যে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে ছিল। উত্তেজনায় ঝাঁপছে সে।

মালাকে বেরে ঢুকতে দেখে সরে এসে চূপ করে।

—একি! জানলাটা বন্ধ করলে কেন? আসো আবুক।

মালা এগিয়ে যায় জানলাটার পানে। বদন্ত বাধা দিতে

গিরে থেমে গেল। মনের অন্তরে একটা সন্দেহ জ্বলি-কীটের মত শির শির করে উঠেছে তীব্র জ্বালায়। মালা জানলাটা খুলে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে।

আলো হাওয়া আসে—বাগানের দিক থেকে বাতাসটা বেশ শোশকুতে ভরপুর। সমীর দুপালের বাবাকে বলে জানালা দুটো কহিয়েছে।

ওর নির্দিষ্টতায় শিউরে উঠেছে বদন্ত, জানলায় সামনে ঝাঁড়িয়ে আছে। বাগান থেকে পুরো গৃহি সব দেখা যায়। গর্জন করে ওঠে বদন্ত—

—বন্ধ করে হাও জানলা।

চমকে ওঠে মালা; সেই আপেকার বিতীক্ষিত মরু নৃতি যেন অন্তরে তাপা পড়া নৃতি তৈল এগিয়ে আসে, তেমনি বৃশং ভাবন নৃতিতে। ভয়ে ভয়ে জানলাটা বন্ধ করে সরে এস।

—এই পনের বছর কি হয়েছে তা সব জানি।

মালা দীর কণ্ঠে বলে ওঠে, ওপর কথা এখন থাক। ছেলে মেয়েরা বড় হয়েছে। গুহের সামনে বা তা বোলা না। অব্যং পনেরো বছর আপেকার সেই অধিকার আর তার নেই; এই কথাটাই মালা জানতে চায়—এবং এই বাবোতেই নিজের লোথগুলো ঢাকতে চেষ্টা করছে সে। বদন্ত একথা মানতে রাজী নয়। আপাততঃ থামলো।

কিন্তু মনের ঝড় হু হু করে বয়ে চলেছে। দ্বির সন্ধানী তীব্র দৃষ্টিতে মালাব দিকে চেয়ে থাকে। মালা অথাক হয়ে গেছে। ওই কচি ছুঁব ছেলে মেয়েগুলোকে নিয়ে কি দুর্ভাগ্যে দুঃখ সন্ধ্যার মাঝেও পথ বাঘারনি—লোকের নিঃস্বার্থ সাহায্যে সে আবার ফুল পেয়েছে, একথা একবারও জানতে চায়নি সে। মনে কি গলে ঢুকলে মাহুৎ এমনি করে অপবর্ষ হয়ে ওঠে, কলনা করতে পারেনা। অদর্শায় ছাথে মালা কন্ঠায় ভেঙ্গে পড়ে। এ অতিবেগ বদন্তের কাছে নয়; মাহুৎের নাগালের বাইরে কোন অথবা ধেবতার বিস্তার। আজ মনে হয় অন্তত অদর্শায় কাটল সে। একা। বদন্ত উদ্ভাব বহুতেও এত দুঃখ পায়নি। সেদিন কেঁদেছিল নিঃশব্দে ছেলেদের ভবিষ্যতের ক্ষত। আজ ঝাঁপে—তার নিঃশব্দ অশ্রুটির মৌন পরিহাস—বদন্তের ছাঁবে এই মাহুৎের সামান্য পরিচয়টুকু বাতাবার দুঃখে।

...বসন্তের কাছে একজন মাত্র এ বাড়ীর অগ্নয়ন বলে মনে হয়। সে ওই নমিতা। দুপুরে বাবার ঘরে বসে গল্প করে চলেছে। মনের দিক্‌ত দিক্‌টা আঁখি মুগ্ধ বলে মনে হয়। বুলাব সঙ্গে সুখালের পটচিত্র—ধুবনের হাসি কথাবার্তা একত্রে সিনেমার কপোলে ঝাওয়া, সবই আঁখি বলে চলেছে নমিতা।

—আমিই বাবা বিয়েছি, তাইত কত রাগ।

—হঁ। বসন্ত মনে মনে কি যেন ভাবছে।

—মাও আমাকে তাই বলে; মাঝে মাঝে ও বাড়ীতে গেলে আমিও বসন্তে ছাড়িনা। এক সমুদ্র ভেদে সঙ্গে। এত মাঝামাঝি বৎসর কি ?

কড়টা উপকোশে মহাপুস্তকে পাক থাকে। কেরকটা চিল শুন, ডানা মেলে গাভালে তীরবেগে ওঠানমা করছে; একটা পাখী ছৌ দিয়ে নেমে এসে এই দিকেই।

মালাকে চুততে বেধে চুপ করে গেল নমিতা। ওঠে পড়ল সে। এতক্ষণ কি যেন অস্ত্রের কান্নাই করছিল, সেই ব্যরণটা তার মনে উন্নয় হয়।

বসন্ত কথা বললো না—স্রীত বিকে চেয়ে থাকে। মালা বলে ওঠে—তোমার আসার লক্ষ অপেক্ষা করছিলাম। স্তম্ভ কান তাকাতাড়ি সেবে কেলতে চাই। বিলতে মাঝার আগেই বিয়েটা হয়ে থাক।

—মানে। বসন্ত বিম্বিত হয়ে উঠেছে।

—বুলাব বিয়ে—ওই সুখালের সঙ্গে।

চমকে ওঠে বসন্ত—নমিতার কথাগুলো সবই সত্য। মালাও বাকী রাখেনি কিছু। তার সম্বন্ধ সত্য; বিপিনের বয়সেই গেলেছে তারের সংসার; নির্গন্ধ মালা আঁখি মেথেকেও তুলে দিতে গেলেছে ওই আমোয়াবের ছেলের হাতে। এ এক নিবিড় চক্রান্ত। তাকে উদ্ধার করে দিয়ে মালা নিজে উপভোগ করতে চায়। আঁখও তাই রূপে তার ভাটা আসেনি। তেমনি দুর্বার রূপ আর বাত্মা রয়েছে।

—না। গর্জন করে ওঠে বসন্ত।

অন্য ঠেকছে মালায়; এতদিন কোন বোঁধ খবর কর্তব্যই বাত করবার সামর্থ্য ছিল না তার এই অস্ত্র-সারপুত উদ্ভত শালন মানতে চায় না সে। বেশ কষ্টনি

কঠেই বলে ওঠে—আব আলিয়োন তুমি। বোম্বাই স্তোমার, সাহাযীবন আলিয়েছে। এবার চুপ করে থেকে শান্তি হাও।

—ইয়া, পেটোপিরি করে তুমি! সর্বদা বলে ওঠে মালায়। অষ্টবর্ষা আত্মহারা হয়ে কসু করে বলে কেল—পাখালানী বাশো।

—পাগল। কবার মনে মাঝ পড়লো; কড়টা কৈপে কৈপে নেমে আসছে আকাশ থেকে। কৈপেছে পাছপালা—মাটি! বসন্তে একটা প্রচণ্ড আঘাত করে বসে বসন্ত। ছিটকে পড়লো মালা আত্মনায়ে। সমীর অক্সিল বেলুজিলো, বাবার কথাগুলো কানে আসে—অন্য হয়ে উঠেছে তাবত। মাঝে তেতবড় অগ্নয়ন সহ কবতে বেখও চুপ করে ছিল—অতকিত আশ্রিতে মাঝে ছিটকে পড়তে বেখে এগিয়ে আসে—কপালটা গর্ভরভাবে কটে গেছে—বস্ত গড়িয়ে পড়ছে মেজতে। বসন্ত ক্রম আক্রোশে গভাছে খুব করে কেলবো তেকে।

হঠাৎ কঠমণে বস্ত্রতুমি অত্মহব করে চমকে ওঠে—সমীরের বলিষ্ঠ হাত ওকে টিপে ধরেছে। এমনি করে টিপে ধরতো। হাতেরাডান বানটেরল—হাসপাতালর ওয়ার্ডার। সেই স্মৃতি—নিবাক্তপ আল্প্র শর্য মন বিউরে ওঠে।

—কব বহি গারে হাত তুলবে—আমিই খুন করে কেলবো তেমাঝে।

সমীর গর্জন করছে রাগে। বাত্মা থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে সেই কোণের ঘরে তৈলে চুকিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে ধের সমীর।

অন্যায় আক্রোশে খুন হাম করে বগোয় লাখি মাঝে বসন্ত।

—লেপেছে মা ?

মালা সামলে নিচ্ছে তৎক্ষণ। শাক্তির ঝাংসটা বস্ত্র ভিজে গেছে। আত্মনাক করছে বসন্ত ঘরের তিতর—আতঙ্কিত কঠে। তাকে খুন করে কেলবে ওরা সব। খুন করে নিশ্চিন্ত হয়ে মনের সাধ মেটাবে মালা—বুলাব সমীর সকলেই।

—ছেড়ে যে। ছেড়ে যে আমাকে। খুন করিস না!

—ওকে ছেড়ে যে সমীর! মালা অল্পনয় করে।

সমীর মাথের বাঁটা ব্যাঙের করতে করতে বলে—
না। থেক ভইখানে।

বুলাও বাড়ীতে ঢুক ধমকে ধাঁড়াল। ঘানসার
গণদের কাছে ধাঁড়িয়ে প্রায়োন্মাদ বসন্ত টেঙাচ্ছে—
ছেড়ে ত। ওরা খুন করে ফেলবে আমাকে।

বাড়ী সমস্ত শান্তি সৌন্দর্য্য ওর বীহৎস বঠের
চীৎকারে খানখান হয়ে গেছে। পনের বছর আগতাব
হিন্তুলো ফিরে আসে। সেদিন মালা ছিল একা—
অপহৃত। আজ সমীরই মরিয়া হয়ে উঠেছে।

—চীৎকার করলেই হাসপাতালে পাঠাবো।

ক্রান্ত হয়ে চুপ করছে বসন্ত। মালা কাঁদছে নীরবে।
সব আশা তার ব্যর্থ হয়ে গেল। বসন্ত চিরকালই অক্লু
থেকে গেল তেমননি। মনের অন্তরে যে কাঁট বাদ্য বেঁধেছে
সে কোনদিনই নিষ্কৃতি বেবেনা থাকে।

ছত্র হয়ে বলে আছে বসন্ত—পনের বছর আগেকার
দিনগুলো একটুকুও বদলায় নি। তাকে সবিধে দিতে চায়
এ বাড়ীর সকলেই—বসন্ত আজ সকলেরই পথের কাঁটা।
সেদিন বিপিনবাবু একা বাধা হয়েছিল—আজ মালা,
সমীর বুলা তিন জনই ধাঁড়িয়েছে তার সামনে। আবছা
অন্ধকারে শিউবে ওঠে ধস্ ধস্ শব্দে।

আতকে চাখ কপালে উঠেছে তার—সকচকে দারালো
ছোটাটার পড়েছে একশিলিক আলো—হিংসার মেতে
উঠেছে সে। সমীরের মুখখানা ঠিক চেনা যায় না—এগিরে
আসছে তার বিকে। একটা অসুট আঁর্দনাহ—কপালে
হুটেছে বিস্ম বিস্ম বায়। বত্যা।

ঘানসার কাছে ছুটে আসে।

—বরজাটা খুলে যে একবার। কিছু করবোনা আমি।
কান্নামেশানো সুর, ননিভা বরজাটা খুলে দিতেই এক

মিনিট থমকে ধাঁড়িয়ে চাবিহিকে সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে
এগিরে চলল বরজাব বিকে।

—বাবা।

—চুপ! ওরা এসে পড়বে। আনিমনা—খুন করে
দেবে ওরা জানতে পারলে।

চোখমুখে ওর শুষ্ক আতঙ্কিত চাহনি—আবছা
অন্ধকারেই বজা; পাথ হয়ে মিশিয়ে গেল কোনবিকে—
কাউকে ডাকবার আগেই।

পরাধিনই হাসপাতাল থেকে লোক আসে বসন্ত সেনের
সন্ধানে। ভুল করে এক বসন্ত সেনকে ছাড়তে হাসপাতাল
থেকে অস্ত্র পেসেন্টকে ছাড়া হয়ে গেছে। সেই বসন্তগাবুর
সন্ধানে তারা বাড়ী অবধি এসেছে।

চমকে ওঠে মালা—ভিনি তো কাল রাত থেকে
কোথার চলে গেলেন আর কেহন নি।

—সিক। পেসেন্টকে এভাবে ছেড়ে যেন আগনারা।
বিপিনবাবুও বরজা পেয়ে এসেছেন এবাড়ী। হাসপাতাল
কর্তৃপক্ষের অসাবধানতার ক্ষেপে উঠেছেন বিপিনবাবু।

একটা বিদ্যুতের ঝলকের মত এগে আবার কোন
শব্দে মিলিয়ে গেছে বসন্ত—মালায় সারা মনে এসেছে
গেহনার নিবিড় ছায়া। অসহায় মানসিক পল্ল লোকটার
মস্ত। জীবনে সব থেকেও কিছুই তার নেই।

একটি অপরাহ্ন বেলা—আবছা আলো আঁধারিতে ভরে
উঠেছে বরজানা। বাতাসে রক্তমীপঙ্ক্য বহুলের রান
দৌরভ। ব্যর্থ জীবনের মধুগন্ধতরা স্ববিকা—অসীম ব্যক্তি,
বিদ্যর অন্ধকারে তির্যনই অধরা হয়ে গেল।

বুলাব বিয়ে হয়ে গেছে—বুলাব বুলা স্ত্রী হোক।

কে মনে বসন্ত এখন কোথায়। সে এক তির্যগাপর
স্মৃতি—হিনরাত মনের আকাশের আলোময়ী তারার মত
চেরে আছে আঁধার রক্ততরা অন্ধরসতার বিকে।



একটি সন্ধ্যা

রঞ্জিত কুমার সেন

দেখিন সন্ধ্যার আশাধের স্তরের আভা ভেঙে যাবার পর পাড়ার কীটিকলেবর যোফান থেকে কাঠের রাসে করে চা এলো। গত কয়েক মাসের প্রচণ্ড গরমের পর মনে তখন আকস্মিক একধরো মেঘে আকাশ কাপো করে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছিল। কাকের বড় একটা বেরোয়ার তাগিদ ছিল না। তাদের আভা ভেঙে তাই নতুন করে চারের আভা বসলো। আকাশে বিদ্যুৎ-ঝলক। মনেও তখন ঝলক কাকের কম নয়। গানের আসর হলে হারমোনিয়মের হীডে বর্ষাঝোনা শুরু হতে পারতো, কিন্তু এ আগবের সুহটা একেবারেই অন্তরকম। আইন করে এদেশ থেকে পতিতাবৃত্তি তুলে বেগুয়া হচ্ছে, এতবড় সংস্কারটা কাকের কাছেই চাপা ছিল না। তবু চারের রাসে চুক্কি দিয়ে সেই কথাতাকেই নতুন করে তুলে বসলো কালীচরণ; হরিব্রজের মুখের হিকে তাকিয়ে বসলো, 'এতকাল তত্ত্বেরে মেরেগুলো অন্ততঃ ঢকা পাঞ্জিল, এবারে তাও বেতে বসলো।' রাতারাতি এদেশের পতিতাদের ব্রহ্মচারিণী করে তুলে আইনের কপালে যে কি বাহবা ছুঁবে, তা আইনকর্তারাই জানেন। কিন্তু তুমি ঘেঁষে নিও হরিব্রজ, এ আইন এদেশে কেইল কবে।'

যাতের রাসটাকে করণের উপর নামিয়ে রেখে হরিব্রজ বসলো, 'তুমি একটা আন্ত ইন্ডিয়াট।' চীনে যদি কৃতকার্য হতে পারলো, জাপান যদি এগেতে পারলো, তবে আমাধের দেশেই বা না হবে কেন! যাবা একদিন সোনার লগোরে সোনার প্রাতিমার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারতো, পলাল-ব্যবহার চাপে পড়ে শিকড়ের ছড়িপা নিয়ে তাদের এনে একদিন আসর নিতে হলো এই ঘৃণ্য জীবনে। এ জীবন থেকে মুক্তি পেলে তারা সত্যিকারের নারীধের পোঁরব নিয়ে সমাধে মাথা উঁচু করে বাঙতে পারবে।'

বিষয়টা হসালো লক্ষ্য নেই, বসে তাই যোগান দিতে কাকের ঘেঁষা হলো না। সুখদর বসলো, 'তবু তাই নয়।

এদেশের বহু মৎকাধের পিছনে বহু পতিতার অপরিণীম হান রয়েছে। ঘৃণ্য জীবন দাপন করেও তাদের নারীধ কখনও তাদের জীবিকার পায়ে মাথা নোদার মি। তাদের কেউ না বাবধু কেউ না অহিমেন্দ্রী, কেউবা বাইজী। সমাজের স্বাভাবিক নারী-জীবনের স্বাধ পেলে এদেশের ভবিষ্যৎ-ইতিহাসে তাদের মর্যাদার স্বাক্ষর থেকে যাবে। আমাধের ভবিষ্যৎ-সনার তাদের হতে অপেক্ষা করে আছে।'

কালীচরণ যে কোন্ কুঞ্জে কথাতার অবতারণা করেছিল, এবারে হঠাৎ তা হাড়ে হাড়ে বুঝলো। স্বপ্নে লোক না পেয়ে এগারের ফেরন একটা নির্ভরতার দৃষ্টিতে আধার মুখের হিকে সে চোখে দুটিকে তুলে বসলো। অর্থাৎ আমি যদি তাকে অনুমোদন করে তো তাকিক আপোদ্যোতা মোটামুটি কিপটি-কিপটিতে বাঁড়ায়। অন্যের অর্গাস্টিক টেম্পারামেন্টটা তার জানা ছিল, বসলো, 'কি বসো প্রামল, পতিতারা অনেক নির্বাতন সহ্য করেছে, তাতে সন্দেহ কি, কিন্তু তা নিয়ে তো কথা নয়! এদেশে এখনও যখন উষ্ম পমস্তার সমাধান হলো না, তখন কি কবে যে গন্তর্ঘ্যেট নতুন করে কেউটে গর্তে হাত বিতে সাহস পেদো, সেইটেই বিশ্বয়ের।' ফলে পতিতারাও মরবে, জাতও ডুবে।'

বসলাম, 'এ জাতের ভুববার আর বাকী আছে কি! পতিতারা এতদিন নিজেদের পুড়িয়ে পুড়িয়ে এদেশে পাণ-হৃত্তিকে শাস্ত রেখেছে। আজ সে কাজ পূর্ণায় আড়ালে সমাজের অনেক দূর অবধি ছড়িয়ে পড়েছে। দেশও ফেরন ক্রমেই ইম্রাকি-সমাজভুক্ত হয়ে পড়ছে, এদেশের জাতীয় চেজিতও তেমনি সেই সমাজের ভাবনামা বন্ধা করে চলছে। সুতরাং পাণ যখন এদেশের আটপেট্টে, তখন এবারে বা হয় একটা কিছু হোক, তা নিয়ে ভাববাব কিছু নেই।'

কালীচরণকে আশ্বস্ত করতে চাইলে কি হবে, তাববার

হবে না। রাত্তা স্ক্রিয়ারেব সাইরেন বেজে উঠলে আমি একাই চলে যেতে পারবো। এবকম সাইরেন তো প্রায় বোজাই বাজছে।’

বল্‌লাম, ‘কিন্তু বোজাই তো আর বোমা পড়ছে না। আককের ঘটনাটা যেমন ঐতিহাসিক, তেমনি মর্যাদাপূর্ণ।’

উত্তরে এবারে একটা কথাও না বলে মনে মনে কি যেন ভাবতে লাগলো সুরূপা। তার নামটা নিয়ে আমিও যে কিছু একটা না ভাবছিলাম, এমন নয়। কিন্তু সুরূপার মতো আমার সেই ভাবনাবও কোনো অস্তিত্ব নেই।

একটুকাল চুপ করে থেকে কেমন একটা তাম্বিলার মত টেনে সুরূপাই নিজে থেকে বললো, ‘বোমা কাটুগার শুধু আগর্যাকই হলো নাত্র, ঐতিহাসিক আর হ’তে পারলো কোথায়?’

জিজ্ঞাস ক’রলাম : ‘কেমন নয়?’

কঠোরের উপর এবারে কেমন একটা কোঁচ দিয়ে সুরূপা বললো, ‘ঐতিহাসিক নয় এই কারণে যে, বোমাব আঘাতে কলকাতার একটা বিশেষ অকলেট ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকলেও আমার মতো এদেশের হাজার হাজার ছাখিনী প্যাপ্পী জীবনকে সেই বোমা এক নিমিষে নিঃশেষ ক’রে দিয়ে যেতে পারলো না।’

‘বললাম, বাংলা দেশের বেয়ে ব’লেই যোগ্যকর এন্‌মি ক’রে ব’লতে পারলেন, অত্‌ কোনো দেশের কোনো দেশেই নিজে এক ছোট মনে ক’রে যেহেতু প্রাণ বিতে চায় না। জীবন তো; মৃত্যুর প্রতীকার ব’লে নেই, নানা কালের মধ্য দিয়ে জীবন যে ক্রমেই গতি পেয়ে পেয়ে জন্ম হ’য়ে ওঠে। বাংলাদেশের মেয়েরা এটুকু ভাবে না কেন?’

কথাটার যথাযথ উত্তর না দিয়ে সুরূপা জিজ্ঞাস ক’রলো, ‘আপনি বিয়ে ক’রেছেন?’

প্রশ্নটা শুনে হঠাৎ কিছুটা হকচকিয়ে গেলাম। এ প্রশ্ন এলো কি ক’রে? বল্‌লাম, ‘না, পাশ ক’রে বেঁচেয়ে কেবল চাকরীতে লুকেছি। বিয়ের কথাটা এখনও মাথার আসেনি।’

একটুকুও বিধা ক’রলো না সুরূপা, বললো, ‘তাই মনেটা এখনও কাঁচা আছে।’

—‘মানে?’

—‘মানে—যে-হন বিয়ে সঙ্গারকে সমাজকে বেধলে অভিজ্ঞতা হয়, এখনও আপনার সো-মন তৈরী হয়নি। তাই মেয়েদের জীবন সম্পর্ক এমন ক’রে ব’লতে পারছেন।’

কথাটা বলে এবারে আমাকে চিন্তিত ক’রে তুললো সুরূপা। শুনেছিলাম—গিয়ে না করা অবধি সঙ্গার-অভিজ্ঞতা বাড়ে না, কিন্তু এমন একটা দুঃসংসারভেদে মুহূর্তে একটা মারীর মূখ থেকে সেই অভিজ্ঞতার কথা শুন্তে হবে, ভাবতে পারিনি। বল্‌লাম, কিন্তু জীবন যে মৃত্যু চায় না, জীবন যে বাঁচতে চায়, একথা তো মানবেন?’

এবারও কথা কাটলো সুরূপা, বললো, ‘জীবন বাঁচতে চায় ঠিকই, কিন্তু কোন্‌ জীবন বাঁচতে চায়? যে জীবনে আশা আছে, আনন্দ আছে, সম্মান আছে, সেই জীবন, না—যে জীবন দুঃখ, লাঞ্ছিত, পণ্য, গণিত, অত্‌,—সেই জীবন?’

কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিতে পারলুম না, একটুকাল চুপ ক’রে থেকে বল্‌লাম, ‘আবার তো নিজেকে সেই পাকের মধ্যেই এনে ফেলছেন?’

উত্তরে কি একটা মলুতে ঘাঙিল সুরূপা, কিন্তু ব’লতে পারলো না, সেই মুহূর্তে সারা মহানগরীকে শচকিত ক’রে আবার তীব্র নিনাদে সাইরেন বেজে উঠলো। একটানা কর্‌ব এল’বিত মূহ; বিপদসংক্রিত সমস্ত-জাতি।

একটা ধীরঃপণ ত্যাগ ক’রে বল্‌লাম, ‘বাক্সাম এতক্ষণে বাঁচা গেল। আপাতত্‌ আর ভয় নেই। চলুন, এবারে বেরোই, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে সুরী লেন ক্রশ ক’রে আমি সটকাট পথে চলে যাবো।’

এবারও বাধা দিয়ে সুরূপা বললো, ‘না, না, আমাকে আপনাদের পৌঁছে দিতে হবে না। এটুকু পথ আমি অনায়াসে একা চলে যেতে পারবো।’

বল্‌লাম, ‘সে পথার বাগান্দরী আছে, কিন্তু কুতিখ নেই। হাঁটু দু’টোর এখনও ভাব পাচ্ছেন বলে তো মনে হয় না। শেষে একা পথ চলতে গিয়ে হুদ্রি খেয়ে পড়ে গিয়ে এ-আব’গর সেন্টারে গিয়ে আত্মর নিদ্রা

কি। তার চাইতে চলুন, আপনার ডেয়ার পৌঁছে দিই।'

এগবে আর আপত্তি করলো না সুত্রপা, কিন্তু বেবোতে গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে আবার গিয়ে দরজার আড়ালে আশ্রয় নিল সে। সামনের পথ দিয়ে তখন একদল মার্কিন সৈন্য বর্জ ক'রে গেল। তাদের বুটের শব্দ মনে হ'লো—গেটা ব্যাটা। এক মুহূর্তে মচকিত হ'য়ে উঠলো।

ভিতরের বিকে মুখ বাড়িয়ে সুত্রপাকে জিজ্ঞেস ক'রলো, 'নামতে গিয়ে হঠাৎ আবার পিছিয়ে গেলেন নে?'

সুত্রপা ব'ললো, 'পথ দিয়ে এই মাত্র পারা মার্জ ক'রে গেল, দেখলেন না?'

—'বখলাম বৈ কি, ওরা তো আমাদের পক্ষে সৈন্য, ওদের দেখে আবার ভয় কি?'

—'ভয় আবার নেই? কাঁপা কাঁপা গলার সুত্রপা বললো, 'ও কক, সেই তো ভকক। ওরা আমাদের শেষ ক'রে দিয়ে তবে যাবে। কাল ভয়ের একজন মাতাল অবস্থায় গিয়ে ঢুকেছিল—' বস্তুতে গিয়ে হঠাৎ যেন গেল সুত্রপা।

জিজ্ঞেস ক'রলো, 'কোবার ঢুকছিল?'

ব'লতে না চাইবার মতো কঠে সুত্রপা বললো, 'ঢুকছিল আমার পানের বাড়িতে।'

—'তারপর?'

—'তারপর যে ইতিহাস ঘটবার তাই ঘটলো। পানের ঘরের অহুয়ার কাল থেকে শুধু হেমাংক হচ্ছে।'

জিজ্ঞেস ক'রলো, 'ধানার গিয়ে কেউ ডায়েরী ক'রারনি?'

—'ডায়েত কি কিছু লাভ হ'তো? ধানও যে ওদের। ব'লে একটা হীর্বাংস ফেললো সুত্রপা।

এ রকম ঘটনা যে কিছু কিছু না জানতাম, এমন নয়; এই নিয়ে সুত্রপাকে তাই আর মিছেমিছি বাটোলায় না। একটুকাল খেয়ে ব'ললাম, 'ওদের বুটের শব্দ এখন আর শোনা যাচ্ছে না, চলুন এবারে পথে নামি।'

কোনো রকম বিধা না ক'রে এবারে সোজা পথে নেমে এলো সুত্রপা। তাকে পৌঁছে বেগুয়া সম্পর্কে আরও যে দু'একবার সে আপত্তি না তুললো, এমন নয়; কিন্তু, সে আপত্তি কানে তুলবার মতো নয়। এমন একটা বিপদের

মুহূর্তে একটি ভারতী নারীকে একা একা ছেড়ে দিতে সংসারে বাধ্যছিল। তাই কথার কথার এক সময় তার শাখারোটোলা ট্রাটের আঁতনার নিঃশব্দে গিয়ে পা রাখলাম।

মধ্যাহ্নে সূর্য্যোপাসে সারা মহানগরী তখন থা থা ক'রছে। তার সঙ্গে শীতের একটা প্রবল আবেগ না থাকলে এ সময় পথে বেবেনো অসম্ভব হতো।

সুত্রপা ব'ললো, 'এটাই যখন কঠে ক'রে এলেন, দু'বুট আমার ঘরে ব'লে এক কাপ চা খেয়ে তবে যান।'

ব'ললাম, 'এই নাকি চা খাওয়ার সময়? ব'স্তুতে গিয়ে থা থিকের একটা ঘর থেকে কেমন একটা চাপা গোষ্ঠানীর শব্দ কানে তেলে এলো। জিজ্ঞেস ক'লো, 'কোনো রোগী আছে বোধ করি বাড়িতে?'

সুত্রপার কঠে এখরে কিছুটা গভীর ব'লে মনে হলো, ব'ললো, 'রোগী বৈ কি, ওইটেই অহুয়ার ঘর।'

পথে আসতে আসতে অহুয়ার কবচা তুলে নিয়েছিলো, এবারে বর্কর্ষে তার গোষ্ঠানীর শব্দ শুনতে পেরে মনটা যেন হঠাৎ কেন্দ্র হ'য়ে গেল।

বাড়িটার ডানদিক থেকে সুত্রপার নিজের ঘর। সেই বিকে ইঙ্গিত করে সে আর একবার আমাকে আসান জানাতে যেতেই কাছাকাছি কোথা থেকে যেন দু'তিনটি মেয়েলি কঠে হঠাৎ বসু বসু করে উঠলো: 'রাতিং ছেড়ে সুত্রপা দেখছি ভয় দুপুরেই বাবু ঘ'রতে হুজ ক'বেছে! কপাল ভালো সুত্রপার, মাপানো বোমা দেখছি সুত্রপার কপাল খুলে বিয়েছে।'

হরতো শুভক্ষণে সুত্রপার ঘরে গিয়ে আদি ব'লে পড়তাম, কথা শুনে পা দুটো আর চ'লতে চাইলো না।

সুত্রপা আর একবার আগ্রহের কঠে ব'ললো, 'আহুন।'

কিন্তু আহুন ব'লেই তো আর যাওয়া যায় না। জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'এইমাত্র ঘরের কঠে শোনা গেল, ওরা কারা?'

—'ওরাও আমার মতই বংগোড়া আর কপালপোড়া, ব'লতে গিয়ে কেমন একটা অহুয়ার আভাষ মুটে উঠলো

সুহৃদ্যব কণ্ঠে : 'ওহের কথাই যেন আপনি কিছু মনে ক'রবেন না ! ওহাও এই ঘোষণাই মেরে।'

এ ঘোষণাই হোক আর বিঘোষণাই হোক, তা নিয়ে তখন আর অমার এতটুকুও প্রশ্ন নেই। আরহ পরিবেশটাকে মিসিয়ে কেমন যেন একটা দ্ব্যস্তত সংক্ষেপে সমস্তটা মনে আমার হঠাৎ ভরে গেল। দ্ব্যস্ততাক্ত এর আগে যদিও এপথ দিয়ে খুব করিনি, তবু এবারে বুঝে নিতে অসুবিধে হ'লো না—এটা কাহা ! কলকাতার বৃহত্তর সমাজে এটা নানাস্বপ্নে নানা নামে ছড়িয়ে আছে হাংকোটার, হাম্বাগানের, সোনাগাছিতে, বাগবাগার আর জামবাগারে, বিধিরপুত্রে আর এখানে। সুহৃদ্যকে পৌঁছে দিতে এনে যেন একটা নতুন বীণ আবিষ্কার ক'রলাম। এ বীণ রূপের বীণ, বেহেরে রুগারে যাব মাথা ঝুঁড় মরা ভিন্ন পথ নেই। অবশ্য এ পথ দূর-বিদূত পথ নয় ; একটা বীণের মধ্যেই এ পথ আছে, বীণের বাইরে যে পথ—সেখানে এক বীণের মানুষকেই অস্বাভাবিক গতি নেই,—তা নামভাবে স্বজিত, বিপর্যস্ত। তাবতে দিয়ে মনটা হঠাৎ যেন কেমন বিস্তারিত গেল।

একটুকাল যেন পুনরাবৃত্ত সুহৃদ্য বললো, 'ভাবছেন, এ বকম জামলে খুশি করে আপনাকে পৌঁছে দিতে আসতে ন, তাই না প্রাথমিকগুরু ?'

কিছুটা ইতস্ততঃকণ্ঠে বললাম, 'না, না, তা কেন ! আপনাকে পৌঁছে দেওয়া আমি কর্তব্য মনে ক'রেছিলাম।'

সুহৃদ্য বললো, 'এর পরেও আপনি আমাকে আপনি করে বলছেন ! এখানে যারা আসে, তুই আর তুমি ছাড়া কেউ বলে না।'

আরও কি একটা বলতে বাচ্ছিল সুহৃদ্য, বাধা দিয়ে বললাম, 'আমি তো তাবের মতো আশ্বিনী, সুহৃদ্য সমবেশনটা আপনাকে দাঁড়ালে স্বত্তি নেই।'

সুহৃদ্য বললো, 'আমিই কি আপনাকে সেই চোখে দেখছি ? আপন আমার কথার মতো। একটু আসে যখন আমার পরিচিত জামলে চেয়েছিলেন, বলতে পারিনি, বলার মতো খুব ছিল না। কিন্তু এখন আর আমার এতটুকুও লক্ষ্য নেই। কেন এ পথে এলাম, কেন এ পথে

আসতে হলো, আপনাকে খুশি বলতে না পারলে আপনি হয়তো মিথ্যেই আমার উপর একটা বিস্তৃত ধারণা নিয়ে যাবেন। তাতে আশ্বিনীর স্বত্তি নেই, কিন্তু আমি চিরকাল আপনীর কাছে ছোট হয়েই থাকবো।' বলতে গিয়ে বেখলাম চোখ দুটা কেমন একবার ছলছল করে উঠলো সুহৃদ্য।

ব'ললাম, 'বেশ তো, বলুন ; আপনীর সম্বন্ধে সবটুকু কেনেই তবে আমি যাবো।' বলে এবারে এতটুকুও ইতস্ততঃ না ক'রে সুহৃদ্যকে অস্বপ্ন ক'রে তার ঘর গিয়ে ব'সলাম। খাটের উপর পাঠভাঙা কণা চাষর, ছ'পাশে লাশ লাগুর খেব বেওয়া ছুটো তাকিয়া। ব'সতে এতটুকুও ঘুগা হ'লো না, বরং সব কিছুতে রক্তিকর একটা পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করে খুশী হলো।'

সুহৃদ্য কিন্তু বললো না, খাটের একটা কোণ বেঁচে এসে দাঁড়িয়ে ব'লতে সুহৃদ্য ক'রলো : 'সাতগাঁয়ের নাম শুনেছেন তো ? আমি সেই গ্রামের মালাকর বংশের মেরে। এককালে সাতগাঁয়ে বনবী পরিবার হিসেবে আমাদের বংশের খুব নাম ছিল। আখীর-বংশে জন্মলাট ছিল বাড়ি। বাবা ছিলেন গ্রামের জোতদার। বাপ-মার বড় মেয়ে আমি। গ্রামের জুড়েই সেখাপড়া করছিলাম, একদিন ভালো নথর পেয়ে মাইনরও পাশ করলাম ; কিন্তু বাড়ি থেকে আর আমাকে খুলে পাঠালো না। আমি নাকি বিনকর বিন দিলী হ'য়ে উঠি, ক্রক পবে আর মানার না, তাই শাড়ি পরতে সুহৃদ্য ক'রলাম। এমন করেই একদিন কীভাবে পনেরোটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল ! বাবা পাত্র খুঁজছিলেন, এলোও ছ' একজন দেখতে, কিন্তু কাজ হলো না। তাবের টাকা আর শাড়ি-পয়নার ধারী মিটিয়ে গুটা বাবার পক্ষে সম্ভব হলো না। হং তো আমার দেখতেই পাচ্ছেন, গৌর নয়, জামলা। পাত্রপক্ষ সহ্য তাই কেউ একটা বেঁধলো না। ইতিমধ্যে মনিসংক্রান্ত ঘটনা নিয়ে বাবার সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দ্ব্যস্তত জোতদারের মগড়া বাধলো, মগড়া ক্রমে দ্ব্যস্তত রূপ নিল। কিন্তু দ্ব্যস্তত জোতদারের আশল লক্ষ্য যে ঘরির বহলে আমি ছিলাম, একেই ভাবেনি। সেদিন দ্ব্যস্তত হাত ; বর ছেড়ে বাবা লোক-লজের নিয়ে খেদিয়ে

পড়েছে, ইতিবাচ্য আমাদের বাড়ি আক্রমণ ক'রে আমাদের নিয়ে হারাপ মোতদারের লোক উঠাও।'

ব'লো একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রলো সুহৃদা। তার চোখ-মুখেও দিকে তাকিয়ে মনে হ'লো—সেই রাতটার কথা স্বপ্ন ক'রে নিশ্চয় মধ্যে তরে যেন একবার শিউরে উঠলো সে।

জিজ্ঞাস ক'রলাম, 'আপনি তিংকার ক'রে কাউকে ডাকতে পারলেন না?'

বসন্তটা বাতাসিক অসহায় আসতে চেষ্টা করে সুহৃদা ব'ললো: 'ডাকার মত সুযোগ পেলাম না, ততক্ষণে আমার মুখে কাপড় বেঁধে থাকাকালি বন্ধ ক'রে দিয়েছে তারা। অথচ তারা যে কারা, তাও ভালো ক'রে চিনলাম না।'

কৌতুহলে এতক্ষণ নিশ্চয় মধ্যে অধীর হ'য়ে উঠছিলাম, জিজ্ঞাস করলাম, 'তারপর? তারপর তারা কোথায় নিয়ে গেল আপনাকে?'

—কোথায় নিয়ে গেল, কিছু জানিনে; ততক্ষণে আমি জান হাতিয়ে ফেলছি, শুধু মনে আছে—কোর কতে ওরা আমাকে একটা নৌকা নিয়ে তুললো, এই পর্যন্ত।' একটুকাল ধেমে পুনরায় বলতে শুরু করলো সুহৃদা: 'স্বপ্ন তখন কিরে এলো, বেখলাম—আমাদের যে ঘাটে ঘাট থেকে রোধ আমি বলি ত'বে জল নিয়ে ধরে ফিঁড়ি, সেই ঘাটের একপাশে আমি প'ড়ে আছি। উঠে যে মাথা তুলে ব'লবো, এমন শক্তিটুকুও তখন নেই; ঠিক আগের অবস্থার মতো। কোনোরকমে একসময় বাড়ির উঠানে এসে ধাঁড়ালাম, কিন্তু ধরে উঠতে পারলাম না। মা-বাবা কেউ আমাকে ধরে তুলতে সাহস করলো না। গ্রামের সমাজের ডা বাতন। তাতে মা-বাবাকে একঘরে হ'তে হবে। মা চোখের জল ফেললো, বাবা কাঠের মতো স্থির হয়ে ধাঁড়িয়ে রইলেন। হারাপ মোতদারের সঙ্গে তখন অনেকগুলো মামলা নিয়ে মাঝে মাঝে দরবার গিয়ে কোর্ট-কাছাবি করছিল বাবা; কিন্তু আমাকে ধরে তুলবার ব্যাপারে কোনো সুবিধে হলো না। সারা সাত গাঁয়ের লোকের কাছে হিম্মত তখন এতল হ'য়ে উঠেছে। বাবা হ'য়ে বিনকরক আমি আমাদের চৌকীশালে গিয়ে আশ্রয় নিলাম।'

ব'লতে গিয়ে চোখ দুটো আর একবার ছলছল ক'রে উঠলো সুহৃদার। ব'ললো, 'গ্রামে রাশেন নন্দীর বড় মনোহারী লোকান ছিল। সওখণ্যজের ব্যাপারে গ্রাইই সে ক'লকাতায় আসতো। গ্রাম সম্পর্কে আমরা তাকে রাশেন বা ব'লো ডাকতাম। বরষ বছর খ্রিষ্ট বজ্রি হবে। গ্রাইই আমাদের বাড়িতে আসতো, মাকে মাদিমা ব'লো ডাকতো। বিয়ে যা করেনি। মাঝে মাঝে নিজের লোকান থেকে আমাদের এটা-ওটা এনে দিত, কখনও চুলের দিতে, কখনও কাচের চুঁবি, কখনও বা সুগন্ধি দ্রাব্যন আর আলতা। তার উপর আমার যে কিছুটা মোহ না ক'তছিল, এমন নয়। কিন্তু রাশেন বা একটুও তার নিকটকে যুক্ত হিত না। ক'লকাতা থেকে ফিরে সব ঘটনা শুনে আমাদের সে বেধতে এসে মাকে ডেকে ব'ললো: 'পাতের লোকের ভরে মা হ'য়ে মেরেকে ধরি ব'লেই না তুলতে পারবন, তবে দিচ্ আপনাদের। আমি সুহৃদাকে নিয়ে যাচ্ছি, কায়বারী লোক আমি, সাত গাঁয়ের সাত কথার মধ্যে আমি সেই। কলকাতায় আমার ছোট পিসী থাকে, তার কাছে সুহৃদাকে রেখে এলে ওর আর হুঁশ থাকবে না।' মা ব'ললো, 'তবে তাই কবো রাশেন, ওকে নিয়ে আমি আর গাঁয়ে বাস ক'রতে পারছি। কলকাতায় গিয়ে তোমার ছোট পিসীকে ব'লো সুহৃদাকে দরি কাকর হাতে তুলে দিতে পারো, তবে আ'দ নিশ্চিত হই।'

টস্ টস্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ছিল সুহৃদার হ'চখে বেয়ে, কিন্তু দেখিকে লক্ষ্য ছিল না তার। একই ভাবে সে বলে চ'ললো: 'চিরকালের মতই নিশ্চিত হ'লো না। রাশেন বা আমাকে নিয়ে কলকাতায় এলো। তাকে পেলে আমি সুখী হ'তাম; লক্ষ্য ফেলে যুব মুটে একবার ব'লসামও সে কথা, কিন্তু নিকটকে হরা ছিলনা রাশেনবা, ব'ললো, 'আপাতত পিসীর কাছে তো থাকো, দেখবো পরে।—কিন্তু রাশেন বাও আর দেখলো না, আমিও বাতায় নাম লেখালাম। তার ছোট পিসী শুভদ্রী পানের ব্যবসা করতো; বাবা বাবু ছিল তার। এখানে শুভদ্রীকে ফেলে আমার দিকে তার নব্বয় গেল। জানি—শুভদ্রীর পানের ব্যবসারটা তাতে আরও বেশী ফেঁপে উঠলো কিনা, কিন্তু সজ্ঞানে আমার এতদিন নিজের ব'লতে যেটুকু ছিল,

এবার সেটুকুও পেল। পাবলাম না নিজে এক আড়াল করে রাখতে। সাত গাঁয়ে ছিল গ্রামের সমাজ, এখানে সমাজহীন শুভচরী। প্রথম প্রথম দু'একবার এসে বাৎসরিক দেখা করেছিল, তারপর তারও আর দেখা মিলে না। কারবারী মানুষ, চরিত্র। ব্যবসায়ী সে ভালো বুঝেছিল, কারুর মন বোঝেনি। কলে আমাকে আমার নিজেকে বুঝতে এতখানি পথ আসতে হ'লো। তাইলাম—যখন মান, ইচ্ছা, সত্য সবই জোরালো, তখন বাপ-মা আর আত্মীয়-স্বজনই বা কেন! একদিন সেরেজ শ্রাবণী-টোলার এই ঘরে উঠে এলাম। দেখলাম—জ্বালা ২৫ ব'লে একদিন যে পুরুষ জাতটা আমাকে খ্রীর আসন দিতে সজ্জিত ছিল, এখানে এসে তারের মুখে আমার প্রশংসা শেষ নেই। বাবা একদিন ঘাঘের টাকা আত্ম-শক্তি-গরমের দ্বারা মেটাতে হিমলিন শেষে উঠেছিল, এখানে এসে জাহেই আত্মীয়েরা সেখে সেখে আমাকে মোটা টাকা আর সোনা দিয়ে মন পেতে চায়। কিন্তু এমন জীবন তো আমি কোনদিন চাইনি প্রভল বাবু। শুভচরের বউ হয়ে আমিও কি আর সুখী হতে পারতাম না? কিন্তু কেন, কেন তা পাবলাম না প্রভলবাবু? সে কি আমার দোষ, আমার অপরাধ?

ব'লে এবার তুকুর কঁধে উঠলো সুরঙ্গা। তাকে যে সাধনা দেবো, এমন তাই ছিল না; এমন কি হঠাৎ যে নিঃশব্দে তার সামনে থেকে উঠে আসবে, তাও পারলুম না।

ঈশ্বর যেমন সুরঙ্গা ব'ললো, 'তাইতো ব'ল্হিলাম, আরকের বোমা-বিস্ফোরণ এই কারণেই ঐতিহাসিক নগর যে, তা ক'লকাতার একটা বিশেষ অঙ্গলের স্বতি করলেও আমার মতো এদেশের হাজার হাজার ছদ্মনি পাপী জীবনকে সেই বোমা এক নিমেষে নিঃশেষ করে দিয়ে যেতে পারলোনা।' ব'লে আঁচল দিয়ে চোখ দু'টো একবার বগড়ে মিল সুরঙ্গা, তারপর পুনরায় ব'ললো, 'পারেন আমার মতো মেয়েদের জন্তে এমন কিছু একটা পড়ে তুলতে, যেখানে নিজেদের মর্যাদা নিয়ে তারা নিজেদের কীদিকা অর্জন করতে পারবে? আমি আপনাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবো, আমার সারা জীবনের সমস্ত

যোগ্যতার নিঃশেষ করে দেবো; পারেন এমন কিছু পড়ে তুলতে প্রভলবাবু?'

মুখ ফুটে ব'লতে পারলুম না যে, পারি। এ পারায় বিপর্যয় আছে। সেই বিপর্যয়ের কথাটা কখনো ক'রেই এবারে আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে বললাম, 'তবে হেঁচি। আবার কোনোদিন দেখা হ'লে বলবো। আর উঠি।' ব'লে সুরঙ্গার ঘর থেকে খেরিয়ে এলাম।

বাতাস অবধি এগিয়ে এসে সুরঙ্গা ব'ললো, 'আমাকে হয়তো অন্তর্ভুক্তি মনে করে মনে মনে ঘৃণা নিয়েই উঠে গেছেন, কেননা, তাই না?'

পথে পা বাড়তে বাড়তে ব'ললাম, 'নিজেকে আপনি যত ছোট ভাবছেন, তত ছোট আপনি নন; আপনায় মধ্যে সর্বকালের মতো তার আপন স্বীকৃতিতে উজ্জল হ'য়ে আছে। তাকে আমার শ্রদ্ধা মনস্তার।'

উত্তরে সুরঙ্গা নতুন করে কিছু একটাও ব'ললো কিনা, শুনবার বৈধ ছিল না, পথে বেয়ে এরিয়াল লকের উদ্দেশ্য এবারে পা দু'খানিকে ক্রান্ত শাখনের দিকে বাড়িয়ে বিলাম। তারপর একে একে স্বতঃস্ফূর্ত হঠাৎ কেটে গেছে, কিন্তু এপথে তেমন কিছু একটা কাজও যেমন ছিল না, তেমনি আদিওনি বড় একটা। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বরং সুরঙ্গার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আরকের এই বর্ষপুষ্পের সজ্জার চারের আড়ায় যেন কালীচরণ বসি তার বক্তব্য সুর না করতো, তবে ভুলেই থাকতাম সুরঙ্গাকে। হঠাৎ এমন ক'রে তাকে কোনক্রমেই মনে পড়তো না। সেদিন সে টাকা দেখেছিল তার মতো হাজার হাজার মেয়েদের জন্তে কোনো সুস্থ প্রতিষ্ঠান পড়ে তুলতে, কিন্তু সে আবেগে আমি সেদিন সাদা বিতে পারিনি। বাবা ছিল। আর রাষ্ট্র থেকে যখন সেই ব্যবস্থা ক্রমেই কার্যকরী হয়ে উঠে, তখন নতুন করে আবার সুরঙ্গার মুখখানি হঠাৎ হুঁচকে যেতে উঠলো। বড় কল্ল, বড় মমতা-মাখা। মনে মনে এই তেবে আশঙ্কিত হলাম যে, পতিভাবুটি উচ্ছেদের জন্তে আর রাষ্ট্র যে পথ বেছে নিয়েছে, তাতে সকলের আগে অন্ততঃ বাংলাঘরের একটি অভাগিনী নারী সাদা বেবে; সে সুরঙ্গা।

বাইয়ের বর্ষ কখন থেকে গিয়ে থাকে ডালে ডালে
 যাওয়ায় মাতামাতি শুরু হয়েছিল, সেদিকে লক্ষ্য ছিল না
 কারুর। কালীচরণ তখনও একইভাবে ব'লে চলেছে :
 'এবার উঠিয়ে দিলেই তো আর বেওয়া গেল না, পবনের
 কাগজ খুলে বেখেঁচ—আইনের বিজ্ঞে এরা কী ভীষণ
 প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব জ্বলেছে! উকিল, মোক্তার আর ডাক্তাররা যদি
 লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করত পাত্রে, তবে এরাই বা
 লাইসেন্স থাকতে তা করতে পারবে না কেন? কেউ
 কেউ এই নিয়ে ইতিমধ্যে কোর্টে মামলা হায়েদ
 করেছে।'

ইচ্ছে ছিল না যে একদুহুঁও আর যদি, ব'ললাম, 'তবে
 আর কি, তেঁদের প্রায়টা ভূমি এখন থেকেই দিয়ে দাও ;
 রাস্তাঘাতি যে দার মতো আবার কায়েদী দকে ব'লে
 পড়ুক।' ব'লে উঠে পড়লাম।

তখন হরিবল্লভ আর সুখময় এখানে হো-হো করে হেসে
 উঠলো, ব'ললো, 'বাইট্‌ ইউ আর। কিন্তু এরাই মধ্যে
 উঠলে নাকি?'

ব'ললাম, 'হ্যাঁ হাই, আর ঘেরী কথা যাচ্ছে না,
 বাড়িতে কাগজ আছে।' ব'লে একদুহুঁও আর কান্ড
 করতে অপেক্ষা না করে দোজা পথে গেরিয়ে পড়লাম।

নতুন
 জীবনের
 নতুন
 দাবী



পূরণ করতে নবজাতকের জননীকে পুষ্টিকর
 টনিকের ওপর নির্ভর করতে হয়।
 সুনির্বাচিত উপাদানে সযত্ন ভাইনো-মল্ট
 সূক্ষ্ম গন্ধ করে, হজমজীর্ণতার সাহায্য করে
 এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিদিয়াে আসে।

ভাইনো-মল্ট

বেঙ্গল ইন্ডিস্ট্রি কোঃ লিঃ

অসীমশ্রুতি

[একাঙ্কিকা]

মন্মথ রায়

[বর্ধীচন্দ্রী ঘনী প্রাক্কণ-বিবরণ। চিত্রাঘী দেবীর
বালীগুরুস্থিত স্মরণে বাগদবন “নাথারনী”। রাজি
প্রায় হুশটা। চিত্রাঘী ঘনী এবং তাঁহার গৃহ-
তত্ত্বাবধায়ক রূপলাল মুখার্জী আলোচনারত।]

রূপলাল। এইবার তব, কর্তার বাৎসরিক শ্রান্তির নিমন্ত্রণ
পত্রের স্বপ্নটো আপনি শুভ্রন না। কালই এটা প্রেমে
ছাপতে হিঃত হবে, জ্যেদ সময় নেই।

চিত্রাঘী। শোনাও বাবা।

রূপলাল। (পাঠ) “বিহিত সন্ধান পুরসের নিবন্ধনমতৎ—
আগামী ১০ই আশ্বিন রবিবার আমার স্বর্গীয় দেবতা
৮নাথারপজ্জ বাল্যাপাণ্ডারের বার্ষিক শ্রান্তি আনন্দের
বালীগুরুস্থিত বাগদবন “নাথারনী”তে অনুষ্ঠিত হইবে।
এতদুপলক্ষে সার্বজনীন গীতাগাঠ এবং সংকীর্ণন হইবে।
অপর্যাপ্ত হইতে বহিঃসংসার-সেবার আয়োজন
ধাকিবে। আপনি সবদ্বয়ে শ্রান্তবাসরে যোগদান
করিলে ব্যক্তি হইবে। নিবেদন ইতি,

ঘনীচন্দ্র

শ্রীমতী চিত্রাঘী ঘনী

চিত্রাঘী। ঠিক আছে বাবা রূপলাল। তব ঐ “ব্যক্তি
হইবে” না লিখে “বক্ত হইবে” লেখ। কর্তা তাই
লিখেন।

রূপলাল। বে অজ্ঞে না। (তথাকথন) আর সব
ঠিকই আছে—কেননা না?

চিত্রাঘী। হ্যাঁ বাবা। মোটামুটি ঠিকই আছে। বাগদা-
বাগদার কর্তৃ-উপগলো আমি সাবিত্রীকে ডেকে করিয়ে
নিছি।

রূপলাল। তাহলে আমিও না বসি।

চিত্রাঘী। না, বাবা, তোমার আর বসতে হবে না।

সাবিত্রী ওসব একাই পারবে। দেখছি তো! খুব
কাজের মেয়ে আমার সাবিত্রী।

রূপলাল। তা বা’ বলেছেন। ঘোষের মধ্যে একটু
‘বাঙাল’।

চিত্রাঘী। তা’ হোক। এই ক’মাসেই কথায় বাঙাল
টানটা গেছে। কালকর্মে আমাঘের সবাইকে খুব
বুশী করেছে। আমার আনন্দ যে একজন চুঃখী-বিঃখা
উঃখকে আশ্রয় হিতে পেয়েছি। তুমি বলেছিলে
বাবা কালকে বিজ্ঞাপন দিয়ে ভালো লোক পাওয়া
যায় না। গেছে তো!

রূপলাল। ‘একটি বৃহৎ সংসারের বক্তব্যগারের তত্ত্বাবধানের
ক্ষেত্রে একজন বিঃখা ব্রাহ্মণ মহিলা চাই’—তুই এইটুকু
বিজ্ঞাপন দিলে সাবিত্রীকে আপনি পেতেন না না। ঐ
বিজ্ঞাপনে ‘কর্মঠা মুক্তচিস্পত্তা বৃকতা বঃখা চাই’ এই
কথাগুলো আমি ফুড়ে দিয়েছিলাম বলেই আপনি
অমন করিবকর্মী মেয়েটি পেয়েছেন, আর তা ছাড়া
‘বেড়ন’ টাকা বেতন এবং নিঃখতাঃর ষাঃখা পঃরার
ব্যবস্থা রয়েছে লেখানে ভালো লোক কেন পাবেন না
না।

চিত্রাঘী। এই কে আছিল—সাবিত্রীকে ডেকে বে।
আজ্ঞা তুমি তব এঃ খাঃ।

রূপলাল। আর তো আমার কোনো কাল-টাঃ নেই না?
মনে করে দেখুন।

চিত্রাঘী। কিছু তো মনে পড়ছে না এখন। তা’ তুমি
আশ্বিন ঘরে আরো তো কিছুক্ষণ থাকছো—যদি
স্বকারণে হয় ডাকবে।

রূপলাল। (হাতধড়ি দেবার) রাত সাড়ে নটা বেলে
গেল। রাত হুশটা পর্যন্ত তো আছিই, তারপরেও
হয়ত আমাকে থাকতে হবে আজ।

[স্বর্ণনা। সান্বিতীয় প্রবেশ। রূপলাল প্রস্থানকালে
তাঁহাকে একবার আড়চোখে দেখিয়া গেল।]

সান্বিতী। আমাকে ডেকেছেন না!

চন্দ্রা। ই্যা মা সান্বিতী, ডেকেছি। আসছে রবিবার
এ বাড়ির সবচেয়ে পবিত্র অস্থানটি হবে।

সান্বিতী। আনি মা। কর্তার বারিক শ্রদ্ধ।

চন্দ্রা। মা মা, এতে সব কথা বলা হলো না। লোক
বলে শ্রদ্ধ, কিন্তু আমি বলি পূজা। মেয়েদের
সব চেয়ে বড় বেবতা সান্বিতী। তার ওপর, আমার
স্বামীর নামও ছিল নারায়ণ।

সান্বিতী। আনি মা।

চন্দ্রা। আমার কাছে সাক্ষ্য নারায়ণই তিনি ছিলেন
না। যেমন ছিল রূপ, তেমনি ছিল গুণ। আমি
আমার সেই নারায়ণ হারিয়ে কি করে যে বেঁচে আছি,
ভবে পাইনা মা। হেলুগলে নেই, সে ছন্দ করিনা
সান্বিতী—

সান্বিতী। কিন্তু আমাদের গুণ হয়। এত বিধ-সম্পত্তি
ভোগ করবে কে মা।

চন্দ্রা। কারা ভোগ করবে তার নির্দেশ অসম কালে
তিনিই দিয়ে গেছেন সান্বিতী। তাঁর সেই কথাগুলো
এখনো কানে বাজছে। [চোখ বুঁজিয়া কণ্ঠকণি
বেন স্তমিতে লাগিলেন]

সান্বিতী। কি বলেছিলেন মা?

চন্দ্রা। (যেন তাঁহার ব্যান জাতি) বললেন, সবই
নারায়ণের ইচ্ছা চন্দ্রা। তুমি যে আজ বিধবা হ'চ্ছ
এও তাঁরই ইচ্ছা, বিধবাই বিধবার দুঃখ বুঝবে।
অনাথ বিধবাদের দুঃখ তুমি দূর করো চন্দ্রা। আর
ছেলে-মেয়ে নেই—এ কোনো দুঃখ নয়। সেসে অনাথ
আত্মবের অভাব নেই—ভারাই তোমার ছেলে মেয়ে।

সান্বিতী। আপনাতর জীবনে কথাটা খুবই সত্য হয়ে
ধাক্কিয়েছে মা।

চন্দ্রা। তা' হয়েছে কিনা জানিনা। তবে এটা ঠিক
আমার এত বড় সংসারের তার নেবার ক্ষেত্রে আমি
কোনো সন্ধ্যা মেয়ে চাইনি—চেয়েছিলাম একটি
বিধবা। তুমি বিধবা বলেই মা, বিধবার দুঃখ এত

বোঝো। বোঝো আমাদের দুঃখ। জীবনে দুঃখ না
পেলে দুঃখের বাধা কেউ বোঝেনা—এ আমি হেঁবেছি।

সান্বিতী। আনাকে আপনি কেন ডেকেছেন মা?

চন্দ্রা। ও, ই্যা। রবিবারের বাড়ি বাড়ির ভদ্রতা
তুমি সেয়ে ফেল মা।

সান্বিতী। কিন্তু তার আগে আপনাতর কাছে আমার কিছু
নিবেদন করবার আছে। আপনি মা ডাকলেও
আমাকে এই ক্ষেত্রেই আসতে হতো আজ।

চন্দ্রা। কি কথা! বলা মা বলা।

সান্বিতী। আমি আপনাতর কাছে বিদায় চাইছি মা।

চন্দ্রা। সে কি! সেকি সান্বিতী!

সান্বিতী। ই্যা মা। এখন থেকে বিদায় বলে বড় বেশী
দুঃখে পড়তে হবে আমি জানি, তবু আমি বিদায় না
চেরে পারছি না।

চন্দ্রা। অশ্চর্য! কি হয়েছে সান্বিতী! আমাকে খুলে
বল মা!

সান্বিতী। সে কথা বলতে মুখে বাধে।

চন্দ্রা। কেউ কি তোমাকে অপমান করেছে সান্বিতী?
না-না, চুপ করে থেকো না, উত্তর দাও না।

সান্বিতী। উত্তর দিলে আপনি মনে বড় আঘাত পাবেন
মা।

চন্দ্রা। কিন্তু তুমি চলে গেলে যে আঘাত আমি পাবো,
কোনো আঘাতই তার চেয়ে বেশী হতে পারে না
সান্বিতী। বল, কে তোমার অপমান করেছে—কি
অপমান?

সান্বিতী। ঐ রূপলাল বাবু—

চন্দ্রা। ও! মোক্ষা আমাকে একটা আভাস দিয়েছিল
বটে একদিন। কথাটা বিশ্বাস করিনি। উটে
মোক্ষাকেই বিরোহিলাম হৃদয়। এখন বুঝি, মোক্ষা
তবে মিথ্যে বলেনি। কে আছিল?—রূপলালকে
ডেকে সে...সান্বিতী স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকে বিধবা।
তার সেই গ্লান, সেই পুণ্যের বাধা সেয়ে যে হৃদয়
লোক, তাকে আমি কখনো ক্ষমা করতে পারি না—
কখনো না। সে হৃদয় এলে বলবে তোমার কথা
মিথ্যা। কিন্তু আমি জানি, মেয়েদের অন্তঃকণের কথা

মেয়ে। যখন নিজমুখে বলে তখন তারের মাথা কাটা
বার—তাই সত্য না হ'লে মেয়েরা কখনো অপমানের
কথা নিজে মুখে বলে না।

[সাবিত্রী চোখে আঁচল দিয়া নীরবে কাঁদিতেন।]
রূপলাল আদিয়া পাড়াইল।]

রূপলাল। আমাকে স্বরণ করেছেন মা।

চিন্ময়ী। তোমাকে আমি বিহার দিছি রূপলাল—আজই
—এখন তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। তোমার
যা পাওনা, আমি হিসেব করে কালই তোমাকে পাঠিয়ে
দেব তোমার বাড়ি।

রূপলাল। আপনি আমার ওপর এমন নিষেধ হচ্ছেন কেন,
আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না না।

চিন্ময়ী। ঐ সাবিত্রীর চোখের জল দেখেও কি তুমি কিছু
বুঝতে পারছেন না রূপলাল?

রূপলাল। বুঝলাম। সাবিত্রী তবে আমার নামে
আপনার কাছে নালিশ করেছে। হয়ত বলেছে, আমি
তাকে অপমান করেছি।

চিন্ময়ী। তুমি সাবিত্রীর আঁচল ধরে টেনেছ—গয়ে যাও
বিশে পেছ—মোকদ্দা নিজে বেবে আমাকে বলেছে।
সেদিন আমি বিশ্বাস করিনি। বলছিলাম, এ কথা
কখনই সত্য নয়, এ সব সইবার মেয়ে সাবিত্রী
নয়—এ যদি এতটুকু সত্য হতো, ঐ সাবিত্রী এসে
নিজের মুখে আমাকে তা বলতো। আজ সে তা
বলেছে।

রূপলাল। হ্যাঁ, আজ বলবারই কথা। আপনি যাকে
মনে করেছেন সতী সাক্ষী সাবিত্রী, আমি তাকে বলি
কুলটা।

চিন্ময়ী। (বেগে চীৎকার করিয়া) রূপলাল, তুমি
সামলে কথা বলবে আমার সামনে।

রূপলাল। কুলটা বলেই তাকে আমি মাকে মাকে শাসন
করতাম। কল হলো তার আজ এই। কিন্তু সত্য
চাপা থাকে না না। সত্যকে চাকবার সাধ্য নেই ঐ
কুলটার।

চিন্ময়ী। (ভাষণ উত্তেজনার) বেহিরে যাও—বেহিরে
যাও এখন এখান থেকে—

রূপলাল। বাড়ি মা, বাড়ি। (পকেট হইতে একখানি
খোলা খাম বাহির করিয়া তারার ভিতর হইতে একটি
চিঠি বাহির করিয়া) আমাকে বেগতেই তর পেরে
আঁচলে বাঁধতে দেখি এই পত্রট, আর সে পত্রটা হচ্ছে
এই :

‘আমছে বৃহস্পতিবার ঠিক বাত সাড়ে বশটার আমি
তোমাকেই বাগানে বিড়কির দ্বারা পাড়িয়ে থাকবো।
তুমি এসো।’ আজ সেই বৃহস্পতিবার। সাড়ে
বশটাও বেগেছে। ঐ বুরুঁওঁর অপেক্ষাতেই আমি
বগেছিলাম আপিসে। আপনার এখানে ইনি আটক
বলে যেতে পারেননি অভিপারে। কিন্তু তাতে ক্ষতি
নেই। (সাবিত্রীকে) আপনার লোকটিকে এখানে ধরে
আনবার মত দায়োমানকে হুকুম দিয়ে তবুই আমি
এখানে এসেছি, সাবিত্রী দেবী। (বাহিরে পদশব্দ
(শুনিয়া) হ্যাঁ, ঐ খোদ হয় তিনি এসেও গেলেন।

[নেপথ্যে, দারোগান।] হজুত, ও আমদি আরা।

রূপলাল। তেজ বেও।

(একটি কুর লোক, ততোধিক একটি কুর শিশু দস্তান
সব কক্ষে আসিয়া পাড়াইল। ভীত, সন্ত্রস্ত তাহারের
মুখ।)

চিন্ময়ী। এটা তোমার সামান্য ব্যাপার রূপলাল।
এ চক্রান্তে আমি ভুলে যা না। (সাবিত্রীকে) এ
লোকটিকে তুমি চেনো সাবিত্রী? (কঠোর কণ্ঠে)
না-না, চুপ করে থাকোনা—উত্তর দাও।

[এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। সাবিত্রী হুঁগাইয়া
কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কুর শিশুটি ‘মা মা’ বলিয়া
সাবিত্রীকে আসিয়া লড়াইয়া ধরিল। সাবিত্রী তাহাকে
হুক চাপিয়া ধরিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।]

চিন্ময়ী। বুঝলাম। ও তোমার ছেলে। কিন্তু ও
লোকটি?

[সাবিত্রী নীরবে কাঁদিতেই লাগিল—কোনো উত্তর
দিতে পারিল না।]

শিশু। (লোকটিকে) বাবা, মা কাঁদছে কেন?

চিন্ময়ী। (বিস্ময়ে) সাবিত্রী! তবে তুমি কি?

সাবিত্রী। না মা, আমি বিধবা নাই। যাতে বিধবা মা
হই কুর বেকার বামীকে দু বেলা দু'মুঠো খেতে

Sulekha WORKS LTD.

মুন্সেখানুগামীদের প্রতি

বন্ধুগণ,

মুন্সেখা কানির বর্তমান অবস্থায় তার পক্ষে
একদিকে বহিষ্কারে ইহার ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষ, অন্যদিকে
বহিষ্কারে আপনাদের প্রেক্ষিতিক অংশগণিত। আজ
কৃতজ্ঞতাটিকে প্রেক্ষা স্বরূপ করি।

কিন্তু কই দুঃখের বিষয়, মুন্সেখার এই অসুস্থ-
তার মূল্যে নানা কঠিনতা ও অসুস্থতাটি কাজে জান
কানি চালাইতেছে। একই আমায় অসুস্থ ক্রমে ক্রমে
জান-নির্ভরতা গুরুত্ব অবলম্বন করিতেছে।

এদিকে আমার কিছুদিনে ইহা, আর এক প্রকার
অসুস্থতা দেখা দিয়াছে। পূর্বের মুন্সেখার কানি, কখনো
নেইনি। কখন - যখন ইহা যখন মুন্সেখা কানিই।
কিন্তু নানা কারণে দেখিতে পাওয়াই, মুন্সেখা নয়,
অন্য কোন নারীর কানি। অসুস্থ মুন্সেখার সঙ্গে
অসুস্থ আত্মীয়ত্ব। প্রত্যেকবার আর এক অসুস্থতা
পাওয়া!

মুন্সেখানুগামী সকলকেই একমুখে সজ্ঞান করিয়া
দিত চাই। সেই সঙ্গে জানাইতে চাই, যে-সকল
সিদ্ধ দেশের অর্থনৈতিক বর্ধিত্যাদ দৃঢ় করিতে সক্ষম
উদ্যোগকে এই সকল দুর্নীতির হাত ইহাতে রক্ষা
করা দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানসমূহই অব্যাহত কর্তব্য।

আপনাদের

অসীমত্বিনী

মণিলাল সরকার

ডায়েরকাল, ম্যানেজিং এজেন্টস্

মুন্সেখা ওয়ার্কস্ লিমিটেড

মুন্সেখা পার্ক
কলিকাতা ৩২
মহানগর, ২৩৬৬৫

বিষয় তাকে বাহিরে তুলতে পারি,
কোলের এই শিল্পটিকে চিকিৎসা
করে আরো কিছুদিন বাতে ধরে
রাখতে পারি তাই—তাই আমার
এই নির্বির নিঃস্বপ্ন হচ্ছে ফেলে
বিশ্বাস-সাথে আপনাদের পায়ে এসে
পড়েছিলাম না।

[কথিত নিঃস্বপ্নতা]

চিন্তা। বস নিশাই তুমি বসো,
তোমার সান্নিধ্য নাম মিথ্যা বহুনি
মা! আর থেকে তোমরা পথাই
আমার কাছে থাকে—(জগ-
লালকে) কিন্তু তোমাকে যেতে
হবে জগলাল।

[জগলাল বাবা হেঁট করিল।]

জগলাল। এরপর আমার হাত বাকা
চলে না কানি। যাচ্ছি।
(সান্নিধ্যকে) বড়ই অপরূপ মনে
হচ্ছে তোমার কাছে। আমাকে
পায়েতো কমা করে সান্নিধ্য।

চিন্তা। কমা যখন নিজ থেকেই
চোরে, পাগলুজ হয়েছি তুমি।
য'ও য'ও য'ও—কালজন্মে সেয়ে
ফেল।

[জগলাল বৃষ্টিতে চিন্তা ও সান্নিধ্যকে
তাকাইয়া লেগিয়া চলিয়া গেল]

চিন্তা। কিন্তু সান্নিধ্য, তোমাকে
আমি কমা করতে পারছি না—
যতজন মা নিঃস্বপ্নে নিঃস্বপ্ন পরছ
তুমি—

[সান্নিধ্য হুঁপাইয়া ক'বির উঠিল।
চিন্তাকে প্রণাম করিয়া চলিতে গেল
কুক নিঃস্বপ্ন গেল]

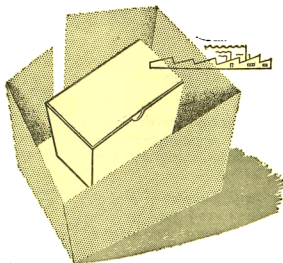
চিন্তা। (সোজাটিকে) তুমি বাপো
বাবা।

লোকটি। আমি সবটা বুঝতে না
পারলেও এটা বুঝছি আপনাদের
দ্বারা শরীর। আপনাদের মা-জননী।
[চিন্তাকে প্রণাম করিতে গেল।]

চিন্তা। আর-থাক-বাক থাক।

[যবনিকা]

factory freshness preserved



with

✱ **POLYBOARD**
✱ **POLYKRAFT**

packaging

Acid, alkali and moisture resistant polythene-coated POLYBOARD and POLYKRAFT help to preserve the factory-freshness of your products, whether they be confectionary, tea, biscuits or chemicals.

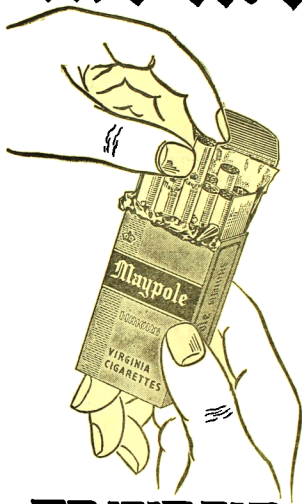
These new, revolutionary packaging materials are several times stronger than ordinary board or paper and prevent damage to your products even when they are subjected to rough handling. And the eye-appeal of your products is enhanced considerably because of the glossy finish on POLYBOARD and POLYKRAFT.



CHANGE TO
✱ **POLYBOARD** ✱ **POLYKRAFT**
PACKAGING FOR INCREASED SALES

ORIENT PAPER MILLS LTD., CALCUTTA.

অতি... স্নোপোল



দ্রব চেয়ে ভাল

ALL

১/০ আনা ১০টি, ১১/০ আনা ৫০টি

MJ/138

দৈব

[নাটক]

সোন কল

নূতন তৈরী গৃহের পশ্চাতে ইট, কাঠ, খয়ের পিপা
প্রকৃতি ছড়ানো আছে। বিমল ও তার ছোট বোন ললিতা
দুই ভিনিষপত্র গুহাচ্ছে। বেলা তখন প্রায় ১টা। বিমলের
মা সুরমা মেপথ থেকে বলছেন—

[সুরমা—বিমল, তুই আন করতে যাবি না!]

ললিতা। হ'ল, ঐ শুনছ মা ডাকছেন।

বিমল। (প্রথম মার ভাবা ছিল) বাচ্ছি না, আর হেঁদী
হেরী নেই। (পরে ছোট বোনকে বলল)—তাড়া-
তাড়ি এটা শেষ করে বাচ্ছি। তুই ভিতরে যা—আর
হোয়ের মধ্যে থাকিন না।

ললিতা। হাঁ, আমি তোমাকে একা রেখে বাচ্ছি কি না।
(হাহাৎ কাতের সাহায্য করছিল—ইট, কাঠ প্রকৃতি
সব জালিয়া ক'রে ছাড়াছিল—সে বলল) না, আমবা
বাচ্ছি—একটু হেরী করে।

বিমল। সত্যি, এই ভারগটার কি করা যাব—ব'লন্ত ?
বেশ অনেকটা ভারগা বের হ'ল।

ললিতা। এখানে একটা ছোট কুলের বাগান করা
করা যাবে হালা।

বিমল। তোকে দিয়ে কিছু হবে না সংসারে। কলকাতা
সহরের জায়গা—ব'লে কিমা কুলের বাগান হবে।
একি তোমের গ্রামের ঐরা পুত্ৰের পাড় পেয়েছিল।

ললিতা। তবে কি হবে ওখানে ? কলকাতায় আর কুল
জন্মায় না, না!

বিমল—ওখানে বেশ দুটা গ্যারেজ (Garage) হ'তে পারে।
এবে তার উপরে কোন বিন যোতালা ও ডেতালার
ছোট ও থানা বর হতে পারবে—এক ঐ গ্যারেজ হতে
নালে প্রায় ৪-৫ টাকা ভাড়া পাওয়া যাবে।

ললিতা। ব্যক্তি হকিণে ছ' আঙ্গুল আমি আছে, তা
বন্ধ করে গ্যারেজ ও তার উপরে যোতালা তেতলা

করবে। কি যে কথা! বাগরে, ঘন বন্ধ হবার যোগাড়
—এই কলকাতা সহরে।

বিমল। (ছোট বোনের বৌদ্ধ-বাক্য শ্রবণে হিকে চেয়ে
লম্বা হেঁলে বলল) তুই কিরে যা, তোরা পত্রপুত্ৰের
জ'লে—সে পান্য-পচা জল ও পাটপচা দুর্গন্ধ ছাওয়া
যেয়ে তোরা ঘন খোলাসা ক'রে নিল। আজ কাল
গ্রামে যার কোন ভ্রাসলোক!

[দুজনের কাণ অবিশ্রাম চলছিল—তাইই কঁকে কঁকে
কথাও চলছিল]

ললিতা। বড় ভ্রাসলোক এসেছে তোমার এই বাগিপক্ষে—
গ্রামে আর ভ্রাসলোক থাকবে কেন!

বিমল। (ললিতাকে উত্কার করার জন্য, আরও মোবের
সঙ্গে বলল) তা' ত' টিকিই গ্রামে ভ্রাসলোক থাকবে
কেন ? দেখানে বিজলী বাতি আছে ? না, হেনের
পায়খানা আছে ? না, ট্রাম আছে ? না, বাগ আছে ?
এখন কি মেয়েদের পড়বার একটা কলেজও নেই—
মেয়েদের একটা স্কুল পর্যন্ত—

[কথা শেষ হবার অবকাশ না গিরেই]

ললিতা। কেব তুমি আমাকে ঐ খোটা দিচ্ছ। বেশ
কলেজে-পড়ার জন্য আমার ভারী ভারী পরজ ছিল।
তুমিই ত' মোর ক'রে আমাকে কলেজে ভর্তি
করালে।

[আবার মার আওয়ালা এ'ল]—না, তোমের নিজে
আর পারছি না। এত বেলায় হোয়ের মধ্যে কি পুত্ৰ
করেছিল তোরা!

[বলতে বলতে তিনি সেখানে এসেছেন।]

বিমল। দেখছ মা, আমার মায়ে লতি কি বনান বিচ্ছে
—ওর কলেজে পড়বার মোটেই ইচ্ছা ছিল না।
আমি নাকি মোর করে ওকে কলেজে ভর্তি করিয়ে

বিরেছি। আজকাল এমন স্রী-স্বামীভার দিনে,
আমার নামে এই অপবাহ; কোন ভয় সম্বন্ধেই সে
আমার স্থান হবে না। কাজ কি, থাক—কাল থেকে
ওকে কলমে বেতে বাতণ করে দিও না।

ললিতা। বাঃ, স্রী-স্বামীভার কি ভক্ত! ওনার ইচ্ছায়
তিনি আমাকে কলমে ভক্তি করাবেন, আমার ওনার
ইচ্ছায় আমার কলমে বাওরা বন্ধ করে দেবেন!
আমার যেন কোন ইচ্ছা, প্রথম না থাকলেও, পরে
হ'তে পারে না। আর আমার একটা বছর এমন
এমনই নষ্ট হবে!

(ভাই বোনের এই কলহের ছলনার' না মুহু মুহু
হাসছিলেন) —তিনি বললেন—এখন তোরা ঝগড়া
রাখ। কাজ বন্ধ করে স্থান করতে যা। আর এই
বোনের মধ্যে কাজ করতে হবে না।

বিমল। চল লতি, যা এখনে পীড়িয়ে থাকতে কি
কাজ করতে যাবেন! অনর্থক মাকে বোঝে দাঁড়
করিয়ে রেখে সাত কি!

[মাতা, পুত্র ও কস্তা একসঙ্গে বেরিয়ে গেল]

(২)

[বিকালে বিমল ঘরে বিছানার ওপরে শুয়ে কি একখানা
বই পড়ছে। ঘরে আসবাহ পড় বিশেষ কিছু নেই।
একটা আলমারি ভরা বই। ছোট একটা টেবিল এবং
চার খানা চেয়ার। বেওয়ালে কয়েকখানা ছবি।
পরিচ্ছন্ন ঘরখানা গৃহস্থানীয় রুটির পরিচর বিচ্ছে।
ললিতা প্রবেশ করল]

বিমল। কি, ঘুম ভাঙল? আগের অঙ্গে তুমি নিশ্চয়ই
কুস্তকর্ষের বোন ছিলি।

ললিতা। হাঁ, তাই বৈকি—ঘুম কেটেছে আমার
কখন। ছুঁবার এলে কিবে গিয়েছি। নাক ডেকে
ছুদাচ্ছিলে। তবে এ অঙ্গের হতো আসের অঙ্গের ও
তোমারই বোন ছিলাম—কাজেই কুস্তকর্ষের বোন
আসের অঙ্গে ছিলাম ঠিকই।

বিমল। বাগবে, আগের অঙ্গেও তুমি আমার বোন ছিলি—
‘অবদ্য’ আমাকে এমনি আলাতন করতিল?

ললিতা। হাঁ, তা ছিলাম বৈকি?

বিমল। কি করে জানিলি?

ললিতা। কেন, এক অঙ্গের পরিচরই কি তুমি আমাকে
এত ভালবাসতে পার! (ললিতার মুখ-চোখ, হাসি
থেকে গভীর চরে উঠল—একটু খেমে আমার বলল)
—আগেও ত কত দাড়া আর বোন দেখেছি, কাস্তর
বোনকে এমন ভালবাসে না।

বিমল। [বিমল একটু হেসে ললিতার চুল ধরে একটু
চান বিরে বলল]—সব বোনই তা মনে করে। তুমি
একটা পাগলী—সব বাহাড়াই বোম্বের এমনি
ভালবাসে।

ললিতা। সবাই? কিছুতেই নয়।

বিমল। ছ'একটা ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

ললিতা। না বাবা, ওতে আমাকে ঠিক দিতে পারবে
না। সত্যি তোমার মতো বাবা আর কোন বোনই
পাবে না। (চোখ তার ছল ছলিয়ে উঠল) সে আজ
১২ বছরের বেশী হ'লে—যেদিন তুমি বাড়ি থেকে
পালিয়ে এলে। আমারে চুপি চুপি বল এলে—
“আমার মস্ত দুঃখ করল না লতি, তোমার সবাইকে
মুখী করার মস্ত আমি দিচ্ছি। বোঝ বোঝ তোমার
যে মস্তাব ভোগ করছিল, তা আমার সহ হয় না।”

বিমল। এত সব তোমার মনে আছে? কতদিন আগের
কথা।

ললিতা। সব মনে আছে বাবা। সেবার সড় তুমি
ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছ। বাবা গাচ্ছিলেন—দেশের
অমায়মি নিয়ে দেশেই তোমাকে রাখতে। তুমি
কিছুতেই মানলে না—পালিয়ে এলে।

বিমল। যেহেতু, বাবার কি অস্ত্রায় দেখ। সে সময় দহি
বের হ'য়ে না পড়তাম, তবে আজ কি অবস্থা হ'তো!
সেই বুনা মস্তলে, মাদার'রদার ভুগে, অর্ধাহারে
অনুভবের হতো দিন কাটাতে হতো। সে সব কমি-
কমা দিয়েও আজ বছবে ছ'মাসের খোরাকও হয়
না। কেহেও ফল নেই, প্রকার কাছে থাকনার
আহারও নেই।

ললিতা। ‘তুমিও’ সব জান না বাবা, কি কষ্ট যে

এমের লোকেরা পাচ্ছে। বাড়ুড়োহর বাড়ি—কত বড় দুর্গাপুজা হ'তো—কত টাকা খরচ হতো। আজ তারা প্রায় খেতে পার না। বস্ত্রের পব বস্ত্রের খেত গেল সব ফেসে—বছরের পর বছর চলল অত্যা; বেশের সব সুখ-সুন্দর, সৌন্দর্য-স্বাস্থ্য অপহরণ করে বেধে গেল কচুরীগানা ও ম্যালেরিয়া—বড় ছোট সবাইই যে অসুস্থ আজ দেখানে সমান। চাবীদের বং বাবার নেই—তল্লাসিকরাত উপবাসী।

বিমল। সে ত' আমি কতকটা দেখেই এসেছি। কিন্তু আনাহের বেশের লোক অঙ্গ ও বোকা—বিপরকে এতটুকু হ'ল থেকেও তারা দেখতে চায় না, পাছে কোন নতুন কাজের চাপ আসে। ১৯৮৭ বছর ব'লে বাড়ি ছেড়ে আসতে কি, আমার খুব অসহন পেয়েছে লতি।

ললিতা। এখানে এসে তুমি কি করলে বাবা?

বিমল। কি আর করব। পঁচিশ ত্রিশ টাকা আমার মজল। কোন আত্মীয় বা পরিচিতের কাছে দাব্য—হয়ত বা হ'বে বেশে পাট্টরে দিবে—না হয় একটা আশ্রয়-বালাই মনে করবে এবং চোখের লজ্জার একটু আঁচু অসুগ্রহ করবে। যুগেতে যুগেতে দিন মজুরী বিদ্যাবে এক বিলাসী কোম্পানীর workshop-এ চুকতে পারলাম। অবসর সময় নিজেই রুচি মতো এবং কাজ দিবার উপযোগী মতো দেখা পড়া করতাম। আজ বার বছর লোহা পিটিয়ে পিটিয়ে চারশো টাকায় উঠেছি। আজ পাব'র নীচে আমি পেয়েছি, লতি। আজ আমি আমার কাজ জানি,—আজ আর apprentice নই। আজ আমার ভবিষ্যৎ আমার হাতে।

ললিতা। (হাতত পর্বে উল্লাসিত হয়ে) বেশি একবছর পর তোমার চিঠির সঙ্গে একশত টাকা গেল—সেদিন বার কাতা ও বাবার আনন্দ ব'লি দেখতে!

বিমল। Workshop-এর কাজ ছাড়া সুযোগ মতো কখনও কখনও কিছু উপার্জন করেছি। ৬ বছর পর একদিন একবছর কথার চঠান কিনে বেশলান—এখানে কয়েক কাঠা জমি—কিছু ঘোড়া ক'তে হ'লো। ২ বৎসর পর কতক বিক্রি করে, তা শোধ বিলান। বখন বাড়ির এই জমি আমার নিজের হ'ল—তখন

আমি নিজেকে অনেকটা হাঠমুক মনে করলাম। শেষের ৬ বছরের মধ্যে মাত্র দুই বার বাড়ি গিয়েছি। বছরে কিছু টাকা তোষের পাঠিয়েছি। তখন তোষের খুব কষ্ট গিয়েছে—নাহে? বাবার উপর খুব ব্যাপ হতো, না? নিজে অধে থেকে তোষের কষ্টেই বেশে বেধেছি। না লতি, তোমার বাবা তত আর্থগর নয়। মাকে আর তোকে কষ্ট দিয়ে নিজে সুখ...

ললিতা। (তাকে বাধা দিয়ে বলল)—তা আর তোমাকে বলতে হবে না। আজ্ঞা কেবল আমার ও মার নামই বললে কেন বাবা? বাবা, নির্দল, অমল—ওষের বুকি কষ্ট হিতে তোমার লগত না—

বিমল। (একটু অপ্রতিভ হয়ে) বা, ছুই মেয়ে।

ললিতা। (তখন সে বাবার হাতের আঙুলগুলি টেনে টেনে কুটিলে বিজিল) এদার ব'ল পড়েছ, বাবা। আমি বলাইকে বলে দেখ। (সে ষিল ষিল ক'রে হেসে উঠল)

বিমল। সত্যিই লতি—তোমার ও মার কথা সবচেয়ে মনে আগত। বাবাকে সমীহ কবি, তার গাভীরকে এড়িয়ে চলি। মনে হয় তিনি এত শক্ত যে তাঁর লজ্জা তাবনা-চিন্তা করলে যেন তাঁকে ছোট করা হয়। আর ও ছুটো—নির্দল ও অমল—ত' মধ্য বানর। মা'র মায়া মাথা মুখখানা, তাঁর স্নেহসিক্ত চোখ দুটি, সব সময় আমাকে শক্তি ও উদ্বীপনা দিয়েছে। আর তোমার কথা? মনে হ'তো করবিন বা আমাধের বাড়ি থাকবি—এ বাড়ি ছেড়ে বাবার আগে যেন এখানকার নীড়ের সুখ-সুখিত নিয়ে যেতে পারি। শুধু দুঃখ-কষ্ট, কেবল অত্যা আর অভিযোগ তোপ করেই এ বাড়ী থেকে ঘাবি তা যেন কিছুতেই লজ্জা করতে পারতাম না।

[হাঘাত হাতের উপর হাতখানা রেখে ললিতা কিছু সময় চুপ করে রইল—হাঘাত সেহের স্পর্শ পেয়ে তার চোখ মজল হ'য়ে উঠল। বিমলও যেন সন্নিহিত ফিরে গেল। সে ললিতাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল]—এই যেথো পাগলীর কাত। আজ আমাকে চা খেতে দিদি না!

[ললিতা তাকাতাড়ি উঠে বেরিয়ে গেল, বিমল তার দিকে তাকিয়ে হইল]

(৩)

[বাহিরের ঘর বিমলের পিতা অধিকাবাবু ও অপর এক বৃদ্ধ প্রতিবেশী ব'লে দ্বাধা খেলছেন ।]

অধিকা। এবার আপনাব মন্ত্রী নামপান, কানাইবাবু।

কানাই। (বিড়ি টানতে টানতে) —তাইত' হুঁফিল হ'লো ত'—আপনাব এই হানটা আগে দেখে পড়িনি।...এই যে পেরে গিয়েছি—এই বার আপনাব নৌকা গেল—আমাবও মন্ত্রী বেঁচে গেল।

[হঠাৎ জলের বধলে তাঁর একমাত্র নৌকা বিগড়ন দিয়ে অধিকাবাবু বেশ একটু বিব্রত হলেন। এমন সময় ললিতা ২ পেছাটা চা নিয়ে এল]

ললিতা। বাবা, তোমাবের চা এনেছি।

অধিকা। বাঁচিয়েছিল মা—গরম চাটা খেয়ে বুড়িটা একটু তাজা করে না নিলে আর চলতেনা। (চা ও বিড়ি চলছে এবং দ্বাধাও চলছে। ক্রমে অধিকাবাবুর অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে)

কানাই। এবার অধিকাবাবু এই দিন কিঁজি।

অধিকা। (বিব্রতের সহিত)—কি যে বলেন, দেখুন না, আপনাব দ্বাধা নিয়ে কোথায় যান। (আবার খেলা চলছে)

কানাই। আর কেন অধিকাবাবু—এবার খেলা বন্ধ করুন। কয়দানের মণ্ডেই মাং হয়ে যাবেন।

অধিকা। কিছুতেই না। খেলুন না। (দ্বাধার খেলা চলছে) কানাই। এবার নিম্ন—মাং। আর আপনাব চাল নেই।

অধিকা। যাক গিরে, আর পাগা যায় না। [খেলা বন্ধ করে অধিকাবাবু উঠে পড়লেন। কানাই আর বেরী না ক'রে বেরিয়ে দ্বাধার মুখে বললেন—]

কানাই। আম্বকার মতো আদি, অধিকাবাবু। খেলার ঘা-ই হ'ক না কেন, আপনাব মতো দ্বাধাভুর সঙ্গে খেলে আনন্দ আছে ;—হেয়েও সুখ, জিতে ত' সুখই। খেলাটা শিখেছিলেন ঘটে।

অধিকা। [একা বসে বিড়ি টানছে—একটু অস্বাভাবিক উচ্চ কণ্ঠে]—এই ললিতা হাত-পাখাটা দিয়ে খেতে

পারিস, মা! কি যে গরম। [ললিতা পাখা হাতে হাসি চাপতে চাপতে ঘরে এসে পিতাকে বাতান দিতে শুরু করল—সুখমা পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকলেন]

ললিতা। কি বাবা, হঠাৎ গরম লাগল ?

অধিকা। লাগবে না, দ্বাধা খেলার দ্বাধা গরম হয়ে যায় যে। আর এই পোড়া কলকাতা! নহবে—কলকাতা বাড়ি আর দ্বাধা—বাতান আমাবার এতটুকুও ঠাক নেই।

সুখমা। তোমাব যে ডাঙ—কোন কিছু বলেই,—এই বাড়ি ও কলকাতা নহেতব যত বোঝ দেখবে। খেলতে গেলে একদিন হার হয়, একদিন জিত হয়—তার অন্ত এত যেজাজ খাওয়া করলে চলবে কেন ?

অধিকা। হা, তোমাব এক কথা ; গরম লাগছে—তার মধ্যে দ্বাধা খেলার হার জিতের কি সম্পর্ক। তারি মনের কথা টের পান ইনি। [পিছনে ললিতা মুখে কাপড় দিয়ে হাসি বদন করছে]

সুখমা। এই ৩০-৩২ বছরেও বরি তোমাব মনের কথা বুঝতে না পারলুম, তবে মিথ্যাই এতদিন সংসার করলাম।

[ললিতা আর হাসি সহরণ করতে না পেরে দিল খিল করে হেসে পাখা রেখে ছুটে পালাল]

অধিকা। যেথছে, ঐ মেয়েটাকে কেমন আঁঠা বানিয়েছে। ওটা হাসছে।

সুখমা। না-না, মেরে আমাব নোটাই জ্যাঠা নয়। কেন মিথ্যা বহমান হেও। কোন কিছু বলেই যে ভূমি কলকাতার এই বাড়ির বোঝ বেও,—ভূমি বোঝ না এতে বিমলের মনে দুঃখ লাগতে পারে। শত্রীরের বক্তা বল করে এই বাড়িখানা কতবেছে। তাই ত' আক দ্বাধা শুদবার স্থান পেয়েছি। এই বাড়িটুকু না থাকলে আর কোথায় পাঁড়াতাম বল যেখি।

অধিকা। তা কি আর জানিনা গিঠী। সবই জানি—বিমল তোমাব অবস্থ ছেলে নয়। আমাব এসব কথায় সে দুঃখ পাবে কেন ? সে জানে কোথায় আমাব লাপে'...খাপ ঠাকুদ্বার ভিটে ছেড়ে, নিমেষের ভেত

ঘানার ছেড়ে, মিঃসেবর বাছড়-নকর ছেড়ে, এখানে পড়ে আছি—সব কিছুই নিজের ভেতনে কিনে দিন চালাতে হয়। মনে পড়ে গিল্লী! পাছে কল-ফলাদি-আম, কাঁঠাল, নারকেল, ভান—কত বেয়েছে; আরও কত বিলিয়েছে। পাড়ার ছেলেগুলো গাছে বা তলা থেকে চুরি করে খেতে আসত; আর আমি তাড়া করতাম। সে বেন একটা খেলা ছিল। একদিন হ'ল বাহরঙালা না আসত, দিনটাই বেন মিছা। খেল মনে হ'তো।...আজ সেও হবে ওজন ক'রে মাছ কিনে বাড়ি—আর আনাধের পুতুরের মাছ কত লোককে দিয়েছি। তবকারী অপাধারে আসত—আসতে না আসতই সব বিলি হ'য়ে যেত। গরুর ছূণ খেয়ে ছাড়তে পারত না। আর এখানে একটু খাটি ছূণ পাওনা। যে হাওয়ায় আলার বাড়িতে টেকা দার হ'ত, সে হাওয়ায় ভক্ত ভক্তটট্টেরে দরি।—দিনল বলছে নামনের বছর তোমার ও আমার ভক্ত বিজলী পাখা করে বেবে। দিনের পর দিন পরমা বিয়ে ভগবানের বাতাস কিনতে হ'বে—এ কি কানের কথা!

সুহবা। জুমি ত' কেবল একটা দিকই দেখছ। সেবের কয় বছর গ্রামে কি ভাংে কাটিয়েছে? চোখের উপর বেখেছ গ্রাম হবে যাক্কে; অন্যদ্বারে অর্থ কষ্ট; রেপে পীড়ার, অজ্ঞানে আত্ম কলহে গ্রাম ম'বে বাড়িল। কোথায় ছিল তোমার সে মত, সে কল, নাছ, ছূণ—সবই যে শুকিয়ে গিয়েছিল।

অধিকা। তাই ত' গিল্লী, কি ছিল, আর কি হয়েছে!

সুহবা। সে দিনকার ঘটনা মনে জাগলে, আজও আমার ভক্ত লাগে। বাঘনা আহার করতে না পেবে, তুমি করলে নানিদ—ভিক্রীকারী করলে। পেয়ালা নিঃসেলে রাখতরের মাল ফ্রোক করতে। কি তাদের ধরে ছিল যে তুমি ফ্রোক করবে! তারা সব উঠল কেনে—হল বেঁধে এসে আনাধের বাড়ি চড়াও করতে। ভরে আনার বুক শুকিয়ে গেল। তাগিস বুড়া ইসমাইল, কানিদ ও বিমাই মতল ছিল; তারা এসে কিষ্ট একাধের সাক্ষে পাঁড়িয়ে বলল—সেবক হারানোর

হল, আজ এসেছ বাবু বাড়ি লুট করতে; এত দিনের এত খাওয়া হাওয়া আহার আহার—সব খেলি তুলে? প্রাণেরা মাথা নীচু করে গেল কিরে।

অধিকা। তবু তারা আমার প্রাণ—তাহেব মল্লক্কেও আকর নয়—সে ত' কত পুরুষের। গিল্লী—আমি বড় জমিহার ছিলাম না; সামান্য তালুকদার ছিলাম; ৭-৮০ বর প্রাণ ছিল। মগাইকে জানতাম, চিনতাম।

সুহবা। চ'লে আসার আগের দিন ইসমাইল কয়েকটি মুলঘান প্রাণ লগে করে আমার কাছে এসে বলল না, তোমার ছেলেদের একদিনের অপরাধ ক্ষমা করলে না,—মতিচাঁ চলে যাচ্ছে? তারা বেঁধে ফেলল। আমি বললাম—ইসমাইল কোন অপরাধই তো তোমাদের শেধিন হয়নি—বরং আমরা যখন বহুদিনের সন্দর্ক তুলে তোমাদের লোটা-বাটি ফ্রোক করতে গেলাম, কিষ্ট হ'য়েও ত' তোমরা সে সন্দর্ক তোল নি। সে গত দিনের কথা মনে করেই তোমরা আমাদের বাঁচালে।...

[ইসমাইল চুপ করে বসে রইল] 'আমি তাকে বললাম এই গ্রাম বিয়ে আজ কারুরই চলছেনা—তোমাদেরও নয়, আনাধেরও নয়, তাই মানটুকু সব খোজাবার আগেই লগে পড়ি। তোমরাও যে ঘর মতো নুতন রাস্তা বেখো—এ পুরানো পথে আর চলবে না।' বরের পুরানো জিনিষপত্র কিছু তাহেব দিলাম—তারা সেলাম করে চ'লে গেল।

[অধিকাবাবু মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ধরেব মধ্যে হাঁটতে লাগলেন। একটু পরে বললেন—]

—গিল্লী বিপ্লব কাকে বলে, জান। [ললিতা এসে পিছনে বাড়িয়েছে]

সুহবা—না।

অধিকা। আমিও জানতাম না। ছোঁকখার যখন বিপ্লব হ'লে লীৎকার করত, তখন বিশ্বাস হ'তোনা, ইতোধের এমন পাকা ভিত্তে কখনও বিপ্লবের নীচ ঢুকতে পারে। আজ বিশ্বাস করছি—কেল বিশ্বাস নয় প্রত্যক্ষ

দেখছি। দৌৰ ভেদে পড়ছে—ওতে আর বাণ করা
চলবে না। এইই নাম বিশ্রু—

সুন্দমা—কি যে তুমি বলছ, বৃষ্টি না।

অধিকা—আজও বুঝবেনা গিন্নী। কেউ বাঁচতে পারবে
কেউ বাঁচতে পারবে না। না বাঁচবে বাঁধা, না বাঁচবে
ঐশা। কেউ না—কেউনা—সবাই বিপ্লবের চেউতে
জুবে থাকে। মনে করছ এমি ছেড়ে পালিয়ে এসে
বৈচেছে—তা বাঁচবে না।

সুন্দমা। কি সব বাঁচবে বকছ!—আমার যে ভয় করছে।

অধিকা। ভয় কি গিন্নী। তার নগরের ব্যয় যশের জ্যেষ্ঠ
ছেলে, আজ হাতুড়ি গিট্টিরে কুলির জব্ব উপার্জন
করছে; আর তাই ভোগ করে আত্মনে আছি। যদি
সবই এমনি নুতন করে সূত্র করত, তবে হয়ত চলত।
এমি আজ আমাদের ভেঙ্গে যাচ্ছে; তার টানে সহরও
ভাঙবে। বাঁধা, বাঁধা সমাজ—সব ভাঙবে।

সুন্দমা। যত সব কুলসুয়ে কথা বলছ—তার সম্ভাব্যেণ্য
এসব কথা বাথ।

[ললিতা চুপ করে পিতার মুখের বিকে তাকিয়ে
ছিল। তার চকলতা লোপ পেয়েছে।]

অধিকা। গিন্নী আজ টাকা চাই। বাড়ির ফেনা এখনও
৫০০ টাকা আছে। শেষের খাজনাপত্র কিছুই
আদায় হয় না—কিন্তু তার হরেক বকম টাক্স ও
সংস্কারী খাজনা এখন থেকে হিতে হয়। ছুদিন বাধে
সরকার বাকি খাজনার দ্বারে সব নিলাম করে দেবে।
সব কিছুই অঙ্কই বিমলের উপর নির্ভর করলে চলবে
কেন! আমায়ও কিছু টাকা উপায় করতে হবে।

সুন্দমা। বাধে কথা রাখ—তুমি এখানে কোথায় টাকা
বোজগার করবে।

অধিকা। কেন, ঘোড়দৌড়ের জুয়া, না হয় বৈব উপায়।

সুন্দমা। সাংখ্যান ঘোড়দৌড়ের নামও তুমি ভুলতে পারবে
না বুধে।

অধিকা। আমায়ও বিশেষ ভরসা হয় না। কলকাতার
যুৎসবের সঙ্গে পারব না। একটা তিক্ততা সাধুর সন্ধান
পেয়েছি—তার ঠাণ্ডে কিছু বৈব উপায় আদায় করব।
টাকা চাই গিন্নী—টাকা চাই—

ললিতা। (আন্তে এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে বলল)
বাণ, আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে না। সন্ধ্যা হয়ে
এল যে।

অধিকা। (হঠাৎ যেন অত্যন্ত কপটে ফিরে এসে)—হী
চল না, জুপেই গিয়েছিল।

[একটা আদা ও একখানা লাট্টি নিয়ে তিনি
মেয়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।]

সুন্দমা। হুর্গা, হুর্গা বেন্দী বেদী করো না—(বান্দী ও কস্তা
এর অধিকারে মিলিয়ে গেল—তিনি চেয়ে হইলেন।
পরে কোড়মাত কপালে ঠুকিয়ে বললেন—না হুর্গা
কোন অমঙ্গল যেন এসেও স্পর্শ না করে। মা কালী,
তোমার মন্দিরে ভাল করে পূজা দিব।

(৪)

[বাবার ঘবে অধিকারী ও বিমল খেতে বসেছেন—
সুন্দমা খাবার দিচ্ছেন]

অধিকা। কাল সেই তিক্ততা সাধুর সঙ্গে সব কথা ঠিক
হয়েছে। তিনি আমাকে এমন একটা বৈব উপায়
বিধিয়ে দেবেন—যাতে আমার সব ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

সুন্দমা। তোমার মাথা এখনও সেই খেয়াল আছে? তুমি
পাগল হলে নাকি?

[বিমল হাসি চেপে বেগে নত মস্তকে ঝাঙ্কিল]

অধিকা। কেন, তুমি কি সব অস্বীকার করতে চাও?
বৈব উপায় বলে কি কিছু নেই?

সুন্দমা। আমি কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করছি না।
আমি কেবল এই বলি যে যদি এতই সহজ হবে, তবে
বহু লোকই বৈব উপায়ে বড়লোক হতো। তুমি
ওগবের মধ্যে যেও না—হঠাৎ বড় লোক হয়ে আমাদের
কাছ নেই। তুমি যদি আমাদের হবে, তবে যা ছিল
তা এখন করে পুড়ে গেল কেন?

বিমল। আচ্ছা, দেখুন না সেই সাধুকে ডেকে। কি সে
বলেন একবার শোনাই দাক না কেন।

সুন্দমা। তুমি আর এতে আত্যাংকি হিঁস না। ও-সব
তাত্ত্বিক সাধুকের আদার ভাল লাগে না। সত্যি সাধু
হলে কেউ এই সব ভোগব্যস্তির ব্যবসায় করতে আগে

না...নাঃ! তুমি যে মানুষ ভাবনার ষাওসাই ছেড়ে
হিলে। সব করটা ভাত খেতে হবে—আর একখানা
মাছ দেই ?

অধিকা। না, আর পারব না। এখন কি আর অপেক্ষ
কি আর বিন আছে! বেশে ধাত্তে এদিক ওদিক
সমস্ত বিন ঘুরে বেড়াইতাম, নানা কাজকর্ম করতাম।
তখন ক্ষুধাও লাগত। এখন সাবাহিন বাকি হবে বলে,
ক্ষুধা লাগবে কি করে ?

[সুবনা তাঁকে আর একখানা মাছ হিলেন কিন্তু তবুও
অধিকা উঠে পড়লেন]

সুবনা। না,—তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।...

বিমল। এখানে যেন বাবার কিছুতেই মন টকছে না।
বুঝেই মনস্তা হয়ে আছেন। একটা অল্পখ বিসপ হয়ে
না পড়ে!

সুবনা। গ্রামের চুখ আর তুলতে পারছেন না। এখানে
কোন সন্ধ্যা নেই, সাবী নেই। কেবল এই জুচকী
কানাইবার আছে—তার সঙ্গে বাবা খেলে—সেদিন
হবে বাবা সেদিন আরও মেজাজ খারাপ হয়। বেশে
গীয়ে প্রচুর জিনিস নাড়া-গাড়া করেছেন, কোন হিসাবও
ছিল না, কোন মাপও ছিল না। আর এখানে সব
হিসাব করে নেপে নিতে ও রিতে হয়। একি তাঁর
ঘাতে পোষায়!

বিমল। সবই বুঝি না, কিন্তু গ্রামে তা তোমাদের ব্যাধ
লভ্য নয়। আর ছুটা বছর কট ক'রে থাক;—তার
মধ্যে বেনাও শোধ হবে, আমার আরও বাড়বে।...
বাবাও ছোট ষাট খেলালে বাগা দিও না। হরত
আরও মনে দুঃখ পাবেন। যেন তাঁর মনে এই ধারণা
না হয় যে—এখানে তিনি পরাধীন।

সুবনা। (একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) তাঁর মতো মানুষকে
তাঁ তুলিয়ে রাখা যায় না।

[বিমলও ষাওয়া শেখ করে উঠে গেল]

(৫)

[বিকালে বিমল তার ঘরে শুয়ে শুয়ে কি একখানা
বই পড়ছে। ললিতা এসে তাইই বিছানার পাশে বসল]

বিমল। কলেজ পালিয়ে এসে ?

ললিতা। খালি কগড়—কলেজ পালান কেন ?

বিমল। তবে এত লকালে যে এসে ?

ললিতা। সকাল আবার কোথায় ! তেওয়ার ত ঘুও বই
হ'লে সময়ের খেলাল থাকে না। ঘান, কটা বাজে ?

বিমল। (খাত্তারের সাথে ভাবনার আন ক'রে)—করটা
আর হবে—একটা বেড়টা হবে।

(ললিতা হেসে উঠল এবং কস্তীতে বাঁধা বড়ি হাথার
চোখের সামনে ধ'রে দেখাল)

ললিতা। বেশ করটা বেছেছে।

বিমল। ও, তাই তো—এবে রটা বেছে গিয়েছে।

ললিতা। বাবা, আমার একটা কথা আছে, তোমার সঙ্গে।

বিমল। তাই নাকি, আমার সঙ্গে একটা কথা। কিন্তু
ইতিমধ্যে যে প্রায় শ'খানেক কথা হয়ে গেল।

ললিতা। না, এসব সাধারণ কথা নয়। একটা বিশেষ
কথা।

বিমল। তবেই ভয়ের কথা।

ললিতা। তুমি বড় বাজে বকে। (বিমল গস্তীরভাবে বই
খুলে পড়তে লাগল)

ললিতা। (চান দিয়ে বইটা সরিয়ে দিয়ে) বা, বেশ তা'
আমি এলাম কথা বলতে, আর ইনি আন্ত করলেন
বই পড়তে।

বিমল। কি আর করব, তুমি বখানাম দিচ্ছ—আমি নাকি
মোলাই বাজে কথা বলি। তাই চুপ করে সেলাম।
তাতেও ঘেঁষি অপরাধ। কি করতে হবে, আদেশ
করুন। আগামী মাসে বেন ধাবার ছোট বোন হ'রে
জন্মাই—ভগবান ! (ললিতা হেসে উঠল)

ললিতা। না, তোমার সঙ্গে পাববার উপায় নেই। এখন
আমার কথা শুনেবে ?

বিমল। (গস্তীরভাবে বদল)—সবাই প্রমত্ত।

ললিতা। আমার একটি বৌদি আনতে চাই। (বিমল
চুপ করেই রইল)

ললিতা। কি কিছু বলছ না যে ?

বিমল। আমার বলবার কি আছে। তোমার সব হয়েছে
—হাটে বাধায়ে কদমাস বেও।

ললিতা। না, এবার আমি চীৎকার করে কাঁপতে শুরু করব। তোমাকে নিয়ে মহা আলাপন।

বিমল। তাই, এই আলাপনের হাত থেকে অব্যাহতি দিবার একটা লোক চাই এবং সবকার মতো স্বপড়াবও একটা লোক চাই। এই ত' ?

ললিতা। না বাবা, আমি হাব মানছি—এবার তুমি গতি্য করে আমার কথাটার অর্থ বুঝেও ত'।

বিমল। (ললিতার গিটে হাত বুলাতে বুলাতে)—তা হয় না। আগে এই স্বপড়াটাকে বাড়ি থেকে বের করে—তবে অন্য কাজ। তার উপর বাড়ির বোনা আছে। হেনাটা শোধ না দিয়ে কি ঝর বাড়িতে আছে ?

ললিতা। না, আমি চলে গেলে বৌদি দিয়ে কি করব। আমি থাকতেই বৌদি চাই। আমার পছন্দমত একটা বেয়ে আছে।

বিমল। বাঃ তবে আর কি। আমার মত, যা যে বৌদি হবে, তার মত—কোনটাইই সবকার নেই—তোব পছন্দ হয়েছে; তবে আর কি ?

ললিতা। (একটু অগ্রসর হয়ে বলল) তা কি আমি বলছি নাকি ! তোমার পছন্দ না বলে তাকে আমি বৌদি করব কেন ! ঠিক তোমার পছন্দ হবে।

বিমল। আমার প্রস্তাবটা আগে শুনে নে ; তেঁকে এক কনের হাতে তুলে দিতে চাই। সেখানে উত্তর পক্ষেই মত হবে বলে আমার বিশ্বাস। বল বৌদি সুকুমারকে তোব কেমন লাগে ?

ললিতা। ব্যাং—(বলেই সে বাবার ঘর ছেড়ে যেখানে বাবার উত্তোলন করল)

বিমল। (পল্লারনগর বোনের হাতখানা ঘঁরে ফেলল—
ললিতার ঘুমে একটা লক্ষ্যের আভা লেগে আছে।
ললিতাকে আঁধার করে পাশে বসিয়ে বলল) পতি, আমার কাছে লক্ষ্য করিস না। আচ্ছ—তোকে আমি ত্যাগে চাই না। সুকুমার ছেলে ভাল। আমি জানি সে তোকে মনে মনে চায়—তোবও মন তার প্রতি বিকল্প নয়। লক্ষ্য করিস না বোন।

ললিতা। (মাথা নীচু করে বলল)—ঠিক জানি না বাবা, নিজের মনের উপর আমার এখনও তেমন আস্থা নেই।

বিমল। না বিনি—তোব চিরজীবনের মন্ত্রী তোঃই পছন্দ মতো হবে; আমার পছন্দ তোব যাড়ে চাপিয়ে দিতে চাই না। আচ্ছই সব পাকা করছি না। তবে সুকুমারকে যদি তোব পছন্দ না হয়, তবে তার মাঝে আঁধার ব্যবহার বহুলাতে হবে। তাকে বাড়িতে এমনি ক'রে ডাকতে ও অভ্যর্থনা করতে পারি না। মিথ্যা আশা তাকে দিতে চাই না—সে আমার বন্ধু।

ললিতা। না, বাবা, তোমার যে এত অন্তরক বন্ধু, তার বাড়ি আসা বন্ধ করবে কেন ? প্রত্যাশাও তার সঙ্গে করতে বলছি না।

বিমল। (তোব মাথার হাত রেখে) জীবনে সুখী হ'স ও সবাইকে সুখী করিস। আমার মের ও শুভেচ্ছা তোমার পর বইল।

[ললিতা বাবাকে প্রণাম করে উঠে গেল]

বিমল। (আবার তাকে ধরে বসাল) পতি, এবার তোব কথার অর্থ বুঝি। নির্দলটা পান করে বের হ'ক, এই হেনাটা শোধ হ'ক—তাবের আমার অন্ত সব তাবনা। তোব দাবা এখনও বুড়ো হয়নি। যা হোক একটা গুটী তার হয়ে যাবে—বংশোদ্দেশ্যে কি মেয়ের অভাব হয় ! বিয়েব অন্ত আরও প্রাণের কোন তাগিদ বোধ করছি না—বাক-তাকে একটা যাড়ে তুলে নেবার অন্ত এত তাড়া কেন ?

ললিতা। আমাঘের ক্লাশের একটি মেয়েও সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছে। সে আজ আমাঘে কাছে আসবে।

বিমল। হেথা দাক, হুয়ন্ত হাকার মতো যদি প্রেমে প'ড়ে গাই—তবে ত' হ'য়েই গেল। নতুবা আরও কিছুদিন ঝাঁকি দেব।

[বাইরে কে যেন ডাকল—বিমলব'হু বাড়ি আসছেন ? —“আসছি” বলে সে বেগিয়ে গেল। ললিতাও বেরিয়ে গেল।]

[কতক্ষণ পরে ফিরে এল, সুকুমারের সঙ্গে]

[আরও কিছুক্ষণ পরে বিমলের ঘরে সে ও সুহৃদ্যাব
বিদ্যনার অংশীদারিত্ব অবস্থার ব'সে গল্প করছে।
আলো-অন্ধকারের একটা পাতলা অজ্ঞান
কক্ষটিকে ছেয়ে রেখেছে]

সুহৃদ্যাব। সত্যদিন তুই এত কি পড়িস?

বিমল। তোরা সব কলেজে পড়াশুনা করেছিস—আমার
ত' সে সুযোগ হয়নি। একেবারে গণা হ'রে থাকলে
চলবে কেন।

সুহৃদ্যাব। তোর ফাগলামী বাথ। কলেজে যা সব বিজ্ঞা
আবরণ করেছে! ওটা কি পড়ছিল?

বিমল। H. G. Wells-এর Work, Wealth &
Happiness of Mankind। পর পর ৩ খানা
বইতে Wells মানব সভ্যতার বিকাশ ও পুণর্গতি
যেভাবে চেষ্টা করেছেন। Story of Life,
Outlines of History পড়েছি; এবার এটা
থেকেছি।

[এমন সময় অপর কক্ষ থেকে একটা গানের সুব
ভেসে এল]

সুহৃদ্যাব। কে গান করছে রে?

বিমল। তোর ছাত্তের ছাত্তী—আমার ছোট বোন
(হাওয়ায় ভেসে আসছিল)—

আজু রজনী হাম ভাগে পোয়াই হু

পেখু পিয় মুখ চন্দা...

ছ'জন নিবিষ্টভাবে শুনছিল—গান থামলে পর বিমল
বলল—

বিমল। কিন্তু ছাত্তী বে গুরুত্ব গুরুত্ব ছড়িয়ে দিয়েছে।

সুহৃদ্যাব। তাতে ত' আরি গুরুত্ব পৌঁছবে বোধ করা
উচিত। কিন্তু আমি যেচারা হস্তগতাপা করে মতো—
কেবল বিভার ভাবনাটী।

বিমল। ঝাকা.....

(আবার গানের সুব ভেসে এল)—

অমল বল পালে লেগেছে মশ মধুর হাওয়া—

(এবার অপর কক্ষের গান.....)

সুহৃদ্যাব। এ ত' এক গলা নয়।

বিমল। ললিতার কোন এক বাস্তবী আসবে বলেছিল;
হয়ত তিনি পাচ্ছেন।

(গান থেমে গেল—

বিমল। কি রকম লাগল?

সুহৃদ্যাব। বেশ—যদি দরব দিয়ে পাওয়া হয়, তাহলে
এই সব গানই আমার ভাল লাগে। তবে ললিতার
গান তার বাস্তবীর চেয়ে অনেক মিষ্টি এবং মার্জিত।

বিমল। তুই একখানা গান ওখের শুনিয়ে রে।

সুহৃদ্যাব। না, তাই, ওখের সামনে তা পারব না।
(তাকে বাধা দিয়ে)—বিমল বলল—আমি ওখের
ডেকে আনি; তুই পাগাস না।

[সে যেহিঁয়ে গেল এবং ললিতা ও তার
বাস্তবীটিকে নিয়ে ঘরে এল—সঙ্গে হারমোনিয়াম]

ললিতা। (নমস্কার করে) ইনি আমার বন্ধু একসঙ্গে
পড়ি—নাম নমিতা—কখনও আমরা 'নমি' বলি
কখনও বা 'মিতা' বলি। (বলে সে একটু হেসে
বাস্তবীকে পাশে নিয়ে বলল)

সুহৃদ্যাব। (নমস্কার করে বলল—)

প্ৰবন্ধ, আপনাদের গানের পর আমার গান শাওয়া
সাথে না—নিভাত্ত সঙ্গীতের caricature হবে;
কিন্তু বিমল বন্ধন রয়েছে, তখন ত' আর উপায়
নেই।

(সে গান বলল—

তুমি কেমন করে গান কর যে শুধী
আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।

গান শেষ হ'লে পর, ললিতার বন্ধু বলল—“আর এক-
খানা গান কখন—চমৎকার আপনাদের গলা ও শিক্ষা।

একটু হেসে সুহৃদ্যাব আবার গান বলল—

দুঃখ মন্দির মোর

এই ভরা ভাব, মহা ভাব

(গানের পর), বিমল—

এবার গানের পালা শেষ করা থাক—সত্যি একটু চা'র
বোগাড দেখ না। তবলোককে বাটয়ে নিদি—কিছু
মজুরী দিবি না।

সুহৃদ্য। তাঁর খান ত' আগে হয়েছে; তার মজুরি ত' আনবা দিলাম না।

বিমল। না, সে ত' তারা নিজেদের মজুর পেয়েছে, আনবা পথে চলতে চলতে পড়ো মাল কিছু পেয়েছি। আর আমাদের গুদক থেকে, জুনি গুদর মজুরই গান করলে।

[ললিতা অভিজুতের মতো, উঠে দাঁড়িয়ে বাত্বীকে নিয়ে বেড়িয়ে যেতে যেতে বলল]—আপনারা বহন, আমি এখনই চা'র ব্যবস্থা করছি।

(একটু পরে বিমল বলল)—আমার এই বোনটি সব চেয়ে আকর্ষণ—আর সাংগিন আমার পক্ষে স্বপ্নভা করে।

সুহৃদ্য। তোর সঙ্গে স্বপ্নভার কেউ পারে? বাবার বোন হতে বাবারই গুণের একটু ছিটা-কোটা পেয়েছে।

বিমল। না, স্বপ্নভার গুণ সঙ্গে আমি পারি না—আমার উপর গুণ আধিপত্য যদি দেখতিল। গুণে খেব পর্বত স্বপ্ন স্বপ্ন একমাত্র উপায় আছে। বেশী অসুবিধার পড়লেই আমি বলি—করবিন আর জালান করবি—শীগগিরই বিহার করার ব্যবস্থা করছি। অমনি চোখ, মুখ সব ভারি হয়ে ওঠে। মা ত' গুণ বিদ্যের মজুর পাপল হয়েছেন।

সুহৃদ্য। এত ভাড়াভাড়ি কি?

বিমল। লামিন ত' না, bourgeoisie aristocracy মতো মতো না—এঁরা কুঁসতেই পারে না যে রায়পুরের রায় বাবু। তাহের ঘরের মেরে এক বয়স পর্বত অবিসাহিত্য থাকবে।

সুহৃদ্য। তোর ও ললিতার মত কি?

বিমল। গুণ মত আরও পড়বে এবং আমারও তাই মত।

সুহৃদ্য। এ মেয়ের বিয়ের মজুর ভাবনা কি? পড়তে চাও, পড়তে যাও না কেন। বহুলোক আছে, এ মেয়েকে পেলে কৃতার্থ বোধ করবে।

বিমল। (সুহৃদ্যের খাড়ের উপর হাত রেখে) তুই গুণে নিবি?

সুহৃদ্য। তোর মত কি?

বিমল। আমার বিশ্বাস—এতে তোরা উভয়েই সুখী হবি। আজই আমি গুণে বিহার করতে চাই না—ও পড়তে, পড়ুক। কিন্তু এটা জামলে আমি নিশ্চিত ও সুখী হব।

সুহৃদ্য। ললিতার মত হবে কি? তারপর তোর বাবা মা'র মত? লামিন ত'—আমার ত' বনেদি বাগদৌরব নেই।

বিমল। বেথে যে তোরা বনেদি বংশ—ও বুয়ে জল খাবে। তোর মতো ছেলের হাতে মোহর বা বোন হিতে যদি কাকুর আপবি হয়, তবে তার মত বোকা খুব কমই আছে।

সুহৃদ্য। তুই ত' তোর বন্ধুদের আবেগে বলে গেলি—কিন্তু ললিতার মত হবে কি?

বিমল। বেশ, আমার মনে হ'ত তোরা উভয়েই উভয়ের প্রতি আকর্ষণ। সেটা বাগদৌরব তত্ত্বের গুণ ভাল লাগে—ভাললাগা নয়। আমি গুণেও জিজ্ঞাসা করছি।

সুহৃদ্য। বিমল, ললিতাকে পেলে, জীবনে সুখী হব না ভাববো, এত বড় বোকা আমি নই।

বিমল। খুব সুখী হলাম, সুহৃদ্য। বহু বিদ্যে তোর চেয়ে জির আমার কেউ নেই। আমার জীবনে যা কিছু সার্থকতা পেয়েছি, তার মজুর তোর কাছে থা—

সুহৃদ্য। (তাকে বাধা দিয়ে) তুই থাম, আর ভেঁপোনী করতে হবে না।

বিমল। না, তোর কাছে গুণ স্বীকার ক'রে ভক্ততবে হার উদ্ধার করছি না। আমার কবচটা শেষ করতে হবে।

সুহৃদ্য। আচ্ছা বল।

বিমল। আর বাড়ির মধ্যে ললিতাই আমার সবচেয়ে বেশী স্নেহের। আমার এই ও যেমন বুঝতে পারে, মা ভিন্ন আর কেউ তা পারে না। তাহের দৃষ্টান্তে নিলেন, তোরা উভয়েই সুখী হবি—তোদের উভয়েই জীবনে সুখী দেখতে চাই।...বেশি, চা'র খোঁজ বোধহয় এত সময় হয়ে গিয়েছে।

(৭)

[ললিতা টেবিলে চা ও জলখাবারের ব্যাবস্থা করছে।

নমিতা তাকে অল্প অল্প সাহায্য করছে এবং দুজনই মধ্যে

আলাপ চলছে:]

নমিতা। আজ যে বেকার smart ; বাপার কিরে ?

ললিতা। বাপার আবার কি ? হাথা ও তার বচ্চ চা

খেতে আসছেন—চার চক্ক কি তারা সাবাহিন হা

পিতোস ক'রে ব'লে থাকবে ? তাড়াতাড়ি করতে

করবে না ?

নমিতা। তা ত' হবেই। কিন্তু এ বেশ ট্রিক সাধারণ কর্ম
অবগতারা চেয়েও একটু বেশী কিছু। মনের ভিতর
যেন একটা ডেউ খেলো যাচ্ছে ; তাইই বেগে তত্ন-সত্যও
যেন শিবরণ বোধ করছে।ললিতা। (হাতের কাছ কেলো দেখে) না, তুই যদি
এমনি জ্বালাতন করবি তবে আমি সব কাছ কেলো
এখান থেকে চলে যাব।নমিতা। (দুই হাসি তার মুখে লেগেছিল) না, লতি—
তা তুই আর পারছিস না। অপরের পরে আজ কাছ
করছিস না। তুই বাপু এ বর থেকে গান শাখিসি—
আজ তবনী হান ভাপে পোরাই দু—পেব্রু পিয় দুখ
চম—আর ওখব থেকে উনি গাইলেন—

শুভ মন্দির মোর—এব সাথে সাথে—অবাক

হ'রে শুনি।

এমনি বোগাবোগ একেবারেই অকারণ ও আকস্মিক
নয়।পর্বতো মহিমানা ; ধূমাত—একেবারে কার্ণকারণ
সম্পর্ক।

[ললিতার মুখ সানন্দ ক্রীড়ায় রেখে উঠল]

ললিতা। (সলজ্জ ; যেন হাতে হাতে অপব্যয় খরচ পড়েছে
এমনি ভাবে বলল) অর্থাৎ নিজের মনের পাপ অপরের
উপর চাপাচ্ছ, এই ত ! তোর পছন্দ হয়ে থাকে, তুই
নিরে নে না।নমিতা। তা কি হহ—সব পর্বত এমন সবী-জোহিতা
করবে—তারপর দুদিন পরে লোকের ঘরের ধিক
ছুটিব ত।

ললিতা। আচ্ছা না হয় আমার বাথাকেই তুই নিল।

(হঠাৎ বলেই সে থমে গেল)

নমিতা। সে কি তার বোনকে ছাড়া আর কোন নারী
ছিলো না, জানে ?ললিতা। আচ্ছা, না হয় আমাকেই বরমাশ) বিল। তাতে
কি তোর মন উঠবে।নমিতা। কিন্তু আমার মন উঠবে কিনা, তা ত' বড় কথা
নয়—তোমারও উঠবে না—আর একজনকেও তাতে
চলবে না—তোমাকে কি তিনি এমনিভাবে হাত ছাড়া
হ'তে দেবেন ?ললিতা।—বেশ হতো কিন্তু, আমি যদি পুরুষ হতাম, তোর
হাতের বরমাশ) পেলে জীবন স্বস্তি মনে করতাম। স্নপ
স্বপ্ন যা আছে, তার ত' জুলমাই নেই ;—তার উপর
আবার একটু চমৎকার নাম।নমিতা। বাগ, তুই যে আমার নামের সঙ্গেই প্রেমে
প'ড়ে গেলি। কি এমন বাহার এতে আছে।

ললিতা। আছে রে, নামের মধ্যে অনেক কিছু আছে।

নমিতা। Shakespear কি বলেছেন, জানিস ত—
গোলাপকে যে নামেই ডাক, তা গোলাপ-ই থাকবে।ললিতা। উহাং, কবিরূপের সঙ্গে পুরো এক মত হ'তে
পারলাম না। মনে কর শকুন্তলায় নাম যদি শকুন্তলা
না হয়ে বগরবা, এমন কিছু হতো, তবে দুঃস্থত বাবা
প্রেমে পড়েও ঐ নামের জ্বালায় ভেগে পড়তেন ; না
হয়, নাম বললে মিতেন। এবং অজস্রুয়া ও প্রিয়বহার
নাম যদি কোথলী ও পাড়া-বেড়ানী হতো, তবে কি
দুঃস্থতের বিরবে শকুন্তলা তারের কাছে প্রাণের কথা
বলতে ভয়গা পেত ? তেমনি তোর নামের ক্ষতই প্রেমে
পড়তে ইচ্ছা হয়।

নমিতা। এবার শুনি, আমার নামের মহিমা ব্যাখ্যাটা।

ললিতা। শুনি, শুনিবার ক্ষত মনটা একটু উপবৃৎ করছে ?
বর এলে তাকে এই ব্যাখ্যাটি শুনিরে বিল। কোন
বৈয়াক পান্ডুল তোর কপালে ভোট, কে জানে,—
এ সব বুঝবে কিনা। এইবার তবে বলছি—যখন নমিতা দেবী কষ্টে যখন—দুঃস্থতী কষ্ট, তত
পূজারী এসে দেবীর পা'র সামনে এমনি নতদাশ ও ভোজ-

বস্তু হ'য়ে (ললিতার তথা ক২৭) বলবে নমি, নমি তোমার
দেবী, তুই হও, নমি তোমায় ।—(নমিতা হেসে ফেলল)....

যেখলি ত নামের মহিমায় কষ্ট দেবী তুই হ'লেন। তা-
পর তক্ত পুজারীটি উঠে দেবীর কাঁধের উপর মাথা রেখে
[বলল হবে বলেন—মিতা, মিতা। (ললিতার তথা ক২৭)

(নমিতা হেসে ললিতার গালে একটু ছোট্ট খাল্লর দিয়ে
সরে পাড়িয়ে, বলল)—তুই কোথাকার।

ললিতা। যেখলি ত নামের কি না মহিমা (নামের সুবে)
এক ঘম হাতে হাতে বকসিন মিল গিয়া। এবার
ওধের ডাকতে হয়।

(৮)

[দৈর্ঘ্যকথানার বহ—অধিকা বাবু, কানাই বাবু ও
সাবুর বেশখারী এক ব্যক্তি ; লম্বা হাড়ী, লম্বা
চুল, কপালে তিলক চিহ্ন, পরনে বস্ত্রবর]

কানাই। বুঝলেন অধিকা বাবু, এ একেবারে ঝাঁট মাল।

ইনি ৩২ বছর ছিলেন হিমালয়ের অপর পারে কৈলাস,
মানস, তিস্ত প্রভৃতি স্থানে।

অধিকা। এত বছর ব্যান ধারণা করার পর, ইনি এই
পাপ তাপময় সংসারে কিরে এলেন কেন ?

কানাই। তা আর বলেন কেন ? ইনি কি নিজের ইচ্ছায়
এসেছেন। এত বছর তুচ্ছ-সাধন ও তপস্তার পর
যেগাফিঁষের মহাধেব (কানাই হাত বাড় করে কপালে
হৌরাল) একধিম আবেশ দিলেন—এ অম্মে এঁর সিদ্ধি-
লাভ হবে না, গত জন্মের কর্মফল সব এখনও কয় হয়
নি। তাই আবার সংসার করতে আসতে হ'লো। যা
বহ বছর আগে ত্যাগ করে গিয়েছিলেন; আবার
তাতে লিপ্ত হ'তে হ'লো। কিন্তু শতু ভোলানাহ একে-
বারে বিমুগ্ধ করলেন না।

অধিকা। খুবই পরিতাপের বিষয়। যদ্যেবে কি এঁকে
হিলেন ? এত বছর পর সংসারে এলেন—কি করে
এর হিন চলছে ?

কানাই। ইনি সাধু মাহুণ; এঁর আবার গলা-না-গলায়
ভাবনা কি ? আপনাদের হাশ অনের দ্বারা একপ্রকার
চ'লে যাচ্ছে। শতুও ওনাকে এ অম্মে মুক্তি দিলেন

না; কিন্তু কিছু ঐশ্বর্য দিয়েছেন—বৈব ক্ষমতা
আপনারা যাকে বলেন—

অধিকা। তা ত পাবেই; এতদিনের ঐশ্বর্য তপস্তা কি
বার্য হ'তে পারে ?

কানাই। তাইই একটা আপনার বস্তু এনেছি। এও
আবার যাকে তাকে দেওয়া যায় না। সব লক্ষণ
মিলিয়ে, তবে ত' দিতে হয়। আপনার মতো মহা
ভাগ্যবান লোক ক'জন আছে ? সবগুলি লক্ষণ জিলে
দিয়েছে। প্রভু, আপনি ভাল করে দেখে নিন।

সাধু। বৎস; আমার একটা বোকা আক খালকা করলে।
এ ভাব কতদিন বহন করছি—কত লোক চেয়েছে, কত
টাকা দিতে এসেছে—কিন্তু যেবার লোক এতদিন পাই
নি। আক তেমাকে পেয়ে আমার বোকা কমাচ্ছি।
এরিক এস, বৎস।

(অধিকা বাবু সাধুর কাছে এগিয়ে গেলেন).....

(অধিকা বাবুর মাথা হ'তে হস্ত করে দ্রব্য অঙ্গ পরীক্ষা
করতে লাগলেন)

(মাথা দেখে) হ, রাজ চূড়া। চোখ...বা, রাজ্যের লোচন
যাকে বলে, ঠিক স্বাম্যস্ত্রের চোখ ছিল এমনি—(কান
দেখে) হয়েছে.....না হয়ে পাবে না। ঘোঁষ হাত.....
হাতের উপর এমনি শম্বক্স আঁকা হয়েছে...পা...বা..

বৎস—এ মধ্যার্ঘ্য তথা তোমারই বস্তু। দ্রব্য সিদ্ধি বাস্তা
গণেশের বাহন ছিল যে ইস্তুর...এ তাইই ষাত; কৈলাস
পাহাড় থেকে আনা। এই নেও সেই ইস্তুর—এটি হাতে
নিয়ে নিতবর পর্যন্ত, যা চাবে তা-ই পাবে। তিনটিই বৈদ্য
হ'বে না। সিদ্ধি বাস্তা গণেশের নাম নিয়ে তিনটি বর যা
হয় চেয়ে নিবে—মনস্কামনা পূরণ হবে।

(জোড় হস্তে নত-মাথু হয়ে একটি ইস্তুরের গুটিকি
অধিকা গ্রহণ ক'রে মন্তকে হৌয়ালেন। নত গাহু
অবস্থাতেই—

অধিকা। প্রভু আপনি ত দান করলেন, কিন্তু এও বস্তু
আপনাকে কি দিতে হবে ?

কানাই। অধিকা বাবু আপনি প্রভুকে চিনেন না। তিনি
অপরিগ্রাহী, তিনি বাৎসারী-ও নন। কোন দ্রব্য নিয়ে
তিনি কিছু বেন না। তবে এটা আপনার কাছে যাতে

লাগতে পারে, তার মস্ত একে শোথন করতে হবে।
দেবতা কিছু খরচ আছে।

মাধু। বৎস, মিথিহাভা গণেশ ছিলেন মুখি-বাহন; গণেশ
জন্মের কোল ছেড়ে, যখন তিনি মাটিতে নামলেন, সে
থেকেই তিনি এই জাতীয় বড় মুখিকের উপর চড়ে
বেড়াতেন। কৈলাসে এতের বংশ আৰম্ভ আছে। তারই
একটা আমার কাছে ছিল। কানাইর কাছে তোমার
সব কথা শুনে-ই মনে হ'ল যেন কোন পবিত্রিত লোকের
কথা শুনিছি। শিব শঙ্কর; বহুবিনেব কোন পবিত্রিত
লোকের কথা যেন আবছায়ায় মত মনে পড়ল। তার-
পর একদিন গণপতি রাজে স্বপ্ন দেখা দিয়ে—বললেন,
পবনপাহাড়ী! কার মন্দির তুমি ঘরে বেধে দিয়েছিল?
যাও। তাকে দিয়ে দে। ...দীর্ঘকাল ছেড়ে বাড়িতে হাত
বুলাতে বুলাতে...গণপতি, গণপতি—দাঁপ করে এতু।

অধিকা। গণপতি কি স্বপ্নে আমাকেই নির্দেশ করলেন?
মাধু। ভাগ্যবান, আপনি পরম ভাগ্যবান। এমন সর্ব
লক্ষণ নন্দ্র লোক আমি খুব কমই দেখেছি।
কানাই। এটা শোথন করতে কম হলোও ২০ টাকা
লাগবে।

অধিকা। আমার ত' নগর এত টাকা এখন ব্যতে নেই—
আমি বরং আপনাকে একটি অনুযায়ী দিচ্ছি; এর দাম
১৫ টাকার কম হবে না। আর নগর যা পাখি—দিচ্ছি।
কানাই। বেশ তাই বিন।

অধিকা। (একখানা পাখর বসানো অনুযায়ী হাত খেঁচ
খুলে সাধুকে দিলেন এবং নগর ১৫০০ দিলেন।)

মাধু। আচ্ছ তবো আসি।

(৮)

[বাড়ির ভিতরের একখানা ঘর—অধিকাবাসু ও তার স্ত্রী]

অধিকা। গিন্নী, আচ্ছ হাও ঘরে গিয়েছি।

সুহমা। কি হয়েছে? বৈব মিলে গেছে নাকি?

অধিকা। হ্যাঁ, এবার আর আমাকে পার কে? (তিনি
কাপড়ের স্তম্ভের হাতে নরী শুকনো ইঁদুরটা বের করে
সুহমার সামনে ধরলেন)

সুহমা। (শিথিল হয়ে উঠলেন—সুখ অপরাধকে কিরিয়ে

দিলেন) হাম, সরাও, সরাও; কি যে সব কাণ্ড শুরু
করেছ! কেলে দাঁও।

অধিকা। তুমি কেপলে নাকি? কেলে বিন কি বলছ?
সুহমা। কেলে হবে না, কি করবে? ওসব অমঙ্গল
বাড়ির মধ্যে ঢুকিও না।

অধিকা। অমঙ্গল বলছ কাকে? এই ইঁদুর হলো গণ-
পতির বাহন। কৈলাসে পাহাড়ে এতের পাওয়া যায়।
গণেশ এতে চড়ে বেড়াতেন। তাই গণপতি এতের
বর দিয়ে গিয়েছেন—তিনটি অভিশাপ পূর্ণ করতে
পারেবে।

সুহমা। ঐ জুয়াচোর কানাইর এই সব কাণ্ড। যত সব
গাফাখুরী কথা হ'লে তোমাকে ঠাকি দিয়েছে; আর
তাই নিয়ে তুমি নাচছ। তোমার পাশ পড়ি—ওটা
কেলে বেও; ওটা বেখলেই আমার কেনন ভর হয়।

[এমন সময় বিমল ঘরে ঢুকল]

বিমল। কিসের কথা হচ্ছে, মা?

সুহমা। দেখ না, একটা মরা শুকনো ইঁদুর পড়ে আছে;
বলে কৈলাস পাহাড়ে ঐ জাতীয় ইঁদুর থাকে এবং
এরই নাকি গণেশের বাহন ছিল।

[বিমল একটু হেসে ইঁদুরটা দেখতে লাগল]

অধিকা। (সতর্কতার সাথে ইঁদুরটা ঘরে রেখে) তা
তোমাদের পছন্দ না হয়, না হবে। আমি টাকা দিয়ে
রেখেছি—কেলে দেখ কেন?

বিমল। তা ত' ঠিকই; ফেলে দেবেন কেন।

অধিকা। (একটু আশ্চর্য হ'য়ে) দেখ ত'; ভাল যদি না-ই
হা হয়, কতি ত' হবে না।

সুহমা। কতিই হবে—ঘরের মধ্যে অমঙ্গল ভেঁকে
ঢুকালে।

অধিকা। তোমার বত সব বাজে কথা।

বিমল। আচ্ছা, মা, থাক না কেন। একটা পরীক্ষা করা
যাবে—প্রথমেই ধরা যাক, বাড়ির ঘোনার ৫০০০
টাকার কথা। বাবা এটা আপনি কামনা করতেন।

অধিকা। বেশ, তাই হোক। (ইঁদুরটা হাতে নিয়ে
তিনি বললেন) আমাদের ঘোনার ৫০০০ দিয়ে দাঁও
থেকে দুক্তি বেও।

(সুমনা কেন যেন নিজের অজ্ঞাতে কেঁপে উঠলেন,—চোখে কাপড় দিয়ে মুখ ধিरे পাঁড়ালেন)

বিমল। (একটু হেসে) দেখা যাক বাবার বৈধ কি করে!

সুমনা। ছোড়ার ভিন্ন করাব—ওটাকে এখন তুমি আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও।

অধিকার। আজ্ঞা আমি নিয়ে যাবছি। (সুমনা ইঁদুরটা নিয়ে যেতিকে গেলেন)

বিমল। মা, তুমি এত বিরক্ত হচ্ছে কেন? বাবা সাতা-দিনই মনমরা হয়ে থাকেন, কিছুতেই যেন তাঁর এখানে মন উঠছে না।

সুমনা। ভীমবতি ধরেছে ওকে। এখন নিজে টাকা বোজগার করবে—ছেলের বোজগারের উপর থাকতে তার সম্মানে বাঁধে; তাই এই সব বুজবুজী ধরেছেন। এতে তাঁর অপমান হয় না।

বিমল। তুমি বোঝ না, মা। এত পুরুষের জমিদার এঁরা; এখন হঠাৎ বুড়ো বয়সে হাতুড়ি পেটানো কুপির বোরগরে তাঁর দিন চলছে। একি তাঁর সহ্য হতে পারে। তাই দিন কয়েক থাকুন, এই বোকাহ—তারপর যখন দেখবেন কিছুই হচ্ছে না, তখন আগনিই আবার শান্ত হবেন এতে ত' অজ্ঞার কিছু নেই।

সুমনা। কি বলিস বিমল। জুয়া বেলার যদি অজ্ঞার থাকে, তবে এতেও অজ্ঞার আছে। কাকি ধিरे কিছু পাওয়ার চেষ্টা করাই অজ্ঞার। তুমি নি ভাবে কিছু পেলে, অজ্ঞার ধিरे তার বরলা বিতেই হবে।

বিমল। তোমার কথা এক দিক ধিरे খুবই ঠিক। এপর তুমি কোবার শিখলে মা? কিন্তু জমিদারীর পদমাটা যে কাকি ধিरे আনতে, তাতে অজ্ঞার হতো না?

সুমনা। ছিল বৈকি। ছিল বলেই ত' সবই গেল। যতদিন জমিদার প্রজাবের অজ্ঞাভাবে কিছু বিতে পারত, তত-দিনই জমিদারের কিছু জ্ঞাথা পাওনা ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন সরকারই সমাজের—স্বাভা খাট, গৃহব জুয়া, শিকারীকা—সব কিছুই তার নিল তখন আর জমিদারের করবার কিছু বইল না; তার

পাওয়ার জ্ঞাথাতাও হুঁইরে গেল; সঙ্গে সঙ্গে তার থাকার প্রয়োজনীয়তাও শেষ হ'ল।

বিমল। মা, এত কথা তুমি কোবার শিখলে? কোন দিবসে তর্ক করতে গেলে তুমি কিছুতেই পেরে উঠেন না; অজ্ঞা এপর কথা এমন করে বল যাতে অজ্ঞার হ'তে হয়।

সুমনা। এ আবার বড় কথা হলো কি? কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ একি তর্ক করে বুঝতে হয়। এ'ত মাহুদ অজ্ঞার ধিरेই বুঝতে পারে।...যাক, তুমি জানি না? তোমার কাছে যেতে হবে না?

বিমল। এই ত, পেয়েই এখন বাব। হাত ১০টাও খাঞ্জিয়া বিতে হবে।

সুমনা। ডোর বেলা একটু সকাল ক'বে আসিস। আজ বড় বেদী করেছিস। মনস্ত রাত ওখানে কাটান—তুমি বাসার ধিरे না আমা পর্যন্ত কত বে দুর্ভাবনা।

বিমল। কতদূর থেকে আসতে হয়। বেদী কি ইচ্ছা করে কবি। রাতের খাটুনির পর জোমারের কাছে ছুটে আসার জন্য আমার মন ছটকট করে। সকাল বেলার লতির হাতের চা না পেলে কুপ্তি হয় না। কোবার গেল ললিতা—

সুমনা। পড়ছে। সেও ত' সকাল বেলা খালি এদিক ওদিক ডাকার। কতকংশ দাধা আসবে। তুমি ত' লাই ধিरे মাঝার তুলসি। দেখে কাট হাতে পড়বে, তার ঠিক নাই। এত জালান কোবার তখন থাকবে?

বিমল। আর তার হাতে ওকে হিঁজি কি না মা!

সুমনা। ইং, কোন রাজপুত্র তোর বোনের জন্য অপেক্ষা করছে।

বিমল। নিজেরের রাজ্যের হাল দেখলে ত'; তবু রাজপুত্রের জন্য আশ্রয় করে? তবে রাজপুত্রের চেয়ে ভাল বর ললিতাকে পেলে কৃতান্ত হ'বে।

সুমনা। তোমার বা আমার মত-নিরে ত' সবাই ভুলে না।

অজ্ঞার, চরিত্র ভাল, দেখাপড়া জানে, এনে নিজে যেতে পারে, এমনি একটা ছেলের হাতে ওকে বিতে পারলে আমি নিশ্চিত হতে পারি।

বিমল। সবই বললে মা, কিন্তু চেহারাটা সুন্দর, বাহুটা

ভাল—এঁত বললে না। এই পক্ষণ না থাকলে
লভিত্বে আমি কান্ডে হাতে ধেইই না।

সুহমা! (অর হেসে) কিন্তু এঁত তোর মনের লগ্ন—তোমার
পায়ে পাবি কোথায়?

বিমল। আছে মা, না থাকলে কি আর আমি বলি!

সুহমা। (সোহুকে) কে, কোথায়—বল দেখি? তবে
ত' ঝাঁপ দি বাবা!

বিমল। সুহমাকে পছন্দ হয় মা?

সুহমা। ওমা, তা আবার পছন্দ হয় না! আমায়ও ত'
পোড়া চোখ। এমন সোমার চোখ ছেলে এত দিন
বরে বেখছি, একবা ত' মনেই আসেনি। কিন্তু লোক
বাকী?

বিমল। (একটু হেসে) আমার বোন কি এমনই অযোগ্য
মা, যে সুহমার বাকী কিনা এটা ই তোমার ভয়।
আমার বয়স তবু লভিই বাকী কিনা।

সুহমা। তোর যে আবার কথা।

বিমল। না, মা, এ তোমাদের শাবক কালের গোঁরী
হানের আরে নয়। ছেলেদের মতোই ও লেখাপড়া
শিখেছে। ওরও একটা মন আছে; তাঁরও বোঝ
মিতে হয়।

সুহমা। (অর হেসে) দাদার আধরের বোন, যা খুশী
কর গিয়ে।

বিমল। (অর হেসে) মার অন্যায়ের মেয়ে কিনা—
তাই এতদিন না মনে মনে রাজপুত্র খুঁজছিল!...
তোমার কোন ভয় নেই মা, বোঝ হয় উত্তরেরই
মত আছে।

সুহমা। বড় সুখী হলাম, খোকা।

বিমল। এই দেবেছে যে। আবার খোকা! ৩০ বছরের
খোকা (হো-হা করে হেসে উঠল)

সুহমা। ৩০ বছর না-বাকী। মাত্র ২০ বছরের একটু
বেশী। তা' না'র কাছে ছেলে বরাবরই খোকা থাকে।

[ললিতা প্রবেশ করল]

ললিতা। কি নিয়ে তোমরা এত হাসা-হাসি করছ?

বিমল। মার সঙ্গে আমার বয়সের ঝগড়া ও তোর বর
কেন্দন হ'বে তার ঝগড়া।

ললিতা। ব্যাৎ—(সে কিরে বাচ্ছিল—হঠাৎ বিমল তার
লগ্না চুলের বেগী ধরে ফেলল—সে উঃ বলে কিরে
ঠাঙাল)

বিমল। আমাকে খেতে দিবি তুইও বাবি সেই সঙ্গে,
চল।

ললিতা। চল দাদা। (তিনজনেই বেরিয়ে গেল)

[পরদিন সকাল বেলা; বাইরে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে।

বিমলের কিরে আসার সাধারণত বা সময় তা হয়ে
গিয়ে। অধিকা ও সুহমা বরে বনে উৎকণ্ঠিতভাবে
আলাপ করছে।]

সুহমা। খোকা এখনও কিরে আসছেন, এই ঝড়বৃষ্টির
মধ্যে কোথায় আটকে আছে, কে জানে?

অধিকা। হ্যাঁ, বেলা নাটা বেজে গেল, বাড়ি কিরে
আসতে ত' দেবী স্বপ্নও করে না।

সুহমা। কি বৃষ্টি চলছে। রাত দুপুরে হুজ হয়েছ,
আকাশ ঘেন ভেঙে পড়ছে। রাজে ঘুম পেল ভেঙ্গে,
তারপর দাগটা হাওয়া ও বৃষ্টিতে আর ঘেন ঘুম
আসছিল না।

অধিকা। আমার কিন্তু খুব ঘুম হয়েছে—প্রথম রাজে কিছু
সময় সাধুর বৈবশক্তিও কথা মনে আসছিল—প্রথম বর
পুরণ হলে, আর ছুটি কি বর চাইব...

সুহমা। তুমি ছাি ওসব কথা বলো না। যা আমার
ভয় করছে। কিবে তুমি বাড়িতে নিয়ে এসে। তজ্জার
বোর একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি।—খোকাও এখনও
আসছেন না।

অধিকা। না, না, তুমি বড় বাজে ভয় পাও। কি আবার
স্বপ্ন দেখলে?

(বাইরে ভীষণ গর্জন করে মেঘ ভেঙে উঠল)

সুহমা। উঃ, এমন একটা বজ্র ঘেন রাজে আমার মাথার
পড়ছিল কিন্তু তবুও মংলাম না। ঠাকুর, বা-ই তোমার
মনে থাক, আমার উপর দিয়েই ঘেন যায়।

[আবার মেঘ গর্জন এবং ধরমায় কে ঘেন ঠকঠক
করছে -- ঐ খোকা আসছে গোণ হয়। হোড়িয়ে
গেল ধরমায় শিবল খুলবার লগ্ন --সব নতুন কাঠ,
বৃষ্টিতে ভিজে মুসে গিয়েছে, শিবল আর খুলতে চায়

না—শিকল খুলবার চেষ্টা করছে এবং বাইরে ঠকঠক আওয়াজও হচ্ছে)

অধিকা। (এগিয়ে গিয়ে) বেথি, আমার কাছে বেও, শিকল খুলে দিছি।

(হেঁচকা খুলে দিল—একটি অপরিচিত লোক ঘরে ঢুকল)

অধিকা। কে আপনি? কি চাই?

অপরিচিত—আমাকে চিনবেন না, আমি বিমলখানুর ক্যাক্টরী থেকে আসছি।

সুরমা। বিমলের ওখান থেকে...সে কোথায়? সে এল না কেন?

অপরিচিত। (ধেনে ঘেমে চলছে) ওই ত বলতে এসেছি।

কাল নাকি কোন সাধু আপনাদের কি একটা বৈধ ঘান দিয়ে গিয়েছেন; বাত্রে কাজের সময় বিমলখানু...

সুরমা। কিন্তু সে কোথায়?

অপরিচিত।...বিমলখানু আমাদের কাছে সে গল্প করছিলেন ও কাজ করছিলেন। সবাই তাই নিয়ে খুব হাসছিলেন।

সুরমা। বোঝাই আপনার, থোকা কোথায় তাই বসুন।

অপরিচিত। গল্পের মুখে হঠাৎ একটু অসাবধান হয়ে পড়ে...

সুরমা। তারপর? বিমল কোথায়...accident হয়ে...

সুরমা। ও বাথারে (বলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ছিল—সেই অপরিচিত যুবক তাঁকে ঘরে কেঁসল। অধিবাসীরা চীৎকার করে উঠল—অপরিচিত যুবকটি বলল “এল, এল বিন একটু”)

(ললিতা ও তার দুটি ভাই বোঁড়ে ঘরে ঢুকল)

[কয়েক দিন পরের ঘটনা]

[শিক্ত সন্ধ্যা, বাইরে খুব জল পড়ছে; ঘর অন্ধকার। কবিরাখানু শুয়ে ছিলেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। অন্ধকার ঘরের মধ্যে পারচাতি করছেন, চিন্তাচুল্ল নত মস্তকে হাতে কখনও বুলাচ্ছেন, কখনও পিছনে পিঠের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখছেন। বেকে বেকে বাজ পড়ছে। মেঘের গর্জন, বৃষ্টির আওয়াজ, খড়ের শোঁ শোঁ। শেষ মিলে অন্ধকারকে আরও ঘন করে তুলেছে]

অধিকা। (একাকী বলছেন)—এ...পাতলা গিয়েছে

—তার জীবনের বিনিময়ে। আমার প্রথম বর মজুর হল। সিদ্ধিহাসতা গণেশ, এই দিতি তুমি আমাকে হিলে! তার জীবনের মূল্য স্বরণ কোলমণীর কাছ থেকে এ...পেরেছি। মানুষ আনন্দ, কত মৌচ হতে পারি। অভিভাবতার পর্বে যাকে হৃত করে দিয়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত তার উপর নির্ভর করে জীবন চালাতে হয়েছে। তাতেও ভুট্ট হলান না; আমার আভিভাবতার পর্বে তখনও মরে নি। চেয়ে-ছিলাম ভাগ্য নিয়ে ছুঁতে খেলো বাতলখী হয়—অর্থ উপার্জন করব। ভাগ্যের সঙ্গে জুড়া খেলে হাব মেনেছি—মুলায় মিশে গিয়েছি। আজ বিমলের জীবনের বিনিময়ে এ...টাকা পেরেছি। নিজের অপোচরে মনের মধ্যেই একটু...শাক সে কথা তাবন্তে পারি না। আমি তার বাবা; আর তার জীবনের মূল্যস্বরণ এ...টাকা গ্রহণ করেছি। বৃত্ত ব্যস্তের সংস্থান...না—না...মাঝুর বত নীচু হতে পারে। নিঃসবল দরীদ্র আমি; আমার মনের বিলাস কোথায়! [সুরমা হেঁচকা করে ঢুকলেন]

সুরমা। কি করছ, কেমন আছ এখন?

অধিকা। কেমন আর থাকব সুরমা। তোমার ত কেবল

পুত্র শোক, আমার যে তার উপর অসহ্য আত্মশ্রম।

সুরমা। ওসব ভেবে কি হবে, সবই কপালেশ্বর লিখন।

অধিকা। সবই বৃষ্টি—কিন্তু ওই অলক্ষ্যে জিনিষটা কেন ঘরে আনলাম! তুমি বহুবার বাথন করছিলে, তোমার কথা শুনি,—অতি লোভের গণপ আমার এই সর্বনাশ হ'ল।

সুরমা। (হাসীকে দাম্পত্য হেঁচকা জড়) ওটাকে আমার অপরা মনে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ওটাকে জড়ই ত' আশাবাদের কপাল এমন করে পড়ে যায়নি। (দুই জনই কিছু সময় চুপ করে আছেন)...সেই একটা কথা ভাবছি—তোমার ত' তিনটা বর ছিল—অস্বস্ত আর একটা তুমি চেয়ে নেও না।

অধিকা। কি বর চাইতে বলছ?

সুহৃদ। বিমলকে কিংবা চাও—সে আবার কিংবা আসুক...
(বলেই তিনি মুখে কাপড় গুঁজে কাঁধে লাগলেন)।
অধিকা। সুহৃদ, তুমি অপেক্ষা করো। এ কখনও হয়!...
দশনে আমাকে বা তোমাকে ওটা খেতে হোকনি কেন,
জানো? তার সমস্ত শরীর গিঁথে এমন হয়ে গিয়েছিল
—যে খেতে ভয় হতো। তারপর অল্প ৭৮ দিন
হল, সেই দেহও দশনে পড়ে কলোছে...

সুহৃদ। থাক, ওপর আমাকে বলো না, তবুও তোমার
পায় পড়ি, তুমি আর একটি বর চেয়ে নাও। দেখেই
না কি হয়... (সত্য সত্যই সুহৃদ অধিকারবাহুর পায়
উপড় হয়ে পড়ে কাঁধে কাঁধে বলতে লাগল)...
আমার বিমলকে কিংবা এম হাও, নইলে কি নিয়ে
আমি বাঁচব? তুমি ত ওকে চিনতে না—আমি জানি,
সেও ত' আমায়ের ছেড়ে থাকতে পারছে না...সে
আসবে, নিশ্চয়ই কিংবা আসবে।

অধিকা। (সুহৃদকে ধরে তুললেন) ওঠ, সুহৃদ দেখছি
ওটা বুঁজে দিচ্ছি। (অধিকারের এক কোণ থেকে
সেই শুষ্ক মৃত ইঁদুরটি বের করল। অধিকারেরই হাতে
সেটা নিয়ে বলল...আমার দ্বিতীয় বর অকুণ্ঠ—
আমি আনন্দের পূর্বক কিংবা চাচ্ছি—সে আবার
আমাদের কাছে কিংবা আসুক।

(উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে)

সুহৃদ। (আবিষ্টের মতো) ঐ যে সে আসছে, বরদার
কড়া নড়ছে; শুভ না! ঐ যে, বরদা খুলে যাও—সে
বুটতে ভিজেছে, খুলে যাও...

অধিকা। (কান্নার সুরে) সুহৃদ কি করলে তুমি...
আমরা বাপ-মা হয়ে তার এমন অনিষ্ট করব...
অগ্ন্যহতি হাও তাকে...এ বরণ তাকে দিও না...

সুহৃদ। দাবধান আলো জ্বলানো—দে পাগিরে যাবে।
খোল খোল বরদা খুলে দেও—আমি বাইরে গিয়ে
বাইরের বরদা খুলে দি...বিমল, বিমল, আসছি বাবা!
(বরের মধ্যে ছুটাছুটি করছে) (বাইরে আরও কোরে
কড়া নাড়ার আওয়াজ আসছে)

অধিকা। উঃ, কী অন্ধকার—কিছু তাম্র তাল—এখন
আলো চাই না। না, না, এ হতে পারে না। আমরা

কোথায় তার মুক্তি কামনা করব—না নিষেধের সুর
আর বাঁধের মত তার প্রেরণাকে ভেঙে আনিছি!...
সেই সেটা...আমার আর একটা বর পাওনা আছে...
কোথায় সেটা পড়ল। [অন্ধকারে হাতকাঁধে]

সুহৃদ। কী নিষ্ঠুর তুমি বরদা খুলে না...বাইরে রুটিতে
ভিজছে সে...আমিই খুলব। (ছুটে গিয়ে বরদার
শিকল টেনে খুলতে পারছে না...অধিকারবাহু তখন
অন্ধকারে দেই শুষ্ক ইঁদুরটিকে বুঁজে পাবার জন্য
হাতকাঁধে দেই...অবশেষে সেটা তিনি পেলেন...

নতজাহ্নবী হয়ে প্রার্থনার ভাবে সেটা ছবোতের মুঠোর
মধ্যে ধরে বললেন আমার তৃতীয় বর প্রার্থনা করছি
হে বিশ্বের স্বাধীন,—কিংবা নাও তাকে; তোমার
কোলে আমি হাও তাকে। অনেক কষ্ট সে স্বাধীন
পেয়েছে—এবার তুমি তাকে শান্তি দিও। (...চোখ
বুঁজে মুগ্ধমানের মতো বসে বসে)

(...সুহৃদ টানটানকি করে বরদা খুলে দেখলেন কেউ
নেই—বাইরের শিকল নাড়ার শব্দও বন্ধ হয়েছে—
একপাতি কপাতি বর নিজের দেহের তার তার ওপর
এলিয়ে দিলেন...বর নিস্তর...বাইরে মেঘগর্জন চলছে
—খুলববারে রুটি পড়ছে। হঠাৎ স্বাধীনতার আলো
জলে উঠল—আন্তে অর আলোর ভিতর দিয়ে ললিতা
ও সুহৃদ আর এগিয়ে আসে! গোখে আলোর ছোঁয়া
লাগার সুহৃদ যেন কতকটা স্ফীত হয়ে পেলেন—কিন্তু
তখনও কপাতি ধরে গাঁড়িয়ে। ললিতা ও সুহৃদ বর
পরস্পরে ধরে তাকে ছ'জনকে ঐ অবস্থায় বেঁধে একটু
বাঁড়াল। ললিতা প্রথম কথা বলল—

ললিতা। মা সুহৃদ বরদা এগিয়েছে।
সুহৃদ। (এতক্ষণ পূর্ণ সজ্জা হয়ে মুখে কাপড় দিয়ে
কান্না চেপে বলল)—বদ বাবা (অধিকারবাহুও উঠে
বাঁড়ালেন)।

সুহৃদ। না, এতকি আমি আগিনি;—কি বলব এসে।
বিমল আমার ভাইর চেয়ে কম ছিল না...আমিও
তোমারই ছেলে মা! (সুহৃদবাহুর পায় কাছে বসে
সে কাঁধে লাগল—সুহৃদ তার মাথার হাত রেখে...
ক্রমে তাকে জড়িয়ে কান্নার অবশেষে তাকে পড়লেন,
জানহাওয়া হয়ে পড়ে গেলেন।)

দি ইন্ডোরাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

[১৯৪৩ সালে রেজিষ্টারী কৃত]

হেড অফিস : ২, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

অমুদোদিত মূলধন	...	৮,০০,০০,০০০
বিলিকৃত ও স্বীকৃত মূলধন		৪,০০,০০,০০০
আদায়িকৃত মূলধন		২,০০,০০,০০০
সংরক্ষিত ভহবিল		১,৩৪,০০,০০০

শাখা সমূহ

ভারতে :—সকল শিল্প ও বাণিজ্য প্রধান নগর ও সহর

ব্রহ্মদেশে :—রেঙ্গুন, যৌলমিন, আকিয়াব, মান্দালয়, বেসিন

যুক্তরাজ্যে :—লণ্ডন

পাকিস্তানে :—চট্ট করাচী

মালয়ে :—সিঙ্গাপুর, পেনাং, কুয়ালালামপুর

তাছাড়া :—হংকং

এজেন্ট

পৃথিবীর সমস্ত দেশে—ইউরোপ আমেরিকা, আফ্রিকা এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া।

ব্যবসায় ও ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্যাবলী :—

এই ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ, অমুদোদিত জামিনের পরিবর্তে দানদান, বিল
খরিদ, ড্রাক্ট দান ও তারে টাকা প্রেরণের ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়
সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করে। আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক শাখা সমূহ এবং
পৃথিবীব্যাপী ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ব্যাঙ্ক সর্ববিধ ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্য
সম্পাদনের সুযোগ দান করে।

জি, ডি, বিড়লা

চেয়ারম্যান

এস, টি, সদাশিবল

জেনারেল ম্যানেজার

১ রং

২ রং

৩ রং

পাঁচ  মিনালী রংয়ের
নিখুঁত স্লোকের জন্যে

স্ট্যা  বোর্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

১, রমা নাথ মজুমদার স্ট্রীট: কলিকাতা-৯

টেলিফোন: ৩৪-১৩৬১

কথিত গল্প

যাবার কথা শ্রীকৃষ্ণদরশন মল্লিক

আমি পুরী একসুপ্ৰেন্সেডেই চেপে
সটান চাষি উঠতে স্বপ্ন ঘায়ে,
তোমরা কথা তও গুয়েটিং ক্রমে
ধিক্ ধিকিয়ে এসো প্যাংকজারে ।
ঘেয়ার তরৌব আশার বসে থাক।
নিরাশ গীথে পায়েব ঘাটে ভাই,
কোনো ক্রমেই পারব না ক আমি
আনো তেমন খেঁও আমার নেই ।
শুক বোটার নীর্ণ বাসি সুল
অতীত শোভার দেখুক গে স্বপন ।
চাইনে আমি জীবন জীবন লয়ে
করতে সুখের ছুঁবের গ্লোম্বন ।
উৎসব তোম লাল হ'ল যদি
চলুক বিধার বিসর্জনের পালা,
কেন সেধার হীন অভিধির বেগে
পথের ঘারে পাত্তে থাকো থালা ।
পক্ষ-হারা স্বর্ণ প্রজাপতি
সামবে কেন লাল করবীর মাথে ?
ভগ্ন-পলা কোকিল উড়ে বাবে
বসন্ত তার খেই বেশেতে ডাকে ।

যাবার মলিন তাস তেঁজে কি মনে ?
শেষ হয়েছে শেষই বউক বাজি'
আব্বী খোড়া খোড় হৌড়ের শেষে—
পিঁজরা পেলে স্বাক্ষর নখে বাজি ।
গুজরিয়া পতঙ্গবৎ বিবে
জগ জগিয়ে চলে যে চাই যেতে ।
মৌমাছি হার ইপপাতালে তরে
পারবে নাকো বাসি সাঙ খেতে ।
মেবার ঘাছা নিয়েছি কোম দিন
ঘোবার ঘাছা এখন আমি খোঁজো,
ভাঙলো আসব সাংকর পোষাক ছেড়ে—
নিজা যাযো যেমনি আমি মোবো ।
বাঁধবার ওই পান কোঁড়ির মত
নয় কো ভাঙো ডোবার অভিন্নর ।
জুয়ে বরি ডোবার মত ডোবো
সমান মদুর অস্ত ও উৎসর ।
যাছি যাবার সার্থকতা নাই—
যাবে চল, বইতে চাপ তো বহ ।
জলা নিভা বরং সূরা যায়,
খোঁজাইবার জুগ্ধ হুবিবহ ।

কালের গতি

শ্রীহরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ

মধুনা বাগদৌল—নবীন বোধনে

উজল করিয়া কৌণ জীবনের আলো,

সর্ব্ব স্বপ্নিয়া বা'রা বাসিয়াছে ভালো,

তাহার ধ'রিত্য যায় বাসিব কেমনে ।

হেতু-তাপে বিটপীর সিঁদ্ধ ছায়া সম

বেধেছিল ঘেরি ঘারা মেঘের আড়ালে,

ভবিষ্যতে লুপ্ত বৃষ্টি হর কালে কালে ;

একে একে চলি' যায় বত প্রিয়তম ।

ঘটিল রহস্ত আত্মা বৃত্তিতে না পারি,

কাল ঘাঘা সত্য ছিল আনিকে স্থপন ।

অচেনা আবার হয় নিকট আপন,

হাসি পায় সম্মাধনে "তুমি যে আমারি" ।

অলক্ষ্যে বসিয়া সখা খেলাইছ বেশ,

বেলিতে বেলিতে দ্রাষ্টা রিক্ত অবশেষ ।

এই কলকাতা

সিন্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

একটি তৃপ্তির রাত ব্যাবার এইখানে আসে

প্রতিবারই ফিরে যায় ব্যাবারি পার্শ্বের আশাতে

ব্যাবার নেমে আসে কুশীতল বিড় তরুণদ্বারা,

প্রতিবারই যুছে যায় হিবিবরী আকাংক্ষার ঘোরে ।

এখানে আকাশে ওড়ে ব্যততায় রূপ কত চলি,

জন্মি না কখনো কোনো মেহে-গানে সুবর কাকলি

সবলরেখার মতো ডালে ফোটে রক্ত স্বর্ধবুখী

কোমল কুঁড়ির লুকে ওড়ে নাকো মধুপায়ী অলি ।

একটি তৃপ্তির রাত তবু যেখি উড়ে উড়ে আসে ।

কাহন আমার খাতা ভরে থাকে প্রেমের কবিতা

সে তো আর জানেনা যে, আমি এক শহুরে কেরানী

কামে কানে বলে বেয়—ছেড়ে যাও এই কলকাতা ।

আত্মনি

বিবেককুমার রায়

তুমি কি বলবে কথা, আমকে বিকেলে

চাপাখাখা রক্ত মাধে স্বর্ধের আলোর,

চারদিকে বেন কি আশাস বাণী ফোটে,

হু'হাতে আমকে তুমি খুলে এসো ঘোর ।

এখানে পা কোলা যদি ঘেঁষবে বা এ সবুজ ভূমি

তোমারি আসন, এসো তুমি ।

তুমি আজ দুয়ে কেন, বনের হরিণ

তোমার নিকটে কেন হরিণ মনের,

সময় হ'য়েছে বৃষ্টি, একবার এসে

মেঘাও মধুর দীপা চাকচর্যের ।

এখানে পা কোলা যদি ঘেঁষবে বা এ মবীন ভূমি

তোমারি আসন, এসো তুমি ।

এ নতুন ভূমিতে কি বেধেছে। কুলের

কি মধুর সমারোহ ? কেনন বাহার,

ক্রিসেনবিমায় আর মালতীর কলি

তুমি কি জানো না এই সকলি তোমার ।

হু'হাতে গঠন খোলা, ঘেঁষবে এ দ্বন্দ্বভূমি

তোমারি আসন, এসো তুমি ।

একটি অলস অপরাহ্ন

অশোক মৃণোসাধার

নদীর ধারে বসে আছি
 মধ্যমলের মত নবম বাসের ওপর,
 সামনে ছড়ানো রয়েছে মেঘনার নীল জল ।
 দু'বে—বিজল গাছের ফাঁকে
 সূর্য ফিকে হয়ে আসছে ।
 এপার থেকে পৃথিবী ডাকিয়ে তা যেখানে
 আবছা করুণ চোখে ।
 চেউ ছোট ছোট কটি চেউ উঠল নদীর বুকে
 এপার থেকে ওপার বয়ে গেল দে কল্পন,
 তারপর মিলিয়ে গেল বীরে বীরে
 সুবতী নারীর বেহে ভক্তিয়ার মত ।
 দু'বে একটা ছোট ডিকি
 চেউয়ের সাথে পাক খেল ক'বার ।
 এই বাত, ডুবে গেল বৃষ্টি
 কুহবাসে ডাকিয়ে বইলুম সে বিকে ।
 না—বৈঠে পেছে
 আবার ভেসে উঠেছে চেউয়ের তালে তালে ।
 ওপারের চরের শুঁড়ে। শুঁড়ে বালি
 হাওয়ায় উড়ছে
 তারই ফাঁকে চোখে পড়ছে সারি সারি বহুতলা,
 ওরা গাছানো রয়েছে ছাপার অক্ষরের মত ফিটকাট ।

খড়ের চালে সাউ-কুমড়ার লতা
 লক্ষ্য হাওয়ায় কাঁপছে,
 কাঁপছে থব থব করে—
 যেন স্মরণ একটি ছিমছাম গীতিকবিতা ।
 অনেক নুবে তালতলার ঠিমার মিলিয়ে গেল বীরে বীরে,
 তার বাঁশ্বির লব্ধ শোনা যাচ্ছে এখনও ।
 ঠিমারের ব্যারান্সর এনে পাড়াল একটি মেয়ে ।
 তার আকাশী রক্তের শাড়ীর আঁচল ঘূরুর করে উড়ছে
 এক ঝাঁক নীলবস্ত্রা প্রজাপতির মত ।
 বিকেলের রাত্তা রোহ পড়েছে তার চোখেবুনে,
 হঠাৎ বৃষ্টি তা সহিতে পারলে না—চোখ বুজলো ।
 অপলক হয়ে চেয়ে বইলুম,
 চোখ অব্যর্থ শাসন মানলে না
 শিল্পী নাই বা হলুম
 মনের ইজেল তো আছে,
 তাতে পড়লই বা ক'টি আঁচড় ।
 ঠিমারটা বীরে বীরে মিলিয়ে গেল বৃষ্টির আড়ালে
 একটি শাখা। বিন্দুর মত ।
 আমারও মনের মাঝে ঘনিজে এসে একটি কবিতার জোয়ার ।
 এই মুহূর্তে মনে হোল
 পৃথিবী গোল না হয়ে সমতলও তো হতে পারত ।

এই পৃথিবীতে

সমতলুয়ার নিত্য

আমি আনি, স্রাস্তি মেখে যদি আনি ফিরে,
 নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাব স্বপ্নময় নীড়ে,—
 নীড়হুঁ মন পাবে; তাই নিরন্তর
 ছুটে যেতে হুঁলে পাই অক্লান্ত অন্তর ।
 ঘাটির মাথাকে ছেড়ে, শিশিরের স্বপ্নজালে ছিঁড়ে,
 তোবের বোকাবুবে মেখে অনাথাসে হাওয়ায় গভীরে

মিশে যেতে ভয় নেই; প্রবলতা জলে এই মনে :
 আবার স্রাস্তির নীলে তোমার পংম স্পর্শ তোমাকে গোপনে
 নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবে শিশিরের স্বপ্নমংগুতো,
 আবার আত্মীয় হবে এই মাটি ধুলো ।
 আমি আনি, নীড় আছে, নীড়হুঁ একখানি মন
 আমার কল্যাণ চায়, আমাকেও চায় অহঙ্কণ ;

আমার চলার পথে ঝেপে থাকে প্রবলতা, একটি ছব্ব,

আমি তাই গভীর, এমন নির্ভয় ।

দ্বিবাঞ্চে

আদোয়ার হোসেন

বিহবেব ক্রান্ত পক্ষে সন্ধ্যা নেমঃ আসে বীরে বীরে ।
 ফিলমিল করে বোম্ব সন্ধ্যারাগে তালতরু নিরে ।
 বসি একা নদীতুলে চেয়ে আছি উল্লাস নয়নে—
 তবছিনী ছন্দে ছন্দে যায় নখে কুলুকুলু বনে ।
 দ্বিপক্ষে অরুণা প্রান্তে দ্বিবাঞ্চেব স্বর্গ পড়ে বেলি,
 নদীতুলে লাক্ষ্যরাসে বহি হাসে লক্ষ পক্ষ মেলি ;
 মনেতে সংশয় কাণে হেরি তবি স্রোতছিনী জলে—
 দ্বিপক্ষে কী নদী বন্ধে বিন-মণি যায় অন্তঃতলে !
 বিলাসী বাতাস বহে, বাশি বাজে বাবলার বনে,
 কত না সুলের গন্ধ ভেসে আসে প্রশান্ত পবনে ।
 বিপুল পুলক আসে তেহঃ মনে সখীর হিল্লোলে,
 পক্ষ মেলি ছায়া নামে চূপি চূপি বনানীর কোলে ।
 ক্ষুব্ধে ব্যক্তিছে বাশি ভেসে আসে পূববীর অর ।
 বনানীর বন্ধ তেহি গায়ে পিক পাণির মধুর ।
 পুষ্প তুলে হেসে তুলে গোষ্ঠে গাভী যায় হলে হলে,
 বাশবিতে বহি' তান কুল বনে বাখালেন্দা চলে ।

নদীতটে পথপ্রান্তে কর্তৃত্ব কত না পথিক
 নীংবে পারের আশে খেয়া-ঘাটে ধাঁড়ায় কথিক ;
 কেহ কাঁধে কেহ হাসে ছুঁয়ে শ্রুৎ বহি' খেয়া-ঘাটে
 কেহ কিংব বিজ্ঞ হস্তে কেহ তুলি পূর্ণ করি হাটে ।
 ছায়াছত্র কুজমাঝে ফিল্মি ডাকে মাগলতা অরে,
 বালুচের বন্ধ চিরি' চকচকি ডাকিছেছে হুরে ।
 নতস্থলে ভেসে যায় ফিলিমিলি বালাকাব মালা,
 কত না পাখির ডাকে নিরন্তর আসে বনবালা ।
 ঝড়বনে মস্ত ব্যার কত কথা হ'লো কানাকাশি,
 নামিল ভাপনী সন্ধ্যা বহুস্তর আবরণ টানি ।
 ও-পারের বার্তা লয়ে পূর্বপ্রান্তে সন্ধ্যাতারা আপে,
 ধরে ধরে বহু জ্বলে স্তম্ভিকার হীপ অম্মরণে ;—
 অনীহের সাথে হ'লো সন্ন্যাসের নীরব মিলন,
 মহা মৌন শাস্তি মাঝে কি সুন্দর সন্ধ্যা আগমন ।
 শান্ত সৌম্য সন্ধ্যা যেন আশ্বিনে কি আমার জীবনে,
 অন্তর্যগে নিশিগন্ধা লাগিবে কি সন্ধ্যা সন্ধ্যারণে ।

বিকেলের মন

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

বিকলে বাগানে মিটি বাতাবী লেবুর তুলে

কাণ্ডন বাতালে মেশা জ্ঞান,

দ্বাগ নিয়ে গাড়া ভাঙ আনাধের প্রাণ ;

‘আমরা বাগানে বাই, চল চল’ বসি ।

কেন জানি সে কথায় দায় বেলে নাই

তবু তাই আমি তো হাঁপাই ।

চামেলি চায়ের কাপে পোনালী আকাশ বোঝে

মিটি মিটি গোষ কুন্ডি বোঝে ;

আমরা বাগানে বাই, চল, চল’ তবু আমি বলি ।

আমরা বাগানে বাই বিকেলের শেষ

আকাশের বুক ববে একে একে তারারাই মেশে,

বাতাসে তখন পাই গাঢ় জ্ঞান বাতাবী লেবুর

আনাধের জ্বরের কানার প্রচুর ।

আমরা বাগানে বাই এর জ্ঞানে বেতে

নির্জনের আনাধের মনটুকু পেতে ;

‘আমরা বাগানে বাই চল, চল, তাই আমি বলি

মনের চামেলি নিয়ে বাগানের চামেলির কলি

মিশে যেতে বুক বুক হাসের সবুজে

আরো আরো চিনে মন বুঝে ।

চীনের প্রাচীর ঘেরা এ-ঘরে ও-ঘরে

সে জীবন ছেড়ে কিংব বিকেলের শেষে এগে শবে

একটুকু ক্রান্তিহীন শান্তি শিখরণ

শিরায় শিরায় নিয়ে আনাধের এ পথচারণ ;

আর মর চল, চল, কোনোকি সন্ধ্যার নীল এ বাগানে বাই

দুঃখে কুঞ্জে নিশে বুক ভরা হাঁপের হায়াই ।

সদয়বাবুর সংসার

নগেন দত্ত

সদয়বাবুর সেদিনের কথা মনে পড়ল। মনে হয় চেনা দিনগুলো মাঝে-মাঝে কাছে এসে উঁকিঝুঁকি মারে, পরিচিত সুরের কথা কয়। অবশিষ্ট সূত্রেব আভকের বাত সেদিনের তা ছিলনা। সেদিনের কথাগুলো আঁকে আরো অনেক বেশী ইঙ্গিত নিয়ে আসে। কাল ধরে এমনিই মাধুরিমা টুক-ঝালমিষ্টি কথাগুলো, কটকিট স্বভিভুলো কোন এক অবচেতনতার অঙ্ককারে বাস করে। সূত্রেব মাধুরী ছড়ায় বর্তমানের চকস চেতনার মাঝে। এই সেদিনও মনে করতে মন দিউরে উঠত, আজ বেন তা অবলীলাক্রমে মনের পছিতে লড়-সড় না হয়ে, বরং গরীমান হয়ে বসে। মনটাকে চাপু করে অণিক বস্তির নেশার বিকে। এ মন্ নয়। মন্ নয় বিভ্রান্তিকর ছড়াপোব ইতিহাস কালের কবর থেকে বৃদ্ধ, ককালের পর ককাল জুড়ে, জীবীন আকাহের বিকে চেয়ে থাকতে। আজ সদয়বাবুর মনে হল সে সেই ক্রপেব বিকেই ভাকিরে ধেখবে, আজ বিগত ঘটনার অঙ্কি সৎযোজন করে একটা গোটা। রূপ বিরে দেখবার মন্ত মনের ভারসাম্য সে ফিরে পেয়েছে। নদী পার হয়ে নদী-তরঙ্গের বিকে ফিরে তাকানো চলে, সদয়বাবু তাই করছেন। অন্তরেব বৃষ্টি তীক, মন শান্ত, তাই-তাই সব অপমানের কথা খতিয়ে পড়েন।

সদয়বাবু সেদিন অকসি চুকেছিলেন—তখন পকাশজন জন কেবানী ছিল। বিতীর মহাবুদ্ধের উগ্রতির পর দেখানে হয়েছে তিনশ'। এই তিনশ' কেবানী সদয়বাবুর মগৎ, এ বাবে সব মিথ্যা। তিনশ' ত্রা আর সব গগৎ মিথ্যা। তিনি এশেছিলেন বড়বাবুর বাসগুণের কেবানী হয়ে। তখনকার দিনে কেউ-কাউকে ফিরে ফাটল দেখানো বুরের কথা, ধেখতে অববি দিত না। সদয়বাবুর মনের কৌতুহল ক্রমশই বেড়ে যায়। ধেখতে হবে ফাইল, কেমন করে লিখতে সেই যোজন বাকা বিভ্রাস যা পড়ে আইমজ অববি

চিটু ধরে যায়। বড়বাবু অকসির ভীড়ের সময় শুভবড় করে কাল করেন। আর বিকস বেলায় সব কেবানীরা চলে গেলে পর মাঝা খাটির গুরুবপূর্ণ পজের মুনবিধা করেন। সদয়বাবু মিনের পর দিন তাই লক্ষ্য করে বাস। তার মনেও কৌতুহল বাড়ে। সবাই চলে গেলে পর সাধেব বড়বাবুকে ডাকেন। বড়বাবুতে সাধেবে কি আলাপ হয় তা ভগবান জানেন। সদয়বাবুর কৌতুহল বেন বাব মানে না। একদিন বড়বাবুর ঘরে লুকে বলেন, স্তাব, আপনার বজ্ঞ কট হচ্ছে। কিছু কাল আমাক ঘি বেনজ্ঞ...। বড়বাবু ফাইল থেকে মূখ তুলে বলেন 'কী বলছ?'

'বলছিযু কি ঘি অমুবিধা না হয় তবে আমাকে কিছু কাল বিতে পাহেন।' অতি নত্র সূত্রে সদয়বাবু বলেন।

বড়বাবু একবার সদয়বাবুর আপারমন্তক নিবীক্ষণ করে বলেন, 'কি চাই তোমার?'

এতক্ষণ বড়বাবু কাকের ঠোকেই ছিলেন। মনস্ত মিনতার কেবানীবাবুরেব বিবিধ বাবীরাগরার কথা শুনে, মূখ-মূখের কথা শুনে বড়বাবু অনেকটা স্থির করে নিঃ-ছেন যে, কেবানী মাঝে মূখিবার বাবী ছাড়া আর কোন বাবী নেই। একটু চোক গিলে বলেন, 'বাবা তোমাকে আমি কি কাল ধেবো। কোম্পানীর কামজ করছই।'

'আজ্ঞে না আপনার অনেক অমুবিধা হয়...'

'তার তার জুমি লাগব কংবে? সে হয় না।'

বড়বাবু একটা নিঃসং ফেলে বলেন। 'একটা ছেলেকে কালে তৈরী করতে পারলুম না। যাও বাবা এখন অনেক কাল। কখন বাড়ি ফিরে আসি না।' বলে বড়বাবু আবার কাজের মধ্যে জুব গেলেন।

সদয়বাবু বাড়ি ফিরলেন আরো অনেক বেশী কৌতুহল নিয়ে।

প্রিরবশিনী সন্ত্যাতার একা ঘরে সন্তান নেই। আকেপটা তার বরমর ঘুরে বেড়াচ্ছে! বেশ বেশ

এসে অবধি সন্ধ্যাতারার দাবীটা বেড়েই যাচ্ছে।
 আখিনা কোন অজ্ঞাতে কারণে হঠাৎ সন্ধ্যাবাবু এই
 দাবীর পিছির দিকে ঘোঁরাছুটি নজর দিয়ে যাচ্ছেন।
 দাবীর মাত্রা বৃদ্ধির ভয় তিনি করেন না কারণ আগলে
 সপাটে একটি মাত্র মানুষ। কত আর দাবী করবে।
 সন্ধ্যাবাবু এমন কি করে তেবেই সন্ধ্যাতারার দাবীবাণ্ডার
 প্রতি অনেকটা বাৎসল্য রূপের বুট্টি দিয়ে থাকেন।
 আর একটা ঔষাসীক বোঝে-বোঝে মনের পংক্তে লব্ধে
 থাকে। এই সজ্জিত ঔষাসীকই সন্ধ্যাতারার জীবনে
 বোকা বলে মনে হয়। সে চায় যে-কোন প্রকারে হোক
 ঔষাসীকের প্রভাব থেকে মুক্তি। অক্লিস-বাসা-অক্লিস-আর
 কাইল—এ কি বকম হচ্ছে গো। এর বাইরে কি কিছু
 নেই। নিশ্চয় আছে, তবে সেটা সন্ধ্যাবাবুর প্রয়োজনের
 বাইরে। সবাই একই বস্ততে হস পাণ্ডে—এমনকি হয় না।
 এ কথাটাই সন্ধ্যাতারা ঘোরের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে। সব
 ব্যবহারের সম্বন্ধ থাকে না, সব ব্যাপারে সবাই মাথা গলায়
 না, সব বস্ততে সবাই হস পায় না। এত জানা কথা—কিন্তু
 সন্ধ্যাবাবু বলেন, সন্ধ্যাতারা এতে রূপ করে কেন?
 সন্ধ্যাতারা নিজেই মনে আর একটা বুদ্ধি স্থির করল।
 সব পোষাকে সবাইকে মানায় না। পরিচ্ছন্ন পৌষ্যের
 মুক্ত সন্ধ্যার। বুট্টি ও মনের প্রতিপদ বস্ত্র। পৌষ্যের
 সীমানা সেখানে কেমন বেন নির্ধারিত হয়ে যায় যেখানে এই
 সন্ধ্যারের অন্তর্য বটে। সন্ধ্যাতারা প্রেরণবিনী বটে, রূপ
 বিলাসিতার তার সময় কাটে এইটে সন্ধ্যাবাবুর
 আপত্তির বড় কারণ। চর্চা করে রূপের সন্ধ্যার বটে
 তা ব্যালাঙ্গস্টেটের কোন খাতে বেঁচে হবে—সন্ধ্যাবাবুর
 জানা নেই। বহুবিন এই অপচয়ের প্রতি সন্ধ্যাতারার বুট্টি
 তিনি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু সে তা মেনেনি। সন্ধ্যা-
 তারার হেসে বলেছে, 'ব্যালাঙ্গ স্টেটের অচেনা বড় পক্ষটা
 তোমার জানা নেই। তাই তুমি অবশ্য খুঁজে বেড়াচ্ছ।'।
 সন্ধ্যাবাবু মনে-মনে এ কথাটা ভেবে নিলেও মুখ বোকার
 করেন নি।

'সংস্কার পর সন্ধ্যা সন্ধিরে বেনন দিল সন্ধ্য,
 ব্যবহারের পর ব্যবহার সন্ধিরে সন্ধ্যার সন্ধ্য, কিন্তু এটা
 না হলে সন্ধ্য।'

সন্ধ্যাতারা এর উত্তর না দিয়ে নোতুন কেনা শাড়িটা
 পরে সাংঘর্ষে এসে দাঁড়াল। একটু হেসে বললে, 'বহুবিন
 বেঁচেছি কিছু।'

সন্ধ্যাবাবু বেন নোতুন চোখে কি দেখলেন। ব্যালাঙ্গ
 স্টেটের কোন সন্ধ্যাটা বদিয়ে এমন সন্ধ্যা থেকে বেঁচেই
 পাওয়া যায়—সেটা জুলে গেলেন। বিশ্বস্তের প্রথম ঘোর
 কেটে, একটু বেহুকের মত ঘেঁষে বলেন, 'two ends
 meet করেছে বেঁচেছি।'

'না সেইটে meet করেনি।' এটা বোল তোমার
 বিদেবের জুলা।'

বাইতে কড়া নাড়ার শব্দ পেতেই সন্ধ্যাবাবু চলে
 গেলেন। একই সঙ্গে দুটা চিঠি নিয়ে ফিরে এলেন।
 একটা, ইয়া এগটা উগ্রতির প্রথম পর্বের পঞ্চমির মত মনে
 হল। বড় সাহেব কালে খুশি হয়ে একটা ব্যক্তিগত পত্র
 দিয়েছেন। চিঠির এক অংশে একটু ইঙ্গিত আছে বড়বাবুর
 সন্ধ্যারী হিসেবে তাকে কালের দায়িত্ব দেওয়া হবে।
 দ্বিতীয় পত্র খুলে সন্ধ্যাবাবু মুখ শুকিয়ে গেল। সন্ধ্যারী
 টোব থেকে বিল এসেছে।

কানন শাড়ী—৫০

মানো মানা শাড়ী—৪৫

শেষের কবিতা শাড়ী—৮০

পরে হল ঘেরী রাউল—২০

সন্ধ্যাবাবু বিলটা আর পড়লেন না। হাতে চাপা দিয়ে
 ঘরে ঢুকলেন। একটু গভীর তবু বিত বাসির বেথা
 চোঁটের ওপর ভেঙ্গে বেঁচেছে। মনটা স্থির করতে পারছেন
 না কোন ঘরটা প্রথম যেন। সন্ধ্যাতারার ব্যালাঙ্গস্টেটের
 মিলের খবর এত। নাইবা হল two ends meet
 সন্ধ্যাবাবু তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে আবার বলে পড়লেন।
 এর কিছুদিন আগে ব্যাক থেকে বা বিলাস পেয়েছেন তা
 ঘেঁষে তিনি রীতিমত চমকে উঠেছিলেন। তবু সন্ধ্যাতারাকে
 কিছু বলেননি, একটা মহাভারতীয় হুঁজুতা ও ঔষাসীকের
 জন্তই সেটা বলা হয়নি। বলব, বসব এমন দুটার বিন মনে
 করেছেন বটে, তা আবার অক্লিশের কালের তাড়ার দবা-
 রীতি জুড়ে দিয়েছেন। কেননা, অক্লিশই আর সন্ধ্যাবাবুর প্রথম,
 আর সব অপর মিথ্যা। আজকাল বড়বাবুর মুণ্ডাবিয়ার কাল

ঠাকেরই কয়েকটি হয়। সে বাধিত ভাঙ হবার পথ সমরস্বাবু
সমোর ভুলেছেন।

কোনোব একটা মক্ষ মোহ নয়। তিনশ কর্মচারীর গুপ-
কার প্রভু। সমরস্বাবুর স্বভাবে প্রভু বলগার গুপ নেই।
তিনি কর্মের দ্বারা উন্নতির সিঁড়ি পেয়েছেন। বড়বাবু
একদিন ডেকে বললেন, বাবা সমর একালগুলো একটু
সতর্ক হয়ে কবে। এর গুপের কোম্পানীর ভবিষ্যত।
বড়বাবু শান্ত নিষ্ঠাচারী সমরস্বাবুকে তার কাছে
ডেকে নিলেন। তার কায়দা সমরস্বাবুর কৌতূহল
ছিল কাণের মধ্যে। বড়বাবু বলেন, আজকাল
অনেক ছেলেই কাণের প্রতি কোন কৌতূহল
নেই। যেটুকু পেলাম সেটুকুই করে বিলাস—এব
পিছু কোন চিন্তা নেই। কাণটা যেন ব্যাক্তির বস্ত্র টেপার
মত হয়েছে। বড়বাবু কোম্পানীর সেকশনে চাকুরে।
পিতৃহত্য। মেন তার পাওয়ারা সম্পত্তি সেটুকু ঝাঁটোঘাটা করে
হিতে পারলেই তিনি খুশী হন। আর একটা আছে
স্বভাবের পরিচয়। কুলস গ্রন্থ করা চাই, এবং ভারও পুরো
উঠব চাই। বাড়ির সবাই কেমন আছে, না কেমন
আছেন। কারুর অস্থ নেই ত। এই গ্রন্থ গুনে-গুনে
নগা আনকোরা কর্মীরা চটে গিয়েছে মনে-মনে। কিন্তু
অপেক্ষাকৃত প্রবীনেরা এটা বেনে নিয়েছে—এটা বড়বাবুর
স্বভাব। বড়বাবু ডেকে বলেন বাবা সমর, কাণটা করে বিও
কল্পী। একটা কথা বলা হয় নি। সত্যিই সমরস্বাবুকে
কিছু কবত, কুৎসা কবত। বড়বাবু একদিন বেগে বলেন,
বাবা শুটা হয়। বড় হতে গেলে কিছু মাগল হিতে হয়।
মনিব যদি সন্ত হয় তবে গুতে কিছু হয় না।

নিষ্ঠাচারী সমরস্বাবু কাণের মধ্যে ভুঁব যান। এমন
নিম্ন যে সাহেব কখন এসে পেছন থেকে কাণ লক্ষ্য করে
গেছে—তা খেয়াল হয় নি। তখন সাড়ে ছটা যাবে।
বড়বাবু বলেন, বাবা সমর চল আমার সঙ্গে গাড়িতে।
পথে নাহিরে বিয়ে যাব। সমরস্বাবু কেমন বিব্রত বোধ
করেন। একটু লক্ষিত হয়ে বলেন 'না স্যার অর্থনিই যেতে
পারব।'

'না, না, তুমি চল আমার সঙ্গে,' বলে বড়বাবু একরকম
ভোর করেই সমরস্বাবুকে টেনে নিয়ে গেলেন। বহুটো

বখারোতি সত্যিই বহু ময়লা প্রচার হল। সব গুনে সমরস্বাবু
একবার সবাই দিকে ক্যান্ ক্যান্ করে তাকালেন। মনের
ভাবটা, তাইত আমার বোঝা কি? কর্মের ভগবতা ক্রমশই
বিস্তৃত বেগে সমরস্বাবুর কাছে বেগে দেয়। এতদিনে বড়-
বাবু নিশ্চিত—একটা লোকের মত লোক পাওয়া গেছে।
সমরস্বাবুর উপর নির্ভর করা চলে। এ স্বর সাহেবের
কাছেও গেছে।

সম্মাতারা বাড়ির ভাঙ ভাঙে-ভাঙে ভাবে স্বাভা-
ভার দিকে মোটেই মতব দিচ্ছেন না। আদি একা লোক
এত বড় স্ফাট বিয়ে কি কবব? শাবা বর ওহিরে
উঠতে পারি নে। বাবা, বা ঝাটনি পড়েছে।

কালকে আলমারি থেকে মশ বোড়া ভাল বাড়ি বাহাই
করে বেয়েছে। সোহের বেলা এইটে পরবে, হুপ্তে উঠা
পংবে, সম্মাত একটা গেছরা বড়ের বাড়ি পরে সমরস্বাবুকে
নিরে বেড়তে যাবে। গরনাক্তো নোভুন বেগে আবার
গড়াবে। আজকাল নানা প্যাটার্ন বেরিয়েছে। কাল সমর
বাবুকে বলে-করে সম্মাতভারকে বাজী করিয়েছে, এখানি
কালের স্ত্রি বেগে একটা কিছু করা চাই। স্ত্রির গুপে
সম্মাতারা পেছিয়ে থাকতে চায় না। সম্মাতারা আজ
কোথায় বেড়বে বলেই আয়োজন হচ্ছে। ছোট বোন
শাবা কাল মেহর করবে গেছে। শাবার পংবে বাড়িটা
তেমন গুর পছন্দ হয়নি তাই টিক করেতে কমলাপুর
থেকে একটা বাড়ি নিয়ে যাবে। বহি সন্তব হয় আর
একটা আটাইৎ বেবে। কেননা শাবার বিবাহবিধি থিব,
কলকাতার বরের বাবা এগে কাল বেগে গেছেন।
সম্মাতার বাবা এস স্বর গিরে গেছেন। হু
একদিনের মধ্যে যিন খার হবে। আজকে সেই খার যিনের
আল দিহাটা, কনে' বেগেতে ছেলে আসবে। ছেলের চিঠি
পেলেই বাপ তখা বলাবন। ঘটনাটা টিক খড়ব কীটার
মত ঘুরবে বলে অখম পাওয়া গেছে। গনেওগো একটা
স্পোর বাশার গুপে বাড়ির সম্মাতারা যংব সব
জামালা বন্ধ করে দিলে। একটা স্ত্রিন অখকার স্ত্রী করে
সবুজ বেড লাইটটা আলল শোবার বং, বেগালে টাঙানো
আরনায় সামনে ঝাড়িয়ে গমনওগো পংল। ঝংব উজ্জল
সবুজ আলোর মধ্যে সম্মাতারা নিজের বেগের স্পটা বং

বার নিরীক্ষণ করলো। মনে হয় নিজেকে শব্দের আকাশের ছোট সন্ধ্যাতারাটি। সন্ধ্যাতার গোখলি ছাড়া পড়েছে আকাশের গায়। প্রথম নীচতারা মনটা তরে উঠেছে। এমন নির্জন কক্ষে সন্ধ্যাতারাকে কেউ দেখবার নেই বলে তার মনে একটুকুও কোঁচ নেই। সন্ধ্যাতারা নিঃকণ্ঠে চেনে, নিজেকে ভালবাসে। গোন সন্ধ্যার তাকে রূপসী বলা যায় তাও সে জানে, কিছুদিন থেকে তাৎসব্ধ, সন্ধ্যাবাসুর আর ঘাই জ্ঞান থাক, রূপচর্চা বিজ্ঞান সবচেয়ে কোন জ্ঞান নেই। অর শান্ত বিজ্ঞান বটে, তাকে মন তরে না। সন্ধ্যাবাসুর বিজ্ঞান শান্ত মনে অর্থ আধারের বিজ্ঞান শান্ত। ওতে রূপ, বস, গন্ধ, স্পর্শ, কিছুই নেই। কি হবে আমার ফাইল ধরে। ওতে কি কোন অহুত্ব আছে? এদের স্পর্শ আমার মনে কোন স্পন্দন লাগে, না সন্ধ্যার আমে? শুধু সংখ্যা, সংখ্যা আর সংখ্যা। সন্ধ্যাতারা এবারে আরনার সামনে অতি নির্বিড়তম অহুত্ব নিয়ে এক রহস্যময়ী নারীর মতই ঠাঁড়াল। এ অচেনা রহস্য। এর অন্তর কোনদিন সে বের করতে পারেনি। নিষ্কল আশায় এমনিতর কোন এক স্পর্শবিধুর রহস্যময়ী অত্যাশ সন্ধ্যাবিলাসী যৌবনকে আরাধনা করেছে সে। এমনত কেউ নেই যে এই রহস্যের সন্ধানের সন্ধ্যারতা করে? এমন জন আমার কে আছে, যে নির্বিড়তম সান্ত্বিত্যে জীবনের রস খুঁজে বেড়ায়? সন্ধ্যাবাসুর সংখ্যা নিয়েই সন্ধ্যা। তার সামনে গৌরীপূজ বড়বাসুর চেয়ার। হরত পাবেম-ও তিনি সেই চেয়ারে কিছ সেদিন আমি কি হব? বিলাসী যৌবনের ভয় সম্পত্তি বই কিছুই নয়। মাঝার ঝাঁচল-ঘেরা শাড়ি ছাপিয়ে সেদিন রূপোর ভারের মত সাধা চুলগুলো বেড়িয়ে পড়বে। যদি অতদিন বৈতে থাকতে হয়? না, না, যেহেতু ঝাঁচার মনের দুয়ার আগে দুহা চাই। সন্ধ্যা নিজের চোখ বুটো আরনার প্রতিফলিত হতেই সন্ধ্যাতারা আঁতকে উঠল। এ অন্ধকার-বেগা সপুষ্ট আলোর মধ্যে নিজের এমন নৃত্তি কি করে সম্ভব হল!

একটা খিলানসুতার মারকতা সন্ধ্যাতারাকে চোখে-বুটে উঠল। সে চাহনিতে স্বপ্ন নেই, শোণ্ডপতির আবেছা আবরণ ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে আর একবার আরনার সামনে ঠাঁড়িয়ে সেই সবুজ আলোর মাঝে নিজেকে চেনবার চেষ্টা করল। কই এত সে নয়—যেন তার ব্যাধ চিত্রের অকল্প নৃত্তি তার চোখের সামনে এসে ঠাঁড়াল। না, না, আর কেউ হবে। হুঁ পা গেঁছিয়ে এনে নিজের শাড়ির

ঝাঁচল বেশ ভাল করে সানিয়ে-সুছিয়ে আরনার সামনে ঠাঁড়াল। কোথা থেকে কেমন একটা প্রেতলোকের ছাড়া এসে তার সমগ্র দেহ ছেয়ে কেলল। আরনার ভারই প্রতিকলন দেখেই সন্ধ্যাতারা চাঁৎকার করে উঠল। আর। নিম্ভত ঘরের আলো। যৌবন স্তরের সাক্ষীবহন করে ঠাঁড়িয়ে আছে। কান্তর ভাস-মন্ডের সে ভাগীদার নয়। আচ্ছ এই দুহুর্ন্তে সন্ধ্যাতারার আতঙ্করূপ চোতনার সাক্ষী হবে কে? সন্ধ্যাতারা কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে থাকল। অন্ধকার এমন ছবি আঁকতে পারে কে জানত?

—সেই আরনার দেহা বিলাসমত্ত ক্রুর বৃত্তি, ভয়াল চাহনির ভক্তা, যেন শত ঈজিতে সন্ধ্যাতারাকে ব্যাল করছে, বিক্রপ করছে, বিক্রপের কৌতংগন সন্ধ্যাতারার মনে আঙন বহিয়ে দেয়। সে উদ্ভাটের দ্যত ভুটে গিয়ে আরনার মাথা টুকল।

নিত্যাবিন্যাসের মত বড়বাসুর গাড়ি সন্ধ্যাবাসুরে বাসায় মানিয়ে দিয়ে যায়। অতি দীর্ঘে ক্রান্ত পায়ে এনে বোতালার ফ্লাটের সামনে ঠাঁড়ালেন সন্ধ্যাবাসু।

ডাকলেন, সন্ধ্যা।

তার পবে হুঁ চড়িয়ে আবার ডাকলেন, 'সন্ধ্যা।'

'সন্ধ্যা, সন্ধ্যা' বলে ক্রত তালের হুঁরে অবিগম ডাকতে লাগলেন। তারপর আতঙ্ক তীর হয়ে চাঁৎকার করে ডাকলেন, কড়া নাকুলেন। পানের ফ্লাটের অবিলাসীরা কৌতুকময়ী প্রর করল 'কি হল।

'কি জানি' বলে সন্ধ্যাবাসু সন্ধ্যাবে এক বুকম বিলাসের মতই ধরবার লাগি মারলেন। লম্ভত ঘরের অন্ধকার যেন কী এক ভয়াবহ ছন্দ নিয়ে বেগা বিল সন্ধ্যাবাসুর কাছে। সন্ধ্যাবাসু তরে আঁতকে উঠলেন। ভুটে শোবার ঘরে গেলেন। মাত্র একটি সাক্ষী সেই রান সবুজ আলোটি, তখনও ডেমনি জলছে।

সন্ধ্যা। এঁয়া!

যেহে থেকে সন্ধ্যার অচেনতম দেহটা ভুলে বিধানের বাগলেন সন্ধ্যাবাসু। তার দেহ ঝাঁপছে, সন্ধ্যার অল সন্ধ্যার আভরণের উদ্ভাস উপছে পড়ছে। কপাল কেটে তখনও বস্ত স্বয়ছিল। পাশে ব্যাঙের খোলা চিঠিটা পড়েছিল বিধানের গুপব—এক পরশা সেই ব্যাঙে, দগ্ন বস্তম।

সন্ধ্যাবাসু বেশ হঠাৎ একটা স্বভাব নিষাদ ফেললেন।
আঃ।

ঐশ্বরবতী প্রেস লিমিটেড ৩২ নং অপর সাহুলার রোড হইতে প্রিন্সম্বর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং

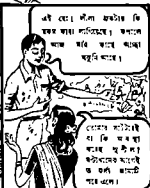
'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২ নং অপর সাহুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা

বাড়ির কী হাঙ্গামাই না হ'ত
আগে।



সকলকে। এখন যদি
আমি ও বাবা কি কি
করতে পারি।



এই যে। লীলা খড়কাই কি
করতে পারে। লীলাকে। কখনো
আমি যদি ওর কাছে
যাই।

কোনো লীলাই
বা কি ওর কাছে
যাই। লীলা
কখনোকে আমায়
ও ওর কাছে
যাই।



বাড়িতে কি আর হয়েছে। বাড়ি বেগুন
ও কুমড়া একটা কাটা লাগবেই। জ্যাখোঁ
লাগান আমায় দেখো কেননাইশুই
করতে পারি। আর লীলা একটা লাগবে
কত (দেই) না লাগতে পারে।

অ্যাস্কো

বায় 3 ট্যাবলেট



কম খরচ চুপচুপে পরিচালিত হয়

এসিমাটিক সোল সোল
কলিকাতা



ASCO

আপনার
রক্তনোপকরণে
যে পুষ্টি
ডান

হনুমান

বনস্পতি



'এ' এবং 'ডি' ভিটামিন দ্বারা সমৃদ্ধ

বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আপনার সুস্থিতির জন্য
৪ পাঃ এবং ১০ পাঃ টিনে
প্যাক করা। ০৬ পাঃ টিনেও
প্যাক করা।

সুখাদ্যই সুখ ও

স্বাচ্ছন্দ্যের উপাদান

এরত কারক
ব্রোমো ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

সাত কিলো ইণ্ডাস্ট্রিজ

ভালমিহানপুর, বিহার

19, BHV 2/3



একত্রিংশ বর্ষ

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩

অষ্টম সংখ্যা

গীতা ও কর্ম সাধনা

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমান চৌধুরী

ভারত-দর্শনমার ঐতিহ্যগতগীতা ভারতীয় সাধন-তত্ত্বের উজ্জলতম মণি-রত্ন। "সাধনা" কি? মন-ব-জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বা "সাধা" লাভের উপায়কেই বলা হয় "সাধনা"। এই সাধা হ'ল "মোক বা মুক্তি"। আমাদের সংস্কর্ষ জীবনভাষ্য থেকে মুক্তি এবং প্রকৃত জ্ঞানসত্তার বিকাশ লাভ হল "মোক বা মুক্তি"। এই মোকসাধনের মূল শাস্ত্র সাধনত্রয় বা ত্রিবিধ: জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম—এই তিনটি প্রধান সাধনা বা মার্গের বিধান দান করেছেন। বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে এই তিনটির মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমগ্রদর্শন গীতার জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—এই তিনটিই বিষয় বিশেষ ভাবে এবং সমান গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। সেজন্য অনেকের মতে, উপাস্তম, পার্বজনীন বুদ্ধিভাজীমূল্য এই অমৃত-গ্রন্থ পৃথিবীর সকলের মস্তিষ্কই সমান চিন্তা করে, সকলের মস্তিষ্কই তাদের মস্তিষ্ক ও প্রকৃতি ভেদে, বিবিধ মোকোপায়ের বিধান দিয়েছেন, যাতে মুক্তির অমল, অমৃত পথ থেকে একজনও বাধা না পান। কিন্তু, পুনরায় অন্তরের মতে, প্রথমে একজন পৃথক পৃথক ভাবে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের বিধান দিলেও, গীতা শেষ অধ্যায়ের প্রায় শেষ দিকে শুদ্ধাৎ শুদ্ধতম, "সর্বভূতময়" যে "পরমঃ বস:"

বলেছেন, সেই বাণীই ঐতিহ্যগতের প্রকৃত বাণী, সেই তত্ত্বই গীতার প্রকৃত তত্ত্ব—"প্রপত্তি—তত্ত্ব" মন্ত সাধন পরিভাষ্য করে ঐতিহ্যগত মিশ্রণের আচ্ছন্নবেশ—তত্ত্ব।

কিন্তু গীতার মূল তত্ত্ব সংক্ষেপে এইভাবে বহু বিভিন্ন মন্তার ব্যাখ্যায়, একটী বিষয়ে সকলে একমত যে যে গীতায় কর্মসাধনা বা নিরাম কর্মের মহিমা বেরপ উজ্জলতম ভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, অগ্রত কোথাও সন্দেহ নয়। এই গ্রন্থে, স্বভাবতই সকাল কর্মের প্রসঙ্গও উঠে। প্রসঙ্গ হল এই যে, যেকোন কর্মকাণ্ডে স্বর্গীয় লাভের উপায়স্বরূপ, ব্যাপকতা বি সকাল কর্ম সম্প্রদায়ের বিধান দেওয়া আছে। সেজন্য, সকল-কর্ম মোক্ষেরও সাধন কি না—এই প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে। এই কারণেই নিরাম-কর্মের বিষয়-সুস্থিতি যে গ্রন্থে একজন উপাস্তম স্থানে সমন্বিত হয়ে উঠেছে, সেই গ্রন্থে সকাল-কর্ম যে স্বর্গীয় থেকে পরিভাষ্য, তা প্রমাণ করা অবশ্য প্রয়োজন। সুতরাং, গীতায় সর্বত্রই একই সঙ্গে, একদিকে নিরাম-কর্মের অমূল্য মৌল্য এবং অন্যদিকে সকাল-কর্মের সন্তোষিত গুরুত্ব ও ব্যর্থতার বিষয় স্পষ্ট স্বপ্নর ভাবে বলা হয়েছে। গীতার সকাল-কর্ম সংক্ষেপে কি

নির্দেশ করা হয়েছে, সেই বিষয়েই সামান্য দু'একটা কথা-
মাত্র বলবার প্রয়োজ্য। করব শব্দ বোঝানুযায়ী।

ভারত দর্শন মার **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার** অত্যাশ্চর্য্য ভাবে
শব্দর কৰ্ম সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। শ্রীতা-
ভাষ্যোপক্রমণিকাতে তিনি সাধারণ নিয়মসমূহের, শ্রীতা-
শাস্ত্রাবলম্বের প্রয়োজন সম্বন্ধে বর্ণনা করে, বলেছেন :—

“তত্ত্বাত্মা শ্রীতা-শাস্ত্রস্ত সংক্ষেপতঃ প্রয়োজনং পরং

নিম্নোক্তসং সাহেতুকস্ত সংসারস্ত অত্যন্তোপশম-লভনং ।

তচ্চ সৰ্ব-কৰ্ম-সম্পাদ-পূৰ্ব্বকাল্ আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠাক্রমাদুৎকৰ্ণং ।

ভবতি ।”

অর্থাৎ, সংক্ষেপ বলতে গেলে বলা চলে যে, এই শ্রীতা-
শাস্ত্রের “প্রয়োজন” বা উদ্দেশ্য হল, সংসার ও তার কারণের
শাস্ত্র নিবৃত্তিরূপ পরম মোক্ষ। সৰ্বকৰ্মত্যাগপূর্বক আত্ম-
জ্ঞাননিষ্ঠা আশ্রয় করলে, এই মোক্ষ লাভ হয়।

এখানে, এখানেই শব্দর বলে নিচ্ছেন যে, কৰ্মত্যাগ মোক্ষের
অত্যাবশ্যক সূত্র। সেজন্য, সেই কৰ্মই পুনরায় মোক্ষ-সাধন
হতে পারে না, তা’ত বলাই বাহুল্য।

কৰ্মত্যাগ বা “মুখ্যম” আত্ম-জ্ঞান বা মোক্ষের অত্যাবশ্যক
সূত্র কেন?—এই প্রশ্নের উত্তরে শব্দর অত্যন্ত স্থানীয় ভাষা
শ্রীতা ভাষ্যেও ব্যবহার বলেছেন যে, জ্ঞান ও কৰ্ম সৰ্ববিধ
থেকেই পরম্পর-বিরোধী, যেহেতু জ্ঞান অজ্ঞেয়বৃত্তক, কৰ্ম
জ্ঞেয়বৃত্তক। এই বিরোধ স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য, শ্রীতা-
ভাষ্যের এক স্থলে শব্দর দুটা সুন্দর উপমা দিয়েছেন।
তা, হল এই :—

(শ্রীতা-ভাষ্য ১৮—৪৫)

যিনি পূৰ্ব-সমুদ্রে যেতে ইচ্ছা করেন, তাঁর সঙ্গে বিপরীত
দিকে, পশ্চিম সমুদ্রে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তির এক পথে যাওয়া
সম্ভবপর নয়। আত্মা বিষয়ে নিরন্তর জ্ঞান-প্রবাহ অব্যাহত
রাখার জন্য প্রচেষ্টা করাই হল “জ্ঞান নিষ্ঠা”। এজন্য
জ্ঞান-নিষ্ঠাই পশ্চিম-সমুদ্র-গমন-তুল্য। সেজন্য, পূৰ্ব-সমুদ্র-
গমন-তুল্য কৰ্মের সঙ্গে তার সম্ভাব্যত্ব অসম্ভব। এই
কারণে, তত্ত্ববিদগণ সকলেই বলেন যে, পৰ্বত ও সর্পের
মধ্যে যে প্রত্যেক ও বিরোধ, জ্ঞান ও কৰ্মের মধ্যে ঠিক তাই।
এইভাবে, পশ্চিম সমুদ্র ও পূৰ্ব সমুদ্র, পৰ্বত ও সর্পের মধ্যে

যে কলীভূত প্রত্যেক, ও বৈপরীত্য ও বিরোধ, জ্ঞান ও কৰ্মের
মধ্যেও ঠিক তাই।

আরেকটা কারণে নির্দেশ করে, শব্দর বলেছেন যে,
“শোক-মোহাবিহী” দুঃখের সংসারের মূল। এই শোক-
মোহাবির দ্বারা জীবের বিবেক-জ্ঞান আবৃত হয়ে যায়, এবং
সেজন্য সে বর্ষ্য পরিত্যাগ ও পরমর্ষ গ্রহণে উত্তর হয়—
যেমন, অজ্ঞান বর্ষ্য বৃদ্ধ পরিত্যাগ করে, পরমর্ষ ভিক্ষা
গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এমন কি, শোক-মোহাবির
প্রভাবে, বর্ষ্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণও, সন্ধ্যাকালে, সাংসারের কৰ্মে
প্রবৃত্ত হয়। এজন্য, সন্ধ্যা ও সাংসার কৰ্মের ফলে বর্ষ ও
অপর্ষ বৃদ্ধি পায়, বর্ষ ও অপর্ষের ফলে ইষ্ট ও অনিষ্টের সৃষ্টি
হয়, ইষ্ট ও অনিষ্টের ফলে সুখ ও দুঃখের প্রাপ্তি হয়—এবং
এই ত হল “সংসার” এজন্য “সংসারের” নিবৃত্তি নেই।

“অতঃ সংসার-বীজ-ভূতৌ শোক-মোহৌ, তয়োক্ত সৰ্ব-
কৰ্ম-সংস্তোমপূৰ্ব্বকং আত্মজ্ঞানং নাশ্ততো নিবৃত্তিঃ ।”

(শ্রীতা-ভাষ্যাবতংগক, দ্বিতীয় অধ্যায়)

সেজন্যই, শোক-মোহই সংসারের বীজ-বহন। সৰ্ব-
কৰ্ম-ত্যাগ পূর্বক আত্মজ্ঞান-লাভ ব্যতীত, এই দুটোর নিবৃত্তি
হয় না।

এ কারণে শ্রীতা-শেষে, অষ্টোদশ অধ্যায়ে তিনি “নৈকৰ্ম্য-
সিদ্ধিকেই” সকল সাধনার চরম ও পরম লক্ষ্যরূপে গ্রহণ
করেছেন। বলায় গীতাই এখানে বলেছেন :—

“অসক্ত বুদ্ধিঃ সৰ্বত্র বিত্তাস্তা বিপদত-স্পৃহঃ ।

নৈকৰ্ম্য-সিদ্ধিঃ পরমাং সম্যাসেনাবিগম্বতী ।”

(গীতা ১৮—৪২)

অর্থাৎ, সৰ্বত্র অনাগন্তদুঃখ, বিতেজস্র, নিস্পৃহ
ব্যক্তির সম্যাসের দ্বারা পরম নৈকৰ্ম্য-সিদ্ধি লাভ করেন।

এই মোক্ষের ভাষ্যে, শব্দর “নৈকৰ্ম্য-সিদ্ধি” শব্দটীর দুটা
ব্যাখ্যা দিয়েছেন :—

(গীতা ভাষ্য ১৮—৪২)

অর্থাৎ ধীর থেকে দলক কৰ্ম নির্বৃত্ত হয়ে গেছে, অথবা
ধীর আর কোনো কৰ্ম অবশিষ্ট নেই, নিজের ত্রুষ্ণ বা
আত্মাকে উপলব্ধি করবার পর, তিনিই হলেন “নৈকৰ্ম্য”
এই নৈকৰ্ম্যর ভাষ্যই হল “নৈকৰ্ম্য”। সেই নৈকৰ্ম্যরূপ সিদ্ধি,
বা মুক্তি।

অধঃ। নৈকর্ম্যের সিদ্ধি, নিষ্ক্রিয়া অঙ্গবস্ত্র বা যুক্তের সিদ্ধি।

অবশ্য “নৈকর্ম্যের” অর্থ কেবলই অকারণে কর্মত্যাগ বা বা অসমতা নয়। “নৈকর্ম্যের” প্রকৃত অর্থ চল জ্ঞানপূর্বক কর্মত্যাগ; অর্থাৎ কর্ম যেরূপ কারণ তা পূর্ণ উপসিদ্ধি করে তবেই সকামকর্ম পরিত্যাগ করা হলে, তাই বলে প্রকৃত “নৈকর্ম্য।” সে কতই গীতা বলছেন :—

“ন কর্মণামনাংস্ত্রৈকর্ম্যং পুরুষোত্তমং।

ন চ সংসারমাংসং সিদ্ধিং সমাধিগচ্ছতি ॥”

(গীতা ৫-৪)।

অর্থাৎ, কর্মের আশ্রয় না করলেই যে পুরুষ নৈকর্ম্য লাভ করেন, তা নয়; এবং কর্ম না করলেই যে তাঁর সিদ্ধি লাভ হয়, তাও নয়। (পৃঃ ৩৪৯)

তাৎপ্রে লক্ষণও বলছেন :

“নাপি সংসারমাংসং কেবলং কর্ম-পরিত্যাগমাত্রাৎসব জ্ঞান-বহিতাং সিদ্ধিং নৈকর্ম্যসংসার জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সমাধিগচ্ছতি প্রাপোত্তি।” (গীতা-ভাষ্য, ৩-৩।) অর্থাৎ জ্ঞানের উদয় না হলে কেবলমাত্র কর্ম পরিত্যাগ দ্বারা নৈকর্ম্য, সিদ্ধি, বা মোক্ষ লাভ করা যায়, তা নয়। সে কতই গীতা সেই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোককে বলছেন :

“কর্মণ্যবাধিকারস্তে না কলেবু কথ্যচন।

মা কর্ম-কল-হেতুভূমি তে সঙ্কোচকর্মণি ॥”

গীতা ২-৪৭)।

অর্থাৎ, একমাত্র কর্মই ভোমার অধিকার আছে, কলেবর নই। কর্মকলের হেতু হয়ে না, বা, সকামকর্ম

করো না। অতএবে, কর্মত্যাগেও যেন ভোমার প্রীতি না হয়।

“যদি কর্মকলং নেচ্ছতে, কিং কর্মণা হুংকরণেনৈতি মা তে ভবনসঙ্কোচকর্মণা করণে।” (গীতা-ভাষ্য ২-৪৭)।

যদি কর্মের ফলই না পাব, তবে হুংকরণের কর্ম করবই বা কেন? এই হেতুে যেন কোর কর্ম পরিত্যাগ না করেন।

তার কারণ হল এই যে, সকামকর্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য হলেও নিষ্কাম কর্ম চিত্ত শুদ্ধির হেতুরূপে আনোৎপত্তি, তথা মোক্ষের পরোক্ষ কারণ।

সকাম-কর্মের বিষয় এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, নিষ্কাম-কর্মের মাধ্যমে গীতার উচ্ছলতর ভাবে পরিচ্ছূট হয়ে উঠেছে।—নিষ্কামতা, ভোগবিমুক্ততা, ইন্দ্রিয়বন্দন, আত্মপদার্থেই ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার মর্মোৎকর্ষ। সেই মধ্যমার্থীই মধুরতম সুরে সঙ্গিত হয়ে উঠেছে জীমূতগবৎগীতার প্রতি ছন্দে—

“বিহায় কামানু যঃ সর্গানু পুন্যাস্তরতি নিঃস্পৃহঃ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমাধিগচ্ছতি ॥”

(গীতা ২-৭১)

যিনি সকল কামনা বিশর্জন হিঃ, সকল স্পৃহা ত্যাগ করে, সকল পার্থিব মনতা বর্জন করে, সকল অহঙ্কার বা ‘অহং-মম-ভাব’ বিনাশ করে বিচরণ করেন তিনিই একমাত্র পরমাশান্তি লাভ করেন।—



কাঁদে আর উৎসন্ন যায়

শ্রীভগবতীপ্রসাদ

বসন্তরস লিখেছেন, “বাঙালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।”
কয়েক দিন হ'ল কলকাতার একখানা বাসো বৈদিকে
এক হল নাতি-বামপহীর এক বিবৃতি পড়লাম। পড়ে
মনে হ'ল, যে-জাতের এ'রা বামপহী নেতা, সে জাত উৎসন্ন
যাবে না তো কোথায় যাবে? কাঁদার ভিতর দুর্বলতা
থাকে, ক্ষুদ্রতা থাকে, আবার কোথাও কোথাও এক আঁটু
উদারতা মহাক্ষুর স্পর্শও থাকে। এ'রা কৈঁধেছেন কি
নিঃ? না, কলকাতার রাষ্ট্রায় বৈধানে আউটারের
প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল সেখানে গান্ধীজীর প্রতিদ্বন্দ্বি রাখার
কথা হয়েছে—তা চলবে না, সেখানে নেতাজী সত্যের
প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিদ্বন্দ্বি করতে হবে। কেউ কেউ বলেন,
নেতাজী আজও বৈঁধে আছেন। বৈঁধে থেক যেকোনো
কারণে এতকাল বহি তিনি লোকসমক্ষে না বেরিয়ে এসে
থাকেন, এইবারে তিনি আর না বেরিয়ে পারবেন না।
বেরিয়ে আসতে হবে তাঁকে শুধু এইটুকু বলতে, “হোমাই
তোমাদের, আমার মাথাটা আর তোমরা কেটে না।”

আউটারদের ভয়গায় নেতাজীর প্রতিদ্বন্দ্বি নানানদই
হবে, তার একটা বুজি কি?—না, আউটারদের প্রতিদ্বন্দ্বি
“উদ্ভট হস্তের প্রতিদ্বন্দ্বি।” কি প্রকার অস্ত্র নেতাজীকে!

প্রায় দশশতাব্দীকাল থেকে বাঙালী তো কৈঁধেছে।
তারপর গত এক শতাব্দী ধ'রে হস্ততা বাঙালীর বহু জন্মের
পূর্বকার অস্ত্রিত শৌভাগ্যের ফলেই এদেশের মাটিতে বেশ
কয়েকজন মহাপুরুষ জন্মগেলেন—ই'রা জাতকে দেখালেন,
কৈঁধা না, তার চেয়ে জাত গড়, জাতকে হুত্বের সম্বল দিয়ে
যাও। সূর্যের কয়েকজনের ক্ষেত্রে এ শিক্ষা কাজে
লাগলো। ফলে, ক্ষুদ্রবীর্য থেকে সূর্য ক'রে নেতাজী
সত্যের পর্বত করেবতি মহাপ্রাণ দুনিয়ার ইতিহাসে এক
অতুলনীয় অধ্যায় রচনা করে গেলেন। কিন্তু তার পর?
ইতিমধ্যেই তো সূর্য হ'ল একাদশের নিচ ও শাণকধের
কাছ। একটা বামপহী হল, বহু সাত্যক শিক্ষক, অধ্যাপক

ও শাখাবিদ, কিছু নিম্নের ও সাহিত্য ব্যবসায়ী ও অপরা-
পর ব্যবসায়ী জাতকে দেখাবার কাজে লেগে গেলেন—
ও এতিহ্য ভুলে যাও, জাতের মনোভব এতিহ্যে ফিরে যাও।
জাতের সব প্রথাব্যবস্থা তো “আপনি বাঁচলে আপন
নাম,” “যে প্রবণি পরিত্যক্ত অপ্রবণি নিষেধে প্রবণি
তত্ত নস্তত্তি অপ্রবণি নষ্টমেব চ,” “সুখের চেয়ে সোয়াস্তি
ভাল।” বামপহী নেতারা কিশোরদের ধ'রে ধ'রে একথাও
শেষতে লাগলেন, বিলাসিতা করব না কেন? জাতের
কৌরিকার মান তো বাড়তে হবে। আশ্চর্য নয় যে,
বর্তমান নাতি বামপহীদের সৃষ্টি হয়েছে।

নীতির দিক দ্বার ভাঙে, বুদ্ধির দিক তার ভাঙতে বৈধি
লাগে না। গান্ধীজীর সঙ্গে নেতাজীর বন্ধ কি না লাগলেই
চলতে না? ভাঙত আন যতোধানি স্বাধীনতা পেয়েছে
ততে নেতাজীর দান কেউ অস্বীকার করবে না। তা
স্বীকার ক'রে নেবার পরেও বহি কেউ বলে, আজ সমগ্র
প্রাচ্যে যে-জাতীয় ও ব্যক্তিগত আত্মসম্মানবোধ মেখেছে,
সেটা গান্ধীজীর দান—এ তুলনাটা কি এই নাতি-বামপহী-
দের খুব ভাল লাগবে? অথচ মহাপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
ও সূর্য প্রাচ্যে বাঁধাই বুঝে আসছেন, গান্ধীজীর কাছে এ
জগৎ স্বাধীনতার কথা তাঁদের মুখে মুখেই বানান যায়।
এটা লক্ষ্য করবারও দিন এসেছে মনে হয়, স্বাধীন
বিল্লের যে প্রতিক্রিয়া এসেছিল মেটানিকের নেক্বে,
কল বিল্লের যে প্রতিক্রিয়া বেধা দিয়েছিল কালিগদের
উদানে, গান্ধী-বিল্লেরও তেমনি প্রতিক্রিয়া বেধা বিচ্ছে
এশিয়া জুড়ে সামরিক শাসনের হিড়িকে।

তারপরের কথা—কলকাতার রাষ্ট্রায় যে-মোড়ে
গান্ধীজীর প্রতিদ্বন্দ্বি রাখা হবে কি নেতাজীর প্রতিদ্বন্দ্বি
রাখা হবে বলে বহু লেগেছে, একথা কি প্রমাণ হয়েছে,
কলকাতার স্বতন্ত্রতা রাষ্ট্রায় মোড় আছে তার ভিতর
সবচেয়ে বেশি লোক চলাচল করে সেই মোড়টি দিয়েই?

কলকাতার একটি বিশেষ রাস্তার মোড়ে কৃষ্ণদাস পালের প্রতিমূর্তি আছে, একটি বিশেষ পার্কে বারতানার মহা-
রাজার প্রতিমূর্তিও আছে। তাঁদের বেশার এই অশোভন
কলং বাড়াপী করে নাই। আজ কি ধরে নিতে হবে
এঁদের চেয়ে ভারতবর্ষের বা দুনিয়ার ইতিহাসে গান্ধীজীর
স্থান কম ?

প্রশ্নটা বিশেষ করে মনে আসে এই ক্ষেত্রে যে, এই
বানশরীষের বিহুতির একস্থানে আছে—“বাংলার কৃত্তী
সম্মানদের প্রতিমূর্তি মহানগরীর বধ্যাথ স্থানে প্রতিষ্ঠিত
করা উচিত এবং এই প্রতিমূর্তিগুলি এমন স্থানে বসে
হইবে যাতে সাধারণ মানুষের মনে ইঁহাদের ঐতি-
হাসিক গুরুত্ব ও বিরাটের ধারণা সৃষ্টি করিতে পারে।”
এই নীতি অনুযায়ী বাংলার সব “কৃত্তী সম্মানদের”
প্রতিমূর্তি যদি কোনো দিন স্থাপিত হ’তে যায়, তা’হলে
হয়তো এই নীতি বামপন্থীদের তরফ থেকে আবার ধারী
উঠবে, বিভাগ্যের মশাইয়ের প্রতিমূর্তি যদি হয় পাঁচ
ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা, বাবা রামমোহনের হবে সাত ফুট
নয় ইঞ্চি এবং নেতাজী সুভাষের হবে এগার ফুট।

বাংলার যেসব কৃত্তী সম্মানের এঁরা উল্লেখ করেছেন,
তাঁদের সবার প্রতিমূর্তি যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে হরিশ
মুখার্জী, শিশির কুমার, মতিলাল ঘোষ, রমেশ হস্ত,
ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি, আনন্দমোহন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ,
ব্রজেন শাস্ত্রী, গুরুদাস বসু, পি. সি. রায়, মহেন্দ্র সরকার,
কালীপ্রসন্ন সিংহ, জুহেব, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীন সেন,
গিরিশ ঘোষ, বিজেন্দ্রলাল, বীনবন্ধু, অমরীন্দ্র ঠাকুর,
ডিবোজিৎ, নবগীর্ষ, রত্নল, সরলা দেবী, নিবেদিতা,
বালবিহারী ঘোষ, অর্ধমৌর্য, অধিকা মজুমদার, বর্ত্তম
মোহন সেনগুপ্ত, মনোমোহন ঘোষ, ব্রজবান্ধব, বাসুদেবী
বসু—এঁরাই বা ব.র. যাবেন কোন্ হিসাবে ? নারী-
বামপন্থীরা মনে কি স্তম্ভগায় থেকে জুড় ক’রে নেতাজী
পর্বত বীরা ভাতকে বৃত্তার সম্বল দিয়ে পেছেন, তাঁদের
কতজন বিজেন্দ্রলালের গানে, কীবাগপ্রসাদের নাটকে,
ঘোষের বিভাজুহরণের লেখায় ও পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন
সেনের বক্তৃতায়ও কতোখনি উজ্জ্বল হয়েছিলেন ? এঁদের

সবার নামে কলকাতার রাস্তার মোড়ে মোড়ে যদি
প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, আমরা খুশীই হব।

• কিন্তু এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা বোধগম্য একমাত্র বা প্রধান
উপায় এঁদের স্থানের সমতুল আকারের এক একটা
প্রতিমূর্তি রাস্তার উপযুক্ত মোড়ে মোড়ে প্রতিষ্ঠা করা—এ
আমাদের মত নয়। এঁরা নাকি-কাজ না কীভাবেই
শিখিয়েছিলেন। কিন্তু আবার তো সেই-কাজতেই
ভাতটাকে পেয়ে বসেছে। এমন কি, এই বিবৃতিটিকেও।
বাঁঘের হাতে পড়ে বিপিন পাল বিপিন বিহারী
হয়েছেন, তাঁদের মাপকাঠিতে বাংলার কৃত্তী
সম্মানদের স্থানের পরিমাপ আমরা করব না। ভাত
মতীকার স্বাধীনতা পেয়েছে কিনা সে আলোচনাও
এখানে তুলব না। কিন্তু রামমোহন থেকে নেতাজী পর্যন্ত
বেশ কৃত্তী পুরুষের উল্লেখ এই বিবৃতিতে আছে, তাঁরা
ভাতকে যদি কিছু শিখিয়ে থাকেন তবে তা আশ্চর্য্যচরিত্য
শিক্ষা। এই বিবৃতি-কাতারী বিবৃতি না দিয়ে যদি নিজেদের
চোঁয়ার টাকা ভুলে যোগ্য শিল্পী দিয়ে নেতাজীর একথানা
স্রোত বা মর্ম্মবৃত্তি করাতেন এবং তা’র ভিত্তি উপযুক্ত স্থান
ধারী করে সেটার প্রতিষ্ঠা চেষ্টা করতেন, তাহলে অন্ততঃ
সে চেষ্টাটুকু করার মতো স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি মনে
হয়। এবং সেই চেষ্টা করলে বাড়াপী ভাতকেও এমন
করে কুপার পাত্র ক’রে তোলা হত না, নেতাজীকেও খাটো
করা হত না, তাঁর প্রতি বং কতকটা সম্মান এবং ঐতিহ্য
বেশান হ’ত।

অবাঞ্ছানী বলে অধুক নেতা বা অধুক লেখক বাড়াপী
সুবেশ্রমণের স্থানকে উপেক্ষা করেছেন—এ ধরণের নালিশ
আমরা অনেক শুনেছি। কিন্তু এ নালিশ পুনঃ পুনঃ করে
অপরের কাছে তো আমরা যান ছাড়াই, নিজেদের কাছেও।
বর্ত্তমান বিবৃতি বীরা দিয়েছেন, তা’হলে কেউ কেউ নিজেদের
বেশ পণ্ডিত লোক এবং বড় লেখক বলেও মনে করেন। তা
কববার যেহেতু নেই এমন কথাও আমরা বলি।
স্রাহুর্গল জনসন লেখক, অর্ন্তস্থান প্রাপ্ততা ও ব্যক্তি
হিসাবে যত বড় ছিলেন, তা’র চেয়ে বড় ক’রে পেছে
তাঁকে বসন্তের লেখক। এমন একথানা ভাবনা এঁরা
কেউ লিখতে চেষ্টা করেছেন বলে তো আমরা শুনি নাই,

যার ফলে কয়েকজনাবের হানকে কেউ ছোট করতে সাধন পেরত না।

সুপ্রসন্নতা বা চিত্তব্রজের দিনে বাঙালী বলসেই এঁদের উপেক্ষা করবার সাধন কারও ছিল না। তার কারণ, আমরা বাঙালী—হুজুর এই ঘাবটেই তাঁরা প্রতিষ্ঠা পেতে চান মাই। চিত্তব্রজ যে মহত্ব দিয়ে একটা গোটা জাত গড়তে গিয়েছিলেন, তাঁর প্রতি দ্রষ্টা বেধাবার নামে এই সব নাশিল জানিছে আর বিবৃতি দিয়ে শুধু সেই মহত্বকেই অংগ। রাম কবচি না, জাতকে আঘাত টুক্কো টুক্কো করবার শড়ক তৈরি করছি। অনেক সময়েই শুনি, চাক্কা বাক্কাবীর ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশ পাঞ্জাব বা মাদ্রাজ প্রদেশবাসীদের সঙ্গে বাঙালীর আর কোনো স্থান নেই। বর্তমান বিবৃতি ঝাঁগে ছিঃছেন বাংলায় ছাত্র সমাজ তাঁদের কাছে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাও হীক্ষা পার। ফলে আমরা বাঙালী—এই ঘাবী ছাত্র বিদ্যায় বৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠা পাবার চেষ্টা আমাদের ছাত্র সমাজে নিখিল হয়ে এসেছে—পাকনোহন বা রাজনারায়ণ বা আর যাদের নাম এই বিবৃতিতে আছে তাঁদের মতো কঠোর পবিত্রন আজকের বাঙালী ছাত্রসমাজে কখন করে? আশ্চর্য নয় যে, আমাদের পাশ করা ছেলেরা আর চাক্কা বাক্কাবীর ক্ষেত্রে সর্ব ভাবতীরেতে পেছনে পড়ে যান্নে।

যে স্বাধীনতা আমরা পেরেছি, সে স্বাধীনতা যে স্বাধীনতাই নয়, এও প্রমাণস্বরূপ অনেক সময় বেধান হয় কর্মচারীরা ঘুর ঘায় বা কালাগাভার চলে। কর্মচারীরা ঘুর ঘায়—অবীকর কেউ করবে না। কিন্তু ঘুর ঘের কে? ছুটা টাকা দিলে যদি কাজ হয়ে যায় তো কে ঘায় হাসান করতে? আমরা যে স্বাধীনতাও বোধ্য তার কি প্রমাণ আমরা দিই এই সহজিয়া সাধনায়? কালাগাভার কি মোগ পাবে এই সহজিয়া সাধনার পথে? উচ্চাঙ্গদের নিয়ে তো কত সন্তোষই বেধলাম। চ'বল আনা পয়সা দিয়ে তায়েব বাড়ি বশুক বেধে কত নেতাই না আসার গরন কলেন। এই সর্বহারা, ভিটেমাটি-ছাড়া, নিঃশ্র লোক-

জলার Doleএর টাকা থেকে পাটির বা পাটি থেকে কোন নির্বাচন প্রার্থীর ক্ষেত্রে চালা আমাদের কথাত শুনলাম। অবশ্য এদের নিয়ে যে-যেণের সন্তোষই করা হয়, কই, ঘুরঘায় কর্মচারীর বিজ্ঞে, কালাগাভারের বিজ্ঞে তো সে যত্নের কোনো দৈ-ভল্লার কথা শুনি না। স্বাধীনতা যখন জাতকে গড়ে তোলাবার সুযোগ—হুজুর মাত্র বিধান ভাঙের বা জগৎহলালের বাড়ীর সামনে পাড়িয়ে “বোম্বের ঘাবী মানতে হবে” চাঁৎকার করার সুযোগ নয়। বিধান ভাঙ বা জগৎহলালই আমাদের ক্ষেত্রে সব কিছু করে যেহেত—চাঁৎকারের মাতকৎ এই হীক্ষা জাতকে বেগুয়া স্বাধীনতাকে বিশালতর বা মুক্ততর করার রাস্তা নয়, পোলাহীতে দিয়ে যাবার রাস্তা।

গাঙ্গীজীব সংগ্রামে যে আমাণী পাওয়া গেছে, তা হয় তো ছুটা আমাণী। অতএব, এ আমাণী ঘাবা আমাদের দিয়ে গেছে হরতো একদিন আমরা তাবের ডেকে বলব, কিয়িমে নাও এ-আমাণী। কংসার জন-কতক নেতার প্রাসবে আর তাইই অনতিদূরবর্তী একখানা মাঠ থেকে ছড়িয়ে পড়তে হুজুর কবেছিল ভারতবর্ষের মানচিত্রে লাল রং ছু'শ বছর আগে একদিন। সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হ'তে ঘেরি লাগবে না—ক্রমপ্রগতিমান আমকের এই সংকীর্ণতার।

একটি মাত্র আস্র এই পরিণতির প্রতিপক্ষে আজও আছে। যদি সেই আস্রের আজও জাত গড়ার দিকে আমাদের শিক্ষিত শ্রেণী ঘন মা ঘে, তাহ'লে এ পরিণতি থেকে আমাদের বাঁচাবে কে? কতাপী বিপ্লবের প্রতি-ক্রিয়ায় নেতা জুটছিলেন নেতানিক, কল-বিপ্লবের মুগোলিনি। গাঙ্গী-বিপ্লবেরও জুটেছে বই কি? জীভালস আর কি কহছেন? নিঃশ্রেক আন্তর্জাতিক নীতি যে তাঁর পছন্দই নয়, তা' কি তিনি গোপন করতে ঘুব চেষ্টা করেছেন? আর আমাদের ভাবতীর রাই-কর্মচারীরা, পাণ্ডাধিকরা, গাঙ্গনৈতিক নেতারা সব ফলে ফলে ঘুরে আসছেন কি অন্নি অন্নিই?

বর্ষ শেষের মাপুকরী ভ্রমর মোষ

২৭. ১২. ৫৭। রওনা হলো পুরীর উৎসব।
উৎসব, কমল আর আমি। একসঙ্গে ভ্রমরমণ, পুরী
আর কৈনিক ঘেঁষে আসব—এই আশায়।

রাত আটটা চল্লিশের টেন। আমার আর উৎসবে
আরগা রিজার্ভ ছিল। কমল পরে টিকিট কেটেছিল।
তাই ছিটকে পড়ল অস্ত্র এক কানগ্রা। আমার চার আনা
ক'রে দিয়ে শুধু বসবার আরগা রিজার্ভ করেছিল।
অপেক্ষে আমারের আসন ছিল "শায়িং" (Sleeping
Car)-র মধ্যে। গিয়ে দেখি বিলকুল খালি। উৎসব
ওপরে একটা বাঁকে বসল ক'রে গুয়ে পড়ল; আর আমি
নিচে একটা বাঁকে হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম।
বেচারি কমল কেন আসে গেল কে জানে।

শুধু এক রাজের ভ্রমণ। আর তা ছাড়া আমাদের
কানগ্রার সহযাত্রীও যাবে একজন উড়িয়া, ছুঁচোরজন
হিন্দুস্থানী পুরুষ, আর একজন শুধু মহিলা—জাণ্ড বর্ষাঙ্গী
হিন্দুস্থানী। কাছেই আর কোনো বিকে মন দেবার ছিল
না। আমাদের শায়িংকার কণ্ডাক্টর গার্ড সাহেব বাঙালী;
তিনি পূর্ব উৎসবের সংস্রব আমাদের ধরবার দাঁড়িয়ে অস্ত্র
লোকের উঠতে বাধা দিতে লাগলেন। ছাড়বার কিছুকণ
আগে কাঁধে ক্যামেরা ঝোলানো সার্কিটের হাওয়াইস্ট
আর কালো ট্রপিক্যালের প্যাট পত্রা এক ভ্রমরলোক তার
সুন্দরী স্ত্রী-ও এক গাধা বাস্ক প্যাটরা আর গোটা কয়েক
ছেলেমেয়ে নিয়ে উঠে পড়েছিলেন। আমাদের বিকে পিছন
কিবে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে বলতে লাগলেন— "ফার্ট" ক্লাসের টিভিট
কেটে অগত্যা হার্ড ক্লাসেই যেতে হচ্ছে দেখছি! কী অশভ্য
ভিড়!" বলে ক্যামেরাটা একটা আঁটার সংস্রব হুঁসিয়ে
রাখলেন। তাঁর স্ত্রী আমাদের বিকে তাকিয়ে এদনু
বাড়ড়ে গেলেন—কেননা, ওপরে উৎসব আর নিচে আমি
আর সেই উড়িয়া সহযাত্রী পত্রা নির্বিকারভাবে যাবা
হ'য়ে পড়ে আছি। আমাদের কানগ্রার একজন রেলের

আর্টেগেট্ট ছিল; সে এসে বাবুকে বলল—'বাবু এটা
নুনোবোর গাড়ি, আপনারা অস্ত্র কানগ্রার যান।' আর যাব
কোথায়। বাবু তেড়ে গালাগাল দিতে লাগলেন লোকটাকে।
"সে আও ভ্রমরমণ কোন্ শালা আক'দার হায়, হায় ফার্ট
ক্লাসকা প্যাসেঞ্জার হায়, জানতা হো?" ভ্রমরমণের কণ্ড
ঘেঁষে অস্বাক হ'য়ে গেল। তিনিও বকতে শুরু করলেন
লোকটাকে। এবকম অদ্রুত ব্যবহার না করলে আরেকটু
হ'লেই আমি ছেড়ে যেতাম আরগা—অন্ততঃ ওই ভ্রম-
রমণিকে। কিন্তু আমাদের মেজাজ বিগড়ে গেল।
লোকটা নেমে গিয়ে কণ্ডাক্টর গার্ডকে ডেকে নিয়ে এল।
কণ্ডাক্টর গার্ড সাহেব কালো বাঙালী; কানগ্রার ঢুকেই
ভ্রমরলোককে বললেন, "আপনারে ব্রিগিং রিজার্ভেশন?"
ভ্রমরলোক বললেন, "নো, বাট..." তঁকে ধাক্কা দিয়ে গিয়ে
গার্ড সাহেব নির্ভয় গলায় বললেন, "প্লিজ পেই ডাউন।"
ভ্রমরলোক—এবার ইংরেজি শুরু করলেন! বেশ দাবদীল
বলতে পারেন, লম্বা ক'রে যেখান, অন্ততঃ গালাগালের
অংশটুকুতে। কিন্তু সাবান আমাদের কালো বাঙালী
কণ্ডাক্টর গার্ড; না গলাব আওয়াধে, না চেহারা
—ভ্রমরলোক তাঁর কাছে সুবিধে করতে পারলেন না। গার্ড
সাহেব বলে চলছেন, "ইউ আর ফার্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার?
লেট মি সি। কান্ উইথ্‌মি, আই ক্লাস গিভ্‌ ইউ ইয়েব
ফার্ট ক্লাস অ্যাকোমোডেশন্?" শেষে ভ্রমরলোক ক্যামেরাটা
আটা থেকে খুলে স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন, "ভূমি একটু
দাঁড়াও, আমি ঘেঁষে আসছি।"

একটা বিজী পরিস্থিতি। আমি ভাবছিলাম—দাঁট
অঁকার করি ভ্রমরমণিকে। কিন্তু কে জানে—যদি
আমাকেই গালাগাল দিতে শুরু করেন! আর হ'ল-ও
তাই। সেই আর্টেগেট্ট-কে ভ্রমরমণি আগর বকতে
শুরু করলেন; কি খাতি লোকটা, ও আমার গিয়ে ডেকে
এনেছে।"

দানিক পরে তত্ত্বলোক এসে বললেন, "চলো, চলো। একধন কাঁকা একটা কানরা পাওয়া গেছে। দু'বান্দ ক'রে বাগ্ন পাটোয়া ছেলেরা নিয়ে তত্ত্বলোক সদর-চলে গেলেন। আমি ঘুমামোর আগে তাবলান, তত্ত্বলোকেই ভক্ত হলেব জেনাহেল মা'নেদার যোগ হয় একটা কানরা পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওই তত্ত্বলোকের কথা তাবতে তাবতেই কিছুক্ষণে মনো খুঁটিয়ে পড়লাম।

২৮. ১২. ৫৭ ॥ বাংলা দেশের বাহিরে ভোর হল। তাকিয়ে কেব মনে হয়—এ-ও বুঝি অস্ত্র এক বাঙ্গা দেশ। পাছপাশর তক্য বড় কম—সুখু মুগামদৌর বাসির উৎসাহ। বাংলা দেশের মগে উড়িভার তক্য বুঝিয়ে দেয়।

বেলা নটার আগে পৌঁছলান পুরাতো। টেবন থেকে বিকশোর ক'রে আমরা তিনজন বড়না হলান কোনো এক এক হোটেলের উদ্দেশ্যে।

বিকশো থেকেই বেধা গেল সমুদ্রতীর। আমার এই প্রথম সমুদ্র দেখা। কতো অধীর আশা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম প্রকৃতির এই পৌনঃসর ধোঁয়ায়। চোখ ভ'রে দেখলাম। বিস্তীর্ণ প্রশান্ত নীল জলের বাসি। বিখাতার কী অপরূপ স্তম্ভি! কার মধ্যে তুলনা হবে এর! এত বিরাট কে আছে?

চিকুটে বিরাট ক্রাব নামে একটা হোটেলের গিরে আনরা উঠলাম। কমল এর আগে এখানে এসেছিল—সেই হলে অগ্রহী।

আনকারবাগু চা পাঠিয়ে হিসেন। খায়র যেখে আনরা হাতিবনতো সোলজিক হ'রে গেলান। ছুঁটো ডিমের পোচ, একটা বোটা মর্মান কলা, পাঁচ ছ'খানা ভালো বিলুট আর চা। মনে প'ড়ে যেন আনদের মনের কথা, কোথায় ভাড়া কাপে ঠাণ্ডা চা আর মাখনমাখানো ছুঁটো। পাঁচজনীক টুকরো,—আর কোথায় এখানকার হাফকীর আরোজন!

আনরা গেরিরে পড়লান সমুদ্রস্রান করতে। ট্রিক আনদের হোটেলের সামনেই সমুদ্র, মাফখানে একটা। রাত্তা আর বেলাছুনি। বাসি আর বাসি—অমণ্যো গালিচ টুকরো কিছুকর বস্ত্রের মধ্যে হুঁরীর আলোর ঝিকঝিক করছে। পায়েব পাভা পর্যন্ত ঢুকে যায় বাসিতে। পড়াগড়ি করতে

ইচ্ছে কালের এই সুন্দর বাসির ওপর, দুটি দুটি নিয়ে ছড়িয়ে বিতে ইচ্ছে করে বেহেৎ ওপর। একটা ছোট শিশুর আনন্দ নিয়ে চললাম এগিয়ে।

জলের দাগে দাগে বেলাছুনির সীতলে যেন পাতের মতো একটা বেধা বেধা বিয়েছে। ছলাং ছলাং ক'রে সমুদ্রের জল কয়েক মুহূর্ত পরে পরে এসে আছড় পড়ছে বেলাছুমিতে—অনেকটা পর্যন্ত জলে তিলে যায়। আবার শুকিয়ে যায়। আবার তিলে যায়। এমন খেল' চলেছে। বিকশে এ খেলা হেথং—এখন আন দেখে কথা থাক মনে ক'রে আনরা এদিয়ে-অদা জল আর ঢেউকে পর্যবেক্ষিত ক'রে এগিয়ে চললাম।

তারপর—সে এক অদূত অভিজ্ঞতা। প্রথমেই লোনা জলেব দাব। তারপর গর্জন ক'রে অদা একরাশ ঢেউ। লাফিয়ে লাফিয়ে ঢেউ সামলালো। হুমড়ী খেয়ে পড়া। আমার গুঠা। এদিয়ে যাওয়া। ঢেউয়ের তোড়ে লুটিয়ে পড়া। হাঁটুতে ছ'ড়ে যাওয়া। আবার এগোনো। ঢেউয়ের ওপর গা ভাসানো—একমগে অটো বশট লোকের নীল ঢেউয়ের শিরে ভেদে থাকা—অদূত, অপরূপ! এরকম কতজন হ'রে যে আন করেছিলাম তা আর মনে নেই।

২৯. ১২. ৫৭ ॥ কাল রাত প্রায় আটটা পর্যন্ত বাসির ওপরে একটা জেলে—নৌকার পন্থীজের মাঝে ঠেল দিয়ে আনরা গল্প ক'রে কাটালান। ঢেউ ভাঙার মাঝেব দুর্জবার মধ্যে বিরাট গটছুনি রাঙিয়ে বেগ রথ জীবনকে। চাকরিস্থলের ক্রটিনে-বাগা জীবনটাকে হাফিয়ে কেলেছি এখানে এসে।

আজকে আমাদের দুপুর গেলার প্রোগ্রাম ছিল জুবনেবর ইত্যাদি লাগুয়ার বেড়াতে যাওয়া। হঠাৎ একটা সুন্দর ভ্রমণ আরোহিত হ'রে গেল। একটা ছোটো বাগ। বড় কোর পনের জন লোক বসতে পারে। আবারেব হোটেলের সামনেই পাঁড়িয়ে ছিল বাগটা। বাগের 'দে আগোজক, তার মধ্যে অস্ত্র আগে থেকেই আনরা কথা ক'রে রেখে-ছিলাম। চটপট ক'রে মাছগোজ ক'রে উঠলাম গিরে বাগে। তেতরে ঢুকে বেশি অনেক বাড়ী ও ও বাড়িনীতে ভর্তি। বসলাম। আমার সামনের থেকেই তিনজন মহিলা, মধ্যে তাদের কিশোরী মেয়ে। সেই মেয়েটি আমার আমার ট্রিক

যুগ্মাধুধি। আঘাঘেই বেক আর ওবেব বেক এত কাছে যে পারে পারে আর ঠেকাঠেকি হ'য়ে বাবার উপক্রম। ব'লে ভাবলাম, বিন বাবে আছ ভালো।

তীত্র গতিতে ছাড়ল পাড়ি—বাচ্চা বাস হ'লে হবে কী। মধ্যে মধ্যে অবাং-চোখো মেয়েটিকে দেখে নিলাম। হামধুধু রক্তের ট্রাউজ আর সেই তখন রক্তের শাড়ি ওর পরণে। পাশে বসে ওর মা কী মাদি। অস্ত্রতঃ যুধের ছাঁর থেকে তাই মনে হয়। বিধি অবাং অস্ত্র কেউ সম-ব্যাঘা কিছু গভীর একজন মেয়ে। এদের ছাড়া আর সবাই নিশ্চ-চরিত। হাতের খিঁড়লগুলো বেশ হৃদয়, পাতলা গড়ন, সাধা আর আর কালো ঠোঁট মিশিয়ে গুণ বৃত্ত; মনগুলো সুন্দর মন্থন ক'রে কাটা। বা হাতের অনামিকার একটা অঙ্গল-পাখের বগানো আংটি। জুহুতে কাছল-আঁকা নেই, শুধু বেশ। চোখেই তারা বড় চকল।—মোটের ওপর মনে হ'ল, বেশ হবে ব্রনগটা।

প্রথমে বাস বাসল সাক্ষীগোপাল মন্দিরের কাছে। রাগ আর ক্রুদ্ধের মূর্তি। পুরী মন্দিরের ছাপ অনায়াসে লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরের বাইরে দু'টো গিঁহ মূর্তি, আর গুহু বেউল। গুগ:মার্নন বা নাটমন্দির কিছু নেই। মন্দিরের পাশে বড় বড় বহুল গাছ; অনেক পাতা বহুল। দু'টো পাতলাহ, খেলায়। অনেক বিন আগ্নে—প্রাচ্য কুড়ি বছর আগেকার দিনে কিবে গেলাম। মনে পড়ে গেল চন্দনবাইসার কথা, বাবা যেখানে চাকরি করতেন। সেখানকার পথবাট অশাষ্ট হ'য়ে গেছে স্মৃতির আধায়ে, তবু বহুল ফলের কথা ভাবতে গিঁহই মনে পড়ে গেল যেন পূর্বজন্মের স্মৃতির মতো। হুধু বক্তের বহুল ফল গাছ থেকে পাততাম। একটু একটু মিষ্ট আর খুঁ ক'টে ক'টে লাগত।

আবার বাসে ঢেপে ছুটলাম জুবনেশ্বরের বিক। জুবনেশ্বরের ঐতিহ্য বহন ক'রে পাড়িয়ে আছে জুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির। বৈটে একটা ছেলে—নাম যমেশ পাণ্ডা—হ'ল আমাঘের গাইড। বগল ও বৃত্তি বা, তাৎপরে মনস্তত্ত্ব বেশি ক'রে বুঝিয়ে দিতে চায়।

জুবনেশ্বরের মন্দিরটা পুরী মন্দিরের মতনই সম্পূর্ণ। প্রথমে বেউল বা বড় মন্দির, তারপর অগমোবন, তারপর

নাটমন্দির। মন্দিরের এই তিনটে অংশ হচ্ছে উড়িয়ার মন্দিরশিল্পের বৈশিষ্ট্য। তারপর বিক থেকে জুবনেশ্বরের মন্দির পুরী মন্দিরকে হাত নানায়। মন্দিরের চারপাশটা খুব বেধেতেই অনেক সময় পেয়ে যায়। এত বিশাল পরিধি। এ সব মন্দির বেধে বিম্বরের সংগে প্রাণিত আনাই প্রাচীন কালের উবার দিহাট প্রাচীনক নৃস্ট্রমণিকে।

কড়ের বেগে আমবা দেখে চললাম—কাজেই বুটরে খুঁটিয়ে সব বেধা মন্ত্রন হল না। বেধা দেখ হ'তেই যমেশ পাণ্ডা হাঁকবা বাবা করল আড়াইটি চৌশামুত্র। তাকে আট আনা পহনা দিয়ে যখন আমবা আবার বাসে ঢেপে বসলাম, তখন দেবকন ভাষায় সে আমাঘের মন্তব্যণ জানালো তাকে আমাঘের মনে বিশ্বব্রাজ্ঞ সম্বন্ধে রইল না যে বড় হ'লে যমেশ পাণ্ডা খুব বড় সাইড না হ'তে পারলেও বড় পাতা হবে।

জুবনেশ্বরের পরে আমবা খেলান কেহা-পাঁচী মন্দিরে। এখানে হুধুহুধু ব'লে আছে এগুটা প্রস্তর। সুন্দর বহুল মল, আঁকলা ভ'বে গেলাম। ঐ মেয়েটি আমার পাশে পাড়িয়ে আর আমাকে স্পর্শ ক'রে চল বেলা।

এখান থেকে আমবা খেলান উরগিরি মণ্ডপটি। দু'টো ছোট পাহাড়, পাশাপাশি।

উরগিরিতে আগে উঠলাম। অনেকগুলো প্রাচীন গুহা। জৈন সাধুরের প্রতি উৎসর্গ করা। খুঁ মন্ত্রবতঃ খাববেলায় আমলঃ—অবাং প্রীতঃ ম.অব প্রাচ্য দু'শে বছর আগেকার।

প্রথমে বেধলাম হাতিগুহা। একটা অতিকায় গুহা। আরপাশে আরপাশে ভেঙে গেছে তাৎপ-ও লক্ষ্য করলেই বেধা বাস গুহাও গুহাও ছাধে পাশিতে দেখা। সেখানগুলো ত্রৈতর থেকে। কাজেই অংক হয়ে ভাবতে হয় কী ক'রে এত বছর আগে তগুলো দেখা হল।

এরপর বেধলাম গণেশ গুহা। এখানেও দু'টো কুটুরি আছে—বেধালে খোঁহাই করা অনেক চিত্র। দু'টো সাধারণ হাতির মূর্তি পাশাপাশি।

তারপর বেধলাম রাণীহুহা ব'লে একটা গুহা। এটা অস্ত্র গুহার চেয়ে অগাধাণে। দোঁতলা গুহা। একক-তলার অনেকগুলি ক'রে গুহা ঘর বা কুটুরি। বাইরের

দেয়ালে অসংখ্য চিত্র খোদাই করা। কোথাও আছে বনের চিত্র, কোথাও রামায়ণ থেকে দৃষ্ট কল্পিত, কোথাও মহাভারতে থেকে। সুন্দর সুন্দর আরতাতারের কাটা শুভাষদণ্ডে—সুকঠিন পাখাও এখনো অবিকৃত রয়েছে।

উবয়গিরি দেখা শেষ হ'লে সেলে আমরা বগুগিরিতে গিয়ে উঠলাম। এখানে বেশ কিছু বৈদ্যুতিক বস্তু আছে। এখানে আরও একটা আধুনিক কালে তৈরি মন্দির।

উবয়গিরি বগুগিরি দেখতে আমাদের অনেকটা সময় লেগেছে। ফিরে যাসে এসে দেখি—ওরা অনেক আগেই ফিরে হ'লে আছে, আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছে। ফেরি যাত্রার জন্য একই যন্ত্রণাকাল ক'রে আমরা উঠলাম বাসে। সেই একই জায়গায়। আমার জায়গার মেয়েটি ব'লে ছিল। আমাকে দেখেই উঠে গেল সুবর্তি ছড়িয়ে। বসল সামনের সীটেই।

ছাড়ল বাস—সোভা পুরীদিকে। আমরা সবাই যেন আত্মীয়ের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। সাত পা এক সংগে গেলেই নাকি কথা হয়—আর আমরা এলাম এতটা পথ। ওদের সংগে ও তাই হ'ল চারটে কথা হ'ল।

মেটের ওপর—আমাদের দিনের প্রথমটা বেশ সুন্দর হ'ল।

ফিরে এলাম চোটেলে বিকলের আগে। তা যাওয়া সেরে চললাম সন্ধ্যার ধারে। আশা ছিল, সন্ধ্যার ধারে আবার দেখা হবে ওদের সংগে—বিশেষ ক'রে ওর সংগে। একটা ভালো প্যাক্ট আর নতুন স্যোটোরটা গ্যারে ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু কই অনেকক্ষণ ঘোড়াদুহির ক'রে ও তার দেখা মিলল না। উৎপল আর কমলের সংগে ছেড়ে দিয়ে বাতের বাতের এদিকে ওদিকে ঘাঙুলিলাম—কিন্তু ব্যর্থ।

কিন্তু ব্যর্থ হতে হবে কেন? পুরীর এই কটা পোকের ভেতর থেকে বেছে নেওয়া যাবে না? এক জায়গার ঘেঁষলাম—একটা লোক বালি দিয়ে সুন্দর একটা ঠাকুরের মূর্তি তৈরি করেছে টিক জলের চেউ যেখানে আসে তার ওপরে। আট বশবন লোক স্তম্ভ ক'রে আছে তার চারপাশে। সন্ধ্যার ছায়া তখন সন্ধ্যার মল থেকে প্রতিকলিত হ'লে আস্তে আস্তে ঢেকে দিচ্ছে বেলাতুনিকে। তবুও ওই আট বশবনের স্তম্ভ থেকে ওকে চিনে নিতে একটুই-ও

দেখি হ'ল না। গিরে এক পাশে ঝাড়োলায়, একজন মধ্যযুগীয় ভক্ত শ্রীলোক যশোভক্তি করল—‘আহা, এক-বারে জলের ধারে ক'রে বেঁচেছে—একটু পড়েই তো ভেঙে যাবে।’ আমি বললাম, ‘সেইজন্যই তো করেছে!’ আমার কথার মর্মার্থ কেউ ধরেতে পারল না, কিন্তু ও তাকালো আমার দিকে, চোখের মাঝখানে চোখের পলকে একটু পরিচিতির হাসি আঁকলো। সংগে ছিল এক ছোট ছেলে। ওর হাত ক'রে চলল বাড়ির দিকে। এতবার ভাবলাম—যাই ওর পিছু পিছু, ওদের বাড়িটা দেখে আসি। আবার ভাবলাম—কী হবে! আমার ভাবলাম—দোষ-ই বা কী। আর তো কোনোদিন দেখতে আসবার ইচ্ছে হবে না। কানেই শেষ পর্যন্ত চললাম। ওদের বাড়ির কাছ পর্যন্ত গেলাম। ও দু'কোণে গেল বাড়িতে—কী একটা পরিচিত স্থানের কলি ভাঙতে ভাঙতে। আমি একটুকুও থেকে ফিরে চ'লে এলাম। মনে মনে নামকরণ করলাম ওর যেমনা ব'লে। উৎপল আর কমল অথাক হ'লে গিয়েছিল হঠাৎ আমার অন্তর্ভাগে।

৩০/১২/৫৭। আজ আমাদের যাওয়ার কথা ছিল কোনার্কে; কিন্তু রাষ্ট্রপতি সম্মতি পুরীতে এসেছেন—সংবাদ পাওয়া গেল কাল কোনার্কে যাবেন। কলে আমাদের কর্ম পথও ভেঙে গেল। যাওয়াটা তাই বাতিল করতে হল, কারণ আমাদের রিজার্ভ করা ডাকবাংলো নিশ্চয়ই ওঁদের জন্য থাকবে।

আজ তাই খুব ভোর বেলায় উঠে কালকের মতো কিছুকিছু ফুডোলায় সন্ধ্যার ধারে। নীল সাগরের ধারে বালির আঁচল বিছানো। চেউয়ে চেউয়ে তা আসে, একের পর আরেকটা, একটা ভেঙে যাবার আগেই আরেকটা ভেঙে যায়, আর তীরে ছড়িয়ে দিয়ে যায় কিছুকিছু টুকরো, নানা রঙের ছোট বড়ো কিছুকিছু। ওরা ব'লে নিয়ে আসে নীল সাগরের বার্তা।

মাড়ে সাউটার সময় ফিরলাম চোটেলে। সেই বিরাট রাজকীয় প্রান্তর। তারপর? তারপর নিত্যকর্ম সেরে আবার বেরিয়ে পড়লাম বাতের। সেখানে থেকে শব্দে। একটা বিষয় কিনতে অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোথাও মিলল না। অবশ্যনী বন্ধ। করেন একচেঁয়ের অভাব।

ধিরে এসে সমুদ্র তখন। আজ বড় বড় ঢেউ বিক্ষিপ্ত।
অনেকক্ষণ ধরে স্থান করলাম। ঢেউয়ের ওপর অধিকার
প্রদান যেনই অস্বাভাবিক। আজ শিশুর মতো আনন্দে
ঢেউয়ের ওপারে দাঁতের স্থান করলাম।

বিকলে চারটে সময় চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম বীচে।
আজকেও ভালো জামা কাপড় পরে বেরোলাম। ঘর
মেঘপার দেখা মেলে। কিন্তু আজ আর দিল্লি না থাকে।
শেষে উৎপল আর অমলেন্দু সংগে কিছুক্ষণের জন্য ত্যাগ করে
গোলাম ওয়ের বাড়ি পর্যন্ত। রাজ্য থেকেই বেরোন ওর
মাকে, ওর ছোট বোনকে, ওর ছোট ভাইটো আখাকে
যেতে যেতে চোঁচিয়ে বলল—কে তুমি? কাকেই কিত
এলাম। কেন যেন একটু ব্যাপার লাগল। জগৎ
কতগুলো ভাগে ওঠে পৃথিবী মতন এমন স্থানের কারণ
এনে। তখন যেন যেন চার একটা অংশ একটা অবলম্বন।
ব্যতিক্রম, সমস্ত বেলারাত্রে এত স্থানের জ্যোৎস্না আর এত
ঢেউ—সব কিছু মনকে কেন যেন স্তম্ভিতভাবে বিধর করে
ছিল। প্রাণ ভরে চাইলাম বিশ্ব, চাইলাম ওই নীল
অলম্বি কান্ত্য। মনে ভাবলাম, পুরীতে এলে বিক্ষিপ্ত
হয়ে কেউ যেন আসে না।

৩১. ১২. ৫৭। রাত তিনটের সময় বাসের লোক
এসে ডাকাডাকি করে তুলল আমাধের। রাতেই মাকি
বসনা হবে—যাতে করে সূর্যোদয় দেখা যায় কোনার্কে,
আমরা ডাড়াডাকি তৈরি হয়ে নিলাম, ওই শীতের রাতে।
রাত সাড়ে তিনটের সময় ছাড়ল বাস। ভাবলাম
জুবেনেশ্বরের মতো অত স্তম্ভিত ভ্রমণ কী আর হবে।

আমি বসলাম সামনের সীটে। উৎপল আর কদল
বসল পেছনে। আমার ও ভাইভারের মাঝখানে ছিল এক-
জন টুর্কি। মোংরা জীল-ভাজা প্যাক্ট কেটের ছাট্
আর স্নাত্ প'রে বসেছিল, লম্বা লম্বা কী যেন সপারহেট
বার করে টানছিল। কটিন দু'থেকেটা কথা আমার সংগে
হচ্ছিল।

হু হু করে বাড়ি ছুটে চলল। পুরী থেকে বেরিয়ে
দু'বলি পর্যন্ত মোংরা এল; তারপর ডান ধারে বৈকে চলল
কোনার্কে থেকে। কোং ছটার দূর ভ্রমণ আগে আমরা
পৌঁছে গেলাম কোনার্কে।

বিরাম মন্দির। চারপাশ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাসিন্দে
ভক্তি। দূরে সমুদ্র দেখা যায়। উঠলাম সেই বিশাখ
সূর্য মন্দিরে—এ মন্দির থেকে রাজ্য নাকি প্রত্যাহ সূর্যোদয়
দেখতেন। পুরীতে সূর্যোদয় দেখছি। প্রথম পুং বিপত্তের
সংগে একটা লাল রেশমি মিলন ঘটে; তারপর সূর্যকুণ্ডি
হুটে ওঠে। আন্তে আন্তে একটা এই ধরণের লাল দিও
দেখা যায়; বীরের দীর্ঘ সেটা গোল হতে থাকে; শেষে চট
ক'রে সমুদ্র-বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মনে হয়
যেন জ্যামিতির বইয়ের স্পর্শ থেকে হঠাৎ যেন একটা নৃত্য
লাগিয়ে উঠে থেলে। কোনার্কে মন্দির থেকে সূর্যোদয়ের
বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না—এক মন্দিরের নিম্নের
বৈশিষ্ট্য ছাড়া।

সেই বৈশিষ্ট্যের কথা অনেক পরেও বলি গেছেন—
এখনো সে সবচেয়ে চরম কথা হয় তো বলা হয় নি। আমি
বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে ঘেঁষা নি। তবু যা ঘেঁষেছি তা এই।

মন্দিরটা থেকে সমুদ্র এখন প্রায় দেখে মাইল। এ
থেকে কখনো কখনো যেতে পারে—আজ থেকে প্রায় সাড়ে
আটশো বছর আগে সমুদ্রের নীল ফিল্মে টুয়ে যেত এই
সূর্যমন্দিরের পরোপাশ। তারপর মুগলমামেরা এলে
এরশে—হয়তো কালাপাহাড় ভেঙে দিয়ে গেছে অনেক
মুতি। কোনার্কে থেকে পাওয়া যায়—কতগুলো মুতি
অংশপ্রভাগ কেটে ফেলা। যেমন বামনতাতা অপক্কপা
সেবানীবেব কতো হয়ত নাক কাটা, কতো হয়ত মুজোল
বলোবোশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন, কতো হয়ত শিবসেন ঘটেছে। এ
সব থেকে অনেক কখনো কখনো—একজনা এসে ভেঙে দিয়ে
গেছে মুতি ও মন্দির। তবে তা কালাপাহাড়ের কীতি না
অন্ত কতো—তা বিবর্ত্য।

এক ইংরেজ মহৌরী কোনার্কেই এই অমূল্য সম্পদবাণি
অধিকার করেছিলেন, যোগ হয় বিংশ শতকের প্রথম
দশকে। অগ্ন্যগোড়া বাসিন্দে চাপা ছিল মন্দিরটা।
বালির জুপ থেকে মন্দিরটাকে এবং ভাবতবর্ষের এক গর্ভের
বস্তকে পুনরুদ্ধার করলেন সেই বংগ্য বিবেকী।

প্রাচীনত্বের দিক থেকে আগে জুবেনেশ্বরের মন্দির,
তারপর পুরী, এবং সর্বশেষে কোনার্কে মন্দির।
জুবেনেশ্বরের আর পুরীর মন্দির দুটির অনেক সাধুত্ব আছে।

হুঁটা মন্দিরেরই ভিতরে ক'রে অংশ দেউল, অগ্ন্যোহন এবং নাটমন্দির। হুঁটাবই প্রবেশ পথে হুঁটা সিংহের মূর্তি আছে। কোনাৰ্কের বেলায় বেধা খোদ—তুণ্ড একটা বিরাট বশ—পাণ্ডাভাৱ আকৃতিৰ মতো। এই বশের ওপৰেই ছিল যোগেশ্বর অগ্ন্যোহন এবং তার পশ্চিমে দেউল। অনেক বসন্তে দেউলটিকে দেখেছেন। তাৰপৰি নানা কাণ্ডে দেউলটি ধ্বংস হ'য়ে গৈছে।

মন্দিৰটিৰ পৰিৱৰ্ত্তন চমৎকাৰ। এখানে প্রাচীন যত্নে এক ক্লাসিক কলান্ধ। বিৰাট এক বশ চালিয়ে নিয়ে বাহ্যে সাৰটি ঘোড়া, চক্ৰবৰ্ত্তী চাকার ওপৰে স্থাপিত সে বশ। সমুদ্রে বিকে নিয়ে যত্নে হৰ্ষ সাংবি অৰুণেশ্বৰ সেই হৰ্ষ মন্দিৰকে। বিশ্বভাৰতীয় হেংহাং, তুৰ্ব্বাং হাং এর অধীশ্বৰ সগিষ্ঠ বশই বিগ্ৰহৰ একপ্ৰান্তে উৰ্ব্বিত হবেন, সমুদ্রেও পৰ্বে। সাদাধীন পশ্চিম অংশে বিচরণ ক'ৰে আবার ক'ৰে আনবেন এই বশে, তাৰপৰি অগ্ন্যোহন বিপুল বিজ্ঞানে পৰিচালিত কৰবে বৰটা সমুদ্রের বিকে। সমুদ্রের নীল তলেৰ কিম্বদন্তি এনে বশ দাঁড়াবে, তাৰপৰি হৰ্ষবেশ সমুদ্রে অগ্ন্যোহন কৰবেন এবং আবার প্ৰত্যুপে উৰ্ব্বিত হবেন পূৰ্ববিগ্ৰহে।

যাহোক, মন্দিৰ পৰিভ্ৰমণ কৰলাম। এ মন্দিৰটোৰ আঁৰ একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর গায়ে গায়ে আঁকা অলংকাৰ (আপাতদৃষ্টিতে দেখলে) অলৌকিক। নানাকন্দের উদ্ভট, অদ্ভুত আঁৰ বীৰত্ব নিলম চিত্ৰ। পুৰীৰ মন্দিৰে প্ৰথমে দেখলাম এ বৰণের মূৰ্ত্তি, সৰ্বসাধাৰণের সমুদ্রেও উদ্ভটভাবে প্ৰকট। কোনাৰ্ক মন্দিরের চাৰিবাৰ চূড়ান্ত অলৌকিক মূৰ্ত্তিতে প্ৰকট।

এৰ কাৰণ নিশ্চয়ই আছে—এবং অগ্নিশেষজ হুঁটিতে শুণ্ড অলৌকিক ছাড়া আঁৰ কিছুই চোখে পড়ে না। কিন্তু এই উদ্ভট নিশ্চয়ই কিছু আছে তার ভিত্তি বিশেষজ্ঞদের মত নেওয়া প্ৰয়োজন।

আমি এক বুঝা পাণ্ডকে জিজ্ঞাস কৰেছিলাম পুৰীৰ মন্দিৰে—“আচ্ছা পাণ্ডা ঠাকুৰ, এশ বছৰি অৰ্ধ কী ?” পাণ্ডা আমাৰ প্ৰেৰণেই অপ্রস্তুত হ'য়ে বলল, “না, না, লোকে বৰ্ষাৰ্থে অৰ্ধ কৰতেই আছে, ওহিকে নবৰ ধৰে না।” আমি বহন বললাম বুঝিয়ে যে নবৰ এড়ানো যায় না, শুধন

সে বলল, ঐক্যের ভাষাভাষা সবজ গোপী ছিল, যাহোক মাংস তিনি ব্ৰহ্ম কৰতেন। শুই সব বৃত্ত বেখল মনে পাণ্ডা ভাষা, শুধন সাধকৰ মন বৰ্ধে বিকে যায়।” পাণ্ডা ঠাকুৰ হুঁটা ব্যাখ্যা একেবারে নিশিয়ে ফেলেছে। ঐক্যের লীলাবেশা বেখলে একাধিক পুষ্কৰ বাক্যতো না; কাৰ্ত্তাই এ মত অৰ্ধবীৰ নয়। বিচীৰ মতটা বৰ্ণনকভাবে নেওয়া যেত পারে।

আৰু একটা ব্যাখ্যা শুনেছি। বাৰশ শতকে মুসলমানদের পূৰ্বভাৰতে অধিষ্ঠান। কালিঙ্গের অগ্ন্যুৎপত্ত ওপৰি মুসলমানদের আত্মী ঘোড়ার জুৱেৰ শব্দ ভেগে উঠল। তলোৱাৰে মাংসে পাৰাণ—মাংসৰ কিছুই বেহাই পেল না। বেহাৰবীৰ মন্দিৰ সব মূৰ্ত্তিৰে পড়ল সেই সৈনিকদের কাছ। শুধন বটে ঘেঁৰে ঘেঁৰে ঘেঁৰে—ওটা মুসলমান, নারীবিলাস। সে অজ্ঞেই হয়তো নারী-মন্দিৰ শুই উৎকট চিত্ৰ অগ্ন্যোহন বসানো হ'ল মন্দিরের নাটমন্দিৰে ও অগ্ন্যোহনে; দেউল অৰুণ শৰ্প কৰতে বেওয়া হল না এ কালিমা। উদ্ভট হল—মুসলমানেরা বহন আসবে, নাটমন্দিৰ আঁৰ অগ্ন্যোহনের শুই চিত্ৰ দেখেই ওটা ভক্তিভক্ত হ'য়ে যাবে, এবং বিগ্ৰহ পৰ্বত হয়তো পৌৰ্ণবে না—অৰুণ বিগ্ৰহ পৰ্বত পৌৰ্ণবে পৌৰ্ণবে পুৰাণীরা অপসৰণ কৰতে পাববে বিগ্ৰহকে।

এ বৃত্তিৰ ঐতিহাসিক বুঝ কতখানি তা অৰুণ জানি না।

যোতলাৰ চাতালে অনেকগুলি অসাধাৰণ স্তম্ভৰ বেখাশীৰ মূৰ্ত্তি আছে, এত স্তম্ভ স্তম্ভৰ যে বেখলে অৰুণ যত্নে বেতে হয় আঁৰ চোখেৰ বল ফেলে বৰ্ণনাৰ জানাতে হয় সেই স্তম্ভাটোৰ নামধীন শিল্পিত্বকে। বৃগ্ৰহাধীনবৰতা বংশীবাতি কলশাকী বেখাশীৰা বাঁড়িয়ে বেন স্বাগত জানাচ্ছে পূৰ্ব্ববৰ্ণকে। এক কথা বলি যায়—এ এক ভাষাৰ অৰুণ কবিতা।

আমরা বুঝ বুঝ বেখাশীলায়—কিন্তু মাংস বাৰ সাংসলন হাইপতি বাওঁপ্ৰমাণ। তিনি আশ্ৰমে জেনে যাতো পুষ্কৰস্থল বাঁড়িৰ মন্দিৰে। শক্ত কাঠের মতো জুতো পৰে ওটা লাঠি হাতে ক'ৰে মন্দিরের ওপৰে গিয়ে উঠল। বৰ্ণনাখীৰা ভক্তিভক্তের জুতো নিচে খুলে রেখে যায়—আঁৰ

দেশেই থাকুক যত্নের এমন আচরণ! আমি দে-কথা বললাম একজন সিপাহীকে, সে বলল, "মল্লির তো ঠাঁহুর নাই!"

সাদে আটটার মধ্যে আমাদের বার ক'রে হিলে। কী আর করব—নবগ্রহের মন্দির বেঁধে বাইরে চলে এসাম। অদূরে সমুদ্রের নীল রেখা।

প্রায় দশটা বেজে গেল। ঠাঁয়ে গাঁড়িয়ে থেকে পা বাধা হ'লে বাবার উপক্রম। শেখ এলেন বাতেন্দ্রপ্রসাদ। আমি কী আর করব—চট ক'রে তাঁর একটা কোটো জুতো বেগলাম খুব কাছে থেকে। ধানিকঙ্কণ বাঘে বলসান একজন বুড়ো পুলিশ অফিসারকে—"এবার আমাদের বাগ্জা ছেড়ে দিন—আমাদের বাস অথবা দু'ঘণ্টা গাঁড়িয়ে থাকুন? তিনি বললেন, "গাঁড়ান, এস, পি, কে বলে ঘেঁপ!" এই বলে বাঁধ সংগে কথা বললেন তিনি আটশ উনত্রিশ বছর I. P. S. দার্কী একজন বুঝ। পরে বুঝলাম—এই হচ্ছে S. P. মেলা শাসককেও বেথলাম অন্নব্রহ্মণের, অরো অরো আমদের বরষ গুনলাম—ডি, এন্স, আর এন্স, পি উভয়েই নাকি বাঙালী।

অল্পমতি পাওয়া গেল। পুলিশ সাহেবের নির্দেশে আমাদের বাসের ড্রাইভার ছোকরাটি ভয় পেয়ে গিয়েছিল, বা গুরুকে গিয়েছিল। তাই সে এমন বৌ করে ছাড়লো যে বাগটা গৌ গৌ করে একেবারে পুরীতে গিয়ে শেষে থামলো।

পুরীতে পৌঁছলাম যখন তখন প্রায় তিনটে বেজে গেছে। বাগ্জা-বাগ্জা সেরে সামান্য একটু বিজ্ঞান ক'রে আবার বেরোলাম বীচে। পুরীতে এসে স্রাঞ্জি লাগে না কেমন যেন। বীচ ছেড়ে দিয়ে বাগ্জা উঠলাম, একাকী। মনের কোণে ইচ্ছে ছিল যদি ওদের সংগে দেখা হয়ে যায়! সেদিন অনেকদূর গুরা আঁধ চলে যাবে। কাজেই আমাদের পথ ওদের বাড়ির সামনের দিক দিয়ে চলল। পলিহ মোড়ে চাষখানা বিকসো দেখে অবাক হলাম না। প্রথম বিকসোয়

ওর ঘাড়ের সংগে শু ব'সে। আমি শাশ বিয়ে যেতে ও লক্ষ্য করেছি। ওর বাবার সংগে কথা বলতে লাগলাম, বিহার-মধ্যনা জানালাম। একটু তাকিয়ে বেথলাম সাগ্রহে ও লক্ষ্য ক'রে দেখছে। ভাগ্য খাপোপ, ওর বাবার সংগে আলাপ করবার বিষয় ছুরিয়ে খেল চট ক'রে। তারপর আর কোন্ ওজুহাতে গাঁড়িয়ে থাকি? বাধ্য হয়ে নরকুর আনিরে চলে আসতে হ'ল। ওর দিকে তাকিয়ে বেথলাম ওর সাধা স্বকলকে দাঁত দিয়ে ডান হাতের অনামিকার অগ্রভাগ আলগোছে খুঁটছে।

আমি এসে গাঁড়ালাম আমাদের ভিক্টোরিয়া ক্লাব হোটেলের সামনে। এতই গামনে বাস্ত—টেশনে বাবার ধানিকঙ্কণ অপেক্ষা ক'রেই দেখতে পেলাম বিকসোগুলো আসছে। আমি একটু অসহনমততার ভাব নিয়ে গাঁড়িয়ে রইলাম। একের পর এক বিকসোগুলো এসে গেল। শেখগরের মতো এগুটা হানি একে বিয়ে দেখা চল গেল। ওর দাধা বলল, "চলুন!" আমিও বললাম, "আজ্ঞা, আবার দেখা হবে!" সেই আবার দেখা হওয়ার অদূর সম্ভাবনার ছবিকে অল্পষ্টর করতে করতে মিলিয়ে গেল বিকসোগুলো।

আর কোনদিন দেখা হবে না—সে অজ্ঞেই তো দেখতে ভাল লাগল। খেউ কারো নাম জান না—শুধু কয়েকটি বুদ্ধের অনিবিজ্ঞান্য পরিচয়। সারাটা জীবন যদি এমন দ্বন্দ্বিক পরিচয়ের সংগমক হত।

সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছিল। হোটেলের বহর দিয়ে এলাম। ফ্রান্সোয়া সার্লার বৌঝো জিন্তেসু বইটে পড়তে লাগলাম।

১৯৪৭ সাল শেষ হতে চলেছে। বিহার ১৯৪৭। জীবনের নিরবচ্ছিন্ন গ্রন্থরচনার মধ্যে লাস নীল হাগের ঐকিমিত্তি একে বিয়ে গেলে ছুমি। কালই বিয়ে চলে যাব পুরী থেকে, কিন্তু অন্ততঃ কিছুবনের ভক্ত যেন তোমায় না জুলি।

দিদি

শ্রীঅবনীনাথ রায়

আমার হিহিকে আশ্রয়তা কেউ দেখেননি—সকলে
মিস্ত্র বসন্তেন, হিহিব মত ভাল মেয়ে বড় একটা হয় না।

আমাদের কোন কাজ হিহি না বলে হত না। সকলে
উঠে বাবা মুখ বুজে বসতেন—দাঁতন এনে এবং গাড়
পানছা দিয়ে যেত হিহি। তারপর চা মল খাবার
এনে দিত হিহি। ঘরের সমস্ত তার ব্যবস্থা করে দিত
হিহি। বাড়ির বাইরে একটা টিউবওয়েল ছিল—তার মল
পাম্প করতে হত, সে কাজ করত হিহি। কোন দিন ঘর
বাথর শরীর খাওয়া হত তবে ছোট ছেলের মত তাঁকে
নাইয়ে দিত হিহি। মাথার মল নিয়ে তেল দিত এবং
তারপর তেলের দ্বারা স্নান করে দিত। কাজ
সকলেই করে কিন্তু এমন প্রাণ দিয়ে করতে কাউকে
দেখি নি। ভাত খাওয়ার সময় পাখা হাতে করে এসে
বসতো এবং ঘরমল খাওয়া না শেষ হর ততক্ষণ সমানে
বাস্তাস করতো এবং ভাতে নাছি না বসে তা দেখতো।
তারপর পান পোস্তা এনে দিত। সকলের বেলায়ই এই
ব্যস্থা। কারো কিছু ঘরকার হলে সকলেই হিহিকে
ডাকতো। হিহিও কখন কার কোন্‌ জিনিষের ঘরকার
হবে সব জানতো এবং কেউ চাওয়ার আগেই তার হাতের
কাছে এনে পৌঁছে দিত। মল হয়েছিল এই বে হিহির
এক নুহুন্তের অবকাশ ছিল না। সমস্ত দিন এবং রাত্রি
ঘণ্টা পর্যন্ত চরকির মত ঘুরতে হত। রাত্রে সকলকে
বাইরে তব হিহির খাওয়ার সময় জুইতো এবং তারপর
ছুটি।

হিহির নাম ছিল বেবতী। কিন্তু সকলেই বেবা বলে
বলে ডাকতো। হিহির মাঝার চুল এত লম্বা ছিল যে বসে
চুল ঝাং যেত না—বসন্তের ছড়িয়ে পড়তো। দাঁড়িয়ে চুল
ঝাংতে হত। আমাদের অস্থায়ী আগে ভালই ছিল—
অমিয়াহি ছিল—হরমল হাতী ঝাং থাকতো। পোখা
হয়নি ছিল। এই ঘর একদিন হিহিকে মেয়ে কেন্দ্রে

গিয়েছিল। হিহিই প্রতিদিন হাতে করে হরিণকে
খাওয়াতো। একদিন খাবার দিতে ঘের হয়ে গিয়েছিল।
তারপর হিহি ঘর খাবার দিতে যাচ্ছে তখন মালা বয়স
করলেন। বললেন, হরিণ বেগে আছে—আজ আমি নিজের
হাতে খাবার দিতে যেও না। কাউকে দিয়ে বহু পাঠিয়ে
দাও। হিহি শুক্লো না। বললে, আমি তোমাকে
খাওয়াই—আমাকে কিছু বলবে না। এমতু পড়েই হিহির
ভয়ানক চীৎকার শোনা গেল। সকলে ছুটে গিয়ে দেখলাম
হরিণটা শিংয়ের আড়ালে দিয়ে হিহিকে হেঁশালের সঙ্গে চেপে
বসেছে—হিহিকে বেজতে বিচ্ছেদ না। তখন মালা একটা
লাঠি নিয়ে এসে হরিণের শিংয়ের মধ্যে চালিয়ে দিল এবং
সেটাকে ছুঁয়ে দিল। হরিণটা উঠে জুড়ুম করে মাটির
উপর আছড়ে পড়লো—তার শিং তখন উঠে গিয়েছে।
খানিক ছটকট করে হরিণটা মারা গেল। হরিণের মায়া
করতে গেলে সেদিন হিহিকে বাঁচানো যেত না।

হিহির এবংর দিয়ে হয়ে গেল। আমাদের বাড়ির
সমস্ত আলো ঘন একদিনে নিভে গেল। আমাদের বাড়ি
আবার করে হিহি তার খন্তর বাড়িকে উজ্জল করে
দুললো।

হিহি বাড়ির বড় খে হয়েছিল—তার আর ছুঁলন আ
ছিল। কিন্তু তারা হিহিকে আ বলে মনে করতো না—
বোন বলেই মনে করতো। ডাকতো ‘হিহি’ বলেই।
হিহি তাদের পারতপক্ষে সংসারের কাজ করতে দিত
না। বলতো, তোরা এখন ছেলে মানুষ, তোদের ত পরে
কাজ করতে হবেই। এখন তোরা একটু বসে জিরিয়ে
মে। এখন আমি বহু কাজ করি।

হিহির পর পর চারটি সন্তান হল। পঞ্চম সন্তান
জুঁজি হওয়ার পর হিহির শরীর আর পারলো না।
সকলেই বুঝলো হিহির এবংর সময় চলেছে—হিহিকে ছেড়ে
দিতে হবে। হিহি নিজেও একথা বুঝতে পেরেছিল।

সেই সন্ধ্যার কথা বুকের মধ্যে কেটে বসে আছে, কোনদিন ভুলবে না। ডাক্তারের ঘরায় বিয়ে গেলেন। দ্বিদি একে একে সকলকে ডেকে দেখে দেখা করে নিল—স্বামীকে ডাকলো, বললে, ছিঃ, কেঁবো না। স্বী চিরকাল কারো থাকে না। তিন মেয়ে এবং ছেলেটিকে ডেকে তাদের আশীর্বাদ করলো। ছই মাকে ডেকে আশীর্বাদ করে বললে, জা বলে কোন দিন মনে করি নি, যেন বলেই মনে কয়েছি। ভোমরাও তাই মনে করো। ছেলেটি এবং মেয়ে তিনটে থাকলো। তাৎপর্য নাহুৎ কোরো। এই শেষ কথা। তারপর বালিশে মাড় বৈকিয়ে অস্তবিকে সুখ ফেরালো—আর সেই মুহূর্তে প্রাণটা বেহিয়ে গেল।

দ্বিদির কুল দিয়ে দাবিয়ে দেওয়া হ'ল। পায়ে অলঙ্কার, দ্বিদিতে সিন্দুর। 'এরোরাণি ভাগ্যমানি' হিন্দু বধুই বোধ হয় এই বকম বৃত্তা কাম্য। কুলের বিছানার যেন দ্বিদি খুঁষিয়ে আছে মনে হ'তে লাগলো। চারিপাশে শোকাত্ত আত্মীয় পরিজন।

বৌদির শেষ সময় বুঝতে পেরে দেবো দেওর পায়ের উপর মাথা রেখে চোখ বুঁজে শুয়ে ছিল। এখন তাকে সকলে উঠে পড়ার লজ্জা ডাকডাকি করতে শুরু করলো। কিন্তু সে ভুটেও না, কোন উত্তরও দেয় না। তখন একজন কেউ তাকে জুলে আনতে চেষ্টা করলো। সে তাকে নেড়ে চেড়ে বললো, দেহ পাখ্যের মত শক্ত আর ঠাণ্ডা।

তার দাধা চেঁচিয়ে উঠলো, ডাক্তারবাবু, ঈশগির যেখান—আমার এক বিপদের উপর আবার এ কি বিপদ হ'ল।

তাকে পানের ঘরে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। ডাক্তারের বহু শুক্রব্যায় এবং শুষ্ক দেহের ফলে পরের দিন তার জ্ঞান হ'ল।

বাড়ির সামনেই নদী—নদীর ঘায়ে শশান। সেই শ্মশানে দ্বিদিরকে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু দ্বিদির মৃতদেহ বাড়ি থেকে বেব করার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ছই বধু ছুটে বেহিয়ে এস। তারা চেঁচিয়ে কেঁদে বললো, আমরাও সঙ্গে যাব।' এরা অস্তঃপুচ্চাদিত্তী—কোনদিন বাড়ির দরজার বাইরে পা বাড়ায় নি। যখন তাৎপর্য বাধা দেওয়া হল তখন সেইখানেই তারা মূচ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

আমার মায়ের বয়স তখন দশের পেছিয়েছে। তাঁর কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছলো তখন তিনি বাড়ি ছেড়ে বেহিয়ে পড়লেন। গদা আমায়ের বাড়ি থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে। বললেন, আজ থেকে আমি গদাভীরে বাস করবো—বাড়ি কিরবো না। আমার দাধারা অনেকবার মাকে ঘরে বাড়ি নিয়ে এসেছেন কিন্তু বাধ্যতে পারেন নি। ব্যস্তির অঙ্ককারে কের পালিয়ে গেছেন। অবশেষে গদার ঘায়ে একখানি ঝড়ের ঘর ক'রে দেওয়া হয়েছে—সেই ঘরে থাকেন। কোন দিন যান কোন দিন তাও হয় না।

জামাইগণ একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। যা দেখা করলেন না—বললেন, এই যুগ আর আমি তাকে দেখাবো না।

দ্বিদির ছোট মেয়ে গায়ত্রী এখন বড় হয়েছে—এখন সে জানে তার মানেই। আগে জানতো তার মা গদা স্থান করিতে গেছে—আবার আসবে। অনেক দিন যখন আকাশ অঙ্ককার করে দক্ষ্য নামে তখন তাকে বাড়িতে বুঁজে গাওয়া যায় না। রোজ করতে করতে দেখা গেছে সে শশানে যেখানে তার মাকে বাহ করা হয়েছিল সেইখানে আসন পিঁড়ি বসে আছে।

এখন আপনারা বসুন দ্বিদির মত মেয়ে কি হয়।

লাইফটাইম

পার্শ্বপ্রতিম চৌধুরী

যে সকালটা অসন্তুষ্ট হয় বাজারের ভিত্তি ধ্বংস আর লাভালাভগানের দ্বন্দ্ব বেগ বিয়োগ নিয়ে তাকে বক্রিণ বছরের জীবনে একটি দিনের ব্যস্ততা কমা করতে পারেনি বিপুল।

তবু কখনোই গলা খেন সাবানটা পাড়াকে জানান দেওয়ার ভয়েই।

ঃ ইস্, এইভাবে দেউ টাকা নষ্ট করে; একটা পড়া ইপিথনাক্ষ কিনে আনলে কিনা দু' ছুটো টাকা নষ্ট করে। এই বারসেই জীবনভিত্তি হলো তোমার! গোপের নংবা কি বেগে বসে আছে একেবারে?"

না, চোখেই নংবা খাটনি বিপুল; কিন্তু নিঃশব্দে নিজের অজানাতাই মনের মাথা বেয়ে বসে আছে সে। নিঃশব্দেই। নইলে পাঁচবছর আগেকার কবি নাটকটাকে সংসারের ময়াল সাপটা ছোঁলে ছোঁলে এত নিঃশব্দ বা কল কি করে? আশ্চর্য, জল পড়ে, পাতা নড়লে মিলেও যোগদান মনে আসেনা বিপুলের—কখন তাকে নিয়ে বললে মাথা গরম হয়; উদ্ভটময় সমস্ত শরীর তার চেতনাকে অকমতার শিথিল হোক্কে নিইয়ে তোলে খেন। অথচ বেই দিনের কথা নয়—

ঃ এবারের শাবদীয়াগুলোতে যে কটা কবিতা লিখেছেন, অপূর্ব হয়েছে কিন্তু! সত্যি আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না!

ঃ বেশতো। সবকথা বাড়িয়েই যে বলতে হবে এমন কোন মাথার দিবা নিশ্চয়ই আমি দিইনি।

মাইনাস কোরেই চমকটাকে আর একবার সামনে নিয়ে বিপুল কলেজের সপাটিনী দিতা ব্যাগকে যে উত্তর দিতেছিল, মুখে ক্যান্ডেগার্স সিনঃগেটের খোঁয়া ছেড়ে বোধহয় সেই একই কথা বলতে হয়েছিল বন্ধ অক্ষয় সোমক।

ঃ তুই মেহাবাই দেখছি আমার fan! নইলে তোমার মত ক্রিটিকেরও যদি আমার সেবার প্রাণশা করতে গিয়ে বিশেষণের ঠেকে শট পড়ে, তবে তো লক্ষ্য ছাড়া খেচ করার মত আর কিছুই থাকেনা।

ঃ তুই খেটা যেসে উড়িয়ে হিস্ সেটা অবিকালে কেজ্রেই সবচেয়ে হামি আর নানী কথা। আমি, আরও প্রাণশা শুনেও চাপ বলেই মুখে বৈজ্ঞব বিনয়। কিন্তু বিখ্যাস কর ভাই তোমার 'স্বদেশি' কবিতাটির এত অপূর্ব ডেপ্‌থ oh I can't think of it! বিশ্বাস না হয় সামনের সংখ্যা বহুভবীতে শুধু তোমার ওই কবিতাটির ওপরই একটা সমালোচনা লিখছি—বেতলে বেথে হিস্, ডেবাল প্রাণশার সঙ্গে ষ্টটি ক্রিটিকমের তফাৎ কোথায়!

সত্যি, অস্ত্র কিছু না হলেও আশ্চর্য তফাৎ সেদিন দুঁবে পেয়েছিল বিপুল সেই বিখ্যাত সোমখয়ের অক্ষয় সোমের মুখে, চোখে, ভাষাতে কিংবা উচ্চসত্যায়।

ভক্তি ভাল; বক্তব্য ভাল; বক্তার প্রজ্ঞা কিংবা প্রতিভাও উপেক্ষণীয় নয়। প্রাণশা চতুর্বিধ। কাগজে, মুখে, বেডিঙেতে, লিখিতা পত্রায়। কিন্তু তবু ক্যান্ডেগার্স ছেড়ে ভাল করে একটা আন্তঃশাস্ত্র ক্ষেত্র খরতে পারেনি বিপুল—এ মুখে তার ছেঁড়া পকেটের অচল দু'খানিটাও যদি বৃক্ষতো। বৃক্ষতে পাতলো অ্যাপলেটেনেট পেটোংখানা হাতে নিয়ে—না, এবার তাহলে একটা কিছু ব্যবস্থা হ'ল যোগ্য। তাহলে ইতি বোধহয় হ'লনা ইতিকথার। না, লিখবে সে—গদ্য, কবিতা, উপস্তায়, প্রবন্ধ সব কিছু!

অবিত্তি সেদিনের সেই খোলাটে হৃদয়ের ভীম প্রতিজ্ঞার ষোড় আর একটা বসন্তের বোম্বুরে এসে সম্পূর্ণই ঝোলো হয়ে গেল। শুধু ঝোলো নয়, সমস্ত

চেতনায় যেন ছত্র এলো বিপুলের; একশ পঁচিশ টাকা মাইনেব আইসেন্ট যোকানোব প্যাকিং ডিপার্টমেন্টের সুপারভাইজার, তার আবার বিয়ে! এ যেন অনেক-গুলো খুনের পর কানীস হাট্টাকে গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে সূলে পড়ার মতো। নিশ্চিত অর্থ নিরর্থক নয়।

কী করবে ভেবে পাচনা বিপুল। অর্থ ব্যক্তিগত চড়া না, ভাই, বোন, অজ্ঞাত আত্মীয় স্বজনরা কেউই তার সঙ্গে যুক্তনোব মতো ব্যবহার করলেন না—শেষ পর্যন্ত মেয়ে ঠিক, মায় কথা ঠিক, আখেরে আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু তখনও আত্মীয় হ'লোনা বিপুল; ক্যান্সাস হয়ে গেল ক্যালটেক্সের ইন্টারভিউ লেটারখানা হাতে নিয়ে। চুপি চুপি লুকিয়ে চুপিয়ে যে ঘরবাড়িখানা করেছিল বিপুল বোন, ক্যালটেক্স তার ঘর বেপেছে। এমনকি শেষপর্যন্ত ঘর বেশ বাপলো তারা। চাকরি হলো বিপুলের। এখন সে আত্ম একশো পঁচিশের মত কবি নয়, পুংপুবি আড়াইশো টাকার মত কবি।

শেষদিন তার পুরোনো চাকরিতীতেও মর হয়ে কি ভাঙছিল বিপুল। পার্কার সাইফটাইমবী যখন তার হাতে এস প্যাকিং-এর কাজে তখন কলমটা বেখে তার সমস্ত শরীরে সমুদ্রের কোয়াথ এলো বোধহয়। সেই রক্ত, সেই ডিভাইস। এই বকমই একটা পার্কার সাইফটাইম দিয়ে সে তার সাহিত্য জীবনের প্রথম সাফল্যের স্নোক লিখতে শুরু করে। উত্তরস্বীরেব মধ্যে বিখ্যাত সাহিত্যিক তার বাবা দুঃশাখার তার হাতে জুলে দিয়েছিলেন মৌঃ। হাতে জুলে নিয়ে লেখা শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত নেই। হাতে হাতে রাখতে পারেনি বিপুল। বারিষ্যের মতক শিকারে যখন চূড়ান্তভাবে ক্ষত বিক্ষত আত্মারের বিপুল বন্ধু, তখনই কোন এক দুর্বল মুহূর্তে সে তার পার্কার পেনটা খেচে দিয়েছিল—মাত্র পনেরটি স্লগার টাকার রূপকে পকেটস্থ করে প্রকৃতিস্থ হবার অবসার।

তাই আজ "টাইলোমার্ট"র প্যাকিং ডিপার্টমেন্টের বিপুল বন্ধুর চোখে নেনে এস ঘন ঘাড় কোন রোগধনের পটভূমিকা বা পদক্ষেপই সন্নিবিষ্ট করে গেল পেনটাতে বর্ডমান প্রথম স্পর্শ পেয়ে। বিলু বিলু ঘাম জমে উঠল বিপুলের কপালে, শিরায়, শরীরের সমস্ত উপত্যকার।

হয়তো কোনো মারোগাড়ী-মন্দন শব্দ করে কিনে নিয়ে যাজ্জন কলমটি—বা কিসে ভবিষ্যতে পাড়ীর টাইটার পেটলের বিশেষ ডাড়া আর কিছুই রাখবে না। না, কিছুতেই তা সম্ব করতে পারবে না বিপুল। অথচ তেঁপে রেখলে এমন সুযোগ তার অতীতেও আসেনি আর ভবিষ্যতে আসার তো কোন প্রায়ই শুটে না। কান্দণ, কাল থেকে "টাইলোমার্ট"—এ সে আসিছেই না, কাল থেকে তার নয়। চাকরী, নতুন জীবন—পুরো আড়াইশো টাকার—যাজ্জেশ্বর অ্যানিভার্সার নিশ্চয়তার। তাই মিনিট করেকের তক্তে কি একটা হেবে নিল বিপুল, তারপরে তার আন্সিষ্টেট সুযোগকে দিয়ে অজ্ঞাত জিনিষ পত্রের সঙ্গে পেনটা প্যাক করে পাঠাতে আরো কয়েকটি মুহূর্ত ব্যত হলো মাত্র।

তারপরে "টাইলোমার্ট"! বিহার তোমাকে!—ক্যালটেক্সের ইন্সপেক্টর বিপুল বন্ধু। ক্যান্সেসও হেড়ে গোডফ্রিক না হলেও উইলস তো বটেই। দেশার ঘন হর বিপুল; তার জীবনের সমস্ত কান্দনা, বাসনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা বা আরও একটা বিশেষ বৃত্ত খুঁজে পায় কন্নার মধ্যে। বিয়ে হয়ে গেলে সে সুহৃৎকিরও প্রাণনা না করে থাকতে পারেনা বিপুল—কন্নার মত সুন্দরী স্ত্রী কখনোব ভাগ্যে লেখা থাকে! বিয়ের পরে কয়েকটা বছর কাটলো যেন এলিফ্যান্টের সমরকার হেনেদাঁর মতো—সাহিত্যে, সাফল্যে, জীবনে, মননে, সুখে, শান্তিতে।

কিন্তু পাঁচবছর পেরিয়ে যন্ত্রের স্বভাবের এলো আবার আবিষ্কার করলো বিপুল জীবনটা নেহাৎই একটা হেনেদাঁর ছইকী। উত্তেজনা সাময়িক। বেশা প্রাণাণত। আড়াইশো টাকার মাইনেতেও তখন শুধে ক্যান্সেসও খেতে হয়; কান্দণ আরও ছুটি মাসের বোধহয় আরোজনটি সুখের হলেও উপসংহারটা পড়া ইলিশ মাছের তিক্ত বিপাকের মতই।

আর লেখাও প্রায় হেড়ে বিরছে বিপুল। তবে অতাব না হলেও, ষণ তার আছে, ফল সুভাব নেই। যোকন আর লছনী তো রাতদিন বক বক করে বাঙালি মাথার করে রাখে। তার ওপরে কন্নার এই দুবিবহ স্ত্রী। অসম্ভব না হলেও সম্ব করা যানে নিরুপায় নিরর্থক হয়ে যবে

ধাক। সেখানে কবিতা কটী আসে, গল্পের চাতাই বা কটা গম্বায়। তার ওপরে তার এতদিনের শব্দের কলমটীও পকেটমার হয়ে গেছে; অনেক কেতানভী কথা কলম তার—পার্কাসের নিব আর সেয়েনের বস্ত্র সমগ্র। তারী পরা ছিল কলমটী, কিন্তু সে ছুঃখ করে আর লাভ কি!

না, ছুঃখ নয় বরং এতো আনন্দের কথা। বাজার থেকে কেবাব পথে একটা দুর্গা গল্পের প্রট অসতর্ক ভাবেই যোগ হয় মাথার এনে গেছে বিপুলের। বতকণ না তাকে খাতার লিখে ফেলা যচ্ছে ততক্ষণ আর শান্তি নেই বিপুলের। পাঁচ সাত বছর অপেক্ষার নেই সাহিত্যসেবী মনটী যেন মাথা চাড়া দিয়ে হঠাৎ বিজোহ করছে আজ। তাই কন্যা বধন বলেছিল :

: ইস্! এইভাবে কেউ টাকা নষ্ট করে! একটা পচা ইলিশ মাছ কিনে আনলে কিনা হুঃটো টাকা নষ্ট করে! এ বরসেই ভীমবতি হলো তোমার। চোখের মাথা কি বেয়ে বসে আছে একবারে? তখন সে কথা কানো নেয়নি বিপুল। বেশ নিষ্ঠি করে বলেছিল :

: একটা কলম বোলাড় করে দিতে পারো? খুব ভালো একটা গল্পের প্রট মাথার এসেছে; লিখে ফেলি? কি বলো? The sooner the better।

উচ্চকণ্ঠে লবাব উচ্চকণ্ঠে এলো না বেথে আতর্ষ হল কন্যা। তারপর স্বামীর মুখে লেখার কথা শুনে অতীত দিনের গর্বের আত্মগটুকু আজও সে একবার বুক ভরে টেনে নিতে ছুঃলো না। অনেকক্ষণ মুড়ভাবে বিপুলের দিকে তুটী রেখে মাছকাটাও ঝিটটা নামিয়ে বাগতে বাগতে বললো কন্যা—

: কোথায় পাব আমি?

: কেন, পাশের ফ্ল্যাটের ছাদাদের ঘরের কাছ থেকে—উৎসাহের সঙ্গে যে কথাটি সূত্র করেছিল বিপুল তাকে মাস পথে ঝামিরে দিয়ে কন্যাই বললো এবার : হু! তোমার মত নির্লব্ধ কিনা, তাই একটা কলম পর্শ চাইতে বাবো পাড়ার পাড়ার। কেন নিজের কলম হারাবার নখাটী এখন বোঝো। এবার আরও কাছে এগিয়ে এসে কন্যার করে বিপুল—

: লম্বাটী, যা হয় একটি ব্যবস্থা ক'রো। ঈগলির! ছুঃমিতো অনো ঠিক সময়ে না বশতে পারলে আমার হাত দিয়ে একটা সাইমনও বেয়েয়ায় না।

এবার বেসে ফেললো কন্যা। তারপরে শোবার ঘরের দিক বেতে বেতে বলেছিল—

: আচ্ছা গো আচ্ছা! খুব ভালো একটা কলম দেখো তোমার! বেশি কেমন দুঃদিনে গল্প লিখতে পারো।

লিখলেও তো তবু ছুঃখ টাকা আসে। কন্যার পেছন পেছন যাব হুকলো বিপুল।

কন্যা আপনাবীট খুলে ফেললো। তারপর ডায়ের থেকে একটা কাঠের বাস্ক ভুলে নিল সে। বাস্কট যে কন্যার একমাত্র গোপনীর এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি তা জানতো বিপুল। সেই বাস্কট আজ অনেকদিন পর খুলতে যেখে প্রথমটার অবাক হয়েছিল বিপুল। তারপর তার মধ্যে থেকে ভাঙ্কড়ার পুটলিতে অড়ানো একটা শকরকে না হলেও হানী পার্কাস লাইফটাইম বার করে ফেললো কন্যা, তখন বিপুলের কপালের চোখ ওপরে ওঠার কথা।

কন্যা কলমটি নাড়ির ঝাঁলে সবত্র মুহুতে মুহুতে বললো—

: জানো, কলমটা এতদিন বারই কিনি। আজ তোমার বিলান! অবাক হয়ে যেখো কি? আমার খুউ-ব ছলে বোলাকার বন্ধ স্বর্ধা আমার বিয়েতে যিরেছিল এই কলমটা!

: স্বর্ধা!—মনে মনে একবার আশ্চর্য করে নিল বিপুল। কন্যা তখনও পেনটা সম্বরে বহছে। দুঃখীতয়া চোখ দুটিতে আরও একটু গর্ব এনে বলছে—

: তিনতে পারবে না। আমার খুব ভালবাসতো, তোমার সঙ্গে আমার বিয়েতে বড় দুঃখ পেয়েছিল স্বর্ধা। বিয়ের পর এটা পাওয়ার পরে আর খুলিইনি কলমটা। বরকার হয়নি ওটা পবন করার কারণ পবন পেয়েই মন ভরে গেছে আমার।

কন্যার মুখে এমন কথা শুনতে ভালোলাগার কথাও নয়, উচিতও নয়। কিন্তু বিপুলের তখন মনের অবস্থা অন্তরকম।

পেনটা আর ছিনিয়েই নিল সে কন্নার হাত থেকে। গছটা তাকে থাকালের মধ্যে লেব করতেই হবে। এ সময় এ কলম—এ যেন আকিনিউপের ইউরেকার মত। কলম হচ্ছেই হ'লো—কবে কোন হুঁহা কি চহুহা বিয়েছে তাই বিদেশটা অন্ততঃ এ সময়টা মাইবা রাখলো বিপুল।

চট করে কলমের খাপটা খুল ফেলতেই আশ্চর্য হয়ে গেল বিপুল—কলমের নিবলুকু মাথাটাই নেই! শুধু ব'ড়টা ঘোড়া ছিল ছে। আদল গিনিখটাই উখাও! কন্নাও সেহিকে চেয়ে হঠাৎ যেন বোকা বনে গেল একবারে। আর

অনেক কিছু একসঙ্গে বলতে গিয়ে বিপুলের মনে হ'ল, হুঁহাও কি তাহলে ষ্টাইলোনাট থেকে পেনটা কিনে নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে খুলে দেখেনি—বা যোকানে দিয়ে এসে রিপোর্ট করেনি!

হুঁহার প্রশ্ন এবার কন্নার অন্তর বলে মনে হলোও কেনন যেন নিইয়ে পড়লো বিপুল। কন্না বিপুলকে কন্না করলো কিম্বা বিপুলের কান্নার উপায় নেই, কিন্তু কন্না'কে এবার কন্না করতে আপত্তি থাক। উচিত নয় বিপুলের।

খয়ের গুটটা কি এর চেয়েও দুর্গস্ত ছিল?



সুরেন কুশায়ী শ্রীমুপেন্দ্রকুমার দত্ত

বেশ তো ভুলেইছে তাকে। অমনাই যে ভুলেও
বলছি। কেবল জীবনের একান্ত কাহাকাছি একদিন না
একদিন ঘাবা এসেছিল তাইহে কথা অত্যাশ্রিত প্রতিদিন
প্রত্যন্তে যখন অঙ্গ কবি, স্বস্তিতে সে বেঁচে ওঠ।

একটি বোটার আমরা পাঁচটি মূল—কুতল, চাক, সুরেন
জীবন আর আমি—যেন পূজার মতই তোলা হয়েছি।
ভারত জার্মান যুদ্ধের তখন প্রচণ্ড খাতা বেধেছে,
চোকোলেটাক বিপ্লবীরা খবর দিয়ে দিয়েছে—কোলকাতার,
বালেশ্বরের, বেশ বিধেপের আরও সব আড়ম্বল্যে তেজে
গেছে; বাসবিহারী জাপানে, বতীন্দ্রনাথ চব্বাখোর দুঃখ
দুঃখ বরণ করেছেন; বাহুগাপাল, অমরেন্দ্রনাথ, অতুল ঘোষ
সত্যীন্দ্র চক্রবর্তী পলাতকের জীবন যাপন করছেন।
আমরাও পলাতক, কিন্তু বোঝাকরা করি। ওই মং
জীবন একদিন খস পড়লো, কলকাতার রাজ্য থেকে ওকে
থরে নিয়ে গেল।

একটা ঘটনা ঘটে গেল। গুলি লাগলো আমার হাতে,
চাকর পিঠে, সুরেনের তলপেটে। সুরেনকে বরাবর করে
নিরে গাড়িতে উঠলাম। ওর মাথাটা আমার কোলে
বেধে শুইয়ে দিলাম। শুনেছি, দুহাংর আগেই বাঁচবার
আকাঙ্ক্ষাটা প্রবল হয়ে ঘোষা ধের। কিন্তু সুরেন বাক
সব চেয়ে ভালবাসে তারই ঝিবে হাত রেখে বললো, আমার
দেখ করে বেধে যাও। বললাম, কেন, তুমি সেবে উঠবে।
বললো, না, আমি বাঁচবো না, বাঁচলেও আমার নিরে
আপনারাই বা বিপর হন কেন, ওরাই বা টানাহাঁচড়া
করার সুযোগ পায় কেন?

বসন্তে বলতেই ওর মাথাটা আমার কোলে চলে
পড়লো। বরাবর করে পক্ষাৎ ঘরে শুইয়ে দিলাম। তখন
আর বেঁচে নেই। তবু...কি আমি? বাক সে অশ্রুতোপ
করেছিল, সে-ই মাথার একটা গুলি করলো। সেখানেই
ওকে রেখে এলাম। গাড়ীটা চলে গেল।

এই দুহাংর তো ওর পরিচয়। ওর বাবার নাম, ওর
গ্রামের নাম, জন্মভাগও কি কখনও? জানলেও, একচল্লিশ
বছর পরে আর আর মনে করতে পারবো না। শুধু জানতাম
ওর বাড়ী ছিল খুলনা জেলায়। আর জানতাম, জীবনে ও
নিজেকে বিলিয়ে দিতেই চাইতো, আর কিছুই চাইতো
না। ১৯১৪—১৫ সালে যখন আমরাও শুনেছি, সে-ও
শুনেছে, বিপ্লব হতে চলেছে, তারপর থেকে অন্তত হৃদয়ভরও
জিজ্ঞাস করছে এই প্রশ্ন থাকে মাহুংটি, কিছু করে যেতে
পারবো তো? করতে পারবো তো? মরার সাধ তার
মিটেছিল। আর কোন্ সাধ মিটেছিল আমি না।

আগের কথা। হৌলতপুর কলেজে পড়ি আর বিপ্লবের
হল গড়ি। সহায়—হোষ্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট কনামণ্যাত
নিম্মাত্রী শনিচূষণ হারচৌধুরী, অধ্যাপক যদি শেঠ,
অধ্যাপক শরৎ ঘোষ, আর প্রথমটা ডাক্তার কুশল আচার্য, পরে
ডাক্তার অনুল্য উকিল। হৌলতপুর কলেজে তখন একটি
ক'রে হরিজ ছাত্র প্রত্যেক মেলে বিনা খরচে খেতে পেত।
একটি সহপাঠীর বাড়ী থেকে কম টাকা আসতো, আমরা
তিনজনে মিলে তার অভাব পূরিয়ে দিতাম। কলেজের ছুটি
ঘরে গেছে—ছাত্রদের মধ্যে আমি আমি আর অধ্যাপকদের
মধ্যে অনুদান। চিত্রিত্তে শব্দ এলো, হলের এককনের বাবা
বলেছেন, হোষ্টেলের খরচ চালিয়ে তাকে হৌলতপুরে
পড়াতে পারবেন না, নড়াল গিয়ে আস্ত্রীর বাড়ী থেকে
পড়তে হবে। হলের বিক বিরে ওকে আমরা ছাড়তে
পারিনে, আর আশ্রয়স্থান বোধ ওর এত তীক্ষ্ণ যে, আস্ত্রীর
বাড়ী থেকে পড়া পোষাবে না। আর এককনের তাঁর
বক্তব্য বতীনবা (বতীন রায়) আমার উপর দিয়েছিলেন।
শব্দ এলো, তার বাড়ী পুড়ে গেছে, বাবা আর কলেজে
পড়ার খরচ দিতে পারবেন না, পড়া বন্ধ করতে হবে।

অন্যদিকে গিয়ে বললাম, কি করি? তিনি ১০০
টাকা মাইনের ৫০ টাকা বিপ্লবের কাজে যেন, নিজে

মাছের গুয়ে কাটান। এই তখনকার দিনে এঁদের জীবন।
বললেন, তেবে বেখ।

পতর্ঘমেন্ট বিল্ডিংএর ঘোড়াসার খোলা বাহানা। বহু
স্বাতি বিকশিত। সূত্রার অঙ্ককারে শশীবার কথল পড়তো
এখানে—ওয়ার্মিণ্টেনের জীবন কথা। সুনাতেন আমাঘের—
অর্ধ ওয়ার্মিণ্টেন নয়, বুকার টি ওয়ার্মিণ্টেন। সূত্রার আগতেন
রাতের বেশার। ভোজের আলো ছুটবার আগে বর্ণবিপলিত
সেয়ে গান ধরতেন, চিত্তর মন মানস হরি চিত্রবন নিবন্ধন।
নিশি ধি-প্রহরে সগাই বুদালে শতীনবা (বুবাঝি) বসতেন
ছ'একজনকে নিয়ে—বিল্লবের রূপ আর উদ্যমান ছুটে
তুলতেন বুকে আর মাথার তার ছক। উপরের আকাশের
বিকে তাঁর দৃষ্টি। আর ঐ আকাশের মতই বিস্তৃত তাঁর
বুক—ছুইই যেন ধরে তারা।

অর্ধেক বাড়ি কাটলো—ঐ নিরিবিলি বায়নাধোয়ার
পাক্কাবি ক'রে। অপরদীঘ তুষ্টি নিয়ে খুঁবালায় রাতে—
ভোরে গিরে বললাম অহুলাধাক, একটা কাজ ঘদি করতে
পারেন তো ব্যবস্থা হয়।

কি ?

আমাঘের ঘরের সবাইকে একটা মেয়ে থাকার ব্যবস্থা
করে দি। মোট ষাটাকা সবার বাড়ী থেকে আসবে,
তা থেকে কলেজের মাইনে, মট ভাড়া ইত্যাদি দিয়ে বাকি
টাকার আমরা শুধু ভাত ঘোটে তাই খাব, ডাল-ভাত
ঘোটে তাই খাব।

অহুলাধার খুব আনন্দ। বললেন, শরৎকে আসতে
টেলিগ্রাম করে দিই। শশীবা হাঁপানীর সঙ্গী, ঘোড়েল
সুপারিশপেটেন্টের কাজ মনিবা আর শরৎবাই দেখেন।
তাছাড়া, শরৎবা মিত্রক লোক—অনেক মেলেতে সহিয়ে
দিয়ে একটা সেল বাড়ী আমাঘের লজ্জা খালি ক'রে দিতে
হবে। পাতার ঘরের খেজুর বাগান সেল আমাঘের ঘরে
গেল। সুরেন আমাঘের একজন। শশীবা কতবার
বলেছেন, বড় ভাল ছেলেমেয়ে সুরেন। মনিবা, অহুলাধাও।
সুরেনের বাড়ী থেকে টাকা কিছু কম আসতো না, বহু
যখন বা চাইত তাই পেত। কিন্তু প্রকৃতিতেই সে এমন
ছিল, সবাইকে না খাইয়ে খেতে পারতো না। শেখ পর্যন্ত
অল্প কেউ এসে পড়লে নিম্নেইটাই ধরে দিত। একা

তাকে কেউ বেয় মাই—কিন্তু দুশীর বাড়ীর মাঘের মত
সবার লুপে মিটিয়েই তার তুষ্টি। এ সেন সম্ভ্রামক হয়ে
উঠলো। সবাই সবার একান্ত আপনার জন হয়ে উঠলান।
কামা কাপড়ও আটপোরে ছাড়া কাবও ব্যক্তিগত কিছু
ছিল না। তিন চারটা টুকে কাভানো যা থাকতো,
যার যখন যা প্রয়োজন হ'ত নিঃশেষিত।

কি আশঙ্কেই সে দিনগুলি গেছে!

কিন্তু শরৎকে সইবে কেন? ঘোঁসতপুরে গিরে হেঁথ,
ঘরির ছাত্র ভাতারের (Poor land) অতি ক্লান্ত অবস্থা।
সুত্র করলাম ক'জন মিলে হেল ও শীনার টেনে
কুলিগিরি। অনেক ছাত্র ও অধ্যাপকরা বেশী পরমা
হিতেন। কলেজ পর্য্যন্ত গরু ছাড়া গরুর গাড়ী ছিলেন—
এক সঙ্গে অনেক মাগ বওয়া বেত। ছাত্র ভাতার স্কীত
হ'তে লাগলো। সুরেনের স্মৃতি যেনে কে ?

আরও কাজ ছিলেন উঁটা। কলেজের ভরিতে
কয়েকটা মতুন বাড়ী উঠেছে। মাইনের জোয়া খান।
চুক্তি ক'রে দেখলো ভরবার কাজ ছিলান, শশীবা বলতেন
বাকালীর ছেলে ঘদি অল্পত ঘর বটা শারীরিক পরিচর না
করে, বাকালী ভাত মরে যাবে। দুটির দিনে ছাড়া ছয়
বটা কাজ আমরা কতাম না, দু তিন বটাতেই সাধারণ
কুলির ছয় বটার কাজ কতাম। আমরা দুই তিন জন
ছিলান একটার উপর একটা এক সঙ্গে তিনটে করে কুড়ি
বইতাম, অধ্যাক অধ্যাপকরা শুধু ঠাঁড়িয়ে বেখেই আনন্দ
পেতেন না, নিম্নেইও কোবাল ধরতেন। বাইরে থেকে
বাঁরা আসতেন, উঁটাও থাকতেন। সুরেনের তিনটে কুড়ি
বওয়া শক্তিতে কুলাত না, দুটা পর্য্যন্ত বইতে চেষ্টা
করতো। কোবালে মাটি কেটে কিন্তু আমরা অনেকই
ভার মাঝে পারতাম না।

এ ছাড়া ছিল মেগের ভরিতে সস্তা কলানো। সে
কাজ যেন সুরেনেরই। আমরা তাকে সাহায্য করতাম
মাঝে। আর ছিল সঙ্গী ওশ্রব—শুধু হোটেলে নয় আশে
পাশের গ্রামেও এবং এই উপলক্ষে রাতভাণা। অনেকবই
শরীর দুর্বল হতে লাগলো। অবস্থা বেখে কলেজের
অধ্যাক অধ্যাপক কেউবা কোনো বেলায় আমাঘের যাত,
কেউ বা কোন বেলায় ভিৎ কিয়ে দিতে সুত্র করতেন।

এম খাওয়া আগে সৌন্দর্যপুর কলেজে নিবিড় ছিল, দুগলদা বিলাত প্রাণী হবার আগেই সে নিঃশব্দ ভেঙে দিয়ে যান।

এই সব কাণ্ডের ত্রিভুজ দিয়ে সুবোনের চরিত্র সবার কাছে ছুটে উঠলো। সবার চেয়ে বেশী খাটলো, সবার চেয়ে কঠোর কাজটি নিজে করলো, সবার চেয়ে কমে নিজের প্রয়োজন মেটাতে—এই ছিল তার সহস্রা মিথাক ছিল। কুশী শুভ্রবাবু সবচেয়ে খারাপ সময় শেষ বাতুটাই সে বেঁচে মিত। বর ফোর বাসন পরিষ্কার করাটা সবচেয়ে অজান্তে কোন অঙ্ককারে সে করে রাখতো; তার খোঁজই বা কে রাখতো? কেউ একটা প্রশংসা করলেই সলজ্জ হাসি হেসে সবার দিকে সেখান থেকে। নিজেকে মুছে ফেলার প্রকৃতিই বুদ্ধি পেতেছিল তার অজান্তে অখ্যাত বাপ-মায়ের কাছে। সেই চরিত্রেই লুৎ হরে উঠলো তার ভাবনের প্রতিটি কাজের ভিতর দিয়ে। সেই চরিত্রেই ছুটে উঠলো তার হৃদয় ভিতর।

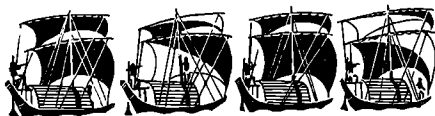
কতকটা মতসব ক'বেই সে দুগের জাতি ভেঙে একটা বা বিতে ছড়ি ভাতের মরুভূমিকে নিয়ে এলান আমায় বোনের বিয়েতে আনার বাড়ীতে। সব আগতেই পরিবেশনের কাজ এরাই করলো। প্রকৃতিও কেউ তুললো না। এটো পাতা না ফেলার মত আশ্রয়স্থান যোগ দানের জেগেছে এরাই তাদের পাতা ফেললো। একখানি ইটি নিয়ে সুবোন বসে গেল মেয়েদের ভিতর তরকারি কাটতে। আনার মাসীনা বেঁচে বেঁচে বসে বসলেন, বাবা, তোনার আকৃতি প্রকৃতি বেঁচে তো

মনে হয় তুমি বাবুনের ছেলে। এই বাবুনের ছেলেই আনারের মেজহা হয়ে উঠলো পলাতক জীবনে। বয়সে ছোট হলেও তার শত্রুশত্রিত গভীর মুখে যে-মানান ঠেকতো না আনারের ডাক।

পড়াশুনার মানাযোগী ছাড়াই ছিল। অন্যায়সে পাশ করে যেতে পারতো, কিন্তু পাশের চেয়ে অস্ত্র বেশার তখন পেয়ে বসেছে। আই এ পরীক্ষা দেওয়া আর হলো না। পড়া ছেড়ে বিপ্লবের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়লো, তারপর তো পলাতক।

চন্দননগরে এক অল্পের তেতর একখানি ভাড়া বাসার দাঁতসেঁতে মেয়ের খবরের কাগজ পেতে খবরের কাগজের তলার তুলোর কবল একখানি বাড়িয়ে শীত কাটাতে চেষ্টা করতো। আর মেজল (শতীশ চক্রবর্তী), বা বালালা (অতুল ঘোষ) কখন আগমন তার জন্ত বিচুড়ী বেঁচে বসে থাকতো। ছোট হোক বড় হোক, কাল যখন বা নিজেছে সবাই জানতো সুবোন করে আগবেই, তুলও কিছু করবে না। অধ্যয়নের অস্ত্রও হবে না, কাল না ক'রে কৈকিয়তের বোঝা নিয়েও ফিরে আসবে না।

তার পর ঐ দুহা। দুহা নামে মিলিয়ে যাওয়া। বয়স তার প্রতিটি বক্তব্যে সারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ক'রে চেয়েছিল, আনার জীবন এক কণা সারের মতো যেসব মাটিতে মিলিয়ে যাক, আর দুহাধীন প্রাণ ফলাবার মতো ক'রে সে মাটি উর্বর হয়ে উঠুক। সেই তো আনার জীবন মরণের পরম পার্থক্যতা।



চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের ইতিহাস

শ্রীভাগবত দাস বরাট

পৃষ্ঠে পূর্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর কথা। তখন চীন দেশে কোনরূপ ধর্ম ভাষের প্রবর্তন হয়নি। সুতরাং সে সময় তাবের মনুষ্যের বিকাশ সম্ভব নয়। আশ্বিন্দপদ ও গৃহযুদ্ধে তারা লিপ্ত ছিল। হিংসা, ঘেব ও মানাধি হুতিভার চীন ভূখণ্ডের আদিবাসীদের মন সন্মোহিত। সে কারণে, এই সময়টাকে বলা হয় চীনের অন্ধকার যুগ।

খ্রীস্ট এই সময়ের কমলুশিয়ানের আবির্ভাব। চীনের সমাজ-জীবন ও ধর্ম-জীবন তখন নীতি বিবলিত। তাব ও আধ্যাত্ম সম্পদের অভাবে জাতীয় জীবন বিপন্ন। সারা রাজ্যের ব্যাভিচার ও অন্যায়। কমলুশিয়ান এই সময় খ্রী মতবাদের দ্বারা চীনে নতবাদের সঞ্চার করেন। তাঁর আধ্যাত্ম মতবাদে তাই ও গণজীবনে পরিবর্তন আসে। খোলাটে জলে এক টুকরো ফিটকিরিও ডুকা পড়লে ঘেমন তা ক্রিষ্ণে হুচ্ছ হয়, কমলুশিয়ানের মতবর্নিত হেমন অন্ধকারোচ্ছন্ন চীন বাসীদের মনে আবর্তন নিয়ে এসে। রাজির অন্ধকার কেটে গিয়ে ঘেমন উজ্জ্বল আবির্ভাব, কিন্তু স্বর্ঘ্যোদয় হল না। কারণ, এই মতবাদে তাবের আধ্যাত্মিক অভাব পূরণ হয়নি। এতে নীতি আছে, ধর্ম নেই। সুতরাং তাঁর নির্দেশ ও বাণীতে নব যুগের সূচনা হয়নি। হয়েছে নূতন বিশ্বাস ও ধারণার প্রচার। চীনে আধ্যাত্মিকতার প্রথম উদ্বোধন হয় বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে। বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ, জীবনানুশীল ও ধর্মকে কেন্দ্র করেই চীন-জীবনে আশ্চর্যজনক বিকাশ।

আনুমানিক ২১৭ খ্রী পূর্বাব্দে জাঠার জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারোচ্চেষ্টা প্রথম প্রদান করেন। খুব সম্ভব সম্রাট অশোক চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার মানসে এই সূচিমের ধর্মাবলম্বীদের প্রেরণ করেন। কিন্তু চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রথম কৃতিত্ব পাবেন মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধগণ। কারণ, সেই সময় মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ ধর্মের বিশুদ্ধতর বিচার লাভ ঘটে এবং

বহির্ভাষেতেও যাতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়, তার সব কিছু চেষ্টাই এই মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধগণ করেছিলেন।

যাক সে কথা। ৪২ খ্রীশাব্দে হান বংশের দ্বিতীয় সম্রাট সিংহি স্বয়ং বুদ্ধদেবের এক লিখাটে তেজঃপূর্ণ নৃতি রচনা করেন এবং তাবপত্র তিনি বৌদ্ধ ধর্ম আগ্রহ করে নীক্ষিত হন। এরপর তিনি মধ্য এশিয়ার স্থানে স্থানে বুদ্ধ নৃতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নৃত্য পাঠান। এই নৃত্যগণ এগার বৎসর পর কান্সু ও গোডংগ নামে দু'জন ধর্ম-প্রচারক ও কয়েকটি ধর্মপুস্তক সহ স্বদেশে ফিরে আসেন। মধ্য সন্যাসের সম্রাট তাঁদের আরাধন জানান এবং রাজধানী সিয়াং নগরে তাঁদের বসতি স্থাপিত হয়।

এই দু'জন প্রচারক নিরন্তর পণ্ডিত ছিলেন। বুদ্ধের মত ও ধর্ম বিবরণে তাঁদের প্রকৃত জ্ঞান ছিল। চীনবাসীদের হিতার্থে তাঁরা চীনে ত বাস করেকটি ধর্ম গ্রন্থের অনুবাদ করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই পণ্ডিত দু'জন মারা যান।

তারপর গ্রন্থ হোক্তোর বন্দব পতে পূর্ব পারস্ত হতে অনুশিকাও নামে একজন প্রচারক চীনদেশে পূর্ণাঙ্গ করেন। তিনিও সিয়াং নগরে অবস্থান করেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এই ধর্মপ্রচারক ১৭৬ খানা বৌদ্ধগ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি অমলোক্তিত্বের ও বুদ্ধের মহিমা প্রচার করেন। এই অমলোক্তিত্বের পরে "জুয়াক্সিন পুত্র" নামে দ্বী দেবতার নৃতিতে চীনাধর্মের কাছে আরাধনা।

২২৬ খ্রীশাব্দে তাবদর্ঘ্য থেকে প্রদত্ত নামে আধ্যাত্মাবী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী চীনে আসেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মানসে তাঁর চীনে আগমন। প্রায় ২০০ বৌদ্ধগ্রন্থ তিনি চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি ছাড়া ধর্মবাক্য নামে আর এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ২৬৬ খ্রীশাব্দ হতে ৩০২ খ্রীশাব্দ পর্যন্ত ৩৬২ খানা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ চীনে ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর অনুদিত এক

যেতে পিতৃ পুত্রদের বিধি ও মন্ত্র লিখিত বাক্যর বৌদ্ধবর্ধ
চীনে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

চীনের সকল রাজ্যে একই সময়ে বা এককালে বৌদ্ধ-
বর্ধ প্রবল হয় নি। ছিন্ন ভিন্ন চীনের বিস্তৃত অনেক
রাজ্যে বৌদ্ধবর্ধের প্রবেশদিকার ছিল না। ৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে
চাউ রাজ্যের রাজা বৌদ্ধ সম্বল সোমবানের বাণ্য প্রকাশের
নথ্যে জুড়ে যেন। বৌদ্ধ সিংহ নামে এক ভারতীয়
ভিক্ষুর প্রচেষ্টায় চাউ রাজ্যের রাজার এই পরিবর্তন
ঘোষণা হয়।

চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে সম্রাট হিয়াও হিং বৌদ্ধবর্ধ
রীক্ষিত হন। তারপর তিনি বর্ধগ্রন্থের অনুবাদে যে সকল
ভুল ভ্রান্তি ছিল তা সংশোধনের ব্যবস্থা হন। এই উদ্দেশ্যে
তিনি এশিয়ার বহুভাগ হতে কুনাবলীভ নামে এক শাস্ত্র
পণ্ডিতকে স্বরাষ্ট্র্যে নিয়ে আসেন। এই পণ্ডিত প্রবর
কুনাবলীভের নেতৃত্বে আঠার জন বৌদ্ধ ভিক্ষু নিয়ে এক বর্ধ
সভার অধিবেশন হয়। সম্রাট স্বয়ং উক্ত সভায় যোগদান
করতেন। সমাপ্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিচার ও গবেষণার ফলে
বৌদ্ধ সম্বল সংস্কার ও গ্রন্থের ভুল ভ্রান্তিও সংশোধন হয়।
কুনাবলীভের অনুর্তিত 'ব্রহ্মরূপ সূত্র' অনুবাদন দ্বারা
চীন ভাষায় ও কোরিয়ার বৌদ্ধ সম্বলসমূহ পরিচালিত
হয়েছিল।

চীনে চার শতাব্দী ব্যাপী চীনে বৌদ্ধবর্ধ প্রচারণা প্রচেষ্টা
শুধু শ্রম অনুবাদের মধ্যে নিহিত ছিল। কুনাবলীভের তখন
কনফুসিয়সের প্রবল প্রোতাপ ও প্রতিপত্তি। এই নব
বর্ধের যোগে চীনে বিস্তার লাভ না ঘটে তার ক্ষেত্রে
কনফুসিয়সের স্বাধীনতা বাণ্য হিতে আবদ্ধ করলেন।
ভিক্ষুদের উপর অত্যাচার হতে লাগল। মন্দির নির্মাণ
নিষিদ্ধ হল এবং নিবিচারে অহিংসার পূজারী বৌদ্ধ ভিক্ষু-
গণের প্রাণ সংহার চলতে লাগল। কনফুসিয়ার প্রাণবিক
রাজত্ববর্ধের দ্বারা এই পাণবিকতা অস্বীকৃত হয়েছিল।
অবশ্য একটা টুক যে রাজত্বগ্রন্থে এই বৌদ্ধবর্ধের বিস্তার
লাভ ঘটেছে। একাধিক দাখা ও প্রাণবিক শাসন কঠা,
পার্বি বৌদ্ধবর্ধের ভোগ কানন। ত্যাগ করে বৌদ্ধ ভিক্ষু
পবিত্র জীবন ধাপনের ব্রত নিয়েছেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর
প্রারম্ভের কথা। চীনে ছয় হাজারের বেশী ভারতীয় বৌদ্ধ

ভিক্ষু, তেজ হাজার বৌদ্ধ মন্দির এবং ছয় হাজারেরও বেশী
বৌদ্ধ বর্ধগ্রন্থ ছিল।

৪২৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট পণ্ডিত ভারতবর্ধ হতে বোধিবর্ধ
ক্যান্টনে পরিচালন করেন। দক্ষিণ ভারতের কোন এক
রাজ্যে গিয়ে তাঁর মন্ত্র। বৌদ্ধ সম্বল উপর তাঁর অন্তিম
প্রতিভা। আশুত তিনি চীনের প্রতিটি প্রদেশের কাছে
মহাপুস্তকসমূহে পুঙ্খিত। ভাষাভাষের যোগদানে,
এখনকি তরবারির গায়েও তাঁর প্রতিভাটি খোঁচাই করা
অসম্ভব। আশুত থাকতে যেনা যায়; শোনা যায়, তিনি
ক্যান্টন হতে লয়াং নগরে এসে এক প্রাচীরের দিকে মুখ
করে ধ্যানের একাধিক্রমে মন্ত্র বহুত ধ্যান করেন। চীনে
বোধিবর্ধ প্রবর্তিত ও প্রচলিত বর্ধমতে বৈদ্যাস্তিক ভাণ
বর্ধে ছিল। তাঁর বর্ধমত চীন দেশে 'চান' এবং ভাষাভাষে
'শেনবত' নামে পরিচিত। 'চি-ই' নামে তাঁর এক শিল্পের
সমকক্ষ সে যুগে চীনে কেউই ছিলেন না।

বোধিবর্ধ ছিলেন জ্ঞানবাহী। তাঁর সময়ে ভারতবর্ধের
বৌদ্ধগণের মধ্যে অনেক তাত্ত্বিক ভাষাভাষ হয়ে পড়েন।
খ্রীষ্ট ৪২৬ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অর্থাৎ বোধিবর্ধের মৃত্যুর
প্রায় ছয় বৎসর পরে, দক্ষিণ ভারত হতে তিনজন বৌদ্ধ
ভিক্ষু চীন দেশে আসেন। তাঁদের নাম স্তম্ভকার ব্রহ্মবোধি
ও অমোঘ এবং চীনে এসে তাত্ত্বিক ভাষাতত্ত্ব বৌদ্ধবর্ধ
প্রচার করেন। তাত্ত্বিক বৌদ্ধগণ যেরবার পূজা করতেন।
তখনোতন চীন সম্রাট এই তাত্ত্বিক ভাষাতত্ত্ব বৌদ্ধ বর্ধে
অনুগ্রহণী ছিলেন। কিন্তু বর্ধের সঙ্গে এই তাত্ত্বিক মতবাদ
মাত্র কয়েক শতাব্দী জীবিত ছিল। পরে তা চীন মতবাদের
সঙ্গে মিশে গিয়ে স্বীয় বৈশিষ্ট্য বিলম্বিত হয়।

১৩০ খ্রীষ্টাব্দে কনফুসিয়সের আবার বৌদ্ধবর্ধ উপর
অত্যাচার শুরু করেন। তাঁরা বৌদ্ধবর্ধের অনিষ্ট করবার
ক্ষেত্রে বহু মন্তব চেষ্টা করতে লাগলেন। তার ফলে 'বারন'
(১২০০) ভিক্ষু ও ভিক্ষুই সমস্ত ত্যাগ করে পার্শ্বস্থ জীবনে
জীবন প্রবেশ করেন। বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ নির্মাণ নিষিদ্ধ
হল। কিন্তু এই সঙ্কটময় পরিস্থিতি বেশী দিন স্থায়ী ছিল
না। শীঘ্র সম্রাট সু-সুং ও টে-সুং বৌদ্ধবর্ধ প্রবল করার
এই নির্দায়ক প্রচেষ্টা হল। ৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট যিয়েন
সুং বুদ্ধবর্ধের এক পুস্তাধি মহাপ্রাণার্থে ভাষাভাষীতে
নিয়ে আসেন।

৮৪৪ খৃষ্টাব্দে চীনে বৌদ্ধদের আবির্ভাব এক চূড়ান্ত ধর্মের আদর্শ। এই সময়ের চীনের সম্রাট উ-সুং মূল্যবোধী ছিলেন। তাঁর অত্যাচারে চীন হতে বৌদ্ধধর্মের মূলধারা বহাও উপক্রম হল। বুদ্ধমোহী সম্রাটের আদেশে ৪৮০০ বৌদ্ধমঠ ও ৪০,০০০ বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করা হয়। সম্রাটের সম্পত্তি সমূহ রাজস্বস্বরূপে ব্যবহৃত হয়। বুদ্ধমোহের কোন চিহ্ন বাস্তব চীনে নেই না। ধর্মের পথে পথে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বনির্মিত নানাবিধি ও বস্তু। ধর্মের পথে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-মুদ্রাতে পরিণত করা হয়। এই অত্যাচারী সম্রাট ছাড়াও অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীকে ধর্মপূর্বক গার্হস্থ্যায়নে প্রবেশ করানি। কিন্তু এক বৈজ্ঞানিক মনোভাৱেই অত্যাচারের সমাপ্তি হয়। পরবর্তী সম্রাটের আদেশে কৃপায় আবার মঠ ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হল। বুদ্ধ মূর্তি সৈন্যী করা ও স্থাপনা করা হল এবং বৌদ্ধধর্মের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হল।

৮৮০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ই-সুং বৌদ্ধধর্ম রক্ষিত হন। তিনি পরম-মামুলি ও বহুগুণ নরপতি ছিলেন। প্রতিদিন তিনি পরম-ভক্তিসম্বন্ধে সংস্কৃত ভোজ পাঠ করতেন। ১২৮০

খৃষ্টাব্দে চীনের প্রধান মোগল সম্রাট সুবলাই বা বৌদ্ধধর্মের ছাত্রতলে আসেন। কিন্তু তাঁর আচরণ বৌদ্ধমোহী ছিল। তাঁর সময় চীনে ১৩০১৪৮ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ৪২৩১৪৮ বৌদ্ধ মন্দির ছিল।

মোগল বংশের পতনের পর যখন সিং বংশ চীনদেশের রাজা হন, তখন বৌদ্ধধর্মের বৃদ্ধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। মোগল সম্রাট ই-সুং এই ধর্মের অস্বাভাবিক ছিলেন।

চীনে বৌদ্ধধর্ম অনাচারে বর্জিত হয়ে আসছে যে পরিচিত। বলা কবে বর্তমানে আছে, তার মূল আছে। বনস্বামিধর্মের শিক্ষা। বনস্বামিধর্ম কখনই অনাচারকে প্রমত্ত দিতে না। তা ছাড়া চীনে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভের পূর্বে অল্প কয়েক বর্ষই বৌদ্ধধর্ম বিস্তার করে নি। অল্প কয়েক শ্রেণী বর্ষ চীনে না থাকার চীনদেশে আজও বৌদ্ধধর্মই প্রবলমান। ভারত, শুধু চীনকে মনস্বামিধর্মের পুণ্যবাণী দিকনে দিক্ত করবিন, ভারতের শ্রেষ্ঠ দর্শন চীনের সাহিত্যকে সহজ করেছে। শিল্প ও ভাষ্যেরও ভারতের কাছে চীন বনী। চৈনিক শিল্পের মনস্বামিধর্ম অংশতঃ ভারতবর্ষেরই দান।



জীবনের ক্রমবিকাশ

বিমল মে

(পূর্বাহ্নি)

প্রত্যেকটি কণা সেলের (daughter cell) ভিতর জননীসেলের সমসংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। প্রয়োজন এবং হইতেছেও তাই। জীবনের এই মূল বস্তুটি সম্বন্ধে আমরা আবার সামনের একটি অধ্যায়ে আলোচনা করিব। বর্তমানে আমরা মনে রাখা দরকার যে আমাদের শরীরের যে কোনো প্রকারের উন্নতি, তাহা মাংশপেশী-কোষের হটক আর ক্ষতস্থানে নতুন চামড়ার উৎপত্তি হটক, উহার মূলে বহিয়াছে আমাদের দেহের শতকেটি সেলের বিভাজন ক্রিয়া দ্বারা বিধা বিভক্ত হইয়া উত্থানের সংখ্যা বাড়ান-প্রত্যেকবার ভাগ হইতে একটি সেলকে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়ার ভিতর বিধা হইতে হয় তাহাকে মাইটোসিস (mitosis) বলে। প্রত্যেকটি মাইটোসিস ক্রিয়ার সাধে মাংশেই এক একটি সেলের ক্রোমোসোমগুলিও প্রত্যেক নিম্নোক্ত লক্ষণবিশিষ্টভাবে ভাগ করিয়া, মাৎসেলের ক্রোমোসোমের সংখ্যা বজায় রাখিয়া, কঙ্কালেন দুইটির ভিতর গাইরা স্থান পায়।

জীবনের বস্তুসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কি না :-

পত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কোনো কোনো জীববিজ্ঞানবিৎ মনে করিতেন যে কোনো প্রাণী নিখিষ্ট প্রতিবেশে বসবাস করিতেন না এবং ইহাকেই স্বাভাবিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন। একটি মৃত পশুর দেহ খেলিয়া বাসিলে তাহার ভিতর যে পোকা দেখা দেয় তাহা স্বাভাবিক ভাবেই পচা মাংসের ভিতর জন্মলাভ করে—ইহাই ছিল সেই সময়ের অনেক জীববিজ্ঞানীদের ধারণা। সপ্তদশ শতকে সর্বপ্রথম Redi বলিলেন যে পচা মাংসের ভিতর যে পোকা জন্মায় তাহা অসম্ভব নহে। তিনি দেখিলেন কেবলমাত্র একপ্রকারের মাছি ঐ মরা পশুর দেহের সংস্পর্শে আসিতে পারিলেই ঐ পোকা দেখা দেয়। তিনি

দেখিলেন যে এমনভাবে যদি মৃতদেহটি রাখা যায় যাতে ঐ প্রকারের মাছি দেহটির সংস্পর্শে আসিতে পারে না তবে যেটি পচিয়া সেলো উঠাতে পোকা হইতে পারে না। তিনি একটি মৃত দেহকে পুত্র বেগমি কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া দেখিলেন যে উহাতে ঐ পোকা জন্মায় না। যদিও ইহা একটি অতি সাধারণ পরীক্ষা তবুও Redi পূর্বে ইহা কেহই করিয়া দেখিবার প্রয়োজন বোধ নাই। কারণ তখন পচা মাংসের ভিতর পোকার বহুত্ব। এত স্বাভাবিক বলিয়া তাহাদের কাছে মনে হইতে যে এই সম্পর্কে তাহাদের মনে কোনো প্রশ্নই জাগিত না। সপ্তদশ শতকে অস্থবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার বিজ্ঞানগত এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করিল। এক আলুবীক্ষণিক জীবজগত মানুষের জ্ঞানের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িল যাহা সম্বন্ধে ইহার পূর্বে মানুষের একপ্রকার কোনো জ্ঞান ছিল না বলিলেই চলে। বস্তুত পক্ষে এই সমস্ত জীবদেহ ক্ষুদ্রত। ইহাদের জীবন ধারার জটিলতা এবং ইহার। এমনভাবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বাহ্যে মড়ার মত ভাগিয়া গাইতে পারে যে মানুষের দৃষ্টি শক্তি বাহ্যে ইহাদের জীবন সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান লাভ করা কোনো প্রকারেই সম্ভব ছিল না।

উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় Posterra তাহার প্রতিষ্ঠা বলে এমন কৃতকালি অতিক্রিয়া করিতে সমর্থ হইল, যাহা যাহা প্রমাণিত হইল যে আমরা পৃথিবীতে যে সমস্ত প্রাণি দেখিতে পাই, তাহা বস্তু ক্ষুদ্র আর বস্তু বৃহৎ হটক না কেন, তাহা ঐ সমস্তপ্রাণী প্রাণী হইতেই জন্ম লাভ করিয়াছে। আমরা আজ পরিষ্কার ভাবে এই সত্য বোঝা করিতে পারি যে এই মুহূর্তে আমরা পৃথিবীতে যে সমস্ত প্রাণি দেখিতে পাইতেছি তাহার প্রত্যেকটি ঐ প্রজাতির পূর্বপুরুষ হইতেই জন্ম লাভ করিয়াছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে প্রাণীর জন্মলাভ সম্বন্ধে

যাযা বলা হইল তাহা কেবল বর্তমান পৃথিবী সৃষ্টিই প্রয়োজ্য। আমরা বলিতে পারি যে আমরা বর্তমান পৃথিবী এবং ইহার প্রতিবেশে :—আলো, আকাশ, আকাশের উদ্ভাপ, বিভিন্ন বাষ্পের চাপ, সমুদ্রের অবস্থা—জীবন স্বরূপ হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে পৃথিবীর জীবনের এক নির্দিষ্ট সময়ে, যখন পৃথিবী এখন হইতে উদ্ভগতর ছিল, যখন পৃথিবীর রাসায়নিক এবং প্রাকৃতিক অবস্থা বর্তমান হইতে অস্তরূপ ছিল তখন এক সময় জীবন অজীব বস্তু হইতেই পৃথিবীর বৃকে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আমাদের আরও মনে রাখিতে হইবে যে সজীব বস্তু বস্তুর পরমাণুর বিশেষ প্রকারের বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নহে এবং এই বিশেষ প্রকারের বিজ্ঞান সম্বন্ধ হইয়াছিল পৃথিবীর জীবনের বিশেষ এক সময়ে, বিশেষ এক প্রতিবেশে। বর্তমানে আমরা জীবনকে যে আকারে দেখিতে পাইতেছি, পৃথিবীতে বস্তু এখন প্রথম সজীবতা লাভ করিয়াছিল তখন তাহার বর্তমান রূপ ছিল না। জীবের বর্তমান রূপ কোটি কোটি বছরের জীব অভিযাত্রির ফল স্বরূপ আমরা দেখিতে পাইতেছি। ইহা হইতে মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারি যে যদিও জীবন পৃথিবীতে একধিন অজীব বস্তু হইতেই আদিগ্ধাছে কিন্তু পৃথিবীর বর্তমান প্রতিবেশে তাহা সম্ভব নহে। পৃথিবীর সে অবস্থার অজীব বস্তু হইতে বস্তু সজীবতা লাভ করিয়াছিল, সে অবস্থার বহুল পরিবর্তন হইয়াছে তাই পৃথিবীর এই পরিবর্তিত অবস্থার কারণে জীবনের তথাকথিত স্বরূপতা আশা করিতে পারি না। যে সমস্ত জীবকে আমরা বর্তমানে দেখিতে পাইতেছি তাহা সজীব বস্তুর আদিমতম অবস্থা হইতে কোটি কোটি বছরের জীব অভিযাত্রির ফলস্বরূপ আজ পৃথিবীতে বর্তমান আকার লাভ করিয়াছে। বর্তমানের প্রত্যেকটি প্রাণী তাহার পূর্ব পুরুষের জননশীলতার মত ময় লাভ করিয়াছে। জীবের এই জননশীলতা সৃষ্টিই আমরা পরের অধ্যায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

অযৌন জনন—আদিম প্রাণী :—

প্রাণীজগত অভিযাত্রির একটি নির্দিষ্ট উন্নত ধাপে আসিয়া পৌঁছাইলে আমরা জীবের যৌন সম্পর্কে নতুন

প্রাণীর জন্মের মত, একান্ত প্রয়োজনীয় ক্রিয়া হিসাবে দেখিতে পাই। এই সময়ে আমরা দেখিতে পাই কোনো একটি প্রজাতি গোষ্ঠির নতুন একটি সন্তানের জন্ম, সেই প্রজাতির বিপরীত লিঙ্গের দুইটি প্রাণীর যৌন সম্পর্ক প্রয়োজন হয়। কিন্তু পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের পক্ষেই ইহা সম্ভব নহে। প্রায় প্রত্যেক প্রাণীরই একটানা একটা যৌন প্রবর্তন আছে, কিন্তু তাহাদের অনেকেরই আবার যৌন সম্পর্ক ছাড়াই প্রজাতি বৃদ্ধির পথ বর্তমান। বস্তুত-পক্ষে জীবিত্যায় জনন বলিতে প্রায়ই অযৌন জনন বোকা যায়। আমাদের যেভাবে বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে সেটা জীবজগতের উন্নততম অবস্থায় জনন ক্রিয়া মাত্র। নির্দিষ্ট করেকটি উন্নততর প্রজাতি বাহ্যে এই প্রকার বংশ বৃদ্ধি অল্প কোনো প্রাণীর ভিতর দেখা যায় না। জীবজগতের আদিম অবস্থায় আমরা দেখিতে পাই—আদিম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি তাহাদের নিজেদের শরীরকে ভাগিয়া দুই টুকরা কাঁচা দুইটি সমপ্রজাতি প্রাণীর জন্ম দিতেছে। এইভাবেই প্রত্যেকটি নিজেই বিধা বিভক্ত করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিয়া চলিতেছে। বংশ বৃদ্ধির এই প্রথাকে বলা হয় বিভাজন ক্রিয়া (binary fission) এই সমস্ত ক্ষেত্রে সম্ভাব্য যে কেবল জনকের একটি বিচ্ছিন্ন অংশে তাহা নহে, এখানে জনকের সমস্ত দেহই ভাগ হইয়া দুইটি সমান জন্ম নেয়। আমরা ময় লাভ করিবার পরও যেমন আমাদের জনকের দেহ বর্তমান থাকে ইহাদের বেলা তাহা হয় না। ইহারা ময়লাভ করিলে ইহাদের জনকের আর কোন ভিন্ন অভিব্যক্তি থাকে না। আর একটা বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে ইহাদের দৃষ্ট্য মানে নিজে বিধা বিভক্ত হইয়া থাকে। এই প্রকারে নিজেই ভাগিয়া ভাগিয়া বংশ বৃদ্ধি করিয়া চলায় যে প্রাণী, তাহার চরম উৎকর্ষতা দেখিতে পাই আমরা অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া প্রজাতির ভিতর। একটি ব্যাকটেরিয়া উহার জীবনের উপযোগী আবহের মধ্যে স্থাপিত হইলে ঐ ব্যাকটেরিয়াটি অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে জীবনের সমস্ত কর্তব্য শেষ করিতে পারে এবং এইরূপে ব্যাচিয়া থাকিবার ব্যাধ পাইলে পাচ ঘণ্টা পর ১০২৪টি ব্যাকটেরিয়া দেখিতে পাইব ঐ আবহের ভিতর—

মশখ টা পর দেখিতে পাইব ১০০০০০০ লক্ষের উপর এবং

২৪ বর্টার যেবিষয় শত শত লক্ষ কোটি ব্যাকটেরিয়া জন্ম লাভ করিয়াছে। এইভাবে বোঝা যায়—উপযুক্ত পুষ্টিকর জায়গা পাইলে একটি ব্যাকটেরিয়া ২৪ বর্টার মধ্যে বিভাজন ক্রিয়া দ্বারা শত শত কোটি ব্যাকটেরিয়ায় পরিণত হইতে পারে। যে সমস্ত প্রাণীর দেহ যন্ত্র কিছুটা জটিলতা বোঝা যায় তাহাদের বিভাজন ক্রিয়া কতগুলি জটিল প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতে দেখা যায়। এই বিষয় আমরা পূর্বে অধ্যায় আলোচনা করিয়াছি। অনেক সামুদ্রিক অ্যানিমোন (sea-anemone) ভিতর দেখা যায় উহার মাথা বিন্দু হইতে আরম্ভ হইয়া লম্বা বিভাজন বিভাজন ক্রিয়া সম্পাদন করে। আমরা যে প্রকার কীপের কথা শুনি তাহা একটি নম্র পলিপ, (polyp) হইতে আরম্ভ করিয়া কোটি কোটি বার বিভাজন ক্রিয়ায় যল-ধরণে হইয়া থাকে। অপরদিকে অনেক প্রকারের ক্রিমিকীট আড়াআড়িভাবে বিভাজন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহাঙ্গিপের মধ্যে 'Planarian'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভাজন ক্রিয়া আবার অমর্য প্রদান দুই প্রকারের ঘেঁষিতে পাই। ইহাদের একটি হইতেছে বহু-ভাজন (multi-fission)। এই প্রকারের বিভাজন ক্রিয়া আবার দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এই দুই প্রকারের একপ্রকার হইতেছে একটি প্রাণী পর পর কতগুলি বিভাজন ক্রিয়া দ্বারা অনেকগুলি ভাগে ভাগ হইয়া যায়। এই বিভাজন ক্রিয়াগুলি একটি পর অপর একটি এত জটিলভাবে হইয়া থাকে যে কীটটির দেহ অত অল্প সময়ের মধ্যে আর বাড়িতে সময় পায় না। অপর প্রাণীটি হইতেছে কীটেরটির ভিতরের নিউক্লিয়াসটি পর পর কয়েকবার বিভক্ত হয় এবং তাহার পরই কীট যেটি নিউক্লিয়াসটি বহুভাগে ভাগ হয় ততভাবে বিভক্ত হইয়া যায়। এইভাবে প্রত্যেক ভাগের ভিতর একটি করিয়া নিউক্লিয়াস স্থান পায়। এই প্রকারের বিভাজন ক্রিয়া এক সেল বিশিষ্ট (mono cellular) প্রাণীদেহেই হইয়া থাকে এবং ইহা হইতেছে সাধারণ নিয়ম। ইহারা এক সেল বিশিষ্ট হইলেও সাধারণ সেলের অতুল্যতা বেশ বড় হইয়া থাকে। ইহাঙ্গিপের মধ্যে Paramecium অথবা সাধারণ অ্যানিমা অথবা ম্যালেরিয়া জ্বরের পরজীৱ

নাম উল্লেখযোগ্য। উপরে লিখিত ক'এক প্রকারের বিভাজন ক্রিয়াবাহক অপর এক প্রকারের বিভাজন ক্রিয়া Platyworm, Annelid Worms-এর ভিতর বোঝা যায়। ইহারা আড়াআড়ি ভাবে বিভক্ত হইয়া থাকে। ইহারা যখন বিভক্ত হয় তখন গেছনের আশের অংশগুলি সম্পূর্ণভাবে গঠিত হয় না। ভাগ হইয়া বাইবার পর ইহাদের সমস্ত অংশগুলি সম্পূর্ণভাবে গঠিত হয়। এই প্রকারের বিভাজন ক্রিয়ার সুবিধা হইতেছে এই যে প্রাণীগুলি বিখ্যাত বিভক্ত হইয়াও সামনের অংশের নিজের পূর্বে অস্তিত্ব, মৃত্যু এবং সাধারণ মৃত্যুর কারণে দাবিতে সমর্থ হয়। অপরদিকে প্রাণীটির অস্থায়ী পিছনের অংশ বিভক্ত হইয়া সিঁদুর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায় একটি মাছ Platyworm-এর দেহের ক'একটি স্থানই বিভক্ত হইয়া ক'একটি জীবের কৃতি করিয়া দেয় এবং বিভক্ত হইবার পর এগুলির নিজ নিজ দেহের অংশগুলি এবং টিস্যুগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অপর এক প্রকারের বাঁশ রঞ্জিত, বাঁশ পলিপ প্রেব এবং বিভিন্ন প্রকারের মেলী মাছের ভিতর দেখা যায়, তাহা হইতেছে প্রাচীরে যে প্রকার নতুন নতুন শাখা বাহির হয়, সেইরূপ উহার দেহের উপর উহার অস্থায়ী বংশধর জন্ম লাভ করে। ইহাঙ্গিপকে মেডুসা (medusa) বলে। এমন প্রাণীটির উপরে দিকের মেডুসাটি সবচেয়ে প্রথম বাহির হয় বলিয়া সবচেয়ে প্রথম পরিদৃষ্ট হয় এবং সব চেয়ে প্রথম মাতার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনতা লাভ করে। তাহার পর একটি একটি করিয়া মেডুসাগুলি যথাক্রমে মাতার দেহ হইতে ছুটিয়া গাইতে থাকে।

গ্যামিট :—(gamete) :—

পূর্বে অধ্যায় আমরা প্রাণী জগতের অমৌল জন্ম নবকে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। বর্তমানে অধ্যায় আমরা সংক্ষেপে জীবের জাতিগত—জৈবিক এবং জৈবিক নবকে আলোচনা করিব এবং ইহার পথের অধ্যায়ে যৌন জন্ম নবকে আলোচনা থাকিবে।

মাতার এবং অনেক উচ্চ স্তরের প্রাণীর জীবন ইতি-হাসকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এই দুইটি ভাগের একটি হইতেছে মনুষ্য দেহ যারা আমরা সর্বদা দেখিতে পাইতেছি, অপর ভাগ হইতেছে গ্যামিট, ডিম্বকোষ এবং শুক্রাণু।

ইহাৰে মিলনই হইতেছে আশাৰে জীৱনৰ আৰম্ভ। এই মিলন সম্পাদিত হইয়া থাকে স্ত্ৰী প্ৰাণীৰ দেহৰ ভিতৰে। ডিম্বকোষ—এৰা শুক্ৰাণুৰ মিলনই হইতেছে আশাৰে প্ৰজাতি এবং অন্তৰ্ভুক্ত অৱস্থাত প্ৰাণীৰ বংশ বৃদ্ধিৰ পদ্ধতি। মানুহৰ জীৱনৰ প্যামিট অংশ স্বাধীনতা অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰাণী দিগেৰে ঐ আশাৰ স্বাধীনতা হইতে অনেক বন। মানুহৰ জীৱনৰ প্যামিট অংশ উহাৰ অপর অংশৰ সহিত মূল্য বিয়া বাধা বহিয়াছে। বস্তুত পক্ষে মানুহৰ জীৱনৰ এই দুইটি অংশ হইতেছে—ঠিক যেন একটি শৃংখলৰ পাখা পানি দুইটি এখি। দস্তত কীটৰ (liver fluke) কৌবনী আলোচনা কৰিলে আশাৰে বোখতে পাই যে একটি দস্তত কীটৰ পূৰ্ণাঙ্গতা প্ৰাপ্ত হইতে বস্তুতলি খাপ পাৰ হইয়া আনিত্তে হয়—এৰা প্ৰত্যেকটি জৱেৰ শৰীৰ বৃদ্ধিৰ বিকল্পতা—এৰা প্ৰত্যেকটি জৱেৰ ইহাকে একটি মন্থন প্ৰাণী বহিয়া মনে হয়। অনেক মলচৰ অৱস্থাত প্ৰাণী উহাৰে কাৰ্যপ্ৰাণতলিক অলৈ মধ্য হাড়িয়া থেৰ তাহাৰ কাৰ্যপ্ৰাণতলিক স্বাধীনভাবে আনিত্তে আনিত্তে হইটি প্যামিট মিলিত হয়। এইভাবে উহাৰে জীৱনৰ প্ৰথম অধ্যায় শেষ হইয়া দ্বিতীয় অধ্যায় আৰম্ভ হয়। একটি ডিম্বকোষ এবং একটি শুক্ৰাণুৰ মিলনেৰে ফলে বাধা সৰ্ব-প্ৰাথম দেখা যায় তাহাকে গলে-গাইগোট (Gyote)। এই বিকল্পিত বস্তুতলি গলে, আপনি, আপনাৰ প্ৰিয় কুহুটি, প্ৰিয় ময়নাটি, আপনাৰ পড়ান বহেৰ জানালার বে প্ৰকাশপিত্তি বহিয়া আছে এবং আপনাৰ বাগানেৰে বাধাপিত্তি, এক একটি গাইগোট হাড়িয়া আৰ পিছুই নহে। ডিম্বকোষ এবং শুক্ৰাণুৰ ডিম্বাণুকে যেনে প্যামিট বলা চলে এবং শুক্ৰাণু হইতেছে পুৰুষ প্যামিট। এই দুই প্ৰকাৰেৰ প্যামিটেৰে ডিম্বকোষ শুক্ৰাণু হইতে অনেক স্তৰ বড়। সাধাৰণ সেলেৰে জুলনাৰ ডিম্বকোষ পেন বড় একটি সেল, ইহা বলা চলে। সাধাৰণত অৱস্থাত দুস্তপাৰী প্ৰাণীবিগেৰে ডিম্বকোষ ছোট হইয়া থাকে। মন্থন প্ৰকাৰিত্তিৰ একটি ডিম্বকোষ ঐ প্ৰকাৰিত্তিৰ একটি কলা-কোষ হইতে মন্থনস্তৰ বড়। প্ৰায় সমস্ত ডিম্বকোষই পৰিপক হইলে সক্রিয় হইয়া পড়ে। ইহাৰ একমাত্র সক্রিয়তা হইতেছে, শুক্ৰাণুৰ সম্পৰ্শে আনিলে শুক্ৰাণুতলিক নিষেধেৰ

প্ৰোটোপ্লাজমেৰে ভিতৰে চুকিয়া পৰিত্তে সাধাৰণ কৰা। ইহা ছাড়া পৰিপক ডিম্বকোষৰ আৰ কোনো সক্রিয়তা নহে। কোনো ডিম্বকোষৰ আশাৰ এই সক্রিয়তাই পৰ্বত নাই।

বিভিন্ন প্ৰাণীৰ ডিম্বকোষৰে ভিতৰে আশাৰেৰে বিকল্পতা তিল এবং তাগেৰে বিকল্পতাৰে সমান বস্তুতলি চলে। ক্ষুদ্ৰতাৰ বিকল্প বিয়া আশাৰে দেখিতে পাই কোনো কোনো শুক্ৰপাৰী প্ৰাণীৰে ডিম্বকোষ ১ মিলিমিটাৰেৰে মন তাগেৰে ১ ডায় (১ ইঞ্চিৰ ২৫০ ভাগেৰে ১ ডায়) মাত্র আয়তন আড়াআড়ি ভাবে। তেৰ এবং ছোটো গো সাগেৰে ডিম্বকোষ একটি ছোট মন্থন ডালেৰে সমান হইয়া থাকে। কুনাৰ, স্নাকহান প্ৰকাৰিত্তিৰ ডিম্বকোষ আশাৰে প্ৰায় সবাই দেখিয়াছি। অধুনা বিদ্যুৎ 'ইপাইন্তবনীদ' নামক প্ৰাণীৰ ডিম্বকোষ ওমনে প্ৰায় ৪ সেৰ পৰ্বত হইত। কিছুদিন পূৰ্বে পোৰি দস্ততলি 'ডাইফ' নামক অধুনা মন্থন অপর একটি বিয়াট জীৱেৰে অৱস্থাত যে ডিম্বকোষ আশাৰে হইয়াছে তাহাৰ আয়তন আৰে অনেক বেছি বস্তুত অৱস্থিত হয়। এই ডিম্বগুলি বৰ্তমান American National museum-এ আছে। এই ডিম্বগুলি আশাৰে হইয়াৰে ফলে জীৱজগত একটি, অধুনা মন্থন প্ৰাণী মন্থন জান লাভ কৰিত্তেছি। এই ডিম্বগুলিৰ একটিৰ ভিতৰে অৱস্থাত বাচ্চা পাওয়া পিয়াছে। দস্তত ডিম্বকোষেৰেই, তাহা পানীৰেই হউক আৰে সন্ধি-পেৰেই হউক, খাটি ওভন (Ovum) হইতেছে উহাৰে কুহুমটুকু। এই প্ৰকাৰেৰে ওভনতলি—এৰা অধিক পৰিমাণে জমান খাত থাকে যে ইহাৰেৰে ভিতৰে প্ৰোটোপ্লাজমেৰে অংশ নাই বস্তুতলি চলে। কেবলমাত্র ভিতৰেৰে উপৰে একটি প্ৰোটোপ্লাজমেৰে খুব পাতলা আৱৰণ এবং এক প্ৰান্তৰেৰে অৱস্থাত প্ৰোটোপ্লাজমেৰে একটি ক্যাপ্ বৰ্তমান। ভিতৰে বস্তুত চটে অংশ এবং উপৰেৰে কঠিন আৱৰণটি আশাৰে ডিম্বকোষেৰে অংশ নহে, উহাকে ডিম্বকোষেৰে আচ্ছাদন বলা হইতে পাৰে। প্ৰায় সমস্ত ডিম্বকোষই আশাৰেৰে পোলা অধবা ডিম্বাণুত হইয়া থাকে। কেবলমাত্র মন্থন, আশুলা এবং অন্তৰ্ভুক্ত কোনো কোনো প্ৰকাৰ ডিম্বকোষ আশাৰেৰে মন্থন হইয়া থাকে। শুক্ৰাণুতলি আশাৰেৰে ডিম্বকোষ

হইতে অনেক বকমারি হইয়া থাকে। ডিম্বকোষের মত ইহা নিষ্ক্রিয় নহে বরং ইহা ডিম্বকোষের সহিত মিশিত না। হওয়া পর্যন্ত স্বেদন্ত সমুদ্রই সক্রিয় থাকে। যদিও বিভিন্ন প্রাণির মোটামুটি ভাবে এই সমা-
 স্কল শুক্রাণু; নিউক্লিয়াসসহ মস্তক, মস্তকের পিছনে প্রোটলক লেজ, লেজ এবং মস্তকের সংযোগ স্থল সেন্ট্রোসোম বহনকারী মধ্যখণ্ড (middle piece) এবং মস্তকের উপরে একটি টুপি মত ঢাকনা স্বাভাবিক গঠিত; হ্রদে বিশুদ্ধতায় বিশ্লেষণ করিলে বিভিন্ন প্রাণির শুক্রাণুর ভিত্তর আকৃতিগত প্রভেদ দেখা যায়। এইখানে বলিয়া বোঝা যাকার যে শুক্রাণুর মাথার উপরে টুপি ঢাকা অংশটিরই থাকে সেই পর্কার বাহ্য ওভারকে ভাবন দক্ষ করিয়া দেখিলেই আরও পূর্ণ বোধ্য করে। শুক্রাণুর গড়নের বিভিন্নতায় উদাহরণ স্বরূপ হল। যাইতে পারে যে বাহুর এবং তারকা মস্তকের (star fish) শুক্রাণুর মস্তকের উপবিভাগ হইতেছে গোলাকার। অপর দিকে মস্তকের শুক্রাণুর মস্তকের উপবিভাগ অনেকটা আত-
 কলের উপবিভাগের মত একটু চ্যাপটা। এইরূপ অস্বাভাবিক প্রাণিবিদের শুক্রাণুর ভিতরও গড়নের বিভিন্নতা দেখা যায়। কোনো প্রাণীর সেন্ট্রোসোম বহনকারী মধ্যখণ্ড খুব ছোট হয়, আবার কোনো কোনো প্রাণীর শুক্রাণুর ঐ অংশ এত বড় হয় যে, অপর দক্ষ অংশ একত্রিত ঐ অংশের দান হয় না। লেজের অংশ স্বাভাবিক শুক্রাণু হিসেবে সক্রিয় করে। ঐ অংশ কোনো কোনো প্রাণীর শুক্রাণুর ছোট আবার কোনো কোনো প্রাণীর বা বড় হয়। কোনো কোনো প্রাণীর শুক্রাণুর লেজের উপর আবার বহু প্রোটপ্লাজমের স্পন্দন পাননা ফিল্ম বর্তমান। শুক্রাণুর আকৃতির এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ফ্রাট ওয়ার্থ নামক পোকের শুক্রাণুর ভিতর দেখা যায়। এই পোকের শুক্রাণুতে দুটি লেজ দেখা যায় কিন্তু সাধারণ ভাবে শুক্রাণুর একটি লেজ থাকে। এই সাধারণ নিয়ম কিন্তু উদ্ভিদের শুক্রাণুর কোনো দিকে না। উদ্ভিদের শুক্রাণু এখন পর্যন্ত আছে বলিয়া দেখা যায় নাই।

বৌদ্ধতার পুনঃস্থাপনা (Replacement of sexuality) :-

আমরা যেখানেই উচ্চস্তরের প্রাণিবিদের সঙ্গে বুদ্ধি বৌদ্ধ সম্পর্কের সাথে স্তম্ভপ্রোভা ভাবে বঞ্চিত।

কিন্তু প্রকৃতিকে অনেক সময় নিত্যই খোঁজা খোঁজা মনে হয়। প্রকৃতি তাহার চলার পথে অনেক সময় এমন সব কাজ করিয়া বসে যাহাকে কোনপ্রকারেই হুজিস্থ করিয়া দেখা যায় না। বিজ্ঞান সেখানে নিজের চলার গতি হারায়া ফেলে—যে—প্রকৃতিতে অদ্বিত্য বর্তমান। আবারে হরত মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানই ইহার মন্ত হারী। মানুষের জ্ঞানের সীমা বাড়িয়া যাবে সাথে সাথে হরত দেখিব যে পূর্বে যাহাকে প্রকৃতির খেলায় বলিয়া মনে করিয়াছি তাহা মোটেই খেলায় নহে। তাহাও সম্পূর্ণ হুজিস্থ বৈজ্ঞানিক সত্য। জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে জীবন তাহার ক্রমবিকাশের পথে চলিতে চলিতে কেমন যেন বর্তাৎ বিজ্ঞানের পথ—হুজিস্থ পথ হারায়া ফেলিয়া তাহার খেলায় মত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রকৃতির ঐ খেলায় কিছুতেই যেন অভিব্যক্তিব্যয়ের মূল্যে বাধা যায় না। অনেক সময় মনে হয় জীবন ক্রমবিকাশের পথ ছাড়িয়া দিয়া পিছনের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুই একটি প্রাণীর ভিতর দেখা যায় যে তাহারা বৌদ্ধ সম্পর্কের ভিতর দিয়া লক্ষ্যভ্রম করিয়াও নিজের জীবনে অর্থনৈতিক পথ অবলম্বন করিয়াছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে ইহাকে নিত্য খেলায় বলিয়া মনে হইলেও বহু-
 তত্ত্বাবধী হিসাবে ইহাকে খেলায় বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। ইহার পেছনেও নিত্যই বৈজ্ঞানিক সত্য বর্তমান—ইহাও নিত্যই জীববিজ্ঞানের সত্য মানিয়া চলে। আমাদের অজানতায় মন্ত আমাদের হরত এই সত্য আমাদের কাছে বদা পরিভেদে না। নব জ্ঞানের উন্মেষের সাথে সাথে যেখানে পাইব যে উহাও সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান দৃষ্ট। কোনো কোনো প্রাণীর ভিতর মাঝে মাঝে এমন দুই একটি প্রাণী দেখা যায় যাহারা স্বাভাবিক বৌদ্ধ জননের মতই ডিম্ব প্রদান করে। কিন্তু আবারে উহারা ঐ ডিম্ব প্রদান করিবার ক্ষমতা কোন কোন ক্রিয়ায় সাহায্য লাগে নাই। এই সমস্ত ডিম্ব কোনো শুক্রাণুর সাথে মিলিত না হইয়া বাক্য দিয়াছে স্বতঃ এই সমস্ত বাক্যভঙ্গিক জননশীল বদা যাইতে পারে। এই প্রকারের ভার্জিন জননকে (virgin reproduction) অপুংজন বলা হয়। অপুং-

জননতা বিভিন্ন প্রকারের ফুলের এবং ফলের মাছি, রোটিকার (Rotifer) নামক ক্ষুদ্র অলচর প্রাণী এবং কখনও আবার কোনো কোনো গম্পূশক পাতেরপর (flowering plant) ভিতর বেধা যায়। একবিক বিয়া বেধিতে গেলে অপুংজননও একপ্রকারের বেগু উৎপাদন, কারণ ইহাও জীবনের হইতে বিচ্ছিন্ন একটি কোষের বহুবার বিভাজন ক্রিয়ায় ভিতর বিয়াই নতুন জীবদেরের জন্মদান করে। অপুংজননতা এবং বেগু উৎপাদনের ভিতর আপাততঃ দৃষ্টিতে কোনো বিভিন্নতা দেখা না গেলেও এই দুইটির ভিতর মূলগত বিভিন্নতা খণ্ডেই পরিমাণ বর্তমান। বেগু উৎপাদন প্রথা আদিম উৎপাদন প্রবণতাবির ভিতর একটি বিশেষ প্রথা। যে সমস্ত প্রাণীদেহের ভিতর বেগু উৎপাদন (spore production) প্রথা দেখা যায় তাহাদের ভিতর বংশোদ্ভূতিক ভাবেই অর্ধো জনন প্রথা বর্তমান কিন্তু অপুংজননের বেলা আনবা বেধিতে পাই যে এই সমস্ত প্রাণী যৌন সম্পর্কের ভিতর বিয়াই জন্ম লাভ করিয়াছে এবং যৌন জননই এই প্রথাভিত্তিক সাধারণ জনন প্রথা। কেবলমাত্র হঠাৎ এই সমস্ত প্রকৃতির কোনো কোনো বিশেষ এক একটি প্রাণী উহাদের সাধারণ জনন প্রথা বার বিয়া; কোনো প্রকার যৌন সম্পর্ক ছাড়াই, সুমারী ভাবে ডিম প্রদান করিয়া কেলে এবং এই ডিম হইতে স্বাভাবিক পূর্ণাঙ্গ প্রাণী বাহির হইয়া উহাদের প্রকৃতিগত স্বাভাবিক জীবন বাপন করিয়া চলিয়াছে। বেগুজননশীল কার্ণ অথবা ছত্রাক হইতেছে নিশ্চিতভাবে অযৌন জননশীল নমুনা। অপরদিকে পূর্ব কথিত মাছি এবং রটিকার স্ত্রীলিঙ্গ। অলচ এই মাছি এবং রটিকার ডিম প্রদান করিবার ক্ষমতা কোনো গুণগত সাহায্য লয় নাই। এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রমাণিত হইয়াছে যে যৌন মিলন ছাড়াও নতুন শরীরের উৎপত্তি সম্ভব। এই বিষয়ে দোব বিভাজন একটি প্রথম শ্রেণীর আবিষ্কার হইতেছে Jacques Toebe এবং এই বিষয়ে মূল্যবান অতিক্রিয়া। তিনি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রমাণ করিলেন, স্বাভাবিকভাবে যে ডিম্ব-কোষের বাচ্চা উৎপাদনের ক্ষমতা গুণগত সহিত মিলিত হওয়া প্রয়োজন হয় সেই ডিম্বকোষটিকেই কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজিত করিয়া স্বাভাবিক জীবন পথে

চালাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব। এক কথায় কৃত্রিম উপায় অপুংজননতা প্রমাণিত করিয়াছেন। সর্বপ্রথম তিনি সামুদ্রিক শল্যকীর ডিম্ব লইয়া এই গবেষণা আরম্ভ করেন এবং এই দক্ষ ডিম্বকোষকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা উত্তেজিত করিয়া স্বাভাবিক বাচ্চা বাহির করিতে সক্ষম হন। ইহার পর কৃত্রিম অতিক্রিয়া দ্বারা ক্রমে ক্রমে একশ পাইল যেন প্রায় সমস্ত ডিম্বকোষকেই, দাড়া ফলের ভিতর জীবিত থাকে এবং যে সমস্ত ডিম্বকোষ জীবিত অবস্থায় থাকে তাহা পাওয়া সম্ভব, এই প্রকারের রাসায়নিক সংশোধন দ্বারা উত্তেজিত করিয়া জীবনপথে চালাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব এবং এই প্রকারের এই সমস্ত ডিম্বকোষ হইতে যে সকল বাচ্চা উৎপত্তি হয় তাহা স্বাভাবিকভাবে উৎপাদিত বাচ্চা নতাই হয় এবং পূর্ণাঙ্গ হয়। Jacques Toebe এই প্রকারের রাসায়নিক সংশোধন দ্বারা তারকা মাছ, একই প্রকারের কোট, শামুক এমন কি ভেকের ডিম্বকোষেরও গর্ভাধান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সমস্ত অতিক্রিয়ায় আরও একশ পাইল যে বিভিন্ন ডিম্বকোষে গর্ভাধান করিতে বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক সংশোধন প্রয়োজন হয়। যেমন নাকি সামুদ্রিক শল্যকীর ডিম্বকোষের পক্ষে নিদিষ্ট পরিমাণের উত্তাপ অথবা নিদিষ্ট বেগের ঝাঁকুনি প্রয়োজন হয়। অপর দিকে ভেকের ডিম্বকোষের পক্ষে দ্রুত দ্রুত একটি পিনের (pin) খোঁচাই খণ্ডে খণ্ডে প্রমাণিত হইয়াছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত গুণগত প্রাণীদেহের ডিম্বকোষ বিজ্ঞানদের আগ্রহের বাহিরে রহিয়া গিয়াছে, কাজেই গুণগতভাবে ডিম্বকোষ লইয়া এই প্রকারের অতিক্রিয়া সম্ভব হয় নাই। কিন্তু আনবা আশা করিতে পারি এমন দিন দ্রুত অদূর ভবিষ্যতে আসিবে যখন বিজ্ঞানের কাছে গুণগতভাবে ডিম্বকোষ লইয়া এই প্রকারের অতিক্রিয়া সম্ভব হইবে। সেদিন দ্রুত আনবা বেধিতে পাইব, মানুষের ডিম্বকোষ পক্ষেও অযৌন জনন অসম্ভব নহে। অস্ত্রচিকিৎসা বিজ্ঞান (Surgery) যে প্রকার দ্রুত উন্নতি হইতেছে তাহাতে মনে হয়, সেইদিনের দ্রুত আনবার খুব বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হইবে না। তবে সেদিন পুরুষের যৌন মূল্য কনিয়া যাইবে না তো! কৃত্রিম অপুংজনন পক্ষে আনবা

যাহা জন্মিতে পারিলাম তাহাতে আশাযের কাছে একটি ন্যূনতম তথ্য উৎখাতিত হইয়াছে। কৃত্রিম অপুংজনন হইতে আমরা জানিতে পারি যে একটি শুক্রাণু যখন একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে তখন ইহা দ্বারা ডিম্বাণুটির জীবন পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রয়োজনীয় দুইটি কার্য সমাধা করে। প্রথমত নিষিক্ত ক্রিয়া নিষ্কৃত ডিম্বাণুকে শক্তিরতা দান করিয়া উহাকে জীবন পথে অগ্রসর হইতে উৎসাহ করে। Loel এবং তাহার সহকর্মীরা ব্যঙ্গনিক সংশ্লেষ দ্বারা এই কার্যই সমাধা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নিষিক্ত ক্রিয়ার দ্বিতীয় কর্ম হইতেছে—শুক্রাণুর সমস্ত অংশ অথবা কতক অংশ ডিম্বাণুর মাঝে মিশিয়া যাইয়া পিতা-পুত্র বংশগতির (father to child heredity) পর খুলিয়া দেওয়া। এই দ্বিতীয়টির জন্য যৌন সম্পর্ক একান্ত ভাবেই প্রয়োজন। এইখানেই আবার প্রশ্ন জাগে ভবিষ্যতে শুক্রাণুরী প্রাণিবিগের ডিম্বাণুকে যদিবা প্রাথমিক সংশ্লেষ দ্বারা জীবন পথে চালিয়াইয়া লইয়া দাঁড়িতে সক্ষম হয় তবুও শুক্রাণুর বেহের ক্রোমোসোম নামক বস্তুটুকু যে কার্য সমাধা করিতে সেই কার্য সমাধা হইবে কি উপায়ে? আমরা জানিবার একটি অধ্যায় দেখিতে পাইব যে ঐ ক্রোমোসোমই আমাদের যৌন ঠিক করিয়া দেয়। ভবিষ্যত সন্তান মেয়ে হইবে কি ছেলে হইবে তাহা নিষিক্ত ক্রিয়ার মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট হইয়া যায়। ইহার একমাত্র সমাধান এই দেখিতে পাই যে কৃত্রিম অপুংজনন পদ্ধতিতে যদি আমরা মানুষ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হই তাহা হইলে সে মানুষ কেবল পুরুষ মানুষই হইবে, কারণ সে

ক্রোমোসোম সন্তানের পিতা ঠিক করিয়া দেয় তাহার একটি হইতে আমরা সর্বস্বই বঞ্চিত হইব। আমরা জানি যে সমস্ত সময়ই ডিম্বাণুর ভিতর একটি করিয়া X ক্রোমোসোম থাকে কিন্তু শুক্রাণুর অর্ধেকের ভিতর কোনো X ক্রোমোসোম থাকে না এবং অর্ধেকের ভিতর একটি করিয়া X ক্রোমোসোম থাকে। X ক্রোমোসোমের মূল শুক্রাণু যখন ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সন্তান মেয়ে হয় এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে X ক্রোমোসোমহীন শুক্রাণু ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সন্তান পুরুষ হয়। এই বিষয়ে সার্বভৌম একটি অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা থাকিবে। কখনো আমরা দেখিতে পাইতেছি—যেথায় কৃত্রিম অপুংজনন প্রচাৰ শুক্রাণুর কোনো স্থান নাই সেই যেথায় ডিম্বাণুটি কোনো সময়ই শুক্রাণু হইতে X প্রাণ ক্রোমোসোমটি পাইতে পাবে না এবং এইজন্যই সর্ব সময়ই ঐ ডিম্বাণু হইতে যেহে গড়িয়া উঠিবে সে যেহেব কোবে একটির বেশী X ক্রোমোসোম থাকিতে পারিবে না। এবং আমরা জানি পুরুষের বেহের কোবে একটি করিয়াই X ক্রোমোসোম থাকে।

জীবনেছে জনসংকোষ কিভাবে গঠিত হয়:—

জীবদেহের একটি সাধারণ সেল কিভাবে বিকশিত হয় তাহা আমরা পূর্ণ অধ্যায়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। বর্তমানে আমরা জীবদেহের বিশেষ বিশেষ কতগুলি সেল কি ভাবে বিধা বিকশিত হইয়া দুইটি জনসংকোষে পরিণত হয় তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। জীবদেহ সাধারণ সেল বিভাজন এবং এই বিশেষ প্রকারে সেল বিভাজনের মধ্যে অনেকখানি প্রভেদ বর্তমান।



কথিত গল্প

এ তবু বালকবেলা

অমলকান্তি ঘোষ

কচুরিপানা

শ্রীকৃষ্ণস্বামী বাগচী

এ তবু বালকবেলা চিরকাল।

মামাজি দফর ভয়ে আর লজ্জার চোখের আড়াল

কবে রাখে।... রাখতার পাত

কিছা গমের আঠা কালির ঝোয়াত

কাগজের ফুল

কাউকেই ধেবে না সে, বাবা আর ছোড়বুঁদি মামনি হুইল...

এ তবু বালকবেলা চিরকাল।

বাঁশের ককি কেটে অতুর্ন মতন তরোয়াল

হাতে নিয়ে মেতে যায় বণে,

গাছেরা শরু হয়ে মিটমিট হাসে একমনে।

তারপরে বাড়ী ফিরে এসে

বলবে মায়ের কাছে, জানো মাগো আজ কী হয়েছে।...

এ তবু বালকবেলা চিরকাল।

আকাশ উড়ার হয়ে বিতে পারে মন আর শ্রমের প্রবাল।

হতে পারে মানে-নেই গল্পের শাবী,

তোমাংকে বিসিয়ে সেবে ফেলে-দেওয়া 'সেল' দিয়ে গড়া

জীব ব্যতি।

তবু তাই নয়

ফেঁটাকাটি পেয়েছিল গুণের সময়

মা-মনির কাছ থেকে। একই আঘবে

গলে গিয়ে ভুলে গিয়ে সে-টাঁকা ফেরৎ বেবের অস্তি অকাতবে।

ডোরা জীবনের বোবা বেধনার মাথে

কচুরিপানারে এনেছে যে কোন জানা,

মাতৃটি তারার স্বপ্ন বিস্তার পাঁখে

কহি উপহাস মরু-পাথরের মানা!

ফেনিল ঝোড়ারে গলে বাঘারর জানি

শোনালো, বুলুচা, শিকল ছেঁড়ার শান,

এনেছে পিৎথকে পরিত্রাণের পাণি

মাগর-পাগল হিসাব-হাদানো প্রাণ।

অপরিচয়ের চির পরিচয় ভাসে

এলো নংগেরে বিতে সরনের ডালি,

কলকলোলে নৃত্যর তালে তালে

ফড়ারে প্রেয় কোঁড়ুক কবজালি।

মেঘের পুতুল নোমের মতন গলে

অন্ত আকাশে হুতিবিহীন আলো,

জ্বরে বিক্য অন্ধকারের তলে

মুক্ত করার "কবে কিরিবার পালা?"

শ্রেণ্তের পথিক, ইতিহাস ভাঙা-ভাঙা,

তবু নীহারিকা নতুনের কথা বলে,

কালের কালিমা, বিপুল বেধনা বালা,

মুছনা করে নিলে তাই ফুলমলে।

আকাশের দৃষ্টি শঙ্কুমাধ চন্দ্রোপাধ্যায়

আমাকে উতলা করে চিরকাল আবিষ্কারবীন
আকাশের নবুদ ইশারা,
কোটি সৌরজগতের নৌকাগুলি আলোক হংগিন
দাল ভুলে হলো বার তরঙ্গ গভীরে বিলাহার।
উপকূল রেখা নেই—ওকী নীল বহুস্তর বেলা ?
সূর্যতায় ঘুরে যায় কত বত নক্ষত্রের বেলা !
বেলা বার আবেক প্রান্তরে ।

মিটিমিটি হীন জলে সন্ধ্যানুধী পৃথিবীর বরে !
অবগ্য-প্রান্তির ছায়া ডেউ ডেউে বিশে বার জলে,
হল পাতা বলে পড়ে, নরী তার চিহ্ন নিয়ে চলে !

তবে এক বিজ্ঞাপন মন বোলে—আমি কোথা যাযো ?
আমি কার চিহ্ন নিয়ে সন্দের আবার্তে যাবোবা ?
চেনা চেনা মুখগুলি বিশ্বস্তির চোরাবাণি থাকে
ডুবে যায়—চিহ্ন থাকে না যে ।

একাকী আকাশ থাকে বহুস্তর চিরবহুসীম
যেন কার শাস্ত ইশার।
মহাকাশে বেধে—গ্রহ-বিশ্বগুলি নীলাভ হংগিন
জটাফালে বেধে নিয়ে ব্যানের নির্মমে বাবীহার।
এই ছোট পৃথিবীর জীবনের শ্রান্ত কোলাহলে
ভুচ্ছ কত আয়ু নিয়ে আমাদের বিনরাহি চলে !

ওকী মহা মৌনতার ডুবে আছে আকাশের মন ?
কালাতীত অন্ধকারে কী ছবি সে করে নিরীক্ষণ ?

বক্তব্য প্রত্যাকর শাকি

হস্তত বলাব কিছু নেই—
তবু আছে বলবার আগ্রহ আমাদের অনিকেত মনে ।
প্রতিদিন তাই সমতনে
অন্ধরের হীন-মালা গাঁবি ।
কখনো চড়াই রঙ ;
কিকে, নীল, হলুদের কাল ।
কখনো বা সাধামাঠো সাধ ।
ঘুরিয়ে কিয়রে সেই বলি এক কথা :
বলবার ক্ষম তবু এ কী ব্যাহুলতা !

কতবার মনকে বলি—কি হবে এ অন্ধর-বিলাসে
নতুন হরোজা যদি বোলাই না যায় ?
তার চেয়ে আর,
করলার ব্যবসা করি, বেখবি কত সুখ,
পুচ্ছই চেছারা হবে, পরিজন বেখবে ছুটো পরশাও সুখ
ও শুধন নিরুত্তর হয় ।
হবে পরে নিকা সই, তবু কিছু বলতেই হয় ।
কোন আশা মনের অন্তরে—
একটি অন্ধরও যদি অকস্মাৎ হীরে হয়ে জলে ।

চ্যুটির সুর

মল্লমল্লর দাঁশগুণ্ড

চুর হতে গান শুনি । বৃষ্টি পড়ে । সে কোন বাড়ল
আশ্রমর আপন বেলালে । বিমিসিমি সুরের বহুল
হুহুর্ডেই হুজো হয়ে প্রাণে আনে সুহৃদিকা সুর
মেঘের ভবন্ত যানে, পঞ্চদশী মেঘের কুমারী
আশ্রব চকলা হয়ে হাওয়ার ওড়ায় নীলাবরী ;
চুর হতে গান শুনি । বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর ।

তাপের ঘর দীর্ঘক বিখ্যাস

এখানে গড়ি তাপের ঘর আশায় মাটি ঘিরে,
এ কথা জেনে তীব্র ঝাঁক কণিক বাতাসেই—
বসবে ঘর খসবে ইট বাঁচার আশা নেই
ঘাসের ছুটি জীবনব্যয় বয়েছি আঁকড়িয়ে ।

এখানে আসো, শুধানে ছায়া, কোথাও ঘন নীল,
জীবনময় বিস্ত্রিতা ছড়ানো সবখানে,
স্বাধীন মনে একটি শূন্য শান্তি চাই প্রাণে ।
তুমি ও আমি নীরব গোঁষে পাইনা বুঁজে মিল ।

তাপের ঘরে ভিৎ জো নেই, বাতাস কণিকের
হঠাৎ জানি বেবাক প্রাণ নীরব করে যেনে,
কি হবে বলে। পুরোন কথা কেবল ভেবে ভেবে—
ভুবনে তরী লাভের আশা ব্যর্থ বণিকের ।

আজকে এসো! তাপের ঘরে নব্বা একে বাই
আগেই যারা অনেক পেরে তাপের কথা ভেবে
ব্যর্থতাকে তাবাই জানি ভিত্তের নিচে ঘেঁষে...
তাপের ঘরে ভবিষ্যতে ভিতের ছোঁয়া পাই ।

দয়িতা পরিমল চন্দ্রবর্তী

জীবনে তোমার সজিনী চেয়ে
কতোনা বেধনা কতোনা ভয়
ঘরের সুনীল আকাশ ছেয়ে
তবুও তুমিই বৈশাখী ঝর ।

আমিই তোমার দুঃখের দিন,
তুমিই আমার কায়ার রাত ;
আমিই শ্রুতির বিগত জীবন—
তুমিই দয়িতা, পূর্ণিমা রাত ।

দীপের সার্থকতা শ্রীমুখীর শুভ

নিশান্তে নিভিবে দীপ । দীপান্তরে কিং
নিবার অন্ধর হাসি উঠবে ছুটিয়া ;
মোহিনী মাটির হস ল'বে সে লুটিয়া ;
আলো দিবে মহাকাল-মহোৎসব-তীরে ।
শকাহুল কেনো হও অশান-ভিমিরে ?
শব্দেহের ছায়া বত বুটিয়া বুটিয়া
উলবাটিয়া তোমো কেনো ? তব দীপ দিয়া
দীপাঙ্কিত-আয়োজন করো বীরে বীরে ।
আলো তো হয় না লগ্ন ; ছায়ার পশ্চাতে
দীপ্তি দিবে দিগন্তে তা'র হাসে বার বার ;—
লুকাচুকি-লীলা হলে আলো-ছায়া মাতে ;
প্রেমের বহন্তে তাই লজব সলার
সার্থক-অন্ধর এতো । নিশি-নিরাশাতে
তব দীপে দেখো মুখ অনাধি-প্রিয় ।

বোরিস্ পাষ্টের্‌নাক্ এবং নোবেল পুরস্কার

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

এ বছর সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার অসাহিত্যিক মহলে চাকলা জাগিয়েছে সবচেয়ে বেশি। তার বেশ এখনও ফুয়েলিং মি।

দিনকয়েক আগেকার কাগজে যখন খবর বেরোল, যে এবার স্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সম্মান লাভ করেছেন সোভিয়েট রাশিয়ার কবি-ঔপন্যাসিক বোরিস্ পাষ্টের্‌নাক্ (১৮৯০), তখন অনেকই সচকিত হ'য়ে উঠলেন, কারণ এতকাল নোবেল পুরস্কারের ভগতে সোভিয়েট সাহিত্যিক-দের নাম সম্বন্ধে পরিবার ক'রে আসা হয়েছে। শুধু তাই নয় এবছর পর্বার বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কারও ঘোষণা করা হ'ল তিনজন সোভিয়েট বিজ্ঞানীর নামে। তবে কি এতদিনে সুইডিশ একাডেমি আপন নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে বহুপরিচর হ'য়ে উঠলেন? অসম্ভব নয়, কারণ তিন বছর আগে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন আইসল্যান্ডের ঔপন্যাসিক হান্স জ্যাক্সনেস্। তাঁর চিন্তাব্যবস্থা মার্কসবাদী।

কিন্তু ব্যাপারটা মোতালো হ'য়ে উঠল যখন জানা গেল যে পাষ্টের্‌নাক্ পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর উপন্যাস 'ডক্টর স্মিথসো'র ক্ষেত্রে এবং সে উপন্যাসখানি আজ অবধি রুশদেশে প্রকাশিতই হয়নি, হয়েছে ইটালি থেকে। রুশ সরকার বইখানিকে প্রকাশের যোগ্য মনে করেন নি। অতএব এ মেনে বইয়ের পুরস্কার লাভে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে এটা একটা রাজনৈতিক চক্রান্তমাত্র, সোভিয়েট-বিরোধিতার ইচ্ছানবানের ছল। সেই সূত্রে পাষ্টের্‌নাকের ভগ্নে বলা বস্তু হ'য়ে উঠলেন সোভিয়েট লেখক সমিতি, যার বর্তমান নেতা আলেক্সি সুভকভ্। তাঁদের মতে পাষ্টের্‌নাক-এর সোভিয়েট দেশ ছেড়ে বাওয়া কর্তব্য, যে বিষয়েই লব্ধ তাঁর উপন্যাসে গুণ্ডামোত, সেই বিষয়েই তিনি থাকবেন ভালো। তার উত্তরে পাষ্টের্‌নাক্ নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং জানিয়েছেন যে তিনি এই বুদ্ধ বয়সে আর রুশদেশ ছেড়ে যেতে চান না।

সোভিয়েট সাহিত্যিকদের মধ্যে যে একটা ভাঙন হয়েছে সে কথা আজ অত্যন্ত স্পষ্ট। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সাহিত্যকে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতির অঙ্গ হিসেবে গণ্য করেন। এবং যেহেতু রুশদেশে রাজ রাজনৈতিক গোষ্ঠী অতি দ্রুত বহুলাঙ্কে সোহেতু অনেককে তার সূত্রে ভাল নিলিয়ে নব নব বেশ ধারণ করতে হচ্ছে। সুঁতরা তা পারছেন না, তাঁদের বিপদে পড়তে হচ্ছে। একটা টালিন-গোষ্ঠীর সূত্রে তাস মেলতে না পেরে কবি মায়াকভস্কিকে আশ্রয়ত্যাগ করতে হয়েছিল। আর সম্মতি নব বহুপতিদের মন কোণাতে না পেরে আশ্রয়ত্যাগ করেছেন ঔপন্যাসিক আলেক্সান্ডার কভাইয়েভ্। এছাড়াও বন্দীদশার নিষ্পন্ন হয়েছেন কবাসাহিত্যিক বোরিস্ পিলুনিয়াক্ আর আইজাক্ বাবেল্। তাঁরা মনে করতেন স্বাধীন সমালোচনার স্বাধিকার শির্দ্দেহর থাকে উচিত, গোষ্ঠীপতিদের সূত্রে সার হিয়ে চলা ছাড়ো সাহিত্যিকের অস্ত্র কর্তব্য আছে।

পাষ্টের্‌নাক্ও তাই মনে করেন। সেইজন্তে তিনি রুশ সরকারের বিরূপভাৱে বহুকাল বাবৎ। যখন থেকে তাঁর আশঙ্কামূলক কাব্য 'স্পেক্ট্রম্' প্রকাশিত হয় প্রায় তখন থেকেই তিনি শাসনকর্তাদের প্রীতি হারিয়েছেন। কেবল টালিনের ব্যক্তিগত অসুস্থগই এতকাল তাঁকে বক্ষা করেছে। মতো থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে সোভিয়েতের অন্তর্ভালেই তাঁর এতদিন কেটেছে। এ সুগম রুশ ভক্তগেরা তাঁকে প্রথানতঃ শেক্সপিয়ারের অনু-বাধকরূপেই জানত। হুবহু আগে 'ডক্টর স্মিথসো' প্রকাশ ক'রে তিনি আবার পুরোভাগে এসে পাকিয়েছেন।

বইখানি একই সূত্রে ইটালি এবং রাশিয়া থেকে প্রকাশিত হবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রুশ কর্তৃপক্ষ প্রকাশ বন্ধ ক'রে দেওয়াই সাব্যস্ত করেন। ইটালীয় প্রকাশককেও তাঁরা এ কথা জানান এবং লেখকসমিতির পরিচালক সুভকভ্‌ নিজে মিলাদ দিয়ে প্রকাশরোধের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইটালির সাম্যবাদী প্রকাশক এক্ষেত্রে

বিশিষ্টার সঙ্গে একমত হ'তে পারেন নি। তিনি উপভাস-
খানির সাহিত্যিক উৎকর্ষকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, এবং
তার ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য নিরন্তরক উপেক্ষা করতে কুণ্ঠিত হননি।
এমন কি পাষ্টের্নস্‌ক্‌ স্বয়ং যখন সখোফনের নাম ক'রে
পাঁতুলিপিখানি ফেরত চান, তখনও প্রকাশক আনাম বে
প্রকাশের কাজ এতদূর এগিয়ে গিয়েছে, যে এখন আর
দেখা চলে না। অতএব বইখানি বেবোর, এবং
একদিনে তার বিতরণ সংকল্প নিঃশেষ হ'য়ে যায়।
প্রথম সংকল্প বইখানি প্রকাশের পূর্বেই অগ্রিম বিক্রী
হ'য়ে গিয়েছিল।

'ভক্তির কিতাপো' স্মরণীয় উপভাস। এতে ক্রম-ব্রহ্মের
গত চল্লিশ বছরের ইতিহাস আঁকা হয়েছে। এত সম্পর্ক
কোন বাস্তবমূলিক গোষ্ঠীর কর্পসডভির সঙ্গে নয়, যতটা
সমগ্র ক্রম সাহিত্যের বিপুল ঐতিহ্যের সঙ্গে। উল্টোর
'সমর ও শান্তি'র সঙ্গে এ উপভাসের তুলনা করেছেন কোন
কোন সমালোচক, আর এর ভাষা সম্বন্ধে কেউ কেউ
বলেছেন যে চেষ্টেভ পরে এমন গল্প আর কেউ
লেখেন নি।

নানা চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে এতে। আর তাহের
কেজে ধাঁড়িয়ে রয়েছে নারক হুবি কিতাপো—কবি এবং
ভক্ত্যার। বনী পরিবারের অনাধ শিক সে, মামার হাতে
মালুম। বড়লোকের বাঘ তার বিয়ে হয় এবং প্রথম
মহাবুদ্ধের সময়ে ভক্ত্যার হ'য়ে সে বংশধরে যায়।

তার স্বত্তর বাড়ির সম্পর্ক আছে হুয়াট্‌ন শহরে।
সেইখানে আর ছটি প্রধান চরিত্রের দেখা মেলে—পাশা
আন্টিপ আর তার স্ত্রী লারা। এরা দুজনেই আত্মগাহী,
দুজনেই শিকাত্রতা। লারার পূর্বজীবনে কিছু মালিক
হ'য়ে গেছে—তার ক্ষেত্রে হারী তাহের পরিবারের উকিল
কম্বারভল্লি। বুদ্ধ বাৎসে পাশাও তাতে বোপ দেয়, আর
লারা তার অহুসরণ করে বেজব্রসের নাস হ'য়ে।
সেইখানেই কিতাপোর সঙ্গে লারার প্রথম দেখা।

তারপরে ক্রম বিপ্লবের ছবি। মস্তকর পথে পথে

মারপিট, হত্যাকাণ্ড, কালোবাজার, চুরি মড়ক। কিতাপো
আর তার পরিবার নিঃস্ব, উপাশমকর্ষ। চুরীর খাতিয়ে ব'লে
বল্ল পর্জন আর জুডহুও-এর সঙ্গে তারা নান্যাক্তমির কবিতা
নিরে আলোচনা করে। অবশেষে কোনদিকে ট্রেনে ক'রে
তার হুয়াট্‌নে এসে পৌঁছায়। সেখানে কিতাপোকে প্রেরণ
করে একমল বিপ্লবী। তাহের নেতা স্ট্রেনিকভ্‌ আর
কেউ নয়, সেই ক্রমশিকক পাশা আন্টিপভ্‌। লারাকে সে
ত্যাগ করেছে। নানা দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে কিতাপোর
সঙ্গে লারার আবার মিলন হয়। ওদিকে তার স্ত্রী সুলজের
বিশিষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় বিপ্লব-বিধোদী ক্রিয়া।
কল্যাপের ক্ষেত্রে। একদিকে লারার প্রেম, অপরদিকে তার
পরিবারের প্রতি আত্মপতা, দু'দিক থেকে কিতাপো ভেঙে
পড়ে। অবশেষে লারাকে নিঃশব্দতার দোস্ত দেখিয়ে
নিরে যায় সেই পূর্বোক্ত উকিল কম্বারভল্লি। তারপর
লারার আর কোন চিহ্ন নেমে না। কিতাপোর হুয়া হয়
ট্রাম দুর্ঘটনায়। তার ঘেরে টানিয়া কাপড় কেটে জীবিকা
নির্বাহ করে। আর আততায়ীর ভলিতে মরে পাশা
আন্টিপভ্‌।

উপভাসের অন্তে দেখা যায় দ্বিতীয় মহাবুদ্ধ সঙ্গ-শয়
হয়েছে। ক্রমব্রহ্ম অপরাজিত। কিতাপোর নোটবইগুলি
পড়ছে বল্ল গর্জন আর জুডহুও। সেই নোটবইয়ের কয়েকটি
কবিতা নিয়েই উপভাসের সমাপ্তি।

মোভিয়েট সহকারের অভিযোগ যে এ উপভাসে ক্রম
বিপ্লবকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, তার ঐতিহাসিক
অযোগ্যতা যথেষ্ট স্বীকার করা হয়নি, এমনভাবে আঁকা
হয়েছে যেন ওটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা, যা না ঘটলেও
চলত। অতএব উপভাসখানি সাহিত্যক্ষেত্রে বড়ই মদুদ হ'ক
তাঁরা এক প্রকাশ করতে হিতে অনিচ্ছুক। এখন প্রশ্ন
হচ্ছে, পাষ্টের্নস্‌ক্‌ কী করবেন? নোবেল পুরস্কার
প্রত্যাখ্যান করলেই কি সব মিটে যাবে? না কি আর
কোন চরমতর ভাষা তাঁর ওস্তে অপেক্ষা করে আছে?
পৃথিবীর লোক তাই আনবার ওস্তে আজ উৎকণ্ঠিত।

লেপচা জাতি

অনিম্য হায়

লেপ্চাঃ। এককালে তিব্বত-হিমালয় অঞ্চল খেঁচে ভারতে এসেছিল। ১২৪১ সালের অক্টোবরমাসে অহুনাং নামে যার যে উপজাতীয় বিভিন্ন ভাষা অহুনাংয়ে বাঙলা-দেশে যে স্থিতি আদিবাসী সমাজের নাম উল্লিখিত হয়েছে সেপ্চা নামে তাহেব মংখ অস্তিত্ব।

একসময়ে সমস্ত হাতিপিত্ত, মেলা ও শিকিম, সেপ্চায়েব বাক্য ছিল। তিব্বতী ও ভুটিয়াগণ সেপ্চায়েব হারিয়ে ছোট ছোট পার্বত্য অঞ্চলে তাহেব সরিয়ে দেয়।

লেপ্চাঃ। তিব্বতীয়দের নত বর্ধাকৃতি এবং তাহেব গায়েব বং অস্ত্র নকশাওয়ান লাতিহেব তার যথিযাত্র। সেপ্চায়েব বস্তাব অস্ত্র নত এবং তাহেব মুখেচোখে নাখুই আছে। তারা নির্ভয়ে বাস করতে ভালবাসে এবং অনেক গভীর বনে গৃহ নির্মাণ ক'রে বাস করে। শিকিমে অসংখ্য পূর্ব তারা পশ্চিম ভূটানের এবং পূর্ব নেপালের নিম্ন উপত্যকাগুলিতে বাস করত এবং নিম্নেব গৃহের চারিপাশে চাষবাস করত।

লেপ্চায়েব বংশগত উপজীবিকা “ফুন চাং”। ১২০১ সালের অক্টোবরমাসে অহুনাং নামে যার যে সেইসময় মৃতকরা ৬০ জন সেপ্চা ফুন চাং ক'রত এবং ৪০ জন নানাংবিব নকুই ক'রত।

তারা অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। জাতি সামান্য সংখ্যক সেপ্চা নিজেদের হিন্দু বলে ধাবী করে এবং কেহ কেহ উপজাতীয় ধর্ম পালন করে। তবে সেপ্চায়েব বৌদ্ধধর্ম, তিব্বতীয় সংস্কৃতিসম্পন্ন। তারা ভূতপ্রেত, আত্মা নানাধেবতা পুনর্জন্ম প্রভৃতি বিশ্বাস করে এবং তাহেব ধাত্মাধাতু বিভাগ নেই। সেপ্চারা পশু, পুংর ও ভেড়ার মাংস খেতে ভালবাসে এবং শ্রী পুস্ত্র সকলেই মজাসক্ত।

যেই বয়সে সেপ্চায়েব বিবাহ হয়। মূল্য বিয়ে কত্ম কিনতে হয়। পত্নী সেপ্চাকে যারে কত্ম কিনতে যেওয়া হয়—অর্থাৎ বিবাহের পরে স্বত্বভারতীতে থেকে মজুতী করে তাকে কত্মপণ শোধ করতে হয়। বত্বদিন না কত্মা পণ শোধ হয় ততদিন স্ত্রী যাপের বাড়ীতে বাস করে। সেপ্চায়েব মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদপ্রচলিত আছে, তবে সহজে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি

মতান্তর ঘটে, তবেকজন মধ্যস্থ ব্যক্তি ঝগড়া মেটাবার চেষ্টা করে। এই সকল মধ্যস্থ ব্যক্তিগণকে সেপ্চারা “শিবুগ” বলে। ঝগড়া যদি না যেতে পারলে লামার সাহায্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করা হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের পর নারী আবার বিয়ে করতে পারে। সেপ্চা সমাজে বিবাহ বিবাহ প্রচলিত আছে।

তিব্বত লামারা এনে সেপ্চা সমাজে পুণ্যোচিতের কাঞ্চ করে। দু'চার জন সেপ্চাও লামা হয় বটে কিন্তু তারা ভূতের ওয়ার (ভুজা বা গিহা) কাঞ্চ করে। সেপ্চা লামাগণ মৃতব্যক্তির আত্মাকে মন্ত্র কহতে পারে এবং দেবতাহেব রোখ শান্তি করতে পারে—সাধারণের এই বিশ্বাসের জন্য সেপ্চা জনসাধারণের ভিতর সেপ্চা লামায়েব প্রতিগতি খুবই বেশি।

লেপ্চা সমাজে মৃতদেহ সৎসর্গ করা হয়। কবর খোঁচার পূর্বে মৃতদেহটি ভাল কাপড়ে সূক্ষ্মকৃত করে তিন দিন বসিয়ে রাখা হয় এবং তার সামনে নানাবিধ খাবার মাঝিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সূক্ষ্মকৃত দেহটি সৎসর্গ পূর্বমুখ ক'রে বসিয়ে বনা অবস্থায় কবরস্থ করা হয়। উচ্চ-শ্রেণীর খাখা সেপ্চাগণ মৃতদেহ পুড়িয়ে সংস্কার করেন এবং অগ্নি কোন মজীতে ফেলে যেন।

ধান কাটাও সময় বাড়ীর কর্তা মৃত পূর্বপুস্ত্রমিসকে ভাত মধ উৎসর্গ করে।

এখন বহু সেপ্চা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। অনেক শিক্ষিত হয়েছেন এবং কেহ কেহ উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছেন। শিক্ষিত সেপ্চাগণ সম্পূর্ণ আধুনিক জীবনযাত্রা গাশন করেন এবং উপজাতীয় আভ্যাস তাঁহেব মধ্যে আর দেখা যায় না।

লেপ্চারা মঙ্গোলয়েড্ জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সেপ্চা ভাষা তিব্বত-চীন ভাষাগোষ্ঠীর হিমালয় শাখার অন্তর্গত অনেক সেপ্চা এখন নেপালী ভাষাতেও কথাবার্তা কয়।

১৯২১ সালের অক্টোবরমাসে অহুনাংয়ে পশ্চিম বাঙলার সেপ্চার সংখ্যা ১০,৪০০ (বাঙালিগণ মেলায় ১০,১৬৪ জন মঙ্গলাইগুড়ি মেলায় ২০১ কলিকাতায় ৭ জন ২৪ পরগণায় ২০ জন, ধাওড়ায় ১ জন, হুগলী মেলায় ৩১ জন এবং মেদিনীপুর মেলায় ৩ জন।)

শুণ্ডকবিয় কবি প্রতিভা ও জীবনবাদ

শ্রীলক্ষ্মী দত্ত

শিল্পীর ভাবতত্ত্বের ব্যক্তিবৈব নিক্ত প্রেরণাই সার্বক কবিতার উৎস। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নান্দিক বাদ্যালীর জীবনপ্রবাহে সেই মধ্যভিদারী নিবৃত্তি ও নভীবতা প্রায় অলভ্যই ছিল। ঈশ্বরগুণ যে যুগে বাংলা কাব্যের প্রায় একমাত্র কবি ছিলেন। কিন্তু কবি কি অর্থে তাহাই বিচার্য।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কবি শব্দটির অর্থ ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। প্রাচীনতম ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থে দেখা যায় “কবিঃ মেধাবী ইতি।” অর্থাৎ যিনি মেধাবী ও প্রজ্ঞাশীল— তিনিই কবি। আবার একজন বিখ্যাত অভিধানকারের মতে যিনি বিদ্বান, প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত অথবা যিনি সত্যকে অন্তরে অন্তঃস্থে স্থির ও নিমূঢ়ভাবে উপলব্ধি করিয়া সেই অমূল্য সত্যকে প্রাণমণী উদীপনায় ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন তিনিই আন্যদের দ্বন্দে কবিত্বগে অভিহিত হইয়াছেন। এই শব্দত অর্থে ঈশ্বরগুণ ছিলেন সে যুগের অন্ততম প্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার স্মরণে রচনাগল্পের মধ্যে একদিকে যেমন যেখি তাঁহাকে বস্তুবাহুগুণ—অপরদিকে আধ্যাত্মিক অমূল্যত্বশীল ও প্রেষ্ঠ আদর্শবাহী। অগ্রত ইহা অস্বীকার করা যায় না যে ব্যঙ্গ রচনার ক্ষেত্রে তিনি বৈরাগ্য অপ্রতিদ্বন্দী—আধ্যাত্মিক ও নৈতিক রচনার ক্ষেত্রে সেরা নছেন। বক্তিত্বগুণ ঈশ্বরগুণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন— “ঈশ্বরগুণ Realist এবং ঈশ্বরগুণ Satirist।” এই দুই বিশেষণই তাঁহার বৈশিষ্ট্য বিশেষিত।

ঈশ্বরগুণ সাহিত্যকর্মে—পদ্য ও গদ্যে তাঁহার ব্যক্তি চৈতন্য বৈতন্ত্র্য সম্প্রদায় প্রতিভাত হইতে দেখা যায়। গদ্য লেখক হিসাবে তিনি গদ্য যুগের আধুনিকবৈরাগ্য ও অনাগতের পুষ্কর আধুনিকতার পথিকৃত্য। কিন্তু গদ্য লেখক হিসাবে শুণ্ডকবি ছিলেন একান্তভাবে আধুনিক। তাঁহার কবিতায় আধুনিকতার বাহা কিছু স্পর্শ দেখা যায় তাহা বিবরণ নির্বাচনে। বক্তিত্বগুণকে অসুসঙ্গ কবিতা

বলা যায়, “ঈশ্বরগুণের কাব্য চালের ঈর্ষা, বাস্তবের দুঃস্বাদ, নীলের দাবনে, পাঠার অস্থিহিত মক্ষায়।” তাঁহার ‘জানারসে’ যখন দেখি—

“সুদ মেখে লেবু বস, রসে যুক্ত করি
চন্দ্রদী চৈতন্তরূপা, চিনি তার ভরি”;

আবার পাঠার সম্বন্ধে যখন তাঁহাকে বলিতে শুনি;

“হস্তরা বসন্তের বেগে ছাপল
তোমার কারণে আমি হয়েছি প্যাসল
ছাড়কাঠে ফেলে দিই, ধবে দুটি ঠ্যাংল
সে সময় বাজ করে, ছাড়াভাল ছাড়াভাল
এমন পাঠার নাম যে বেখেছে বোকা—
নিজ সেই বোকা নয়, কাড়ে যংশ বোকা”;

তখন কেবল তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মনে, “তাঁহার লঘু পরিচয় ও বক্তিত্বগুণ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ থাকেনা। একমাত্র পরমার্থিক ও নৈতিক পদ্যের কবিতাগুলি ছাড়া সমগ্র কবিতাগুলির মূল হুইই বসবসের। অতি তুচ্ছ নগণ্য উপেক্ষিত, অথচ সুপরিচিত বস্তু সমূহ অপস্রগ যত্নে ও কাব্যপৌরব আচরণে কবিতায় তাঁহার কবিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। প্রাক-ঈশ্বরগুণ যুগে বাঙ্গালী কবিত্বের ইহা ব্যবসায়ীত্ব ছিল। প্রেষ্ঠ কাব্য কেবল বিবরণ গৌরবের উপরই নির্ভর করে না, শক্তিশালী কবি অতি সাধারণ বিবরণ লইয়াও প্রথম শ্রেণীর কবিতা রচনা করিতে পারেন। কবি ঈশ্বরগুণ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তাঁহার কাব্যের নিত্যতরপ ভাবা ও মনন প্রকাশবীরিত্বের মধ্যে কোথাও সাহিত্যিক নিমিত্তির চিহ্ন মাত্র নাই। তাঁহার কবিতা যেন সত্তা স্বনি হইতে তোলা সোনা—আর্টের প্রক্রিয়া দ্বারা এই সোনাকে শোধান করিয়া লইবার কোন প্রয়োজন। তিনি করেন নাই। একজন পাণ্ডিত্য সমালোচকের ভাষায় ঈশ্বরগুণের এই প্রতিভাকে বলা যায়

—“to open out the soul of little and familiar things.”

ঐহিক কবিতার অন্তর্গত বিষয়-নিরপেক্ষ লক্ষ্য ও বহিঃক ভঙ্গিমার বাক-প্রাচুর্যই প্রধান। ‘পৌষ পার্বণে’ ‘মল্ল-মত’ ঈশ্বরচন্দ্রের ‘স্বপ্নপূর্ব’ ভ্রমণানন্দ স্মৃতিস্মারক হইয়া আছে—

“স্বপ্নের নিশির কাল, স্বপ্নে পূর্ণ বর।

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশে তবু বঙ্গের ভরা।”

কিন্তু দেশবাসী দৃষ্টিক ও অকালের ফলে যে বহুতে, সেই স্বপ্ন সত্যাবস্থা বিস্তৃত হইয়া গেল—যদি হইল দুঃখপূর্ণ, সেবারও শুভ-কবি ‘পৌষ পার্বণ’ কবিতা লিখিয়াছেন—

“এবার বছরেকের দিন, কপালে ভাই

ফুটিলো নাকো পুসি পিঠে,

যে মংগুরি বাক্যে, বাহার বাহার

মেতেছে লোক, কপালে পিঠে

কত না পেয়ে উইহ তারে কত দুঃখী গেল মোরে,

চোলের বাহার সস্তা করে

কেন না বাজা চোঁড়া পিঠে

সেই একই প্রকার পরিবর্তনশ্রিত্য, এখানে কবির সামাজিক সচেতনতা স্পষ্ট ও স্মৃতিস্মিত; দৃষ্টিক পীড়িত গৃহস্থের উৎসব দিনের বিস্তারিত একটি পরিপূর্ণ ছবি কবি এক আংটা তুলির ঐচ্ছিক স্পষ্ট বহিরা তুলিয়া ধরিতেছেন।

স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবোধ ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় প্রথম ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা খুব উচ্চশ্রেণীর নহে,—ঈশ্বরচন্দ্র সংগর্ষ যুগের কবি। দুইটি বিশেষণী সত্যতঃ প্রাথমিক পরিচয় সংগর্ষে মধ্যেই ঘটয়া থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র দ্বিধাবোধী ছিলেন ইংরেজী সংস্কৃতিতঃ—সেতর কেন্দ্রবিশেষে তিনি যেমন বিশেষী রাষ্ট্রশক্তির ভয় গানও করিয়াছেন, সেইরূপ বিশেষীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ক্ষমতা বেশবানীকে আশ্রয় করিয়াছেন—

‘পেটে খেলে পিঠে সয় এই বাক্য ধর

বাহার সাহায্যে হেঁচু ব্রহ্মদক্ষা কর।’

আবার তাঁহাকে বলিতে শুনি—

ব্রাহ্মত্বের ভাবি মনে যেন বেশবাদিপণে

প্রেমপূর্ব নয়ন মেলিয়া

কতরূপ হেঁচু কবি যেনেব সূত্রের বরি

বিশেষের ঠাকুর কেলিয়া—

আবার বেশ প্রেমিকতার উচ্চল ঘুটাও তাঁহার কাব্যে নাই বটে কিন্তু সংস্করণগুলি মনেই সংস্কারে যখন আঘাত লাগিয়াছে—তখন তাঁহাকে কাব্যে স্বাভাব্যবোধের উদ্বোধন দেখা গিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্রই সর্বপ্রথম কবি তাঁহার কাব্যে সমাজচেতনা ও ঐতিহাসিক বোধ পূর্ণবাজার বিস্তারিত। তাঁহার কারণ তিনিই প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি যিনি সামগ্রিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। এই সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থাকায় সমসাময়িক সামাজিক ঘটনাবলি যেমন তাঁহার কবিত্বের বিষয়বস্তুতে গৃহীত হইয়াছে—তেমনি ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, বিশেষতঃ যুদ্ধের ঘটনাবলী তাঁহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার ‘সংবাদ প্রকাশক’ বাংলা সংবাদপত্র সাহিত্যে অল্পতম উল্লেখ্য দিগ্‌দর্শনী।

প্রাচীন যুগের কবিতায় যে প্রকৃতি কেবল ছিল ভাষা-উদ্দীপনী ঈশ্বরচন্দ্র সেই প্রকৃতিতে আপন মনের মাহুতী মিশাইয়া কাব্যের ক্ষণতে সম্পূর্ণ আপন করিয়া লইলেন—কাব্যের ক্ষণতে নিঃসর্গের নিমিত্ত একটি মহিমাময় রূপ প্রতিষ্ঠিত হইল যাহা আপনাকে আপনি পূর্ণ ও সার্থক। পূর্বে যে নিঃসর্গ নেপথ্যালোকে থাকিয়া কেবল যুগের ঐন্দ্রজালিক পটভূমিকা সৃষ্টি করিত ঈশ্বরচন্দ্র সেই প্রকৃতিকে কাব্য ভ্রমণের কেন্দ্রে আনিয়া দাঁড় করাইলেন। যদিও এই কবিতাগুলির মধ্যেও গভীর ভাবুকতার পরিচয় স্পষ্ট নহে—কিন্তু ইহাই কবির বৈশিষ্ট্য। তিনি কোথাও ভাব-গভীর হইতে পারেন নাই। সর্বত্রই লক্ষ্য-পরিবাস, হাফা-শব্দসম্ভার ও শব্দ প্রকাশরীতি তাঁহার কাব্যের অনাড়ম্বর সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার গ্রীষ্ম নামক কবিতায় গ্রীষ্মের প্রবল প্রভাবের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। পশ্চর উপর গ্রীষ্মের প্রভাব—

“বাধ বল ভাগহত ভাগ নাই ভাব

শিকার শীকার নাই শিকারে শিকার

কতপতি বর্ষাভাষের রূপ বর্ণনার যে

পশনের সিংহাসনে বসিলেন হুইমনে

তিনিযেব বৃষ্টি বাধার

পথন প্রবল অতি পূর্বদিকে করে নতি

বিষা মিশি চামর চুলায়

ইহাতে ভাবের পত্নীত্বতা দেখা যায় না কেবল শব্দ ও অর্থাৎ অর্থের প্রাচুর্য। তাঁহার শব্দ, শব্দ ও বস্তু বর্ণনাও অল্পরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বস্তুতঃ ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বনা বহুধর্মী, যজ্ঞনাথর্মী নহে। তাই তাঁহার নির্দগ্ধ কবিতা-গুলি ব্যবহারিক প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করিয়া দাদুশব্দে সঞ্চিত একান্ততা স্থাপন করিতে পারে নাই। যে কবি কল্পনার Keats এবং রবীন্দ্রনাথ বসুসদীন বস্তু চিত্রের ভিতর দিয়া নির্দগ্ধের অশুভ পরিচয় উদ্ঘাটিত করিয়াছেন—সেই যজ্ঞনাথর্মী কবিকল্পনা ঈশ্বরচন্দ্রের নাই বলিলেই চলে। আবার ষ্টিক এই কারণেই—তাঁহার বস্তুধর্মী মনন কবি কল্পনার ক্ষুদ্রই সামাজিক ও বাস্তব বিষয়ক কবিতাগুলিতে কবির অনন্ত সাধারণত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

কবিগোলাদের যুগের কবি এবং তৎকালীন কৃতি অল্পসংখ্যায় রচনা করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে কিছুটা ভাঁড়ানি ও অসামঞ্জস্য মূল কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেজন্য তৎকালীন যুগের এবং তাঁহার শিক্ষার অপর্যাপ্ততাই প্রধানতঃ দায়ী। ইহা ছাড়া অবিমিশ্র তথ্যাহসজ্জিন্দা সমকালীন জীবন শব্দে পুথোহুপুথ বসন্তিত কোকুৎস ও বলিষ্ঠ বুদ্ধিবাদ তাঁহার কবি প্রতিভার মৌল উপাদান।

তাঁহার প্রথম ব্যক্তিগত, সমসাময়িক জীবনযাত্রার অল্প কালিন্দা এবং অঙ্গশব্দতা—বহিঃপ্রবর্তের ভাষায় সহবন্ধন 'মেক'র বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ রচনা করিয়াছে। কবির সমগ্র ব্যক্তিত্বের মূল উৎস ছিল একটি sense of negation, বাৎসর্য থাকে বলে নেতিবোধ। অথচ কবি নিছির ক্ষুদ্র প্রয়োজন একটি স্পষ্ট মূল্যবোধ (positive sense of values) সামাজিক অঙ্গশব্দ ও অঙ্গশব্দতাকে তিনি সাংবাদিকের দৃষ্টিতে বিচার বিদ্রোহ করিয়াছেন—নিরীক মত ইহার অন্তলম্পর্শ পবিত্রত্বতাকে আরম্ভ করিতে পারেন নাই।

ঈশ্বর চন্দ্রের বিভিন্ন বিষয়ক কবিতার মধ্যে পারমাণবিক ও নৈতিক বিষয়ক কবিতাই সর্বাধিক। যাহা কিছু ইঞ্জিয়াতীত, বস্তুতে নয় যজ্ঞনাথ সাধারণ প্রকাশ, যাহা যেখানে কেবল চোখের দৃষ্টি নয়, মনের ও ঘ্যানের দৃষ্টি

প্রয়োজন—ঈশ্বরচন্দ্র সেই ঘ্যানশব্দে সত্য বর্ণনাকেও কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার 'বিহু'র পুথ্য' ঈর্ষক কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

“এই গুপ্ত অঙ্গশব্দ অঙ্গশব্দের সাহ
নকলি মদার আর নকলি অঙ্গশব্দ।”

আনন্দের ভাবভীর বিষয়ের মর্মমূল আছে ঈশ্বরকে এই বিশাল পৃথিবী, কৃষ্টি-বৃত্তি-প্রসঙ্গের একমাত্র কারণ-রূপে ভাষা। উপনিষদেও বর্ণিত বলিয়াছেন—“সৃষ্টিকালে ঐহ্য হইতে এই সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে; উৎপন্ন হইবার পর দ্বিতিকালে ঐহ্যে যাহা এই সকল বস্তু প্রাণায়িত হইয়া রহিয়াছে এবং প্রসঙ্গকালে ঐহ্যের মধ্যে এই সকল বস্তু পুনরায় প্রবেশ করে তাঁহাকেই বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করে—তিনিই ব্রহ্ম।”

এই দীর্ঘা গুপ্তকবিও অঙ্গশব্দের সর্বত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—

ব্রহ্মরূপ সত্ত্বের ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নয়, ব্রহ্মময়

অবিল মদার।

ভাবভীর মতে ঈশ্বর অঙ্গশব্দের উপাদান ও উদ্ভবের কারণ। একই তিনি বিশ্বের সকল অঙ্গশব্দের পদমাণ্ডিতে জড়িত হইয়া আছেন। আবার এইভাবে সকল বস্তুতে সীন হইয়া থাকিলেও ক্ষুদ্র অঙ্গশব্দ তাঁহার বিরাট ব্রহ্ম প্রকাশে অক্ষম। সেজন্য ব্রহ্ম আকারে অবস্থিত হইয়াও নিরাকার। কবি এই সত্য উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন—

“আকার ব্রহ্ম কিন্তু নাহিক আকার

আবার আকারে ব্যাপ্ত আছ সবাকার।”

গীতার মর্মধর্মীও ঈশ্বরচন্দ্রের বর্ণনে পাওয়া যায়। ‘মন্তব্যমি যুগে যুগে’ এই বাণী কবির কবিতারও দেখা যায়—

অপরূপ অবয়ব মানা অবতারে

অদ্বুত অথবা অবলম্ব্য বাবে বাবে।

ভারতীয় বর্ণন, বর্ণ ও নীতিশাস্ত্রের মূলীভূত সত্যকে কবি জীবনবর্ণনের সহিত মিসাইয়া লইয়াছেন। ঈশ্বরকে বাহু দিয়া সঙ্গাৎক সাহ করিবার প্রচেষ্টা মানুষকে কেবল দুঃখই দেয়—ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই সঙ্গাৎকে “সমুদ্র”, “অরণ্য” “জাঁতা” ইত্যাদির সহিত তুলনা

ক'রিয়াজেন, সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জনে এবং ভয়াবহ সংসারভাষণে পথভ্রষ্ট অশ্রদ্ধা পুত্রকে সেই পথযাত্রার কল্পনাই একমাত্র পথ দেখাইতে পারে তাই তিনি জীবকে সেই ঈশ্বরকে স্বরণ কবিত্তে বলিতেছেন—

“অতএব গুন-জীব; প্রাপ্ত হয়ে নিম্ন শিব
হইবে অশিব সব পদ
মারামাশ মুক্ত হও; সত্যের আশ্রয় লও
ঈশ্বরের হও পরানত।

ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়া সংসারকে আশ্রয় করিলে প্রিয় ভ্রমের মধ্য হইতেই পথ প্রিয়তমের সন্ধান মিলিবে—কণ-স্থায়ী সংসারিক সুখের মধ্য দিয়াই চিরস্থায়ী সুখের আভাস দেখা দিবে—যেথা দিবে সৌন্দর্য ও মাধুর্যের পূর্ণতম প্রকাশ। সেজন্তই উপনিষদ বলিয়াছে—

“জানত্যাচ্যেব স্বধিমানি কৃতানি ভারতে
জানন্মেন জাতানি জীবন্তি।”

অর্থাৎ জানন হইতেই এই জগতের সৃষ্টি, জানন্মেই তার স্থিতি, জানন্মেই তার লয়।

ঈশ্বরানন্দ-সমাপনে ব্রত কবি ঈশ্বরগুণও স্থির বিদ্যাস লইয়া বলিয়াছিলেন—

“যদি না প্রকাশ পায় প্রতিভা তোমার
কণং কি হতে পারে সোভার ভাষার?”

এই আলোচনা হইতে ইহা দেখা যায় যে কাব্য রচনার একদিকে তাঁহার মধ্যে যেমন ছিল—বালাসী-প্রাণতা অপরদিকে আত্মবন তিনি ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক বাহক ও প্রকাশক।

ঈশ্বরগুণ বাংলাকাব্যের এক মহা দুর্গোপের মুহূর্তে আবিস্কৃত হইয়া সুলভ কবি, প্রচুর চমক কোড়ক, সহজ প্রকাশভঙ্গি প্রভৃতির অশ্রয়ে বাংলাকাব্যের শুকপ্রায় বর্ণ-প্রবাহটিকে বাচাইয়া আনিয়া পংখতী ছুগের বিরাট ভাব সমুদ্রের সহিত সংযোগ ঘটাইয়াছেন। তাঁহার মধ্যে তৎকালীন সাহিত্যের ঋষ্যযোগী ও ভাবযোগীর মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। তাঁহার কবিতার রস কেবলমাত্র বর্তমান যুগের পাঠকের মণেই নিঃশেষিত হইবার নহে—ইহার মর্যকোষে যে যুগ সঞ্চিত রহিয়াছে—স্বাধী যুগের যৌক্ত-জনেও তাহা দীর্ঘকাল পান করিবে। আধুনিক যুগের প্রবর্তনায় তাঁহার কবিতাবলী কতখানি সহায়তা করিয়াছে—তাহা বিতর্কের বিষয় বটে, কিন্তু তাঁহার সাহিত্যিক অধর্মের দলই যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই দিক দিয়া নিচায় করিলে ঈশ্বরগুণ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শুক স্থানীয় অতএব তাঁহার কবিত্বটিকে কেবল সামাজিক প্রয়োজনে ওষধির মত বিনষ্ট করা উচিত নহে—বনস্পতির দীর্ঘ স্থায়িত্ব দিয়া ইহাৎক নথ্যে রক্ষা করা উচিত।





বহি-বন্যা গজেন্দ্র কুমার মিত্র

(পূর্বাহণতি)

॥ ৫৫ ॥

এই পর্বত খেল ইতিহাসের কথা। এবার কাহিনীতে
কিছিয়া আসা যাক।...

মোহ যত বড়ই হোক—এক সময় তাহা কাটিয়া যায়।
অকস্মাৎ ঘুরে—এই গ্রাম্যের মতোই কোথায় কোন
শিশুর কাহা কানে যাইতে—নানাদাহেবের মোহ ভঙ্গ
ঘটিল। তিনি খেল ভেদিয়া আগিয়া উঠিলেন।

‘কিস্ত মেরেতা?’

বিদ্যুৎ মুখে হাসনের দিকে চাতিয়া আবারও প্রশ্ন করেন
নানাদাহেব, ‘মেরেছেলে আর শিশুগুলোকে অস্ত্রত বাঁচাও
হসেনী। আমাকে একবারে চরম নরকে ভুঁবিও না।...
আমি বরং এখনই একবার ঘাটে যাই...এই গোষাকেই
ধাব?..না না, আমার গোষাকটা কাউকে জানতে
বলে—’

হেমেমাহুয়ের মত অলপলয় কথা বলিতে থাকেন নানা
পুষ্পপথ।

আমিনাও সেন ব্যস্ত হইয়া উঠে। কণ্ঠে ঘষেই ব্যাকুলতা
আনিয়া বলে, ‘মোহাই আপনাব পেশারা, আপনি উঠবেন
না। আমিই দেখছি। আপনি অস্থ...একটুখানি অস্ত্রত
বিশ্রাম নিল। পাহেন ত একটু ছুঁ খন।...আপনি কিশের
অন্তে ছুটোছুটি করবেন—আপনি রাজা, মালিক, আপনাব
ইচ্ছার ওপর কার কথা? আজিহুলাকে ভেঁকে আপনাব
আবেশ জানিয়ে দিছি আমি এখনই। তার ভয়ে আপনি
ছুটে যাবেন কেন?’

‘কুমি কথা দিছি হসেনী?’

‘কথা দিছি পেশোরা।’

হসেনী সত্যই ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু অন্ধরের শেষপ্রান্তে আদিয়া পৌঁছিতেই প্রথম
মহার মহিত তাহার দেখা হইল—সে আজিহুলা।

তাহার সল্যটে হৃদয়তার দেখা, চোখের বুটিতে স্নেহ।

‘কী ববর আজিহুলা?’

উৎসে ও ব্যাকুলতায় আজিহুলাকে স্তম্ভনয়ক মনোবদন
করার কথাটা তাহারও খেমন মনে পড়িল না—তেনমি
আজিহুলাও স্তম্ভনয়ক পলি ন।

‘ববর খারাপ। খেমনগুলো এখনও ঠিকানাই পড়ে রয়েছে
—সিপাহীরা ওদের ওপর গুলি চালাতে বাকী হচ্ছে না
কিছুতেই। বলছে যে বসাইব’ও প্যারী কাটতে চায়না—
আমরা ত সিপাই। মেরেছেলে আর বাচ্চাদের ওপর গুলি
চালাতে আমরা হাতিনার খবিনি।’

‘হাঁ?...যাক—আপাতত ওরা বাঁচুক। এদিকে নানা
সাহেবও একবারে কেপে উঠেছে, মেরেছেলে আর ছেলে-
মেরেগুলোকে অস্ত্রত বাঁচাতে হবে। বুড়ো মেরেদের নতই
কাপছে সে। এতক্ষণে হরত খেঁবেও কেপেছে। এখাজা
যাক। তারপর আমি আছি। সবকর হর—এ হাতেও
বন্ধুক কিবা তলোয়ার বরতে পাবে।’

‘কোথায় বাঁচা যায় ওদের? এখনে গ্রাম্যেরে আনব
না বিটুরে পাঠিয়ে দেব?’

‘উঁহ! উঁহ। বেকুবি ক’রো না আজিহুলা। বাঁকসীর
জাত ওরা, ওদের বাঁচতে বেওয়া চলবে না।...গ্রাম্যেরে
তাড়্য আছে, বধন নানা আছেন, ওঁদের দয়ার শরীত, দয়া

উপলে উঠবে একেবারে। আর বিহুবে আছেন বাজীংগের
বিধবারা, তাঁরা আমাদের হুজুর বেড়ালেব নত ঘণা
করেন।’

‘কিস্ত তাঁরা ত প্রায় বন্দী।’

‘হ্যাঁ, বন্দী—কিস্ত প্রাসাদেই বন্দী। প্রাসাদের বন্দীদের
কাছে এখনও তাঁরাই বাসিন্দা হবেন।...না, না—অন্ত কোথাও
রাখতে হবে।’

‘কোথায় রাখব বলে! ছসেনী, আর সময় নেই।’ ষষ্ঠ
অসহিষ্ণু কর্ত্তেই প্রশ্ন করেন আজিমুন্না। সম্ভবত এই দানবীর
হস্ত-পিপাসা তাঁহার কাছেও অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

‘আবু ত কিছু মেনকে আটক করে রাখা হয়েছে
আজিমুন্না খাঁ। তাঁরা কোথায় আছে?’

‘তাঁরা? ওখানে একটা ছোট ব্যারাকমত বাড়ী আছে,
তুঁহু দেওয়ান-খেরা, কার বাড়ী তা জানি না, সেইটাই খানি
করে নেওয়া হয়েছে। বিকিরা আছে বলে সিপাইরা নাম
দিয়েছে বিবিসং।’

‘ঠিক আছে। সেইখানেই ওদের নিয়ে গিয়ে তোলা।’

আজিমুন্না সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া বাইতে উভত হইলেন।
পিছন হইতে আমিনা তাহার একটা হাত ধরিল।

‘দাঁড়াও। হইলারের কী হয়েছে জানো?’

‘ঠিক বলতে পারব না। একজন বললে যে সিপাইরা
তাঁদের কোটে কেলছে নৌকোর ওঠবার আগেই।...অবুও
তিনি চাবজনকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁরা কিস্ত সকলেই
বলেছে যে হইলারকে তাঁরা নৌকোর উঠতে দেখেছে।
তার পরের ধর অবশ্য কেউই বলতে পারেনা।’

‘সে যাক গে। তার খবরের দস্ত আমি খুব উদ্বিগ্ন
নই। বরং সে বেঁচে থেকে তার নিবুদ্ভিতার কল্যাণল ঘেঁষে
সেলেই আমি খুশী হই।...আমার প্রয়োজন তার নয়কে।
তার মেরেকে ওদের সঙ্গে রাখা চলবে না। তাকে আমার
চাই। সাবখানে কড়া পাহারায় তাকে এখনে নিয়ে
আসবে। পিছনে বাগানের দোর দিয়ে সোলা নিয়ে বাবে
আনার হবে। আমি তার অপেক্ষা করব।...মুসল্লং থাকবে
অশ্বর মহলের পথে, কোন অশুবিধা হবে না। নিজে না
আসতে পারো—কেনে বিখাসী লোক দিয়ে পাঠাবে।
বাও।’

অত ব্যস্ততার মধ্যেও কোকুৎস অসহনীয় হইয়া
ওঠে। অসুস্থিত করিয়া আজিমুন্না প্রশ্ন করেন ‘তাকে
তোমার এত কি বরকার পড়ল বেগমদা হেবা?...বহি—বহি
তার কোন পাতা পাওয়া না যায়? কিধা এর মধ্যেই
ছুটকে।’ শুণিতে বহি মরে গিয়ে থাকে?’

‘না, না তাকে আমার চাই-ই।...বহি মরে গিয়ে থাকে
মৃতদেহটাও নিয়ে আসবে। মৃত বলে শোণ ভুলতে আমি
ছাড়ব না। খুঁজে বাব করতেই হবে। বহি পাশিয়ে
গিয়ে থাকে ত বুঝব ভুমি—বা তোমরা একেবারে অপহার্য।
সিপাই লাগিয়ে যোয়েনা লাগিয়ে যেমন করে হোক খুঁজে
থরে নিয়ে আসবে। উল্লাসদিকে বলবে তার যেখানে বড়
পুলিশ আছে সব লাগাতে—নইলে নিজে হাতে তাকেই
টুকরো টুকরো করে ফেলব আমি।...বাও, হইলারের
বেটিকে আমার চাই-ই। তাকে আনতে না পারলে আর
ভুমিও মুখ দেখিও না—’

কোকুৎস কিছুদূর মিটল না, বহর বাড়িয়া গেল।
তবু আর প্রশ্ন করিতে সাধন হইল না আজিমুন্নার। সেই
মুহূর্ত্তে ক্রোধে, কোতে, দিখালোর—আমিনার মুখখানা
বোধ করি সত্যকার বানবীর মতই পৈশাচিক হইয়া
উঠিয়াছিল। তবু হইল বুদ্ধি এখনই তাহার উপরই
কাঁপাইয়া পড়িয়া নখে-রক্তে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তুলিলে।
তিনি সবলে বেশ একটু ক্রত পদেই বাহির হইয়া গেলেন।

হোক বানবী—তবু লোভনীর বৈকি।

বাননার নিরুজ্জি হয় নাই যে এখনও।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল আমিনাকে।

দ্বিপ্রহর অপরান্তে আসিয়া পৌঁছিল, তবু আজিমুন্নার
পাতা নাই। শারীতিক স্ত্রাতি আমানদার বড় কম নয়,
তবু দিল্লারের কথা তাহার মনে পড়িল না। আহারের ত
কথাই ওঠে না—মুসল্লং মোর করিয়া বার-ছুই নরং
খাওয়াইয়াছে, নিত্যন্ত অলস গরমে মুহূর্ত্ত পিপাসা পার
বলিয়াই সেটুকু প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। তবে
সুখই সেইটুকু, অর্থাৎ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যেটুকু হয়।
আজিমুন্না কে বিহার দিয়া একবার মাত্র সে নানাস্থানেব
ধরে গিয়াছিল নবাবটো নিতে যে, সে কথা ঠিক রাখিয়াছে,
পেশোয়ার আবেশে আজিমুন্না কে জানাইয়া বিচারে।

তাহার পথই নিম্নের দ্বারে কিরিয়া আসিয়াছে সে—আদিয়াই
মান করিয়া লইয়াছে, বোধ করি বৈদিক অন্তর্জিতার
সহিত মানসিক স্রানিও ঘোত করিবার একান্ত আশ্রয়ে ও
আত্মপতায়—তাহার পথই শুভ হইয়াছে এই অশীর
প্রতীক্ষা, পিঞ্জরাবদ্ধ নিম্নের মতই অশীর পথচাওয়া।
ধবংও যেন আর কিছু নাই। পাইবার উপায়ও নাই।

তবে বাহিরের উত্তেজনা কিছুটা স্তিমিত হইয়া
আসিয়াছে। সেটা এখান হইতেই বোকা যায়।
প্রভাতের সে উদ্ভত কোলাহল অনেক কমিয়া আসিয়াছে
—হরত বা বৈদিক স্রান্তিতেই—কিনা ঘটনাটার স্তনন
কুণাইয়া দিয়াছে বলিয়াই। যেন হয় পথের অাবন্যজ্ঞা
আবার প্রাত্যহিক খাতে বহিতে শুরু করিয়াছে। এখানে
ধিপ্রহরের শেষ দিকেই ভাত্যা চৌপ্তি, উল্লাস সিং, নান্দে
নবাব, বালা সাহেব সকলে মিলিয়া বরবার গৃহের বরতা বন্ধ
করিয়া নানাব সহিত মন্ত্রণায় বসিয়াছেন—এখনও সে
বরতা খোলেন নাই বা কেহ বাহিরেও আসেন নাই। বরং
ইতিমধ্যে আরও দুজন পরে আসিয়া সে মন্ত্রণায় যোগ
দিয়াছে—চীকা সিং ও ছলগুজান সিং। মন্ত্রণাও নানাই
ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

ইহার ভিতর আমিনাব ধবং কেহ হয় নাই। মন্ত্রণা
গৃহে ডাক পড়িলেও তাহা লান্য কথাই। সেখানকার
আলোচনাটা কোন খাতে বহিতেছে তাহা আমিনা
অনায়াসে অনুমান করিতে পারে। তাহার বিস্তৃষ্টই
অধিকাংশ বগনা বিবোধপারে ব্যস্ত। কথাটা মনে পড়িতেই
অবজ্ঞার আমিনাব হুবহাচিত ওষ্ঠ দুটি বারেক ফুঁকিত
ও বিকৃত হইল। তেড়ার হল সব। উষাধের বিধই বা
কতটুকু যে তাহাকে ভয় করিতে হইবে। বেচারা নানা
—অস্ত্রের অপরিপীদ্য স্থণা পাত্র উপচাইয়া উঠিলেও,
সহস্রাত মন্তব্য কথাটা মনে না পড়িয়া পাইল না—সকাল
হইতে বেচারীর কিছু খাওয়া হয় নাই। এমন কি খোঁষ
হয় দুটুকুও না। তাহা হইবার শখ হইয়াছিল কিন্তু
তাহার কোন স্বাভাবিক যোগ্যতা নাই—ই, কোন শিখাও
ত পায় নাই। সামান্য মাত্র আঘাতেই অস্থির হইয়া
পড়িয়াছে।

কিন্তু আদিমুজা কৈ ?

মতাই কি সে শত্রুতানের বাহ্য্য মেয়েটা ছাতের মধ্য
হইতে পলাইয়া গেল না কি ?

কথাটা মনে পড়া মাত্রই অসহ ক্রোধ ও অতৃপ্ত অক্রোশে
মুখ আরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল আমিনাব—লসারটির
ছই পানের শিরাতুলি স্মিগা উঠিতে লাগিল। হাত
ছুইটা নিরুপায় তাবে শুণু ঘূর্ণিবদ্ধ বহিতে করিতে
নবগলা করতলের নমন মাস কাটিয়া বলিল।

যাব করেক পথ পর—অকাবণ আমিনাও—মন্ত্রণাও
বাহিরে পাঠাইল। কিন্তু শুণু বাহিরে গেলেই ত ধবং
বেলেনা। ধবং মুলস্থল আর কিহিলই না। অবশেষে
বৈধ শেষ সীমায় উপস্থিত হইতে যখন আর বেনী দেবী
নাই—তখন মহলা আদিমুজাই আসিয়া হাতিব হইলেন।
সঙ্গে রক্ষী-সেষ্টিতা এক তরুণী ইংরাজ ছুঁত।

আতঙ্কে জনশনে কণবিনের অনিয়মে—দর্শোপরি পুলায়
দোত্রে, পরিশ্রমে—পূর্বের চেহারা সানুস্ত নিলাইয়া পাওয়া
শক্ত—তুণু আমিনা ভাল করিয়া চাহিয়াই চিনিতে পারিল,
ছইলারের ছুঁতাই গটে কোন ভুল নাই।

যে অবস্থা দেখিলে স্বাভাবিক যে কোন মানুষের চোখে
ভল আমিনাব কথা—সেই পুত্রই আমিনাব সূতিকে উজ্জ্বল
করিয়া ছুলিল। এতক্ষণ যেন সে কিছুটা তৃপ্ত হইয়াছে,
তাহার এতদিনের আয়োজন সার্থক হইতে চলিয়াছে।

রক্ষীধের বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমিনা
একবারে তাহার সামনে আসিয়া ঝাঁড়াইল। দেখিল
মেয়েটি টিপিতেছে, ইংিতে একটা চৌকা দেখাইয়া দিয়া
ইংরাজীতে বলিল, 'বোস।'

তাহার পর কিছু পূর্বে তাহাৎই এক মূর্ত্তমৎ যে শব্দ
রাখিয়া গেছে, সেই শব্দই আমিনা তাহার সামনে বহিয়া
বলিল 'খাও।'

মেয়েটি এক মুহূর্ত্ত ইতস্তত করিল, বরত বা শত্রু
হেওয়া পানীরে বৃদ্ধা লুকাহিত আছে কিনা সেই কথাটাই
তাবিয়া লইল—কিন্তু তখন আর প্রত্য্যাখ্যান করার মতও
অবস্থা নয় তাহার। বোক বিয়, পানীর ত। স্বাভাবিক
শক্তি তাহার এমনমতেই নিঃশেষিত হইতে বলিয়াছে।
সে মাগেহে হাত বাড়াইয়া পাত্রটি লইয়া এক নিঃশ্বাসে
শেষ করিল। পাত্রটি বরিয়া থাকার সার্থক্যও আর বুকি

নাই। হাতটা ধরবে করিয়া কাঁপিতেছে যেখিয়া আমি।
তাড়াপিড়ি শূত্র পাত্রটা নিজেই লইয়া নামাইয়া রাখিল।

আবার গলাটা একটু নামাইয়া বলিল, 'শোন।
তোমাকে এখানে কেন আনিয়াছি জানো? তোমার প্রাণ
রক্ষা করতে।'।

মেয়েটি কি বলিতে গেল, বলিতে পারিলনা। টোট
হুইটা বুঝা কাঁপিল মাত্র। 'আমি! অসহিষ্ণু ভাবে তাহাকে
নিরুত্তর করিয়া কহিল, 'জানি। বলবে যে সবাই এখন গেল
আমারই বা বিচারের ব্যবসার কি? কিন্তু সবাই গেলেও
মাহুৰ বাঁচতে চায়। জীবন বড় প্রিয়। ঐ মাহুর বিবি-
দার পাঠানো হ'ল তাদের কেউ বাঁচবেন। মহামন্ত্র
পেশেরা তাঁর বহু অশ্রম, বহু প্রবন্ধনার কথা ভোলেননি,
শেষ তিনি তুলবেনই। কিন্তু তোমার বাবাকে আমি জানি,
ঐ বড় প্রবীণ বীচেরে যদি সামান্য উপকার করতে পারি
সেই আমার চেষ্টা। তাছাড়া তিনি আমারের বিশ্বাস করে-
ছিলেন, বিশ্বাস করে চলেছিলেন। তাঁর কাছে আমারের
সম্ভার রূপ আছে। সেই কারণেই তোমাকে বাঁচাতে
চাই। কিন্তু এখন বর্তমান অবস্থায় কোন ইংরেজ বন্দী
প্রাণ বাঁচানো শক্ত এটা তুমি বুঝতে পারো অবশ্যই। সশ
সমর তোমাকে পাহারা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়, আর তা
বাহলেও উন্নত জনতার জিহাষা—কটা বন্দীর কী সাধ।
তাই দ্বিধা করেছি, তোমাকে আমার বোনের বাড়িতে
পাঠাব।'

এক মুহূর্ত থানিল আমি, বোধ করি প্রস্তাবটা
করিতে তখনও সংকোচে বাধিতোছিল। তারপর বিব্রিত
অধিমুখ্য বিস্ময়িত চোখের দিকে সম্পূর্ণ গিছন করিয়া
ধাড়াইয়া বলিল, 'কিন্তু একটা কথা—সেটা নামে সে
পাড়টাই কসলোৎসব মহলা। আমার বোনও তাই ছিল,
তা তুমি জানো নিশ্চয়। ...সবান্নে সেই ভাবেই থাকতে
হবে।'

মেয়েটির প্রথমটা বৃষ্টিতে বিলম্ব হইল, তাহার পরই
শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, 'নান্না—না—সে আমি পারব না।'

'পারতেই হবে বোন। নইলে বাঁচবার উপায় নেই।
সে মহলা, আর শুধু সে মহলা কেন, অস্ত্র কোথাও তুমি
ধাচতে পারবে এমন। তাছাড়া মুহুর্তেই কি তুমি

ইচ্ছাটা বাঁচাতে পারবে শেষ পর্যন্ত? দুটোই হবে।
তার চেয়ে একটাই থাক। আর চাই কি, কোন মূল্যদান
হইলের নজরে পড়ে গেলে তাব ধরনী হয়ে সম্রাট ভাবেই
কীখনটা শেষ করতে পারবে। আনারের খর্ষে সে উদারতা
আছে। যাও বোন।'

আরো মত বন্দীর আশিয়া আবার তাহাকে বেঁধেন
কহিল। নিচে ঘোড়া টোপ দেওয়া পাখী আছে, তাহাতে
করিয়া লইয়া বাইতে হইবে, নচেৎ বাঁচানো কষ্টিন।
মেয়েটিকে শুনাইয়াই আমি নির্দেশ দিল।

কী শুনিল আর কী শুনিলা মেয়েটি সে জানে, যেমন
আশিয়াছিল আমার অভিভূতের মত বন্দীর সহিত বাহির
হইয়া গেল—অজ্ঞাত অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে। ...

উদাহরণে পঞ্চদশি মিনাইয়া বাইতেই আধিমুখ্য ফুট
ভাবে কহিল, 'কিন্তু এতটা ভাড়াবাড়ির কী মতিই ধরকার
ছিল বেগম সাংবা?'

'সব প্রয়োজন সবাইকে বোঝানো যায় না ধাঁ সাংবা।
যে জালা এ বুকে অলছে তা সবল নিতবে না। এ তুচ্ছ
মিটবেনা মহা! একজনকেই বেছে নিরেছি মাত্র, এদের
মধ্যে যে সংচেয়ে সম্রাট তাকেই। বাকীদের সম্বন্ধে নিশ্চিত
থাক আধিমুখ্য। না—তার মতবে কিন্তু ইচ্ছা নিরেই
মরবে। যাও, কবে যাও। আমার বড় খুম পেয়েছে
আল, অনেক দিনের অনেক খুম বাকী আছে।'

॥ ৫৬ ॥

কালকাগ্রদানখী উল্লসানে দুটিরাহেন, তাহার বিপদ
অনেক। তীড় এড়াইতে হইবে, নচেৎ কে কোথায় তিনি
কলিবে তাহার ঠিক নাই, অবচ ভীড়ের মধ্যে না গেলে
ট্রিক জলের মধ্যে কী বটিভেছে তাহাই বা বেশা যায়
কীরণে? কোনমতে অগ্রসরবের পাশ কাটাঁয়া স্রোত-
ধাপের আড়াল হইতে বতটুকু দেখা যায়, আর বৈবাৎ
কোন সম্পূর্ণ অপরিচিত মুখের জনতা পাইলে সতর্পণে পুরা
তামাসটার বিসরণ জিজ্ঞাসা করা—ইহাতেই বড়টা দর।
কখন কোন পরিচিত লোকের সামনে পড়িয়া বাইবেন, সে
তখনই দ্রুত টেঁচাইয়া উঠিবে, এই লোকটা সাংবাংয়ের
নৌকর, যাও উদাহকেও সাংবাৎ করিয়া, আর ...সে

কাছেই যে শত্রুঘাতি আছে সে অঘনি বকা নিকাশ করিয়া দিবে—এক ভুলিতে।

না। বিক্রিয়া থাকিলে ঢেব পরলা রোজখার হইবে।
পৈতৃক প্রাপ্তা বোঝাবে খোয়াইয়া লাভ নাই।

কিন্তু মনে মনে হুটই এবিধ গুত সংকল্প করুন শেখ
পর্বত ঘাট ছাড়িয়া যাইতেও পারিলেন না। কে যেন ভৌষক
আকর্ষণে ধরিয়া রাখিল।

অশ্রুত থাকিয়াও যে বিশেষ সুবিধা হইল তাহা নয়,
নানকট্যের উপদেশ কোন কাছেই লাগিল না। চোখের
সামনেই গভীর গভীর সাহেব মহিল, নৌকার আশ্রয়
লাগিল, যেমনসাহেব ও বাচ্চা বাহাদুর মরিতে পারিল নহে
বাচিল, বাহাদুর পারিল না—তাহারা বোঝাড়ে আবদ্ধ পত্তর
মত্ত ভড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

একজনে নিরুপায় নিম্প্রহর্ষক হইয়া পীড়াইয়া থাকে
ছাড়া উপায় নাই। সিপাহীদের মনোভাব ত দেখাই
যাইতেছে; হর্ষকষের মনোভাব অনিশ্চিত। কেহ কেহ
স্পষ্টই উল্লাস প্রকাশ করিতেছে তবে সে সংখ্যায় খুব বেশী
নয়। অবিক্রমেই শুধু বেধিয়া যাইতেছে—তবে তাহাদের
ঠিক মনের তাহ কি কে বলিবে? সহ্যক্ষমতা আছে কি না
বুঝিতে বাধ্যও ত বিপদ! শেবে যদি হিতে বিপরীত
হয়? ছুই এক আশ্রয় উল্টা কথা পাড়িয়া ঘেঁষিতে
গেলেন, তাহাতেও ফল হইলনা—কারণ উহার মতলব
বুঝিতে না পারিয়া তাহারা সঙ্কটভাবে যৌনী হইয়া রহিল।
বস্ত্র বিলম্বের মিনে সকলেই সাবধানে থাকিতে চায়।

অন্যশেষে অনেক সুলক্ষণবানের পর শিবমন্দিরের
পিছনের পাটিল হইতে নব্বের পড়িল ছুটী নৌকা। কতক-
গুলি সাহেব লইয়া মাথ পক্ষার জাসিয়া চলিয়াছে।
তাহাদের পিছনে সিপাহীদের নৌকা হইতে এবং পাড়
হইতেও অনাথ্য অরিষ্টি হইতেছে। সাহেবরা ছুই একজন
করিয়া মরিতে লাগিল বটে—কিন্তু নৌকা ছুটি খামিল না—
অশ্রু হস্তের ধাঁড় ও স্রোতের উপর নির্ভর করিয়া ভাসিয়াই
চলিল।

কালকা-প্রসার আর পীড়াইলেন না। উপস্থানে ছুটিতে
গুরু করিলেন। অনেকেরই ছুটিতেছে, তাহাদের সহিত
ছোট্ট এখন কোন সংকেতকর ব্যাপার নয়। ক্রমে যখন

সেই 'অনেক' ক্রান্ত হইয়া ছোট্টা বদ্ধ করিল, তখন আর
সংকেতও কার্য্যে ছিল না, কালকা-প্রসার নিশ্চিত হইয়া
ছুটিতে লাগিলেন। কিন্তু কতক্ষণ? বা ছুটিবেন, বিশ্ব
ইচ্ছা (সাহেবের অসুস্থকর্ত বটে) প্রচুর দুখ যদি মালাই
খাইয়া মেহটা। কিন্তু তাবীই হইয়াছে—মনের অবস্থা
আগ্রহ কতক্ষণ আর সে বেহ ছুটাইয়া লইতে পারে?
পা দুইটা ক্রমশ পাথরের মত হইয়া উঠিল, হাপরের মত
শব্দ করিয়া নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল। তাও যেন পড়িতে
চায় না। বুকটা ফাটিয়া যাইবার মত হইল। অংশে
এক সময় বসিয়াই পড়িতে হইল।

তাছাড়াও বিপদ আছে। শব্দ আশ্রয় নবীর পাক
অশিগম্য নয়। কঁটাঝোপ ধলপ বস্ত্র এসব খুঁটিয়া যাইতে
যাইতে নৌকা দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যায়। তাছাড়া স্থানে
স্থানে স্থানীয় উৎসাহী লোকের হস্তা ত আছেই। নজর-
পড়ে ত দেখা গেল ঐতিমত কামান বন্দুকের আয়োজন।
সেখানে হর্ষক হিমাংগেও কাহে যাইতে ভয়সা হয় না।

হাল ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত কিন্তু কালকা-প্রসার তবু
হাল ছাড়িতে পারিলেন না। নানকট্যের সেই বিজপ-
ভুটিপ দৃষ্টি এবং বিস হিম কর্তব্যে যেন দৈববাণীর মতই
প্রাণে লাগিয়াছে।

অন্যশেষে অনেক তাড়িয়া ক্রিয়ায় এক উপায় ঠাওর
করিলেন। পাশের একটা গ্রামে ছুঁকিয়া অনেক খোলা-
খুলির পর এক এড়াওয়াকে বাহির করিলেন এবং
তাহাকে অনেক বুঝাইয়া বৈদিক এতটাকা হিসাবে তাড়া
কবুল করিয়া নব্ব বশটাকা জমা রাখিয়া তাহারই সেই
কীংকার অশ্রুতরীতে দগড়ার হইয়া বসিলেন। বড়ীর বাপ
—তা হউক, বন্ধর পুত্রদের আর এমন শক্তি অধর্শিত নাই
যে বেশী গোলমাল করিবে। সেই গ্রাম হইতেই খানিকটা
খাইয়া লইয়া, গামছার প্রান্তে খানিকটা 'নাওয়া' বা
কোয়ার্কীর সংগ্রহ করিয়া আবার বসিয়া বসিলেন।

কিন্তু আর একটু পরেই অন্ধকার হইয়া আসিল।
এদিকে কোথায় বা নৌকা আর কোথায় বা সাহেব!
এখন রাতটা কোথাও কটানো বরকার—সকালে তখন না
হয় খোলা যাইবে। আগ্রহ মেধা কঠিন কথা নয়।
তবে হঠাৎ কোন অপরিচিত আশ্রয় আশ্রয় লইতেও

তরঙ্গা হর না। সঙ্গে কিংবা টাকার আদে, খুব বেশী নয় তবু এই সব স্বাক্ষরে টাকার লোভে লানটা কে কাড়িয়া লইবে—ঠিক কি! কোথাও বাজার কবা ডাওয়া গাইলেন না। নদীর ধারে লক্ষ্যে থাকিতেও তরঙ্গা হইল না—ছোট খাটো বাথ এক-আধটা স্বাক্ষর বিক্রি নয়। অবশেষে ঘোড়াটিকে একটা কোম্পের পাশে বাঁধিয়া নিজে অতি কষ্টে একটা গাছে চড়িয়া বসিলেন। দুর্দান্ত মশা, ছির হইয়া বসে যায় না, অথচ বেশী মাড়া লক্ষ্য করিতেও তরঙ্গা হয় না, কে কোথা হইতে আসিয়া ঘেঁষিলে চোর ডাকাত ভাবিয়াও নারিয়া কেসিতে পারে। শেষে পাগড়ী খুলিয়া আশ্রয় মস্তক মুড়ি দিলেন।

যাত্রা হউক কোনমতে বাতটা কাটিল। চুলিতে চুলিতে দুই একবার পড়িয়া ঘাইবার উপক্রম হইয়া ছিল, নবিলে আর কোন বিপর ঘটে নাই।

জনবিল নদীতীরে 'উদ্যোক্ত' তবু যে কিছু ছিল না এমন নয়—তবে গাছের ডালে সাহা কাপড় মুড়ি দিয়া তিনিও সেই উদ্যোক্তে দলেই বিস্মিতা গিয়াছেন—মনে মনে এই একটা কীর্ণ সাধনা ছিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে আবার সেই কষ্টকর যাত্রা।

নৌকা ততক্ষণ বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। এপেক্ষারে বি-প্রহর পার হইয়া আবার হৃদয় মিলিল—কিন্তু তখনও ত পিছনের সোঁক হাল ছাড়ে নাই—কালকাজনাধার খুব হইতে সেই নীরব বর্ষক হইয়াই রহিলেন।

দেহিনও খাবানয়ে সদ্ধা হইল। তবে দেহিন আর কালকাজনাধার আশ্রয়ের ক্ষত ব্যস্ত হইলেন না। ঘোড়াটা একেই ক্ষণকালী তাহাতে সারাদিনের পরিভ্রম ক্রান্ত। সেটাকে এক একাওয়ালকে গছাইয়া খেতে বাধে দুইটি টাকা দিয়া তাহার ঘোড়াটিকে সংগ্রহ করিলেন। (কবে কি লাভ হইবে তাহার ঠিক নাই, মাথাখন হইতে একগুলি কষ্টাধিত অর্থ লভন।) এটাও তেমন জোরালো নয়, তবে পরিভ্রম কম গিয়াছে বলিয়া অনেকটা ভাষা আছে—তেমন তেজী হইলে অবশ্য তাহারও সামলানো তার হইত—কালকাজনাধার নীতাবাস ও মহাবীর স্বরূপ করিয়া উদ্ভাসেই লগায় হইলেন এবং এদিকের একটা লবণ পথ ধরিয়া রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের মধ্যেই সুবার মাউ গ্রামে

তাঁহার বন্ধু জমিদার হিবিম্বর নিয়ের বাড়ী উপস্থিত হইলেন।

যাত্রাটা সোঁকা আসিয়াছে, নদী গিয়াছে মস্ত বড় স্বাক্ষর গেলিয়া, অনেকটা খুব খুশি উদ্যোক্ত বত ডাড়াডাড়া আসুক কাল প্রভাতের পূর্বে পৌঁছিতে পারিবে না।

হিবিম্বর সিং কালকাজনাধারকে ঘেঁষিয়া বৎপথোনাক্তি বিস্মিত হইলেন। তবে আদর-থরের ক্রটি হইল না। তাঁহার ইংরাজ বিবেচনায় তরঙ্গকর নয় যে সুন্দরায় ইংরাজের নৌকর এই অপরাধে বন্ধকে বন্ধ করিবেন না। সত্য কথা বলিতে কি হিবিম্বর সিং ঠিক ইংরাজবাদের অবলম্বনটাও চাহিতে-ছিলেন না—কারণ উদ্ভাসের অল্পপ্রায়েই তাঁহার পিতৃব্য তালুকদার হইয়া বসিয়াছিলেন। কে অথোথার নবাব রেল আর কোথাকার পেশোয়া মহিল তাহার ক্ষত তাহার মাথা-ব্যথা নাই। বরং বাহাদুর শাহ বাবশা হইলে আমার তাহাকে পুরাখুবি অগ্রজকতার ক্ষত প্রস্তুত হইতে হইবে, পুরা একবল সেটেন পুর্বে হইবে।

সুতরাং তিনি আন্তরিকভাবেই বন্ধকে আলিঙ্গন করিলেন। শুভ্র স্বরূপে আসিল, 'মহারাণিন' বা পাটিকাকে ডাকিয়া পুরীর স্বরূপ হইল—একটি জুতা গ্রামে ছুটিল কোন গোয়ালার বাড়ী কিছু মালাই আছে কিনা খোঁজ করিতে।

তার আভিষেকতার পালা চুকিলে হিবিম্বর প্রথম প্রশ্ন করিলেন, 'তারপর, কালকাজনাধার, হঠাৎ এতদূরে কী মনে করে বসে থাকা? শুধুই বন্ধুপ্রীতি তা'ত মনে হয় না।'

এই সবল প্রশ্নে সুন্দরী একটু বিব্রত বোধ করিলেন। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া করিলেন, 'বরাত কেবলে চাপ হিবিম্বর সিং?'

'ক'ব বরাত? তোমার না আমার?'

'বরো দুজনেরই।'

'আমার বরাত কেবলে কোন আপত্তি ত নেই—ই এমনকি নিষেধ কতি না করে যদি তোমার বরাত কেবলে পাঠি তাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু বলি যাপাড়া কি?'

তখন সংক্ষেপে সভ্যগোঁরা যাঁচের বিবরণ দিয়া কালকাজনাধার বলিলেন, 'একটা নৌকায় ঠেকেছে—তবু লাভ-

আট জন ত হবেই কমলে কম। এবার বাঁচাও, বহুত ইনাম মিলবে, বরাত ফিরে যাবে।’

বিধিভয় সিং ঙ্গ হুঁকিত করিয়া কহিলেন, ‘ওদের বাঁচিয়ে বরাত ফিরবে—না ওদের ধরিয়ে দিয়ে।’

‘মোঃ! তুমি কি ভাবছ সত্যি-সত্যিই আরেজলাহী চলে গেল, কিছু না কিছু না—প্রথমটা। ওরা প্রস্তুত ছিল না তাই। ও ধারে শোন নি নীল সাহেব কান্ট এলাহাবাদে কী কাণ্ডটা করেছে? তাকে ঠেকাবে কে? তোমার ঐ নানা বুদ্ধিগছ—না ভীমবর্ষী-পাণ্ডা বুড়ো বাহাদুরবা? না বদ্ধ, বত পারো আরেজ বাঁচাও, তবে আরেজের ঠাক আসবে।’

‘হুঁ!’ বিধিভয় সিং অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, ‘কিন্তু তুমিই শেষ পর্যন্ত আমাকে ঈশানে না ত? আমি আরেজ বাঁচাই, আর তুমি সেই ব্যবস্টি দেখানে পৌঁছে দিয়ে হাতে হাতে ইনামটা বুঝে নাও! এমনটা হবে না ত?’

কালুকাঙ্গার রীতিমত দর্পাহত হইয়া উত্তর দিলেন, ‘আমার যেখাি এ কথা তোলাটাই হুল হয়েছে। এতদিনের বন্ধুত্বের বহি এই পরিণাম বহ, বহি এই বিশ্বাসই করে থাকে আমার ওপর—তাহলে বিহার নেওয়াই ভাল মনে মানে। আমি উঠি—’

‘আহা-হা চটহ কেন? বাজিয়ে যেখাি তোমাকে একটু! দিনকাল কী পড়েছে তা ত যেখাি। যেণ্ডি ইমান্ এগর কুখার কোন বুল্য আছে কি? সাংখ্যের নুন ধারনি কারা বসো ত? যারা বত খেই খেয়েছে তাহাই তত আল উৎসাহী সাহেব মারতে।’

কালুকাঙ্গার অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলেন। কহিলেন ‘তা বটে!...তবে এক্ষেত্রে আনিত ত তোমার মনে ঙ্গড়িয়েট হইলুম।’

‘হ্যাঁ—আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম। সাহেব ঘরদিন থাকবে, তোমাকে এখানে থাকতে হবে, এই লাক্ কথা আমায়! জাখো, রাকী আছে।’

কালুকাঙ্গারের মুখটা ঈকং গভীর হইল। মনে অবচেতনে ওরিকের গবটা খোলা রাখিবার কথাটাও যে মাঝতে ছিল না তা নয়, বহি তেমন অবস্টাইল বটে, বহি

শেষ পর্যন্ত ইংরাজের বিহার লাইতেই হয় ত তখন মিথের ইংরাজ সেবার কপল কালনেও এই একটা সবল পথ ছিল বৈ কি!...কিন্তু এখন আর যেণ্ডিও সম্ভব নয়। তিনি কহিলেন, ‘বুৎ—আমাকেও না হয় ঐ মনে নজর দখী ক’রে রেখো।’

এবার বিধিভয় একটু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, ‘না না নজরদখী হবার কথা বলছ কেন। দুই বন্ধু আমবা—বাঁচি নরি এফ মঙ্গ দরব। ইনামটাতেও না কীকি পড়ে। সেটাও ত তেংগার নজর রাখা হবকার।’

পরের দিন হোর বেলাই বিধিভয় পসার ধারে পোক পাঠাইলেন। নৌকার কোন চিহ্নই নাই। বেলায় মিথেরা গেলেন—কিন্তু ফল সেই একই। বিধিভয়ের কাছে ফিরিবিরের নিকট হইতে নতুন সাগুহীত এক ঢোলা একটা ছব্বীণ ছিল সেটা লাগাইলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ইংরেজ কি নৌকা নুঠিয়েচর হইল না। অবশেষে নদীর পাড়ে একটা পোপ খোঁজারেন করিয়া তাঁহার্য্য ফিহিয়া আদিলেন।

বিগ্রহবে আহরাবির পর আবারও দুই বন্ধু ভিজা গ্যাম্ভা মাঝার আর বুধে ওড়াইয়া বাটে গেলেন।

তখনও কোন পাতা নাই। অনেকক্ষণ গাঁড়াইয়া থাকিয়া উভয়ে ফিহিয়া আদিবার উপক্রম করিতেছেন—দুধে দুই ভিনটা গুদির লব হইল! কালুকাঙ্গার উৎসাহিত হইয়া কহিলেন—‘ঐ!’

কিন্তু ‘ঐ’ ঐ পর্বেই রহিল। আরও কিছুক্ষণ গাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিহিয়া আদিলেন। নৌকা দুই একটা আগা-মাংগা বে না করিতেছে তা নয়—তবে তাহার অধিকাংশই খোলা ডিক্রি নৌকা—তাহাতে গায়েবের কোন চিহ্ন নাই।

বিধিভয় কহিলেন, ‘ও সবই একে একে শেষ হয়েছে বুঝলে? তোমার বাঁচাবার তদস্যার আর কতক্ষণ থাকে বসো!’

কালুকাঙ্গার কাঁঠ বাগি দািলেন।

মিছামিছি অনেকগুলি পরগা বহত হইয়া গেল। অবশেষে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে একটা পোক ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া খবর দিল—তন চার পাঁচ লোক বাটের ধারে চূপ করিয়া সম্বেদনকভাবে দল্য পর্বে ফলে জুঝাইয়া বসিয়া

আছে। তাহাৎই বাবাটা মাত্র জাগিয়া আছে, তাহাতে
বোকা যাহ চুলগুলি কটা, গায়েই বেটাও অনেকটা পরিচয়,
ঠিক তাহাৎইই মত নয়।

তখনই দুই বন্ধু খাটে ছুটিলেন। প্রথমটা টমসনের মল
উঁহাৎ‌ও লক্ষ্য হাবিগাছিলেন, লক্ষ্যে লম ছাড়া উঠিত
চান নাই, তারপর উঁহাৎ‌ও কাহারও হাতে কোন ছাতিয়া
নাই দেখিয়া এবং পুনঃ পুনঃ অব্যাস ব্যাধি কতকটা অবা-
বিশ্বাস করিলেন। কালকাক্সপ্রাণকে ওকলিভান চিনিতেন
—“অনি ছুঁর কালকাক্সপ্রাণে ঐনওয়ে সাংহেৎ‌ও মুদ্রা,
সিনতে পাবছেন না?” বলাতে মুখখান আপদ আপদ
মনে পড়িল। তাছাড়া এননিতেই যা বাঁচার পর কই,
লল ব্যাকিলেও দুই এক বটাব মধ্যেই মরিতে হইবে।
অগত্যা উঁহাড়া উঠিয়া আসিলেন।

কাহারও গায়ে বিশেষ বস্ত্র নাই। জামাটা খাড়িলেও

পা-জামা নাই। দ্বিবিজয়ের ইকিতে খুঁটি আশিল কখন
আশিল। সেই সব জড়াইয়া কোনমতে ধরিয়া ধরিয়া
লাইয়া যাত্রা হইল। সেখানে গরম হুঁদের ব্যবস্থা ছিল—
পেটা পান করিবার পর মনে হইল এ যাত্রা হয়ত বা ঝাঁটিয়া
গেলেন।

কালক্রমেসহ বিবাহেরে কবিক অঙ্গবহিত্তিত
কলিতনের কানের কাছে মুখ লইয়া নিয়া বলিলেন,
‘আমি সাংঘ, আমিই পরশা খরচ করে টুটে এসে খবর
দিয়েছিলাম। ওই এ ব্যাটা বেঁচে গেছেন। আমিই
ব্যাটালাম।’

কলিভান চোখ মেলিয়া একবার তাকাইলেন যাত্রী।
কিন্তু কবাবুজার অর্থ হ্রস্বতম করিবার মত তখন তাঁহার
অবস্থা নয়।

उत्तराखण्ड



एतन्न किञ्च कठिनं नय

ছোট ছেলের পক্ষেও সম্ভব যদি চিকিৎসিত।

ସବିଧେ ଦେଖା ଯାଏ



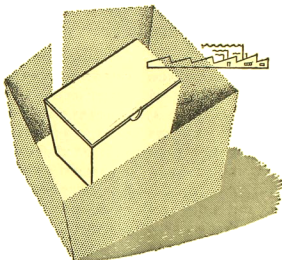
আপনার সংগ্রহে
আপনার পুণ্যের কর্ম-জীবনের
সাফল্য বিনোদনভাবে
দৃষ্টি করবে।



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ସେତ ଅଫିସ : ୫ନଂ ବ୍ରାହ୍ମେଶ୍ୱରୀ ଷାଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ, କଲିକତା-୧

factory freshness preserved



with

★ **POLYBOARD**
★ **POLYKRAFT**

packaging

Acid, alkali and moisture resistant polythene-coated POLYBOARD and POLYKRAFT help to preserve the factory-freshness of your products, whether they be confectionary, tea, biscuits or chemicals.

These new, revolutionary packaging materials are several times stronger than ordinary board or paper and prevent damage to your products even when they are subjected to rough handling. And the eye-appeal of your products is enhanced considerably because of the glossy finish on POLYBOARD and POLYKRAFT.



CHANGE TO
★ **POLYBOARD** ★ **POLYKRAFT**
PACKAGING FOR INCREASED SALES

ORIENT PAPER MILLS LTD., CALCUTTA.

কাঁচা ডিম

শ্রীজয়দেব রায়

বড় শুকনোট লাগতে লাগল। কেবিনের সব দরজা-
কামালা ঐটে বন্ধ। সারা দিনরাত্রে এই বয়েস পর্যন্ত
মোটা পড়ে নব্বুতে হচ্ছে। আমার নিজেও কেবিনেই আমি
বন্দী। আমার কেবিনের দরজাটা খুব ঐটে বন্ধ হয় না,
কিংবা ফিরে যেতে সেলাম একজন প্রবাসী হাতে বন্ধ
করে রাখেন পারচারি করছে। হাত-পা বাঁধা না থাকলেও
সেইটো এত দুর্বল লাগছিল যে, ছোঁব ক'রে মানসার গাটা
কথাটো ভাঙতে পারলাম না।

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ চোয়া করেবার করা।
চাওতেই রাগ হচ্ছে। অ.হালতে আমার বিরুদ্ধে যদি এ
প্রকার অভিযোগ আনা হ'ত আমি সবচেয়ে নিজে
নির্দোষ প্রমাণ করতে পারতাম। কিন্তু দত্বিন না
আমাকে আদালতে হাজির করে, তত্বিন এরা আমাকে
এইভাবে আটকিয়ে রাখবে না কি। হু-মিনেই তো আগ
দগা হয়ে পড়েছি।

সত্যি কথা বলতে, হোষ্টা অনেকটা আমায়ই।
একটা ব্যবসায়ী বাহাৎ কোম্পানীর কর্মচারী ছিলাম।
আমার কাজ ছিল ব্রহ্মপুত্র নদীর একটা বাহাৎ থেকে
আর একটা বাহাৎ থেকে খুব ঘুরে বাহাৎ অবস্থা, নাবিকদের
বাধ্য প্রকৃতি পরীক্ষা করা।

মানবানেক আগে একটা ছোট টিমার আমার কর্তৃত্ব
এসেছিল। ঐ টিমারে পাকিস্তানের এক কাউন্সিল
অফিসার সেহিন এসে উঠে নাবিকদের সঙ্গে বড় বাহাৎ
ব্যবহার করছিল। সুক্কে বহু নামে বাহাৎের এক
নাবিক আমার কাছে এসে বলল—“গাহেব আলিমুদ্দিন তো
বন্ধ আলাচ্ছে।”

বাইরে বেরিয়ে এসে যেখি কাউন্সিল অফিসার আলিমুদ্দিন
একজন নাবিককে প্রায় উল্লঙ্ঘন ক'রে তল্লাস করছে। আমি
বেত্বিয়ে এসে তাকে এক বদক থালাব।

তাকে ছেড়ে দিল কিন্তু সে তারপর যেমন ভাবে হস্তা-

বাহাৎ করতে লাগল যে, বাহাৎ হলেই আমাকে তাকে
বাহাৎ ছেড়ে চলে যেতে হুকুম দিতে হ'ল।

তারপর সেবারকার টিমার শেষ চেক-পয়েন্টে এসে
পৌছলাম পূর্ব পাকিস্তানের উত্তর সীমান্তে, আসামে বাবার
পথে ব্রহ্মপুত্রের উপর। টিমারটা খাটি ছাড়ায় সঙ্গে সঙ্গে
কাউন্সিল সেই আলিমুদ্দিন এসে উঠল।

তারপর কথা নেই' বার্তা নেই, আমার উপর হুকুম
করল—আপনাকে প্রেয়ার করলাম। আপনি চোরাই
চালানের ব্যবসা চালাচ্ছেন। টিমার আপনার এখানেই
আটকা থাকবে।

বিনতি হয়ে বললাম—“সে কি! আমি ..

কোন কথা না বলে তার লোকজন দিয়ে আমাকে
আমারই কেবিনে আটক ক'রে রাখল। কোন কথা
বলবার উপায় নেই। তীব্র থেকে তখন আমায় লামাটাই
ঘুরে গিয়েছিলাম, আর ভারত সীমান্ত থেকেও বোম্ব হয়
মাইল ২৭ ঘুরে। এখানে সম্পূর্ণরূপে ঐ কাউন্সিলের কর্তৃ-
চরিত্রের রাজত্ব।

প্রথমটা অতটা বুদ্ধিতে পারিনি। বৈকালে হঠাৎ
যেখি আমার ঘরে একফোটা খাবার জল নেই। বাহাৎের
সমস্ত জল টিমারের পেছনে এক ছায়াগার জমা করা
থেকে। আমি হঠাৎ বাহাৎগিক গুরু করলাম। প্রবাসী
বেশ কর্তব্যেরে বলল—“কি, কি ব্যাপার?”

আমি বললাম—“আমার আর্গালীকে বলা আমার ঘরে
জল আর খাবার বিধে যেতে।”

প্রবাসী ভেটি কেটে বলল—“আপনার বেগারী আর
টিমারের সবাইকে চোরাকারবাবীর এক প্রেয়ার ক'রে
আটক রাখা হয়েছে।”

আমি বেশ নিনতি ক'রে বললাম—“বাই হোক,
আমাকে জল আমাতে বাও, না-হলে আমি মারা পড়ব।”

এবার লোকটি একটু নরম হয়ে বলল—“না সাহেব,

জলের চ্যাক, ঠোঁব সবই শীল ক'রে রাখা হয়েছে, এগুলির মধ্যে চোবাই মফ আছে বলে আমাদের কর্তার বিশ্বাস।”

• প্রহরী আর আমাদের কোন কথা বলতে না দিয়ে দরবার তালি সাপিয়ে চলে গেল। জলের তেঁতুল আমাদের সমস্ত গলা বুক জলে জলে উঠতে লাগল।

যব থেকে আমার নিষেধ সমস্ত ভিনিষপত্র গের ক'রে দেওয়া হয়েছিল। বংটাকে আমার জেলের যব ব'লেই মনে হল। কিছুতেই খুব আপছিন না, মশারটা পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে গিয়েছে, মশার কামড়ে কিছুতেই খুবে পারলাম না। গলাটা এত শুকিয়ে গেল যে, দাঁতটা পর্যন্ত নাড়তে পারছিলাম না।

সাবিহিলাম কাষ্টমস অফিসার যদি আমার ওপর রাগটা এবার ভুলে যায়।

রাতি আটটা নাগাদ প্রহরী আমাকে একবার বাইরে নিয়ে গিয়ে কতকটা এক্সারসাইজ করিয়ে আনল। বল বেধে আবার তেঁতুলি বাড়িয়ে দিল, আমি এবার হুগুগিত করে বললাম—“আমি একজন ব্রিটিশ, আমাকে এভাবে ক্রিয়েতেষ্টার বহি মেরে ফেলো, তবে পরে তত্ত্বের সময়ে তোমাকে ছাড়া হবে না। তুমিও দারী হবে।”

প্রহরী একটু দাঁড়িয়ে গেল—সে আমাকে ভাড়াভাড়ি হবে পুরে একটু বিব্রত হয়ে বলল—“হুজুম নেই।”

যখন বেড়াছিলাম তাকে দেখলাম আমার ভিনিষপত্র ছড়ানো আছে, কেউই সেগুলো তুলান করেনি।

শুয়ে শুয়ে নিষেধ দুর্ভেদে কথা চিন্তা করছিলাম। এমন সময়ে হঠাৎ দরবারটা খুলে প্রহরী চুকল—তাব হাতে একটা মগ ছিল। মগটা যে কোথা থেকে এসেছে বুঝতে পারলাম। তবে মগটা বেধে বেশ বরতে পারলাম তা সবুজ থেকে সোজা তুলে আনা হয়েছে—“বোলা জল।”

পান করব কিনা তাবছিলাম—এতে ব্যত বহু বীজপু আছে। কিন্তু আব তো থাকতে পারলাম না—মগটা এক চুমুক খেয়ে ফেললাম।

প্রহরী আমার জল পান করা দেখছিল—হঠাৎ পকেট থেকে ছুটি ছোট ডিম বের ক'রে দেখালো। আমি ঠিক ভিখারীর মত হাত বাড়তে সে বলল—“ছয় আনা ক'রে।

আমি তার বিকে একটা টাকা ছুড়ে দিয়ে ডিম দুটো কেড়ে নিয়ে কেড়ে সেই কাঁচা ভিন্নই বড়বড় ক'রে পান করলাম।

রাতি বেলায় আবার সেই প্রহরী এসে আমাকে কথা বল আবার পানিফটা শু গোটাফতক পচা ডিম দিল শু সঙ্গে সঙ্গে টাকা মিটিয়ে দিলাম। মনে হচ্ছিল যেন তোজ বাড়ি।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি টিমারটা। ওইতেই বাবা ছিল। সেদিন প্রাতঃকালীন কার্বেদ তক্ত সাইরে গেরিয়েছিলাম হঠাৎ বেশি কাষ্টমস অফিসার তেঁতুল বাড়িয়ে আছে। আমি তাকে বেধে চাঁৎকাব ক'রে বললাম—“আর কতদিন আটকিয়ে রাখবে বাবা।”

সে আমাকে বেধে ক্ষত হয়ে পড়ল। এই তাবে দুদিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে টাকাকড়ি হিরে প্রহরীর সঙ্গে বেশ ভাব ভমিয়ে ফেলেছিলাম। সেও আমাকে কিছুতেই বলতে পারেনা কেন আমাকে আটকিয়ে রেখেছে বা কতদিনই আমাকে আটকিয়ে রাখবে।

চতুর্ভবিন আর মতপান না ক'রে থাকতে পারলাম না। আমার কাছে একটা দশ টাকার নোট ছিল পেটা তাকে দিয়ে বললাম—“ভাই, এই ১০ টাকাটা তোমার কোন লোককে দিয়ে এক খোতল মদ আনিবে হাও না ভাই।

প্রহরী টাকাটা ছিমিয়ে নিয়ে চলে গেল। বণ্টা চাবেক পরে প্রহরী এক খোতল খেনা নিয়ে এসে আমাকে দিল। কিন্তু একবার মুখে লাগিয়ে খোতলটা জলে ছুড়ে ফেলে দিতে হ'ল। ‘সাতিক্যাল ফ্রোহোফর্ড’ খাবার কোন ইচ্ছা ছিল না।

মবম দিনে আমার বেয়ারা ব্রত বেঙ থেকে বেশি আমার কাছে আসতে দিয়েছে। তাকে বেধে আমার যে কি আনন্দ হ'ল তা আর বলবার নয়। এবার গালাবাব কথা চিন্তা করতে লাগলাম। ভাল মেবে ছাড়া ডাঙার খাবার কোন উপায় ছিল না। জলে এত বেশী কুমীর আর যে বকম জোতের চাঁদ তাতে নাখবার কোন উপায় নেই।

আমার বেয়ারা ব্রত বেঙ বড় শক্ত লোক। তার গায়ে

প্রসন্ন হোয়, মনে হ'ল তাকে আটকিয়ে রাখার সাহস এদের হয় নি। ঠিক কল্যানে প্রহরী এবার ঘরে চুপসেই তার বাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ে শেখ করব, তারপর সীতাবিরে পালাবো। ব্রহ্ম দেও বলল “আমার কাছে ভোলাসী আছে, এ ঘিরে কুমীর সাধ করব।

কিন্তু তারপর দিন সকালে যথার্থীতি থেকে বেরিয়ে দেখি একটা ছোট টিমার আমার পাশ দিগে যাচ্ছে, ওপরে ঘেঁষি ভারতীর পতাকা। ব্রহ্ম যেওকে বললাম—“তুমি ঐ বাহায়ে উঠে গিয়ে ওদেরকে সখ কথা খুলে বলে।”

ব্রহ্ম দেও সঙ্গে সঙ্গে সীতাবিরে দেখানে গিয়ে উঠল।

তর হাঙ্গুল ওরা রাণী হবে তো!

না, বাহাঙটা আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে পাশ দিগে যাবার ব্যবস্থা করছে। বাহাঙটা কাছে এসে পড়তেই আমি ডেক থেকে এক লাফ দিলাম—মাক্ষানে প্রায় ২০ ফুট জল ডিঙিয়ে পানের বাহাঙের ডেকের ওপর গিয়ে

পড়লাম। বেশ লেগেছিল—কিছুক্ষণ চূপ ক'রে বসে থাকতে হ'ল। বাহাঙটার কাপ্তেন বেশ ভরলোক, ভাড়াভাড়ি দুটে এসে আমাকে হাতে ধ'রে তুলল। ব্রহ্ম দেও কোথা থেকে এক গ্লাস ব্রাভি এনে আমার মুখে বদল। চেয়ে বেঁধি পাশে আমার পুথানো টিমারের ডেকে প্রহরী হ্যাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

মুণ্ডে পাইলাম এ নিয়ে গোলমাল করার সুবিধা তার হবে না। আমাকে তো আইনসঙ্গত ভাবে বন্দী ক'রে রাখা হয়নি, কাজেই সে কোনরূপ বাধা দিতে পারবে না। সেই ব্যাটা কাঁটমণ অক্সিয়ারের বহমাইগিতে আমি এতদিন আটকে পড়েছিলাম।

কাপ্তেন একটা সিগারেট ধিলেন। সেটা টানতে টানতে ইমি চেয়ারে তার গুহে সুন্দর ডকমের গছ শুকতে লাগলাম। আর তাবতে লাগলাম কাঁচা পটা ডিম ও বোলা মল খেয়ে ক'দিন কি ক'রে কাটিয়েছি।



আর্থিক প্রসঙ্গ

শ্রীমদ্রাশাদ ভট্টাচার্য

। ভারতে মূলধন গঠনের আবহাওয়া ।

দেশকে শিল্পে সমৃদ্ধ করার জন্য ভারত যে বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তার জন্য মূলধন গঠনের প্রয়োজনীয়তা যে-কোন সময় থেকে এখন বেশী হয়ে পড়িয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা স্তর হওয়া থেকে এই প্রয়োজনীয়তার কথা দেশের নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে বার বার সংগে করিয়ে দিয়ে আগছেন। অবশ্য চূড়ান্ত বিষয় দেশে আশাহুতপভাবে মূলধন গড়ে উঠছে না। কেন এক্ষেপেও তা বিবেচনা করে দেখা হয়কার, যাতে মূলধন গঠনের অসুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

সামাজিক ঋণে দেশকে গড়ে তোলার সম্ভব অর্থ-বিনিয়োগকারীদের মনে যে একটা শঙ্কা সৃষ্টি করেছে তা সরকার পক্ষ থেকে অনেক আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও বিদূষিত হয়নি। দেশের কর্মসংস্থান আশাহুত হ্রাস পায়নি। অর্থনৈতিক সৃষ্টির নামে ক্ষেত্রবিশেষে ভোগের পরিমাণ কমাতে বসে হয়েছে, অর্থবিনিয়োগকারীদের গুরু কর্তব্য বহন করতে বলা হয়েছে এবং জনসাধারণকে ভবিষ্যতের উত্তর পুরুষদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন পত্রের দ্বারা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলেছে, তার উপর বৈদম্বিন প্রয়োজনের অনেক বিভিন্ন সর্বদা বাধার পাওয়া যায় না। এই অবস্থার পড়ে সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অসুস্থতা দেখা দিয়েছে। সাধারণ আর্থ পরিকল্পনার আশ্বাস ব্যতীত সন্নিধান হতে সূত্র করেছে। দ্রব্য-মূল্য হ্রাস ও অন্ন আয়ের জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গুরুত্ব কমতাকে কেন্দ্র করেই কমে গিয়েছে। তাঁদের মন সূত্র নিয়ে তাঁরা খুঁকি নিতে

চাননা। শতকরা ৬, কিংবা ৭, টাকা অর্থকারী প্রেক্ষাবেশ পেয়াবে টাকা লগ্নী করা পছন্দ করেন। অভিনারী পেয়াবে খুঁকি বেশী। কাজেই সেখানে ডিভিডেন্ডের পরিমাণ প্রেক্ষাবেশ পেয়াবের ডিভিডেন্ডের থেকে বেশী হওয়া হয়কার। অর্থাৎ প্রেক্ষাবেশ পেয়াবে ৬/৭, টাকা ডিভিডেন্ডে মিলে অভিনারী পেয়াবে অন্ততঃ ২/১০, টাকা ডিভিডেন্ডে যেওয়া হয়কার। কিন্তু বর্তমানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এত বেশী হারে ডিভিডেন্ড দেওয়া অনেক কোম্পানীর পক্ষেই অসম্ভব হয়ে পড়িয়েছে। এর ফলে কিছু সংখ্যক অপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ছাড়া বাকি প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে মূলধন সংগ্রহ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। নতুন কোম্পানীর জন্য মূলধন সংগ্রহ করার সমস্ত আরও বেশী কষ্টসাধ্য হয়ে পড়িয়েছে।

পরিবর্তন প্রাপ্তদের গুরু সরকার অসামান্য কষ্টসাধ্য চাপাতে বাধ্য হয়েছে। এর উপর করাগোপ নীতির অনিশ্চয়তা অর্থবিনিয়োগকারীদের উৎসাহকে আরও হুমিয়ে দিয়েছে। এর ফলে দেশেরকারী মহলে অর্থ-লগ্নী আশাহুত হচ্চে না।

এসব ছাড়া শিল্পের পুনর্বিভাগ (Rationalisation) প্রকটিও মূলধন গঠনের একটি প্রতিবন্ধক হয়ে পড়িয়েছে। শিল্পের পুনর্বিভাগ করতে পারলে অনেক খণ্ড বাঁচানো এবং তার ফলে অতিরিক্ত আয়কে পুনরায় শিল্পে নিয়োগ করা সম্ভব হয়। কিন্তু তাতে বৈদেশিক মুদ্রার দম্ভতা ও ছাঁটাইয়ের সম্ভা মন্ত বড় বাধা। বৈদেশিক মুদ্রার দম্ভতা সমাধান করতে পারলেও ছাঁটাইর সম্ভা থাকবে। শিল্পকে পুনর্বিভাগ করতে গেলে কিছু ছাঁটাই অবশ্যস্বারী, কিন্তু দেশে যেখানে বেকার দম্ভতা এমনই গুরুতর আকার

ধারণ করছে, সেখানে কর্মে নিযুক্ত লোকদের পুনঃশিক্ষার নামে প্রকার করে হুললে, সমস্ত আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে।

এর পরে রয়েছে জাতীয়তাবাদের ভীতি। সরকার থেকে আশংক্য ছিলও অর্থনিয়োগকারীদের মনে কিছু শঙ্কা এখনও রয়েছে। কাম্বই যেথা যাচ্ছে যে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক আবেগেই মূল্যবান গঠনের সহায়ক নয় এবং সরকার পক্ষ থেকে আরও সুচিন্তিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হওয়ার। এও ভক্ত সরকার ও শিল্পপতিদের পতি-প্রেক্ষিতে মূল্যবান গঠনের অসুস্থ অবস্থাও সৃষ্টিও এক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হওয়ার।

■ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিডাল কর্পোরেশনের গতি বৎসরের কার্যাবলী ■

কয়েক বছর পরে গত বৎসরে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিডাল কর্পোরেশনের কার্যাবলীর ফলাফল কিছু ভাল দেখা গিয়েছে। কর্পোরেশন এ বছর তার অর্থনৈতিকদের প্রতিশ্রুতি ভিত্তিতে যেবার এক সরকারের কাছ থেকে সাহায্য চানওয়ার যে ঋণ হয়েছিল তার কিছুটা (৫০০ লক্ষ টাকা) পরিণাম করতে সক্ষম হয়েছে। পরিচালন ব্যবস্থার স্বয়ং এবং ঋণের সুখ মেটাতে পরে গত বৎসর কর্পোরেশনের লাভ হয় ৫৮-২৫ লক্ষ টাকা। পূর্ববর্তী বছর লাভ হয়েছিল ৪০-০৬ লক্ষ টাকা। পাঁচ বছর পরে গত বছর সাধারণ বিভাগে যাতে ১১২ লক্ষ টাকা লভ্য করে কাজের পরিমাণ ১৭ লক্ষ টাকার তোলা হয়েছে।

এ বছর ঋণের ব্যবস্থার সাহায্য আরও নিরুদ্বী ছিল। তার প্রধান কারণ নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং বর্তমান শিল্পের সম্ভাব্যতার এক বিশেষ থেকে বুদ্ধিগতি শিল্পরূপে আদ্যাত্মীয় লাইসেন্স সংগ্রহ করার অনুবিধা বৃদ্ধি। ঋণের ব্যবস্থা বিবেচনার পূর্বে কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় আমদানীর লাইসেন্স দেখতে চায়। যে সব রাজ্য গোছাই কিংবা বাংলায় মত শিল্পে অগ্রসর নয়, সে সব রাজ্য এ বছরও ঋণের বেশ একটা বড় অংশ পায়। অতঃপর এ বছর পায় ৩১১ কোটি টাকা, মাদ্রাজ ৮-৭৭ কোটি টাকা, মহীশূ ৪৮-০ কোটি টাকা, উড়িষ্যা ২-২৪ কোটি টাকা, পাকিস্তান ২-১৭ কোটি টাকা এবং উত্তর প্রদেশ ৪-০১ কোটি

টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এইসব রাজ্য গেরেছিল যথাক্রমে, ২-৬১ কোটি টাকা, ৫-৪৮ কোটি টাকা, ৩-৮০ কোটি টাকা, ২-০০ কোটি টাকা, ২-৬৬ কোটি টাকা এবং ৩-৬৬ কোটি টাকা।

শিল্প অধিদপ্তরী তিনি পূর্বের মতই ঋণ গ্রহণে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু কাগজ ও সিমেন্ট যথাক্রমে কেমিক্যালস ও বহুকে গিছনে ফেলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে।

কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলির উপর এ বছরও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। গত বছর এদের ২২ কোটি টাকা মজুর করা হয়। এই নিয়ে কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলিকে এ পর্যন্ত ১৩-২৪ কোটি টাকা মজুর করা হল। এতদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র তিনি শিল্পের দরখাস্তগুলিই কো-অপারেটিভের দ্বারা দিয়ে আসত, কিন্তু সম্মতি বহুশিল্পের কিছু দরখাস্তও কো-অপারেটিভের দ্বারা দিয়ে এসেছে।

গত বছর ব্যাংকের বড় ছেড়ে কর্পোরেশন ১২-৩৭ কোটি টাকার উত্তরিত তুলে। এই বস্তুগুলি প্রধানতঃ শ্রমীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের আবার কর্পোরেশনের মূলধন অংশও রয়েছে।

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া হয়েছে তাদের সাময়িক রিপোর্ট ও কর্পোরেশনের অফিসারের কার্যকলাপ পরীক্ষার রিপোর্ট থেকে দেখা যায় এইসব প্রতিষ্ঠানে বেশ ভালভাবেই চলছে এবং তাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান কর্পোরেশনের পূর্বাভাসটি নিয়ে শতকরা ৬ টাকার উপর ডিভিডেন্ড ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছে। এই সব ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই তাদের দায় রক্ষা করেছে। কলে মূলধন পরিণোষের অদম্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ১৯৪৭ সালের শতকরা ৮-৪ ভাগ থেকে ৬-১ ভাগে নেমে এসেছে।

■ সম্ভাব্য আন্ডোলন সম্পর্কে বিচার্য ব্যাংকের রিপোর্ট ■

কিছুদিন হল ভারতের ১৯৪৬-৪৭ সালের সম্ভাব্য আন্ডোলন সম্পর্কে বিচার্য ব্যাংক একটি পরিসংখ্যান বের করেছে। তাতে বলা হয়েছে যে সম্ভাব্য আন্ডোলন পূর্ববর্তী বছরগুলির মত এই বছরও সমানভাবে এগিয়ে গিয়েছে।

যদিও দেশের সমস্ত বকমের সমন্বয় সমিতির সংখ্যা মাত্র শতকরা ১৮ ভাগ, অর্থাৎ ২,৪০,০০ থেকে ২,৪৫,০০ বেড়েছে, কিন্তু তাহের সম্মিলিত কাংবাবী মূলধন (working capital) ৪৬৯ কোটি টাকা থেকে ৫৬৮ কোটি টাকা, অর্থাৎ শতকরা ২১ ভাগ বেড়েছে। লাইফ ইনশুরেন্স কর্পোরেশন দ্বারা সমন্বয় বীমা সমিতির ক্ষতকৃত ৩,০০,০০০ লক্ষ পলিসি-গ্রহীতা সমন্বয় সমিতি থেকে বেরিয়ে গেলেও এ বছর প্রাথমিক সমিতির সভ্য সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ, অর্থাৎ ১,৭৬,০০০ থেকে ১,৯৪,০০০, বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রাথমিক সমিতিগুলি যে পরিমাণ ঋণ ধরে, এ বছর তা থেকে শতকরা ২৩ ভাগ বেশী ঋণ ধরে।

১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের ক্ষত মণিপুর ও ত্রিপুরা রাষ্ট্রীয় সমন্বয় ব্যাংক নতুন করে স্থাপন করা হয়, মধ্যপ্রদেশ রাষ্ট্রীয় সমন্বয় ব্যাংককে তেলে বিতরণ ও মহাকোমল রাষ্ট্রীয় সমন্বয় ব্যাংকটির স্থিতি করা হয়। আবার আন্ধ্রপ্রদেশ, তুঙ্গা, কর্ণাটক এবং বিহারপ্রদেশ রাষ্ট্রীয় সমন্বয় ব্যাংক সমূহের প্রাথমিক স্থাপন পায়। ফলে ১৯২৭ সালের জুন মাসে রাষ্ট্রীয় সমন্বয় ব্যাংকের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ২৪ এর পরিমাণে ২৩ এ হ্রাস এবং তাহের সভ্য সংখ্যাও ৫৬,৩৯৪ থেকে ৩৩,৪৪০ এ কমে যায়। কিন্তু আনন্দের বিষয় যে তাহের কাংবাবী মূলধন শতকরা ২৫ ভাগ বেড়ে গিয়ে ৭২.৫৪ কোটি টাকার ওঠে। এই বৃদ্ধির শতকরা ১৫ ভাগ আসে তাহের নিঃসৃত তহবিল থেকে এবং আরও ৭০ ভাগ আসে ঋণ থেকে, এই ব্যাংকসমূহ তাহের সভ্য ব্যাংক ও সমিতিগুলিকে এ বছর ১১৩.৭৭ কোটি টাকা ঋণ দেয়। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৫৫.৬৭ কোটি টাকা ঋণ এবছর বেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় সমন্বয় ব্যাংক ও ব্যাংকিং ইউনিয়নের সংখ্যা আরও হ্রাস পায়। ব্যাংকের সংখ্যা এ বছর ৪৭৮ থেকে কমে ৪৫১ হয়। তা সত্ত্বেও তাহের সভ্য সংখ্যা ৩০,০০,০০০ থেকে বেড়ে ৩,১১,০০০ হয় এবং কাংবাবী মূলধন ২২.৬৭ কোটি থেকে বেড়ে ১১০.২৬ কোটি টাকা হয়। এ বছর

ঋণও পূর্ববর্তী বছর থেকে শতকরা ২০.৫ ভাগ বেশী বেওয়া হয়।

কৃষি ঋণ সমিতিগুলি দেশের সমন্বয় আন্দোলনের একটি প্রধান অংশ ছাড়া আছে। ১৯৫৬-৫৭ সালের শেষে দেশে ১,৬১,৪১টি কৃষি ঋণ সমিতি ছিল এবং তাহের মোট সভ্য সংখ্যা ছিল ২,১২,০,০০০; তাহের কাংবাবী মূলধন ছিল ২৮.৩০ কোটি টাকা। রাষ্ট্রীয় ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ থেকে গৃহীত ঋণই এহের কাংবাবী মূলধনের প্রধান অংশ যোগায়। ১৯৫৭ সালের ৩০শে জুন এই ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৫.২০ কোটি টাকা। এ বছর এই সমিতিগুলি ৬৭.৩৩ কোটি টাকা ঋণ ধরে এবং বছরের শেষে পাওনা ঋণের পরিমাণ হ্রাস ৭৬.৮২ কোটি টাকা।

১৯৫৬ সালের শেষভাগে কেন্দ্রীয় ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ১২ এবং এহের সভ্য সংখ্যা ছিল ১১৬,১৪২ ব্যক্তি এবং ৪১২টি ব্যাংক। তাহের আদায়ীকৃত মূলধন ও রিসার্ভের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০২ লক্ষ ও ৬২ লক্ষ টাকা। এ বছর এই ব্যাংকগুলি ৩৮.০ কোটি টাকা ঋণ ধরে এবং বছরের শেষে পাওনা ঋণের পরিমাণ (৩০শে জুন ১৯৫৭) ছিল ১৪.২৪ কোটি টাকা।

১৯৫৭ সালের জুন মাসের শেষে বিভিন্ন সমন্বয় সমিতি রাষ্ট্রীয় সরকার সমূহের কাছ থেকে যে টাকা পায়, তাহর পরিমাণ ছিল ৭.৭৪ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ৩২৮ লক্ষ টাকা (শতকরা ৪২ ভাগ) কেবলমাত্র প্রাথমিক কৃষি সমিতিগুলি পায়। ২২০ লক্ষ টাকা পায় রাষ্ট্রীয় সমন্বয় ব্যাংকসমূহ এবং ২২৬ লক্ষ টাকা পায় কেন্দ্রীয় সমন্বয় ব্যাংকসমূহ। সমস্ত রাষ্ট্রীয় মধ্যে একমাত্র বোম্বাই রাষ্ট্রীয় নানাবিধ সমন্বয় সমিতির মূলধন অংশ যুগিয়েছে এবং অনেকক্ষেত্রে এই অংশের অদুপাতও অস্তিত্ব রাষ্ট্রীয় থেকে বেশীই ছিল।

বকেয়া পাওনার দাবি এ বছর প্রতিক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী বছর থেকে কম ছিল এবং লভের দিক থেকেও প্রতি ক্ষেত্রেই আর বিস্তার উন্নতি দেখা গিয়েছে।

পুণ্য তীর্থ রামেশ্বরম্ শ্রীস্বামীজেন্দ্রনাথ সিংহস্বামী

নিম্নক বৈশিষ্ট্যম। এক আয়ুধ্য হতে আর এক আয়ুধ্য হুই। বোম্বার আনন্দ যে কি তা যে না বুঝেছে সে বুঝতে পারবে না। যুগতে যুগতে এসে হাজির হল্যাম ভারতের পুণ্যতীর্থ রামেশ্বরম্। শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করার জন্য এই রামেশ্বরম্ হতে লঙ্কাযৌগ পর্বত বিরাট সেতু বৈধিহিলেন একদিন। আজ সে রামও নেই, সে অশোভাও নেই—আছে এখন রামরাক্ষসের বড়াই। অশোকবন হতে সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র—কিন্তু আজও এই রাজসভে কতশত সীতা বে দুঃখে কাল যাপন করছে তার বিসাব কে রাখছে, কেই বা তারে উদ্ধারের চেষ্টা করছে ?

'মাম্বাপান ক্যান্স' ষ্টেশানে গাড়ী থামল এবং থামবেও অনেকক্ষণ, কারণ সিংহলরাজ্যের তত্ত্বাসীকার্য চলে এখানে। 'মাম্বাপান ক্যান্স' ছাড়লেই ভারতের মাটির লুকে বোম্বাশোম হবে বিচ্ছিন্ন। দু পাশে সযুত, বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাদাগর এসে মিলেছে এখানে—সোয়া একমাইল চওড়া এক খালের আকারে। সেই খালের ওপর বিদ্যে ব্রীজ পার হয়ে ট্রেন এসে থামল 'পম্বসু' ষ্টেশানে। এখান হতে দুটী লাইন দূরিকে বেরিয়ে গেল—একটা গেল ৭ মাইল দূরে রামেশ্বরম্ তীর্থে, আর একটি গেল ২০ মাইল পথ বহুদূরিতে। আসে যখন এই খালের ওপর ব্রীজ ছিল না তখন ছোট ছোট নৌকা করে পার হয়ে রাজ্যের আসতে হত বহু বিপদ সাধারণ করে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তুফান্ নামের এই পথে প্রথম পাথরের সেতু বৈধি তীর্থ-পথ করেছিল সর্ব ও সুগম। কিন্তু ঝড় ও ঝড়ায় সে সেতু ভেঙে যায় একদিন।

সময় রামেশ্বরম্ ও বহুদূরিতে নীল সূত্র বিদ্যে বোরা—একটি বীণ, আকারও নাকি বিকূর শাঁখের মত। হাজার হাজার বছর আসে এই বীণ একদিন স্তম্ভ হয়েছিল সমুদ্রের গর্ভে হতে।

১৯৪০ সাল, ২২শে অক্টোবর। রাতে চন্দ্রগ্রহণ লাগবে। মনের মধ্যে কেবল বেড়াবার মনো থাকলেও পুণ্য শঙ্করের সোত একবারে ত্যাগ করতে পারলাম না। তাই রাতটা রামেশ্বরম্ পুণ্যতীর্থে কাটিয়ে পবদিন শান্তব সন্ধ্যা বহুদূরিতে থাম করব মনস্থ করলাম।

শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যভিষেকের পর এই রামেশ্বরম্ এসে-ছিলেন পাপমুক্তির জন্য তীর্থ করতে। তাই আজও শত শত নরনারী আসে এই তীর্থে পাপমোচনের আশায়, পুণ্য ও স্বর্গলভের আশায়। এখানে তীর্থের অস্তাব নেই—সারা রামেশ্বরম্ বীপটার ছড়িয়ে আছে—চক্রতীর্থ, পাপ-বিনাশ তীর্থ, কবিতীর্থ, মঙ্গলতীর্থ, সূত্রীব তীর্থ, অন্নবীর্থ, পাণ্ডবতীর্থ, ব্রহ্মতীর্থ, পরশুরামতীর্থ, নাগতীর্থ, তৈরবতীর্থ, সীতাকুন্ত, পদ্মদাম্ব পর্বত প্রভৃতি। এছাড়াও বিশ্বি মধ্যে আছে—সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী, চন্দ্রতীর্থ, গঙ্গাতীর্থ, বহুনাতির্থ, সর্বতীর্থ ইত্যাদি।

রামেশ্বরম্ ষ্টেশনে নেমে গরুর গাড়ীতে মালপত্র ঢাপিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। মনমুগ্ধে ষ্টেশন থেকে এক পাশা পিছু বাওয়া করেছে আমাদের। যত বলি আমরা তীর্থ করতে আসিনি; বেড়াতে এসেছি—বরকার নেই পাণ্ডব, তবুও লোকটা বলে সব ব্যবস্থা করে দেবে বা হয় যেন। অবশ্য শেষ পর্বত ভারই নির্দেশ যত মন্দিরের দিকটে এক বর্ষশালার গেলাম, কিন্তু কোন বর্ষ শালি পাওয়া গেল না। দেখে তাইই পাশে আর এক বর্ষশালার ব্যবস্থার স্থান পাওয়া গেল অতি কষ্টে। বেড়াব খাওয়া হয়ে গেল, বিদ্যে, ভেট্টা, দুই সব মিলে বিজ্ঞি লাগছিল, তার ওপর সেই পাশা আবার লাগল পিছনে—দুব করে থিলাম পাশাকে।

পরে বিশ্বি দেখতে চুকলাম, সেই পাশার জন্য মনটা একটু কেমন লাগছিল—তাকে আর বুঁজে পেলাম না। বিশ্বির প্রবেশদ্বার—গোপুশ্ব দেখবার মত। বিশ্বি

প্ৰাৰম্ভে প্ৰবেশ কৰায় সন্দেশেই আৰ এক পাণ্ডা
জুটে গেল একেবাৰে চিনে পোঁকৰ মত।

মন্দিৰে দুকে নামধৰম্ নিবলিত বৰ্ণন কৰে কিছু
পুৰাণ দিলাম। এই সুভিক্ষে নামনাথ নামী বা নামলিঙ্গমণ্ড
বলা হয় এবং এই শিবেৰ নামাধৰায়ীই জায়গাৰ নাম
হয়েছে 'নামধৰম্'। অৰুণ্ড আৰ একটা নাম আছে—
'ধৰমণ্ড'। মন্দিৰ তৈয়াৰি বহু পূৰ্বে হৈছে এই শিৱলিঙ্গ
এখানে প্ৰতিষ্ঠিত এবং প্ৰিয়ামচন্দ্ৰ এই লিঙ্গ পুৰা
কৰেছিলেন। সেই হতেই এই নাম নামধৰম্ হয়।
আপো কোন মন্দিৰ ছিলনা—চালাগৰ ছিল এবং গুৰাবাশন
কৰেজন সন্ন্যাসীরা, তাৰপৰা বীৰে বীৰে পড়ে ওঠে মন্দিৰ,
হৰ্ষণ ভাৱেৰ বিভিন্ন ৰাধা ও বন্য ব্যক্তিৰেৰ সাহায্যে।
১১৭০ খৃঃ মন্দিৰ নিৰ্ধাৰ অৰু হলেও অষ্টাদশ শতাব্দী পৰ্যন্ত
চলেছিল তৈয়াৰি কাম। মন্দিৰেৰ কাৰুকাৰ্য হৰ্ষণ
ভাৱেৰ অষ্টাদশ মন্দিৰ অপেক্ষা কম নয়। নামধৰম্
মন্দিৰেৰ ভিতৰেৰ চাৰিবিধে মূৰ্ছাশত স্তম্ভ, হৰ্ষণ
পাৰেৰ কাৰু কৰা অলিঙ্গ হৰ্ষকৰেৰ বিমৰ ৰাগিয়ে
তোলে।

এখানে দুটা শিৱলিঙ্গ আছে। এই দুই লিঙ্গের সৰ্ব্বোচ্চ
জানি যায় যে—কানী হতে শিৱলিঙ্গ আনতে হুয়ানৈৰ
যেবী হুয়ানৈৰ প্ৰিয়ামচন্দ্ৰ বালিৰ লিঙ্গ কৰে যথাসময়ে তা
প্ৰতিষ্ঠা কৰে পুৰা কৰেন। অৰুণেৰে হুয়ানৈৰ ৰাগাৱিত
হয়ে সেই লিঙ্গ সৰ্বোচ্চ চোঁটা কৰেন কিন্তু পায়েন না।
তখন প্ৰিয়ামচন্দ্ৰ হুয়ানৈৰ আনা শিৱলিঙ্গ তাঁৰ প্ৰতিষ্ঠিত
লিঙ্গের পাশে স্থাপন কৰেন এবং তাঁকেই পুৰাৰ অগ্ৰা-
ধিকার যেন। সেই হতে প্ৰিয়ামচন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত '২'মানাৰ'
এবং হুয়ানৈৰ কৰ্তৃক আনীত 'বিশ্বনাথ' দুই লিঙ্গ দুই নামে
আজও গৱিৰিত। মন্দিৰ সকল ৬টা হতে প্ৰায় ১০টা
পৰ্যন্ত খোলা থাকে এবং দিনে ৰাতে পুৰা ছাঁৰ হয়।

বীৰ্য্য পুণ্যশাভেৰ আশাৰ ভীৰ্ঘনামে আসেন তাঁহেৰ
অৰু পুৰা নামাধিৰ নানানুতৰ সাহায্য আছে। যেমন
নামধৰম্ ভীৰ্ঘে ৩৬ বাৰ প্ৰান কৰতে হয়—সময় লগে

নাকি একমাত্ৰ। অৰু কিছু অৰ্ঘ ৩৬ কৰলে ভিম্বিনেও
নাকি এই প্ৰান সাধা যায়। নিত্যন্ত পক্ষে পূৰ্বে প্ৰবেশৰাৱেৰ
সমূহে অৱিতীৰ্ণেৰ সমুদ্ৰেৰ অলে প্ৰান কৰতেই হয়—পুৰা
যেবৰ আপো। উৎসবাহিও হয় মাৰ্গে মাৰ্গে—প্ৰধান হৈছে
ভিম্বি উৎসব। লৈয়াৰ্মানে—আনি, আশাৰ মানে—আহি ও
মাৰ্মানে—বাশি। এইসব উৎসবে সোনাৰ বলয়ে শিব ও
পাৰ্ণতীকে বসিয়ে সহব প্ৰৱক্ষণ কৰিয়ে মন্দিৰে ক্ৰিয়ৈ
জানি হয়। তাঁৰ মাৰ্গে ৰূপাৰ মনুৰ, ৰূপাৰ ইঁহুৰে ৰাকেন
কাতিক, পণেশ। আৰ এই সব বলৰ মনুৰ, ইঁহুৰেৰ
আকাৰও বিকট। আৰ সেই সন্দেশে ৰাকেন থাকে নানাম-
বাস্তি। এইসব মন্দিৰে এই সব উৎসবে পোনাকপাৰ
হুতাভি কিছু ৰাকেনৰ মনে কোন মিল নেই। এখানকাৰ
মাৰ্গ, এখানকাৰ ৰৱৰাভীৰ এই সব উৎসব ও মন্দিৰেৰ সন্দেশে
কোন সামৰুত নেই, কোন মিল নেই। একহিকে অৰ্ঘেৰ
প্ৰাচুৰ্য আৰ অপৰ বিধে দুঃখৈক কষ্ট অস্তাব।

মন্দিৰে চোঁকৰাৰ আগেই—একল ভিৰাৱী বিৰে বৰল
—হাত পাতল কিছু ভিৰাৱ ৰুত। চেহাৱা ৰেখলে
লিনেমা বা বইয়েৰ পাতাৰ ৰাকেন ৰাকেনেৰে ছবিৰ কথাই
মনে পড়ে—বিশেষ কৰে য়েয়েৰেৰ চেহাৱা। মন্দিৰেৰ
বাইৰে ও ভেতৰেৰ শাঁৰ, কিছুক, সমুদ্ৰেৰই টুকিটাকি
জিনিষ, ভালপাতাৰ তৈয়াৰি নানানুতৰ জিনিষ বিক্ৰী কৰছে
হানীৰ অবিবাহীয়া। কথা না বুধসেও পৰমা ঠিক চেনে
সব। প্ৰথমে চড়া ৰাম হাঁকলেও শেৰে খুব কম হামেই
ছেড়ে য়ে, বিক্ৰী কৰে ৰেখ ৰেখলান। অৱতেই মনুৰ এৰা
—খুব অস্তাব এৰেৰ। অস্তাব ব্যৱহাৰে চেহাৱাৰ ভাই বোন্ধা
যায়। এধেৰ অধিকাংশই জীৱিকা নিৰ্ধাৰ কৰে সমুদ্ৰে মাছ
ধৰে, কিছুক, শৰ্ম সংগ্ৰহ কৰে বিক্ৰী কৰে, ভিক্ষা কৰে।
নামধৰম্ বৰ্ণন কৰে কেৱলৰ পৰে—এই কথাই বাৰ বাৰ
মনে হুজিল—যে পুণ্য ভীৰ্ঘনামে প্ৰান কৰলে, হুতি বৰ্ণন
কৰলে, পুৰা ৰিলে সব পাপ য়েচেন হয়, সব দুঃখ দুৰ হয়—
সেখানে কেন এই ৰাকিৰা, কেন এই অস্তাব, কেন এই
বন্য ৰৱিৰেৰ ভাৱতম্য ?

পুস্তক পরিচয়

ছোটদের বাঙ্গালীকি রামায়ণ : শ্রীশশিভূষণ রায়চন্দ্র
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২-এ,
আপার সাকুলার বোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ২।

রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গে প্রত্যেক ভারত-সহানুর
অনিষ্ট পরিচয় একান্ত বাহ্যিক। আর তা কবিতা হলে
ছেলেবেলাতেই সে পরিচয় সাধন করা স্বরকার। এ সকল
মহাকাব্য শিশু মনকেও আনন্দায়িত কেড়ে নিতে পারে।
সেখানে বড় বড় চরিত্রের এবং ঘটনার ছাপ এঁকে
দিয়ে যায়।

শশিভূষণ এই বইয়ে বাঙ্গালী রামায়ণের গল্প সহজ করে
লেখছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে মূল কাব্যের একটু আধুঁ
অমল বহল করা হয়েছে। লেখক এখানে মূলকাব্যের
আধুঁকুই পরিবেশন করতে চেয়েছেন,—শুধু গল্পের নয়,
বর্ণনারও। পাণ্ডিত্য ছাড়া এমন মিল্লি করে মহাকাব্যের
কথা বলাবার ক্ষমতা খুব কম লেখকের আছে। ঝাঁটা ঐ
চলন্ত কনতার অধিকারী, এছকার তাঁর একজন।

শিশু সাহিত্য সংসদ বইখানিকে সুবৃদ্ধি কববার লক্ষ্য
ঘেঁটে বই নিয়েছেন। ছাপা ঝাঁটাই অতি সুন্দর।

ছবি আঁকা (১) : শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু। মূল্য ১।
নিত্যে কর : শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীপ্রহ্লাদ গুপ্ত
মূল্য ৫০।

এ ছ'খানিও শিশু সাহিত্য সংসদের বই। লেখক,
ছদ্ম, ছবিতো ছেলেদের মন ভোলাবার এবং সঙ্গে সঙ্গে
শিক্ষা দেবার বিভিন্ন আয়োজন এই সংসদ করেছেন। প্রথম
খানিতে ছবি আঁকার কৌশল (এ বইয়ের আরও দুই খণ্ড
পূর্বে বেরিয়েছে), আর দ্বিতীয়খানিতে যোগ-বিয়োগ কণার
পদ্ধতি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সব বই এমনই মজার
যে ছেলেদেরেরা খেলতে খেলতে শিখবে; শিখছে—এটা
বুঝতেই পারবেরা।

কেশবচন্দ্র সেন : শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বঙ্গীয় সাহিত্য
পরিষৎ। ২৪৩.১, আপার সাকুলার বোড,
কলিকাতা-৬। মূল্য ১।

যখন জাতির মন-আগরণ ঘটে, তখন জীবনের
সকল ক্ষেত্রে তার লক্ষণ প্রকাশ পায়। উনিশ শতকে
বাংলায়, তথা ভারতের নব-আগরণ ঘটেছিল। ধর্ম,
সাহিত্য, রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভাব হয়েছিল বহু সাহসিক,
বহু মনীষীর। কেশবচন্দ্র তাঁদেরই একজন। রামমোহন
যে উহার ধর্ম সাধনার পথ দেখিয়েছিলেন, কেশবচন্দ্র সেই
পথেরই পথিক। তাঁর বিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ব সে পথকে
আরও প্রশস্ত করতে চেয়েছে। তাই 'নববিধানের'
প্রবর্তক সর্ব-ধর্মের সর্বশাস্ত্রের সারমর্ম-সংকলনে উদ্যোগী
হয়েছিলেন। সামাজিক ক্ষেত্রেও তিনি যুক্তির উপাসক।
বস্তুতঃ কোনও সংকীর্ণতা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।
ধর্মের সহিত্তিকে তিনি প্রাধান্য দেননি, তার সাহসিকতাই
লাভ করতে চেয়েছিলেন। তাই রামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা
কীর্তনে অসুযোগ প্রকাশে তাঁর বিধা আসেনি।

শুধু ধর্মসাধক ন'ন তিনি অস্তিত্ব কৃতী সাহিত্য-
সাধক। তার গদ্য রচনা প্রাণবন্ত, উদ্ভীর্ণনাপূর্ণ। জাতির
সর্ববিধ উন্নতির মূলে চরিত্র, এবং ধর্ম চরিত্রগঠনের
সহায়ক, এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি ধর্মতত্ত্ব লিখেছেন ব্রতী
হয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর সর্বতোমুখ আগরণের ইতিহাস বিনি
অদ্যাত্ম অধ্যয়ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে রচনা করে চলেছেন,
সেই যোগেশচন্দ্র বাগল এই প্রথমখানি রচনিত। তিনি
ভাবানুভূতির গম্ভীরতা ম'ন। যুক্তি প্রমাণ ও নিশ্চিত
তথ্য নিয়ে ইতিহাস রচনা তাঁর লক্ষ্য। শুধু উপাধাস
আড়া করতে নয়, তাকে সাক্ষাতে এবং গৌণে চুলতে তিনি

পট। তাঁর সেখা কীবনী পড়ে আলোচ্য মাহুটির পূর্ণ
পরিচয় পেতে ক্ষতবিধা হয়না। তারহণ ও কর্মের মধ্য
। হয়ে তাঁর বৈশিষ্ট্য আপনি খরা বের।

আজ প্রভাত পদে শব্দীয়, তারতে মহাকাশি সংগঠনের
কল্পনা কেশবচন্দ্রের মনে জেগেছিল; বাপিলা-বিজালয়,
নিম্ন-বিজালয় ও অমলীখী বিজালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি
উৎসাহী হয়েছিলেন। বসন্তঃ জাতীয়-কীবনের শব্দীয়
উন্নতি ছিল তাঁর লক্ষ্য।

বইখানি ছোট, কিন্তু সাহিত্যসাধকচরিতমালার,
অগাধ বইয়ের মতই প্রচুর তথ্যপূর্ণ এবং সযত্নচিত।

পরীক্ষা : শিলাবিহা। প্রাণিহান-একলোক,
কলিকাতা-১২। মূল্য ২ টা. ১৫ ন. প.।
উপজাতি। দ্বন্দ্ববৃত্তিঃ গ্রন্থকারের প্রথম রচনা।

পাঁচটি সুবক বেড়াতে বেরলো। তাদের বাছনিঃ
জুড়ে হিতে গেল গেলেন। হাদি পরিহাস গল্প-স্বল্পের মধ্য
দিয়ে হরতে মন-জানাজানি কিছু হ'লো।

তারপর বেড়ানের অভিজ্ঞতা, পথে নানা গনের সঙ্গে
আলাপ-পরিচয়। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র আর পাকলের মিলন।
একটি মিষ্ট রোমান্সের আমেজ বইখানিতে বিবে বেরেছে।
কাচা হাতের পতিতর আছে স্থানে স্থানে, তবু পড়তে মন
লাগেনা। —১।



স্বস্ত বৈবস্ত বা নারকস্তম্ভেও কিছু কল্যাণপাশন
অপেক্ষা নয়। যেখানে দুর্নীতি প্রবল অথবা লুণ্ঠ্যের অভাব
সেখানে আর্থ-উদ্ধৃৎ কোনও নারক ঘোর করে দুর্নীতি
ঘটন ও ধানিকট। লুণ্ঠ্য আনয়ন করতে পারেন। সেখানে
নারকের যোগ্যতা ও সঙ্কল্পে সফল সাধনগণের মনে প্রভা
এবং বিশ্বাসের প্রয়োজন। পাকিস্তানের সাময়িক নারক
সম্পর্কে সেখানকার অধিবাসীদের মনোভাব কিন্তু, আনন্দের
আনি না। প্রাণবন্তের ভয় দেখানোর কলে বাবশারীরা
জিনিসপত্রের দাম নামিয়ে দিয়েছে, কঠোর শাস্তির ভয়ে
লোকে পথঘাট পরিষ্কার করছে, এই কারণে দু'চারটে
টুকরো ধবর কাগজে দেখা গেছে। রাষ্ট্রের স্বার্থী উন্নতি
ভয় দেখিয়ে সস্তাব হচ্ছে কিনা জানি না। জিনিসের দাম
কমে যেতেই নাকি খেদের জড় বেড়ে গেছে। বিজ্ঞেতাঃ
জিনিস ভোগান্তে পারছেন না। দু'দিন পরে পণ্যের বাজার
বন্ধ হয়ে গেলে বিঘন অনর্থ ঘটবে। তাই ইতিমধ্যেই মূল্য
নিয়ন্ত্রণের আদেশ অনেক স্থলে প্রত্যাহার করতে হয়েছে।
নারকস্তম্ভের শাস্ত্য নারকের বিচক্ষণতা, দুর্বলতা, এবং
চাষিক্রমিক মাধ্যমের উপর নির্ভর করে। অযোগ্য নারক
নিষেধ এবং দেশের দুর্গতির পথ রচনা করেন মাত্র।
পাকিস্তান-নারকের যোগ্যতা আজ কালের বিচার্য্যীন।

৪ সাহিত্যিকের বিপদ ৪

কল সাহিত্যিক পাণ্ডুরনাককে এবার সুইডিশ
একডেমি সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার দিয়েছেন।
সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বলেছেন, এই পুরস্কার-দান রাজনৈতিক
উদ্দেশ্যে প্রণোদিত; পাণ্ডুরনাক অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য লেখক
ন'ন। তাঁর 'ডক্টর জিভাসো' উপন্যাসে বিপ্লবকালীন
নিষ্ঠুরতার চিত্র আছে, অতএব তিনি সোভিয়েট বিদ্বেষী,
এই নাকি কর্তৃপক্ষের মত। ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ
যেওয়া বা স্বাধীন মত প্রকাশ করা যদি দণ্ডনীয় হয়, তবে
আর বাই বোঝা জনগণের স্বাধীনতার বড়ই করা চলে না।
'ডক্টর জিভাসো'—রাশিয়াতে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি;
অথচ ইটালিতে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার হাজার হাজার
কপি বিক্রি হয়েছে। কোনো গুণ না থাকলে অমনি
অমনিই কি বইখানি বাইরের সাহিত্যিক লগ্নায়ে মর্যাদা
পেলে ?

সোভিয়েট লেখক সর্ব পাণ্ডুরনাককে রাশিয়া-বাসের
অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চান। পাণ্ডুরনাক
রাশিয়াতেই থাকতে ইচ্ছুক; সেজন্য নোবেল পুরস্কার
প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবু সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের যা
লেখকগণের মন পাননি। তাঁকে মজা দেড়ে কোনো
মনতাত্ত্বিক দেশে চলে যেতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

৫ অল্পপ্রকাশ্য নারায়ণ ৫

অল্পপ্রকাশের উৎসাহ ও অর্ধশ্রদ্ধা জনসাধারণের মনে
একদিন খুঁড়ে আশা জাগিয়েছিল। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে
কর্মক্ষেত্রে তিনি আশাহীন যোগ্যতার পরিচয় দিতে
পারছেন না। তিনি ক্রমশঃ স্বপ্নবিভোর বা ভাববিষ্ট হয়ে
পড়ছেন। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তিনি বলেছেন,
নেহরু থেকে আরম্ভ করে প্রাণম নেতাদের উচিত সংস্কারী
কর্তৃপক্ষ দেড়ে জনগণের মধ্যে গিয়ে কাজ করা। শাসন
বিভীর শ্রেষ্ঠ নেতাদের দ্বারা ইহতে পারে। এ ব্যবস্থা
যদিও কিছু অসুযোগিত বলে মনে হয় না। অবশ্য প্রাণম
নেতারা কেউ কেউ সংস্কারী শাসনগণের বাইরে থেকে
জনসাধারণের মধ্যে কাজ করুন, এটা আনন্দের চাই।
তা বলে শাসনকার্য পরিচালনা দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নেতাদের
দ্বারা চলতে পারে, আমেরিকা সে বিশ্বাস নেই।

তাঁর আর একটি উক্তি আরও বিশ্বাসকর। পাকিস্তানের
সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে দেশে ভারতবর্ষ নাকি উত্তাপী হওয়া
সরকার, অথচ ভারত নাকি সে চেষ্টা করেনি। এও কি
সেই অল্পপ্রকাশের উক্তি দিন কিছুকাল পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তান
সমস্যা বিচলিত হয়ে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন
বোঝ করেছিলেন ? মিটমাট হয় ভাংয়ের সর্বপ্রকার
চেষ্টা ও পার্থক্য কিভাবে বার হচ্ছে এবং পাকিস্তানের
বিষেবারিতে ইচ্ছা জুগিয়েছে তা কি তিনি জানেন না ?

৬ পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সরকারী ব্যবস্থা ৬

পূর্ব-পাকিস্তানের মোটা অধিনায়ক চোবাবাবারীর
প্রাণবন্তের ভয় দেখিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, তাতে জিনিস-
পত্রের দর কিছু নেমেছে। তাতে প্রাণবন্তের ভয় না
দেখালেও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন আবশ্যিক একথা দ্বাই
অস্বীকার করছে। সশ্রুতি এখানেও সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণের

চোঁড়া করছেন। তবে, সে চোঁড়া যোশো-আনা না হ'লে কল হবে না।

উৎপাদন কম থাকলে বাজারের বাড়ি সঞ্চয় নেই কিন্তু বর্তমান বাজারের শুধু সেই কারণে বাড়েনি, এটা প্রায় সকলেরই ধারণা। চোঁড়াবাজার এবং দুর্নীতি বহু দূর প্রসারিত, সরকার সে কথা জেনে না এমন নয়। তবু মনে অসমর্থ হয়ে সরকার আপন দুর্বলতার পরিচয় দিচ্ছেন।

বহুত: ঝাঁপা হমন করবেন, তাঁরাই যে অনেক দুর্নীতি-প্রস্তুত। কাজেই প্রতিভার হুমসাদা। পঠিত পথ এবং কংগ্রেস-সভাপতি ডেবর শাসন বিভাগীয় দুর্নীতি হইতে মুখ্য-মন্ত্রীর কুসংস্কার হতে বলেছেন। শুধু নির্দেশ, উপদেশ বা শিষ্টাঙ্গ প্রকাশে কাল এগোচ্ছেনা। প্রয়োজনমত শক্তি প্রয়োগ না করলে কিছু লাভ হবে বলে মনে হয়না।

শিবপুর বাগান ও নয়া সেক্রেটারিয়েটের উপবত্সার কাণ্ডবাহানা, কলকাতার কাটকা বাজার ও চোঁড়া টেলিফোন, তত্ত্বাবধি প্রত্যয়ে ছেলচুতির অভিযোগ চাপা দেওয়া, ইত্যাদির খবর ছুৎপনের কলকটিক এঁকে বিচ্ছেদ শাসন বিভাগের লস্যাটে। বহুজনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ঐ কলকটিককেই স্পষ্টতর করে তুলছে। কার ঘোষ? কোনও একজনের নয়, অনেকের। কার হাতিব? ঝাঁপা উপরে আছেন, তাঁদের। যে বাড়ীর মনিষ গোপ বুঁজে থাকেন, সে বাড়ীর জুতোরা বা খুশি তাই করে। যে বাড়ীর মনিষ সর্বত্র। বৃষ্টি বাধেন, সে বাড়ীতে সব ঠিক ভাবে চলে। উপবত্সালাদের শৈবিল্যই সর্বত্রের অনাগারের পথ খুলে দেয়। 'কর্কটাতীরা অসং, আমি কি করবো?'—এ উত্তর হারিষসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে অশোভন।

পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে শুধু রানবৈধে বিল হবে না। ভাত, ডাল, তেল, কাপড়, গুণ্ডা—নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যাতে সহজে পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। বাতারাতি হাজার হাজার মণ জিনিষ কলকাতা শহরে কোথায় লুকায়ে? আন্তানালি কি প্রহরীরে একাত্তই আনানা? বাবা লুকোচুরি খেলছে, তা'রও কি মন্ত্রলো জড়ত হতে আনে? প্রহরীরে কর্তব্যচ্যুতির কলেই এসব সম্ভব হয়।

আজ কিছু চাউল রেশনে দেওয়া হয়। খোলা বাজারে

কিনলে কাকবহীন চাউল পাওয়া যায়; রেশনের চাউল কাক-ভক্তি কেন? রেশন যোক্তানুসৃত্ত্বপে, নাহি... সুব্যবস্থার গুণে?

দুঃস্থত শুশুনবহু পরিচালনা করতে না পারলে বেশে শান্তি বা স্থিতি আনা যাবেনা। পাকিস্তানে, বর্ধার—প্রতি-বেশী রাষ্ট্রগুলিতে যে বিপর্যয় ঘটছে, তা বেধে আমাদের আরও সতর্ক হওয়া কর্তব্য।

॥ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ॥

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমুক্ত অতুল্য ঘোষ এবং কার্ণিবর্ধারক সমিতির সভাপতি পদত্যাগ করেছেন। নূতন কংগ্রেস কমিটি গঠিত হ'বে। দীর্ঘকাল ধরে আভ্যন্তরীণ দলদলি বাংলা কংগ্রেসকে দুর্বল করে রেখেছে। ঐ বিধের প্রভাব থেকে আজও কি সে মুক্তি পাবেনা? কর্মী বুঁজে বার করবার, দাবাবণ মাহুনের ছব্বর অর করবার চোঁড়া বা আগ্রহ নেতৃত্বের মধ্যে কোথায়? সে বিষয়ে বৃষ্টি আকর্ষণ করতে গেলে কেউ কেউ খুঁটতা বলে মনে করেন এবং শিষ্ট ভাষায় 'তোমার পরম থাকে তুমি করো' উত্তর দিয়ে চলে যান। 'প্রতিষ্ঠানের শক্তি বৃদ্ধির পথ এ নয়। মনের পরম থাকলেও অনেক সময়ে এগিয়ে আসতে পারেনা। ঝাঁপা নেতা তাঁদেরই মিশতে হবে লোকের সঙ্গে, উৎসাহ দিতে হবে আদর্শবাদী কর্মীদের। ঝাঁপা সংকোচে ঘুরে দ'রে আছে তা'দের ডেকে আনতে হবে কাছে। দল গড়ার চেয়ে মানুষ বোঁকার দিকে বেশি মন দিতে হবে। সত্য কথা বলতে গেলে সে দিকে মন এ পর্যন্ত নেতৃত্বক কদই দিয়েছেন। বাৎসরিক আসুর মালাবার জন্তে দু'চার দিন বেক্সালেকব সংগ্রহ ছাড়া বেশি কিছু করেননি। সকল ক্ষেত্রে আজ নির্ভাবান কর্মীর প্রয়োজন। কর্মী তৈরীর দাল মশলা অনেকের মধ্যে লুকিয়ে আছে। নেতাকে খেতে হবে, বুঝতে হবে, কালে লাগতে হবে। বহুরে ছুঁনি ছুঁকাওয়া বা মলদার আয়োজন নয়, অথবা চা'চা তোলাও নয়, প্রত্যেক অঞ্চলে লোকেরে নিত্যকার কামকর্ষের সঙ্গে যোগ দক্ষা করতে হবে, নিত্য সেবার আয়োজন করতে হবে। এমনমনে শিকড় গাভুতে না পারলে কংগ্রেস বেশিদিন টিকতে পারবেনা।

শ্রীমদ্বতী প্রেস লিমিটেড ৩২ নং অপর মাহু'লার বোড হইতে শ্রীমদব চক্রবর্তী কর্তৃক বৃষ্টি এবং 'দমিরা' কার্ণাল ৩২ নং অপর মাহু'লার বোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

ছোলেয়েদের খেলাধুলা



মায়ের কী হাস্যমাই না হ'ত
আগে।



সকলিগে। এখন আর
কান্দে না যা য়ি বি
কখনে হুয়ে বে।



এই বে:। কীনা জব্দার কি
হকম কারা লাখিয়েছে। কপালে
আমি যদি কারো আশা
বহুনি করে।

হোলে সাইরই
না কি না ব দ্বা
করে প্রী ন?
হুয়েকো আশাই
ক তলী জাবাই
গরে এসে।



বাকুয়ে, কি আক হুয়েছে। মাঠে খেলা
ক হকম এতটী ভাল লাগেই ক। জাকো
সকলিগে আয়ে বেগো খেলন হুইলী
কখনে কখনে হুই। আর সঠিক এতটা
কখনে হুইলী না কখনে কখনে না।

অ্যাস্কো

বার 3 টাবলেট



কম খরচে চটপট পরিষ্কার হয়ে

এসিয়ারটিক সোপ কোং

কলিকাতা-১



ASCO BAR

আপনার
স্বকনোপকরণে
যে পুষ্টি
চান

হনুমান

বনস্পতি



সাহ ফ্রেন্স ইন্ডাস্ট্রিজ

'এ' এবং 'ডি' ভিটামিন দ্বারা সমৃদ্ধ

বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আপনার সুবিধার স্বরূপ
৪ প্যাঃ এবং ১০ প্যাঃ সিন
প্যাক করা। ৩৬ প্যাঃ সিনও
পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক
বোম্বে ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ

ভানসিওয়ানগর, বিহার

সুখাদাই সুখ ও

স্বাচ্ছন্দ্যের উপাদান

(R.M.V-2/8)



একবিংশ অর্থ

শৌক, ১৩৬৩

নবম সংখ্যা

জীবনের ক্রমবিকাশ বিমল দে

সাধারণ একটি সেল বিভাজনের বেলা আমরা দেখিয়াছি একটি সেল বিভক্ত হইবার পথে কিছুই অগ্রগতির উদ্যম না। উদ্যম ভিতরের নিউক্লিয়াস নামক সেলসেন্টার ভিতর ক্রোমোট্যাম নামক যে পদার্থটি বর্তমান তাহা কতকগুলি আণুবীক্ষণিক ক্রোমোসোমে পরিণত হইয়াছে। আরও কিছু সময় পর দেখিতে পাইতেছি নিউক্লিয়াসের উপরে বিন্যাসিত হইয়াছে এবং সম্মতি সেলের ভিতরে আবদ্ধিত সত্ত্ব বস্তুটির ঠিক মাঝখানে স্থান লইয়াছে—তারপর দেখিতেছি ক্রোমোসোমগুলির প্রত্যেকটি বিকশিত হইয়া এক একটি খণ্ড সেলের বিপরীত দুই প্রান্তে ঘাইয়া স্থান লইয়াছে। এইভাবে কন্ডাসেল দুইটি উদ্যমের মাক্সসেলের সম-সংখ্যক সেল লইয়াই জীবনযাত্রা স্থান পাইতেছে। প্রত্যেকটি সাধারণ সেলের ক্রোমোসোমগুলি এই প্রকারে বিকশিত হইয়া সেলটির বিভাজন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইবার পূর্বসূর্যে লক্ষ্যমান সেলটির দুই প্রান্তে ঘাইয়া স্থান পাওয়া এবং তাহার পর পরিপূর্ণ এক একটি সেট ক্রোমোসোম লইয়া মাঝখানে দিয়া ভাগ হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দেহের প্রত্যেকটি সাধারণ সেল উদ্যমের ক্রোমোসোম সংখ্যা বজায় রাখিয়া বংশ বৃদ্ধি করিয়া চলিতেছে। তাই যেহেতু জননকোষের বিভাজন ক্রিয়ার সময় কিস্তি ইহা

ঘাটে না। সেল বিভাজন ক্রিয়ার ভিতর ক্রোমোসোমগুলির বিলিখ্যবস্থায় হইতেছে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয়। সাধারণ সেল বিভাজন এবং জনন কোষের বিভাজন ক্রিয়ার বিভিন্নতা হইতেছে এই ক্রোমোসোমের বিলিখ্যবস্থাকে ভিত্তি করিয়াই। প্রত্যেকটি প্রজাতির দেহকোষেই নির্দিষ্ট সংখ্যাক্রোমোসোম থাকে। কোন প্রাণীর দেহকোষেই এই প্রজাতির নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোমের ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। মানুষের দেহকোষে ৪৬টি ক্রোমোসোম বর্তমান। পূর্বেই বলা হইয়াছে জনন কোষের বিভাজন ক্রিয়ার সময় ক্রোমোসোমের বিলিখ্যবস্থায় প্রভেদ দেখা যায়। এই সময় ক্রোমোসোমগুলি প্রত্যেকে বিধা বিভক্ত হইয়া না গিয়া মোট সংখ্যা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি শুক্রাণু অথবা ডিম্বাণুতে ঘাইয়া স্থান লয়। সাধারণ সেল বিভাজনের সময় দেখিয়াছি প্রথমত ক্রোমোসোমগুলি সেলের স্পিন্ডলের মাঝখানে ঘাইয়া স্থান লইতেছে; তারপর সেলটি দুই ভাগে ভাগ হইয়া ঘাইবার পূর্বে প্রত্যেকটি ক্রোমোসোম বিধাবিভক্ত হইয়া, দুইটি কন্ডাসেল ঘাইয়া স্থান লইতেছে। কিন্তু জনন কোষের বিভাজন ক্রিয়ার সময় দেখিতে পাইতেছি—ক্রোমোসোমগুলি সেলের স্পিন্ডলে স্থান লইবার পূর্বে

কোড়া বাঁধিয়া দাঁড়িতেছে এবং এই কোড়া বাঁধা অবস্থায় স্পিন্ডলের সংস্থাপনে দাঁড়িয়া স্থান লইতেছে। তারপর সেলটি দুইভাগে ভাগ হইয়া দাঁড়িবার পূর্বে ক্রোমোসোমগুলির কোড়া খুলিয়া দাঁড়িতেছে এবং প্রত্যেকটি কোড়ার দুইটি ক্রোমোসোম বিভিন্ন দুইটি গ্যামিটে বাঁধা স্থান লইতেছে। এই ভাবে আনন্ডা ঘেঁষিতে পাইতেছি জনন-কোষের বিভাজন ক্রিয়ার ক্রান্তিকাল দুইটিতে মাতৃকোষটির অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোসোম স্থান পাইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা দাঁড়িতে পারে যে একটি মানুষের দেহের প্রত্যেকটি সাধারণ কোষে ৪৬টি ক্রিয়া ক্রোমোসোম বর্তমান কিন্তু মানুষের জনন-কোষে কেবলমাত্র ২৩টি ক্রিয়া ক্রোমোসোম থাকে। আবার যখন দুইটি গ্যামিটে মিলন হইতে একটি ডাই-গোটের সৃষ্টি হয় (এই ডাইগোটাই) লক্ষ লক্ষ বার মাইটোসিসের মতো গাঁথিয়া পূর্ণাঙ্গ জীবদেহ গঠন করে এবং জীবের সমস্ত জীবিত কাল ব্যাপিয়া বিভাজন ক্রিয়ার দ্বারা যন্ত্রক সৃষ্টি করিয়া, বৈমন্ডিন সক্রিয়তার জন্য জীবদেহ যে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার পুষ্টি সাধন করিতেছে। তাহার ভিতর ৪৬টি ক্রোমোসোম পাইতেছি। এই বিশেষ প্রকারের সেল বিভাজনে ক্রোমোসোমগুলি দুইভাগে ভাগ হইয়া দুইটি ক্রান্তি কোষে স্থান লয় বলিয়া এই প্রকারের বিভাজন ক্রিয়াকে রিডাক্শিয়ন (Reduction division) বলা হয়। পূর্বে যেখানি জীবদেহের সাধারণ সেল, বিভাজনের সময় ক্রোমোসোমগুলির নিখিঁট সংখ্যা বজায় রাখিয়াই জীবদেহের সেল সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা সম্ভব হয় বিভাজন ক্রিয়ার সময় প্রত্যেকটি ক্রোমোসোম দ্বিগুণ হইয়া মোট ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া যায় বলিয়া। যেমন মানুষের দেহের একটি সেল বিভাজনের সময় উহার ৪৬টি ক্রোমোসোম প্রত্যেকটি দ্বিগুণ হইয়া ৯২টি হইয়া যায় এবং এই ৯২টি আবার ঠিক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি ক্রান্তি সেলের ভিতর স্থান লয়। কিন্তু reduction divisionএর বেলায় ৪৬টি ক্রোমোসোম সখান দুই ভাগে ভাগ হইয়া, বিভাজন ক্রিয়ার দ্বারা যে দুইটি গ্যামিট উৎপন্ন হয় তাহার ভিতর স্থান লয়। এইভাবে মানুষের প্রত্যেকটি গ্যামিটে (স্ত্রী ও পুরুষ) ৪৬÷২ = ২৩টি ক্রোমোসোম স্থান পায়। এই ভাবে আনন্ডা

ঘেঁষিতে পাই, প্রত্যেক জীবের ডাইগোটের ভিতর যে সংখ্যক ক্রোমোসোম বর্তমান, উদাহরণ গ্যামিটের ভিতর সেই সংখ্যক ঠিক অর্ধেক ক্রোমোসোম থাকিতে বাধ্য। যেমন নাকি মানুষের ডাইগোটে ৪৬টি ক্রোমোসোম বর্তমান এবং উহারেই গ্যামিটে ২৩টি বহিরাগত। জীববিজ্ঞান ভাষায় গ্যামিটকে বলা হয় হ্যাপ্লয়েড (Haploid) এবং ডাইগোটিকে বলা হয় ডিপ্লয়েড (Diploid), কারণ গ্যামিটের ভিতর কেবল মাত্র একসেট (Set) ক্রোমোসোম বর্তমান কিন্তু ডাইগোটের ভিতর দুই সেট ক্রোমোসোম বর্তমান। এইরূপ হইবার কারণ পূর্বে বলা হইয়াছে। এই ঠিক দিয়া ঘেঁষিতে গেলে মানুষ (স্ত্রী এবং পুরুষ) হইতেছে ডিপ্লয়েড, কারণ প্রত্যেক জরাজীর্ণ প্রাণীরই প্রথম রূপ হইতেছে ঐ ডাইগোট, সেই মজ্জাই জনক জীববিজ্ঞানিগে মানুষকে ডাইগোট বলিয়া থাকেন এবং মানুষের স্ত্রী ও পুরুষ হইতেছে হ্যাপ্লয়েড, কারণ এই স্ত্রী ও পুরুষ জীবের ভিতর কেবল মাত্র ডাইগোটের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক ক্রোমোসোম থাকে।

নিষেক (fertilization) :—জীব দেহে জনন-কোষের সম্মুখভাগ পূর্ণ অথবা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এইবার আনন্ডা জনন ছন্দের (Reproductive Rhythm) বিস্তারিত সন্ধান আলোচনা করিব। এই স্তর হইতেছে স্ত্রী ও পুরুষের মিলন। এখন দেখা যাউক এই নিষেক ক্রিয়ার সময় ব্যাপ্যারিত কি হয়। যে অভিক্রিয়াটির কথা এখন বলিব তাহা কতকগুলি সামুদ্রিক শরকী (Searchin) লইয়া করা হইয়াছে। তবে এই সামুদ্রিক শরকীর বেলায় আনন্ডা বাহ্যে ঘেঁষিব প্রায় সমস্ত যৌন জননশীল প্রাণীর বেলায় তাহাই সত্য বলিয়া বহিরা লইতে পারি। প্রথমতঃ কতকগুলি সামুদ্রিক শরকী বহিরা তাহারিগকে স্ত্রী ও পুরুষ দুই ভাগে ভাগ করা হইল। স্ত্রী-শরকীগুলির দেহের উপরের কঠিন আবরণ খুলিয়া দেখা হইল। তারপর অতি সাবধানে দেখাশুনার হইতে ডিবাণু-গুলিকে বাহির করিয়া লক্ষপূর্ণ একটি চ্যাপট। কাচের পাত্রে রাখা হইল। ডিবাণুগুলিকে বর্তমানে জলের উপরিভাগে দল বাঁধিয়া ভাসিতে দেখা যাইতেছে। অপর বিকে পুং-শরকী-গুলির স্ত্রী ও পুরুষ একটি কাচের নলে রাখা হইল। তারপর

কানের মল হইতে কয়েক ফোটা শুষ্ক ডিবাগুগুলি
 মলপূর্ণ কানের পায়ে ঢালিয়া দেওয়া হইল। এইবার আস্থান
 আশ্রয় অশুভীকণ যন্ত্র চোখে দিয়া পাতটির কলের ভিতর
 কি ব্যাপার হইতেছে দেখিতে চেষ্টা করি। আনন্দা দেখিতে
 পাইতেছি ধূসর বর্ণের গোলাকার বড় বড় ডিবাগুগুলি
 কলের উপর নিষ্ক্রিয়ভাবে ভাসিতেছে। অপরদিকে ডিবাগু
 হইতে অনেক ছোটো, ব্যাংগোচীর মত শুক্রাণুগুলি চা-
 পার্শ্বে বৈ-চৈ করিয়া ঘোড়াঘোড়ি করিয়া ডিবাগুগুলিকে
 ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাবপর হঠাৎ একটি
 শুক্রাণু উহার ব্যাংগোচীর মত মাথাটি বিচাট গোলাকার
 ডিবাগুর বেহের এক স্থানে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। মস্তকটি
 ডিবাগুর বেহের ভিতর প্রবেশ করিয়া মাত্রই ঐ ক্ষত
 স্থান হইতে কতকটা প্রোটোপ্লাজম বাহির হইয়া আসিয়া
 ঐ ক্ষত স্থানটির উপর এবং ডিবাগুর সমস্ত বেহের
 উপর একটি দিল্লী ফুটি করিয়া দিল, যাহাতে অল্প কোনো
 শুক্রাণু ঐ ডিবাগুটিকে আর নিবৃত্ত করিতে না পারে।
 একটু সময় পরই দেখা গেল শুক্রাণুর লেজের অংশটি,
 বাহা এত সময় ডিবাগুর বেহের মলের হইয়া তরতর
 করিয়া কাঁপিতেছিল, তাহা বসিয়া পড়িল। এখন আর
 বাহির হইতে ঐ নিবৃত্ত ডিবাগুটির ভিতর শুক্রাণুটির
 কোনোই চিহ্ন দেখা বাইতেছে না। কিন্তু শুক্রাণুর মস্তকটি
 ডিবাগুটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার মধ্যেই স্থলিতে আরও
 করিয়াছে, টিক যেমন নাকি এক প্রকারের আগানী খেলনা
 কলের মধ্যে ফেলিলে ডালপালা মেলিয়া একটি ছোট বাট
 জলপাছে পধিত হয়। তারপর ঘোঁষতে গাইতেছি স্কাঁত
 বেহ শুক্রাণুটি দীরে দীরে বাইয়া ডিবাগুর নিউক্লিয়াসের
 দখিত মিনিয়া বাইয়া একটি মাত্র নিউক্লিয়াসে পরিণত
 হইয়াছে। নিবৃত্ত ডিবাগুটির ভিতর বর্তমানে যে
 নিউক্লিয়াস দেখিতে পাইতেছি তাহাকে যোগল নিউক্লিয়াস
 বলা বাইতে পারে, কারণ ইহাতে বর্তমানে দুইটি নিউক্লিয়াস
 একত্র হইয়া বাইয়া একটি হইয়া গিয়াছে। এই যোগল
 নিউক্লিয়াসের একটি অংশ ডিবাগুটির ভিতরেই ছিল এবং
 অপর অংশ নিবেশকারী শুক্রাণুটি হইতে প্রাপ্ত। এই
 নিবৃত্ত ডিবাগুটি হইতে যে জীববেহ গঠিত হইবে তাহার
 প্রত্যেকটি কোষের ভিতর এই যোগল নিউক্লিয়াস থাকিবে।

এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে প্রত্যেকটি যৌন জনন-
 শীল প্রাণীর বেহের প্রত্যেকটি বেহকোষ (জনন কোষবাণে)
 এই যোগল নিউক্লিয়াস দ্বারা হইতে বাধ্য। কারণ ঐক্লপ
 ভাবেই প্রত্যেকটি প্রাণীই ট্রিপ এইক্লপ একটি নিবৃত্ত
 ডিবাগুর লক লক বার নাইটোসিনের ফল স্বরূপই গঠিত
 হইয়া থাকে। এইক্লপভাবেই প্রত্যেকটি যৌনজননশীল
 প্রাণীর জ্যামগত ডিবাগু শুক্রাণুদ্বারা নিবৃত্ত হইয়া
 ডিম্বদেহ হইয়া যায় এবং লক লক বিভাজন ক্রিয়াধারা
 জীব-বেহের লক লক ডিম্বদেহ মেলের জন্য বেহ। এখন হরত
 আনন্দা বুঝিতে পারিতেছি কেন প্রত্যেকটি গ্যামিট
 (শুক্রাণু অথবা ডিবাগু) উৎপাদনের নবজীবন পথে বাজা
 সূত্র করিবার পূর্বে নিবেশের বেহের ক্রোমোসোম সংখ্যা
 মাতৃবেহের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক করিয়া লয়।
 ইহাই যদি না হইত তাহা হইলে প্রত্যেক প্রজাতির
 ক্রোমোসোম সংখ্যা বংশাধিকারিক ভাবে বিকশিত হইতে
 আরম্ভ করিত। উৎপাদন স্বরূপ বলা বাইতে পারে—তাহা
 হইলে মাতৃবেহের দ্বিতীয় জন্ম (generation) দেখিতাম
 তাহাৎবেহের মেলের ক্রোমোসোম সংখ্যা ৪৮ হইতে ৯৬তে
 পরিণত হইয়াছে, এইভাবে বংশাধিকারিকভাবে, ৯৯২,
 ৩৮৪, ১৬৮, বিকশিত হইয়াই চলিত। ইহা নিশ্চয়ই
 অসম্ভব ব্যাপার। বাহাতে এইক্লপ অসম্ভব ব্যাপারের
 সম্মুখীন হইত না হয়; সেই জন্যই প্রত্যেকটি জনন-
 কোষ উৎপাদনের জীবন পথে অঙ্গের হইবার পূর্বে নিবেশের
 ক্রোমোসোম সংখ্যা কমানিয়া অর্ধেক করিয়া লয় এবং
 এইভাবেই প্রত্যেক প্রাণীর বেহকোষের ক্রোমোসোম
 সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়।

ক্রোমোসোমের কর্মজীবন—আনন্দা দৈনন্দিন
 জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে দেখিতে পাই প্রত্যেকটি
 শিশু তাহা মাতৃবেহই হউক অথবা অল্প কোনো
 প্রাণীই হউক, শরীর বৃদ্ধির দিক দিয়া, পিতা এবং
 মাতা উভয়কেই কোনো না কোনো দিক দিয়া অঙ্গুলন
 করিয়া থাকে। একটি দিকে হরত দে পিতাকে
 অঙ্গুলন করিয়াছে; অপরদিকে আবার অন্য দানের
 অল্প পিতা এবং মাতা অথবা শুক্রাণু এবং ডিবাগুর
 দানের ভিতর অনেকখানি প্রভেদ বর্তমান; অবশ্য

এই প্রভেদ দুইটি জীবকোষের পক্ষে কি পরিমাণ থাকে। সম্ভব তাহাও বোঝিতে হইবে। একত্রিক ডিফকোষ হইতেছে অপেক্ষাকৃত অনেক বড় এবং নিষ্ক্রিয়, অপর দিকে শুক্রাণু হইতেছে ডিফাণুর তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র এবং সজ্ঞ সক্রিয়। একত্রিক দ্বিমা মাত্রা নতুন শিশু মাতা এবং পিতা হইতে অথবা ডিফাণু এবং শুক্রাণু হইতে নতুন বস্তু পাইয়া থাকে। নতুন শিশু উৎসার দেহকোষের নিউক্লিওসের এবং ক্রোমোসোমের ঠিক অর্ধেক পাইয়া থাকে। পিতার অথবা শুক্রাণুর কাছ হইতে এবং মায়ের অর্ধেক পাইয়া থাকে মাতা অথবা ডিফাণুর কাছ হইতে। ডিফাণু এবং শুক্রাণুর ভিতর এতখানি গুণগত এবং মানগত প্রভেদ থাকে না যে কোন যে নবজাত শিশু পিতা এবং মাতার শরীরবৃত্তীয় গুণাবলী পাইয়া থাকে তাহার একমাত্র কারণ এই নিউক্লিওস এবং ক্রোমোসোমের মধ্যেই ইচ্ছিয়া পাই। কারণ এই নিউক্লিওস সহ ক্রোমোসোমই হইতেছে একমাত্র পদার্থ দ্বারা নবজাত শিশু উৎসার পিতা এবং মাতা হইতে সমভাবে পাইয়া থাকে। এই ক্রোমোসোমই হইতেছে বংশগতির (heridity) গুণবিশিষ্ট, এই ক্রোমোসোমই হইতেছে বাহন দ্বারা বাহ্য বংশাশু-ক্রমিক ভাবে প্রত্যেক প্রজাতি তাহাদের প্রজাতিগত শরীরবৃত্তীয় গুণাবলী বহ্যর দ্বাৰা বিতরণ করে। প্রাণীবিজ্ঞা সম্পূর্ণ ভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রাণীজীবের বহু পূর্বে অনেক বিজ্ঞানীরা এই দিকগত পৌছিয়াছিলেন। বর্তমানে অবস্থা ইহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে এই ক্রোমোসোমই হইতেছে প্রজাতিগত শরীর বৃত্তির বংশগতির কারণ। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি প্রত্যেক প্রজাতির নিজস্ব বিশেষ ক্রোমোসোম সংখ্যা থাকে। সাধারণ পাঠক এখন পর্যন্ত ক্রোমোসোম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞানিবার সুযোগ পাইয়াছে খুবই কম, ইহাই আমরা যাবৎ—কারণ এই বিষয়ে মানুষের জ্ঞান খুব বেশী দিনের মধ্যে। সাধারণ পাঠক ১০০ বছর পূর্বে অ্যাটম (atom) সম্বন্ধে যেমন বিশেষ কিছুই জ্ঞানিত না অথবা ৩০ বছর পূর্বে তাহাদের ইলেকট্রন (electron) সম্বন্ধে জ্ঞান যেমন ছিল না বলিলেই চলে ঠিক সেইরূপ বর্তমানে সাধারণ পাঠক ক্রোমোসোম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানে না

বলিলেই চলে। কিন্তু প্রত্যেকটি বস্তু গঠনের পক্ষে ইলেকট্রন হইতেছে ঠিক একটি দ্বিমান গঠনের পক্ষে ইষ্টকের প্রয়োজন যেমন অবিস্ফোরক, ঠিক সেইরূপ অবিস্ফোরক। বস্তুগত ইলেকট্রনের স্থান আর এত সুবিধিত যে, যেকোনো প্রকারের বৈজ্ঞানিক আলোচনা আর ইহাকে বাদ দিয়া চলিতেই পারে না। বস্তু বিজ্ঞানে ইলেকট্রনের স্থানের মতই অসুবিধিত প্রাণবিজ্ঞানে ক্রোমোসোমের স্থান হইতে বাধ্য কারণ জীববহুর ইহাই হইতেছে আদি বস্তু। এই অতি আত্মবিক্রমিক চটুটে প্রোটোপ্লাজমের ক্রোমোসোমগুলিই প্রত্যেক প্রজাতির শরীরবৃত্তির বোধ গুণ বংশাশুক্রমিক ভাবে বহন করিয়া লইয়া যায়। প্রত্যেকটি জীববহুর গঠন এবং উৎসারের প্রজাতিগত চরিত্রের মূলে রহিয়াছে এই বিষয়কর বস্তুটি। এই সুস্থর্তে এই বইখানা যিনি পড়িতেছেন এবং তাহার যে আশ্রয়ের কুসুমটি যারা যারা বসিয়া লেখ নাড়িতেছে, ইহার মধ্যে পাঠক যে পাঠক হইয়াছেন মানুষের সমস্ত প্রকার প্রজাতিগত গুণাবলী লইয়া এবং কুসুমটি যে কুসুম হইয়াছে উৎসার সমস্ত প্রকার প্রজাতিগত বিশেষত্ব হইয়া তাহার কারণ বুঝিতে গেলে এই দুই প্রজাতির নির্দিষ্ট সংখ্যার এবং নির্দিষ্ট গুণগত ক্রোমোসোম সমন্বিতে গাইয়া পৌছাইতে হইবে।

প্রাণীর জী এবং পুং হইবার কারণ—আমরা বর্তমানে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছি—একটি নির্দিষ্ট শিশু যে জী অথবা পুং হয়, ইহার পেছনে কি কারণ রহিয়াছে? এই প্রশ্নের অনেক প্রকার উত্তর প্রচলিত আছে—কেহ বলেন ইহা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে মাতার স্বাভাবিক বস্তু এবং পরিমাণ দ্বারা আর কেহ বলেন ইহা পরিচালিত হইয়া থাকে বাস্তব ইচ্ছা এবং চিন্তা দ্বারা। কোনো ডিফাণর পুং ডিফাণুর জন্মের আর কোনো ডিফাণর স্ত্রী ডিফাণুর জন্মের। এইরূপ আরও অনেক প্রকারের প্রচলিত মতবাদ, আমরা শুনিতে পাই। কিন্তু ইহার একটিও বিজ্ঞানের দ্বাৰা সাপ্য যায় নাই। কিন্তু এই সমস্ত মতবাদের এখনও কিছু কিছু সমর্থক পাওয়া যায়। এই সমস্ত মতবাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই কারণ আমরা বর্তমানে যে প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিতে বাইতেছি তাহার উত্তর সন্দেহাতীত

ভাবে প্রাণীজীবির কাছ হইতে আমরা পাইয়াছি। সেই বিষয়ই বর্তমানে আমরা আলোচনা করিতে গাইতেছি।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল গেল্ট্রিণ পোকাটির ভিতর পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের একটি ক্রোমোসোম বেশী। স্ত্রী পোকাকগুলির ভিতর যুদ্ধ সংখ্যক ক্রোমোসোম বর্তমান কিন্তু পুং পোকাকগুলির ভিতর অল্প সংখ্যক ক্রোমোসোম বহিরাছে। পুং পোকাকগুলির ভিতর স্ত্রী পোকা হইতে একটি কন ক্রোমোসোম বহিরাছে। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে জননকোষগুলি বিধা বিভক্ত হইয়া গ্যামিটে পরিণত হইবার সময় উহাদের ভিতরের ক্রোমোসোমগুলি ভোড়া বাখিয়া যায়। এই পোকাকগুলির ভিতর অল্প সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকার জন্য একটি ক্রোমোসোমকে বোঝা অবস্থার থাকিতে হয়। এই বিশেষ ক্রোমোসোমকে X ক্রোমোসোম বলা হইতে পারে। এই ব্যাপার হইতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে যে জননকোষগুলি বিধা বিভক্ত হইবার সময় যখন ক্রোমোসোমগুলি ভোড়া ধরিয়া সমান দুই ভাগে দুইটি শুক্রাণু ভিতর স্থান লয় তখন এই অল্প X ক্রোমোসোমটির কি অবস্থা হয়? এর উত্তর সংক্ষেপে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই এই ধারণা করিতে পারি যে নিশ্চয়ই X ক্রোমোসোমটি অল্প অবস্থার থাকিয়া যার এবং বিভাজন ক্রিয়ার সময় যে কোনো একটি শুক্রাণুর ভিতর স্থান লয়। এই ঘটনা হইতে তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত যে পোকাকগুলির অর্ধেক শুক্রাণু ভিতর X ক্রোমোসোম থাকে। অপর অর্ধেক এই বিশেষ ক্রোমোসোমটি থাকে না। X ক্রোমোসোম যুক্ত শুক্রাণুর ভিতর এই লক্ষ্য স্বাভাবিক ভাবেই একটি ক্রোমোসোম বেশী থাকিতে বাধ্য। অপরদিকে স্ত্রী পোকাকগুলির জননকোষের বিভাজন ক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবেই হইয়া থাকে কারণ উহাদের ভিতর ক্রোমোসোম সংখ্যা যুদ্ধ এবং ঐ X ক্রোমোসোমও একভোড়া থাকিবার জন্য প্রত্যেকটি ডিম্বাণুর ভিতর ১টি করিয়া X ক্রোমোসোম স্থান পাইতে পারে। তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি যে ডিম্বাণুগুলি অর্ধেক হইতেছে X ক্রোমোসোম যুক্ত এবং অর্ধেক হইতেছে X ক্রোমোসোম বীন। ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্ত পৌছাইতে পারি যে

একটি X ক্রোমোসোম যুক্ত শুক্রাণু যখন একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে তখন ঐ ডাইগোটের ভিতর ২টি X ক্রোমোসোম থাকিবে। ডাইগোটটি ১টি X ক্রোমোসোম পাইয়াছে ডিম্বাণু হইতে এবং অপরটি পাইয়াছে শুক্রাণু হইতে। অপর দিকে X ক্রোমোসোমবীন একটি শুক্রাণু একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করিলে যে ডাইগোটের সৃষ্টি হইবে তাহাতে ১টি মাত্র X ক্রোমোসোম থাকিবে কারণ এই ডাইগোট কেবল মাত্র ডিম্বাণু হইতে ১টি X ক্রোমোসোম পাইয়া থাকে। আবার আমরা জানি এই ডাইগোটই লক্ষ লক্ষ বার বিভাজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পূর্ণাঙ্গ জীবেরে গঠন করে। অতএব আমরা অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারি যে, একটি X ক্রোমোসোম যুক্ত ডাইগোট যাহা (বস্তুতপক্ষে ডাইগোটকেই জীবেরের প্রথম অবস্থা বলা হইতে পারে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমরা প্রত্যেক এবং প্রত্যেকটি মৌল জননীল প্রাণী এক একটি ডাইগোট দ্বারা আর কিছুই নহে) যে, জীবেরে গড়িয়া ওঠে সেই যেরের যেরকোষে একটি করিয়া X ক্রোমোসোম থাকিবে এবং আমরা জানি যে একটি পুং যেরের যেরকোষেই একটি করিয়া X ক্রোমোসোম থাকে। অতএব একটি মাত্র X ক্রোমোসোম যুক্ত ডাইগোট পুং যেরে গঠন করিতে বাধ্য। অপর দিকে দুইটি ক্রোমোসোমযুক্ত ডাইগোট যাহা যে জীবেরে গড়িয়া ওঠে তাহার যেরকোষে দুইটি করিয়া X ক্রোমোসোম থাকিতে বাধ্য। আমরা জানি পূর্বকথিত একটি স্ত্রী পোকাক যেরকোষে দুইটি করিয়া X ক্রোমোসোম থাকে। অতএব দুইটি X ক্রোমোসোমযুক্ত ডাইগোটকে স্ত্রী ডাইগোট বলা হইতে পারে এবং ঐ ডাইগোট যাহা যে যেরে গড়িয়া ওঠে তাহা স্ত্রী যের হইতে বাধ্য। এই সমস্ত তথ্যগুলি হইতে আমরা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারি, X ক্রোমোসোম যুক্ত শুক্রাণু বাহ্য ডিম্বাণু নিষিক্ত হইলে যে যের গঠিত হইবে তাহা স্ত্রী যের হইবে। অপর দিকে X ক্রোমোসোমবীন শুক্রাণুর বাহ্য ডিম্বাণু নিষিক্ত হইলে তাহা যাহা পুং যের গঠিত হইবে। তাহা হইলে আমরা পরিকায়েই দেখিতে পাইতেছি—একটি নিষিক্ত স্ত্রী হইবে কিংবা পুং হইবে তাহা সম্পূর্ণ রূপেই নির্ভর

করিতেছে কোন প্রকার শুক্রাণু (X ক্রোমোসোমযুক্ত অথবা X ক্রোমোসোমহীন; ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে তাহার উপর এবং কোন প্রকারের শুক্রাণু একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করিবে তাহা সম্পূর্ণরূপেই ধর্মের উপর নির্ভর করিতেছে—কারণ এই শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুকে নাহুৎ তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালন করিতে পারে না। নিষিক্ত ক্রিয়া একবার হইয়া গেলে সব ঠিক হইয়া গেল। আইগোট তখন তাহার নিদিষ্ট জীবন পথে চলিতে আবদ্ধ করিবে এবং বৃত্ত্যাব পূর্ব পর্যন্ত উহার সক্রিয়তার বিকাশ হইবে না। এত সময় উদ্ভিদের একপ্রকারের পোকা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই পোকা এবং ইহার যৌন জীবনের তথ্য একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। ইহা সাধারণ জীবজগতের বৈজ্ঞানিক সত্যেরই একটি উদাহরণ মাত্র। তাই এই পোকার যৌন প্রবাসী সম্বন্ধে পূর্ববর্তিত তথ্যাবলী নাহুৎ বোঝাও খাটিতে বাধ্য। ইহা এতদিন নাহুৎ জ্ঞানের সীমাবদ্ধ থাকিবে ছিল। এই সত্য প্রকাশ পাওয়ার A. B. Mendel এর উত্তর সন্ধি সূত্রের (Law of inheritance) সত্যতা আর একবার খাটি বলিয়া প্রমাণিত হইল। Mendel এর Law of inheritance সম্বন্ধে এর পূর্বের একটি অধ্যায় আলোচনা

করিব। এত সময় বাহা বলা হইল তাহা হইতে দুইটি সত্য আমরা জানিতে পারিয়াছি। প্রথমটি হইতেছে এই X ক্রোমোসোম নামক বিশেষ ক্রোমোসোম বাতাই আইগোটের লিংগ ঠিক হইয়া থাকে। দ্বিতীয়টি আইগোটের লিংগ, শুক্রাণু বাহা ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার সাথে সাথেই নিহিত হইয়া যায়। পূর্বকথিত তথ্যাবলীকে সাধারণ নিয়ম হিসাবে বলা হইতে পারে। তবে প্রকৃতিতে অনেক সময় সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইহার কারণ অনেক ক্ষেত্রেই নাহুৎের কাছে অল্পদৃষ্টিগত থাকিয়া যায়। তাই শেগুলিকে আমরা প্রকৃতির খেদাল অথবা এইরূপ একটি কোনো নামে অভিহিত করি। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে ঐ সমস্ত ঘটনাবলীর পিছনে কোনো বিজ্ঞানসম্মত কারণ নাই। আজ যে আমরা, তৎকালীন প্রকৃতির খেদালের পিছনে কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ দেখিতে পাইতেছি না তাহার মত সম্পূর্ণরূপে বর্তমান সীমাবদ্ধ জ্ঞানই ধারী। বর্তমান জ্ঞানের সীমা বাড়িবার সাথে সাথে নিশ্চয়ই বোধগত পাইব, আজ যাহাকে, প্রকৃতির খেদাল বলিয়া নিষেধের জ্ঞানের দ্বারা চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহা সম্পূর্ণরূপেই বিজ্ঞানসম্মত।

(ক্রমশঃ)



পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী

অধিদায়

ভারতীয় সভ্যতার একটি অপরূপ বিশেষত্ব যে সমস্ত সমস্ত বহুত্ব ধর্মের এই সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতের আদিবাসী লোপ পায় নি। অবশ্য বহু আদিবাসী হিন্দু মতাবে যোগ দিয়ে অমূল্য সভ্যতার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু বেশির ভাগ আদিবাসী হিন্দুদের কাছ থেকে বোঝার পরে গিয়ে বারীনভাবে বহু সাম্প্রদায়িক ক্রটি, ধর্ম, সমাজ শাসন ও জীবনযাত্রা প্রাণী আদম ও অমূল্য রাখতে পেরেছে। অনেক বলেন যে, তারা বনে জঙ্গলে লুকিয়ে প্রাণরক্ষা করে থাকে, অবশ্য একথা সত্য নয়—রাষ্ট্রপুতনার ভীষণ ও দক্ষিণভারতের আদিবাসী প্রকৃতি বহু আদিবাসী সম্ভার প্রাকৃতিকভাবে বাস করে বহু ক্রটিযুক্ত বলায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। অল্প দেশের তুলনায় এটা একটা মহা ধর্মের বহু। অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা শেভালিয়ার সংস্পর্শে এসে প্রায় লোপ পেরেছে। আমেরিকাবাসীরা, যারা নিকটের অত্যন্ত সভ্য বনে করে, স্থানীয় আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের আদম ও জীবনযাত্রার মত কয়েকটি সংরক্ষিত জঙ্গলে আশ্রয় করে রেখেছে। অবশ্য মধ্যযুগে (যেটা ভারতের অন্ধকার যুগ) অমূল্য সভ্যতার উপর অত্যাচার হয়েছে, কিন্তু তারপর ফল করা হয়নি। আদিবাসী বহু বহু পেরেছে ইংরাজ আমলে, বহু বিদেশী ধর্মপ্রচারক ও ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয় লোক এই সমস্ত আদিবাসীদিকে বিভ্রান্ত করেছে ও ঠিকিয়েছেন (exploited)। আদিবাসী সমস্ত ভারতীয় মুষ্টিভঙ্গী ভারতের শাসনভাগে স্থান পেরেছে। স্পষ্ট ভাষায় শাসনভাগে দেখা হয়েছে যে, আদিবাসীদের জীবন-

যাত্রার উন্নতির জন্য সমস্ত সমস্ত অর্থায়ন করতে হবে কিন্তু তারপর ধর্ম, তারপর ক্রটি, তারপর সমাজবহন উপর একেবারে ছাড় দেওয়া চলবে না। সুপরিচিত ভারতের ভিতর থেকে দূর করতে হবে কিন্তু বস্তুতঃ নয়—ভারতের বৃত্তির বৃত্তির ভারতের মধ্যে জীবন বিনষ্ট করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জর্জ হিগানসন বার এ বিবরণ সম্পূর্ণ সচেতন। তাঁর চেষ্টায় ও নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের জন্য কি করা হয়েছে তা ভবিষ্যতে বলা হবে।

১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুসারে সমস্ত পশ্চিম বঙ্গের আদিবাসীর সংখ্যা ১৫,৬৭,০০০ (পেট্টেট অব ইন্ডিয়া ৮ই নভেম্বর ১৯৫৬ সাল)। তবে এ সংখ্যা ঠিক কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। কেননা আদিবাসীদের ভিতর বহু উপজাতির লোকসংখ্যা এখনও গননা করা হয় নি। আদিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি আছে, যেমন পাঁড়োয়া, ওয়াড়, মুন্ডা, ক্র, মেচ, দেপতা, ভূটিয়া প্রভৃতি। চক্কা, গাভো, হাঙ্গামা প্রভৃতি শুদ্ধজাতি আদিবাসী এবং লোকসংখ্যা এখনও নির্ণয় করা হয়নি। টোটা ছাড়া সমস্ত উপজাতি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে আছে, তবে সমানভাবে নয়। শুধু টোটা জেলায়ই শুদ্ধজাতি জোড়ানীতির ভীয়ে টোটা পাড়া বলে একটি জায়গায় বসে; তারা সে স্থান কখনও পরিভ্রমণ করেন—কেননা তাদের ধারণা যে অজ্ঞান বাস করে। ভারতের স্বাধীনতা দেওয়া ইচ্ছা: সুপরিচিত হবেন।

১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় কত আদিবাসী আছে সেগুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হল—

জেলা	সেচ	দেপতা	ভূটিয়া	পাঁড়োয়া	ওরোঁ
পশ্চিমবঙ্গ	১০,৭৮৭	১০,৮০০	৪,৮১০	৩৪২,৩২২	২০,২২৬
বর্ধমান	...	...	...	১২,৭৪৪	৪,৪৪
বীরভূম	...	...	...	৭৮,৪৪০	৮০২
বাকুলপুর	...	...	...	১০৪,৬১২	২৮৭
মেদিনীপুর	...	৩	২	২০২,৬৮২	৩,৪৪০
হুগলী	...	৩১	১৪২	৬৮,২২৩	৪,৭০৬
হাওড়া	...	১	...	৪,০৪৪	১,৭৭০
চক্কিপাড়া	...	২৩	১৮	২০,০০২	২,৪২৮
কলিকাতা	...	৭	১৪	১৬৬	৪২
নবদ্বীপ	...	...	...	৬,২০৪	৩,৬৮১
দুর্গাবাদ	...	...	...	২১,৮৪০	১,২০২
মালদা	...	...	...	৭২,৮০০	৭,৪০০
পশ্চিম দিনাজপুর	...	...	...	২৪,২১০	২,৬৭৪
জলপাইগুড়ি	১০,৪০৭	২০১	৬১৬	১১,২২৬	১৫,৭৭৬
হাওলা	২২৪	১০১৪৪	৪,০১৮	৩৪৮১	১৭,২১৭
কোচবিহার	৪৪	...	...	১৩,০২২	১,৬০০

জেলা	মুতা	শ্র	মোট আদিবাসী
পশ্চিমবঙ্গ	৮২,২২৩	৪,৮২৬	১,১৮৫,৫০৭
কর্ডমান	২,৪৪৭	১০২	১৫৪,২৪৪
বীরভূম	১৭৪	...	৭২৪১৭
বাকুল	২০৪	২১	১০২২০
মহিষীপুর	৫,০০০	১,৫৪৪	২১২,৫২১
মুন্সীগঞ্জ	১,২০০	১,১০৮	৫৭,২৪০
হাওড়া	৪৬১	১১	৫,৪১০
চল্লিশপদগা	১৭,৪২৭	৮০০	৬১,৭০১
কলিকাতা	৮৬	৮	৩০০
মহীষ	১,০৭১	২	১০,২৬৮
মুন্সীগঞ্জ	২১৬	১১০	২০,৪৪১
মালদা	১০২	২৮	৮০৪০
পশ্চিম দিনাজপুর	৮,০৭৪	২০৬	১২৪,১২৪
জলপাইগুড়ি	৩২,৪০০	৬৭৪	১৮২,১২২
লালিগঞ্জ	৫,৭৪২	১২৪	৪৪,৭১১
কোচবিহার	২১৪	...	২,৬০০

১৯০১ সাল থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে আদিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৭০টি বেড়েছে। এদের মধ্যে মুতার সংখ্যা সব চেয়ে বেশি বেড়েছে—শতকরা ১০০ জন। কিন্তু মেচের সংখ্যা এই সময়ের মধ্যে শতকরা ৫০ জন কমেছে। শাঁওতালদের সংখ্যা শতকরা ৬৪ জন বেড়েছে, সেপগা ও ভুটিয়াদের সংখ্যা শতকরা ৩৪টি বেড়েছে। মুতা ওরার ও শাঁওতালদের সংখ্যা বৃদ্ধির একটি কারণ যে, এই চল্লিশ বছরের মধ্যে চা বাগানে ও সমস্ত জেলাতে কৃষিকার্যের মজুর হিসাবে বহু শাঁওতাল পশ্চিমবঙ্গে এসে বাস করছে।

মেচের সংখ্যা কমান কারণ যে, বহু মেচ পশ্চিমবঙ্গে জীবনধারণের উপায় করতে না পেরে আশামে চলে গিয়েছে। ১৯০১ সালের পূর্বে ঋষের সংখ্যা কত ছিল তা জানা নেই কিন্তু গত দশ বছরের মধ্যে বহু ঋ পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে।

সমস্ত উপজাতিদের জাতিগোষ্ঠী মোটামুটি বিশেষ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়,—শাঁওতাল, ওরার, মুতা প্রভৃতি জাতির উপর প্রোটো—অস্ট্রেলয়েড এবং মেডিটেরেনিয়ান জাতিগোষ্ঠী ছাপ দেয়া যায়। সেপগা, ভুটিয়া, মেচ, ঋ প্রভৃতি জাতির উপর মঙ্গোলয়েড জাতিগোষ্ঠী ছাপ বিস্তারিত। তারা হিসাবে বিচার করলে এই বিভাগ পুরোপুরি ফলে না। শাঁওতাল ও মুতার ভাষা অষ্ট্রিকভাষা

গোষ্ঠীর অন্তর্গত, কিন্তু ওরারদের ভাষা ড্রাবিড় ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত। সেপগা, ভুটিয়া, ঋ প্রভৃতির ভাষা তিব্বত চীন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

১৯১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে শতকরা ৬৯ জন আদিবাসীর জীবিকা চাষের উপর নির্ভর করে। ১৪ জনের জীবিকা নির্ভর করে অল্প উৎপাদনের উপর, (যথা—কয়লা বা ধান কল্লা তেল, চা-বাগানে চা উৎপন্ন করা প্রভৃতি)। শতকরা ১ জনের জীবিকা নির্ভর করে অমির মালিক হিসাবে, খাজনার উপর। শতকরা ৪ জনের জীবিকা নির্ভর করে বাণিজ্যের উপর, এবং শতকরা ১ জন বাসবাহন চালান এবং ১০ জন অল্প নানাবিধ কার্য করে।

আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার বিশেষ হয়নি। ঠাণ্ডা ও মুতারের মধ্যে শতকরা ৮৬ জন এবং ২১ জন শিক্ষিত। সেপগাদের মধ্যে শতকরা ১২০ জন শিক্ষিত। শাঁওতাল ও ঋষের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা অত্যন্ত কম। ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় যে শতকরা ১৭ জনও নয়। মেচের মধ্যে শিক্ষিত লোক লোক শতকরা ১৪টি।

আদিবাসীকে প্রায় কেহই ধোয়াশ খায় না। তাদের মধ্যে কতকগুলি উপজাতি যেমন শাঁওতাল, মুনাহার প্রভৃতি দুগ্ধ, বিড়াল, ব্যাট, কুইর, সাপ, গো-মাংস ও মোটা ইঁদুর খেয়ে থাকে। তবে মুতার মাংস সমস্ত উপজাতিই খেয়ে থাকে। ময়গান সমস্ত উপজাতির মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত।

উপজাতিদের মধ্যে অধিক বয়সে বিবাহ করা প্রচলিত। পুরুষের টাকা নিয়ে পত্নী সংগ্রহ করতে হয়। এই টাকা সংগ্রহ করতে সময় লাগে এবং দেহস্ত তারা খুব পতিশ্রম করে। এমন কি মধ্যে মধ্যে বিবাহের টাকার জন্য মোটা স্ত্রী তাদের টাকা দাবি করতে হয়। কোন কোন অগিবাশী পত্নীর পিতার বাড়িতে তিন থেকে বার বছর পর্যন্ত বসবাস করে বিবাহের ঋণ শোধ দেয়। বল-পূর্বক বিবাহ করার প্রথাও উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

উপজাতিদের মধ্যে প্রায় সব আদিবাসীই পিতৃতন্ত্র-শাসিত। তবে মাঝে প্রকৃতি কয়েকটি উপজাতি মাতৃতন্ত্র (পরিবর্তী অংশ ৭১২ পৃষ্ঠার ত্রুটি)

কুলীন-কলিকায় তিব বৎসর

নারায়ণ চৌধুরী

আমি মাগুর উপরীপের অধিবাসী। সাধারণ যত্নে একজন লোক। জাহাঙ্গীর খালসীও কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি। জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীর নিয়ত লাগব পাড়াপার করে, বেশ-বেশান্তরে খুঁড়িয়া বেড়ায়। ক্রমাগত জাহাঙ্গীর খুঁড়িয়ার অভ্যাগের ফলে এবং নানা দেশের নানা বকম মানুষের সঙ্গে বেলামেশার ফলে আমার মন এখন আত্মজাতিক আবহাওয়ার সহজেই নিঃশ্বাস লইতে পারে। জাতি বিচ্ছাতির কৃত্রিম ভেদাভেদ আমার চোখে একপ্রকার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। অল্পভূমিকে ভালবাসি, তাই বলিয়া অত্যন্ত বেশেক ও তাহাঙ্গীর মানুষকে ভালবাসি না এমন কথা বলিতে পারিব না। সর্বদা জলে ভাসিয়া কাজ করিবার অনেক অনুবিধা, খালসীও কাজে বাড়-ভাঙ্গা খাইনি, জাহাঙ্গীর নিয়ম-কাহ্ননও কড়া; কিন্তু জাহাঙ্গীর জীবনের একটা মন্ত লাভ এই যে, উহাতে মন নানাবিধ লক্ষ্যবর্তার বেড়াভাল হইতে আপনা হইতেই মুক্তি লাভ করে এবং মনে বিশেষ একটা ঠোকাঠের সকার হয়। এই লক্ষ্যবৃত্তি ও ঠোকাঠ বেশে যিহলে খুঁড়িয়ার পক্ষে বিশেষ সহায় হইয়া থাকে।

একবার আমার মাঝপন্থে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়ি। তখন বাজি তোর বর-বর। ভেতরের কুপার নলে কড়ের তাকত ও বৃষ্টির প্রচণ্ডতা নিশ্চিন্দা সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আমার যে জাহাঙ্গীর করিয়া ভাগিতেছিলাম, সেই জাহাঙ্গীর অনেককণ ঝড়ের সহিত হুৎ, কিন্তু খুঁড়িয়াও শেষ বকা করিতে পারিল না। জাহাঙ্গীর একটিকে কাং হইয়া পড়িল। আর উপায়ান্তর নাই বৃষ্টিয়া আমার লাইক-বোট বাহির করিলাম। প্রথমে শিত ও মারীঘের তারপর অত্যন্ত যাত্রীদের তারপর জাহাঙ্গীর সহকর্মীদের পার হইবার সুযোগ দিয়া, আমি ও জাহাঙ্গীর ক্যাপ্টেন মিঃ রবার্টসন দুইটি লাইক-বোট প্রায় করিয়া ভাসিয়া পড়িলাম। প্রথম কিছুকণ আমার দুইজন একসঙ্গে

ভাসিয়া চলিলাম, তারপর উভাল শুকনামালাব সংঘাতে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোবার যে ছিটকাইয়া পড়িলাম তাহার আর টুক-টুকানা বহিল না। মিঃ রবার্টসনের আর দেখা মিলিল না। ভাদিতে ভাদিতে ও জলে বাসি ঝাইতে ঝাইতে প্রায় অচেতন অবস্থায় এক জাহাঙ্গীর আসিয়া আমার হেঁচ ঠেকিল।

তখন লজ্জা দমাস্ত। ভাল করিয়া বুঝে জিনিষ ঠাংব হয় না। প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টা অনবদ্য ডেউয়ের সহিত হুৎ করিয়া শরীরে খেঁটু হৈতু ও বল অবশিষ্ট ছিল তাহা একত্র সংহত করিয়া চারদিকে অবধান সহকারে তাকাইতে মনে হইল, আমি একটি দেশের সমুদ্রপল্লভানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। উহা বীপ নহে, বীপ হইলে নাবিকের সহকাত সংজ্ঞার দ্বারা অনায়াসে উহার অস্তিত্ব টের পাইতাম। তখন অশঙ্কর হইয়া আসিয়াছে। জ্ঞানিতে ও স্তম্ভ-পিপাসায় বেহ অভিভাব অবদ্র। উহা সংজ্ঞা ও সংজ্ঞা-হীনতার মাঝখানে ক্রমাগত কোল খাইতেছে। চেতনাকে জীয়াইয়া রাখাই কঠিন। যেখানে আসিয়া আমার হেঁচ ঠেকিয়াছে সেই জাহাঙ্গীর কোনও এক দেশের প্রান্ততাপ এই জানিয়াই তখনকার মত আমার মন নিশ্চেষ্ট রহিল, অশ্রয়-ভূমিকে উহার অধিক পরীক্ষার গুহবস্থায় শক্তি বর্তমান ছিল না। স্রাতিতে এক সময় জোখের পাতা মুগিয়া আসিল। বেলোভূমির বালির উপরেই নথ্য চেনা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ঘুম ঘনন ভাঙিল তখন আকাশে হোর চিকচিক করিতেছে। জ্ঞানিতে অবশেষে প্রায় বার ঘণ্টা একটানা ঘুমাইয়াছি। কোথা দিয়া যে বাজি অভিবাহিত হইয়াছে তাহা বৃষ্টিতে পারি নাই। ঘুম ভাঙিতে মন্তকলাকার সমস্ত ঘটনা অরণ করি পরিস্থিতিটা আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করিলাম। আমি কোথায়, কোন দেশে আসিয়াছি। চারদিকে ঠাংব করিয়া দেখিতে অবশেষে লোকালয় আছে

বলিয়া যেন হইল। কোন কুটীর বা গৃহচূড়া চোখে পড়িল না। কিন্তু মাহুকের কোলাহলের দূর হইতে ভাসিয়া আসা তখনকমি শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম কাছেই কোথায়ও নহব বা গল্প আছে, নহতো এত লম্বা আশিবে কোথা হইতে! লম্বা লম্বা করিয়া তম-ভিত্তিযুৎ চলিতে লাগিলাম।

একটানা বহুদূর নিভা মাইবার কলে শব্দীয় এখন অনেকটা কতকবে হইয়াছে, কিন্তু সূর্য্যের উপর জলিতেছিল। প্রথম সূর্য্যের তাড়নার পেটের নাকীভূঁড়ি ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম। আশ্রয়তবে পা চালাইয়াছি, কিন্তু পা চলিতে চায় না। আশু কিছু দ্বাভ পেটে না পড়িলে চলিবার ক্ষমতাও আর থাকিবে না। তাই আশ্রয় অপেক্ষাও দ্বাভের সন্ধান এখন প্রধান ভূতা হইল। চাহিয়া-চিহ্নিয়া যেভাবেই হোক আগে কিছুটা দ্বাভ উল্লেখ করিয়া শব্দীয়টাকে মোটামুটি ঢাকা-করিয়া লজ্জা দ্বাভ, তারপর দীর্ঘসূত্র আশ্রয়ের সন্ধান করিলেও চলিবে। নাবিক-জীবনে আমরা লম্বা বকম-বই ভোগেই অন্ত্যন্ত আছি, আরাধের খতিজতা বিচিত্র প্রকারের, নৃত্যব্যং অপরিচিত অনন্তীয় বেশে আসিয়া পড়িলেও একেবারে মাঝা পড়িব না, এই বিশ্বাস আছে। নিম্নের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের উপর আমার আস্থা আছে, পথিযতিত্ব অবস্থার শব্দে নিকটকথাপ দাওরাইয়া লইবার উপযোগী-স্বভাবের স্থিতিস্থাপকতা। স্তম্ব আমার আছে বলিয়া আমি যেন কবি। সেই ক্ষমতার উপর ভরসা করিয়া নূতন বেশে নূতন-করিয়া ভাগ্যক্ষেপে পা বাড়াইলাম।

আমার অস্থান-বিখ্যা-নহে। কাছেই একটি গল্প মিলিল। গল্প শিয়া এক লোকানীকে আমার অবস্থার কথা জানাইয়া কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। লোকটি বোকাইয়া উঠিল এবং আমাকে তাহার দ্বারপ্রান্ত হইতে তাড়াইয়া দিতে থাকে। আমি। মারম্বের বে করে মাই সে আমার বহু-তাস্য। বুঝিলাম স্থূল-ভারস্বয় টোকা দ্বাভ হইয়াছে। বোকানীও ভাবদ্বাভে কথায়-বার্তায় তাহাকে একজন শব্দবহু ব্যাপারী বলিয়া বোঝাইল। এখন প্রাধের গল্প হইতে মাল-কিনিয়া-শব্দে চালান দ্বাভ উল্লেখ সে মাল বোকানে মম্ব করিতেছে। আমার

কথাবার্তাও সে বানিকতা বুঝিতে পারিয়াছে বোঝাইল। দীর্ঘকালীন নাবিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র বেশ পরিভ্রমণের কলে আমার কিছুটা ভাঙা ইংরেজীর জ্ঞান হইয়াছিল। সেই খতিত ইংরেজীর জ্ঞান লম্বা করিয়া বারবার মাতলমম্ব তেরো নদী পাতাপার হইয়াছি, কখনও কোথায়ও অবস্থিয়ার পড়িতে হয় নাই। এখানেও হইল না। লোকানীকে আমি আমার কথা বুঝাইতে পারিলাম। সেও শব্দে বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল। তখনকুও বোঝ-হয় আমার কথা বুঝিতে পারিবার কলেই আশুও বেশী করিয়া আমার ভাঙ্গো-পাছনা মিলিল। বোকানী আমাকে পূর্ণলজ্জা দ্বাভার পূর্ণেই তাহার প্রতি পূর্ণপ্রদর্শন করিয়া আমি সেই চৌকদী হইতে কতিতি লরিয়া আসিলাম। অবস্থে এক ব্যক্তি বোলা জয়দ্বাভ বলিয়া ক'কার করিয়া কলা, শশা, দ্বাভাবী সেহু ইত্যাদি দ্বাভদ্বাভ-দ্বাভবি বিক্রি করিতেছিল। তাহার দ্বাভদ্বাভদ্বাভে তাহাকে প্রাধদ্বাভী বলিয়া বোঝাইল। কাছেই অনেক তাহাই মত ক'কার করিয়া মানাবি শব্দী লম্বা ইত্যাদি বিক্রি করিতেছিল। পূর্ণলজ্জা লোকটির কাছে মাইয়া আমার অবস্থা তাহাকে জানাইলাম। সে আমার কথা একবর্গও বুঝিতে পারিল না, কিন্তু আমার অবস্থা তাহার মনে ধরাই লকাবে করিল ইহা আমি শব্দে অস্থত করিলাম। শব্দ-একটা পূর্ণা-বিন মানাবি বিপর্করব লম্বা হুড করিয়া আমার শব্দীয়ের ও বস্ত্রাবিৎ বে দ্বাভ হইয়াছিল তাহা পদ্বিজাত করাইবার অন্ত তাহার প্রয়োজন হয় না, উহা স্বভাই আগনাকে আগনি-প্রকাশ করিতেছে। তাহা আর কতটুকু মনোভাষ-প্রকাশ করে। তাহার চাইতেও মাহুকের আটকনের ও অবস্থার প্রকাশ ক্ষমতা বেশী।

বাহা হোক, লোকটি আমার প্রতি মাইতাই লম্বা হইল। সে আমাকে কিছু কলা ও শশা বাইতে দিল। প্রথম সূর্য্যের মুখে তাহার বেগুলা কলাদি খাইয়া উপর কিছুটা দ্বাভ হইল। মাহুকের দ্বাভিত আগাপ জমাইবার মত মনের অবস্থা করিয়া গাইলাম। লোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাতিবাস্তি আকাং-ইকিত অস্থামের দ্বাভাযো বতটা তাহার কথা জয়দ্বাভ হইল তাহা হইতে বুঝিতে পারিলাম আমি সুপরিচিত তম-স্থলীন বেশে আসিয়া

উপনীত হইয়াছি। যেখানে আমি দাঁড়াইয়া কবা
কহিতেছি উহা শুই যেমতই দক্ষপ্রান্তরতী প্রত্যন্ততাপের
একটি আশ্রয়। ভব-কুলীন দেশের নাম আমি অনেক
শুনিয়াছি, কলো-উপসাগর দিয়া যাইতে কতবার এই
দেশের পাশ ঘেঁষিয়া গিয়াছি, উহা আমার দেশ-হইতেও
খুব দূরবর্তী নহে; কিন্তু কোনদিন শুই দেশের স্তম্ভিকায়
সম্মার্ণ কবি নাই। আজ সমুদ্রিক বিপব্বের কলে সেই
দেশের একেবারে বুকের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।
ভাষাভিযুক্তি মাধ্যমে লোকটির সহিত আমার নির্যাত্তরপ
কথাবার্তা হইল—

“তোমার নাম কি?”

“নাম কুয়ালিঙ্গ।”

“দেশ কোথায়?”

“দেশ পেনাতের অন্তরে এক গ্রামে।”

“এখানে কেমন করিয়া আসিয়াছ।

“কলো-উপসাগরে বাহান ডুব হইয়া-ভাবিতে-ভাবিতে
এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।”

শোকটি-আমার নাম-ধাম-পরিচয় বিশেষ অবধান
করিতে পারিয়াছে-বলিয়া-বোধ হইল-না; তবু জিজ্ঞাসার
বাতিহেই-জিজ্ঞাসা করিল, “এখন কোথা যাইবে হির
করিয়াছ? নিশ্চয় দেশে কিরিবার চেষ্টা করিলে?”

“অ-করিব; তবে তার আগে-একবার এই-দেশটা
একটু ঘেঁষিয়া-দেখিতে চাই। দৈবগতিক-একবার যখন
আসিয়াই পড়া-পেছে-তখন এ দেশের-চেহারাটা-মোটামুটি
না-কোয়া-বাগরা উচিত-হইবে না। এদেশের রাজধানী
এখানে হইতে-কতদূর?”

এখান হইতে সমুদ্র-আশী মাইল-দূর হইবে। রাজধানীর
নাম-কুলীন-কলিকা। এখান হইতে কিছুদূর নামে
ইটিয়া-উত্তর-অতিদূরে চলিলে-হীরকপঙ্ক-পাগুয়া-যাইবে।
উহা-একটি পোতাশ্রয়ও বটে-শহরও বটে। সেখান-হইতে
রেলো-চকিয়া-কুলীন-কলিকায় পৌঁছিতে-হয়। প্রকাণ্ড
শহর। ভব-কুলীন-রাজ্যের-তো বটেই-শুই-রাজ্য-যে
দেশের-অন্তর্গত সেই-অন্তঃদেশেরও-সেরা শহর। সেখানে
একবার দিয়া পড়িতে-পারিলে-আশ্রয়ের-অভাব হইবে না।
চাই-বি-আবিকার-সন্ধানও-মিলিতে-পারে।”

আমার উপকাবক পরীবারী বহুটির সহিত এইরূপ
কথাবার্তা-হইবার পর আমি কুলীন-কলিকা-বাগুয়াই হির
কহিলাম। তাহাকে নানাভাবে বহুবার জানাইয়া তাহার
নিকট হইতে বিদায় লইলাম। তাৎপর্য বাক্যালে
হীরকপঙ্ক পৌঁছিয়া রাজধানী কুলীন-কলিকায় উল্লেখে
যেলে চাপিয়া বসিলাম। আমার টোকে কিছু মুদ্রা ছিল।
কয়েকদিন চনিবার মত সংস্থান। হীরকপঙ্ক দিয়া সেই
টাকা স্থানীয় মূদ্রায় ভাঙাইয়া লইয়াছিলাম। আতর্জাতিক
পদ্ধতিতে আমার নির্যত বিচরণ, স্ততরাং-নুতন অবস্থার
সহিত ঋণ ঋণাইয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়
নাই।

কুলীন-কলিকার যে ঠেগনে আসিয়া আনাথের গাড়ী
পৌঁছিল উহার নাম শৃঙ্গালকূপ। মস্ত বড় রেল-ষ্টেশন।
তাহার ভিন্নটি ভাগ। দর্শন-স্থিতি ভাগের নাম বাসিন্দীড়ি।
উহা-নিজেই একটি ষ্টেশন। দক্ষিণের বাকীভের এই ষ্টেশনে
আসিয়া গাড়ী ধরিতে হয়।

ভব-কুলীন রাজ্যের প্রধান শহর রাজধানী কুলীন-
কলিকা, আমি ভাবিয়াছিলাম ষ্টেশনে নামিয়াই-একটি
পরিদ্রষ্ট রকমকে তততকে শহরের দূর ঘেঁষিতে পাইব।
সেইরূপই যেন পূর্বে লোকমুখে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এ
কি-বেশিলাম। এমন বৃত্ত ঘেঁষি বরনাও-কহিতে পারি
নাই।

মধ্যবর্তী প্রধান ষ্টেশনের পাশ দিয়া-যাইতে চোখে
পড়িল-কাতারে-কাতারে মাথু-শিশু বহু প্রৌচ-নাড়ী—
ষ্টেশনের বারান্দাতে শুইয়া বসিয়া কিম্বাইতেছে। পরণে
তাহাদের শতছিন্ন ডালি বেগরা কাপড়, চুল উকো-খুসো
তৈলবীলি রুপু, গায়ে ময়লা নাটি, কেহ-ভূমিতেই-শয্যা
লইয়াছে, কেহ-কেব-বা শয্যার অছিলা রূপে ছেঁড়া মাড়ব
চট হোগলার পাট বা জীর্ণ কাঁধা আশ্রয় করিয়াছে। রুদ্ধতা
বিড়ি-বাইয়া ঘন ঘন কানিতেছে, মায়েয়া পথিকের
বিবেচনার উপর-তাহাদের সংকোচ-লক্ষ্য সম্মর্ণ করিয়া
শিশু-সন্তানকে প্রকাণ্ডে মাই দিতেছে, বধু বা বহুয়া কজা
ইট-দিয়া মাঝামাঝি সাময়িক উত্তরে রাজ্যের উল্লেখ্য
করিতেছে। চোলা কাঠের ঘোঁরা-চাবিকি অন্ধকার।
বান্ধ-বিছানা-তৈলগণ-ইন্ডিকুড়ি-বড়ি-কাঁধা-বাসিন্দ

ইতস্ততঃ ছড়াইয়া বহিয়াছে। শিশুরা বাত্যা ভাণে চিংকার করিতেছে—তুই বাড়ীতে রীতিমত কোম্পল শুভ্র হইয়া গিয়াছে। পাশের কোম্পলে যেন তাহাদের কিছু দার আগে না এমনি এক দিকে জনকরকম মিথ্যে বসিয়া নিরুবেগে তাল পিটিতেছে ও তাল খেলা দেখিতেছে। অকস্মিক রোহে পিঠ করিয়া মা ঘেঁরের একমাত্র গুটী চুল হইতে উকুন বাহিয়া দিতেছে। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য।

ইহাদের ঠিক দ্বারী বলিয়ঃ বোধ হইল না। হেলের তুতীর শ্রেণীর রাজ্যের চেম্বারের ন্যূন পরিচয় আছে। কিন্তু ইহারা যে এই পর্গাড়ের নাস্তব নয় সে বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চয় হইলাম। রেল-বাহ্যীরা এমন নাটী আঁকড়াইয়া গাথাগাদি করিয়া অবস্থান করে না। জিজ্ঞাসাযাে লানিলাম ইহারা সাপোয়া রাজ্যের উষ্ম, সেখানে ঘন-মান গ্রাম বিপর হওয়ার আশ্রয়ের সন্ধানে ভক্ত-কুলীন রাজ্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। তা, আশ্রয়ের সন্ধানে আসিয়াছে তো ঠেঁশনে গাথাগাদি করিয়া পড়িয়া আছে কেন? ঠেঁশনের ছুঁকেই বা আস্তানা বানাইয়াছে কেন? সাময়িক আস্তানা এমন বোধ হইল না, মনে হয় দিনের পর দিন নাসের পর দাস নিত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ইহারা এইভাবে ঠেঁশনের হাতের মধ্যে কাপাতিপাত করিতেছে। রোজ শত শত রাজী শূণাল-কূপ ঠেঁশনে গাড়িতে ওঠা-নামা করিতেছে, ইহাদের সুখ বিয়াই তাহাদের ঠেঁশনে ছুঁকিতে বা ঠেঁশন হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইতেছে। রাজীঘের মনের উপর ইহাদের এই অপমানীয় অবস্থা কতটা রেণাপাত করিয়াছে তাহা বলিতে পারিলাম তবে ইহাদের অবস্থায় কোন প্রতিকার হয় নাই সে অতি প্রত্যক্ষ। যেমন রোজ সূর্য ওঠে সূর্য ডোবে তেমন নিরম অশ্রুশায়েই যেন শূণাল-কূপ ঠেঁশনের চৌহদ্দীর ভিতর ইহাদের বাসবাড়া চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

আমি তাক্কাব বলিলাম। আমি মাধারণ একজন থানাসী রাজ্য। স্থল-কলেজে লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পাই নাই। নানা দেশ বেধা হইয়াছে সত্য, তাই বলিয়া শিক্ষিত মনুষ্যের মত আমার জ্ঞান-অজ্ঞান বোধ এক ভীত হইবে কেন। কিন্তু আমার ওই অপরিণত অমার্জিত জ্ঞান-অজ্ঞান বোধ সত্ত্বেও আমার মনে ভীষণ এক দাক্ষিণ্য।

এই রাজ্যের অধিবাসীরা এরকম অপমানীয় অবস্থা দিনের পর দিন স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছে কিভাবে? তাহারা কি দাস দাস, না, বাজজবো উৎসর্গপূর্তি করে? এমন অবস্থা চলিতে হিতে তাহাদের বিবেক সংকুচিত হয় না? ভক্ত-কুলীনরা এমন একটি দৃষ্ট নিয়ত চোখেই উপর কুলিগা বাহিয়া বাস্তব্য করিতেছে কি করিয়া? আর রাজ্যের বাহারা কর্তব্যাক্তি, রাজ্যের শাসনসত্তা পরিচালনা করিতেছেন, তাহাদেরও বলিহারি বাই। তাহারা এই অবস্থার প্রতিকার না করিয়া রাজ্যে চালাইতেছেন কেন? কুস্তিতে? তাহাদের রাজ্যে যুব হয়, আদ্যে যুখে যোচে?

হৌকসঙ্গ হইতে গাড়ীতে আসিতে আসিতে এই রাজ্যের অবস্থা—বাহবা বাত্যা-বরন মশক্কে অনেক কবাই জানিতে পারিয়াছিলাম। রাজ্যেরা নিষেধের ভিতর কথা কহিতেছিল, আমি কান পাতিয়া বহিলাম। সব কথা যে বৃষ্টিতে পারিয়াছিলাম এমন নহে, তবে যতটা অজ্ঞানে পারিয়াছিলাম তাহা হইতেই এই-রাজ্যের একটা চিত্র মনস্ককে ঝাড়া করিয়া লইতে অবহিলা হয় নাই। বৃষ্টিশায় এই রাজ্যের সর্বত্র বিলুপ্তা, সর্বস্তরে অপসৃত্যে। বেকার-সমস্তা ক্রমবর্ধমান, সমাজ-বিরাটী কার্যকলাপ নহব হইতে শহরস্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। শুনিতে পাইলাম ১৯৪৬ সনে কুলীনকলিকা সহরে তসাব্ব এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছিল। সেই দাঙ্গার ধুন-ধারাকিতে বাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাবিশ্বকে বীর বলিয়া অভিনন্দিত করা হয়। সেই 'বীরেরাই' এক্ষণে রিডলবার ঠেঁশগান ইত্যাদি লইয়া ডাঙাতি ও রাহাঝানি করিয়া সমাজে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছে। ঢেঁকা ঢেঁকা সব নাস্তব, অভিভাবকের দল, পাপকে একথা প্রসন্ন দিয়াছে, পুঁথিয়াছে, সেই প্রসন্ন-লালিত পাপ এখন বক্ষককেই ভক্ষণ করিতে উত্তত হইয়াছে। শুনিলাম পুলিশ বিভাগ এই সব অজ্ঞারের প্রতিবিধানে তাদৃশ বত্বান নহে। এই সব ক্রিয়াকলাপের সহিত তাহাদেরও একাংশের সোপান যোগদান্য হইয়াছে বলিয়া অনেকে সংশয় করে। সংশয় অশূলক মনে কবিবার কারণ নাই। এখানকার পুলিশী ঐতিহ্যই নাকি এই প্রকার। অজ্ঞারের প্রতিবিধানে পুলিশ যতটা না কার্যকারী—

উহা অপেক্ষা অস্তর-যোগে নাকি ওই বিভাগের তৎপত্তা সমধিক। সুতরাং আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, পরিবাহী যেখানে স্বয়ং ভূতাবিষ্ট সেখানে পরিবা বিয়া ভূত ভাড়াইবার করণা অসম্ভব না হইয়া পারে না।

সে যাই হোক সুখালকুণ শৈশবের হাতা পার হইয়া আমি বড় বাতীর কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। এইবার একটি আশ্রয়ের সন্ধান করিতে হইবে। সাময়িক আশ্রয় নর, বেশ পাকা-পোক্ত বৃক্ষের একটি আশ্রয়। সঙ্গে বে অর্ধ-সম্পত্তি ছিল উহার দ্বারা কয়েক দিনের গ্রাস-বাদের ব্যবস্থা হইতে পারে। উহাই আপাততঃ আমার প্রধান ভরসা। বাতীর টান-বাসের ভীড়, অগণ্য মানুষের কল-কোলাহল। জনতার একটানা প্রোত। শুনিলাম বিজিৎপুর

না কোণায় অনেক জাহাজী খালাসীর বাস। শুইখানে নদীতে সমুদ্র হইতে জাহাজ আসিয়া নোঙ্গর করে, জাহাজ মেঝামতির কার্য হয়, জাহাজ হইতে বাস খালাস ও জাহাজে মাল-বোতাইয়ের কাজ পুরাতমে চলে, নানা কোম্পানীর 'লাইনার' এখান হইতে যাত্রী বহন করিয়া বিভিন্ন দেশের অভিবৃথে গাত্রা করে; মোট কথা সাহুজিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া সেখানে একটি নাবিক-নগর গড়িয়া উঠিয়াছে বলিলেই চলে।

সম্মুখভীষীর মধ্যে সম্মুখী মিলিলেও মিলিতে পারে মনে করিয়া আমি বিজিৎপুরের উদ্দেশ্যে হওনা হইলাম। জল-সমুদ্র হইতে উৎকণ্ঠ হইয়া জনসমুদ্রে ভাসিয়া চলিলাম।



শিক্ষক ও সমাজ

ঐপ্রবোধচন্দ্র দত্ত

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব—সমাজের প্রয়োজনীয়তাবোধের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ যশস্বরের কাছে নিজের অস্তিত্বের ইতিহাস বেঁধে রাখার আকাঙ্ক্ষা তার মনে বেঁধে দেয়, আর তারই পরিণতিতে আজকের শিক্ষার প্রাথমিক অবস্থার উদ্ভব। প্রাচীনকালের যৌবিক শিক্ষা বেঁধে শুরু করে ক্রমে সিপিষদ শিক্ষা ও বাস্তবিক শিক্ষা সেই মূহুর্ত অতীতের সামাজিক প্রয়োজনীয়তাবোধের বিজয়কর্তন উড়িয়ে চলেছে। শিক্ষণ ও শিক্ষক অদ্বাদ্যভাবে জড়িত। স্যাক্রিটাস প্লেটো, এ্যারিস্টটলস থেকে শুরু করে আধুনিক শিক্ষকশ্রেণী পর্যন্ত সকলেই শিক্ষার অন্ততঃবার্ষিক করবার পূণ্য দায়িত্ব বহন করে চলেছেন—এ চলার শেষ নেই, সীমা নেই এ চলার পথের। বেশ ভেঙ্গেছে, তেঙ্গেছে সমাজ কিন্তু ভাঙেনি শিক্ষকের মনের উদ্ভাবনী সক্তি—প্রোতসাহীনা কল্পনাব্যবহার মতো ব'য়ে চলেছে এ সক্তি মানব থেকে মানবান্তরে। বহু পতিতের টোল আর বিশেষ শতাধীর প্রাণাধোপম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বেগ অস্তিত্ব; যা পরিবর্তন হয়েছে তা বাস্তবিক, পরিবর্তন হয়েছে পরিবেশের, পরিবর্তন হয়েছে সামাজিক প্রয়োজনের কিন্তু আশ্রয় রয়েছে অটুট, অস্তিত্ব। অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য যে পারিবা ও আর্থিক উন্নতি, সে যাবার পরিবর্তন হয়নি। সমাজব্যব থেকে উদ্ভূত শিক্ষক সমাজের পুরোহিতরূপেই যুগ যুগ আবির্ভূত হন—শিক্ষকে সমাজ থেকে আলাদা করে দেয়া আর একই মানুষের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলাদা করে দেয়া একই কথা। সমাজব্যবের শিক্ষকের অবস্থান ও ক্ষমতা অসীম। শিক্ষক সমাজের কারিগর; শিক্ষক সমাজের চিকিৎসক, শিক্ষক সমাজের সারথি। সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে সমাজ পদ্ধতির বা সমাজগঠন প্রকৃতির পরিবর্তনের আদর্শ থেকে, আর সে আদর্শ আসে শিক্ষকের হস্তধর্মী নবের শিক্ষা থেকে; সামাজিক অগ্রগমনের পুশপথের ঢাকা শিক্ষকের

নিপুণ সাংযোজ্য অভাবে কবে অস্তিত্বের পক্ষে আটকে থেমে যেত কে জানে! তাই সমাজ শিক্ষকের দ্বন্দ্বী-শক্তি বহিঃপ্রকাশ। যে জাতি প্রকৃত শিক্ষকের অনিপুণ পতিলায় হত বেদী পার সে জাতি ততবেদী উন্নত, শক্তি ও সুখী। সমাজের উপর শিক্ষকের স্তম্ভবপূর্ণ অবিষ্টান সম্বন্ধে বিদ্যত নেই।

বুড়ি হিসাবে শিক্ষক ও সমাজ নিয়ে আলোচনার পূর্বে শিক্ষা সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। বলা হত, "Education is the supreme profession of man." একথা কতটা ঠিক তা প্রতিটি প্রাকৃতিক বস্তু ও মানুষের জীবনের নিত্যকার অস্তিত্বতার কটিপাথরে বাচাই করলেই স্পষ্ট বোকা যায়। মানব-মন স্বজনধর্মী। আমাদের সখ্যার, আমাদের পরিচয়, আমার কার্যকলাপ ও সমাজে আমার দান সবই তো নিঃশব্দিত-হৃদে ঐ একটি আকাঙ্ক্ষা দিয়ে। আমি যা ভালবাস, যা বেখোলা, শিবলাম তা যদি আমার চিন্তাশক্তি ও গঠনপ্রকৃতির আবরকরূপে রসান্বিত করতেই না পারলাম, যদি না আমার কথা রইল কারো মনে, তবে বুঝি বা আমার জীবনই ব্যর্থ। এই যে ভাব, এটা শিক্ষকের মনে সবচেয়ে, বেদী কার্যকারী। সমাজের কটি শিশু থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক পর্যন্ত সকলকে এবং পরোক্ষভাবে সমস্ত সমাজকে তাঁর স্বজনধর্মী মনের প্রকাশরূপে মনে করেন—এমনটি আর কোন্ বৃত্তিবাহীর পক্ষে সম্ভব? যথার্থই বলা হয়ে থাকে, "Those who love to see things grow, love teaching." ফুলের কুড়ি থেকে যদি না ফুলই ফোটানো গেল তবে বার্ষ মালকের মাল্যকরের জীবন, বার্ষ তার সাধনা। শিক্ষক সমাজের মাল্যকর—সমাজের কুড়ি শিশু-মাগরিকের মধ্যে ঘুঁিয়ে আছে যে মানুষ, তাকে পূর্ণ প্রকৃষ্টিত করিয়ে, শিক্ষক মাশা গাঁথেন সুখী ও সৎ জাতির,

কালমাটির 'ভাল থেকে মিশ্রণ শিল্পী' স্তার তিনি গড়ে
 তোলেন উন্নত সমাজের কীৰ্ত্তি মাহু—তাই শিক্ষাদান
 সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ।

প্রকৃত শিক্ষক শুধু বিদ্যারস্ত্র শিক্ষা দেন এ ধারণা ভ্রান্ত ; শিক্ষক তো বহুদিক দিয়ে ব্যস্ত নন, তাঁর কাজ জীবনমর্যে-
ত্তবা জীবন সঞ্চা-দ শিক্ষাদান। জামাই জীবন, অজান
তিমিরাত্ম মানুষের জীবন কার্য, তার মানবরূপে কয়গ্রন্থবৎ
বার্ষিক। মানুষের এ বার্ষিকতার মূলে আশ্রিত হবে জীবনমর্যে
দীক্ষিত করাই শিক্ষকের সবচেয়ে বড়-স্বপ্নদান। বহুশিক্ষা-
সমাধে সমাবে "জাতিতে জাতিতে আদার। কিন্তু জীবনমর্যে
দে শিক্ষাতত্ত্ব অনেক উপরে ; এ শিক্ষা ভৌগোলিক সীমা-
রেষা মেনে চলে না, মানে না-কৃত্রিম প্রস্তেব ; তাই যুগে যুগে
পৃথিবী নিখোছে জীবনমর্যেের শিক্ষা- বীজ, ঐতিহ্য, কবীর,
হামী বিবেকানন্দ, টলষ্টয়, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি হৃদয়
শিক্ষকের কাছে। মনের অন্ধকারের আবিলিতা দূর করে
জ্ঞানের প্রদীপ বধন মলে-ওঠে তখন কি-আর গভীরত্বতার
বীদন থাকে ? শিশুর হাতেবড়ির দ্বিনে বিনি হয়তো
"শায়ারতঃ শুভার তবতু" উচ্চারণে একটি পূর্বাভূষের
বাহ্যাপথে বদল-কামনা জানিয়ে অগোচ্য করেননি, তাঁর
দীক্ষিত শিশুর ভবিষ্যৎ স্বচক্ষে দেখে থাকার মতো শিশুর সেই
প্রাথমিক স্তর থেকে স্তর করে পরবর্তী জীবনে দে যার
কাছে শিশল "হবে বর্ষে নাইরে বিভেদ নিবিদ কণ্ড প্রসংগ"
এ-বাকী সেই শিক্ষক-পর্বত শকলেরই কেউ হিয়েছেন মাটির
আতরণ, কেউ হয়েছেন রত্নী-তুলির স্পর্শ আর কেউ
করেছেন প্রতিহার প্রাণদান। পাঠ্যবইয়ের চোখে শিক্ষকের
ছোটবড় ভ্রমের যে প্রকাশ তা কাহিন্যেরই কর্তব্যভাগ
পর্যায়ের। বস্তুতঃ শিক্ষকে শিক্ষকে পার্থক্য নেই, সব
শিক্ষকই মহান।

শিক্ষক সদাশয়, বর্ষকৃত, সৌভাগ্য, একান্ত-বল
ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতিমূর্তি। অথচ যে কোন পেশার
চেয়ে শিক্ষকের পেশা স্বতন্ত্র ও কঠিন। নিম্নের কখনোশক্তি
শিশু ও যুবাব কখনোশক্তির-সহ সঙ্গমস্থলরূপে মিশ্রণ
দিয়ে তিনি তৈরী করেন জাতি। এ কারণে তো সহজ হতে
পারে না। সত্যি, "Teaching is the most subtle
and the most crucial of all professions."

প্রতিটি ছাত্র থেকে তিনি যে জ্ঞান লাভ করেন, নিজের লক্ষ্যজানের দিকে তার সামঞ্জস্য করে তিনি বৃহত্তর সমাজের প্রাণ সঞ্চারও সতত করে তোলেন। শিক্ষকের কাজ “to guide the growth of another person.” তাঁর অবধান কোণার মধ্যে যেতে পারে না। কৃতী থাকুনো বিদ্বৎ, সুদক্ষ শাসক, শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ, সুদক্ষ শিল্পী যে কেউ যদি একবার কেসে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে তাকান তা হলে তাঁর কুতিয়ের মূলে যে কিছু উপাধান তার মধ্যে প্রবান হয়ে বেধা বেবন পেই হারানো যিনের শুদ্ধমশার বিনি তাঁর যাত্রাপথে উজ্জ্বল করেছিল। “অরনায়াস্ত্যন্তায় ভবতু”; বেধা হেবন দুঃল, কলঙ্ক, বিঘ্ন-বিভ্রান্তিরেবঃ এবং অন্ত্যস্ত কোত্রের শিককগণ বিনা তাঁর অগ্রসরনের দ্বয়ের পার্থি হয়ে তাঁকে এমন পৌছিয়েছেন সন্তুষ্টমূলে। অ্যাডামসের তাৎপা—

"A teacher affects eternity, he can never tell where his influence stops."

শিক্ষাবান একটি নিয়ম; শিক্ষক শিল্পী এবং ছাত্র মন-
শিল্পীর উপভোগ। অল্প যে কোন পেশার দায়িত্ব ও নীতি-
বোধের প্রয়োজন শিক্ষণ দৃষ্টি কেবল প্রয়োজনের চেয়ে
অনেক কম। বসন্তঃ, "Teaching is an art and
not a trade nor a civil service. It exalts
service over personal gains and evolves a
code of ethics governing work and be-
haviour."

উপরুক্ত আলোচনার পর:প্রেক্তিত ভারতীয় সমাজ ও
ভাষ্যীয় শিক্ষকের সম্বন্ধ কি তা হিয়ার করে দেখলে উক্ত
পুথিবীর বুকে আমরা কত পিছিয়ে পড়ে রয়েছি তা গোকা
সম্ভব হবে না। শিক্ষা, শিক্ষক, সমাজ এতপোর কর্তব্য
সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয় আর বর্তমান
প্রবন্ধের গভীর মধ্যে এগুলো পড়েও না। সমাজ শিক্ষকের
স্থান এবং সমাজসেবে শিক্ষকের প্রত্যাবের আলোচনাই
আমাদের উদ্দেশ্য। শিক্ষক ও সমাজ নিয়ে বর্তমানে
আলোচনা সাধারণভাবে করা হল তাইই ত্রিভুক্ত ভারতীয়
অবস্থা মালাচনা করতে গেলে চোখে বেলে গেটে একটা
হতাশা ও মানির ছবি। রূপিত প্রকৃৎ আবল থেকে স্তর

হয়েছে, শিক্ষক বলতেই ধরে নিতে হবে এমন একটা শ্রেণী থাকে এককথায় বলা চলবে, "The shabby genteel." সমাজের উপর তার ক্ষমতা শিল্পের বেধে পুষ্টির উপর স্বাস্থ্যের ক্ষমতার দ্বারা সেই শিক্ষকই যদি "shabby" হবেন তার সমাজের অসুখপতনের আর বাকীই বা থাকল কি? শিক্ষক হলে কেউ অধ্যয়ন না, শিক্ষক কোনও অশুভশক্তিই সৃষ্টি নন, তিনি সমাজেরই একজন। পরিবেশ, আত্মকাণ্ড ও শিক্ষার ফলে তাঁর মধ্যে যে স্বজনবদী মন ফোঁপোরে শিক্ষকত্বের ভারই প্রকাশ। স্বজনবৃত্তি আত্মকাণ্ডের দ্বারা শিক্ষণবৃত্তি গ্রহণ করেন তাঁর শিক্ষাদান তো বার্ষিক হতে পারে না। শিক্ষকতা বৃত্তি হবে আকর্ষণক্ষম, ফলের বস্তু যেমন সর্বদা আপন হৃদয়ময়ই আকর্ষণ করে নেয়।

হুয়েলা অগ্রেস অবস্থানে কাঁচের জীবন তাকেই আত্মসমাজ বৈশীরা ভাগ ক্ষেত্রে বেধতে পাই শিক্ষকের জীবনিকার। আর্থিক অস্বচ্ছন্দ্যের ফলে শিক্ষকতা পেশা হিসেবে এখন বৈশীরা ভাগ সুখ-সুখভীর কাছেই শেষ উপায় বা last resort. শিক্ষক নিজের জ্ঞান, পারি-পাশিক ও ছাত্রের কাছে থেকে পাওয়া জ্ঞান এবং মনোবীরের চিন্তাধারার সমন্বয় করে তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডারে পূর্ণ হতে পূর্ণ হতে করে তুলেছেন। একমাত্র এভাবেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে জ্ঞানের ভবিষ্যৎ তৈরী করতে সহায়তা করা। বুদ্ধি শিক্ষক বুদ্ধি সমাজই তৈরী করতে পারেন, সুস্থ ও মঙ্গল সমাজ জীবন ও বুদ্ধি শিক্ষকের একত্র জ্ঞানের বস্তু করা যায় না। শেষ উপায় বা Last resort হিসেবে যিনি শিক্ষণবৃত্তি গ্রহণ করেছেন তাঁর কাছে থেকে সমাজ বৈশী কিছু আশা করতে পারে না, ফলে উন্নতির দিকে সমাজের যাত্রা স্লো হতে হয়। ভারতের ক'জন শিক্ষক আর বলতে পারেন Teaching has been a good life to me? বর্তমান পর্যন্ত না এতো ক'জন শিক্ষক একথা বলতে পারেন ততদিন শিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নতির কথা চিন্তা করা অর্থহীন। অধ্যাপন ও অধ্যয়ন একই বেধের দুটি অঙ্গের দ্বারা আবদ্ধিত—অভাববৃত্তি সমাজে উপেক্ষিত শিক্ষকের অধ্যয়নের অবকাশ কোথায়? ফলে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার অসম্পূর্ণ আর অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে অসম্পূর্ণ জ্ঞানদান কি করে হবে সম্ভব? অর্থই আর ভারতীয় সমাজে কৃতকার্যতার মাদকত, অর্থের দ্বারা ধারণে লিপল যে সমাজ, শিক্ষকের বর্ষা সেখানে চূর্ণিত। রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির বিভাগীর ফুল আর সমাজের সর্বত্র বেধা দিলে

বিশ্বেটিকের মধ্যে। পরাবীন বেধে ইংরেজ যে বিশ্বক ধোপন করে দেল, দুর্ভাগ্য এবেশের, দুর্ভাগ্য এ জ্ঞানের, স্বাধীন ভারতও পারল না যে বিশ্বকের ফুলোপটন করে অশুভবাবি দিকন করতে। জ্ঞানের জীবনে জ্ঞানের মৈত্রিক-জীবনের ইতিহাসের এ দৃশ্যের ফল হবে মৈত্রিক-জীবনের সুযোগ্য ভারতের সার্থে হুঁতুত হয়ে যাবে স্বাধীন ভারতবাসী আর এ আশাই করে। অভাবগ্রস্ত শিক্ষক পারেন না, "To educate for equal opportunity for all and to insist upon the highest standard of character"—যা প্রাচ্য ও প্রান্তীয় মনোবীরের ভাব্য প্রত্যেকটি শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য। সমস্ত শিক্ষক সমাজের সার্থক পূর্বগ্রন্থক। যে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিহীন ভারতকে অপরাধে পথ দেখিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় না। আমাদের শিক্ষক সমাজও আর অর্থ নৈতিক ধারণা-কবলে গড়ে পড়ছে পড়বার উপক্রম হয়েছে।

শিক্ষণবৃত্তি জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রতিচ্ছবি, কিন্তু সব জ্ঞানেরই নীমা আছে। হারিক্রান্তের দিকে বৈশ্ববিন্দু বুদ্ধি তার জীবন ক্ষতিবিক্ষত তার ভাষা আর ক্ষমতা থাকে না জ্ঞানের ও জ্ঞান সন্ধানের, তাই একটা সর্বনিম্ন অর্থ নৈতিক নিশ্চয়তা শিক্ষকের দিতেই হবে: ভাল উপার্জন, চাকুরীর নিশ্চয়তা, বার্ষিক অধ্যয়নমূলক থাকবার পথ ও সামাজিক বর্ষা সমাজ শিক্ষকের নিশ্চয়তা দিতেই হবে—নইলে দুর্বল শিক্ষকের হাতে জ্ঞানের জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বহন করবার ক্ষমতা থাকবে না। এককথায় সমস্ত দিক থেকে শিক্ষকের মনে সাহসের সঞ্চার করতে হবে।

শিক্ষকের হাতে সমাজের তথা জ্ঞানের উন্নতির চাবিকাঠি। আর শিক্ষক বুদ্ধিতার প্রান্তে এসে ধাক্কাধাক্কি, আর আল্লাই আল্লা এসে পৌঁছেই এমন একটি পৃথিবীর আবেশে বসন স্বাভাবিক বসায় রেখে বৈশ্ব বাসলে সুশিক্ষা, পঠনমূলক ভাবধারা ও আর্থিক উন্নয়ন অপরিহার্য। সুযোগ্য শিক্ষক ছাড়া এর কোনটিই অসম্ভব। তবে কি আমরা ভুবে যাব জ্ঞানের অতলে? সুই শিক্ষক সমাজ সৃষ্টি করে সুখরতম সমাজ গড়ে তোলার বস্তু নিয়ে নামতে হবে কাজে। শিক্ষকের নিরতম প্রয়োজন যিগিরে যোগ্য হারিহর নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে জ্ঞানের সন্ধানের সন্ধানকে। এগিয়ে আসতে হবে প্রত্যেকটি চিন্তাশীল মানুষকে, এগিয়ে আসতে হবে প্রতিটি নাগরিককে। ভারতীয় শিক্ষকসমাজ বৈশ্ববিন্দু বসল ও সুই হবে সেদিনই দেশের প্রকৃত উন্নতি পথ।

কালীঘাটের কালী

শ্রীভাগবতদ্ব্যস বরাট

কালীঘাটের কালী দেবীর বিগ্রহ। দেবী সর্বজন পূজিতা। স্তুতগাং নৃতন করে পরিচয় দেওয়া নিম্নোক্ত। তিনি আপন মহিমায় মহিমান্বিতা ও সুপরিচিতা। অদ্বিত ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি পরম আরাধ্যা। এই দেবী শীঠের ব্যাতি ও প্রতিপত্তির কারণ সত্ত্বে অমূল্যমান করলে সহজেই অহমিত হবে যে কোলকাতা নগরীর জনপ্রিয়তা ও জনরুচির ফলে এবং আগন্তুক তীর্থকারী অধ্যক্ষ জনগণের বহুগ উক্ত দেবী বিগ্রহের পরিচিতি ও এসিদ্ধি সর্বসাধারণের মাঝে দিন দিনই ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন শুভাচার দেখা বেশি আমি, আবার আমার অঙ্গনরূপে অপরাধন—এইভাবে প্রতিজ্ঞার পূজা দেবী পেয়ে থাকেন এবং এই পূজা-আচার মাধ্যমেই তাঁর জনপ্রিয়তা ও এসিদ্ধি। কিন্তু প্রাচীনকালে তীর্থ কালীঘাট বর্তমান দুগের নত এতটা উৎসবধূমের না হলেও পাত্তীপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সাধন ভক্তনের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত ছিল।

প্রাচীন নগর বাস্তুতন্ত্রের উপর তৎকালীন গোবিন্দপুর গ্রামে এই শীঠস্থানের অবস্থান ছিল। বৃহদীল ও শিবান্ন তত্ত্ব এই অকলের নাম দেওয়া হয়েছে কালীঘাট। সতীর কনিষ্ঠাঙ্গি এখানে পতিত হওয়ার এই স্থান পদম পবিত্র। সেই পবিত্রতার থেকেই এই স্থানের এসিদ্ধি। ভদ্রা পূজারী ব্রাহ্মণে আদ্যবা এর পরিচয় পাই, “গোবিন্দপুর গ্রামে ৫ কালী স্থবহনী তটে,”

পুরাকালে এই কালীক্ষেত্র ছিল জনমানবহীন খাপর-মহুল এক বিশাল অরণ্য। ক্ষুদ্র পর্বতটির মধ্যে দেবী বিরাজমানা ছিলেন। বাইরের জন-সমাগম তখন নথ্য ছিল। সাধারণতঃ তীর্থযাত্রীর হল এখানে দেবীর পূজারীর মানসে আগতেন। আর আগতেন সাধারণতঃ হিন্দু বনিকগণ। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাকালে কিছা ফেদার পথে নগর ঘাটে নেমে ভ্রাজ্যতা দেবী কালী মাতার নিকট দ্রব পূজা তাঁরা নিবেদন করতে আগতেন। সেই সময় হতে এই ঘাটের নাম দেওয়া হয় কালীর ঘাট বা কালী-ঘাট। কিন্তু তৎপূর্বেও শক্তিসাধক শ্রমায়ী ও কাপালিক-

গণ এখানে আরাধনার ভক্ত মনোভব করেন। অমূল্য বে দেবীমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়, তৎকালে তা ছিল না। প্রত্যহ নিমিত্ত দেবীর বিগ্রহ সে দুগে আরাধ্য ছিল। আর সেই মূর্তিরই পূজা হত। তখনকার দিনে শক্তি প্রতীক নিত্যসুই গুণ ছিল। বৃহদীল তত্ত্ব তাই এই পৌরাণিক কালিকা দেবী গুহ কালী নামে অভিহিত। নিপদকল্পে শীঠ মালার এই কালীক্ষেত্রে সীমা নির্ধারিত হয়েছে। এতে দেখা যায় হস্তিগণের হতে মঙ্গল অর্থাৎ বেহালা পর্যন্ত এই দুগোজনে পরিমিত মনুষ্যসত্তি স্থানই কালীক্ষেত্র নামে পরিচিত ছিল। কবিদ্বয়ের বিবরণ প্রকাশে আনত এই শক্তি শীঠের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয় পাই।

শীঠমালা তত্ত্বের মতে ভাণ্ডারী তাঁর এই স্থানে সতী দেবীর বাম অঙ্গুলি পতিত হয়। এই কালীক্ষেত্রেয় সন্নিহিত অকল গোবিন্দপুর গ্রাম, ভটপল্লী এবং লুগাল হাছ (শিয়াল হাছ) কার্যতঃই শাসনাধীন ছিল। আবার অনেকের মতে উপরোক্ত স্থানদুই বাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাধিকারভুক্ত ছিল। প্রতাপাদিত্যের পুত্রতাত বসন্ত তায় নাকি এই কালিকা দেবীর তৎকালীন দেবাইত শক্তি সাধক ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন। সে দুগে বসন্ত রায়েই আত্মে মায়ের একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মিত হয়। মনে হয় এই সময় হতেই এই গুহ কালিকাদেবীর বিগ্রহের কথা বীরে ধারে চারিত্রিক ছড়তে থাকে। মোগল শত্রু আকবরের সমসাময়িক ত্রিবেদীর মাধ্যমচার্যের দুর্গা মাধ্যম এবং কবি কণের চর্চা মঙ্গলে এই গুহ শীঠস্থানের কিছুটা তথ্য পাওয়া যায়। অনেকের মতে যশোরের কার্যতঃ রাজারা কালীক্ষেত্র অকল বেবোক্ত-ব্রহ্মপ প্রধান করেন। ভুবনেশ্বর অমূল্যক থাকার তাঁর যৌহিত্য-বংশীয় শাসনাধরণ এই অকল হরণ করেন। এর দীর্ঘ দিন পরে বড়িয়ার দাবর চৌধুরী বংশীয় অমিত্যর শতাব্দে বার ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে বর্তমানের মন্দির তৈরী করিয়েছেন।

বিন্দা

রশিগুলা হোসেন

বিন্দার মা পরন্তু মাঝা গেছে।

সে এখন লেকেন্দ ধাতের একটা বড় পাছের তলাকাঁব ছাটার থেকে উপর এসে বসল। সে কাল বিকেল থেকে পেট ভরে খল ছাড়া। আর কিছুই খায় নি,—যেহে চাকা চাকের মত তারি করুণ তার মুখ। কবিতার মত তার এই অপকণ রূপের বিঘটতা তারি মর্মান্বিক।

সে বসে সে ভাবছে তার মায়ের কথা। ছেড়ে আসা তার অশ্রুের কথা। মাকে হারানোর দুঃখই তার সবচেয়ে বড় দুঃখ। সে মায়ের কথাই বেশি করে ভাবে। ছপুয়ের দুই ষট-বুড়িতে মহা-পৃথিবীর বিকে তাকিয়ে আছে নিরুপদ্রব—যেন কাবুলীওয়ালা—ঘরিত্তীর রস যেন শুধে না নিয়ে ছাড়বে না।

দূরে নীল আকাশে ছোটো ছোটো শিশুর মত মেয়েরা উড়ে বেড়াচ্ছে। কাছেই ছুঁটা কাক স্কাটা দিয়ে মাঝ-মাঝি করছে আর কা কা করে কেবলি ডেকে চলেছে চিত্রকালের একটানা অপর্যাপ্ত।

বৃষ্টিবনের চোখে ভ্রম্মা নেমেছে এবার। বার দুইরক হাই তুলে চোখ দুটা বসড়ে নিয়ে পা ছুঁটা তুলে দিয়ে একটা হাত মাথার তলায় রেখে আর একটা হাত কুলিয়ে দিয়ে শুভে পড়ল।

অন্যায়ের অবসানে ক্রান্তিতে তার লাঙ্গল চোখ ছোড়া জুড়ে এলো। সে এবার একবারে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে দেখতে লাগলো স্বপ্ন। স্বপ্নটা যেন দ্বিবিদ্যার কোলে শোনা রূপকথার মতো। নীল আকাশ দিয়ে পক্ষীরায় ঘোড়ার চেপে উড়ে চলেছে সে কোন এক অচিন রূপকথার ভোম সত্যার, লেশানে তার নিমন্ত্রণ। সত্যার সে দেখে রূপকথার ঘোষের বাহুসুয়ারীকে ভোম-বেলাকার শিশিরের হাব। মাথার উপরে নীল আকাশ নীচে নীল সাগরে আকাশের ছায়া—তার ভিতর দিয়ে সে চলেছে রক্তাণা এক সবুজ দেশে।

হঠাৎ ব্রেক কবলো একটা গাড়ী।

বৃষ্টিবনের ঘুম ভেঙে গেল। বড়মড় করে লাফিয়ে

উঠে দেখলে চক চক কালো রক্তের একটা বড় গাড়ী বীরে বীরে চলে গেল।

শরীহটাকে বার দুইরক তেঙে নিয়ে বৃকে ঠেস দিয়ে থেকেটার সে বসে পড়ল আবার।

অনেককণ সে ঘুমিয়েছে। বিকেল আর পড়িয়ে এলো। একটু একটু করে হাওয়া বইছে। স্বপ্নটা হেলে পড়েছে পশ্চিমের আকাশে, ঝাঁকা দুটি তার, মনে হয় যেন কান উপর সে বেগেছে। হাঙ্গ তার এখনও পড়েনি।

বলে বলে মার কথা সে ভাবছে। বাণীর কথা তার মনে পড়ে না। সাগরে মা-ই ছিল তার আপন। মনে পড়ে বড় হবার কত কল্পনাই না মা তার মনের মধ্যে এনে বিত। মা তাকে আরই বলতো, পশ্চিম বিন মা খেয়ে খেয়ে কী করে বড় হবি বল তো?"

নীড় ভাঙা পাখীর ছুঁটা পালক তার চোখের সামনে দিয়ে পাচের কাছে এসে পড়ে গেল।

এবার তার গারে ঘোষ এসে লাগছে। তার পাটা জলে উঠছে। সে তখনও ভাবতে ভাবতে জ্বাক হয়ে তাকিয়ে আছে চলমান মিছিলটার বিকে। তিন সারির বিরাট মিছিল চলেছে ছোটো ছোটো ছেলেদের নিয়ে। তারা মাছুষ হাতে চার, বাঁচতে চার সবুজ পৃথিবীতে সোনালী স্বপ্ন নিয়ে। তাদের দাবী বাঁচার দাবী, মাছুষের অধিকার থেকে যেন তাদের বঞ্চিত করা না হয়। স্বাধীনতা থেকে না তারা, তারা থেকে না স্বাধীনতাকাল, শুধু তারা জানে জীবন আর ক্ষণের অর।

সূর্যের ঝাঁক তেঙটা যেন তার অঙ্গ হ'ল। ছায়ার বোঁধে ঘুরতে ঘুরতে মিছিলের কথা ভাবতে ভাবতে মিছিলের মধ্যে সে মিশে গেল নিজের অজান্তে—ঈশান কোণের বড় মেঘের মধ্যে ছোটো ছোটো ছেঁড়া মেঘেরা যেমন করে বীরে বীরে মিলিয়ে যায়।

রমা রোড ধরে তখন মিছিল ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। দুইে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। কাছেই কোথায় একটা বাজ পড়ল। পশ্চিম আকাশটা যেন রক্তাক্ত হয়ে উঠছে।

শিকড়

মনোজ মিত্র

কার্পিশের কাঠগোলাপের চারাটা ডালপালা ছড়িয়ে
বীতিমত ঝাঁকিয়ে বসেছে। পুঝোপুঝি জীর্ণ ছাতে মোটা
শক্ত শিকড় চালিয়ে এঁটে রয়েছে। চূর্ণস্বরূপের ভাঁড়ের
মধ্যে রসেরও সন্ধান পেয়েছে মিস্টারই। নইলে এমন
পতিপুঁই বাড়ন্ত চেহারা হোল কেনন ক'রে।

ফুলের চারার ফুল ফুটেছে। খোক খোক সাধা ফুল।
শকালের নরম বোধেরে এখন বরতো অনেক সন্ধ্যার আর
উজ্জল হয়ে উঠেছে সন্ধ্যাপাতার গন্ধ, সাধা ফুলের বোক।
বাধারে বরতো বকমক করছে কাশেম শেখের কাটা বাড়ীর
ছাত।

কাশেম শেখের গল্প-বল্লু চোখ দুটোর একটা
বিড়কাব ছায়া পড়ে। সর্বাংগ জালা করে তার ঐ বেহায়া
গাছটার ভরা বয়েসের উজ্জলতার। ওর রূপ রঙের
আলোর। নিম্নের ওপরও রাগ হয় কাশেমের। বছর-
খানেক আগে চূর্ণস্বরূপের ভাঁড়ের চারাটা যেদিন সবে
গন্ধিয়েছিল, কাশেম যদি একটা টানে ফুলে ফুলে দ্বিত
সেদিন, তবে আজ আর তার কাটা ছাতে এতগুলো ফাটল
তৈরী হোত না। এমন ঝাঁকবা হয়ে যেত না ওটা। আর
শেকড় চালিয়ে শক্ত ঘ'রে এঁটে বসে এমন বেইমানের মত
হাসতে পারত না গাছটা। সেদিন হেঁটে ফেলতে পারেনি
কাশেম। বট অর্থ নয়, একটা ফুলের চারা। ঘৈবাং
জন্মেছে। আহা, বাঁচুক ও।

ভাপসা গ্যাং বেঁটে ঘরে, ঝাঁকবা ছাতের তলে কাশেম
শেখ তার আলগে বিছানায় নড়েচড়ে শোয়। ঐ মমতাই
তার সর্বাংশ করছে। চোখে ছানি ধিয়েছে। তা নইলে
এতোকদিন লক্ষ্য কবেও আজ যে হঠাৎ চমকে উঠলো
কেন। কাঠগোলাপের একটা মোটা শিকড় ছাতের কাটলের
মধ্যে বিরে বরে চুকেছে আর ঠিক কাশেম শেখের
বিছানার উপরই শূঁজে জ্বলছে। কাল শক্তার রক্তের জল

চুঁয়ে চুঁয়ে বৃষ্টি শেকড় বেয়ে পড়েছিল। ডেভা-ডেভা মনে
হচ্ছে ওটা। একটা মরা সাপ।

আজই গাছটাকে কেটে ফেলবে কাশেম। শেকড়টাকে
আরো নীচে নামিয়ে বিছানার সংশ্ল কাশেমকে সঁপে
ফেলবার মতলব করেছে গাছটা। তার ফুলের রস
মিছড়ে ঐ গাছটা ফুল ফোটাবে। আলোর রোশনাই
ছোটাবে। না, না, আর সহ হয় না। ও রঙের রোশনাই
আর দেখতে পারে না কাশেম। এতদিন চূর্ণ করে
বাকলেও, আজ আর কলঝেঁড়া যন্ত্রণাকে উপেক্ষা
করবে না সে। আজ আর মরা সাপের মত ঠাণ্ডা
শেকড়ের স্পর্শহিম হয়ে যাবে না সে। সব আগাছা।
সব হেঁটে ফেলবে সে। হ্যাঁ, ফুলজানকেন্ড। তালোক
দেবে সে।

ফুলজান। ঠাণ্ডা বিছানাটা একটু একটু করে গরম
হচ্ছে। নামটাও কাশেমের পেঁচা। কতো অহং করে
নাম রেখেছিল কাশেম সাত বছরের ছুটছুটে মেয়েটার।
কাশেম শেখ তার সাত বছর বছরের বউএর যুব ধোঁবে
যুঝেছিল যে, ঝুঁড়ি একদিন ফুটেবে। পাপড়ি দেলবে।
অসুমান মিথ্যে হয়নি কাশেমের। পাপড়ি দেলেছে
ঝুঁড়িটা। আর বিশ বছরের জমাট বগদে পুঝোপুঝি
ফুটে ফুলজান হয়েছে ফুলবিবি। তাও কাশেমের নয়,
গহবের। গহব ডকে ফুলবিবি বলেই ডাকে।

তাই হোক। গহবকে নিয়েই মেতে থাক ফুলজান।
মিথ্যে মিথ্যে ফুলজানের স্বামী সেক্রে আর হাত পা গুটিয়ে
বসে থাকে কেন কাশেম। উপেক্ষার যন্ত্রণা পোহায় কেন
সে। আগাছা জড়িয়ে তার সাত কি। মাহুকের চোখ
টেপা যদি আর সেই সাত বছরের অসুখের মেয়েটার
বেইমানি আর সহ হয় না। নীরবে মনের আগুনে আর
পুড়তে পারে না সে।

নিশেষে সুলভানের সব বেগাবণি মাথা পেতে মেনে নিয়েছে কাশেম। কোনদিন এতটুকু শ্বাসন করতে পারেনি। ছুটো কট্টু কথা শোনাতে পারেনি। একবার নিষেধও করতে পারেনি সুলভানকে। শুধু বিছানায় গা এলিয়ে মনের আগুন পুড়েছে কাশেম। সময়ে সময়ে হঠাৎ ভেঙে উঠেছে বিছানা, রক্ত গরম হয়েছে কাশেমের, মাথায় খুন চেপেছে। কিন্তু পরক্ষণেই একটা জোলা মমতার ঠাণ্ডা স্পর্শে কিম্বিয়ে পড়েছে কাশেম। নিঃশব্দ হয়ে পড়েছে তার রক্ত। একটা নিবিড় আশ্রয়ে আচ্ছন্ন হয়েছে কাশেম শেষের সব উত্তাপ।

সাত বছরের ফুটফুট মেয়েটার ছুটো ভাগ্যের চোখ বদিয়ে দিয়েছে কাশেমকে। চোখ না, ছুটো মোটা টলটলে বলের চোপ।

অ—কাশেম, ও একরকমি বউ হবে বেবে কি দাশ্রয় হবে তোমার? ও না পারবে তোমার বেবেতে, না পারবে নিষেবে।

চোখ টিপে আর একজন বলছে, বউ নিয়ে হাতে গড়ে কাশেম। ঐ ফুঁড়ি ফুঁটলে তবে হবে সত্যিকার বিবি।

অ—কাশেম একফোঁটা মেরেঃ ভজ্ঞে এতদিনের কাবোরাটাও তুলে দিলে।

কোন উত্তর ধেরনি কাশেম। সাত বছরের টানা টানা ছুটো টলটলে চোখ। পদ্মশাপড়ির ওপর ফুঁকোটা জল। রাত্রিদিন মেয়েটা কাঁদে। ছুটো টলটলে চোখের তাহা গলে গলে ফড়ে। স্বর্দি গুয়ে যায়। আর তাইতো দিনে শতবার জুঁধা টানতে হোত কাশেমকে তার সুলভানের চোখে। কেউ বুঝবে না। এ কথা কেউ বুঝবে না।

কাশেম ভিন্ন সেদিন সুলভানকে মাথুর করার কেউ ছিল না। বাপ মা তাই বোন কেউ না। সাতবছরের অবুধ্য মেয়েকে ঘরে এনে সেদিন বড় কাঁপরে পড়েছিল কাশেম। এককণ্ড কাছ ছাড়া হ'লে ক্যাা বামে না মেয়েটার। পাশে থাকলে অবুধ্য আশ্বা। সে আশ্বা

পুরোতে অনেক নাতানাব্ব হ'তে হয়েছে কাশেমকে। নিষে হাতে মেয়েটাকে খাইয়েছে সে, আনা কাপড় পরিয়েছে। চোখের জল মুছেছে। বিশ বছরের উড়োমন কাশেম তার শ্বহের কোণে আটকে পড়েছে। বাবা পড়েছে ছুটো টলটলে কালো তারার খাঁচায়।

আজ কেউ বুঝবে না। বুঝতে চাইবে না কোন দিটে বাঁধা আছে কাশেম তার সুলভানের সংগ। কোথাও তার টান। সবাই বলবে, বেইমান বিবিকে শায়েস্তা বরো কাশেম। তালাক হাও।

পারে না কাশেম। ওরা জানে, সুলভান শুধু তার বিবি। আর কিছু নয়। কিন্তু কাশেম তো জানে কোথায় তাবের বাঁধন। সেই টলটলে কচি চোখ ছুটোর শক্ত বাঁধন কেমন ক'রে ছিঁড়ে আগবে কাশেম। তার বিবির শরতানি বুঝানো কাপা কাপা করে মিলেও, কেমন করে ভুলবে কাশেম সেই সাত বছরের অশ্রুয়ার চোখ ছুটো।

আর তাইতো কাশেম শেষের তালা রক্ত হিম হ'রে যায়। এক শিথ কক্রণায় পিছিয়ে পড়ে বে। তাইতো সে তার বিছানায় গা এলিয়ে শোনে কেউ বলছে, অ—কাশেম, শারাবীবন কোকিলছানা পুবে মরলে!

সুঃবাগ পেয়ে সুলভানও যেতে উঠেছে। কাশেম শেষের একটুখানি দুর্বলতা। জানতে পেরে নিভিত্ত হয়েছে সুলভান। শুয় ভেঙেছে গহবের। সবাই বেখেছে কাশেম শেষের বিশ বছরের সোমন্ত বউ সমবয়সী গহবের সংগে ভিন্ গায়ে বাজা গান শুনতে চলেছে যেটো পনের হাওয়ার আঁচল উড়িয়ে রাজির অন্ধকারে পা ক্লে। বুথ টিপে বেলেছে সবাই। গহবে যায় সুলভান দিনেমা বেখেতে, বেখায় গহর। মেলা থেকে ছুঁটি কিতেটা কিনে এনে গহর নিজের হাতেই সাঝার তার সুলভাবিকে। ঘরে বাইরে, সাবাকণই হংতামাশার মশজল হয়ে থাকে সুলভান তার গহবের সংগে।

মেলা বেখে সাত কাটিয়ে বিবে একছড়া বাসি দহনী-গন্ধার চটকানো মালা এগিয়ে দিয়েছে। সুলভান কাশেমের হাতে। বলছে, কাল সন্ধ্যায় মেলায় কিনে গহবের হাতে বিলাম তা সারা রাত ও ছুঃগাতে ডলেছে।

আর পারে না কাশেম। আর পারে না। হুটহুটে
মেরটার অসহ্য কান্নার আঁশ আর ভিড়তে পারে না
কাশেম। আর নিভেন হয়ে পড়ে থাকতে পারে না।

কাশেম শেষের হৃদয়-হৃদয় চোখে একটা দাবলো
দুগা চমকে ওঠে। ইয়া, হেঁটে কেঁপেবে সে। সব অগোছা
দুব কববে।

একটা বৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বিছানা ছেড়ে গাঁড়িতে যায়
কাশেম। পারে না। পর মুহুর্তে হারুণ চমকে হিমন্তক
হয়ে যায় কাশেম শেষের বক্তের আঁশ।

একটোপ জল। ছাঁতের কাঁটল ছুঁয়ে কাঁঠগোলাপের
শেকড়টার মাথায় জমেছিল। একটু একটু করে অনেকক্ষণ
হয়ে জমেছিল। এতক্ষণে টোপটা স্ববে পড়লো কাশেম
শেষের আগুন-লাগা নুকে।

বাইরে ঘরভেঁা বেহায়া গাছটা স্থলে স্থলে আলো
জলে বাসছে। কাঁটা ছাঁতের অন্তরে শেকড় চালিয়ে
নিচিতে গাঁড়িয়ে আছে বোঁইমান।

ধাক্ক। এক শান্ত হিম অবশেষে চোখ বোঁজার
কাশেম।



যকের ঘন

সত্যভূষণ সেন

[এক]

ইরাণে ডেল আবিষ্কার

‘হে বিদ্যেপী, আমার আজ্ঞায় তুমি ছুঃখাণ্য ব্রত উদ্‌যাপন
করেছ। তোমার অতীষ্ট বর প্রার্থনা কর।’

...ইরানের বাহসাব—সাহেনসাৰ, রাজচক্রবর্তী বলহুল
অন্তরীক্ষের অবিপত্তি। সাত্ৰাজ্যের সীমা সেই অহুরে
আবস্ত, যে বেশে চক্রে প্রথম উদ্ভিত হয়—সাত্ৰাজ্যের শেষ,
সমুদ্রের সেই পতীর তলদেশে, যেখানে প্রত্যহ চক্রে অন্তৰ্যিত
হয়।...

দ্বিতমুখে সাৰ বললেন—কী তোমার প্রার্থনা নির্ভরে
বল!

অষ্টেলিয়ান ইঞ্জিনিয়ার ডি' আৰ্কি (D' Arcy)
আজ প্রৌঢ়। কোন অহুরে কৈশরে ইতিহাসে পড়েছিলেন
—পুৰাকালে ইরাণে অগ্নিপূজক পরম্পরায় ধর্ম প্রচলিত
ছিল। পবিত্র বর্ষগ্রহ আবস্ত্যের লিখিত আছে—সত্যতার
প্রথম উদয় ইরানের পুরোহিতগণ, অগ্নিবেশতা পরমুজ্জ
Ormuzad) এর বেষ্টিতে বেষ্মনস্তে বজ্রাণি প্রজলিত
করেছিলেন। সেই পুত অগ্নিশিখা শতাব্দীর পর শতাব্দী
অনির্বাণ স্তম্ভ আলোকে স্তম্ভের সর্বপ্রকার লক্ষ্য হইল
করেছে।

ডি' আৰ্কির একান্ত বাসনা ছিল ইতিহাসের বহনিকা
উন্মোলন করে, অগ্নিবেশতার সমুখে ধোমরুত পুরোহিত
কুলের কীৰ্তি নিরীক্ষণ করবেন, বজ্রবোঁটার অবস্থান নির্ণয়
করবেন। যে উজ্জল অগ্নিস্তম্ভ সুদৃশি আক্রমণের বজ্রায়
শেষবারের মত নির্ধাণিত হয়েছে—সেই হত্যামের বহন
আবিষ্কার করবেন।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম যৌবনে ইরাণে এসেছিলেন।
তখন দিগ্বাণনে শাহ নাসিরুদ্দিন, গোঁড়া পাত্ৰাত্য বিবেচী
লাহির অগতের সঙ্গে পবিত্র ইরানের কোন যোগদ্বয় ছিল
না। স্থাপিত বিদেশীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল বাহসাবের

সাত্ৰাজ্যে। তবু সত্রাট এই বিদেশীকে বহিষ লক্ষ্য
অহুমতি বিরুদ্ধিলেন।

ইরানের অগ্নিবর্ষী অহুরে উত্তাপে ডি' আৰ্কি আর
অগ্নিবেশতার হাবিরে পরিণত হয়েছেন। শুধু অটুট আছে
জীবনের স্বপ্ন, হান হয়নি ভগবৎ বিশ্বাস। এই সত্যবাহীন
বিদেশীর ঈশ্বরে বিশ্বাস শিক্তর মতই পরিপূর্ণ, সম্ভবহীন।
ঔরুর নীচে, আধো আধারে, ম্যাপ এই ও যন্ত্রাশির এক
পাশে, সোমার একটি ক্ষুদ্র বিজ্ঞপ্তি। প্রত্যহ নতমাহ
হয়ে, পবিত্র সূত্রের সমুখে প্রার্থনা করেন...ভগবান। বল
হেও, শক্তি হেও প্রহু! জীবনের লক্ষ্য থেকে বেন বিচ্যুত
হই। কল্পনাকে বেন বাস্তবের রূপ দিয়ে জীবন্ত করে
ভুলতে পারি।

এই ক্যালকিক ইঞ্জিনিয়ার অতীতের অগ্নি মন্দিরের
কল্যাণশেষ অহুমতান করতে করতে সদয় ইরাণ পদত্রে
ব্রণ করেছেন। ঔরুর সূচ বিশ্বাস জুনিয় ডেলের বনি
আছে। নইলে শত শত সূত্র উজ্জ বেষ্ট অনির্বাণ অগ্নিশিখা
—সত্যবাহীর পর সত্যবাহী কি করে জলতে পারে?

অগ্নি বেবতার পরম অহুমতান করে হস্তর পর্বত
অভিক্রম করেছেন। চলার পথে কৃষক পরীক্ষা করেছেন, অতীপ
করেছেন। কখনো দিগন্ত হস্তায় স্তম্ভিত তাঁর হিত্ত
হয়েছে—কখনো নিশার তক্তর আক্রমণ করেছে। ক্যাল
বেশ পরিত্যাগ করে জুন্মিতে শব্দ্য রচনা করতে হয়েছে...
কীট পতঙ্গের চেয়ে বম্বকের স্তম্ভিক তর বেষ্ট। মাটিতে
কান পেতে নিভার আবাধনা করেছেন—সম্ভবজনক মর্দর
কানিতে নিঃশেষ শব্দ্য ভাগ্য করে, সুহৃৎ অগ্নি নিয়ে
বিশ্বের প্রতীক্ষা করেছেন।...

সাধারণ ইরানীকর হত অদ্যাবিত পরিজ্ঞক, যুবনগল
অজ্ঞতঃ অজ্ঞক, বেষ্মণ বৌদ্ধতত্ত্ব তাত্ত্বাত। অনর্গল

ভাণী বলতে পাবে, আঘবী ভাষাতেও লুপ্তিত। হঠাৎ যেখানে একজন খাঁটি ইংলিশ পরিচয়ক বল চুল হয়।

সম্মুখে দীর্ঘ পথ। কখনো চৌহা, কখনো কুটি...কতো কোলাহলধন দিন...কতো নিস্তব্ধ রাত্রি। প্রকৃতির কতো বিভিন্ন দীপার মাক ফিরে বেবত্যা আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছেন। দক্ষিণ ইরানের জনপথ পিছনে পড়ে রওয়েল... মধ্য ইরানের গোলাপন, জাকার ফুল তাঁকে বাধতে পারে নি...উত্তর ইরানের আদি অজহীম কৃষ্ণ অরণ্যের লগনের মল্লভূমি পথিকের পতি বোধ করতে পারে নি। কঠিন হয়েছিল চোখে ধাঁধা পেয়েছে, বেধ অবসর হয়েছে। ভাষার এগেছে ছোট একটি মন্ত্রস্তান, স্মরণ একটি মলমল। কতো মন্দিরের স্তম্ভাবলয়, কতো বেলীর চিহ্ন, কতো পথিক বলাবল্যের অবস্থানে পরীক্ষা করেছেন।...কিন্তু সেই কালো লম্বা শামজীটির সন্ধান পান নি।

ইতিমধ্যে সাহের নির্দেশে ছোট একটি বেলপথ, একটি ধ্বংসপূর্ণ হেলপথ...ইরানের মালভূমির উপরে প্রথম হেলপথ...নির্মাণ করেছেন। চুই হয়ে সাহ প্রস্থ করলেন—কী আকাজক্ষা তোমার বিবেচনা? ডি আকি পোনাংনা চাইলেন না, আঙ্গীংবের কথা মনেও এল না। চেয়ে বসলেন 'তেল'। যে তেল কখনো আবিষ্কার হয়নি, যে তেল ইরানে আছে কিনা শেখবে—সেই তেলই চেয়ে বসলেন এই তৈলোদ্ভাব ইকিনিয়ার। সাহ কাধান দিলেন,—এই রকম তার ভাষা:.....

“প্রথম পরাক্রান্ত অষ্টেলিয়ান গভর্নরেন্ট ও ইরানের বাহাদুরের মধ্যে বসিষ্ঠ বন্ধুত্বের নিবন্ধন-বন্ধন, বাহাদুর সাহেনসাধ মুখ্যকরত্বাঙ্গিন সাহ—ইকিনিয়ার উইলিয়াম নক্স ডি’ আকিকে এই অবিকার বিভেদেছেন যে, ছোট বৎসর পর্যন্ত উক্ত ডি’ অকি বা তাঁহার বংশধর বা স্থানভিত্তিক ব্যক্তি কিবা বন্ধুত্ব...স্বাধীনভাবে ইরান সাম্রাজ্যের সর্বত্র, ধর্মজ্ঞা, যে কোন স্থানে, বসিষ্ঠবোধের অমূল্যমান করিতে পারিবে, কুণ্ডল বনন করিতে পারিবে, কৃপ নিমজ্জিত করিতে পারিবে। জু-নিয়ের সর্বপ্রকার সম্পদে তাঁহার, কিবা তাঁহার অর্ন্তমানে উত্তরাধিকারী বা স্থানভিত্তিক ব্যক্তির সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে...

সংগ্রহ ইরান দেশের ছত্র তাগের পাঁচ ভাগ—প্রায় পাঁচ

লক্ষ বর্ণনাইল পরিমিত স্থান এই কার্যানের অন্তর্গত উত্তরে কাম্পিয়ান দাপতের ভীষণতরী ক্রম অতিক্রান্ত করেকটি প্রদেশের বসিষ্ঠ সম্পদ এই দানপত্রের বাহিরে।

এই কার্যনিবাহী সূচি ও মোহরাক্ষিত হতে না হতেই আবিষ্কৃত হল দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের চূর্ণম অঞ্চলে। এই আবিষ্কারই ছিল ডি’ আকির বৌবনের স্বপ্ন, বাধ্যকায় সাধনা...ডি’ আকি বৈজ্ঞানিক, তিনি সাধক। এতদিন স্বপ্ন মল্লম হয়েছিল, সাধনার দিক্‌লাভ করেছেন।...আজ তিনি চম্বী। মল্লম মেনেছে ডি’ আকি উদ্বাহনন—ব্রহ্মশী ইকিনিয়ার... সাহের দানে যে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছেন—সেই পাবিব সম্পদের প্রতি কোন সোত ছিল না ডি’ আকির।

যেহে ফিরে বাওরার সত্ত্ব করলেন। সাহের সঙ্গে অনেককণ আপাণ আলোচনা হল। বিস্তৃত বর্ধাসোচনা—কোন বর্ধ প্রেষ্ঠ—বুঠ বর্ধ না ইলদাং—এই নিয়ে পবেবধা। তেলের বসির বিবরণ নিয়ে কোন কথাই হল না। কয়েকজন মিননারি নিয়ে ইরানে ফিরে আসবেন সেইরকম আভাষ দিলেন।... বর্ধা অয়েল কোম্পানিকে নবাধিকৃত বসির ইকারা দিলেন। কথা বইল, তেল যা উঠবে বর্ধা অয়েল কোম্পানী কিনে নেবে—সাহ রহস্যটি পাবেন সত্ত্বকরা বোলোভাণ। ডি’ আকির নিষেধ কিছু গুণ হয়েছিল তা শেষ হবে তেলের দান থেকে।

তেলের গন্ধে বিলাতের কোটিপতিরা ছুটে এসেন...

লগনের শেখার-মার্কেটের জুয়াড়ী নানা লোভনীর প্রভাব নিয়ে উপস্থিত হলেন...বিভিন্ন তেল সম্পদের একেটরা ডি’ আকিকে ছেঁকে মেল। অভাবের দিনে এইসব লোকদের হাড়ে হাড়ে চিনেছেন, পাবিব সম্পদে আক যে বিতৃষ্ণা এগেছে সেও এই বনীকুলের অন্তরেই দীনতার পটীর পেয়ে।...সকলকেই নিরাশ হতে হল, কেউই জানতে পারল না কখনো কি আছে।

এই সব নাছোড়বান্দা দাপলদের লালসা, কৌতুহল ও কুটিলতার অস্থির হয়ে, অবশেষে একদিন সম্মুখে যে বাহাদুর বেললেন তাতেই চড়ে বসলেন। বাহাদুরানি ইউরোপের পথে আমেরিকা চলেছিল। ডি’ আকি বাহেন যখন—আষ্টেলিয়ান। তা, বরং আমেরিকা থেকে অন্ত বাহাদুর

ধরবেন। এই মুহূর্তে এই ভাষ্যাধেবীহের কবল থেকে মুক্তিই সর্বপ্রধান লক্ষ্য। তাই এই জাহাজেই উঠলেন 'ডি' আকী।

জাহাজেও লক্ষ্যকেই সম্বোধের চোখে রেখেন। কান্ডও সবে মেলেন না। শুধু নিজেদের ক্ষুদ্র জীট মূর্তিটির সম্মুখে প্রার্থনা করেন—আর মিশনারিহের বই ও প্রচার-পত্রে ডুব থাকেন। সেই জাহাজে প্যাগোজাহারের মাঝে একজন মিশনারি ছিলেন—অতিশয় ধর্মপ্রাণ ও বলভাবী। তিনিও অস্ত্রাস্ত্রের সাহচর্য বর্জন করে, প্রার্থনা ও ধর্মকর্মে নিমগ্ন থাকতেন। এই শাখু একুতিব মিশনারিটির সঙ্গে 'ডি' আকীর পরিচয় হল, এবং সেই পরিচয় ক্রমশ বন্ধন পরিণত হল।

মিশনারি ভক্তলোক অস্বকার আফ্রিকার অপভ্রাতের মাঝে খুঁটদর্ম প্রচার করেন।—তিনি আফ্রিকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন—'ডি' আকী ইহাণের চুর্ছর্ষ উপভাতীর হস্তার গল্প বলেন। ইহাণে খুঁটদর্ম প্রচারের কথা নিয়ে দুই বক্তৃতে পরামর্শ হয়।

জাহাজ নিউইয়র্ক বন্দরে পৌঁছবার দুবিন আগে

ইঞ্জিনিয়ার জীবনের সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করলেন—বন্ধুর কাছে কিছুই গোপন করলেন না না। মিশনারি অবস্ত্র এই তেলের কাহিনীতে তখন বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। কিন্তু পরদিন তাঁর মাঝার একট: চমৎকার আইডিয়া এল। —সাহেবের কর্মানখানি তো জীটদর্ম প্রচারের কাজে ব্যবহার করা যায়। চার্চকে স্থান করে দিলেই হয়ে যায় ॥

ক্রীষ্টান মিশনারিহের ইহাণে প্রবেশ নিবেধ। কিন্তু কার্ধানে আছে—'ডি' আকীর উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি বা বন্ধু, ইহাণের যে কোন স্থানে প্রবেশ করতে পারেন। কর্মানের জেবের মিশনারিহের সেই সেশে প্রবেশের অনিকার জন্মাবে—সাহ বাধা দিতে পারবেন না। হাকীম নড়তে পারে হুকুম নড়বে-কি করে ?

সকল সমস্তার এমন সহধ সমাধান। জাহাজ বন্দরে ভিড়বার আগেই চার্চের প্রতিনিধি ও প্রতীক এই মিশনারী বন্ধুকে কর্মানখানা স্থান করে 'ডি' আকী মূর্তির নিঃশাল ফেললেন। পৃথিবীর বাবতীর ভাষ্যাধেবী জাহাজীরা এইবার সম্পূর্ণ পরাক্রান্ত হল ॥





(পূর্বাভাস)

॥ ৫৭ ॥

কানপুরে ইংরাজ নিৰ্মল হইয়াছে, তাহাদের শক্তি তাহাদের প্রতাপ এখন বিপন্ন দিনের জনশ্রুতিতে পূর্ণ-বসিত—পেশোয়া এখানে একেধর—তবু নানাদাহের মনে সুখ নাই। সত্য বটে এদিকে নীল ও হাতেলকের আমোদ অঙ্গশক্তির সংঘর্ষ প্রত্যাহই স্তুতিভেদন, তাহাদের নিষ্ঠুর বৈয়নিনীতিতমের, নির্ধম প্রতিবিশ্বাসের বীতংস বিবরণ লোকের মুখে মুখে পল্লবিত হইয়াই তাঁহার কাদে আনিতেছে—ভেমনি ওরিকে লক্ষ্যের ইংরাজ শক্তিও পতনোদ্ব, এখনও ত তিনি পাইতেছেন নিরাসিত ভাবেই, সেখানে এখনও তাহারা নামেবাত্র টিকিয়া আছে কিন্তু শীঘ্রই তাহাদের অবস্থাও যে কানপুরের ইংরেজদের মতই হইবে—ইহা ত একদ্রপ সন্নিহিত।

আর লক্ষ্যের পতন হইলেই এখিকার ইংরাজ প্রতি-রোধ একেবারে শেষ হইয়া যাইবে—তখন কি সন্নিহিত বিন্দুহীন শক্তির নামনে নীল শাঙ্কই দাঁড়াইতে পারিবে ?

মোটের উপর সবটা জড়াইয়া নানাদাহের উল্লসিত হইয়াই কথা—অন্ততঃ ভয় পাইবার কথা নয়।

তবে ? তবে তাঁহার লগটে পরাসর্ব্বা এমন চিত্তার জুড়িট বনাইয়া থাকে কেন ? সর্ব্বথাই তাঁহার আচরণে এমন একটা অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও অন্তমনস্কতা প্রকাশ পায় কেন ?

ভয় ? ভয় ত বটেই। কিন্তু ভয় কাহাকে ? সে কি ইংরাজ শক্তিকেই ?

প্রশ্নটার বর্ষা উত্তর দেওয়া হয় ত নানাদাহের পক্ষেও সম্ভব নয়। তবে একটা ভয়—নামহীন, আকাবহীন, অকাংক্ষণ আতঙ্ক যে তিনি অহুভব করিতেছেন এটা অস্বীকার করারও উপায় নাই। তিনি অন্তরে অন্তরে চারিদিকের এই বিপর্য্যোম্মতের মধ্যেও কেমন করিয়া অহুভব করিতেছেন যে তিনি এহার ভীমবেগে তাঁহার জীবনের অবস্ত্রাসী পরিণতির বিকেই আগাইয়া যাইতেছেন। পরিণতিও বটে—নিশ্চিতও বটে। শীঘ্রই তাঁহাকে ভাগ্যের সহিত চরম যোগাপড়া একটা করিতে হইবে—আর সেদিক তিনি প্রস্তুত নন।

আসলে একটু একটু করিয়া তাঁহার মানসজ্ঞের সামনে হইতে ঘোরের পর্দাটা দখির দিয়াছে, কেমন করিয়া তিনি এই সিপাহী অভ্যুত্থানের সত্য চিত্রটা দেখিতে শুরু করিয়াছেন। একটু একটু করিয়া তিনি যেন তাঁহার অহুগামী ও সহবর্ম্মাৎমও চিনিতে আরম্ভ করিয়াছেন—আর তাহাতেই যেন এতখানি হতাশা তাঁহার।

এখানে একটা দৃষ্ট আশ্রয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাসা সাধেব ও সেনাপতির হল ঘর সবুজ সন্নিহিত। কিন্তু দুইয়ের ইংরাজকে অবরোধ করিতে গিয়াই যে রুতিহ সিপাহীরা বেখাইয়াছে তাহাতে নানা আর অসুখী ভয়না পান না। তাত্য্য পরামর্শ দিতেছেন রাশিয়াতে যাইতে—সেখানে এখনও পেশোয়া নামের ঝাড় সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় নাই, এখনও নানাদাহের গিয়া উপস্থিত হইলে হাওয়ার হাওয়ার মারাতী তাঁহার পতাকাভঙ্গে সমবেত হইবে—অর্ধেরও অস্তাব হইবে না। কিন্তু নানা জানেন যে হাওয়ার

হাজার বছরের বা গুরু যেমন ছুটিয়া আসিবে, পোশোরা
বংশের পুণ্যতন শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীরাও বসিয়া থাকিবে
না। পূর্ব বৈধাতা তাহাদের জুলিয়া বাইবার মত কোন
কারণ খেতে নাই।

কেহ কেহ পরামর্শ দিতেছেন, এখানকার সিপাহীদল
লইয়া সোঝা হিন্না রওনা হইতে—কারণ একতাই শক্তি।
তাহাতেও পোশোরা খুব ভীতি নহে। এই ক'দিনে স্বাধীনতার
স্বপ্ন কিছুটা পাইয়াছেন; আবার সেখানে গিয়া সেই স্বপ্ন
ও হতবুদ্ধি বাহাদুর শাহ উদ্ভূত পুত্র এবং নির্বোধ
চিকিৎসকের আবেশমত চলিতে তিনি পারিবেন না।
তাহাজ্ঞা একটা কথা আজি যুগ্মা ঠিকই বসিতেছেন, 'হিন্না
পর্বত ইংরেজ নৈরাজ্যের গতি অব্যাহত ও অব্যবহিত বর্ধিবার
সুযোগ কেওরা ঠিক নয়। জনসাধারণের মনোবল তাহাতে
একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। যে অভ্যাচার এখন
ইংরেজরা করিতেছে, সে অভ্যাচারের সুযোগ আর খেদী
হিলে সারা উত্তর ভারত আতঙ্কগ্রস্ত ও পলায়িত হইয়া
পড়িবে। তাহাজ্ঞা এখানকার স্থানীয় সহায়তা হইতেও
কচিত হইবেন তাঁহার।

স্বর্গ্যে নানাসাহেব শুধু পথিমা চিত্তান্তেই অবগত নন
—আত্ম কর্তব্য সম্বন্ধেও তাঁহার বিদ্যা ও অন্তর্দৃষ্টির
শেষ নাই।

আমিনা এ সব সবাই পাইতেছিল, খবর খেটোর পাওয়া
যায় না—মনের কথাটার—দেটা সে অনুমান করিয়া লইতে-
ছিল। নানাসাহেবকে সে ভাল করিয়াই চেনে। তিনি
খুব নির্বোধ নন। আর তা নন বলিয়াই তাঁহার মনে যে
বিপুল তোলপাড় চলিতেছে তাহা দূরে থাকিয়াও আমিনা
বুঝিতে পারে।

সেহিমেব পর হইতে আমিনা আর তাঁর নিকট যায়
নাই; নানাসাহেবও তাহাকে ডাকেন নাই। কেমন
করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে নিষেধ এই আকাংক্ষীন
আতঙ্কের কথাটা আমিনার সামনে কিছুতেই ছাপা থাকিবে
না, আর তাহা হইলেই বড় লজ্জার পড়িতে হইবে।
আমিনাই যে তাঁহাকে বেশী করিয়া এই স্বপ্ননাশ কাণ্ডে
জড়াইয়া কেলিয়াছে—যোগ করি সে কথাটাও তাঁহার মনে
ছিল। আমিনা তাহা বুদ্ধি, তাই সেও শায়ে পড়িয়া

তাঁহার কাছে যাইতে চেষ্টা করে নাই। খুব হইতে সব-
কিছু লক্ষ্য করিত। নানাসাহেবের নিকট এখন সাধারণ
মন মন আশা-বাঞ্ছা করে তাহাও কথাবার্তার টুকরা
হইতেও অনেক খবর সংগ্রহ করিত।

ইহারই মধ্যে একদিন শুনিল, এখানকার চাটিবাটি
গুটা ইয়া নানাসাহেব বিটুর বাইতেছেন। কাপলপত্র সব
গোছগাছ করা হইতেছে, ইতিমধ্যে নাকি কিছু কিছু
পুড়াইয়া ফেলাও হইয়া গিয়াছে—স্বাধীন জিনিসপত্র
বাগছাঁদা গুলু হইয়াছে।

আমিনা বুঝিল আর নষ্ট কথিবার সময় নাই। সে সেই
দিনই অপরাহ্নে যথাসম্ভব পোশোরা যাত্রা করিবার
অবকাশে একেবারে তাঁহার শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত
হইল।

যারে বন্দী ছিল অস্ত্রই—কিন্তু সে মানিত যে বিশ্রাম-
কক্ষে আর সাধারণই বাতরার বাধা থাক, বিশ্রামজিনীর
পক্ষে বাক্য উচিত নয়, সে বিনা ওষুধে পথ ছাড়িয়া দিল।
আমিনা ভিতরে ঢুকিয়া সন্তর্পণে ঘরখা বন্ধ করিল, তাহার
পর হতবুদ্ধি সন্তব নিঃশব্দে কাছে গিয়া তাঁহার পায়ে একটা
হাত রাখিল।

‘কৈ!’ নানাসাহেব চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন।

‘ভয় নেই। আপনার বন্দী হুসেনী।

‘ও হুসেনী, বোন, বোন।’

হুসেন বোঁটা আর একটু কনিত নানাসাহেব ভাল
করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। বলা বাহুল্য এখানে আশার
আশে আমিনা প্রকৃত নিপুণতার সহিত প্রণাম করিয়া
আসিয়াছে। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, হস্ত বা কল্পন
পূর্বের রতন-রত্নীর স্বাভাবিক মনে পড়ায়, নানা প্রশ্ন হইয়া
উঠিলেন।

‘এলে ভালই করেছে। বোন।’

সঙ্গেই হাত বরিয়া তাহাকে পাশে বসাইলেন।

‘তোমার কথাই ভাবছিলাম। তুমি যে আমাকে ত্যাগ
করলে একেবারে।’

‘কৈ, আমাকে স্বপ্ন করেন নি। ক'রলেই আসতুম।
আমি আপনার ভালবের বাদী পোশোরা।’

‘না—হ্যাঁ, মানে ব্যস্ত ছিলাম। অনেক বকমের
চিন্তা মাথায়।’

পেশোয়া অপ্রতিত হইয়া পড়েন।

‘অমিত ঠিক দেই মস্তাই আপনাকে বিরক্ত করিনি।

কিন্তু সে কথা থাক—আপনি নাকি কিছুতে চলে যাচ্ছেন?’

‘হ্যাঁ—তাই স্থির করেছি। ও, তোমাকে বুঝি কেউ বলেনি তৈরী হয়ে নিতে?’

আমিনা সে প্রশ্নের দ্বার দিখাও পেল না। স্থির অপলক নেত্র পেশোয়ার চোখে উপর দৃষ্ট করিয়া কহিল, ‘এটা কি আপনার পলায়নের ভূমিকা পেশোয়া?’

নানাসাহেব গভীর হইয়া উঠিলেন—কিন্তু আমিনার হাতটা ছাড়িলেন না। বরং সেই রুদ্ধ কোমল হাতে একটু চাপ দিয়া কহিলেন, ‘না হুসেনী, পলায়নের ভূমিকা নয়। তোমার কাছে গোপন করব না। ওখানের পলটা খোলা রাখতে চাইছি মাত্র। অন্তঃপুরে একটা ব্যবস্থা করতে হবে, টাকাকড়ি কিছু সংগ্রহ করাও—সবই শুধু এলাখেলো হয়ে রয়েছে। এখানে নিঃশব্দই একবার শব্দ হুঁচকুনি ঠাড়াতে হবে, সেটা ত বৃক্ষেই পারব, আর—বৃদ্ধ হারজিত আছেই।’

‘কিন্তু একবারের দ্বার বা একবারের ঘিটোকেই কি আপনি চমক বলে মনে করবেন?’

‘তা নয় হুসেনী। কিন্তু বৃদ্ধ নেমে পড়লে আর ত স্বাধীনতা থাকবে না। তখন ভাগ্যের হাতে খেলার পুতুল হয়ে পড়ব। ভাগ্য-তাক্তিত হয়ে কোথার যেতে হবে—এগোতে বা পেছোতে হবে তার ঠিক কি? সব রকম অবস্থার মস্তাই প্রস্তুত থাকা উচিত নয় কি? অন্তত বইটা সামলে যাওয়া বরকার।’

আমিনা কিছুকণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর কহিল, ‘তাৎসল আশাধের কথা কি চিন্তা করছেন?’

নানাসাহেব বেন চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, ‘তুমি কিছুতে বাবে না?’

‘কিছুতে গিয়ে কি করব বলুন? আপনি যদি ভাগ্য-তাক্তিত হয়ে শিখিয়েই যান, তখন কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছেন? আপনার মহিবীরের কোন ভয় নেই, এমন কি আপনার প্রেমসী আলারাতও না। তারা শুধু বন্দীই হবে, এই মাত্র। তাছাড়া শেষ মুহূর্তে হস্তে আপনি

মহিবীরের দাবাব ব্যবস্থা একটা করতে পারবেন কিন্তু আমাদের গিয়ে বিস্তৃত হস্তে নিশ্চয়ই চাইবেন না। তখন? আমাদের হাতে পেল ইংরেজরা কি করবে ভেবে দেখেছেন? আমি যে তাদের কী সাংঘাতিক শত্রু, তা তারা একদিন ভাল করেই মেনেছে অন্যথ।’

এবার নানাসাহেবের চুপ করিয়া থাকিবার পালা। একটু পরে কহিলেন, ‘তাই’লে তুমি কি করতে চাও?’

‘এতদিন বা কংলুম তা-ই। আপনার শত্রুরের সঙ্গে অবিশ্রাম বৈবিত্য। আমাদের হেঁড়ে মিন পেশোয়া, আমার ব্যবস্থা আমি ঠিকই ক’রে নিতে পারব। তাছাড়া আপনার সঙ্গে থাকলে আপনার বোঝা-মোজ হয়ে থাকবে—বাইরে থাকলে আপনার সহায়। আমি সর্বতোভাবে আপনাকে সাহায্য করতেই প্রস্তুত—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ইংরেজ আমাদের ছাত-বৈরী। ঠিক আমার মত বিবেক আপনারও নেই তারের ওপর—একথা নিশ্চিত জানবেন।’

‘হ্যাঁ—তা আমি জানি হুসেনী। তাত্যা টোপী, আশিফুল্লা এদের কথা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু তুমি বা মৌলভীসাহেব—তোমরা নিঃস্বার্থভাবেই ইংরেজের সঙ্গে চাও, সেটা আমি জানি। সে সঙ্গে আমার উদ্ভিত—সেটা তোমাদের কাছে পঠোক্ষ।...আর একটি ছোকরার কথা শুনেছি—মহম্মদ আলি কী—সেও এমন শত্রু ইংরেজের। লক্ষ্যেতে সে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করছে সিপাহীসৈন্যের ক্ষম। সে নাকি এক পরমাণু চায় না, নিজেই শরীরের বিকে তাকার না। অতুত মিঠা তার। এটিকে লেখাপড়া জানা লোক—পাশকরা ইঞ্জিনিয়ার, তাকে যদি আমার পাশে পেতুম!...আশিফুল্লা তাকে চেনে, তাকে এখানে আনবার চেষ্টাও করেছিল—কিন্তু কে জানে কেন—সে রাণী হারনি।’

আমিনার মুখ অকস্মৎ রক্তবর্ণ ধারণ করিল—কিন্তু বসুন্ধরের পর্বা ফেলা প্রায়াক্রমিক হয়ে বসিয়া নানাসাহেব তাহা টেব পাইলেন না। এমন কি তারার স্মৃতির মধ্যে উহার ছাতখানা যে করেক মুহূর্তের মধ্যেই যাবে ভাসির গেল তাহাও লক্ষ্য করিলেন না।

আমিনাই হাতটা টানিয়া লইয়া অপর হাতের কনামে

সুস্থিয়া লইল। তাপের কহিল, 'কিন্তু যেখানেই যোক—
আপনারই কাছ হুঙ্ক ত ?'

'তা বটে।' একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নানা
কহিলেন, 'তবু নিঃশ্বাস শোকের এতই অভাব—নিঃশ্বাস
পাশে এমন একটা লোক থাকলে বুকের বল বাড়ি।
...সুখিও থাকত না—বড় অপব্যয় বোধ করত। চারি-
বিকেই খাওঁতে চক্রান্ত, সন্তা-সন্তা আমার মঙ্গল চিন্তা
করে এমন লোক কৈ ?'

'যেখানেই থাকি—সামান্য আপনার মঙ্গল চিন্তাই
করত ঘনাই !'

নানাগাহেব হঠাৎ যেন নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন,
পুনশ্চ আমিনার হাতখানা নিজে হাতের মধ্যে টানিয়া
লইয়া কহিলেন, 'কিন্তু আর যদি যেথা না হয় ? দুজনে
যদি দুমিকে গিয়ে পড়ি ? কিংবা যদি—'

কথাটা শেব করিতে পারিলেন না।

আমিনা অসব্য প্রস্তাব লবাবে কহিল, 'যেখানেই
থাকি আপনার মঙ্গল চিন্তাই করত। আর দুজুর
কথা ? আমি গেলে আপনার অসব্য সেবিকার একজন
হবে শত্রু—সে অভাব আপনি টেবৎ পাবেন না। আর
যোবা না করুন—যদি আপনিই যান, বেছে যতদিন
একবিধু বস্ত্রও থাকবে আপনার শত্রুর ক্ষতি ক'রে
যাব—এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।'

নানাগাহেব সবেহে আবারও তাহার হাতে একটা
চাপ দিলেন।

'কিন্তু পেশোয়া ? কথা ত অনেক হ'ল—যদি প্রস্তুতই
হচ্ছেন—আমাকেও তাহলে একটা ব্যবস্থা করে দিন।
আমাকেও প্রস্তুত হতে হয়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—নিশ্চয়। তোমার কি করতে চাও বলে।
টাকা-কড়ি কী ব্যবহার—অবশ্য বেশী কি দিতে পারব
বুঝি না, এরিকোও ত বরত হচ্ছে জলের মত। তবু যা
ব্যবহার বলে। আরও যদি কিছু ব্যবস্থা ক'রে নিতে
চাও—'

'টাকা-কড়ি যা পাবেন যেন পেশোয়া, টাকা ত চাই-ই।
আমার নিজের তবিত্ততের দ্বারা নহ, আপনার দেহের
হান বে সব অলঙ্কার আছে তাতে একটা বীড়ীও দাঁবন

কোন দূর গাঁয়ে বাপ করলে অন্যত্রালে কেটে যাবে—
কিন্তু কাছ করতে গেলে টাকা চাই বৈকি !...আর তার
চেয়েও বেশী চাই, আপনার একটা পরোয়ানা।'

'পরোয়ানা ? কিসের পরোয়ানা ?'

'এখানে থেকে যদি আনাকে কাছ করতে হয়—অনেক
সময়ই আপনার সেনা বা সেনাপতিদের সাহায্য নিতে
হবে। তখন যাতে তারা আমার কথা শোনে—তারাই
একটা ক্ষমতাপত্র চাই। মানে যা করছি আপনারই
কাছ এবং আপনারই অনুমোদন-সাপক্ষে করছি—এমন
একটা পরোয়ানা লিখে দিন।...এখন আপনি আছেন
আমার কোন ভয় নেই, হাঙ্গশক্তি রয়েছে লগে—কিন্তু
আপনি না থাকলে আমার শক্তি কতটুকু বহুন—আমার
পথিতরই বা কি ? প্রভু পরিত্যক্তা সামান্য বীড়ী বই ত
নয় !'

'হি ছি—ওকথা বলছ কেন ! আমি এমন পরোয়ানা
নাই লিখে দেব যে আমার মতটুকু শক্তি—যদি কোন
শক্তি থাকে আর তা যদি হাঙ্গশক্তি হয়—সম্পূর্ণই তোমার
লগে থাকবে ! তুমি বৎ মঙ্গলকরকে ডেকে এখনই
আমার মোহর, কাগজ আর কলমখান আনিতে বলা—
'ও কাছ সেয়েই হিই। এরপর হয়ত আর অবদর
থাকবে না।'

'আপনি কি আজই চলে যেতে চাইছেন ?'

'অন্তত কাল প্রচ্যুবে যেতে চাই।'

নিমেষকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া আমিনা কহিল, 'এখানকার
বন্দীহের কী করবেন ?'

'প্রাণাধের বন্দীদের ত বিধূরে পাঠাবার হুকুম দিয়েছি।
এখন সমস্তা বিবিধর নিয়ে—'

কণ্ঠে যতদূর সম্ভব নিরাসক্তি টানিয়া আমিনা
কহিল, 'কেন, ওদের কী করতে চান ?'

'তাড়াতাড়ি বলছে অবিলম্বে ওদের ছেড়ে দিতে। ও
যোবা বেছে শুধু শুধু বরত, তাছাড়া অকারণ আরও
বিষয় বাড়ানো। কিন্তু আভিযুক্তা বলছে যে ওরাই
আমাদের বরৎ হাতের পাঁচ। যদি কখনও দুদিন আগে
তখন ওদের বিনিময়ে আমরা শত্রুপক্ষের কাছ থেকে

অনেক সুবিধা আহার করতে পারব! তাই ভাবছি যে ওদেরও কিছুতে পাঠিয়ে দেব কি না।'

'আজিহুয়াই বুঝিমানের মত কথা বলেছেন জনাব। তবে মিথি মিথি এখনই ওদের কিছুতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বাড়িয়ে লাভ কি—আমি ত রইলুমই—যদি তেমন বুলি ত ওদের কিছুতে পরিচয় দেব, চাই কি এখনও হতে পারে যে আশুত সুখে নিরাপদ কোন স্থানে পাঠাতে হবে। একবার বুদ্ধ হলোই যে ওদের ব্যবহার করতে পারবেন, তা হলেই না-ও হতে পারে। নিষেধের নিরাপত্তার ক্ষণে আমিই যথেষ্ট ব্যবহার করার প্রয়োজন—আমার মনে হয় কিছুদিন পরেই হবে বরং।' হয় নিষেধের ভয়ে কোন সুবিধা আহার করতে কিংবা আহারের কিছু বন্ধী ছাড়িয়ে নিতে—সে প্রয়োজন ত এখনই হচ্ছে না!'

'ত: বটে। কিন্তু সে রকম বুললে কোবার পাঠাবে—?'

'দে টিক ব্যবস্থা করব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'তারলে ওদের ভারও তুমি নিলে?'

'আপনি দিলেই দেব।'

'আমি একেবারে লিখিত হুকুম দিয়ে যাচ্ছি। তেমনই নির্দেশমতই ওদের রাখা বা সরানো হবে।'

'সে আপনার খুশি।' আমিও নিশ্চয় ঠেগানীয়েত বহিত বলে।

॥ ৫৮ ॥

আজিহুয়া গুপ্তিত বইয়া চাষিয়া বহিলেন। কথাটা স্পষ্টই শুনিয়াছেন, আদিনার বাচনভঙ্গীতে বা কণ্ঠে কোন জড়তা ছিল না—তবু, তবু যেন বিখাপ হইতে চায় না।

সত্য বটে অবিয়ান এই মোহময়ী রমণীর ধোয়াধুনির বন্দন ভোগাইতে ভোগাইতে তিনি ক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন—এও সত্য যে ইহানীং একটা ছুটিল সন্দেহ মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে অন্তরিত হইতেছিল যে—এই ছলনাময়ী নারীর সবটাই ছলনা। নিজের কাণশিঁড়ির ক্ষণ কেবলই ভোক বা মিথ্যা আশাস দিয়া বাইতেছে, সেব পর্যন্ত কোনকিনই দরত তাঁহার কাছে থকা দিবে না, তবু ইহাও ত মিথ্যা নয় যে এসব সন্দেহ ইহার মোহ আশুত ছুনিবার। আশুত ইহার ক্ষণের, ইহার বনীবীর জাহ তাঁহার উপর একটা অপ্রতীত

প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, আর তা রাখিয়াছে বলিয়াই আশুত তিনি সত্যতা কাজের মধ্যে ছুটিয়া আনিয়াছেন ইহার আশানে। মনে হয় আশুত ইহার ক্ষণ অকস্মিক, ইহাকে অধের তাঁহার কিছু নাই।

তথাপি—এ প্রভাব! এবে অবিদ্যাত, কল্পনাভীত।

তিনি ভুল শোনেন নাই ত?

না কি এ পরিণাম? তাঁহাকে একটু বাধাইয়া দেখিতে চায় এই রমণী?

কিন্তু না—এখনও ত সে সাগ্রহে উৎকর্ষা-ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে তাঁহার মুখপানে।

'কী—কথা কইতেম না যে থা নাহেব?'

'না। এ অসম্ভব। এ আমি পারব না।'

'পারবেন না? আমার ক্ষণেও পারবেন না?'

একই বসে সে অলিত কর্তব্যের অতিমান, হতাশা, অহুন্নয় করিয়া পড়ে যেন।

'না বেগম সাহেবা। বাহুবের ক্ষমতার সীমা আছে।

আপনার ক্ষণে অনেক কিছুই করেছি—কিন্তু তবু সে মহত্ত্বের সীমানার মধ্যে ছিল। এ পৈশাচিকতা। এ কাজ করলে আপনিই দুগা করতেন আশাকে!'

'না করব না—মতি! বলছি থা নাহেব, পুণ্ডা করব আপনাকে। এই শেষ, আর তখনও কোন অহুন্নয় করব না। বলেছিলাম স্বাধীনতা! পেয়ে ছুজেন যখন দিগ্‌হোলন ভাগ করে নেব তখনই বরা দেব আপনাকে। সে কথা টেনে নিচ্ছি। এখনই এই মুহূর্তে থা দিচ্ছি আপনার কাছে—বেগুন। এই মুহূর্তে।'

সোভ বড় বেশী। মায়াবিনীর দৃষ্টি যেন অঘোষ আকর্ষণে টানিতেছে। কি অতল বহন্ত, কী অতীক্সর সুখের ইঙ্গিত করিতেছে। একময় এ প্রভাব জীবনের ভূমভিতম সৌভাগ্য মনে হইতে পারিত। বহন্ত আশুত—

না।

মাথা বাড়িয়া আজিহুয়া থা বলেন, 'না, তা হয় না। এতটা আমি পারব না। সেদিনের ব্যাপারটাতেই লক্ষ্যর সীমা মেই। আর এ ত কয়েকজন অসহায় রুঢ় ব্রীলোক আর কতকগুলো দিল্ল—না সে সম্ভব নয়। আমাকে মাগ করবেন।'

অনুন্নয়ের ভাবী নিমেষে মিলাইয়া গেল। সে
জায়গায় ছুটিয়া উঠিল প্রবল আপাত-নিরুদ্ধ অভিমান।
'স্মৃতিত ওষ্ঠাধরে সোহাগের সেই অভিমান বর্ষণ করিয়া
আমি না কহিল, 'যেণ বে পাতবে তার কাছেই থাকি।'

'তুইন বেগমদাহেবা', এ পাঠা উচ্চিৎ নহ। আপনি
প্রকৃতিস্থ হোন। এ হানবীর কাল, পৈশাচিকতা। সমস্ত
সত্য-জগৎ এ কথা শুনে আমাদের অভিসম্পাত করেছে।'
'তা আমি। তবুও আমার চাই এ।' আমি না
ধুইয়া ধাঁড়াইল।

'কিন্তু এতে কতটা ক্ষতি হবে ভেবে দেখছেন? এরা
হাতে থাকলে ভবিষ্যতে কতটা সুবিধা হতে পারে?'

'সব আমি খাঁ সাহেব। তবুও আমি চাই ওদের প্রাণ।
আপনি জানেন না—বুক জলে যাচ্ছে আহার, কী সে আপা
আপনি বুঝবেন না। ওদের রক্ত ছাড়া সে জালাত
শক্তি হবে না। হিন্দুদের ডাকিনী-বাগিনীর মতই
আমি আজ রুবিং-পিয়াসী...বাক, আপনি আপনার
কাজে যান। ছোট ছেলের মত ভয়ে কাঁপছেন আপনি,
নিঃপথ দৃশ্যে সবে থাকুন। একাজ স্রীলোক বা
শিশুর নয় তা আমি। তবু সেই—এ হারিষ আমারই থাক।
—আপনাকে এর দাবাবাহি করতে হবে না।'

শিশু ও স্রীলোকের ইচ্ছিতে আবিষ্কারের সুখ অদ্বার্য
বাঞ্ছন করিল। তিনি কহিলেন, 'কিন্তু নিরাপন দৃশ্যে থেকে
অসহায়ভাবে চেয়ে বেঁচেও আমি পাব না বেগমদাহেবা।
আমি বাধ্য দেব। দিব্যবের তার আমার হাতে—আমার
হুকুম ছাড়া কিছুই হবে না।'

'পেশোয়ার হুকুমও হবে না?'

'পেশোয়ার হুকুম?'

'হাঁ, পেশোয়ার হুকুম!'

আবারও স্তম্ভিত হইবার পালা আবিষ্কার।

'কখনও না। হ'তে পারে না। তাঁর সঙ্গে আমি
কালই কথা করছি।'

'পেশোয়ার হুকুম।' শব্দ অচেন্দ্রভাবে কথাগুলির
পুনরুচ্চারণ করে আমি না। তাহার পর বেন কতকটা বিষয়-
গর্ভে ওড়নার বগা হইতে কাপড় দুইখানি বাহির করিয়া
আবিষ্কারের গোখের নামনে খেলিয়া ধরে।

'এ পরোয়ানা ভাল!' কতকটা অসহায়ভাবেই বলেন
আবিষ্কার। হজরত ব্যক্তির ভূগাবল্যবের মত।

'সে পেশোয়ার হুকুম! আপাতত এইতেই আমি কাজ
উদ্ধার করব।'

'কিন্তু পেশোয়ার নামে ঢালালেও এই হুকুম কোন
সিপাহীই তামিল করবে না হুগেনৌবিবি—আপনি নিশ্চিত
থাকুন। সেহিন লজীজোরা যাটে বেশ সরল সোজা
ভাষাতেই তারা এ কাজ করতে অস্বীকার করেছিল, সেটা
ভুলে যাবেন না। তবু তখন চারিদিকে হত্যার তাজব
চলেছে, রক্তে সেহিন তাহার রক্তের বেশাই ছিল। তবুও
তারা রাণী হয়নি।'

'আমি যে তাহের ভদ্রমতেই আছি এমন কথাই বা
আপনাকে কে বললে। আমার ব্যবস্থা আমি ক'রে নিতে
পাবব। এ পরোয়ানাতে আর হাই হোক বা না হোক
আমার কাজে তারা বাধ্য হিতে পারবে না—এটা সঠিক।
ওখান থেকে তাহের সরিয়ে দিতে পারব?'

'আচ্ছা আমিও যৌব, এ পাগলামি বন্ধ করতে পারি
কিনা। আমি পেশোয়ার কাছেই থাকি। এ পাগে
আপনাকে আমি অভিভূত হতে হবে না, আমার সাধ্য
থাকতে নয়।'

আবিষ্কার আর বাহাযুবের অপেক্ষা করিলেন না।
এক রকম ছুটিয়াই চলিয়া গেলেন।

আমি না বহুকণ সেইখানেই স্থানবৎ ধাঁড়াইয়া বসিল।
তাহার মুখের সে বিষয়গর্ভ কোষার চলিয়া গিয়াছে, সে
জায়গায় ছুটিয়া উঠিয়াছে একটা হতাশা এবং চুক্তিতা।

তবে কি তাহার সমস্ত জাহ চলিয়া গেছে এই
ক-হিনেই? তবে কি সে ইহার মধ্যেই শক্তিহীন হইয়া
পড়িল? আবিষ্কারও তাহাকে উপেক্ষা ও অথহেলা করিয়া
চলিয়া গেল অনাগ্রাসে।

তবে কি সে এত কালের পর, এতবার বিফল হইয়া
পেছ বহুতে বার্য হইবে?

অবশ্য সত্যই তা আর এ কাজ নিষেধ হাতে করা যার
না। তাহার বাহা কিছু বল রূপে যৌবনে কটাকে বুদ্ধিতে

একথা তাহার চেয়ে বেশি কে জানে। কিন্তু এ কাজ যে শেনীর।

যাহ বহুকণ অপহার হিরণ্যে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর শূণ্যতাহার ভ্রুহুটি মিলাইয়া গেল, মনো আশায় চোখ দুটি উঠিল অগিয়া।

‘আছে—এখনও তেমন সেবক আছে বৈকি। অন্তত সে এই চুনিমে আমিনাকে ত্যাগ করিবে না।

আমিনা প্রায় দুটিগা ঘাব প্রাপ্তে গিয়া ডাকিল, ‘মুন্সং?’

‘খী, মালেকান।’ মনিবের গুরুতর কঠকরে প্রায় দুটিতে দুটিতে আসিল মুন্সং।

‘এখনই একটা বোড়সওয়ার পাঠিয়ে যে কনাইটোলায়, সর্দার খাঁকে ডেকে নিয়ে আসুক এখনই। জলদি! বলতে বলদি যে খুব গুরুতর রককার—যেমন অবস্থায় আছে যেন তেমনই অবস্থায় চলে আসে! এই নে—, একটা টাকা নে, বোড়সওয়ারকে দিবি, আগাম বকশীশ! সর্দার খাঁকে এক বটাব মধ্যে এনে হাতির কবতে পাঠলে আরও এক টাকা পাবে।—বলে দে।’

* * *

সর্দার খাঁও কথটা শুনিয়া বহুকণ হির অপলক নেড়ে প্রোক্তকাহিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বহিল। তাৎপর্য বীরে বীরে করিল, ‘মালেকান তোমার হুকুম হ’লে একা শুধু হাতে একশ’ ছশমনের সামনে দাঁড়াতে পারি—বাঘের গর্ভে গিয়ে তাকে লড়াই দিতে পারি। জানেব মায়্যা তোমার হুকুমের কাছে তুচ্ছ—কিন্তু এ যে... এ যে অস্ত্র কথা মালেকান! অপহার নিরপরাধ কতকগুলো জেনান—আর বাস্তবের কোতল করা, তাও খাঁটার মধ্যে পুবে—! এ হুকুম তুমি কিরিয়ে নাও। এ হুকুম আমাকে তুমি দিও না।’

শেষ পর্যন্ত সর্দার খাঁও!

চির বিবস্ত, চির অসুগত সেবক সর্দার খাঁ।

অকস্মাৎ আমিনার মনে হইল, তাহার প্যা দুইটোতে যেন কোন বোহ নাই, হাঁটুর কাছে ভাঙিয়া পড়িতেছে। বুকের মধ্যেটাও যেন নিষেধে থালি হইয়া গেছে—কোথাও কোন দীর্ঘনীশক্তি আর অবশিষ্ট নাই। ঐ অত্যন্তকাল

সময়ের মধ্যেই—নিজের অবস্থায় সে নিশিত হইল। এ তার কি অবস্থা! এমন একান্ত অনস্বার এবং হতাশ বোধ করিবার কোন কারণে ইহার পূর্বে ঘটে নাই, অতিজ্ঞতাটা একেবারেই নূতন। বিষয় বোধ করি সেইজন্যই।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র।

না। হার মানিলে চলিবে না—কিছুতেই চলিবে না।

মুহূর্তে নিজের শরকে নূতন অস্ত্র যোজন্য কহিল আমিনা, একলহমায় কর্তব্য স্থির করিয়া লইল। একেবারে সর্দার খাঁর সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া দুইহাতে তাহার গলা জড়াইয়া বহিল, তারপর অতিমানস্কর করণ কণ্ঠে কহিল, ‘তুইও আমাকে ত্যাগ করবি সর্দার, তুইও আমার কথা শুনবি না? তাহলে আমি কার কাছে যাবো বলা?’

তবুও সর্দারের বৃষ্টি তাহার চোখে আসিয়া মিলিল না। তাহার মুখের বিশ্র ভাবও দূর হইল না। বরং তাহার অন্তরের প্রবল কড়াইয়া আরও বেশি করিয়া মুখে ফুটিয়া উঠিল।

‘তুই না পারিল, তোর কনাইটোলায় অস্ত্র লোক ঠিক কর। আমি টাকা দেব—প্রচুর টাকা। এক এক জনকে হাজার করে টাকা দেব। জানেনও তর মেই—এই ঘাঘ নানা শাহেবের পরোয়ানা, আমি যা বলব তা তাঁরই হুকুম মনে করতে হবে।—সর্দার, সর্দার—এই শেষ বাহের মত আবহার করছি তোর কাছে, আর কখনও কিছু বলব না। সর্দার—আমি, আমি তোর মনিবের বেগ। তোর আগবের মালেকান—তোর কাছে তিকা চাইছি!’

সর্দার খাঁ। সঘরে—তাহার পক্ষে বর্তী সঘরে সন্তর্ভ—আমিনার হাত দুটা নিজের গলা হইতে ছাড়াইয়া ধিল। তাহার সেই বীভৎস দানবীর মুখে সেই মুহূর্তে যে হতাশা, যে মানি, যে স্বপ্না কুটিয়া উঠিল তাহা বেশিলে করুণা বোধ করিবারই কথা—স্বস্ত আমিনাও কহিল কিন্তু দলিল না—বরং মুক্ত হাত দুটা ঝোড় করিয়া দাঁড়াইল সামনে, ভিখারীর মত।

অতিক্রমে যেন গভীর বেদনার সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস কেপিল সর্দার খাঁ। তাহার পর বলিল, ‘আমিনা আমাকে কোণায় চেনে নিয়ে বাছ মালেকান, পরলোকে গিয়ে খুদার

কাছে কি অবাবলীহি কব, তাও জানি না। শুধু এই জানি যে তোমার হৃদয় ঠেগবার শক্তি আমার নেই। বত বড় কঠিনই হোক, এককণ্ঠ আমারে করতে হবে, আমি করবও। কিন্তু এ না করলেই পারতে মেলেকান, এ না করলেই পারতে !

হয়ত শেব যুদ্ধেও সর্গের বীর মনের মধ্যে তাহার মালেকানের মতি পরিচিতি হইবার একটা ক্ষণ আশা ছিল—তাই সে চলিয়া যাঁতে গিয়াও কয়েক লবণ উৎসুক ব্যাকুল নেত্রে একপ্রকারে কল্প আশায় চাহিয়া রহিল আশিনার মুখের দিকে। কিন্তু যেহিঁল সে মুখে এতটুকু থিরা নাই, অশুকলা নাই—অশুশোচনার সস্তাবনা যাত্র নাই।।.....

হীরাবাসও যেন আর কেলিতে পারিল না সর্গের খাঁ। নিঃশ্বাসট: মুক চাপিয়াই সে বীরে বীরে হস্তশালিতের মত মাথা নিচু করিয়া বত হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার অনিশ্চুক ভায়ী পায়েব শব্দটা দূর আশিখে বাজিতে বাজিতে কৌণ হইয়া এক সখর মিলাইয়া গেল।।...

সর্গের বাওয়ার আগে অশুশোচনার পূর্ণাভাস পায় নাই নত্যা কথা—কিন্তু এখন বহি সে আর একবার কিথিয়া আশিত ত তাহার বিষয়ের অন্তর গ্রহিত না। দেখিত যে তাহার মালেকানের সেইশুকট্টম বৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া, সেই আশ্চর্য স্কন্দর চোষদুটির কুল ছাপাইয়া অস্ত ভরিয়া আসিয়াছে এবং ইহারই মধ্যে সে মল ঐ রাশদীর পাশাণ-অবিচল কপোল ভাসাইয়া দাবার ধারায় তাহার বুকের শুড়নার উপর কড়িয়া পড়িতেছে।

একি স্বার্থকতার আনন্দাশ্র ?

একি আশ্রয়ানি ? —আশ্র-অশুকলা ? —অথবা অশুশোচনাই ?

এ অস্ত কিসের তাহা আশিনা নিজেও তখন বলিতে পারিত না।

॥ ৫৬ ॥

হীরালাল দামার বেণা পায় নাই। পাইবার কথাও নয়—কারণ সে পৌঁছিতে পৌঁছিতে মাথা বহুদূর চলিয়া গিয়াছেন। নাকশান হইতে তাহার নিষের জীবনটাই বিপর্য হইতে বসিয়াছিল। তবু সে ত ব্যটিতে গিয়া পড়ে

নাই, দূর হইতেই বোঝাযব লইয়া দামার অন্তর্ধানের কাহিনী শুনিয়াছিল। একেবারে সেই বাঘের ভয়ানক গিয়া পড়িলে কী হইত তাহা না গিয়াত হীরালাল বেশ অশুমান করতে পারে, কারণ পথের মধ্যেই বহুবার বহু বলের হাতে পড়িয়া আন্টা হাইতে বসিয়াছিল। সে 'বাগোদী' অন্তএব আশ্রয়ের হালের লোক অথবা তাগের গোয়েন্দা— এই সম্বন্ধে আর সকলকাই। হীরালাল রাশপথ বড়টা সস্তব এড়াইয়াই চলিয়াছিল—সিপাহীবেব হাতে ধরা পড়িবার ভয়। গ্রামবাসীবেব তবু নামা মিথ্যা বলিয়া যোঝানো যায়—সিপাহীবেব যোঝানো কঠিন।

কিন্তু গ্রামবাসীবেব কাছেও অবাবলীহি বড় কম করিতে হইল না, এক এক আরগার তাহারা দীতিমত নাস্তা-নাবুধ করিয়া ছাড়িল।

গোয়েন্দা সম্বন্ধটাই বেশী। 'বৈদমান বেসরম বাগোদী লড়াই করিতে জানে না—জানেন গোয়েন্দাগিহি করিতে আর চুকলি হাইতে !' এই অতিব্যোপ সর্জন।

গ্রামবাসীবেবও বিশেষ সোখ বেগুয়া হয়ে না। ওধারে 'পুরব' হইতে আগত ইংরাজবেব বর্ষ অন্তাচাবেব কাহিনী, কিছু কিছু হয়ত বা অন্তিরস্তিত হইয়াই, ছড়াইয়াছে—সেই অগ্রসরণাশ্রু বলতেই গোয়েন্দা সে, এই সম্বন্ধটাই মাস্তব্যক। ভয় হইতে বিষয়। একটা লোককে হাতে পাইয়া বেব লইবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক।

হীরালাল কোনমতে—অথবা বুকিয়া—কোথাও ভয় দেখাইয়া, কোথাও মিষ্টাভাষ্যে সম্বন্ধ ভঙ্গন করিয়া, কোথাও বা শপথ করিয়া অব্যাবহিত পাইল। শপথ করিতে তাহার বাণা নাই, কারণ গোয়েন্দা সে নিশ্চয়ই নয়।

নাস্তা-নাবুধ বতই হোক—ইহাবেব সম্বন্ধে একটা সহাস্রভূতি অহরহ না করিয়াও পারিল না। অগ্রগমন-কাহী ইংরাজবেব যে বর্ষ অন্তাচাবেব কাহিনী তাহার কানে আসিতে লাগিল তাহার অর্ধেক নত্যা হইলেও ভয়াবহ। এই সব গ্রামবাসীবেব সহিত কথা করিয়া সে বুঝিল—ইহাবেব বেশীত ভাগই নিতীহ, সিপাহী-অশুশোচনের সহিত তাহারা বিন্দুমাঝে ভুক্তিত নয়, এমন কি সহাস্রভূতি-সম্পন্নও নয়। মুগ্ধবানবেব কেহ কেহ বরং স্থানীর যোদ্ধা বা মৌলবীবেব আবেশে শুনা-শুণারীর ভয়ে কিছু কিছু

মাথাব্য করিতে বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু কেহ কেহ হয়ত মূলমণ্ডল বাহ্যবাহীর আশাও রাখে—কিন্তু বিশ্বব্যাপী কেহই এসময় নয়। তাহার প্রায় সকলেই মনে-প্রাণে ‘আংবেজ সরকার’ কাননা করে। কারণ এ বাঙালি তাহাদের উপর লইতে যোয়া। মৌলবীর অভ্যাচার কমিয়াছে, বর্ণী ল্যাঠ-কোহিলা-ঈগীর অভ্যাচারও বন্ধ হইয়াছে। মোটা মুঠি অনেকদিন পরে একটু শান্তির মুখ দেখিয়াছে। এমন কি জাহাঙ্গীরনগরের অভ্যাচারও (যেটা ভাষাতাত্ত্বিক এবং সঙ্গত বলিয়াই মনে করে অনেক—ভাষাভাষে বা কথ্য কলে বধন তাহার গর্ভের ঘরে জন্মিয়াছে, এটাও সহিতেই হইবে) যে কিছুটা সংকট হইয়াছে তাহাতেও ত সন্দেহ নাই। ইংরাজ মনে মনে ইংরাজের জগৎ কাননা করে। অথচ এই একবারে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও নির্দোষ মানুষগুলিকেই অপরের নিরুদ্ভিষ্টা ও অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে। আর কি কঠোর সে প্রায়শ্চিত্ত! বৈধনির্ঘাতনের নিত্য নূতন পৈশাটিক উপায় উদ্ভাবনই নাকি তরুণ ইংরাজ অধিকারের একটা কৃত্তিব-প্রতিযোগিতার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে!

তবু—হতই সে লজ্জার দিকে অগ্রসর হয়—এ ধারের সংসারেও মনটা হরিয়া যায়। এদিকে সর্বত্রই ইংরাজের শোচনীয় পরাজয় ঘটতেছে—কোথাও এতটুকু আশার সুশব্দ নাই। যদি এ ধার হইতে লতাই ইংরাজ শক্তি একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং নিশ্চিন্ত সিপাহীরা লতাই সংঘবদ্ধ হইতে পারে (মনে ত হয় না—তবু) তাহা হইলে এ ‘পুতুবা’ ইংরেজরা কি তাহারে লজ্জা দাঁড়াইতে পারিবে শেষ পর্যন্ত?

হীরালালের বিলাত লঙ্ঘন কোন ধারণা নাই, ইংরাজের শক্তি কত তাহাও সে জানে না—সিপাহীদের মুখে কয়দিন বরিয়া অবিরত শুনিতেছে যে সেটা নিত্যন্তই অতি ক্ষুদ্র বেশ, তাহারের শক্তিও নগণ্য, সিপাহীরা আছে বলিয়াই আংবেজ সরকার চলিতেছে। কলে মাথার সেই ‘জাহাজ জাহাজ পোরা’র উপর খুব ভরসা নাই তাহার। ইংরাজের সহিত নিম্নের তবিস্তরের কথা ভাবিয়াও একটু চিন্তাগ্রস্ত হইল। চাকরী থাকিবে না সেটাই বড় কথা নয়। শেষ পর্যন্ত সে বিশ্বস্তভাবে ইংরাজের নৌকরী

করিয়াছে—এ কথাটা কিছুতেই ছাপা থাকিবে না, বরী পড়িবেই। তখনকার কথাটা ভাবিয়াই নিঃশব্দ উঠিল সে। ইংরাজের কাছে দেখা প্রতিহিংসার এই সব কোশল কি ইংরাজ ও তাহার নৌকরদের উপর বিরাট প্রতাপ করা হইবে না? দুহাত ত বটেই—হয়ত ভরসাবহ শোচনীয় দুহাতই অব্যুত আছে।

এক একবার মনে হইল মাথার পর্ব অসুস্থত করিয়া সে দেশের বিকেই পালায়। কিন্তু এতটা পণ একা নিঃশব্দ অবস্থার যাওয়া কি সম্ভব? মামার সহিত মোটা টাকা আছে—তাহার বে কিছুই নাই। তাছাড়া বাংলাদেশে পৌঁছিতে পারিলে একইরকম নিরাপদ বটে কিন্তু তাহার আগে দীর্ঘ অরাজক পর্ব অতিক্রম করিতে হইবে। পাটনা আরো পর্বত্র ইংরাজ বিধেব মাথা তুলিয়াছে—আবার ইংরাজের হাতে পড়িলেই বা কি হইবে কে জানে? শুনিতেছে বলিষ্ঠ তরুণ ‘নেটিভ’দের উপরই উদ্বোধনের আক্রোশ নাকি লুপ্তের বেশি।

অর্থাৎ এক কথায় বাবে মারিলেও মারিবে—রাখিবে মারিলেও মারিবে।

তাহার চেয়ে যথাস্থানে বিরিয়া যাওয়াই ভাল। অব্যুত বা আছে তাই হোক! কর্তব্য পালনের চেষ্টা ত তবু করিতে পারিবে।

কিন্তু কাছাকাছি আসিয়া যে সব সংসার পাইল, তাহাতে বুকটা আরও হরিয়া খেল। লজ্জার বা অবস্থা শুনিতেছে—ইংরাজ শিবিরে ঢোকা ঘাইবে ত? সেই চেষ্টাতেই না প্রাণটা খোয়াইতে হয়।

শহুরে শিখা তাহার সেই বোকান গরের পিছনের বাসাতে দিনকত্তক ঘাপটি মারিয়া থাকিতে পায়ে কিছু সে ত আর বিনা পরশার থাকিতে দিবে না। ঘাইতে শু বিবেই না। মামার ভাষায় ‘বৈত’ চাই। সেই বৈত কোথায়? মাহিনাপত্র সব পড়িয়া রহিল। সন্দেহ বা ছিল, পথেই কদিন শেষ হইয়া গিয়াছে?

শেষ পর্যন্ত কানপুত্রেই ঘাইবে নাকি।

সেখানে সিপাহীদের হাতে পড়িলেও তাহার ইচ্ছা-কারিগী বৈবী আছেন সেখানে, পর্গার বা আছে। পরিজ্ঞান

পাইতে পারে। কিন্তু সেখানে গিয়াই বা কি করিবে? সিপাহীদের হাঙ্গামে সে থাকিবে না কিছুতেই। এক উপায় হুসেনী বেগমের নিকট হইতে কিছু অর্থ লইয়া লক্ষ্যেতে ফেরা এবং ঘটনাবলীর পরিণতির অপেক্ষা করা। কিন্তু—কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কানের ডগা পড়ে লাগল হইয়া উঠিল। ব'হাৎকে তাহারই সব কিছু উল্কাড় করিয়া ফেলা উচিত, তাহার কাছে যাত পাতিয়া ভিক্ষা করা? হিঃ! বরং পথে বাটে মজুরী খাটিয়া খাওয়া ভাল।

কোন-কিছুই ঠিক হইল না। কিন্তু অংশেবে একটা সময় আসিল যে মন আর স্থির না করিলেই নয়। এই অবস্থায় কানপুর ও লক্ষ্যের মাঝামাঝি একটা জায়গায় পুরা একটা বিনই আসতে ও চিন্তায় কাটাইতে হইল। চণ্ডীওয়াল! হোকানো তাহার পতিবিধি ও উদ্দেশ্য মথছে সন্নিহিত হইয়া ফেরা করিতে 'অরতাব হইয়াছে' এই অভ্যুহাত দিয়া তখনকার মত অব্যাহতি পাইল সত্য, কিন্তু পরের দিন কি অভ্যুহাত দিবে? সে আরও চিন্তিত ও বিভ্রত হইয়া পড়িল।

সম্ভবতঃ ম'কালীকে সে মন গিয়াই ডাকিয়াছিল। সেই ঐকান্তিক ডাকেই তিনি তাহার কর্তব্য স্থির করিয়া দিলেন।

এক বিচিত্র ঘটনা ঘটিল সেইদিনই।

সারাদিনটা পরমে এবং চিন্তায় রত হইয়া সন্ধ্যার আগে প্রকৃতির রক্তরক্ত প্রদর্শিত হইলে সে মন করিয়া চৌর বাহিরে একটা গাছতলার আসিয়া বসিল। সব বসিয়াছে—নখরে পড়িল পশ্চিমবিকের রাজ্য ধরিয়া একটি ত্রীলোক এদিকে আসিতেছে। ঘটনাটা এমন কিছু আশ্চর্য নয়—তবু সে কিছু বিমিতই হইল। কারণ ত্রীলোকটির পরশে মূলমামনের বেশ, অথচ বোরখা নাই। তাহা উপর উজ্জ্বল পত্টিটাও যেন কেমন কেমন—উদ্ভ্রষ্টাঙ্গ, উদ্বাসীন, ক্রান্ত মন্থর পতি। সাধারণতঃ অপরিচিত ত্রীলোক আসিতে যেখানে মাথা নামাইয়া লওয়াই হীরালালের অভ্যাগ কিন্তু ইহার তাবজ্ঞী এমনই যে চাহিয়া না থাকিয়া পারিল না। আর চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই মনে হইল—এই চন্দনটা তাহার অপরিচিত নয়—আরও একটু পরে মনে পড়িল

এই দৈহিক নটনটার সহিতও তাহার কোন-মতে পরিচয় আছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে লাক্ষাইয়া উঠিল।

হুসেনী বেগম! তাহার বক্ষাকর্জী দেবী? এই লাক্ষা-কালে কি তিনিই আবার বেধা দিলেন?

বোধ করি সে লাক্ষাধিনি আশ্রিত করিয়াই তাড়িতছিল, অথবা এমন ব্যার ব্যার এই মহিলাই তাহাকে বন্ধা করিয়া-ছেন যে হরত মনের অব্যেতনে তাহারই আবির্ভাব আশা করিতেছিল সে। তাই কথাটা মনে হইয়াছে কোন অপ্র-পশ্চাদ্ধ না জানিয়াই সে ছুটিয়া একেবারে তাহার সেই গমন-পথের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। একথা একবারও মনে হইল না যে হুসেনী বেগমের সঙ্গে এমন সামান্য বেধে পারে ইটিয়া এভাবে আশা সম্ভবপর নহে।

কিন্তু সামনে গিয়াই অপ্রত্যাশিত হইল।

অনেকটা সেই রকম কিন্তু তবু সে মনে।

লক্ষ্যার পরিচীনা বহিল না। ইনিই বা কি মনে করিতেছেন—অপর কেহ যেখানেই বা কি ভাবিবে। অলং উদ্দেশ্য আছে মনে করিয়া মাঝ-বোহ করাও ত বিচিত্র নয়। কোনমতে প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে 'মাগ করবেন' বলিয়া সে কিরিয়া আসিতেছিল—সংস্কার মতই তখন মুখটা কোথাও লুকাইতে পারিলেন যেন বাঁচিয়া যায় এমন অবস্থা—সহসা সেই ত্রীলোকটিই পিছন হইতে ডাকিল, 'শোন—তুমি বাকালী?'

বিশ্বের বৃষ্টি শেষ হইবে না আশ। আরক্ত নতমুখে কিরিয়া দাঁড়াইল হীরালাল, কোনক্রমে বাড় নাড়িল।

'তোমার নাম হীরালাল?'

আরও বিশ্বস। হীরালাল এবার বাড় না তুলিয়া পারিল না।

কহিল, 'হ্যাঁ কিন্তু আপনি?'

'আমাকে তুমি হুসেনী বেগম ভেবেছিলে, না?'

বিশ্বের বহোও কোথায় যেন অস্পষ্টতা কাটায়া বাইতেছে।

'হ্যাঁ?'

'আমি তারই বোন। তোমাকে যেখাই চিনেছি।'

এবার হীরালালও বুকিতে পারিল।

আজিজন বিবি। ইহার কথা সে শুনিয়াছে।

সুতরাং তাহার এখন এই একটিই মাত্র পথ—

কিন্তু এভাবে কেন? এইবার কথাটা মনে হইল—

কানপুরের পথ।

যেটা বহু আগে মনে হওয়া উচিত ছিল। সে প্রেরণা করিয়াও বসিল।

॥ ৬০ ॥

প্রাস্তবর্গে উত্তর আদিল, 'সে কথা থাক।—তুমি আমিনাকে খুব ভালবাস, না? খুব ভক্তি করো? আমি তার মুখেই সব কথা শুনেছি। তুমি ভক্তি করো বলেই সে তোমাকে দখীল করে, হয়ত তোমার কথা সে শুনেবে। তাহা তুমি একবার কানপুরে যাও। সে সর্বনাশের দেশের যেতেছে, রক্তে হোলি খেলছে সে। অকারণ, অর্থহীন রক্তপাত। ভুলপথে যাচ্ছে। এপথে গেলে সে বাঁচবে না। কানুর কথাই শুনেছে না কিন্তু হয়ত তোমার কথা শুনেবে সে। যাও একবার, যদি তাকে ফেরাতে পারো।

'কিন্তু—' বিম্বিত হতচকিত হীরালাল আরও কি প্রশ্ন করিতে পেল, ইংিতে নিবৃত্ত করিয়া আজিজন বসিল, 'আর বেশী বলতে পারব না। হয়ত সম্বন্ধ নেই। তবু বলছি তুমি যাও। যেতে যেতে পুনেই শুনেবে সব। পারো তাকে নিবৃত্ত করো।'

আজিজন আর গাড়াইল না। যেমন চলিতেছিল তেমন উদ্বেগবান লক্ষ্যহীন ভাবেই ইটিতে লাগিল।

হীরালাল তাহাকে বাধা দিতে সাহস করিল না, কথা বলারও আর অবসর পাইল না, কতকটা স্তম্ভিতভাবে সেদিকে চাছিল। গাড়াইয়া বসিল শুধু।

বলিল যৌক্তিক মুখ, খুশিখুশি বেশভূষা—

একম হইবার ত কথা নহে।

পাপল হইয়া যায় মাই ত?

কিন্তু তবু তাহার কর্তব্য স্থির করিয়া কিয়ই পেল আজিজন, একটা বা হোক পথ সে বেধিতে পাইয়াছে।

উহার কথা বহিই মত্ত। হয়?

হয়ত না-ও হইতে পারে, হয়ত কথাটা উদ্ভাবের প্রাণপ কিন্তু তবু হীরালাল সে, 'হয়ত'র উপর ভরসা করিয়া থাকিতে পারিবে না।

আমিনা বিপন্ন—হীরালাল তাহার কাছে লাগিতে পারে, তাহাকে বাঁচাইতে পারে, এ সম্ভাবনাটাও ত কম নয়?

কানপুরের উপান্তে পৌঁছিয়াই ন্যাতিতিক সংঘর্ষটি পাইল হীরালাল। ইংেজদের অংরোধ আর নাই, তাহাদের নিরাপদে এলাহাবাদে যাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া নানাশাহেব সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন, পতৌচৌরা ঘাটে নৌকার উল্টাবার পর নৃৎসংভাবে তাহাদের হত্যা করাইয়াছেন। কিন্তু হেমশাহেব ও কয়েকটি শিশু বাঁচিয়াছে—সে-ও শিপাহীরা তাহাদের মারিতে অস্বীকার করিয়াছিল বলিয়া। তাহাদের বিবিধর নামক একটি ছোট বাকীতে আটক রাখা হইয়াছে—তাহারা ই বা করিন কে জানে।

যে বোকারো হীরালাল আজর লইয়াছিল সে বোকারাটি বেশ গুচা-কি-বাহাল। সে পলার খর নামাইয়া বসিল, 'অবশি শুনিছি নানাশাহেব এ কথা বুঝা-কি-ও জানাতেন না, ভর সেই মারায়ী উল্টাবও না। এমনকি শিপাহীরা নাকি গোড়াতেই সাক্ষ্য করিয়া দিয়াছিল। কহিতেছে এই আজিযুয়া ধাঁ। ভাতি বড়ি-বাহ। এমনভাবেই নানাশাহেবকে ভড়িতে চাইছে যত নামার না ফেরার পথ থাকে। এদের ডুবিয়ে উনি যে বেঁচে গিয়ে, আবার ইংেজের সঙ্গে খাতির ঘমায়েন—সেটি হতে দিচ্ছে না এত। শুনিছি—পলার খর আরও নামাই' বোকারাটি কহিল, 'এ হেমশাহেবগুলো-কও ছেড়ে কথা কইবে না। তাইই নাকি মতলব বাঁচছে।—নানাশাহেব ত কাল হুঁত্রে চলে গেছেন। ভর যে পথ বাকী নিয়ে যাবার নিয়তই ত গেছেন। এদের ছেড়ে গেলেন কেন? সবই এই ধাঁ সাহেবটির বুদ্ধি।... দেখা থাক—আমাদের কী, বলো না তাই, বলে বলে মজা দেখা বই-ত নয়! তবে যদি আংরেজ আগে আবার—এব হুনে শোণ ভুলবে। কাউকে আর আন্ত রাখবে না শহরা... আমি সেই ভয়ে বংগালীদিগের সব দেখাতে পাঠিয়ে দিচ্ছি—একা আছি, আর এই বুদ্ধ নৌকর। তেমন বুকেল আমিও পাইব।'

মিথের বুদ্ধির পথে বোকারাটির মুখখানা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

এতকণে আজিজন বিবি বক্তব্য হীরালাল বুঝিল।

‘বসন্তে হোলি খেলা’ ও ‘সর্বনাশের নেমা’ কোনটাই বাছা-উক্তি করে নাই সে। আজিজুল্লা খাঁই সব কবাইয়াছেন—কিন্তু তাহার লিখনে কোন শক্তি কাজ করিতেছে তা দোকানী বুঝিবে না। হোয়ালাল বঙ্গোৎসব অনুমান করিতে পারে।

দে আর বলিল না। সামান্য শুভী দোকানীর বিদ্যা করিয়া বিদ্যা ছুয়ার মলে খুশ হাত খুইয়া লইয়াই বাহির হইয়া পড়িল।

প্রথমেই গেল সে কশাইটোল। একেবারে প্রাণাধে হইতে সাহস হইল না। দিপাহীর বেশ সে কিছুদিন আগেই খেলিয়া বিগাছে—পথে নামা অব্যবহীহি করিতে হইত। এখন সাধা বাঙ্গালীর পোশাক—খুতি ও পিরাণ। এ অবস্থার প্রাণাধে চুকিতে পারিবে কিনা টিক কি। হস্ত বাঙ্গালী দেখিয়াই আগে গ্রেপ্তার করিবে।

কিন্তু সর্দার বীর দোকানে গিয়া দেখিল সর্দার নাই, তাহার সহকারী কশাইটিও নাই; একটি বাজা চাকর অতি সামান্য মাংসের পণ্য লইয়া বসিয়া আছে। সে কিছু বলিতে পারিল না, শুধু বলিল যে মকালেব দিকেই প্রাণাধ হইতে কে একজন সর্দার বীর ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল। অল্পক্ষণ পরেই সে তিরিয়া আসিয়া তাহার সহকারী এবং আপ-পাশের লোকান হইতে অপর কয়েকজন কশাইকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গিয়াছে—এখনও ফেরে নাই।

অতি সাধারণ ধর, হস্ত নিত্যই তুলে বটমার ইতিহাস—কিন্তু কে জানে কেন হোয়ালাল বুকট মধ্যে একটা রিম-মৈত্যা অনুভব করিল। নিজে কে বড় দুর্বলও বনে হইল কিছুক্ষণের জন্য।

কিন্তু ঝাঁড়াইলে চলিবে না। অপেক্ষা করার সময় নাই।

অবত কোথায়ই বা যাইবে সে? প্রাণাধে? হসেনীকে আপে খুঁজিয়া বাহির করাই ত উচিত।

ওদিকে সর্দার বীর অনেকক্ষণ বাহির হইয়াছে, এখনও ফেরে নাই। তাহার মনের মধ্যে কে বেন বলিতে লাগিল তাহার এই সমস্যাতে অভিযানের সহিত বিবিধধর ঐ বসন্তীনের একটা যোগাযোগ আছে।

সে যুদ্ধ-শানিক ভাবিয়া স্থির করিল, কিছু হউক বা না

হউক—বিবিধের যাওয়াই ভাল। সেখানে দিপাহী সাত্তী এবং সর্দার বীর হলের মধ্যে গিয়া হস্ত কিছু ক্রটিতে পারিবে না সত্য কথা, কিন্তু অস্থির বিনয় করিয়া অল্প কিছুক্ষণ সময়ও ত অন্তত চাহিয়া লইতে পারিবে।...

কিন্তু বিবিধের কোনটিকে? কেংই ত জানে না।

হুই একজন পরিচকে গিজাগা করিল, তাহার কেব বলিতে পারিল না। একজন বলিল, নামটা সে কদিন শুনিতেছে বটে, তবে কোথায় কী হত্যাত তাহা সে জানে না।

অবশেষে এক মিঠাইওয়ালার কাছে হাবি নিলিল। সে প্রথমে সন্দেহভাবে তাহার দিকে তাকিয়া প্রশ্ন করিল, ‘কেন বলো ত? সেখানে তোমার কী দরকার?’ তাহার পর, হোয়ালাল সে দিক দিয়া তাহাকে লষ্ট করিবার চেষ্টা-নাহ না দেখানোর, নিত্যন্ত বিস্ময় হইয়াই একটা পথের নির্দেশ দিল।

হোয়ালাল হস্তের দস্তব মোরে পা চালাইল এবার।

কিন্তু পথের নির্দেশ অর্থে কতকটা শুধু দিকেবই নির্দেশ। কিছুদূর গিয়া আবার পথ গিজাগা করিবার প্রয়োজন হইল—এবার বাহাকে গিজাগা করিল সে শুধু পথটা জানে না—যেখা গেল আরও অনেক কিছু জানে।

সে একেবারে হোয়ালালের হাতজুইটা চাপিয়া ধরিল, করিল, ‘ঠো? মং বাইয়ে ভাই সাহাব, মং বাইয়ে। ঠো শ্রমতান কী এক আক্ষব খেল চল হোয়া হোয়া!’

হোয়ালাল বুঝিল সে খুবই অভিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছে, যে দুইটা হাতে তাহার হাত ধরিয়া আছে, তাহা ধর-ধর করিয়া কাঁপিতেছে।

কিন্তু হোয়ালালের আর তখন অপেক্ষা করিলে চলে না, সে উভির ব্যাকুলকণ্ঠে তাহাকে একটা স্বাকি দিয়া প্রস্ততি করিবার চেষ্টা করিল।

‘কী হয়েছে? ভাইগা, বলো বলো, বলদি বলো। কী চলছে সেখানে?’

লোকটি অল্প-বয়সী, বেশভূষার মনে ধর শিকিত ওজর বরের ছেলে। সে সত্যই ভয় পাইয়াছে। এতক্ষণ হোয়ালাল ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল তাহার মুখে চোখে দ্বন্দ্ব অস্তম্ভ।

সে কোনমতে, জড়াইয়া জড়াইয়া, বহু অশ্লের কবাব সহিত বাহা বলিল তাহার অর্থ হইতেছে এই যে, আমি দুপুরের দিকে বিবির হইতে শিপাহী সাত্তী শয়ইয়া; লওয়া হইয়াছে, কটকের চাবি দেওয়া হইয়াছে একবল কসাইয়ের হাতে—তাহারা ভিতরে ঢুকিয়া নিবিচাতে সবাইকে কাটিতেছে, একজনও—এমন কি একটা শিশুও বোধ হয় তাহাদের ক্রবির-তৃষা হইতে অব্যাহতি পাইবে না। কাটিতেছে আর একটা কুয়ার কেলিতেছে, কুয়াটা বোধ হয় এতক্ষণে ভরিয়া গেল।

কথাটা সে শুনিয়াছিল অশ্লের মুখে, বিশ্বাস হয় নাই, কৌতুহলী হইয়া দেখিতে গিয়াছিল। ভিতরে ঢোকে নাই, বাহির হইতেই বাহা দেখিয়াছে তাহাতেই তাহার কৌতুহল মিটিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ এখন কিছুকাল মুখে কোন বাত্ম জুলিতে পারিবে না—প্রায়ের ঘুম ভাঙেই!

হীরালালের পা ছুঁটা তারো পাখর হইয়া উঠিল।

তবু তাহাকে বাইতেই হইবে—এখনও বধি একজনকেও সে বাঁচাইতে পারে—হুগুনীর পাপের বোকা হইতে যদি একটুইও কণে।

সে যথেষ্ট ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, 'তবু আমাকে বেতেই হবে ভাইসাহ! বলো বলো কোনদিকে, কতদূরে?'

কাঁধের ও দাতের একটা হতাল শুদী করিয়া কোনমতে পথটা দেখাইয়া দিয়া ছেলটি প্রায় চলিতে চলিতে চলিয়া গেল। আর হীরালাল নিবিষ্ট পথে উল্লসে ছুটিল।

কিন্তু বিবির পর্বত তাহার আর বাইবার প্রয়োজন হইল না। কাছাকাছি আসিতেই নগর পড়িল সর্গার বা। এই পথ ধরিয়া এই দিকেই আসিতেছে। সর্গার ধঃ—কিন্তু এ কী নৃতি তার!

ভয়ে হীরালালও বুক কাঁপিয়া উঠিল।

সাক্ষাৎ কৃতান্ত-সংঘের মতই দেখাইতেছে তাহাকে। দানবীর মুখ আরও দানবীর, আরও পৈশাচিক হইয়া উঠিয়াছে। চোখদুটো অবা কুলের মতই লাল, আর তাহার সর্বাঙ্গে—ছুই হাতে, কাপড়ে জামায়, মুখে মাথায় রক্ত। তাহা রক্তে তাহার জামাটা ভিজিয়া বোধ করি পথে রক্ত কবিত্তে কবিত্তেই আসিতেছে। মনে হইতেছে সাক্ষাৎ রক্তবর্ণ একটা দানব হাটিয়া আসিতেছে।

হীরালালের হাত-পা অশ্ল অনড় হইয়া গিয়াছিল। ছুটিয়া পলাইবার ইচ্ছা হইল একবার, পলাইতে পারিল না। পা ছুটা টানিবারও শক্তি ছিল না, কিছু ভাবিতও পারিল না। আপৎকালে কোন-কিছুই যেন মনে পড়িল না। পাতাশের মত অচল হইয়া দাঁড়াইয়া অদ্বায়ভাবে চাবিয়া বহিল শুধু।

সর্গারের হাতে তখনও একখানা তলোয়ার বহা রহিয়াছে, শেটবও সম্পূর্ণ বাত বাটের কাছ পর্যন্ত হস্তে রাখা, এখনও তাহাতে কাঁচা ক্রবির লাগিয়া। হীরালাল বুকিল মাথার খুন চড়িয়াছে দানবটার, হত্যার বেশা পাইয়া বসিয়াছে। ঐ তববারি এখনই—গামনে আসিয়া পড়িলে—হস্ত তাহাবই পলার উঠিবে।

কিন্তু একেবারে সামনে আসিয়া সর্গার থামিয়া গেল। থামিতে হইল, কাহন হীরালাল দাঁড়াইয়া আছে পথ ছোড়া করিয়াই। একটা জুড় জুড়ি কহিল সে, একবার তলোয়ারটা অভ্যন্তমত জুলিলও, তাহার পরই যেন তিনিতে পারিল হীরালালকে। একবার তাহার দিকে একবার তলোয়ারের দিকে আর একবার স্বপাখিটের মত চাবিদিকে তাকাইয়া দেখিল। বোঝে বোঝে জুড়ি মিলাইয়া গেল লগাট হইতে, প্রায় চুপিচুপি বলিল, 'ও, হীরালাল ভাইয়া?'

আর একবার নিবের বয়েঃ দিকে ও হাতের দিকে চাহিল, তাহপর তলোয়ারখানা ধরে ছুঁড়িয়া কেলিয়া দিয়া পাপলের মত থানিকটা হাসিয়া লইল। তেদনি চুপিচুপি কহিল, 'হীরালাল ভাইয়া আমার একটা উপকার করবে? মালেকানের কাছে যাবে একবার? তাকে ব'লো যে তার বাবা সর্গার তার ছুদু তামিল করেছ, অক্ষরে অক্ষরে করেছে, কেউ বাকি নেই, বাসবাহা কেউ না...আমি—আমি আর এখন বেতে পারছি না। এই থবটো শুধু পৌঁছে দিও তাকে। কেমন?'

আরও থানিকটা হাসিয়া লইয়া সর্গার ধঃ চলিয়া গেল।

হীরালাল আর দাঁড়াইতে পারিল না। সেইখানেই—পথের ধূলায় উপর ধগিয়া পড়িল। তাহার হাতে-পায়ে কোন জোর নাই, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে—ভিতরে

ভিতরে একটা কাঁপুনি লাগিয়াছে—এই প্রচণ্ড ঐশ্বর্য
অপরাজিত হাজার কোন বাছ কারন বা যৌক্তিকতা নাই।

সৌভাগ্যের পথটা তখন নির্জন, খুবই নির্জন। একে
এখানেটার এমনই বশতি কম—আসপাশে অধিকাংশ
বাড়ীই আবাস-গৃহ নয়—সেলেচারী গুদাম। তার উপর
সিপাহীরা এতটুকু আভ্যন্তরীণ ভাবেই একজন যাহারা ছিল
তাহারাও বহুবাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। সিপাহীরাও
কিছু নাই—মুতরাং লোকজন এতটুকু থাকিবার বা
আনাগোনা করিবার কথাও নয়।

হৌদালাল অনেকক্ষণ বিজল হইয়া বসিয়া রহিল।
এত বসে সে কখনও বেঁচে নাই। পূর্বার সময় মামার বাড়ী
হাইত প্রায়ই। মামার এক আতিথ্য কারার বাড়ী বটা
করিয়া দুর্গা পূজা হইত, নবমীর দিন পাঠা ও ধর্ম
বলি হইত অনেকগুলি। পাড়ার অনেকে ‘মানত’ বলিও
হিতে আসিত ঐদিন। খুব ছেলেবেলায় কী দেখিয়াছে মনে
নাই—একটু বড় হইলে সে একবার অজ্ঞানের মত হইয়া
গিয়াছিল। অজ্ঞান সে শুইই রক্ত দেখিয়া নয়, কামাটটার
অবিরাম বলি দিতে হিতে শেষ অবধি মাথার খুন চাপিয়া
গিয়াছিল, সে স্নেহলই মাটিতেছিল এবং খড়স আত্মপন
করিয়া হাজার হিতেছিল, ‘সে আও, আস্তি সে আও!’
তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া সকলে সন্ত্রস্ত এবং কিংকর্তব্য-
বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক চেষ্টায় অনেক কৌশলে
তাহার নিকট হইতে বাঁকা কাড়িয়া লওয়া হয় এবং একটা
হাড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাহার মাথার বাস্তুতি বাস্তুতি লস
চালিয়া তবে তাহাকে শান্ত করা হয়। সেই কামাটটার
কাত দেখিয়াই বালক হীরালাল নাকি ‘ভিরমি’ গিয়াছিল,
সেই হইতে তাহার না তাহাকে নবমীর দিন আর পূজা-
বাড়ী হাইতে হিতেন না।

আজও তাহার সেই অবস্থা হইল নাকি? তবু
সর্গার থাকে বাহাদুরী হিতে হইবে—এতগুলি নবমি
হিয়াও সে প্রকৃতিস্থ আছে।

আর সে? সেই লোকটাকে দেখিয়াই এখন হইয়া
গেল। সে না অগোচর পুরুষ?

মাঝাটার ঝাঁকানি দিয়া যেন নিজেই কিছুটা লজ
কহিতে চাহিল।

এখন তার কাজই বা কি? নির্বোধের মত প্রশ্ন করিল
নিজেই।

হুসেনীর কাছে যাওয়া? আর কি প্রয়োজন? সর্গার
বা তাহাকে খবর দিতে বলিয়াছে—কিন্তু খবর ত সে
পাইবেই।

তবু—হয়ত এখনও তারের আও কি মতলব
খাটিতেছে সে—বিদ্যা পড়িলে এখনও হয়ত সেই সন্তান
তাহার পা পাইতে নিতুল করা যায়।

তাহাড়া—এই সমস্ত রকম অস্বাভাবিক ইতিহাস এবং
বীতল্য ঘটনার পরও—বোধ করি এই সকলেও প্রত্যেকের
সেই নারীকে দেখিবার একটা ইচ্ছাও প্রবল হইয়া
উঠিল। তাই কর্তব্যের বুদ্ধিতে মনকে বোকাইয়া আবার
বীরে বীরে উঠিয়া গাড়াইল।

কিন্তু পা বাড়াইতে গিয়াই যেন একটা বাঁকা খাইয়া
ধামিয়া গেল সে।

এতক্ষণ অর্ধ-অচেতন হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই বোধ
হয় দেখিতে পার নাই—তবু, এই পথেরই প্রান্তে, পাশাপা-
শ্রিতমার মত এক বন্দী গাড়াইয়া আছে, সন্ত্রস্ত তাহারই
হিকে চাহিয়া। ‘সন্ত্রস্ত’ এইবস্তু যে তাহার আপাতমস্তক
বোধগম্য ঢাকা। ঠিক বুঝিবার উপায় নাই।

দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে হীরালালের সর্বাঙ্গে একটা
নিহরণ খেলিয়া গেল।

মুখ এবং সর্বাঙ্গ আবৃত থাকিলেও তাহার মুখিতে
ফেরি হইল না যে ঐ বন্দীই আমিলা।

সে গাড়াইয়া গেল, আর তাহার বশকিয়া গাড়াইয়া
হাইবার ভক্তিতেই আমিলা মুখিতে পায়িল যে হীরালাল-
তাহাকে চিনিয়াছে। হয়ত তাহার বেথা করিবার ইচ্ছা
ছিল না, হয়ত হীরালাল তাহাকে না দেখিয়া চলিয়া গেলে
সে আর ডাকিত না। কিন্তু এখন আর আত্মপোষণের
প্রয়োজন রহিল না, সেই হীরালালের দিকে আপাইয়া
আসিল।

কাজে আসিয়া মুখের উপর হইতে বোরখা উন্মোচন
করিয়া একপ্রকার অস্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠে কহিল, ‘তুমি
এখানে কেন? কী করছ?’

তাহার চোখের দিকে চাহিতে পারে নাই হীরালাল—

কাছে আসিতেই মুখ নামাইয়াছিল। তেমনি ভাবেই বীরে বীরে অবগন হিল, 'আমি—আমি আপনাকে এ কাজ থেকে, এই দৰ্শনাগ থেকে নিবৃত্ত করবার অস্ত্র এনেছিলাম বেগম-মাহেবা, কিন্তু আমার দেরি হয়ে গেছে। আপনাব উদ্বেগ সিদ্ধ হয়েছে—একজনও আর ওখানে বেঁচে নেই, সর্গার বা সব শেষ করেছে। সে নিজে আপনাব কাছে আর যেতে পারেনি—আমাকে এই খবরটা দিতে বলে গেছে।'

বলিতে বলিতেই তারাব গলা তাকিয়া আসিয়াছিল, এবার সে হ-হ করিয়া কঁাদিয়া ফেলিয়া কহিল, 'কেন, কেন এ কাজ করলেন বেগম মাহেবা, কেন এমন দর্বনেশে বুদ্ধি আপনাব মাথার এল? আমি যে আপনাব সম্বন্ধে খারাপ কিছু ভাবতেই পারি না। আমি যে আপনাকে দেবী বলেই জানি।'

আমিনা রক্ত কণ্ঠ কোমল হইয়া আসিল। সে কাছে আসিয়া হীরামালার কাঁধে একটা হাত রাখিল, তারপর উৎসাহে হাঙ্গামা করিল, 'মিথো একটা খাবার নিয়ে কষ্ট পান্ধিলে, ভালই হ'ল জুল বেড়ে গেল। আমি যেহী নই, মানবীও নই—আমি পিশাচী—এই আমার সত্য পরিচয়। যদি কখনও তোমার কাজে এগে থাকি, যদি কোন উপকার ক'রে থাকি ত সে নিজের স্বার্থের অজ্ঞেই করছি।'...জু'মি আমাকে জুলে বাও। নিতান্ত জুলতে না পারো, আমার ব্রহ্মপুত্র বেধে গেলে—পিশাচী বলে ঘৃণা ক'রো। তা'লে আমার অশান্তি ভোগ করবে না।—এ সব গোলমাল থেকে

বাঁচতে চেষ্টা করো হীরামাল—এখানে আর থেকে না। ইংরেজ আগছে—তার প্রতিহিংসার মূগে পড়লে জু'মি ধাঁচবে না।...যাও লক্ষ্যেতে যাবে যাও, যেমন ক'রেই যোক তোমার দপ্তরে গিয়ে যোগ দাও। ইংরেজের আশ্রয়ই তোমার সবচেয়ে নিরাপদ। বেশ কিধে যেতেই বলতাম—কিন্তু এখন আর নিরাপদে তোমার বেশে কেহবার উপায় নেই। জু'মি আজই লক্ষ্যে রওনা হও।...আর আর মনে রেখো আমি পিশাচী, খবরদারী—আমাকে ঘৃণা ক'রো।'

এবার হীরামাল মুখ তুলিয়া চাহিল, অস্বস্তিক্ত গাঢ়কণ্ঠে কহিল, 'জু'মি পিশাচী নও, জু'মি দেবী। যখন জু'মি আমার প্রাণ ধাঁচিয়েছিল—তখন স্বার্থের কথা ছিল না। এখনও আমার কল্যাণ চিন্তাই করছ। জু'মি যা করেছ—যা করছ তার স্বর্ষ জু'মিই জানো। আমার কাছে জু'মি দেবী। তোমাকে আমি জুলে ন'—তোমাব বিচারক করব না। এ প্রাণ তোমাবই দেওয়া, হতদিন প্রাণ থাকবে, তোমাবই মঙ্গল চিন্তা করব—মনে মনে তোমাকে পূজা করব।'

আমিনা আর কথা কহিল ন', ত্রঃ পোরখাটা আখার মুখের উপরে ফেলিয়া হিল—কেন ত'নে উদ্ভট অস্ত্র গোপন করিতেই কি না—তারপরে ক্রতসঙ্গে দেই লক্ষ্যে ধু'লি-বহুল উত্তর পথ ধরিয়া প্রাণদেবী বিকে ক্রিয়া চলিল।

ক্রমশঃ



২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

প্রীতির রীতি শ্রীমদীর গুণ

(১)

বাধার সংসার কবে সলানক্ষয় হবে ?
 মাথুরের বহি-বাঁহে দহিবে না হিয়া ।
 বিশ্ব-বৃন্দাবন ভরি' চির দিবা-নিশি ধরি'
 কল-কণ্ঠে অমরগল গাহিবে পাশিরা !—
 এই প্রণ বার বার চিন্তে তোলে মাধাকার ।
 বস্ত-বাধা—বেহ-বাধা, বাধার বাধায়
 প্রেমত বধুনা-পারে বাধা-চিন্ত-বীণা-তানে
 আতনার সুরে ছুটে দূরে তেমে যায় ।

(২)

সে সুর মধুরা শোনে ; মাগবের দৃষ্টি কোণে
 ছুটে ওঠে ঐশ্বর্যের ছবি অকস্মাৎ :
 বিরহিনী বেদনার ভূমিতে বৃদ্ধি যায়,
 দুর্জ-বোধে ললাটেতে করে করাবাত ।
 মধুরাত্ত লত কাখে বিরহ-রাগিনী বাজে ;
 উন্নয় মনের মাঝে কাপে আলোড়ন ।
 মধুরা ভাবিতে থাকে কি করিয়া কোন কক্ষে
 ছুটে যাবে—বন্ধে পাবে চির বৃন্দাবন !

(৩)

বৃন্দাবন মধুরার চেরে ঘরে বাবে বাবে ;—
 মধুরাত্ত বৃন্দাবনে চারি অহরহ ।
 অনুভূত-গগল-মিশ্র এ কী দিবা প্রেম-ভূষা !
 অনিবার্য প্রেমলস এ কোন বিরহ !
 যুগ যুগান্তর যার তুকা তো ছাড়ে না হার ;
 রাগা-কৃত লক্ষ লক্ষ চিন্তে ফেলে ছায়া ।
 বৃন্দাবনে মধুরায় প্রেমাত্মিতে শুধু যায়
 কাহার মাধুর্য কেন কেঁপে মরে কায়া ?

(৪)

শুধায়ো না কেন কীদে ? কেন বন্ধে বন্ধ বাঁধে ।
 বধুনাও চলোমিতে রতে ব্যবধান ।
 শাখত লীলা যে এই ; প্রেমের অগনি নেই ;—
 বামিবে না বৃন্দাবনী মাথুরের পান ।
 রাগা-কৃত কাঁহিবেই— আলসনে বাঁধিবেই ;
 ব্যবধান বচিবেই চিরদিন ধরি' ;
 এই তো প্রীতির রীতি চক্ষে অল ভবু গীতি ;—
 অভিন্নের ভিন্ন রীতি বৃধা আশা করি ।

বক্ষুত

ঐ অরীক্ষাণিৎ যুথোপাখ্যায়

ভাং ইয়া । আমি বহু তোমার ;
এ'র নাস্তে আর হবে না'ক কোন ছেপ ।
পাহাড় যে দিন ধূলা ধরে যাবে,
নদী হবে জলহীন,
শীতকালে হবে বর্ষার সমাবেশ,
গ্রীষ্মেতে হবে ভূষার-প্রপাত,
আকাশ পড়িবে পৃথিবীর কুকে ভেঙে
দেইদিন হবে তোমার আবার ছাড়াছাড়ি ;
তার আগে নয় কোনদিন ।

২

তুমি চলিছাছ গাড়ী চড়ে,
আর আমি হেঁটে চলি মাথার ঝড়ের চৌকা ।
এই বেশে বহি দেখা হয় হু'লনার
একদিন বাস্তব,
তা'হলে অমনি গাড়ী থেকে নেমে তুমি
জানাবে আমাকে তোমার নমস্কার ।
আমি চলিছাছি আমার ঘোড়ায় চড়ে,
তুমি কিংবদন্তী ছাড়াটি মাগায়
হাস্তায় বলে বেচিতেছ টুকিটাকি ;
এমন সময় দেখা হলে হু'লনার
আমি ঘোড়া থেকে তুলুপি নেমে
গুণাব তোমাকে কুশল ও সমাচার ।

অতিক্রম আবদী যুথোপাখ্যায়

একটি চেতনা থাক জীবনের মৌন মর্মস্থলে,
একটি আকাশ থাক লবণাক্ত সমুদ্রের পথে,
একটি উজ্জল স্রোত সমুদ্রের দিকে গিরে ভুলে
দুতীর সবুজ দেশ গুলে থাক আলোর প্রহর।
যেবেলা মুহূর্ত ঘরে সরে থাক কূলে-উপকূলে।

তাহলে সমুদ্র-স্বর্ষ স্বপ্ন হতে পারে বা কখন,
তা না হলে এ অরণ্যে অন্ধকার,
এ মাটিতে মৃত্তির গড়ন
অসম্ভব; বিস্তৃত আমি প্রত্যাহের ঝড়ে।
নীড়ে সে ফিরে আসি, তবু তার আকাশের মন
মুহূর্ত আবেশ তেনে অস্ত্র কোনো মহাবেশ গড়ে।
কী করে সে ভুলে যাবে একদা যে তারও স্বেদগণ
ছিল, ছিল এ আকাশ-ছোয়া পলালের নত
বিস্তৃত শেকড়ে তার বসন্তের বর্ণাশ্রম ব্রত।

প্রত্যাহের পরাক্রম যেনে নিম্নে
আকাশের অবাধ উচ্চারণ
তবু আমি, তবু এক অতলান স্বর্ষের পতীরে
মুখ দেখি, দুর্যোগ্য জ্বরেব নিশ্চিন্ত ভিত্তিরে
নব জগৎ ফিরে পাই; এই সব কাঙ্ক্ষার প্রহর
যেনেও মানিনা তবু কী আবেগে উপভোগ করি
যন্ত্রণা দুঃখের দায় : শাশ্বত স্বপ্নের প্রহরী
আমানের অজুওবে তালো-মন্ড-মুখ-মুণ্ডে সব
অতন্ত্র ঐশ্বর্ষে তারা বার বার বিচিত্র উৎসব।

পৃথিবী তোমার মনে কুমুদ ভট্টাচার্য

পৃথিবীটা মনের মধ্যেই
বাইরে তো নয়,
মন মন মনই লবণানি
মনই এক আনন্দ নিলয়।

স্বর্ষ ওঠে অস্ত্র যায় আগে চাঁদ তারা
মনের আকাশে,
তোমার মনের রক্ত মূষে যেখে নিয়ে
হাজা যেখ হাঁসে।

বন নদী-সাগর পাহাড়
গৃহ আর গৃহ-আয়োজন
পশু আর পাখি আর
চেনা আর অচেনা সকলে
প্রিয়া আর প্রিয় পরিজন
সবই তো তোমারি মনে বাঁচে।
তোমার জ্বর বাচে তারা,
তুমি চাও তাই তারা আছে।

তুমি মনহীন হলে পৃথিবী কোথায়।
বিমন তোমার মনে স্বর্ষ ডোবে চাঁদ মুছে যায়।

মনোলালীনা

শান্তশীল হাস

তুমি তো আসবে জানি : এ প্রদীপ জলবে দেখি।

আজ যদি এ আধারে নাহি বাজে বীণ,

না বাজুক, ক্ষতি নেই ; নীরব নিঃস্বপ্ন

থাক না আবার গৃহ, আর ছুটি চোখ ঘুমঘুম ।

নেবােনো প্রদীপখানি বাজুক না একপাশে পড়ে ;

বীণাখানি যদি কেউ নাই তুলে নেয় সমাধরে—

না তুলুক । তবু সেই নেবােনো প্রদীপ

আর গীতহীন বীণা,

আমার গম্বী হয়ে থাকুক আধার ঘরে :

কতদিন ? জানি না, জানি না ।

জ্বলু রানি, একদিন এ প্রদীপ জলবে,

এ বীণা যবেদর কথা বলবে ।

তোমার হাতের ছোঁয়া লাগবেই লাগবে ;

ভাঙবে ঘুমের ঘোর অচেতন মন আবার আগবে ।

কাজল পরো

(কৃষ্ণকপিকে)

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

তোমার চোখে ডাকিয়ে বেখে কেউ

কখনো খোঁজে বনদ্বীপল নির্জনতা শান্ত ।

—ওখানে অবগাহন করে করে কখনি ঢেউ

এমন করে কোলাতে পাবে, আগে কি মন জামতো ।

ও' মুখে যেন বরষাঘরা অনাগতে ছায়া

এই মনেহি অন্ততলে ডাকে—

ওই মুখেরি মিষ্টি এক মাত্রা

কি আলো জ্বলে শুষ্কপালে, মবীমন্তলু বাকে ।

শে আলো তুমি আবার আলো, আবার তুমি জ্বালে ।

অবদান বাধীর মতো মহানিবিড় টানে ।

তোমার চোখ আমাকে হিলে মেঘমেঘর আলো,

এ' মন বলে তোমার কানে কানে,

—কাজল পরো, কাজল পর : মজল ছুটি চোখ

আবার কুক মুষ্টি ঢেলে নৃত্যময় হোক ।

তিবর্তি ঘুসর চড়াই

অনুপম রায়

স্বতির রাত নুপুর

তবু মাকে-মাকে

কাজে ও অকাজে

বাগিয়ে শীতের ছপূর

হঠাৎ যখন ছুরোর,

ভখনো ডাকিয়ে

মেখেছি, ফাঁকি এ—

ভাঙা পাঁজিরে ছুড়োর

তিমটি খুঁদ চড়াই,

বোঝের সোনার

বে-পান শোনার

মন যে সেখানে ছড়াই ।

পঞ্চ দেবতা

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

দুস্ত নারক—সোমেশ বাসনার

দুস্ত নারিক—সুদিত্রা মিত্র।

অদুস্ত নারক :—

ভ্রামল চৌধুরী।

মল্লয় কুমার।

বপন সেন।

ভাপল বোস।

অদুস্ত নারিক :—মনীষা দাসগুপ্ত।

হান—সুদিত্রাধের বাড়ীর দ্বিতলের বারান্দায় একাংশ।

কাল—সন্ধ্যা ; সাতটা বাজিতে পনের মিনিট।

[সোমেশ বারান্দার পায়েচাওরী করিতেছিল। সামনে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখিয়া সে ঠাড়াইয়া পড়িল এবং ছবিখানাকে অভিনিবেশ সহকারে দেখিতে লাগিল। এখন সময়ের পালের বরণী দিয়া সুদিত্রা আসিয়া প্রবেশ করিল। সুদিত্রা সুপ্রী। বয়স বাইশের বেশী হইবে না। বেশভূষার অভিনববেশ সুকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।]

সুদিত্রা। (নমস্কারের ভঙ্গীতে) নমস্কার! অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে বেছেছি আপনাকে। বিরক্ত হইতেছেন বোধ হয়?

সোমেশ। (প্রতিনমস্কারের ভঙ্গীতে ডান হাতের তর্জনীটি কানের পাশ পর্য্যন্ত তুলিয়া) নমস্কার! না, বিরক্ত হবার মত অপরাধ সমগ্র আমায় নেই মিত্রির সাহেব। আর ভগবৎ বৃত্তির প্রসন্ন আমি দ্বিষ্ট নই। বস্তু না দেওয়া যায় ততই ভাল। তবে বর্তমানে একটু দারৈ পড়েছি। সবকে পড়েছিও বলতে পারেন। বাকি আপনাদায় বলে থাকেন গরম বড় বালাই তাই হয়ে ঠাড়িয়েছে আমার।

সুদিত্রা। অর্থাৎ?

সোমেশ। (সুদিত্রাকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া)

অর্থাৎ উত্তর দেব পরে। তার আগের প্রশ্ন হচ্ছে আপনাকে কেমন বেন ব্যস্ত বলে মনে হচ্ছে।

কোথাও যাবার তড়িৎ আছে নাকি?

সুদিত্রা। (বাড়ি নাড়িয়া) না তড়িৎ নেই, আছে বাসনা।

সেই বাসনা মেটাবার এটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

সোমেশ। ভাল কথা। আপনার বাসনা সিদ্ধ হোক। আমি বিদায় নিচ্ছি।

[প্রস্থানের ভঙ্গী করিল]

সুদিত্রা। (মিত্র কটিয়া) ওকি কথা! আপনার মত লোক বাবের বেশেও আনন্দ হয়, এত সহজে কি তাবের হেঁড়ে বেওয়া যায়! বহুদ, দিল্লীর গল্প এখনও শোনা হয়নি আমার।

সোমেশ। এটা যে আপনার অভিশ্রোতি নই সে কথা বুঝি। তবে আপনার ঐ 'বাবের' মধ্যে আমি একজন এতবড় ভাগ্যবান বলে নিজেই মনে কর্তে পাচ্ছি না মিত্রির সাহেব। একথা আপনিও জানেন, আমিও বুঝি।

সুদিত্রা। (কটাক্ষে চাখিয়া) আপনি ভগতে জানেন বেছেছি।

সোমেশ। (বাড়ি নাড়িয়া) না, তবে জানলে বোধ হয় ভাল হোত। তাহলে দ্বিত্তা দুর্ভোগ এবং ছুটো-ছুটি এগিয়েই হাত থেকে রেহাই পেতাম আমি।

সুদিত্রা। এটা কি আপনার মনের কথা বাসনার সাহেব? আমাধের মধ্যে পরিচরটা কি দুর্ভোগের পরিচায়ক বলে মনে করেন আপনি?

সোমেশ। এতদিন করিনি। বরঞ্চ উন্টোটাই ভেবে এসেছি। কিন্তু বর্তমান পতিব্রতি মনের কোলকটিকে এমন এক বিপরীতমুখীক দিতে সক্ষম করেছে যে সম্বোধের আবারও পড়ে গেছি।

সুনিজা। সন্দেশ ? এ তো ভাল কথা নয়।

সোমেশ। ভাল যে নয় সে কথা বুঝি।

সুনিজা। সন্দেশ জিনিশটাই বড় মারাত্মক হাস্যাত্মক সাহেব। গুর পরবার্হু বাক্যেতে দেওয়া সুবিধানের কাৰ্য্য নয়।

সোমেশ। এবিষয়ে আপনাব মতের সঙ্গে আমার মত মিলে গিয়েছে মিত্তির সাহেব। একটা মৌমাথা করবার অন্তই আপনার কাছে এসেছিলুম। কিন্তু দেখছি এসে পড়েছি অপনয়ে।

সুনিজা। (হাতের বড়ির দিকে তাকাইয়া) না। ঠিক দময়েই এসেছেন সোমেশবাবু। আমার অপনয়ের পালা শুরু হবে সাতটাের পর। তার পেরী আছে অনেক।

সোমেশ। অর্থাৎ—

সুনিজা। অর্থাৎ উপস্থিত বলতে পাবেন আপনি, যা বক্তব্য আপনাব।

সোমেশ। কিন্তু বক্তব্যটা একটু যোয়াল। সোজা কথায় বললে, বৃত্তেতে কষ্ট হবে আপনাব। তাই একটু ঘুরিয়ে বলছি। (একটু বামিরা) একটু আগে যে সন্দেশের কথা বলেছিলুম তার মৌমাথা না হওয়া পর্য্যন্ত বৃত্তি পাঙ্কি না সুনিজা দেখী।

সুনিজা। (বুঝিতে না পারিয়া) বলুন কি করতে হবে আমাকে।

সোমেশ। বিশেষ কিছু না। একটা উত্তর পেতে চাই আপনাব কাছে থেকে। তবে পেটা সহজ এবং সহল হওয়া চাই।

সুনিজা। (হাসিয়া) প্রশ্নই শক্ত হয়ে থাকে সোমেশবাবু অন্ততঃ এই আমার আনা ছিল ছাত্রীজীবনে। উত্তরও যে শক্ত হতে পারে এ আমি জানতুম না। বেশ আপনাব বক্তব্য বলুন, চেষ্টা করে দেখি, সহজ করে উত্তর দিতে পারি কি না।

সোমেশ। পারবেন। ইচ্ছা করলেই পারবেন। প্রশ্নটা কিছু নুতন নয় এবং আপনাব অজানাও নয়। যদি শ্রুতিশক্তি একেবারে বিকল না হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে একটু চেষ্টা করলেই মনে পড়বে যে এ প্রশ্ন

আমি আপনাকে আরও একবার করেছিলাম, এই করে ঠিক এইখানে বসে।

সুনিজা। (ভাবিবার ভান করিয়া) মনে পড়েছে। সে দিন আপনি প্রশ্ন করেছিলেন যে সহকারী বৃত্তি যদি পান তাহলে কোন দেশে যাবেন উচ্চশিক্ষার জন্য, ইংলণ্ড না আমেরিকা ?

সোমেশ। এ প্রশ্নটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয় মিত্তির সাহেব। যার অন্তে অবশ্য আপনাব সমস্ত অপব্যবহার করাব আমি। সেদিন আমার প্রশ্ন ছিল—

সুনিজা। মনে পড়েছে। একটু স্মৃতির সঙ্গে উপমা দিয়ে কি যেন বলতে চেয়েছিলেন আপনি।

সোমেশ। বলেছিলুম যে একই সূত্রে আমাদের উভয়ের ভাষ্যকে গাঁথা সম্ভবপর কিনা। সুনিজাব যুগ আরম্ভ হইয়া উঠিল। সোমেশ একটু অপেক্ষা করিল, তারপর আবার বলিল :—

সোমেশ। এব উত্তর সেদিন এড়িয়ে গিয়েছিলেন আপনি। আমাদের না প্রবণ না বর্জন নীতিই পুনরভিনয় করেছিলেন সেদিন। কোন বস্তুই ধরা ছোঁয়া না দিয়ে, আপন অনবরত ভ্রমিয়ার, চট্টল বাস্তব পরিহাসের মধ্যে প্রশ্রুতিকে নিঃশুন করিয়ে। সেদিন হার যমো-ছিল আমার। তাবলন্ত পনের দিনগুলিতে স্নোভের সীমা ছিলনা এই ভেবে যে এত বড় একটা প্রশ্ন, যাব উপর নির্ভর করছে জীবনের অনেক কিছুই, তাব একটা সহল এবং সহজ সমাধান কেন করে নিলাম না সেদিন। তাই দিল্লী গিয়ে পর্য্যন্ত বৃত্তি পাইনি। মনে হত, বিদেশ যাওয়া যদি ঘটে সত্য সত্যই, তাহলে পদম্পরের মাকে একটা ছুঃখ প্রচারী হয়ে যাবে চিরদিনই। তাইত দিল্লী থেকে গিয়ে পাঠালুম জানতে আপনাব স্থলটি প্রতিমততা।

সুনিজা। যদি বলি দিল্লীর চিঠি পাইনি আমি।

সোমেশ। (সহাস্তে) আপনাব অস্বীকার করবার ভয়টাই বলিয়ে দিলে আপনাকে মিত্তির সাহেব। শুধু যে আমার চিঠি পেয়েছেন তা নয়, আমি জানি এব ঘবেই সে চিঠিখানা পড়াও হয়ে গিয়েছে অন্ততঃ বিশ্ববার।

সুমিত্রা। (প্রতিবাদে ভঙ্গীতে) কখন না। বিশবাস
কখন পড়িনি আমি। একথানা চিঠি বিশবাস
পড়বার মত অসুস্থ অবসর নেই আমার। তা ছাড়া
চিঠি আমি সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াই না যে পড়ব সব
সময়।

সোমেশ। (বিত মুখে) আচলে গেহো দিয়ে বেগেছেন
একথা বলিনি আমি। তবে জানি, ওখার বেগেছেন
যেখানে সে চিঠিখানা রয়েছে তোলা। যদি অসুস্থ
হেন, আমি নিজেই না হর বের করে আমি খুঁজে।

সুমিত্রা। (হাসিয়া কেলিয়া) আপনি বেখিৎ সর্জত।

সোমেশ। অস্ততঃ অস্ত নই একবার। নিবুদ্ভিত্যর যে
ভুল করেছি গতবারে, সুবুদ্ধি থাকতে থাকতে তথ্যে
নিয়ে চাই সে ভুল। সেজন্য বিদ্রী থেকে ফিরেই
ছুটে এসেছি এখানে।

সুমিত্রা। ভাল করেছেন। আমি খুশী হয়েছি। স্ত্রী
পুরুষ আপনারা, আপনাদের দেখলেও আনন্দ হয়।
এবারে বলুন, বিদ্রীর গল্প আপনাদের। কিন্তু তার
আপে জানিয়ে দিই, এত ছোটোছোটো করে আপনাদের
কোন প্রয়োজন ছিল না। বীরে সুস্থে এলেও আমি
খুশী চতুর্ন, এবং গল্প না শুনে ছাড়তুম না আপনাকে।

সোমেশ। প্রয়োজন ছিলেনই সমান নয় সুমিত্রা ঘেঁই।
প্রয়োজনেও আভিপ্ল আছে। আপনাদের
প্রয়োজন যেখানে চলে মনোজ্ঞাত্য তালে, আমাদের
প্রয়োজন হয়তো চলতে চায় দেখেনে বেসু বিয়ে।
গতগোল ত দেখেনেই। সেইজন্যই না এই ছোটোছোটো।
(অকস্মাৎ গলার বর বদলাইয়া) এ আমার ভাল
লাগে না, সুমিত্রা ঘেঁই। একই কথা নিয়ে বার
বার বিরক্ত করতে আপনাকে আমার লক্ষ্য করে
নির্ভরই। তাই এর চরম নিষ্পত্তি করে ফেলতে
চাই আজই। আমার আশি সবচেয়ে আপনাদের
মতামতটা জানতে পারলে এ নাটকের ওপর যাবনিকা
টেনে দি।

সুমিত্রা। (বঠে হাসি দোপন করিয়া) আপনাদের লক্ষ্য
আমি আন্তরিক চুপ্তিত হালদার সাহেব। আশি
শেষ কর্তে আপনাদের বিলম্ব হয়ে গিয়েছে কিংবা।

সোমেশ। (সাক্ষ্যে) 'টাইম বাড'। কি সর্বাংশ।

চাকরীর উদ্দেশ্যের মত এখানেও কি 'টাইম বাডের'
প্রশ্ন আছে নাকি? দরখাস্তের শেষ দিন ছিল
কবে?

সুমিত্রা। (মুখ নীচু করিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে) না
টিক তা নয়। তবে আরও—

সোমেশ। তবে হচ্ছে আরও আশি হাতির হয়েছে নাকি?

সুমিত্রা। (সমজ্ঞভাবে সম্মতিগতক বাড় নাড়িল।)

সোমেশ। ওঃ! জানতে পারি ক'খানা এখানের আশি
এশে হাতির হয়েছে আশি পর্যন্ত?

[সুমিত্রা এবারও কথা কহিল না। শুধু তর্জনী তুলিয়া
হাতের চাটী আঙ্গুল দেখাইল।]

সোমেশ। (চমকিতভাবে) একগণ্ডা! পুরোপুরি একগণ্ডা!

সুমিত্রা। (দুঃস্বরে) আপনাদেরখানা পাঁচ নম্বরের।

সোমেশ। চারের পরেও আছে পাঁচ? (ব্যঙ্গ করিয়া)
কলিকাতার জোপদী! সুন্দরী সুমিত্রা ঘেঁইকে
দিয়ে পঞ্চপাত্তর বিদ্রাঘধান! কিন্তু কর্ণ এবং কর-
জ্ঞব, কি অপরাধ করল এরা? তাদের আপন সূত্র
বাক্য কেন?

সুমিত্রা। জানিনা। কিন্তু আপনাদের উপমাটা বড় সেকলে
বল হালদার সাহেব। বিপদী, ত্রিপদী, চতুর্পদী
অথবা জোপদী এদের কোনটাকেই পছন্দ করবে না
আধুনিক বয়সের। পঞ্চ পাণ্ডব না বলে, বসু
পঞ্চ দেবতা। এতে সন্তুষ্ট হবেন তাঁরা।

সোমেশ। (স্বেরসরে) পঞ্চ দেবতা? দেবতা না, ভূত?

সুমিত্রা। (হাসিয়া কেলিয়া) হাস করে যে নামে ইচ্ছে
অভিহিত করতে পারেন তাঁদের। তাতে তাঁদের
কিছু এসে থাকে না।

সোমেশ। না? আচ্ছা বলুন তো এই সব ভূতের দল
ক'রা? ঘেঁই বোঝার হাতে ভূত পালায় কিনা।

সুমিত্রা। এদের সকলকে চিনবেন না আপনি। চিনবেন
বাক্য, তার কথা আপনাদের কাছে বলা বাহুল্য যাত্র।
তাছাড়া জানেন তো হুঁদ এবং ভালবাসি ক্ষেত্রে এক
পক্ষের কথা জানতে নেই অপর পক্ষকে। এতে
বিশ্বাস তত করা হয়। (সুমিত্রা হাসি গোপন
কহিল)

সোমেশ। (বিশ্ব মুখে) ভাল কথা। আমি জানতে চাই না। এমন ভুলভুলে কাজের মধ্যে আমি নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখতেও চাইনা। তাই আপনাকে জানাতে চাই যে সুমিত্রা দেবীর রত্নমণ্ড থেকে সোমেশ হালদার বিদায় গ্রহণ করল আশ থেকে।

সুমিত্রা। (বিশ্বের তান করিয়া) সে কি হালদার সাহেব! এমন অশুভকণে কথা বুঝেও আনবেন না। আপনার নাম নিয়ে হাতে আমি লিখে বেবেছি। ওয়েচিং লিষ্টে।

সোমেশ। বক্তব্য, অশুভ বক্তব্য আপনাকে। এর পর আর প্রোবান হবে না, কিছুই। ভালবাসার ক্ষেত্রে 'কিউ' ফিরে দাঁড়িয়ে ড'ভেভা'তি করতে রাণী নই আমি সুমিত্রা দেবী। এই মুহূর্তেই আমার আঁজ প্রত্যাহার করে নিতে চাই।

সুমিত্রা। আপনি বড় বেশী নিরাশ হচ্ছেন হালদার সাহেব। এমনও শু হতে পারে—

সোমেশ। (বাড় মাড়িয়া ঢুককণে) না কিছু হতে পারে না, অনিশ্চিতকে ভেবে অনর্থক মাথায়ে ব্যস্ত করে তোলাই পক্ষপাতী আমি নই। বীর ছাড়া যে সুন্দরী নারী অপরের ভোগ্য হতে পারে না, এ মতবার আমার নয়। তাই অজুনের মত স্তম্ভকে ধরন করবার অথবা পুত্রিয়াম সংস্কার কাহিনীর পুনরতিনয় করবার বাসনা আমার নেই।

সুমিত্রা। ('সান্ত্বনামে') আপনি অনর্থক রাগ করছেন হালদার সাহেব। এরকম কোন ইঞ্জিওই আমি করিনি।

সোমেশ। (হাসিয়া ফেলিয়া) আপনার অতি বড় শত্রুও এ অপব্যব হবে না আপনাকে। এ আমার নিজস্ব খেদোক্তি মাত্র। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি রাগ করিনি। কেন করব? নিজের অকমত্যে অন্তে অতিশ্রান্ত বহি কাউকে দিতে হয় ও যেব নিজেকেই। অপহকে দোষী করব কি অজুহাতে? তবে একথা ঠিক, বর্তমানে মন যে আমার একেবারে নিবাত নিঃশব্দ এবং কলুষহীন, এ কথা বলিনি। দেখানে একটা ঈর্ষার ঢেউ আছাড় খেয়ে খেয়ে

পড়ছে। তবে সে সম্পূর্ণ অপ্রকৃষ্টে। প্রকৃষ্টে কিন্তু মন আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। ভাল-বাসার মত চূড়ান্ত পরার্থ বা মাহুষের সারাশীষনের মধ্যে একবারও আসে কিনা নন্দেব, তাইই অতি প্রাচুর্য্য আপনার ভাবনে সেবে সে বিশ্বের হতবাক হয়ে খিঁচছে আর আপনার ভয়গাম গাইবার মতো আকুলি বিকুলি করছে। তারই লগ্নে মূর মিলিয়ে আমারও বপতে ইচ্ছে করছে, 'জয় সুমিত্রা দেবীর জয়,' জয় মিত্তির সাহেবের জয়'।

সোমেশের এই উজ্জ্বল সুমিত্রা এবার সত্য সত্যই লজ্জিত হইল সে অসন্ত মুখ মত করিল।

সোমেশ। শুধু এই সমস্তার দমাগান করবার জন্য আমি করিন থেকে বড় ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলাম। আজ সে সন্তোষ সমাধান হয়ে গেল। আমিও নিশ্চিত হলাম। আজ্ঞা, এবার উঠি তাহলে। নমস্কার সুমিত্রা দেবী।

সুমিত্রা। বাঃ এই মধ্যে বাধেন কি করে? এখনও যে ফিল্মই পর শোনা হয় নি আমার।

সোমেশ। শুনবেন এখন আর একদিন। আর নয়। কথা বিজি, এ বেশ ছেড়ে যাবার আগেই আপনাকে শুনিবে বাব দহ।

সুমিত্রা। (চকিত হইয়া) যানে? বেশ ছেড়ে যাবার কবার অর্থ?

সোমেশ। (নিশ্চিত ভাবে) অর্থ এমন কিছু নয়। আমি আমেরিকায় যাচ্ছি সুমিত্রা দেবী। আপনি তো জানতেন যে বিশেষ উচ্চ গবেষণা করবার জন্যে বরাবরই আমার বাসনা প্রবল। সেইজন্য একটা সরকারী বৃত্তি সংগ্রহের চেষ্টার ব্যস্ত ছিলাম করিন।

সুমিত্রা। আমি। কিন্তু শুনেছিলাম, সে বৃত্তি নাকি শেষ পর্যন্ত হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল আপনার?

সোমেশ। বা শুনেছিলাম তা মিথ্যে নয়। (একটু বোঁজা হিয়া) হচ্চিন শুনে একটু আশঙ্কিতও হয়েছিলাম নিশ্চয়ই।

সুমিত্রা। আমার লত?

সোমেশ। কারো সাত লোকগানের সমাধে আমি বাধি না। আপনি প্রথমটি শুনেই নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু তার পরেরটি শোনেননি। সেইটাই বলি। এ আমি আশা করিনি, স্বপ্নও, ভাবিনি। অথচ সম্ভবপর হল। জুটল একটা আমেরিকান বৃত্তি। এ বৃত্তির দামও অনেক, মানও অনেক। এর মেচার পাঁচ বৎসরেই।

সুমিত্রা। (বিবর্ণমুখে) পাঁচ বছরেই? আপনার মন-জামনা পূর্ণ হয়েছে হালধার সাহেব। এ আশঙ্ক্য কথা। আপনাকে অনেক ছুটোছুটি করতে হয়েছে এর ক্ষেত্রে।

সোমেশ। তা হয়েছে। এরাই ক্ষেত্র আমার বিল্লী খাওলা। শেদিন আশাভঙ্গ হয়ে বিল্লীতে বসে পাড়েছি, এমন সময় কলকাতা থেকে 'তার' গেল। কিংবে এসে দেখি, বৃত্তি মজুর হয়েছে। মনে হল, ভগবানের আশীর্বাদ। তিনি হয়তো ভাবলেন এ ছেলেকে লব দিক থেকে বঞ্চিত করা অসঙ্গত হবে, তাই মজুর করলেন এ দিকটা। অসঙ্গত এর পেছনে আপনারদের মত শুভাভ্যুত্থানের কল্যাণ কামনার মূল্যও কম নয়। যাটা আমাদের ভালবাসে, অংশিনিশি মঙ্গল কামনা করে, তাদের কামনার গোয়েই যে এ যোগ-সাজসু এ কথাও আমি অস্বীকার করি না।

সুমিত্রা। (অভিমান ভরে) আমরা আপনার মঙ্গল কামনা করি এ কথাটা ঠিক বল না হালধার সাহেব। বরঞ্চ বিপরীত কামনা করে থাকি। একটু আগেই এ কথাটা বলেছেন।

সোমেশ। (হাসিয়া) সেটা করে থাকেন অগ্রকাশে। বৌটু করে থাকেন তাহও তো কল একটা আছে।

সুমিত্রা। থাকবেও কথা। তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি ভাল লাগে না। বলছিলেন না, আমেরিকায় না ইংলণ্ডে যান্নে কোথায়?

সোমেশ। কালিকোনিয়ায়। বছর পাঁচেকের ক্ষেত্রে। অসঙ্গত আমেরিকান গভর্নমেন্ট পাঁচ বছরের ক্ষেত্রে টাকাটা মজুর করলেও, যেন হয় এতদিন থাকার প্রয়োজন হবে না। যে কাজ করবার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া

সে কাজে ইতিমধ্যেই একটু অগ্রদূত হয়ে রয়েছি আমি। ভাগ্য যদি অগ্রদূত হয়, বাধ্য যদি না আসে কিছু, থাকটুকু শেষ করতে তিনটে বছরের বেশী সময় লাগবে না বলেই আমার ধারণা।

সুমিত্রা। ভাগ্য আপনার প্রতি অগ্রদূত নয়। থাকি কাজ আপনার তিন বছরেই শেষ হয়ে যাবে হালধার সাহেব।

সোমেশ। সে ক্ষেত্রে হাতেছাড়। হয়ে যাবে অনেকগুলো টাকা। স্ত্রী অমুখারী যে টাকা মজুর হয়েছে, তার সবটাই পরচ করে আসতে হবে সেখানে। সন্তে করে নিয়ে আসতে পারব না কিছুই।

সুমিত্রা। তাহলে পুত্রোপরি পাঁচ বছরই থাকতে হবে সেখানে?

সোমেশ। স্ত্রী সেই বকমেরই, তবে আমার ইচ্ছা অন্তরঙ্গ।

শেদিন এই আলোচনাই করছিলাম মনোবার সন্তে।

সুমিত্রা। (শচকিতে) মনোবা?

সোমেশ। (আড়চোখে সুমিত্রায় দিকে একবার চাখিয়া দেখিল, তারপর সহমভাবে বলিতে লাগিল) হ্যাঁ মনোবা। ডেপুটি হাদপলের যোন, মনোবা হাদপল। আপনি বোধ হয় শুনে থাকবেন তার নাম। এম, এস, দি পাশ করে, ট্রিপি করছে। বিলতে যাবার ভারী ঝোঁক। বাবা সব বহাল করেছে নতুন চাকরিতে। তার কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা কম। তাই দুখ কুটে বলতে পাচ্ছে না কিছু। আমি যাচ্ছি শুনে কত যে খুশী হল। উৎসাহও দিল অনেক। মেয়েটির উৎসাহ বেধে ভারী ভাল লাগল। ভেবে দেখলুম, যে টাকাটা পাব, যদি একটু ধরাবাধা নিয়ে চলতে পারি তাহলে দুজনের তিনটে বছর কেটে যাবে বেশ। সেই কথাটিই মুখিয়ে বললুম তাকে। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি মনোবা। কিন্তু বহন পারল, শুধন সে কী আশ্চর্য তার। যেন স্বর্গ পেল হাতে।

সুমিত্রা (স্বচক্ষে) কী? মনোবা রাজী হল যেতে?

সোমেশ। হবে না? যাবে? কীবসে এমন সুযোগ কি বারবার আসে? এ কদিনের মধ্যেই তাপাখাও হয়ে গেছে কয়েকবার।

সুমিত্রা। তার দাধা? বাবী আছেন এ প্রান্তরে?

সোমেশ। বাবীর মতামত আরও উচ্চাচ, তিনি বলেন, ভগবান বধন বোনকে সাধায়া করবার মত ক্ষমতা যেনি তাকে, তখন এ বিষয়ে অন্তরায় হবেন না তিনি। বোনকে ভালবাসেন অতিবিস্ত। কোন আশ্বাসই তার অপূরণ রাখেন না। (একটু বানিয়া) মনীবাকে কথা দিয়ে পর্বত কেমন যেন অবতি বোধ করছিলুম মনে মনে। একটা বাধা বেন দাঁড়িয়ে ছিল পথ আগলে। কিন্তু এখন নিশ্চিন্ত আমি। এখন-কার সমস্তা সমাধান হবার সঙ্গে সঙ্গেই সব বাধা দূর হয়ে গিয়েছে আমার। সব সত্যোক্ত। এখন বাই, মনীবাকে কথা দিয়ে আমি, উজ্জ্বল আয়োজন করবার। এই মাসেই হবে আমাদের যাত্রা সূত্র।

সুমিত্রা। (বিশ্ববৃক্ষে) কিন্তু এটা কি উচিত হবে আপনায়? একজন অবিবাহিতা তত্ত্ববীকে নিয়ে এভাবে বিশেষ যাত্রা কি বুদ্ধিযুক্ত হবে হালদার সাহেব?

সোমেশ। (সুমিত্রার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া) এর মধ্যে অর্থোক্তিকতার কারণ কি দেখলেন মিত্রির সাহেবা? মনে করুন, মনীবীর স্থানে আজ যদি সমাপীন থাকতেন আপনি, তাহলে এক্ষণ প্রত্যবে কি পিছিয়ে যেতেন, না অশেষ হতেন?

সুমিত্রা। (উত্তেজিতভাবে) আমি? গুণাত্ম্যে প্রত্যাখ্যান করতুম এ বকম প্রস্তাব। এতে আমার এগুরু করতে পারতেন না হালদার সাহেব।

সোমেশ। আপনি মনে মনে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন বলে ব্যাপারটাকে এভাবে নিচ্ছেন সুমিত্রা দেবী—

সুমিত্রা। (খাড়া নাড়িয়া) আমি কতিপূৰী নই হালদার সাহেব, যে এক বড় অন্তঃসলিলা ব্যক্তিত্বটা দৃষ্টি এড়িয়ে রাখে আমার। আমাদের সমাজ, আমাদের সংস্কার, এ সবেরই কি পরিপক্বী হবে না আপনাদের এ ব্যবস্থাটা?

সোমেশ। আমার মনে হয়, তা হবে না। পরিবর্তন সবেরই হচ্ছে, আমাদের সমাজেরও সূত্র হচ্ছে, আর তাইই কুঠারাবাত পড়েছে আমাদের সংস্কারের মূল। আমাদেরই সমাজের মেয়েরা, আপনাত বস্তু মেয়েরা,

বৃত্তি পেয়ে বিপদে যেতে সূত্র করেছে বলে বলে। কই সমাজ ব্যবস্থা ত তেজ পড়েছে না সেখানে? মনীবীর চূর্তাণ্ডা যে যে বৃত্তি পারনি আকণ্ড। কিন্তু যদি পেত এবং যদি আমরা হস্তে একই আঘাতের সহ-যাত্রী, সেটাও কি সমাজ ব্যবস্থার পরিপক্বী হত সুমিত্রা দেবী?

সুমিত্রা। (মাথা দোলাইয়া) না হত না। তার মধ্যে নিজে কলঙ্ক ছিল না কিছু। সেক্ষেত্রে দুজনে হস্তে সহযাত্রী, ধৈর্যক্রমে দেখা পথে। যে কটা দিন গন্তব্যস্থলে পৌছান না যার, যাওয়া একশব্দে। তারপর সব শেষ। কিন্তু এর যে শেষ নেই। একটা বিদ্যোৎসাহ, যে আপনাত আত্মীয়া নয়, বন্ধনও নয়, তাকে কাঁধে বয়ে বেড়াতে হবে দিনের পর দিন। এটা কি নিঃস্বার্থ পরোপকার? স্বার্থের বাশলম্বা কি এর পিছনে লুকানো নেই? এ উপকার গ্রহণ করছে যে, তার অন্তরে কি একবারে নিবাত নিরুপ নিরুপ? প্রতিধান হেবার আশ্রয়ে সে অন্তর কি সূত্রের পড়তে চাইবে না?

সোমেশ। এ সবই আপনাত অসুখান, মিত্রির সাহেবা। কার অন্তর নিবাতনিরুপ নয়, কার অন্তর সূত্রের পড়বে কি পড়বে না এত খবর আমি বাঁচি না। তবে এ বিষয়ে কেউ যদি কৌতূহল প্রকাশ করে, তাকে না হয় জানাবেন যে মনীবী সাংসারী বৃত্তি পেয়ে বিবেশে চলেছে। তেতরের কথা বাইরের লোক তো জানবে না কেউ।

সুমিত্রা। (মাথা নাড়িয়া) আমিও একজন বাইরের লোক হালদার সাহেব। আমি বধন মেনেছি, তখন বাইরের লোকও মেনেছে মনেবেন। এতে আমার কি স্বার্থ থাকতে পারে যে মিথ্যের দ্বারা ভোলাব অপহরক? বরক এই সব অসামানিক অত্যাচারের প্রেরণ আমার দিক দিয়ে না বেঁচেই যলল।

সোমেশ। (বিশ্ববৃক্ষ তান করিয়া) সেই একই কথা আপনি বার বার জুগছেন সুমিত্রা দেবী। মনীবী নাথালিকা নয়, নিষেধ ভালমশ বোধবার বয়স হয়েছে তার। নিরুপকণ্ড সে নয়। এন. এন্স. পি. পাল

করা যেয়ে, নিশ্চিতা, বুদ্ধিমত্তী। কোন্টা আত্ম-অবমানাকর, কোন্টা অসম্মানজনক, এ কথা বোঝেন। তার ওপর তাঁর হাল ম্যাকিন্ট্রিট, নিজের বোনের সম্মান সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সচেতন। এর মধ্যে যদি অসম্মানের বাশ থাকত, নিশ্চয়ই এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেন তিনি।

সুমিত্রা। এক শ্রেণীর জীব আছে হাস্যরস সাহেব, যাঁরা খুমোর চোখ চেয়ে। হাস্যগুণ ভাইবোনেরা এই শ্রেণীর লোক। এদের চোখে আত্মল দিয়ে হোঁচরে বিশেষ এরা স্বীকার করবে না নিজেশের ভুল। তবুও তাদের জানাব আমি।

সোমেশ। আপনি জানাবেন?

সুমিত্রা। (দৃঢ়কণ্ঠে) শুধু জানাব নয়, সাহসমত ব্যাখ্যা দেব।

বিশেষ ব্যক্তির সোভ দেখিয়ে একজন মেহের যে অনিষ্ট করতে চলেছেন আপনি, যেহেতুমান্বয় হয়ে, এ আমি সহ্য করব না কিছুতেই।

সোমেশ। কি বলছেন আপনি?

সুমিত্রা। (নিজেকে দানলাইতে না পারিয়া বিকৃতস্বরে) মনোবার প্রতি এত যদি দরজ আপনাত, তাকে বিয়ে করে নিঃস্বামী বৈধানে খুঁটা। কেউ বলবে না একটি কথাও। হোয়াই আপনাকে, এভাবে প্রলুব্ধ করে একজন নিরীহ মেয়ের সর্বনাশ করবেন না আপনি।

সোমেশ। কী আশ্চর্য! এ ব্যাপার নিয়ে কেন যে আপনি এতখানি উত্তলা হচ্ছেন, আমি ভেবে পারছি না। কিন্তু মনোবা, থাকে কেন্দ্র করে আপনার এত দুর্ভাবনা, তার দিক থেকে দুর্ভাবনার বিন্দুমাত্র ত প্রকাশ পেলনা আজও।

সুমিত্রা। পাঁচ নাও কোনদিন। মোহগ্রস্ত যেন কোন ভাবনাই প্রকাশ পায় না হাস্যরস সাহেব।

সোমেশ। ভাল কথা। ওই মোহগ্রস্ত অদ্যচরী মন যদি সহসা প্রসন্ন করে যেন যে তাদের অবলম্বিত পথ যদি দৃঢ় হয়, সমাজভ্রোহী হয়, তাহলে যে যেটিকে বিবেচনা পোচন পুরুষ ভুলেলে মন্ত অথবা যে মেয়েটি একাই পাঁচজন পুরুষকে, আকর্ষণই বলুন আর প্রলুব্ধই বলুন, করে চলেছে, তার অবলম্বিত

পথটি সমাজব্যবহার কোন ভাবে? এর ব্যাখ্যা সমাজের মুখ উজ্জল হয়ে উঠছে খুব বেশী? এর কি জবাব হবে মিত্র সাহেব?

(সোমেশ আড়চোখে সুমিত্রার দিকে তাকান।)

সুমিত্রা। (আহত হইয়াছে এইরূপভাবে) আপনাকে অপমানিত করবার উদ্দেশ্যেই যে আপনাত এই ইচ্ছিত ভা বৃষ্টি। কিন্তু তবুও বলি, এ দুয়ের ভুলনা হয় না। একটা কর্বতা পরিপূর্ণ আর একটা ঈর্ষা প্রণোদিত। একটা মেয়েকে দেখে হাজারটা পুরুষ লুপ্ত হতে পারে, তাতে মেয়েটির কিছু ব্যয় আপস না হাস্যরস সাহেব, যদি না সে নিজে হয় কলুষিত। এতে সমাজের ব্যাখ্যা হয়ে পড়ে না। পড়ে আপনাতের প্রদর্শিত পথে। সেইখানে আমি চাই ব্যাখ্যা দিতে।

সোমেশ। (হাসিমুখে) ভাই দেবেন। তবে ফল যে বিশেষ কিছু হবে, মনে হয় না তা।

সুমিত্রা। (হঠাৎ উত্তেজিতভাবে) তবু আমি দেব। মনোবার চোখে আত্মল দিয়ে দেখিয়ে দেব তাদের এ অইহর অভিমানের ফল। হোঁচর মুকল ফলে কিনা। (বলিতে বলিতে চোয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া) ভাল কথা, আপনি যখন আছেন এখানে, তখন আপনার সাক্ষাতেই মৌমাংগা হয়ে যাক ওরা। কি তার মনের অভিপ্রায় একবার যাচাই করে যোঁ।

(হঠাৎ দিকে আশায়া চলিল)

সোমেশ। কোথা যান?

সুমিত্রা। পারেশের ঘরে। কোন করতে মনোবা। দেখি মনের বল তার কতখানি। আপনি কিন্তু যাবেন না হাস্যরস সাহেব। আপনাকে প্রয়োজন আমার খুব বেশী।

সোমেশ। (হতবুদ্ধির মত) কি কাত! হোয়াই আপনাকে, আপনি যাবেন না সুমিত্রা দেবী।

(সুমিত্রা গুলিল না।) ক্রিপ্রপরে প্রস্থান করিল।

সোমেশ গাড়াইয়া উঠিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

কি কাত দেখ। আজ একটা কেলেজারী না করে ছাড়বে না দেখছি। ছি-ছি, এত মেয়ে থাকতে মনোবার নাম কেন আমি করতে পেলাম সুমিত্রার

কাছে। ওকে মধ্যে যে পরিচয় থাকতে পারে, এ খোঁজাটুকু আমার হল না কেন? মনোবাকে আনন্দে। নিয়ে যাওয়া দূরের কথা, তার সঙ্গে পরিচয়ই নেই আমার ভাল। একদিনের মাত্র আলাপ। এমন একজনকে যার সব প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। কি লক্ষ্যের কথা। সুখিতাকেই বা বুঝে দেখাব কি করে! তার চাইতে পালাই। সুখিতা আসবার আগেই সরে পড়ি। এ ভাবনে এতবেলা নয় আর। (সোমেশ অস্থির চরণে করে পারচারি করিতে লাগিল। এক সময় খাম্বা পড়িয়া আপন মনেই বসিতে লাগিল।)

সোমেশ। না, পালাব না। মেয়েদের মন বড় সন্ধিহ, বড় ঈর্ষাকাতর, বিশেষতঃ এই প্রণয় ব্যাপারে। মনোবা অস্বীকার করলেও, সুখিতা বরত বিখ্যাপ করতে পারবে না। ভাববে, তার কাছে গোপন করছে সব। এ বন্ধ হবে না। সুতরাং এর শেষ ফলাফল না দেখে যাওয়া উচিত নয় আমার।

(যত্নে আটটা বাজিল। সোমেশ তল হইয়া উঠিল।) কই সুখিতাব তো দেখা নেই। একজন করে কি কথা হচ্ছে ওদের? কি মুখিলে পড়া গেল। বরত ছুঁলে হাসাখাসি করছে এখন। বলে গেল, কোন আছে পাশের ঘরে। দেখি, কিছু শোনা যায় কি না।

(বেওয়ারে কান বাখিয়া সুখিতার চোঁটা করিল, এমন সময় সুখিতা ঘরে প্রবেশ করিল।)

সুখিতা। ওভাবে শোনা যাবে না হালকার সাহেব। ওখানে কোন নেই। আছে তার পাশের ঘরে।

(হঠাৎ পড়িয়া সোমেশ লক্ষ্যের দিবর্ন হইয়া উঠিল।)

সুখিতা। (চোঁরাব বসিতে বসিতে) হোপদেসু। একবারে হোপদেসু এই সব ফাখিল টেলিকোন পূর্ণগোলা। ওদের মধ্যে সব কটাকে বিবের করে বেওয়ারে উচিত। অত্যন্ত বড়। ওদের হাদির সব কানে ভেসে আসছে, শুনেতে পাচ্ছি। বুঝতে পারছি, নিজেদের মধ্যে বসিকতার উদ্ভব ওয়া। কিন্তু হিং করে করে

আমার যে হাত বাখার কন্ট্রনিয় উঠল, 'হালো' 'হালো' করে গলা মেটা হয়ে গেল, সে ছাঁদ নেই। হাঁশ বগন হল, দিল তুল নবর।

সোমেশ। (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া) তুল নবর? সে আবার কোথায়?

সুখিতা। কোথায় আনি না। চাইছি মনোবা বাসন্ত্যাকে, দিল এক ছবৎখাল। না সুন্দরুণ্ডাখালকে। বেটা আপন মাড়োয়াট। না খোঁজে ইংরিজি না খোঁজে বাংলা! কোন তাখাই আনে না। শুধু বলে 'কিনা কিচা'। শেষ পর্যন্ত বিবক্ত হয়ে কোন বিলুপ ছেড়ে।

সোমেশ। তাহলে মনোবার সাদা পাওয়া গেল না?

সুখিতা। না। কোন নিয়ে সাগাসান্য মুক্ত করলম আবার। তবে এবার অপেক্ষা কর্তে হ'ল না বেস্টমণ, উত্তর হ'ল 'লাইন এনগেজড'। তবুও খেঁচি যারাই নি। কিন্তু খেঁচিও দীর্ঘ আছে। সে দীর্ঘাও ছাড়া, যখন তৃতীয়বার উত্তর এল 'নো ট্রায়াই'। এবার এদের সঙ্গে বচসা করবার মত হীন প্রবৃত্তি হ'ল না আমার। কোন ছেড়ে নিয়ে উঠে এসে মানে মানে।

সোমেশ। (অন্যভাবে) বাঁচা গেল। ওর বন্ধা করেছেন। (প্রকাশে) শেষ পর্যন্ত মনোবার নাগাল পাওয়া গেল না তাহলে?

সুখিতা। না।

সোমেশ। বেশ তো, চোঁটা করে দেবেন আর একদিন না হয়। (খড়ির হিকে অ্যাসুল দেখাইয়া) সাতটা বেজে গিয়েছে অনেকক্ষণ। আপনার হেঁরা হয়ে গেল অনেক। এ ক্ষেত্রে আমি দিতি ছুঁবিত। অ্যাঙ্কা, আর উঠি তাহলে। নব্বার।

সুখিতা। না। উঠবেন না, বহন। বেরবার তাড়া আমার বিশেষ নেই।

সোমেশ। কিন্তু কোথায় বেরাঙ্কিলেন যে?

সুখিতা। বাখা পড়েছে। তাই যাওয়া বাতিল করে দিলুম। কিন্তু যাওয়াই বহন হল না তখন একটা খোঁজপড়া হয়ে যাওয়াই ভাল।

সোমেশ : (স্ববিশেষ) বোকাপড়া ? কিসের ?
সুমিত্রা : হিল্লী থেকে যে চিঠি লিখেছেন তার। তখন
উত্তর দেওয়া হয়নি। তারই একটা বোকাপড়া সে-
নিত্যে চাই।

সোমেশ : কিন্তু তার উত্তর তো পেতে গিয়েছি আমি।
সুমিত্রা : না, পাননি। যা পেয়েছেন তা আপনার আভি-
যা একদিন এই ঘরে বসে পেশ করেছিলেন আপনি।
চিঠির উত্তর বসে গিয়েছে বাকী।

সোমেশ : হহি বাকী থাকে, থাক। উত্তর যে কি হবে তা
আমার অনুমানের বাইরে নয়। আগেই হলেছি যে
এসব ব্যাপারে 'কিউ' দিয়ে ঝাড়িয়ে ভাঁতাভাঁতি
করবার প্রবৃত্তি আমার নেই, সুমিত্রা দেবী। এতদিন
যা কিছু করেছি, না ভেদে করেছি। তাহলে তার সব
বিষয়ই প্রত্যাহার করে নিতে চাই বিনা পটে।

সুমিত্রা : (সোমেশের কথায় কান না দিয়ে) আপনাকে
ওয়েটিং লিষ্টের কথা বলেছি এবং আরও বলেছি
যে সেই লিষ্টে আছেন আর চারজন। টেলিফোন
করতে গিয়ে লিষ্টের বিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে
গেলাম আমি। এতদিন গোঁষে যা পড়নি, তাই
পড়ল আজ।

সোমেশ : কি ?
সুমিত্রা : তার স্থান এতদিন ভেবে আগলিলাম সকলের
তলায়, আজ আবিষ্কার করলুম, তিনিই অধিকার
করে আছেন লিষ্টের শীর্ষস্থান।

সোমেশ : তাই নাকি ? কিন্তু সেই ভাগ্যবান পুরুষটিকে ?
সুমিত্রা : (চোখের কোণ দিয়া তাকাইয়া) যিনি আমার
অসুখোষ এড়াতে না পেরে আমার নামের স্থানটির
শোভা বর্ধন করে বসে আছেন এখনও, বসন্তের মনে
হয়, এ ভাগ্যবান তিনি ছাড়া আর কেউ নয়।

সোমেশ : (উল্কাচাটায়) শুনে সুখী হলান। কিন্তু
এমন অবচন ঘটল কি করে ? মনোহার ভাড়া ?
সুমিত্রা : জানি না। তবে তখন হিল্লীর চিঠির উত্তর
আমার সোজা হয়ে এস। এবং এইটুকুই
জানাবার অন্তে আপনাকে বঠ দিয়ে বসিয়ে রেখেছি
এখনও, হালকার সাহেব।

সোমেশ : বুঝলাম, হালকার সাহেব শোভাগ্রাযান ব্যক্তি।
কিন্তু আপনার দেবভাণ্ডার বাকী চারজন ? তাঁরা
গেলেন কোথায় ?

সুমিত্রা : মুখ লুকিয়েছেন সব লক্ষ্যায়। কল্পলোকের সহচর
তাঁরা। বসন্তদিন বাতবের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধেনি, সব
সকল ছিলেন প্রাবল্য। এখন সংঘর্ষে উপক্রমেই,
পড়েছেন সব সেরে। কল্পনার এঁরা ছিলেন আমার
সহচর। এঁদের সাহচর্যে মনে মনে খুশী হতেন আমি।
এঁদের মধ্যে ছিলেন ভ্রামল সাহা, বনী অমিহাভের
ছেলে। মটরে চড়ে করতেন আনাগোনা, আমার
করণা ভিকার অন্তে। ভারী ভাল লাগত তাঁকে
যখন যেন্তাম তাঁর একধাতো থাকত রঙীন শাড়ী
আর অপর হাতে ছড়োয়া গরমা।

সোমেশ : বোকারী ভ্রামল।

সুমিত্রা : ভ্রামলের পিছু পিছু আপতেন মল্লকুমার। নব-
যুগের তত্ত্ব কবি। মুখে গোঁষে তাঁর বীজ প্রতিভা।
মুগ্ধ করেছিল আমার তাঁর কবিত্ব, অভিব্যক্ত করে-
ছিল তাঁর কাব্য কৃতিত্ব। ভ্রামলের সঙ্গে সঙ্গে পতন
আমি তাঁরও।

সোমেশ : এরমত আমি সত্যই চ্যাবিত সুমিত্রা দেবী।
কিন্তু তার পরের আগন্তুকটি ছিল কে ? মল্লকের
পর আসত নিচর প্রলয় ?

সুমিত্রা : না। তারপরে আসতেন বপন সেন। কিন্তু
প্রলয়েরই প্রতিমূর্তি তিনি। ঔরামকক বিবেকানন্দের
মন্ত্রণস্ত। লগৎটাকে গ্রহণ করেছিলেন মারা বলে
আর সেই 'মারা' মোহে আমাকেও কলে এই স্থল
লগৎটাকে একেবারে নড়াৎ করে দিয়েছিলেন
চোখের সামনে থেকে।

সোমেশ : বাহাদুর ছোকরা বটে। তারপর বপনের দাড়া
কাটল কি করে ?

সুমিত্রা : তা জানি না। তাঁর মারা কাটবার আগেই
এসে গেলেন তাপস ঘোষ। তাপস ছিলেন নেতাজীর
সহচর। চোখে মুখে তাঁর উদ্ভীপনা। বিনা দুহে
যে প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, এই যুক্তির
সমর্থক ছিলেন তিনি। প্রকৃত স্বাধীনতা পেতে হলে

যুদ্ধ যে অনিবার্য একদিন, একথাই বুঝিয়েছিলেন আমার। সেই যুদ্ধে প্রত্যাশন হবে যেহেতুও। তাই ভাষের পরিচালনার ভার দিচ্ছেছিলেন আমার উপর। এই অতাবিত দৌত্যার্থে বেশ কিছুটা গর্ব অনুভব করতুম মনের মধ্যে। তাপসের পাশে দাঁড়িয়ে, দেশের নারীবাহিনীকে পরিচালনা করবার কর্তব্য মনের মধ্যে উৎসাহ হলেই আমার যুদ্ধ উত্তীর্ণ হুসে আর তাপসের প্রতি কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে পড়ত হুয়ে।

(একটু খানিক)

ক্রামল, মল্ল, যশন, তাপস আমার নিক্ত অংশের দৃষ্টির ঐরা। সেখানে ঐদের ছিল নিজস্ব আনন্দোৎসাহ। আমি সে অংশের মৌরবতা গেল ভেঙ্গে। ঐদের আনন্দোৎসাহ হয়ে গেল শব্দ। বাস্তবের স্রুত আঘাতে সব হয়ে গেল চূর্ণ। কল্পলোক থেকে মহা-প্রস্থান করল সব অশ্রুণ্য লোকে।

সোমেশ। (সুমিত্রার কাছে এসে) আর সেই কল্পলোকের পৃষ্ঠ আসনে জুড়ে বসল সোমেশ হাসিমুখে। কি অতাবিত দৌত্যার্থে আমার সুমিত্রা যে চারজনকে উদ্ধার করে নিলের আসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারলুম তোমার অন্তরে। যুদ্ধও কয়েক আগেও এক কর্তব্য করতে পারিনি। আমি তখন মনোবাক সফল করে, স্যাত শয্যুস্তরের মনো পেরিয়ে বাস্তবের আয়োজন করছিলাম মাকিন যুদ্ধকে। তুমি দৃষ্টি করেছ আমার।

সুমিত্রা। কিন্তু মনোবা ?

সোমেশ। তোমার কল্পলোকের দৃষ্টির দৃষ্টি আমার কল্পলোকের দৃষ্টিরও এই যুদ্ধের মহাপ্রস্থানের পথে দ্বারা করল অশ্রুণ্যলোকে।

সুমিত্রা। (সম্বোধন করে) মানে ?

সোমেশ। মানে খুব সোজা। তোমার কল্পলোকের চারজন দৃষ্টির দৃষ্টি একা আমি ভুলে গেলে পেরে উঠব না ফলেই সাহায্য নিলাম মনোবাক। তবে মনোবা একেবারে কল্পলোকবাদিনি নয়। মর্ত্যলোকে অস্তিত্ব রয়েছে তার। পবিত্র আমার দৃষ্টি বিশেষ কিছু

নেই। যেটুকু আছে, তাকে পবিত্র বলা চলে না। একদিনের আশা, তাও অতি অল্প সময়ের জন্য মাত্র। তাকে অশ্রুণ্য করে ক্যালিকোনিয়া কেন কোলকাতার একাংশ থেকে অপর অংশে যাওয়া যায় না। তবু আমাকে ক্যালিকোনিয়াতেই যেতে হচ্ছিল এই মৌরব আশা নিয়ে যে তোমার মনের মধ্যে সামান্যতম দৃষ্টির উত্তর করতে পারলে, বিজয়লক্ষী যুদ্ধে জয়লাভ তুলিয়ে দেবেন আমার দলার। এ অনুমান বিফল হয়নি সুমিত্রা।

সুমিত্রা। আর ক্যালিকোনিয়া ? সেও কি কল্পলোক থেকে যাত্রা করেছে মহাপ্রস্থানের পথে অশ্রুণ্যলোকে ?

সোমেশ। (মিত্রা কাট্টা) এতখানি অধিকার আমার তুমি কোথায় না, মিত্রা। ক্যালিকোনিয়া আমার যেতে হবে। অন্তত পাঁচ বছরের ভ্রমণে না হলেও পাঁচ মাসের ভ্রমণেও হটে। এই মর্মে মনোর হয়েছ তুমি। ভাবছি, মনোবাক বদলে তোমার নিয়ে 'হরিশূন্য' করে আসব সেইখানেই।

সুমিত্রা। (অন্তিম করে) আমি যাব না।

সোমেশ। তাহলে আমিও না। (স্বপ্ন হৃদয়)

তুমি যদি কর মানা

আমি যাবনা, যাবনা

ওগো প্রিয়া

আমি যাবনা ক্যালিকোনিয়া।

তুমি যদি থাক ঘোর সশস্ত্র,

আমি থেকে যাব আমারের এ বক্ষে।

যাবনা ক্যালিকোনিয়া।

কাজ কি আমার প্রিয়া

ভেগাভেগে গিয়া

রব দেখা তব সাথে

এক প্রাণ একহিয়া।

যাবনা যাবনা,

যাবনা ক্যালিকোনিয়া।

সুমিত্রা। (হাসিয়া) তুমি গেলে আমি যাব দেখ না।

(ହୃଦୟ ବିଳାସ)
 ନା ନା ନା
 ତୁମି ମୋର ଆସି ବାସ ଦେବ ନା ।
 ଓଷା ଶ୍ରୀର
 ବସି ତୁମି ବସିବ,
 ଅଥବା ଶ୍ରୀରାଜା, ଜାତା, କାୟାକାଟିକା
 ବୋଗଦାସ, ବସରା କିନ୍ତା ନକୃତା
 ଆସି ବାସ ଦେବ ନା ।
 ଓଷା କବି ଏହି ନିମିତ୍ତ
 ଦିନିବାର କେତେ ନା ନାହିଁ ।

ବସି ହୁଅ ଶ୍ରୀରାଜନ ତବ,
 ଶ୍ରୀରାଜା ଆସି ନାଥେ ବସ;
 ଏହି ଯଥା ଅନ୍ତର ବାସନା ।
 ନା ନା ନା
 ତୁମି ମୋର ବାସ ଦେବ ନା ।
 ଶୋଭେନ । ଓଷାକ୍ତ । ବସ ନିଶ୍ଚିତ ତୋରା
 କାୟନା ତୋରା ଦେବୀ କବିର ପୁରୀ ।
 [ଶୋଭେନ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାଜା ପ୍ରଶଂସାରେ ଦିବେ
 ଆସିବାରା ଆସିଲ । ଶୋଭେନ ଶ୍ରୀରାଜା
 ଡାନ ବାସନା ନିଶ୍ଚିତର ଭାବରେ ବାସ
 ବାଞ୍ଛା ହେଲା ।] [ଶ୍ରୀରାଜା ପଢ଼ିବା ମେଳ ।]

ପଞ୍ଚମବାସନ୍ତର ଆଦିବାସୀ

(୧୧୭ ପୃଷ୍ଠାର ପର)

ସାମିତ । ବିଷାକ୍ତର ପତ ଡାହା ପତ୍ରର ପିତାଙ୍କ ଗୃହେ ବାସ
 କରନ୍ତେ ବାସ । ହେଲେବା ଯାହାର ମୋଡ଼ିତେ ଚଳେ ବାସ ଓ କେତେବା
 ମାମୁଣ୍ଡର ଉତ୍ତରାଦିକାଦିନୀ ହୁଅ ।

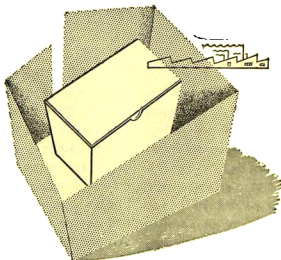
ଶ୍ରୀର ମନୁଷ୍ୟ ଉପକାଞ୍ଚିତ ଯାହୁ ମନୁ ବିଷାକ୍ତ କରେ ଏବଂ ଯାହୁ
 ବଢ଼ିତ ନାନାବିଷ ଶ୍ରୀରାଜାର ବାସା କୌଣସି ସମସ୍ତ ଆପଣ ବିଷାକ୍ତ
 ଦୂରୀଭୂତ କରାଏ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଡାହିନି ଓ ନାନାବିଷ ଶ୍ରୀର ମନୁଷ୍ୟ
 ଉପର ଆତ୍ମକ ବିଷାକ୍ତର ଶକ୍ତ ତାହାର ନିକେଶେର ଏବଂ
 ନାମାଞ୍ଜିକ କୌଣସି ଶକ୍ତତର ମୋଳାଞ୍ଜିତର ହୁଅ ହୁଅ । ଏନ
 କି ମୋଡ଼ିତ ହେଲେ ଡାହା ଶ୍ରୀର ମେଳେ ଓ ତା ଶ୍ରୀର କରେ ନା—
 ଯାହୁମନୁଷ୍ୟ ମୋହାକ୍ତ ଶ୍ରୀର ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରୀରାଜିତ କରେ ଯୋଗ ହୁଅ
 ସାହାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନେ ଉପକାଞ୍ଚିତେ ନେତ୍ର ହିନ୍ଦୁର୍ବ, ବୁଢ଼ିର୍ବ, ଏବଂ
 ବୌଦ୍ଧର୍ବର ଦେଶ ଶ୍ରୀରାଜ ହେଉଛି । ୧୧୭୧ ମାସର ଆଦି-
 କାଳୀ ଅନୁସାରେ ମାଓଡ଼ାଳାହର ମଧ୍ୟେ ମନୁଷ୍ୟ ୫୫ ଜନ ପୂର୍ବ-
 ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ, ମନୁଷ୍ୟ ୫୫ ଜନ ବାସେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ହିନ୍ଦୁ

ଏବଂ ଏକଜନ ବୁଢ଼ିର୍ବାରବଳୀ । ଶ୍ରୀରାଜାହର ମଧ୍ୟେ ମନୁଷ୍ୟ
 ୩୭ ଜନ ବୁଢ଼ିର୍ବାରବଳୀ, ୫୨ ଜନ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ୫ ଜନ ଶ୍ରୀରାଜ ।
 ଶ୍ରୀରାଜାହର ମଧ୍ୟେ ମନୁଷ୍ୟ ୮୦ ଜନ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ବୁଢ଼ିର୍ବାରବଳୀ
 ମଧ୍ୟେ ମନୁଷ୍ୟ ୫ ଜନ ଏବଂ ଏକଜନ ମିତ୍ରମୁକ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣ ମାଳନ
 କରେ । କେତେକେବେ ମଧ୍ୟେ ଏକଜନ ମନୁଷ୍ୟ ୬ ଜନ ବୁଢ଼ିର୍ବାରବଳୀ
 ଓ ବାକୀ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ । ଆଦିବାସୀହର ମଧ୍ୟେ ଏକଜନ କେବେ
 ନୁହେଁ ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଜା କରେନି ।

ଶ୍ରୀରାଜାହର କୋଳେ ମାଳିତ-ମାଳିତ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଓ ସବଳ
 ମାଳିତର ଶ୍ରୀର ମନୁଷ୍ୟର ମହାବୁଦ୍ଧିତ ବୁଦ୍ଧିତ ଏସେ ମନୁଷ୍ୟ ।
 ଶ୍ରୀରାଜାହର ମଧ୍ୟେ ବିଷାକ୍ତ କଥା ବାସ ବା ଶ୍ରୀର କଥା ଶ୍ରୀର ମନୁଷ୍ୟର
 ବୁଦ୍ଧିର ଅପରାଧ ଏକେବାର୍ତ୍ତେ ଏକଜନିତ । ଶ୍ରୀରାଜାହର ଓ
 ମାଳିତର ଶ୍ରୀର ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ତାହାର ଆଦିବାସୀ କୌଣସି
 ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ ନାହିଁ କେତେକେବେ ମଧ୍ୟେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମନୁଷ୍ୟ
 ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ ନାହିଁ ଶ୍ରୀରାଜାହର ମଧ୍ୟେ ମନୁଷ୍ୟ ଏସେ
 ତାହାର କୌଣସି ମଧ୍ୟେ ମନୁଷ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଶ୍ରୀରାଜାହର ଏସେ
 ମନୁଷ୍ୟ କି ନା କେ କେ କେ ?

factory freshness preserved



with

★ **POLYBOARD**
★ **POLYKRAFT**

packaging

Acid, alkali and moisture resistant polythene-coated POLYBOARD and POLYKRAFT help to preserve the factory-freshness of your products, whether they be confectionary, tea, biscuits or chemicals.

These new, revolutionary packaging materials are several times stronger than ordinary board or paper and prevent damage to your products even when they are subjected to rough handling. And the eye-appeal of your products is enhanced considerably because of the glossy finish on POLYBOARD and POLYKRAFT.



CHANGE TO
★ **POLYBOARD** ★ **POLYKRAFT**
PACKAGING FOR INCREASED SALES

ORIENT PAPER MILLS LTD., CALCUTTA.

আর্থিক প্রসঙ্গ

১। দ্বিতীয় পত্রিকল্পনার আর্থিক সঙ্গতি ॥

দ্বিতীয় পত্রিকাধিকার পত্রিকল্পনার ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ মজুৎ করা হয়েছিল। কিন্তু পত্রিকল্পনার দ্বিতীয় বছরেই অর্ধেক সঙ্গতিতে বেধা দিল নানা অসুবিধা। প্রথম দু'বছরেই ১৪২৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়ে গিয়েছে। ১৯৮৬-৪৭ সালে ব্যয় হয়েছে ৬০৫ কোটি টাকা এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে ৮৬১ কোটি টাকা। এর মধ্যে 'ডেভিসিট ফাইন্স্যান্সিং' করতে হয়েছে ৭০২ কোটি টাকার—অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক টাকা। গত মে মাসে পত্রিকল্পনা কমিশন পত্রিকল্পনার বিভিন্ন দিক ও অর্ধের সম্ভাব্য তহবিলের বিধি পর্যালোচনা করে জ্ঞানদাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের নিকট বিপোর্টে পত্রিকল্পনার সম্ভাব্য আয়ের পরিমাণ ৪,২৬০ কোটি টাকার স্থির করে। কিন্তু তখন এই কাউন্সিল পত্রিকল্পনার মূল বরাদ্দ ৪৮০০ কোটি টাকা থেকে পত্রিকল্পনার বরাদ্দ কমতে বাধী হল না। তার পরিবর্তে কাউন্সিল পত্রিকল্পনাটিকে দুই ভাগে ভাগ করল—পার্ট "এ" ও পার্ট "বি" এবং তার বরাদ্দ হল যথাক্রমে ৪৫০০ কোটি টাকা এবং ৩০০ কোটি টাকা। পার্ট "এ"তে রাখা হল কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিসংক্রান্ত সমস্ত পত্রিকল্পনা, দৌহ শিল্প এবং যে সমস্ত পত্রিকল্পনা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে ও অন্ত্যস্ত পত্রিকল্পনা যা কিছুতেই একটোনা সম্ভব নয়। আর পার্ট "বি"তে রাখা হল বাকি সমস্ত পত্রিকল্পনা। পার্ট "বি" সম্পর্কে মোটামুটি বোঝা গিয়েছিল যে নবন প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হবে, কেবল মাত্র তখনই কাজে হাত দেওয়া হবে। বলে দ্বিতীয় পত্রিকল্পনা বলতে পার্ট "এ"ই বোঝা গিয়েছিল, কারণ দ্বিতীয় পত্রিকল্পনা শেষ হওয়ার মধ্যে অর্ধেক ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে পার্ট "বি"র প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হবার সম্ভাবনা ছিল অতি ক্ষীণ।

পার্ট "এ"তে যে টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে তা-ই তখনকার আনুমানিক সম্ভাব্য আয় থেকে ২৪০ কোটি টাকা বেশী এবং এই আনুমানিক সম্ভাব্য আয়ের মধ্যে কম করে ১২০০ কোটি টাকা ডেভিসিট ফাইন্স্যান্সিং করা হবে বলে ধরা হয়েছিল। এর পর গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে পত্রিকল্পনা কমিশন গত দুই বছরের পত্রিকল্পনার কার্যকলাপ ও অগ্রগতি পুনর্বিবেচনা করে। বিষয়টিকে বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করে কমিশন এই সিদ্ধান্তে আসে যে গত মে মাসে ডেভিসিট ফাইন্স্যান্সিংএর অন্তর্গত ১২০০ কোটি টাকা বরা হয়েছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে অত টাকার ডেভিসিট ফাইন্স্যান্সিং নিয়োগ হবে না। কমিশনের এই মত পরিবর্তনের পিছনে যুক্তি ছিল এই :

(১) পত্রিকল্পনার প্রথম দুই বছরের মোট ব্যয় ১৪২৬ কোটি টাকার মধ্যে ডেভিসিট ফাইন্স্যান্সিংই হয়েছে ৭০২ কোটি টাকা। পত্রিকল্পনার তৃতীয় বছরের (১৯৪৮-৪৯) আনুমানিক ব্যয় ৯৬০ কোটি টাকার মধ্যে ২২০ কোটি টাকার ডেভিসিট ফাইন্স্যান্সিং করা হবে। তার অর্থ পত্রিকল্পনার প্রথম তিন বছরে ৯২২ কোটি টাকার ডেভিসিট ফাইন্স্যান্সিং। গত মে মাসের বিগাব অস্থায়ী পত্রিকল্পনার ৪র্থ ও ৫ম বছরের অন্তর্গত ডেভিসিট ফাইন্স্যান্সিংএর পরিমাণ হবে ২৮০ কোটি টাকা। দেশের বর্তমান জর্য মূল্য এত বেশী টাকার ডেভিসিট ফাইন্স্যান্সিং করার গক্ষে নিয়োগ নয়।

(২) একদিকে চড়া জর্যমূল্য এবং অপরিমিত মাইনে ও মজুরী বৃদ্ধির চাপ—এর মধ্যে অত বেশী টাকার ডেভিসিট ফাইন্স্যান্সিং করলে সম্ভাব্য আয়ও উচ্চতর আকার ধারণ করবে। টেলিগ্রাফ প্যাকটার পরিমাণ কমে যাওয়ার ডেভিসিট ফাইন্স্যান্সিংএর বস্ত্রপ বুজানীতির চাপকে প্রতিরোধের ব্যবহার অসুবিধা আছে।

এ সব কারণ দ্বারা লক্ষ্যেও কমিশন দ্বিতীয় পন্থি-কল্পনার পাঁচ বছরে ১০২ কোটি টাকার পর্যন্ত ডেফিসিট কাইন্সালিং করতে সুপারিশ করেছে। এই টাকার ডেফিসিট কাইন্সালিং হলে পরিকল্পনার পেশের ছব্ব্বেরের এক ডেফিসিট কাইন্সালিংএর পরিমাণ দাঁড়াবে ১৭০ কোটি টাকা। ফলে কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট ব্যয় ৪২২০ কোটি টাকার উপরে হওয়া উচিত হবে না। গত যে মাসের হিসাব থেকে এই বরাদ্দ ৪০ কোটি টাকা কম। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার একই কমিশন বৈবেশিক সাহায্য ও পেশের আন্তর্যবাহী সংস্থানের পরিমাণ বর্ধাক্রমে ১,১০০ কোটি টাকা ও ২,০২৮ কোটি টাকা করেছে। যে মাসের হিসাবে এর পরিমাণ বরা হেরেছিল বর্ধাক্রমে ১০০৮ কোটি টাকা ও ২০২২ কোটি টাকা। বর্তমান হিসাবে বৈবেশিক সাহায্য দ্বারা ৬২ কোটি টাকা বেশী বরা হয়েছে কিন্তু আন্তর্যবাহী সংস্থান দ্বারা রাজ্য সমূহের সংগ্রহের পরিমাণ ৬৫ কোটি টাকা কমে গিয়েছে। ফলে বৈবেশিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি কাটা-কাটি হলেও কিছু বেশী ঘাটতি হচ্ছে।

১. পরিকল্পনা।

কমিশন ডেফিসিট কাইন্সালিংএর পরিমাণ ১০২ কোটি টাকার সীমাবদ্ধ রাখতে বলেছে, তাও খুব বেশী বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ কমিশন আপা করেছে যে পেশের আন্তঃপাশন বৃদ্ধি পাবে এবং আন্তঃমূল্যও কমে যাবে। কিন্তু পত্রের দাম যদি বাস্তবিক পক্ষে হ্রাস পায় তাহলে অত টাকার ডেফিসিট কাইন্সালিং হয়ত বিপদ-জনক নাও হতে পারে, কিন্তু মূল্য-হ্রাসের সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। গত যে মাসের হিসাব থেকে অক্টোবর মাসের হিসাবে আন্তঃমূল্যের আয় ও ব্যয়ের ব্যবধান ২৪০ কোটি টাকা থেকে নেড়ে ২৮০ কোটি টাকার উঠেছে।

পরিকল্পনা কমিশনের এই সুনিশ্চিত মতামত সত্ত্বেও ত্রাণদাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল পরিকল্পনার বরাদ্দ মূল বরাদ্দ ৪৮০০ কোটি টাকা থেকে কমাতে রাজী হয় নি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও রাজ্য সমূহের মুখ্য-মন্ত্রীদের নিয়ে এই কাউন্সিলই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার

সর্বোচ্চ কক্ষতার আদিকারী। কাউন্সিল পরিকল্পনার অনেক কাঠতে রাজী না হবার এক কারণ দেখিয়েছে যে :—

(১) আন্তঃপেশের পাইকারী ব্যবসায় সরকারী-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আন্তঃপেশের মূল্য হ্রাস সম্ভব।

(২) আন্তঃপেশের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনাকে আন্তঃপেশের কক্ষতার এক প্রাধান্য সন্যাস সমিতির ভিত্তিতে একটি নতুন ও বড় আকারের সমস্যার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(৩) পরিকল্পনার ব্যয় শতকরা ১০ ভাগ সঞ্চোচনের এক শতকরার সমূহকে বর্ধাণ্য চেষ্টা করতে হবে।

(৪) সরকার আন্দোলনকে খুব আন্তঃপেশের করে তুলতে হবে। একই আন্তঃপেশের কক্ষতার মূল্য সরকার পরিকল্পনার কথাও বিবেচনা করতে হবে।

কাউন্সিল বেশব বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা করেছে তা আপাত-বৃত্তিতে সাধু সম্ভব নেই। কিন্তু একটু বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে এই বৃদ্ধির মধ্যে অনেক বাস্তব অনুরোধ আছে। যেমন অতীতে দেখা গিয়েছে যে আন্তঃপেশের কোন বক্ষম নিয়ন্ত্রণ আবর্তন হলেই চোরাকারবারীরা অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ এই চোরাকারবারীদের শাসন করার মত শক্ত অস্ত্র সরকারের হয় নেই অথবা যে কারণেই হোক সরকার তার ব্যবসায় প্রয়োগ করে এই দুগুণ সমা-বিবোধী কাজটিকে প্রতিবোধ করতে পারে না।

সমস্যার আন্দোলনের ভিত্তিতে আন্তঃপেশের বৃদ্ধির চেষ্টাও অতীতে কম হয় নি। কিন্তু তার অস্তিত্বতা মোটেই আশাশ্রয়ক নয়। সরকার নতুন বর্ধণের কি-সমস্যার আন্দোলন গড়ে তুলবে তা না দেখা পর্যন্ত বর্তমানে সম্ভব একে পড়ে।

পরিকল্পনার ব্যয় শতকরা ১০ ভাগ সঞ্চোচন করতে পারলে প্রাথমিকভাবে হিসাবে ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস হবে। কিন্তু যেখানে সর্বমাই পরিকল্পনার ব্যয় অনুমানকে ছাপিয়ে উপরে উঠেছে সেখানে শতকরা ১০ ভাগ ব্যয় সঞ্চোচন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। আর যদিও বা হয়, তা হলেও তা থেকে ২০০ কোটি টাকার উপরে আশা করা যায় না, যেহেতু পরিকল্পনার মোট বরাদ্দের ২০০০ কোটি টাকার বেশী ইতিমধ্যেই ব্যয় হয়ে গিয়েছে।

সকলের আন্দোলন অর্জিতে বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি।
 বিনিময়-পত্রের চূড়ান্ত, অধীন-স্বাভাব্য ব্যয় হ্রিও গুরু ক-
 ভারে জনসাধারণ এমন এক আর্থিক সমস্যাটিকে সম্মুখীন হয়ে
 আছে যে এর উপরে ব্যয়ভারসূচক সকলের কোন পরিকল্পনা
 বাস্তবে কার্যকরী করা কতদূর সম্ভব তা বহুদূর সমস্যা-বিশেষ
 বিষয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট
 কাউন্সিলের পরিকল্পনার বরাদ্দ ৪৮-০০ কোটি টাকার স্থি-
 রাধা কতদূর সুকলমত তা পুনরায় বিবেচনা করে দেখা
 আবশ্যক।

। কৃষি মন্ত্রকের ব্যবস্থাপনা ।

বাণী-নবাব এগারো বছর পূর্বে আজও ভারত একটি
 কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির উন্নতির উপর নির্ভর করে এই
 দেশের সমৃদ্ধি। যে-বছর কৃষি খারাপ হয়, সে বছর জন-
 সাধারণের কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না। এমনই একটি গুরুতর
 বিষয় কৃষি, অথচ দুঃখের বিষয় যে এর উপরে আজও
 স্বাধাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায়
 অনেক বড় বড় পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে অথচ কৃষির যে-
 প্রাণ চাষী তার অবস্থার উন্নয়ন সাধন করে তার প্রাণে
 নতুন আশার সঞ্চার করে কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর কোন
 চেষ্টা করা হচ্ছে না।

এর কারণ হয়ত এই যে এদেশের চাষীরা অজ্ঞানত্বের
 মত্ত হৈ চৈ ও আন্দোলন করে তাদের দাবী আদায় করতে
 জানে না। দেশে যখন বাংলার সববাহা মোটামুটি ঠিক
 থাকে তখন কৃষির কথা সকলে ভুলে যান। যে বছর
 উৎপাদন খারাপ হয়, তখন হঠাৎ সমস্ত কর্তৃপক্ষ কৃষির
 উন্নয়নের জন্য বাতাস-কলমে পূর্ব তৎপর হবে ওঠেন।
 আবার যখন সমস্ত কেটে যায় তখন সমস্ত তৎপরতা বন্ধ হয়ে
 যায়। কৃষির মত এমন একটি গুরুতর বিষয়কে কর্তৃপক্ষ
 এরকম বিমাতার মত দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেশের বড় বড়
 পরিকল্পনা সংস্কার কৃষির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হবে না।

পরিকল্পনাকে যদি সত্যিই কার্যকরী করতে হয় তা
 হলে সমস্ত কৃষি-বল্লভকে নতুন করে গড়ে তোলা দরকার।
 সরকারী বল্লভে কৃষিকে একটি সুখ্য স্থান দিতে হবে—যেমন

আছে রাশিয়াতে। কৃষি মন্ত্রকের অল্পম ব্যক্তির কোন স্থান
 হওয়া উচিত নয়। কোন ব্যক্তির অল্পমতাব লক্ষ্য মারাটা
 দেশের লোক কষ্টভোগ করতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে কৃষি-ব্যবস্থাপনা কমিশনের রিপোর্ট উল্লেখ-
 যোগ্য। ১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে জীনগরে রাজ্য
 সম্মেলন কৃষি-মন্ত্রী-বৈঠকের এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে
 রাজ্যসম্মেলনের জন্য একটি আহ্বান কৃষি ব্যবস্থার সুপারিশের
 জন্য এই কমিশন নিয়োগ করা হয়। কমিশনের
 চেয়ারম্যান নিম্নলিখিত কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের
 উপায়কের উপস্থিতি। রাজ্য সম্মেলন সিং। কমিশন
 তার রিপোর্টে সমস্ত কৃষির ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন
 পরিবর্তন করে নতুন করে গড়ে তুলবার জন্য সুপারিশ
 করেছে। কৃষির ব্যবস্থাপনায় কোথাও কোথাও গলদ আছে
 তা কমিশন পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছে। কমিশনের
 মতে কৃষির ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আই, সি,
 এন, অফিসার নিয়োগ করা দরকার। সরকারী ব্যবস্থা-
 পনার নানান খাটো-খাটো ফুঁড়ে—কোন বিষয়কে বার ক্রমে
 অনেক সময় এত বেশী সময় লাগে যে সে বিষয়ের
 উপযোগিতা তখন আর থাকে না। এই সব জটিল-বিচ্ছাদিত
 দুর করে কৃষির ব্যবস্থাপনাকে সহজ করা দরকার।

সরকার রিপোর্ট বিবেচনা করে স্বাধাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ
 করে কৃষি-বল্লভকে নতুন প্রাণে সজীবীত করে তুললেই
 দেশের সমৃদ্ধির পন প্রশস্ত হবে বলে আশা করা যায়।

। জমি-ব্যবহার সংস্কার ।

জমি-ব্যবহার এদেশে অনেক গলদ অনেকদিন থেকে
 চল আসছে। দেশ বাণী-নবাব পূর্ব থেকে জমি-ব্যবহার
 পরিবর্তন সাধন করার প্রশ্ন নানানিক থেকে ওঠে। কেন্দ্রীয়
 সরকারের নির্দেশনায় বিভিন্ন রাজ্য-সরকার সম্মুখিত্বিত্বের
 মধ্যেই জমি-ব্যবহার সংস্কারের প্রশ্ন মোপান হিসাবে
 জমিদারী প্রথা বিলোপ সাধনে অগ্রসর হল। জমিদারী
 প্রথার উচ্ছেদ হল, কিন্তু জমির আসল সংস্কারের কাজ
 আজও অনেক দূরে পড়ে আছে। চাষী পূর্বের মতই জমি
 বীন হয়ে থাকে—জমির মালিকানা দিয়ে তার প্রাণে নতুন
 আশার সঞ্চারের কাজ হইল পড়ে পিছনে। বড় পরিকল্পনা

নিম্নে দেশভূমি লোক থাকল যেতে, কিন্তু যে চাষী সত্যি-
কারেই সবুজি বহন করে আনবে সে এইস পড়ে অবহেলিত
— সে খেঁচল কি মতল সে খোঁজ নেবার থাকল না কেউ।
আজ তাই প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে চাষীদের মধ্যে ভূমির
বন্টন করে তাদের প্রাণবন্ত করে তোলা, তাদের কামে
নুতন প্রাণের সংযোগনা করা।

কিন্তু ভূমির এই বন্টনে জমি আবণ্ড খণ্ডিত হয়ে পড়বে
সন্দেহ নেই। খণ্ডিত ভূমির অপকারিতাকে অস্বীকার
করা চলে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নেহরুর চাষীদের ছোট
ছোট সমস্যার নিতিতে চাষের পরিকল্পনা যদি সমাধাভাবে

কার্যকরী করা যায় তা হলে এই অপকারিতাকে দূর করা
সম্ভব।

ভূমি বন্টন ও সমস্যার নিতিতে চাষের ব্যবস্থা
প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই কৃষি-শ্রম, ভাল বীজ ; সার ও
বাড়ারের সুবিধা সুযোগের প্রচল এসে পড়ে। প্রথম পর্যায়ে
সরকারকেই এই গুরুত্বপূর্ণ বহন করতে হবে। লক্ষ লক্ষ
লোকের খাতের সমস্যা হ'লে কোটি কোটি কৃষক পরিবারের
স্থায়িত্ব ও অগ্রতির প্রশ্নে সে কৃষির সঙ্গে জড়িত তাকে গুরুত্ব
কালীন ব্যবস্থা বিসর্গে গ্রহণ করে সরকারের আশ্রয়
আশা করুক।



এমন কিছু কঠিন নয়

ছোট ছেলের সঙ্গেও সমস্ত যদি ঠিকমতো
বঁধিয়ে দেওয়া যায়



আপনার সমস্যা
আপনার পুণ্যের কর্ম-জীবনের
সামান্য বিশেষভাবে
সুচি কববে।



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

সেড অফিস : ৪নং লাইভ বাট স্ট্রিট, কলিকাতা-১

আল্‌বের অজ্ঞাত অঞ্চল

নির্মলেন্দু মাল্লা

সে এক অজানা দেশ! তার মাটিতে মজুতুমির দিগন্ত-প্রসারী রুক্ষতা, তার মাছুষেই বিরাটবিহীন সংগ্রামের কাঠিন্য, তার অনেকখানিই সভ্য মানুষের অপরিচিত, পর্যায়নিক মানচিত্রে পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রসীমা অনিহিত। এই হোল টুপিয়াল ওমান। সৌদী আরবের 'শুকহান' এবং পারস্য উপসাগরের মধ্যে অবস্থিত এক বিচিত্র দেশ।

শেষের রাজত্ব চলেছে। আরব উপদ্বীপ বেধানে পর্তুগী উপসাগরের মধ্যে নাক গলিয়েছে সেখানে অবস্থিত পাঁচটি রাজ্য: আবু বাহি, হিবাই, আতমান, উম আল কোহাই ওয়েন, তাল আল বাইয়া এবং মার্বা। শেষোক্ত রাজ্যটি ওমান উপসাগরের প্রান্তে অবস্থিত কাদবার রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত।

রাজ্যগুলির মধ্যে সুদ এবং চক্রান্তের অন্ত নেই। পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ন্যাশ্রয় কলহ লেগেই আছে। খরী বখলের জন্তে 'জোর বার মুহু' তার' নীতিই এখনো বলবৎ। এ ছাড়া আছে দস্যুর উপভব। অত্যন্ত আক্রমণ করে লুণ্ঠনকারীর বল, তারা আসে ভেতর দিয়ে কিংবা গুলিকবার মুখে বাড়ে কেউ না তাদের চিনতে পারে, গ্রাম মগরে হাধাকার কেল দিয়ে তারা অধিক্ত হয়ে যায়। তাদের আক্রমণ যোগের জন্তে দুর্গ তৈরী করতে হয়েছে, প্রবাল কিংবা বালি পাথরের কেলা মাথা জুলেছে স্থানে স্থানে, সেখান থেকে প্রহরী সদায়তর্ক দৃষ্টি মেলে রয়েছে দুঃের দিকে। কেলার শীর্ষে শুড়ে বসুপতাক:—রাষ্ট্রভেদ তার বেত অলো কম বেশী হয়।

বিলল বসতি রাজ্য নয়। সাতটি রাজ্যের মোট জনসংখ্যা আশী হাজারের মত। শতাব্দী পূর্বে এদেরই পূর্ব-পুরুষ প্রোতা ও পাস্কাভ্যগানী বাগিভ্যপোতের ওপর জল-দস্যুর বেশ কাগিরে পড়েছে, লুণ্ঠনরাজ, নরহত্যা কোন কিছুতেই পেছ পা হয়নি। প্রায় সাড়ে আটশ' বেসীর

মৌকা ছিল তাদের হাতে, তারা সংখ্যায় ছিল প্রায় বিশ হাজার। সূর্যঘট গেরে আল্লার নিত সুবক্ষিত প্রবাল বলরে। সমুদ্র সেখানে অগতীর, বড় সাহাব কাছে বেঁগেতেই পারত না। তাদের মৌক ছিল চাপ্টা, সহজেই গ্যা ঢাকা ঘেরা চলত। বরা ছোয়া কঠিন ছিল তাই।

জায়েব আক্রমণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতবাগিলা বিপর্যস্ত প্রায়। বাধা হয়ে বোঝাই পরকার জলদস্যুসমাকীর্ণ আনবতীরভূমি আক্রমণ কংলেন, স্থানীয় প্রধান শেষেরে সঙ্গে সাময়িক শান্তিচুক্তি স্থাপিত হোল, একেই ইংরেজীতে বলে টুল আর এই জগেই এর নাম হোল টুপিয়াল ওমান। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এষ্ট কুটনের সঙ্গে এই শান্তিসন্ধি সম্পাদিত হোল স্থায়ীভাবে। এরই কলে পারস্য উপসাগরের মৌ-চলচলে এল নিব্যাপতা।

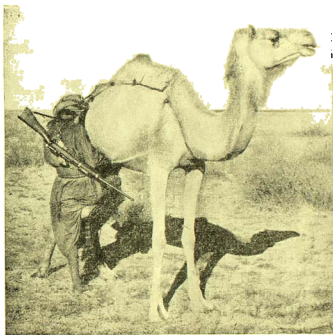
এখানের প্রধান আধিবাসী যাবাবর—বেছুইন নামে পরিচিত। উটের পিঠে চেপে এরা শত শত মাইলব্যাপী মজুতুমি অতিক্রম করে চলে। একটা কুল থেকে আর একটা কূপের দূরত্ব হয়ত একশ মাইল, মাঝে তার পথ বলে কিছুই নেই, একই বন্ধন বাস্তুশূণ্য বিভ্রান্তি ঘটাবার পক্ষে পর্যাপ্ত, বালির তাপ ১১০ ডিগ্রী কারেনমাইট পর্যন্ত ওঠে, এ অবস্থায় এতটুকু পথ ভুলের অর্ধভুকার অপমুহূ। থব-ভুটি এবং স্ত্রীকৃত স্ত্রীর ওপর নির্ভর করে এরা দিক নির্ণয় করে, দিকচিহ্নহীন অর্ধে বাসু সমুদ্র পার হয়।

উটের দুগ ও মাংস ছাড়া খাদ্যের মধ্যে অল্পতম হোল বেঁচুয়। সমুদ্রি পদপালের উপভব মুক্ত হয়েছে। বিধাতার এই মৎসাধিক্ত মানব বিনষ্টের পথে।

একদিকে মজুতুমি অপরিচিত সমুদ্র। বালির মধ্যে বাটফুট অবশিষ্ট গর্ত খুঁড়ে এরা তিক্ত, দুর্গন্ধবুস্ত, স্নানি, নানা বন্ধনের নানা বস্তের জল বার করে, 'আব সমুদ্রে ডুব দিয়ে' আনে মণিভুস্তা, তারই সন্ধান বেধিয়ে পড়ে দূর দালমা কি

আবু হাবি ঘোঁপের উদ্দেশ্যে। হাওর, মেদী কিশ এবং অজ্ঞাত সামুদ্রিক প্রাণীর আক্রমণ উপেক্ষা করে মরণ্যাত জুহুরী নেমে চলে সমুদ্র সতীরে, প্রায় একশ নুট নীচে অবধি যায়, থাকে বেড় থেকে ছাঁমিনিটের মত, তারপরই তেমে ওঠে, কাঠের অথবা হাড়ের ত্রিণ দিয়ে নাক বদ্ধ থাকে, সেইটে ধুলে নুতনের বাতাস যায়। এইভাবে নাক আটকালেও কান বদ্ধ করতে পারে না, অনেক

কোমরে 'খানজার'—বাঁকা ছোরা—এ ধোঁপের জাতীয় অস্ত্র। এ হেন অস্ত্র কাছে রেখে এরা সে উগ্র রকমের স্বাধীনতা প্রিয়তার পরিচয় দেবে তাতে আশ্চর্যে কিছু নেই। এই সঙ্গে এদের আছে স্বর্ঘ্যচেতনা এবং জাতীয়ভাবোথ। নিষ্ঠুর প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম ও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সধাসতর্কতা এদের মধ্যে এমনছে একটি প্রকায়োথ। অপরকে সাহায্য না করাই পাপ, আঘাত যদি একে অপরকে না হেঁচি তবে



মরুভূমির মধ্যেই উটের দুই বোহন চলেছে, ওতেই মিটেবে হুকা

কেন্দ্রে জল ঢুকে অসহ্য যন্ত্রণা হয় কানে, তখন উত্তপ্ত লোহার শিক চুকিয়ে চিকিৎসা চলে। (আমাদের প্রশ্ন : তাতে কান বাঁচে, প্রাণ বাঁচে কি ?) মাঝে মাঝে তীব্র ঝড় ওঠে পাহাড় উপসাগরে, চ্যাপ্টা নৌকা উল্টে যায়, বহু প্রাণ বিনষ্ট হয়। এ এক কঠিন সংগ্রাম।

সলে বেদন সংগ্রাম ধুলেও তেমনি—তীক্ষ্ণ, কঠিন এবং নিষ্ঠুর। আশ্চর্যকর অস্ত্রে হাতে থাকে রাইফেল আর

মরুভূমিতে বাঁচবে কি করে ?—এ কথা তো একজন সাধারণ বেহুইনের মুখে লেগেই আছে। এখানে একে অপরকে সাহায্য করে হয়। দেখাতে নর, পবিত্র কর্তব্য পালন করতে।

এই মনোভাব এদের মধ্যে এমনছে সূক্ষ্মর আতিথেয়তা প্রথা। ধীন বেহুইন থেকে সুস্থ করে রাখার সর্বসর্বা শেষ পর্যন্ত অন্তিবি সংকারে সচেত। দরিদ্র যেখানে এক কাপ

ଓଟର ଛବି ଦିଅେ ଆପ୍ୟାୟନ କରେ ସେଠାନ୍ ସହସ୍ର ସେହସେର ଯଥା
ତୋଷେର ବହର ନିଅେ ଦୀତିମତ ଶ୍ରୀତିଯୋଗିତା ଚଳେ, ବିକ୍ରମ ମୂଳ
ହୁବତୀ ଏକହି ।

ଅତିବିକେ ଅନ୍ଧାନ୍ ଶ୍ରବଣେର ଏକଟି ବିନ୍ଦିତୀ ଶ୍ରବଣ ଆହେ
ସେହସେର ଯଥା । ବା ହାତେ କଢିପାତ୍ର ଆଦି ଡାନ୍ ହାତେ
ମୋଟାଲା ନିଅେ ଗୃହ-କୁଣ୍ଡାର ଆଦିରାବ ହୟ । ଶ୍ରବଣେ ମେ କହେକ
ଫୋଟା କଢି କାପେ ଡେଲେ ଅତିବିକେ ହୟ । ଶ୍ରବଣ ଯାଦିକି
ଅତିବି କୁଣ୍ଡାକେ ଗୃହସ୍ଥାନୀର ଦିକେ ଚାଳିତ କରନ୍ତ । ତିନି
ଆଦାର ପର୍ବଣ ମୋକ୍ତେ ଅତିବିକେହି ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ର ଶ୍ରବଣ
ଅହୁରୋଧ ଜାନାନ୍ । ଏହିତାସେ ବାବକହେକ ଚଳେ ଅହୁରୋଧ
ଓ ଶ୍ରବଣାଧାନେର ପାଳା । ଅବଶେସେ ଅତିବି ତିନି କାପ
କଢି ଶେରେ ମୁକ୍ତ ମାତ୍ର ବେଦେ ଜାନାନ୍ ସେ ଓପର ପୂର୍ବ । ନ
ଜାନାନୋ ପର୍ବଣ ମୁକ୍ତ ମାତ୍ର ପୂର୍ବ ହେଇ ଚଳେ ଏବଂ ଆଗିନି
ବହି ଏହି ଶ୍ରବଣାଟି ଯା ଜେନେ ଦେବାସେ ମେ ଡେଲେ ଦିଅେ ପଢେନ ତସେ
ତିନେର ବହେଲେ ଆପନାଟି ତିନିଶ ବାପ କଢି ଶେରେ ହସତ
ନିକାଟା ନାଜ କରତେ ହେବ ।

ବଲା ବାହାଲ୍ୟ ବନାତା ବାକ୍ତି ଏବଂ ନାମକହେର ଯଥେ
ତୋଷେର ଆହୋଜନ ଏତ ଡେରେ ଅନେକ ବେନି ଜାକାମୋ ।
ମତ୍ତ ହଲେ କାର୍ପେଟେର ଓପର ମାଧା ଚାପଟ ପଢେହେ । ବିଟାଟି
ଡେ ଭାରି ଖୁମ୍ବାକାର ତାତ, ତାର ଓପରେ ହେଲ, ତେଡ଼ା ଦିଆ
କଢି ଓଟେର ନାମ, ସେହି ଡୁମ୍ବ ବିରେ ମତ୍ତବାନେକ ଛୋଟି ଡିଲେ
ହରେକ ଡକମ ତବକାରୀ ଆଦି ବେହୁର । ମିଛିଲ କରେ ଅତିବିଶା
ଶ୍ରବଣ କରବେନ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଅତିବିହି ହବେନ ଗୃହସ୍ଥାନୀ,
ଅର୍ବାବ ତିନିହି ଗୃହସ୍ଥାନୀକେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜାନାବେନ । ବାଜ୍ଜା ଲୀ
ବହେର ବିନାସବିଗଳିତ ଗିଜେର ସେହି ଉକ୍ତି “ମାତ୍ତେ ଏତୋ
ଆପନାଟି ବାଜ୍ଜା” ଓହେର ମଣ୍ଡେ ଏକେହାରେ କର୍ବେର ସାହା
ହୁଶ୍ରୀତିକ୍ତି ।

ଆଦି ବାଲୋ ବେଶେର ବନେଦି ବେଶେର ବାବୁବେର ସେହି ପାୟତା
ଓଡ଼ାନୋ ସେଲାର ବହେଲେ ଓହେସେ ହରେହେ ମାଧ୍ୟାମି ବାକପାଦୀ
ଦିଅେ ପାଦୀ ନିକାଟେର ଶ୍ରବଣ । ଏକଟା ଶ୍ରୀତି ନିୟାମିବ
ଜମଜଟା ଆଦିବ—ଜମଜାଓଡ଼ାର ଗୁଣ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱାବଟି ବଟେହେ ।

ଫୋସେ ଚୂଳି ବେସେ, ସେଗାଟୋପଓଡ଼ାରା ବାଟାର ପୁଅ,
କହନୋ ମାପେ ବଢି ବେସେ ନିକାଟେର ମେହେନେ ମେଲିଅେ ଦିଅେ
ଏହି ନବ ବିକ୍ରମ ପାଦାକେ ବନ ଜାନାନୋ ହୟ । ଏ ଦୀତିମତ
ଏକଟା ଆଦି । ଅନନ୍ଦେବ—ଏକବିନ ବାକ ସୁନିକ୍ତିତ ହରେ

ଓଟେ, ମହେକାଲେ ପାଦୀର କାକି ବନେ ନେମେ ଆସେ ଯନ୍ତ୍ର-
ଯାଦିତେ ତବନ ନିକାଟାର ବଳ ସେର ହୟ । ନିକାଟାର ନକ୍ସା କରେ
ନିକ୍ତିତ ବାକ ବନ୍ଧନହୀନ ଶ୍ରୀତି ପତିତେ ଓଡ଼େ ସାହା ସାଲିକେର
ହାତ ଥେକେ, କିରେ ଆସେ ଠୋଟେ ଏକ ବଜ୍ରାସ୍ତ୍ରତ ସୁତଶ୍ରୀ
ନିରୀହ ଶ୍ରୀତି ନିଅେ ।

ଏହାବେଳେ ଆଦି ଏକଟା ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଓଟେର ମୋଡ଼
ଶ୍ରୀତିଯୋଗିତା । ଆସେ ବାକତେ ବିଶେଷ କୋନ ଡୋଡ଼ାଘୋଡ଼
ନେଇ । ଭୋବେଲେ ହସତ ଡକନବାନେକ ଓଟ ଗାଳକ ମିଟେ
ନିଅେ ଯନ୍ତ୍ରଭୂମିତ କାମିଅେ ମଡ଼ା । ମିଛୁ ମିଛୁ ମରୀତେ



ଫୋସେ ସାମି ମେହେହେ ; ମାପେର ମେହ ଦିଅେ ମେଟି ବେର
କରାବ ଡୋଟା କରହେ ଆଦିବ ବେହୁର

ଫୁଟଲ ବର୍ଷକେର ବଳ । ଏକ ଏକଟି ଓଟେର ମେହେବେ ଏକ ଏକ-
ବଳ ସର୍ବବକ । ତେବେ ସେହୁନ, ଧୁ ଧୁ ହରୁହୁରି, ଡକନବାନେକ ଓଟ,
ଏକ ଏକଟାର ମେହେବେ ମରୀତ ଗିଜତ ମାହୁବେର ବଳ, ହେ ହେ
ଚୀବକାର, କହେ ବର୍ବ ବାକହେ, ହୁ ଚାପଟେ ବୁଲେଟ ଟୁଟେଲେ ହୁକେ,
ଏ ସର୍ବବି ଆଦି ଏକଟୁ ଗୋରେ ଛୋଟାର ଅହୁରୋଧ । ଐ ସେ
ନିୟାମୀର ବାହ ବରାବର ଏସେ ମେହେ ବୁକ୍ତି, ମରୀ ଦିଅେ ଏକଟୁ
ବାକାହି ସେବେ ବିଲ ଓଟଟାକେ, ଅବେହି ନା ଜମଳ ଯାହାଟା ।

କେ କିଜଲ ? ଐ ସେ ବିକ୍ରମୀ ଓଟ ଚଳେହେ ଛର୍ପେ, ମୋହାବେ
ସାହାସା ଓବ ମାପେ ମୋହାସା ଜଳ ବର୍ଷ କରବେନ, ମାହାସ
ହତ ହୁଡ଼ାବେନ ।

এতো গেল জনতার উৎসব। লোক চমুর অস্থানে চলে রক্তময় বর্ষাছুটান। বিশেষতঃ ইপসাহের সুকি শস্ত্রধারের করেবটি আচার অল্পকিট হর নিম্ভুত রাখে। পরিচালকের নির্দেশে সমবেত হর নিম্ভুত, আহবায়ক, ইত্যাদি এবং বাবুচী শস্ত্রধারের লোক। বাহের নীচে কার্পেটের ওপর তারা নার ফিরে মুখোমুখি বসে, এক বলের হাতে থাকে ছাশ, তাহের সমুখে বসেন পরিচালক। বাহের তালে তালে আহবায়ক ভাষায়, হুগ করণ মুখে স্তোত্রপাঠ

অকস্মৎ পরিচালক একমনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, সে মাঝনে এগিয়ে আসে, পরিচালক তরবারী তুলে নেন, লজ্জাবে আঘাত করেন, তীব্র ধার তরবারী কাঁথের একোয় একোয় হয়ে যায়, কতের সৃষ্টি হয় কিন্তু বিশ্বস্তের বিধর রক্তপাত হয় না। তাহের বিশাল ইশ্বর কর কতি থেকে সকলকে বন্ধা করছেন, তাই একে একে অনেকেই এগিয়ে আসে স্তব্র নির্দেশে।

কখনো কখনো রক্তপাত হটে। কতদ্বানে এক সৃষ্টি



আজের পুনঃ পুনঃ আঘাত চলেছে কিন্তু কোন রক্তপাত হচ্ছে না

মুক্ত হর, অল্পকিট মর্ষণজিহ্বানের কাছে কোমল প্রার্থনা আর অঙ্গুনয়ে আকাশ ভরে ওঠে।

ছাটো গান বেধে যায়, তরবারী হস্তে নেতা উঠে দাঁড়ান, সকলে গোল হয়ে তাঁকে ঘিরে ধরে, ডোমের শব্দ নেমে আসে হুগ আর বিসম্বিত লয়ে, সকলে তীব্র চীৎকার করে ওঠে, আবার শব্দ উচ্চগ্রামে ওড়ে, এমন তব্রা হুগে গোল দুগোশ থেকে। তারা কখনো মাঝনে হুগে পড়ে কখনো পাশে হেলতে ছলতে থাকে। একটা কাগর সুবণ শোনা যায় তাহের মধ্যে।

বালি ঘষে কেন পরিচালক। তারপর অঙ্গুটান শেষ হয়। তাহের অঙ্গকারেই সকলে ঘিলিয়ে যায়।

এ অঞ্চলের স্ত্রীপোক্তকের মধ্যে পরাগ্রাধা বিস্তারান। যোয্যার বহলে কাল কাপড়ে মাথা, মুখ ও দেহ আবৃত করে মেয়েরা পথেঘাটে বেড়ায়। সেই আবরণে ঢাকা পড়ে যায় তাহের গহনা ও স্তব্রের উচ্চল ঐশ্বর্য। অল্পকিট নগরেই এই প্রথা কিঞ্চিৎ কঠোরতার সঙ্গে অহুস্ত হয়। নিজ নিজ গোষ্ঠিতে বেহুইন নারী অনবগুণিতাই থেকে যায়।

এই পর্বেপ্রবাস কালে পেশাবার বৃত্ত্যপটীয়শী রমণীস্বর
আবির্ভাব ঘটছে পুত্রব্রতপ্রধান সমাজে।

পুত্রব্রতের মতই মাটির গুপে মেয়েদের বেছে মনে অগ্রে
এক বলিষ্ঠতা বা সত্যসমাজে দুলভ। মরুভূমিতে চলেছে
উটের শ্রেণী, মাথার ওপরে শব্দগ্রাসী সূর্য, পারের তলে
মিতলপ পৃথিবী, বেহুইন নারী টুপ করে নেমে পড়ে উটের
পিঠ থেকে, অলক্ষণ পরেই কতি শিশুর কান্না শোনে
পৃথিবী, নবজাতককে নিয়ে মা আবার উটের পিঠে চেপে
বসে।

সর্বত্রই যখন সংগ্রাম তখন প্রথম এবং পরিণতের মধ্যেও
যে দুঃখের ব্যবস্থা থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি! রাস অংশ
বাইমার শিল্প উপলব্ধির মধ্যে একটি বিশিষ্ট প্রকাণ্ড
শিল্পরা অনেক ছাত্তরীন ভূপাকার পাথরের ধরে কিংবা
গুহার বাস করে। কুমারী কস্তা থাকে গুহার ভেতরে।
বাইরে যুগের হাতে পাকিয়ে থাকে তার আত্মীয়। পানি-

প্রাণী যুবককে তার মাথা ঝাড়িয়ে (গা হাত পাও মটে!)
প্রিয়তমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে।

এই হোল আরবের অজ্ঞাত অঞ্চল। এখানেই বালি
চূর্ণমান প্রপেলায়ের দ্যত পর্জন করে, এখানে উত্তর
পশ্চিমা 'শামন' স্ত্রী নৌকা ভূমিরে দেয়, এখানে বালি আর
ফলের নীচে আছে পেটল, গলা সোনা, আর আছে মাহুধ,
মাহুধের দাবিরা, অভাব, অশিক্ষা। কত বিভিন্ন তাদের
জাতি-উপজাতি, তাদের ভাষা, আচারপ্রথা। এক বিপুল
পরিবর্তন আগছে তাদের জীবনে, এক একটি তৈলশনি
আবিষ্কারের সঙ্গে অনিদিষ্ট রাষ্ট্রসীমা নিয়ে উঠবে প্রবল
বিতর্ক, প্রচণ্ড কলহ, তাইই থাকার সাধারণ মাহুধের
জীবন একটিকে হয়ে উঠবে অশিক্ষিত, বিপণ্ডিত, অপর
দিকে 'গল সোনা'র মহিমার আগন্তুক গারে সূর্য সন্ধ্যা...
শান্তি ঐশ্বর্য...শতাব্দী সঞ্চিত লাহমার পারে এক নব-
জীবনের আভাস—



পুস্তক পরিচয়

শান্তির সব বিপাক : চেষ্টার বোম্ব : অস্বাধক—
পরিমলকুমার ঘোষ। পার্স পার্লিগেমন্স প্রাইভেট
লিমিটেড, বোম্বাই—১। মূল্য ১।

চেষ্টার বোম্ব, কিছুকাল আগে ভারতবর্ষে মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপুত্র ছিলেন। এনিয়ার নামা স্থান পর্যবেক্ষণ
করে তিনি বিশ্ব শান্তির অদৃশ্য শক্তির সন্ধান করেছেন
এবং এখানে তার পরিচয় দিয়েছেন। এঁরখানি আট ভাগে
বিভক্ত : দুই অংশ থেকে মিশ্রল অবস্থা, মার্কস এলেন
মফোর, চীন বিপ্লব পথভ্রান্ত, গান্ধীর পন্থা নির্দেশ,
বালুকের স্পর্শিত আত্মা, তেজস্বী উইলসন ও হেন্রি
ফোর্ডের বিপ্লব, স্পর্শিত আত্মার নক্তি নিরুপণ, বিপ্লবের
অগতে মার্কিন নীতি।

ভারতের পররাষ্ট্র নীতি প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন :
“আমাদের নিজেদের জাতীয় লক্ষ্য এবং ঠান্ডা হৃদয়ের
কারণ বিবেচন দিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বিচার করা
ভুল হবে। বৈষ্ণব নিরপেক্ষতার একজন প্রধান সমর্থক,
এই কারণে নিরপেক্ষতার অস্বাধক হই আমেরিকাবাসীরা
একমাত্র ভারতের উপর আয়োজ করে, তা-ও ভুল হবে।
এশিয়া, আফ্রিকা এবং হক্সি আমেরিকার অগ্রহস্ত
দেশগুলির ভিতর এই অবস্থা কম বা বেশী ব্যাপকভাবে
বিস্তার লাভ করেছে এবং শুধু এদেশগুলিতেই এ অবস্থা
দীর্ঘাবধি নয়। জাপান, ইতালী, ফ্রান্স এবং কাঁধাণীর
অনেক সংখ্যালঘু জনসাধারণও একটা স্থাপিত বাস্তবনৈতিক
কর্মপ্রাণী রূপে নিরপেক্ষতার মতবাব প্রকাশে সমর্থন
করে।—ভারতবর্ষকে বিভাব করতে হবে তার নিজের
হাবি অনুসারে, বাসিয়া বা আমেরিকার বলভূক্ত হবার
প্রার্থীরাপে নয়। বরং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি,

বৃহত্তম গণতন্ত্র, এশিয়া ও আফ্রিকার বৈশ্ব জাতি নৃতন
স্বাধীনতা পাবে, তা-ও প্রধান নেতারাণে ভাবভুক্ত
বিচার করা উচিত।”

উপসংহারে তাঁর উক্তি : “লিঙ্কন এই ভাবে...
আমেরিকার বাণী ঘোষণা করেছিলেন...এ, স্বাধীনতার সব
মামুলের উপর থেকে সবকম নিশ্চেষ্ট উঠে যাবে এবং
সকলে সমান অধোগ লাভ করবে। যদি আমরা লিঙ্কনের
গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের কতকটাও পুনরুজ্জীব করে অগতে
প্রয়োগ করতে পারি, আমরা যেতে পাব, আমাদের
নিজের রাষ্ট্রবিপ্লবই তার সতিবেগ নিয়ে আবার জীবনী-
শক্তি লাভ করেছে এবং ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও
হক্সি আমেরিকার জাতিরা নৃতন বিশ্বাস ও নৃতন
সৌহার্ষ্যের ভাব নিয়ে আমাদের বিকে দ্যত বাচ্চিয়ে
দিয়ে।”

বইখানিতে বিশ্বের রাজনৈতিক অস্বাধক নিপুণ
আলোচনা আছে এবং একটি উন্নত আদর্শপ্রকাশ পেয়েছে।
অস্বাধক শাসন, স্বাধা এবং জরাজীর্ণ। প্রকাশনা
পরিপাটী এবং মূল্য স্থগত।

মুদ্রা : আবার শ্রাবণ, ১৯৩২। ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

সম্পাদক : সমর চক্রবর্তী। কাঁধাণ ২৩১০ চক্রবেড়ে
বোড মাউথ, কলিকাতা-২৪। মূল্য ০.৪০ ন. প.

এই বৈমাদিক কবিতা পত্রিকাখানি ছয় বছর ধরে
চলছে। এটি সম্প্রদায়ের মিঠা এবং অস্বাধের নিবন্ধন।
বর্তমান সংখ্যার প্রধান প্রবন্ধ ভীষ্মানন্দ শানের ‘লেখার
কথা’। নবীন কবিদের যে কবিতা এতে স্থান পেয়েছে
তা তাঁদের ভাবগতির ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিচ্ছে।

—বী।





। কিশোরী।

১২ই ডিসেম্বর কিশোরীর জন্মি বাবিকী। তাঁর সম্পর্ক ঐশ্বর্য্য এতদেহন, তাঁরাই তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় পেতেছেন। নিজের সকল ক্ষুণ্ণে নীরবে সহ্য করে, হাসিমুখে প্রেমের ও বশের সেবার আত্মনিয়োগ করে এত বড় বৃষ্টান্ত এ যুগে বিরল। অর্থনয়, খ্যাতি নয়, আত্মপরিচয়ই আত্মপ্রেমের অঙ্গসঙ্গ, পেয়ে নয়—শুধু দিয়ে তৃপ্তি, এই ছিল তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য। সে মহর কি আমাদের অঙ্গপ্রাণিত করেছে ?

। জগদীশচন্দ্র ও বিপিনচন্দ্র ।

যেহেতু সুস্থান এই দুই মনীষীর শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হ'লো। এই উপলক্ষে চিন্তামূল ব্যক্তিসংগ্রহে জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তা হেতু যদি আমরা জীবন-পথের পাতের সংগ্রহ করতে পারি, তবেই আমাদের এ উৎসবে যোগদান সার্থক।

মজ্ঞানি বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ জগদীশচন্দ্রের কাছে সেবা বরীন্দ্রনাথের চিঠিগুণ্ড প্রকাশ করেছেন। তা দেখে একদিকে যেমন জগদীশচন্দ্রের আত্মপরিচয় সন্ধান পাই, অন্যদিকে তেমনি তাঁর আধিকার ও গবেষণাকে বরীন্দ্রনাথ কত আগ্রহ ও প্রভাব সঙ্গে বেষণতেন তার পরিচয় পাই। এ বিষয়ে যুগ্মপত্রের ভাবানুষ্ঠে বরীন্দ্রনাথ বেকনা বোধ করেছেন, এবং প্রয়োজন হ'লে সংসার-চিন্তা থেকে বিজ্ঞান সাধককে মুক্তি দেবার জন্য যত্ন অর্থ দিয়ে প্রদত্ত হতে চেয়েছেন।

শিশুচন্দ্রের ভালো জীবন-চরিত আশও সেবা হয়নি। এ বিষয়ে দৃষ্টি মেঘের আবৃত্ত। তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের জাতীয় জাগরণের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে বদ্ধিত। শুধু তাই নয়, জগদীশচন্দ্র ও বিপিনচন্দ্র বাক্যক্রমে বৈজ্ঞানিক ও-বাহনৈতিক বৈজ্ঞানিক হ'লেও সেই সঙ্গে সাহিত্যিক। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁদের স্থান স্বরস্বী।

। পাকিস্তানের আচরণ ।

প্রতিদিনের কাগজ খুলেই দেখি, ভারত-সীমান্তে নিরপরাধ ভারতবাসীদের উপর পাকিস্তানী পুলিশ বা সৈন্য অত্যাচার করেছে, জেলেদের জাল কেড়ে নিয়েছে, চাকীদের কদম কেটে নিয়েছে, কাউকে কাউকে ধরে নিয়ে আটক করে রেখেছে। তাঁদের স্পর্শ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে—যতটা আমাদের সহিষ্ণুতার প্রশ্রয় পেরে। সত্যগতি হচ্ছে বাথানো নিরাপত্তা নয়, তা তারা জানে, এবং আমবাও মুছ এড়াতে চাই বলেই বৈধ ধারণ করি। তবু অবস্থা উৎসাহনক। মিষ্টি কথাই যেখানে চৈতন্য হয়না, সেখানে অন্য উপায় চিন্তনীয়।

এবিক দুই রাষ্ট্রের ভূমি-বিনিময় সম্পর্কে যেহেতু হু-চুক্তি কার্যকরী করার আয়োজন হচ্ছে। শ্রীযুক্ত নেহরু ভারতের বে-বে অংশ পাকিস্তানকে ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছেন তা নিয়ে লোক সত্যার এবং তার বাইরে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের কোন অংশ হস্তান্তরের পূর্বে বহু বিচার বিবেচনা আবশ্যক। বহুতঃ রাষ্ট্রের কোন অংশই দেশবাসীর বিনা অনুমতিতে হস্তান্তর করার অধিকার কার্যকর নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে কোনওকম কথা যেওয়া প্রধান মন্ত্রীর সম্মত হয়নি বলে অনেকের ধারণা। পাকিস্তানের সঙ্গে সত্যায়িত সেন বেন বা বিনিময় আশা করা কঠিন, কেননা সহযোগিতা বা সৌভাষ্যের কোনো পরিচয় তার দিক থেকে পাওয়া যাচ্ছেনা।

অরুণিম আপসেই ভারতীয় হাই কমিশন অফিসের বিদ্যাব্যবহক জিআয়ার তাঁর পরে যোগ দেবার জন্য রাজশাহী যাবার পথে বর্ণনার পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের হাতে গুরুতর ভাবে প্রদত্ত হয়েছেন; তাঁর স্ত্রীও স্বর্গদেব অত্যাচার থেকে বেহাই পাননি। হু'বনই হাণপাতালে জাচ্ছেন। আরও কিছুদিন পূর্বে করাচীতে ভারতীয়

হাইকমিশনের উপর পাকিস্তানী জগত্মির কথা কান্নে
বেগিয়েছিল। এ অবস্থায় আবেদন নিবেদন বা চিঠিতে
প্রতিগার মানানোয় কি কিছু ফল হলে? আর, এই
যেখানে শাসকবের মনোভাব, যেখানে সম্ভবে জুনি-
বিনিময়ের কোনও সম্ভাবনা আছে কি?

। মুক্তির প্রেক্ষার।

ঐতিহাসিক মুক্তির বিরুদ্ধে অনেক মামলা চালায়
হয়েছে। অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হাতে নিয়ে তিনি
নানাবরকম ছল চাতুরী অবলম্বন করেছেন, এই অভিযোগ।
তার নামে পরোয়না বেস্তার পরে কলকাতার পুলিশ
নাকি তাঁকে খুঁজে পেলো। অবশেষে তিনি আশ্রয়সম্পন্ন
কলেন এবং এক মামলা উপলক্ষে তাঁকে লক্কো নিয়ে
ফাওয়া হ'লো। খুঁজে না পাওয়ায় ব্যাপার অনেকের কাছে
বহুস্তম্বর মনে হয়েছিল।

অনেক মামলায় তিনি ঘড়িত। ব্যবসায় ক্ষেত্রে আর
কি বরকম অসাধুতা এবং ছিন্মিনি চলেছে, এই উপলক্ষ
তার একটি প্রকৃষ্ট বুটায় পাওয়া গেল। অবশ্য সব
ব্যবসায়ী অসাধু ন'ন, কিন্তু অসাধুতার মাত্রা আপত্যজনক
হয়ে উঠেছে। লাইক্‌ইন্সিওরাস কর্পোরেশনের পত্নী
কর্মচারীরা ঘারিঘরানের পরিচয় দেননি, মুক্তকে সম্বন্ধ-
জনক ভাবে সাহায্য করেছেন, এটা আরও পরিভাপের
বিষয়।

। দণ্ডকারণ্য-উপনিবেশ।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর শিবির ঈশ্রই জুলে বেওয়া হবে
হলে সবকরে ঘোষণা করেছেন। উত্তরবা ডিবকাল ডিকা
বা মদকারী দানের উপর নির্ভর করে বাস্ক, এটা বাস্কীর
নয়, সম্বন্ধ নেই। কিন্তু এতদিনেও তারের বসতি-নির্দেশ
কিবা নির্দেশ পায়ে দাঁড়ানোর সংস্থান সরকার থেকে
কবে দেওয়া হয়নি, এটাও দুঃখজনক। টাকা খরচ কম
হয়নি, তবু মূল্যবান ভাবে কাজ হয়নি, বহু অর্থের অপচয়
হয়েছে। উত্তর বিভাগের ক্ষুদ্র কর্মচারী থেকে উপ-
প্রাশালা সকলেই এর ক্ষয় দায়ী। বেস্তার বা অনিচ্ছার
তারা অপচয় হতে দিয়েছেন। উত্তরবা অনেকে মন নয়,
এ অভিযোগ শোনা দিয়েছে, কিন্তু সরকারী মহল থেকে

সাহায্য না পেলে তারা অসং পত্নী অবলম্বনে কৃতকার্য
হ'তো না।

সম্প্রতি দণ্ডকারণ্যে উত্তর উপনিবেশ স্থাপনের
আয়োজন চলছে। প্রত্যক্ষকারীবেদ সংগঠনপক্ষে প্রকাশিত
বিবরণ থেকে মনে হয়, স্থানটি বঙ্গবাসের অল্পপাশে
বহুনা। প্রথম দাঁড়া বাবনে তাঁদের কষ্ট স্বীকার করতে
হবে সম্বন্ধ নেই। কিন্তু এখানেই বা উত্তরবা কি স্থানে
আছেন? কেউ কেউ বাঙালীকে দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার
নিবেদী। আমাদের মনে হয়, এ বিষয়ে ভয়ভাবুরে
স্বভাবকে বেশী প্রভাব না দেওয়া ভালো। পশ্চিমবঙ্গে
চাষ বাস করে বসতি করবার মত খালি জমি বেশী নেই।
এ অবস্থায় বাইরে নতুন বসতি গড়ে তুললে ক্ষতি কি?
এর আগেও তো বাঙালী নানা স্থানে দি়ার হলে হলে
বসবাস করেছে। সেন্স স্থান অঙ্গ নির্জন বন ছিলনা,
লোকালয় ছিল। কিন্তু ইউরোপের লোক বেস্তার গিরে
বনজঙ্গল কেটে আমেরিকাকে নতুন করে গড়েছে,
আফ্রিকার উপনিবেশ স্থাপন করেছে। বাঙালী কি
সরকারী সাহায্য নিয়েও নতুন উপনিবেশ গড়তে পারবেনা?
আম্মানানে, দণ্ডকারণ্যে যদি দুঃস্তব বস্তের সূচনা হয়, মক্ষ
কি? সাহস পক্ষর করে এগিয়ে গেলে হয়তো বাঙালী
ব্যর্থতার অপবাহ নিয়ে কিরবেনা।

। সোভিয়েট দেশে।

বুগেনিন আর কুন্ডেৎ একসঙ্গে এসে ভারত সফর
করে গেলেন। ভারতবাসী তাঁদের সাহস অভ্যর্থনা
জানালো। আর এর মধ্যেই বুগেনিনকে প্রেসিডেন্ট পদ
ভ্যাপ করে' অজ্ঞাতবাসে যেতে হলো। সে অজ্ঞাতবাস
ইহলোকে কি না, তাই ব'কে জানে? কড়া শাসন হয়তো
ভালো, কিন্তু তা বলে পাম্পশবিক সম্বন্ধ এবং প্রাপের
অবধায়া কোন রাষ্ট্রেরই গোঁবের বিষয় নয়।

। গান্ধীজীর মূর্তি।

কলকাতার চৌকী-পার্কট্টের মোড় শ্রী দেবীপ্রসাদ
বায়চৌধুরী গড়া গান্ধীজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্রোজে
ভৈরী, বকী-গাজার, মজী। পথের ঈশা ডিঙিরে চলেছেন।
উটায়ের মূর্তি অপমানিত করে এই মূর্তি স্থাপন নিয়ে
অপে পরে নানান কথা উঠেছে। একদল সমালোচক

উটান মূর্তি স্থানান্তরের নিষ্পত্তি করেছিলেন। তাঁদের মতে ইতিহাস ও শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শনকে এভাবে সরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আর একদল শাক্তিকের পরিবারে ওখানে নেতাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন। শুধু তাই নয় একদল বৈষ্ণবোদ্ভবক শাক্তিকের মূর্তি ভাঙতেও গিয়েছিলেন।

ইতিহাস বা শিল্পের নিদর্শনরূপে ধারা আমাদের বাসস্থান চিত্তকলিক লোকচকুর সংক্ষেপে রাখতে চান আমাদের তাঁদের সমর্থক নই। অস্ত্রের বক্ষণগারে সেগুলো রাখাও ব্যাবস্থা বোধক, আপত্তি নেই, কিন্তু রাষ্ট্রপতির বাসের প্রবেশ অলঙ্করণ তাহের গৌরব বোধবা পছন্দ করি না। অস্ত্রের বিধেই শাসনকের মূর্তিও অপসাদিত হলে আমরা খুশী বই। গবেষকদের মত তারা অস্ত্র কোনো সংগ্রহালয়ে রাখুন।

নেতাজীর মরহুম স্বদেশীয়, দেশিগণের বিমত নেই। কিন্তু শাক্তিকের মূর্তি সরিয়ে ঠিক দেইখানেনই তাঁর মূর্তি বসাতে হবে, এর কি মূর্তি আছে, বৃষ্টিনা। বিশেষ, এই ব্যাপার নিয়ে শাক্তিকের মূর্তি ভাঙবার চেষ্টা বড়ই অযোজন।

৥ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ৥

ঐযুক্তল্য যোষ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সভাপতির পূর্ব পরিত্যাপ কববার পূর্ব প্রিয়ারবেশ মাথ পাঁচা নূতন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি প্রবীণ, অভিজ্ঞ, অদ্বৈত। তবে সুদৃষ্টিপে দারিদ্ৰতার বহনের পক্ষে কি তাঁর বরণ বোধে নয়? কংগ্রেস কোমন্সে টিকে থাকুক, শুধু এই আমাদের কামা নয়, সে নতুন প্রাণে উজ্জীবিত বোধ, আমরা এই চাই। বাংলায় তরুণ আজ কতকটা বিশেষভাবে, তারা কর্মক্ষেত্রে অনাহুত। ধীরে আস্তানে তারা সাড়া দেবে, পাশে এসে দাঁড়াবে, এমন নেতা কি কেউ নেই?

আপনার
রকনোপকরণে
যে পুষ্টি
চান

হনুমান

বনস্পতি



'এ' এবং 'ডি' ভিটামিন দ্বারা সমৃদ্ধ

বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আপনার পুষ্টির অভাব
৪ পাঃ এবং ১০ পাঃ দিনে
পাওয়া যায়। ৩৬ পাঃ দিনেও
পাওয়া যায়।

সুখাদ্যই সুখ ও

স্বাস্থ্যের উপাদান

প্রস্তুতকারক
ডাঃ এম. এ. হোসেন সিং

সাইকেল ষ্টোরী

ভালমিহানপুর, বিহার

SRM/2/8



একবিংশ বর্ষ

মাস, ১৩৩৩

দশম সংখ্যা

স্মৃতিকথা শ্রীকালিদাস রায়

বসন্তের শেষে ইতিহাসটা এই—অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী একদিন কালিকা প্রেসের মালিক মনোব্রজ চক্রবর্তী ও আরেকটি প্রেসের মালিক যুত্মজ্ঞকে সঙ্গে করে এনে আমাকে বললে—এঁরা একথানা মালিক পত্র বার করতে চাচ্ছেন, আপনাকে ও আমাকে সম্পাদক করে। মালিক পত্র চালানো যে কত শক্ত সে অভিজ্ঞতা আমার বা বিশ্বের ছিল না, ঐ দুই প্রেসের মালিকদেরও ছিল না। আমরা ভাবলাম—সাহিত্যিকরা আমাদের বড়, লেখা পাওয়া শক্ত হবে না, সেকালে বিনা পয়সায় লেখা পাওয়া যেত। তা ছাড়া, আমরা দুজনেই লিখতে পারি, কাগজ সেকালে এত দুর্লভ ও দুর্লভ ছিলনা। অতএব কাগজ ও মগজ দুটোই চিন্তার কারণ নেই। দু'টো প্রেসের মালিক যখন তার নিচ্ছেন তখন আর ভাবনা কি ?

ওঁরা ভেবেছিলেন—লেখার কাজ আমাদের ভাবতে হবে না—ছাপার কাজ ও চিন্তা নেই—ই, ছাপাখানা রয়েছে; এমন কি Type foundryও রয়েছে। এক শুধু কাগজের সামান্য দামটা লাগবে। ভালোমত বিজ্ঞাপন যোগাড় করতে পারলে লাভই হবে। সম্পাদক দুজনকেও ত কিছু হিতে হচ্ছে না।”

‘বসুধারা’ নাম দিয়ে মালিক কাগজ বার করা গেল। লেখার অভাব হয়নি। কিন্তু বড় বড় লেখকের লেখাই পেয়েছিলাম। ৪ মাস পরে মনোব্রজ দেখলে লাভের কোন আশা নেই। প্রতি মাসেই লোকমান, সে হাল ছেড়ে ছিল। যুত্মজ্ঞর বেতারা আরো ৪ মাস কোন প্রকারে চালানো। বিজ্ঞাপন যা পাওয়া গেল তার প্রাপ্য টাকা পাওয়া গেল না। তিন মত গ্রাহক চেষ্টা করে করা গিয়েছিল। ৪ মাসেই বসুধারা দশমী দশায় উপনীত হ’ল। যুত্মজ্ঞর স্বয়ং এ বৃত্তা যোগ করতে পারেনি। ভাবেন সেই আমার প্রথম ও শেষ সম্পাদকতা। ঐ বসুধারা নামটা নিয়ে এখন একজন দলী প্রকাশক প্রথম শ্রেণীর মালিক পত্র বার করেছেন। বসুধারাকে আশ্রয় করে বসুধারার লেখকদের নিয়ে একটি সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল—এই সাহিত্যিকগোষ্ঠী প্রত্যেক বর্ষবাহেব বৈকালে আমার বানী বাড়ীতে সমবেত হতেন। আমার বাইরের ঘরে (বাড়ী ছোঁয়ার ঘর) একটি বেঞ্চো ছিল বসুধারার অফিস।

বসুধারা উঠে গেল কিন্তু সাহিত্যিকদের সাপাহিক মহলিদটা টিকে গেল। এই সাপাহিক সাপাহিকের নাম বেওয়া হ’ল—বসন্তক। যাঁদের নিয়ে বসন্তক

মানক বহুসংস্কৃত গড়ে, উঠল—ভাঁধের নাম অধ্যাপক
বিশ্বপতি চৌধুরী, বর্ত্তমানোহন বাগচি, বর্ত্তীনাথ
সেনগুপ্ত, কথাসিদ্ধী হুটবিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ-
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (উকিল কবি), হেমেন্দ্রনাথ
হাসগুপ্ত, অদ্যবদ মুখোপাধ্যায় গগনেশ গুপ্ত, শিবক,
সেধক বিহারকৃষ্ণ গুপ্ত, সুগাঢ়ক অতুলানন্দ বসী,
নন্দ্যোপাধ্যায় সেনগুপ্ত, প্রবোধের মুখোপাধ্যায়, পাকিক পদ্ম
সম্বলদীপ সম্পাদক কালীমোহন বসু, উষোৎসবের সেধক
বর্ধমান কুমুদবসু সেন। অধ্যাপক কুমুদবসু বার চৌধুরী
(বর্ত্তমানের সরকারী সম্পাদক) ইত্যাদি।

এই বৈঠকে গল্প শুধর ও কিছু কিছু সাহিত্য
আলোচনা চলত। এতে আমার চা ও পান ছাড়া
অন্য কোন খবর ছিল না। আমি তখন যে বাড়ীতে
বাস্তব—তার নাম ছিল নীতায়াম স্কটিং। বসন্তের
তোন কর্ণহুটি ছিল না। বিশ্বপতি খুবই আশ্চর্য
লোক, আর প্রবোধ বাবু ছিলেন অত্যন্ত বঙ্গ বদিক।
এঁরাই ছিলেন বসন্তের প্রধান অঙ্গ (spoke)।
চুই বর্ত্তীনাথ কবি হতকণ না আসতেন ততকণ শুধু,—
বদিকতাই হ'ত। এঁরা Serious প্রকৃতির লোক।
এঁরা এলেই সাহিত্যআলোচনা শুরু হ'ত তার অবসরস্বাধী
কল, দিতর্ক। বিতর্কে বিশ্বপতি ও নন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন
উঁধের প্রতিদ্বন্দ্বী। তারপর বসন্তের তর্কতর্কে পরিণত
হ'ত।

আমাকে বসন্তের বাড়ী বদলাতে হ'ত। বাক্সপেটরা
বইবিহীনবার সঙ্গে বসন্তের ও আমার সঙ্গে এক বাড়ী থেকে
অন্য বাড়ী যেতে বাধ্য হ'ত। ক্রমে ইঁরা এশে বসন্তের
যোগ দিলেন ভাঁধের নাম—কথাসিদ্ধী গগেন্দ্রকুমার মিত্র,
কথাসিদ্ধী সুরব বোম, বনোজ বসু, জ্ঞানানন্দ
চট্টোপাধ্যায় (কবি), অধ্যাপক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
কবি হরেন্দ্র নাথ সিংহ, অদ্যবদ্য বন্দ্যোপাধ্যায়,
বর্ত্তমানোহন চক্রবর্তী, কবি গণিউদ্দিন, কাধের
নগরাজ, বসন্ত আলি মিত্র, শিল্পী সত্যীন্দ্র দিগে, চট্টোবর
মিত্র (কবি) ও অধ্যাপক বহিষ্কৃত বোম, অধ্যাপক শশীকুমার
হাসগুপ্ত, ঔপন্যাসিক সত্যকুমার বার চৌধুরী, কবি
সত্যীন্দ্র বার, কথাসাহিত্যিক জীবিকা গাঙ্গুলী, কটিক

বন্দ্যোপাধ্যায়, বহিষ্কৃতের লাঠির সম্পাদক কেশব সেন,
ভাষিক প্রবোধকুমার বোম এবং অধ্যাপক বিভাস বার
চৌধুরী। এঁদের মধ্যে শিল্পসাহিত্যিক কটিক ছিলেন
সবচেয়ে বয়সকমিষ্ঠ। ক্রমে বসন্তে খুবই জমে উঠল। তখন
প্রভাব হ'ল একে ভ্রাম্যমান করে তোলা যাক। একজন
এক এক রবিবারে বসন্তের এক আয়োজন
করতে হ'ত। উত্তর কলিকাতার ছ' একবার আহূত
হয়েছিল, কিন্তু ঢাকারিয়ার বহুবার আমন্ত্রিত হয়েছিল।
বলা বাহুল্য, আরামকারীর সংখ্যা ক্রমে ক্রমে এলো।
সকলের গৃহে ঠাই সম্বলানও হ'তনা। শেষে অল্প বসন্তের
আবার আমার এক-দু লোক ঘোড়ের বাগা বাড়ীতে
স্থায় হ'ল।

এখন হতে মুগেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ মিত্র,
পবিত্র গাঙ্গুলী, অতিথ্য কুমার, শৈলনাথনন্দ, প্রবোধ সান্যাল,
সুরনাথের বহু ইত্যাদি কল্যাণ-কালিকলম গোপীন্দ্র
গুপ্ত সাহিত্যিকরাও মাঝে মাঝে আসতেন;—নিরমিত
ভাব নয়। কবি শাসিতীপ্রসন্ন, বরেন্দ্র বোম, বসন্তের
কিরণ কুমার বার মাঝে মাঝে আসতেন। কবি কিরণকল
চট্টোপাধ্যায় শনিবারে ঢাকারিয়ার বসন্তবাড়ীতে আসতেন;
তিনি রবিবারে বসন্তের বোম দিতেন এবং নীরবে এক
কোণে বসে পান চিবোতেন। বেশিদিন তাঁর সঙ্গ আমার
পাইনি; সহসা তাঁর অকাল মৃত্যু হ'ল।

কালীঘাটে মিলনী নামে একটি সাহিত্যিক সমিতি
পড়ে উঠেছিল। আমাকে ঐ সমিতির সমস্তের সম্পাদক
করেছিল।

এই মিলনীর কয়েকটি মাসিক বৈঠক বঙ্গ কালীঘাটের
নানা স্থলে। মিলনীর বৈঠক রবিবারেই বসত। যে
রবিবারে মিলনীর বৈঠক বসত, সে রবিবারে বসন্তের মিলনীর
বৈঠকেই বোম দিত। মিলনীর বৈঠকে আবৃত্তি, কবিতা
পাঠ, প্রবন্ধপাঠ ও সাহিত্য আলোচনা হ'ত। যদে
আছে একটি বৈঠকে স্ক্রল ভাণ্ডারপুত্রের মুগেন্দ্র বরেন্দ্রনাথ
মজুমদারের কালোজাতী শরীত হয়েছিল কয়েক ঘণ্টা বয়ে।
একটি বৈঠকে বসন্তের "শেখ প্রসন্ন" ছিল আলোচ্য বিষয়।
এই বৈঠক বসেছিল শাহনগর ইন্সটিটিউট,—অধ্যাপক

জয়গোপাল বাবুর সভাপতিত্বে। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও
বিশ্বপতি চৌধুরী “প্রেম প্রেম”র বিস্তৃত মনোভাষ্যনা করেন
এবং কবি যতীন্দ্রনাথ দেনিক্ত তার প্রতিবাদ করেন।
কয়েকটি বৈঠকের পর মিলনী উঠে গেল।

সাহিত্য সম্বন্ধে যতীর ভাবে আলোচনা বা কবিতা
পাঠ, প্রবন্ধপাঠ চললে কোন সমিতি বেশি দিন টেকে
না। এই ভয়ে রসজ্ঞ এদব বতস্বর সম্বন্ধে এড়িয়ে চলত।
তবে রসজ্ঞ আত্মজ্ঞান ও বিতর্ক এই তিনটিকে বাধ
দেয়নি। তবে কারো কারো লেখা নিয়ে রসবসিকতা যে
হ’ত না—তা নয়।

কাব্যী নরকুল ও নলিনীকান্ত সরকার মাঝে মাঝে
আগত। কাব্যী নরকুল বা নলিনীকান্ত যে বৈঠকে
আগত সে বৈঠকে বরে লোক ধরত না, পথে ধাঁড়িয়ে
থাকত বহুদোক। আর একজনর নাম বিশেষ ভাবে
উল্লেখযোগ্য; ইনি এখন বেলুচ মঠের পূর্ণানন্দ স্বামী—
এর পার্শ্বাঙ্কী ভাবনের নাম ছিল অনুল্য রায় চৌধুরী।
ইনি কবি ও উকিল ছিলেন। সম্মান প্রাপ্তের আগে ইনি
প্রত্যেক বৈঠকেই আগতেন। রসজ্ঞের একটি উক্তোপ
সম্মিলনীতে কবি প্রবোধ নারায়ণ একটি অষ্টরস্তা নামে
কবিতা পাঠ করেন; তাতে সমস্তের কিছু পরিচয় আছে।

অষ্টরস্তা

[শ্রীশ্রী নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১ম বস্তা)

বেশববিহার্য বনে

প্রাণ-প্রাণে কানন ভোমানে মেলে বত অভাজনে।

মেহু—মাছ-ভাড়া, মুগের বিচুড়ী,—

বাড়ী থেকে ‘বিত্ত’ কতিল দি-চুরি।

কুট-বিহারী ও কুটবাতে আশা ছাপিয়ে আসামী যনে,

ইলিশের কাউ নিল ঝাঁকী দিয়ে উকিল কিয়ের মনে।

(২য় বস্তা)

যিখা কথার থনি

বার মাঝে বিত্ত-ব্রহ্ম-গোবর জিহবী সম্মিলনী,

কর্মে বৃত্ত কবিহা বোহন

কীর নাহি পেয়ে সে কালীমোহন

আনে ভাস, চাল, গিল্লী বাল খেয়ে পক্ষার্জনী—
কুশিহ্ন তখন এ বন-ভোমানে রক্তগত যে শনি।

(৩য় বস্তা)

বার কবি কালিদাস

ব’সে ব’সে শুধু ক’র করিছা হ’লেন হয়ে বালাস।

মুক্ত-হস্ত, উদার রাগে

দ্বিধাবী দ্বাধার না মানি’ অপ্রেম

কেনে মনে মনে কত দাম্পন্য, তাহাতেই উল্লাস,

লক্ষীছাড়া এ’ তারের ব্যাভারে বাধা ছাড়ে নিঃশ্বাস।

(৪র্থ বস্তা)

প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিং তেড়ে কবি বাচুরের সঙ্গে ঢোকে যেমালুম এসে,

যতীন্দ্র পেন এসে টেকো হাতে

বাঁটা গেল টেকো মিটে নাই মাধে

—অর্থাৎ লাঠি মাধায়ে না পড়ে’ গেল খুব বস বেঁসে—

সরে নাই নীর বস-বাণীর হুহু পড়ে ঘেসে।

(৫ম বস্তা)

কলীর কি বাহা ?

ত্রপে, বসে, লালে অভুলানন্দ ঘের প্রাণে সবাকার।

অমর দিল যে ঠকু বই আনি’

নবজাত শিশু হ’তে আনধানী ?—

ভগ্ন-বিজয় হীণ ক্ষুধার খোঁজ নেয় বাগীর,

জুতা-সারা মার চকো-পাঠেং চকো লয়েছে তার।

(৬ষ্ঠ বস্তা)

কীপিছে কেশব কার ?

কার বাশোখিরি তুলু কতিল কুতুবের সে দিনার !

কার গর্জনে খেঁড়িও বাহনে

লেডি জাম-সারা কাহনে কাহনে,

বাণীর জুহার-বল কত কে দিল ভবার হার !

সিংহ বহেন ক্রী-পাশে যোবেন ঠকায় দি, এন, আর।

(৭ম বস্তা)

নাম কবি কাহেতু ?

কেহ পাঠোপার, কেহ জাণোপার—সবাই সমান ঠকু

ব্রহ্ম না মছে’ এ কেশব সেন

পরমানন্দে লাগি-ই ভবেন,

তেহার-চেহারা এগেই গজেন ভবে বায় বৈঠক
মথুনাথ অসমজের লেখা, নাহি তাতে কাগ-টুকু ।

(৮ম দৃষ্টা)

বিচুড়ীর হাড়ি কাটে,
ইলিশ ওলাও কড়া হ'তে প'ড়ে মিশে যায় শোড়া কাটে,
যেথো বৈপতিক, ব্যাপার সস্তীম
সন্ধ্যার কর্তা প্রবীণ

গাটের কড়িতে অষ্ট-দস্তা কিনে আনে গিয়ে হাটে,
ছই কালী নিলে আটটাই খেলে—বাকী সব খেলে চাটে ।

[বিদ্যুৎ—বিশ্বপতি চৌধুরী । ছুটিবিহারী মুখোপাধ্যায়
—উকিল কথাসাহিত্যিক । কালীমোহন বসু—সন্ধ্যার
সম্পাদক । প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়—লেখক নিজে । অর্থাৎ—
অমর বন্দ্যোপাধ্যায়, কথাসাহিত্য । গুপ্ত বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎকৃত
গুপ্ত শিক্ষক । বতীন্দ্র সেন—কবি বতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ।
টেকো মিতে—বতীন্দ্রনাথ বগচী । কুমুদ—অধ্যাপক
কুমুদ চন্দ্র দাস চৌধুরী ।]

বসন্তের একটি অবিবেচনের হিপোট (সন্ধ্যার) :
গত ৮ই মার্চ রবিবার সন্ধ্যার কীৰ্ত্তীলেখক শ্রীযুক্ত
হেনরী নাথ হালপাণ্ডের ভবনে বসন্তের বৈঠক বসে ।

উপস্থিত ছিলেন—অধ্যাপক হরিচরণ ঘোষ, জ্যোতিষ
চন্দ্র ঘোষ, প্রেমেন্দ্র দত্ত, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, কবি
জসিমদ্দিন, কবি বতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিশ্বপতি চৌধুরী,
বিদ্যুৎকৃত গুপ্ত, উকিল কবি প্রবোধ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
কালিদাস দাস, উকিল কথাসাহিত্যিক ছুটিবিহারী
মুখোপাধ্যায়, জিতেন্দ্র শঙ্কর দাসগুপ্ত (উকিল), নিবিরাজ
হালদার, অমলা দাস চৌধুরী (উকিল, সন্ধ্যার গ্রন্থের
পরে পূর্ণানন্দ স্বামী), মদনীশ গুপ্ত, অসমজ মুখোপাধ্যায়,
কথা সাহিত্যিক সর্বোদ কুমার দাস চৌধুরী, অধ্যাপক
কুমুদ চন্দ্র দাস চৌধুরী, কুমুদবন্দ্র সেন, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ
চট্টোপাধ্যায়, বরীদ দাস, অধ্যাপক তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
কবি সস্তীম দাস ইত্যাদি ।

যেদ্বন্দ্ব কীৰ্ত্তী সন্ধ্যার কিছুকণ আলোচনার পর
সাহিত্য হিদাবে কীৰ্ত্তনচরিত্রের ন্যায় সন্ধ্যার আলোচনা
হয় । তারপর বৈদ্যনাথ বসন্তের বারোয়ারী উপজাতির

সংস্করণ রচিত অংশ এবং তারপর রচিত অংশ পাঠ করিয়া
অনাম । তারপরে কতকগুলি কবিতার আবৃত্তি হয় ।

কবিকেশরী বরেন্দ্র সিংহ বরচিত্ত কবিতা পাঠ করেন ।
হেনরী বাবু সন্তস্পর্শকে জলযোগের দ্বারা অধ্যায়ন
করেন । আগামী রবিবার ১০ই মার্চ বেলা ৪টা
৩১:৩০ পত্রপুস্তক হোটে জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষের ভবনে
বসন্তের আগামী বৈঠক বসিবে । (সন্ধ্যার)

আমাদের এই বসন্তের প্রতিষ্ঠানটাকে আমরা চেষ্টা
করে গড়ি নি ; এটি আপন ; হতেই গড়ে উঠেছিল । কোন
উদ্দেশ্য নিয়ত এর জন্য নয় । প্রকৃত পক্ষে এ একটা বন্ধ
সময় । এই সভার দ্বারা যোগ হইতে, তারপর অনেকেই
সাহিত্যিক ; বাকি সকলে সাহিত্যসুহৃদ । তাই একে
সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান মনে করা হয় । বন্ধুত্ব কবি
মোহিত লাল একে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান মনে ক'রে, বাকী
অন্য সাহিত্যিক তারপর প্রবোধ হেগরা হেগে বলে অল্পযোগ
জানাতেন । আমাকে বলতেন শ্রদ্ধাভী ভ্রাতৃ ।

এই বসন্তের কোন লিখিত বা মুদ্রিত নিয়মাধীন
ছিল না, এর সমস্ত হ'তে হলে কোন চাৰা হিতে হ'ত মান—
কিছুই না ক'রে এর বৈঠকে যোগদান করতেন—কিছুই
হতেন এর বরগিষ্ঠ সমস্ত । যে কোন বসন্ত ওজস্বী
বসন্তের আপনায় গুণে আশ্রয় ক'রে এ বৈঠক
বসন্তে পাহতেন । তার জন্য কোন বাধ্যতামূলক
যায় ছিল না । বসন্তের ইচ্ছা করলে যে কোন সাহিত্য-
সেবী, যে কোন সাহিত্য-বলিক তার যে কোন ঘটনা
কীর্ত্তন হলে পাঠ করতে পারতেন । বৈঠক কবিতার
বতীন্দ্রনাথের কাব্যচরিত্র, বিশ্বপতি চৌধুরীর কাব্য
বতীন্দ্রনাথ, আমার সাহিত্য প্রদল ইত্যাদি পুস্তকের পূর্ণ
পাঠ্যনি পদ্যের বৈঠকে ব্যাখ্যাত্তি তারে পঠিত
হয়েছিল । সাহিত্যিকের পদ্যপত্রের মধ্যে এবং সাহিত্য
সমাজের বাহিরের লোকের সঙ্গেও বাতে আমাদের অবাধে
অকুণ্ঠিত চিন্তে আলোচ-পরিচয় ও তারপর আদান প্রদান
হ'তে পারত, যাতে ব্যক্তিকৌতুক গল্পগল্পের মধ্য দিয়ে
পদ্যপত্রের মধ্যে ছুটিতার সৃষ্টি হয়,—সমাজের ছয় দিন
অন্তর্ভুক্তের জন্য প্রমত্তপাত ক'রে যাতে রবিরাত্রের
সত্যাকালটা একটু নির্দোষ আনন্দে কাটান যায়—তারই

সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য আমাধের প্রাণেই আশ্রয়েই চক্রের জন্ম হয়েছিল।

ব্রাহ্মধর্ম নিয়ন্ত্রণাঙ্গনের ত্রুড় ভেঙে আমাধের বেশে কোন সাহিত্যিক লজ্জা বেশি দিন বাঁচেনি—তাই আমরা এই বঙ্গ-চক্রে অবাধ স্বাধীনতার পথ চেয়েছিলাম। আপনা হতেই এর জন্ম—অপনা হতেই এটা একদিন তেজ পড়েছে। এর জীবনে যেমন অবাধ স্বাধীনতা, এর মরণেও তেমনি অবাধ স্বাধীনতা ছিল। আমরা মানতাম, প্রয়োজন বা আন্তরিক আগ্রহ যে দিন থাকবে না, সেদিনই এ চক্রকে যেদিনী প্রাস করবে।

এই বঙ্গচক্র কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠান ছিল না—এর মধ্যে প্রবীণ ছিলেন, মণীন-স্ত্রী ছিলেনই, ঔপন্যাসিক ছিলেন, কবি ছিলেন, অধ্যাপক ছিলেন—চিত্রকর ছিলেন, শ্রমীতজ ছিলেন। মুসলমান ছিলেন। সংসারী ছিলেন, সংসারের বাহিরের লোকও ছিলেন।

এক বঙ্গসর, এক জীবিকার, এক মস্তের বা এক ত্রুতের লোক নিয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান এটা নহে—কাণ্ডেই আলাপ আলোচনা অনেক সময় তর্কবিতর্কে পবিত্র হ'ত। তা সবেই বাদ্য না। কেবল এক বিষয়ে মিল ছিল—কিছুতেই মনোমালিন্দ বা বৈষম্যের জন্ম হত না। বঙ্গচক্রকে বঙ্গ করে কেউ কেউ চলে-চক্রেই বলেছিল, কেউ কেউ বঙ্গচক্রও বলেছিল—ভাতে আমাধের কোন আপত্তি ছিল না। তবে যাতে এটা বিষয়কে পণ্ডিত না হয়, সেদিকে সকলেরই লক্ষ্য ছিল। বঙ্গচক্রের মধ্যে গলাগলিত ছিল না—বলাবলিও ছিল না। কোথাও কোন বৈঠকে বার ঠাই ছিল না, তাঁরও ঠাই ছিল এখানে। বঙ্গচক্রে যে সকল লেখক ছিলেন, তাঁদের রচনা প্রকাশের জন্য বিশিষ্ট কোন পত্রিকা ছিল না—যে কোন পত্রিকাতেই

তাঁদের রচনা প্রকাশিত হতো।

হাতকৌতুকটা প্রধান উপলব্ধি বলেও বঙ্গচক্রের আলাপ আলোচনা যে নানা প্রসঙ্গে পরিণতি লাভ ক'রে মাসিক সাহিত্যের কিছু দৃষ্টান্ত বৃদ্ধি করেছিল, তা জীবিত সহস্রগণ মনে ন।

বঙ্গচক্রে আমাধের মধ্যে একটা কণার প্রায় আলোচনা হ'ত,—বেশে নট-স্টার এত আদর, সত্ত্বগুণপুটেত, ফুটবল খেলোয়াড়ের এত আদর—দৈনিক সাম্প্রদায়িক ও মাসিকে তাহের এত সচিত্র বিভিন্ন গুণকীর্তন হয়; আর সাহিত্যিক-দের কোন আদর নেই,—এটা বড়ই দুঃখের বিষয়। বং এঁদের অনাধের করেন সাহিত্যিকরাই।

আমরা ঠিক করলাম আমাধের ক্ষুদ্র শক্তিতে বটটা ফুলের, আমরা যোগ্য সাহিত্যিকদের যথাযোগ্য মর্যাদা দান করব। অবশ্য এতে আমরা নিজেরাই দগ্ধ হব। কবি যতীন্দ্র মোহনের কথা আমাধের সর্বাঙ্গে মনে পড়ল। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলেই শুধু নয়, তিনি আমাধের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি বহুকাল হ'তে সাহিত্য পাঠনা ক'রে আসছেন এবং তাঁর বঙ্গচক্রের সর্ব শতাব্দী অতিক্রম করেছে। বাঙালী জাতির স্বাভাবিক আত্মতুল্যে কথা তাহলে তাঁর মর্যাদা হানে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। বেশে ঔপন্যাসিকগণের আদর আছে—তাঁদের গ্রন্থের প্রচার ও গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ হতেই বুঝতে পারা যায়। সিনেমা বেড়িও-ও তাঁদের সমাদর করছে। কিন্তু কবির আদর কই? আমরা সাহিত্যসেবী, আমরাই যদি কবিকে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা দান না করি, তাহলে অজ্ঞ কেন মর্যাদা দেবে? কবির মর্যাদা দান যদি অসম্ভব না হয়—তাহলে সর্বাঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের অভিনন্দন যে সম্পূর্ণ সঙ্গত, একথা সকলেই স্বীকার করলেন।

হে অতীত কথা কও

রঞ্জিত কুমার সেন

নিরাশ্রিত অন্ধান অন্ধান কল্কাতা মহানগরী। ইতি-
পূর্বে এগে একবার শব্দভাষ্যে গলে দেখা ক'রে গেলো
এ হুঁচোবে কল্কাতা। স্বপ্নের মতই থেকে গেছে।
শিয়ালঘরে পা দিয়ে তাই ডিন্ডা হ'লো!—এবারে দাঁট
কোথায়?

অতীত দিয়ে মুহুম্বলাল ব'ল্লে, 'আপাতত চলুন
কোনো একটা হোটেলের গিরে গুঠা যাক, তারপর কোথাও
হুঁএকখানি বসে ভাড়া পেয়ে বাবো নিশ্চয়ই।'

সেই ব্যবস্থাই হ'লো। বউবাড়ার আর ওয়েলিংটন
ট্রাফিক মোড়ে এসে বঙ্গলক্ষী হিন্দু হোটেল উঠলাম।
সন্ধ্যা-বাড়ার পর মুহুম্বলাল সত্যি সত্যিই অল্প-
সময়ই মধ্যে দু'কানরাও একটা বিতল স্ট্রাট ভাড়া করে
কেলেন বাজারের অক্ষয় সেনে। ইলেকট্রিকের বালাই
নেই, তবে ভাড়া খুব সস্তা, মাত্র ছ' টাকা। সেবার
ক'লেম মুহুম্বলালের সঙ্গে। রাত থেকে তাঁর স্ত্রীই
হ'লো তাঁর নিলেন। অতএব ঘরের ব্যাপারে যখন নিশ্চিত
হওয়া গেল, আপাতত পথবাটগুলো তখন ভালো
ক'রে চিনে নেবার ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে মুহুম্বলালের
দায়িত্ব ছিল উপায় নেই। কিন্তু আত্মনা পেয়ে অতক্ষণে
আবার তিনি স্তব্দ-সাদান্য মত হ'য়ে উঠেছেন। নতুন
বেকর্ড ক'লেম তিনি হিন্দুস্থান গ্রানোফোন। বোম্বাই
জামা'ত নিজে কাছের কম পোতনীর নয়। অতএব
পথ-পরিচয় ছেড়ে আপাতত মুহুম্বলালের সঙ্গেই সাবা
হুগে হিন্দুস্থানে কাটিয়ে দিতে স্কট ক'রলাম।

প্রথম দিনই আসা প'রে গেল দু'বার শচীনদেব বর্গের
সঙ্গে। বেঙ্গল—অবুঝ জীবনীশক্তিতে উজ্জল মানুষটি,
কথার সুরে আপদতলার চান আছে। আলাপের সঙ্গে সঙ্গে
মুহুম্বলাল ও আমাকে তিনি তাঁর হিন্দুস্থান বোডের
বাড়িতে বাবার নিয়ন্ত্রণ ক'লেন। এককাল হু'র থেকে
তাঁর বেকর্ড-সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়েছি, এভাবে প্রত্যক্ষভাবে
শচীন দেবের সংস্পর্শে এসে তাঁর চরিত্রের আন্তরিক

দিকটি লক্ষ্য ক'রে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা যেন ভ'রে গেল।
তাঁর বাড়িতে গিয়ে বেঙ্গল—নিচের ঘরের একপাশে
একটি একটি সংকীর্ণ স্তম্ভ। সেই স্তম্ভগুলোর হ'য়ে ব'লে
আছেন শচীন দেব। মুহুম্বলালই এবারে নিজে থেকে
আমার গানের কথা তুললেন। মনে মনে আশা ছিল,
শচীন দেবের কণ্ঠে যদি আমার গান বেকর্ড হয়, তবে সে
গান পশুপাঠ হ'তে দেবী হবে না। গানের স্বাভাবিক
তাই সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিলাম। তা থেকে পর পর
অনেকগুলো গান বেবলেন শচীন দেব, যেখানে যেখানে
আমার দিকে মুখ তুলে বিজ্ঞপ্তি করলেন, 'আপনি নিজে
গাইতে জানেন?'

বললাম, 'না, সাব বাকলেও কোনোদিন সে সাব পূর্ণ
হয়নি।'

শচীন দেব বললেন, 'কিন্তু গানের সুর না জানলে
এমন সব চমৎকার গান আপনি লিখলেন কি ক'রে?'

বললাম, 'সঙ্গীতের শাস্ত্রগম্য সুর না হ'লেও গান
রচনার সময় মনের মধ্যে সুর কিছু—একটা ধাপে। তবে
গান না জানার কলে সে সুর বৈশিষ্ট্য মনের মধ্যে থাকে না,
হাঝিয়ে যায়।'

শচীন দেব বললেন, 'আপনি যে-চি পড়াকালের
সাধক সঙ্গীতকার। কিন্তু আমার মুগ্ধ হ'য়েছে কি
জানেন, অল্প ভট্টাচার্যের গান ছাড়া আমি পাঠ্যপুস্তকে
আধুনিক বা রাগগ্রন্থ গান গাই না। তার সঙ্গে আমার
এই আভ্যন্তরীণতাই রয়েছে। আপনি বরং এক কাল
কল্লম, মুহুম্বর মতো আমাকে ভালো কিছু ভাটিয়া
সংগ্রহ ক'রে এনে দিন, আমি নিশ্চয়ই গাইব।'

ইতিপূর্বে করিবপুত্রের গ্রাম থেকে 'গৌরবর্ণ বেথিয়া
হয়েছি পাগল' গানখানি শচীন দেবকে সংগ্রহ সংগ্রহ ক'রে
এনে দিয়েছিলেন মুহুম্বলাল। অল্পদিনই সেই বেকর্ড-
খানি অসাধারণ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠে। যদিও আমি নিজে
একসময় বাউল ভাটিয়াসী আর গৌরবর্ণের অনেক গান

সংগ্রহ ক'রেছি, কিন্তু এ জাতীয় সংগ্রহের বেকড়িং সম্পর্কে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না, কারণ সে-সময়ের পুণের মধ্যে আমার নিম্নের কোনো কৃতিত্ব নেই। আর তা যদি না থাকলে, তবে লাভ কি বেকড়িং করিয়ে ? বাণ্য হ'য়ে শটান দেবের আশা ত্যাগ ক'রেতে হলো। হিন্দুস্থানে পোদ্দুল মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি আমার পান বেকর্ড ক'রলেন নিশ্চয় প্রমিলা। ১৯৩৮ সালের গোড়ার কথা। হিন্দুস্থান বেকর্ডে গীতিকার বিশেষে অল্প ভট্টাচার্য্য এবং নরেশ্বর ভট্টাচার্য্যের তখন খুব প্রভাব। তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পেরি হ'লো না। তাঁর প্রধান উৎস ছিলেন হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্ট্রের ম্যানেজার হামিনী মোহন মতিলাল। তিনি নিজেও সাহিত্যস্নানক ছিলেন। কবিতা, গল্প এবং বিশেষ ক'রে নাটক রচনায় তিনি দিব্বন্ত ছিলেন। কলে আমাদের পারম্পরিক সম্পর্ক নধুর হ'য়ে উঠতে দেবী হলো না। উত্তরকালে আমি বঙ্গী পত্রিকায় যোগদান ক'রে তাঁর 'সোহাগিনী হস্তিয়ার' নামে একটি কোমুক নাটক বলজীতে বারাবাহিক শতাব্দীর সৌহচক্রে আকো মোরা বিশেষিত মাহুবেদা হই নি বিলীন, আছে পরমাত্ম আকো, দীর্ঘ পঙ্করের মাঝে আবৃত নিখোদ বহে স্কীণ এখনো স্তনিত পাবে। কোমল এ বক্ত মাংস কট্টন পাখাণ চেয়ে ধূপি, বক'পরে পাখাণের ভারে নিভিল হ'ল না তাই আকো: দিচ্ছ পাবে খুঁজি। নগরের ধূত নভে আমাদের নিশ্চিত নয়ন অবশিষ্ট নীল রেখা, বৃত্ত অবগোহর স্বপ্নে মোরা ভাবি ঘুরে ঘুরে কান্ডমের পাই কি না রেখা। হিনাস্তের বেছাখটে রাত্রি লয়ে আঁধি-আগে কহি আকো: হুগায় নি বিন, শতাব্দীর সৌহচক্রে আকো মোরা বিশেষিত মাহুবেদা হই নি বিলীন।

প্রকাশ করি। তাঁর ঐতিপূর্ণ ব্যবহারে ও চরিত্রের অমারিকতায় সকলেই মুগ্ধ হ'তো। বাইরের আমি কখন যে তাঁর ঘরের আনিত নিশে পেলাম, নিজেই টের পেলাম না। তাঁর আন্তরিক ব্যবহার এমন করেই মাহুবেদে কাছে টানতো। অল্প ভট্টাচার্য্য তখন থাকতেন ডোতার সেনে। সেখানে গিয়েও চায়ের আড্ডা অন্যতে দেবী হলো না। কিন্তু শটান দেবের কথাটা ইচ্ছে করেই তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম না। এ শুধু Trade secret হই নয়, Moral secret. তাকে খুঁড়িয়ে তোলা ভাবনগত নয়। অল্প ভট্টাচার্য্য শুধু সার্বক গীতিকারই নয়, সেই সঙ্গে শক্তিমান কবি ও গল্পকারও ছিলেন। তাঁর 'ইনল' এবং 'নৈনিক' কাব্যগ্রন্থে কবির কাব্যশক্তি বেতাপে স্মৃতি হ'য়ে উঠেছে, তা বহু তরুণ কবিই অমুকরণযোগ্য। যাযা তাঁর কাব্যের বৃত্ত পাঠক ছিল, আমি ছিলাম তাৎবেই একজন। মাঝে মাঝে তাঁর নিঃসর কণ্ঠে তাঁর স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি শুনে বৃত্ত বিষয়ে মন ভরে উঠেছে। এমনি একটি কবিতা 'মাহু' :

জ'লে বাওয়া সুতীরের রুবিবাক্ত ভবস্থপে বেঁধিছ না মোরা খেলি কাণ ?
পুনিবার চঞ্জ সাক্ষী, হুতু-বুতী আমরাও প্রেয়সীর সতি অহুতাপ।
বিত্রাস্ত বিল্ললক্ষণে পুনিবীর ধুলিগবে খুঁজি মোরা যৌবন-স্বপাল,
বেথিত কি পাণ্ড ? আমাংবেরা আছে অতিগর আছে কত প্রেম-অনিধান !
অকথ্য কোনোদিন অকারণে করি যদি মন-বেরা-বেরা মিছে ভুল—
মে কি বল অপরাধ ? উভার চুখন চায়ে নাকি ভাঙ্গা কাটপের ফুল ?
জত প্রণয়ের বিবে আমরাও হই কোনো বিখ্যাস-প্রমত্ত কালনাগ,
জ'লে-নাওয়া সুতীরের রুবিবাক্ত ভবস্থপে বেঁধিছ না মোরা খেলি কাণ ?

খর্বনিয় বহিজীর অপরাধ আরও বড় নষ্ট শিল্প তামাধের বেধি
 হাদি মোরা হুসিলাং বুজুফিত শুদ্ধ নই, পরাক্রম আমাধের সে কি ?
 কীনাহু নুতুল হয়ে বেলাঘরে কব বাপ সংঘাতের ভয়ে কম্পমান,
 কুকা-ভীর আমরা যে তীক্ষ্ণ তলোয়ার জানি বিক-রক্ত করিয়াছি পান ;
 যেত পৌঃ মণি-ককে সত্যতার ভীত হিয়া ভিত্তি লজ্জায় করে বাপ,
 আমরা যে কাপালিক হীনতার পাত্র 'বহি' পান করি অনন্ত নিখাস ।
 অলংকার তহুতী সে সত্যের নিকট পাতি বুঝিয়াছে তোমরা যে মেতী,
 খর্বনিয় বহিজীর অপরাধ আরও বড় নষ্ট শিল্প তোমাদের বেধি ।

বাজি হ'ল হীপাঘিতা, বেধ হীপা শিখা তার—আলিয়াছি মোরা

জ'লে জ'লে,

তোমাধের অর-পথে আলিশান বেধিয়াছ রক্ত-রাগে আঁকিয়াছি বলে ।
 হুঃহু আমন সে যে তোমাধের স্বাস্থ-ভাব ধরি মোরা বাসুকির প্রায়,
 আমাধের চিনিবে না চাধিবে না জানি পাছে পীতবৃষ্টি বজ্র হয়ে যায় ।
 পিঙ্গব পোশাকী পাখি ঐশ্বর্ষের খুব-কণা ভট-পুটে ধরিয়াছ হুঃ
 অকৃপিত অশক্ত অসত্য সত্যবনা রাধি জেনো এই শীর্ণ বৃক,
 নোমের প্রদীপ মোরা কুঠারে কতু নই, বহি তবু বহি ঘাই প'লে,
 বাজি হ'ল হীপাঘিতা, বেধ হীপা শিখা তার—আলিয়াছি মোরা

জ'লে জ'লে ।

পীতিকা হ'য়ে যিনি কথার ললিত লাংগে বাহুবক
 হসিত ক'রেছেন, ক'বি হয়ে চারপাশে তিনিই আবার
 বাহুবক তার মানবিক দাবীতে উজ্জ্বল করে তুলেছেন ।
 তাঁর কাব্যের এই যেত সুর আমাকে অপ্রাপ্ত করে
 তুলে। হুসলাম, 'অভয়না, বিব্রাতির ঘটিল আবারে
 যে হুর অনেককাল তুলে ছিলান, তাকে আবার নতুন ক'রে
 জাগিয়ে দিলেন আপনি । আপনার কাছে স্বপ্ন আমায়
 কন নয় ।'

অজর ভট্টাচার্য্য হলেন, 'বিরাট সূর্য্য বরীজনাথের
 পালে আমরা নাজ ছোট ছোট সোনাকীর মতো । তবু
 আমাধের কাক করবার আছে অনেক, সেই কাক যে
 আমাধের ক'রে বেঙেই হবে তাই ।'

সেই কাক করতেই একদিন কলকাতায় ছুটে এসে-
 ছিলান । অজর ভট্টাচার্য্যের কথা নবের মতো তাই
 আলোড়ন সৃষ্টি করল। সেদিন থেকে জুঃ তাঁর নীরব

স্রোতাই রইল না, দাখিক মন নিয়ে নানা বিষয়ে তর্ক
 জুড়ে ছিলান । সে তর্কের মীমাংসার আস্তে অজর
 ভট্টাচার্য্যের এতটুকুও ঘেরা হ'তো না । বেশ লাগতো
 তাঁর সান্নিধ্যের মুহূর্ত্তগুলি ।

নুতুলশাল কিন্তু যেই দিন তাঁর গ্রীকে নিয়ে কাটলেন
 না । গান হের্ড ক'রে আবার তিনি কতিপয়ের গাড়ী
 ধরলেন । আমি উঠে এলাম মৌলানীর একটা ঘরে ।
 কলকাতায় এসে শিরাগুডদীন আহমদের এই ঘরেই ছিল ।
 গুরো বন্ধুর আশুনা পেয়ে সব ভাঙার দায় থেকে
 আপাতত ঝটলান । পাঁচ মঘর ম্যাঝো গেন থেকে মন্ত্রী
 নাদহুদীন আহমদের পহিচালনার তখন কুবক-প্রাণাটির
 দৈনিক যুগপা 'কুবক' নিয়মিত প্রকাশিত হ'তে শুরু
 হয়েছে । আবুল ননহুর আহমদ সম্পাদক, শিত-নাট্যকার
 কেশব সেন বার্তা সম্পাদক, রমেশ চন্দ্র বসু ক্যান্সার
 এবং শিরাগুডদীন আহমদ ম্যানেজার । পত্রিকার এমন

অবস্থা নয় যে, কাউকে হাসকাবারে ভালোমতো মাইনে দিতে পারে। পত্রিকার মাধ্যমে সমাজ-সংস্কার একটা মতঃ আর্থিক জীবাণু ধরে কর্তার মাসের পর মাস কাজ করে বাড়িলেন। নিরাশ্রয়ীদের আশ্রয়ে আমি প্রতি সপ্তাহে দু'দিন করে গিয়ে অবৈতনিক ভাবে ক্রমিক অতিশয়ে দ্বন্দ্বিত্ব করলাম। ক্র-নামে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লেখা তির পত্রিকার 'মহিলা বিভাগ' পরিচালনার ভারটিও আমাকে নিতে হ'লো। এমন মহিলাকর্মী নেই—বাকি বিয়ে আপাততঃ এক কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। ফলে বিভিন্ন মেয়ের নাম বিয়ে নারী সমাজের নানা সমস্যা নিয়ে আমাকে একাই রচনা তৈরী করে প্রকাশ করতে হ'তো। এ ক্ষেত্রে মেয়েদের নানা অসুস্থ অবস্থাপ্রাপ্ত এবং তাদের জীবনের নানা সমস্যাগুলি সংগ্রহের কাজে আমাকে মন দিতে হ'লো। এর দ্বারা মেয়েদের জীবনকে গভীর ভাবে জানবার একটা দার্শনিক সুযোগ পেলান। এ সময়ে মনে আছে, দুঃস্বপ্ন পত্রিকাও এক দ্বিধাভাবের সাহিত্য সংখ্যায় স্বনামে 'ব্যাটে নারী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে বিশেষ খ্যাতি পেয়েছিলেন। বার্তা-দাম্পত্যক কেশব সেন নিজের চেয়ারের বলে প্রায়ই এ ক্ষেত্রে ভাবিক করতেন। আমি তাঁর শিশু-নাটকের বিশেষ ভক্ত ছিলাম। কর্পোরেশনের ভোটার সময় তিনি 'ভোটারক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন। কল্যাতম, 'আপনি একালের ব্রাহ্মদাম'। তিনি বলতেন, 'ঘরেই মেয়ে বনের মোহ ডাঙিয়ে যে ব্রহ্মলোকে আহ্নি, তাতে আনন্দে দিন কাটছে বৈ কি!' বলে কোঁচুক বোব করে ঘেসে কেলে ডিঙি ধরাডেন কেশব ব'লু। সুন্দর মালুঘটি, তাঁকে ভোলা কটিন। কিন্তু পরিভাষের বিষয়, দীর্ঘ জীবন পাননি তিনি। অল্প কালের মধ্যেই তিনি এ পৃথিবী ত্যাগ করলেন। আমি এক শুভাশুভ্যারী অগ্রজকে হাবালাম।

এদিকে নিঃসঙ্গ কল্যাতম আমার কাছে ক্রমেই অন্তঃস্প হ'য়ে উঠতে লাগলো। এ সময়ে কর্পোরেশন ট্রুটের একটি বাড়িতে প্রায়ই মাঝে মাঝে চুটে যেতাম। তার আকর্ষণ ছিল শিল্পি। করিধপুত্রের সম্পর্কের বিক থেকে এক ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে। তিন বোন তার, শিল্পি ছোট। তাদের বাবা একসময় ক্রিষ্ণীপে গিয়ে এক

কিষ্ণিয়ান মহিলাকে বিয়ে করেন। শিল্পিরা সেই কিষ্ণিয়ান নারেরই মেয়ে। তাদের মা কিষ্ণিতেই আশ্রয়তিনী হন, শিল্পিদের নিয়ে তাদের বাবা বেশে চ'লে আসেন। করিধপুত্রের আশ্রয়ের পাশের বাড়িটা ছিল তাদের জ্যাঠা-মশাইয়ের। জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাইমার কাছেই আপাততঃ কিছুকাল এসে শিল্পিরা বইল। বাংলা ভাষেনা, কিষ্ণিয়ান ভাষার কথা বলে। কতই বা বয়স, শিল্পির তখন খুব বেশী হলে আট কি নয়, আবার চাইতে দু' এক বছরের ছোট। তিন বোনের মধ্যে শিল্পির ভ্রপের তুলনা ছিল না। আমার প্রথম বাল্যের খেলার সঙ্গিনী ছিল সে। প্রথম প্রথম কেউ কাতুর ভাগ: দুঃস্বপ্নাম:। ক্রমে এ বেশীর শিক্ষা ও জীবনযাত্রার সঙ্গে শিল্পিরা অভ্যস্ত হ'য়ে উঠলো। তিনটি বোন ছিল তারা। বোন মল্লিকা, মালতি আর সু'ই। ভাবতেই পারতুম না যে আমার দুই পরিবারের মানুষ। বিকেল হ'লে তিন বোন নিলে যোগান থেকে শঙ্কামালতি তুলে এনে আমার মায়েব লস্করী আপন সাঙ্গিয়ে দিত। দুর্গা প্রতিমার ছবি কেটে আমি দুর্গোৎসবের আয়োজন ক'রলে তিন বোন নিলে শঙ্খ, বটী আর ঝাঁকর বাজিয়ে আমাদের সাং বাড়িটাকে সুখর ক'রে তুলতো। বিনর্দনের দিন ষাট অর্ধ গিয়ে বিদর্ভনের বাজনা বাজিয়ে আসতো। পৌত্তলিকতা নিয়ে প্রব ছিলন', আচারনিষ্ঠ হিন্দু কি নিয়মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম ব'লে কোনো পার্থক্য ছিল না। আমরা চারজন নিলে ঘেন এক মন হ'য়ে গড়ে উঠেছিলো। সেই মনের অনেক বেশী কাছে এসে ঝড়িয়েছিল শিল্পি। বীবে বীবে আমার শবাই বালা ছেড়ে কৈশোর, তারপর কৈশোর ছেড়ে যৌবনের প্রথম শিঙিতে এসে ঝড়ালো। শিল্পির ছুঁবিহির একে একে বিয়ে হ'য়ে গেল, তারপর শিল্পির পালা। এ সময়ে তারা করিধপুত্র ছেড়ে কল্যাতমের এই কর্পোরেশন ট্রুটের বাড়িতে। একশো চৌষটি মাইলের ব্যবধান। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কল্যাতম থেকে আমাকে একখানি ক'রে চিঠি লিখতো শিল্পি। বন্ধ যেমন ক'রে চিঠি লেখে বন্ধকে। চিঠি পেয়ে মন ভ'রে যেতো। দিষ্ট সেই চিঠিও একদিন বন্ধ হ'লো। বিয়ে হ'য়ে গেল তার। একশো চৌষটি মাইল দূরে থেকেই মনটা কেমন ঘেন হ'য়ে গেল। সেই মন-কেমনকে নিজের

হেরা কিরিয়ে আস্তে সময় পেগেছিল।—এতদিনে নতুন ক'রে আবার তাদের মাঝে দিয়ে গাড়ালাম। দিলি আর তার বর এপহিরে এখানেই ছিল। একগুচ্ছ মূপ নিয়ে তারের ছ'জনের হাতে ভুলে দিয়ে কনুগ্রাচলেশন জানালাম। দিলির বরকে বেধলাম, আমার নিজেও চাইতেও আমার সম্বন্ধ বেশী মানে। দিলির কাছ থেকে নিজে আমার অনেক লেখাই সে পড়েছিলেন, এবারে সেগুলো নিয়ে আলোচনার যুগর হ'য়ে উঠলো।

দিলি বললো, 'এখানে তো বেশী দিন নেই, যে কটা দিন থাকি, তুমি যোগ আসবে, এসে এসে তোমার নতুন লেখা পড়িয়ে শোনাবে, আর যখন যা লেখ, একটা ক'রে কপি আমাকে পাঠাবে।'

ভিজেন করলাম, 'তার বহলে আমি কি পাযো ?'

অনেকক্ষণ আমার ঘুমেব হিকে তারিয়ে থেকে দিলি বললো, 'তোমার লেখার সব চাইতে বড় পাঠক।'

প্রথম বৌবনের সেই হাদিশবার দিনগুলিতে এত বড় পাঠক আমার সত্যিই আর কেউ ছিলনা। এজ্ঞে দিলির কাছে আমার কৃতজ্ঞতারও শেষ ছিলনা। যে ক'টা দিন সে কলকাতার ছিল, আমাকে নতুন ক'রে মাতিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, তারপর আবার একটানা বিচ্ছেদের অন্ধকার। কিন্তু সেই অন্ধকার থেকেই যেন নতুন এক আলোকের সন্ধান পেলাম। দিলির অন্ধকাহিনী নিয়ে নতুন একটা গল্প গড়ে উঠলো মনে। সেই গল্পটি হচ্ছে 'হাড়'। উত্তর-কালে আনন্দবাজার পত্রিকার দ্বিবাঙ্গদীর সম্পাদক মদননাথ সান্তাল শাহরীস আনন্দবাজার পত্রিকার গল্পটি প্রকাশ ক'রে খণ্ডকালের একটা জীবন-সত্যকে চিৎকারের সাহিত্য-সত্যে ভুলে যাবলেন। পরবর্তীকালে আমার 'প্রথম গল্প' সফলনে 'হাড়' গল্পটি সংযোজিত হয়। 'নিষিদ্ধ' উপন্যাসের আংশিক পটভূমিও দিলিকে কেন্দ্র ক'রে ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে গড়ে ওঠে। এ যেন সফলকে ঢেকে সুই ক'রে নতুন ক'রে নতুন ঝাতে পরিবেশন! এ ছাড়া ইতিহাস আর সাহিত্যের আর কিছু নেই। একদিনের ইতিহাস অস্তবিনের সাহিত্য হ'য়ে পাঠকের মন বোজে। শুধু 'হাড়' আর 'নিষিদ্ধ'ের বেলায় নয়, সব লেখকের সমস্ত রচনার বেলাতেই তাই।

তা থাক। কলকাতার একটানা দিনগুলির সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগলো, ততই নিজের মস্তে একটি স্বতন্ত্র পরিবেশ তৈরী ক'রে নিতে উত্সাহী হ'য়ে উঠলাম। মৌলালীর যে ঘরে সিংহাটকীনের সঙ্গে থাকি, সেখানে সে নিজে এমন ভাবে ছড়িয়ে আছে যে, আমার নিজের মস্তে স্বাভাব্য বুলে পাওয়া সম্ভব নয়। দৈনিক কৃষকের মানেষারি ভিত্তি একখানি 'পাণ্ডাহিক কৃষক' পত্রিকাও তাকে সম্পাদনা ক'রতে হ'তো। তার মস্তেও পোকেব আনাগোনা কম ছিল না। এখানে থাকতে হ'লে নিজের স্বাভাব্যকে স্তব ক'রে থাকতে হয়, কিন্তু তা সম্ভব নয়। অর্ধ বাধাধরা এমন কিছু রোগধার নেই যে, তার উপর নির্ভর ক'রে অন্ধ কোথাও উঠে গিয়ে বর শুছিরে ব'সতে পারি। কাগজে-পত্রে লিখলেও একগুচ্ছ কনুগ্রেমেন্টারী কপি ভিত্তি অর্ধ কিছু ছোটোনা। বাঙ্গালার প্রায় সব লেখকের ভাগ্যেই তখন এই ছুটোতো। একদিন তাই হাটতে হাটতে গিয়ে নলিনীরঞ্জন সরকারের বাবর হ'লাম। হিন্দুস্থান-কো-অপারেটরের হর্তাকর্ড। তিনি, তা ছাড়া মিনিট্ট থেকে কর্পোরেশন পর্যন্ত তাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতা। তিনি ইচ্ছে করলে যে কোনো সময় যে কোনো লোককে যে কোনো কার্যে চেয়ার-টেবল দিয়ে বসিয়ে দিতে পারেন। শুনেছিলাম—তিনি আর ক্যান্টেন নবেস্তনাথ রত তখন যুগান্তর পত্রিকার কর্তৃত্বভার নিচ্ছেন। যুগান্তর সাময়িকীতে আমি তখন মাঝে মাঝেই লিখি। তাবল্যাম—পরিচর দিয়ে গিয়ে গাড়াতে হরতো সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ের ক'রে দিতে পারবেন না। খানিকটা ফুলাহুই বলা যায়। শুধু তাঁর 'রজনী' শুধনে গিয়ে স্লিপ পাঠালাম। বিতলের ঘরে ব'সে তিনি তখন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ডিক্টেশন দিচ্ছেন। ডেকে পাঠাতেই উপরে গিয়ে ব'সলাম। যোগ করি আমার বয়সের তারুণ্য লক্ষ্য ক'রে প্রথম প্রশ্নই তিনি 'তুমি' ক'রে বলতে শুরু ক'রলেন। ভিজেন ক'রলেন, 'কি বরকার বলো ?'

কোনোরকম দ্বন্দ্বোচ্চ না ক'রে খুঁসেই ব'সলাম, 'এ অবস্থায় কিছু একটা বাধাধরা কাব না পেলে আমার লিটারেরি একাউন্টিটি হরতো বড় হ'য়ে যাবে। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে তাই আপনায় কাছে এলাম।'

হাতের কাপড়পত্রে দিকে চোখ রেখে মলিনীরঙ্গন ব'ললেন, 'অনেকেই এ প্রত্যাহা নিয়ে আসে। সকলেই হয়ণা—আমি ইচ্ছে করলেই তাঁদের চাকরী করে দিতে পারি।'

ব'ললাম, 'কথাটা মিথ্যা নয় ব'লেই আপনায় কাছে সকলে ঘাব্টী নিয়ে আসে।'

মলিনীরঙ্গন ব'ললেন, 'তোমার মতো সকলেই ভুল ধারণা নিয়ে আসে। চাকরী কোথায় যে আমি চাকরী বেগো!'

ব'ললাম, 'না থাকলেও চাকরী আপনি তৈরী করে দিতে পারেন। আপনি নিজে মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক, মধ্যবিত্ত সমাজকে আপনি যদি না টেনে তুলবেন, তবে কে তুলবে?'

কথা শুনে বেথলায়—মলিনীরঙ্গনের প্রাইভেট শেক্রেটারী এখানে বলম বেথে আমার ঘুণের দিকে যা করে তাকিয়ে রইলেন। মলিনীরঙ্গন নিরুত্তর। তাৎপাণ—হয়তো কথাটা তিনি উপলব্ধি করেছেন। ব'ললাম, 'শিন্ন বসুন, সাহিত্য বসুন, সবই তো এই মিডল ক্লাসের ধান। আপনি যদি অল্পগ্রহ করে একটু সাধারণ করেন, তবে আমাকে অন্ততঃ এই নিম্নসাহিত্য থেকে স'রে থাকতে হয়না।'

এবারে মুখ তুলে কেমন একটা অদ্ভুত বৃষ্টিতে তিনি আমার ঘুণের দিকে তাকালেন, তারপর ব'ললেন, 'আজ আমি কিছু ভাবতে পারছি। এখন তখন যদি সকলের ক্ষেত্রে চাকরী করেই দিতে পারবো, তবে তো বাংলা দেশের কোনো হুঃখই ছিলনা।'

—'ছিলনা তো বটেই।' ব'ললাম, 'আপনি যদি মিল ক্যাস্টেরী করে বাঙালীঘের টেনে নিতেন, তবে বাঙালী বেকারের সংখ্যা এতদিনে অনেক কমে যেতো।'

মলিনীরঙ্গন ব'ললেন, 'লোকে তাই বলে ঘটে; তা'দের ধারণা নেই কত ধানে কত চাল হয়। তা থাক, তুমি বং আস'তে মাসে একবার আমার সঙ্গে দেখা করো।'

ব'ললাম, 'যদি আশাস যেন, তবে দেখা করি; নইলে মিছেমিছি এসে আপনাকে বিরক্ত করে লাভ নেই।'

মলিনীরঙ্গন ব'ললেন, 'এলো তো একবার, দেখাও; আপাতত কিছু ভাবতে পারছি।'

ভেবে বেথলায়—এরপর বসে থাকার কোনো মানে হয় না। উঠে তাই বেরিয়ে এলাম। খানিকটা আশাস হয়তো টিকই পেতেছিলাম, কিন্তু আর দ্বিতীয়বার গিয়ে তাঁর হাতস্থ হইনি। বিশেষ একটি টাইপ চরিত্রের মানুষ ছিলেন মলিনীরঙ্গন। এই জাতীয় চরিত্রকে মানস করে গল্পলেখা যেতে পারে। চাকরীর কথা ছেড়ে তখন এই কথাটাই কেবল মনের মধ্যে ঘুরছিল। ঘুরবার আর একটা কারণ দেখা দিল। মাস দু'য়েক বাবে কেতকাতলাব কাছাকাছি বাসবিহারী এডিনিউতে একটি সাহিত্য চক্রের অধিবেশনে 'রবীন্দ্রনাথের সাংবাদিকতা' সম্পর্কে কিছু বস্তুার ক্ষেত্রে আমি আমন্ত্রিত হলাম। শুন্দলাম—অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেবেন মলিনীরঙ্গন গরকার এবং 'লিটিক কবি রবীন্দ্রনাথ' সম্পর্কে বলবেন বুদ্ধবেথ বসু। গিরে যথানুযে উৎসাহিত হ'য়ে বেথলায়—প্রোগ্রামে কীকি নেই তোখাও। বুদ্ধবেথ বাবুকে এই প্রথম বেথলায়। মানুষটি আরো বড়জামদ্বী ম'ন, খেমে খেমে আছে আছে তাই বিবৃতি প্রকাশ করেন। মলিনীরঙ্গনকে বেথলায়—মাঝে মাঝে আমার দিকে কেমন একটা ভিত্তাহু বৃষ্টি নিয়ে তাকাতেন। তাৎপাণ—চাকরীর ব্যাপারেটা এখানে আবার বৈকাস করে না বলেন! কিন্তু সেদিকে তিনি বিশেষ এংগেলেন না। সভাপতির অভিভাষণে কোনোরকম ফ্রীপ্ট ব্যবহার না করে ব'ললেন: 'আমার সৌভাগ্য যে আজকের এই সভায় আমাকে পৌরোহিত্য করেতে হ'চ্ছে। কবিগুরু সম্পর্কে দু'টি বিভিন্ন আলোচনা আমাকে আনন্দ দিয়েছে। আমার নিজের জ্ঞান অত্যন্ত সামান্য। কবিগুরুর খুব বেশী রচনা যে জীবনে পড়েছি, এখন নয়; তবে তাঁর সাহিত্য লাভের সুযোগ পেয়ে তাঁর জীবন থেকে গ্রহণ করবার মতো বহু সামগ্রী পেয়েছি। সেইটাই আমার সব চাইতে বড় রবীন্দ্র-পাঠ। এই অহর্কালের সীয়া উভোক্তা, তাঁদের ধন্যবাদ বিই, কারণ আমার মতো এবজন ভিন্নবর্গী লোককে তাঁরা এখানে সম্মানের আহ্বান বসিয়ে তাঁদের দকে একত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ দিয়েছেন।'

অধিবেশন ভেঙে যাবার পর সিঁড়ি দিয়ে নামতে

গিরে আমার চোখে চোখ পড়তেই কাছে ডেকে তিনি বললেন, 'আপনাকে এতক্ষণ যেন বুঝে নেই। কেনা মনে হ'চ্ছিল! কোথায় দেখছি বসুন তো?'

'তুমি' বোকে আজ 'আপনি'তে উঠলেন মলিনোয়ন।

সত্য গোপন ক'রে বললাম: 'এমনি কোনো মিটে টিটিংয়ে কোথাও হয়তো হবে, ঠিক মনে ক'রেতে পারছি না।'

মলিনোয়ন বললেন, 'কি জানি, আমরাও হয়তো ভুল হ'তে পারে। তা—এম বলুচেন আপনি, ভালো-লাগলো কথাগুলো।'

হাস, এই পর্যন্ত। আর কোনোদিন তাঁর মুখোমুখি পাড়াবাত সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু অমকবার কলমের মুখে তাঁর চেহারা ভেসে উঠেছে, কিন্তু কোনো লেখাতেই তাঁকে আর সম্পূর্ণ ক'রে আঁকা হ'য়ে ওঠেনি। যেখানে—যা বলে আঁকা হয়, কিংবদন্তীর মুখে তার ঘেঁষে উপস্থান থাকলেও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তাকে পাইনি। তাই সেখান আর এগোয়নি। সেদিন তাঁর হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভে চাকরীর সুযোগ না পেলেও উত্তরকালে তাঁর প্রতীকিত হিন্দুস্থান বিজিৎয়ের ব'লে সরকারী চাকরী ক'রে তাঁর মন্দির মূর্তির দিকে তাকিয়ে তাঁকে নতুন করে চোখের সামনে দেখেছি, দেখেছি একটি বিশেষ টাইপ চরিত্র—দাঁড় ভুলনা একমাত্র তিনি নিজে।

চাকরীর অভাবে সেদিন মৌলানার খবরই আরও কিছুকাল বাটতে হ'লো। সৌভাগ্যক্রমে এসময়ে কৃৎক-নেতা মৌলানা মনিকৃষ্ণদাস ইসলামাবাদী এসে পাশের ঘরে কিছুকালের জন্য আশ্রয় নিলেন। বয়স আর বছর সমস্ত হবে। পাকা চুল আর দাড়িতে স্মরণন লগা চেহারা। অল্প অল্প সেখাপড়ার কাল ছাড়া আর কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণ যতক্ষণ পারতেন রুস বলে বই পড়তেন। পাশাপাশি ধর, তাই মৌলানা সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে দেখা হ'লো না। তিনি আমাকে সানন্দে গ্রহণ করলেন। বেকার মুহূর্তগুলোকে শুধু এবারে কিছুটা কাজে লাগাতে পারলাম। মৌলানা সাহেব শুধু জাতীয়তাবাদেই জীবন ব্যয় করেননি, সেই সঙ্গে তিনি শাস্ত্রাধি পাঠের দ্বারা পাণ্ডিত্যও অর্জন

করেছিলেন। যতক্ষণ পারতেন আমাকে নিয়ে তিনি শাস্ত্র আলোচনা করতেন। আতীবন জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, তাই ইসলাম সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোনো সংশয় ছিল না। তিনি একমুখবাকী এবং ভারতীয় দর্শনে আস্থাশীল। যেখানে—যিনি মনীষীদের জীবনী ও দর্শনের সংগ্রহই তাঁর বেসী। একদিন রাত্রি রামমোহন রায়ের জীবনী তুলে নিয়ে দীর্ঘ সময় ব'লে রামমোহন সম্পর্কে আলোচনা করলেন, বললেন, 'এমন মানুষ আর কি এরূপে সম্ভবে?'

বললাম, 'হয়তো রামমোহনের মতো ব্যক্তি আর আসবেন না, কিন্তু ইতিহাসের অনিবার্যতার একদিন আবার যে নতুন শক্তির পুরুষের জন্ম হবে, এ কথা বিশ্বাস করি।'

মৌলানা সাহেব বললেন, 'তোমার আশাবার তোমাকে জরী করুক।' ব'লে আপন মনে কি একটা উর্দু স্লোক আওড়ালেন। ভালো উর্দু জানতেন তিনি।

জিহেস করলাম, 'এটা কিগের স্লোক?'

মৌলানা সাহেব বললেন, 'এতে মানুষের কল্যাণ কামনা বোঝায়।'

অনুত একটা পিতৃহর অহতব করছিলেন তাঁর সার্বিযো। কিন্তু অস্বাভাবিক ঘেবে বেশীকাল তিনি বেঁচে রইলেন না। আমার অনেক দিনের অনেক বেকার মুহূর্তকে তাঁর প্রজ্ঞার আলোকে উজ্জল ক'রে দিয়ে তিনি একদিন শেষ নিশ্বাস ফেললেন। তার আগেকার একটা দিনের কথা এখনও প্রতিমুহূর্তে মনে পড়ে। সেদিন সাঝা দুপুর তিনি আমাকে কোথাও বেরোতে দিলেন না। কথা বলার বিশেষ শক্তি ছিল না, তবু কথা ব'লেতে চাইলেন, হাত বাড়িয়ে রামমোহনের জীবনী গ্রন্থখানি টেনে নিয়ে দীর্ঘবে আমার হাতে তুলে দিয়ে অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি, তারপর কিস্ কিস্ ক'রে বললেন, 'আমার সবচাইতে প্রিয় বইখানি তোমাকে বিলাম।'

বইখানি হাতে তুলে নিয়ে আমি মাঝার হোয়ালাদ। তাঁর এই অমূল্য দানের তাৎপর্য যে কত গভীর, তা বুঝতে দেবী হয় নি। একটুকাল ধেমে পুনরায় মৌলানা সাহেব

ইংরেজিতে বললেন, 'Culture Rammohan and become great,' এতবড় স্তোত্রা আর আদীয়ার আমি কখনে আর কাকুর কাছ থেকে পাইনি। কিছুক্ষণ মাথা নিচু ক'রে তাঁর সামনে ব'সে রইলুম, তারপর এক-সময় তাঁর পাল থেকে উঠে এলাম। এরপর মাত্র কিছু-দিনই তিনি বেঁচে ছিলেন। তাঁর প্রদত্ত বইখানি এখনও মাঝে মাঝেই খুঁস নিয়ে বসি। কোনো কোনো পৃষ্ঠায় মাঝিনে নীল পেন্সিলে উর্দু অক্ষরের মোট আছে। মৌলানা সাহেবের নিজের হাতের নোট। সেই নোট আলাও অব্যাহত আছে, কিন্তু মৌলানা সাহেব নেই। তাঁর অভাবে আমার বেকার মুহূর্তগুলি সেদিন আরও তীব্র হ'য়ে উঠেছিল।

এ সময়ে মনে পড়ে, প্রথম যোগাযোগ ঘটে সংহতি পত্রিকা ও সংহতি পাবলিশিং হাউসের সত্কাধিকারী সম্পাদক সুব্রতনাথ নিয়োগীর সঙ্গে। সংহতি কার্যালয় তখন গং মুন্সীপুর সেন সেনে। তখনকার দিনের একখানি ক্রিডিয়ান সাংস্কৃতিক পত্রিকা 'সংহতি' আলাও তার স্বতন্ত্র বহার রেখে শতৃপ্পতিতে এগিয়ে গেলেছে। ছবি, ছাপা ও বচনার সংহতি তখন অনবস্থ। সত্তরচিত্র একটি পত্র পকেটে ক'রে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ানাম দেখানো। আলাপ ক'রে দেখলাম—সুয়েন বাবু মাছুটি চমৎকার। গায়ালীবন বেশের কাজে জেল বেটেছেন। চিত্রকুমার; গায়ে খদর, মুখে হাসি। কবার তাঁর আন্তরিকতার গুণ। এখানে বসিও হ'য়ে উঠতে দেবী হয় না। সেই মাসের সংখ্যাতেই আমার পত্রটি প্রকাশ ক'রে আশ্বাৎ তিনি নিয়মিত তাঁর বৈঠকে টানলেন। 'সংহতি'র বৈঠকে তখন অনেককই ভিড়। তাঁদের মধ্যে নিয়মিত থাকে মাস্ত্রা পোতাং, তাঁরা হ'চ্ছেন—ভারতবর্ষ-সম্পাদক কণীশ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ক্যান্সার্টা। মিউনিসিপাল-মিউজিয়ানের কিতুরেটায় কাশীচরণ ঘোষ, ব্যাটিষ্টার সুয়েন চন্দ্র বিশ্বাস, কবিবাণ ইন্দু ভূষণ সেন, কবি অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অতুল্য চরণ যে প্রাণবন্ত, মুখোত কুমার গায় চৌধুরী, নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত, সত্যোৎ কুমার ঘো, ব্রজবক-সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

নিয়মিত চা আস্তে, আড্ডা গুতো, সেই সঙ্গ

পাশের ঘর থেকে ভেসে আসতো সংহতির ছাপাখানা অল্পস্বা প্রিন্টিং ওয়ার্কসের ট্রেডেল মেশিনের শব্দ। মাসের পর মাস মন খুলে সংহতিতে গল্প, প্রবন্ধ আর কবিতা লিখেছি। বৈঠকের প্রায় শকলেই নিয়মিত সংহতিতে লিখতেন। মাঝে মাঝে পুস্তকিয়ার সামান্যিক কাজের ডাক এসে তিনি আর এক মুহূর্তও ঘরে ব'সে থাকবার সোজা ছিলেন না। এতকম হ'একবার কিছুকাল ক'রে সংহতি প্রকাশের তার তিনি আমার উপর চাপিয়ে পেছেন। কি জানি কি ক'রে তাঁর বিখাপ হ'য়েছিল—আমার হাতে সংহতির মাধ্যমতা বন্ধা পাবে। চুয়াডাঙ্গার 'বিলব' সম্পাদনা ক'রে যে অভিজ্ঞতা হ'য়েছিল, এবারে তা কালে লাগলো।

কিন্তু সর্বত্র বেমন, এখানেও তেমন। বচনার বিনিময়ে কোনো বক্ষিৎ নেই। ঘরে বাইরে নিষেধকে নিয়ে নানাভাবে লড়াই ক'রে চ'লতে হ'চ্ছে। লড়াই বে ক'রতে হবে, তার পূর্বাভাস প্রথম দিনই পেয়েছিলাম—বেদিন শুধু মাত্র আশ্ববিদ্যাপুর উপর নির্ভর ক'রে দুইশত সাইক্লোমের মধ্যে কবিগুপ্তের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। বেরিয়ে এসেছিলাম—সর্বোপ গুহা থেকে বিদ্যুৎ মরাকাসের নিচে। আমাদের সাংসারিক পরি-বেশটিও তার জন্তে কম দায়ী ছিলনা। নায়ের বৃত্তার পর বাবা অনেকখানি বোঝার হাতের ক্রিড়ক হ'য়ে পড়েছিলেন। সংগারে বড় বৌদি আগেই এসেছিল। মাস্ত্রের সজার তখন বৌদির সংসারে ব্রপান্তরিত। পরে ছোট্টাধার বিয়ে হ'য়ে ছোট বৌদিও সংসারে এলো। পারি-বারিক আবহাওয়াটা ভাগ্যভাগির পরায়ে এসে পৌঁছেছে। বড়ভাষার সিঁচিল কেউই চাকরী, ছোট্টাধার ভাড়াওয়া। প্রাকৃতিশে তখন ভালো পশাৎ ছোট্টাধার। সংগারে তাঁকে কিছু হিতে হ'তোনা বলে আমার বা কিছু প্রয়োজনীয় থংচেব ভার ছিল ছোট্টাধার উপর। বাবাই এ ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। সেই যোগে নিয়ে আমার উপর ছোট্টাধার কর্তৃত্বের অস্ত ছিলনা। আমার সাহিত্য-সাহায্য যে তিনি অগ্রহোহন করতেন না, মাঝে মাঝে তা তীব্র ভাবে প্রকাশ পেতো। প্রকাশ পাবার হেতু হলো—কলেজ থেকে বেরিয়েই আমি কেন অর্থকরী কোনো

কাজ সংগ্রহ করে সভ্যদের সাহায্যে আসছিলাম! অথচ সে সুযোগ কোথাও ছিল না। আজ মনে হয়, না থাকায় শেহিন আমার অন্তর্ভাবী আমাকে বন্ধাই করেছিলেন। একদিন রূপে ছোট্টা, বড় বৌদি ও আমি পাশাপাশি বেতে বসেছি। কবার কবার আমাকে জিজ্ঞাস্য করে অর্থ হোওয়াগের লোহাই দিয়ে ছোট্টালা জুড় কণ্ঠে বললেন, 'কিছু যদি না করবি তো তোর গল্প কবিতার ব্যাটা সব আমি পুড়িয়ে ফেলবো।'

কথাটা ঘটানু বৃন্দত ভিতরে কোথায় গিয়ে যেন বড় বিবলো। এত বড় কথাটা বাবা অবধি কোনোদিন মুখে আনেননি। শুনে তাড়ের গ্রাম গলার আটকে গেল। সহ হ'লোনা কথাটা; বললাম, 'গল্প কবিতা তো ব্যাটার পাতা জুড়ে খুব বেঁধে নেই, স্তব্ধতা তা পুড়িয়ে ফেললে আমার খুব বেঁধে কতি হবে না। বাবার আমার হাজার হাজার লেখা আছে। তা হোক করি আমার সুখটির আগে পোড়ানো সম্ভব হবে না। কিন্তু আমি যদি তোমার হাজার হাজার টাকার ওদুৎ ওড় ডিসপেন্ডারী পুড়িয়ে দিই, তবে যে তোমার প্র্যাক্টিশ বড় হবে, তাতে সন্দেহ নেই।'

উত্তরে ছোট্টালা শুধু একবার ফ্রোবলীপ চোখে আমার মুখের দিকে তাকালেম মাত্র, তারপর খাওয়া শেষ করে উঠে গেলেন। আমি আর ঘাতে করে তাত তুলে মুখে নিতে পারলুম না, কিছুক্ষণ একইভাবে বসে থেকে উঠে পড়লাম। ভেবে দেখলাম—এরপর এ সম্মারে কোনো বেলাই স্বচ্ছন্দ মনে এক গ্রাম তাতও মুখে নেওয়া যাবে না। কলেজ থেকে বেরিয়েছি, বিষয়টা তাই কেমন আশ্চর্যমানেও বাগছিল। বাবার দিকে তাকিয়ে দেখলাম—নিবিকার। কোনোদিকের মস্তমস্ত দেবার মতো ক্ষমতা ছিল না তাঁর, তাতে তাঁরও অসম্মানের ভর ছিল। চিন্তা করে দেখলাম, মাতৃহীন সংসারে যেরূপ বার্ষাটা যখন ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছে, তখন এখানে আর নয়। অস্ত্রবানে, অস্ত্র কোনোখানে, সোজা কলকাতা। সেই সাইক্লোমের রাস্তে সাবা পথ তাই রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করে বলছিলাম—

‘...ভ্রমকে আর কটিন বলে

অড়িয়ে ধরতে বুকের তলে

উধাত হ'য়ে হবর ছুটেছে।

এগে খুশীর তুফান উঠেছে।’



কুলীন-কলিকায় তিথ বৎসর

নারায়ণ চৌধুরী

দ্বিতীয় পর্ব

কোন দিকে খিদিরপুর কেমন করিয়াই বা সেখানে
হাইতে বসে বিবরে আঘার কোন ধারণা ছিল না।
কলে সম্ভবতঃ নিবিষ্ট থাকিলেও একপ্রকার উদ্বেগজনক
ভাবেই আমি পথ চলিতেছিলাম। শূণ্যলুপ্ত পথের সম্মুখভাগে
রাস্তার প্রচণ্ড ভিড়, এ উৎসাহে টোলা মারিয়া সে ইংকে
কমুইয়ের স্তম্ভতা দিয়া পথ করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে।
সকলেই চলনে ব্যস্ততা, পথ চলিবার ধারা সরল ও প্রার
এক। স্থিতিমান এ বেশে রাস্তাঘাটে চলিবার ইচ্ছাই
হীতি। এ উৎসাহে পাশ কাটাইয়া অগ্রে চলিবার
অন্তর্যাত্তর্য পদস্পর্শকে সে রাস্তার ধূলির স্যায় মারিয়া
কেদিয়া দিতেছে না সে এক সখা আশ্চর্য। রাস্তার
একপাশ ঘেঁষিয়া ফুটপাথ। কিন্তু ফুটপাথ বাহিয়া চলিবার
উপায় নাই। ছত্রিশ বকমের কেহিওয়াল ফুটপাথ
তাহাদের পদমা সাজাইয়া রহিয়াছে। তার উপর খণ্ড
আঁতুহ ভিখারীর দল পথিকের কল্পনা আকর্ষণের চেষ্টার
গাণাণাদি করিয়া অবস্থান করিয়া পথিকেরই পথ অবরোধ
করিয়া রহিয়াছে। স্তম্ভরাম ট্রাম-বাস-মোটরের অস্তরৈন
চলমান বিহীন অগ্রাহ্য করিয়া তৎসহ পৈতৃক প্রাপ্তকু
হাতে লইয়া প্রশস্ত সড়কে নামিয়া হাঁটা ছাড়া সম্ভবতঃ
নাই। ফুটপাথের ওপাশে চৈতক বীর বাজার। বেশ
অবলম্বাটে হাঁট। তাহাতে ভিড় এবং কলকোলাহল
প্রবলতর হইয়াছে।

রাস্তার এই পাশে দেখিলাম বড় বড় টিনের বেড়ার
পায়ে কী সব বং-বেরস্তের ছবি। দিনেমার বিজ্ঞাপনের
ছবি বলিয়া মনে হইল। কিন্তু উহাদের এমন কিছু
চও কেন। বড় বড় চাপড় সব ছবি, মাছের প্রমাণ সাইও
চোরা, দেখিতে স্বর্ঘ্য মনে হয়। একটি ছবিতে দেখা
গেল মানের পোশাক পবাইয়া একটি বেগম তরুণীকে
সমুদ্রের তীরভূমিতে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। কদলী-

রক সমুদ্র তাহার অনাবৃত উজ্জ্বলনের সৌন্দর্য দেখাইবার
লক্ষ্যে কী ক্রটিবিগ্নিত প্রয়াস। অপর একটি ছবিতে
অসংখ্য দেশবাস একটি নৃত্যপত্রা হাটোয়লা যুগতী
নাচকেত ছই কাতের তাগুতে অংশগান অবস্থার পাক
খাইয়া ঘূরিয়া নাচিবার ভঙ্গীতে বিরামমান। একাধিক
ছবিতে বিপ্লবী মারিকাকে পরাক্রান্ত আক্রমণকারীরা কবল
হইতে বক্ষার চেষ্টার শিকারের গোলাকণ্ঠা নায়কের
হস্তে বিতলবার বন্ধু ছোঁয়া-ছুঁতে-সোয়াবের শানিত
আফালন। চক্ষুর পরিভ্রমিত লক্ষ্য চমৎকার ভোজের
আয়োজন। এমন দার্শনিক সমাবেশ সতরাচত দেখিতে
পাওরা যায় না।

কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম অল্প কথা। সুসৌন্দ-
র্যবিশিষ্ট অধিবাসীরা এই সকল ক্রটি-বিকার সহ করে কী
করিয়া! ভল-কুলীন রাঙের আইনে এইসব অন্যায়
রোধের কি কোনই বিধান নাই? ছবিগুলির মধ্য দিয়া
যে মনোভাব ও যে মনুষ্য ইঙ্গিত প্রকাশ পাইতেছে যিনি
পর দিন কিশোর-কিশোরী তরুণ-তরুণীদ্বয়কে তাহা
সিলাইবার চেষ্টা করিলে তাহাদের নৈতিক অবনতি
অবশ্যিস্ত। বয়ঃসন্ধিকালীন যুগ্মের কোমল চিত্তের
উপর এই সকল ক্ষুণ্ণতাপূর্ণ চিত্রের কী প্রতিক্রিয়া হইতে
পারে তাহা স্থগীত বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কিন্তু
মনে হইল এ সকল সমস্তা লইয়া এ বাংলা ভাবিবার লোক
কেহ নাই। নোট কর্তৃপক্ষও সম্ভবতঃ এ সকল বিষয়ে
নিশ্চিন্ত। নগরোত্তর শূণ্যলুপ্ত মত একটি অবলম্বল
অয়সার লক্ষ লক্ষ লোকের আগমন-নিগমনের পথের প্রান্তে
চক্ষুর সম্মুখের এই সকল চিত্রদলক তাহাদের অশ্রুযোজন-
লাভে বঞ্চিত হইত। এ সকল ছবি তাহারা দূরতো
সম্বন্ধ করেন না, কিন্তু উহাদের নিশ্চিত ক্ষুদ্র নিরোহে
তাঁহারা যে যতপূর্ব নহেন সে অতি প্রত্যক্ষ।

বাই হোক, আঁখি জাহাজী মানুষ, সিনেমার বিভাপন হাতাধেব এই জাঁহাজী লইয়া আমার মাথা ঘামাইবার কী প্রয়োজন। লোকে বলে আমার ব্যাপারীর আশাশ্রয় বদল লইতে নাই। আমার বেশার কথাটাও উল্টা মানে ধাঁড়াইতেছে। আমি জাহাজের খবর চাখি, আমার ব্যাপারের ব্যাপারী হওয়া আমার শায়ে না। সিনেমাচিত্র ও সিনেমার বিভাপন চিত্রের মাধ্যমে যৌনতার আধাঙ্গল পরিবেশনের সহজ ত্রস্ত বাহ্যে। এখন কহিয়াছে তাহাদের ঘূরু হইতে বহুৎ বহুৎ জাহাজ-শেলাম জানাইয়া আমি আমার পথ পরিভ্রমার পুনরায় আগ্রহ হইলাম।

আমি হস্তিনাভিত্তিক চলেতেছিলাম। পথ হাটিতে হাটিতে এক সময় চৌতালির ঘোড়ে আসিয়া ধাঁড়াইলাম। এবার কী কবি কোন কবে ঘাইব জাবিয়া ইতস্ততঃ কবিত্তেছি এমন সময় যেন আমারই সৌভাগ্যক্রমে একটি বাস বিজিৎপুর বিজিৎপুর কহিয়া ডাকিয়া ঘোড়ের মাথায় আসিয়া ধাঁড়াইল। কাল বিশেষ না করিয়া বাসে উঠিয়া পড়িলাম। বাসে অনন্তর ভিড়। ভিতরে জাহাজ না পাইয়া অনেক প্রবেশ পথের হাতল কোনমতে চাপিয়া ধরিয়া বাহুড় কোলা হইয়া চলিয়াছে। বাসের পিছনেও লোক। এইরূপ বিপন্ন অবস্থায় চলার হস্তর যে কোন সময় পা হড়কাইয়া পড়িয়া পিয়া প্রাণ সংসার হইতে পাত্রে জানিয়াও লোকে ওইভাবে বাসে চাপিতে ইতস্ততঃ করিতেছে না। উহা হইতেই কুশীন-কলিকা সহরের বানবাহন সমস্তের ভয়াবহতা অনুমান করা বাইতে পারে।

আমি নানাবিধ কনস্টেবল সাতাধে কোনমতে মাথা প্লাসাইয়া ভিতরে প্রবেশ সময় হইয়াছিলাম। কিন্তু বাসের ভিতর পা বাধিব এমন পথঘাটের বারগা বাসে নাই। ভিড়ের মধ্যে অজান্তসারে এক ব্যক্তির পা মাড়াইয়া রিয়াছিলাম। সে রোগ কবায়িত লোচনে অধিবৃষ্টি হানিয়া আমার উদ্দেশে এমনভাবে খেঁকাইয়া উঠিল যে সৌন্দর্যহৃৎক দুঃখ প্রকাশের আগে অবশর মিলিল না, আমি তাহাকে এড়াইয়া আর একটু ব্যবধানে সরিয়া আসিতে চেষ্টা করিলাম। সকলেরই অবস্থা সমান সঙ্গীন। কে কাহাকে জাহাজা ছাড়িয়া বা কহিয়া বের।

পাশ করনতলা বাহিয়া চলিয়াছে। বেলা তখন চারিটা

হইবে। পশ্চিমের বৌজালাক আসিয়া স্তেহহাভাবে প্রবেশ করিতেছে। অপরাহ্নকালেই এত ভিড়, সকল সম্ভার না জানি উহা আরও কত ভীষণ আকার ধারণ করে। ক্রমে বাস বাক লইয়া ধৌড়নী অকালে প্রবেশ করিল। এখানকার বাস্তাব্যটি বোকাবাপট বৈশ পরিভ্রমর মুশতাবলিয়া বোধ হইল। চারিধিকে একটা ছিন্নছিন্ন শুকতাকে ভাব। ধৌড়নী বাস্তার একধিকে মহতান, অত্রধিকে মুদ্রিত বোকানেশ পারি। মাঝে মাঝে প্রাণাধোপন বোটেল ও স্তোত্র। একটু আগাইয়া নিউকিয়ম, তারপর কুশীন-কলিকা স্রাব-গৃহ, তারপর আর্কটিকের মোড়। বোকাবাপটের পক্ষায় বিজ্ঞানে ও পারিপাট্যের ইউরোপীয় প্রভাব সমধিক। বোকা সেল এক সময়ে এই অকল প্রবানতঃ ইউরোপীয়-গণের বসবাস এবং আহার-বিহারের কেন্দ্র ছিল। আজ কখনো স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, কখনো দেশের অংশ হিসাবে ভগ্ন-কুশীন রাজ্যে স্বাধীন হইয়াছে, এ দেশে ইউরোপীয়-গণের পূর্বতন প্রতিপত্তি আর নাই। ইংরেজ তাহার শাসন-তান্ত্রিক তল্লীতলা গুটাইয়া সময় ব্যক্তিতে মানে মানে এ বেশ হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখনও তাহাদের প্রভাব একবারে হ্রাস পায় নাই। ইংরেজ তল্লী লইয়া প্রবান করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের তল্লী বাহকেরা তাহাদের প্রভাব জীয়াইয়া প্রাণিবার লজ্জা ভগ্ন-কুশীন সমাজের আনাচে-কানাচে ছড়াইয়া বহিয়াছে। বিভাজীত ভাবের পরিণামক বিভাজীত বীভীনীতিতে অত্যন্ত এইসব তল্লী বাহকেরাই প্রবান বিচরণ কেন্দ্র হইল এই ধৌড়নী অকল। কুশীলাস কুশীন-কলিকা শহরের এখনও ইহাই কুশীনতম অকল। পৌরপতিয়া শহর পুনর্নবীন ও পুনর্বিভাগ পরিকল্পনায় মধ্যে ইংরেজের ব্রীতিক্রমই বহন করিয়া চলিয়াছেন। বেশী পৌরপ্রতীকনের বিশেষী নতি গতি লক্ষ্য কহিয়া বাস্তবিকই চমৎকৃত হইলাম।

আর্কটিক অকলে একটা দেখাশোবে উঠিলেন। দুইজন বাত্রী একটা সেজদা নীচে জাঁহাজিয়া বসিয়াছিল, যেম-সাধেবকে জাহাজা ছাড়িয়া বিবাহ লজ্জা কে কাহার আগে উঠিয়া ধাঁড়াইবে তাহাও প্রতিযোগিতার উত্তরে সুপণৎ ভিকিং করিয়া লাকাইয়া উঠিল। যেমসাধের সুবশা বৃত্তী, চলনে দৃঢ় স্বাধীন ভাব, আড়ষ্টতার সেনমাজ নাই। যেমসাধের বসিয়াই অশ্লি নির্দেশে তাহার পাশের আগনে একজনকে বসিতে ইচ্ছিত করিলেন। ইহার মধ্যে যে কোন

গণ্যকোচের কারণ থাকিতে পারে এমন কথা তুলেও কাহারও মনে হইল না। যেমতাহেবের অসুস্থতা ঘনঘন আচরণ বাল যাত্রীর সম্ভাবিত সর্বপ্রকার কুটিল চিন্তাকে নিবৃত্ত করিল।

কিন্তু আশাহের এশ্বর মেরেবের বহুই বোধ হয় আসাধা। ণ্টাঘটিক হোডের মোড়ে একজন ক্লান্ত-লিপটিকের লালিমা সন্নিভা ত্যানিটি ব্যাগবাহিনী আগুনিকা ভক্ত-হুশীনী মেরে উঠিলেন। ছইজন পুরুষ যাত্রী প্রবেশ পথের সমীপবর্তী আর একটি সেডীস নীটে আঁকড়াইয়া বসিয়াছিল। তিনি তাহাযের দিকে এমন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিলেন যেন তাহারা সেডীস নীটে বসিয়া মহা অপরাধ করিয়াছে। যাত্রী ছইজন আরগা ছাড়িয়া দিতে পথ পাইল না। আগুনিকাটি উচ্চত গরিমাত্তের পরিত্যক্ত আসনের একাংশে অবস্থিতা হইলেন, অপর অংশে ঝালি পড়িয়া রহিল। তিনি কংকোকেও আসেন আদিকারের লক্ষ আসন ধানাইলেন না বরং এমন একটা কষ্ট অবস্থায় আড়ষ্টতাতে একক বসিয়া রহিলেন যেন পুরুষ যাত্রীর সেডীস নীটে আঁকড়াইয়া বসিয়াছে। ওই মহিলার প্রতি পুরুষ যাত্রীযের মনেও যে খুব বেশী সম্মানের ভাব উদ্ভূত হইল যাত্রীযের যুগলোষের ভাবে তাহা মনে হইল না। একই জাতির অসুস্থত যাত্রী ও যাত্রীণীযের এই পারম্পরিক বিমুগ্ধতার কারণ আশার ঠিক বোধনমা হইল না। যেখানে স্ত্রী ও পুরুষ সম্মান্যের মধ্যে স্বনিকের সম্বন্ধনই ওইরূপ প্রতিকূলতার মনোভাব জাগিয়া ওঠে সে স্থলে পারম্পরিক স্খল্যবোধ উদ্ভেবের উপযোগী ক্ষেত্র রচিত হইতে যে এখনও অনেক বিলম্ব তাহা অসম্ভবন করিতে খুব বেশী কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না।

যাত্রীযের মনোভাবকেও বলিহারি বাই। বাল বহুদা রোডের মোড়ে পৌঁছিতে ভিড় কিছু পাতলা হইয়াছিল। একটি আসন ঝালি পাইয়া আমি তাহাতে উপবেশনের চেষ্টা করিলাম। পানের যাত্রীটি অপাঙ্গে একবার আমার প্রতি চাহিয়া বোধ হয় আমার বেশভূষা আকৃতি চোখা ইত্যাদির উপর এক নম্র চোখ বুলাইয়া আমার শ্রেণী-বহুপটী বুকিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। যাত্রীটিই পরে ঘানী হাট, হুইপুঠ চেবায়া ও যুংবের জুয়াট জোঁল সঙ্কলতার

ইঙ্গিত করিতেছে। খুব সম্ভব কোন সরকারী দপ্তরের উপদের দ্বিগের ভেটোর কেবলী হইলেন। তাঁহার পরিচ্ছদের তুলনায় আমার পরিচ্ছদ, নদাই বাহুলা, অনেক কম হামো। কয়েকদিনের ছেবহীন ব্যবহারে দেওলি যথেষ্ট মলিনও দেখাইতেছিল। এতদ্ব্যতীত আনার যুগে চোখে খেটে-খাওয়া মেঘনতী মনতার দৌলভল-সত্তা কাঠিরে ছাপ। আমি যে কারিক শ্রম তথা হাড়ভাল্যে বাটুনিতে অন্তত সাধারণ একজন মেঘনতী মানুষতাহা হাঁকডাক পাকিয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না, আনার বহিরলীর আকার আকৃতি ও বেশভূষাতেই সে পরিচয় মুদ্রিত রাখাচ্ছে। একই বাসের নীটে উপবিষ্ট পাশাপাশি ছইজন যাত্রী, তাহাও যুংবের যাত্রী নয়, কিছুকি আগাইয়াই ছই চাবি ঠপের ব্যবস্থানে ইনি কিংবা আমি অগ্রে নামিয়া বাইব। তবু এই বহু সময়ের মধ্যেই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কী অদ্ভুত লীলা প্রকটিত হইল। যাত্রীযের একজন সঙ্কল সম্মান্যের প্রতিনিধি একজন সাধারণ গণ-শ্রেণীর প্রতিভূ। ইহাওই মধ্যে উভয়ের ভিত্তর শ্রেণীভেদ গুরু হইয়া গেল।

তত্সলোক আমার এই শ্রেণীভেদের প্রতি উপেক্ষা প্রার্থনের লক্ষই যেন আরও বিশেষ করিয়া পা ছইটি কঁাক করিয়া বসিলেন। ছই জনের বসিবার লক্ষ যে জোড়া নীটের ব্যবস্থা ছাত্রসম্মতভাবে তাহার অর্ধাংশ এক-একজন যাত্রীর প্রাপ্য। অন্ততঃ উহার একাংশে নিশ্চয়ই বসিয়া বাইবার অধিকার আছে। তত্সলোক কোথায় লক্ষকে বসিবার সুযোগবানের লক্ষ সৌভাগ্যবৃত্তক অঙ্গ সকালন করিবেন, তা নয়, পা ছই আরও কঁাক করিয়া কাং হইয়া বসিয়া আমার বসিবার জায়গা সংকুচিত করিয়া আনিলেন। আমি অভিনয় লক্ষণভূতাবে নীটের এক পাশ বেঁধিয়া বসিলাম। কিন্তু যতই আমি আমার পা ওঠাইয়া আমি তিনি ততই তাঁহার পা ছড়াইয়া বসিয়া ওই সমগ্র নীটটিতে যে তাঁহার মৌলনীপাটার অধিকার উহা সম্রাধানে বাস্তব হইয়া উঠেন। অংশের এমন হইল যে আমি আর বসিবার আরগা পাই না। আমি তাহাযের খালসী হইলেও সার্কাসের খেলোয়াড় তো নই। শরীরের অর্ধাঙ্গ পুঞ্জ বিলম্বিত বাহিরাও কেমন করিয়া দেবের ভারপাশ্য বহা

রাখিতে হয় উহা আবার আশিবার কথা নয়। সুতরাং বাস এক বাস্তব বোঝে ঝাঁক লইতে পতিবেশের হেঁচকা টানে আনি শাশনবৎ হিঁক হুড়ুড়ি বাইয়া পড়িলাম। তাগো সীটেই গারে একটি হুড় ছিল তাই বন্ধা, নয় ভো কী হইত বলা কঠিন। আমি আমার দুর্দশায় বিমুখ্যস্ত মুক বা বিচলিত না হইয়া ভক্ত-লাকের বিকে তাকাইয়া মুকি একটি হাসিলাম, কিন্তু উহাতে তাঁহার অন্ধুর বিশেষ কোন তাৎপৰ্য্য ঘটনাছে বলিয়া মনে হইল না। তিনি তাঁহার আচরণের ওস্তাদ বিমুখ্যস্ত লজ্জিত বা অহুতঃ হইলেন না, বরং কিছুই যেন হয় নাই এইরূপ ভবিষ্যৎ পূর্বের ভায় সীটের ভিন-চকুর্বাণ হৃদয় হবল করিয়া গীট হইয়া বসিয়া বহিলেন। ভাবনা এই যে, তিনি আপন চিন্তার বিস্তার হইয়া অচেতনভাবে তাহার সীটে বসিয়া আছেন; পাশের বাড়ীর কী হইল তাহা যেবিবার শুনিবার বা স্মৃতির মত পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে নজানতা আপাততঃ তাঁহাতে সক্রিয় নাই। বাহা কিছু ঘটনাছে তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-সায়েই ঘটনায়ে।

অশ্বিনের সাংবিধানে শুনিয়াছি সকল শ্রেণীর লোকের সম-অধিকার। কিন্তু এই বরকাসীন বাস ভ্রমণেই উহার ব্যতিক্রম-বৃত্তান্ত চোখে পড়িল। শুধু আমার বেলার নয়, আরও কতিপয়ের বেলার এমনতর বৈষম্য একটি হইল। একজন কুশী-মজুর শ্রেণীর লোক এক সুশেষবাহী বুকের পাশে গিয়া বসিতে সে প্রকাততঃ নাগিও কৃত্রিম কপিল এবং নিজেকে অভ্যস্ত গুটাইয়া নিয়া বসিল। যুগার অভি-ব্যক্তি কোথায়ও প্রকাশে কোথায়ও ন্যাকাতনে; কোথায়ও নিজেকে জাহির করিয়া অপরের প্রতি অশ্রুয়ার বোঝা, কোথায়ও আপনাকে আপনার খেলের ভিতর সংবরণ করিয়া আনিয়া অপরের প্রতি জুগুপ্সা প্রদর্শন। এই ছুই আচরণের পিছনে একই মনোভাব সক্রিয় একই প্রকার উদ্যোগে কলাকল। অথচ উক্ত মজুর বাড়ীটি যে খুব নোংরা কাপড় আনা পরিধিত ছিল তাহা নয়। তাহার বেশবাস মোটামুটি পরিচ্ছন্ন ছিল, শুধু তাহার চেহারা আদল হইতে তাহার শ্রেণী-বরণ টের পাওয়া বাইতেছিল। উহা হইতেই ঐ আশ্চর্যজননী বুকের বৈষম্য চেতনার উদ্ভব। তাহার ভোগাঙ্ক আচরণের কুলে রহিয়াছে, এই

বাংলা যে সে ওই মজুর অপেক্ষা অধিক সম্মানীয় ব্যক্তি। কিন্তু কী যেহু? সে তাহার গায়ের উপর আপাত ভয় বেশ-চুবার বরাহুড়া চড়াইয়াছে বলিয়াই কি? কাছের বড়-ছোট থাকিতে পারে কিন্তু সংভাবে ভীতিকা অর্ধনের ওস্তাদ যে কাছ, উহা কথাপি যুগ্য নহে। তবে কিসের ওস্তাদ এই আশ্চর্য্যের ও ওহা বীর শ্রেণী-শ্রেণীভেব চেতনার ভঙ্গন বুঝ তাহার সঙ্গী মজুর বাড়ীকে যেনভা কহিবার সাধ পায়? মানুষকে তাহার বতাবসিদ্ধ মানবীর মর্দাধার ওস্তাদ শ্রম প্রদর্শন—ইহাই সত্যতার বীতি। কিন্তু মানুষকে পাকে চক্রে টানিয়া লানানো ও তাহাকে ছোট করাই যেন আধুনিক মানুষের বাসনে পরিণত হইয়াছে। কোথায় মানুষ অবহেলিত মানুষকে উপবেশ করে টানিয়া উঠাইবে, তাহা নয় তাহাকে আশেও নীচেও দিকে টেনিয়া দিবার দিকে সমাধের সকল চিন্তা ও চেষ্টা প্রধাবিত হইতেছে। সমাধের সম্বন্ধে প্রাণে মানুষকে তাহার মানবীর মর্দাধার প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত না হইয়া উহা তাহার মর্দাধার হরণের কাজে সমবিক ব্যস্ত হইতেছে। গম্বুধেশবানীয়া পণ্ডতন্ত্রের আওতার বাস করে বলিয়া জাঁক করে, কিন্তু ইহাই কি পণ্ডতন্ত্রেই নহুনা? একজন বাড়ী তো স্পষ্টই যেবিলাস একজন সাধারণ চেহারা বাড়ীকে এড়াইয়া সমশ্রেণীর অস্ত একজন বাড়ীর পাশে গিয়া বসিল। উহার বিপরীত বৃত্তান্তও চোখে পড়িল। প্রমিক-শ্রেণীর বাড়ী স্পষ্টই ওস্তাদ লোক শ্রেণীর বাড়ীর পাশে বসিতে ভয় পায়, তাহার শ্রেণী চেতনাই যেন অজ্ঞাতসারে তাহাকে তাহার স্বশ্রেণীভুক্ত বাড়ীর অভিমুখে আকর্ষণ করে। জনসাধারণের চলাচলের সাধারণ একটি বাহনেই যেখানে অধিকার বোধ ও ভেদ-চেতনার এইরূপ উগ্র প্রকাশ দেই হুলে সমাধের অস্তিত্ব জয়ের অবস্থা ও সাধারণ অবস্থা অসমান করিয়া লইতে বেশ পাইতে হয় না।

বাই হোক, এক সময়ে বিভিন্নবুর বাস আদিয়া বাসিল। বাস হইতে নাগিয়া পড়িলাম। কোথায় কোন্ দিকে বাইব তাহার কিইই স্থিরতা নাই, তবু মনে বল সংগ্রহ করিয়া পশ্চিম দিক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম। তখন বিকাল হইয়া আসিয়াছে, রোদে বহুবৎ ছটা লাগিয়াছে। দিনটি বোধ হয় কোন ছুটির দিন ছিল। যেবিলাস

একাধিক ছোট-ছোট-জটলা বাড়ীর গায়নের তোরাক
বসিরা বিদ্যা আসর অমাইয়াছে। আসরে প্রৌঢ় যুবক
কিশোর সকল বয়সের আভাষারীই আছে। যেখানে
প্রৌঢ় ও যুবকের সংখ্যাদিক্য, সেখানে আলোচনার বিষয়
অবধারিত ভাবে ঘূর্ণিত-কিয়ো মোহন কানন বনাম অভঙ্গ-
কুলাল খেলার প্রশংসা আসিরা ঠেকিতেছে। আলোচনার
সে কী উৎসাহ! চানচুক সংযোগে হাক-চায়ের পেয়াদার
ঘন ঘন জুকান উঠিতেছে। যে আভার কিশোর ও
বালকদের আশিষ্য সেখানে সিনেমার মনমকুমার ও
বিচিত্রা সেন প্রাধান্য আলোচ্য বিষয়। সিনেমা স্টোরের
সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য ছোকরাদের মনদর্পণে বলিয়া যোথ
হইল। এমনি গড়গড় করিয়া তাহার সকল বৃত্তান্ত
বলিয়া বাইতেছে।

কুলাল-কলিকার হেথিলান এই এক আশ্চর্য বস্তু—
বোয়াক। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া নাকি এখনকার সংস্কৃতি
ব্যাপ্ত: পড়িয়া উঠিয়াছে। বোয়াক-আশ্রয়ী জটলাকারীদের
মধ্যে ভাবভার বোধ খুব পাকা। এমত বোধ হইল না।
কেহ নিরাকের বস্ত্র অদেকখানি উত্তোলন করিয়া ভিলেচ'পা
ভাবে বলিয়াছে, কেহ পথচারীদের প্রতি পহন তচ্ছিন্ন-
বস্ত্র: তাহাদের অভিযুগে ছুই-পা তুলিয়া বলিয়াছে, কেহ
পথচারীর স্রুতিমধ্যেই প্রাণের অযোগ্য বিষয় লইয়া পহন
পরিভোজের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতেছে।
ইহার নিষেধের মধ্যে রাগা-উজীর মাত্রন ক্ষতি নাই,
কিন্তু পথচারীদিগকে এমন অমাহুৎ তাবা কেন? ইহার
কেহেজু বলিয়া আছে এবং পথচারীরা ছুই-পা আশ্রয় করিয়া
হাটরা চলিয়াছে সেই হেতুই কি পথচারীরা ছোট হইয়া
গেল? পথচারীদের মধ্যে সবলেই বিধান বুঝমান
কুচিবান এমন কথা, নিশ্চয় কেহ বলিবে না, কিন্তু তাহাদের
কাহারও কাহারও মধ্যে এ সবল জগের সত্য বাকা কি
একবারেই অসম্ভব? পথচারী বলিয়াই কি তাহাকে এত
যেলা ফেলা।

কিন্তু কাহাকে কি বলিব। এ দেশের রীতি-কানুনই

বোধ করি এই বস্তু। এক ব্যক্তি বিজ্ঞান করিয়া
বাইতেছিল। সে যে এই মুহূর্তে চলমান বিজ্ঞানটাই
অবীষর ভণ্ড নয়, সমগ্র বিশ্ব জু-মণ্ডলেবহু অবীষর ওই
ভাব তাহার আচরণে আচরণে যেন সূটিয়া বাহির হইতেছে।
সে পায়ের উপর পা তুলিয়া বিরা বলিয়া সমগ্র জগৎ-
সংসারে কেন তাহার বৃদ্ধাঙ্কুৎ দেখাইতেছে—অবশ্য
একত্র হাতের নর পায়ে। আর তাহার গৌল মুচুড়াইবার
কী ভলী। চুনট-করা মুক্তি, মিলে-করা পান্ধারী—পান্ধারীর
উপর বাহারে চাপর, মাখার ঝাকানো টেবি—যেন এক
কান্তেন নব কাতিক মাঝিরা চলিয়াছেন। কোথায় কাহার
নিকট কী উদ্দেশ্যে তিনি চলিয়াছেন সে খবর এদেশের
তাবা অনুসরণ করিয়া বলি, মা গলাই জানেন। কিন্তু
তাহার হায়েতাবে যেন হইতেছে তাহার জুলা কেউ-কেউ
ব্যক্তি শুই তল্লাটে আর কেহ নাই।

মাথুঘের এই এক দুর্ঘর দুর্ঘলতা। যে প্রকারেই
হোক নিষেধে লাহির করা চাই। অপহের উপরে
নিষেধে এক-কাটি সতেন প্রাণন করিতে না পাযা
পর্বন্ত তাহার বস্তি নাই। যেন অপহের সঙ্গে ঘন জগে
বিভ্রমান কিংবা অপহের জুলনার কিছু খাট বলিয়া প্রমাণিত
হইলে পুবিবী বসাতলে বাইবে। কিন্তু এই যে যেন-
ভেন প্রকারেই আশ্রয়িত্য প্রতিপন্ন করার অভ্যাস—
ইহাতে যে নিষেধে আতঃ খট করা হয়, ইহার মধ্যে
যে স্রুতির মানি রহিয়াছে উহা যে আশ্রয়-অবমাননাকর সে
কথা কেহ ভাবিয়াও যোথ না। আশ্রয় লাহিরেই আশ্রয়ানি
বেশী।

বাই হোক, হাটিতে হাটিতে এক সময়ে আমি শোদ্
বিজিবপূরে আসিয়া পৌঁছিয়া। তখন বৈকাল প্রায়
পড়ার কোলে চলিয়া পড়িয়াছে। আমি ব্যক্তিই আশ্রয় ও
আল্ভানার আশ্রয় চারিমিক একবার ভাল করিয়া ঠাহর
করিয়া হেথিলান। সম্বাবী নাবিক-ভাইয়ের পঙ্কানে এখানে
আসিয়াছি, তাহাকে বুঝিয়া বাহির করিতেই হইবে।

(ক্রমশঃ)

হারানো সুর

(একাঙ্কিকা)

॥ অন্নদা মোহন বাগচী ॥

বিয়ে বাড়ি। একটা নাতিপ্রসন্ন হলধরের বরজার ছই পাশে কলাগাছ খাড়া করে—তার দামনে আত্মপল্লব গর্ব পূর্ণ স্তম্ভ পাতা হয়েছে। চতুর্দিকে মানসিক অন্তর্ধানের সম্পদে চির। সদয়—অপরাধ। ছই চাহজন করে নিমগ্নিত অভ্যাগত—অসন্তে সুর করেছেন।—এই মাত্র একটা হল এসে পড়ল। মাদুরী—তার ছোট ছোট ছই ছেলে বেয়ে—আর নম্র নন্দিতা। মাদুরীর বয়স বছর ত্রিশ—সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। নন্দিতা ঘোড়শী, লজ্জা বিবাহিতা। এরা ঘরের মধ্যে এসে চুকবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির ভিতর থেকে দয়্যাবতী ব্যস্ত ভাবে প্রবেশ করলেন। বয়স প্রৌঢ়—বিধবা। চোখে চন্দ্রমা। এসেই ছেলেমনের ছটিকে আঁকড় করে চুষে খেয়ে মাদুরীকে বুকের মধ্যে ভড়িয়ে ধরলেন।

দয়্যাবতী : আমি কেবল ঘর আর বার করছি। আর মনে মনে ভাবছি—ওটা এতক্ষণও এলো না—

মাদুরী : ঠিক সময়েই তা হলে এসে পড়েছি মামীমা। আমার বুদ্ধি অনেকদিন বাঁচবে।

দয়্যাবতী : যাট। যাট। বাঁচবে বই কী না। জন্ম-এয়োত্তী হয়ে বৈতে থাক।

মাদুরী : আমি সেদিন আপনাকে কথা দিয়েছিলাম—যে ভাবেই হোক—তপুর্ন দিয়েতে যাবই। দেখুন ঠিক কথা রেখেছি।

দয়্যাবতী : তুমি আপনজন—রাখবে বই কী না? আমি তো সেই কথাই ভাবছিলাম এতক্ষণ ধরে। নাথু আমাকে নিজে যুগে বলল যাব—অথচ এতক্ষণও তার দেখা নাই। মনের মধ্যে বড়ই অশান্তি বোধ করছিলাম এতক্ষণ ধরে।

মাদুরী : (নন্দিতাকে) নন্দি, মামীমাকে প্রণাম কর। (নন্দিতা দয়্যাবতীর পদগুলি নিল।)

দয়্যাবতী : (নন্দিতার মাথায় হাত রেখে—পরে চিবুক-স্পর্শ করে) থাক মা—থাক...। চির সুখী হও।

মাদুরী : একে বুদ্ধি আপনি চিন্তে পারলেন না মামীমা? এ আমার ডাউনগঞ্জের খুড় খত্তরের মেয়ে। কালই সকালের টোপে এখানে এগেছে। থাকবে কয়েকদিন।

দয়্যাবতী : হেঁ! হেঁ! খুব খুশি হলাম মা বেখে। হাতের নোরা আর সিঁঝির সিঁদুর খেন চিরদিন যথায় থাকে।

মাদুরী : আর সব লোকজন কই মামীমা? কেমন বেন কীকা কীকা লাগছে। বিয়ে বাড়ি—লোকজন হাঁকে ডাকে লজ্জা করবে—হৈ-হৈ ব্যক্তি বাজনাতে কান পাতা যাবে না—।

দয়্যাবতী : (বাঁচলে চোখ মুছে) লোকজন বড় বিশেষ কাউকে আমমা বলি নি মা। তুমি তো সবই জান মাদুরী—কী সুখের এ বিয়ে। হেরো বছর আগে সেই—তপুর্ন যখন বিয়ে হল—তখন ওর বাগা বৈতে। তার মাধ্যমত ছই হাতে বরচ করে কত আমার আফ্রাঘের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দিল। বিয়ের রাতে বর দেখে মা, আমার বুক ভরে উঠল। মনে মনে বললাম—হ্যাঁ, বরচ সার্থক হল। নিতান্তকৈ তো তুমি যেখনি মা—ঠিক যেন কাতিকটি।...কিন্তু এ ভালো কপালে—অত সুখ গইল না।

(শেষের দিকে গদা ধরে এল।)

মাদুরী : ছিঃ মামীমা! আমকের বিনে গোথের জল কেমনে নেই। ভতে যে তপুর্ন অকলাপ হবে।...ও সব পুরাণে; কথা আল আর মনে আনবেন না।...আপনার এ জামাই দেখতে কেমন?

দয়্যাবতী : এও দেখতে শুভে বেন। তবে কথা হন্দে কী মা—বয়স হয়েছে।

মাধুরী : (হেসে) বাঃ রে । বসন হবে না ? তপুও কী কচি খুকী নাকি ? নইলে মানাবে কেন ? তপু বুদ্ধি উপরে আছে মাসীমা ?

দয়্যাবতী : না মা, ও বাড়িতে নেই । এষ্টুখানি বাইরে গেছে । ওর কলোলের কাকে কাকে যেন বসতে থাকি ছিল—তারের বসতে গেছে । হয়তো বা তারের সঙ্গে করেও আনতে পারে । এখিকেও তো আর বেশি সময় হাতে নেই—এখনই কিরে আসবে । তোমরা উপরে চল মা । ঝাঁটা এসেছেন—সবাই উপরেই আছেন ।

মাধুরী : আমরা একটু পরে বাড়ি মাসীমা ।

দয়্যাবতী : আবার পরে কেন মা ? তপু এখনই এসে যাবে ।

মাধুরী : আপনার আমাই এখনো আসে নি—

দয়্যাবতী : তাই তো মা ! তাকে ঘমে জুলুক । যেবেছ আমার কী মনের ভুল ? তোমাদের সাথে গল্প করছি—অর্ধ ঘণ্টা হইবে আসেনি—এ কথা ভুলেও একটিকার মনে পড়ছে না । ছিঃ ! ছিঃ ! ছিঃ ! ভাবতেও লজ্জা হচ্ছে ! তা—বাবা আমার আসবে কখন ?

মাধুরী : (হুটকি হেসে) তিনি আমাদের পৌঁছে দিয়ে ফের গাড়ী নিয়ে চলে গেলেন । তাঁর অনেক দিনের ইচ্ছা তপুকে একটা বিটওয়ারচ প্রজেক্ট করবেন । তাই কিনবার লজ্জা গেলেন ।

দয়্যাবতী : কী দরকার ছিল মা—একশাল টাকা মিছামিছি খরচ করবার ?

মাধুরী : (মুখ টিপে হেসে) ও সব শাসী ভরীপতির ব্যাপার মাসীমা—কী দায় পড়েছে আমাদের ওতে নাক চুকেবার ?

দয়্যাবতী : (হেসে) তাই বলে মা নয় তাই বরচ করবে ?

মাধুরী : মার টাকা সে যদি খরচ করে খুশি হয়—আমি আপনি বললেই বা সে তববে কেন ? ওসব আপনি বুঝবেন না মাসীমা ।

দয়্যাবতী : কী জানি মা, তোমাদের কথাবার্তা সত্যি আমি একটুও বুঝতে পারি না । ঐ নিয়ে তপু সাথে

আমার হাতদিন বিটমিটি লাগে । সাহায্যিন ডাক্তার বই মুখে করে বসে থাকবে সোয়ে—বড়কুটো ভেঙ্গে ছুঁখানা করতে নিখল না আশ পর্বত ! তাই নিয়ে যদি কিছু বলি—সঙ্গে সঙ্গে বস কথা শুনিবে দেয় ।

মাধুরী : এবারে পেও তো চললো—আর বিটমিটি করবেন কার সাথে ? এক রইল বেহম—সে যে কত বাড়ীর দার দারে—সে তো আমি জানি ।

দয়্যাবতী : সত্যি বলেছিল মা মাধু, সে তার দিদিরও এক কাঠি ওপরে । দিদি বা বলবে—সে তার বেবাক্য । আর—একদণ্ড বাড়িতে থাকে নাকি ?... বেটুকু সময় কলোলে থাকে—তা ছাড়া সব সময় একটা গেলার ঝিকানো লাঠি হাতে করে—বেশ পে—সে এ মাঠ আর মাঠ চষে বেড়াচ্ছে ।

মাধুরী : (হেসে) সে আবার কী ? গল্প চমায় নাকি ?

দয়্যাবতী : না মা, ঐ যে হাকি মা হাকি কী ছাই বলে—

মাধুরী : ওঃ হাকি ? তাই বলুন—

দয়্যাবতী : হাতদিন ঐ ছাই বাংলাই খেলে বেড়ায় টো-টো করে । বাগের ঘমে তনিও নি অতপত নাম—ঘনেও থাকেনা তাই ।

মাধুরী : বিয়ের লজ কটার মাসীমা ?

দয়্যাবতী : সত্যার পরে পরেই—

(বেহের প্রবেশ । সুন্দর বাস্তবনে তত্ত্বন । হাতোজল মুখ ।)

হেম : (মাধুরীকে প্রণাম করে) আবে ! মাধুবি এসে গেছ দেখছি ।

মাধুরী : (মাধার হাত রেখে মৌন আশীর্বাদ জানিয়ে) থাক ভাই—বৈতে বর্তে থাক ।... আমি তাই বলছিলাম মাসীমাকে এতক্ষণ... আর বিয়ে—বার-বোনের বিয়ে—তারাকেটু বাড়ি নেই । আর আমবা দেই কোন্ দাপদাড়ি গোবিন্দপুর থেকে এসে সাত সকালে পাত পেতে বসে আছি ।

হেম : (করজোড়ে) মোবাই মাধুবি ! আর কবার তীর বিয়ে দি'গোনা । আমি হই সন্দেশগুলো ভিতরে রেখে আসছি এখনি । তখন ঘত খুশি কোমর বৈষে কদড়া করো—চুঁ শব্দটি করবনা ।

মাধুরী : অচ্ছ! যা। এই সন্দেশ দিয়ে সুখ বন্ধ করে
হিলি তাই বন্ধা পেলি এবারের মত। হ্যাঁ, বো-
ঝাকানো লাঠি হাতে সারাবিন টো টো করে মাঠে
মাঠে ঘুরিস কেন ?

হেম : সে আমার কী ?

মাধুরী : (মুখে অঁচল ঢাপা দিয়ে হাসি সাম্যস্বাব চেঁচা
করে) মাসীমা যে বলছিলেন—

হেম : মার খালি নালিশ জার নালিশ। আমি আর
বিবি হয়েছি মার ছু চক্ষের বিধ, বিবি তো কেটে পড়তে
চলল। আমিও উঠব গিয়ে বিবি আমাইবারুং ফ্র্যাটে।
বেশি—মা কার মাঝে তখন স্বপড়া করে ?

হুম্মাবতী : দেখা যাবে তখন—কত স্বপড়া বাছাবেনে !
এত বড় ছেলে আশুও যাব একা ঘরে শুলে ঘুম
হরেনা—, পরীক্ষার দিনে না খাইয়ে দিলে মার পেটে
হানা পড়ে না—, তার বে কত মুখে আমার জানতে
আর থাকি নেই !

হেম : কের তুমি ঐ সব লাগানি ভালানি সূত্র করে
দিলে মা ?

হুম্মাবতী : না দিয়ে কী করি ? গলের ছিটে দিলে
ভঁতো খেতে হয় মানিস না ?

হেম : কার কী তোমাদের সব ভঁতোভঁতি খেয়ে ? তার
চেয়ে বলে বলে মশালে দই সন্দেশ টেট করিয়ে ঘরে
খিল দিয়ে।

(হাসতে হাসতে প্রস্থান)

হুম্মাবতী : যেখালি তো না মাধু, অতবড় ছেলে কিন্তু ঐ
কী স্বভাব। সারাবিন ছোট ছেলের মত আমার সাথে
খুনহুড়ি করবে।

মাধুরী : ওতো সত্যি ছোটই মাসীমা। আর চিরদিন
বাঁকবেও ছোট হয়ে।

হুম্মাবতী : আমার মা এখন এইটুকুই সখল ! বল
ভরসা সাহস সম্পদ...বা কিন্তু সব এই !...আমি এবারে
উপরে বাই না—ওরা সবাই বলে আছে। আমাই
এলে তোমরাও এসো কিন্তু—

মাধুরী : তাই বাৎ মাসীমা—আপনি যান।

(হুম্মাবতীর প্রস্থান)

মন্দিতা : বেশ লোক ইনি খোঁজি। কিন্তু মনে হল যেন
কী একটা দুঃখের কথা বলতে বলতে চেপে গেলেন।—

মাধুরী : (দীর্ঘ নিশ্বাস কেলে) আমার একতরফ একটা
আনন্দের দিনে ঐ দুঃখই যে কাঁটার মত অনুভবত
মনের কোণে ফুটছে খোন। তুই তো আনিদনা সব
কথা।

মন্দিতা : আমাকে বলনা খোঁজি।

মাধুরী : বিয়ে বাড়ি—ক কোথায় এখনি এসে পড়ল—

মন্দিতা : খুব সংক্ষেপে বল—

মাধুরী : প্রায় তেরো বছর আগে তপতীর বরদা মখন
ঘোল আর মাত্রিক দিবার গল্প তৈরী হয়ে—তখন
হঠাৎ একদিন সিতাংগুর মাঝে ওর বিয়ে হয়ে গেল।
সিতাংগু খুবই বড়লোকের ছেলে। বাপ মা নেই।
গ্রাম্যুয়েট। বিয়ের পর একটা বছর গুপের ঘেন
স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে যায়। সিতাংগু যৌ অল্প
প্রায়। দুম্বনে একসাথে গুঠে—একসাথে বলে—
একসাথে হাসে—এমন কী ঘর ঘরকা বন্ধ করে—
একপাতে কাড়াকাড়ি করে ধার। তপতী স্বামীর
প্রায় ঢালা ভালবাসার মধ্যে নিজেই নিশেবে হারিয়ে
কেলে। বাপ তখন বৈতে। বেরেকে আনতে যায়।
এক বেলা কি দুই বেলায় গল্প বেরে ঘবি বাপের বাড়ি
আসে—সঙ্গে সিতাংগু ও। আদি অবস্তা চোখে
দেখিনি। তোর দাদা তখন নতুন ফেব্রিতে বদলী
হয়ে এসেছে। সে বেন কার কাছে শুনে এসে হাসতে
হাসতে আমার কাছে গর করল। আমার কিছু
তপতীর ভাগ্যে বিংশা হল।

মন্দিতা : যাও। কী যে কথা বল। নিজেরা বেন
এর চেয়ে কথা !

মাধুরী : (মন্দিতার গালে ঠোঁটা মেরে) তুই খুঁজি সব
বেশেছিন ? তারপর—এত বড় গল্প বেয়াদবে
একদিন কাটল দেখা দিল। সিতাংগু কিছুদিন থেকেই
কেমন যেন উসখুস করছিল। মনমরা। বিন্দবাত
কী বেন ভাবে আপন মনে। ডাকলে অনেক ঘেঁহিতে
উত্তর দেয়—আর তাও যেন কেমন ভাগা ভাগা।
কেউ কোন হাশি পাগ না কী হল। হঠাৎ একদিন

হাতে তপতীর ঘুম ভাঙিয়ে বলল : আবার মনে
বৈরাগ্য এসেছে। এ মাথার সমস্যা আর এক
বুহুর্ভুত মন টিকছে না। হয় বন্ধ হয়ে আসছে।
তুমি আমাকে মুক্তি দাও—আমি যাই। তপতীর ঘুম
ছুটে গেল : সে কী ! কোথায় যাবে ?—তা
আনিলা। তবে কথা দিচ্ছি—যদি কোন দিন বুদ্ধিতে
পারি—আমার পথ জুগ—এক বুহুর্ভুত আর আমি
যেঁরি করব না—তোমার কাছেই কিয়ে আসব।
তোমার ভালবাসা তিরদিন আমার পাথের হয়ে থাকবে।
তপতী মুক্তি বিজ্ঞপ্তি করেছিল :—কিন্তু আমার
জীবনের বিনষ্টগতি কঠোরে কী করে ? কী নিয়ে আমি
বঁচব ? শিতাংগ বলেছিল : হাতে তুমি আনন্দ
পাও—তাই কবো। সব কাজে তোমার স্বাধীনতা
রইল। কিন্তু আমাকে তুমি অহমতি বিজ্ঞ তো ?
তপতী বলেছিল : আমি তোমার সহধর্মিণী। তোমার
পথের কাঁটা হতে চাই না। কবে যাবে ?—অন্ন
বিসের মধ্যেই—উত্তর দিয়েছিল শিতাংগ। কিন্তু সেই
রাতেই পাখী শেকল কাটল। তপতীর জীবনে নেমে
এল চরম দুর্দিন। অতবড় শোক মইতে না পেয়ে
ব্যথা মারা গেলেন। তপতী শোকের বোঝা মাথায়
নিয়ে জুগ ছেড়ে কলেজে ভর্তি হল। কলেজ থেকে
ইউনিভার্সিটি। আজ সে লেডি ব্রাবোর্নের প্রফেসর।

শক্তি : এতদিনে মুক্তি ভাই বিয়ের কথা নতুন করে
মনে পড়ল ? পুরানো জীবনের মাঝে পুরানো স্বামীও
বাতিল হতে চলল।

মাধুরী : সেও আর এক কাহিনী। কলেজে পড়বার
দমর প্রফেসর দিচ্চার্ন রাসের মাঝে তপতীর পরিচয়
হয়। সেই পরিচয় থেকে বনিষ্টতা...আর বনিষ্টতা
থেকে—বলতো কী ?

শক্তি : (হেসে) যা হবার তাই। প্রেম।

মাধুরী : এ প্রেম কিন্তু যে সে প্রেম নয়। ‘এ প্রেম
নিকবিত হেম—কংমগন্ধ নাহি তারে।’ সব একদিন
সুনল প্রফেসর—সুনল তার জীবনের স্তম্ভ
কাহিনী। তপতী বিবাহিতা—স্বামী তার নিকবিত।
মনের চুপে যেচোরা বিশেষ চল গেল। বছর তিনেক

সেখানে থেকে মত্ত বড় এক বিলাসী ভিগ্নি আর
তারই মাগে এক জাঁকিয়েল পোষ্ট নিয়ে এসে সম্মুখ
শান্তিমে চুকে পড়ল। কিন্তু বিয়ে করল না। তপতীর
শ্রুতি ঝাঁকড়ে ধরে বিবাহ পাথারে হাতুড়ু শেরে বিন
কাটিয়ে বিতে লাগল।...

শক্তি : এভাবে বুঝি ঘুং ধরা পড়ল কী ?

মাধুরী : এ দিকে ক্রমশঃ হাতো বছর যাবৎ শিতাংগের
কোন খোঁজ খবর না পেয়ে দবার পরামর্শ নত তার
জুগ পুস্তিকা হার কবে তপতী বিবাহ মাজল। এখন
আর বিয়েতে বাগা কী ? বিবাহ বিয়ে তো কতই
হচ্ছে আজকাল। এও তাই।

শক্তি : বড় ট্যাগেভি তো। শুনেই মনটা ধাড়া
হয়ে গেল। এখন মনে হচ্ছে—না সুনসেই ভাল
করতাম।

মাধুরী : (ব্যক্তি কর্তে) তোর যদি এক বুহুর্ভুত এই
বয়স—ভাঙলে মারের মনেই অবস্থা কী হতে পারে—
সহজেই অস্থান করতে পারিস। শিতাংগ এখনও
ওঁর মনে আসন পেড়ে বলে আছে—কিন্তুতেই তাকে
মন থেকে সরিয়ে দিতে পারছেন না। সুনসিমা ওঁর
মুখে শিতাংগের কথা ? (তার পাঁচজন মহিলা সহ
তপতীর প্রবেশ। বয়স সাতশ আঠাশ। বাগ্যাবতী।
শূর মৃগী। চোখে চশমা। হাতে ত্যানিটি
বাগ।)

তপতী : আরে মাধুরি যে। কতক্ষণ ?

মাধুরী : এই একটু আগে এলাম ভাই। স্তোর খোঁজ
করলাম—সুনসিমা বাইরে গেছিল। আজ এই শেষ
বুহুর্ভুতও বুঝি বেখানুনা না কবে পাতে পাংলিনে ?
যদি মেয়ে যা হোক তুই !

তপতী : তোমার অস্থান মিথ্যা মাধুরি। মা বেক্ষবার
মুখে পই পই করে নিষেধ করে দিয়েছেন—আজ না কি
আর শুভ-বুদ্ধির আগে থেবা করতে নেই। থালি
ফোনে জুটো কথা বলেছি।

মাধুরী : কী বলল ? আর দেয়ি কত আসতে ?

তপতী : ভয়লাক শেত করছেন। আর আখ বটোর
মধ্যেই এসে যাবেন।

মাধুরী : (ক্রিমি কোণে) আর তাই বুঝি তুমি এত ঘেরি করে এলি ? শিশুর কাপড় গোপড়গুলো ছাড়। চল একটু সান্নিধ্যে ডুবিয়ে দি।

তপতী : এই তো বেশ আছি মাধুরি। এর উপর আরার শাখ কী হবে ? ওর না হয় হাড়ি আছে—তাই শেত করছে। আমার তো সে বালাইও নেই।

(সবাই সম্বরে ঘেসে উঠল)

মাধুরী : আজকের দিনে আর তা বললে শুনছি নে। এমন দামি হয়ে দিবে ওর শুভবুদ্ধির সময় ভক্ত্যলাকের যুগু ঘুরে যাবে।

তপতী : (গোপের কোণে বিদ্রোহ হেনে) এঃ বাবা ! তারপর ডিকিংবার ঠেলা সাধ্যাবে কে ? তুমি তো যেখান সাংখ্যাতিক লোক মাধুরি, তুমি লব পার।... এখানে বসে করছ কী ? ভিতরে চল।

মাধুরী : তোরা যা তাই—আমি এই এলাম বলে। আমার পাইলট যে এখনো আসেনি।

তপতী : ওমা তাইতো ! আমাইবা তুকে যেখানি নে !

মাধুরী : উনি এন্টুনি এসে যাবেন।

তপতী : আচ্ছা আনন্ডা চললাম। তুমি কিন্তু বেশি ঘেরি করোনা মাধুরি।...

(সবল বলে তপতীর প্রস্থান)

(পরক্ষণেই মহিমের প্রবেশ। পরিধানে দামী স্যুট। সাল ব্লাস। ফিটকাট চেহারা। সুখে হাসি।)

মহিম : (পকেট থেকে গড়ির বাক্স বের করে মাধুরীর বিকে এগিয়ে দেয়) দেখতো—কেন্দন হল।

মাধুরী : (হাতে নিয়ে বেখে মুচ কঠে) চমৎকার ডিঙ্গাইন্টা !

বেখ হয়েছে।

মহিম : এ চেষ্টা করা কী যে পে কাছ। পছন্দ কী সম্বন্ধে হতে চায় ? বাশ বনে ডোম কান্য। লেডিগ বিষ্টওয়াওগুলো এক একটা এক এক বকমেব। বেটা হাতে নেই দেইটেই ভাল লাগে। এ এক বড় বকমাদি কাছ !

মাধুরী : বাম কত এটা ?

মহিম : দু কিস্টি কোর—ইন্সিভিং সেলট্যাক্স।

মাধুরী : তা হোক। বেশ হয়েছে ডিঙ্গাইন্টা।

মহিম : তুমি গিয়ে তপুকে ততক্ষণ এটা দেও পে। আমি পাড়োটা এক ঘাবে পার্ক করিয়ে বেখে আসছি।...

(ছেলেমেয়ে ও নন্দিতা সহ মাধুরীর প্রস্থান।)

মহিম একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। ইতি-মধ্যে জন তিনেক নিমন্ত্রিত প্রতিবেদী প্রবেশ করলেন।)

প্রথম জন : কই, বিয়ে বাড়ির লোকজন তো কাউকে যেখনি নে।

মহিম : আমি এই বাড়িরই। আপনারা বস করে বসুন।

দ্বিতীয় জন : বিয়ের ঘেরি স্বত আর ?

মহিম : (অপ্রতিত কঠে) আমি সেটা সঠিক বলতে পারছি নে। আচ্ছা—আমি এখনই ঘেনে বলছি।

যেম ! যেম। একবার এটিকে শুনে যাও তো।

(ব্যস্তভাবে ঘেমের প্রবেশ।)

যেম : কী আমাই বাবু ?

দ্বিতীয় জন : এই যে বাবাবো ! তা—তোমাদের লগ কটায় ?

যেম : সন্ধ্যার পরই।

তৃতীয় জন : তা হলে ঘেরি আছে বল।

যেম : আর ঘেরি নেই। এখনই বর আপনেন। পাশের বাড়ি থেকে এই মাত্র কোন এ্যাটেন্ট করে এলাম। ওঁরা ফোন করেই ট্যাগ্মিতে উঠেছেন। এই পথটুকু আসতে বা ঘেরি। (মতিমকে) লামাইবা, আপনি ভিতরে চলুন—না ডাবছেন।

মহিম : পাগল। এখনই বরঘাত্তোরা সবাই এসে পড়বেন। তাঁদের অত্যাধনার লগ এখনো কেউ না থাকলে চলে ? আমি এখানে থাকি। মাসীমাকে বলবে—আমি পরে ঘেবা করব।

(ঘেমের প্রস্থান।)

জৈনক আগন্তকের প্রবেশ। বেশভূষা মলিন। সুখে খোজা খোজা হাড়ি। অস্বাভিক রূপ বেশ। চোখ দুটি উজ্জল। ভগ্ন কৃষ্ণিত।)

মহিম : (এগিয়ে এসে অত্যাধনার ভঙ্গিতে) আগুন—আগতে আচ্ছা হোক।

আগন্তক : (অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনার খতমত খেয়ে)
বেধুন, এইটাই কী বসন্তবাবুর বাড়ি ?

মহিম : হ্যাঁ...হ্যাঁ...এই সেই বিয়ে বাড়ি। আপনি
ভিতরে এসে বসুন।

আগন্তক : (বিস্মিত কণ্ঠে) বিয়ে বাড়ি ?...তা—ওঁকে
যদি একটু হয়্য করে ডেকে বিতেন—

মহিম : (বিস্ময়-বিমূঢ় কণ্ঠে) উনি তো বছরদিন যাবত
মারা গেছেন।...আপনি আসছেন কোথেকে ?

আগন্তক : (জল্পিত কণ্ঠে) মারা গেছেন ?...তাহলে...
আমি যাই—

মহিম : সে কী। যাবেন কেন ? উনি না থাকলে কী
হবে—ওঁর স্ত্রী ছেলেমেয়ে সবাই আছেন।

আগন্তক : (উচ্ছল হৃৎ) আমার নাম সিতাংগু সেন।
আম্মা বেধুন তপতী নামে ওঁর যে মেয়ে ছিল...সে কী
আছে এখানে ?

মহিম : আছে নানে, তাইই তো আজ বিয়ে !

আগন্তক : (বিচ্যুৎপৃষ্টের মত চমকে) বিয়ে ! তার
আজ বিয়ে ! না...না...আমি এখন যাই। পরে
অন্ত এক সময় আসব। (রানহাটে) তার বিয়ে !
বাঃ ! বেশ। খুবই খুশি হলাম শুনে।...খুবই আনন্দ
পেলাম।

(প্রস্থানোত্তত)

মহিম : কী নাম বললেন...সিতাংগু সেন ? যাবেন না...
একটুখানি ধাঁড়ান। আমি ওঁদের গিয়ে বলছি—

আগন্তক : (প্রবল আগন্তির কণ্ঠে) না...না...অজ
ধাক। আমি পরে আসব আর একদিন।...

মহিম : তাও কী কখনও হয় ? এমন স্তম্ভবিনে যখন
হয়্য করে একবার এসে পড়েছেন—তখন আর
ছাড়াছাড়ি নেই। আপনাকে ধাকতেই হবে

অমুঠমে। হেঁম ! হেঁম ! তাড়াতাড়ি একটিবার
মাগীমাকে পাঠিয়ে যাও তো।...বল—সিতাংগু সেন
বলে এক তরলোক এসেছেন দেখা করতে।

আগন্তক : (অত্যন্ত বিব্রত ভাবে প্রস্থানোত্তত হয়ে)
আমি...আমি তুল বলছি। বেধুন...ও নাম আমার
নয়। আমি...আমি অজ লোক। ও নামের কেউ
নেই।...আমি যাই, আগন্তকের মত যাই। নবদ্বার—
(ক্রতপরে দ্বারাবর্তী, হেঁম ও তপতীর প্রবেশ। পিছনে
আবগু অনেক।)

দ্বারাবর্তী : (স্থান কাল তুলে চীৎকার করে) কে ! কে
এগেছে বললে ?

মহিম : সিতাংগু সেন—

দ্বারাবর্তী : সিতাংগু ? আমার সিতাংগু ?...কই ? কই সে ?

মহিম : (আগন্তককে দেখিয়ে) এই যে ইনি—

আগন্তক : (কাঁপা গলায়) না...না...আমি মই।

আমি মিথ্যা বলছি। আমি সিতাংগু মই...। আমি
...আমি...অজ লোক।...

দ্বারাবর্তী : তবে তুমি কে ?

আগন্তক : (বাশকুড় কণ্ঠে) আমি...আমি...কেউ
না...। আমি যাই...আমি যাই... (চলে যাবার অন্ত
যুবে ধাঁড়ান।)

তপতী : (ক্রতপরে এগিয়ে এসে আগন্তকের বাক্য চেপে
হবে) না...বেতে পাবেনা। আমি বলছি...তুমি
দে-ই। তাকাও তো আমার দিকে। (দুহুর্তকাল
কী যেন বেখে—দ্বারাবর্তীর দিকে চেয়ে) যা, এই নাও
তোমার জানাই...! (নেপথ্যে ঘোড়ার এসে ধাঁড়ানার
শব্দ শুনা গেল। বহুদ্বারাবর্তীর সঙ্গিলিত কণ্ঠের
কোলাহলের শব্দ শব্দধ্বনি মিশে লম্বা পরিবেশকে
মুখরিত করে তুলল।)

■ ববদিকা ■

জীবাণু প্রতিরোধকরণ ক্ষমতা

মানুষের শরীরকে আক্রমণ করিয়া যে সব ছোট ছোট প্রাণী বাস বিধিয়া থাকে এবং অধিকাংশ সময়ই অস্বস্তির সৃষ্টি করে তাহাদের ইংরেজীতে বলে-microbes এবং বাংলায় সাধারণ ভাবে জীবাণু বলে। এই পরাশ্রয়ী জীব-গুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়। তাহা হইবে প্রাণীজগতের আর দুইটি উদ্ভিদ জগতের।

প্রাণী জগতের প্রধানটি পুস, উল্লু, ক্রমি ইত্যাদি। যিহাট্টে পুস, নিয়ন্ত্রণীত ক্ষুধাকার জীব। তাহাদের বলে প্রোটোজোয়া। ইহারা প্রায় এককোষসর্বস্ব, এবং কোষ প্রাচীরের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে খাদ্য গ্রহণ করিয়া বর্জিত হয় এবং নিজেকে বিধা বিভক্ত করিয়া প্রজননকার্য সম্পন্ন করে। এই শ্রেণীর সর্বপরিচিত প্রাণী হইল ম্যালেরিয়া রোগের বীজ। ইহারা শরীর আক্রমণ করিয়া রক্ত কণিকা ধ্বংস করিয়া নিজেরা বাড়িতে থাকে এবং আশ্রয়স্থানকে বিনষ্ট করে। আফ্রিকা দেশের নিম্না ব্যাধিও এই ধরনের বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহারা সাধারণতঃ মল্লুত ঘেঁষে সংক্রমণের ক্ষমতা রাখা থাকে ইত্যাদি অল্প এক প্রাণীর সাহায্য গ্রহণ করে। ইহাদের সহিত ব্যাকটিরিয়া-জাত রোগের প্রধান এবং বিপজ্জনক তফাৎ এই যে ইহাদের বিরুদ্ধে কোন উপায় দ্বারা অনাক্রম্যতা (Immunity) অর্জন করা যায় না। একবার মল্লুতঘেঁষে আক্রমণ করিলে এমন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় সাধারণ শরীরের মধ্যে উহাদের আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করিতে পারে।

উদ্ভিদ জগতের জীবাণু দুইটিকে একটিকে বলে ব্যাকটিরিয়া আর একটি ভূজি। ব্যাকটিরিয়া জীবগণের মধ্যে ক্ষুদ্রতম এবং শারীরিক পঠনে সর্বাপেক্ষা সরল। সাধারণতঃ জীবাণু বলিতে সাধারণ বোকা আর সাধারণের মতে প্রাণীজগতের সর্বোচ্চ বর্জিততম তাহারা ব্যাকটিরিয়া। ইহারা প্রায় সর্বব্যাপী; ধূলায় মাটিতে, জলে, জীবদেহে এমন কি বাতাসের পর্বত ইহাদের অবস্থিতি।

খাদ্য না পাইলে ইহারা মৃতবৎ থাকে আবার জল বা খাদ্য পাইলেই বাড়িতে থাকে এবং নিজেকে বিধা বিভক্ত করিয়া প্রজননকার্য সম্পন্ন করে। ইহাদের কয়েক জাতি, আছে তাহারা ২৫ ঘন্টার খাদ্যভাবে থাকিয়াও মৃত বহু নাই, অল্পকাল অবস্থা পাইয়াই আবার জীবন যাত্রা আরম্ভ করে। কোন কোন জাতি ২০ মিনিটে প্রজননকার্য সম্পূর্ণ করিতে পারে, ইহাদের অর্থ এই যে একটি প্রাণীর স্থলে এক ঘণ্টার পর ৮টি, ৪ ঘণ্টার পর ৪০০০, ৮ ঘণ্টার পর ১৬,৭৭৭,২১৬ প্রাণীর উদ্ভব হয়। এই ব্যাকটিরিয়াগুলি যদি রোগের বাহন হয় ত কি ভীষণ কথা তাহা সংক্ষেপে বোঝা যাইবে।

ব্যাকটিরিয়াদের সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা যে ইহারা সর্বদাই রোগ উৎপাদন করে, এই ধারণা কিন্তু ভুল। অধিকতর ইহাদের মূল্যবান দান আছে। প্রথমেই মনে রাখা প্রকার যে পৃথিবীতে যত জীবিত বস্তু আছে তাহাদের সকলকে একত্র করিলেও সংখ্যায় ব্যাকটিরিয়াদের সমান হইবে না। এই সর্বব্যাপী জীবাণুগুলির প্রধান মূল্যবান কার্য হইল মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলিকে নষ্ট করিয়া পদ্ধতুতে মিলাইয়া দেওয়া। ইহারা না থাকিলে পৃথিবীতে উদ্ভিদের ও প্রাণীর শবের চাপে জীবিতের জীবন ধারণই অসম্ভব হইয়া উঠিত। ইহা ছাড়া মাটির মধ্যে থাকিয়া ইহারা বায়ু হইতে উদ্ভিদের খাদ্য প্রদত্ত করিবার কার্য করে। যে মাটিতে নাইট্রোজেন বন্ধনকারী ব্যাকটিরিয়া থাকে না সে মাটিতে চাষ ভাল হয় না। আবার এক শ্রেণীর ব্যাকটিরিয়া মানুষের আশ্রয় মধ্যে থাকিয়া ভিটামিন 'বি' উৎপাদন করে। শেখাজ বস্তুটি ঘেঁষে পুষ্টির ক্ষমতা একান্ত প্রকারী। প্রাকৃতিক যে সকল কার্য ইহাদের দ্বারা প্রবাহমান হয়, তাহা ছাড়া ইহাদের দ্বারা মানুষও অনেক কার্য করাইয়া লয়। যেমন অবাঞ্ছিত জৈবিক অবশেষগুলিকে শোধন করার কালে

লাগান হয় যেগটিক ট্যাঙ্কে, যেগুলি কোথাও কোথাও
ক্রানিটার পাইপানো বসিয়া থাকে। কোন কোন বায়োনিক
বস্তু উৎপাদন করার কালেও ইহাদের লাগান হয়, যেমন
অ্যান্টিটোন, বিউটাইল অ্যালকোহল।

ব্যাাকটিরিয়া ছাড়া উদ্ভিদশ্রেণীর অন্তর্গত জীবাবুগুলি
অন্যদের গোষ্ঠের হয় কোন বস্তুর উপর ছাড়া পড়িলে।
ইহারাও সকল সময়ে অবাছনীয় নয়, কেন না পানীর
তৈয়াগী ইত্যাদির কাজে ইহাদের সহায়তা লওয়া হয়।
এবং বর্তমানে পেনিসিলিন ব্যাতির ঔষধ প্রস্তুতে সহায়তা
করিয়া ইহারা মানব সমাজের প্রভূত উপকারে
আসিতেছে।

পূর্বেক্ত জীবাবুগুলির মধ্যে ব্যাকটিরিয়া এতখানি স্থান
বহুল করিয়া আছে যে, ইহাদের দ্বন্দ্ব জাতিবার লক্ষ ব্যাক-
টিরিয়ালগি নামে একটি শাস্ত্রেরই সৃষ্টি হইয়াছে এবং অনেক
বিজ্ঞানী আকৌবন ইহাই অধ্যয়ন করিয়া নিবেদনের জ্ঞান
পিপাসা মিটান ও মানব সমাজের কল্যাণ করেন। ইহাদের
খালি চোখেও দেখা যায়ই না, অস্বীকৃতিও সহজে দেখা
যায় না, কেন না ইহাদের কোন রং নাই এবং ইহাদের দেহ
প্রায় বহু। তবে বাহির হইতে রং লাগাইলে ইহারা
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রঞ্জিত হয়। এই পদ্ধতির দ্বারা ইহারা
অস্বীকৃতি প্রদর্শিত হয় আর ইহাদের আকার দ্বারা
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পার্থক্য বুঝা যায়। আকার ভেদে
ইহাদের প্রধান দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম
শ্রেণীতে হইল ককাস। ইহারা দেখিতে প্রায় গোলাকার
এবং প্রায় গুচ্ছ-বীথিয়া থাকে। যথা মানুষের দেহে আগ্র
করিলে ফোড়া ইত্যাদি হয় তাহাকে বলে ষ্ট্যাকিলোস ককাস,
ইহারা প্রায় আঙুরের স্তম্ভের মত দেখিতে। স্ট্রেপ্টোককাস
যাহাদের প্রভাবে ক্ষত সেপটিক হয় তাহারা ঝাঁকা-ঝাঁকা
শিকলের মত আকারে বিরাজ করে। নিউমোনিয়া বোগ-
বাহী নিউমো ককাস ও মেহ বোগের বীজ গণককাস
কোড়ায় কোড়ায় থাকে। প্রথমটি লম্বাটে গড়নের আর
দ্বিতীয়টি বড়নটির বীজের মতন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাক-
টিরিয়া হইল ব্যাসিলাস। ইহারা ছোট ছোট লাঠির
আকারের। ইহারা নানা বিভিন্ন আকারের, কেহ মোটা,
কেহ সরু, কোনটি লম্বা, কোনটি বেঁটে, কেউবা সরল, কেউ

বা বক্র, কাহারও শরীর দু'চোশো, কেউ বা আগাগোড়া
একই পরিমিত, কাহারও সীমা চতুস্তোন, কেহ গোলাকার।
অবস্থিতিতেও প্রভেদ আছে, অ্যানথ্রাক্সের ব্যাসিলাস
সূক্ষ্মলাবক ভাবে থাকে, আর ডিপথিরিয়ার ব্যাসিলাস
বিশেষ ভাবে সংবদ্ধ ভাবে থাকে। ব্যাসিলাসের কয়েকটি
আকার আছে যথা ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে দেখা যায় না।
যেমন টিটেনাথ বা বগুঠেকার ব্যাসিলাসের এক ভূদায় একটি
গোলাকার বস্তু দেখা যায় যাহাকে স্পোর বলে। এই
স্পোরগুলি অনেক অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিতে পারে। যেমন,
ফুটন্ত অঙ্গে ইহারা নষ্ট হয় না। অস্বস্থ অবস্থায় আবার
বাড়িতে থাকে। এইজন্যই হাসপাতালে শোধান করিবার
লক্ষ অতিবিক্ত চাপে বাষ্প প্রয়োগ করা হয়। টাইফয়েড
ব্যাসিলাসের আবার কতকগুলি শুঁড়ের মত বস্তু থাকে
ইহাদের বলে স্পাইকুল। উপরোক্ত দুই প্রকার আকারের
ব্যাকটিরিয়া ছাড়া আরও দুইটি বিশেষ আকারের উল্লেখ
করা যায়। কলেরার বীজ দেখিতে বক্র, গোলাক
লাঠির তায় এবং ইহাদের একটি করিয়া লেগ থাকে।
এই আকারকে বলা হয় ডিট্রিও। দিকিলিসের বীজ
দেখিতে সপিল আকারের। এই আকারের ব্যাক-
টিরিয়াকে বলা হয় স্পাইরোবিং।

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও জাতির ব্যাকটিরিয়ার ব্রহ্মণ পরিবার
লক্ষ ও তাহাদের জীবনপ্রণালী বুঝিবার লক্ষ বিজ্ঞানীরা
বীক্ষণাগারে তাহাদের রীতিমত চাষ করেন। যেখানে
ইহাদের জীবিত নিশ্চিত যেমন বোগীর কক্ষ, মল নুজ
সেখানে হইতে সামান্য কিছু শইয়া ইহাদের অস্বস্থ
বাড়িতে দেওয়া হয়। ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে
ইহাদের উপনিবেশগুলি অনেক সময় বালি চোখেও দয়া
পড়ে এবং উপনিবেশগুলির আকার দেখিয়াই অনেক
সময় বিশেষজ্ঞরা বলিতে পারেন যে ইহারা কোন শ্রেণীর
ব্যাকটিরিয়া। উদ্ভিদ কলাইবার লক্ষ লক্ষ মাটিতে বীজ
বপন করেন। ব্যাকটিরিয়া চাষের লক্ষ প্রয়োজন হয়।
মাংসের জুস, বক্রদণ্ড, ডিম, চিনির সহবৎ ইত্যাদি বস্তু
যথা হইতে ব্যাকটিরিয়া বা গাছ লাগাই করিতে পারে।
এইজন্য বস্তুগুলিকে প্রথমে শোধান করিয়া জীবাবু শূন্য
করিয়া লওয়া হয়। তাহার পর তাহার সহিত চীমা

বসে হইতে উৎপন্ন শোথিত আগার নামক বস্তু মিশাইলে কঠিন বেশির ভাগ একটি বস্তু হয়। এই আধাংশের মধ্যে ব্যাকটেরিয়ার বীজ ছাড়া বিয়া, বাহির হইতে অল্প অবাঞ্ছিত ব্যাকটেরিয়া না আসিতে পারে এমন ভাবে ঢাকিয়া রাখা হয়। তাহার পর শুষ্ক হাড হিলেই ব্যাকটেরিয়ার চাব হয় না, উহার মস্ত ধ্বংসিহিত তাপ ও বাতাস প্রয়োজন হয়। এগুলিও বিশেষজ্ঞের জানা আছে। আধারটি পরীক্ষা করিয়া যদি দেখা যায় যে একাধিক উপনিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে তখন সেগুলিকে আলোশা করিয়া ত্রিঃ ত্রিঃ আধারে বাড়িতে দেওয়া হয়। এই ভাবে বিশুদ্ধ ব্যাকটেরিয়ার আধার তৈয়ারী হয়।

উপরোক্ত জীবাণুগুলি ছাড়া আর এক প্রধান শ্রেণীর জীবাণু আছে, যাছারা যোগের দিক হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু মাছাংশের অগ্রতম এত ক্ষুদ্র যে অত্যন্ত সূক্ষ্মশালী অণুবীক্ষণেও ধরা পড়ে না। ইহাদের বলা হয় ভাইরাস। ধান, ইন্দুরেরজা, গম্বি, পানবসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক যোগের বীজ ভাইরাস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইলেকট্রন অল্পবীক্ষা আবিষ্কারের পূর্বে ইহারা ঘোচর হয় নাই। ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে ইহাদের প্রধান তুল্য এই যে ইহাদের বীজগণ্যগণের কোন অপ্রাকৃত আধারে চাব করা যায় না। ইহারা মাত্র জীব স্বেছেই বাড়ে। বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহাদের সম্বন্ধে মানা কথা জানা গিয়াছে। তাহাতে কেহ কেহ মনে করেন যে ইহারাই জীব ও অজীব

পদার্থের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। কেননা উদ্ভিদ রাজ্যে যোগে উৎপাদনকারী কয়েক জাতির ভাইরাসকে প্রাণ-রাসায়নিক (Bio-chemist) বা কোলাসিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এভাবে কাল কোলাস আকারে স্থিতি অজীব পদার্থের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বলা হইত। আবার ইহাদের রাসায়নিক গঠনও অনেক ক্ষেত্রে স্থির করা গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে ইহারা সম্পূর্ণভাবে নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনে গঠিত। জীব কোষের অনন্যোক্ত্যের মধ্যে যে নিউক্লিয়াস (কেন্দ্র) থাকে তাহার বিভাজনের সময় কতকগুলি ক্রোমোসোম নামক বস্তুর উৎপত্তি দেখা যায়। এইগুলি জিন নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুযারা গঠিত। প্রজনন বিভাজন বর্তমান সিদ্ধান্ত হইল যে জীবকোষের বিশেষ বিশেষ ধর্ম এই জিনের দ্বারা বিয়াই পুরুষাঙ্কক্রমে সঞ্চারিত হয়। ইহাদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহারাও নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত। আরও অনেক পরীক্ষার দ্বারা গিয়াছে যে ভাইরাস ও জিনগুলির মধ্যে অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে। ভাইরাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরও বাড়িলে হয়ত অজৈবপদার্থ হইতে জীবনের সৃষ্টির সম্ভবতার উদ্ঘাটন সম্ভব হইয়া আসিবে। কেননা জীব প্রজননের মূল অঙ্গ-জিনদের জীবন কথাও তাহা হইলে অবিকল স্পষ্ট হইবে। তবে এখনও ভাইরাসকে জীবনের পূর্বের অবস্থা বা জীবের সহজতম রূপ বলা যায় না, যেহেতু ইহাদের অভ্যন্তর মস্ত বিশেষ অঙ্গুষ্ঠ অবস্থা ও পরিধৃতির প্রয়োজন।



জীবনের ক্রমবিকাশ

বিমল বে

(পূর্বাহ্নরতি)

কোনো কোনো প্রজাতির ভিতর দেখা গিয়াছে, দুই একটি শুক্রাণুর ভিতর একঝোড়া X ক্রোমোসোমই বর্তমান, তবে উদ্ভাবের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট অথবা আকৃতিতে স্বাভাবিক X ক্রোমোসোম হইতে অন্তর্ভুক্ত। এই অস্বাভাবিক ক্রোমোসোমটির নাম দেওয়া হইয়াছে Y ক্রোমোসোম। Y ক্রোমোসোমযুক্ত শুক্রাণু দ্বারা নিখিল ডিবাণু পুং-কৌশল গঠন করে। বর্তমান সময় পর্যন্ত ডিবাণু এবং শুক্রাণুর এই যে ক্রোমোসোম সম্বন্ধীয় বিচিত্রতা তাহা নানাপ্রকারের পোকা, মাছ; দুইপায়ীদিগের মধ্যে—ইঁদুর, ঘোড়া, আপোসাম, বিড়াল, বানর এবং মানুষ, বহুপ্রকারের পাখী, গরীষ্প, উভচর মাদুজীক শরকী এবং আরও বহুপ্রকারের প্রাণী এবং উদ্ভিদের ভিতর, ডিম্বকোষ এবং শুক্রাণুর এই ক্রোমোসোমের বিচিত্রতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাদের সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে—পুং জাতির জনন কোষের ভিতর একটি মাত্র ক্রোমোসোম বর্তমান এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রেই অর্ধেক শুক্রাণুর ভিতর একটি করিয়া ক্রোমোসোম থাকে—অপর অর্ধেকের ভিতর ক্রোমোসোম থাকে না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পাখি, প্রমাণিত এবং যথ নামক দুই এক প্রকারের পতঙ্গের ভিতর এই সাধারণ নিয়মের ঠিক উল্টা হাল দেখা যায়। ইহাদের জী জাতির জননকোষের ভিতর একটি X ক্রোমোসোম বর্তমান। অপরদিকে পুং জাতির জননকোষে একঝোড়া X ক্রোমোসোম রহিয়াছে। কল বস্ত্রপ ইহার অর্ধেক ডিবাণুর ভিতর একটি করিয়া X ক্রোমোসোম স্থান পায়। অপর অর্ধেক কোনো ক্রোমোসোম থাকে না। অপরদিকে প্রত্যেকটি শুক্রাণুর ভিতরই একটি করিয়া X ক্রোমোসোম থাকে। এই দুইটি পতঙ্গের জনন পদ্ধতিতে তাই ডিম্বকোষই ভবিষ্যৎ সন্ততির লিংগ ঠিক করিয়া দেয়। এই দুই ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সন্ততির লিংগ নির্ভর করিতেছে, কোন ডিবাণু (X ক্রোমোসোম যুক্ত অথবা

X ক্রোমোসোমহীন) শুক্রাণু দ্বারা নিখিল হইল তাহারই উপর। এই ব্যাপারেই বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে পতঙ্গ প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রকারের পতঙ্গই সাধারণ নিয়ম নানিয়া চলে, কেবল মাত্র এই দুইটি ক্ষেত্রেই এই বৈপরীত্য দেখা গিয়াছে। এইখানে বলা প্রয়োজন যে সন্ততির লিংগ নির্ধারক ক্রিয়ার সাথে সাথেই নির্দিষ্ট হইয়া যায়—এই সত্য আমাদের যমজ সন্ততির জন্য সখ্যে অঙ্গ কিছুর আভাস দেয়। অনেক সময় দেখা যায়—দুইটি শিশু এক-বারে জন্মগ্রহণ করে এবং উদ্ভাবের শারীরিক গঠন দুইটি সহোদর ভাই খোনের চেহারার মধ্যে যতখানি মিল আছে, তাহা হইতে অধিক এক বকম মনে। এইগুলি আদ্যন্ত যমজ সন্তানই নহে। কোনো কোনো সময় একই সময় দুইটি ডিম্বকোষ (সাধারণভাবে একটি ডিম্বকোষই একবারে মানবদেহে পতিত হয়) ওভিডাক্ট বাহিয়া জরায়ুতে আসিতে পারে। পতিতক হইয়া জরায়ুতে আসিয়া পড়ে এবং এই দুইটিই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকশিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দুইটি দেহ গড়িয়া ওঠে। এক সময়ে দুইটি শিশুর জন্ম হইলেই যমজ বলা চলে না। বাস্তবিক দুইটি শিশুর শারীরিক দাবুজ এইরূপ থাকিবে যে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চেনাই যায় হইয়া পড়িয়াইবে। এই প্রকারের যমজ শিশু হইবার কারণ হইতেছে—জাইগোটটি একবারে প্রথম অবস্থায় যে কোনো কারণেই হউক ভাঙিয়া দুই ভাগ হইয়া যাওয়া। এবং তাহার পর ঐ বিধা বিকস্ক জাইগোট ভিন্ন ভাবে দুইটি দেহ নিয়া গড়িয়া ওঠে। পূর্ব কথিত দুই প্রকারের যমজের ভিতরে, প্রথম প্রকার যমজ, শুক্রাণুর বকম অনুসারে দুইটি ছেলে অথবা দুইটি মেয়ে অথবা একটি ছেলে এবং অপরটি মেয়ে, এই তিন প্রকারের হইতে পারে। দুইটি ডিবাণুই যদি X ক্রোমোসোম যুক্ত শুক্রাণু দ্বারা নিখিল হয় তবে দুইটি শিশুই মেয়ে হইবে, দুইটি ডিবাণুই যদি X ক্রোমোসোম বিহীন শুক্রাণু দ্বারা

নিবৃত্ত হয়, তবে শিশু দুইটিই ছেলে হইবে এবং ডিম্বাণু দুইটিই একটি X ক্রোমোসোম বহুল অপগতি X ক্রোমোসোমহীন গুত্রাণু দ্বারা নিবৃত্ত হইলে শিশু দুইটিই একটি হইবে মেয়ে, অপগতি হইবে ছেলে। দ্বিতীয় প্রকারের যখন শিশু দুইটিই কিন্তু একই লিংগ বিশিষ্ট হইতে বাধ্য হয়। ইহারা দুইটিই ছেলে হইবে নয় দুইটিই মেয়ে হইবে। এর কারণও খুবই পরিচর। আমরা জানি নিবৃত্ত ক্রিয়ায় সাধে সাধেই নবজাতকের লিংগ ঠিক হইয়া যায় এবং তাইগেটই হইবেহে প্রত্যেকটি নবজাতকের প্রথম রূপ। তাইগেট যখন গঠিত হইয়াছে তখন উহার লিংগও নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে। এই তাইগেট দুই ভাগে ভাগ হইয়া তিন তিন ভাবে দুইটি দেহ গঠিত হয় বলিয়াই দ্বিতীয় প্রকারের যখন একই প্রকারের হইতে বাধ্য।

দূর কল্পনা—বর্তমানে আমরা এমন অনেক কিছুই দেখিতে পাইতেছি এবং জানিতে পারিয়াছি, যাযা একদিন মানুষ কল্পনাও করিতে পারে নাই, এই কথাও যেমন সত্য, আবার বর্তমান, অতীতকে ভিত্তি করিয়াই ধাঁড়াইয়া আছে, এই কথাও সেইরূপ সত্য। মানুষের জ্ঞান ও বিজ্ঞান একটানা অঙ্গুর হইয়া চলিয়াছে। গত দিনের অঙ্গুর বর্তমানে পূর্ব ভাবে বিকশিত হইতেছে আবার অন্যদিকে দিনের পূর্ণতা বর্তমানে অঙ্গুরিত হইতেছে। তজ্জ্বতে হয়ত এমন অনেক কিছুই হইবে যাগর আভাস এখনও বর্তমানের পৃষ্ঠাক আঙ্গোভিত করে নাই। সেই সমস্ত অঙ্গুরিত হইতে নয় আবিষ্কার সম্বন্ধে আমরা আশা সম্পূর্ণরূপেই ক্ষম। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের পটভূমিকার ধাঁড়াইয়া অদূর ভবিষ্যতের বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা একটা কাল্পনিক ছবি আঁকিতে পারি। পূর্ণ অধ্যায়ে সন্তানের লিংগ নিশ্চিত হইবার যে কারণ আমরা দেখিয়াছি তাহাতে স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্ন মনে উত্থাপন হয়—আমরা কি আমাদের সন্ততির লিংগ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি না? আশা প্রাণিবিজ্ঞান এবং পৈল্য তিকিংলা-বিজ্ঞান এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, আমাদের মনে এই প্রশ্ন ভাঙ্গা খুবই স্বাভাবিক, যদিও বর্তমানে আমাদের ইহার উপর কোনওই হাত নাই। ইহা সম্পূর্ণ রূপেই, যে গুত্রাণু ডিম্বাণুকে নিবৃত্ত করিবে তাহা

ক্রোমোসোম-সঙ্কর উপরই নির্ভর করে। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের গতি যেখান মনে হয়, এই বিষয়ে মানুষের অক্ষমতা হয়ত অদূর ভবিষ্যতে দূর হইবে। অদূর ভবিষ্যতে একদিন হয়ত মানুষ তাহাও ভবিষ্যৎ সন্ততির লিংগ নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইবে। তাহাও সেদিন ইচ্ছাশূন্য হইলে অথবা যেহে সন্তান উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে। যে পরে আমাদের এই আশা পূর্ণ হইতে পারে তাহার একটি সুন্দর ধারণা আমরা H. G. Wells, J. Huxley এবং G. P. Wells-এর কাছ হইতে পাই। আমরা জানি যে একটি গুত্রাণুর মস্তক কতগুলি ক্রোমোসোমের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে। ক্রোমোসোমগুলি প্রোটোপ্লাজমের পাতলা স্তরীয়া দ্বারা খুব শক্ত করিয়া আটকান থাকে। আমরা আরও জানি যে খুব অল্প দুই একটি ক্ষেত্র বাহ্যে গুত্রাণুর অর্ধেক X ক্রোমোসোমবহুল থাকে এবং অপর অর্ধেক ক্রোমোসোমহীন থাকে। কেবলমাত্র দুই একটি গুত্রাণুর ভিতর দুইটি X ক্রোমোসোম থাকে। তাহাও ভিতর আবার একটি থাকে স্বাভাবিক অপগতি প্রায় সব ক্ষেত্রেই ছোটো অথবা বিকলাংশ হয়। আমরা জানি এই ক্রোমোসোমগুলিকে Y ক্রোমোসোম বলে। এখন স্বাভাবিক ভাবেই এই দুই প্রকারের গুত্রাণুর ভিতর X ক্রোমোসোম বহুল গুত্রাণুগুলি, X ক্রোমোসোমহীন গুত্রাণুগুলি অপেক্ষা আকারে বড় হইবে কারণ X ক্রোমোসোমবহুল গুত্রাণু-গুলিতে একটি ক্রোমোসোম (X ক্রোমোসোমটি) বেশী থাকে, X ক্রোমোসোমহীন গুত্রাণুগুলি অপেক্ষা, এবং এই ক্রোমোসোমটির যেহে বহুটুকুই হইতেছে দুই প্রকারের গুত্রাণুর ভিতর আকৃতিগত বিভিন্নতা দ্বারা বহুপ্রকারের পোকামাকড় বাহ্যে বহুপ্রকারের ছপাটী প্রাণীর গুত্রাণুর ভিতর (ইহাধিকের মধ্যে মানুষও আছে) প্রমাণিত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ হল্য হাইতে পারে যে মানুষের গুত্রাণুর X ক্রোমোসোম বহুল গুত্রাণুগুলির মস্তক লম্বা অঙ্গগুলি হইতে কিছুটা বড়। এই আবিষ্কার ভবিষ্যতের একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বারা উজ্জ্বল করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ করিয়াই হয়ত একদিন মানুষ তাহার ভবিষ্যৎ সন্ততির লিংগ ইচ্ছাশূন্য ঠিক করিয়া দিতে পারিবে। স্বাভাবিক ভাবেই ইহা

আমরা যদিও সইতে পারি, ছই প্রকারের শুক্রাণুর ভিতর বর্ণন আন্তরঙ্গত বিভিন্নতা বর্তমান তখন ইহাধের প্রতি একই পারিপাখিক বিভিন্ন বেগলক্ষণ হইতে বাধ্য। এই সত্যকে অবলম্বন করিয়া এমন সত্তা আবিষ্কার করা অসম্ভব নহে বাহ্য বাহ্য; এক প্রকারের শুক্রাণুকে অন্তর্গত হইতে বাছিয়া বাহির করা সম্ভব হইবে। যদিও বিবর্তনটি মোটেই সহজ নহে তবুও আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ইহা সম্ভব হইবে। মানুষের বেলায় যে ক্রমিক নির্দিষ্ট ক্রিয়া সম্ভব তথ্য প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। Abbe Spellanxani অষ্টাদশ শতকে প্রথম এই প্রকারের নির্দিষ্ট ক্রিয়া ফুকের এবং বিজ্ঞানে উপর প্রয়োগ করিয়া কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলেন। বর্তমানে কুনিয়া এবং অন্যান্য যেন এই প্রকার বোড়া এবং মেঘ ব্যবসায়গত ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত একদিন শুক্রাণু বাহ্যই করিবার যন্ত্র বাহির হইবে এবং বর্তমানে যেমন নানাপ্রকার ব্যাক্টেরিয়া পূর্ণ এ্যামপুল বাহ্যের কিনিতে পাওয়া যায় সেইরূপ বিভিন্ন প্রাণীর শুক্রাণু পূর্ণ এ্যামপুল বাহ্যের কিনিতে পাওয়া যাইবে। বর্তমানে যেমন ব্যাক্টেরিয়া পূর্ণ এ্যামপুলগুলির উপর চিরকুট লাগান থাকে—টাইকড কাল—কলো কাল ইত্যাদি; সেইরূপ শুক্রাণু পূর্ণ এ্যামপুল-এর উপর চিরকুট লাগান থাকিবে—অষ্ট্রেলিয়ান ডাল বোড়ার X ক্রোমোসোম বুদ্ধ অথবা X ক্রোমোসোম-হীন; মেক্সিকোর ভাল খেচর X ক্রোমোসোমবুদ্ধ অথবা ক্রোমোসোমহীন শুক্রাণু ইত্যাদি। এই সমস্ত শুক্রাণুপূর্ণ এ্যামপুল কিনিয়া লইয়া বাইরা প্রত্যেকেই তাহার নিজের ঘূড়িকে অথবা মেয়াকে গর্ভবতী করিয়া তাহার ইচ্ছাপ্রযায়ী পুং অথবা স্ত্রী সন্তান উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইবে। ইহাই যদি সত্য হয় তবে ইহার ক্রমোপত্তির কল আমরা যে ইচ্ছা করিলে মানুষ ভাতিরও ভবিষ্যৎ সন্ততির যেরূপ এবং ছেলের সাধ্যা নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হইবে সে বিষয় কোনো লক্ষ্য নাই। বর্তমানে পব পর কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা pure biology লইয়া আলোচনা করিব।

উচ্চতর প্রাণীর সাধারণ লক্ষণ (General Character)—উচ্চতর প্রাণীদের সামান্য লক্ষণগুলিকে

হয় তাপে ভাগ করা গেল—(১) ইহাধিগের পাচের চর্চ প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই আবহবর্তী এবং গ্রহণীয়। প্রাণিবিজ্ঞা বর্তমানে একরূপ নিয়মিতরূপে প্রমাণ করিয়াছে যে উচ্চতর প্রাণী সর্বপ্রথম “লাল বাস্তু প্রস্তর যুগ” (Red sand stone age) পৃথিবীর যুগ দেখা দেয়। এই যুগকে ডেভন যুগও বলা হয়। কিন্তু আদিমতম উচ্চতর প্রাণীর সাক্ষ্যের পরিচয় আমাদের কেবল মাত্র পাথের ছাপের উপর নির্ভর করিয়া হিতে হয়। কেবল মাত্র “কারবনিকেরাস যুগে” যে সময় করল্যা দেখা দেয়, সেই যুগে ইহাধের সম্পূর্ণ রূপ আমরা দেখিতে পাই। ইহাধের ষ্টিগোসেফালি (stegocephali) বলা হয় এবং ইহাধের অনেকগুলি বিবর্ত দেখা বিলিষ্ট ছিল। ষ্টিগোসেফালি মেসোজোইক (Mesozoic) যুগের প্রথম দিকেই সমস্ত লুপ্ত হইয়া যায়। ষ্টিগোসেফালিই হইতেই চতুষ্পদ মেসুর্ভী প্রাণিবিধের মধ্যে সর্বপ্রথম। ইহাধের কোনো কোনো ধলের পর্বতের মাথার সমান মাথা ছিল। খুব সম্ভব ইহাধের পূর্ব পুত্রস্ব ভাইতেছে বিপিডিয়া নামক আদিম যন্ত। এই ষ্টিগোসেফালি নামক উচ্চতর প্রজাতিই খুব সম্ভব আবার সর্পিং প্রজাতির পূর্ব পুত্র। বর্তমান উচ্চতর প্রজাতিক কটিক প্রজাতি বলা যাইতে পারে। বর্তমান যুগের উচ্চতর প্রাণী ভেক্স, গোরিকা, শিবগিটা প্রভৃতির সহিত বড় বড় ষ্টিগোসেফালি যেরূপ তুলনা হইত তাহা হইতে উচ্চতর করিষ্ণু প্রজাতি না বলিয়া পারা যায় না। যদিও আপানের একপ্রকার শিবগিটা পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি এবং আফ্রিকার একপ্রকার ভেক্সের পাঁচ ইঞ্চি এবং পেছনের পা দুইখানা আকড় পাঁচ ইঞ্চি মোট ৮ ইঞ্চি পর্যন্ত বড় হয়। কিন্তু ইহাধের সাধারণত দেখা যায় না এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে ইহাভাও হয়ত লুপ্ত হইয়া যাইবে। আর এই দুইটি হলও বর্তমান সর্পিংযুগের, যেমন নাকি কুম্ভীর, বড় বড় ষ্টিগোসেফালির তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র বলিতে হইবে।

বাণী ও ব্যাপ্তি

নুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত

পূরণ সহস্র চাক। বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে তার
অবস্থান। দৌড় করতল, শরীর পবনপূত। উদীয়ন্ত
সে নদীর বাহি আত আত অনাবিল নদে, পেয়ন্ত নদে।
শ্রোতবহা হস্তে আত ব্যাধির বহা। তীরে তীরে তার
প্রাণহীন অট্টালিকা। জীবিকা শিল্পের (Industrial
factories) বৃহৎ বৃহৎ ভবন। নাই তার তীরে সমীপ
সবুজ দ্বিত তরুবাণি, নাই তার জলে ঢকল ঢকপত্রে ঢকল
ছায়া। নাই সৌন্দর্য শিল্পের নিহর্ষন। সে নদীতে চলে
অবগাহন—কিন্তু বেধে হয়ন। অমলিন, বস্ত্র চলে না গুল।
জলে তার তেলে আসে আবর্জনা—কারখানার পরিভুক্ত
উচ্ছিন্ন (refuse)। তার দুই কলপনি আর স্রুত হয় না—
তাও হুং যায় যত্নের কঠোর বর্জনার গর্জনে! নাই তাতে
পিপাসার বাহি, নাই তার তীরে নির্জন শান্তি। তার পবন
নয় ক্রান্তিহারা—সরস তার মানচিত্র।

বাটে-বাটে তার আর ধোণা যায় না করুণাক্রপণী
সৌন্দর্যশালিনী স্নেহময়ী নারীত্বের জল আহরণ—দে জল
নয় পিপাসাহারিণী, অত্যন্তের ভাবনশালিনী। সমগ্র
সমাজের সকল একসাথে সানুহিকভাবে নেয় না তার
জল, সব নারীরা মিলেমিশে কলহান্তে পড়ে ভঞ্জন আর
নিবিল গতিময় চরণে।

স্রোতের আত অচল। তাতেও আত নাই সকলের
সমবেত জীবন নারীমাতা, নারীবধু, নারী-তপিনী—নারীই
হিস্ত পিপাসার বাহি, করত স্নেহময় পরিবেশন। সে
আহরণ ছিল (socialistic) আত তার ভাবনাগা লুপ।
সে আহরণ আত হয়েচে ব্যক্তি কেন্দ্রিক (Individualistic)।
আত আর নয় সববার সিদ্ধ (co-operative) আত
হয়েচে প্রতিযোগিতাক্রম (competitive)। জীবন
হতে জীবন আহরণের উৎসকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তারপরে
চাই বাট্টে ও সমাজে সানুহিকতা (socialism)। তাইতে
দেখি সমাজিকতাবাদ সোকেয় দুখে—ব্যবহারে দেখি চরম
ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা।

সহরে যেখানে মানুষের ঘন সমাবেশ—সেখানে জীবন
আহরণে নাই মিলন। আছে দ্বন্দ্ব ও কোলাহল। যে জল
ছাড়ুক জীবন অচল সেই জল নিজেই দ্বন্দ্ব, জীবনে আসবে
কোণা হতে মিলন?

আত বাহির উৎস নলের কূপ ও কলের নল। এরা

তো জলসঙ্গ নয়—এরা সকলকে এক সাথে জল বিতে
পারে না—ধেয় না।

এদের হান তো। সানুহিক নয়—ব্যক্তিকেন্দ্রিক।
এদের হান তো বিপুল উৎসারও নয়—এদের হান সীম
স্বাভাব। এদের হর্ষন তো বিপুল প্রগতির নয়, এদের হান
তো সীমার দ্বারা সীমায়িত। এদের দানে নাই ব্যাপকতা—
চোখের ভূগ্নিকারকতা। এর দ্বারা পণ্ডিত—কণিকের
পরিচিত।

উষার সিদ্ধতার অপরাহ্নে ছায়া ঈউলতার সূর্যবধন ঘন
থাকে মিলনোদ্বৈ তখনই সেকালে নারীরা যেতেন হল
বৈধে বাহি আহরণে। সিদ্ধ পরিবেশে সিদ্ধতার ছিল
ভাঁঘের কলকলন, অবশর ছিল বেধ ও মনোনিমোহন। সে
যেন ছিল সরোবরে ও নদীতীরে কাব্যলক্ষীর সমীপ নদীত
ও রূপশালিত্য। গতিতে ছিল চলিত; ছন্দ, বেধে কুটে
উঠত ভূগ্নির সৌন্দর্য।

প্রত্যতে চাকার কলের তলার, বৈকালে জলের আশার
দেখি প্রতিদিন নারীর সমাবেশ। কোথায় মনের স্থিরতা,
কোথায় মনের আশ্রয়। গতি ভাঁঘের অশব্দপ্রস্রুত, বাক্য
ভাঁঘের ছন্দোহীন রুদ্র, প্রয়াস ভাঁঘের বন্দুলক—অবশর
ভাঁঘের বিহবল। কে কাকে বিজিত করিয়া আপে বাবে, কে
আপে জল ভরিবে, কে কাকে কত কঠোর তাবা প্রয়াস
করিবে তাহাই প্রচেষ্টায় দেখি বৃহৎ প্রত্যাহার ও রৌদ্রহীন
অপরাহ্নে সকল শান্তি অন্তর্হিত। বাহির সিদ্ধতার
দ্বাবে সামঞ্জস্যহীন নারীর রৌদ্রমুষ্টি এবং বিষবহুট
রোষ।

এই রৌদ্র বিষবহুট বাহির আহরণে নারী আত সমাবে
দেখি শান্তির পরিবেশন। মিলনের প্রান্তরে যার কণ্ঠ—মধ্যে
যার কঠোর স্বর্ষচাকল্য—অপরাহ্নে যার কোলাহল—তার
পক্ষে কেমন করে আসবে সমাজতন্ত্রতা? মনের দ্বন্দ্ব
যেখানে অস্বস্তির কর্মের তত্ত্ব সেখানে মিলন।

নারীর সমাবেশ আর বাহির আহরণ আত সমাজে
আনিতচে সৌন্দর্যের ও সামঞ্জস্যের বিপর্যয়।

নদী বহি আবার হয় প্রাণময় জীবনের বাহন, শ্রোত
বহি হয় তার সিঁদী, সরোবর বহি হয় পেয় বাহির আশ্রয়,
তবেই ফিরে আসবে সমাজ জীবনে সমাজতন্ত্রতা। জনদুর্ভ
ফিরে পাবে মিলনের ও প্রেমের সানুহিকতা।

লেখার বিচার

ঐশ্বর্য্য রায়

[মাধা চোপে]

আমাদের দেশে লেখক যত চালাক, পাঠক তত নর তাই লেখক দেখনভাবে পাবে, যে ভাষে ইচ্ছা করে পাঠকের মনের মোড়ে সেই বিকে খোঁজার। অস্ত্র পেশার মত লেখকের পেশার যে একটা গোপন চটকদারি লোক-রঞ্জন ভাব, ভাষা ও ঘটনা আছে সে সত্য সব ব্যঙ্গাত্মক মত লেখকরা কিছুতেই প্রকাশ করবেন না। কেননা 'ব্যঙ্গ' 'ফেল' পড়বে, পাঠকরা শিখবে জিনিস ঘাটাই করতে।

মানুষের অহুত্বিত্ত্বগোচর প্রকাশ বিভিন্ন রকম। কিন্তু ধর্মী শুধুমাত্র আবেগ, ভাবানুভূতি প্রকৃতি কল্পন অহুত্বিত্ত্ব-গোচরই বস সাহিত্যের মাধ্যমে লেখকরা বেছে বেছে তুলে ধরেন তবে মাধ্যমে পাঠক সেই ভাববিশ্বলতার আনন্দভাষা হয়ে ভাবেন ও বলেন, 'আঃ, একটা উজ্জ্বলতর উপজ্ঞান, কবিতা, গল্প বা নাটক।' সেখানে পাঠকের বৃত্তিশক্তি ও চিন্তাধারাকে লেখক নিজের মননতভাবে এমনিই আচ্ছন্ন করে ফেলেন যে পাঠক অনুগতি ঘাটাই করতে তুলে যায়। কতখানি ভেজাল আবেগ, আর কতখানি স্রাকানি ভাব-বিশ্বলতা সে বৃত্তি তাঁর থাকে না। ঘটনার পর ঘটনা এমন করে লেখক সাজানেন যে পাঠক সেই ভালে লেখকের সঙ্গে এগিয়ে চলতে সাধ্যলেন। পাঠকের আপন সত্তা ও বৃত্তি, বিচার ও সংশোধনশক্তি পরে পরে ব্যাহত হয়ে সহজ পরিণতি বিস্কৃত ও কষ্টকৃত পথে ভাড়িয়ে নিয়ে চলে। পাঠক সেখানে লেখকের হাতের ক্রৌড়নক। লেখকের বৃত্তি, বিচার তার চরম মনে হয়; লেখকের চিন্তাশ্রোতে পরানী অভিজ্ঞানে পাঠক ভেঁতা সমালোচক বনে যায়।

একথা সত্যি, লেখক বাণীন চিন্তা ও সংস্কারমূলক আদর্শবাহী মতবাদের প্রচার সাহিত্যের মাধ্যমে করে থাকেন। কিন্তু একথা আরও সত্যি, সব লেখকই যে আদর্শবাহী সংস্কারমূলক ও আত্মরোষণমূলক এমনও নয়। সেটা নির্ভর করে প্রত্যেক লেখকের স্বীয় পরিবেশ এবং সন্তোষ চিন্তার অস্থিহীন আত্মবিক্রান্ত ও সন্তোষের উপর। সুতরাং লেখক বা তেবেছেন পাঠক সেপথে না তেবে যদি একই

ঘটনার পরিণতি সংস্কারমূলক হয়ে অস্ত্রভাবে ভাবেন তবে সে ক্ষেত্রে লেখকের বার্থপূর্তি চিন্তা ও বোকাধির চাইতে কি বেশী আন্তরিকতার দাবী রাখে না?

মত স্বখনও এক হয় না; মানুষের চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন বলে। এ'বোধ বৃদ্ধির চাইতে নিবৃত্তি। কম থাকার দ্রুপ। কিন্তু নিবোধ থাকে কম পরিভ্রমের কাজ বলে চিন্তা-শক্তি দিয়ে বৃদ্ধি বাড়বে না সে জাতীয় লবলতার কোন বস্তুগত মূল্য নেই। মানুষের চিন্তাধারা কতখানি নীচে নামলে বৃদ্ধির মাপ কম হয় আর কতখানি উঁচু হলে বৃদ্ধির মাপ বেশী, ততখানি বৃদ্ধি দিয়ে বিচারমততা ভাবানুভূতির মুহূর্তে বড়ই কম বলে আবেগ প্রধান লেখকরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কতকগুলো বৃত্তিহীন বাহ্যে প্রবর্তন পায়-দর্শী বলে সম্মান লাভ করেন। আবেগপ্রধান বৃত্তে বৃত্তি-বৃত্তি অনড় হোয়ে পড়' যেমন অস্বাভাবিক নয়; তেমনি মনোরঞ্জন ঘটনা সাক্ষিয়ে কতকগুলো দুর্বল চরিত্র বৃত্তি করে লবললতা বাচাল প্রসংগার অধিকারী হওয়াও স্বাভাবিক।

অনেকে জানেন, অনেকেই জানে যে কোন কাহিনী হুই হয় দু'রকম উপাধানে। এক হচ্ছে, লেখকের ইচ্ছার ঘটনার অগ্রগতি ও চরম পরিণতি এবং অস্ত্র হচ্ছে, লেখকের উপস্থাপিত চরিত্রগোচর স্বীয় অগ্রতিহত গতিপথ—সেখানে লেখকের কোন হাত নেই। লেখক শুধুমাত্র চরিত্র আঁকেন সেই বিশেষ চরিত্রের চারিত্রিক পরিচয়বলী দিয়ে। সেখানে লেখক বন ঘোণ, ভাবগত মূল্যবোধ প্রয়োজন তার বড় কম। প্রথমক্ষেত্রে কিন্তু লেখক হন মুখ্য। সেখানে লেখকের ইচ্ছাশক্তি, প্রকৃতি ও পরিবেশের দায়ব কাই হচ্ছে চরিত্রগোচর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। সুতরাং এখানে লেখক অটুট স্বাধীনতা ও নিজেই আদর্শ-সর্ব্ব আবেগ দিয়ে সে সব চরিত্রের পরিচালনা করে থাকেন। এখানে ছোট বড় মানদণ্ড নেই, মান-অপমান বা বৃত্তি-অবৃত্তি প্রগ্রই ওঠে না। লেখকের কাহিনী

উত্থাপনের কুতিত্বই এখানে বড় কথা। প্রথমক্ষেত্রে লেখক বা ইচ্ছা তাই করতে পারেন; কিন্তু দ্বিতীয়ক্ষেত্রে লেখকের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, বলতে কি, লেখকের হাত এক বন্ধ প্রায় বেঁধে।

মৃত্যু-বুণা, বিরহের-দুশা, চাওরা না-পাওয়া ও অজ্ঞাত সহজ আবেগপ্রধান দৃশ্যগুলো তুলে ধরে অসম্ভব ভাবানুভূতি সৃষ্টি না করে সরলভাবেই বই চরিত্রগুলোর হৃৎ, বৈরাগ্য, বৈরাগ্য-শেষ প্রবৃত্তির প্রতিফলিত এবং দলক সংগে বহি তার মুক্তি তুলে ধরা হয় তবে কোনটার কুতিত্ব বৈধ?

এই প্রশ্নের লেখকের বই চরিত্রের অল্প একটা দিক তুলে ধরছি।

কোন গল্প বা উপন্যাসের চরিত্র দেখা যায় শুধুমাত্র 'ভাল' বা 'মন্দ' গোছের। চরিত্রের উত্থান-পতন নেই, দুইয়ের সন্ধিগোচরও অসম্ভব। ফলে সত্যজন চরিত্র চিত্রিত ও মানুষ চরিত্র প্রশংসিত। কিন্তু এই কি মানুষের প্রকৃত চরিত্র? কে বলে একটা মানুষ শুধুই মন্দ, অসম্ভব মন্দ ছাড়া শুধুই ভাল! এ দুটি ও বিচার কখনই সঙ্গলমনে পতিবেশ নয়। এ ভারতীয় চরিত্র লেখকের মুক্তিহীন ইচ্ছার প্রকাশমাত্র। প্রত্যেক মানুষের ভেতর দুইয়ের সংমিশ্রণ। এবং এই সংমিশ্রণ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ও ভিন্ন কার্যকারণে বৈশাঙ্গে যখন হয় সেই চরিত্রের মনস্তত্ত্বের উদ্ভাসিত হওয়ারই সাধারণ কারণ ও মানুষের চরিত্রে প্রকৃত সৌন্দর্যই থাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য, মানুষের দুর্বলতাকে গোপন রেখে, ইচ্ছার চাইতে চলমান সামাজিক প্রথাকে প্রোথিত দিয়ে কেন্দ্রীয় ভাল চরিত্র ও স্তম্ভ ইংগিত লেখক জানতে চান সেকথা ঠিক সহজ হয় না। একজ্ঞ কষ্টমি জানি, তাই একাঙাই সাহিত্যের ধর্ম ও প্রকৃতি। লেখার যা ভাল হয় শুধুমাত্র সেটা নিয়েই তার কুতিত্ব হয়। সত্যমত সত্যিকারী হামেলস পাঠকের প্রিয় ও আশীর্ষ চরিত্র বটে; কিন্তু ভাষাতত্ত্বের মূলীয়াধীকৃত পরিণত বয়সের চরিত্র-চিত্রণ তার চেয়ে সত্যমত প্রকৃত পাওয়ার উপভূত, তথা সাহিত্যে নিতৌল কুতিত্বও বটে। হরকান্ত-মনের উত্থান-পতন, বক্তব্য, কল্প মুক্তিই সাহিত্যে বাস্তবিক মূর্খির সার্থক জ্ঞাপন। পাঠকের মনে প্রশ্ন ও বিচার আনতে হবে, তার নিজেকে নিজে চেনবার স্বাধীন করে দিতে হবে।

এর চেয়ে বড় দিগন্ত লেখা যায়, কোন নির্দিষ্ট চরিত্রের পারিপার্শ্বিক ও বিপত অবস্থার বিচার অভাব। যার ফলে উক্ত চরিত্র কেন যে বণিত ভগিন্যার বিদায় করছে বোঝা

যায় না। যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, বস্তু সময় ও নির্দিষ্ট পরিবেশের ভিতরে একটা। পূর্ণাঙ্গ চিত্র ও চরিত্র একে তোলাই লেখকের কাজ তবে স্বীকার করে লাভ নেই যে সে পথ হাতে বিচ্যুতদের সংখ্যাই বাঙালি সাহিত্যে বেশী। যে চরিত্র বা পরিবেশ সৃষ্টি হোল তার পিছনের ঘটনা কি ও কেন, সে প্রশ্নের উত্তর প্রায় সব কামিনী-কাহ্নের লেখার অঙ্গুপস্থিত। বস্তু চিত্রে যে মানুষটাকে দেখছি ধানিক বা মাভাল, সুখী বা অসুখী, হাতে-লাভে বা অন্তঃবেদনার মর্জিত তার মূল কাহ্ন কোথায়? কোন উপাধানে কেনন অবস্থার পিছনের জীবন আভ্যন্তর পরিণতির সর্বক ভগিন্যার সহায়ক?

লেখার বিচার করতে বসে এইসব অসম্ভব প্রশ্নের সমাধান চানার ভজ্ঞে চাই মুক্তিবাধী লেখক। লেখাটা শুধু প্রশ্নের আবেগের বন্ধনহীন প্রকাশ না হয়ে চরিত্র বিশ্লেষণের ব্যতীে শাসাণো অজ্ঞানও বটে। আজকের প্রচলিত বর্নীর, সামাজিক ও রাজনৈতিক অনেক ব্যাখ্যা ও সংস্কার হরতো বিরোধিতা করবে। কিন্তু কে না জানে শুধুমাত্র প্রশ্নটি পাওয়া বা সমর্থন জানানোর কাজ সাহিত্যের নয়। যদি প্রশ্নোত্তর হয় এই ভজ্ঞে অনেক কিছু প্রথা স্বীকার করতে হবে;- হরতো লেখার 'মায়া' বাঁক ঘুরে ঘুরে দীর্ঘ অসম্ভব উজ্জ্বল পথ বেয়ে মূগোপযোগী সামাজিক ব্যবস্থাকে সঙ্গল করে তুলতেও লেখকের বিচা-পূজ্য হোতে হবে। কেননা সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথা অঙ্গল ও পূরণ হয়ে যায়, কিন্তু মূগু মূগু পরিবেশ পরিবর্তন মনের নীতি ও প্রথার মূলমত আগে গই কি।

লেখকরা তত্ত্ববিদীকাঁবার থাকবে যতদিন অগতর্ক পাঠকরা সাহিত্যে নিজেদের মূল্যবিচার না জানবে। সাহিত্য পাঠকের কাছে শুধু মূগুর 'মরফিয়া' ও মূগু বা ভ্রমপথে চিত্রবিনোদনের অস্ত্র সঙ্গী নয়। মৃত্যুমুখে তরল চিত্র পাঠকের চোখে জল আনা বস্তু সহজ, বৈরাগ্যন জীবনে মৃত্যুবেশ মনের মৃত্যুমুখ তুলে ধরা তত্ত্ব কঠিন বসেই লেখকরা সত্য ও কল্পনিক দৃশ্যে জানিয়ে এবং বাস্তবতার সহজ অঙ্গুভূতিগুলো বেশ কুশল হাতে বাংলা সাহিত্যে পরিবেশন করতে লেগেছেন। এমন করে সাহিত্যের উন্নতি হয় না। ভাষাবিশল পাঠক গড়ে তোলায় চাইতে কার্যকারণসমর্থবিশিষ্ট মুক্তিবাধী মানুষ গড়ে তুললে নীতির অঙ্গুহাতে বাস্তবিক অঙ্গুভূতিগুলোর হরতো এমন অঙ্গু ভূগতি নাও ঘটতে পারে।



১৯৮০

বহি-বন্যা গজেন্দ্র কুমার মিত্র

(পূর্বাহুতি)

॥ ৩১ ॥

আগাগে ফিদিয়া আনিয়া নোন্না যোদলখানার গিয়া
শান করিতে বসিল। পর পর কয়েক কলনী হল
চালিয়াও যেন মাথা ঠাঙা হয় না—অবশেষে হল কুড়াইয়া
বাইতে সে দেখানোই সেই তিরা মাথার তিরা কাপড়ে
চূপ করিয়া বসিয়া বহিল।

অজিহুয়া বহুক্ষণ দিহুর গিয়াছে, হরত এখনই করিবে।
সঙ্গে আনিবে নানার পরোগোনা অথবা স্বয়ং নানাকেই—
বিক্রী একটা। অথাবহিহিতে পড়িতে হইবে। তাহার
উপপূর্ণি অসহ স্পর্শ্য বিরক্ত হইয়া নানা তাহাকে
কয়েক কড়াইতে পারেন। সত্য বটে নানার নিজে
হাতে লেখা নাগোতিক চিঠি তাহার কাছে আছে, কিন্তু
অজিকিতে কয়েক কথিলে সে অত্র প্রয়োগেই হরত সঘর
মিলিবে না। তবে এ সব কোন চিন্তাই তাহার মনের
মধ্যে বড় হইয়া ছিল না তখন। সে পরাক্ষিত হইয়াছে—
এবং লক্ষ্য পাইয়াছে। তাহার পরাক্ষর বটিতেছে সব
থিকেই।

সে আনিত সর্দার বা তাহার কর্ম প্রত্যক্ষ রূপেই
সমাধা করিবে—তা সে যত গহিত এবং কঠিন কার্যই হোক
না কেন—সে চত্রে সে নিজে এই প্রত্যক্ষ গ্রীয়ে বোধবা
চড়াইয়া স্ববোধবা করিয়া যায় নাই, সে গিয়াছিল
প্রতিহিংসা সম্পূর্ণ বোধবা সেই 'অভ্রম্বালা অত্রিলা
মুখ' পান করিতে, নিজের বীভৎস কীতি সন্তোষ
করিতে। কিন্তু পাবে নাই। বাড়ীটার সামান্য-সামান্য
গিয়া তাহার পা দুইটা যেন পাথর হইয়া গিয়াছিল,

কিনে যেন টানিয়া বাধিয়াছিল তাহাকে। বুব হইতে শেষ
ছুই একটা আর্ন্তনাবক কানে গিয়াছিল—এবং সেটা
টিক বিজয়ধ্বনির মত সুখবাতক মনে হয় নাই—বয়স
কানের মধ্য দিয়া মধ্যে বি'গিয়াছে, কানটাও যেন অসিয়া
গিয়াছে সে ধরে।

এ আনিবার শোণনীয় ব্যর্থতা—নিজেব কাছে নিজেব
অ-কমিত পরাক্ষর।

আহার লক্ষ্যের আগেও কারণ আছে। আজ সহসা
সর্দার বাঁর কাছে নিজেব বড় ছোট মনে হইয়াছে।
সর্দার বাঁ যখন ক্রমবাক্ত বেহে হস্তবাক্ত ততবারি লইয়া
মাতালের মত টলিত টলিতে বাহির হইয়াছে বিবিধর
হইতে, তখন তাহার হরত ছুটিয়া কাছে ঝাড়া উচিত ছিল,
প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করাও উচিত ছিল কিন্তু সে পাবে
নাই। তখন সে শুধু ব্যর্থতার এই প্রার্থনাই করিয়াছে
খোঁষার কাছে যে, সর্দার যেন না তাহাকে বেধিতে পার।

সেই লক্ষ্য তাহার কতকটা হীরালালের কাছেও।
হীরালাল তাহাকে দেবী মনে করে, আজও সে তাহাকে
পূজা করে মনে মনে—এটা কিছুদিন আগেও হস্তকর ছিল
হরত—অন্তত তাহার সুহৃৎবৎ হিংসাধ্বজের কাছে হীরালালের
মত তত্ত্বণ বালকের শ্রদ্ধা এমন কিছু বিবেচনার যোগ্য
বলিয়া মনে হইত না—কিন্তু আজ তাহার ঐ শ্রদ্ধাটুকু
তাহাকে নিজের কাছেই থেয়ে, তৃষ্ণ করিয়া, বিয়া গেল।
নিজের সেই লক্ষ্যের চতুর্থা কতকটা ক্ষুদ্র হইয়া উঠিয়াছিল
আমিনা,—আর সেই ক্ষেত্রেই তাহার কঠোরকে অকার্য্যে
রূপ ও কর্কশ করিয়া তুলিয়াছিল।

তবে কি সে তুলসী করিল ?

তবে কি তাহার দেখিন অজিতনের স্তম্ভ-বাণী
শোনাই উচিত ছিল ?

তবে কি—তবে কি সে প্রতিহিংসার নামে শুধু মান-
বীর হিংসাই এত দিন লাসন করিয়াছে মনে মনে—?

বাহির হইতে মৃদঙ্গ ডাকিল, 'মালেকান !'

কেহ দেখিয়া সে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

আমিনার মনে পড়িল, আজ মৃদঙ্গও তাহার ডোপের
দিকে চাহিতেছে না—সামনে আসিলেই মাথা হেঁট
করিতেছে।

আজ পৃথিবীর সকলেই বোধ হয় চুপায় মুখ কিরাইয়া
লইবে তাহার দিক হইতে।

আবারও মৃদঙ্গ ডাকিল, 'মালেকান !'

না না, এ কি ভাবিতেছে সে, নিজের কাছে অস্তিত্ব সে
খাটি আছে। সে মাথা উঁচু করিয়াই থাকিবে। এখন
এতটুকু মাথা হেঁট করিলে আর পৃথিবীতে সে মাথা লুকাই-
বার স্থান থাকিবে না। নিজেই যদি ছোট মনে করিতে
থাকে নিজেকে, তবে পরে যে একেবারে মাথার পা ভুলিয়া
যিবে।

সে যতদূর সম্ভব সহজকণ্ঠে সাড়া দিল, 'হ্যাঁ রে মৃদঙ্গ,
এই যে যাই !'

গা-মাথা মুছিবাত্র আর আবশ্যক ছিল না, অগ্রিম
হাতাসে সে কাপটা আপনিই সারা হইয়া গিয়াছে, এখন
তাকাতাড়ি একটা শুভ বস্তু পরিয়া বাহির হইয়া আসিল
গোললথানা হইতে।

'কী রে ? বাঁ সায়েব এসেছেন ?'

'না।' কতকটা অজ দিকে মুখ কিরাইয়া লুকাই দিল
মৃদঙ্গ, 'বাঁ সায়েব আর পেশোয়া দুজনেই নাকি
আসছিলেন, এক জন সাত্তী বেছেছে—কিন্তু তাঁরা এখনও
এসারে আসেন নি। হরত—।'

সে চুপ করিয়া গেল।

হরত চরম সংবাদ পাইয়া অনর্থক বোঝেই আর আসেন
শাই।

আমিনা মনে মনে একটা স্বপ্নের নিঃশ্বাস ফেলিল।

ভয় ? না ভয় নয়। ভয় আর তাহার কাহাকেও

নাই, কিছুতেই নাই। প্রাণের ভয় সে কোনদিনই করে
না—এখন আর কার্য অনস্বীকার্য থাকিবার ভয়ও নাই। কে
আনে কেন, আজ ধীরেধীরে উদ্বেগটাও যেম পেছে
ছুটাইয়া।

ভয় নয়—বিবর্তিত। এখন এই স্তম্ভ বেহ-মন লইয়া
যে কতকগুলো কথা-কাটাকাটি করিতে হইল না, তাহাতেই
সে বাঁচিয়া গেল।...

মৃদঙ্গের বেগুলা সরব পান করিয়া আমিনা অনেকক্ষণ
তাহার শব্দ্য পড়িয়া বহিল মড়ার মত। বরের আব-
হাভা আশুন হইয়া উঠিয়াছে, বাহিরে একটু ঠাণ্ডার
কোথাও বসিতে পারিলে হইত—কিন্তু সেটুকু উজ্জ্বলও
যেন আর শক্তি অর্থাৎ ছিল না। যামে জামা বাসিন
ভিজিয়া উঠিল ক্রমশ—তবে তাহাতে কোন অসুবিধা
হইল না। কিছুতেই আর তাহার কোন অসুবিধা হইবে না।

অনেকক্ষণ পরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবারও করেক-
দণ্ড পরে সে উঠিয়া বসিল। বোধ করি মৃদঙ্গ কাছের
কোথাও ছিল, তাহার উঠিয়া বসিবার শব্দ পাইতেই
একটা আলো হাতে করিয়া দর চুকিল।

'মৃদঙ্গ শোন্। কাছে আর।' দেহমাথানো কোমল
কণ্ঠে ডাক দিল আমিনা।

মৃদঙ্গ কতকটা কাঠের মতই নিঃশব্দে কাছে আসিয়া
পাঁড়াইল। আমিনা হাত বাড়াইয়া তাহাকে টানিয়া
একবারে পাশে বসাইল। 'মৃদঙ্গ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া
বসিল। না কাহা নয়—বোধ করি তাহার নিজের মনো-
ভাব মালেকানের কাছে ধরা পড়িবার ভয়ই লক্ষ্য।

পাট-কণ্ঠে আমিনা করিল, 'মৃদঙ্গ, অনেকদিন দুই
আমার সঙ্গে আছিল, স্নেহে দুঃখে দ্বারের মত পাশে
থাকিস, বোনের মত মায়ের মত সেবা করি—কিন্তু তোর
দিকে কোন দিন তাকানো হয়নি। দুই অনেক দূর
করেছিস, আমার মত ভাইবীর সঙ্গে থেকে বহু কষ্ট
পেরেছিস।—তোর কথা আমার অনেক আগে শুনি উচিত
ছিল।'

এই পূর্ণ বসিয়া আমিনা একটু থামিল। তাহার পর
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বসিল, 'কিন্তু তা হয়নি—আজ
বরত অনেক বেধি হয়ে গেছে। তবু শোন।—আমি আর

কানপুরে থাকব না। ইংরেজ আসছে—মুন্সের একটা অভিনয় হবে—এরা ছাড়বে। হেঁদে কে কোথায় ছিটকে গিয়ে পড়বে, নামাও তখন আদাকে সঙ্গে নিতে চাইবেন না, আমারও আর থাকবার প্ররুতি নেই। তঁকে দিয়ে আমার যা বরকার নিটে গেছে। আমি, আমি এবার সজ্জা যাব। পেশোয়ার বেগম হিসেবে নয়।

বাধা দিয়া মুন্সফং কহিল, 'তখানে মহশ্বর আলি বাঁ আসছেন, না?'

'হ্যাঁ আছে। কিন্তু তাকেও আমি বিব্রত করব না। সে তার কাজ করবে আমি আমার কাজ করব। আমি আরও জবিকে, বিনীতে যেতে পারি। তার সঙ্গে বেধা না ধলেও চলবে।—কিন্তু সে কথা থাক। এবার সামনে বিবন বিপর। এবার চলছি মুন্সার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে। ইংরেজের মার খাওয়া এবার শেষ হয়ে এল, সে এবার কিরে মারতে শুরু করেছে। শেষ কী হবে জানি না—কিন্তু ইংরেজের হাতে অনেকই মরবে। আমার বিশ্বাস তাহেই হয় হবে—ওগের বাহশাহী শেষ হবে। সময় আসে নি এখনও। তবু—আমি আমার কাজ ক'রে যাব—সামান্যত ওদের প্রাণ নিতে থাকব যতদিন না ওরা আমার প্রাণ নিতে পারে। এ বিপথে আর তোকে টানতে চাই না মুন্সফং।—এখনও হয়ত সময় আছে কোনও দূর বেশে গিয়ে বাংলা বাঁধবার, সুখী যবার। তুই আমার খোঁজ করতে শুরু করেছিল, নিগনিই আমার শরত তোর অলস বেধে ধরে তাব চেয়ে তুই এখনই কোথাও চলে যা। নগর টাকা যা আছে আমার লাগবে; মুন্সফং—তুই আমার, পহনার ব্যস্ত-ভুলো নিয়ে যা বরং—তোরা কাছেই ত আছে, ততে যা আছে, অস্তিত্বের জীবন সুখে কেটে যাবে। তুই বরং আছই বাস্তব কব—কোথায় থেকে চাপ, খুব দূরে কোথাও ঠিক কর, আমি লোক বিহীন সঙ্গে, নিরাপথে রেখে অশ্রুক তোকে।'।

মুন্সফং অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহপার বলিল, 'না, তা আর হয় না মালেকান। এখন তোমাকে একা ছেড়ে দিতে পারব না।'।

আমিলা ষেংং ব্যাঙ্গলম্বর্থেই কহিল, 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত

তুই কিছুতেই আমার কাছে থাকতে পারবি না মুন্সফং! তখন বড় বিপদে পড়বি। চুপ করিদি নি।'।

'যতক্ষণ পারব থাকব। যখন একেবারে অসম্ভব হবে আমার ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব। এতকাল তোমার সঙ্গে থেকে দেখুচ্ছি তরঙ্গ কি আর হয় নি?—আমার লজ্জা ভেদ না।'।

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, কতকটা স্বপ্নোক্তির ভরীতেই আমিলা বলিল, 'তোরা যদি আমাকে পুরোপুরি খোঁজ করতে পারতিস—আমার পথ অনেকটা সহজ হ'ত। অনেক সহজ হ'ত।'।

তাহপদ সহসা উঠিয়া বাতিগানটা দইয়া স্বপ্নের পাশে রান্নিতে রাখিতে কহিল, 'তাহলে তুই সব গোহ-সাহা ক'রে নে। বা নিত্যন্ত না নিলে নয়, তাই শুধু নিবি। হ্যাঁ—আর শোন, আমার ত পিছল আছে, তুই একটা না হোক হাতিয়ার নে।—কাল তোহেই রওনা হয়ে যেতে চাই—সেই মত তৈরী থাকবি।'।

তাহপার চুপ থুগিয়া বেগী বাঁধিতে বলিল। প্রসাধনের পূর্ণাঙ্গান।

মুন্সফং বিহিত হইয়া কহিল, 'এখন আমার কোথাও যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ।'। মুন্সফংর মধ্যে অস্ত্র-বাঁজা হইয়া উঠিল তাহাব মুখ, কিন্তু সাবিত্রী বাঁধে আলোয় মুন্সফং অত লক্ষ্য করিল না।

'হ্যাঁ' বলিয়া দলটা ঘেন একটু সাব করিয়া দইয়া আমিনা বলিল, 'এক লাফগার কিছু বেনা আছে—সেইটে যাওয়ার আগে শোধ ক'রে দিয়ে যাব।'।

সে বেশ একটু হঠাৎ সবিত্রীই প্রসাধন করিতে লাগিল। অগ শোধ করিতে যাওয়ার সহিত এমন প্রসাধন পারিপাট্যের কী লক্ষ্য—এবং আমিনার নিষেধকেই বা বাইতে হইবে কেন, এমন সহজ প্রশ্ন করা বাইতে পাবিত কিন্তু মুন্সফং কিছুই কহিল না, সে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে এককাল বুঝা আমিনার সহিত বর করে নাই। বাচ্যার্থের পিছনে গূঢ়ার্থ থাকে তাহা সে জানে।

মাংসের হোকামেনের উপরতলার নিম্নের ছোট্ট ঘরটোতে চারপাইয়ের উপরে শুদ্ধ হইয়া বসিয়াছিল সর্দার বা। সে এখানে পৌঁছিতে বাহ্য চাকরটা শুধু পাইয়া বিকট চিৎকার করিতে করিতে পলাইয়া গিয়াছিল—তাৎহাতেই তাহার সন্নিবিষ্ট হইয়া আসে। নিম্নের চেয়ারটার কথা তাহার খেয়াল হয়। তাহার পর সে উপরে আসিয়া তাল করিয়া আন করিয়াছে, বস্ত্রমাখা পোশাকগুলো চুলায় দিয়া মালাইয়া দিয়াছে—কিন্তু সে সবই কতকটা ঘরচালিতের নত। হুঁশ তাহার পুরাপুরি না হোক—কিছুটা আছে। নিম্নের হোকামেনটা পোশা ছাড়া করিতেছে, টাকার পরসার বাজটাও সম্ভবত সামনেই পড়িয়া—তা সে সবই জানে কিন্তু নিচে গিয়া আবার সব বন্ধ করা বা শুদ্ধাইয়া আবার আর প্রস্তুতি নাই।

কিছুতেই যেন আর তাহার কোন স্পৃহা নাই। মাংসের হোকামেন যে আর বিতে পারিবে না—স্বস্ত্যং ও যে পাবে নিক্ত। তাহাকে এ স্থানটাও ত্যাগ করিতে হইবে—কোথায় যাইবে তাহা সে এখনও ঠিক করে নাই। সেই কথাটাই বসিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিতেছে। যেখানে হোক। যত দূরে হয় ততই ভাল।

ভাবিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কিছু যেন স্পষ্ট মাথাতে আসিতেছে না। আগলে সে যেটা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে সেটা বিগ্রহের ঘটনাটা মনে না আনিবার।

কিন্তু কিছুই হইতেছে না, শুধু যেহ নয়, মনটাও যেন জড় হইয়া গিয়াছে। হস্ত সে এক দিরা খোঁজার আশীর্বাদ, নহিলে, নহিলে সে হস্ত পাপলই হইয়া বাইত।—

সহগা সিঁড়িতে তাহার পদশব্দ হইল। খুব হাল্কা কোন পায়ে পদ—নয়সে চট টানার আওয়াজ।

এতদ্বারা তাহার এখানে কে আসে? সর্দার সোজা হইয়া বসিল।

পরক্ষণেই দৃষ্টি তাহার কোমল হইয়া আসিল।

আমিনা।

আমিনাকে দেখিলে তাহার দৃষ্টি আশ্রয় কোনদল হইয়া আসে—আজও সে তাহার নয়নানন্দ।

আমিনা সন্তর্পণে স্বার ভেঙাইয়া দিল।

কহিল, 'সিঁড়ির দরজা এখন খোলা রেখেছিল কেন রে সর্দার?'

সর্দার কেমন একটা বিরূপ ভাবে কহিল, 'খোলা ছিল?'

'হ্যাঁ। আমি বন্ধ করে দিয়ে এসেছি।'

ওড়নাটা দুই টুকরা ফেলিয়া দিয়া আমিনা কাছে আসিয়া একবারে পাশটিতে বসিল। তাহার পর সর্দারের একটা হাত নিম্নের হাতে বসে জড়াইয়া তাহার দেই হুল কঠিন বাহুল্যে নিম্নের গালটা চাপিয়া ধরিয়া আসে আস্তে আস্তে ডাকিল, 'সর্দার!'

সে স্পর্শেও সে ডাক সর্দারের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না।

আমিনা হস্ত তাহার মনের অবস্থাটা বুঝিল, তাই সে-ও আর কোন কথা কহিল না। শুধু বাহুবন্ধনটা আরও নিবিড় করিয়া, গালটা তাহার বাহুতে আরও ঘোরে চাপিয়া ধরিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হৃৎকেন্দ্রই যুদ্ধের রক্ত উত্তাপ, হৃৎকেন্দ্র দুই কারণে সম্ভবত—তবু উত্তেজিত সেই তীব্র উত্তাপ বহুস্পন্দন নীরবে অঙ্গুষ্ঠ করিতে লাগিল—কেবলই কথা বলিবার চেষ্টা যাত্রা করিল না।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে—সর্দারের মনে হইল একদুগ পরে,—প্রায় অশ্রুট পাত কর্তে আমিনা কহিল, 'সর্দার আমার আর কমা চাইবার মূল্য নেই—তুই কি আমার কমা করতে পারবি?'

এবার সর্দার কথা কহিল। তাহার যুদ্ধের মধ্যে কী হইতেছিল তাহা ঈশ্বর জানেন, হস্ত আমিনাও কিছু বুঝিল—কিন্তু কর্তে কোনদল প্রবেশ-উচ্চাস প্রকাশ পাইল না। বীরে বীরে শুধু কহিল, 'ও কথা থাক মালেকান। তোমার কোন কন্য কোনদিন আমার কাছে হ'তে পারে না।'

আমিনা তবুও অজিত ভ্রমকর্তে বলিল, 'কতটা যে করছি, কতটা জুলুম যে করা যায়, তা আগে বুঝি নি সর্দার—বিশ্বাস কর। তোমার জীবনটা হস্ত নষ্টই ক'রে দিলুম চিরকালের মত। তুই, তুই যদি এখন নিবিচায়ে আমার সব খেয়াল না মেটাও—তুই যদি আমাকে বাধা

বিত্তিস্ । তাহলে হরত একটা বিধেচনাধীন হ'তে পারতুম না !'

সর্গার তবুও কথা কহিল না । প্রমথীন বিচারধীন বিশ্বস্ত সেবার বহলে এই অস্থগেগের পুংস্কাও সে নিশ্চেষ্ট নহ কহিল । আশ সারাদিন বিভিন্ন অস্থকৃতি ও আবেগের যে ভূতান উঠিয়াছে তাহার মনে, তাহাতেই সে ক্লান্ত অবশর হইয়া পড়িয়াছে । বোধকরি এদখে সে অভ্যস্ত নর বলিয়াই আত্মও বেশী অবশর, আরও বেশী ক্লান্ত বোধ করিতেছে নিশ্চেষ্টে ।

'শোন্ সর্গার, কাল আমি চলে যাব ।'

এইবার সর্গার চেকিয়া উঠিল, 'কোথার যাবে মালেকান ? বিষ্ঠুর ?'

'না । এবার নানাসাধেবের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে পেল । কোথার যাব, তা আর তোকে বলে যাব না । আর তোকে আমার জীবনের সঙ্গে জড়াব না । তুইও হুঁর কোথাও পালিয়ে যা, ইংরেজদের বিবেক থেকে বহুদূরে কোথাও—দেশখানে গিয়ে নতুন ক'রে জীবন শুরু কর । এবার—এবার তুই বিয়ে-থা করার চেষ্টা কর সর্গার !'

সর্গার তবু নীরবে বসিয়া রহিল । আমিমা বুকটা আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়াছে তাহার বাহুতে । একান্ত নিবিড়, একান্ত ঘনিষ্ঠ । বোধ করি সেই অতীতপূর্ব অকল্পিত অবস্থাটাই অল্পভব করিতে চেষ্টা করিতেছে সে ।

আমিনা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মাথাটা সহাইয়া সর্গারের বুকুর উপর লইয়া আসিল । তাহপর কহিল, 'তোকে পুরস্কার দেবার কথা চেষ্টা করব না । কিন্তু তুই ত অল্প লোক নিয়ে গিয়েছিলি, তাহের সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকা কাল ভোরেই পাঠিয়ে দেব যুগ্মস্বত্বকে দিয়ে । তাহের দিয়ে দিল । আর তোহ—তোহ যদি কোন সরকার থাকে ত বলিস আমাকে—কোন সন্ধ্যা করিস নি ।'

'আমার নিষেধ কোন সরকারই নেই মালেকান !' এবার সর্গার উত্তর দিল । আপের মতই শাস্ত বীর ভাবে ।

'আমার কাছে কি তোহ কিছুই চাইবার নেই সর্গার ?'

বুকুর কাছেই মাথাটা রাখিয়া মুখটা তুলিয়া বসিল আমিনা, তাহার উক্ত নিঃশ্বাস আদ্য পড়িতে লাগিল সর্গারের মুখে, গালে । আমিনার ঘেহে ও কেশে প্রসাধনের

সুগন্ধ । উত্তম তাহার স্পর্শ । হলের কাছে শিরা ছুইটা ধপ ধপ করিতে লাগিল সর্গার বাহ । এমন অস্থকৃতি ত ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই ।

'তবে জাণ্ । আর হৃদয় জীবনে বেথা হবে না । যদি কিছু চাইবার থাকে—তা সে যাই হোক, বিধা করিস নি, নিঃসন্ধ্যাও বন্ !'

প্রাণপণে অন্তহিকে মূখ কিরাইয়া, পাছে এদিকে কিরিস কথা কহিতে গেলে আমিনার মুখেও যেনই নিঃশব্দ মুখের বাতাসটা লাগে—সর্গার কহিল, 'তুনি খুশী হয়েছ মালেকান, এই আমার পুংস্কার । তবে এখনও আর একটা শাধ আছে—'

একটু ইতস্তত করিয়া বেন শেষের কথাগুলি বলিল সে । 'বন্ বন্—কী শাধ !' উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করে আমিনা । এবং জোর করিয়া নিজের কপালটা সর্গারের হাড়িতে চাপিয়া ধরে ।

'তুনি এসবের বাইরে নিরাপদে কোথাও চলে যেছ, তোমার কোন ভয় নেই আর—এইটে জানতে পারলেই আমি শ্রুতী হস্তান, নিশ্চিত হস্তান ।'

অকস্মাৎ আমিনাতে দুই চোখের কোদ উপচাইয়া তপ্ত অঙ্গ উঠিল পড়িল । ঈশত পাত বিদ্যা সে সেই অঙ্গ সম্বরণ করিতে লাগিল কিছুকাল ধরিয়া । তাহপর ধরা ধরা গলায় বলিল, 'তুই আমার কথা আর ভাবিস নি সর্গার, আমি এতখানি ভালবাসার উপযুক্ত নাই !'

তাহপর বাহ বন্ধন বিধিল করিয়া লোভা হইয়া বলিল । একটুখানি তেমনি ভাবে স্থির হইয়া থাকিয়া কহিল, 'আমার আর কেহবার, হুঁর যাবার কোন পথ নেই তা ত তুই জানিসই । যে আভন জেলেছি সে আভনে মরতেই হবে । তবু মেন ওদের হাতে বন্দী হয়ে, কানিকার্টে না মরতে হয়—যোহাও কাছে এই যোহা জানা !'

সর্গার আবারও শিহরিয়া উঠিল—সমস্ত আমিনার সমস্তা আমিই আশরা করিয়াই । স্পর্শ করিয়া না থাকিলেও আমিনা তাহা অস্থকৃতি কহিল । আবারও দুই চোখে অঙ্গ অংগা হইয়া উঠিত চার । চকিতে কানিকার প্রান্তে তাহা মুছিয়া লইল সে ।

তাহপর অনেক চেষ্টায় লব্ধ হইয়া একটু আলস্তের

তকী করিয়া কহিল, 'বজ্র ঘূষ পেয়েছে সর্গার, এখানেই ঘূষ'।

সর্গার চমকিয়া উঠিল, বিহ্বল ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কণাটাব সমাক অর্ধ উপলব্ধি করিয়াও চোঁটা করিতে করিতে কহিল, 'এখানে ঘূষকে কি ? না না— সে হয় না। জুনি বাড়ী চলো; মালেকান, আমি পৌঁছে বিজি।'

'কেম, এখানে ঘূমোলে হোষ কি ? লোকে কী বলবে ? লোকের কথায় কি এখনও আমার এসে-যায় কিছু ?'

'না তা নয়। কিন্তু এখানে এই মরলা বিছানার— হি হি। সে হয় না—মালেকান।'

'খু' হয়!' আমিনা তাহার কানিভের বোতামটা খুলিতে শুরু করিয়াছিল, এবার কানটা খুলিতে খুলিতে একটু হাসিয়া কহিল, 'জানিসই ত আমাকে। আমার খেরাল তিরদিনই মেটাতে হয়েছে তোকে, আজও মেটা। আজই ত দেখ।'

সর্গার উঠিয়া দাঁড়াইল। বিব্রত ভাবে কহিল, 'তা হ'লে জুনি ঘূষও মালেকান—আমি এই বাইরে—নির্ভীতে রইলান।'

সে বাহিরে ঘাইবার জন্ত পা বাড়াইল।

আমিনা হাত বাড়াইয়া তাহার হাতটা ধিল।

'তোত সঙ্গেই শোব সর্গার। একা শোবাব জন্ত আমি নি !'

সর্গারের অনিচ্ছুক চোখ তাহার দিকে না পড়িয়া পারিল না। সেই বেহুর্লভ অপভ্রমণ যেহ-লাবণ্যের দিকে

চাহিয়া তাহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। সে কেমন বিহ্বল অবশ ভাবে আমিনার নূহ আকর্ষণে আবার শয্যাতেই আশিয়া বসিয়া পড়িল।

আমিনা প্রায় কিশকিল করিয়া কহিল, 'তোকে আজ দেখাব আমার কিছুই নেই সর্গার—নিজেকে ছাড়া। তাকেও তোরা গুণ শোধ হবে না আমি জানি—তবু কতকটা তৃপ্তি পাব। তুই হয় ক'রে আমাকে এটুকু যে—

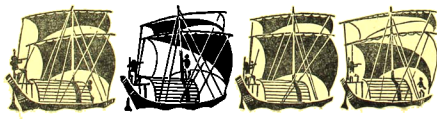
সে শয্যার উপর এলাইয়া শুইয়া পড়িল।

সর্গারের সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এরকম অল্পকৃতি কীংমে কখনও হয় নাই। মনে হইল সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিতেছে, বুকাটাও বুন্ধি কাটিয়া ঘাইবে এখনই—

তবু প্রাণপণ চোঁটার চোখ বুন্দিয়া নিজেকে সে সম্বরণ করিয়া পইল, আরও একটু ইতস্তত কবিল, তারপর হেঁট হইয়া আমিনার সেই রক্ত-কমলের মতই রক্তাক্ত কোমল পা হুটিতে অতি দস্তর্পণে, যেন তরং ভয়ে ছুটি চুখন কবিল। তাহার পর—আবেগ অদৃশ্যরূপে হওয়াতেই বোধ করি—সে সেই দুর্লভ এবং ঈপ্সিত চন্দ্র ছুটি নিজের বুকে সম্বোরে ও সহস্রে চাপিয়া ধরিল একবার। এইভাবে কয়েক বহুর্লভ নিজের এই সৌভাগ্য—দর্শকাল শোবার এই আশাতীত পুংস্কার অমূল্য বসির: সহস' সে যেন কী এক মর্মান্তিক আশাতে লাফাইয়া উঠিল।

বিব্রত গাঢ় কণ্ঠে শুধু বলিল, 'জুনি তৈরী হয়ে নাও মালেকান, আমি নিচে রান্ডার অপেক্ষা করছি।' এবং ব্যাপারটা কি ঘটিল আমিনা তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার আগেই সে ঘর হইতে, বাড়ী হইতে, ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

[ক্রমশঃ]



জীবন লীলা

কাকানাহেব কাসেলকর

অনুবাদক: শ্রীশ্রীরজন সেন

[প্রাক্তনী ভারতবর্ষে ১৯১৪ সালে আশাব পত্র হইতে কাকানাহেব কাসেলকর তাঁহার পার্শ্বকর ছিলেন। ভারতবর্ষের জীবনগ্রন্থ, নবী ও জলপ্রপাত প্রভৃতি তাঁহার মনে যখন যখন আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে তাঁহার 'জীবনলীলায়' তাহার পরিচয় আছে। 'জীবনলীলা' হইতে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি গৃহীত হইয়াছে।]

নেপালের বাসমতী

কান্দীর যখন দুঃখকা, নেপালেও তেমনি গুহ্যমতী বা বাসমতী। এতখানি ছোট নদীর প্রতি আর কাহারও দৃষ্টিও পড়িবে না। কিন্তু বাসমতী এমন এক ইতিহাস প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে লক্ষ লক্ষ যুগের যুগে তাহার নাম। নেপালের উপত্যকা অর্থাৎ আঠারো জোশ জুড়িয়া বেইনীর মধ্যে চার দিকে পাহাড়ের দ্বারা সুরক্ষিত রমণীয় অশ্রুকার ঘরঘান। পশ্চিম দিকে কচপিন্ধ নারায়ণ তাহার বক্ষক। উত্তর দিকে গৌরীশঙ্করের ছায়ার নীচে চমুনানারয়ণ উহারে সামলান, পূর্ব দিকে আছেন বিশ্ণু-নারায়ণ, এবং পশ্চিম দিকে ইচনু-নারায়ণ।

হিমালয়ের জোড়ে সমাধীন স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের এই নীমানার ভিত্তি রাজধানী আছে, এমনভাবে আছে যে মনে হয় বৃষ্টি তিনটি অণু কেহ বাত্মিয়া গিয়াছে। ললিতপট্টন হইল অপ্রাচীন রাজধানী; তাহার পরে ভাঙ্গাপাও, আর আনকালকার কাঠমাণ্ডু বা কাঠ মণ্ডপ। নেপালের মন্দিরের রচনা মৈথুণ্য হিন্দুধর্মের অজ্ঞাত জ্ঞানস্বরূপ মন্ত নয়। মন্দিরের ছাত্ত হইতে যেখানে বর্ষাৰ জল ধারা বাহিয়া পড়িতেছে, নেপালীরা সেখানে ছোট ছোট বসতি স্থলাইয়া রাখে। আর মাঝখানে যে সোলকটি খোলে তাহাতে পিতলের পিপুল পান লাগাইয়া বের। একটু বাতাস লাগিলেই তাহা নাচিতে শুরু করে। এই কলা তাহারদিকে শিখাইতে হয় না। এক সঙ্গে অনেক করণি বস্তু কিন কিন লক্ষ করিতে থাকে। এই মনোজ্ঞ ধ্বনি শ্রমিকের শান্তি তদ করে না। বহু শান্তিকে আনও গভীর করে, আনও মুগ্ধিত করে। ভাঙ্গাপাওয়ের করণকটি

বৃত্তি তো শিল্পকলায় অদ্বুত নিদর্শন। শিল্পশাস্ত্রের নিয়মগুলি বক্ষা করিয়াও কলাকার তাহার প্রতিভাকে কতখানি স্বাধীনতা দিতে পারে, তাহার নিদর্শন যদি দেখিতে হয় তবে এই বৃত্তিগুলি দেখুন। মনে হয় যে এগানকার কলাকার কলাকে অতিমাহুখী বলিয়াই মনে করে।

ক্ষেতের মধ্যে দূরে দূরে সূর্যন গুপ এমনই সূক্ষ্ম, মনে হয় যেন সমাধির ভাব অসূত্র করিতেছে।

আর কাঠমাণ্ডু তো আনকাল নেপাল রাজ্যের ঐশ্বর্য। নেপালে যাইবার অসুখমতি মহলে পাওয়া যায় না। একান্ত পর্যাপ্ত পিছনে কি আছে, অবগতনের মধ্যে কি ধরনের সৌন্দর্য আছে তাহা জানিবার জন্য কোতুলক যেমন আপনাই উৎসাহ হয়, নেপালের বিষয়েও সেই কথা থাকে। আট দিন থাকিবার অসুখমতি পাওয়া গিয়াছে। বাহা কিছু আছে তাহা দেখিয়া লও। ফিরিয়া গেলে আর আনিত পাহা বাইবে না। মনে এই অবগার যে দিকে তাকাও সেখানে কাব্যই দৃষ্টিপথে আসে।

পশুপতিনাথের মন্দির কাঠমাণ্ডু হইতে দূরে নয়। উহা দেখিলে যেন মনে হয়, মন্দিরের ত্রিভুজ মধ্যে বহু নন্দী বা দুঃখ বৃষ্টি বসিয়া আছে। নিকটেই বাসমতী রহিয়াছে। বাসুনাটির উপর দিরা তাহার জল বহিয়া যায়, তাই উহা সর্বদাই একটু মহলা বলিয়া মনে হয়। উহাতে দাঁতাব কেওয়ার ইচ্ছা অবশ্যই হয়, কিন্তু জলটা ততখানি গভীর হইলে তো? গুহ্যবৃত্তি ও গুপ্তপতি নাম, উভয়ের মধ্যে এই নদী বহিয়া বাইতেছে, এইজন্য তাহার ধর্ম।

পশুপতিনাথ হইতে আমরা শোলা পশ্চিম দিকে

শিশু-ভগবানকে ধর্ষন করিতে গেলাম। পথে বেধা হইল বাঘনতীর ভরা বিজুঘরীর সঙ্গে। এই নদীর উপর যেখানে সেখানে পোল আছে। পোল কেন? নদীর উপর জল হইতে এক হাত উঠিতে কাঠের এক এক বিকৃত চওড়া গুস্তা। বহি কেহ সামনে দিয়া আসে তবে দুহানে এক সঙ্গে ঐ পোল দিয়া পার হইতে পারে না। উত্তরের মধ্যে কোনও একজনকে জলে নামিতে হয়। কোথাও কোথাও জল বেশি গভীর; সেখানে তো গলা পর্যন্ত লোকের ডুবিয়া যায়।

শিশু ভগবানের তল্লাটে ঘানী বুকের এক বড় মূর্তি সূর্যের তাপে তপস্কায় রত। সূর্যের উপর এক মন্দির। তাহাতে স্তম্ভিত মূর্তি আছে। এক বৃদ্ধ ভগবানেয়, ষ্টিত, ধর্ম ভগবানের; তৃতীয়, সংখ ভগবানেয়। প্রত্যেকটির সামনে বিয়ের বাতি জলিতেছে। আর এক কোণে কাঠের তৈরী এক চৌকটে পিতলের এক হলং ফলক ঝাঙানে, তাহাতে 'ওন্দ নামে পামে হুদ' (ওন্দ মণিগহেহুদ) এই পবিত্র মন্ত্র কয়েকবার খোদাই আছে। হাত খুঁতাইলে উহা গোল গোল হইয়া ছুটিতে থাকে। কুত্রাক বা তুলসীর মালা ফেরানোর চেয়ে ইহাতে অনেক সুবিধা। চক্র প্রত্যেক-বার খুঁতাইবার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে মন্তব্যর মন্ত্র গেহা আছে ততবার নিম্নের মন্ত্র ধপ করা হইল। আর ততটা পুণ্য নিম্নের আপনা আপনি লাভ হইল। ইহাতে সন্ধ্যের কোনও অবকাশ নাই। 'নামে কার্ঘ্য বিচরণে।' তবাপত বে তাঁহার বানীর এই স্বরূপ বেধিতে পান নাই, ইহা তাঁহার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি! এই মন্দিরের নিকটে পিতলের তৈরী ইস্তেরা বস্ত্র এক চব্বরের উপর বস্কিত আছে। ইহার আকার ভগিনী নিবেদিতার নিকট খুবই ভাল লাগিয়াছিল। তিনি নির্ধন বিয়াছিলেন যে ভারত-বর্ষের রাষ্ট্রের পতাকার উপর ইহার চিত্র খেন অঙ্কিত থাকে।

বাঘনতীর ভীবে দান, গম, মকাইও বখেট উৎপন্ন হইতেছে। অঙ্কুর সেখানে হয় না। জিনি না, ইহারা তাহা উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছে কি না। তুলা উৎপাদন করিবার চেষ্টা এখন কিছু কিছু হইতেছে।

বাঘনতী নেপালীদিগের গণ্যনাভ। গোবন্ধন্য তাহাদের পিতা। ১৯২৬-২৭

বিহারের গণ্ডকী

হেসেবেল্যঙ্গ এইটুকু শুনিয়াছিলাম যে গণ্ডকী নদী নেপাল হইতে আসে আর উহার মধ্যে শালগ্রাম পাণ্ডুরা যায়। শালগ্রাম এক ধরনের পাথরের মত প্রাণী; উহা তুলসী পাতা খুব ভালবাসে; জলে তুলসীর পাতা ফেলিয়া দিলে উহা বীরে বীরে বাহিরে আসিয়া পাতা খাইতে আন্তর করে; তখন লোকে উহাকে ধরিয়া উহার ভিতরের প্রাণীটিকে মাঝিরা কেসে এবং পাথরের মত ঐ পাথ পবিত্র করিয়া পূজার মন্ত্র বিজয় করে; কিন্তু আধুনিক যুগের দুর্ভ লোকেরা কালো ঢেঁ-এর একটুকুটা শিলা লইয়া উহার মধ্যে ছিদ্র করিয়া মকল শালগ্রাম তৈরী করে। এরূপ কয়েকটি উদাহরণ আমরা শুনিয়াছি। এই মন্ত কতবার মনে হইয়াছে, যাই, এমন একটা নদী একবার বেধিয়া আসি।

মনে পড়ে স্বামী নিবেদ্যানন্দ কোথাও লিখিয়াছিলেন, নর্মদার পাথর মহাদেবের বাণলিঙ্গ, এবং বিজয় শালগ্রাম বৌদ্ধজুগের প্রতীক হিসাবে গণ্ডকী হইতে আনীত প্রস্তর বস্তু। প্যারিসের সুহৃৎ প্রবর্ধনীর সমর তিনি কোনও বক্তৃতা বা লেখার প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বাণলিঙ্গ ও শালগ্রাম বৌদ্ধ ধর্মের দুই স্তর স্মৃতি করে।

গঙ্গার যেখানে উৎপত্তি, সেখান হইতেই সে দুই দিক হইতে কর-ভার লইয়া অগ্রসর। উহার মণ্ডলীর নদীগুলি অবিক্রমেই উত্তর দিকের অথবা বাহিরের। জল ও শোণের কথা ছাড়িয়া দিলে, বক্ষিণ হইতে উত্তর অস্তিত্বের আর কোনও বড় নদী যায় না। গঙ্গার বক্ষিণ বাহিনী মাতলিক নদীর মধ্যে গওকী গঙ্গার মন্ত বিহারের জল লইয়া আসে।

আমরা সকলে মধ্যযুগপুর্বে গিয়াছিলাম; এক দিন গণ্ডকীতে স্নান করিতে গেলাম। বিহারের জুড়ি হইল অনাসক্তির আবি প্রবর্তক সন্ন্যাসী জনকের কর্মভূমি, অবিলাসবর্ষের মহানু প্রচারক মহাবীরের তপোভূমি, অষ্টাদিক মার্গের সংশোধক বৃদ্ধ ভগবানের বিহার-ভূমি। এই সকল ধর্মসন্ন্যাসী এই নদীর ভীবে ভীবে সাতদিন বিচরণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের অসংখ্য সহকারী ও অনুযায়ীরা ইহাতে স্নান-পান করিয়া থাকিবেন। মাতা

মানকী বৈশিষ্ট্যে ইহাতে কত মূল বিহার থাকিবেন। সেই গল্পকী আমাকে তাঁহার শৈল্য ও পাবন্য দ্বারা কৃতার্থ করুন—এই সংকল্পেই সঙ্গে সঙ্গে আমি তাহাতে স্থান করিলাম। নদীর মূলে কোনও প্রকার বসতি ছিল না। কোনও প্রকার উৎপাত ছিল না। উহা শান্ত ভাবে বিদ্যা বাইতেছিল, যেন যাহকে পড়াশুনা করিবার পর বুদ্ধ ভগবানের প্রবর্তিত উহা অশুভ স্থান।

গয়ার কল্প

সংস্কৃত ভাষার কল্প শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কল্প অর্থে (১) নিঃশেষ, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ; আর (২) মূন্দর। গয়ার নিকটবর্তী নদীর নাম কল্প দুই অর্থেই ঠিক বা সঙ্গত। পুরাণে বলে যে সৌভাগ্য লাগে উহাতে লাগিয়াছে। সৌভাগ্য অতিশায়ে যাহা হইবার তাহা তো হইবেই; কিন্তু আমরা নিজেদের চোখে দেখিতে পারি যে উহাতে বাসুকারও লাগ লাগিয়াছে। যেহেতু ডাকাই, খালু আর বাপু। নদীর কোণে প্রবাহিত হইতে মাথা উঁচু করে কি করিয়া? যাত্রীরা এখানে ওখানে বুদ্ধিমান গড় করে। কঠোর বড় বড় টুকরা লম্বা দড়িতে বাঁধিয়া লাগলের মত এই সব গড়ে চলার, বাহাতে নিচের ময়লা বাহির করিয়া গড় অধিক পড়ার হয় ও অধিক মূল পেরে।

অগাধে প্রভাবান যাত্রী কল্পের উপর স্থান করিয়া পিতৃ পুত্রের মত বাঁধিয়া পিও তৈয়ার করে। চাউল, মটর, মটরী, খুঁটে আদির পরিমাণ পাণ্ডার সর্বস্বই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দেয়। নিরম মত পরশা দিন, পাণ্ডা সমস্ত কিনি লইয়া আসিবে। খুঁটের চুলা জ্বালাইয়া তাহার উপর চাউলের হাড়ি রাখিয়া দিন; অল্পকি বিধি পূর্ণ হইলে তাত তৈয়ারী হইয়া যাইবেই।

কল্পের ভীবে মন্দির ও বর্ণশালায় সৌন্দর্য অনেক। ইহাদের মধ্যেও ঐগলাধরকীর মন্দিরের চূড়া তো সহজেই আমাদের চোখে পড়ে।

গয়া হইতে বৌদ্ধগয়ার বিকে যাইবার সময় কল্প সমস্তকারের শোভা দেখিয়া লউন। বাপুদের লম্বা চওড়া পাড়, আমপাশে তালের বড় বড় শাখা, আর তাহাদের মধ্যে আকিয়া থাকিয়া চলিয়াছে কল্পের কোণ প্রবাহ। কিন্তু তাহাকে ক্ষুদ্র বা নিঃশেষ বলিবে কে? এখানে বায়ুচক্র

ও সৌতা আসিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধ এখানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কত শত সন্ধান এখানে প্রাপ্ত করিতে আসিয়াছেন। এই মহাতীর্থে নিঃশেষ তো বলাই যায় না। শেষে কল্প অর্থাৎ মূন্দর—এই অর্থই ঠিক।

গর্জনকারী শোণভদ্র

'অসং শোণঃ শুভগণেশঃপাণঃ পুণ্ডিনমতিভঃ।

কতরোপ পথা ব্রহ্মন্ সংভোগ্যনহে বরন্ ৭'

এবমুক্তর রামেণ বিশ্বামিত্রোহব্রবীৎ ইহন্।

এব পশ্য মরোন্ দ্বিষ্টো যেন বাতি মর্যমঃ।

সেতুবন্ধ হইতে হিন্দালয় পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের কথা এক সঙ্গে চিন্তা করিতেছেন ক্ষত্রিয় শুদ্ধ শিষ্য; উত্তরের মন শোণের পার হইবার সময় কোন্ কোন্ কথা আসিয়াছিল? প্রকৃতির কবি বাস্তবিক, বিশ্বামিত্র ও রাম উত্তরের নিঃসঙ্গিত মুক্তকণ্ঠে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনজনই জনপণের হিতকারী। তাঁহাদের চিন্তাশ্রান্ত ও শোণভদ্রের মতই প্রবাহিত হইয়া চারদিকের ভূমি মুগ্ধিত করিয়া থাকিবে।

অমরকণ্টকের আশপাশের উন্নতভূমি ভারতবর্ষের প্রায় মধ্যস্থানে গাঁড়াইয়া আছে। সেই স্থান হইতে তিন দিক অভিমুখে মাথা তাঁহার করুণার শুভ্র উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন। ভৌগোলিক সংস্থানের দৃষ্টি হইতে ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট সাম্য আছে, কিন্তু অল্প দিক হইতে সম্পূর্ণ বৈষম্য আছে, এমন দুইটি প্রদেশে তিনি দুইটি নদী উৎসারিত করিয়াছেন—জলদাতার ভাগে পড়িয়াছে মর্যম, মরানদী পড়িয়াছে উৎকলে।

অমরকণ্টকের তৃতীয় স্রোত হইল পীথরত্ন শোণভদ্র। মর্যম সুবীৰ্য্য, মরানদী অষ্টাবক্র, শোণভদ্র সুর্য্যব। প্রায় পাঁচশত মাইল ব্যাপী ভূমি প্রবল বেগে আসিয়া সে পাটনার আসিয়া গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। শোণের মতই শোণপুর প্রসিদ্ধ। লোকে বলে, গঙ্গাক্ষেপের বৃদ্ধ গঙ্গা-শোণের গঙ্গামের নিকট দহের মধ্যেই হইয়াছিল। যেম এই প্রসঙ্গকে চিত্রশরঙ্গীর্ণ করিবার মতই এখন শোণপুরে লক্ষ লক্ষ লোকের মেলা হইতেছে, তাহাতে নত নত বাতি বিক্রম হইতেছে।

দিশু ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গ শোণভঙ্গকে পুরুষের নাম দিয়া প্রাচীন কথিগণ তাহার উপযুক্ত আখ্যায় দেখাইয়াছেন। কালী হইতে গঙ্গা যাইবার সময় এই মহাকার ও মহাপ্রব-
কারী নদের বর্ণনাই হইয়াছিল। গাড়ি চলিতেছিল বড়
পোলের উপর দিয়া, শোণের পুলিন্দমণ্ডিত মহাপট দেখা
যাইতেছিল। সংকটী ঘটিতে নিম্নের অগ্রগতি রুদ্ধ
হওয়ার অধীর হইয়া যখন ছুটিতে ছুটিতে সে একাকী
বিশাল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছিল তখন 'কোথায় যাই
আমি কোথায় না যাই' এই ভাব তাহার চেহারাের উপর
স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। 'নায়ে স্বপ্ন'ও যে বৈ ভূমা
তৎস্বপ্ন'— এই মতাবলম্বী মহাবিগণ শোণের তীরে
নামিবার পথ ধুঁজিয়া যখন বেড়াইতেছিলেন, তখন
তাঁহাদের মনে কোন্ কোন্ চিন্তার উৎস হইতেছিল ?
সে কথা তো বিখ্যাত ও তাহার বহুরস্বাকারী প্রু
ঐরামচন্দ্রই জানিয়া থাকিবেন :

ভেরনালের মরীচিকা

আমার বিবাহের কম করেছিন পরেই আদ্য
শব্দপূর হইতে কমবত্তী গেলান। আমার পিতা আমাৎ
পূর্বেই সেখানে পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন। আমার যখন কুড়চী
স্টেশনে নামিলাম তখন রাত হইয়াছে। রাজ্বেই সেখান
হইতে গোত্রর গাড়ীতে রওনা হইলাম। গোত্র দুইটিই
সেতবর্ণ ও চুচকার ছিল। বর্ণ, শূকর আকার, যুগ্ম
ও চলিবার ধরণ—সকল বিষয়েই উভয়ে সমান ছিল।
আমাদের বেশে এমন কোড়ার নাম 'বিল্লারী'। গোত্র
দুইটি আনাবিগকে ২৪ ঘণ্টার ৩৫ মাইল পৌঁছাইয়া দিল।

কমবত্তী যাত্রার পথে হাতার ইতিবাণ প্রমিত ভেরনাল
পড়ে। আমরা যখন তাহার নিকটে গেলাম তখন মধ্যাহ্ন
বেলা। হকিণ বিকে দুই দুই ব্যাপিয়া ক্ষেত পড়িয়া
আছে। অনেক দূরে, প্রায় বিপ্লবের নিকটে এক নদী
বহিয়া যাইতেছিল। জলের উপর কঠোর বোঁর পড়িয়া
উহা চমকাইতেছিল। আর জল যে কত বেগে বহিতেছিল
তাঁহাও কিছু কিছু অস্বাভাবিক করিতে পারিতেছিলাম। এত
সুন্দর নদীর ধারে গাছ কেন এত কম আছে, তাহার
কারণ বুঝিতে পারিলাম না। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা
করিলাম। 'এই নদীর নাম কি ?' কত বড় দেখা

যাইতেছে ! কৃষ্ণা নদী নয় তো ?' গাড়োয়ান হাসিয়া
কেলিল। বলিল, 'এখানে নদী আসিবে কোথা থেকে ?
ও তো মরীচিকা।' তাদের এই দৃষ্ট দেখিয়া বেচারি
পিপাসী হরিণ খোষার পড়ে ও হোঁজে ছুটছুটি করিয়া
জলের লজ্জা লাফাইয়া লাফাইয়া মরিয়া যায়। তাই ইহার
নাম যুগ মরীচিকা।'

মরীচিকার মতই আমি তো বইয়ে পড়িয়াছিলাম।
মরীচিকার উপরের গাছের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, মরুভূমিতে
চলিবার সময় উঠের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, ইত্যাদি
অভিজ্ঞতা ও তাহার চিত্র আমি বইয়ে দেখিয়াছিলাম।
কিন্তু আমি বুঝিয়াছিলাম যে মরীচিকা তো অস্ত্রিকাতেই
দেখা যাইতে পারে। সাধারণ মরুভূমিতে এতদূর দিনের
যাত্রাতেই এই অস্বাভাবিক দৃষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় হয়তো।
যদি কখনও বহিতে পারিতাম যে তারতবার্ষিক মরীচিকা
দেখা যাইতে পারে তাহা হইলে আমি এত সহজে
এবং এত স্বচ্ছভাবে ঠিকিতাম না।

এখন দেখিতে পাইলাম যে আমরা যতই গাড়িতে
অগ্রসর হইতেছি, জলই ততও আগে আগে দিয়া
যাইতেছে। ইহাও দেখিলাম যে ঐ জলের আদেপানে
সমুদ্র কিছু নাই। জলের বার কাছাকাছি মাটির নীচেও
নাই। কমির উপর দিয়াই জল বহিয়া যাইতেছিল।
উপরের যাত্রাতেও হোঁজের প্রভাব দেখা যাইতেছিল।
পুনরায় মরীচিকার মত দেখিতে ও তাহার যন্ত্রণা বুঝিতে
পুংই আনন্দ হইল। বেচারি গোত্ররা অর্ধবৃত্তিত নেজে
নিম্নের গতির ভালে ভালে একসঙ্গে চলিতেছিল। কোনও
কোনও গোত্র চলিতে চলিতে ব্রহ্মভাণ্য করিতেছিল,
তাঁহার ছায়া পড়িতেছিল মাটিতে, আর তাহা ঈর্ষাই
স্বকাইয়া যাইতেছিল। আমরা প্রতি আগ বঁটার ইজো
হইতে জল লইয়া যাইতেছিলাম। তবু পিপাসা
নিটিতেছিল।

এই ভাবে যাইতে যাইতে শেষে তেরনালে আসিলাম।
বর্ষাশা ছিল পাথরের। বেশীর বাল্যের গ্রাম ; তাই
বর্ষাশা ভাঙাই তৈরী হইয়াছিল। কিন্তু চড়া রোজ ছিল
বলিয়া তাহাও ঈতিহাস বলিয়া তেমন মনে হইতেছিল না।
বাড়ীতে পৌঁছিয়া পুরুষের পিয়া স্থান করিয়া আসিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে বিগ্রহ ছিল। বেতের চূপড়ী হইতে তাহা বাহির করিয়া পূজার আয়োজন করিলাম। তাহার মধ্যে এক শিখ্রাশ্রম ছিল। তাহা তুলসীপাতা তিল আর কিছু তৈলময় করিত না। তাই আমি তিল কাপড়ে, নয় পাত্রে, তুলসী পত্রের লম্বায়ে বাহির হইলাম। একটি বাড়ির আদিনায় যেত 'কলকেশ' স্নানও পাওয়া গেল, তুলসীপত্রও নিলি। বেশা তখন বিগ্রহবর। পেটে ছিল ক্ষুধা, পা জলিতেছিল, মাথা গরম হইয়া গিয়াছিল—এই দ্বিতাপের মধ্যে পূজা করিতে বসিলাম। ঘেবতার সংখ্যা বড় কম ছিল না। দৈব অবস্থা এক আদ্যে, কিন্তু সকলের দিক হইতে একই বেষতাব পূজা করিলে তাহা তো চলিবে না। পূজা কবির সময় ঢকে অঙ্কুর দেখিলাম। খুব কষ্টে পূজা শেষ করিলাম। ভোজন করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

স্নেহে যেখান, একবল হরিণ ভেড়ার মত ঘোড়িতে ঘোড়িতে চল বাইতে গেল।

ঘাণ্ডী অভিধানের সময় এমনই এক স্মৃণ মরীচিকা নউদারি হইতে ঘাণ্ডী ঘাণ্ডার পথে ঘাণ্ডীর সমুদ্রতীরের দিকে বাইতে বাইতে দেখা গিয়াছিল। ইহা মরীচিকা বলিয়া বিশ্বাস করিলেও চোখের ভুল একটুও কম হয় নাই। বেধান্তের জ্ঞান চোখ কি করিয়া বীকার করে ?

আজকাল কলিকাতার কোল-টা বস্তাব উপরেও দি-প্রহরের সময় এমন মরীচিকার সৃষ্টি হয় যে ভুল হয়। বৃষ্টি বৃষ্টি হইয়াছে। মোটর গাড়ি ছুটিতেছে এমন দায়ও বৃষ্টি সেখানে পড়ে। ভগবান সম্ভবত এইমত মরীচিকা সৃষ্টি করিয়াছেন যে জ্ঞান হইলেও মানুষ কি করিয়া মোহের বশে থাকিতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তর উরা হইতে পাওয়া যাইবে।

চর্মবতী চঞ্চল

যে সকল নদীর তলে আন-পান করিয়াছি তাহাদের এখানে পূজা করা আমার সংকল্প। তথাপি ইহাতে একটা নিশানা থাকিয়া যায় না। মধ্য-বেশের চঞ্চল নদী বর্শন করিয়াছি বলিয়া আমার অরুণ নাই। কিন্তু পৌরাণিক কালের চর্মবতী নামের সঙ্গে এই নদী সর্বদাই আঘাতের স্মৃতিপটে অংকিত হইয়া আছে। নদীতলির নাম তাহাদের তীরের পশুপক্ষী বা বৃক্ষ অমুসারে রাখা হইয়াছে, ইহার

বৃহত্তম আছে বিস্তর। বৃন্দাবতী, সহস্রতী, গোমতী, বেঙ্গবতী, কুশাবতী, শংখবতী, বাঘবতী, ছাত্তবতী, শাখবতী, ইন্ডাবতী প্রভৃতি নাম এই সকল নদীর প্রবাহের ফুকার। নদীর নাম হইতেই তাহার সংকৃতির প্রকাশ। তবে চর্মবতী নাম কি স্মৃতি করে ? এই নাম শুনিবামাত্র প্রত্যেক গোপেন্দ্রের যোন ঝাড় হইয়া উঠে।

প্রাচীন রাধা রত্নিহের অমর কীতিলসিত করিয়াছিলেন। মহাভারতের মত বিরাট গ্রন্থ রত্নিহের কীতি গাহিতে ক্রান্তি বোধ করে না। রাধা এই নদীতীরে বিস্তর বজ্র করিয়াছিলেন। সেই সব বজ্রে যত গুলু নিধন করা হইত তাহাদের বজ্র এই নদী সর্বদা রঞ্জিত থাকিত। এই সকল গুলুর চামড়া শুকাইবার জন্য এই নদীর তীরে ছড়াইয়া রাখা হইত ; তাই এই নদীর নাম ছিল চর্মবতী। মহাভারতে এই প্রসঙ্গের বর্ণনা পরম উৎসাহের সহিত করা হইয়াছে। রত্নিহের বজ্র এতজন ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন যে স্থপকারের ব্রাহ্মণের মিনতি করিয়া বলিতে হইত যে শ্রুতগাম, আশ্রম্য কাম দাম হইয়াছে। আশ্রম্য শুধু পটিন হালাব পশুই নার। হইয়াছে। এইমত তবকারি একটু বেশি করিয়া নিম্ন।

তখনকার হিন্দুধর্ম ও এখনকার হিন্দুধর্মে কত বেশি প্রভেদ ! ঐক্যের হেকাটোম-ও (Hecatomb) দুই, এমন বড় বড় বজ্র করিয়া আমরা স্বর্গের দেবতাদের শুভ্রবেশের বস্ত্রসাধন করিব, এমন আশা তখনকার ধর্মগ্রাণ ব্যাক্তরা জগরে পোষণ করিতেন। পরে লোকেরা প্রায় উঠাইল :

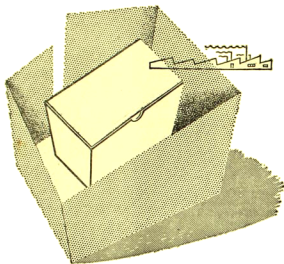
হুমান্ হিষা, পশুং বধা, কৃষা স্তবিরকর্মন্ম

স্বর্গঃ চেৎ গম্যতে মর্ত্যঃ নরকঃ কেন গম্যতে ?

'পাছ কাটিয়া পশুহত্যা করিয়া বজ্রে কর্ম করিয়া যদি স্বর্গে যাওয়া যায়, তবে নরকে যার কোন উপায় ?' এই চর্মবতীর ভাবে কতই না বৃদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছে ! মানুষ মানুষের বহুপাত করিয়া থাকিবে। কিন্তু চব্বলের নাম করিলেই রাধা রত্নিহের বৃগের কথা মনে পড়ে।

যদি আজও আমাদের মনে এতখানি উৎসেহ হয় তাহা হইলে প্রাণিগণের মাতা চর্মবতীর তখন কতই না ব্যাধা বেধনা হইয়াছিল।

factory freshness preserved



with

★ **POLYBOARD**

★ **POLYKRAFT**

packaging

Acid, alkali and moisture resistant polythene-coated POLYBOARD and POLYKRAFT help to preserve the factory-freshness of your products, whether they be confectionery, tea, biscuits or chemicals.

These new, revolutionary packaging materials are several times stronger than ordinary board or paper and prevent damage to your products even when they are subjected to rough handling. And the eye-appeal of your products is enhanced considerably because of the glossy finish on POLYBOARD and POLYKRAFT.



CHANGE TO
★ **"POLYBOARD" POLYKRAFT**
PACKAGING FOR INCREASED SALES

ORIENT PAPER MILLS LTD., CALCUTTA.

আন্তর্জাতিক চর সিডনী রেলী

খ্রিস্টীয় সেন

[দ্বিতীয়]

মিশনারি যন্ত্রটি আর কেউ নন—ব্রিটিশ ইনস্টিটিউশন সার্ভিসের একজন অধ্যাপক নামা চর সিডনী রেলী (Sidney Reilly), ইরানের ক্রোমাক তেল দিয়ে তাঁর ঘাড়ে খড়ি। অবিকালে তিনি দাক্ষিণাত্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেন—ইউরোপের রাষ্ট্র-প্রধানবিশেষের বহুবল লাভ করেন। আর হস্তপ্রাপ্য ইরান দেখেই হতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গুপ্তচর ও বড়বড়কারীদের বন্দুকঘেরা এড়ানার (Arena) পরিণত হয়ে যায়। ‘বকেব বন’ এই তেলের সঙ্গে গুপ্তচরদের একটা অশেষ সখ্য আছে।

একজন অদ্বিতীয় কর্মী গুপ্তচর এই রেলী। পিতা আইরিশ নাবিক—মাতা রুশ ইহুদী—সমগ্র জাতিগত বন্দরে। বরিত ইহুদী বালকদের বলে পথে পথে খেলা করে বেড়াতে—বালক রোজেনব্লুম (Rosenblum)। দুনিয়ার সববুরে নাবিকেরা সঙ্গে ছিল বহুবল। এইভাবে বাল্যকালে আট দশটা ভাষায় কথা বলতে শেখে—কোনোবান কঠোর ইচ্ছায় মানুষ চেনার কৌশল আয়ত্ত করে। তাইই বর্তমান নাম—সিডনী রেলী।

তাঁর বেশ ছিল না, জাতি ছিলনা, ধর্ম ছিল না। তাই, যা কিছু কার্যকলাপ তাঁর গোপনই রয়ে গেছে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও বীরত্ব, কোনদিনই প্রচারের সুযোগ পায়নি। টুকরো টুকরো খবর বা পাওয়া গেছে তা মোড়া বিলে দেখা যায় এ যুগের গুপ্তচরদের মাঝে তাঁর মত চূড়ান্তচরিত্রের লোক আর ছিল না। আরও লক্ষ্যের প্রতিভাও তাঁর লক্ষ্যে রান। কিন্তু বেলী ইংরেজ নন—ব্রিটেনে তাঁর কোন আত্মীয় নেই—তাঁই ইংরেজি পুথিপত্রের কোথাও তাঁর নাম পাওয়া যায় না। তিনি রুশ নন—গোবানও আপনাব বলতে কেউ তাঁর নেই—তাঁই এতগুলি ‘পার্শ্ব’ মামলার কোথাও তাঁর পরিচয় প্রকাশিত হয়নি।...বহিঃ সোভিয়েটের বিরুদ্ধে অস্ত্রবিল্প আরোহনের মূলেই ছিলেন তিনি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে রুশ দেশে একজন অস্ত্র-ব্যবসায়ীর নাম পাওয়া যায়—বোঝেনরুম। তিনি ব্যবসার মাধ্যমে রুশ সনও ও নৌবাহিনীর ব্যবসায়ী গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। আর্ম্যানের অস্ত্রনির্ধারণ কারখানার মালিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে আর্ম্যান সাবমেরিনের প্রাচীর হস্তগত করেছিলেন। এবং সবই প্রত্ন ব্রিটিশের হাতে জুড়ে দিয়েছিলেন।...যুদ্ধ বাধার পরে, ১৯১৬ সালে রুশ নামে আর্ম্যানিতে প্রবেশ করে আর্ম্যান নৌবাহিনীর অফিসার হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত গুপ্তচরের কণ্ঠ—আর্ম্যান নৌবাহিনীর গুপ্ত সংগ্রহ প্রেরণের কাজ তিনিই অপূর্ণ করেন। তাঁর কৌতিকে ভিত্তি করে অনেক উপজাত সেবা হয়েছে কিন্তু তাঁর নাম কোথাও নেই।

যুদ্ধের অবসানে তিনি স্মার্টন রুশদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ব্রিটিশ ইনস্টিটিউশন সার্ভিসের সর্বময় কর্মী হয়ে বসন্তেরিকার লক্ষ্যের কাছে আত্মনিয়োগ করেন। রুশদেশের বিকল্পমান রাজনৈতিক চলগুলিকে একসঙ্গে এখিত করা; একই বড়বড় নিয়ন্ত্রিত করা এবং তড়িৎ শক্তি সকার করে একই লক্ষ্যপথে পরিচালিত করা—তাঁইই তত্ত্বের পরিচয়...কিন্তু অদ্বৈতের পরিচয় ১৯২৬ সালে হঠাৎ একদিন অদ্বৈত হয়ে গেলেন, যেমন পঁচিশ বছর আগে হঠাৎ একদিন ‘ডি’ আকির কাছাকাছি এসে উঠর হয়েছিলেন।

নামান্ত একটু অভিন্ন ও করেকটিনায় কথায় ‘ডি’ আকিকে মূঢ় করে শাওর দেই অল্লা বানপুজখানা হস্তগত করেন এবং ব্রিটিশ ইনস্টিটিউশন বিভাগের হাতে জুড়ে দেন। বৃষ্ট বর্ষ প্রচারের ঘর এই মহামূল্য সম্পদ হান করে বড় ‘ডি’ আকি শান্তিতে পরলোকগমন করেন।... এই নিশ্চিত বিশ্বাসে, যে প্রাচীন বহুগুণী আলোর চেয়ে বহু কোটিগুণ উজ্জ্বল আলো অদ্বৈতবিশ্বতে ইরানের

দ্রব্য মালভূমি উদ্বাসিত করবে। ইউক্রেটস থেকে নিম্ন ক্রমে ক্রমে ছেয়ে যাবে।

ব্রিটিশ নৌবিভাগ তখন যুদ্ধ জাহাজের ডিজাইন পরিবর্তনের কথা চিন্তা করছিলেন। মনোযোগী জাহাজের যেমন বর্ধিত্রোজন আয়তকার গজ, দুই পাশের কামান বরকার আক্রমণের উৎক্রে; তেমনি অত্যাবশ্যক ক্রত গতিবেগ। ক্রতগামী জাহাজ প্রথমতী শত্রুকে ইচ্ছামত আক্রমণ করতে পারে—বিপদে পড়লে হলে ভঙ্গ দিয়ে বা ঢাকাও দিতে পারে। করণার জাহাজের চেয়ে তেল চালিত জাহাজের গতিবেগ বেশী। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যে তেল নেই! নগদ কড়ি ফেলে যে ভিনবিষ কিনতে হবে, তার উপরে বিখাস কি?—অস্ত্রের উপর নির্ভর করে তো সড়াইয়ের আয়োজন চলে না!

এখনি সময় ইনটেলিজেঞ্চ হস্তের হাতে ডি' আকির মনহালা পৌছাল। নৌবস্তুর সেধালা কিনে নিলেন। ইনটেলিজেঞ্চ হস্তেরের মোটা নিম্ব তহবিল আছে—ট্রাষ্ট সম্পত্তির মত শেয়ার ও বণ্ডে লাগি করা থাকে। গুপ্ত-চর্যের নিম্ননে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়—এইভাবে সংখার ও হপিল বিক্রয় করে প্রচুর অর্থ উপার্জনও হয়। পার্লামেন্টে ডিকেন্স বাজেট 'সিক্রেট কাগজ' হিসাবে কিছু টাকা ইন-টেলিজেঞ্চ বিভাগকে দেওয়া হয়। কিন্তু সে এত সামান্য যে তার উপরে নির্ভর করতে হলে সাম্রাজ্য রক্ষা চলে না।

ডি' আকির সময় কিনে ব্রিটিশ নৌবস্তুর ইরানের তেলের মালিক হল এবং বর্ধনকার অন্তরালে এ্যাংলো-পার্সিয়ান অয়েল কোম্পানী গঠিত হল। বিশাল সে কোম্পানী। তার এত মূলধন কোথা থেকে সংগ্রহীত হল, কেউ জানেনা না!—মৃতন কোম্পানীর শতকরা ৫৫ ভাগ শেয়ার 'ব্রিটিশ নৌবস্তুরের, ২৮ ভাগ শেয়ারের মালিক 'বার্চি অয়েল কোম্পানী', এবং বাকি ১৭ ভাগ শেয়ার বাজারে ছাড়া হল।...পার্সিয়ানের অগোচরে, দেশের জনসাধারণকে ঘূর্ণাস্থবৎ কিছু জানতে না দিয়ে, নৌবস্তুর তেলের মালিক হয়ে বসল। নৌবস্তুরের নিম্ব তহবিল আছে—পার্সিয়ানে যার খবর রাখেনা।...এসব খবর থাকে হীল ক্রেনের জিম্মায়। মন্ত্রী সভারও পরিবর্তন আছে—হীল ক্রেন বদলাবে কে?

ব্রিটিশ ইনটেলিজেঞ্চ বিভাগ অবশ্যই নিজনী তেলীকে পুত্রকৃত করলেন, কিন্তু সেই অগ্রচর পুত্রভাবে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। তলে তলে আমেরিকার তেল শত্রু ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীকে হোমেন দুয়ের নাম করে এক চিঠি নিখলেন। সেই চিঠিতে ডি' আকির তেলের সময় বিক্রয় করার প্রস্তাব ছিল—আর ছিল সংখার, যে ব্রিটিশ নৌবস্তুর ইরানের তেল নিয়ে মস্ত বড় কোম্পানী করতে চলেছে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড তখন পৃথিবীর অগ্রভিত্তনী তৈল ব্যবসায়ী। নানা বৌশলে আমেরিকার মন্ত্রতম তেলের কোম্পানিদের গ্রাস করে ফুলে উঠেছে। আমেরিকার অসুস্থত তৈল সম্পদের একমাত্র মালিক সে। ইউরোপের বাজার সম্পূর্ণ তারই কংতলগত। তার তেলের জাহাজ বন্দরে না ভিড়লে ইউরোপের হারিকেন সন্তবন্য আধার হয়ে থাকে।...সে কেন ইরানের তেলের মস্ত পরোয়া করবে? আর, তেলের ব্যবসারে ব্রিটিশ? সে আবার এন্টা কথা!...চর্যারের নীচেই পড়ে বইলো হোমেনদুয়ের সেই চিঠি।

আমেরিকার বন-বৈধন্য আছে—কিন্তু ধনী হরিত্রের জাতিতের নেই। আজ যে মোটর পাড়ীর মোহা—কাল মে মোটর কারখানার মালিক হয়ে বসতে পারে। চেষ্টার ক্রটি নেই কারও—উপার্জনের কোন পছাও নিম্ননীয় নয়। ষ্ট্যাণ্ডার্ডের অফিসের দুইজন কেরানী, অবস্থা কিহিয়ে কেলবার সহম উপায় আবিষ্কার করেছিল। অফিসের গোপনীয় হপিল পত্রের ফটোটাট কপি বিক্রি করে দু'পয়সা কামাতো। হোমেনদুয়ের চিঠি তাদের হাতে পড়ল। চিঠির কপি নিয়ে তারা ছুটলো ইউরোপের বাজারে হব বাগাই করতে। বহিদ্দার পাওয়া গেল না—এবং সংখারটা কীল হয়ে গেল।

সে যুগের চারটি বড় সাম্রাজ্য—চারটিই ইউরোপে। এরা নিজেদের মধ্যেই প্যাক্ট করতেন, আঁতাত পাভাতেন, কিন্তু কেউ কাউকে চুচকে ধেবতে পারতেন না। এই চারটি শক্তির ভাঁড়ি ছিল—লন্ডন, প্যারিস, বাগিন ও মস্কোতে।...সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীর হুদান। আর শিকড়? শিকড় দিয়েছিল মাটির নীচে দিয়ে অপদের

অলঙ্কিত—বিভূত হয়েছিল ধরতীর সর্বত্র। ইরানের তেলের সংখ্যে শিকড়ের বৃক্ষ ডগাগুলি (spearhead) কর্ষচকল হয়ে উঠল।

কাদামী আধ দ্বিবি। অতীত পৌরবের স্মৃতি ও 'একরা ছিলাম' এর বস্তু মাত্র দৃশ্য। ইংরেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সাধ্যাতীত, তাই অন্তরাণ থেকে যেটুকু সম্ভব শত্রুতা করেন। বুড়োর মুখে ইংরেজের শত্রুকে অশ্রুপত্র বিক্রি করে দুপয়সা কামিয়েছে। এবার ইরানের উপজাতীয়ের মাঝে রাইফেল পিস্তল ছড়াতে লাগলেন। অর হাতে পেসে বীহের হাত বিস্রোহী হবে—যেহ অস্বাভাবিক হবে—ইংরেজ তেল পাবে না।

জর্জানীর কানে তেলের ধবধব পৌছা মাত্র একপল বৈজ্ঞানিক প্রেরিত হলেন মিত্র রাষ্ট্রা তুর্কীতে। তাঁরা ইরানের পশ্চিমে ইরাকের পাখাড়ে ছিন্ন করতে লাগলেন।

তেলের ধনি একটা বিশাল ব্রহ্ম, মাটির নীচে ঢাকা। উপরে বহু রাষ্ট্রা বহু সীমান্ত—ব্রহ্মের তলে কোন সীমারেখা নেই, নেই কোন বেগুয়াল। ক্রমশঃশেষে বাহুর ধনিই ইরানের নীচে এসেছে—সীমান্ত পাব হয়ে চলে গেছে ইরাক—বহিঃস্থার নীচে গিয়ে গেছে আরবে। যে আগে তেল তুলবে, যে বত বেশী তুলবে, সেই বিজিতে। মাটির তেল লুণ্ঠের মাগ—সেই করলে ছুঁয়ে যাবে।

কার্বন ইঞ্জিনিয়ারবল ইরাকে তেল আবিষ্কার করলেন—তেল তুলবার আয়োজন করলেন—বালিন থেকে বায়বাহ রেল লাইন খুলে ফেললেন তেল বাড়ী নিয়ে বাগদার ভক্ত। তুর্কী ও ইরানের সীমা পাহাড় মজুর দেশ—হুর্গ ও জনবীন—কোন বাঘা-বরা বাউগারি নেই। তুর্কীর খলিকা বললেন—তাঁর সাম্রাজ্যের বেশ খানিকটা ইরানের দাধ বেরখল করে নিয়েছেন—কেন্দ্র দিতে হবে। এই 'বেরখলি' ধারণাতেই এ্যাংলো পার্সিয়ানের তেলের ময়দাম (oil field)। ইংরেজ বললেন—তেল অমের হুন্ডে—তেল ছাড়বো না, বাঘনা চাও, রয়েলটি চাও বেশ ভাল কথা। তোমরা খলিকা ও সাধ—বালা কর, দামদা কর—ভারপর এমো—ঘাট বা প্রাণ কড়ার জ্ঞান্তিতে বুঝ নিয়ে যেও।...ইরানের সাহ আভিসংঘের বহুবারে (League of Nations) বিচার প্রার্থী হলেন। তাঁর পিছনে রইলেন ইংরেজ—তুর্কীর পিছনে রইলেন কার্বানী। অবস্থা ঘোরালো হয়ে ওঠার আন্তর্জাতিক বাউগারি কমিশন এমো পরেখমিনে তদন্ত করতে।

তেলের সংখার পেয়ে আর একফল কসাক সৈন্ত

মোতায়েন করলেন ইরানের সীমান্তে—পালাগান ছেলেবা যেমন কপার কথার অস্ত্রিন ঘটায়।...কিন্তু এর পর এখন জাপানের হাতে বড় বকনের হার হল, বেশে ছোট বকনের বিপ্লব হল, মন্ত্রীদত্তা বরলাতে লাগল বারবার—ইরান সম্পর্কে মিত্রিত পরিবর্তিত করতে হল—রাষ্ট্রকোষ উদ্ভূত হল—এবং ইরানের সাহ প্রচুর টাকা খার পেতে লাগলেন ক্রশের রাষ্ট্রকোষ থেকে।...মহাভনরা ছাওনোট লিখিয়ে বড়লাকবের নাবালক ছেসেকে টাকা ধার দেয়—আর সুযোগ মত সম্পত্তি বস্তগত করে, তেমননি বেশ কিছু মোটা অংকের ছাওনোট কাটার পরে, লাহও একদিন টাকা কেন্দ্র চেয়ে বসলেন। বসলেন—বহু, তোমার ধন টাকা শোধ দেওয়ার ক্ষমতা নেই—ইরানের উত্তরের অর্ধেকটা লিজ দিয়ে ফেল। ধমিল সম্পদ থেকে পাওনা আধার করে দেব।...তুর্কী টাকা কথা নয়—একফল কসাক সৈন্ত প্রেরণ করে বসল উত্তর ইরানে।—তখন অগত্যা সাহ রাজি হলেন। কিন্তু বাধা বিল।

সেটা ১৯২২ সাল—ইংরেজ ক্রশে আস্তাত। ইংরেজ প্রাক্তে বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন না, তাই এ্যাংলো পার্সিয়ান অয়েল কোম্পানী মার্ঠে নামলেন। এ্যাংলো-পার্সিয়ান যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের একটা হস্তর—তখনও প্রাক্তে স্বীকৃত ছিল।

বড় তেল কোম্পানিদের প্রাক্ত্যেকের একটা বৈদেশিক বিভাগ থাকে—গুপ্তচর থাকে একফল। এ্যাংলোপার্সিয়ানের বৈদেশিক বিভাগ এতদিন চূপ করে বসে ছিল না। উপজাতীয় শেখদের রাষ্ট্রো, সহহের বাঘায়াইদের মাকে, বেশ প্রতিপত্তি ক্রয় করেছিল। ক্রাণের চোরাই চালানি রাইফেল-পিস্তলের সঙ্গে তেলের টাকা মিশে ঘেন্টাকে পরম করে তুলেছিল। ক্রশকে তেলের ইজারা দেওয়ার প্রস্তাবে মমত উত্তর ইরান, সাহেব বিরুদ্ধে বিরোধ ঘোষণা করল। জনি তুলল—“ক্রশকে...লিজ দেওয়া চলবে না!”

সাহেব পৈন্তুল হেশবাগা বিকোন্ডের সমুখে এক বস্তু তিষ্ঠাতে পারল না। সাহ লিখ বাতিস করলেন। অন্তবিপ্লব ও বহিঃস্থে ক্ষত বিক্ষত ক্রশের নুতন করে মুখে নামবার সামর্থ্য হল না। ক্ষুর ইরানের হাতে এই অসমানও হজম করতে হল অর্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর প্রবল প্রতাপ ভারকে।

তখন মহাহুর্ডের রথচক্রের সূত্রগত ধনি পোনা বেতে আরম্ভ করেছে ইউরোপের রাষ্ট্রবানীশিপিতে।

প্রবন্ধ, রম্যরচনা ও সেই বিস্তৃতি প্রথম চৌধুরী

শিপ্রা ঘোষ

একটি এবং রম্যরচনা। মনে কিছু আলোচনা করতে হলে প্রথমেই আমাদের জন্য ইতিমধ্যে যে প্রবন্ধ এবং রম্যরচনা কাকে বলে এবং এর মধ্যে পার্থক্য কেবল নয়। আমরা জানি যে প্রবন্ধ কবোটা এসেছে সংস্কৃত থেকে। সংস্কৃততে প্রবন্ধ অর্থে সাহিত্য। সাহিত্য বলতে সংস্কৃত ভাষায় গদ্য এবং কবিতা; রচনা, দুইই বোঝাতো। আমরা ভাষায় গদ্য গদ্য রচনা নামে কোনো রচনাই ছিল না। মধ্য বাঙালি প্রবন্ধ অর্থে মূলতঃ পাঁচালীর মতো গদ্য রচনাই বোঝাতো। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আধুনিক বাঙালি গদ্য রচনার সাহিত্যবাদী স্বীকৃত হোল। এর পর এলো প্রবন্ধ বা 'Essay'র যুগ, কিছুটাই দেখানো প্রদান হয়ে উঠলো। গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই প্রবন্ধের আবির্ভাব আমরা গল্প এবং উপন্যাসের আগে বলতে পারি। তাই যেহেতু ষোলো শতকের প্রথম দিকে বিখ্যাত প্রবন্ধ ইত্যাদি দেখতে পাওয়া গেলো, ছোট গল্প বা ভালো উপন্যাস প্রকৃতি তখনও আমাদের কাছে অপরিচিত। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি বা তারপর রচিত হোল উপন্যাস। মাই বোঝে ক্রমশঃ প্রবন্ধের উন্নতি হোল, পরিবর্তন এলো চেহারাও অর্থাৎ ভাষামোড়ে এবং আদিকে। শুধু এবং রূপ উভয়ের সমন্বয়ে রচিত হোতে লাগলো সার্থক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে বিবিধ শ্রেণীর উদ্ভব হোল। একটি বিষয়গত বা objective, অপরটি ব্যক্তিগত বা Personal, ইংরাজী প্রবন্ধ সাহিত্যে আমরা Expository এবং Familiar বা Personal Essay দেখতে পাই। প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধে অর্থাৎ বিষয়গত রচনার লেখকের মনন গমিতা বিধি পথে বিবর্তিত এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনায় বা Personal Essay:ত রচয়িতার মন ও জীবনের প্রকাশই অনেকখানি। অর্থাৎ একটি তথ্য ও তত্ত্ববহুল এবং অপরটি ভাব-ধর্মী। সংস্কৃতের ক্ষেত্রে ক্লাসিক (Classic) গান বলতে আমরা সাধারণতঃ প্রবন্ধ এবং খ্যাতিলাভের বুক বাকি। প্রথম যদি প্রবন্ধ হয় তাহলে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা প্রেরণী রচনা

বা Personal Essay কে আমরা নিঃসংশয়ই খ্যাতিলাভে অভিষিক্ত করতে পারি।...এবং এর এলো রম্যরচনার যুগ; বিদ্যুৎ মত, দিঘটীই যেখানে হয়ে উঠলেন প্রথম। বিশেষ একজন ব্যক্তির ভাবনাকে অঙ্গলম্বন করে রচিত হোল রম্যরচনা। অনেক বলেন যে ক্রান্তি সাহিত্যে 'বেল-লেটার' এর বাঙালি প্রতিশব্দ "রম্যরচনা।" ইংরাজী সাহিত্যে ট্যান্ডেম, ল্যাং প্রকৃতিই রম্যরচনার মূল রচয়িতা। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সঙ্গে আমরা অনেক সময়েই রম্য রচনাও সংস্কৃত দেখতে পাই। কখনোই ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে নিশ্চয়ই রম্যরচনা বলা যেতে পারে, কিন্তু রম্যরচনা মাত্রই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নয়। সংস্কৃতের ক্ষেত্রে আমরা কৃষ্ণের সঙ্গে রম্যরচনার তুলনা করতে পারি। বাঙালি সাহিত্যের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ইতিহাসকে মোটামুটি চারটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্বে বক্তৃতা, দ্বিতীয় পর্বে প্রথম চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ, তৃতীয় পর্বে বুদ্ধদেব বসু, স্যোতির্গিরি বাগ প্রকৃতি এবং চতুর্থ বা শেষ অধ্যায়ে সৈয়দ মুজিব আলী, বাহাবর, ইন্দ্রজিৎ ইত্যাদি। রম্যরচনার ইতিহাসে আমরা বীরবল বা প্রথম চৌধুরীর নাম স্মরণ করলেও, নিঃশঙ্করেই বলতে পারি যে তিনি শুধুমাত্র রম্যরচনা রচয়িতা নন; প্রবন্ধ লক্ষ্যভিত্তিক তাঁর রম্যরচনা অনেক সময়েই রম্য প্রবন্ধের আকার ধারণ করেছে। প্রথম চৌধুরীর পঞ্চদশ রম্যরচনা রচয়িতাদের মধ্যে মুজিব আলী, বুদ্ধদেব বসু, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্যোতির্গিরি বাগ, বাহাবর, তরুন, রূপস্মৃতি, পত্রনবিন (চন্দ্রনাম) প্রকৃতি আরও অনেকের নামই উল্লেখযোগ্য। তবে আমরা এখানে প্রথম চৌধুরীর বা বীরবলেরই প্রবন্ধ এবং রম্যরচনা নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করবো।...

প্রথমে, প্রবন্ধের কথাই ধরা যাক। ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম আধুনিক প্রবন্ধকার ছিলেন বেকন (Francis Bacon—1561—1626) মধ্যযুগের বন্ধনযুক্ত যাহদের দ্বারের বিকাশ হোল, তেজস্বীর যুগ। সেই বিকাশের

ফলে মানুষের চিন্তাধারা উন্নত হোল, গভীর হোল।
এরূপের ক্ষেত্রে তখন আবির্ভাব হোল বেকনের।
হের্গেসার পরে যুগেও সাহিত্য জগতে ইংরাজদের মন ও
চিন্তনের ক্ষেত্রে আত্মর করে থাকে। এরূপ; যার ফলে
জনগণ, ল্যাব প্রভৃতির অত্যাধিক বোঝা গেল।

ফরাসী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মন্টাইগ্নে (Montaigne)
একজন বড় ব্যক্তিগত রচনাকার ছিলেন। (১৫৩৩—১৫৯২)

বাঙলা সাহিত্যে এরূপের গোড়াপত্তন করলেন
রামনাথবাবু রায়। এর পরের যুগে নবজাগরণ, বিজ্ঞানায়ন
প্রভৃতি প্রাথমিকভাবে আবির্ভাব ঘটিলো। বিমলচন্দ্র সিংহ
ঊর্ধ্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি নামক গ্রন্থে এই যুগকে “বাহ্যগত
গভীর আত্মানুসন্ধানের যুগ” নামে চিহ্নিত করেছেন।
সেই যুগের এই আত্মানুসন্ধান ও আত্মবিজ্ঞানসা আত্ম-
প্রকাশ করেছিল প্রাথমিকভাবে প্রসঙ্গ রচনার মাধ্যমে।
তারপর পরেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখোপাখ্যান, নিবন্ধ বা প্রবন্ধ
প্রভৃতি এরূপের পরপর দেখা দিয়েছেন। এর পর সাহিত্য
জগতে অবতীর্ণ হোলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁর প্রসঙ্গে
আসবার আগে আমরা তাঁর ব্যক্তিগত রচনাবলি ১৮৭০—
১৮৯৯ ও অবসরোত্তরকাল (১৮৭১) মধ্য পর্যন্ত করি।
এঁরা দু’জনেই ছিলেন ব্যক্তিগত প্রাথমিক এবং
রবীন্দ্রনাথেরও বেশির ভাগ প্রবন্ধই তাঁর ব্যক্তিগত রচনা।
বিচিত্র প্রবন্ধের কৃমিকায় তিনি নিজেই লিখেছিলেন
“ইহার বহি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিধর বস গোঁরবে
নয়, রচনা বসগোঁরবে”।

বাঙলা গভীর ইতিহাস অর্থাৎ প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রথম
চৌধুরীর রচনা চিত্রসংবীথ। প্রথম চৌধুরীর রচনার
বাঙলা দেশের পাঠক সমাজ এক নোতুন বিশেষের মাধ্যমে
এসে দাঁড়ালো। তাঁর রচনার ভাবাবল্যবিহীন ভাষা
দৃষ্টি, বিদেশী সাহিত্যের জ্ঞান, যন্ত্র কৃতি গোধ, নিঃস্র
ঐচ্ছিকতা, মাজিত চতুর বসিকতা এবং বৃষ্ প্রকৃতিস্থতা
বা “ভ্রান্তি” পাঠক সমাজকে বৃষ্ করেছিল। তাঁর রচনা
থেকেই আধুনিক প্রবন্ধের একটা যোগাযোগ নোতুন রূপ
পাওয়া গেল। তখন সেই প্রবন্ধকে বলা হোত ব্যক্তিগত
রচনা বা Personal Essay, যাকে আমরা এখন
নিম্নলিখিত রম্যরচনা বস্তুতে পারি। এই ব্যক্তিগত
ভাষিতে প্রথম চৌধুরী ছিলেন শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচয়িতা।
নব প্রয়োগের নৈপুণ্যে, প্রেম-বসকর বসার্ণ ব্যবহারে,
সুদৃঢ় বস্তু এবং বস্তু পবিসিত পরিবাসের উজ্জ্বল সময়ে,

Wit এবং Paradox এর প্রাচুর্যে নব্বু তাঁর ব্যক্তিগত
প্রবন্ধাবলী। তাঁর পর এবং প্রবন্ধ অনেক সময়ই একান্ত
ভাবে অভিন্ন এক বস্তুে গিয়েছিল। রচনার এই বৈশিষ্ট্য
বীতিতে বা প্রবন্ধে ব্যবহারে তিনি ইংরাজী সাহিত্যের
চেস্টারটন (G. K. Chesterton. 1874—1936) ক
অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর বসাহল খাতা, নব্বুপত্র
প্রভৃতিতে আমরা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পর্দায় ফেলতে
পারি। প্রথম চৌধুরীর রচনার বস্তুবাহী প্রধান বস্তু
বস্তুে গিয়েছিল। সেই বস্তুবাহী বস্তুে বস্তু বা বস্তুবাহী
প্রাচুর্য বা বস্তুবাহী বস্তুে আমরা তাঁর বস্তু রচনাগুলিতে
পেয়ে থাকি, তাকে বস্তুতে রম্যরচনা বস্তুে। তাঁর সঙ্গে
তাঁর পূর্বসূরীর রচনার কিছু কিছু মিল থাকলেও
প্রবন্ধের লক্ষ্যভুক্ত তাঁর রম্যরচনাগুলিকে বস্তু প্রবন্ধ
ছাড়া আর কোনো আখ্যায়ি বস্তুে চলে না।

প্রথম চৌধুরীকে আমি রম্যরচনা রচয়িতা বলে বসে
করি না। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার ছিলেন। তাঁর
রচনার এক বস্তু সমালোচকের মনোভাষিকে প্রকাশিত
হোতে বস্তুে। বস্তুে বস্তুে বা লব্ধবস্তুে বস্তু
সাহিত্যের একটা বস্তু বস্তুে বস্তু বস্তুে পারে, তবুও তাঁকে
ঠিক রম্যরচনা রচয়িতা বলা চলে না। অস্তু তিনি
কখনোই রম্যরচনা লেখেননি এ’ কথাও মিথ্যে নয়।
কারণ ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে আমরা অনেক সময়ই রম্যরচনা
বলে থাকি। এই নিরিখে প্রথম চৌধুরীও একজন রম্য
রচনাকার। তবুও আমরা বস্তুে বস্তুে তাঁর বস্তুে
প্রবন্ধই রম্য, ব্যক্তিগত, বা বস্তুে রচনার বস্তুে
অনুপস্থিত। কারণের বস্তুে, গুলিখোবের আবেশন
পত্র, গর্জন বস্তুে সংবাহ, বস্তুে ইত্যাদি কয়েকটি রচনাকে
রম্যরচনার পর্দাভুক্ত করা বস্তুে পারে বস্তুে, কিন্তু
বীতিবস্তুে হালখাতা প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ সংগ্রহ।
তবে বস্তুে রচনাটিতে আমরা নিবিধাধেই রম্যরচনা বা
রম্য সাহিত্য বস্তুে পারি। কারণ এই রচনার কাব্য-
বস্তুেই প্রবন্ধ বস্তুে হুটে উঠেছে। এই রচনার একটা
বস্তুেই আবেশন বা Intellectual appeal আছে।
তবুও বস্তুে আলোচনা করলে বস্তুে বস্তুে প্রথম চৌধুরীর
প্রবন্ধাবলীকে লামাত্রিক ভাবে রম্যরচনা বলা বস্তুে
পারে না। তবে তিনিও কিছু কিছু রম্যসাহিত্য বস্তুে
করেছিলেন যাকে নিম্নলিখিত রম্য-প্রবন্ধ নামে অভিহিত
করা চলে।

অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ

শ্রীমন্তরপ্রসাদ ভট্টাচার্য

॥ পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি ॥

সারা ভারত পাট উৎপাদনের চূড়ান্ত অনুমান অনুযায়ী চলতি ১৯৫৮—৫৯ বৎসরে ৫১,৭৮,০০০ গাঁট পাট উৎপন্ন হয়েছে। বেশ বিভাগের পর ভারতে এই সর্বাধিক উৎপাদন এবং গত মহৎম থেকে এবারকার উৎপাদন শতকরা ২৮ ভাগ বেশী। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পন্থিকল্পনাতে পাট উৎপাদনের যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল এবারকার উৎপাদনের পরিমাণ তা থেকে মাত্র ৩,২০,০০০ গাঁট কম। পাট চাষের জনিত পরিমাণও শতকরা প্রায় ৫ ভাগ বেড়েছে। পাট উৎপাদন সব থেকে বেশী হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এবং বিহারে। আসাম, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে আবার প্রতিবৃন্দ আবহাওয়ার জন্য উৎপাদন কিছু কম হয়েছে।

এই উৎপাদন বৃদ্ধির কলে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু দিন হ'ল পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পাট রপ্তানী করবার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু রপ্তানীর পরিমাণের মাত্রা সম্পর্কেও কিছু পরিহার জানান হয় নি। কোন কোন ব্যবসায়ী মহল এবং রাষ্ট্র সরকারেরও মতে রপ্তানীর এই অনুমতি বেশী দেরীতে পাওয়া গিয়েছে। স্তব্ধকবেই হাতে এখন বড় কোর শতকরা ২৫ ভাগ পাট আছে এবং বাকি ৭৫ ভাগ ইতিমধ্যেই আড়ংকারদের হাতে চলে গিয়েছে। কাজেই পাটের কিছু দুল্যা বৃদ্ধি হলে আড়ংকারেরাই বেশীমাত্রায় লাভবান হবেন।

রপ্তানীযোগ্য পাটের রকম সঞ্চে অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের মারফতে রপ্তানী হবে সেই সম্পর্কেও কোন ধরন জানান হয় নি। তবে আশঙ্ক করা যায় যে ট্রেড-ক্রিডিং কর্পোরেশনের মারফতেই রপ্তানীর কাজ চলবে। ভারতে বৈ-রকমের পাট হয় তা বিদেশের বাজারে চাহিদা

মেটাতে হবে না। যা কিছু ভাল পাট এদেশে আছে তা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদাই সম্পূর্ণভাবে মেটাতে পারে না। কাজেই তা রপ্তানীর কথা আসে না।

বিদেশের বাজারে পাট বিক্রয় করা এখন আর আগের মত সহজ নয়। সেখানে ভারতকে পাকিস্তান ছাড়া আইও কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বীর সন্মুখীন হতে হবে। চীন এখন পাটের একটি বড় বিক্রেতা এবং অল্প দামে সে বেশ পরিমাণ পাট বিদেশের বাজারে ছাড়তে পারে। বাইল্যান্ডও খুব উচুদরের পাট সরবরাহ করতে পারে, যদিও তার পরিমাণ খুব অল্প। বিদেশের বাজারে নিজ নিজ মাল কাটিতির জন্য প্রত্যেক দেশই যতদূর সম্ভব কৌশল অবলম্বন করবে। তবে পাকিস্তান তো শেনা যায়, বিদেশে রপ্তানী-যোগ্য পাটের উপর থেকে রপ্তানী-শুল্ক তুলে নেবার কথা বিবেচনা করছে। এ অবস্থার বিদেশের বাজারে আধিপত্য বিস্তার করতে চাইলে ভারতকেও পাটের উপর থেকে রপ্তানী-শুল্ক তুলে নেবার কথা মরত বিবেচনা করতে হবে।

১। বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি।

সাম্প্রতিক বাণিজ্যের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ ৫৫০ কোটি টাকার কাছে স্থির হয়ে আছে। অপরদিকে আমদানীর পরিমাণ ১৯৫০ সালের ৫৭০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে গিয়ে ১৯৫৭ সালে ১০২৫ কোটি টাকার দাঁড়িয়েছে। এই সময়ে বাণিজ্যে অতিবিক্ত দেয় টাকার পরিমাণ ৩৮ কোটি থেকে ৪২০ কোটি টাকার উঠেছে। ১৯৫৮ সালের প্রথম ৮ মাসে আমদানীর পরিমাণ হয় ৫১২ কোটি টাকা। গত বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় ১৪৭ টাকা কম। রপ্তানীর পরিমাণ আবার ৬২ কোটি টাকা কমে গিয়ে ৩৪৯ কোটি টাকার দাঁড়ায়।

রপ্তানীর পরিমাণ কম হওয়ার কারণ ছিল অব্যবস্থা হ্রাস।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বিতীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিনিয়োগী শিল্প-ঐক্য বৈশিষ্ট্য মাত্রায় আনয়ন করা হয়েছে। অর্থায়ন পরিকল্পনা বার্ষিক বিশেষ অগ্রগতির পথ বন্ধ করে দিতে হবে। দেশের অগ্রগতিক অব্যাহত রাখতে হলে আনয়নীয় বৃত্তি বৈশিষ্ট্য রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। দেশের উৎপন্ন অর্থসমূহের রপ্তানী বৃদ্ধির দ্বারা যে-সব প্রচেষ্টা চলছে বলে খবর পাওয়া যায় তা কেন চল-বতী হচ্ছে না সে বিষয় বিশ্লেষণ করে দেখা বরকার এবং প্রয়োজনীয়তার নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করার পথ সূচন করা আন্তঃপ্রয়োজন।

১. বৈশিষ্ট্য সমস্যা।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও প্রায় শেষ হতে চলল, কিন্তু দেশের বৈশিষ্ট্য সমস্যা যেন ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করেছে। দেশের কর্ম-সংস্থান-কেন্দ্র সমূহের হিসাবে ১৯৫১ সালে বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা ছিল ৩,০৬,০০২ জন, ১৯৫৫ সালে ছিল ৬,০৭,১০০ আর বর্তমানে (১৯৬৮) ১০,৮৬,১২৬ জন। বৈশিষ্ট্যের এই সংখ্যা বৃদ্ধি অবশ্যই চিন্তার বিষয়, কিন্তু সমস্যা কেবল এইটুকুই নয়। উপরেই এই সংখ্যাগুলি কেবলমাত্র তাঁদের দ্বারা এই সকল কর্মসংস্থান কেন্দ্র সমূহের সঙ্গে তাঁদের নাম পঞ্জীয়নভুক্ত করেছেন। কিন্তু এখন অনেক লোক আছেন যারা মানা কারণে এই সকল কর্ম-সংস্থান কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের নাম পঞ্জীয়নভুক্ত করেন নি। এদের সংখ্যা যোগ করলে দেশের বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা বহুগুণ উপরে উঠে যাবে। এ সব ছাড়া আবার অনেকে আছেন যারা বহুক্ষেত্র কর্মসংস্থান কেন্দ্রের মধ্যে নিযুক্ত থাকেন এবং বার্ষিক সময়ে বৈশিষ্ট্য থাকেন। আবার অনেক তাঁদের যোগ্যতার তুলনায় সামান্য কর্মে নিযুক্ত আছেন, যেমন এম. এ পাশ ব্যক্তি ৩০ টাকা মাসের হুজুরের গৃহ শিক্ষকতায় নিযুক্ত। বৈশিষ্ট্য সমস্যা সমাধান করতে হলে প্রত্যেককে হিসাবে নিতে হবে।

এক পশ্চিমবঙ্গেই ১০ লক্ষ বৈশিষ্ট্য আছে বলে

অনুমান। তার সঙ্গে বহিঃঅর্থবৈশিষ্ট্যের সংখ্যা যোগ করা যায় তা হলে মোট বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা ২০ লক্ষের উপর হাঁড়াবে। তার অর্ধে মোট কর্ম-সংস্থান শতকরা প্রায় ১০ ভাগ। পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় কর্ম-সংস্থান কেন্দ্রের সঙ্গে নাম পঞ্জীয়নভুক্ত করেছেন তাঁদের সংখ্যা ২ লক্ষের উপরে। এই বৈশিষ্ট্যের মোট বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রায় ৪ লক্ষ নিযুক্ত প্রাথমিক এবং এর প্রায় অর্ধেক প্রাথমিক এবং আরও উচ্চ শিক্ষার শিক্ষিত। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা একজন বৈশিষ্ট্য আছে।

এই বৈশিষ্ট্য সমস্যা কেবল মাত্র দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে স্বাস্থ্যকর যন্ত্রে বহু লোক বৈশিষ্ট্য আছে। কিছুদিন পূর্বকাল হিসাবে এক পশ্চিমবঙ্গেই প্রায় ১০ লক্ষ বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৭০০।

এর থেকে যোগ্যতার যে দেশে কর্মসংস্থান যে হারে বাড়ছে সে তুলনায় কর্ম-সংস্থান বাড়ছে না। দেশে বছরে প্রায় ৬০ লক্ষ লোক বাড়ছে। এদের কর্মসংস্থানের প্রশ্ন যে দীর্ঘকাল আকার ধারণ করবে তা বলাই বাহুল্য। কর্ম-সংস্থান বাড়ার দ্বারা এক্ষেত্রে যেমন উন্নয়নমূলক কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, অপব্যয়কে তেমনই ক্ষয়-নিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক। ক্ষয়-নিয়ন্ত্রণের অবশ্যকতা সম্পর্কে আমাদের দেশের নেতৃবর্গ প্রায় সময়েই উল্লেখ করেন, কিন্তু তা থেকে এখন পর্যন্ত কোন সুফল দেখা যায়না। ক্ষয়-নিয়ন্ত্রণ সমস্যা না হলে দেশের বৈশিষ্ট্য সমস্যা মোটামুটি সমস্যা প্রচেষ্টাই ব্যবস্থার পর্যবেক্ষিত হবে। ক্ষয়-নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করার দ্বারা কোন আইন প্রণয়ন করা হুক্তিযুক্ত কিনা তা দেশের কর্মসংস্থানের এখন বিবেচনা করে দেখা বরকার।

২. ভারতীয়করণের অগ্রগতি।

স্বাধীনতালাভের পর থেকে বিদেশী মালিকামায় বা বিদেশীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। ১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারীর ১০০০ টাকা এবং উপরে মাইনেতে নিযুক্ত ভারতীয়দের সংখ্যা আরও বেড়েছে।

১৯৪৭ সালে এইসব প্রতিষ্ঠানে ১০০০ টাকা ও তদ্ব্যবস্থায় মাইনেতে ভারতীয় ও অ-ভারতীয়দের নিয়োগের অবস্থা ছিল এইরূপ :—ভারতীয়—৫০৪ (৭২%), অ-ভারতীয় ৪,৮৪৪ (৯২%), মোট ৫,৩৪৮ জন। ১৯৪১ সালের অবস্থা ছিল ; ভারতীয়—১,৭৮৪ (২০.৪%), অ-ভারতীয় ৬,২৪০ (৭২.৬%), মোট ৮,০২৪ জন। ১৯৪৫ সালের হিসাবে এদের অবস্থা দেখা যায়, ভারতীয়—৩,৯২৪ (৩৭.০%), অ-ভারতীয় ৬,৮১০ (৬০%) মোট ১০,৭৩৪ জন। এবং ১৯৪৮ সালের হিসাবে অস্থায়ী এদের নিয়োগের অবস্থা এইরূপ, ভারতীয়—৬,৭০৪ (৪৪%) অ-ভারতীয় ৪,৬৪২ (৪৪.৭%), মোট—১২,৩৪৬ জন।

১৯৪৮ সালের হিসাবে দেখা যায় যে বিশেষভাবে আনুগত্যিক হার শতক বন্ধের প্রতিষ্ঠানেই কমে গিয়েছে। অপরদিকে ভারতীয়দের অস্থগত ১৯৪৭ থেকে সমানে বেড়ে গিয়েছে আর ভারতীয় মোট সংখ্যা গত ১১ বছরে ১০ গুণের বেশী বেড়েছে।

১০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা মাইনেতে ভারতীয়েরা শতকরা ৮৪.২ ভাগ পোষ্ট ১৯৪৮ সালে অবিকার করেছিল আর ১৯৪৭ ও ১৯৪৬ সালে এই মাইনেতে পোষ্ট অবিকার

করেছিল শতকরা ৭৭.৭ ভাগ ও ৬৭.২ ভাগ। পরবর্তী মাইনের স্তর ১৫০১ টাকা থেকে ২০০০ টাকান্তে নিম্নস্তর ভারতীয়দের অস্থগত ১৯৪৮ সালে ছিল শতকরা ৬২.২ ভাগ। ১৯৪৭ সালে এর অস্থগত ছিল শতকরা ৪৪.২ ভাগ। এর পরের মাইনের স্তর অর্থাৎ ২০০১ টাকা থেকে ৩০০০ টাকান্তে ভারতীয়দের অস্থগত ছিল শতকরা ৩৬.৪ ভাগ। ১৯৪৭ সালে এর অস্থগত ছিল শতকরা ২৯.৪ ভাগ। ভারতীয়ের মাইনে স্তর অর্থাৎ ৩০০১ টাকা থেকে ৪০০০ টাকান্তে ভারতীয়দের অস্থগত ১৯৪৮ সালে ছিল শতকরা ১৬.৪ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরে এর অস্থগত ছিল শতকরা ১৩.৭ ভাগ। দর্বাঙ্গ স্তর ৪০০১ টাকা থেকে আরম্ভ করে উপরে ভারতীয়েরা ১৯৪৮ সালে শতকরা ৬ ভাগ পোষ্ট অবিকার করেছিল।

এইসব প্রতিষ্ঠানে নিম্নস্তর ১০০০ টাকা ও তদ্ব্যবস্থায় মাইনেতে নিম্নস্তর ১২,৩৪৬ জন ব্যক্তিদের মোট মাইনে রেগে বর ২৮৪ কোটি টাকা। তারমধ্যে ভারতীয়রা পান ১০.৮ কোটি টাকা, অপর ভারতীয় হলেন শতকরা ৪৪.৩ ভাগ। আর বাকি ১৭.৭ কোটি টাকা পান অ-ভারতীয়গণ, যাদের অস্থগত হল শতকরা ৪৪.৭ ভাগ।



পুস্তক পরিচয়

হে যুদ্ধ বিদায় : আনন্ট হেমিংওয়ে। অমুবাদিকা
শ্রীশ্রীপালি যুগোপাধ্যায়। ১৫৫ পৃঃ।

সেতুর ওপারে মুক্তি : হেমন্ট এ. মিলেনার। অমুবাদিকা
শ্রীমদ্ব্যধিকারী চৌধুরী। ১১৭৫ নম্বা পয়সা।

নব বহুবর্ণ আশ্রম : টিকেন জেন। অমুবাদিকা : শ্রীমাননা
দেবী। ১১৭৫ নম্বা পয়সা।

ভারত-ই আজব দেশ : সিন্ধিয়া বোম্ব,। অমুবাদিকা
শ্রীশ্রীশ্রী রায়। ১১৭৫ নম্বা পয়সা।

আমার জীবন কথা : হেলেন কেলার। অমুবাদিকা :
মাসা তিয়া। ১১৭৫ নম্বা পয়সা।

কলিপাইনে কৃষি-সংস্কার : অ্যালভিন এইচ. ক্যাক।
অমুবাদিকা : শ্রীমদ্ব্যধিকারী চৌধুরী। ১১৭৫ নম্বা পয়সা।

রূপান্তর : ফ্রেডারিক নিউইন্স অ্যালেন। অমুবাদিকা :
শ্রীশ্রীশ্রী রায়। ১১৭৫ নম্বা পয়সা।

—পার্ল পার্লকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১২ ওয়াটার্স
ম্যানশন। বোম্বাই-১।

পার্ল পার্লকেশন্স বিখ্যাত বিদেশী বইয়ের অমুবাদ
করিয়ে শতাব্দী প্রচাদের ভার নিয়েছেন। অমুবাদ অধিকাংশ
কেবলই দাবলী ও অমুপাঠ্য হয়েছে আর বইগুলি হয়েছে
অতি সুসুন্দর। পড়তে আনন্দ, উপহার দিয়ে কৃতি।

প্রথম বইখানি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হেমিংওয়ের
পূর্ণাঙ্গী বিখ্যাত গ্রন্থ ক্রোয়াইয়েল-ই-অর্গনের অমুবাদ।

লেখক এতে তাঁর দৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে রূপ
দিয়েছেন। বিত্তীয় প্রবেশ বর্ণিত হয়েছে হাঙ্গেরীর অন্তর্ভুক্ত
ও সোভিয়েট কূটনীতির কাহিনী। কৃত্তরখানি নয়টি

স্বয়ংসিদ্ধ ছোট গল্পের সংকলন। টিকেন জেন উনবিংশ
শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আমেরিকান ছোট গল্প লেখক ও কবি।

‘ভারত-ই আজব দেশ’-এর পেন্থিকা এখন মা-বাবার
সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন তখন তিনি কিশোরী। বছর
দুই তিনি ভারতে ছিলেন। সেই সময়ে বা হেমিংওয়ে
তখনই তাই নিয়েই বইখানি লেখা। পঞ্জাব, দিল্লী,

শান্তিনিকেতন, দেবপ্রস্থ প্রভৃতি স্থানের স্মৃতিচিত্রগুলিতে
এসেছে প্রতি তাঁর প্রভা ও অমুপাঠ্য প্রকাশ করেছে।

অল্প বয়সে হেলেন কেলার বিজ্ঞানজ্ঞা, বচনাত্মক ও চরিত্র-
মাধুর্যের সমস্ত সকল বৈশেষ্য মাধুর্যের প্রভা সঞ্চার করেছে।

তাঁর আত্মজীবনী শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক।

‘কলিপাইনে কৃষি-সংস্কার’ের সত্যতা আমায়ের নব জীবন
প্রদর্শনী দেশবাসীর মনে প্রবেশা লাগবে। ‘রূপান্তর’

লেখানো হয়েছে আমেরিকান যুদ্ধযাত্রা বিশেষজ্ঞাধী
প্রথমবারে কি-কি যুদ্ধযাত্রার পরিবর্তন হয়েছে।

এ ধরনের অমুবাদ প্রবেশ মধ্য দিয়ে অল্প দেশের
মনোবীরের ভাব ও কল্পনার সঙ্গে সহজ পরিচয় স্থাপনের হে

অমুপাঠ্য হতে তা জীবনের গুরু বিশেষ মূল্যবান।

বিত্তীয় সন্ধি : গুইল্ফগার সরকার। এম. সি. মদকার
এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ। ১৪, বন্ধিম চাট্টো ট্রাষ্ট,

কলিকাতা-১২। মূল্য ১৫।

কবি তরুণ। পূর্বে তাঁর আরও দু’একখানি কবিতার
বই বেিয়েছে। বিশেষ আশার কথা, নৃতনবয়সে যোগে

তিনি বিজ্ঞান হ’নি। ধর্মের কথা তিনি সোচ্চারিত
বলতে চেষ্টাছেন এবং জগৎপন্থী করে বলতে পেরেছেন।

তাঁর রচনা নিত্য গত্যাহুপতিক নয়, উৎকট নৃতনও নয়।
যোগসম্মত এবং অমুতবোধে—এই অর্থে তা সত্যতনুদী,

আবার তাঁর কথা তাঁরই কথা, অস্ত্রের প্রতিধ্বনি নয়, এই
অর্থে তা নবীন।

"ও যবে তোমারি আমি বেশি আনা-গোনা।
তুমি পছন্দ। ঐ কি হাতের আঁচনা—
যে স্বর-সঙ্গীত বস। ই-তুমি মাঝে-বিত
আমি ক'র গান-ক'রি তুমি ঘনোনিতি।"

এতে ব'ব কবির নিজের মনের স্বর বোঝায়ে, তা বুঝতে
হ'র' হয় না।

"কসলী খোঁজ চল তালে।" শব্দ তার তুমি।

... ..
উঠেন নূ' হাও। গোখে লুকাও যে চল।"

—অনুভূতি-রঙিন হয়ে দেখা দিয়েছে এমন কত সুখ-
দুঃখের ঘূর্ণন। শব্দেব হিলসী-সীলার মাতেনি তাঁর মন।
এক'মকার কথা বলতে গেলে দুঃখের ছবিই সূটে উঠেছে।
যেমন, ইংলি:তে। তাঁর মানসী কোথায় আছে পরীর
শিউ ছাড়া—

"বজ্রবার তুমি তার মণুকঠ। কলকলি তার
কান পেতে শোনা দ'র। উঠোনের ঢেঁকিতে
পড়ে লাড়।"

যৌগিক ছন্দেও যাত্রা-গণনার কবি দ্রুত ভাবেই
গোখের চেয়ে কানের উপর বেশি নির্ভর করেছেন। বস্তুতঃ
এতে স্থিতিস্থাপকতা বা সামঞ্জস্য আসে স্বত্বনির শোষণ
শক্তিও গুণে: "অবতর ক'ন কথা"তে যদি আপত্তি না
করি, তবে "বামটা ঘুখে কলসীতে কে" বল নিলে
আপত্তির কারণ থাকতে পারে না।

সঙ্গায় মন নিয়ে গিবেছেন বলেই কবি উগ্র বিভ্রাট
যোষণা না করেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করতে
পেরেছেন এবং সেইখানেই তাঁর প্রকৃত মর্যাদা।

—বা



এমন কিছু কঠিন নয়

ছোট ছেলের পক্ষেও সম্ভব যদি ঠিকমতো
ধৈর্যে দেওয়া যায়



আপনার সক্ষমতায়
আপনার পুণ্যের কর্ম-জীবনের
সামান্য বিমোক্ষভাবে
সূচিত করবে।



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪ নং লাইভ বাট স্ট্রিট, কলিকাতা-১



॥ আগপূর কংগ্রেস ॥

নাগপুরে ইতিপূর্বেও কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছে। বিশেষতঃ ১৯২০'র অধিবেশন অস্বাভাবিক, কারণ ঐ বৎসরই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কংগ্রেসের সেই অধিবেশনে আন্দোলনের গতি ও সম্ভাবনা আলোচিত হয় এবং আন্দোলন সম্বন্ধিত হয়।

অজ্ঞাত পূর্ব পর্যন্ত নাগপুর ছিল মধ্যপ্রদেশের রাজধানী। বর্তমানে সে দৌরহাৎ থেকে বঞ্চিত হলেও একটি সমৃদ্ধ নগররূপে তার প্রতিগতি আছে। শুধানকার বিখ্যাত স্বামী জননায়ক অন্তঃকরের নামে নাম বেওয়া চলেছিল অধিবেশনস্থলে—“অন্তঃকর-নগর”। সভাগুলো ২০,০০০ লোকের বসবার ব্যবস্থা ছিল। কোন স্থান শূন্য ছিলনা। বাইরেও বর্ষক বা শ্রোতার ভিড় কম হয়নি। কংগ্রেস-সম্পর্কে দেশের আমল ও শ্রদ্ধা এবং ঐশ্বর্য্য আছে, যোঝা যায়। অস্বস্তি তা অংশতঃ তার পূর্ব দৌরহাৎ ভেদ। স্বাভাবিক আদর্শ বহুর রেখে চলতে না পারলে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা নিবিল হয়ে পড়বে, যোগ হয় কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছেও।

এবারে প্রধানতঃ ভারতের বৈদেশিক নীতি এবং গঠন পরিকল্পনার সম্বন্ধে কথা হয়েছে। শ্রীমহন্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন : কৃষি এবং শিল্প—উভয়েই উন্নতিসাধনে আমাদের মন দিতে হবে। শিল্পোন্নয়ন ব্যতিরেকে দেশের অত্যাধিকার মন্তব্য নয়। কৃষিক্ষেত্রে যত্নসম্পন্ন সমস্যা গ্রহণ অসম্ভব করতে হবে। পণ্ডিত জমির পুনরুদ্ধার হলে তা দিতে হবে ভূমিহীন কৃষককে। শ্রীমতী হুচেতা কৃপালনী আরও ক্রমবর্ধমান বাহান এবং বেকার-সমস্যাও প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

শ্রীমহন্তের পর কে সভাপতি হবেন, এখনও স্থির হয়নি। কিছুদিন আগে নির্বাচন হবে। যিনিই হ'ল, আর কংগ্রেসকে কর্মক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করে তোলবার ক্ষমতা হারিব তাঁর; এবং সে হারিব বহন বিশেষ শক্তি ও প্রতিভামাপেক্ষ। শুধু সংস্কারী কাজের অনুযোজন ছাড়া বেশ গড়ার কাজে কংগ্রেস বিভাবে নিজেদের সার্থক করে তুলতে পারে সে কথা আর ভাবতে হবে।

॥ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ॥

সংস্কৃতির নামে যে ছাত্রাশ্রমি চলেছে, তাকে আর প্রগ্রহ বেওয়া উচিত নয়। শ্রদ্ধা, সংঘ, নিষ্ঠা যেখানে উপহাসের বস্তু, সেখানে আর যাই থাকুক, সংস্কৃতি নেই। বেশবাসী মাহিভা, শিরঃ সর্পভেদ অহুতাগ্নি হয়, ভালো কথা। কিন্তু তা নিয়ে চেলেবেলা কববার অধিকার তাদের নেই।

নাগপুর কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাকি চিত্র-তাইকাবের বেখবার কজে এক প্রবীণ দলক হাতাহাতি মারামারি করেছে এবং পুলিশকে লাঠি চালাতে হয়েছে। কংগ্রেস-নেতাদের সংস্কৃতিও কি শেষ পর্যন্ত চিত্রতাইকাবের হাতে দিয়ে বেয়েছে? সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নাম করে শ্রদ্ধা চিত্রতাইকাবের ভায়েতে কববার ব্যবস্থা করেছিলেন? সব পর নাকি গোয়ে পৌছেছে। ছেলে পড়ে লকসে তো চিত্রতাইকা-ভজ্ঞান অভ্যাস করেছে। জানোজ্ঞী বেশ নারকেভাও কি তাদের বলে যোগ দিয়েছেন?

॥ সোভিয়েট রাষ্ট্র ॥

সোভিয়েট রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক নীতি নিয়ে বৈচিত্র্য জননা করনা যথেষ্ট চলেছে। সে দেশ থেকে যে হাউই

টানের অভিমুখে পাঠানো হয়েছিল, তা টানের এলাকা ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে। ঘটতো তা এখন স্বর্ষ প্রকটিত করছে।

কেউ বলছেন, মানুষের তৈরী এই কৃত্রিম গ্রহ দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করবে, কেউ বলছেন, অতিরে নেমে আসবে। কতদিনে আমরা চন্দ্রলোকে যাতায়াত করতে পারবো, তারও অনেক বিস্ময়-কিতাব চলছে।

বিজ্ঞান মানুষের বিশ্বকব শক্তির সন্ধান দিচ্ছে সংস্কৃত

নেই। তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, আনন্দোচ্ছাদ-প্রকাশে আমরা বাড়াবাড়ি করছি। হাইট-ওড়ানোর চেয়ে আশ্চর্যের সাধনা কি কোন অংশেই নিকটই বা 'কম' কল্যাণকর? সে-বিকে দুটি বা মনোযোগ ক'লনের আছে? বহির্জগতের এ সকল কৌতিকে আমরা ছোট করতে চাইনা, এর উপযোগিতাও অস্বীকার করতে চাইনা, শুধু অরণে রাখতে চাই যে অন্তর্জগতের কীতি এর তুলনায় উপেক্ষীয় নয়।

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে সবাই কোলের সমস্যাতে শরীর
ও মস্তিষ্ক ব্যথিত হয়, রক্ত পথভ্রান্তের
মাধ্যমেই তাবা পূরিত হতে পারে; তাই
রক্তকে প্রাণবদ্ধ প্রথম উপায়
হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত
হয় পড়ে, তখন স্বভাবতই বিভিন্ন
কঠিন ব্যাধির আক্রমণে ভীষণ দুঃখ-
ব্যস্ত হয়ে ওঠে।



সারিবাতি সঞ্চিাদি পান্য অতি শ্রুত
যাতে ভ্রমের সম্ভাবনা নাই।
রক্ত পথের অপ্রত্যক্ষ পথের
সারিবাতি সঞ্চিাদি পান্যের
কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, শোথ, ক্রান্তি,
প্রতি কষ্ট, একতম প্রভৃতি সমস্ত
চর্মরোগ, হাত ও পৃষ্ঠের জীবাণু
সাক্ষমভবিত সমস্ত রক্তের
সম্পূর্ণ নিষ্কাশন হয়, জিহবার জ্বরা
স্বাভাবিক হয়, মুখা শুষ্ক পায় এবং
শরীরে প্রচুর বিশুদ্ধ রক্ত
সঞ্চিত হয়।

সারিবাতি সালসা

ওষধি রক্ত পরিষ্কারক ঔষধি



স্বদেশী ঔষধোৎপাদক যোজ, এবং
আরোহণ শাস্ত্রী, কলিকতা (বর্তমান),
এমবিসি (আমেরিকা), কলিকতা
কলেজের রসায়নবিদ্যে ডক্টর
স্বদেশী।

কলিকতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এমবি (কলি), অ্যান্টিসি-আর্জি।

• ৩৬নং গোয়ালপাড়া রোড, কলিকতা-৩৭

সাধনা
ওষধি
টাকা

পাণ্ডা ও অমলী-গুণিয়ার সর্বস্ব।

আপনার
রক্তনোপকরণে
যে পুষ্টি
চান

হনুমান

বনস্পতি



সাহ স্কেন ইন্ডাস্ট্রিজ

'এ' এবং 'ডি' ভিটামিন দ্বারা সমৃদ্ধ

বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আপনার অধিকার করে
৬ গাং এবং ১০ গাং চিনি
প্যাক করা। ৩৩ গাং চিনিও
স্বাধীন দায়।

একত কারক
ফ্রোন্টল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ

ভালমিয়ানগর, বিহার

সুখাদাই সুখ ও

স্বাস্থ্যের উন্নাদান

(R.M.V-2/8)



একবিংশ বর্ষ

ফাল্গুন, ১৩৩৩

একাদশ সংখ্যা

স্মৃতিকথা শ্রীকালিদাস রায়

আজকাল রবীন্দ্রনাথের মতো বড় কবিও নাকি নিখার প্রয়োজন ছাড়া দেউ বড় একটা করে না। একথা সবাই জানে। যাহা, আনন্দের যেমন বেশ, যেমন তার বিজ্ঞানবুদ্ধি, যেমন তার রুচিপ্রবৃত্তি, যেমন অস্ত্রাঙ্গ দিকে তার প্রগতি তার সাহিত্যও তেমনি হোতে হবে। ভারতীয় জীবনের অস্ত্রাঙ্গ দিকের সঙ্গে সাহিত্যেরও সামঞ্জস্য আছে। রবীন্দ্রনাথের মতো Towering genius এ দেশে একটা accident. সেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনার অস্ত্রাঙ্গ সাহিত্যিকদের এতটা নগণ্য মনে করা হ'ত না। শুনতে পাই আজকাল বিগ্গল অধ্যাপকদের অনেকের বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে বনিষ্ট পরিচয় হয়েছে, অনেকে ইউরোপ আমেরিকা ঘুরেও এনেছেন—তারা বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের তুলনা ক'রে বলেন—এদেশের সাহিত্য সব রাশি। সেখানেও অনেকেরই বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ছিল—তারা বহু ভাবাবিধ পণ্ডিতও ছিলেন—কিন্তু তারা বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা ক'রে বঙ্গীয় সাহিত্যের বিচার করতেন না।

আজকাল বিগ্গল অধ্যাপকদের প্রধান প্রামাণ্য বিধ হয়েছে—বঙ্গীয় সাহিত্যে কিছুই বিশেষ নেই। এদখা তারা Gospel বা message এর আকারে Bombshell এই মতো আঘাতের মধ্যে ঝাটেন। আমরা একবারে হক-

চকিয়ে বাই—তরুণ-তরুণীরা আনন্দে লম্বমান ক'রে ভয়ধ্বনি ক'রে বলেন—“হাঁ, এতদিনে আমরা সত্য কথা শুনলাম—কাপুত্ব ভীতির দল ভেদে শুনেও যা বলতে সাহস করিনি,—এতদিন পরে একজন জ্ঞানবীরের মুখে আসল কথা শুনলাম। এই নয় এখন ভগ্ন করতে হবে।”

বাই হোক ইংরাজি ভাষাটা সংস্কৃতের কাছেই পড়ে ছিল।—ইংরাজি ভাষার নাবল্যে আমরা বিশ্বসাহিত্যের কিছু কিছু খোঁজ রাশি, তবে বিগ্গল পণ্ডিতদের মতো original বই পড়িনি, কিন্তু বঙ্গ ভাষা original থেকে কিছু কিছু অংশ উৎকলন করেন এবং আঘাতের মতো নুড় গৌড়জনের গল্প নীচে তার ইংরাজি অনুবাদ করতে যেন—তখন আমরা নুতর হয়ে পড়ি। উদ্ধৃত্যশের মহিমান্বস কিছুই জ্বরপদ করতে পারি না।

বিগ্গল পণ্ডিতদের gospelগুলি ব্যক্তমানস। সে ব্যক্তনা এই—তোমরা যতই ভিত্তি পাও—আর সেখাপড়া জানার বড়াই করো—তোমরা সবাই নুড়, অবশিক, অজ্ঞ ও uncultured. অতএব “শূণ্ড তে নৃত্যঃ।”

এদেশের কবিতার মধ্যে শেখ কথা এঁদের প্রায় বলা হয়েছে—বাকি আছে শুধু রবীন্দ্রনাথ সত্যে শেখ কথাটা বলার। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে অভিধান, প্রকৃতপক্ষে তা রবীন্দ্রনাথেরই বিরুদ্ধে। যে যে কারণে তার শিষ্টাঙ্গ

বিবৃতিত আছেন—সেই সেই কাহণগুলি রবীন্দ্রনাথের কবিতার পূর্বাভাসেই বর্তমান। এখন Logicএর Syllogismএ সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের ‘রূপার পাত্র’ হয়ে ধাঁড়িয়েন।

কবাসাহিত্য সম্বন্ধে Writers' Conferenceএ যে message উদ্বীর্ণিত হয়েছে—এখনও তা বার বার পুনরাবৃত্ত হয়নি। তাঁরা নিশ্চিত আছেন—কিন্তু “থুঁটে পোড়ে গোবর ছাঁদ,” প্রবাহটি মনে রাখবেন। কথা সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ Bombshell বিশেষ কার্যকরী হবে না—এর ভল্ট চাই Atomic Bomb. সেমস্ত্র বোম্ব হয় বিপদ হচ্ছে।

ভাবের সব দেশের শিক্ষার সঙ্গে তুলনা ক’রে এদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে একটা Gospel এর প্রত্যাশা করছি। সভ্য দেশের শিক্ষাপদ্ধতির তুলনায় এই দরিদ্র দেশের শিক্ষা পদ্ধতি যে নগণ্য—তা আশ্রয় জানি। কিন্তু এসম্বন্ধে gospel এখনো উদ্বীর্ণিত হচ্ছে না কেন? যে ডাঙলে বসে ভুলটী বাস্তব উদ্বীর্ণিত হবে সে ডালটায় কুড়ালের কোণ খাটো খোঁচ হয় অসম্ভব। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্ত—বাংলা সাহিত্য এখন রাবিন, তখন এর উপর গোষ্ঠার গোষ্ঠার ভি-কিলের খিসিস কি ক’রে হয়? এটার সম্বন্ধে বিখ্যাত পণ্ডিতের কোন মন্তব্য তো দেখি না। ভি-কিলখানার বিস্তারিত তো অস্তিত্বান হবার কথা। Beethoven, Wagner, Mozart, Tchaikovsky ইত্যাদি সঙ্গীত কণ্ঠোচ্চারণের নদ্যে তাঁরা ভাসছেন—এদেশের গানে তাঁরা নাখুঁঁ কিছু পান কিনা—তাও তো শুনবার মন্ত্র প্রতীক্ষা করছি।

যাক, এখন যা বলছিলাম—তাই বলি। কবি রবীন্দ্রনাথকে তো রবীন্দ্রনাথের অঙ্ক অঙ্ককারী ব’লে এযুগের বঙ্গ পণ্ডিতেরা অর্ধচন্দ্র ধিরেছেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছন্দোবদ্ধ ও পদবিভাগের পাবিপাটী ও পদবিদ্বত্ত্য শিখিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সে অঙ্গুলি এখন তাই নির্ভর সঙ্গে পালন করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার হাওয়াই ছিল আলাদা। রবীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ অতীন্দ্রিত ভাবমগ্নতার কবি, রবীন্দ্রনাথ একেবারে বাংলার মাটির বাতাস অঙ্গভের কবি। তাঁর

বচনার আশ্রয় পেয়েছি মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের পার্শ্বস্থ সুখদুঃখ, বাঙালী জীবনের মাদুর ও বাঙালীর গুণ-উন্নয়ন, আশা আকাঙ্ক্ষার কথা। রবীন্দ্রনাথের বচনাদি ব্যাখ্যা ছিল না—একথা সেই বলগে যে তাঁর কবিতা মন দিয়ে পড়েনি। না পড়বারই কথা। শেষ ২৪ বৎসর তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি একেবারেই পাণ্ডুলিপি থেকে না। মাত্র কয়েক মাস ছ’ল তাঁর কবিতার একটা সংকলন বেচিয়েছে। গত ২৪ বৎসরে তাঁরা যৌবন প্রাপ্ত হয়েছেন—তাঁরা কবির কোন বই চোখেও দেখেননি। ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে তাঁর মৃত্যু হয়েছে—মৃত্যুর আগে ১১/১২ বৎসরে তাঁর কবিতা খুব কমই মাসিকে বেচিয়েছিল। আমরা তাঁর কবিতাবলী মন দিয়ে পড়ে জানকই পেয়েছিলাম। কয়েকই—তাকে অভিনন্দিত ক’রে কিছু মাত্র তুল করিনি।

বঙ্গভাষার বার্ষিক সম্মেলন হ’ত উত্তর কলিকাতা অঞ্চলে কোন না কোন বাগানবাড়ীতে। এই সম্মেলনের ভাব নিভেন আমার ভাই রাধেন। এর বেশির ভাগ খরচ সেই-ই কতক পকেট থেকে রিত, কতক সংগ্রহ করত চাঁপা ক’রে। এই সম্মেলনে বঙ্গভাষার পরিচিত সকল সাহিত্যিকই যোগ দিতেন। এর মন্ত পৃথক নিমন্ত্রণও করা হ’ত। এই সম্মেলনে মনোজ বসু ও বিদ্যুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব উৎসাহ দেখা যেত। এরা বাগানময় ছুটাছুটি করে বেড়াতেন।

প্রথম সম্মেলন হয় বেলঘরিয়ায়, এতে বঙ্গভাষার সর্বমোষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বাংলা ১৩৩৮ সালের ৬ই ভাদ্র, জলধর সেন সভাপতি হয়েছিলেন।

পরবর্ত্ত অতিমন্দ সম্রাট উপস্থিত হতে পারেননি, তিনি আমার নামে একখানি পত্র পাঠিয়েছিলেন সভায় পড়বার মন্ত—

সেই চিঠিখানা এই—

সাবিত্যবদ্ধ, পানিজাল

কল্যাণীয়েষু,

তাই কালিদাস, তোমার চিঠি পেলাম। আমার একটা দুর্ব্বল আছে—যে আদি চিঠির জবাব দিইনে। সেহাং মিথ্যে

বলতে পরিবে, কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে তুমি নিমন্ত্ৰণ পাঠিয়েছ তাতেও যদি সাড়া না দিই তো। শুধু যে অশৌভক্তের অপরাধ হবে তাই নয়, কোন দিক থেকেই যে দতীনকে সমাহার জানাবার অংশ নিতে পারলাম না সে চুঃখের অবদি থাকবে না। অনেককই জানে না যে দতীনকে আমি সত্যিই কত ভালোবাসি। শুধু কেবল কবি বলে নয়, তাঁর ভেতরে এমন একটি স্নেহসদৃশ বস্তুগৎসদ সত্ত্বন আছে যে তার স্পর্শে নিজের মনটাও তৃত্বিত করে আসে।

যতীন জানেন, আমি তাঁর কবিতার একান্ত অমুহাঙ্গী। এখন যখনেই তাঁর কবিতার মেধা পাই, বাহবার করে পড়ি। বিত্ত লক্ষ্যে নিরুপল ছন্দগুলি কানে কানে যেন কত কি বলতে থাকে।

কারও সম্বন্ধেই নিজের অভিমত আমি সহজে প্রকাশ করিনে,—আমার মতোই যোগ্য হয়। ভাবি আমার মতামতের মূল্যই বা কি, কিন্তু যদি কখনো বলতেই হয় তো সত্যি কথাই বলি। যতীনকে সেহ কবিতা, কিন্তু মেহের অভিশ্রোয়াজি দিয়ে তাঁকেও খুঁজি করতে পারতাম না সত্যি না হ'লে। বাক একথা।

তোমাদের অন্তর্ভুক্তি ছোট,—যেই তো ছোট। কিন্তু তাই বলে তার হামটি ছোট নয়। এ তো ট্যাটারি দিয়ে বহুলোক ডেকে এনে উক্ত কোলাহলে “লর, যতীন বংশটী কি লর!” বলায় ব্যাপার নয়, এ তোমাদের ছোট বসন্তের ঐতিমত্বজন অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ দিনে ও বিশেষ স্থানে জনকয়েক সত্যিকার সাহিত্যগতিক ও সাহিত্য সেবী একসঙ্গে মিলে আর এক জন সত্যিকার সাহিত্য-সেবককে মাঝে আনান করে এনে বলা—‘কবি, আমরা তোমার সাহিত্য সাধনার আনন্দলাভ করেছি, তোমার ব্যক্তি-পূজা সার্থক হয়েছে, তুমি সুখী হও, তুমি দীর্ঘায়ু হও, আমরা তোমাকে সর্গীশুঃকরণে ধন্যবাদ দিই,—তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর।’ এই তো ? আরোজন সামান্য বলে তোমরা ক্ষুব্ধ হয়ে না।

কিন্তু তবুও সংগলনে একটুখানি ত্রুটি ঘটলে, আমি যেতে পারলাম না। কারণ, আমি যোগ্য করি তোমাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়।

এ অকলটায় ব্যারাম জাঁকান নেই, কিন্তু হঠাৎ কোথা

থেকে হস্তভাণা ভেঙে এসে জুটেছে। সকাল থেকে ছোট ছেলে মেয়ে ছুটির চোখ ছল ছল করতে, চাকবরের ভন দুই ছাড়া সবাই বিছানা নিয়েচে, আমার এক নাক বন্ধ, অস্তটার টিউবওয়েলের পীলী শুক হয়েছে, বাজি নাগায় যোগ হয় যেহ মন প্রাণ উৎসবে যোগ যোগ, আজাদে ইনারায় তার ধর পৌছোচ্ছে। নইলে এ অন্তর্ভুক্তি আমার নামে তোমাকে পর-বাঞ্ছিতব্য চ্যাবা টানতে বিস্তার না।

অনেক উপস্থিত আছে, এই সুযোগে একটা চুঃখের অগ্রঃবাগ জানাই। কালিহাণ, তুমিও তো প্রায়শঃবালক (?) হতে চললে। আগেকার দিনের সকল কথা তোমার স্মরণে না থাকলেও কিছু কিছু হয়তো মনেও পড়বে। এ দিনের মতো দেখিনে আমরা এমন করে পরস্পরের ছিন্ন বৃক্ষে বেড়াতে না। এক আখটা ব্যতিক্রম হতে যাচ্ছে, কিন্তু এখনকার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। সাহিত্য সেবকদের মাঝখানে তাদের আদান-প্রদান একেই কাছে অপরের দেওয়া এবং পাওয়া চিরদিনই চলে আসছে এবং চিরদিনই চলবে। কিন্তু ততখালসের মধ্যে অংকল একি হতে চললো ? নিম্নে করার এ কি উদ্দাম উৎসাহ, মানি প্রজাদের একি নির্ধর অধ্যবসায় ? কেবলি একজন আর একজনকে চোর প্রতিপন্ন করতে চায়।

খবরের কাগজে এসে হতে দেখি ততই যেন মন লজ্জায় চুঃখে পতিপূর্ণ হয়ে আসে। ক্ষমা নেই, ঐখ্যা নেই, বেহনাবোধ নেই, হানাহানির নিষ্ঠুরতা যেন শেষ হতেই চায় না। কোথায় কার সঙ্গে কার কতটুকু মিলেচে, কার লেখাথেকে কে কতখানি মকল করেছে, ক্রক কতু কঠে এই খবরটা বিশ্বের বহুরারে ঘোষণা করে যে এরা কি সাহসী অন্তর্ভুক্ত করে, আমি ভেবে পাইনে। তবে বাইরে কেবলি জানতে চায় যে বাঙালি দেশের সাহিত্যিকদের বিবেকের চুবি করা ছাড়া আর কোন মধ্যই নেই।

যতীনকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে, অতি পরিশ্রমে বৃক্ষে বৃক্ষে এই গোয়েন্দাগিরির কানটা তখনও অমোদের সাহিত্যিক মহলে প্রচলিত হয়ে উঠেনি। বাই হোক কাননা কবি তোমাদের বসন্তের রসিকদের মধ্যে যেন এ ব্যাপি কখনো প্রবেশ করবার দরজা খুলে না পার।

কবি নই, মনের মধ্যে কথা ভয়ে উঠলেও তোমাদের
মতো প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাইনে, শুধিরে বলা হয় না।
তাই চিঠি লেখা হয়ে যায় আমার ডিইদিনই এলো-যেথো।

তা, হোকেন এলো-যেথো, তবু এমনি করেই বলি,
তোমাদের বঙ্গচক্রের অর হোক, তোমাদের আজকের
আয়োজন সতল হোক এবং বতীনকে বোলো শরৎ
তাকে এই চিঠির মাধ্যমে মেহাশয়ীকরণ পাঠিয়েছেন।

ইতি—২ই ভাদ্র, ১৩৩৮।

—শরৎকবি

রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে এই আশীর্বাদী পাঠিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদী

আমরা তো আজ পুরাতনের কোঠার,

নতুন বটে ছিলাম কোনো কালে।

বসন্তে আজ কত নতুন বৌটার

হ'ল কঁড়ি বাঁধবনের ডালে।

কত ফুলের বোঁদে বসে চুকে

এক বেলাকার মৌমাছিদের প্রেমে।

মধুর পালা বেগুণগার মূখে

করা পাতার অগ্নিকে যায় ধোমে।

ফাটন-ফুলে ভরেছিলে শালি

শ্রাবণ নালে আনো ফলের ভিড়।

নেতাকেতে ইন্দু উঠে ব্যালি

সুত-বাধাবে বিক কানাকার বীড়।

২রা ভাদ্র, ১৩৩৮

—

অভিনন্দন পত্র

হে কবিবর,

তুমি জীবনবিধাতার আশীর্বাদে পকাশ্যে বর্ষ অভিক্রম
করিয়া বহিঃ-স্তরে দূরবোধে বহিঃশৈলপানে যাত্রা করিয়াছ,—
আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তুমি সাবক্ষত সাধনার রপ-
সূত্রের দ্বারা পৌড়কনের দাবী তৃকার পরিতৃপ্তিমান
করিয়াছ,—সংসার-বিবৃদ্ধের দুইটি অদ্বৈত-কলসই আমরা
তোমার মাধ্যমে লাভ করিয়াছি। আজ আমরা, তোমার
অনুভব সুবর্ণ, তোমাকে কৃতজ্ঞ অন্তরে অভিনন্দিত
করি।

তুমি বনীর গৃহে অগ্রগণ্য কবিগণ পতিত লাহিত ও
দীনদীন-হেতু কবি,—তাই তোমার অভিনন্দনে আজ ঘটা-
সমারোহের কোন আড়ম্বর নাই। আমরা জানি, এই
অনুভবের স্বতঃস্ফূর্ত, বহুদল প্রভাঃপ্রাপন তোমার হেচনায়ই
হইবে।

যে কয়েকটি ভাগ্যবান সাহিত্য সাধক কবি-রবিকে
ঊষার উদয়কালেই বরণ করিয়াছিলেন,—তুমি ঊষার
মধ্যে অগ্রগণ্য। ঊষার আশীর্বাদ তোমার কাব্যে
কৌশলীকৃতিতে পরিণত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে
আদর্শ-কাব্য বলিয়া গণ্য করিলে তোমার কাব্য-সাধনাকে
উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।

তুমি এক বিষয়ে অব্যবহা, সংকল্পের অজ 'বতীজ'
নাম তোমার সার্বক। সংকল্প-গুণেই তোমার কাব্যকলা
বসন্তায়।

পশ্চিমবঙ্গে তুমি সর্বপ্রথম পল্লীকবি। দূঃখ দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট
শরল অনাড়ম্বর পল্লীজীবন তোমার লেখনীর কৃষ্ণ-স্পর্শে
বসন্ত।

তুমি বাঙ্গাল্য-প্রেমের কবি।—বাঙ্গাল্য-প্রেমের মাধুরী-
স্পর্শে তোমার লেখনীতে যে রোম্যক গাণিগাছে—তাৎ
বঙ্গ-সভ্যতার ঐতিহ্যের কমল-বৃগালে অক্ষর হইয়া আছে।

তুমি বাংলার পারিবারিক জীবনের কবি।—
পারিবারিক জীবনের মাধুরী তুমি যেমন আকর্ষণ উপভোগ
করিয়াছ, সেই উপভোগের আনন্দও শু শুভমি তোমার
কাব্যে নানা ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

এ সুপে তোমার করে দেশ-প্রেমের বোধনশল। দেশের
অন্তর্যাক্ষর ভীতিভুক্তি বাণীকে তুমি তোমার কাব্যে মুক্তি
হান করিয়াছ। মুক্তি-ঐর্ষ্যধাত্তি-বলের প্রাণে, হে
চরণকবি, তুমি উদ্ভীপনার সকার করিতেছ।

তুমি বাংলায়, শাসন-মাধুরীর কবি, তোমার করে
বাংলার প্রাণমাতারো শাসন। তাঁহাতে আজিও আগমনী-
বিজ্ঞান মেঘদৌলভারী মুখ্য বা ধনিত হইতেছে।

নিগণ-নাভার আনন্দচূলাল কবি তুমি। তুমি ফুলের
মত ফুলে ফুলে মধুগান করিয়াছ,—প্রাণপতির স্রাব শ্রাম-
কুঞ্জের কঁকে কঁকে বিহার করিয়াছ,—চাতকের মত নব-

বননিষ্ঠ গগনে গগনে তুফান বারি ঝাটরাহ,—মহালের মত
পল্লবনে কুতূহলে কেলি করিরাহ।

তুমি শোভন সামন্তের কবি, অমৃতুত্তির সহিত পদ-
বিশ্লেষণে এমন যক্ষ্ম সাধারণ কারণবিত্তে দুর্লভ।
তোমার কাব্যের অন্তরে ঐশ্বর্য যেমন অপূর্ণ—বহিঃস্থ
ভেমন অনবৃত্ত—তোমার অলঙ্কার এমনই কল্যাণ-
প্ৰীতিভিত্তি যে, কাব্যে অলঙ্কারের উপস্থাপন কাব্যের স্বকীয়তা
বা প্রগতি নষ্ট হয় না—। তোমার কাব্যধারা যক্ষ্মা ও
প্রসঙ্গ। তাহার গতি সাবলীল ও জবা,—কাব্যে
পাতিতত্ত্ব বিস্তার নাই—তত্ত্বের আবর্ত নাই,—স্বাভাব্যের
ধেনিলোচ্ছলতা নাই।

হে চিত্র-নির্ধ্বজ, বননিষ্ঠার কবি,—জ্ঞান অন্বেষণ
তোমার মেঘের দুর্গ-প্রাচীরে তেজ করিয়া আঘাত অন্তরকে
বিস্তৃত করিতে পারে নাই। তুমি যতই প্রবীণ হইতে
প্রবীণতর হইতেছ,—ততই তোমার কাব্যে নব নব
বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইতেছে—। তোমার লেখনীর ওজস্বিতা ও
স্বাভাব্যতার বিপুলতা হ্রাস হয় নাই। তোমার মনে চিত্র
বসন্ত,—তোমার দীর্ঘনে চিত্র যৌবন।

বিশ্ববিদ্যার কাছে আমরা সমবেত প্রার্থনা করি,—
তুমি সুদীর্ঘ আয়ুঃ ও অমূল্য স্বাস্থ্য লাভ করিয়া আমাদের
মন্দির কর্ণ এবং বার বার অভিনন্দিত হও। *

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

গুরুদ্বন্দ্ব

বেলঘরিয়া, (২৪ পরগণা)

রসচক্রের সত্যবন্ধ

এই অভিনন্দন সত্য বহু সাহিত্যিক (তরুণ ও প্রবীণ)
যোগ বিহাছিলেন এবং প্রায় সকলেই গল্পে কিংবা পক্ষে
কবিকে অর্থাৎপ্রধান করেছিলেন। কাব্যী নবজন্ম স্বচিহ্নিত
গান পেয়েছিলেন, অভিনন্দন পত্রটি আবারই চিহ্নিত।
সমস্ত রচনাই উপাধনার যতীঃসংখ্যার প্রকাশিত হয়েছিল।

শতচক্র বন্ধন বাণিজ্যে এসে বাস করেন—তখন
আমাদের রসচক্রের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। নামজালা
সাহিত্যিকরা একে একে আমাদের ত্যাগ করেছিলেন—
অসাহিত্যিক-প্রধান মজলিসে তাঁদের প্রতিভার যথাযোগ্য
মর্যাদা বসিত হ'ত না ব'লে তাঁদের কারো কারো বিশ্বাস
ঘুগেছিল। রসচক্র নিয়ে কোন কোন সাময়িক পত্র ব্যঙ্গ-

বিজ্ঞপ্তি করতো বলে রসচক্রের সংসর্গে কাব্যী বাছনীর নয়
মনে করে কেহ কেহ আমাদের প্রতিযোগ করেন। কেউ
কেউ শোকারত্রে, কেউ কেউ বা বেশভূষার চলে যান।

এই দুঃসময়ে শতচক্রের অবির্ভাব হ'ল রসচক্রে। তাতে
আবার রসচক্রের মৃতপ্রায় বেঁচে নবজীবনের স্ফূর্তি হ'ল।
তার স্তব নীচের ভীমের আবার রসের বজ্রা প্রবাহিত হ'ল।

শতচক্র বন্ধন প্রকাশিত হয়ে আমাদের এই রসচক্রে
যোগদান করে আমাদের সৌন্দর্য্যিত করেন। তাঁর যোগ-
দানের সুবিধার জন্যই রসচক্রের বৈঠক ঘটান হাল হোলে
চিত্র-নিষ্ঠা সত্যচক্র সংস্কার যুগে স্থানান্তরিত হ'ল।

আমাদের এই রসচক্র কয়েকজন শিক্ষাত্রী ও
সাহিত্যস্বার্থী ব্যক্তির মাধ্যমে মজলিস,—বৈঠকের মাধ্যমে
হলে ইষ্ট গেলো। শিক্ষাত্রী-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঃ
শ্রীশ্রীশ্রী হালদার, কবি অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
অধ্যাপক হরিচরণ বোম, কবি সুধীর গুপ্ত, অধ্যাপক বিভূষণ
চন্দ্র রায় চৌধুরী, বিশ্বপতি চৌধুরী ইত্যাদি। আমাদের
মাঝে নামজালা সাহিত্যিক বেশি ছিল না।
তখনকার তরুণ সাহিত্যিকরা আর বেশে পদ্যমাত্র, তখন
তাঁরা প্রখ্যাত হন নি। আমরা ছিলাম সাহিত্য ও শিক্ষা-
ক্ষেত্রের পরাভিকের হ'ল। রূপী, মহারথী আমাদের মধ্যে
ছিল না। একজন নবম্য প্রতিষ্ঠানে রসচক্র বন্ধের
সর্বশ্রেষ্ঠ কথানিষ্ঠকে যখন চক্রবর্তী রূপে লাভ করল—
তখন তার গৌরবের পরিমীমা থাকল না। আমরা বড়
সাহিত্যিক বা পণ্ডিত নই ব'লে শতচক্র আমাদের কোন
দিন উপেক্ষা করেন নি,—অবজ্ঞা করেন নি,—অমান্যের
মান দান করবার ক্ষেত্রেই তিনি আমাদের তাঁর স্নেহজ্ঞান
টেনে নিলেন। আমাদের তাঁর বিশ্ববিশ্বদ্বিনী প্রতিভা ও
বেশব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার কথা ভুলে দাঁড়া ব'লে অসম্মেতে
টাকে বিব্রত করলাম। আমরা এত বড় পোকেব সাহিত্য ও
সাহচর্য্য দীর্ঘনে কখনও লাভ করি নি—কখনও
করবও না।

তাঁর স্নেহ আমাদের তৎকাল বাছনীর কথার 'অন্বনিক'
সমুদ্রগোষ্ঠ—কিন্তু তিনি নিজ কণ্ঠে নিজের দৃঢ়তাসুলভ
উদারভাৱে সেই বাছনীর মুহূর্ত্তে গুটীর দিতে ন।

শতচক্রের পূর্বচক্রের চাবপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের মত

আমরা তাঁকে বিবে বসতাম। তাঁর আগমনে আমাদের তথাকথিত সাহিত্যালোচনা স্তব্ধ হইত। তিনি গল্প করতেন, মন্তব্যের মত আমরা শুনে যেতাম। পিছে রাখলে দেখিলি সাহিত্যাংশে অপকৃষ্ট হ'ত না। তখনই তাঁকে শুধু গল্প লেখার নয়; বৃক্ষে গর বলায় এমনই অদ্ভুত ক্ষমতা বিদ্য ছিলেন যে তিনি যা কিছু বলতেন সবই কথা সাহিত্যের মর্যাদা ও অর্থ বসতী লাভ করত।

ধারা নাচতে ঘামেন—তাঁহের movements graceful হয়, ধারা গাইতে ঘামেন—তাঁহের মুখের বাক্যগুলিতেও মধুর থাকে। ধারা কবি, তাঁহের সাধারণ কথাবার্তাও মঙ্গল হয়। বে'ব হয় সেইরূপ প্রকৃত কথাসাহিত্যিকের মুখের যে কোন বিকৃতি গল্পের মাধুরী লাভ করে।

অল্পের কথা বলতে পারি না, আমরা লক্ষ্য করেছি,—শব্দচ্ছন্দ ঘোঁরনে যে কোন স্মৃতি-বার্তা বা অভিজ্ঞতার কথা গল্পের টেকনিকে ও কৌশলে একাধি করতে পারতেন। কত ভুল সে সব কথা। অল্প কেহ বললে এক মিনিটের বেশী আমরা হয়তো বৈধি ধরে শুনেই পারতাম না।

তিনি ভূঁইয়ের গল্প, শাপের গল্প, কুমীরের গল্প, নানা-প্রকার ছুঁসাহসের গল্প, ভবঘুরে ঘোঁরনের গল্প অনেকই করেছেন—সেগুলি তিনি বার বারই বিবৃত করেছেন—কিন্তু পুনরাবৃত্তিও কত কোনদিনই সেগুলি অরোচনীয় হয় নাই। তাঁহার বিবৃতির পাণ্ডিপাটের গুণ—সেগুলি ছিল 'নিভুই নয়।'

বাঘা ছিল চির পুরাতন,

তাঁর পাই বেন হাধান।

যে সব কথাই কোন বৈচিত্র্য নেই—যেমন কোন আশা আশ্রম বা কৃষ্টি-প্রদের কথা, তাঁর গ্রামের গুণ্যে মহাশয় বা কুহু মহাশয়ের কথা, তাঁর কুহুরের কথা, আত্মীয় শিশুদের সর্পবন্দনের কথা, ভূতের ভাষা, শাপের বোঝাবের কথা, ভাগলপুরের গলা পাত হওয়ার কথা, পাঁচুর মারের কথা—এই তুলিও এমনই হৃদয়ে বিধে কৌতুকাবহ করে গল্পের টেকনিকে তিনি বিবৃত করতেন যে, আমরা সেগুলিতে হতা বা হ্রাসের স্মৃতি পাঠের মাধুর্য লাভ করতাম।

দতকণ তিনি গল্প করতেন—দতকণ আমরা নীরব নিশ্চল, কিন্তু যখন তিনি মহামত একাধি করতেন, তখন

আমরা নীরব থাকতাম না। তাঁর অনেক মতামতের সঙ্গে আমাদের মিল হ'ত না। আমাদের যতদূর সম্ভব তাঁর মর্যাদা রক্ষা করে উত্তেজিত না হয়ে থর্ক করতাম,—সবিনয়ে প্রতিবাদ করতাম। তিনি অনেক সময় উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, কিন্তু কখনও সংযম ও বৈধি হারাতেন না, কখনও শেনস্ত তাঁর স্রোত হতে বঞ্চিত হইনি।

পঞ্চাশের তিনি অনেক সময় আমাদের অগ্রিম কথাও বলেছেন, তিরস্কারও করেছেন। কিন্তু কখনও তাতে আমাদের প্রভা বা ভক্তি বিগলিত হয় নি।

বলজ্যে ক তিনি স্রোত করতেন, আমাদের সঙ্গে উৎসবে যাতে ভালবাসতেন—কেহ অমুপস্থিত হলে নাম ধরে ঘরে বোঁক দিতেন—আমাদের বিপদে আপদে উৎকণ্ঠিত হতেন—জ্বাধেব বিনে গাছনা দিতেন—জুল করলে উপদেশ দিতেন—জীবনের অনেক গোপন কথাও আমাদের কাছে বলতে ছিলামোহ করতেন না, বসন্তের বার্ষিক উৎসব-গুলিতে অবিকালে ব্যস্ততার তিনিই বহন করতেন এবং উদ্ভান দলিলমতে সকলের সঙ্গে বলে আহারাদি করতেন, অসাহিত্যিক অন্নবিভ বা অন্নবিভ হলে কোনদিন কাকের উপেক্ষা করেননি।

ভাল তিনি অনেককেই বাসতেন। তাঁর ভালবাসার লক্ষি ছিল অগাধ অপরিমের। বহু লোকই তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা লাভ করেছিলেন। কিন্তু সকলেই মনে করত হুঁকি এত ভাল তিনি, আব কাকের বাগেন না। আমাদেরও তাই মনে হত। আমাদের প্রতি তাঁর ছিল অধেতুক ভালবাসা।

তাঁর দ্বিভাষ্য ভূমিতে যেন স্রোত বিগলিত হয়ে পড়ত। তাঁর কর্তব্যের ছিল স্বাভাবিক মাধুর্য—স্রোত যেন সেই মাধুর্যকে শতগুণে বাড়িয়ে দিত। নাম ধরে যখন সন্ধান করতেন, যেন হ'ত যেন তাঁর নবনীকোমল ছব-খানি তাতে স্রবীভূত হয়ে পড়ছে। তিনি আমাদের কোন কোন সত্যের মূল্য নামকরণ করেছিলেন।

শব্দচ্ছন্দে সঙ্গে সাহিত্যালোচনার একটি নিবর্ণন এখানে শিগিবদ্ধ করছি। শব্দচ্ছন্দে বইগুলির সম্বন্ধে আমার মতব্য মাঝে মাঝে তাঁকে জানাতাম—বলা বাহুল্য, প্রতিজ্ঞা মন্তব্য কোনদিন জানাইনি। তিনি একদিন

বলতেন—“তোমাকে আমার সবচেয়ে লিখতে হবে। তবে আমার জীবদ্দশার নয়। আমার জীবদ্দশার লিখলে স্বাধীন অশুদ্ধপাত ভাবে লিখতে পারবে না। স্বাস্থ্য হওয়া বন্ধ করে নেই—আমার দিন ত দুইয়ে এলো।” আমি বললাম—“না-না। আপনার শরীরে কোন রোগ নেই। চুল পাকা ছাড়া বার্ধক্যের লক্ষণ নেই, কর্মক্ষমতা ও বৈরিক প্রাণবর্ধকটুট রয়েছে—আমি বছর পর্বত বাঁচেন। তা ছাড়া কেউ কি বলতে পারে, হাঙ্গা কার দিন, দুইয়ে এলো।” তিনি বললেন—“তা ঠিক, তবে তোমার সঙ্গে আমার যে বয়সের তফাৎ তাতে প্রত্যাশা করি তুমি আমার কথা লিখে যেতে সমর্থ পাবে। রোগ-রোগ করা অভ্যাস নয়—তাই বুঝতে পার না। আমার শরীর ভিতরে ভিতরে তেড়ে গেছে। থাক।”

শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশাতে তাঁর সবচেয়ে লিখতে হুত্ব করিনি বটে, তবে তাঁর সঙ্গে আসাপ আলোচনার মোট রাম্যতাম, একদিন তাঁর সবচেয়ে লিখব স্তরদার। মুশকিল ছিল, কিছুতেই শরৎচন্দ্রকে সাহিত্যের আলোচনায় নামাতে পারতাম না। যখনই কোন সাহিত্যপ্রসঙ্গ তুলেছি—তখনই বলছেন ওসব থাক—একটা গল্প শোনো।

আমি বলতাম—“তা না হয় শুনিছি। কিন্তু আমাকে যে আপনার কথা লিখতে হবে—আপনি আপনার সাহিত্যের প্রসঙ্গ উঠলেই ধামিয়ে দেন, লিখব কি তবে?”

তিনি বলতেন—“আমার যা কিছু বলবার তার সবই আমার বইএ আছে, আমার কাছে গল্প ছাড়া বাজে কথা কিছুই শোনবার নেই তাই। আমার বই থেকে বই আমার সবকথা উদ্ধার করতে না পারো, তা হলে তুমি লিখতে পারবে না। লেখকের জীবনকথার যা কিছু প্রকাশযোগ্য তা কি তার লেখার বাইরে বিশেষ কিছু থাকে? আর সাহিত্যালোচনা মানেই তর্ক, তর্ক করার কেশটা আমি এড়াতেই চাই।

বদন্তকের বৈঠকে তো সাহিত্য সম্বন্ধে প্রশ্নের কোন অবকাশ থাকত না, কাজেই সপ্তাহে ২০ দিন অন্ততঃ তাঁর বাড়ীতে সকালবেলার দেখতাম। দেখতাম শরৎচন্দ্রকে চট্টরে দিলে কিছু কথা বার করা যায়। চতুর্থ পর্ব খেরোনার পর একদিন বললাম—শ্রীকান্ত নিয়ে নানা জন

নানা কথা বলছে। ভারতবর্ষে শ্রীকান্ত যখন বেহুতে হুত্ব করে তখন এর নাম ছিল শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী। একজন বলছিল—আপনার উদ্দেশ্য ছিল আপনার ভবগুহে জীবনের ভ্রমণকাহিনীই আপনি লিখবেন। অবশ্য পুরাপুরি হ’লনা, তবে অনেকটা ভ্রমণকাহিনীই হয়েছে, ঠিক নভেল হয়নি। পিয়াদী না এসে পড়লে পুরাপুরি ভ্রমণকাহিনীই হ’ত।”

শরৎচন্দ্র বললেন—“কেউ যদি তা বলে থাকে তবে অস্ত্রায় কিছু বলেনি। শ্রীকান্ত ভ্রমণকাহিনী ছাড়া আর কি? যেখানে যেখানে বেড়ানো ও ভ্রমণ, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মনোরাশ্যে বেড়ানোও ভ্রমণ। শ্রীকান্ত নানাজৈতির নরনারীর মনোরাশ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে। যা যেখানে তাই লিখেছে। ভ্রমণকাহিনীই বই হয়—তাহেই বা কতি কি?” আমি বললাম—একথাও তো বলতে পারেন—“শ্রীকান্ত একজন সুশিক্ষিত দুব জীবনপথে চলেছে। মাঝে মাঝে পথের ধারে সরাইখানার বা সুশিক্ষিত ধানার বিশ্রাম করছে—নানাজৈতির লোকের সঙ্গে মেলোমেলো করছে। একটি নারী তার পিত্ত নিরেছে—মাঝে মাঝে তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হচ্ছে। পথে যেতে যেতে ব্যারাম পীড়া হলে সে কোথা থেকে একখানা পাখা আর একটা পাত্র মল নিয়ে এসে ছুটছে। এমনি করে চলতে চলতে শেষে তারা ডেবা বাঁধল একজায়গার গিরে।”

শরৎচন্দ্র একটু হাসলেন—যেহে বললেন—তুমিও আমাকে সমর্থনই করলে। আর কে কি বলে?

আমি—“কেউ কেউ বলে—শ্রীকান্ত আপনার স্বত্বিকথা—ঠিক নভেল নয়। আপনি নিজেই লিখেছেন—“এই জীবনের অপরূহ বেলায় একটি অধ্যায়ের কথা বলিতে গিয়া আমার কত কথাই মনে পড়িতেছে।”

শরৎচন্দ্র—“এ কথা কে বলেছে? যখন শ্রীকান্ত প্রথম ভারতবর্ষে বেহুতে তখন কি আপনার জীবনের অপরূহ বেলা? জীবনের অপরূহ বেলা শ্রীকান্তের।”

আমি—“যাই হোক সে একই কথা। শ্রীকান্তের মধ্যে আপনি ত অনেকটাই আছেন, তাই তারা একথা বলে।”

শরৎচন্দ্র—“তাহাই বা অস্ত্রায় কি বলেছে। সকল উপজাদুই ত লেখকের স্বত্বিকথা। ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত চরিত্রের

মুখে বলানো। যাহার বনিষ্ঠভাবে বেবেছে পেয়েছে তাহের কথাও থাকে। লেখক তার অভিজ্ঞতার বাইরের কথা কি উপজ্ঞানে ঠাই দেয়? ঠাই দিলে রূপকথা হয়, রোমাঞ্চ হয়, উপজ্ঞানের ছন্দবেশে প্রবেশের বই হয়, উপজ্ঞান হয় না। আমি অন্যান্য স্বত্বিকথা ঐকান্তের মাদকতে সবটা নয়, অনেকটা বলেছি। এ অন্তই সাধারণ পদ্ধতি ত্যাগ করে First person singular number-এর অবস্থানিতে গোটা বই লিখেছি; এতে নাকে নাকে দত্তব্য করায় সুবিধে হয়েছে।"

পোড়াতাল আমার ভাগলপুরের কিশোর জীবনের স্বত্বিকথা বটেই। তোমরা নিশ্চয়ই, আনো ভাগলপুরে ছোটবেলার পিশীনার বাড়ীতে থাকতাম।

আমি—হ্যাঁ, তাতো আমি। ইন্দ্রনাথ-তো দুবস্ত, বল-ভিষক, জলন্ত বালক ছিল। একটু Emphasis দেওয়া আছে হয়ত ঐ চরিত্রে।

শরৎচন্দ্র ঐহৎ কুপিত হয়ে বললেন—একটুকুও Emphasis দেওয়া নেই। তবে একাধিক রাত্রির পরামর্শের অভিব্যক্তি হয়ত এক রাত্রিতে দেখানো হয়েছে। ইন্দ্রনাথ যে কত বড় মানুষ ছিল, তা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না—আমি তাকে পুরাপুরি একে দেখাতে পারিনি। আমি তার অভ্যাস দিয়েছি মাত্র। তবে নতুন হাতে একটু Emphasis দেওয়া হয়েছে। নতুন হাত একেবারে কবিত্ত যুবক নয়।

আমি—ইন্দ্রনাথের মাজুচুরিটা হয়েছে অল্পটা বিবির সঙ্গে Connecting link. অল্পটা বিবির সন্ধানের অনিবার্য হেতু ছিল কি?

শরৎচন্দ্র—নিশ্চয়ই ছিল। বাপরে! স্বত্বিকথার তাঁকে বাদ দিতে পারি? (এই বলে তিনি হাতজোড় করে মন্তব্য করলেন।)

আমি—অল্পটা বিবি তবে Real Character, অল্পটা চরিত্র তো সচরাচর দেখা যায় না, ঘাঘা।

শরৎচন্দ্র—আমিও ঐ একটাই বেবেছি। কোন অত্যাশ্চর্য নেই। সাপের সন্ধে আমার কৌতূহল আর অভিজ্ঞতা অসাধারণ, সাপুড়ের সঙ্গে আমি খুব মিশেছি।

আমি—বিলাসী পরভ্রাতাও আপনাব সাপের সন্ধে অসাধারণ অভিজ্ঞতা দেখা যায়। কি চমৎকার, কি pathetic গল্প।

শরৎচন্দ্র—সাপের সঙ্গে আমার কতবার বেবেধা তার ইয়ত্তা নেই, কতবার যে সাপের দাঁত থেকে বেঁচে গেছি তারও ইয়ত্তা নেই। তোমরা যে পুতানো লাঠিটাকে ফেলে দিতে হলো ঐ লাঠিটা দিয়ে আমি অনেক সাপ মেরেছি।

আমি—আজ্ঞা, অল্পটা বিবিকে কোথায় বেবেছিলেন, বেগানসপুরে—না—ভাগলপুরে?

এই প্রস্তে শরৎচন্দ্র একটু চটে গেলেন—বললেন তোমার প্রস্তের উদ্দেশ্য আমি বুঝছি। তুমি কি মনে কর আমি ডায়েরি বা রিপোর্ট লিখছি যে স্থান কাল পাত্র সন্ধে কাটার কাটার বর্দি ধরে মিলিয়ে লিখব? স্বত্বিকথার ক্ষেত্রে এক, রিপোর্টের ক্ষেত্রে আর।

আমি—অনাবস্তাব রয়েছে শশানে রাত্রি যাপন—এও কি আপনাব অভিজ্ঞতার বিবরণ?

শরৎচন্দ্র—নিশ্চয়ই! মনে রেখ ঐকান্ত ইন্দ্রনাথের বেগপোয়া চেনা। তার অসাধ্য কাণ্ড নেই।

আমি—আমি ভেবেছিলাম—আপনাব অসাধারণ প্রতিভার সর্বশক্তিঘন্যতা করন্যে সৃষ্টিই সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। ভেবেছিলাম—অশ্বিনের অশ্বকার পট্টা বাগলসরীর দৃষ্টান্তগোলের একটা পটভূমিকা।

শরৎচন্দ্র—সত্য না বলে ঐ চিত্রের প্রাণে ঠাই পাবার কোন বাহি ছিল না।

আমি—সম্মানী হয়ে বাঙলার অভিজ্ঞতা আপনাব আছে আমি। কিন্তু ভবদ্বরে জীবনের গুণানন্দই কি শেষ?

শরৎচন্দ্র—ভবদ্বরে জীবন আমার সম্মানসেই শেষ হয়নি—অনেক দিনই নানা বশাবলিপর্ষের মধ্যে দিয়ে চলেছিল, ঐকান্ত বেচাষকে আর ঘুড়িখনি। ওর পূর্বে যে অগ্রণী বাতীর আভির্ভাব কথা আছে—সেটা আমার জীবনে ভবদ্বরে অবস্থাতেই ঘটেছিল। পোড়ামাটি গ্রামের ডোমের বাড়ীর খটনাটার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার গ্রামেই ছোটবেলায়। গ্রাম জীবনের স্বত্বিক সন্ধ্যা বই এ ছড়ানো আছে—ওর্ষ পূর্বেই বেশি।

বেশ্যে বাঙালী বাণিজ্যবধূর শোভনীয় বশ্য শস্যাদি
অবস্থাতেই স্বতঃক্বেদ্য, একটুও অতিবিক্রিত নয়।

আমি অন্যান্য পিরাটী বাই সম্পূর্ণ করিতা হইত।
আমি বাঙালীর প্রশংসা একবারে না তুলে একেবারে সমুদ্র-
কক্ষে সাইক্লোনের বুকে চলে পেলাম।

আমি—সাইক্লোনের সমুদ্রে যে আপনি নিঃস্র হুজুগভাগী
সে বিষয়ে সম্বন্ধ নেই। ডাঙার বস্ত্রানব পক্ষে সমুদ্রের
ঐ মূর্ত্ত বর্ণনা অসাধ্য। ব্রহ্মদেশেতো আপনি ছিলেনই।

আমি অস্ত্রার কথাও না তুলে জিজ্ঞাসা করলাম ও বেশ
সম্বন্ধে অনেক কথাই আপনাতঃ তিনখানা বইএ আছে।
ব্রহ্মদেশে বাঙালীদিগের সম্বন্ধে আপনাতঃ অভিজ্ঞতা কি ?

শব্দচক্র—ব্রহ্মদেশ তখন ছিল বেকারদের চাকরি সম্বন্ধে
স্বাধীন। বাঙালী পূর্ব লোকেরা চাকরি খোঁজাত করে
হিত। বাঙালীদিগের গাঢ়তা দেখার এমন আদর্শ
আর কোথাও ছিল না। বহু অপরাধই ব্রহ্মদেশে
পলাত। চরিত্র বন্ধা করা কঠিন হ'ত সেখানে,
কেউকেই বন্দী, কেউকেই অস্ত্র আভির ঘেরে বিধে
করত। বাংলা থেকে পূর্বের সম্ভাব্য বা বিবাহ নিয়ে ঐ
দেশে কেউকেই পলাত, পলাতক স্বামীর বেঁচে
হুলবৎ ব্রহ্মদেশে যেত, বাঙালীদিগের অনেকে ওকালতী,
জাক্সারি ও চাকরি করে ওদেশে গিয়ে বড়লোক হ'ত।
নিরস্ত্রের দোকানের মধ্যে বাঙালী কাঠমিস্ত্রীর সংখ্যা
ছিল খুব বেশি। নিরস্ত্রের মেয়েদের মধ্যে অনেককেই
ছিল সুভিকশালী। ওদেশে জাতিবিচার ছিল না,
বর্গবিচার ছিল না।

আমি—আচ্ছা দাখা, ক্রীকান্ত সম্পূর্ণ করিত চরিত্র কি
একবারে নেই ?

শব্দচক্র—তা আবার নেই। তা না থাকলে অস্ত্র বড়
একখানা বই গড়ে ওঠে ? কোন চরিত্রগুলো সম্পূর্ণ
করিত— তা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।

আমার বিশ্বাস ছিল—সুনন্দা, কমল, গহর, বস্ত্রানব
এসবই করিত। একটি মূল্যমান চরিত্র (গহর)
শব্দচক্র ইচ্ছা করতই বইএ সন্নিবিষ্ট করেছিলেন।

আমি—বেশম—গহর,—

শব্দচক্র—গহর পূর্বা করিত নয়—ঐতাক চরিত্রের উপর

বড় চড়াই। কমলপতাও তাই। দাক ও প্রশংসা
ধাকুক। লোকে ক্রীকান্তকে নভেল বলে না ?

আমি—সবাই একে পূর্বাপূর্ব নভেল বলে না।

শব্দচক্র—কেন ?

আমি—বলে কতকগুলি চরিত্রের চিত্র, কতকগুলি ঘটনা,
কতকগুলি অসম্মত মূর্ত্ত। কতকগুলি অসম্মত চরিত্র
নিবিলম্বেই গাঁথা। এর ভিতর কোন সন্নিবিষ্ট প্রকারের
সংঘটিত নেই। চরিত্রের উদ্দেশ্য সাধন করা হয়নি।
ইচ্ছানাথ, বাজলক্ষী, কমলপতা, বস্ত্রানব, গহর, সুনন্দা
ইত্যাদি সবই Ready made character, উত্তম
পুস্তকীয় জীবনীতে পোটা বইখানা দেখা, শাব্দিকগুলি
মূল আখ্যানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে গ্রথিত। অতএব
নভেলের যেসব লক্ষণ সে সব এতে ঘোলে না।
তারা বলে নভেল না বলেও অসম্মত হয়। তারা বলে
নভেলের মস্ত ৪র্থ পর্বের প্রয়োজন ছিল না।

শব্দচক্র—তারপর বলো—যুব প্রয়োজন ছিল যে, বৈতিকলের
বনে পল্লের যাত্রাপথের স্বতন্ত্রতা—সবই বৈতিকলের
বনে ফিরে না এলে তার সন্নিবিষ্ট হতে পারে না। ৩ পর্ব
বাইরে বাইরেই কেটেছে, যে সকলের মাছের কৌবন
কথা সে সকলে তাকে কিহিরে আনার ব্যবহার ছিল।
আমি ভাবতাম যে গোলাইয়ের আশীর্বাদে দু'লেব বরকার ছিল।
আমি তোমাদের Natureএর খুব ভক্ত নই, তবু বই-
খানাকে সম্পূর্ণ করবার মস্ত ওতে তাকে স্থান
দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যদিও আমি কবি নই।

আমি—কবি ন'ন ? ৪র্থ পর্বে কি কবিত্বের ছড়াছড়ি।
আমার তো মনে হয় আপনি যে কত বড় কবি
তাই আনবার জন্যই ৪র্থ পর্ব লিখেছেন। বৈকল্যের
আবর্ত্তা তো একখানি অপূর্ণ কাব্য। কমলপতা তো
জগৎ গোষ্ঠীর নাটকের চরিত্র। শুধু সমস্ত কবিতা
লেখেন নি—একটি কবিত্বকেই আনবারি করেছেন।

শব্দচক্র—আমি তো সেদিকই ৪র্থ পর্ব বেরুলে তোমাকে
একখানা বই উপহার লিখে দিয়ে বলেছিলাম—অন্তেষ
কমল লাগবে আমি না—তোমার ভালো লাগবেই।
যাক আর কে কি বলে বলো—

আমি—কেউ কেউ বলে—রাজসম্রাটের সঙ্গে শিকারের শিবিরে জিকান্ডের সঙ্গে যেথা হওয়ার পর নভেল মুক্ত হয়েছে—বইএর বাঁকিটা রীতিমত নভেল। আবার কেউ কেউ বলে—জিকান্ডই সকল দৃষ্ট, সকল ঘটনা, সকল চরিত্রের যোগদ্বয়। উত্তমপুরুষীয় জীবনীতে দেখা নভেল বিদেশে যদেলে আরো আছে। বড়ই, বয়স্রনাথও দেখেছেন। Dickens এথ David Copperfield এই ভঙ্গিতে দেখা। আপনাতঃ স্বামীও তাই। এটাই হ'ল সর্বোচ্চের ভঙ্গি। এই জীবনাই বৈজ্ঞানিকের মধ্যে একে সংহতি, সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য দান করেছে। এটা নতুন টেকনিকে দেখা নভেল। বিবিধ চিত্র ও উপকাহিনীগুলি এই নভেলের পরিবেশ ও আবেষ্টনীতে স্থিতি করে একে সম্পূর্ণতা দান করেছে—*vitality* বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে জীবনবর্ণনের পর্ভাবস্থা আছে। চরিত্রের উদ্ভাব একেবারে নেই তা নয়—শিকার পাটিতে প্রথম যেথা হাঙ্গলসম্রাট আর ওর্থ পর্বত শেখের রাজসম্রাটের মধ্যে চের তফাৎ। জিকান্ডের চরিত্রেরও কম বদল হয়নি। যেথেষ্টে অনেকটা বেলা হয়ে গিয়েছে—

পদংচ্ছ—মডেল হোক, ব্রহ্ম কাহিনীই হোক, স্মৃতিকথাই হোক,—কথাসাহিত্য—তো। এগটা শ্রেণীতে না ফেললে পণ্ডিতদের ও মাষ্টারদের বক্তি নেই, ব্রহ্ম পঠকদের তাতে কিছু যায় আসে না। কোন শ্রেণীতে না পড়ে গুটা মিছেই একটা। শ্রেণী তৈরি করক না কেন? কোন শ্রেণীতে পড়বে সে কথা না ভেবেই আমি লিখেছি।

শবৎস্রা আশার একবৎসর পর অশমস্রাবরূপে অভিমতন
হেত্তরা হয় শবৎস্রের রোভের বাগান বাড়ীতে । এই শবৎস্রের
ঐশ্বর্য উঃভাজন শবৎস্রের মিলে ।

ভারই প্রভাবে এই অভিনন্দন। অভিনন্দনপত্র আমি লিখেছিলাম—১৮৭৭। নিজে সভাপতি হয়ে তাকে স্বাক্ষর করে দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে আমরা আর একটা কাম করেছিলাম—
সংস্থা প্রবাসভোজিত কামজে একখানা উপগ্রন্থের সূত্রপাত
করেছিলেন। এক সংখ্যার পর আর লেখেন নি। সেটাকে

আর চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। চক্রের সমস্তগণ ঠিক কবেলেন—এই কর পাত্তা অবলম্বন করে একটা বাথোয়াসী উপস্থাপন বড়না করা যাক।

শতাব্দীর অসুস্থতির হৃদয়কার। তিনি তখন সামন্ত্যবোধে।
কুম্ভবাবু (অধ্যাপক কুম্ভকলৈয়ার চৌধুরী) আবার চিঠি
নিয়ে শতাব্দীর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি চিঠির উপরই
অসুস্থতি লিখে নিলেন এবং জানালেন—দেখ যেম
ভাষাটার সঙ্গে মিল থাকে।

শৈলজানক প্রথম লিখল—এমন ঠাইেলে সে লিখল যে
কোথায় শব্দবাণী খেলেছেন তা বুঝবার উপায় থাকল না।
তাহার অগাধীশ গুপ্ত, অমলমুখ, নবপ্রহেল, রাধাবাণী,
মৌলী, সত্যোজ্জয়িতার হার চৌহী, নমোজ বসু, বিশ্বপতি
চৌহী, তাহাশব্দর বন্দোপাধার ও দাবিকারজন
স্বকোপাধার লিখলেন।

উপসংহারটাই সব চেয়ে কঠিন। এ কার্যের ক্ষমতা চক্রের
বাহিরে যেতে হল। তার নিষ্পন্ন প্রাণী শাসিতিক
নরেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত। তাঁকেই সবচেয়ে বেশী লিখতে হল।
পুস্তকের নাম হল রসচক্র। সম্পাদক আমি নিজে।

সহযোগী ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট.পেলে আমরা
তাকে ডি.সি.সাহসীরা বাগানে অভিনন্দন দিয়েছিলাম।
সহযোগীকে আগে জানানো হয়নি—রমচক্রের বাবিক
উৎসবের অনুষ্ঠান হিসাবেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন।
তাকে বিয়ে আমরা যখন বাগেছিলাম—তখন হঠাৎ
অভিনন্দন পত্র পড়তে শুরু করলাম।

দহংহা—একি কাণ্ড ! বই কিছুই আমাণনি ।
 আমি—এত খটা করে কিছু নয়—তা আর কি জানাব ?
 দহংহা—তোমরা ত আমার ঘরের লোক । তোমাদের
 কাছে আমার অভিনন্দন কি ?

আমি—আপনার কাছে এ ডি-সিটর কীইবা মূল্য।
নারা হেথ প্রতিদিনই আপনাকে মনে মনে অভিনন্দন
জানাচ্ছে। ডি-সিট তার কাছে তুচ্ছ।

দরংবা গভীর হয়ে বসুপেদ—না হে না। এর মূল্য
 চের বেশি। গল্পের নেশায় ব্যাথা গল্প পড়ে—ভাড়া আত্মকে
 গল্পবাহ বলে জানে—সাহিত্যের ব্যাধি সত্যি ব্যাধি না।
 ভাঙের প্রশংসায় প্রাণের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে মেটে কি

ভাই? দেশের বিশ্বসনাক কোন সাহিত্যিকের ক্ষতি
বীকার না করলে—তার ক্ষোভ মিটেতে পারে না।
কই? তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় তো ছিলনা, তবু ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয় দিলে ত? হিম্মত বিশ্ববিদ্যালয় দিলে না।
মুশলমানের বিশ্ববিদ্যালয় দিলে। সত্যই আমি এতে
সংবোধিত হয়েছি।

প্রবোধ দ্বারা বললেন—আঁরা বেওয়ার্জ কৰ্তা, হয় তাঁরা
ডক্টর নিষেধা হন নি, নতুও চয়েছেন ইংল্যান্ডে Thesis
লিখে। তাঁরা ভাবেন বাংলায় কবিতা কি গল্প লিখে খুব
জোর কবিতা হওয়া যায়, ডাক্তার হওয়া যায় না।

শরৎলা বাসলেন।

শরৎলা বললেন—সাহিত্যের সুপপত্রী নিয়ে আলো-
চনার বইএর অন্ত কেউ কেউ ডি-সিট পায়। সাহিত্যের
সঙ্গে কোন সম্পর্ক না বেধে কেবল পরমর্ষাবার অন্তও
ডি-সিট পায়, অবশ্য ৪০ বৎসর বয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি করে
সে পায় না। অল্পত বিচার বটে!

শরৎলা বাসলেন—বাড়ী করার পর থেকে তাঁর
বাড়ীর কাছাকাছি হবে ব'লে রপচক্রের অধিবাসন হত
শিল্পী মতীশ গিহেব বাড়ীতে। মতীশ তারা দ্বারা বর্ত
গড়গড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। শরৎলার আকর্ষণে রপচক্র
খুবই ভয়েছিল। তাঁর একটা কাঠের লাঠি ছিল, লাঠিটা
হেথতে ভাল ছিল না। শরৎলা বলত এ লাঠিটা ব্যবহার
করবেন না—আমরা একটা ভাল লাঠি দেব।

শরৎলা বললেন—আমো এ লাঠিটা দিয়ে আমি ৪১টা
গাপ মেয়েছি—এ লাঠি টাং শরৎলার হেঁতালের লাঠি।
এ লাঠি কি ছাড়তে পারি?

এ সময়ে এটা বড় অশ্রুতিকর ঘটনা ঘটে। বাগচি কবি
একটা বাগিক পত্র সম্পাদনের ভার পান। সেসকল তিনি
শরৎলার কাছে একটা গল্প চান। শরৎলা বলেছিলেন—
আম্মা, চেষ্টা করব দিতে। কিন্তু তিনি তা দিতে পারেন
নি। যতীনলা ছাড়বার পাত্র নন—তিনি একমুখ খুবই
শ্রীচাপীড়ি করেন এবং বলেন আপনি কথা দিয়েছিলেন
কেন? শরৎলা বাসলেন—কথা দিয়েছি বলে নাথ
ও বিই নি। সেখা আসছে না কি করি তাই। কত জন
অগ্রিম টাকা দিয়ে বেবেছে তাহেই দিতে পারছি না।

এতে যতীনলা বলেন—আমি টাকা দিতে পারব না
ব'লে দিচ্ছেন না।

তারপর যতীনলা বাড়ী গিয়ে শরৎলাকে অন্তত
কঠোর ভাষায় একখান চিঠি লেখ। যতীনলা আমাকে
ভেঙ্গে পাঠিয়ে চিঠিখানা পড়িয়ে শোনালেন। আমি 'দেখি
দেখি' ব'লে নিয়ে ছিঁড়ে তাঁর পিতৃদানীতে ফেলে দিলাম।

যতীনলা বললেন—ভাই, এটা আপন চিঠির নকল।
আপন চিঠি চ'লে গিয়েছে। তুমি যদি কাল একবার
আসতে তা হলে সে চিঠি পাঠানো হ'ত না। এখন আর
উপায় নেই। সুহৃৎের উদ্দেশ্যে লেখা বড় অন্তরায় হয়ে
সেছে।

শরৎলা খুবই ক্ষুব্ধ ও হুপিত হয়েছিলেন—রপচক্র
তাঁর ক্ষোভ ও কোপ সকারিত হল। রপচক্রের সঙ্গে
যতীনলার কোন সম্পর্ক থাকল না।

আমরাই মুগ্ধকল হলো।

কিছুদিন পরে যতীনলার কস্তা লীলার মৃত্যু হল।
শরৎলাকে বললাম—যতীনলার মেয়ে দ্বারা দেল শরৎলা।
শরৎলা বললেন—বল কি? চল একমি চলো। তখনই
হন হন করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন যতীনলার বাড়ী।
কম্পাউণ্ডে ঢুকে প্রিয়কণ্ঠে ডাক দিলেন—যতীন।

যতীনলা এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে ও কণ্ঠস্বরে
চমকে উঠে হাউমাউ করে কেঁদে একবারে শরৎলার পায়ের
তলার পড়লেন। শরৎলা যতীনলাকে বুকে আঁকড়ে
বললেন।

লীলা মরে দুই মাসের মনোবালিষ্ঠ দিগিরে বিল। আমি
স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে ব'সলাম।

শরৎলা সাহিত্যবোদ্ধে গিয়ে ম্যালেরিয়া বরিষে
আসলেন। কিছুদিন ভুললেন—বতীহটা গ্যারপই হলো।
ডান দিকে চোখের উপরটা কনকন করত, তারপর থেকে
একটা না একটা উপসর্গ লেগেই থাকত। তবু রপচক্র
বেলা তিনটার সময় উপস্থিত হ'তে তাঁর হুল হত না।
মাঝে মাঝে মৃত্যুর কথা বলতেন। তারপর পেটে ক্যান্সার
হওয়ার পর আর আগতে পারেননি। আমরাই যেতাম।

তারপর তাঁর জীবনান্ত হ'ল Nursing Home এ।
রপচক্র তাঁর শোকলতা হলো—সত্যপতি ডাঃ সুব্রহ্মনাথ

হাশগুপ্ত। রসজ্ঞের প্রত্যেক সমস্ত তাঁর সম্বন্ধে কিছুই-না কিছুই লিখেছিল, আমিও লিখেছিলাম গরু প্রবন্ধ ও কবিতা। তাঁর শোকমগ্নতার আমি এই কবিতাটি পড়েছিলাম।

এত কাহ্নে ছিলে হৃদয় বহু ছিলে এত আত্মীয়, কত বহু জুনি হিংসাকরো তবু জানিতে পারিনি, প্রিয়।

হুত্বা তোমারে চিনারে বিদ্রাহে আছ, বাশলেব মাগে আমাৎবেব মাগে ছিলে হাশ অবিবাহ। তোমার সঙ্গে ছেলেছি হিনেছি আপনার জন কোনে, আপন নহিন লুকাইছা জুনি বহু নিজে টেনে। কবেছি প্রোদ, কত অপরাধ, করিয়াছি কত হেলা, আপন বিদ্রুতি নঃবরি নিতি করিয়াছ ছেলে-খেলা।

অবোধ জনের প্রেমে

কোন রসবাহ সৌন্দর্য-সুখ হৃদ্বিতে এসে নেনে। তবু যেন যেনে হইয়াছে মনে, নও জুনি সাগরং, তোমার মাগারে ঐশ্বর্যের হেবিস্তান আভাসন।

ভক্তি-ভাংকা যেমনি উঠেছে ভেঙ্গে ঢাকিয়া দিয়াছ তাড়াতাড়ি ঐতিহ্য মাধুরী যেনে। মোহ-মাধুর্য্যে বিচিয়া বাশলে টুটাইলে ব্যাঘন; প্রিয়জন কোনে তোমার উপরে করিয়াছি অভিমান। পাছে বহু তোমা ব'রে কেলি তাই অবোধ সেবেছ নিজে। আবেশনে ভরা নয়ন তোমার কে জানে চাহিত কী নে। জানিতে পাইনি কত বে তোমার আদ্যেব গভীরতা, আমাৎবেব মন্ত হাসিতে কীহিতে কহিতে মনেই কবা।

বিব্রজিতের হাতা,

কি গ্নেব তব কাঠালের গরে তব অঙ্গলি পাতা ?

আমি মনে হয় কত অপরাধই করিয়াছি আচরণে হুত্বা হেরিয়া কতবারই জুনি হাসিয়াছ মনে মনে। সাধ ক'রে জুল ক'রে কত বার মানিয়াছ পরাধর, অমানীবে মান দিতে করিয়াছ বালকের অভিনয়। হুলাও মন্তন ঝাড়িয়া ফেলেছ মোহের আবাগুণ্ডলি, স্বপ্ন-ভঙ্গ পাছে হয় বলি আবাগু কবনি জুলি।

পাছে পাই প্রাণে বাধা,

কোন দিন তাই বলনিক কই কঠোর সত্য কথা।

দর্ঘাধা তব কখনো রাখিনি উৎসব-কালারসে, কত কথা আছ মনে পড়ে আর আঁখি ত'রে উঠে মেলে।

সাধা বহুর ছবয়েব জুনি জুগ।

হুত্বা আজিকে দেখাশোনা বহু ভৌমার বিশ্বরূপ। আবিষ্কারের বিষয়ে লতে ছবর বিস্ময়ং। নিরায় শোণিত শুভিত, ভীত চকিত নয়ন মন। সেখিনত বাহ্যত সাধে পরিচোদ করেছি বহু বলে, সে সাধা দেশের মনোবাঞ্ছা পায়ে টেলে গেল চলে। আঁখিমেলে ত্রেনে ভাবি আছ বারবার কেন হিলেনাক পূজা কবিবার অবসর অধিকার। চলে গেলে জুনি মহাসমারোহে জয়-ভাংবং বহু, ব্রজবাশালিয়া চোখে চেয়ে আছি তোমার বিদায়পথে।

বৈকালী

এর পরও রসজ্ঞ জীবিত ছিল—সবৎ বাহার হুলে সভাপতি ডাঃ হাশগুপ্ত। ডাঃ হাশগুপ্ত তাঁর কাব্যবিচার ও রবিশোধিতা রসজ্ঞে পড়ে গুনিরেছিলেন।

রসজ্ঞের রূপ আর থাকলনা—হাশগুপ্তের সুখঃম তত্ত্বেরই প্রাধান্য হ'ল। উত্তর কলিকাতার সাহিত্যিকরা আর বহু আসত না। রবীন্দ্রনাথের সুভাষার পর শোকমগ্নতাই সন্তুষ্টঃ এর শেষ অবিশেষন। এই অবিশেষনে আমি প্রস্তাব করেছিলাম—রবীন্দ্রনাথের জন্মবৎসর থেকে রবীন্দ্রাব্দ গণনা করা হোক—সাহিত্যিকরা যেন এই অব্য বাবহার করেন। কবির স্মৃতির সম্মান এই চেয়ে মনস্তত্ত্ব কিছু আছে বলে আমার বানা নেই। কেউ কেউ আমাকে উপহাস করেছিলেন। প্রবাসী ও আনন্দবাহার আমার প্রস্তাব সমর্থন করেছিল।

আনন্দবাহার (৩০ আগষ্ট ১৯৮১) লিখেছিল—কবির উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবহারে মাত্র এ পর্যন্ত বহু প্রস্তাব উঠিয়াছে। তাঁহার একান্তপ্রিয় সাক্ষিত্যোগাধী হইতে বিভিন্ন প্রকার প্রস্তাব উঠিতেছে। এ সম্বন্ধে রসজ্ঞের বিগত অবিশেষনে কবিশেষর কালিদাস রায় রবীন্দ্রাব্দ প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সত্যি তাহা সাহিত্যিক-অনোচিত হইয়াছে। বাশালা সাহিত্যে রবীন্দ্রাব্দ একটি বিশেষ যুগের প্রবর্তক। সেই যুগকে অবস্টের কবিবার মাত্র অব্য প্রতিষ্ঠার চেয়ে সার্থকতার উপায় আর কিছু থাকিতে

পায়ে বলিয়া আমরা জানি না। সাহিত্যিকসমাজ অতি
সতর্কতাই ইচ্ছাযেব অসংখ্য লেখার ভিতর দিয়া এই অশ্বকে
প্রচলিত করিতে পারেন।

বসন্তের অনেকের কাছে উপেক্ষা ও পরিহাসের বস্তু
ছিল।

সাহিত্যচর্চায় যত্নশীল এটা ছিল না, ছিল ইষ্টদেবীর
সত্তা। আমরা কয়েক বৎসর এতে যে অনাবিল আমনসাত
করেছিলাম তা পরবর্তী জীবনে আর পাইনি। কল্লোল-
চক্রের সঙ্গে বসন্তের যোগসূত্র রক্ষা করেছিলেন শৈলজা,
প্রেমেন, নৃপেন, অচিন্তা, পবিত্র, কাকী দত্তকল ইত্যাদি
সাহিত্যিকরা। বসন্তের নমনোভাব প্রগতির বিরোধী
ছিল না।

বসন্তের সঙ্গত্বের অনেকই আজ ইহখানে নেই।
তাঁদের কথা শ্রবণ করে পরে কথাসাহিত্য পত্রিকার
লিখেছিলাম—

বসন্তের ঐক কোটোখানি হেওরাল হইতে পাড়ি

কোঁচা দিয়ে খুল' ঝাড়ি,

আর ভাবি হার কতজনই এরে অশ্বময়ে গেল ছাড়ি।

বাঁধের লজ ছাড়।

গোড়ী ছিলম ভমিত না, বস্তো জীবন বসন্তহাচ

ক্রমে দেখি তারা স্মৃতি রতে হার দুবে।

পথে যেতে যেতে পরিচর যেন ভুলে যাই যেড়ে বুবে।

গুথু এক অই শব্দেস্ত্রে ভোলাব উপায় নাই,

মোদের জীবন রক্তে রক্তে পেরেছেন তিনি ঠাই।

হাস্ত বসিক প্রবেশ বাঁধারে ভাবি

কবি ছিল তবু কবিখ্যাতিতে ছিল মাক তার ঘাবি।

বসন্তের বসের উৎস ছিল যে বসনা তার

জুলিসেন তিনি চক্রে আসিয়া সকল বেরনাতার

নাম পড়ে সেই কানীমোহনের কথা

অনেক ধান করিত শরীরে লুকায় গভীর ব্যথা।

বিচুট ভাতার ছিল মাক চুপের

সে ছিল মোদের ভাঙা কুলাখানি ছাইর ভাবেব।

ভূমিত বীর গভীর কবি চৌকোবে খরি

সারাদিন খাটি মন্থনামে মগ আয়োজন করি

কোঁকের বড় বড় গুহ কর্তার মত

কোমরে থামছা বাঁধিয়া দু'টি কত যেন বিস্ত্র।

দীর্ঘকন্ঠী সে বেশবকে যান পড়ে

শোভনীর তার পরিণাম অবি চোখ মোর জলে ভবে।

নাম পড়ে সেই অশ্বের কথা প্রথম শ্রমীর এম-এ

শিবির মত সারগানচ প্রেমে,

ভূলায়ে ছিল সে সেবে ছিল বিয়ান

মাঝে মাঝে তাই করিত সে অতিমান।

বিনীত শব্দ নিঃস্বস্তার বাঁধিকারে আজ 'দাঁ,'

অস্ত্র পড়িছে অরি

কলকিনির বালে সে পতিল কলক নয়, বশ।

আইন এবং সাহিত্য তাঁর সমান ছিল যে বশ।

বিজয়ের স্মৃতি বেহনার কণ্টক

প্রথর বুদ্ধি ছাত্রগছু অর্ঘ্য শিকক

স্নাস্ত কঠোর শ্রমে

পরের জন্ত খাটিল' খাটিয়া অপরূ হলো সে ক্রমে।

আরো শোভনীর ফটকের পরিণাম

নিজ হাতে করে যারে আমি গড়িলাম,

বাংলা দেশের সকল শিবির মাঝে

মহা পলাল ভেঙে দিয়ে খেলাপ্যতি।

পেরেছি এবের গভীর নিবিড় ঐতি

কবির ছন্দে বন্দী করিয়া বাঁধিছ এদের স্মৃতি।





বাহি-বন্যা গজেন্দ্র কুমার মিত্র

(পূর্বাশ্রয়)

॥ ৬২ ॥

কালকাগ্রসার করবিন যাবৎ নানকটাবেক খুঁকিয়া
খুঁকিয়া ঘরতান হইয়া গিয়াছেন। লোকটা শহরে আছে
বা আশা-বাগরা করিতেছে এ খবরটা তিনি বহু লোকের
নিকটই পাইয়াছেন—কিন্তু আসল লোকটাকে টাকিও ধরিতে
পারিতেছেন না। নিশ্চয়ই কোন একটা বড় বকনের 'তাগে'
ঘুরিতেছে—সেই লোকই আরও কালকাগ্রসার তাহার লজ
বাসুল। লোকটা চতুর্থ এবং টাকার গন্ধ পায় (এ
লোকটাই পায়—তিনি জানি না কেন ? গণপতি মহাত্মার
এ হিতৈষী একমেশদণ্ডিত!) এ কথা তিনি জানেন, সে
যখন এমন করিয়া ঘুরিতেছে তখন টাকাই কোথাও আছে
আন-পাশে। একবার নাগাল ধরিতে পারিলে বোকা
হইত।

টাকা পাওয়া ত হুঁরে থাক, চারিটা শূকরখাষককে
বাঁচাইতে গিয়া তাঁহার বেশ কিছু বরং খরচাই হইয়া
গেল। হঠাৎ আবেগের কাজ কিছু হইয়া রহিল—সোনা
ঘাইতেছে 'আংহেং' অগ্নিরা পড়িল বলিয়া, আদিলে এবং
তাঁহারাই জরী হইলে তাঁহার কিছু সুবিধা হইবে সন্দেহ
নাই, অতঃতঃ ঈশিকাটে প্রাণটা ঘাইবে না—কিন্তু যদি
আংহেংরা না ক্রিতিতে পারে ? যদি সত্য সত্যই নানা
আর ভাষা টোপির হল ঘর লাভ করে—তখন ? তাঁহার
এই সুকৌতব কথা শি আর ছাপা থাকিবে ? হঠাৎ
বিবিধর দিই সব সোবটা তাঁহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া
নিজের গলাটা বাঁচাইবে।

তখন কি উপায় হইবে—এইটাই একবার নানকটাবেক
কাছ হইতে জানিয়া লইতে চান কালকাগ্রসার। উহার

পরামর্শেই ত কানটা কবিলেন, এখন যদি শেষ দশা না
হয় ? নানকটাবেক ত বড় বুদ্ধির অধিকার, এখন কিছু বুদ্ধি
একটা।

কিন্তু লোকটাকেই কোথাও পাওয়া ঘাইতেছে না যে !
খোঁটা শহরটাই তো প্রায় পোতা-বোঝা করিয়া ফেলিলেন—
লোকটা কৈ ?

অবশেষে সেদিন উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন এবং প্রায়-অবশ
কালকাগ্রসার মহাবীরের কাছে লাভু ভোপ মানসিক
করিয়া ফেলিলেন। আর সেইদিনই (যদি বলাবলি
মহারাজকী) একটা বহিষ মিলিল উকীল সাহেবের।

হঠাৎ ঘুরিতে ঘুরিতে দাবাপল্লী বাজারের কাছে পুস্তকান
বন্ধ কানহাইয়ালালের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। এ
লোকটিরও বুদ্ধি খুব, অনেকবার অনেকরকমে বাঁচাইয়া
ধেঁষিয়াছেন কালকাগ্রসার, যখন যখন তারিখ না করিয়া
পারেন নাই। কানহাইয়ালাল তাঁহার অনেক আগেই বেঘাতে
গিয়া বাস করিতে শুরু করিয়াছেন—এখন আশাপ করিয়া
জানা গেল তিনিও বসিয়া নাই, সেইখানে বসিয়াই 'হু পরদা'
বেশ কামাইতেছেন। তরিকে লক্ষ্যেই একিকে কানপুরে—
সিপাহীদের কাছে বসন্ত ঝোপাইতেছেন এবং পোশাক
হইতে শুরু করিয়া জুতা মোরান ত পর্যন্ত ব্যবতীয় টিকারী
লইয়াছেন। নিজে বড় একটা এই সব হাঙ্গামের মধ্যে
যান না—লোক রাখিয়া চালান, ইহার দল-সংগে বাঁড়ীর
কাছাকাছি যাবেন নাই—নিজের গাঁ হইতে বহু দূরে গর
কতেপুরের কাছে একটা গাঁয়ে বসাইয়াছেন। আবার
ওকিৎকও তলে তলে কিছু কাল শুভাইয়া রাখিয়াছেন
বৈকি। দুই মেঘ সাহেবকে প্রায় বৃত্তান্ত শুন হইতে

বাঁচাইয়া কয়দিন পরে রাখিয়া শেষ পর্যন্ত পোস্তুর গাড়ীতে চড়াইয়া সীতাপুরের লক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। আর কি করিতে পারেন তিনি ? তাঁহার বাহ্যিকভাবে ত কহিলেন—এখন তাহারই বরাত। অশ্রু শোনা যাইতেছে, তাহার শব্দ পর্যন্ত কয়জন গিলাবীর হাতে থকা পড়িয়াছে, এবং সে অবস্থায় ঘলাঘল কী হইয়াছে তাহাও অনুমান করা কঠিন মন্তব্য—তবে কানহাইয়ালালের তাহাতে কিছু আশিয়া যায় না। তিনি পোস্তুর গাড়ীতে তুলিবার পূর্বে বেম সাহেবকে বিদ্যা হুইখানি 'স্যাটিকফিকিট' লিখাইয়া লইয়াছেন—তাঁহার ইংরাজ-ভক্তি ও বিশ্বস্ততার উচ্চপ্রমাণ। লিখিয়া বিদ্যা দিয়াছে তাহার—সুতরাং ও পক্ষই ঘরী হটক আর এ পক্ষই ঘরী হটক—তিনি নিশ্চিত। যে-ই ঘরী হটক—সাময়িক ভাবে অপর পক্ষের সহিত কাল-কারবারের চিহ্নগুলি স্বাভাবিক মণির নিচে পুতিয়া ফেলিতে কতজন ?

কালকাক্সাদার মৃত হইয়া শুনিতেছিলেন। সকলেই বেশ শুধাইয়া লইল, কেবল তিনিই আশঙ্কিত, কিছু করিতে পারিলেন না। অবশ্য তিনি প্রাক্তন (এবং সম্ভবত বর্ধিত) মনিবের কিছু পয়সা শেষের দিকে নিতের দিম্বকে পুতিয়াছেন ঠিকই—এবং এই কয়দিন সব কী ঘোণাইয়াও ছই চারি পরমা করিয়াছেন—তবে সে আর কতটুকু ? সে কি ইহাযের আরের সঙ্গে তুলনীয় ?

একই সঙ্গে অপর বৃত্তিতে তুলি-এবং নিতের নির্বৃত্তি ও ছুঁড়্যা ছুঁড়-বোধক একটা দীর্ঘবাস কেলিয়া কালকাক্সাদার কহিলেন, 'তা আশ্রম এখানে কি করছে ? শহরের হওয়া ত ভাল ঠেকছে না।'

'সেই জগতে ত এগেহিও তাই, প্রাণের দ্বারে। অনেক টাকা পাওনা—লোক পাট্টেই সুবিধে হচ্ছে না—তাই নিজে ছুটে এসেছি। আরেরও এসে পড়ল বলে, কাল পংক্তির মধ্যেই একেবারে বোরে এসে পড়বে, বরং এদের লড়াই দিতে হবে নয় পালতে হবে। এখন কিছুক বা হারুক—এবং কি আর কোন পাশা পাওনা হবে ? কে কার কড়ি ধারে, এই হয়ে ধাঁড়াবে। তাই এসেছি যেত মন্তব্য করে যেতে। তা কাল উদ্ধার হয়ে গেছে, স্বাভাবিক সঙ্গে আশ্রমের রক্ষা করতেই নগর টাকা বেরিয়ে এল এক লক্ষ্যমাত্র !'

'আশ্রমের ?'

'তাতেও আমার লোকশান হয় নি।...আগে ত অনেক মক্ষা করেছি এটার না হয় না হ'ল !' হাসিতে লাগিলেন কানহাইয়ালাল।

সঙ্গে সঙ্গে উহার মুনাকার একটা আনুমানিক অক্ষ মনে মনে অনুমান করিয়া লইয়া কালকাক্সাদার ঘামিয়া উঠিলেন।

'তা তুমি এখানে কি করছে মুনী কালকাক্সাদার ?'

কালকাক্সাদার সব কথা না বলিয়া সংক্ষেপে শুধু বলিলেন, 'আমি মানকটাককে খুঁজছি। তার সঙ্গে একটা লক্ষ্যমাত্র হওয়ার আছে।'

'ও, মানকটাককে খুঁজছে ? তা এখানে কেন ? বিটুরে যাও, যেখানে প্রাসাদের আনাচে-কানাচেই সে যুগছে। আরে, ওরা হ'ল শহুরে ভাত, তাগড়ে আর অপায়েই ওরা ঘোরে। বিটুরের এখন হ'ল শহরমুখীর অবস্থা—বুড়ো শহুরি দেখে টিক সেখানে গিয়ে হাঙ্গির হয়েছি।'

'কেন, কেন বিটুরের অমন হাসি বলছে কেন ?' সাগ্রহে প্রশ্ন কহেন কালকাক্সাদার।

'আরে, মানসারের ত ওখান থেকে চাট-গাট গুটিয়ে ভাপবার তালে আছে—শোন নি ? এখানে যে বহুত কাণ্ড হয়ে গেছে। ছিল কোথায় ? আদিত একদিনের মধ্যে এসেই সব শুনে নিয়েছি।...ঐ যে বিবির না কোথায় একপাল মেমসারের আর তাদের বাচ্চাকাচ্চা ছিল, তাদের নাকি নানাই এক বিবি খুন করেছিল; অল্প নাম করে মানার কাছ থেকে পরোয়ানা নিয়েছিল—সেই পরোয়ানার জোবে কনাই দিয়ে কোতল করেছিল। খবর পেয়ে নানা-সাহেব ছুটে আসছিল, শহরে পা দিয়েই শোনে কক্ষ কক্ষ। তখনই তেড়ে পড়েছিল নানা—সিঁধে নাকি গঙ্গার ঢলে গিয়েছিল ভুবে মরতে। কে নাকি হঠাৎ এটিকে এসে পড়েছিল—তাতে আর অজিযুরা বাঁতে অতিকষ্টে টেনে কিয়েছিল।...এখন শুনিছ আংরেজ ত হোবে—মানসারের বিটুর ছেড়ে যাওয়ার জন্তে তৈরী হচ্ছেন।...হামো তিনিপত্র, হীরে-বহরত, সোনার বালা-বাগনগুলোও কোন একটা কিসাতি করে রেখে বাবে যাওয়ার আগে নিশ্চয়—হরত ঘাটের নিচে পুতেই রেখে বাবে কোথাও—জাশোনে যাও তোমার

নানকটাব সেই তালে ঘুরছে। ওহা ঘড়িবাঁজ—আমাদের মত খেটে খেতে ত শেখে নি, মেহনতের মধ্যে ও নেই—ওর হ'ল মরি ত গটার লুটি ত ভাঙার। নিশ্চয় এখানেই উকিছু'কি মারছে, গুপ্তধনের যদি সন্ধান পায় ত—যাতায়াতি মহারাজা। বুঝলে না!'

চোখ টিপিয়া হাসিলেন কানহাইয়ালাল।

'জাহা চলি তা হ'লে। ভগ্ন রাথলোঁকি! আমার এতটা পথ যেতে হবে। আজ অশ্রু বাতটা শহরের বাইরেই থাকব—আমার এক জানাইয়ের বাড়ী। তু'রদি করা ঠিক নয়—যা অব্যক্ত দিনকাল যাচ্ছে। সঙ্গে অংবার কাঁচা মাল রয়েছে ত!'

তিনি রওনা হলেন। কিন্তু কালকাপ্রসার অনেকক্ষণ নড়িতে পারিলেন না। যেন মহাবুদ্ধির মত অবস্থা তাঁহার।

টাকা-কড়ি, হীরা-অহরৎ, সোনার বাসন! গুপ্তধন!

উঃ, নানকটাবেটা কি সাংখ্যাতিক ধৃত্ত। ঠিক বলিয়াছে কানহাইয়ালাল, বুড়া শহুনি!

কানহাইয়ালালের কথা যে নির্জলা সত্য সে বিষয়ে তাঁহার সম্বন্ধ নাজ বহিল না। আরও একবার কানহাইয়ালালের বুদ্ধির তাত্ত্বিক করিলেন। এইসব কাহিনী তিনিও কিছু কিছু ভুলিয়াছেন কিন্তু তাহার সহিত নানাগাংহেবের টাকা-কড়ি পুঁতিয়া রাখার প্রয়োজন হইবে—এমন কল্পনা ত তাঁহার মাঝে আসে নাই কখনও। আর ঐ নানকটাব—ঐ ধৃত্ত শৃংখলার কথাও তিনি অমন করিয়া ভাবিতে পারেন নাই ত!

অবশেষে যখন সবিস্তারি পাইলেন, তখন কালকা-প্রসার সেই রাঙেই একটা একটা ডাকিয়া বিটুরের বিকে রওনা হলেন। একাওয়ালারা আবার এখন প্রাত-বিরেতে গৃহিকে বাইতে চায় না—বিশেষত সিপাহীদের বাগ এলাকা গুট—ওখানে পৌঁছিয়া অনেকই ভাড়া ধের না—চেষ্টামেচি করিলে সিপাহীরা সন্ধান উঁচাইয়া তাকিয়া আসে।...অবশেষে ঠিক বিটুর অবধি না গেলেও চলিবে, তিনি না যর কিছু দূরেই নামিয়া পড়িবেন—অবিশ্বাস হয় ত আগাম ভাড়া দিতেও রাণী আছে—এইরূপ অনেক বুঝাইয়া তবে রাণী করিলেন একটাকে।

কী দিনকালই পড়িল, সামাজ্য একাওয়ালারও

খোশামুখি করিতে হইতেছে তাঁহাকে। বাস্তব কপাল!

নানা সাহেবের প্রকৃমে করদিনই প্রাণাধার বাহির বিককার সব আলো মছ্যার পর নিভাইয়া দেওয়া হইতেছে। নানকটাব এ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন বাহিরের পাখা-বা-দারের কাছ হইতে—আর সেই স্ত্রী ধরমাই তিনি কর-দিন যাবৎ প্রায় সারা রাতই বিটুর প্রাণাধারের পিছন বিক-কার বাগানে কাটাইতেছেন। মশার উৎপাতে চারব বৃদ্ধি দিয়া থাকিতে হয়—শাখা চারবের বং আবার বহুবু হইতে অন্ধকারেও দেখা যায়—কালো বংও খুব সুবিধার নয়, পাংসা অন্ধকারে গোলা বাইতে পারে—সেই লজ তিনি একটি গাঢ় সূঁচ রঙের বড় চারব সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রাণাধার হইতে বাগানের বিকে বাহির হইবার যে দরজা—তাহারই কাছাকাছি কোণে ঝাড়ে পা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকেন। আলো নিভানোর অবশেষ কেন? নিশ্চয়ই অন্ধকারে কোন কাণ করিতে হইবে। পাছে একদিন হঠাৎ আলো নিভাইতে বলিলে অপর কোন ভৃত্ত বা আত্মীয় সন্মুখ করে তাই প্রত্যাহই আলো নিভাইবার অবশেষ হইয়াছে। বাহিরেই শুধু যখন এই অবশেষ তখন কানটা বাহিরেই দাড়া হইবে। বাহিরের কী এমন গোপন কাণ থাকিতে পারে—যনরূপ পুঁতিয়া রাখা ছাড়া?

নানকটাব এক আঁচড়ে পোকের মতলব বুদ্ধিতে পারেন—এটা পারা আর এমন সস্তকি? তিনি তাই প্রত্যাহই সারাগ্রস্ত এখানে কাটাইতেছেন—এবং প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে নিষেধ বাড়াই পিছনের দার পুলিশ উপরে উঠিয়া সারাদিন বিশ্রাম করিতেছেন। সেই লজই কালকাপ্রসার তাঁহার পাভা পায় নাই—যে বাড়ী দীর্ঘকাল ভাল বন্ধ পড়িয়া আছে, যে বাড়ী ইচ্ছাপূর্বক চরে ত্যাগ করিয়া গেছে—যাহুব সেই বাড়ীতেই আদিয়া বাপুটি বাড়িয়া বসিয়া থাকিবে, ইহা কল্পনা করা কালকাপ্রসারের সাথের অতীত। বিশেষ যখন বাহিরের সবর যেমন বন্ধ তেমনিই আছে। শুধু ভোর ও মছ্যার পর যংগা-আগার সময় দুই একজন পরিজিতের সঙ্গে বৈবায় দেখা হইয়া গেছে—তাঁহাদের মুখেই কালকা-প্রসার খবর পাইয়াছেন যে নানকটাব শহরে আছেন বা আসা-যাওয়া করিতেছেন।

সেদিনও যথারীতি নানকটাব মছ্যার পর আবার পা

চাকিয়া পিছনের পাঁচাল ডিকাইয়া বাগানে নিষেধ বাটতে আসিয়া বসিয়াছেন।

পাঁচালের একটা মাদ্রাসার তিনি খানিকটাইট খসাইয়া রাখিয়াছেন ঘাতাতারের সুবিধার মত। সে মাদ্রাসার কাছে হইতে তিনি মাসিক একটি বক্তৃত্ত্বার বিনিময়ে নিয়মিত প্রদানের সংগ্রহ সংগ্রহ করেন—সেই মাদ্রাসিককে আর একটি মুদ্রা কবুল করিয়া এই কাগজটি করাইয়া লইয়াছেন—তাঁহার নিজের কোন মেহনৎ হয় নাই। সে লোকটাও দীর্ঘকাল ধরিয়া বেঁচেতেছে নানকটাককে—কখন কী মতলবে তিনি কি করেন—কতদিন পূর্ব হইতে কোন ঘটনার মত কীভাবে তৈরী হন, তাহা সে বহুবার বুঝিবার চেষ্টা করিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। আশ্চর্য্যকর আর প্রশংসা করে না।

কতদিনে বাগানের পথবাট কোণস্বাভূ সব পরিচিত হইয়া গিয়াছে। তাই নিঃশব্দে আসানোনা করিতে কোন অসুবিধা হয় না। বড়ীর জ্ঞাতও এক ছোড়া সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন—খালিপায়ের যেটুকু শব্দ হয় ইহাতে ভাগ হইবে না। সাধারণ লোক হইলে তিনি চাব বাজি এইভাবে বুঝা কষ্ট করিয়াই হতাশ হইয়া পড়িত। বিশেষতঃ যখন সবটাই—অসুস্থমান মাত্র, ঠিক কিছু জানা যায় নাই—কিন্তু নানকটাক সাধারণ লোক নন। তিনি হাল ছাড়েন নাই—নিজ বিখ্যাসে বৃত্ত আছেন। এই মতলবই কতদিন একাধার ধরিয়াছেন। এখন হইতে কিবিবার পথেই 'বহি' সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। 'বহি'ও ছাড়ু খাইয়া লন তখনই। মজার আর কিছু আশাব্যব করেন না, ভাবাপেটে ঘূন পাগ বসিয়া।

অবশেষে এত কষ্টে 'কেষ্ট' নিলিল।

হঠাৎ মধ্য রাত্রে পব খুঁট করিয়া পিছনের দরজা খুলিয়া গেল।

নিঃশব্দে বাহির হইল দুইজন লোক। বক্তৃত্ত্ব সত্ত্বে নিঃশব্দেই বহুদূর খোলা হইয়াছিল—কিন্তু নানকটাকের সবা-লাগ্রেত কানে সেটুকুও এড়ায় নাই—তিনি তৎক্ষণাত্ মতর্ক ও লক্ষণ হইয়া উঠিলেন।

অন্ধকারেই ছুটা শোক বাহির হইল। অন্ধকারেই সাবধানে চলিল। দুজনকেই খালি পা। সেমত এক-মনের খুবই কষ্ট হইতেছে তাহা বেশ বোঝা যায়।

নানাসাহেবও কোন বিবস্ত্র ভূত। তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

আর একটু ভাল করিয়া চাওয়া বেশিগেল, পিছনের লোকটির কাঁধে দুইটা বস্তা।

উদার খানিকটা পথ অগ্রসর হইয়া গেলে নানকটাক তাঁহার বাঁটি হইতে বাহির হইলেন। বাহ্যিক এ বাগানের মাসিক তাহারের বস্তা কষ্ট হইতেছে—নানকটাকের সেটুকুও কষ্ট নাই। তিনি স্বল্পে নিঃশব্দ মতর্কতার সহিত দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন। পাতা ঝড় কাল বহুদিন অতীত হইয়া গিয়াছে তাই হুকা, গুতপত্রে পা দিয়া শব্দ তুলিবার ভয় নাই।

অগ্রগামী লোক দুইটি বহু পথ বুঝিয়া একেবারে বাগানের শেষ প্রান্তে একটা পবিত্রত্ব অ-ব্যবহৃত কুয়ার সামনে আসিয়া থামিল।

বাঃ। নানা সাহেবের বৃত্তির তাত্ত্বিক করিলেন যেন যেন নানকটাক। মাটি খুঁড়িতে গেলেই শব্দ হইবে, তাছাড়া খুব গভীর করিয়া মাটি কাটিলে তাহার চিহ্ন ঢাকা শক্ত। আন্তে আন্তে কুয়ার মধ্যে নামাইয়া দিলে বাহির হইতে কোন চিহ্নই থাকিবে না। এ কুয়াটা এককালে মালীরের মত কাটানো হইয়াছিল বোধ হয়—এখন ওপাশে একটা বড় কুয়া হইতে বলহের দ্বারা মল ওঠে—তাই কষ্ট করিয়া এখান হইতে আর কেহ মল তোলে না। বহুদিনের অব্যবহারে মলও গাঢ় হইয়া গেছে, পাকও নিশ্চয় খুব বেশী ভরিয়াছে—সহ্য কেষ্ট মল তুলিতে গেলেও গুপ্তবস্ত্র বাহির হইয়া পড়িবার ভয় নাই।

কুয়ার কাছে পৌঁছিয়া অগ্রগামী লোকটি কাঁধের উপর হইতে পাংসা বড়ীর মত কি নামাইল। গাঢ় অন্ধকার কিন্তু সেটা চোখে সহিয়া গিয়াছে, এখন মজারের আলোতেও স্পষ্ট দেখা যায়।

নানকটাক ভংগা করিয়া আর একটু কাছে গেলেন।

হী, বড়ীই বটে। সত্ত্বত রেশমের বড়ী—মিহি অখট মজবুত।

নানা—কাছে হইতে বেশি আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না—নানা একটা পুঁটুলির সহিত এক গাছি বড়ী বাঁধিলেন, তারপর ভূতটি সেই পুঁটুলি দীর্ঘ দীর্ঘে নিচে

নামাইয়া দিল—খুব শতর্পণে—তবু সামান্য একটি শব্দ উঠিল ছাড়া করিয়া, আর একটু নামাইল বড়ী—তারপর বড়ীটাও ছাড়িয়া দিল। আর একবার নানকর্টার মনে মনে নানার বুকের প্রার্থনা করিলেন—উপর হইতে ছাড়িলে বিঘন শব্দ হইত, ঐ সামান্য বড়ী এখনই লগে ত্রিবিয়া মিশিয়া যাইবে, উপর হইতে কোন চিহ্নও পাওয়া যাইবে না।

ঐভাবেই আর একটি পুঁটুলি মলমলই হইলে তৃত্যটি একা ভিবিয়া গেল নিঃশব্দে। নানা ঠাড়াইয়াই রহিলেন, আর তাঁহার মাত্র ছয় হাত দুয়ে নানকর্টার। নানা মশার আড়ম্বার এদিক ওদিক ঘিরিতেছিলেন, একবার মোগা নানকর্টারের দিকেও তাকাইলেন—ভয়ে নানকর্টারের নুকটা চিপ্ করিয়া উঠিল কিন্তু নানা কিছুই লক্ষ্য করিলেন না। সবুজ পাতাবাহারের ঝোপের সহিত পাট সবুজ বৈচিত্র্য চাপবট। মিশিয়া গিয়াছে। এখান নানকর্টার তারিক করিলেন নিজেদেরই।

অপেক্ষা করার কারণটা বোঝা গেল—একটু পরেই। তৃত্যটি আরও দুটি পুঁটুলি আনিতে গিয়াছিল। এসব কাজে বেশী লোককে বিশ্বাস করিতে নাই—তা নানা জানেন।

নানকর্টার মনে মনে হিঙ্গাব করিলেন—পুঁটুলিগুলি নিচয় খুব ভারী—নহিলে এক সঙ্গেই সবগুলি আশিত।

পূর্বের ব্যবস্থাহুয়াই এ পুঁটুলিগুলিও মলমল হইল। নানাসাধেব হিঙ্গাব করিয়াই বড়ী আনিয়াছিলেন। কাজ শেষ হইলে নানা ইঙ্গিতে তৃত্যকে আরও কাছে ডাকিলেন, তাহার পর নিজের পিরানের মধ্য হইতে উপবীতটা বাহির করিয়া তাহার দ্বায়ে ঠেকাইয়া প্রায় অক্ষট-কণ্ঠে বহিলেন, “আমি তোরা মনিব, বাবা, প্রাণধন—এই আমার ঘেন্নেই দুয়ে আছি—বল, একথা তোরা গলা কেটে ফেললেও কাউকে বলবি না। জীকে না, ছেলেকে না, মাকে না—এমন কি আশ্রয় কোন আত্মীয়কেও না। বলবি না—নিজের কোন দিন নেবার চেষ্টা করবি না। বল—বিদ্যা কর।”

তৃত্যটি ভীত কম্পিত কণ্ঠে বিস্ময় করিয়া বহিল, “আমি আপনাব ঘেন্নেই দুয়ে ভগবান গণপতির নামে, আপনাব নামে বিদ্যা গালাছি পেশোয়া, একথা খরং ভগবান এসে দ্বিজলা করলেও বলব না—মাহুত ছায়া।”

নানাসাধেব সন্তুষ্ট হইলেন, উপবীতটা। পুনরায় নামাব মধ্যে ঢুকাইয়া বহিলেন, “আমাব ঘরে যেখানে এই সব মাল ছিল—সেখানে আর একটা ছোট মাল আছে দেখে-ছিন ত ? এবার চুপি চুপি দিয়ে দেটা নিয়ে চলে বা। ওতে ছন্দ মোহর আছে। যদি আমি বিত্তি, আনাত হান্দা দী থাকে ত—তোকে আত্মীয় দেব—নইলে ঐটেই তোরা বকশিশ। আর যদি কোনদিন নিষিদ্ধ জানিব যে আমি মরে গেছি—তুই এগুলো নিতে পারিস।”

তৃত্যটি হেঁট হইয়া পেশোয়াকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। নানাসাধেব আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সেই-খানেই ঠাড়াইয়া রহিলেন। সন্তুষ্ট নিজের ইষ্টধনতা শিব ও গণপতি ভগবানের কাছে প্রার্থনা আনাইলেন—এই পৈত্রিক ঐশ্বর্যের বক্ষণাবেক্ষণের জন্য। তারপর তিনিও প্রাসাদে বিবিয়া গেলেন।

এত রাজে পথে ঘাটে বিশেষত এ অঞ্চলে বাহির হওয়া নিরাপদ নয়—তাই নানকর্টার বাবী রাতটুকু সেই বাগানেই কাটাইলেন, অস্ত্র এবার পাঁচালের দ্বায়ে, অপেক্ষাকৃত ঠাঁকা জায়গাতেই। তারপর উষার আভাসময় দেখা দিতেই—সবুজেরাই বাতাসে এবং শুকতারা অস্বাভাবিক আভাস পাইয়া পাঁচাল ডিঙাইয়া বাহিরে আনিলেন।

কিন্তু প্রাসাদের পিছন দিকটা ঘুরিয়া এখিকের পথে আনিয়া পড়িতেই এক বিপত্তি। পাশের গভীর শুক নালার কে একটা লোক বাপটি মারিয়া বসিয়াছিল—এখন এক লাগে উঠিয়া পড়িয়া একেবারে তাঁহার সামনে পথ রোধ করিয়া ঠাড়াইল।

চমকিয়া উঠিয়া শতরে তিন পা পিছাইয়া আনিলেন নানকর্টার। কী বিপদ, মূকে একটা বাতিয়ার পর্বত মাই। আর থাকিলেই বা কি হইত, অতর্কিত তিনি এই মুহূর্তে ইষ্ট নামই জুলিয়া গেলেন ত হাতিয়ার।

কিন্তু যে লোকটা পথ রোধ করিয়া ঠাড়াইয়াছিল সে হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিতেই চিনিলেন—কাল্পনা-প্রসাদ। রাজে প্রবেশ পর্বত জলিয়া উঠিল নানকর্টারের। কী তরুটাই না দেখাইয়া দিয়াছিল আশাশ্রয়। তিনি ক্রুদ্ধ অচল নিরকণ্ঠে বহিলেন, “তুমি এখানে কি করছ—এত রাজে, বোকার মত। বস্তাব চরিত্র বিপদেও না কি ?”

‘আরে বাবু নানকটায়জী, ওস্মা মৎ করিয়ে।
কানহাইপ্রালাল তাংলে ঠিকই বলেছিল—

‘এক নিমেষে সন্ধ্যা হইয়া উঠিলেন নানকটায়,
‘কানহাইপ্রালাল কী বলেছিল?’

অন্ধকারেই নিত কাউলেন নৃপী কালকাগ্রসার, কণাটা
বলা আখ্যো ঠিক হয় নাই। ‘কবিলেন,—‘না কানহাইয়-
লাল বলছিল যে এই শব্দেই আপনি আছেন।’

‘ও, বলেছিল নাকি? সে শব্দে কিরূপে?’

‘না। আসা যাওয়া করছে।’

উত্তরেই হাঁটিতে শুরু করিলেন।

‘হ্যাঁ, কী বলছিলেন উকীলসাহেব, বতায় চরিত্র
বিগড়োল নাকি? সে কথা ত আপনাকেও বলা যায়।—
আপনিই বা এত রাত্রে কী করছিলেন? পঁচৌল
ভিক্সিয়ে নানাব পেয়ারের আউলা বেগমের হয়ে দিচ্ছিলেন
নাকি?’

কণাটা ক্রমশই বিপজ্জনক এলাকার দিগা পড়িতেছে।
নানকটায় সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়া কহিলেন, ‘ওদম ব্যাং
কথা থাক। তারপর তুমি কী মনে ক’রে এখানে বসেছিলে
বল বিকি?’

‘আপনাকেই বুকে ছরান হয়ে থাকি কদিন। ওগাবে
ত সবই বোঝা হয়েছে—তাবলুম আজ একবার বিটুংটা
যেতে যাই। তাই এখানে—’

‘তা আমার বেঁচে—সাহায্যত?’ শব্দিত হয়ে ওঠেন
নানকটায়। সেটা কালকাগ্রসারও টের পান। ‘তাড়াতাড়ি
বলেন, ‘না—যানে আসতেই বাত হয়ে গেল, এখিক গুহিক
খুঁতে আরও হাত হয়ে পড়ল। তাবলুম যে এখন পথে
বাটে একা চলা ঠিক নয়। তাই গুহিরে বসেছিলাম।
তা মহাবীর ভগবান সবর আছেন, এই পথেই আপনাকে
আন্সিয়ে ছিলেন।’...এই পর্বত বলিয়া একটু ঘানিয়া ভাল
দাহবেয় মত পুদন্ড করিলেন, ‘তা বিটুংের কি করতে
আসেন নানকটায়জী—নানাসাহেবের সঙ্গে কোন কাজ
করবার চলছে নাকি? টাকা পরমা বেশ জাহানি
হচ্ছে তাহলে? আপনি ত পরমা ছাড়া চলেন না
একপাত?’

‘হু হু। নানাসাহেবের সঙ্গে কাজকাবাব হলে আয়

প্রাসাদের পিছনে আসব কেন? এক সাংকেয় সাংকেয়
সঙ্গে কাজ ছিল।’ শব্দীবতাবে বলেন নানকটায়।

‘সাংকেয়!’ শাননে শাপ বেছিলে যেমন মাহুং লাকাইয়া
ওঠে তেমনিই লাকাইয়া উঠিলেন কালকাগ্রসার।

‘হ্যাঁ বাবুজী হ্যাঁ! সাংকেয়! এসে পড়ল বলে।
ওরা একেবারে চুপিচুপি এলে নানাসাহেবকে দ্বতে চায়—
লড়াইয়ের আগে। তাই পিছনবিকের পথবাট বেগতে
এসেছিল। আমি বেগিতে হিলাম।’

‘ও। তা সে সাংকেয় কোথায়?’

‘সে নবীং বিকে চলে গেল। ঐ পথেই এসেছে ত?’

‘জয় বহরত্ বলী। সাংকেয়ই তাহলে কিতবে—কী
বলেন উকীল সাংকেয়?’

‘তাতে সন্দেহ আছে নাকি?’

‘তাহলে আমি বেঁচে সেলাম। চাইকি কপালও কিরূপে
পারে।’ কালকাগ্রসার সংক্ষেপে চারিঘন ইংরেজ বাঁড়ানোর
ইতিহাস বিবৃত করিলেন। যে মংঘটা তাহাকে পীড়া
কিতেছিল, যে কারণে তিনি এমন ‘হতে’ হইয়া ঠাহাকে
খুঁঝিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাহাও বলিলেন। শুণু বলিলেন
না—কানহাইপ্রালালের সহিত নিজের কথোপকথনটা—
এখন হইতে বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়াটা কিছু নয়। ও
বিকে কালকাগ্রসারও নিজের মত করিয়া একটু বোঝ-
খবর লইতে পারিবেন বরং—অলবমত।

সব শুনিয়া নানকটায় ‘হু’ করিয়া কণাটা উড়াইয়া
দিলেন।

বলিলেন, ‘আংরেজের ভগ্ন অনিবার্য। নৃপী তুমি
নিশ্চিত থাক।’ এই বলিয়া তিনি একটু কাব্যাবও
আশ্রয় লইলেন। উত্তর-বিপত্তের সন্তানাতার বিকে বোঝাইয়া
বলিলেন, ‘গতের পরে যিন আসে। ওদের বাত এই
আধাতেই বাত! কেটে গেছে। ওদের বংগতেই ঐ ভোর
হচ্ছে! মাসখানেক দিগে নিজের বেহাতে বসে থাকো।
কারণ কাল পরন্তই এখানে গওগোল লাগবে। আমিও
চললুম, আজই আবার বক্তৃতা চলে যাবে। টাকার কথা
—? কালকাগ্রসার, বড় সাধা খাতা মোশাক্ত করতে
পারো কয়েকটা? সববে ত সব বোকানি বন্ধ, পাওয়া
যাচ্ছে না।’ সমকিয়া হাড়াইয়া বেলেন নানকটায়।

‘নালা বাত্স ?’ কালকাগ্রসাদও শুভিত ।

‘হ্যা—হ্যা। বাত্স। আমি এখন বসে শুধু বাত্স লিখব। ঐ বাত্সতেই পরশা। যদি বাত্সতে চাও বাত্স এনে দাও।’

‘বাত্স ?’ তবুও হৃদের মত প্রশ্ন করেন কালকাগ্রসাদ ।

‘হ্যা—হ্যা। বুঝতে পারছ না নালা কখাটা ?’ অগভিকৃতাবে নানকটার জবাব দেন, ‘আমি যে কিতাব লিখছি। আংও লিখব, টের লিখব। বাত্স বাত্সতে চাইবে তার আমার ঐ বোজ-নামচার নামটা শুভান্যত্ব লভে রাশি রাশি টাকা চেষ্টে দিয়ে যাবে আমার কাছে। ঐতেই লাখ লাখ টাকা কামাবে।’

‘কিতাবে লাখ লাখ টাকা কামাবে ? কী কিতাব উকলসাদেব ? হানারপের মত বড় পুঁবি নাকি ?’ কঠ একটু বিক্রপের আভাসও দেখা দেয় কালকাগ্রসাদের ।

‘না ভাই—সামান্য এই নানকটার বাবুনাদেবের জীবনী, বোজকার জীবনী—যাকে বোজনামচা বলে !’

নানকটার আর অপেক্ষা করিলেন না। পাড়া কাগিতে শুক্ক করিয়াছে। সহসা একটা চলতি একদার লাকাইয়া চড়িয়া বসিয়া খুখটা বাড়াইয়া বলিলেন, ‘আজ্ঞা আপাতত চলি ভাই কালকাগ্রসাদ, রাম রাম !’

সত্যিই লোকটার তল পাওয়া যায় না। কখন যে কী তালে থাকে, কী যে বলে ! দুই হঠক, মতক পে ছাই, ওর ও হেঁয়ালী বোঝা তাঁহার কর্য নয়।

কালকাগ্রসাদ হাস ছাড়িয়া দেন।

তাঁহারও একটা একা প্রয়োজন। এখনই শহর ছাড়িতে হইবে।

[ক্রমশঃ ।



ঋণিত গুচ্ছ

তবু আসি
মহীভাষ বিখ্যাস

তবু আসি, ভরে ভরে বসে থেকে
ভীকু পায়ে ধরে চলে ঘাই ;
ওখানে পাখুরে-পথ চলে গেছে বেঁকে,
কোথা সেত আজ জানা নাই ।
উঠোনের এক কোণে মালতীর কোণে
কুড়ানো সে শুভটুকু প্রেম,
তাই নিয়ে পথ হাটি, রাত জাগি,
ভুলে ঘাই কোথায় এসে ।

আকাশ-পিহিম-জলা কান্তিক-বাত
ঝরে পড়া শিশিরের সুরে,
যত গান বেধেছিল সেদিনের
সে মনের অবাক নুপুরে ;
লাজুক স্বপ্নের ছড়া, নিরালী হুণ্ড,
মেঘে-ঢাকা ঝাউঘন ধরে,
দূর হতে অবগু ধূরে ঢলে যায়,
স্বপ্নের মোনাকী ঘরে ধূরে ।

সারাদিন কেউ বেই, নিরিবিচি হাওয়া
কাঁপে শুধু এসোমেসো গাছে ;
নিরালা কামনা কাঁধে মেঘের ঘোপনে,
নীল লগল লগল আলো নাচে ।

প্রত্যাবর্তন
ঋণিতের স্তম্ভ

আলোচিত আশ্র-শাখে আনন্দ-কুসুম
প্রবণ ভবিষ্য মোর,—কহিল উন্নয়ন ;
কৈশোরে কুড়ায়েছিল যত স্মৃতি-কণা
চিন্তা যেন কিবে পেলো বিবৃত সে ঘন ।

কিরে পেলো অকস্মাৎ বিগত যৌবন ;—
ঐক্য-বিস্তৃত সেই স্বপ্ন-যোজনা,
প্রেরণা-বিশিষ্ট প্রকৃতির সাহস-সাধনা,
মুক্তিকার তার-মুক্ত মাহুক-দী-ঘন ।

এই গ্রামে—ঐতি-নীড়ে কিরিতু আশ্রয় ;
নিরাশ নিরাশ ফেলে প্রাণের প্রস্রাবে ;
প্রথম প্রস্রাব এই প্রকৃতি উদার
স্নেহ-স্পর্শ বের মোর সর্বক্ষে সূচায় ;
সুখে ভবে শুভে ধীরে ছিন্ন বীণা-স্তাবে ;
মধ্যস্থ মাটিতে চিন্তা পড়ে গো গুটায় ।

হেনা

ঐশ্বরীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

চাঁদ উঠে আসে সেই দক্ষার নিয়মে,
সব কাজ ফেলে রেখে যে ঈড়ার আড়িনার পথে—
মনে করো নাম তার হেনা।
কোনদিন বানী থাকে তুর হ'তে তুর অতি চেনা।
কোনদিন নির্জন গলিতে
কর তীক্ষ্ণ ভাটিয়ালো তেলে আসে বধিনা হাওগাতে।
কোনদিন কে ঘন চকিতে
বনভুল'সেঁথে দেয় পিছু হ'তে ব্যগ্র বোঁপাটিতে।
মুছ বাসি যেসে অকস্মাৎ
আগন্তুক ধরীবে সে স্পর্শ করে সমপিত হাত।
সাবাহিন হু'রে শাসনে
বেলা কাটে কুহকসে ঐত অকৃতমনে।

উতল আঘাতে কিংবা হেমন্তের নিতম্ব বোঝু'বে
শুষ্করিত হয় সে যে সেই সব সুখে,
কে তার আশার চেয়ে বেশী।
যার মুখ ঘেঁষে তার মনে পড়ে সেই পরবেশী
শুষ্করিত পাখিটির কথা—
কিংবা বার গানের শূন্যতা
কঁদে কঁদে শুক রাতে নিদ্রান ঘোঁরাগাতে—
না তার হৃদাতে
একদিন যে পরালো কুম্বের আনন্ডিত পুতি!
তুনি জানো অপূর্ণতা এগরের পৌরাণিক রীতি।

তাই তার বিন কেটে যায়
শীতে গ্রীষ্মে উন্মাদিত, ত্রিভাণ বেদতে বর্ষায়।
কখনও সে মূব, বিধায়ে
কখনও সে ক'রে যায় মুক অবসাদে।
শায়ারিন মনে মনে তার
আসে যায় প্রজাপতি মেঘে তুলে বহুতঃ বাহার।
কখনও সে তার গ্রীষ্ম, কখনও অচেনা
ফুলসবী হেনা।

ভাবনা

স্বপ্নাঙ্কন চক্রেবর্তী

ভাবনা আমার বিই ছড়িয়ে

অশোক পলাশ ককচূড়ার ডালে,
বা মেঘে নিকু গুহের খেকে,
গাম হয়ে থাক নৃতন ছকে তালে ।

ভাবনা তখন বিক হারিয়ে—

নিশির ডাকে চলুবে।
কঠিন কথা লজ্জা সুরে বলবে ।

ভাবনা আমার শিশুল বনে

বতীন হয়ে কপে কপে
ছুঁধ হয়ে বরণ মালা—

আকাশ পাড়ে প্রাণীপ জালা

গীষ্মের বাসর হবে ।

ভাবনা আমার লক্ষ্য হবে তবে ।

ভাবনা আমার ডালিষ সূলের

বস্ন মেঘে পাতে,
চলুবে হুলে মধুপ পট্টবী না'য়ে ।

ভাবনা, আমার ভাবনা ।

তবু আমার মনেই থাক না ।

মিথো কেন ডাকে। তাকে লক্ষ লোকের ভীড়ে,

উড়িয়ে বিলুপ্ত তাকেই আনি—

হুব আকাশের নীড়ে ।

বিকেল

বিকাল রায়

বেলা পড়ে আসে,—

প্রান্তরে ঘাসের সুল বিধর মেয়েত মত হালে ।
জাকতানী আকাশ চূপ, বাত্মাধেবী লোকহের ভিড়
পার্ক,—ওই উড়ে গেল এক ঝাঁক পায়রা-তিতিয় ।
কলুকাভার প্লেন নামে, উইলিংডেন পার্কের ছায়ায়
তোমার আদার কথা,—এলে কী ? সময় চলে যায় ।
এখন তো কিছু নেই বড়ো বাত্মা,
বড় কোর হ' চারটে পাড়ী যায় আসে ।

এখন তো তাড়া নেই অকিস বাবার—

এখন এক বুঠো স্বপ্ন মনের আকাশে ।

এ' লগ্ন মলিন হয়ে শুকনো সূলের মত বহরার আছে,
একতাপ ভালো চুল ছড়ারে মেয়েত মত গিঠে—

জড়ারে বতিন পাড়ী ভরুপ পরোবে অসুতাপে

আসলে নীরব কপে, বাসলে লগ্ন ;

তবে কিছু বলা নেত সজ্জিত মদিশীর কানে—

বাগিচায় উড়ে যাওয়া অপরূপ বিকসে এগাবে ।

বাবে যদি বাসতুল নির্জন দুহুট যদি যায়,

প্রাণের উজ্জল স্বপ্ন শিশিরের মত যাবে হবে বর্ষা লাগার !

আবার নিষ্ঠুর বিন হানা গেবে পালাপ লগ্নে,

তোমার সুখের ছায়া মনের ক্রমের খেকে মেঘনগর কড়ে

সুখে যাবে, লগ্নের ডেই তেলে বলা তুমি আর—

এ লান বিকসে এসে বাসবে কী লগ্ন তোমার ?



নকল সংসার শ্রীআদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বিয়ের প্রায় পাঁচ বছর পর শমীচূষণ বে ট্রাটের সে ভাড়াবাড়ীতে যে প্রণয়ভোর চিরন্তনে ছিন্ন হয়েছিল অকস্মিক ভাবে তার তিন বছর পর, বাবা মন্দির গোড়ে এ ভাড়াবাড়ীতে আবেহা মধ্যাহ্নিকভাবে অশোকের ঘোঁষনে ছেঁচ চিক পড়ে গেল।

একমাত্র শিশুর পরিচর্যা, বেহা মনের বয় এবং কামনা ও একটা গোপন পূর্ণা সন্ধ্যার সোতে সেহিন বা' সে করেছিল, আর তা নির্বিক বলই মনে হয় তার।
কিন্তু—

কিন্তু কেনন করে যে সে সেহিন তা' অস্তিত্বভাবে যেনে নিরুচ্ছিন্ন, আর তা' কেবে পারনা। তুল বলগে মনে হয় না তার।—সন্ধ্যার বৃত্তিভরীতে বা' অস্তিত্ব অবিচার নানে খ্যাত—তা' গোপনে দিচ্ছ করতে চেয়েছিল—এইমাত্র।

সত্য মুক্তা হ্রীত স্তুতি তখন বুক ছুঁড় হাহাকার তুলেছে।
সংসারের সত্য বিখ্য অর্জবিত করে তুলেছে তাকে।

সে কি তুল করেছিল ?

হ্রীত অমুখ দিনের দিন বেড়ে যাচ্ছে। সে সঙ্গে অক্লি কানাইও বেড়ে গেল।

মল্লিকা একদিন বললে, 'অন্ত করে অক্লি কামাই করা কি টিক হচ্ছে ?' মাসের শেষে ক'টাকাই বা পাবে ? এবিকে চিকিৎসার ব্যয়, সামোদিক খরচ, লাইক ইমসিওরের প্রিমিয়ম—'

ইচ্ছে করে অক্লি কামাই কবেনা অশোক। রোগিনীকে কে দেখবে ? তা'ছাড়া একমাত্র এই ছ'মাসের কচি ছেলোটাকে ? সামান্ত মাইনে পেয়ে জি বা মার্গ রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। না হয় এ মাসে মাইনেটাই সে কম পাবে কিন্তু পথেও ওতার ডিউটি করে পুষ্টিয়ে নিতে পারবে।

মল্লিকাকে বাগ দিয়ে অশোক বলে, 'তোমার অন্ত ভাবনা কিসের ?'

মাম বাসে মল্লিকা।

এ হাসির দ্বিলিকটুকু দেখে অশোকের মন কতকটা সুখী হয়। কতদিন সে তার মুখে এ হাসিটুকুও দেখেনি।

স্বামীকে খেদীহিন অক্লি কামাই করতে দিলেনা মল্লিকা। বিবধা যেন উথাকে টেলিগ্রাম করে আনালে।

অশোক অবাধ নিরস্তিত ভাবে অক্লি বাতায়াত আনন্ত করলে।

উভাব বয়স অল্প। প্রথম ঘোঁষমেই সে স্বামীহারা হয়ে বছরখানেক হলো ভ্রাতাধের আশ্রয়ে। পাড়াগাঁয়ের সে নিস্তর পত্নী ছেড়ে কিছুদিন দ্বিদির কাছে কলকাতার বাসার আসতে কিছুমাত্র আপত্তি করেনি।

মানখানেক পর মল্লিকার রোগ ঝাঁকপথ বরলো। অশোক স্বাস্থ্যস্বর্থ খরচ করেও ত্রীকে বাঁচাতে পারল না। স্ত্রতঃ একমাত্র পুত্র স্বনীলকে ভরী এবং স্বামীকে বিশ্বাস রেখে বাধ্য হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হলো মল্লিকাকে।

এক একটা দিন যেন মামতুল্য। এমনি ভাবেই মামখানেক কেটে গেল অশোকেব।

উভা বিদ্যে নিতে চাইল ভরীপতির কাছে, 'স্বনীলকে নিয়ে যাচ্ছি, বড় হলে নিয়ে আসবেন।'

অমহার ভাবে অশোক বলে, 'কিন্তু আমি—'

দীর্ঘ বাস ছাড়ে উভা, 'আপনার ত এই বয়স—কি বলবো—বিয়ে বা—' কথাটা শেষ না করতে পেয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে সে।

কিছুক্ষণ পর অশোক বলে, 'কিন্তু আমি বলছিলাম কি—'

উভা তার মুখের দিকে তাকায়। 'বলুন—'

'যদি বিয়ে না করি, অর্থাৎ তুমি যদি আমার কাছে থেকে ছেলোটাকে মানুষ করো, আর আমাকে মামাখান্না করে থাকো—'

উপার চোখদুটো সামলাতে পারেনা। বিস্মিত কণ্ঠে বলে, 'আমি ?'

• 'হাঁ',—তুমি—পারবে না উষা ?'

'সংসারে সবকিছু পান্না যায় না আমাইবাযু। এ বিধবা তটপতিব্র জ্বালায় বেংক দিনের পর দিন কাটায়ে শুণু আমার ভাইয়েরা নয় খাওয়া আমাকে ঢেঁনে তারাত দিবার বেধে।'

'কতি কি তাতে তোমার ? হুসিগ্ধ জীবনধারণের থেকে একটা অনাবাকে যাক্‌তুল্য। যেহঁ বয়ে লালন পালন করা এবং এ হতভাগ্যের যুগের সামনে জুবার অঙ্গ জুগিয়ে বেওয়াও বর্ষ।'

রাস্তা কণ্ঠে উষা বলে, 'আমাইবাযু, সংসারে কোনটা বর্ষ কোনটা অধর্ম,—আমি আছো ভেবে পাইনি। আমাঘের সমাজে এমন কতকগুলো অবিচার আছে দেখানে গতিকার বর্ষ মিথ্যার মনোহারিষে বিভীষিকা দেখায়। যাই হোক্‌ এ এসক বাধ বিন—আমার যাবার ব্যবস্থা করে দিন। বিনবাস্ত দিগির স্বতি মনে করে আর থাকতে পারছি নে।'

যাচিত কণ্ঠে অশোক বলে, 'আমারও তাই মনে হয় উষা, কিন্তু পেটের দ্বায়ে এখানেই পড়ে থাকতে হবে।'

'আপনার শোক আপাততঃ—বিয়ে কলসেই দেবে বাবে; আমাঘের মত যাবা যদি পেতেন—'

'ভাইয়ের আঙ্গরে না গিয়ে আবার বিয়ে করতান।'

'ঠাট্টা করবেন না আমাইবাযু।'

'ঠাট্টা নয়, সত্য কথাই বলছি।'

সত্য কথা বলতে অনেকেরই পারে—কিন্তু কাছে পরিণত করতে পারে না—যার উদাহরণ আপনাকে কিছু আগেই দিয়েছি।'

'কিন্তু আমি পারি।'

'হয়ত পারেন—আর পারবেন না-ই বা কেন,—' মেহের বিকে একবার চোখ জুগিয়ে নিয়ে কেব উষা বলে, 'আমার এ পূর্ণিপূর্ণ বৌবনে রূপ আছে, বিয়ে করা বউ ছেড়েও অনেকে রূপের নেপাশ আমার মাথায় করে রাখতে পারে কিন্তু ভবিষ্যতে—' দুহুর্ন্তে গা বিন্‌বিন্‌ করে ভঠে উষা।—'না—না, আমার পক্ষে একথা উচ্চারণ করাও

পাপ—আমায় যাপ কর্ত্তন আমাইবাযু, আমি পারবনা, আমার পাঠিয়ে বিন বাবার কাছে।'

উষার যাই যাঁই করেও যাওয়া আর হয়না। এয়ার এক সপ্তাহ হলো সে এবং অশোক জ্বলনের মধ্যে তেমন কথাবার্তা নেই। অশোক আক্শিপ যার জ্বরে এসে বিকালে পার্কে কিছুক্ষণ খোঁচাফেচা করে তারপর সন্ধ্যায় ফিরে এসে খেয়ে শুয়ে পড়ে, উষা রাগা করে। বাকী সময়টা সুনীলের পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকে। শিশুর নান্না তাঁকে আকৃষ্ট করে, 'আহা—না-না-না ছেলে।'

দিন কয়েক পর অশোক একদিন খেতে বসে বলে, 'হাকা হনীক্স হোড়ে বাঙ্গ পাটাছি—'

'পাটাবার কি বরকার, এ ঘরগানা ত আপনার পক্ষে যথেষ্ট। অথবা বেশী ভাড়া দিয়ে—'

'তোমার অহুবিষা হচ্ছে না ? একখানা মাত্র স্বপ, সামনে হাত পাঁচ-ছয় উঠান—কল পারাঘনার মাঝানারি—অত হাঙ্গানা কি ভক্তলোকের মেরেছেলের পোষায় ?'

বিস্মিতভাবে উষা বলে, 'আপনি কি আমার রাখতে চাচ্ছেন আমাইবাযু ?'

'আপত্তি আছে ?'

চোখ দুটো জলে তরে আসে উষার। 'আমায় যাপ কর্ত্তন আমাইবাযু, হুর্ন্তে নামে অর্থেরে ডোবাবেন না।'

পরদিন আক্শিপ থেকে পালিয়ে অশে অশোক।

উষা বলে, 'এরি মধ্যে চলে এলেন যে ?'

'লিভার কমপ্লেন্—বজ্র ঘন্থা হচ্ছে পেটে।'

রাতে রাগা করে না উষা। কে খাবে ! সে ত বিধবা। অশোকের মধ্য পার্শ্বে বসে অশ্রুজলের মালা গাঁবে। বড় চুপে হয় তার। দ্বিদি চলে গেলেম। জামাইবাযু অসুখ। আহা, কেমন করে ফেলে পাল্লার তাঁকে।

এক সময় উষা জিজ্ঞেস করে, 'ওহু এনেছেন ?'

দীর্ঘবাক্স ছাড়ে অশোক। মাথা নেড়ে বলে, 'না তাই ওহুদের পছন্দ নেই। তিন মাসের ঘর ভাড়া বাকী ছিল, বাড়ীর মালিক অক্শিপের বড়গাযু কাছে কমপ্লেন্ করে টাঙ্কাটা কেটে নিলে, যা' পেয়েছি তাতে এ মাসটা চালানো পক্ষ হবে।'—কিছুক্ষণ পর কেব বলে, 'জানো উষা, আমার যা' কিছু সত্ত্ব ছিল তোমার দ্বিবি চিকিৎসার পিছে সব

বেশ হয়ে গেছে। তবু ঘনি সে বাঁচত—' দলটা খরে আসে অশোকের। বোধ হয় দুটা স্ত্রীর চেহারাখানা তার মানদপটে হেসে ওঠে।

উষা নীরব।

নিজেকে সামলে নিয়ে অশোক বলে, 'সমস্যা নেই, বলাতে কেউ নেই, কিন্তু ঘাকে পেয়ে সব চুল-ছিন্নান, তাকেও হারাতে হলো। এবার তোমরাও যত্ন ত্যাগ করবে হুতো।'

'তা কেন জানাইবাহু ?'

'তা না বলে আমার এমন করে কেনে পালাবে বলতে পার ? কত হুঃসমর আঁধার—'

সেই ঘর কণ্ঠে উষা বলে, 'জানাইবাহু, হুতই ত্রুত নিয়ম পালন করি, হুতই সংসদতায় বাঁচনে নিজেকে কণ্ঠে হুই, হুতই না নিজেকে দুঃ করি—লোকের কাছে পরিচয় দেবার মতো কিছুই খুঁজে পাবেন না—সে মতা পরিচয় লোকের মুখে ব্যঙ্গ হাসির উদ্রেক করবে। আমারে বদমাশ করা হবে অস্ত্র আচারকে প্রেরণ দেওয়া।'

'শক্তিকার পরিচয়ের মাফকাটি গোপন রেখে যদি আমার যোক্তনের মা হয়ে থাকে, ঘুনাংকও কেউ সম্ভব করবেনা উষা। থাক না আসল পরিচয় মনের কোণে দমননা হয়। যে শত্রু তুমাককে তুমার জল পান করতে দেয়না, সে শত্রু পণ্ডিতের আলমারি যোকাই হয়েই থাক—এসো আমরা মকুন করে সংসার পাতি !'

দুশর মাসিকা কুক্তিত করে উষা। 'ছিঃ জানাইবাহু, আপনাদা পুত্র জাতটা কি এতই দেহবিলাসী সে একটা বিদ্যাকে একথা বলে অপমানিত না করলে চলত না ? আপনি বিয়ে করব বলসেই ত কত মেয়ের বাপ ছুটে আসবে, আমাকে কেন আমার না-ঠাকুঁয়ার মত ভিলেভিলে করতে যেবেন না !'

'তোমার সেহিনের উক্তি কি তোমার জন্মের সত্য আবেদন জানায়নি আমার ? তুমি হুতই চাকচাক্য কর—তোমার দুঃের কথা আর মনের কথা এক নয় ! ইচ্ছে করলে তুমি চলে যেতে পার, তবু আর একবার বলব, যদি আপত্তি না থাকে—'

পুনরায় অশোক ও প্রদম বাহু রেখে বলে, 'বিভিন্ন এ কলকাতা নগরী। অস্ত্রতঃ এদিক থেকে অস্ত্রকে বদমাশ করা যায়, এখানে মানুষের খবর কেউ কেউ রাখে, সমাধের নয়। নাই-বা হইল পাকড়ারের খোঁটা পাকানো সমাধ আনাধের—যে সমাধ শুধু তোমাদের কুক জগদল বদিয়ে যেহুনি, পরোক্ষভাবে পুত্র জাতটাকেও আত্ম-প্রবক্তা করেছে।

কিছুদিন পরই অশোক বাবা মনীন্দ্র হোটে বাপা বদল করলে। উষা উষালোকের মত অশোকের সংসারে আবার নতুন আশালোক ছড়িয়ে গিলে। বদমাশ করতে থাকল ওরা যেন হামী-স্ত্রীর মতই। কথাবার্তা চালচলনে অশোকের ত দুঃের কথা ওদের মনেও সম্ভেদের উদ্রেক করল না। উষা থাকে যোক্তমকে নিয়ে আর অশোক আকৃষ্ট নিজে। অমীলকে চোকেব আড়াল করে না উষা।

তিন বছর নিবিয়ে কেটে গেল ওদের কিন্তু তারপর এসো হুত বিপত্তি।

সেহিন বহিবার।

উষা অশোকের লামাকাপড় কাচতে কাচতে আবিষ্কার করলে তার পকেটে একখানা চিঠি, যা উষার বাবা আকিসের টিকানায় লিখেছে।

'জানাইবাহু,

উষাকে দীর্ঘদিন আটকে রেখে কার সর্বনাশ করছেন আনিদা দিষ্ট এদিকে আশাঘের বিবাহযোগ্য যোন ছুটি লোকনিদা ও সমাধের চোখ রাঙানীতে আকো অবিরাহিতা।

এ বাবালিকা ছুটি আপনায় কাছে কোন অস্ত্র করছে কি ? মমতার।" 'তুষার'

আমাকাপড়গুলো কোন একভাবে কেটে নিয়ে মেলে দেয় উষা। না বেয়েই শুয়ে পড়ে। রাক্ষর চিন্তায় মনটা ভাঙাফাঙ হয়। কিবে গিয়ে লাভ কি ? যে সমাধ তার নিম্নায় মুখর, সে সমাধের কাছে গিয়ে কি কৈফিয়ৎ দেবে সে ? সেহিন যে ছুল সে করেছে নাড় মেহের বোহে—সে ছাড়তে পারেনি এই আবেষ্টনী ! সমাধের চোখে তবুও সে অপরাধী। না আর নয়, সে এ নকল সমার থেকে চির-বিহার নেবে।

রাত্রে মাথাটা বচুত হয়েছ বলে বাগান্দার একাকী শোয় উষা। পতীর রাতে বৈকালে সংযুহীত মরৎবন্ধ—বিধ পান করে। চিঠিখানা আর একবার পড়ে। ক্রমশঃ বিষ-জরগ্রস্ত রেহখানা ছুটকুট করে কিন্তু মুখে কটের কোন অভিব্যক্তি লনিত হয়না। জোর করে মৃত্যুপ্রণয় চেপে রাখে।

মকালে হওকা খুলে বেরিয়ে বাগান্দার সে দৃষ্ট রেখে অশোকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে ওঠে।

মল্লিকার মৃত্যু বিশ্বাস করে সে কিন্তু উষার মৃত্যু যেন বিশ্বাস করতে পারে না। মাথাটা বোঁ-বোঁ করে খুঁবে ওঠে। টলতে টলতে উষার মৃত রেহের উপর সে আহঃড় পড়ে।

উষার জান হাতের মৃত্তিতে প্রান্তার চিঠিখানা ভখনো বদা আছে।

ব্র্যাট্‌ বার্নস্‌

[১৭৭২—১৭৯৬]

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

The Life of Burns is what we may call a great tragic sincerity. A sort of savage sincerity—not cruel, far from that; but wild, wrestling naked with the truth of things. *Carlyle*

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইংরেজী কবিতার প্রাণের লক্ষণ অপেক্ষা বৃদ্ধির দীপ্তিই বেশী ছিল। আলেক্সান্ডার পোপ্‌ এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর লেখায় ছন্দেব ছটা আছে, ভাবের বাহু আছে। কিন্তু চিত্তের প্রকাশ নেই, কল্পনার বিকাশ নেই। রোমান্সের বর্ণবিজ্ঞান নেই। শতাব্দীর বির্তারধ'ন্তরু বওয়ার কিছু আগে থেকেই কবিতার আবার রোমান্সের স্বরেব দুইমন্ড ফনি শোনা যায়। পরবর্তী কালে এই স্বরের আসোতেই উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যাকাশ উন্মাদিত হয়ে উঠেছে। 'সাদিকাল' ও 'রোমান্টিক', এই দুই যুগের মাঝামাঝি য়াঃ অংসছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ভেদন্স্‌ টমসন্‌, অলিভার গোল্ডস্মিথ্‌, টমাস্‌ গ্রে, উইলিয়াম্‌ কলিন্স্‌, উইলিয়াম্‌ কুপার এবং গর্জ্‌ ক্র্যাফ্‌। এই অন্তর্বর্তীকালীন কবিদের কবিতায় রোমান্টিক নব-মাপদণের পরিচায় পূর্বাভাব পাওয়া যায়। উইলিয়াম্‌ ব্লেক্‌ ও রবার্ট্‌ বার্নস্‌কে অনেক সময় এঁদের সঙ্গে সমশ্রেণীভূত করা হয়। কিন্তু বস্তুতঃ ব্লেক্‌ ও বার্নস্‌ মনে প্রাণে রোমান্টিক, এবং এঁদের রোমান্টিকতার দ্ব্যতি পরবর্তী রোমান্টিক যুগের পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কবি ওয়র্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ্‌, বায়র্ন, শেলি ও কীটসের কবিতার রোমান্টিক দ্ব্যতির মতই সমুজ্জল। ব্লেক্‌ ও বার্নস্‌-এর কবিতা ও গানেতেও শত বরংগের ভাব উজ্জ্বল কলাপের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—“একদিন সাহিত্যের অঙ্গরে পোপ ছিলেন নেতা। তাঁর ছিল স্বকৃৎকে পালিদ-করা লেখা; কাটাকাটা ছাটাছোটা ঝোড়া বেওয়া বিপবীর

গাধনি। ভাতে ছিল নিপুণ ভাষা ও তীক্ষ্ণ ভাবের উজ্জলতা, রমণ্যতার প্রবাহ ছিল না। শক্তি ছিল তাতে, তখনকার লোক তাতে প্রচুর আনন্দ পেয়েছিল। এমন সময় এলেন বার্নস্‌। তখনকার শান-বাধানো সাহিত্যের হাতা, যেখানে অক্‌মা-পরা কারখানাহনের চলাচল, তার উপর দিয়ে হঠাৎ তিনি প্রাণের বসন্ত উৎসবের যাত্রীবের চালিয়ে নিলেন। এমন একটি সাহিত্যের রূপ আনলেন যেটা আগেকার সঙ্গে মিলল না। ভারপূর থেকে ওয়র্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ্‌, শেলি, কীটস্‌, আপন আপন কাব্যের স্বকীয় রূপ সৃষ্টি করে চললেন।” ব্লেক্‌ ও বার্নস্‌দের কবিতার যে রোমান্টিক ভাবধারা প্রবাহিত হয়েছে পরবর্তী কালে তাতেই এসেছে জোয়ার।

ব্লেক্‌ ও বার্নস্‌ দুজনেই প্রথম শ্রেণীর দীপ্তিকার। দীপ্তিকবিতা রচনায় দুজনেই সিদ্ধহস্ত। এঁদের বৈশািবুস্ত কিম্ব অনেক বেশী গুস্তবপূর্ণ। রোমান্টিক রচনায় দুটি প্রধান দিক্‌ আছে। একটি দিকে মানব ও হুস্তিকার মঙ্গলক নিবিড় হয়ে ওঠে। আর একদিকে 'উজ্জতবে, আরও উজ্জতবে' মাছুবের কল্পনা পাখা মেলে বেদ। বার্নস্‌ প্রধানতঃ প্রথমটির কবি, এবং ব্লেক্‌ দ্বিতীয়: বিতীয়টির। ব্লেক্‌ আকাশ, বার্নস্‌ হুস্তিকা। এই আকাশ ও মাটি এসে মিলবে উনবিংশ শতকের প্রথম প্রান্তে রোমান্টিক নবমাপদণের কবিদের রচনার মধ্যে।

বার্নস্‌ একাদিক অর্বে হুস্তিকার সন্ধান। "I was bred to the plough", তিনি বলেছেন। ১৭৭২

খ্রীষ্টাব্দ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ১৮৩৫-এর নিকটবর্তী Alloway-তে এক হৃদয় কৃষকের মাটির ঘরে বাবুন্স-এর জন্ম হয়। সে সময় নিখরসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছিল। বাবুন্সের জন্মের কয়েকদিন পরেই এক প্রবল ঝড়ো ঝড়ের মাটির বাতীর ছাড়া উড়ে যায়। দানবজাত শক্তিকে নিয়ে প্রতিবেশীর কাছে অশ্রয় নেন। অনেক বছর পরে বাবুন্স মন্তব্য করেছিলেন—“A novelist might perhaps have viewed the scene with satisfaction, but not so I.” তাঁর বাবা উইলিয়াম ছিলেন খাঁটি বাহুব। ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে তিনি আসন্ন যৈশ্বেত সপ্তে সংগ্রাম করেছেন। মা অ্যাগ্‌নেস ছিলেন অদ্যাত্ম লাবণ্যবতী। তাঁর অন্তর ছিল গানের আলোড়ন ভরা। তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারিণী।

ছয় বছর বয়সের সময় বাবুন্স গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়তে যান। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, “I was a good deal noted for retentive memory” এবং “though it cost the schoolmaster some thrashings, I made an excellent English scholar.” লাটিন ও ক্যান্টা ভাষাও তিনি সাতারে একটু শিখেছিলেন। বাবুন্সের তিন বছর বয়সেই পড়া হ্রাস পাননি। তাঁর প্রথম পড়া বই হচ্ছে “The Life of Hannibal” স্থানীয় কর্মকারের কাছে থেকে চেয়ে নিয়ে তিনি “The History of Sir William Wallace” পড়েন। কবির নিজের ভাষায়—এই গ্রন্থ “poured a Scottish prejudice into my veins, which will boil along there till the floodgates of life shut in eternal rest.” পরে অবশ্য বাবুন্স অনেক পড়াশুনা করেছিলেন। কিন্তু “Far seen in Greek, deep mau o’ letters” তিনি কোন দিনই ছিলেন না। আর সেই-সঙ্গেই বোধ হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ কীটমট না হ’লে বহু পণ্ডিত হত।

বাল্যাবস্থা থেকেই রবার্টকে ব্যারিস্টার বরণা ভোগ করতে হয়েছে। অনেকদিন সঙ্গ পরিবারকে অনাধারে

দিন কাটাতে হয়েছে। তেঁরো বছর বয়সে রবার্টকে চাষের কাজ পুরোবস্তর আংশে ক’রে দিতে হয়। কৈশোরে এই নিখরসা পরিভ্রমের কালে এই সময় থেকেই বাবুন্সের শরীর খারাপ হ’তে শুরু হয়। অবশ্য শক্তিক্রোধে বাবুন্সের হাতে বই দেখা যেত এবং কঠোর শ্রম শোনা যেত। পনের বছর বয়সে বাবুন্স কবির ব্যাপারে পিতার প্রধান নির্ভর হ’লে ভট্টেন। তাঁর তদানীন্তন ভাবনের তিনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন—“the cheerless gloom of a hermit, and the unceasing moil of a galley slave.” সংসার চালানোর আর্থিক দিকের সব দুশ্চিন্তা উৎসেগে বালক বাবুন্স তাঁর মা বাবার সঙ্গে লম্বাভাবে ভোগ করেছেন।

তখনকার দিনে স্কটল্যান্ডে ছেলেমেয়েরা একমুখে কেতের কাজ করত। পঞ্চদশবর্ষীয় বাবুন্সের সন্নিহী ছিল একটি চতুর্দশী কিশোরী। এই মেয়েটির নাম ছিল মেলি কার্‌প্যাট্রিক্‌। এই ‘মুড়কারিণী’ মেয়েটির বার্ষিক প্রথম গানের প্রেরণা। গানটি হচ্ছে—“Once I loved a Bonnie Lass”। এই থেকেই বাবুন্সের শব্দভরসার আদ্যমূল।

১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন গৃহ ছেড়ে বাবুন্স-পরিবারকে ১০ মাইল দূরে টার্নবোল্টনে উঠে আসতে হয়। এখানে আসার পর বাবুন্স স্থানীয় বিতর্ক-মতের যোগদান করেন ও একটি মৃত্যু শিক্ষালয়ে শিক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁর বাবা এই মৃত্যুশিক্ষার যোগতর বিহীন ছিলেন। এই সময় থেকেই পুত্রের প্রতি পিতার মনোভাবের মধ্যে একটা বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকটমান হত। একটু লাটিন শেখারও বাবুন্স চেষ্টা করেন। কিন্তু এদিকে তিনি ছিলেন ব্রাউনিঙের নায়ক স্রা লিপো লিপি’র নিষ্ঠা। স্রা লিপো লিপি লাটিন ভাষার শুধু ‘আমো’ (‘অমি ভালোবাদি’) কথাটি শিখেছিলেন। শিথিলতা পটায়নী। বাবুন্স তার্লিলি অবশি এগিয়েছিলেন। তিনি নিজেই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন, একটি মাত্র তিনি খুব নিপুণভাবে শিখেছিলেন। সেটি হচ্ছে “Omnia vincit Amor” (‘প্রেম সর্বমন্ত্রী’)।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালটা বাবুন্স সুমি-পরিমাপের কাজ শেখার মত কার্‌কস্‌ওগান্ড-এ কাটান। এইখানে

তিনি আরও দুটী বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত করেন। 'কি করে পানপাত্র পূর্ণ করতে হয়' ও 'নির্ভর সুবাসনতরঙ্গ কলহে যোগ দিতে হয়'। পুরুষ ও নারী চরিত্র সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতাও তিনি অর্জন করেন।

এই পত্রের চার বৎসর বার্নস্‌দের জীবনে খুব উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। অল্প Alison Begbieর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা বার্নস্‌ দিলে (এই মেয়েটিই তাঁর পরবর্তী কবিতায় Many Morison)। বার্নস্‌ যখন তাঁকে বিবাহ করার প্রস্তাব করেন তখন তিনি অসম্মত হন।

এই সময় বার্নস্‌ উচ্চশ্রম জীবন বাপন করেছিলেন। মেয়েবেশ তিনি ভালো না বেলে থাকতে পারতেন না। গ্রামের অনেক মেয়ের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। কবিতায় এঁদের অনেককে তিনি তাঁর ভাষার সৌন্দর্যে অমর করে রেখেছেন। নারী তাঁর কাছে "dear, deluding woman, the joy of joys"। একজন সাধারণ মেয়েও তাঁর কবিকল্পনার আলোকে অপূরণীয় হয়ে উঠত। তিনি মিছেই বোঝার করেছেন—"My passions, once lighted up, rage like so many devils, till they find vent in rhyme."

কৃষি থেকে জীবিকা-নির্ধায়েই আশা ত্যাগ করে ১৮২২তে বার্নস্‌ Irvine-এ যান তাঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে মন তৈরী করার কাজ শিখতে। এক দিন অরিকান্ডের কলে তাঁদের বোকান ভণ্ডিত হওয়ার বার্নস্‌কে বাধা হয়ে ফিরে আসতে হয়। এত পনের বছর তাঁর ভগ্নভবন পিতার হুজুর। অমানুষিক পরিশ্রম ও অপরিমীম দারিদ্র্য তাঁর হৃদ্যকে এগিয়ে আনে। হৃদ্যলম্বায় তিনি বার্নস্‌কে বলেন, "Robbie, আমি তোমার ভবিষ্যতের আশঙ্কা নিয়ে মরছি। আমার কাছে অলৌকিক করা, তুমি ভালো হবে।"

'২৩-ই বাবার হাত হাতে নিয়ে অলৌকিক করেছিলেন। সে অলৌকিকের মর্যাদা তিনি বাধ্যতে পারেন নি।

বাবার হুজুর পর বার্নস্‌ Mossiel-এ চাষের কাজ আরম্ভ করেন। এইখানেই তাঁর Jean Armour-এর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়।

দারিদ্র্য ও নিম্নের চারিত্রিক দুর্বলতার সিক্ত বার্নস্‌

দেহান্তরে দিয়ে বাশ কদার শিষ্টান্ত কংরে জ্যায়াইকা বাওয়া স্থির করেন। বাওয়ায় আগে তিনি নিম্নের কতকগুলি প্রথম বিকের রচনার একটা সংকলন করেন। কিছু অর্থলাভের কল্পনা ছিল আর ছিল অসম্মতিন্তে নিম্নের কিছু স্মৃতিচিহ্নে দেখে সাওয়ায় আশ। 'যেখানে যা বাসেই মনে, এ নিমিত্তি করি পথে।'

একবারকে মাত্র কুড়ি পাউণ্ড পারিশ্রমিক দিয়ে Kilmarnock-এর John Wilson ছয় শত গ্রন্থ গ্রহণে সম্মত হন। 'The Colter's Saturday Night', 'To a Mouse' এবং আরও কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা এই সংকলনের অন্তর্গত ছিল। জ্যায়াইকা বাওয়ায় মাত্র টিকিট কেনা হয়েসিগেছিল। জ্যায়াইকা হাজার আগের বিন রাত্রিতে বার্নস্‌ তাঁর অসম্মতিকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন—

"Farewell, old Coila's bills and dales,
Her beathly moors and winding vales;
The scenes where wretched faucy roves,
Pursuing past unhappy loves!
Farewell, my friends! Farewell, my foes!
My peace with these, my love with those;
The bursting tears my heart declare,
Farewell, the bonnie banks of Ayr!"

('The Gloomy Night')

পরের দিন সকালে বার্নস্‌ মত পরিবর্তন করলেন। প্রখ্যাত সমালোচক ডক্টর Blacklock তাঁর নব-প্রকাশিত গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। লোকের মুখে মুখে তাঁর বইয়ের সুখ্যাতি। বার্নস্‌'দের মনে নতুন আশার স্ফূর্তি হ'ল। তিনি জ্যায়াইকা না গিয়া রাজধানী এডিনবরাহ গেলেন। সেখানে এই কৃষক-কবিকে নিয়ে 'খন্ড, খন্ড' পড়ে গেল। বিবর্তনময় মুক্ত। শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ নবনারী সমারদের লক্ষ্যমাল্য নিয়ে বহন করে নিলেন নতুন কবি বার্নস্‌কে। বার্নস্‌'দের মত তিনিও বলতে পারতেন—"I awoke one morning and found myself famous."

এই আকস্মিক কনজিয়াসের স্রোতে বার্নস্‌ নিজেও উপারহা বিদগ্ধন হেন নি। আত্মসম্মতির নিজেও ক্ষীণ ক'রে তোলেন নি। তাঁর গৌরব তিনি লক্ষ্য, অনাড়ম্বর ভাবে, শান্তচিত্তে বহন ক'রেছেন, প্রকৃত বীরের মত। তবে এডিন্‌বরাহর প্রভাবশালী মহলেও ব্যবহারে অনেক গমর একট: 'পৃষ্ঠপোষকতার ভাব' ছিল। সেটা লক্ষ্য ক'রে বার্নস্‌ স্তব্ধ হয়েছিলেন। এই আদর্শ-অভ্যর্থনা কিন্তু বৈধি দ্বারা হ'ল না। তটপ্যাণ্ডের যে সহস্রমণ্ডলী বার্নস্‌দের কবিতার জগৎ-গেয়েছিলেন তাঁরা তাঁর উচ্ছ্বলতার কথা জানতে পেরে হতবাক্‌ হলেন। পরের বছর তিনি যখন এডিন্‌বরাহর এলেন তখন সে সম্বন্ধে শুক হয়ে গেছে।

যশের নুহুটে অনেক সময় ব্যথার কাঁটা লুকান থাকে, এ কথা বুকেছিলেন যবটি, বার্নস্‌। তিনি লিখেছেন—

"Nae treasures, nor pleasures,
Could make us happy lang';
The heart aye's the part aye
That makes us right or wrang."
(*Epistle to Davie*)

বার্নস্‌দের জীবনের শেষ কর বছর মর্যাদা হুঃখে কেটেছে। কিন্তু প্রায় সারা জীবনই হুঃখে কাটলেও হুঃখ কোনদিন তাঁর মনের আনন্দের উৎসকে শুক ক'রে দিতে পারে নি। প্রাণ খুলে তিনি হাসতে পারতেন। রঙ্গ-পরিহাসের প্রতি তাঁর ছিল স্বাভাবিক টান। আলাপচারী বার্নস্‌ তাঁর বন্ধুদের তিত্ত লয় ক'রেছিলেন। তাঁর কয়েকটি চিত্রিত আত্মবিকৃত্য ও অন্তরঙ্গতার চিত্রদ্বারা হ'য়ে উঠেছে। তাঁর মধ্যে প্রচুর আশার প্রস্রবণ রয়েছে। সত্যই, তাঁর জীবন বৈরাগ্যবিমুক্ত হ'লেও ক্রমশঃ লোক তিনি মন। হুঃখ তাঁকে স্পর্শ করত কিন্তু তাঁর মনে হাগ কাটতে পারত না। বার্নস্‌দের এই আশা, আনন্দ, উল্লসিত্য সব কিছুই নূলে আছে স্বপ্নের স্বত-উৎসাহিত প্রীতি ও গ্রেহ।

১৭৭৮ এ তিনি Dumfries-এর কাছে Ellisland Farm কেনেন। অবিচলিতাঙ্গীরা Jean Armour কে বিবাহ ক'রে তিনি এখানে বসবাস শুরু করেন। এই

নীড়-বীথার বন তিনি অনেক দিন হ'রে বেধে এসেছেন। ভোগের হুঃখে শান্তি নেই; আর কি যন্ত্রণা, কি কণ-তপ্পন সে হুঃখ!

"But pleasures are like poppies spread—
You seize the flow'r, its bloom is shed;
Or like the snow falls in the river—
A moment white—then melts for ever."
(*Tam o' Shanter*)

তিনি জানতেন

"The heart benevolent and kind
The most resembles God"
(*A Winter Night*)

আর অন্তরেও করুণার প্রাণিত করার প্রথম স্থান 'একটুকু গৃহকোণ'।

"To make a happy fire-side clime
To weans and wife,
That's the true pathos and sublime
Of human life."
(*To Dr. Blacklock*)

বার্নস্‌দের 'fire-side clime' 'happy' কথাই শুক বার্নস্‌কে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বসাবয় সন্ধ্যাম করতে হয়েছে। বিবাহের পরের বছর তিনি আবগাহি বিভাগে কাজ পান। এই কাজ ছিল পরিশ্রম-সাপেক্ষ। এই কাজের সামান্য বেতন শু কবিতার আয়ে তাঁর সংসার মোটাটুকু স্বাক্ষর্যে চলতে পারত। কিন্তু শৌভিকালয়ের মোহ তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। পরিশ্রম ও উচ্ছ্বলতা মিশ্রিত তাঁর শেষ জীবনের তমসার থাকে তাঁর অপমান্ত গীতিপ্রতিভা আলোকগুণের নত হুটে উঠেছে। "Bonnie Doon", "My Love is like a Red, Red Rose", "Auld Lang Syne" প্রভৃতি নীতি-তচ্ছ বিখ্যাত-হৃদয়ের সঙ্গী হ'য়ে রয়েছে।

১৭৯৬ ঈশ্বরে ২১শে জুলাই মাত্র ৩৭ বছর বয়সে বাতশ্রমিত জরে রবাক্‌ বার্নস্‌দের মৃত্যু হয়। মরণকে তিনি একবার সন্ধ্যাম করেছিলেন "The poor man's dearest friend, the kindest and the best!"

ঊর শেষ চিঠিতে তিনি এক বন্ধুর কাছে টাকার অল্প প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। পিছনকার টাকার তাপান্না পেরে ঝিটবার লজ্জা। আর ঊর একটি শেষের কবিতায় তিনি Jessie Lewarsকে ভালোপান্না জানিয়েছেন। বার্নস্ যখন অসুস্থ ছিলেন তখন এই কোমলপ্রাণা মেয়েটি বার্নসের শুশ্রূষার সাহায্য করেছিলেন। সুন্দর, সুন্দর গানে অসুস্থ, সীমাহীন প্রেম—

"O wert thou in the cauld blast
On yonder lea, on yonder lea,
My plaidie to the angry air,
I'd shelter thee, I'd shelter thee."

Or were I in the wildest waste,
Sae black and bare, sae black and bare,
The desert were a paradise,
If thou wert there, if thou wert there."

নিজের লজ্জা বার্নস্ যে সমাদি-লিপি লেখেন তাতে তিনি নিজের বোম-কট-দুর্বলতা স্বীকার করেন নি—

"Is there a man whose judgment clear
Can others teach the course to steer,
Yet runs himself life's mad career
Wild as the wave?
Here pause, and, through the starting tear,
Survey this grave.

The poor inhabitant below
Was quick to learn and wise to know,
And keenly felt the friendly glow
And softer flame;
But thoughtless follies laid him low
And stained his name.

Reader, attend! whether thy soul
Soars fancy's flights beyond the pole,
Or darkling grubs this earthly hole
In low pursuit;

Know, prudent, cautious self-control
Is wisdom's root."

যদি এখানে বোমান্টিক হলেও বার্নসের ইংরাজী কবিতায় গোপ প্রকৃতি ক্লাসিকাল গোড়ার কবিতার ভঙ্গী ও শৈলীর ছাপ অনেক স্থলে দেখতে পাওয়া যায়। ইং,

এ, গোল্ডস্মিথ, ডাভর্নন্ প্রকৃতি কবিতার দ্বারাও বার্নস্ প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে বার্নসের ব্যঙ্গ-কবিতাগুলি 'ক্লাসিকাল' ধরনের। এই শ্রেণীর কবিতা রচনার বার্নস্ দক্ষ শিল্পী। ব্যঙ্গ-বিশ্রুপে ঊর একটা স্বাভাবিক নৈপুণ্য আছে। স্বর্গপ্রকৃতির তত্ত্ব, হুস, শঠতা ও প্রকৃৎকাকে তিনি তীক্ষ্ণ কথায় কত করেছেন। অস্তায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই প্রলক্ষে ঊর "The Holy Fair" ও "Holy Willie's Prayer" উল্লেখযোগ্য। নৈর্ব্যক্তিক হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বিবরণ "Tam O' Shanter" কবিতাটি। ভৌতিক কাহিনী কবিতায় কত কোহুৎকর হতে পারে তো "Tam O' Shanter" না পড়লে যোঝা যায় না। এতে অনেক 'দৃশ্য' আছে। বার্নসের নিজের কথাই মনে পড়ে—

"Some rhyme a neebor's name to lash;
Some rhyme (vain thoughts) for needfu'
cash;

Some rhyme to court the country clash
An, raise a din;

For me, an aim I never fash;

I rhyme for fun". ('Epistle to James Smith')

কবি নিজের বহু "Tam O' Shanter" ঊর শ্রেষ্ঠ কবিতা। কার্লসাইন্স কবিতাটিকে 'a piece of sparkling rhetoric' বলে বর্ণনা করেছেন।

কিছু ব্যঙ্গবাদের কবি হলেও ঊর বড় মহত্ব হচ্ছে যে তিনি জনগণের কবি। মানুষের হৃৎ-হৃদয় ঊর কোমল প্রাণে বার বার আঘাত করেছে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার ঊর যেমন বেছে বেছে এমন খুব কম লোকেরই হয়।

"Man's inhumanity to man
Makes countless thousands mourn."
(Man was made to Mourn).

এরই প্রতিফলন পাবে আমরা গ্যার্ড'স্‌পোরের কবিতায় শুনেছি। বাগদাদী চতুঃপদ গিয়েছিলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' স্বচ্ছ বার্নস্ গাইলেন,

'A man's a mau for a' that. '

"Is there, for honest poverty,
That hangs his head, and a' that ?
The coward-slave ! We pass him by,
We dare be poor for a' that !
For a' that, and a' that,
Our toils obscure, and a' that ;
The rank is but the guinea's stamp ;
The man's the gowd, for a' that."

(For a' that and a' that).

তখন মাছের মত, পাত পাতী মত সব কিছুর সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করেন। তাই হল্যাপলনার সময় যে দু'বিকটিকে তিনি বাস্তবায়িত করেছিলেন তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছেন—

"I'm truly sorry Man's Dominion
Has broken Nature's social union,
An' justifies th'ill opinion
Which makes thee startle
At me, thy poor, earth-born companion,
An' fellow-mortal !"

তার পর দ্বিতিক ও মাহুকের নিম্নতম সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন—

"The best laid schemes o' mice an' men
Gang aft a-gley." (To a Mouse)

যে ভেজি-মুগটিকে তিনি উল্লিখিত করেছিলেন তার কাছে মাহুনা প্রার্থনা করেছেন। এই "To a mountain Daisy" কবিতাটি হেরিকের "Daffodils" কবিতাটি মনে করিয়ে দেয়।

প্রাচীনকালীনের মুখ-রূপ নিয়ে বাবুনের মত মনন, মুগের ও অকপটভাবে অনেকদিন লেখা হয়নি। তিনি তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন ও ভক্ত উপভাষার সরল লালিত্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সেই ভক্তই তাঁর গীতিকবিতাগুলি ও গানগুলি অন্তর স্পর্শ করে। তাকে পৃথিবীর সেরা গীতিকার বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। পুরাতন সুয়েডিনি অনেক নতুন গান লিখেছেন। অনেক পুরাতন গানকে নতুন রূপ দিয়েছেন। মাহু, প্রকৃতি ও প্রেমকে তিনি কতভাবেই না বেখেছেন। তাঁর "Auld Lang Syne" এক বিশ্ববিখ্যাত গান।

"We twa hae run about the braes,
And pu'd the gowans fine ;

But we've wander'd mony a weary foot
Sin' auld lang syne.

We twa hae paidl't i' the buru,
Frae moruin' sun till dune,
But seas between us braid hae roar'd
Sin' auld lang syne."

এ সম্বন্ধে অসাধারণ মৌলিক আছে। কিন্তু অমৃত, অপূর্ণ স্বপ্নের তাঁর প্রেমের কবিতা। প্রেমের কবিতার এ লালিত্য সাংল্য দুর্লভ।

"My love is like a red, red rose
That's newly sprung in June :
My love is like the melody
That's sweetly play'd in tune.

So fair art thou, my bonnie lass,
So deep in love am I :
And I will love thee still, my dear,
Till a' the seas gang dry."

কিংবা

"I'll ne'er blame my partial fancy,
Naething could resist my Nancy,
But to see her was to love her,
Love but her, and love for ever.
Had we never lov'd sae kindly,
Had we never lov'd sae blindly,
Never met—or never parted,
We had ne'er been broken-hearted."

(Ae Fond Kiss)

কিংবা

"The wane moon is setting ayont
the white wave,
And time is setting with me, oh"—
("Open the Door to me, oh")

যে পঙ্ক্তির ছুটি লম্বা ছেটেই লেখেন, "There are no lines with more melancholy beauty than these by Burns."

য়েই লম্বা ছেটেই রবীন্দ্রনাথ লেখছিলেন, আয়ারল্যান্ডের ছবির কবি য়েইসের কাব্যে ব্যক্ত হয়েছে। স্কটল্যান্ডের ছবিরও ব্যক্ত হয়েছে কবি বাবুনের কাব্যে। আর যে ছবির বিশ্বদানবের ছবিরে পরিব্যাপ্ত।

অবস্থ অবলীনাথ রায়

অশ্রুতের লেখা যক্ষতীর্ষ হিংলাল পড়ে মুগ্ধ হয়ে-
হিলাম। এই স্বীকৃতি তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম।

কিন্তু উদ্ধারপুত্রের খাট পড়ে নিরাশ হয়েছি। তার
কারণ বিহত করে বলছি।

এই বইখানিতে লেখক তারুণ্যবর্ষের তাত্ত্বিক সাধনা
সম্বন্ধে কিছু হস্ত বসতে চেয়েছেন। তত্ত্বকথা না থাকলেও
এই উপজ্ঞানখানিতে আমরা তাত্ত্বিক সাধনার বিস্তৃত এবং
বীভৎস রূপ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনে। তাত্ত্বিক
সাধনা মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে সাধক মন্ডার লেপ কাঁধার
পরীর উপর বসে থাকবে এবং যখন তখন ঢক ঢক করে
কারণ গলার ঢেলে বেবে এবং গাঁজার ধম বেবে। উদ্ধারপ-
পুত্রের মধ্যশ্রমণে অনেক দিন পর্যন্ত বসে থাকার ফলে
তিনি সেব নাগাদ কি পেশেন তার কোন উল্লেখ নেই
বইতে, অবশ্য নিতাই বোষ্টমীকে পেলেন এই যদি লাভ বলে
বরা বার তবে তাঁর লাভ হয়েছে। এতদিন শ্রমণে বসে
থাকার ফলে তাঁর যে বৃহাত্তর দূর হয়েছে এমন প্রমাণও
বইখানিতে নেই—কারণ যখন হারোগা তাঁকে হাতকড়ি
লাগাতে এল তখন তিনি একটা নিবস্ত্র তিতার উপর বসে
মন্ডার হাড় ধাতে চেপে ধরলেন এবং ছুটো মরমুণ নিয়ে ছুই
হাতে বেরে থাকলেন। তখনকার একটা ছবি লেখক কেন
রাখেননি জানিনে—তাইলে এই বইখানিতে বেশ মানাতো।
বাক্সালী ভেতো হারোগা বলেই সে যাত্রা। বক্ষা পেয়েছিলেন
—আথলো ইতিয়ান সার্কেট হলে নিশ্চর গুলি চামাতো।
আগমবাগীশ যে তাত্ত্বিক সাধনা করলেন তার চিত্র লেখক
হিয়েছেন—তার শক্তির ইতিহাসও বলেছেন—কখন কবে
সেই শক্তি একদিন আবার নাক মুখ চোখ বসে যাওয়ার
পরও শ্রমণে এসে উপস্থিত হল তা দেখিয়েছেন। মনে হয়
শক্তি তাঁকে আশ্রয় না করে আগমবাগীশের কাছে দিয়ে-
ছিল বলেই তার উপর তাঁর যত রাগ। নরত নিতাই খোস
মোকাষে বহাল তবিয়েতে ছাঁচর মাস কুমার সাহেবের
ঘায়েলে বাস করার পরও শুকন্য হয়ে ফিরে এল, আর
আগমবাগীশের শক্তি নাক মুখ চোখ বসিয়ে আসবে কেন ?
সে ত আগমবাগীশের সঙ্গে কান্ধি গিরেছিল। কি এখন ব্রহ্মার্ব
কবেছে বার ভক্ত নাক মুখ চোখ খোঁজাতে হবে ? আর
নাক মুখ চোখ বসে বাতগার পরও কান্ধি থেকে উদ্ধারপ-
পুত্রের শ্রমণে পর্যন্ত আগমবাগীশের পিছনে পিছনে তাড়া
করা বার কিনা, এর মধ্যে একটা বাতবতার প্রশ্ন আছে।

ট্রেনে এল কি করে ? থাক সে, বাতবতার প্রশ্ন তোলা
অবৈধ—লেখক তাঁর কলমের এক খোঁচাতেই ত হরকে
নয় এবং নরকে হস্ত করে দিতে পারেন।

আমার বক্তব্য এই যে উপজ্ঞানের ছলেও তারুণ্যবর্ষের
তাত্ত্বিক সাধনাকে ব্যঙ্গ করার অধিকার নেই লেখকের—
এই সাধনার পথ বিয়েই বামাক্ষেপা, ভ্রাতাক্ষেপা প্রকৃতি
মহাপুত্রবেগা নিচ্ছিন্নত করেছেন। লেখকের নিজের
সাধনার শাখাও হস্ত ঐপথে। কিন্তু তাঁর এই লেখার
ফলে তাত্ত্বিক সাধনাকে লোকে গুণ্য করবে। তিনি যদি
নিজে অশ্রুত না হতেন এবং উত্তমপুরুষে কথা না বলতেন
তবে আমি এই আপত্তি তুলতাম না। শ্রমণে মশানে
বসে থাকা, কৈচরেব বাতুনবিবিকে ওষু বোওয়া, বস্তা
বোবের ডাকাতির টাকার মত গাঁজা খাওয়া এবং তারপর
একদিন মোহন্তকে শেব করে নিতাই বোষ্টমীর হাত ধরে
বেরিয়ে পড়া—এই নিশ্চর তাত্ত্বিক সাধনার স্বরূপ নয়।
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের “তত্ত্বাভিলাষীর সাধুসং”
পড়ুন। কি উচ্ছল চিত্র হিয়েছেন বরণা লেখক।

কথা উঠবে লোকের ত পড়ছে—ছ হ করে বই বিক্রি
হচ্ছে—তা নিশ্চর হবে। কারণ যেটা অজানা তার ভক্ত
পাঠক-পাঠিকার অকুন্তল আগ্রহ। শ্রমণে মশানে বসে
তাত্ত্বিকতা কি সাধনা করেন, সেটা কৃত্তর ভয়ের মত
মাজুকের মনকে সহজেই আকর্ষণ করে। “Mysteries
of the Court of London” খুব অনেক বিক্রি হয়ে-
ছিল, “পতিতার আশ্রয়কা” ও তাই, কিন্তু সেগুলি স্থায়ী
সাধিত্যের পর্যায়ে আসেনি। যামে মোড়লের মড়া
খেলানোর গল্প শুধু বীভৎস নয় রীতিমত অশ্লীল।

নিতাই বোষ্টমীর রূপ বর্ণনার মধ্যেও শালীমতাব অচ্যব
আছে। কুটিবোধ থাকলে ঐ বর্ণনাই অস্ত্র বকমে কড়া
যেতে পাততো। শব্দচক্র যেমন ইন্দ্রনাথের বেলার
রাজলক্ষ্মীকে দেখিয়েছেন, তেমনি লেখকের বেলারও নিতাই
বোষ্টমীর অভ্যাগমে আমাদের কোন আপত্তি নেই কিন্তু
তাঁকে স্বাভাবিক ঘটনার মধ্য দিয়ে আনা চাই। উদ্ধারপ-
পুত্রের খাট, উদ্ধারপুত্রের রাত্রি, উদ্ধারপুত্রের বধ প্রকৃতি
একই টেকনিক পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যার করার ফলে একঘেয়েমি
কোষ এসে গেছে—পৌনঃপুনিকতা থেকে পাঠকের মনকে
বাঁচানো উচিত ছিল।

জার্মান গুপ্তচর ওয়াসমুস

খ্রীসতীভূষণ লেন

[ভিত্তি]

১৯১২ সাল। স্থান—পশ্চিম ইরানের পার্শ্বাঞ্চল।

একজন পথিক ষাড়া পাহাড় বেয়ে নেমে আসছিলেন। সন্ধ্যাপরের পাখড়—তার মাথোঁ কোথাও কোন বুল আশ্রয় খুঁজে নিজেছে—শিকড় সন্ধান পেয়েছে ভল্লের। দিল্লি অধিকাংশ ক্রান্ত কঠোর তরুণভিত্তি।

অকস্মিক গতি রুদ্ধ হল পথিকের, যিস্ত্রে দেখলেন সন্ধ্যা এক প্রশস্ত সূর্য উপত্যকা। বহুকাল পূর্বে চাষ হ'ত, তার চিত্র বিদ্যমান। হস্ত কোন অসুভাষাতি বাস করত। আরবের বেহুইম কিংবা মধ্য এশিয়ার বাঘের ভাতির তরোয়ালের মুখে ধ্বংস হয়ে গেছে। চাষের পালাও শেষ হয়েছে। ইরানীর বাঘের ভাতির গোচারণ-ভূমি হয়েছে—এই নয়ন-নিরন্তর স্থান উপত্যকা। কয়েক হাজার ভেড়া, দশেকশো খোড়া চরে বেড়ায়—অল্প কয়েকজন মানুষের খাত কোমলক্রমে উৎপন্ন হয়।

তেজোমান আদমী খোড়াটির ঘাড়ের হুহ করাখাত করে ক'বে-সী বললেন,—‘ভুলো না বন্ধু’ এখন আমরা অতিশয় পরিশ্রান্ত—বহুদূর বেদে আসছি। শিক্তি অথবা কিংবা বোধ—তার গতি রূপ হ'ল চোখ হল বিস্তারিত, বক্তিমাক্ত।

প্রথম দৃষ্টিতে পথিককে ইরানীর দরবেশ বলেই মনে চর।—সম্প্রদায় জায়ে চোখে চোখ পড়লে। উত্তর ইউরোপের একঝোড়া নীল চোখ, ইরান দেশে এল কোন পথে?

একজন সওয়ার-ক্রান্তরূপে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আসছিল—পথিক দেখলেন নিরন্ত উপত্যকার অস্বাভাবিক। তিনি ধামলেন। সওয়ার নিকটে পৌঁছালে—নিজের পরিচয় বিলেন। সওয়ার কিয়ে পেল এবং অবিলম্বে চারজন সশস্ত্র অস্বাভাবিকের সঙ্গে কিয়ে এল। এরা তাঁকে নিয়ে চলল, নাচে তাঁরুও সহরে।

সব চেয়ে বড় তাঁরুটিতে শেখ এর বাসগৃহ। তিনিই

এই উপত্যকার অবিসংখ্যকীয় অধিপতি—একাধারে প্রজা-দ্বিগের জ্ঞানের মালিক, বর্ষকৃত্ত ও বিচারপতি। আর বৃহ উপস্থিত হলে (বৃহ তো তাদের মল-ভাতের মত) সেনাপতি। আগন্তুক সম্মানিত অতিথির মত তাঁরুও ভিতরে অভ্যর্থিত হলেন। হস্ত পূর্বের বন্ধু ছিল, কিংবা হস্ত উপত্যকারের স্বভাবই এই—যার সঙ্গে চুপচাপি আছে সে ছাড়া পৃথিবীর সকলেই তার ঘোড়।

কফি এল, চা এল, খানা এল। আহার ও গল্প চলতে লাগল একত্রে। স্থানীয় কথা ভাষার (Dialect) আলাপ চলছিল। আলাপের বিষয় গুরুতর কিছু নয়—সাধারণ ঐতিহাসিক তত্ত্ব। আর্থান বৃদ্ধের অবস্থা, পদ ও লাকড়ীর বাম, কোথায় ভেড়ার পালে মড়ক লেগেছে, কোথাকার খোড়া কইনবিহু, কার হাতের রাইকেলে কত, নিশানা হয় (রাইকেল তো উপত্যকারের চির শত্রু, হাঁটেতে শেখা থেকে মাটি বেগরা পর্যন্ত)—মানে, পথে দেখা হলে যে সপ অলোচনা হয় সেই সব সাধারণ কথা। অতিথি নিজের বেস্ট থেকে ‘মদ্যার’ পিত্তলটি খুলে নিয়ে স্তবপনা বিবৃত করতে লাগলেন—কত লখা ব্যারেল, বাঁধগুলি কেমন পরিচায়। প্রয়োজন হলে রাইকেলের মত কাঁধে কেসে কেমন ব্যবহার করা যায় দেখালেন। পান্নাও প্রায় রাইকেলের মতই।

শেখের বড় ছেলে—বহুর পোনরো বয়সের কিশোর। পান্নে বসে উজ্জল চোখ ছুটি দিয়ে দিলছিল যেন আগন্তকের কথা। হঠাৎ নিজের বেস্ট থেকে ওয়েবলী বিভলভাষটি বের করল—বলল আমি এর স্তবপনা খুঁজে বলবনা—কাঁধ দিয়ে দেখাব।’ উৎসাহে লাকিয়ে উঠে ছুটে চলল।

“কোথায় বাও বৎস?” জিজ্ঞাসা করলেন শেখ।

“কয়েকটা ভেড়ি পাহাড়ের উপর বেঁধে রেখে এখনই কিয়ে আসবো। চাষবাতির পরীক্ষা হবে। নইলে বুঝবো কি কবে—কার হাতিয়ারের পান্না কতবুড়, কার নিশানা ভাল—কার অস্ত্র শ্রেষ্ঠ, আর্থানের না ব্রিটনের?”

আপাতকের মুখে হাদি বুটলো—আমি যৈব সুপ্রসন্ন !
যদি নিজে অসুস্থ হইতেন আর্থানীর অত্র প্রেমাবিত্ত
হইত। যদি বালক ভ্রমী হয়, মুক্ত গর্বে শেখ এতই কুলে
উঠবেন যে প্রার্থনা মজুর না করে পারবেন না।

এই পবিত্র প্রসিদ্ধ আর্থান গুস্তাভ ওয়াসমুস (Was-
smuss)। বুদ্ধ বাধবার আগে ইরানে আর্থান কনসাল
ছিলেন। তখন উপজাতীয় শেখদের অনেকের সঙ্গে পরিচয়
হয়েছিল। বিভিন্ন উপভাষায় কথা বলতে শিখেছিলেন।
ফারসী ও আরবী ভাষাতেও তিনি সুপণ্ডিত। শিখেছিলেন
ইরানে আসবার আগে। চোখে দেখবার আগেই
ইরান দেশকে ভালবেসে ফেলেছিলেন এই যুবক।

তিনি পূর্বে ছিলেন মাদাগাস্কারের জার্মান কনসাল।
বৃহৎ বর্ষ শতাব্দীর সন্মতি বহুদূর যখন অগ্রিমেরতার
আমির্ষায়ে পৃথিবী জয়ে বহির্গত হন—সেই সময় সুদূর
মাদাগাস্কার দীপেও অবতরণ করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয়
সভ্যতার পরিচয় যেন সুবর্ণকুমির সমুদ্রোপকূলে বহুতর
বিস্তৃত—প্রাচীন ইরানীয় সভ্যতার চিত্রও তেমনি পশ্চিম
এশিয়া, পূর্ব ইউরোপ এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ছাড়াও
যেথা যায়। যুবক ওয়াসমুসের অঙ্গশক্তিৎসু মন মাদাগাস্কারে
অবস্থানের সময় আছর মাগবার কাহিনী ও লরথুট্রির
দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হন। ক্রমে ক্রমে তিনি প্রাচীন
ইরানকে ভালবেসে ফেলেন। বিস্তীর্ণ মাতৃকুমির মত
নিষেধ বলে মনে করতে থাকেন।...তারপর বহলি হয়ে
আসেন ইরানে।

এ যুগের ইরান ইসলামের উপাসক। কিন্তু ইরানীদের
জাতীয় জীবনে লরথুট্রির জীবন দর্শন স্থায়ী আসন করে
নিরেছে। ইসলাম বিবাহী সুবিধা তাইই অতিথ্যক্তি।...
ইরানে আগমনের পরে, বগ্রবিলাসী ওয়াসমুসের মনে হল
এই প্রাচীন দেশের পূর্ব দৌরব আবার ফিরে আসবে।
ইরান-তুরান-আফগান-পাঠান সকলেই তো এক সুবহু
ইরানীয় মালকুমির পত্তান—যার পূর্ব দীয়ার দিক, পশ্চিমে
ইউফ্রেটিস। এই বিশাল ভূখণ্ডের সকলে পুনরায় একই
পত্তাবার তলে সমবেত হবেন। এই তো! সেদিন পর্বত সকলে
ইরানের সাহসকে বাহসা হ'লে স্বীকার ক'রতেন।...নাহিব-
সাহ পত হয়েছেন আমি দেখেছি বহুবেক কিছু উপর মাত।

মত বিন যায় ওয়াসমুসের স্ববেশে ফিরে বাবার
আকাঙ্ক্ষা জান হতে থাকে। আত্মীয় স্বজনদের সম্পর্ক
বর্জন করেন। প্রবাসী ইউরোপীয় সমাজের আকর্ষণ ছিন্ন
হয়—ক্রমে বৃত্তা ও পানিয়ে অসুস্থি আসে।...সুদূর অবপূর্তে
উপজাতীয় অকলে ভ্রমণ করেন—মোস্তা মোস্তুরীর দাপে
কোরান-সরিক-হাদিস নিয়ে আলোচনা করেন। পক্ষার
আধা আধারে অমীতিপর বুদ্ধ গল্প কথকের (Story
teller) কাছে মোস্তা ও রক্তধের কাহিনী শোনেন।...
মালকুমির উঠের সোনে প্রস্তুত আসখান্না—মাধার গোল
ইরানী টুপি—হেলান টুপিটির নীচে লম্বা বাধা চুল।
চোখে শিল্পর বহু কোকুল পূর্ণ বৃত্ত। এই বিভিন্ন বিদেশী
আত্ম অঙ্গধিনেই ইরানীয় শেখদের প্রীতি ও দ্রষ্টার পাত
হয়ে উঠেছিলেন।

তারপর ইউরোপে মহাসমর উপস্থিত হল—ওয়াসমুসকে
ফিরে যেতে হল বেলা...অপ্রত্যাশিতভাবে নব্য তুর্কীর
উচ্ছল জ্যোতিষ এনভার পানার সঙ্গে বাদীনে পরিচয় হল।
তখন জার্মান যুবকের অভিজ্ঞতা ও একমুখী সন্ধ্যার
পরিচয় পেয়ে এনভার ঐত হলেন—বহুত উচ্চাভিলাষী
এনভার পাশা আপনার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন—
নীল তীক্ষ্ণ চোখ দুটির আড়ালে।

এনভারের নিজের স্বপ্ন ছিল—ইস্তাফুল হতে তুর্কী
স্থান পর্যন্ত সমগ্র তুরানী জাতিগুরুকে অগ্রতিষ্ঠিত করে এক
নৃত্যে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর গোধান ছিল “ইয়েনি তুরান”
—তুর্কীর জন্যই তুর্কীস্থান। অল্প দিনের মধ্যেই তুর্কীর
সমর সত্তিরে বনিষ্ট বহু হয়ে পড়লেন এই অধ্যাত ভূতপূর্ব
আর্থান-কনসাল।—

স্থি হল, তুর্কীর খলিফা জেহাং ঘোষণা করবেন।
ইরানের সাহসকে ধর্মদেহে প্রবৃত্ত করার তার নিলেন
ওয়াসমুস। অসকার ভন নিডার মেরার (Oscar Von
Niedermeyer) যাবেন কারুল। আদির ভাংত আক্রমণ
করে পাক্সা দিক্ত ও কানীরেব মূলমানবের মুক্ত করবেন
এবং তৈল পিপাসু ইংরেজ ও ফ্রান্সকে ইরান থেকে বিভা-
জিত করবেন সাহ। স্পিলার (Spiller) যাবেন তুর্কীস্থান,
বোখারা, বিতা ও আজার বাইজানে বিভাজেব আয়োজন
করতে।

ওয়াসমুল ইরানের সীমা অতিক্রম করে মালভূমির মাঝে অল্পস্বল্প হয়ে গেলেন... একজন স্বল্পবাক ইরানী উপ-জাতীয়—উহায়াত্তেও এমন কোন বিশেষণ নেই যে কারও চোখে পড়বেন। তেহাভায়েব গলিতে গলিতে খুবে বেড়ালেও কে আর কৌতূহলী হয় বলুন,—তবু সঘরে বাজার ও মসজিদ, যেখানেই বহুলোক একত্রিত হয় সেখানেই বিপদ আসতে পারে। অপরিচিতকে সকলেই সন্দেহের চোখে দেখে—কণ্ঠের নেমে আসে—সুফ হুফ কিম কিম কথা, সচকিত চাহনি। যুদ্ধের জন্য অসামান্য হওয়ার উপায় নেই—ইংরেজ ও রুশ স্তম্ভের সমগ্র ইরান পরিপূর্ণ। —কিন্তু ইরানীদের চরিত্র যিনি সঘরে অধ্যয়ন করেছেন—বিভিন্ন উপজাতীয়ের কথ্য ভাষার পার্থক্য, কথার শব্দ (Swearing) ধীরে ধীরে—কোন গুপ্তচরকে শাণ্ডী তাঁকে চিনতে পারবে।

পর্বত ও মরুর উপরে, সঘরের ধূলি ধূসরিত রাজপথে, কখনো অস্বপূর্ণ কখনো পদচিহ্ন—তখনও বাঁচি উপজাতীয় বেশে, কখনও বা নিখুঁত ইউরোপীয় পোশাকে, এই দুঃশাসনী জার্মান যুবক ইংরেজ বিধেয় প্রচার করে যাচ্ছেন। কারো কাছে বলেন ইরানের অতীত সৌন্দর্যের সম, কারো কাছে অধিক করেন ভাবী পৌষের চিত্র। কোথাও প্রচারিত হয় জার্মানীর বাদসাহ ইসলাম কবুল করেছেন—কেহ বেধে তিনি বাঘশায়েব সঙ্গে বেতাবে আলাপ করেছেন (একটি বাক, কিছু তার, করেকটি বাঘ ও বেটারি ছিল সঙ্গে) বাঘসার কাছ থেকে খানসেবর অস্ত্র যোগ্যযুক্ত প্রণয়সার বাঈ আসে, কর্ণভূজা পুরস্কার ঘোষিত হয়।

সমগ্র পশ্চিম হাফিজ ইরানের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। উত্তরে কারমানসাই হ'তে হাফিজ কুশাভার পর্বত বিস্তীর্ণ বন বসতিপূর্ণ অঞ্চল ইংরেজশত্রু হল। কেউ পলায়ন করলেন, কেউ বা বন্দি হলেন। তেলের সরবরাহ বন্ধ পেল একমূল তুর্কী-

বিদ্রোহী তৈল-সেহ-পুট আরবের বীরবে; কিন্তু পাইশ অক্ষত রইল না।

এনভার পাশার হাতে জেনারেল টাউনসেন্ড নাকাল হলেন। তাঁর দিলিকেৎ অস্ত্র বে ভারতীয় সৈন্যবল প্রেরিত হল—তাঁদের ইরানের উপকূলে অবতরণ করতে হল তেল হস্তার অস্ত্র। টাউনসেন্ড সশস্ত্র বন্দি হলেন। তুর্কী জার্মান সেনাবল পারস্তের সীমান্তে উপস্থিত হল।

তেলেং সাহেবদের অসুস্থগৃহীত ইরানীদের হাতে রাইফেল দিহে-লাউব পার্সিয়ান রাইফেলস পণ্ডিত হল; ওয়াশিংটনের পরামর্শে শীঘ্র যোগদান করলেন—এই সৈন্যবল বৈদেশিক বাহিনী অতএব ইরানের শত্রু। ইংরেজকে অসুযোগ করলেন সৈন্যবল সরিয়ে নিতে। ইংরেজ ক্রকশ করল না—সাহ এই বিধর্মী বিদেশীদের হানাপানি বন্ধ করার আদেশ দিলেন। অবস্থা এমন হল যে জাহাজ ভাঙি করে ভারত থেকে বদল না এলে ইংরেজ সৈন্যের উপবাস ভঙ্গ হয়না। জাহাজ এলেও ভিক্তে পারে না ইরানীদের ঘোঁরাঘোঁ। লাউব পার্সিয়ান রাইফেলের এবল সৈন্য হলভ্যাপ করে জেহাদি দলে যোগ দিল ও তেলেং সঘর কুশাভার লুণ্ঠন করল। তখন চাহগানা মানোরাহি জাহাজ এস কুশাভার, আবাহান ও বন্দর আকাশ পুনরবিকারের অস্ত্র।

জুর্ভাগ্যক্রমে, কুট-এস-আমার্য পতনের পরে একমূল তুর্কী সৈন্য ইরানে প্রবেশ করেছিল। তারা বিজিত রাজ্যে তুর্কী শাসনের নমুনা দেখিয়ে ছাড়ল। তুর্কীর অন্ন হল ইরানের ভাগ্যে কি আছে বুঝতে দেয় হলনা কারও। এং এংই কলে তখন কোন শক্তিশালী জার্মান মিলিটারি মিশন, ইরানের উপর দিয়ে কানুলে পাঠানো উচিত মনে করলেন না ওয়াসমুল। আমিরের ভাবত আক্রমণের প্ল্যান বিলম্বিত হল।...

নইলে, সমগ্র পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাস অস্ত্রভায়ে রচিত হত।



আবহমান কাঁথি

শ্রীমন্তের ত্রণ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সব আগমন আন্দোলনে কাঁথি মহকুমা তথা মেদিনীপুর জেলার অগণন অগণনীয়। মোগল শাসনকর্তাদের আমলেও এই মহকুমার হিজলীতে অর্থাৎ বর্তমান খেজুরীতে একটি জেলা ছিল এবং স্বাধীন বাংলাদেশে এই হিজলী সর্বশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। তাল বা নামে জনৈক আত্মপালের দ্বারা হিজলীতে এক প্রশাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিজলীর মসনদ-ই-আলি রাজ বংশ উহারই প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে খেজুরীতে যে সব পাশ্চাত্য দেশীয় নবমারীয়া সমাজিক্ত, কটওয়ালি বাতিবহ, হিজলীর মসনদ-ই-আলির মসজিদ ও মসজিদ আছে, তাহা হইতে এই স্থানের অতীত পৌরব প্রমাণিত হয়। অব-চারণ-এর নেতৃত্বে ইংরাজগণ বাংলার নবাব শ্যামসুন্দার খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হিজলী অধিকার করিয়াছিলেন এবং হিজলীতে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারা বাণিজ্যকেন্দ্র হয়। এইভাবেই হিজলী এবং খেজুরীতে বীরে বীরে বন্দর গড়িয়া উঠে। ১৮৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে হিজলী পর্যন্ত ভারতের সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সুদূর বোড়শ-পঞ্চদশ শতাব্দীর স্বাধীন হিজলী রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইতে এই শেখিনের বিদ্যামিশ্রের বিপ্লব পর্যন্ত একই সৌরভময় ঐতিহাসিক পরিচয় স্পষ্ট আছে এই মেদিনীপুরের মধ্যে। তাম্রলিপ্ত বন্যের খ্যাতিও প্রাচীনকালে মেদিনীপুর যেমন গৌরবাবিত ঠিক তেমনই বাংলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মেদিনীপুর জেলার স্থান সর্বজনবিদিত। প্রকৃত বোমবেশজ মহা হস্তি মেদিনীপুরের ইতিহাস এবং প্রকৃত মহেন্দ্রনাথ কবন রচিত হিজলীর ‘মসনদ-ই-আলি’ নামক দুইটি গ্রন্থ স্বরস্বীর কীতি। ইহা ছাড়াও বোমবেশজের ‘বঙ্গসাহিত্যে মেদিনীপুর’ এবং মহেন্দ্রনাথের ‘খেজুরী বন্দর’ ও ‘কনসা-হিজলীর বিবরণ’ এবং মেদিনীপুরের বিপ্লবী বীর হেমচন্দ্র কানুনগোর ‘বাংলায়

বিপ্লব প্রবর্তা’ এই গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব সাহিত্যিক ভ্রামনক, বাংলা সাহিত্যের বিকশিত কবিত্বগণ মুহুম্বদাম, ধামেশ্বর ভট্টাচার্য, বঙ্কিমচন্দ্র, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রকৃতি বাংলার বহু মনীষীর নামের সঙ্গে মেদিনীপুরের নাম অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। একথা এই মেদিনীপুরের পবন বহিয়া ঐতিহ্য মহাপ্রভু নোয়াখালীর পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মহা মনীষীদের পঙ্খলম্বিত মেদিনীপুর জেলার ভূমি স্পর্শে নিম্নে কৃতার্থ মনে করি। মেদিনীপুর হইতে ২ (দুই) ঘণ্টার পথ বাস যোগে অতিক্রম করিয়া কাঁথি পৌঁছাইলাম। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে জ্যালেটিন মসজিদে মাসজিদে ‘কেন্দ্রিয়া’ নামে উল্লিখিত স্থানটিকে পণ্ডিতগণ কাঁথি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাৎপরিবিশ্রুত বোমবেশজ রায় বিজ্ঞানি মহাশয় অনুমান করেন যে কাঁথির বিকট বালিঘাড়া ও বাসুর্ কাঁথি আছে বলিয়া এই স্থানের নাম কাঁথি হইয়াছে। অর্থাৎ কাঁথি নামের উৎপত্তি সম্ভবতঃ একজন মহাবীর পাতক্য দ্বারা যে ‘ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ১৭৮৮ খৃঃ পদ প্রবর্তের হস্ত এবং বনবাসের ক্ষত যে প্রবৃত্ত ও স্বরূপ পাকাবাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল তাহা বর্তমানে কাঁথির কৌকরী আবালতরুণে ব্যবহৃত হইতেছে। এই স্থানটি এবং পার্শ্ববর্তী কতক স্থান জঙ্গলবি কাটিয়া পরিষ্কৃত হয়। এই জঙ্গল কাটিয়া স্থানটি ‘কাটি-জঙ্গল’ বলিয়া কথিত হইত। ইংরাজগণ কাটিকে হয়ত ‘কাটি’ বলিত, এইরূপে ক্রমে দেশীয় ভাষায় কাটি ও পরে কাটিত পরিণত হইয়াছে।’ অতীতে শত শত কীর্তি বিম্বিত কাঁথি মহকুমা ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও এ এই মহকুমা হাওড়া জেলার প্রায় বিংশ অর্থাৎ প্রায় ১১২ বর্গমাইল। সমগ্র বাংলাদেশে জিয়ামপুর মহকুমার পথই কাঁথির আরম্ভণ দ্বারা; কাঁথি মহকুমার অধিবাসী সংখ্যা ৮ লক্ষের কিছু বেশী। কাঁথির উত্তরে হলদী ও কেল্লাই নদী, পূর্বে ও

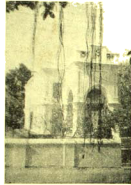
দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে উড়িষ্যা প্রদেশের বালেশ্বর জেলা অবস্থিত। এই মহকুমার জল নিকাল ও নৌ চলাচলের উপযোগী উড়িষ্যা কোটেক্যানেল, হিজলী টাইডেল ক্যানেল, শিছাবনী খাল প্রভৃতি এবং হুসুলপুর, বাগলা ও বরোজ প্রভৃতি নদী রহিয়াছে। সম্প্রতি এই মহকুমার কয়েকটি সুহৃৎ বাগলপু বৃক্ষাতি হইয়া যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হইয়াছে।

কৃষি এখানকার অধিবাসীগণের প্রধান উপজীবিকা। আমন, আউল ও ঝোংবাগান, মুগ, ধোলা, ভিল, সহিবা, পাট তিসি, মন, চুলা, লতা, হুসুল, গোলাপ, কপি ও নানাপ্রকার শাক সব্জী উৎপন্ন হয়। সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে নারিকেল ও বালিগাড়ি জ্বলে বাদামের চাষ বিশেষ লাভজনক ভাবে চলিয়া আসিতেছে। সমুদ্রতীরে লবণ উৎপাদন শিল্প ও নানুটিক মৎস্তের ব্যবসা প্রাচীন কাল হইতে অত্যন্ত পর্বন্ত অনেক বিস্তার লাভ করিয়াছে, এখানে সংগে উৎপাদন ও ব্যবসা ইষ্ট ইতিয়া কোম্পানীর আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কাঁচি বর্তমান আশালত শত বর্ষ পূর্বে একটি নিমক কুঠি ছিল।

এখানকার গ্রামা শিল্পের মধ্যে তাঁত, বাহুর, সুতা, কাঁসা ও পিতলের বাসন, হুশিষ্ট, বেত, বাঁশ, নারিকেল ছোবড়া ও হোখলা শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধুনা তাল ও খেজুর ডঙ্কের কারু ও বিস্তার লাভ করিতেছে।

বর্তমানে কাঁচিতে প্রভাতসুনার কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, আদর্শ কলেজ, ৬০টি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ৮১টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ৬৪টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও প্রায় ১৪০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় চলিতেছে। কাঁচি ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির ও ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া মাইলখানেক দূরে এক মন্দিরে এক কালী মূর্তি পূজিত হইতে দেখিলাম। কবিতা আছে যে সাহিত্য সম্রাট বাজমচন্দ্রের অমর উপজাঙ্গ কপালকুণ্ডলার পত্রিকল্পনা ক্ষেত্র 'বরিশাপুর' হইতে এই ঐতিহ্য আনিত হইয়াছে। বাংলা দেশে বর্তমানে যে সকল সাধারণ গ্রন্থাগার আছে ১৮৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই জেলার 'রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার' সম্ভবতঃ তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। এই পাঠাগার সমগ্র ভারতের মধ্যে প্রাচীনতম সাধারণ গ্রন্থাগার। বহু দুর্লভ পুস্তক,

পুঁথি, পত্রিকা, যেমন ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মিঃ এইচ ভি বেসী কর্তৃক কাঁচি হইতে প্রকাশিত 'Midnapur and Hijli Guardian' এই পাঠাগারে সমস্তে সংরক্ষিত হইয়া আছে। সাহিত্য পত্রিকা কাহ্নি, হিন্দুধর্ম, বেগু, সুগতি, প্রদীপ, শিখা প্রভৃতি যেমন কাঁচির ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করিবার একটি ইতিহাস বেগু, বর্তমানের নিয়মিত ভাবে তেমনই প্রকাশিত হইয়া চলিতেছে নোবাব, হিজলী হিষ্টরী ও



কাঁচি ব্রাহ্মসমাজ

বেশপ্রাণ নামে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষণের এবং দিলারী ও ভাষতী নামে সাময়িক সংকলন। পকাশ বহুই আগের পত্রিকা হইতে নিরলিখিত ধরনগুলি উদ্ধৃত করিলাম :—

বন্দেমাতরম—“পল্লীগ্রামে একদা হীলোক দেখা যায় বাহারা কোনও কথা বলা মাত্রই কেপিয়া গালি বিতে স্তম্ভ করে। ‘বন্দেমাতরম’ শুনিলে আমাদের গর্ভমেট কর্ণচারীগণও পল্লীবাদিনী কেপা হীলোকের স্তার দিবিদিক জান শূন্য হইয়া উঠেন। আমরা দেখিতেছি বালকগণ কেপা হীলোককে খোপাইবার আমোদটা ‘বন্দেমাতরম’ বলিয়া গর্ভমেট কর্ণচারীকে কেপাইয়াই উপভোগ করিতেছে।”

দীর্ঘায় : “গত ৩০শে মার্চ রাত্রি প্রায় ১টার সময় তিমল্লন পুলিশ সবইলপেট্টার ও ৭৮ জন কনস্টেবল যেহিনীপুর গহরে স্মৃতিবাস বসু নামক জনৈক পক্ষমব বর্ষীয় বালককে তথাকার বন্দেমাতরম তাঁতশালা হইতে ১২৪ (ক) ও ৪০৫ ধারার বাহাব্রোহিতার অপরাধে

প্রেরণার করিয়াছেন। বালকটি এখন মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিসাল বোম এম-এ, বি-এল, মহাশয়ের আধিনে বাল্যে আছে। প্রথম পর্য্যায়ের দুটিশ বালকে একটি নব্বু স্ক্রোফি স্কুল বালক যে কি প্রকারে বাধ্যকৃত হইতে কার্য্যক্ষমতা কবিল তাহার বারংগা করা আশাঘের স্কুল বৃত্তির অতীত।”

অগ্রিমের প্রথম মহৌর তত্ত্ব বিল্লবী স্ক্রিবান বহুর এই কাঁধি অকলে অনেক সহকারী ও বিশেষ বোগাযোগ



হরিয়াপুর হইতে আনীত এই দেই ভৈরবী—বক্ষিণ বাহ
উজ্জোলন করিয়া কপালকুন্তলাকে ডাকিতেছেন।

ছিল। মহাত্মা গান্ধি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষ-
চন্দ্র, দেশপ্রিয় শেনগুপ্ত প্রভৃতি বাংলার সমস্ত কৃতি সন্তান-
গণ কাঁধিতে পর্য্যাপন করিয়াছেন। ১৯০১ সালে মেদিনীপুর
সহরে কংগ্রেসের প্রাথমিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত
হয়। ১৯০৫ সালে যখন আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গের প্রতি-
ক্রিয়ার বয়কট ও বিদেশী বর্জন আন্দোলন মেদিনীপুর
জেলায় শাকল্যের সহিত পরিচালিত হয়। এই সময়ে
আত্মীয় আন্দোলনে কাঁধিবাসীর আগ্রহ ও সহযোগিতা
সর্বজনবিদিত। বৈপ্লবিক আন্দোলনেও কাঁধিবাসীর
বিশেষ সহযোগিতা ছিল। ১৯২১ সালে মহাত্মা প্রবর্তিত
অসহযোগ আন্দোলনে কাঁধিতে দেশপ্রিয় বীরেন্দ্রনাথ
শাণ্মল মহাশয়ের নেতৃত্বে কাঁধিবাসী সংঘবদ্ধভাবে অংশ
গ্রহণ করেন। তারপর ইউনিয়ন বোড বর্জনের
আন্দোলন একমাত্র মেদিনীপুর জেলাতেই দেশপ্রিয়ের

নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। ১৯৩০ সালে মহাত্মাবীর লবণ
সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কাঁধি মহত্মার বহু স্থানে বিশুল
উজ্জয়ের সহিত কাঁধি হয় এবং জনসাধারণ দুটিশ সরকারের
অসহযোগ অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ বরণ করেন।
১৯৩৪ সালের আইন সম্মেলন আন্দোলনে এবং দেশপ্রিয়
পরিচালিত মেদিনীপুর ব্যাংকের বিরোধী আন্দোলনেও
কাঁধিবাসী সমান উৎসাহে কাঁধি করিয়াছেন। সর্বশেষ
১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে কাঁধি মহত্মার যত্নে
শাকল্যের সহিত পরিচালিত হইয়াছিল ভারতের ইতিহাসে
তাঁহা অগ্নিস্বরসী। এই আন্দোলন ধান, সরকারী
অধিস সমূহ ও গোষ্ঠাকিস বঙ্গল প্রভৃতি কাঁধি তত্ত্ব
পতিতে করার সময় সরকার চরমভাবে বিচলিত হইয়া
তলিবর্গে শত শত ব্যক্তিকে নিহত করেন।

এই মহত্মার সমুদ্রতীরবর্তী হীরা বর্তমানে একটি
বিশিষ্ট স্বাধীনবাসরূপে গড়িয়া উঠিতেছে। এই সংগঠনের
অন্ত হীরা সমবার স্বাস্থ্য নিখাস নমিতি লিবিটেড নামক
প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া কাঁধি অগ্রস্ত হইয়াছে। হীরা
বালুকাময় সমুদ্র সৈকত ঘোঁটের চালন ও বিধান অবতরণের
উপযোগী সুবীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।



কাপালিকের মূর্তি—বর্তমানে কাঁধি অগ্রাপটে অবস্থিত।

রাত হটাৎ প্রকট হইলান ‘হীরা’ ভ্রমণের অন্ত। ‘স্বাস’
আমাকে হৃদয়বাহের পূর্বে হীরা পৌছাইয়া দিল।
হৃদয় লাগ আভা সমুদ্রে একহিকে তখন দুষ্টিগোচর হয়।

'আমি তাই আগাইয়া গেলাম সেইথেকে সেই প্রশস্ত বালুতটের উপর দিয়া। পুরাতন বালুতটের সঙ্গে হীবার বালুতটের পার্থক্য এই যে এখানকার বালির মধ্যে পা বসিয়া যায় না এবং তাই পায়ে চলাচলপরের মত ঈর্ষার মনে আশ্রয় আনেন। ছোট ছোট সোফা তরঙ্গগুলি আমার প্রতি নিকটে আসিয়া টুকরো টুকরো হইয়া ভাঙিয়া পড়িতেছিল। হৃদয়ঙ্গর নামা বস্তুর বেলা ও সমুদ্রের নানারূপ হেথিতে হেথিতে এত বিভোর হইয়া আগাইয়া গিয়েছিলাম যে ফিরিয়া আসিতে আর বটখানেক সময় লাগিয়াছিল। ফেরার পথে, কয়েকটি দীঘল সমুদ্র হইতে যে দৃষ্টি দিয়াছিল সেগুলি নিম্নোক্তরূপে মধ্যে বটনে ব্যস্ত ছিল—তাৎপা বাঘলা ও উড়িয়া ভাষার সংমিশ্রণ কথা কহিতেছিল, মনোবাগ দিয়া শুনিতে বৃষ্টিতে বিশেষ অনুরাগ হয় না। তটদেশে এক নদীতে কয়েকটি নৌকা

এবং নদীর ঘূর্ণ সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। সমুদ্রশূণ্য নানাবিধ পক্ষিপণ ক্রীড়া করিতেছিল—বহিষ্যবাহু বণিত সেই নদী একপাশে 'রত্নলপুংগের নদী' নাম রাখণ করিয়াছে; তিনি তাই কপালকুণ্ডলার শিখিয়াছিলেন "রত্নলপুংগের ঘূর্ণ হইতে সুবর্ণরেখা পর্বত অবধি কয়েক ঘোজন পথ ব্যাপিত করিয়া এক বালুকাভূষণশ্রী বিরাজিত আছে; আর কিছু উচ্চ হইলে ঐ বালুকাভূষণশ্রীকে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্বতশ্রী বলা হইতে পারিত। একপাশে শোকে উছাকে বালিগাড়ি বলে"। সমুদ্র, বালিগাড়ি, বালিগাড়ির বৃক্ক হিমাল-বাহাম ও কামতঙ্গর বীথিকা, বমচালতা, সুলেত্র ষোণমাড়—এই নিম্ন গৌণ লইয়া দীঘা আঘাৎ চোখে খুঁই ভাল লাগিল। এই বালিগাড়ী ও বালুর কাঁধ হইতে কাঁধি নামের উৎপত্তি হইয়াছে।



এমন কিছু কঠিন নয়

ছোট ছেলের সঙ্গেও সম্ভব যদি চিকমতো

বঁচিয়ে দেওয়া যায়



আপনার সমস্যা
আপনার পুণ্যের কর্ম-জীবনের
সাফল্য বিমোক্ষতার
সূচি হবে।



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

সেত অফিস : ৪নং ব্রাইট গার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

কুলীন-কলিকায় তিন বৎসর

শারঙ্গ চৌধুরী

তৃতীয় পর্ব

অবশেষে অনেক চেষ্টায় এক আত্মনাও আশ্রয় মিলিল। আমাকে যে আশ্রয় দিল তাহার নাম আদমর আলী, চট্টগ্রামের জাহাঙ্গ খানসাহী। সে আমার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার প্রতি ধন্যপত্রবল হইয়া তাহার ডেয়ার থাকিতে দিল। তাহার ওখানে থাকি, দুই বেলা ছোট্টেলে দিয়া তাহার পর্ব সমাপন করিয়া আসি। আদমর আলী লোকটি ভাল, আনাইই সমবয়সী। এই বিশেষ বিকুঁইয়ে একান্ত অপরিচিত আর অনায়াস পরিবেশে সে আমাকে স্বস্তি প্রসূত হইয়া। আশ্রয় না দিলে কোথায় গিয়া বেড়াইতে হইতে বলা কঠিন। এই কয়দিনের মধ্যেই তাহার সঙ্গে আমার বেশ একটা সৌহার্দ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা দুইজন দুই ভিন্ন দেশী দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী (সে মুসলমান আনি বৌদ্ধ) হইলেও ও আমাদের পদম্পরের তাহা ভাল বুঝিতে না পারিলেও বোধ হয় স্বভাবগত ঐক্যে বন্ধনই আমাদের একের অন্তরে ভাল লাগিয়া গিয়াছে। জাতের মিল ধর্মের মিল এসব কিছু নয়, এই ভাল-লাগাটাই হইল আসল কথা। এখানে আসমর আলীর অনেক ব-শ্রেরী ব্রাহ্মণী বন্ধ আছে, যেখানায় সে তাহাদের সঙ্গে অপেক্ষা আমার সঙ্গেই অধিক পছন্দ করে। নৃতনদের আকর্ষণে নহে স্বভাবের মিল আছে বলিয়াই। বহুতা পাকা হইবার পথে বোধ হয় ইহাপেক্ষা বড় সহায় আর কিছু নাই।

যাই হোক, আমার হাতে বিশেষ কাজ নাই, অসমর প্রচুর, কয়েকদিন ঘূরিয়া-ঘুরিয়া কুলীন-কলিকা শহরটি বেগিয়া লইলাম। পারে ইতিয়াই বেশী যেখানায়, তবে কখনও-কখনও প্রয়োজন বোধে টাম বাসের তুলস্ত ভিড় অগ্রাহ্য করিয়া ওই দ্রুতি বাহনেও চাপিয়া বসিতে হইত। টামে প্রথম শ্রেরী ও দ্বিতীয় শ্রেরী পার্শ্বকাটি পুরাতন ঐতিহ্যের স্মারক। অস্তকার দিনেও কেন ওই পুরাতন পার্শ্বকাটি কীয়াইয়া রাখা হইয়াছে ভাল ছবিরকম হইল না। যেখানায় সেকেন্ড ক্লাসে চাপিয়াই বেশী স্থান। পরগা

কম লাগে বলিয়া নহে, ব-শ্রেরীরা মানুষের সঙ্গ-সুখ বেশী পওয়া বাস বলিয়া নহে; সে এইজন্য যে, দ্বিতীয় শ্রেরীর বাড়ীঘরের মধ্যে প্রথম শ্রেরীর বাড়ীঘরের তুলনায় প্রায়শঃ অধিক সম্ভবত্বতা ও বিবেচনা-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন যেখানায় এক বৃদ্ধ তাড়াতাড়িতে টামে উঠিতে গিয়া এমনই বেসামান্য হইয়া পড়িল যে তাহার হাতের সওয়াই পোটলার মধ্যে খুঁটিয়া গিয়া নকল জিনিস টামের মোক্কেতে জড়খান হইয়া ছড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধ সোথে ভাল দেখিতে পার না, তাহার হাত কম্পমান। একাধিক বাড়ী স্বস্তিপ্রসূত হইয়া তাহার ছড়ানো-ছিটানো জিনিসগুলি ছড়াইয়া দিল ও একজন সেগুলি একত্র করিয়া পরিপাটী-রূপে পোটলার দিট বাঁধিয়া উহা বৃদ্ধের হাতে তুলিয়া দিল।

এ বস্ত প্রথম শ্রেরীতে দেখা যাইবে না। প্রথম শ্রেরীর বাড়ীরা সকলেই কেমন যেন আত্মভাবনায় বিভোর, আত্ম-কেন্দ্রিক, পরের মঙ্গলাংশস সম্পর্কে উদাসীন ও গোমরা-বুঝা। তাহাদের আত্যাত্মিক বাক্যগতম তাহাদের আত্মসম্মানের স্তোত্রক। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মর্দাণ ও শ্রেষ্ঠ সম্পর্কে এমনই মগ্ন যে ওই অতি-সচেতনতাই তাহাদের মূখে কুলায় নাটিয়া রাখিয়াছে। অথচ দ্বিতীয় শ্রেরীর বাড়ীরা কত গ্রাম খোলা, বিশ্ববিদ্যা, পরস্পরের সহিত আচরণে ও কথা-বার্তায় স্বচ্ছন্দ। প্রথম শ্রেরীর বাড়ীঘরের একাংশের আপাততন্ত্রবোধের অন্তরালে অতমজাত potential energy-র যত প্রসূত হইয়া আছে, উহাতে একটু খোঁজা মারিলেই উহা অচিরে Kinetic energy-তে পরিণত হয়। আকস্মিক অর্ধে এবং আলমারিক অর্ধে কাহারও পায়ে কড়া একটু চটকাইয়াছে কি সে অমনি কোঁচ করিয়া উঠিবে। তাহা বাবহারে কী রকমতা, তুলতা, অনালীনতা। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেরীর বাড়ীঘরের মধ্যে খুব কম ক্ষেত্রেই এ রকম ক্রটিবিকার দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বিত্তের শ্রেণীঃ রাজীপের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মানগত পক্ষপাত-বশতঃ এ কথা বলিতেছি না, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই বলিতেছি। সব চেয়ে জড়িয়া আমার কোনমতে ধারণা হয়িচ্ছে, যে কোন দেশে সমাজ নীচুতমার বিচ্ছেদ ইতি শুদ্ধরূপে সক্ষম বেশী। বহুই উপরের দিকে দৃষ্টি করোনা যায় ততই ঐ-ইন্দমতের বিকলতা ও তত্ত্বপাতিক স্বার্থবোধে অধিকতর লক্ষ্য করা যায়। উপরে তমার মাদ্রাস বহু বেশী আত্ম-সচেতন, আত্মতৎপরতার নিমিত্ত। নিম্নে নিম্নে ক্ষুদ্র পাদিত্যিক গণ্ডী ও দুই চারিটি আত্মীয় বহুই স্বার্থে বৈধেয়র ব্যতিরেকে তাহার দৃষ্টি যম পৌছিতেই চায় না। নীচুতমার তেমন নয়। ওই সমাজে আত্ম-তার পশ্চিমে অনেক বিস্তৃত। সেখানে অর্ধের কমতি আছে কিন্তু স্বার্থের কমতি নাই। অসঙ্গ এ কথার ব্যতিক্রম নাই তাহা বলিতেছি না, তবে সাধারণভাবে এই বিচ্ছেদ সত্য বলিয়াই আমার ধারণা।

অন্য জনমন্ডলের ভিতর এই সকলের একটি বিখ্যাস প্রচলিত যে, অর্ধের বীনতার ন্যস চিন্তার বীনতার অস্বাদী যোগ। চিন্তার বীনতা বলিতে সত্যতার অভাব, নিখ্যাচার প্রকৃতিক বুক ইত্যেছে। একদিন বৌদ্ধী অফল হইতে বিজিপুর ট্রামে বিনিত্তছিলাম। যাবার যেমন এইদিনও তেমন দ্বিীয় শ্রেণীতেই ট্রাম চাপিয়াছিলাম। ততহিনে আমি কল-কল-নীঘে ও কল-কল-কলিকা শব্দের লতাধরণ অনেকটা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি। এখনও তাহা ভুলে আয়ত্ত হয় নাই, তবে অপত্যে কথা বুদ্ধিতে পারি এবং নিজের মনোভাব ইংরেজী বাংলা বিখ্যার এক অস্বাদিচ্ছিন্ন মিশ্রণের সাহায্যে অপরকে বুঝাইতে পারি। পূর্বেই বলিয়াছি, অর্ধল যাবায়েত কীং এমন ব্যক্তিরে সঙ্কে সমাজে বড়ই বিখ্যাসের অভাব। অর্ধলিচ্ছিন্ন যেন চিত্ত-হারিচ্ছিন্ন মনোবর্ধক। এ কথা সব সময় সত্য নয় বং অনেক সময়ে উহার বিপরীতটাই সত্য। আমারে যাত্রাপথে নরবানের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্টপ হইতে পর পর তিনটি টিকিট-চেককারী ইম্পেস্টর উঠিল। প্রথম দুইজন ইম্পেস্টরকে আমি খোলা মনেই টিকিট দেখাইলাম, কিন্তু তৃতীয় জন আসিয়া পুনরায় টিকিট চাহিতে আমি আর বৈধ রক্ষা করিতে পারিলাম না, তাহাকে টিকিট দেখাইতে

অস্বীকার করিলাম। উহাতে বাড়ীর মধ্যে একটা ক্ষুদ্র বচসায় হুটি হইল। ইম্পেস্টর কহিল—আমরা বত-বয়ে টিকিট চাহি না কেন, ট্রাম কোম্পানীর আইন অনুসারে আপনি ততবারই আপনার টিকিট দেখাইতে বাধ্য।

আমি কহিলাম—না, বাধ্য নই। এই সন্ধ্যা এক-ক্ষেপ ট্রাম-যাত্রার অভ্যাস সময়েই মধ্যে আপনার তিন-তিন জন ইম্পেস্টর উঠিয়া সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রীবীর টিকিট পরীক্ষা করিতে ব্যস্ত বহিয়াছেন। অথচ আমি লক্ষ্য করিয়াছি ফার্স্ট ক্লাসে আপনারা একজনও উঠেন নাই। আপনারে এই বৈষম্যমূলক আচরণের ব্যতিক্রম না সন্তোষ-জনক কৈকিয়ৎ হিতেছেন ততক্ষণ আমি আমার টিকিট আর দেখাইব না।

ইম্পেস্টর—আমি আপনাকে কৈকিয়ৎ হিতে বাধ্য নহি।

আমি—আমিও আপনাকে আমার টিকিট বাবে বায়ে দেখাইতে বাধ্য নহি। আপনারে কী হাওয়া বহুন তো ? আপনারা কি মনে করেন সেকেন্ড ক্লাসে কেবল ঠগ মোড়োর আর বাটপাড়েরা চাপিয়া বেড়ায়, আর ফার্স্ট ক্লাসে সব খোয়া-ভুলদীরা বিস্তার করিতেছেন ? তাহাই যদি না হইবে তো আপনারে সকল মনোযোগ ও সতর্কতা কেবলমাত্র সেকেন্ড ক্লাসকে ঘিরিয়া কেন, ফার্স্ট ক্লাসকে আপনারে মনোযোগ হইতে বর্জিত করিবার কী কারণ। একবার ফার্স্ট ক্লাসে বোঁক লইয়া দেখুন, সেকেন্ড ক্লাসে টিকিট কাঁকী যেনওয়াল্যাপেপকা ফার্স্ট ক্লাসে ভূয়া-মায়লীগারী আর মায়লী না ব্যাক্তেও 'আছে' বলিয়া খড়-নাড়া খাড়া বেশী বুজিয়া পাইবেন। আপনারে বত তথি দুর্বলের উপর।

ইম্পেস্টর—আপনার সহিত আমি বিবাহ করিতে আসি নাই। টিকিটখানা দেখাইলেই ল্যাঠা চুকিয়া যায়।

আমি—না, আমি টিকিট দেখাইব না। নিরবিত্ত শ্রেণীকে অস্বাদন ছোট মনে করিবার বহুবল সামাজিক কুলসত্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার উদ্দেশ্যে আমি আপনারে ও আপনারে কোম্পানীর সহিত সহযোগিতা করা হইতে প্রতিবন্ধিত্ত বলিলাম।

টিকিটখানা হাতে থাকিতেও আমি হাত নুটিবদ্ধ করিয়া রহিলাম। আমাধের বচনায় আকৃষ্ট হইয়া কয়েকজন শাস্তিপ্রিয় যাত্রী আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রায় সমতবে করিয়া উঠিল—কেম আমোলা কংছেন মশাই, টিকিটখানা দেখালেই তো গোল নিটে যায়! কেব কেব আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়াই বলিতে লাগিল—শোকটি ভয়ানক দেখী তো! সামান্য ব্যাপার নিয়ে কী কাজটাই না বাধিয়ে ফুলেছে টানের মধ্যে। অপর একজন কবিল—সখছেন না বিশেষী আবদো, ইনস্পেক্টর সাহেবের সঙ্গে মনোনে মনোনে কথা বলবার বিষয় রাখে। এ কি ভেতো ভগ্ন-কুলীনো পেয়েছেন মশাই যে শত অপমানও বা কাজ নেই। মাথায় অবস্থার শোক হলোও তেতর থেকে নী রকম তেজ ফুটে বেবছে যেখানে পাচ্ছেন দিম্ভর।

গোল মিটাইবার আমার কোন বাসনা ছিল না। কামোলা ভীয়াইয়াই রাবিলাম। ইনস্পেক্টর কী করিয়ে বুঝিতে না পারিয়া কতকণ ক্যাপক্যাল করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া তারপর এক সময় নিজের বনে মনেই পলক-পলক করিতে করিতে ট্রাম হইতে নামিয়া গেল। যাত্রীরা আমার দৃঢ়তাবল্লভে বিস্ময়াপন্ন হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

কেম আমি ইনস্পেক্টরের দপ্তর এইরূপ আচরণ করিলাম তাহা এইদব সলমেনা যাত্রীদের বুঝানো বুঝা। আমার ব্যক্তিগত মান-অপমানের প্রশ্ন এখানে অব্যাহত, আমি নির্বাপিত অবস্থাপিত সমাজের পক্ষ হইতে সকলের সম্মুখ প্রতিনিধিত্ব ভাষা দিতে চাহিয়াছিলাম বলিয়াই আমার মধ্যে ঐ সময় এরূপ দৃঢ়তার পকার হইয়াছিল। নয়তো কেবলমাত্র নিজের ব্যাপার হইলে এতটা মনোবল সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। যাত্রীরা আমার যেহই শুধু বেবিল, ইহাও মধ্যে যে একটা বড় নীতির প্রশ্ন অভিভূত চাহিয়াছে তাহা তাহাধের চোখে পড়িল না। মানবতা প্রতিষ্ঠার যে কোন প্রকারের লড়াই প্রথম প্রথম অবদান্য চোখে কিছুটা ঝাপ ছাড়াই ঠেকে, তারপর চোখে গহিয়া গেলে উহার ভিত্তিকার স্ফার্মণ ও বৃদ্ধি আছে আছে পশ্চিমুট হইতে থাকে। আমি হরত আমার আচরণ যাত্রীদের নিকট অদলদ, অদ্রুত, অস্বাভাবিক

মনস্তত্ত্বপ্রযুক্ত বলিয়া বেথ হইল, কিন্তু যেদিন পণমাংস কাগিয়া উঠিলে, আশ্চর্য্যবর্ণা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সে তাহার সকল শক্তি নিয়োজ করিলে, সেদিন আর আমার আচরণ বা তদন্তনিহিত মনস্তত্ত্ব তাহাধের নিকট কিছুত ঠেকিলে না। অমরা সাধারণ মাত্রের বল সেই স্থিতির প্রতিষ্ঠাতেই আছে।

আমগর আদার ওখানে দিনগুলি মন্য কাটিতেছিল না। কখনও হোটেলের বাই কখনও তাহার ওখানেই আমার গর্ব সাবিয়া লই। অমরা জাহাজী লোক, বাতায়-হাওয়ায় ব্যাপারে আমাধের কোন বাহু-বিচার বা ছোয়া-ছুয়ি বিচার নাই। ওইসব যেদিন প্রথম জাহাজে চড়িয়াছি সেই দিনই সমুদ্রের ধূল ভাসাইয়া দিয়াছি। কিন্তু এইভাবে আর বেশী দিন বলিয়া থাকে চলে না। হাতের টাকা ফুরাইয়া আসিল। এবার বোম্বায়েবে একটা চেষ্টা দেখিতে হইবে। কিন্তু বোম্বায়েবে ভক্ত কোন্ জীবিকা বাছিয়া লইব তাহাই সমস্যা। অতঃপর জীবিকা পথেই পা বাড়াই আপাততঃ কিছুকাল জাহাজী জীবনযাত্রা হইতে মুখে থাকিব, সে বিষয়ে আমি একপ্রকার মনস্থির করিয়াই ফেলিয়াছিলাম। স্বদেশেও সর্বদা প্রত্যাগর্তন করিতেছি না। আমি ভগ্নকুলীন ঘেমে আকর্ষক আসিয়া পড়িয়াছি, এই ঘেষে হাস্যগণ ভাল করিয়া না দেখিয়া ক্ষিরদ না এই ছিল আমার শব্দ। বিশেষতঃ ভগ্নকুলীন দেশের রাজধানী কুলীন-কলিকা শহরটি ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া চাই। তবে বলিয়া এই বিষয়টি লইয়া মনের মধ্যে ভোলপাড় করিতেছি এমন এক সময় আমগর আলী আসিয়া নৌদবে শয্যাপার্থে উপবেশন করিল। অমরা সকলে মাটিতে বিছানা পাতিরা; শুই। তবেই সন্ধ্যারক্ষায়ের মধ্যে প্রত্যেকেই একটি কি দুটি তোরঙ্গ কিংবা হুটেকেশ, ময়লা বিছানা, বড়িতে ফুলানো কাপড়-চোপড় লুঙ্গি, বজোর পাশে বসনা, ঘরের মেঝেতে পোড়; জামাকের তল, টাকার ছাই আর আবেশাড়া গিড়ির টুকরা এখানে-সেখানে ছড়াইয়া রহিয়াছে, ইহাওই মধ্যে প্রথম পরিভোব সহকারে শব্দটির মত অবিচীন করিয়া বলিয়াছি। আমগর আলী একবা পেশবার পর বলিল—আমাধের জাহাজ তো কিছুদিন

বাহেই বন্ধর ত্যাগ করিবে। এটা আমাদের সামগ্রিক আত্মনা বই তো নয়। তখন তুমি কোথায় যাইবে ?

আমি একথা না বলি পড়িতেছিলাম, হাতের বই বন্ধ করিয়া তাহাকে কহিলাম—যখনেই যাই আপাততঃ বাহ্যে কিরিত্তেছি না সে কথা স্থির জানিও। ভক্ত-কুলীনীরা বেশীর ভাগই তো শহরের উত্তরাকাশে বাস করে, সেখানে যাইয়া তাহাদের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের সহজে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ করিব এইরূপ বাসনা আছে। আমি একা মাহুদ, যা হোক কোন প্রকারে নিজের পেট চালাইয়া লইব। তুমি চিন্তিত হইও না। উপায় একটা হইবেই।

আসগর আলী কহিল—তোমারতো খুবই বই পড়ার বাস্তবিক বেধি। ঘরে যতক্ষণ থাক, কোন না কোন বই লইয়াই আছে। আমরা বাপু মুখা মাহুদ, বইয়ের নর্থ অতশত বুঝি না। আগে হইতেই নিম্নের ভোমার লেখাপড়ার খাত। তা' এক কাজ কর না কেন, ভক্ত-কুলীনী পাড়ার গিয়া লেখাপড়ার কোন একটা কাজ লও না কেন।

আদারও সেইরূপ ইচ্ছা। আমি উত্তর কহিলাম, তবে তার আগে ভক্ত-কুলীনীদের ভাষাটি মোটামুটি রকম আয়ত্ত করিয়া লইতে চাই। নয়তো কাজে অনুবিধা হইবে।

আসগর আলী কহিল—এই ক'দিনেই তুমি ভক্ত-কুলীনী ভাষা বেশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছ। তোমার ভাষা শিক্ষার দিকে একটা সহজ ক্রমশতা আছে বলিয়া মনে হইতেছে। এক কাজ কর, ভক্ত-কুলীনীদের মধ্যে থাকিয়া উভয়ের ভাষা আরও একটু রপ্ত করিয়া শুই ভাষার গ্রন্থ রচনা কর। দেখিবে, দেখিতে না দেখিতে ভোমার নাম ছড়াইয়া পড়িবে। ভক্ত-কুলীনীদের বড় লোক হইবার সহজ দুইটি রাস্তা আছে—কাটকাবাণী আর বই লেখা।

আসগর আলীর লক্ষ্যমী বন্ধু রহিম শেখ পানের বিছানা হইতে আমাদের কথা শুনিতেছিল, সে কহিল—কুলীন-কলিকা শহরের মধ্য অকসে স্থল ট্রিট বলিয়া এক পাড়া আছে, সেখানে অন্তর্নতি বইয়ের দোকান। গাইবাহী

হারে ভাষায় বই বেচা-কেনা হয়। ওখানে বইকে 'মাল' বলা হয়। একবার যদি ওখানে বই লিখিয়ে দিানো নাম লিখাইতে পার তবে তুমি দু'দিনেই নামী লোক হইয়া যাইতে পারিবে। চাই কি বাড়ী গাড়ীও তোমার ভাসো কোন্-না জুটিবে। উপজ্ঞানের বাজার ঘর বেশী, সুতরাং উপজ্ঞানেই নাম করা সহজ।

রহিম শেখের বেশ চট্টগ্রামে, আসগর আলীর স্বগ্রামবাগ। আসগর আলীর ঘোঁলতেই তাহার বাহ্যে চাকরী। বলিতে গেলে আসগর আলীর অভিতাবকরে তাহার দোকানতেই সে বাস করে। আসগর আলী তাহাকে একটা থমক দিয়া বাঁটা চাটগারে ভাষায় কহিল—থাক থাক, তোকে আর গদ্যই করিতে হইবে না। তুই তো লাহাজের খালসী বই মোস, তুই এত কথা জানিলি কী প্রকারে। ওইদব স্থল ট্রিট কলেজ ট্রিটের ব্যাপার, সে কারের শুদ্ধ-কন্নি জানা তোমার আমার কর্য নয়।

রহিম শেখ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কহিল—যাও, আমি জানিব তো না কে জানিবে। দেই যে আয়েত আলী, আমার চাচাতো ভাই, তাকে তো তুমি চেন, কতদিন আমার খোঁজ খবর করিতে আমাদের আন্তানার আসিয়াছে, তৈতেক বা রোডের মস্ত বড় ধপুয়ী—বই বাঁধাইয়ের ধপুয়ী। বই-পাড়ার খবর সব তার লক্ষণপণে। কোন্ লিখিয়ের বই কত চলে সে তারও অজ্ঞাতদের ওঝামের ঠেক বেথিয়া হিসাব কমিয়া অর্জিয়েই বলিয়া দিতে পারে। ওয়াই বইয়ের বাজারের সত্যিকারের ব্যারোমিটার। আমি আয়েত আলীর মুখ হইতেই সব কথা জানিয়া লইয়াছি।

আমি কহিলাম, বই লিখিতে তো অনেক বিভার বরকার। সে কাজ আমার দ্বারা কেন হইবে।

রহিম শেখ বলিল—আমার চাচাতো দ্বারা বলে, বই লিখিতে আরো বিভার বরকার হয় না। বিশেষ উপজ্ঞান লেখা নাকি খুবই সহজ। যে কোন রকমের একটা প্রেমকাহিনী কাঁদিয়া তার মধ্যে অনেকখানি আদ্বিহনের গাঁজলা যোগ করিয়া অন্ত্রলভার কেনা তুলিতে পারিলেই নাকি উপজ্ঞান হইয়া পেল। তাব উপর যদি রক্তচঙে মলাটের বাহার থাকে তবে তো লোনার সোয়াগা। সে

বই বাহির হইতে না ছইতেই বুঝাইয়া বাইবার দাবিদ।
 নিয়ম বাহারেও খুব বিক্রি হয়। শস্তা উপভাস গল্পেই
 সবচেয়ে চাহিদা। কিন্তু কেহ যদি খাটিয়া খুঁটিয়া বই লেখে,
 বইয়ের ভিত্তর অনেক বিভ্রান্ত ও বুদ্ধির সমাবেশ ঘটাইয়া
 বইটিকে সত্যি সত্যি পাঠযোগ্য করিয়া তোলে, তবে সে
 বই বাহারে আদৌ কাটিবে না, কাটিবে পোকার, বস্তুর
 ওষাৎ ধরে। এইজন্য টাকা রোমপার বাহারের মতলব
 তাহার। সকলেই প্রায় উপভাসের বাহারে পিত্তা ভিড়
 জমায়।

আমি প্রায় আমার অজানতেই বলিয়া উঠিলাম, এ তো
 বড় মজার ব্যবসায় বেধিতেছি! উপভাস লিখিয়া সংজ্ঞা
 বনী হওয়া যায় অথচ তাহাতে বিভ্রান্ত বুদ্ধির প্রয়োজন
 হয় না—

রহিম শেখ আমাকে বাধা দিয়া কহিল—আমার
 চাচাতো বাবা আশ্রিত আপী বসে, লোকে গল্প গেলার
 আশ্রয়ে গল্প গেলে, কে অত বইয়ের ভাল-মন্দেব খোঁজ
 লয়। উপভাস পাইলে ভগ্ন-কুলীন পাঠক পাঠিকার—
 বিশেষতঃ পাঠিকার—আহার নিদ্রা ভাগ করিয়া
 উপভাসেই মজিয়া থাকে। অল্পব কাককর্ষের কথা
 তাহাদের মনেই থাকে না। বইয়ের ভাষা শুদ্ধ হউক ভুল
 হউক, বানান যেমন-তেমন করিয়া লেখা হউক, কিছুতেই
 কিছু ঝগ-আসে না। শুধু কোন প্রকারে কাল চালানো
 গোছেব একটা প্রেমকাহিনী ধাঁড় করা হইতে পারিলেই
 হইল। এইজন্য বেধিতে পাইবে উপভাসের হাটে অদ্বিত
 লোকের ভিড়। ভগ্ন-কুলীন বেশে সাহিত্য বলিতে
 উপভাস সাহিত্যকেই বুঝায়।

এ তো মজা মন্দ নয়। যেমন তেমন একটা গল্প-
 কাহিনী ধাঁড় করা হইতে পারিলেই তাহা উপভাস হইয়া
 গেল। তারপর তাহা ছাপাইয়া মুদ্রিত করিলেই বই
 আর বাহারে মলাটের অত্যন্তবে জীবিয়া বিতে পারিলেই
 তাহা বই। এমন বই লিখিতে স্বাধার না পাৰ যায়।
 আমারও পাৰ থাকিল।

আমি অবশ্য এখনও ভগ্ন-কুলীন ভাষা ভাল রপ
 করিতে পারি নাই, তবে ভগ্ন-কুলীন সমাজের সঙ্গে
 মেলামেশা গাঢ়তর হইলে কোন না অল্প কিছুদিনের মধ্যে

সেই ভাষার পাকাপোক্ত বক্তব্য দখল কার্যে কথিতে
 পারিব। আদিয়া অধি তো সমাজের বাসানী শ্রেণীর
 সঙ্গেই কেবল শোয়া-বসা করিতেছি। ভগ্ন-কুলীনদের
 সহিত বিশেষ আসা-পাশ পরিচয় হয় নাই। তিনিরাছি এবং
 কুলীন-কলিকা শহরে বহুকালীন অবস্থানজনিত অস্বস্ততার
 ফলে ঘোণতেও পাইলাম, ভগ্ন কুলীনরা বেশ মিত্তক
 প্রকৃতির মানুষ, তবে একটু বেধাকী। তাহাদের অতিবিক্ত
 ভাষাভিমান ও সাতশ্রীপ্রিয়তা হইতে এই মেমকের উদ্ভব
 হইয়াছে। যেমক তাহাদের শিল্প ও সাহিত্য-প্রীতি
 লইয়া, ভাষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ লইয়া, আচা-আচরণের
 উৎকর্ষ লইয়া। ঐরা ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে মনে গর্ববোধ
 লাগলে ঘোষ বেধি না, তবে মনে হয় উহার সহিত অপর
 জাতিসকলের সহিত কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাও মিশ্রিত হইয়া আছে।
 কিছু বেশের অজ্ঞাত জাতিগুলির সম্পর্কে তাহাদের
 মনোভাবে সন্দেহের কিঞ্চিৎ অস্তাব আছে বলিয়া বোধ হয়।
 এই শ্রমবহীনতা ও অবজ্ঞা ভাল কিনিম নহে। এই দোষ
 কাটাওয়া উচিত। এক ভগ্ন-কুলীনদের আন্তরিকভাবে চেষ্টা
 করা উচিত।

আমি অংশ ভগ্নকুলীনদের এই আত্মাত্মিক স্বাভাবিক
 স্পৃহাকে আমার দিক হইতে অমিতক্রমের বাধা বলিয়া
 মনে করি না। মানা কাজের মানুষের সহিত মিশিয়া আমার
 স্বভাবে এমন একটা স্থিতিস্থাপকতা ওপের দকার হইয়াছে
 তাহাতে আমি সহজেই যে কোন বেশের কে-কোন অঙ্গলের
 অববাসীর সহিত বাহু-মুখ মিশিতে পারি। স্বাভাবিকতার
 শুণ্ডসিকিৎ অব্যাহত রাখিয়া জাতীয়তার বাহিরের
 খোলসটিকে তাহারা কেপিতে পারিয়াছি বলিয়াই অপর
 জাতির মানুষের সহিত মেলামেশায় আমি বিশেষ কোন
 অসাবৃদ্ধের বাধা অনুভব করি না। মানুষে মানুষে ব্যবধান
 বোধের সৃষ্টি হয় মনস্তাত্ত্বিক মানস বৃত্ত হইতে, আমার এই
 বীর্ঘ জাহাজী জীবনের শৃঙ্খল অতিক্রম্য ওই মানসিক
 জটিলতার একেবারে গোড়া বরিয়া কোপ বধাইয়া উহাকে
 মোটা-মুটি নিশিহর করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করি।
 যতবড় স্বাভাবিকায়ন আর অভিমানী জাতিই হোক, সেই
 জাতির মানুষের অন্তরে প্রবেশের চাবিকাঠি আমার জানা
 আছে। দব জাতির মানুষই আমলে ভাল, তাহার

বহিঃকীয় আচরণেই শুধু ভেদ এবং তাহা হইতেই দত্ত গোলযোগের উৎপত্তি। ওই বহিঃকীয় ব্যবহারের আচরণ তেজ করিয়া অন্তরকে স্পর্শ করিবার কৌশল বাহার অসম্ভব, তাহার সত্যিগিহি সকল দেশে সকল সমাজে অগাধ।

ভক্তকুলীনি সনাতনকে আরও কাছে হইতে আনিবার কৌশল মনস্তত্ত্ব আনার পূর্বেই ছিল, লেখক যমিবার প্রস্তাবে তাহা আরও চাপাইয়া উঠিল। এত সত্তায় লেখক হইতে পাবিলে কে না লেখক হইতে ইচ্ছা করে? বইয়ের উৎকর্ষ বইয়ের বক্তব্যের মহিমায়, লিপিকুলতায়, ভাষামৌল্যে ও অগ্নিকটনপুণ্যে। তা নহ, এখানে নাকি বই মানেই হইল

উপভোগ, আর সে উপভোগও অলিখিত সুপাঠ্য কোন গ্রন্থ নহ, অল্পাল ও অশাপীনের টক-কাল মেশানো মাহুকের সুপ যৌনানুভূতিতে সুদুঃস্থি দেওয়া সত্তা হইবার বই। এমন বইয়েই নাকি আশ্চর্য চাহিদা বেশী। এ ভাঙিয়া বই লিখিতে পারিলে আত্মল সুখিরা দাতার্য্যে কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা। অনেক তাহা হইয়াছে। সুতরাং আনিই কেন বা সুযোগ ছাড়ি!

প্রস্তাবটি মনে লাগিতে আনি ভক্ত-কুলীন দেশের শাস্ত্রাত্তিক উপভোগ-বিজ্ঞের মনে ধারণ প্রকরণাধি আরম্ভ করিতে সন্ধিবেশ তৎপর হইয়া উঠিলাম।

[ক্রমশঃ]



পশ্চিমবাঙলায় আদিবাসী কল্যাণ

অনিমিত্ত রায়

১৩ই জুন ১৯৪২ সাল পশ্চিমবঙ্গের উপজাতীয় ইতিহাসে একটি বহুশীর্ষক দিন। এইদিনে মুশামলী ভাঃ বিধানচক্র রায় উপজাতির কল্যাণের ক্ষত্র ব্যঙ্গলা সরকারের হস্তে একটি পৃথক বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন। এই উপজাতি কল্যাণ বিভাগের ক্ষত্র জীবাধাখোবিশ্ব রায় মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত (প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা কালে) আদিবাসীদের ক্ষত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করেছেন এ প্রবন্ধে দে দখল বলা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হস্তে নতুন চাকরী বা দেওয়া হয়েছে তাৎক্ষণিক শক্তকথা এটি আদিবাসীরা পেয়েছেন ও উচ্চপদের ক্ষত্র আদিবাসীদের বয়সের উপর সীমা তিন বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ চাকরীর বেলায় বয়সের উপর সীমা অষ্টাশ্রু পাঁচ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আদিবাসীদের মধ্য থেকে উপযুক্ত লোক থেকে নেবার ক্ষত্র গতি বেসরকারী সমিতির পরামর্শ নেওয়া হয়ে থাকে।

আদিবাসীদের জমি ছুঁলোকে নানা উপায়ে ঠিকিয়ে নিত। কখনও বা বাকি খাজনার দায়েরী দালালে উঠে তাদের জমি হস্তান্তরিত হয়ে যেত। বাঙলা সরকারের নতুন আইনে এ জিনিস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আদিবাসীরা যাতে এভাবে জমি না হারায় সেজন্য উপজাতি কল্যাণে নিযুক্ত কর্মচারীরা বিশেষ নজর রাখেন।

এই সময়কালীন আদিবাসীদের শিক্ষা ও সাংসারিক জটিলতার উপর দৃষ্টি রাখেন। তাঁরা প্রায় সকল সময়ে আদিবাসীদের মধ্যে খুঁজে পেতেন এবং তাদের কল্যাণের ক্ষত্র নানাবিধ বিষয়ে পরামর্শ দেন। তাদের সামাজিক জগৎ। মিটিয়ে দেন এবং সরকার তাদের উন্নতির ক্ষত্র যে সব পরিকল্পনা করেন সেটি কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করেন।

১২টি উপজাতীয় এম. এল. এ. ও পাঁচটি ক্ষত্র ক্ষত্র সত্য

নিরে একটি উপজাতি পরামর্শ কমিটি (Tribes Advisory Council) গঠিত হয়েছে। এই সমিতি আদিবাসীদের কল্যাণ ও উন্নতির বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পরামর্শ দেন। ১২টি জেলাতে ও স্থানীয় কর্মচারীদের উপজাতি কল্যাণ বিষয়ে পরামর্শ দেবার ক্ষত্র ১২টি সমিতি গঠিত হয়েছে।

আদিবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতির ক্ষত্র বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কতকগুলি স্থল চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং আদিবাসীদের ক্ষত্র হাসপাতালে বস্তু চিকিৎসার ও যোগ্য-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহাজনদের কল থেকে রক্ষা করার ক্ষত্র আদিবাসীদের ক্ষত্র কতকগুলি ধর্মশালা স্থাপন করেছেন। আদিবাসীরা এইধর্ম শালা থেকে অশ্রমে থান দাত করে এবং কদম উৎসব হলে ঐ ক্ষত্র দিয়ে শ্রবণ শোণ করেন।

ভারত সরকার আদিবাসীদের বিতার্ক পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অর্থ সাহায্য করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অসুস্থ অর্থ নিষেধের তহবিল থেকে আদিবাসীদের কল্যাণের ক্ষত্র ব্যয় করবেন, এই ক্ষত্র এই সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। ভারত সরকার ১৯৪১-৪২ সালে ছুই লক্ষ টাকা দিয়েছেন, ১৯৪২-৪৩ সালে ছয় লক্ষ টাকা দিয়েছেন, ১৯৪৩-৪৪ সালে ১১'৪৬৪ লক্ষ টাকা দিয়েছেন এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে বোল লক্ষ টাকা দিয়েছেন। প্রথম প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই টাকা আদিবাসীদের কল্যাণের সাধারণ ব্যাঙ্কে মাহফুজ ব্যয় করতেন। কিন্তু উপনির্ভুক্ত স্তর থাকায় এতে অসুবিধা হ'ত। ১৯৪৩-৪৪ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদিবাসীদের কল্যাণের ক্ষত্র একটি আলাদা তহবিল করেছেন। আদিবাসী জীবনে ব্যবহার ও অসুস্থতা করে বিভাগে তাদের নানা সমস্যা দূরীভূত করা যায় সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পরামর্শ দেবার

ভক্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার "আদিবাসী সংস্কৃতি গবেষণা ইনস্টিটিউট" (Cultural Research Institute of Tribal welfare) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। আদিবাসীদের ভক্ত বহুবিধ কাজ এখানে হয়ে থাকে, তার মধ্যে সংস্কৃতি বড় কাজ—আদিবাসীদের নিজেদের ভাষার তারের ভক্ত পাঠ্যপুস্তক লেখা এবং আদিবাসীর সাহিত্য প্রচারে উৎসাহ দান করা।

আদিবাসীদের শিক্ষা বিষয়েও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। সরকার সব সময়ে ভক্ত প্রাথমিক স্কুলে কোন আদিবাসীর ছাত্রের অর্থভাবে পড়াশুনা বন্ধ না হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাধ্যমিক বিভাগের আদিবাসী ছাত্রদের শিক্ষার খরচ বহন করেছেন। ১৯৪৮ সালে ১ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা এর ভক্ত ব্যয় করেছেন। ১৯৪৯ সালে এই ব্যয় ২২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। পশ্চিম বাঙ্গলার শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা এই টাকা বিভিন্ন বিভাগের আবহাওয়া মন্ত বন্টন করেন। এ ছাড়া প্রত্যেক জেলা অফিসারের হাতে আদিবাসী ছাত্রদের পুস্তক, পত্রিকার কি এবং হস্তি আদিবাসী ছাত্রদের খেঁওরা পত্রার ভক্ত একটি তহবিল দেওয়া হয়। এই তহবিলকে "আদিবাসী শিক্ষা তহবিল" বলা হয়। আদিবাসী ছাত্রদের ভক্ত মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে, গোপীবন্দরপুরে, শিবপুরে, ঝাড়ুড়া জেলার বাগীবাংলা, বাওরা এবং ঝাঁকড়াবাড়িতে, মালদহ জেলায় বুলুপুন্ড্রীতে, বীরভূম জেলার বাঁধপুন্ড্রীতে ও হাফিলিঙ জেলার একটি কলে ছাত্রদের নির্মাণ করা হয়েছে। আদিবাসীদের শিক্ষার ভক্ত গ্রামে বহু বুদ্ধিবাসী শিক্ষাবিদগণের খোলা হয়েছে।

চাবের ভক্ত আদিবাসীদের মধ্যে কতকগুলি এগ্রিকালচার ও পশুপালন করা হয়েছে। ছোট ছোট বাল কেটে মল সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশুপালন, সার এবং বীজ আদিবাসীদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। গবাদি পশুর উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করেছেন। আদিবাসীদের হাঁস মুগীতে উন্নতিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কৃষিবিদ্য শিক্ষা বিষয় ভক্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদিবাসীদের মধ্যে কতকগুলি বহন বিভাগের স্থাপন করেছেন। কোচবিহার শিল্প বিভাগের এবং তৎসংশ্লিষ্ট কারখানাতে আদিবাসী ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

আদিবাসীদের গ্রাম থেকে বড় রাস্তার বাতায়নভেদে স্থিতির ভক্ত বাংলা সরকার বহু গ্রাম্য রাস্তা নির্মাণ করে দিয়েছেন বাঙালি সরকার মেদিনীপুর জেলার বেলপাহাড়—বাঁধপাহাড়ী নামে একটি বড় রাস্তা নির্মাণ করতে মেদিনীপুর, ঝাড়ুড়া ও বীরভূম জেলার আদিবাসীদের বহু গ্রাম বহিষ্কৃতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

আদিবাসীদের কৃষ্টি অক্ষর রাখার ভক্ত তাদের মধ্যে জীড়াকৌতুক, মৃত্যু, বাজাহ মল, শিল্প ও কলাবিভাগ ভক্ত বাঙালি সরকার বহু অর্থ ব্যয় করেন। ১৯৪৯ সালে কলাশিল্পে যে প্রদর্শনী হয়েছিল তাতে আদিবাসীদের দ্বারা প্রস্তুত নানাবিধ দ্রব্যের একটি দোকান খোলা হয়। জনসাধারণ সেই দোকানের উপর বিশেষ আকৃষ্ট হয়। ঝাঁওতাল, মুগু, ভুটিয়া, লেপুড়া ও টোচোদের বিখ্যাত বহু চলচ্চিত্র গ্রহণ করা হয়েছে। এই চলচ্চিত্র থেকে তারা শুধু যে প্রশংসার বিখ্যাত জানতে পারে তা নয় নিজেদেরও ভাল করে বুঝতে পারে। আদিবাসীদের সংগত কলাবিভাগ উৎসাহদানের ভক্ত একমুখ ঝাঁওতাল নর্তক নর্তকীকে ১৯৪০ সালে দিল্লীতে সাধারণতন্ত্র দিবসে নাচ দেখাতে পাঠান হয়েছিল। আর কলিকাতার স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে ঝাঁওতাল, ভুটিয়া, লেপুড়া প্রভৃতি নৃত্যশিল্পীদের আনা হয়েছিল।

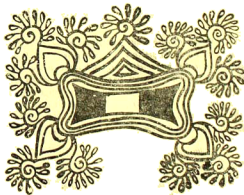
যে সব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করতে চায় বাঙালি সরকার তাদের অর্থ সাহায্য করেন। বহুভাষা প্রচার সমিতি, হিন্দু মিশন, ভারত সেবাশ্রম সন্থা ও 'সমর স্বানন' বাঙালি সরকারের অর্থে আদিবাসীদের হিতার্থে বেশ ভাল কাজ করেন।

১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ সালে (বিভিন্ন পত্রিকাদিক পত্রিকরনার) পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদিবাসীদের ভক্ত দা করেছেন তার বিবৃতি নিচে দেওয়া হল :—

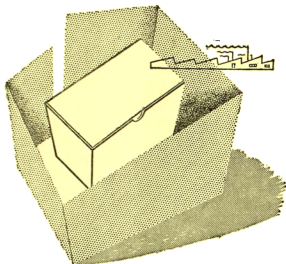
৪০৮০ জন আদিবাসী ছাত্রকে পড়াবার খরচা দেওয়া হয়েছে। ৮০০ আদিবাসী ছাত্রকে ছাত্রোপার্জের খরচা, পুস্তকের মূল্য, পত্রিকার কি ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। ২৪টি আদিবাসী বিভাগকে মেসামতের ও উন্নয়নের খরচা দেওয়া হয়েছে। আদিবাসীদের জমির উপর ২৭৭ আশ্রয় চাবের নতুন পছা দেখান হয়েছে। ২৪টি স্থানে ছাগল,

তেড়া ও শ্রম পালনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ থেকে তাদের জীবিকার আর একটি উপায় হবে। অনেকগুলি ছোট ছোট জলসেচের পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা হয়েছে। বিগত পান্ডুর মসের মন্ত্র আদিবাসীদের গ্রামে ২১০টি মল্লুপ বসানো হয়েছে। জলসেচ আদিবাসী কর্মীদের বালের মন্ত্র ১০০টি ক্ষুটির নির্মাণ ও ৫০টি কুপ খনন করা হয়েছে। ১২টি পমবার মন্ত্রপোলা খোলা হয়েছে। আদিবাসীদের মধ্যে কাজের মন্ত্র ১২টি বেসরকারী সমিতিতে অর্থসাহায্য করা হয়েছে। আদিবাসীদের মন্ত্র ৫টি কল্যাণকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এইসব কাজে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৬—১৯৫৭ সালে মোট ২২,৩৫,৭৮২ টাকা খরচ করেছেন। একটি বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছেন, “আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে মন্ত্র সন্তানদের মানুষগুলিকে আমাদের নিজেদের হাতে পড়ে তোলবার এবং আমাদের নিজেদের জীবনযাত্রা প্রণালী তাদের হাতে চাপাবার আশ্রয় বেগে আমরা ভয় হয়। আদিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালী ভাল

না আধুনিক জীবনযাত্রা প্রণালী ভাল সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহে কিছু বলতে পারি না। তবে কতকগুলি বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আদিবাসীদের মধ্যে নানাবিধ কুটি বেগা বায় এবং কতকগুলি বিষয়ে তারা মোটেই পিছনে পড়ে নেই। আমরা উচ্চশ্রেণীর জীব এই ব্যবস্থা নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত নয়। এক কথায় আদিবাসীদের আমাদের একটি নিষ্কণ্টক সংস্করণে তৈরী করবার চেষ্টা করা দৃষ্টান্ত চূড়ান্ত। আদিবাসীরা যাতে নিজেদের ভাষা ব্যবহার করে সে বিষয়ে উৎসাহ দিতে হবে। কোন বাইরের লোক যাতে তাদের জমি বা জল অধিকার করতে না পারে সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে। আমি চাই যে তাদের অগ্রগতি হোক; কিন্তু তাদের নিজস্ব কল্যাণকৌশল এবং আনন্দময় জীবন ও কুটি যেন কোনদিন লোপ না পায়, সেটিকে সতর্ক বৃষ্টি রাখতে হবে।” সরকারী ও বেসরকারী যে সব কর্মী আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করছেন তাঁদের শ্রীনেহরুর উক্তি পূর্ববা দরপ রাখা বাহনীয়।



factory freshness preserved



with

★ **POLYBOARD**
★ **POLYKRAFT**

packaging

Acid, alkali and moisture resistant polythene-coated POLYBOARD and POLYKRAFT help to preserve the factory-freshness of your products, whether they be confectionery, tea, biscuits or chemicals.

These new, revolutionary packaging materials are several times stronger than ordinary board or paper and prevent damage to your products even when they are subjected to rough handling. And the eye-appeal of your products is enhanced considerably because of the glossy finish on POLYBOARD and POLYKRAFT.



CHANGE TO
★ **POLYBOARD** ★ **POLYKRAFT**
PACKAGING FOR INCREASED SALES

ORIENT PAPER MILLS LTD., CALCUTTA.

জীবনের ক্রমবিকাশ

বিষয় যে

(পূর্বাভ্যুত)

পালক কিংবা চুল উভচর প্রাণীর দেহের উপর দেখা যায় না। ইহাদের চামড়ার তলে শ্রেণীবদ্ধ গ্রন্থিসমূহ দেখা যায়। (২) প্রায় সমস্ত উভচর প্রাণীই শিশুকালে জলে বাস করে এবং কানুকের সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকে। কোনো উভচর আবার সমস্ত জীবনই কানুকের সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। (৩) ইহারা পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হইলে ফুসফুস এবং নাকের সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকে। ইহাদের নাকের ছিদ্র মস্তকের উপরে, মুখের কাছাকাছি হইতে আরম্ভ হইয়া মুখের ভিতরে বাইরা শেষ হইয়াছে। (৪) প্রায় সমস্ত উভচর প্রাণীই দুই বোঁড়া অঙ্গ বর্তমান। ইহাদিগকে বলা হয় উর্ধ্বশাখা এবং অধঃশাখা। ইহাদিগের পায়ে আঙুল বর্তমান। ক্রম-বিবর্তনের ফলে অধঃশাখার পা দু'খানা লম্বা এবং শোকা হইয়া যেহেতু মাটি হইতে উপরে জুলিয়া দিরাছে। (৫) উভচর প্রাণীর মাথার খুলি দুই ভাগে বিভক্ত। পার্শ্বী এবং সর্বোপরে মস্তকের খুলি অবিভক্ত, অপরিচ্ছিন্ন। দুই-পার্শ্বীদিগের মস্তকে দুইটি কন্ডাইল (condyle) বর্তমান। (৬) উভচর প্রাণীর রূপান্তরে তিনটি প্রকারে বর্তমান। তিনটি প্রকারের দুইটি হইতেছে খলিঙ্গ (auricle) এবং একটি হইতেছে নিলর (ventricle)। ফুসফুস হইতে বায়ু খলিঙ্গে বিতরণ রক্ত আশ্রিত হইয়া যায়। ইহাদের রক্ত, পার্বী অথবা দুইপার্শ্বীদিগের মত উষ্ণ নহে। ইহাদের বলা যায় শূন্য-শোণিত (cold blooded)। (৭) ইহাদিগের খাদ্যদানী অবগাহনী প্রকারেই বাইরা শেষ হইয়াছে। খাদ্যর এই অবগাহনী প্রকারেই হইতেই দুইটি দলী আরম্ভ হইয়া একটি বৃক্ক (Kidney) অপগতি ঘনন করে চলিয়া গিয়াছে। ইহাদিগের অন্তের পশ্চাৎভাগ হইতে একটি অল্পতর বকমের স্থলী (bladder) জমালাভ করিয়াছে। এই যে স্থলী ইহাই জীবজন্তুরাতির ফলে allantoisএ পরিণত হইয়াছে সর্বোপরি, পার্বী এবং

দুইপার্শ্বীদিগের ভিতরে। (৮) উভচর প্রাণী ডিম্ব প্রসব করে। একত্রে বহু ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বগুলি ছোটো; বহুকক্ষীয় এবং খোলাহীন হয়। ইহাদিগের ডিম্বের কুহুম এবং প্রায়ঃগণ (pole) দুইটির একটি কাছাকাছি থাকে। প্রায়ঃ সমস্ত ক্ষেত্রেই ইহারা জলে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে এবং জলের ভিতরেই ইহাদের উদ্ভাপনান যৌলম ক্রিয়া ঘাটা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন নাকি গোমিকার ডিম্বের উপরে মক্ত খোলা থাকে এবং ডিম্বের তা হিবার কাছ মাথের দেহের ভিতরেই হইয়া থাকে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে এই সমস্ত উভচর প্রাণীদিগকে জন্মবৃত্ত (viviparous) বলা চলে। (৯) উভচর প্রাণীদিগের শারীরিক পটনের পরিবর্তন (শিশুকাল এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থার জুলনামূলক বিভায়ে) ইহাদিগকে রূপান্তরীক (metamorphic) প্রাণীই কোঠার কেলিয়াছে। ডিম্ব কাটিয়া প্রথম যে প্রাণী বাহির হয় তাহাকে জীবটির শূক (Larva) বলা চলে। একটি পূর্ণাঙ্গ ভেকের দেহের সহিত একটি বেঙাটির দেহের জুলনা করিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে।

উভচর প্রাণী ও মৎস্য :—মাছের সহিত উভচর প্রাণীর অনেক বিবরণ মিল দেখা যায়। ইহারা অনেক সময় জলের ভিতর থাকে বলিয়া মাছের সহিত এই সাদৃশ্য খুবই স্বাভাবিক। উভচর প্রাণীদিগের মাছের মত জুলকা বর্তমান। জুলকা বাজাকালে প্রত্যেক উভচর প্রাণীর ভিতরেই দেখা যায় কিন্তু পূর্ণবয়স্ক হইলে প্রায়ঃ নর্যকক্ষেই ইহা আবদ্ধ থাকে না। মৎস্য এবং উভচর প্রাণীর উভয়েরই বাজাকালে পার্শ্বীয় সংখ্যক দেখা যায়। ইহাদের উভয়েরই বৃক্ষোচ্চা নার্ত মস্তক হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত বেহে ছড়াইয়া গিয়াছে। উন্নততর প্রাণীদিগের ভিতর বারো বোঁড়া নার্ত মস্তক হইতে বাহির হইয়াছে। মৎস্য এবং উভচর প্রাণীর কাহাংই নার্তবিল্লী নাই। এই নার্তবিল্লী

আমরা জীব অভিযান্ত্রিক সনাতনপের কোঠার বাইরা প্রথম দেখিতে পাই। বেঙাটির ভিতর মাছের মত দুইটি প্রকোষ্ঠ যুক্ত জংপিত এবং মাছের মতই একটি মাত্র খন্দী জংপিত হইতে অপবিত্র রক্ত ফুলকা পর্যন্ত লইয়া যাইতেছে এবং এইখানে রক্ত বাহিরের বাতাসের সংস্পর্শে আসিতেছে। বেঙাটির সেকেন্ড মাছের মত একটি অবিভক্ত পাখনা বর্তমান। জীবগণ সনাতনপেরই সর্বপ্রথম শুকনা মাটিতে উঠিয়া আসিতে দেখে। কিন্তু উভচর প্রাণী জল ছাড়িয়া উপরে উঠিয়া আসিতে সক্ষম হইলেও উভচরের পূর্ণপুঙ্খ মস্তক শারীরিক দোষগুণ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় নাই। এই সমস্ত সাক্ষ্য সত্ত্বেও উভচর প্রাণীর শারীরিক সঠক মস্তক শারীরিক সঠক হইতে অনেকখানি অভিযান্ত্রিক পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। মাছের শারীরিক সঠক সম্বন্ধে কিছু বলিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে। মাছের ফুলকা সমস্ত জীবন বর্তমান থাকে কিন্তু উভচর প্রাণীদিগের প্রায় সকলেরই পূর্ণবয়স হইলে ফুলকা থাকে না। উভচর প্রাণীর এই ফুলকা চলিয়া যাওয়া নিশ্চয়ই জীব অভিযান্ত্রিক পথে, মস্তক হইতে একথাপ উপরে। কদাচিৎ বেধা বার, সমস্ত বস্তিই (swim bladder) একটি ফুসফুসের কাছ করে। মস্তকের জংপিত প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দুইটি কক্ষবিশিষ্ট, অপেক্ষিক উভচর প্রাণীদিগের প্রায় সবাই জংপিত তিনটি কক্ষবিশিষ্ট হইয়া থাকে। মস্তক ঘেহের অবিভক্ত পাখনা, এই পাখনা বন্ধ হইয়া ভাঙ বন্ধিত হইতেছে। বেঙাটির সেকেন্ড অবিভক্ত পাখনা বর্তমান কিন্তু উহাতে পাখনা বন্ধ নাই। মাছের সাধারণত আইশ থাকে। মস্তক এবং পাখনা বাহে সমস্ত ঘেহই আইশ দ্বারা আবৃত থাকে। মস্তকের পক্ষাৎ নানারক নাই এবং ইহাদের অংশ হইতেছে ইহাদের পাখনা।

এখন উভচর প্রাণীদিগের অঙ্গসংস্থান মস্তক সহিত ফুলকাবুলক ভাবে বেধা বাউক। যে ফুলকা মাছের ঘেহের একটি বিশেষ কার্যকরী অংশ বিধাবে জীবনস্তর অঙ্গস্থান করে; তাহা উভচর প্রাণীদিগের বেশা প্রায় লামাত্র দু'একটি ক্ষেত্র বাহে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই বহুল থাকিবার সাধে সাধে লুপ্ত হইয়া যায়। সমস্ত উভচর

প্রাণীরই বড় হইলে ফুসফুস থাকে কিন্তু ইহা মাছের ভিতর নাই। কেবলমাত্র দুই একটি ক্ষেত্রে মাছের সমস্ত বস্তি উহার ফুসফুসের কাছ করিয়া যায়। উভচর প্রাণীর জংপিত থাকে তিনটি প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট কিন্তু আমরা দেখিয়াছি মাছের জংপিত প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দুইটি প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হইয়া থাকে। শিশুকালে কোনো কোনো উভচর প্রাণীর অবিভক্ত পাখনা; যেমন নাকি বেঙাটির সেকেন্ড থাকে, কিন্তু বড় হইলে ইহা থাকে না এবং এই পাখনায় কোনো শলা নাই। উভচর প্রাণীর প্রায় সব ক্ষেত্রেই আইশ থাকে না কিন্তু মাছের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই আইশ বর্তমান। উভচর প্রাণীর পক্ষাৎ নানারক বর্তমান কিন্তু মস্তকের ইহা নাই। উভচর প্রাণীর উর্ধ্ব অংশ অঙ্গুল এবং নিম্ন অংশ উভচর প্রাণীর মত পায়ের আঙ্গুল বর্তমান কিন্তু মস্তকের অংশে উহার পাখনাই সীমাবদ্ধ। মস্তক এবং উভচর প্রাণীর ভিতর এই সমস্ত আনয়িক বিভিন্নতা দ্বারা আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে উভচর প্রাণীর অঙ্গসংস্থান জীব অভিযান্ত্রিক পথে মস্তক হইতে একথাপ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত বিভিন্নতা সত্ত্বেও উভচর প্রাণীর ভিতর উহাদের পূর্ণপুঙ্খের বেধ সংস্থানের উপপ্রায় বহু স্থিতি বর্তমান তাহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি। প্রয়োজনের তাগিদে প্রতিবেশের সহিত যুদ্ধ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার মত মস্তক জীবনের অনেক কিছু জীবগণের উভচর জীবন হইতে ত্যাগ করিয়াছে। অনেক অনেক নতুন কিছু গ্রহণ করিতে হইয়াছে। প্রকৃতি উহাকে গড়িয়া-পিটিয়া তাহার বিভিন্নশক্তি সহিত যুদ্ধ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার মত নতুন অঙ্গসংস্থানে গড়িয়া তুলিয়াছে। আবার এই মস্তক এবং উভচর প্রাণীর ভিতর যে বিভিন্নতা বর্তমান, একপ্রকার ভগ্নাবস্থিত মাছ আমরা দেখিতে পাই তাহাকে আমরা ঠিক স্বাভাবিক মস্তক কিংবা স্বাভাবিক উভচর প্রাণীও বলিতে পারি না। ইহাদের সহিত মস্তকের অংশ সংস্থানের বৃহৎ যেমন খুব কম আগের উভচর প্রাণীর ইহা খুব কাছাকাছি। বহুতরকে মস্তক প্রকৃতি উহার অভিযান্ত্রিক পথে এই ক্ষুদ্র গাণিতিক অঙ্গসংস্থান করিয়া উভচর প্রাণীর কোঠার উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে ইহাকে একটি ভিন্ন

বলা যাইতে পারে। জীবজগতে স্থল অধিকারের যে অভিধান উত্‍তর প্রাণী অথবা আরও পূর্বে যে ছ' একটি প্রঃশব্দী মন্তঃ ; যেমন নাকি পূর্ব বংশের উত্থি মন্তঃ অবতর করে, তাহা সম্পূর্ণরূপে জরতরূপে হয় সর্পীস্বপের জীবনে। জীবজগতে সর্পীস্বপই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণরূপে জন্মগত জীবনকে বাদ দিয়া চলিতে সমর্থ হয়। ইহার উত্‍তর প্রাণীর মত আর ভিৎ প্রসব করিবার ক্ষমতা নাই। ফিরিয়া যাইতে হয়না ; অথবা বাচ্চাকালে বেড়াতির মত গলে থাকিয়া ফুলকা হারা খাস গ্রহণ করিতে হয়না। সর্পীস্বপ জন্মান্তর করিবার পূর্বে অথবা ভিৎ কুটিয়া বাহির হইবার পূর্বে জন্মকাল পর্যন্ত সর্পীস্বপ মাতৃবাহের রক্তবাহর (blood vessel) সাহায্যে অথবা ভিৎের এককিকে যমান বাহু হইতে খাপ গ্রহণ করিয়া থাকে। জন্মকাল অথবা জন্ম কালী সর্পীস্বপের, পানীর এবং দুগ্‍দপানীর ত্রণের বাচ্চ-নালাই শেষ প্রান্তের পক্ষাৎ দিক হইতে জন্মলাভ করিয়া সন্ত ত্রণের উপরে ছড়াইয়া যায়। এই কালীর উপর হয় হয় রক্তনালা ছড়াইয়া আছে। এইগুলির সাহায্যেই মাতৃবাহ হইতে অভিধেন গ্রহণ করে এবং এই রক্তনালা-গুলির সাহায্যেই আবার কার্বনডিক্সাইড (carbon-dioxide) মাতৃবাহের রক্তবাহতে ঢালাইয়া যায়। সর্পীস্বপ এবং পানীর ভিৎের মাতৃবাহের সহিত এই প্যাস বিনিময় ভিৎের উপরের আব্রুয়াক্সিকি ছিঁয়ের সাহায্যে হইয়া থাকে। দুগ্‍দপানীর জন্মকালী (birth robe) ফুলের (placenta) অংশ বিশেষ হইয়া গাঁড়ায় এবং ইহাদের প্যাস বিনিময় হইয়া থাকে জন্মকালীর উপর ছড়ান রক্তবাহ এবং মাতৃবাহের রক্তবাহের তিতর।

সর্পীস্বপের বিশেষ লক্ষণ :—সর্পীস্বপের বহু কটন আইন হারা আচ্ছাদিত। এই আইন বহিঃত্বক (epidermis) হইতে জন্ম লাভ করে এবং সম্পূর্ণরূপে পুষ্টিলাভ না করা পর্যন্ত অন্তত্বকত্বিত (dermis) রক্তবাহ হারা পুষ্টি লাভ করে। সর্পীস্বপ সাধারণত নবজন্মকাল চতুশ্রী কিন্তু সর্প ইহাদের মধ্যে অপসহীন হইয়া থাকে। কোনো কোনো সর্পীস্বপের আবার অংশ হাতায় (flipper) পরিণত হইয়াছে ; যেমন নাকি কচ্ছপ। ইহাদের আঙ্গুল থাকে না। সাতার কাটিবার এবং ফুলে হাঁটিবার উপযুক্ত চওড়া

হাতালুজ ছোট ছোট চাখিখানা পা থাকে মাত্র। সর্পীস্বপ ফুলফুলের সাহায্যে খাপ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং ইহাদের জীবনের কোনো অবস্থাতেই ফুলকা থাকে না। বহিঃ ইহাদের ত্রণবাহর কক্ষত বচ্চ (gill cleft) থাকে, (যেমন নাকি পানীর এবং দুগ্‍দপানীর ত্রণবাহরও দেখা যায়) কিন্তু ইহা কোনো সময়ই কোনো কাজে লাগে না, ইহা কেবল মাত্র ইহাদের পূর্বপুরুষের জন্মগত জীবনের লুপ্তপ্রায় অকর্মণ্য স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা খাপগ্রহণের কোনোই সাহায্য করে না। সর্পীস্বপের ত্রণের দুইটি কিল্লী বর্তমান—একটিকে বলা হয় এমনিয়ম (amnion), অপরটি এলেন্টইস (allantois) সর্পীস্বপ হইতেছে অক্ষুণ্ণশোণিত। এই অক্ষুণ্ণশোণিকা সর্পীস্বপের উত্‍তর প্রাণী এবং মন্তের সহিত সম্পর্ক রেখেইয়া দিতেছে, অপর দিকে ইহা সর্পীস্বপকে পানী এবং দুগ্‍দপানীর ত্রণী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতেছে। অক্ষুণ্ণশোণিতের জন্ম সর্পীস্বপের বেহের উত্‍তাপ উহার চাখিখানের উত্‍তাপের সহিত ঠঠানানা করে। আক্‍কির বাচ্চাকাল প্রান্তরে দাক্ষণ প্রীয়ে একটি সাপের বেহে যে উত্‍তাপ হইবে, তাহার সহিত সাইখেরয়াং বচ্চ কোনো শীতে একটি সাপের বেহতাপের কোনো তুলনাই হয় না ; বহুতপকে একটি সাপেরই বিভিন্ন স্থানে পরিমাপিক আবহাওয়ার বিভিন্নতার জন্ম বেহতাপের বচ্চ বিভিন্নতা দেখা যায়। অপরদিকে পানী এবং দুগ্‍দপানী উহাদের বিশেষ বেহতাপের সাহায্যে উহাদের বেহাৎপন্ন উত্‍তাপের, উৎপাদন এবং খরচের সমতা বচ্চ করে। উচ্চতর প্রাণীদিগের সুবিধা হইতেছে এই যে অপেক্ষাকৃত উচ্চ আবহাওয়া ইহাদের বেহের তাপের সহিত সমতা বচ্চ করে বলিয়া ঐ প্রকার আবহাওয়ার উহাদের বেহতাপ সন্তুভাবে কাঙ্চ করিয়া যাইতে পারে। অপরদিকে অক্ষুণ্ণশোণিত প্রাণীদিগের বেহের উত্‍তাপ উচ্চ আবহাওয়ার সহিত খাপ খাপ না বলিয়া ঐরূপ আবহাওয়ার উহাদিগের বেহতাপ বিপাকক্ষমতা সন্তুতপে পরিচালনা করিতে পারেনা। এইজন্য আমরা প্রায় সমস্ত সর্পীস্বপকে পানী অথবা দুগ্‍দপানী হইতে মন্তর গতি এবং নিরুদ্ভব বেহিতে পাই। অনেক ক্ষেত্রেই সর্পীস্বপের জন্মগত তিনটি প্রকারে দলিত হয়। এই দিক

দ্বিতীয় ইহার উভয় প্রাণীজগতের অন্তর্গত। কিন্তু কুনীর আত্মীয় স্ত্রীস্বপের স্থাপিত পানী এবং হৃৎপায়ীজগতের মত চারিটি প্রকারে সঞ্চিত হয়—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই তিনটি প্রকারের দুইটি বইতেছে ট্রিক আখ্যায়িকের মত অলিম্ব। দুইটি অলিম্বের একটিতে বৃন্দুসু বইতে অপরিহার্য রক্ত অশিরা স্থান লয়। কিন্তু কেবল মাত্র কুনীর বামে স্ত্রীস্বপের স্থাপিত একটি মাত্র নিলর ventricle বর্তমান, অতএব আবার পদ্বিরা লইতে পারি এই একটি মাত্র নিলরে পদ্বিহার এবং অপরিহার্য এই দুই প্রকারের রক্তই স্থান পাইতেছে। কিন্তু অহতে তাহা সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে না, কারণ নিলর একটি বইলেও উহার ভিতর আবার একটি ব্যাপ্যাকর ব্যাধ। দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। নিলরের এই দুইটি অংশের ডান অংশ থাকে অপরিহার্য রক্ত এবং বাম অংশ থাকে পদ্বিহার রক্ত; ইহারই মত পদ্বিহার এবং অপরিহার্য রক্ত একত্র মিশিয়া বাইতে পারে না। কুনীর এবং উহারের মধ্যে প্রাণীজগতের নিলরের এই বিভাগ পরোক্ষরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে, কারণে ইহারের স্থাপিত পূর্ণাঙ্গ চারিটি কক্ষ বর্তমান, দুইটি অলিম্ব এবং দুইটি নিলর।

স্ত্রীস্বপের লোহিত রক্তকণিকাগুলি অনেকটা উভয় মস্তক এবং পানীর লোহিত রক্তকণিকার মত নিউ-ক্লিয়ারুল এবং ইহারের উপবিভাগ বিভাচার। অপরদিকে হৃৎপায়ীজগতের লোহিত রক্তকণিকাগুলি পূর্ণাঙ্গ বইলে নিউক্লিয়ারহীন বক্রোহর এবং ইহার উপবিভাগ গোলাকার হয়। স্ত্রীস্বপের যেতরক্তকণিকাগুলি নিউ-ক্লিয়ারুল এবং বিভিন্ন আকারের হইয়া থাকে। স্ত্রী-বৃত্তির বিভিন্নতা দ্বারা স্ত্রীস্বপকে অসংখ্য প্রজাতির প্রাণী হইতে ভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাহার বৃত্তিটি পরিচয় এখানে দা হিলেও বইয়ের উদ্দেশ্য নষ্ট হইবে না। তবে মোটামুটি ভাবে নিম্নলিখিত স্ত্রীস্বপের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। বহুদিন পর্যন্ত এই প্রাণী আখ্যায়িকের কাছে কারণিক ভ্রমকণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আখ্যায়িকের রামায়ণের ঘটায় পক্ষী এবং মহাভারতের গরুড় পক্ষীর উপাখ্যান ইহার কিছুটা সাক্ষ্য দেয়। আরব্য উপাখ্যানে শিবুবার নাথিকের গল্পে এইরূপ বিবৃতি পক্ষীর উল্লেখ আছে।

এই সমস্ত বইতে মনে হয় যে এই বিবৃতিটির উদ্ভূত ভাগন সম্বন্ধে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য অবিহনে বইবার বহু পূর্ব হইতেই এই সম্বন্ধে মানুষের কোনোই জ্ঞান ছিল না। তারপর বর্তমান জীববিজ্ঞানের আওতার এই সম্বন্ধে অমত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করি। বর্তমান জীববিজ্ঞানের মতে এই উদ্ভূত ভাগন উহারের বিবৃতি কালোপাখ্যানে বিভাজ্য করিয়া যে সময় পৃথিবীর আকাশ চাক্ষুশ্য দিত সে সময়টা হইতেছে প্রত্নতত্ত্বের ভাষায় 'Triassic,' 'Jurassic' এবং 'cretaceous' যুগ। তারপর যত প্রকৃতির টেইটাইটেব এমন এক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল, যে আবহাওয়া উদ্ভূত ভাগন জীবনের ব্যতিক্রম থাকার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নহে। অথবা যত পৃথিবীর পক্ষে এমন এক বিপর্যয়ের অবতারণা হইয়াছিল যাহাতে এই উদ্ভূত ভাগন প্রজাতির চিহ্ন বহুপুট হইতে উহার মাটির তলায় ঢাপা পড়িয়া গিয়াছিল। তারপর মানুষের বিজ্ঞা, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের জ্ঞানের আলো যখন বঙ্গী-পৃষ্ঠের কঠিন আবরণ তের করিয়া মাটির তলায় গুস্ত বহুস্তের সম্মুখে গাভিত হইল; তখন আবার বীরে বীরে সেই আধুনিক যুগের ধ্বংসলীলার সম্মুখে অতিক্রান্ত অবশেষ সেই আলোর কাছে ধরা দিল। এই আলোর বর্ণি টেরোডাকটাইল সম্বন্ধে কি কথা আখ্যায়িকের মত সংগ্রহ করিয়াছে দেখা যাইক। জীববিজ্ঞানীদেব বারংটা টেরোডাকটাইলই সর্বপ্রথম জীবজগতে আকাশে উড়িবার পৌত্তাপ অর্জন করে। একখানা পাতলা চামড়ার শিট (sheet) গলায় পার্শ্বদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া সামনের অংশে দুইখানার চতুর্ভুজ অংশগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত লাভ করিয়া পিছনের পা দুখানার পাঁচটি আঙ্গুলের শেষ অঙ্গুল পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই উদ্ভূত ভাগন আবার দুই প্রকারের দেখা যায়। ইহারের একপ্রকারের নাম হইয়াছে—Rhamphorhynchus এবং অপর প্রকারের নাম হইয়াছে—Pterodactyle. Rhamphorhynchus-এর বিশেষত্ব হইতেছে ইহারের লম্বা একটি লেজ। লেজটি হেথিতে অনেকটা নৌকা চালানোর মতো মত। অপরদিকে Pterodactyle-এর অতি ক্ষুদ্র একটি লেজ ছিল কিন্তু উহা তাহারের কোন কাজে লাগিত বলিয়া মনে হয় না।

সেজটির উপর বিহাই চমড়ার পাখা প্রদর্শিত হইয়া পিছনের পায়ে আঙ্গুল পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সকল একাত্তরের উক্ত ভাগনবই সমস্ত ভাগের অংশ ছইটির প্রথম তিনটি আঙ্গুল ছোট ছিল এবং খুব সস্তর ঐ আঙ্গুল কয়টি পর্যন্ত শূন্য ঐক্যবাহী। পরিবার কত ব্যক্তিত্ব হইত। ইহাদের সংখ্যাই পাখার প্রথম অবলম্বন ছিল চতুর্থ অঙ্গুলি। বিশিষ্ট শ্রেণীর টেরোডাক্টাইলদের মধ্যে পরিমাপের ভিত্তি আকাশ পাতাল তথ্য ছিল। খুব সস্তর ক্ষুদ্রতর দিক বিদ্যা বলিতে গেলে কোনো কোনো শ্রেণী হস্ত বর্তমান বাহুর হইতে মোটেই বড় ছিল না। অপর দিকে কোনো কোনো শ্রেণী এত বড় ছিল যে ইহার পাখা মেলিলে পাখার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ২৪ ফুটের কম হইবে না। মোটামুটি ভাবে বলিতে পারা যায় এই উক্ত ভাগনগুলি দ্বারা ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ ব্যতীত চাপকহীন বিমানগুলির সমান ছিল। আধুনিক এ্যালব্রাটন পাখীর পাখার আয়তন ১২ ফুট পর্যন্ত হয় এবং ইহাই পাখীর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাখী। কোনো কোনো উক্ত ভাগনের অঙ্গীকৃত বৈশিষ্ট্যকাল বৈদ্যা বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উভারা যে টিক উড়িতে পারিত তাহা নহে। আধুনিক বিমান ছত্রিকার সাহায্যে যেমন বৈমানগণ বিমান হইতে লাফাইয়া পড়িতে সমর্থ হয় ঐ সমস্ত উক্ত ভাগনগুলিও সেইরূপ একপাছ হইতে অল্প গাছে অথবা পাহাড়ের এক স্থান হইতে অল্প স্থানে ঐ পাখার তর করিয়া লাফাইয়া পড়িতে সমর্থ হইত কিন্তু অপর কতকগুলি প্রকৃতপক্ষেই উড়িতে পারিত। উড়া বলিতে আশঙ্ক্য বৃত্তি পাখাঘরা বাতাসে আশ্রিত করিয়া আকাশে গিরণ করা। কোনো কোনো টেরোডাক্টাইল খুব সস্তর সস্তরের জলের উপরে যে সমস্ত নাক ঘুড়িয়া বেড়ায়, সেই-সম্প্রদায়িক পরিবার কত উড়িয়া বেড়াইত। পৃথিবীর গর্ভের অঙ্গীকৃত জীবায় সন্ধ্যা আমাদের জ্ঞান বাড়িবার নাথ সাধে আমরা এই আদিম উক্ত ভাগনদের সন্ধ্যা আরও অনেক তথ্য জানিতে পারি। যেমন নাকি Broili বলেন—এই উক্ত ভাগনগুলিও সেই বর্তমান স্তরোপের মত আইশ দ্বারা আবৃত ছিল না, ইহাদের গায়ে লোম ছিল এবং ইহারা উল্লিখিত ছিল। Broili এবং Wiman-এর

এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে বর্তমান জীববিজ্ঞানের একটি অধ্যায় নতুন করিয়া লিখিতে হইবে। তাহা হইলে টেরোডাক্টাইলই হইবে জীব-জগতের পর্যবেক্ষণ সোমবৃত্ত এবং হির দেহ উত্তাপনিবন্ধী জীব। তাহার আরও বলেন যে Pterodactyle-এর পাখার চামড়া খুব শক্ত ছিল এবং উহাদের বেহেহে অস্থি পাখীর মত কাঁপা ছিল। ইহাদের বেহাতি কাঁপা ছিল বলিয়া বেহেহে ওজন আয়তনের তুলনার খুব কম ছিল। ডাইনোসর (Dinosaur) আদিম পৃথিবীর অধুনালুপ্ত অনেক বিরাট-কার প্রাণীর মধ্যে ডাইনোসর একটি বিশ্বব্যপ্ত প্রাণী। এই ডাইনোসর সন্ধ্যা আমাদের জ্ঞান আধুনিক এবং ইহারও অনেকটা জীবজগতের উপর নির্ভরশীল। মন্সোলিয়ার গোবি মন্ডলস্থিতে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে একজন আমেরিকান অভিযানকারী কতগুলি ডাইনোসরের আধিকার করেন। বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের আগতর এই ডিমগুলি ছাড়া আর কোনো ডাইনোসরের ডিম নাই। ইহা বর্তমানে American Museum of Natural History নামক প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি। ইহা বর্তমানে এক একটি ছই সহস্র ডলার মূল্য বিক্রয় হয়। এই মূল্য অল্প নামক বিরাটকার পক্ষীর ডিমের মূল্য হইতে চার গুণ ; ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর এইরূপ আর দেখা যায় নাই। অবশ্য যে কেহ এই ডিম ক্রয় করিতে পারে না। বিশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বিশেষ স্থানেই বিক্রয় করা হয়। ডাইনোসরের এই ডিমগুলি সন্ধ্যা যদি ভবিষ্যৎ থাকেন যে উহা আপনার বাস্তবতার মত ডিম-গুলির মতই শব্দী এবং চুনকা তবু খুব ভুল করিয়াছেন। উহা চুনকাও নহে টাটকাও নহে, লক্ষ লক্ষ বছর পৃথিবীর অধরে থাকিয়া যে অবস্থায় পরিণত হইয়াছে তাহাকে বলা হয় জীবায় (fossil)। ঐ ডিমগুলি আরও ডিমের জীবায় ছাড়া আর কিছুই নহে। উহা বর্তমানে পাখার মত শক্ত। খুব সস্তর বহু লক্ষ বছর পূর্বে এই ডিমগুলি পাড়া হইয়াছিল। প্রশ্ন উঠিতে পারে এই ডিমগুলি এত মূল্যবান এবং আকর্ষণের বস্তু কেন? ইহার উত্তরে বলা বাইতে পারে প্রথমতঃ এর পূর্বে কেহ ডাইনোসরের ডিম দেখে নাই। দ্বিতীয়তঃ ঐ ডিমগুলির একটির মধ্যে ডাইনোসরের একটি রূপ বহিয়াছে। বর্তমান বিজ্ঞান তথ্য-

কবিত অল্পকালকৈ ঘেঁষিবার বে ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে তাহার সাহায্যে অসীমভূত ত্রুটিকে পরীক্ষা করিয়া অধিম যুগের এই অসীম প্রাণীটি সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান লাভ করিতে পারি। তৃতীয়তঃ এই ডিমগুলির প্রাপ্তিস্থান হইতে এই অধিম লুপ্ত বিরাটকায় সরীসৃপটির ভৌগোলিক সাবিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিতে পারি। ইহার পূর্বে ইহাদের বেহাযশেব ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, সিরিয়া, ইউরোপ, দক্ষিণ আফ্রিকা, মাভাগানস্কার উত্তর আমেরিকা এবং উত্তর আর্টেলিয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ডিমগুলি আবিষ্কার হইবার পর বর্তমানে ডাইনোসোরেব বাদস্থানেব তালিকাভার সহিত মঙ্গোলিয়ায় লুপ্ত হইল। কোন কোন জীববিজ্ঞানী মনে করেন, মঙ্গোলিয়ায় ডাইনোসোরদের একটি প্রধান অভ্যাস ছিল এবং এই স্থান হইতেই এই সরীসৃপ বর্তমান বেহীং প্রাণী, (যে স্থান দ্বিতীয় মনে করা হয় সেই সময় একটি বোম্বক বর্তমান ছিল) সেই স্থান দ্বিতীয় উত্তর আমেরিকায় যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। Iguanodon নামক ডাইনোসোরেব একটি দল Brussels এর বাহুবরে দেখা যায়। এই অসীমভূত কংকালগুলি বিধেব একটি বিশ্বকর বস। এই জীবাত্মগুলির মস্তক মাটি হইতে ১৪ ফুট উচ্চ। এইগুলি গতি Belgium-এব একটি কয়লাব খনিতে পাওয়া গিয়াছিল। এইগুলি দেখিয়া এই লুপ্ত বিরাটকায় সরীসৃপ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা জন্মে এবং ভাবিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। বর্তমান যুগের ক্ষুদ্রাকায় সরীসৃপগুলি ইহাদেরই বংশধর। সর্বপ্রথম Iguanodon এর জীবাত্ম আবিষ্কার করেন Dr. Mantel প্রায় ১১০ বছর পূর্বে, কিন্তু Belgium এর কয়লাখনির Iguanodonগুলি আবিষ্কার হইবার পূর্বে এই সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিবার ততটা তৎপরতা দেখা যায় নাই। Belgium-এব Iguanodon-গুলি আবিষ্কার হইয়াছে প্রায় ১০০ বছর পূর্বে। এই বিরাটকায় সরীসৃপগুলি খুব সম্ভব ভূগোলী

ছিল এবং ইহাদের প্রধান খাদ্য দ্রব্য ছিল গাছের কচি পাতা বাহা উহা অতি সম্বন্ধেই ভাবিয়া যাইতে পারিত। ইহাদের উল্লম্ব অস্থি প্রায় এক গজ লম্বা এবং পায়ের বাহা প্রায় এক ফুট ব্যাসবিশিষ্ট ছিল। এত সময় আনন্ডা যে বিরাট অধুমালুপ্ত সরীসৃপের কথা বলিলাম তাহাও আধুনিক কয়েকটি আবিষ্কারের ফলে নিভান্তই ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইবে। Atlantosours নামক সরীসৃপের জীবাত্ম হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে উহাদের উল্লম্ব অস্থি ছয় ফুট লম্বা। Stegosaurus নামক সরীসৃপের পিছনের পা দুইটি মাছের উচ্চতাব ঘোষণার সমান হয়। অধিম যুগের এই বিরাট সরীসৃপগুলির বেহের বিরাটব সম্বন্ধে মাহুবক তাক লাগাইয়া দিয়াছে ইংলণ্ডের British Museum of Natural History এর দৌলত্রে লংগুহীত Diplotocus এর জীবাত্ম। এই প্রস্তরীভূত সরীসৃপ কংকাল একটি বিশ্বকর বস হইয়া ঝাঁড়াইয়াছে। এই কংকালটি লম্বায় ৬ ফুট। তখনকার দিনের সমস্ত সরীসৃপই যে বিরাটকায় ছিল তাহা নহে। কোনো কোনোটি ইহাদের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র ছিল এবং উহাদের বেহা দ্বি পাখীর বেহা দ্বি মত কাণা এবং হাডা ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই এইগুলি ক্ষুদ্র ছিল, তবে কোনো কোনোটি আবার নদী এবং সমুদ্রের তলে অনেক দূর পর্যন্ত যাইতে সক্ষম ছিল। ইহার কোনো কোনোটি ভূগতজী আবার কোনো কোনোটি বা মাংসভোজী ছিল। ইহাদিগের বেহের অস্থিগত মস্তিষ্কের ক্ষুদ্রতা দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিভান্তই কীণ ছিল। এই জীবগুলি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ট্রায়াসিক যুগে (Triassic) দেখা যায়। তারপর জুরাসিক (Jurassic) এবং ক্রিটাসিয়ান যুগে ভূপৃষ্ঠে প্রাণাত লাভ করে কিন্তু দ্বন্দ্বপাত্রী প্রাণী পৃথিবীতে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা দিবার সাথে সাথে ইহারা লুপ্ত হইয়া যায়।

[ক্রমঃ]

কি করে ইম্পাত তৈরি হয়

[৩১]

ইম্পাত স্রুতঃ সোহা ও কার্বনের মিশ্র বাতু। তবে ইম্পাতের শক্তি ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য অল্প পরিমাণে ম্যাঙ্গানীজ সিলিকন, ফ্রেনিয়াম ও ভ্যানাডিয়াম যোগ করা হয়ে থাকে। সোহা বনিতে সাধারণতঃ অক্সাইড হিমায়ে পাওয়া যায়, আর তার সংগে যেখানে থাকে মাটি, গন্ধক, কপকরাস প্রভৃতি বর্নিজ পদার্থ। কাজেই ইম্পাত উৎপাদনে প্রধান কাজ হল প্রাকৃতিক সৌহবনিজ থেকে অক্সিজেন অথবা মুক্ত করে প্রয়োজন যত কার্বন ও অক্সিজেনিক অথ্য মিশিয়ে দেওয়া।

প্রথম দু'গে কাঠ কয়লায় সংগে বর্নিজ পিণ্ড আনিতে সোহা তৈরি করা হয়। সোহার চাহিদা; বেড়ে যাবার সংগে সংগে বেধা গেল যে এইভাবে সোহা উৎপাদন করলে চাহিদায়ত সোহা উৎপাদন করা কখনই সম্ভব হবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাক্যামি সময়ে সম্ভা এবং সংগে প্রাপ্তব্য আপানীর সম্ভান আরম্ভ হয়। কয়লাই হল এর একমাত্র উত্তর।

এ মিনিষ সহজে প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায়, মানও কম।

কিন্তু বনি থেকে কয়লা যেভাবে পাওয়া যায় সোহা উৎপাদনের পক্ষে তা উপযোগী নয়। এইজন্য কয়লা পুড়িয়ে কোক তৈরি করে নেয়া হয়। সৌহ বনিয়ের সংগে কোক জলতে থাকলে বনিয়ের অক্সিজেন কোকের কার্বনের সংগে যুক্ত হয়ে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। গন্ধক, কপকরাস প্রভৃতি অথ্য চূর্ণাপাথরের সংগে মিলে থাকে তৈরি হয়, বা ইম্পাতমিশ্রে "স্ল্যাগ" নামে পরিচিত।

একটি পূর্ণাঙ্গ ইম্পাত কারখানায় নিয়োক্ত চারটি বিভাগ থাকে :—

(১) কোক-চুন্নী—যেখানে কয়লা পুড়িয়ে কোক করা হয়;

(২) রাষ্ট কার্বেদ—যেখানে সৌহবনিজ পুড়িয়ে সোহা উৎপাদন করা হয়;

(৩) ইম্পাত উৎপাদন বিভাগ। যেখানে সোহা সংগে কার্বন ও অক্সিজেন অথ্য মিশিয়ে ইম্পাত তৈরি হয়;

(৪) রোলিং মিল—যেখানে ইম্পাত পিড়িয়ে বিক্রয়-যোগ্য ইম্পাত অথ্য রূপান্তরিত করা হয়।

এ ছাড়াও আরও অনেক আনুষঙ্গিক বিভাগ বা কারখানা দরকার, যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, স্লোয়ার প্লান্ট। যেখান থেকে রাষ্ট কার্বেদে খুব জোরে হাওয়া দেওয়া হয়, মেয়ামতি কারখানা, জল সরবরাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি।

মোটামুটি হিসাবে সোহা যায়, ১০ লক্ষ টন ইম্পাত তৈরি করতে ১৭০ টন সৌহবনিজ, ১৭০ লক্ষ টন কয়লা, ৫ লক্ষ টন চূর্ণা পাথর, ৫ লক্ষ টন ডোমোমাইট, ম্যাঙ্গানীজ বনিজ ও অক্সিজেন অথ্য প্রয়োজন হয়।

এই কারণে যেখানে ইম্পাত কারখানা স্থাপন করা হবে তার কাছে সৌহবনিজ ও কয়লা থাকা চাই। প্রচুর জল পাওয়া যায় কি না, বোগাযোগের ব্যবস্থা উপযুক্ত কি না তাও অত্যন্ত প্রধান বিচার্য বিষয়। এই সব দিক থেকেই বিচার্য করলে দেখা যাবে রাউরকেলা, ভিলাই ও চুর্ণাপুর ইম্পাত কারখানার পক্ষে উপযুক্ত স্থান।

বিশ্বের প্রধান প্রধান দেশে বিশেষতঃ যুক্তন, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও ফ্রান্সে যুগে যুগেই ইম্পাত কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। কারখানাগুলি সেখানে ক্রমেই আকারে বৃহত্তর হয়ে উঠছে। কারণ সোহা পিরেছে কারখানা আকারে বড় বড় হয়ে ওঠে উৎপাদনের ব্যয় তত কম পড়ে।

চাহিদা আর কাঁচা মাল কিস্তি পাওয়া যায় প্রধানতঃ তারই উপর কারখানার আকার আরও নির্ভর করে।

যেমন কোক চাহিয়া বেড়ে গেলে নুতন কোক-চুলী বসাতে হয়।

তবে প্রধানতঃ রোলিং মিলের আকার অনুসারেই কারখানার আকার নির্দিষ্ট হয়। ১০ লক্ষ টন ইম্পাত থেকে ১০ লক্ষ টন ইম্পাত জন্ম তৈরি হয়ে থাকে। এই কারণে কারখানাগুলির উৎপাদনক্ষমতা ১০ লক্ষ টনের কাছাকাছি হিচ কদা হয়। উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে হলে সাধারণত অসুস্থ আবার একটি কারখানা পাশে স্থাপন করে নেওয়া হয়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার অতিরিক্ত সংখ্যক ব্রাষ্ট কার্বেস বসিয়েও উৎপাদনক্ষমতা বাড়ান হয়ে থাকে।

উৎপাদন ক্ষমতা ২০ লক্ষ টনের বেশী করতে গেলে অসুস্থ অনেক অসুবিধা দেখা দেয়—যেমন পরিবহনের অসুবিধা, কাঁচা মালের রক্ত বিনিয় সন্ধান এবং পরিচালনার অসুবিধা।

যেদর দেশে ভাল খনিজ সৌধ পাওয়া যায় না সেখানে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কার্বেস বসিয়ে (লো স্কাফ্ট) ইম্পাত উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়েছে। এইভাবে উৎপাদনের খরচা বেশী পড়ে এবং দৈনিক ৫০ টন থেকে ১৫০ টন পর্যন্ত উৎপাদন করা সম্ভব। তবু গণতান্ত্রিক আধাণ রাষ্ট্র ও অসুস্থ করেকটি দেশে ক্রমেই এই ব্যবস্থা অসুস্থ হতে। বিভিন্ন ধরনের মিশ্র ইম্পাত তৈরি করার পক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানাই উপযুক্ত। কারণ এই সব বিশেষ ধরনের ইম্পাতের মোট চাহিদা খুব বেশী নয় এবং উৎপাদনের পদ্ধতিও বেশ জটিল।

সরকারী উদ্যোগে নির্মায়মান তিনটি ইম্পাত কারখানার ব্যয় মূল হিসাবে এইরূপ করা হয়েছিল :

রাউরকেলা— ১২৮ কোটি টাকা।

ভিলাই— ১১০ কোটি টাকা।

হুর্গাপুর— ১১৫ কোটি টাকা।

১৯৫৭ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে লোকসভায় ইম্পাত কারখানাগুলির ব্যয়ের সংশোধিত হিসাব পেশ করা হয়। উহাতে দেখা যায় যে, রাউরকেলা কারখানার রূপ ১১০ কোটি টাকা, ভিলাইয়ের রূপ ১০১ কোটি টাকা এবং হুর্গাপুরের রূপ ১০৮ কোটি টাকা ব্যয় পড়বে। এই

হিসাবে সহর নির্মাণের খরচ, বনি ও জমির মূল্য, পরামর্শ-হাতাঘের কি, জল ও বিদ্যুত সরবরাহ, কর্মীদের শিক্ষার ব্যয়, কারখানার অঞ্চলের বাহিরে রেলপথ নির্মাণের ব্যয়, ব্যাংক ও ভাড়া, চিকিৎসা বাবদ ব্যয়, অকলি প্রভৃতির ব্যয় ধরা হয় নাই। ইহাতে জন্ম মূল্য ও মজুরীর সম্ভাব্য বৃদ্ধির কথাও বিবেচনা করা হয় নাই।

প্রথমে অনুমিত ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হইল কারখানার বিশেষ উন্নতি সাধন, কারখানার ইম্পাত জন্ম, তপ-নিরোধক জ্বালি আয়বানিহ রূপ অতিরিক্ত ব্যয়। পূর্বে এইগুলি বেশেই নির্ধারণ করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়েছিল। তাহা ছাড়া রাউরকেলা কারখানার ক্ষেত্রে প্রথমে পরামর্শহাতাঘের পারিশ্রমিক কম করে ধরা হয়। পরে কারখানার কাজ আরম্ভ হওয়ার পর ইউরোপে শাধারণভাবে মজুরীর হার বৃদ্ধি পায়।

তিনটি কারখানার ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে মূলগত পার্থক্য বিস্তারিত। ক্রম বিশেষজ্ঞগণ যে হিসাব দেন তাতে ভিলাই কারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রীসম্বন্ধে রক্ত মোড়িয়েট ইউনিয়ন থেকে সরবরাহ করার কথা বলা হয় এবং উহাতে সরাসরি সরবরাহকারীদের দর উল্লেখ করা হয়। হুর্গাপুর কারখানার রিপোর্টে মূল কারখানা ও সরঞ্জামাদির দর ৮৭ কোটি টাকা সহ মোট ব্যয় ১১৫ কোটি টাকা ধরা হয়। তবে দর সর্বাধিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। রাউরকেলা কারখানার হিসাবে বিশেষ থেকে কারখানার প্রয়োজনীয় সকল জিনিষ ক্রয় করতে গেলে কি পরিমাণ খরচ হবে তা বলা হয়েছিল। উহাতে প্রকৃত সরবরাহকারীদের দর উল্লেখ করা হয় নাই।

প্রাথমিক রিপোর্ট পাঠ্যর পরেও প্রস্তাবিত কারখানার নক্সার অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্তন করা হয়। ইহার সবগুলিই যে উৎপাদন বৃদ্ধির রূপণ করা হয় এমন নয়। তবে পরামর্শহাতাঘের বলেন যে, যোগ্যপুঙ্খভাবে কারখানা পরিচালনা কর্তৃক প্রকৃত পরিবর্তন প্রয়োজন। উদাহরণ-রূপ বলা যায় যে, ভিলাইয়ে ভূগর্ভস্থ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়। ইহাতে এই সুবিধা হবে যে ভবিষ্যতে কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ২৫ লক্ষ টনে বৃদ্ধি

কলেও ইহার সম্প্রদায় প্রয়োজন হবেন না। ইহা ছাড়া সেখানে অতিরিক্ত একটি টার্বো-মেশিনের স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়, কারণ হঠাৎ ফোরবা হইতে বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ হইয়া গেলে এইটি হইতে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতে পাওয়া যাবে।

রাউহেলেন্ডেও একটি উপলব্ধ প্রযুক্তি নির্মাণের কারখানা স্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইহার কলে কারখানাটি সম্প্রদায়িত করা হলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে। তা ছাড়াও এখানে বৃহত্তর চালাই কারখানা, টিনিং ইউনিট, কিনিনিং লাইন স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

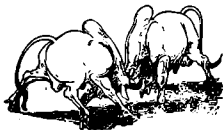
দুর্গাপুরে উন্নত ইম্প্যান্ড উৎপাদন পদ্ধতি (ডুপ্লেক্স পদ্ধতির পরিবর্তে ওপেন হার্ড পদ্ধতি) গ্রহণের কলে ব্যয় বৃদ্ধি পেরেছে। তা ছাড়া অধিকতর পরিমাণে ইম্প্যান্ড জ্বা উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে।

১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসে লোকসভার ব্যয়ের যে

সংশোধিত বিদ্যাব পেশ করা হয়েছিল প্রকৃত ব্যয় তদপেক্ষা বেশী হবে বলে মনে করবার কোন কারণ নাই।

গহর প্রকৃতি নির্মাণের শটিক ব্যয় নির্ণয় করা কঠিন। তবে এইগুলির আনুমানিক ব্যয় নিম্নে উল্লেখ করা হল :-

(ক) তিনটি গহর নির্মাণ	...	৩২ কোটি টাকা
(খ) রাউহেলেন্ড ও ভিলাইয়ের জঙ্গল বনি	...	২০ কোটি টাকা
(গ) পরামর্শদাতাদের পারিশ্রমিক	...	৮ কোটি টাকা
(ঘ) রূপ পরিবর্তনকারীদের পারিশ্রমিক	...	৪১.০ কোটি টাকা
(ঙ) কারখানার বাইরে বিভিন্ন অংশ স্থাপন ব্যয় স্বতন্ত্র প্রকৃতি	...	৪৫ থেকে ৪৬ কোটি টাকা



আর্থিক প্রসঙ্গ

শ্রীমন্তরঙ্গাসহ ভট্টাচার্য

॥ শ্রীমন্তরঙ্গাসহ ভট্টাচার্য ॥

আমাদের দেশে শ্রীমন্তরঙ্গাসহ ভট্টাচার্য এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে তো দেশের শ্রীমন্তরঙ্গাসহ ভট্টাচার্য উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অনেক কম, তার উপর ব্যবসায়ী মহলের নানা প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা বাবারে শ্রীমন্তরঙ্গাসহ ভট্টাচার্য অনিশ্চিত থাকে এবং তার দায়িত্ব অনিশ্চিত ভাবে উঠানো করে। ফলে জনসাধারণ পিষ্ট হয়। দেশের উপর শ্রীমন্তরঙ্গাসহ ভট্টাচার্য থেকে আত্মনির্ভরতা শ্রীমন্তরঙ্গাসহ ভট্টাচার্য বাতে সমভাবে দেশের সর্বত্র সমবাহ হর সেজন্য ভারত সরকার শ্রীমন্তরঙ্গাসহ ভট্টাচার্য পাইকিত্বী ব্যবসায় স্টেট ট্রেডিংএর মারফৎ চালাবার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করেছে। নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনেও এই বিষয় নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয় এবং শ্রীমন্তরঙ্গাসহ ভট্টাচার্য ট্রেডিংএর প্রস্তাব কংগ্রেস সমর্থন করে। প্রস্তাবটি প্রথমে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ থেকে নভেম্বর মাসে আসে এবং বিভিন্ন স্তরে আলোচিত হবার পর বর্তমান অবস্থায় ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সরকার প্রস্তাবটিকে কার্যে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। এখন কি ভাবে ব্যবসায় চালানো হবে সেটাই প্রশ্ন।

ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের শ্রীমন্তরঙ্গাসহ ভট্টাচার্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় ওয়াকিং গ্রুপ এই সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তৈরী করে দাখ্য সরকার পক্ষের কাছে তাদের মতামতের দস্ত পাঠিয়েছে। এই ওয়াকিং গ্রুপে শ্রীমন্তরঙ্গাসহ ভট্টাচার্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় অফিসারগণ, ছাড়া পরিকল্পনা কমিশন, রিজার্ভ ব্যাংক ও স্টেট ব্যাংকের অফিসারগণ ছিলেন। এই রিপোর্টে তারা কিছুটা গোপন্য অতিরিক্ত শ্রীমন্তরঙ্গাসহ ভট্টাচার্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন এবং আর্থের যোগান, মাল বহুতের প্রশ্ন ও পরিচালন বহুদূর দেশ অস্থিবিধা রয়েছে তার উল্লেখ

করেছেন বলে জানা গিয়েছে। ব্যবসায়িক সমস্যা তাদের মতামত পাঠালে পর এবং পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার ফলাফল ক্যান্সেলিং টো জানালে পর, সরকার শ্রীমন্তরঙ্গাসহ ভট্টাচার্য ব্যবসায় পরিচালনের ব্যবস্থা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ শ্রীমন্তরঙ্গাসহ ভট্টাচার্য ট্রেডিং প্রবর্তনের প্রস্তাব দেওয়ার সময় থেকে এ বিষয়টি নিয়ে দেশের বিভিন্ন মহলে বহু আলোচনা হয়ে গিয়েছে। ব্যবসায়ী মহল সরকারী মনোভাবকে নানাভাবে নিন্দা করেছে এবং শ্রীমন্তরঙ্গাসহ ভট্টাচার্য ট্রেডিং হলে সমস্যা আরও বেড়ে যাবে বলে তারা অনেক ক্ষুণ্ণ দেখিয়েছেন। কিন্তু দেশের সাধারণ লোক তারা সরকারের প্রতিনিষিদ্ধ নন কিংবা ব্যবসায়ী মহলের প্রতিনিষিদ্ধ নন তারা স্টেট ট্রেডিংএর প্রস্তাবটিকে আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন। শ্রীমন্তরঙ্গাসহ ভট্টাচার্য আমোদেব দেশের শ্রীমন্তরঙ্গাসহ ভট্টাচার্য ৭৫ জন লোকের সংখ্যার মোট খরচের ১০ ভাগ টেনে নিয়ে যায়। অতিরিক্ত মুদ্রাফাখোরদের হাতে পড়ে সাধারণ লোক কৃত্রিম অত্যাচার ও অস্বাভাবিক চড়া দামের মধ্যে পড়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছেন। খাজে স্টেট ট্রেডিং হলে এই মুদ্রাফাখোরেরা জন্ম হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণ স্বাভাবিক দুল্যে চালের সমবাহ্য পাবে। এতে কৃষকেরাও উপকৃত হবে, কাড়ন ভাড়া তাহের উপর জন্মের দ্বারা মুদ্রা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবে।

শ্রীমন্তরঙ্গাসহ ভট্টাচার্য ট্রেডিং জন্মই সরকারের একটি বৃহৎ প্রচেষ্টা। এতে একটিকে যেমন বহু টাকা বিনিয়োগ করতে হবে অত্যাধিক পরিচালন ব্যবস্থাও খুব ভাল হওয়া সরকার। পরিচালন ব্যবস্থার দুর্নীতি প্রবেশ করলে সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতার পর্যবসিত হবে। শ্রীমন্তরঙ্গাসহ ভট্টাচার্য ট্রেডিং করলে বিভিন্ন স্তরের সমস্ত সমাধান

হতে পারে, কিন্তু অসম্পন্ন। অর্থাৎ বায়োপ্লাস্টিক বৃদ্ধি না হলে অসম্পূর্ণতার কারণে খুব লাভ হবে না। এক্ষেত্রে সরকারকে সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, সার ও ভাল বীজের ব্যবহার এবং কৃষি-ব্যবস্থার সংস্কারের কাজ আরও দ্রুত গতিতে চালিয়ে যেতে হবে। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির এক্ষেত্রে নাগপুর কংগ্রেস যে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তা আমলে নেওয়া, কিন্তু সরকার কতটা তৎপরতার সঙ্গে কংগ্রেসের প্রস্তাবকে কার্যকরী করে, তার উপর নির্ভর করছে প্রস্তাবের সার্থকতা।

১৯৫৮ সালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯৫৮ সালের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ন' মাসে ভারতের মোট আমদানী হয় ৪৭১ কোটি টাকা। মূল্যের দ্রব্য এবং বস্তানী হয় ৪২৫ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য। পূর্ববর্তী বছরে অক্টোবর মাসে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৪৫ কোটি টাকা ও ৪১১ কোটি টাকা। আমদানী হ্রাসের ক্ষয় তার কারণের উল্লেখের কারণ হয়েছে অনেক বেশী। তবে মোট বাণিজ্যে ভারতের অতিরিক্ত মোট দেশ-টাকার পরিমাণ এ বছর ধাঁড়িয়েছে ৪৪৬ কোটি টাকা। গত ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে এর পরিমাণ ছিল ২৪০ কোটি টাকা। অতিরিক্ত দেশ-টাকার পরিমাণ কম হবার কারণ লৌহ ও ইস্পাতে, পেট্রোলিয়াম ও শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের আমদানীতে অস্বাভাবিক হ্রাস। বস্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ যদি হঠাৎ এত কমে না যেত তা হলে অতিরিক্ত দেশ-টাকার পরিমাণ আরও কমে যেত।

জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত আমদানী ও বস্তানী পদ্ধতিতে দেখা যাবে যে ১৯৫৮ সালের ১২ মাসে মোট অতিরিক্ত দেশ-টাকার পরিমাণ ২০০ কোটি ধাঁড়িয়েছে। ১৯৫৭ সালে এর পরিমাণ ছিল ৩৮০ কোটি টাকা। ১৯৫৮ সালের পরিমাণে কিছু নিম্নাতি দেখে আশ্চর্য্যের কোন কারণ থাকে উঠিত নয়, কারণ বস্তানীর পরিমাণ যদি আমদানীর কমে যায় তাহলে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের আর কোন ভবিষ্যৎ নেই।

উল্লিখিত ন' মাসে পণ্যক্রম হিসাবে বাণিজ্যে কিছু

অসম্পূর্ণ অবস্থা দেখা যায়। বস্তানী বাণিজ্যে দেখা যায়, ১৯৫৭ সালে তিনি বস্তানীর পরিমাণ ছিল ১০৬ কোটি টাকা, কিন্তু ১৯৫৮ সালের এই সময়ে তিনি বস্তানী হয়েছে মাত্র ১৮ কোটি টাকার। এর কারণ ছিল আন্তর্জাতিক বাজারে হঠাৎ তিনি হার হ্রাস এবং সরকারী সাহায্য ফিরে বিদেশে ভারতীয় তিনি বিক্রী করার একটি ভাল পদ্ধতি প্রণয়নে বিলম্ব। লৌহ ও অক্সিজেন লৌহের বস্তানী ১১২ কোটি টাকা থেকে ২০ কোটি টাকার মধ্যে এসেছে।

লৌহ বাতীত অক্সিজেন হার বস্তানী ১৯৫৭ সালের ২৬৪ কোটি টাকার কারণে ১৯৫৮ সালে মাত্র ১৫২ কোটি টাকা হয়েছে। কাঁচা পণ্যের বস্তানীও ১৯৫৮ সালে মাত্র ৭৪ কোটি টাকার হয়েছে, ১৯৫৭ সালে এর পরিমাণ ছিল ১০৮ কোটি টাকা। উদ্ভিদ তেল ও চামড়ার বস্তানীও ১৯৫৮ সালে পূর্ববর্তী বছর থেকে অনেক কম হয়। এ বছর এদের পরিমাণ হয়েছে যথাক্রমে ৬৪ কোটি ও ১০৮ কোটি আর ১৯৫৭ সালে এদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০২ কোটি ও ১৭০ কোটি টাকা। সব থেকে বেশী বস্তানী হ্রাস হয়েছে হুতী কাপড়ে। ১৯৫৭ সালে যেখানে হুতী কাপড়ের বস্তানী হয়েছিল ৪২২ কোটি টাকার দেখানে ১৯৫৮ সালে হয়েছে মাত্র ৩৪৬ কোটি টাকার। হুতীর প্রত্যন্ত বিভিন্ন জ্বার বস্তানীও এ বছর মাত্র ৩৬৪ কোটি টাকার হয় কিন্তু ১৯৫৭ সালে তার পরিমাণ ছিল ৪৬৪ কোটি টাকা। বেশী বৈদেশিক মুদ্রা আহরণকারী পণ্যের মধ্যে চায়ের বস্তানী ১৯৫৭ সাল থেকে এ বছর সামান্য বেশী হয়েছে। এ বছর চায়ের বস্তানী হয় ৮২২ কোটি টাকা, আর ১৯৫৭ সালে হয়েছিল ৮৪২ কোটি টাকা। তামাকের বস্তানীও এ বছর কিছু বেড়েছে ১০২ কোটি থেকে ১০৮ কোটি টাকা হয়েছে। গত ন' মাসের পদ্ধতি হিসাবে বলা যায় ১৯৫৮ সালে পূর্ববর্তী বছর থেকে প্রায় ৭৫ কোটি কম টাকা বস্তানী হয়েছে।

আমদানী বাণিজ্যে অনেকক্ষেত্রেই বিশেষ লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। সরকারী লৌহ ও ইস্পাত কারখানার প্রয়োজনীয় লৌহক্রমা গত বছর বেশীর ভাগ আমদানী হওয়ার এ বছর লৌহ জ্বার আমদানী ৫০ কোটি টাকা কম হয়। শিল্পের কাঁচা মাল আমদানীও এ

বছর অনেক কম হয়। ভোগা জীবের আয়তানও এ বছর খুব কম হয়। একমাত্র খাদ্যজাত্য ও মাংসের আমদানী এ বছর পত্ত বছরের তুলনায় লক্ষণীয় ভাবে বেশী হয়। পত্ত বছরের তুলনায় এ বছর খাদ্য আমদানী ৩৩ কোটি টাকা বেশী হয় আর সারের আমদানী বেঁচে হয় ৩৬ কোটি টাকা।

বৈদেশিক বাণিজ্যের আলোচনা থেকে একটা কথা বেশ পরিস্কার বোঝা যায় যে আমদানীর পরিমাণ হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি না হওয়ার ফলে দেশের ঠান্ডি পাওনার উপর আরও চাপ পড়বে। এই অবস্থার উন্নতি করতে হলে রপ্তানীর পরিমাণ আরও অনেক বাড়িতে হবে এবং সেজন্য সরকারী রপ্তানী বৃদ্ধি পন্থাকে সমস্ত বিঘ্নটি হুতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করে কর্তব্যস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৷ চিনির কারখানার কলকজা তৈরী ॥

আমাদের দেশের চিনির কারখানাগুলি অধিকাংশই অতি পুণাতন কল-কজা দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে উৎপাদন বরচ বেশী পড়ে। আন্তর্জাতিক বাজারে চিনির দাম অনেক কমে গিয়েছে। যে-সব দেশ আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে অল্প খরচে চিনি উৎপাদন করেছে তারাই আন্তর্জাতিক বাজারে প্রভুত্ব করছে। কাজেই ভারতের সেখানে সফটপূর্ণ অবস্থা। এ অবস্থার উন্নতির জন্য চিনির উৎপাদন বরচ কমানো দরকার। এর জন্য প্রথমতই দরকার আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয় পদ-ব্যবসায়ী পরিকল্পনায় চিনি শিল্পের উন্নয়নের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তার মধ্যে ২০ কোটি টাকা নিষিদ্ধ করা আছে চিনি শিল্পের কলকজার জন্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরুতে মাত্র ৬টি প্রতিষ্ঠান চিনির কারখানার কল-কজা তৈরী করত। এর পর ১৯৫৫-৫৬ সালে আরও ৪টি প্রতিষ্ঠান চিনির কারখানার কল-কজা তৈরীর জন্য সরকারের আর্থিক সাহায্য লাভ করে। চিনির কারখানার কলকজা তৈরীর বর্তমান পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সম্পর্কে

কোন ধরনের তথ্য দায় না। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের ১৯৫৭-৫৮ সালের বাৎসরিক রিপোর্ট থেকে ১৯৫৭ সালের শেষ পর্যন্ত চিনির কারখানার কল-কজার উৎপাদনের অবস্থা জানা যায়। ১৯৫৭ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অনেক বেশী টাকার কলকজা তৈরী হয়। ১৯৫৬ সালে উৎপাদিত কলকজার মূল্য ছিল ৩২ লক্ষ টাকা আর ১৯৫৭ সালে উৎপাদিত হয় ১৬২ লক্ষ টাকা মূল্যের কলকজা। ১৯৫৭ সালে ১২টি প্রতিষ্ঠান কলকজা উৎপাদন করেছে আর ১৯৫৬ সালে করেছিল মাত্র ৭টি প্রতিষ্ঠান।

কাছারীরা মশে সরকারী উদ্যোগে দিল্লীতে ৬টি চিনির কলকজা তৈরী প্রতিষ্ঠানের, ১২টি চিনির কারখানা, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত্বাবধায়ক সমূহের এবং কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি, সমাজ-উন্নয়ন ও সমবায় এবং বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে চিনির কারখানার কলকজা প্রস্তুতের কাজ ঘরানিত করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য একটি অধিবেশন হয়ে গিয়েছে। এই অধিবেশনে ১২টি প্রতিষ্ঠানকে (এর মধ্যে ১১টি সরকারী প্রতিষ্ঠান) চিনি তৈরীর জন্য ১২টি পূর্ণাঙ্গ চিনির কলকজা সরবরাহ করা হবে। এই কলকজা দুটি উৎপাদক সংস্থা উৎপাদন করবে। বাৎসরিক কারখানার মধ্যে ৪টি ১৯৬০-৬১ মরক্তমে সরবরাহ করা হবে এবং বাকি ৮টি পরবর্তী মরক্তমে সরবরাহ করা হবে। এই ১৭ কলকজার মোট দাম ১১ কোটি টাকা পড়বে এবং তাতে দেশীয় উপাদান থাকবে শতকরা ৭৫ ভাগ। এই দামের জন্য প্রতিটি সময়ের চিনি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ২০ লক্ষ টাকা অনশীকারেইর কাজ থেকে সম্মত হবে এবং বাকি টাকা ইন্টারস্ট্যাটাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন, সমবায় ব্যাংক এবং রাজ্যসরকারের কাছ থেকে (সেয়ারেইর দ্বারা হিসাবে) ঋণ গ্রহণ করা হবে। সরকারের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। চিনির কারখানার কলকজা বেশে প্রস্তুত হলে কেবলমাত্র যে উৎপাদনই বাড়বে তাই নয়, বিশেষ থেকে কলকজা আমদানী বন্ধ হওয়ার ফলে বহু বৈদেশিক মুদ্রাও বেঁচে যাবে এবং উৎপাদন বরচও আশা করা যায় কম পড়বে।



॥ ২৬শে জাম্বুয়াগি ॥

২৬শে জাম্বুয়াগি সর্বত্র সাধারণতঃ বিংশ পালিত হয়েছে। জনসাধারণের স্বতন্ত্র উৎসাহ আশা ও আনন্দের বাণী বহন করে এনেছে। কিন্তু শুধু আনন্দ নয়, হৃদয় চেতনা এবং কর্মপ্রবণতার প্রয়োজন আজ প্রবল। বঙ্গ কর্মীর বহু ত্যাগীর নিষ্ঠার ও আত্মত্যাগে আনন্দা স্বাধীনতা পেয়েছি এবং সাধারণতঃ রচনা করেছে। ঐরা আজকের এই শুভদিনের জন্য জীবন দিয়ে আয়োজন করে গেছেন তাঁরা মনস্ত, চিত্তবলীরা। তাঁদের দান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শ্রদ্ধা করি। তাঁদের আত্মকর্মে রূপ দেবার জন্য কৃতনংকর হই।

॥ গান্ধীজী ও নেতাজী ॥

২০শে জাম্বুয়াগি নেতাজীর জন্মদিন। ৩০শে জাম্বুয়াগি গান্ধীজীর দুই দিন। দুই দিনে সেন্থানী ঐ দুই মহান নেতার প্রতি উদ্‌ঘোষন করেছে। গান্ধীজীর কাছে আশ্রয় পেয়েছি বাঙালীভিক্ষুরে আশ্রয় সত্যের প্রতিষ্ঠা, নেতাজীর কাছে পেয়েছি বাস্তব বাঙালীতির হুলাসিক অভিগান। স্বাধীনতার ইতিহাসে উভয়ের দান উজ্জল অক্ষরে চিত্রবিন লেখা থাকবে।

॥ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ॥

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তিনি শুধু ভারতের নয়, বরং প্রথম বৈজ্ঞানিকই ছিলেন না, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে এবং ভারত-সরকারের পরিকল্পনা উপদেষ্টারূপে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে-

ছিলেন। শিক্ষা ও গঠন-কর্মের মধ্য দিয়ে দেশের সেবা ছিল তাঁর ক্রত।

॥ ডাক্তার চন্দ্রাবরকার ॥

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাধিক্ষেত্রে তাঁর ভাষণ শেষ করে বোম্বাইয়ে ফেরার পথে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ চন্দ্রাবরকার অকস্মাৎ দুঃস্বপ্নে পতিত হন। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং কর্মনিপুণতা সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। দেশের শির যাদিগের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এ ধরনের মনবী কর্মীর আমাদের বেশী নেই। ভারত—বিশেষ করে বোম্বাই—তাঁর অভাব গভীরভাবে অনুভব করবে।

॥ চাউলের বাজার ॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাউলের দাম বেঁধে দিতে না দিতেই নানান স্থানে বাজার থেকে চাউল উঠাও হয়ে গিয়েছে। রাতারাতি কি করে লব কিনিব উঠাও হয়, সে বিষয়ে কিনারা আজও হয়নি। ব্যবসায়ীরা ধানের দর বাড়তে বলেছেন, সে সম্বন্ধে সরকারী বিবৃতিতে বলা হয়েছে : এ দাবি অসম্ভব। গত বছর যা পাইকারী দর বেঁধে দেওয়া হয়েছিল এবারেও তারই ভিত্তিতে দ্বালা নির্ধারণ হয়েছে। ধানের দাম বাড়ালেই বাজারে চাউলের দরও বাড়বে। ফলে, বাজার থেকে বাজার চাউল কিনে খেতে হয়, তাহলে সকলেরই অসুবিধা হবে। ছোট চাষী, ক্ষুদ্র-হীন কৃষক—এরূপে বিপথে পড়ল কারণ এদেরও চাউল কিনে খেতে হয়। গতপর্বদে দেশের যেকোনো মাথা প্রতি

চাউল ও গমের বহুদ্য বাড়িয়েছেন। মনে হয়, জনসাধারণের শব্দযোগিতা পেলে সুতর্কমেন্ট সাবমারিনের চক্রান্ত ভেঙে দিতে পারবেন।

জনসাধারণও তাই চায়। 'থানেন্ট না চাউলের ধান কি বড়ো উচিত, গভর্ণমেন্ট তা বিশেষভাবে সজ্ঞা আলোচনা করে দ্বিধা করুন; কিন্তু নিষিদ্ধ হবে যদি সমস্ত হয় তবে কোনও হুমকিতে তার পরিবর্তন করা উচিত নয়। শুধু চাউলের মাঝেই নয়, সকল পণ্যের বাজারে আদ্য বড় বাণিজ্যব্যবহাৰ জোট চলেছে। সাধারণের স্বার্থ পরদর্শিত হচ্ছে। কঠোর শাসন ছাড়া এর প্রতিকার নেই। অবশ্য সে কঠোর শাসনের সঙ্গে বিচক্ষণতার প্রয়োজন আছে।

৪। ধর্মঘট।

চতুর্দিকে ধর্মঘটের হুঁড়ুক। কয়েকটি কলেজে ছাত্রদের মাইনে বাড়ানো হয়েছে বলে হলো প্রজেক্ট-ধর্মঘট, আন্তর্জাতিক ইন্দোপাকিস্তানের কর্মচারীদের বেতন হ্রাসের বাবিত্তে চললো ধর্মঘট, তাদের দাবির সমর্থনে দলল ইন্দোপাকিস্তান আসন্ন ধর্মঘট, আরও ছোটখাটো ধর্মঘটের ত্তো কথাই নেই। জনসাধারণ পথে পথে বিস্তৃত, বিপন্ন, অর্থচ নিষ্কপায়। ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির নিদর্শন প্রতি মুহূর্তে চোখে পড়ছে। এর মধ্য দিয়ে কি আসবে কোন কল্যাণ?

শেখবাসী দ্বিত্বিত্ব এ অশান্তির মুখ্য কারণ, সম্ভব নেই। কিন্তু কাল বন্ধ করাই কি তার একমাত্র প্রতিকার? ধর্মঘট চরম অস্থি, নিবিজারে যখন-তখন প্রয়োণ করা উচিত নয়। বর্তমান ক্ষেত্রে অনেকগুলি অন্তত লক্ষণ একটু হয়ে উঠেছে। তলেতী ধর্মঘটে ছাত্রদের পড়ানোর কীট হেবার আগ্রহ, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপৌত্ত; সরকারের কলেজ-কর্তৃপক্ষের অপদৃষ্ট কভার উৎসাহ; কলেজ-কর্তৃপক্ষের শিক্ষা বা শিক্ষকের উগ্রত সাধনে নিদৃষ্টতা। ইন্দোপাকিস্তানে—একদিকে বোঙ্গীদের সম্বন্ধে নার্স ও অস্ত্র কন্নীতের দ্বিত্বিত্বব্যবহানতা, অস্ত্রধিক কন্নীতের কীমোপায় সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সহায়হুঁত্বপূর্ণ বিবেচনার অভাব। উভয় পক্ষের সুবিবেচনা থাকলে বোধহয় আপোষ মীমাংসা অসম্ভব হ'ত না। ইন্দোপাকিস্তানে, জনস্বার্থ বোঙ্গীদের

মতের মূখ্য ত্তেলে দিয়ে কাল বন্ধ করতে ইচ্ছার আটকান না, তাঁরা এ সেবাত্তের পথে না এলেই তাপো করতেন।

৫। ইন্দোপাকিস্তান।

কোনও পত্রিকায় কন্নীত পত্রলেখক লিখেছেন: চুঁচুড়া ইন্দোপাকিস্তানের নতুন স্বত্বক বাড়ী বেধে মন শুনী তর; কিন্তু প্রাধিক বক্তৃতাধা তুলো, পূর্ণ এধা বিধি আবর্তনা বেধে সা বিনবিন করে।

এ অধিকতা কেবলমাত্র চুঁচুড়ার নয়, প্রজেক্ট ইন্দোপাকিস্তানেই হবে। মেডিক্যাল কলেজ ইন্দোপাকিস্তানের প্রাধিকণও এধ কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না। দ্বিত্বিত্ব বোগ সাগতে ধান তাঁদের পথে পথে সম্বস্ত হতে হয় পাছে কষ্টমতর কোনও সাম্রাজ্যিক বোগের বোজাপু নিয়ে আসেন। ইন্দোপাকিস্তান পত্রিকার সাধারণ দ্বিত্বিত্ব কি কারও নেই? বোগ পত্তীকার এধ চিকিৎসাধ সুব্যবস্থা ত্তো নেইই, উপরন্তু আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আসত হ'লে ইন্দোপাকিস্তানকে আবোধ্য নিষেতন নয়, স্বত্বাপত্তী ব'লে মনে হতে থাকে।

৬। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তান।

সম্প্রতি এই দুই বেধে ব'লে ভূমি বিনবিন হতেছে তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার প্রিয়ন্ত লশাশশেধর সান্ত্রাল গুস্তত্তর অতিবোগ করেছেন। ইতিপূর্বেই যখন পত্তিত নেহরু ভূমিবিবিনিময়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন তখন এবল প্রতিবার উঠেছিল। তাংয়ের ইঠাং একদিন মরকারীভাবে বিনিময়ের ব্যবস্থা হ'য়ে গেলে, শেখবাসীধ মতামত নেওয়া হ'লো না। ব্যাপারটো আশ্চর্য এধ হুংগমক। সুনিদ্যাবোধের ৩... একর কন্নি পাকিস্তান পেলো। এ অতল বস্তাবব পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্হুস্ত ছিল, হু-হু-হু-হু এধাধে নিধাচন হয়ে গেছে, ব্যাগে-বোয়দ্যে অসুসাধেও এধাধে নিয়ে বিস্তর্কের কোন অবকাশ ছিলনা। বলা হয়েছে, এর পরিবর্তে নাকি পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে সুনিদ্যাবোধের চরমসম্পাণপূর্ণ। বস্তত: চরমসম্পাণপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গেই ছিল, সুত্তরাং মনুন ক'রে পাবার কথা গুঠে

চাউল ও গমের বয়স্ক বাড়িয়েছেন। মনে হয়, জনসাধারণের শরৎযোগিতা পেলে গুণগমেই ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত ভেঙে দিতে পারবেন।

জনসাধারণও তাই চায়। যানের বা চাউলের যান কি বয়স্ক উচিত, গুণগমেই তা বিশেষভাবে সজ্ঞা আলোচনা করে দিতে পারেন; কিন্তু মিথিষ্ট হয় যদি সত্য হয় তবে কোনও সমস্যাতে তার পরিবর্তন করা উচিত নয়। শুধু চাউলের বাজারে নয়, সকল পণ্যের বাজারে আর বড় ব্যবসায়ীদের ষোট চলছে। সাধারণের দ্বারা পণ্যবলিত হচ্ছে। কঠোর শাসন ছাড়া এর আতিকার নেই। অবশ্য সে কঠোর শাসনের সঙ্গে বিচক্ষণতার প্রয়োজন আছে।

৬. ধর্মঘট।

চতুর্বিধ ধর্মঘটের ইতিহাস। কয়েকটি কলেজে ছাত্রদের মাইনে বাড়ানো হয়েছে বলে হলো প্রতিক-ধর্মঘট, আর-বি-কর হাঁসপাতালের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে চললো ধর্মঘট, তাদের দাবির সমর্থনে সকল হাঁসপাতাল আশ্রয় ধর্মঘট, আরও ছোটখাটো ধর্মঘটের তো কথাই নেই। জনসাধারণ পথে পথে বিব্রত, বিপন্ন, অথচ মিস্ত্রিপায়। ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির নিবর্ণন এতি মুহূর্তে চোখে পড়ছে। এর মধ্য দিয়ে কি আগুন কোন কল্যাণ?

দেশব্যাপী দারিদ্র্য এ অশান্তির মূল কারণ, সন্দেহ নেই। কিন্তু কাজ বন্ধ করাই কি তার একমাত্র প্রতিকার? ধর্মঘট চরম অস্ত্র, নিবিচারে দমন-তখন প্রয়োগ করা উচিত নয়। বর্তমান ক্ষেত্রে অনেকগুলি অস্ত্র লক্ষ্য একটু হয়ে উঠেছে। কলেক্টর ধর্মঘটে ছাত্রদের পড়াশোনার ঠিক দেবার আশ্রয়, উচ্চশিক্ষাও অসীম; সরকারের কলেজ-কর্তৃপক্ষকে অপরাধ করার উদ্দেশ্য; কলেজ-কর্তৃপক্ষের শিক্ষা বা শিক্ষকের উন্নতি সাধনে বিরুদ্ধতা। হাঁসপাতালে—একবিধে রোগীদের সন্ধ্যে নার্স ও অন্ত্র কন্নীদের দায়িত্ববোধবিন্যাস, অস্ত্রবিধে কন্নীদের জীবনোপায় সন্ধ্যে কর্তৃপক্ষের সহায়ত্বপূর্ণ বিবেচনায় অভাব। উত্তর পক্ষের সুবিবেচনা থাকলে বোধহয় আপোষ যৌমাসো অসম্ভব হ'ত না। হাঁসপাতালে, অসহায় রোগীদের

মরণের মুখে ঠেলে দিয়ে কাজ বন্ধ করতে ইচ্ছার আটকায় না, তাঁরা এ দেহান্তরের পথে না এলেই ভালো করতেন।

৭. হাঁসপাতাল।

কোনও পত্রিকার কঠোর পত্রলেখক লিখেছেন: চুঁচু হাঁসপাতালের নতুন শুদ্ধ বাড়ী দেখে মন খুশী হয়; কিন্তু প্রাণে রক্তমাখা কুলো, গুলি এবং বিবিধ আঘাতের মধ্যে গা ঘিনঘিন করে।

এ অতিভয় কেন্দ্রমাত্র চুঁচুড়ার নয়, প্রত্যেক হাঁসপাতালেই হবে। মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালের প্রাণেও এত কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না। দীর্ঘা যোগ মারাত্মক যান তাঁদের পথে পথে সমুদ্র হতে হয় পাছে কঠিনতার কোনও সংক্রামক রোগের বীজাণু নিয়ে আসেন। হাঁসপাতাল পরিষ্কার বাতাসের হাওয়া কি কারও নেই? রোগ পরীক্ষার এবং চিকিৎসার সুব্যবস্থা তো নেইই, উপস্থিত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আসত হ'ল হাঁসপাতালকে আযোগ্য নিকতন নয়, দুঃখপূর্ণ ব'লে মনে হতে থাকে।

৮. পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তান।

মস্তি এই দুই দেশে যে ভূমি বিনিময় হয়েছে তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার ঐক্যবদ্ধ সদস্যদের সাক্ষাৎ গুরুতর অভিযোগ করেছেন। ইতিপূর্বেই এখন পণ্ডিত নেত্র ভূমিবিভাগের কথা উল্লেখ করেছিলেন তখন এতল প্রতিবাদ উঠেছিল। তারপর ইঠাৎ একদিন সরকারীভাবে বিমিনয়ের ব্যস্থা হয়ে গেল, দেশবাসীর মতামত নেওয়া হলো না। ব্যাপারটা আশ্চর্য এবং দুঃখজনক। সুশিলাবাদের ৪০০ একর ভূমি পাকিস্তান গেলো। এ অঞ্চল বরাবর পশ্চিমবঙ্গের অস্ত্রভুক্ত ছিল, দু'দু'বার এখানে নিরাচন হয়ে গেছে, ব্যাংক-বায়েরাও অস্থায়ের এখানে নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ ছিল না। বলা হয়েছে, এর পরিণতি নাকি পশ্চিমবঙ্গ পোয়ছে সুশিলাবাদের চরমব্যাংকপূর্ণ। বর্তমানে চরমব্যাংকপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গেই ছিল, সুতরাং নতুন করে পাণ্ডার কথা ওঠে

না। শ্রীযুক্ত সাত্তাল হেমচন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রবল প্রতিবাদ জানান এবং পাঠ্যক্রমের সংকট আর একবার বোকাপড়া কববার প্রস্তাব করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি সুচীনিষিত বিভাগের উপস্থিতি ওনার তাকেই আমি সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেন।

৷ কর্পোরেশন-কলঙ্ক ৷

কর্পোরেশনের কেলেকারির অন্ত নেই। কখনও চোরা-ছোড়াছুড়ি, কখনও বিদ্রোহপ্রিয় মন্তব্যের চাটুতা।

এবারে কবিশমারকে নিয়ে বিকল্পপন্থের দড়িটানাটানি। যোগ্যতা দেখো, রাখো, অযোগ্যতা দেখো, ছেড়ে দাও। চূপকালি লেগে দেবার উদ্যোগ আরো এবং রাখা ও ছাড়ার টানা-পড়েন বড়ই বিজ্ঞি লাগে। এক বিচারক তার হিসেন তাঁকে অপসৃত করতে হবে, অস্বাভাবিক তার হিসেন, অপসৃত করা চলবে না। শেষকল কি ধাঁড়াবে জানি না। কিন্তু এই ঝগড়া বিধায়ে কর্পোরেশনের কাজ কি ব্যাহত হচ্ছে না এবং কবিতাতারা কি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না ?



একবিংশ বর্ষ

চৈত্র, ১৯৬৩

ষাটশ সংখ্যা

মজা পূজা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকবচী'তে ক্ষমা পুষার কথা আছে। বসন্তঃ দ্রুমিগা জুড়ে এই ক্ষমা পুষার আড়ম্বরই চলছে। ক্ষমা বাব প্রতীক, তার প্রতি দৃষ্টি নেই। লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ্য হয়ে উঠেছে বড়ো। দেবতার চেয়ে প্রতিমা বড়ো; ভক্তির চেয়ে উপচার বড়ো। এই তো পৌত্তলিকতা। প্রতিমা দেখানে দস্ত উপলক্ষের সন্ধান, যেখানে তো পৌত্তলিকতা নেই। ভগবানকে ভুলে যখন মন্দির মন্দির বা গির্জার খোঁজ খোঁজ আশ্রয়তা ছই, তখনই পৌত্তলিকতা। সেই বিভ্রান্তিই তো ছদ্মবেশে কিংবে সর্বত্র। মানুষের চেয়ে আর যোগ্যতমের কথা বৈশি, ছদ্মবেশের চেয়ে বিরোধিতার বৈশি-সন্ধান।

এই অসঙ্গতি ঘোচাবার মতে বাবে বাবে মহাপুরুষেরা এসেছেন। আমরা মহাপুরুষের পূজা শুরু করে করে দিয়েছি, তাঁদের আর্চনের অহুসরণ করিনি। ধর্ম থেকে রাজনীতি—মকল ক্ষেত্রই তার দৃষ্টান্ত হিসেবে।

এ ক্ষমা পুষার শেষ হবে কবে? ভাবগ্রন্থতা বা প্রচ্ছন্ন অর্থনিকার হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে কবে মানুষ আপনাকে চিনবে, অন্তরাঙ্গার হিকে তাকাবে? অধুনা তবিলিতে তার তো কোনো আভাস চোখে পড়ছেন।

একদিন মানুষ ভেবেছিল, ধর্মের গোঁড়ামি মানুষকে অন্ধ করেছে; বিজ্ঞানের অন্ধন-শলাকায় তার দৃষ্টি মূলবে। তাই বা হ'লো কোথায়? বিজ্ঞানের গোঁড়ামিও মানুষের চোখে আবরণ টেনে বিশো। যা নিত্যের কাছের যা মূল বাস্তব, মানুষ তাকেই সত্য ব'লে জানলো এবং মানলো। যদিও বিজ্ঞান অহংহ ব'লেছে, প্রত্যক্ষের মধ্যেই সত্য। লীমাবন্ধ নয়, তবু আশ্রয় ক্ষুদ্র জ্ঞান নিয়ে আশ্বাসন করছি।

সাম্যের বাণী এসেছিল মানুষের দুঃখ দুর্গতি মোচনের উদ্দেশ্য নিয়ে। অথচ তার পতাকাবাহীরা কি বুকের আয়োজন কম করেছে? মধ্যযুগের ধর্মযুদ্ধ, এ যুগের শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম—চুইই রক্তপকে গিছল ক'রেছে পথ।

শুধু বুলি নিয়ে বর্ণা বর্ণের সমতার সমাধান হবে না। ব্যক্তিকে হ'তে হবে সচেতন, আত্মবিশ্বাসী, ঐতিহাসিক। যে-কোনো ক্ষেত্রে সত্যকার পূজা আপন মনোমন্দিরে, বাহ্যিকতার ভিত্তি নয়। মজুর-জাতকে ভালোবাসার আগে একটি মজুরকে ভালোবাসতে হবে। মানবতার বাণী শোনানোর আগে যে মানুষটি চোখের সামনে না গেয়ে মনছে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে।

কিন্তু সে হিকে যন কই আমাদের? সামগ্রিক কল্যাণ চিন্তার আড়ালে ব্যক্তির কল্যাণ যাচ্ছে হারিয়ে। মানুষ হিসাবে মানুষকে দেখবার প্রবৃত্তি আমাদের আগেরা ব'লেই হয়, অথচ ধর্মমত করে মানান্দ নামের বুলি আঁড়িয়ে পণ্যবস্তার মিছিল বা'র করছি। এখিক থেকে ক্ষমা পুষার আয়োজন বেড়ে গেছে। সাবেকী লোকেরা এত 'বাব' ও 'দাম্পত্য' নাম জ্ঞানতেন না, আত্মীয়-পরিজন প্রতিবেশীর সুখদুঃখের খবর রাখতেন, বরকার হ'লে পাশে গিয়ে পাড়াতেন। আজ সে মনোভাব প্রায় স্তব্ধহিত, নব নব ভাববিশ্বাসে আমরা বিভোহ। ব্যক্তিগত আরাধ আর দলগত সংগ্রামের এই পথেই কি লক্ষ্য পৌঁছতে পারবো? ছদ্মবেশে বাব দিয়ে যে মত, যে পথই বেছে নিইনা কেন, সে কি শ'স বাব দিয়ে খোশা বড়ো করার শাবিল হবে না?

মানব কল্যাণে জীবাণু

ডাঃ সেলম্যান এ, ওয়েকস্ম্যান

(মাকিন হুটগার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাণুতত্ত্বের অধ্যাপক)

জীবাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষ অদ্বৈত হবার অনেক আগে থেকেই জীবাণু নানাভাবে মানুষের দেখা করে আসছে। সেই অতীতের বাবরের মানুষ বেশ থেকে বেশিতে ঘুরে বেড়িয়েছে তাদের গবাধি পত্ত তেড়া ও তৃণভোজী প্রাণীদের লক্ষ দ্রামল প্রত্যয়ের সন্ধান। সেদিন তাদের দুঃসংস্কারের জন্য নির্ভর করতে হত এই জীবাণুর উপর। ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেরিয়া হুকে টক করে হই করে হিত আর তাতে দুঃ পচতে পারত না।

তাদের মানুষ বর বাঁচতে শিখল, চমির উপর নির্ভর করতে লাগল—শস্ত্র তার অস্ত্র চিত্রা যোজাল। এবার তাৎসাহ্যিকের লক্ষ এগিরে এস নূতন ধরনের জীবাণু।

'লেডন' নামে বিশেষ গাঁজলা মানুষকে ক্রটি তৈরি করতে সাহায্য করল। অস্ত্রাত্ম জীবাণুরা আত্মে গাঁজলা হুটি করে যোগাল পানীয় মদ, খাদ্যভক্ষ থেকে তৈরি হল দ্রিয়ার। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আরও জীবাণু দিন রাত পরিভ্রম করছে মানুষের ক্ষেতে—শস্ত্রের ক্ষেপে বেগরা অংশকে নষ্ট করেছে তার—বাহ্যাহারযোগ্য নাইট্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস করেছে। আর এইভাবেই শস্ত্রের পুষ্টির লক্ষ প্রয়োজনীয় যোগ্যক যোগাতে তার সাহায্য করেছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে—বিশেষ করে পত্ত শতাব্দীর শেষার্ধ্বে—জীবাণু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান একটা স্তরবৃদ্ধি বৈজ্ঞানিক অনুপদ্ধানের রূপ নিল। লুই পাস্ত্যর, ক্যাডিমাক্স কোকোথ, রবার্ট কচ, এথলিক এবং অন্যান্য বহু বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফলে মানব জীবনে জীবাণুর বিশিষ্ট স্থান অধিদখাধিতভাবে বীকৃত হয়েছে। মোটামুটি দুইশতাব্দীর জীবাণুর অস্তিত্ব যেনে সেওয়া হয়েছে—এক ধরনের জীবাণু অদ্বৈতভাবে কাল থেকে মানুষের মধ্যে নানা ধরনের রোগ ছড়িয়েছে, বহুত আসছে। গৃহপালিত পত্ত এবং ক্ষেতের শস্তও এই সব জীবাণুদের দ্বারা থেকে রেহাই পায়নি। এইসব জীবাণুর সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে হবে, তাদের ধ্বংস করতে হবে। আর এক ধরনের জীবাণু

নানাভাবে গাঁজলা হুটি করে। ফলে মানুষের জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক নানা ধরনের রাসায়নিক জব্য তৈরি হয়। এদের বৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ চেষ্টা করতে হবে।

প্রাচীন যুগে মানুষ মনে করত ব্যাধির মূল হল দেবতা বা হানব। লেজ্ঞ বৈববাবীর লক্ষ তার আত্মতির শেখ ছিল না, হানব দুঃ কবাব লক্ষ চলত নানা প্রচেষ্টা। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের সেই আধিম বীতিনীতির পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক পদ্ধতিতে পরিভার পরিভ্রমতা বক্ষা ও রোগ সংক্রমণ রোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে—বিশিষ্ট ধরনের রাসায়নিক জব্য ব্যবহার করে দেহটির নিয়ন্ত্রণ আজ সম্ভব হয়েছে। প্রথমে কুইনাইনের মত কয়েকটি ভেবল জব্য, নানা ধরনের চীকা, বিশ্বনাশক ঔষধ ও পিডাথের সাহায্যে বনল, ডিপরিভিগা, নিউমোনিয়া ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করা হত। বীরে বীরে ক্রমিক রাসায়নিক জব্যের সাহায্যে এতগুলি সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় বা উৎসাহের পরিবর্তে নূতন রাসায়নিক জব্য চালু করা হয়। যেমন পাড়া ও আনেনিক থেকে তৈরি বৌগিক জব্য দিয়ে সাঙ্কলের সঙ্গে যৌনব্যাবি চিকিৎসা সম্ভব হয়েছিল। পদ্ধক হতে ঔষধ তৈরি করার পর থেকে গ্যাকিলোসাস ট্রেন্ডো ককি এবং এন্টেরিক ব্যাকটেরিয়া ঘটত অসংখ্য রোগের চিকিৎসা সম্ভব হয়েছে। সেই সঙ্গে ভাল জীবাণুদের উন্নয়ন ও তাদের মানুষের উপকারে লাগাবার লক্ষ কাজ চালান হয়। অসংখ্য নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়েছে। ব্যাপক হারে জীবাণু বৃদ্ধি করা হয়েছে, উত্তির ও অধির বক্ষার লক্ষ তাদের ব্যবহার করা হয়েছে। আধুনিক শিল্প যুগের উন্নয়নের লক্ষ আজ নানা ধরনের সুগাম, লৈজ, এসিড এবং এসিটোনের মত অন্যান্য রাসায়নিক জব্য ব্যাপক হারে তৈরি হয়েছে। নানা ধরনের এন্থাইম ও ভিটামিন, বিশেষ করে বি৬ ও বি১২ তৈরি করার লক্ষও এতগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। কলাই আতীর লক্ষ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাব করার সঙ্গে চালীর

প্রভূত উপকার পাখিত হয়েছে। জীবাণু সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের ফলেই আজ মন চোলাই, পনির ও অন্যান্য খাদ্য শিল্পে এক ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। আজ মানুষের সেবার জীবাণুকে যে কতভাবে লাগান হচ্ছে তা বলে শেষ করা যায় না। খাদ্য সংরক্ষণ থেকে শুরু করে নগ্নাচার জল্লাল সাক, সব কালেই জীবাণুই সাহায্য নিতে হচ্ছে।

এইভাবে জীবাণুকে মানুষের নিঃশ্রমে আনা হয়েছে। কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবাণুকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। ভাল আর খারাপ জীবাণু মিলিয়ে তা করা হয়েছে। মানুষের উপকারের ক্ষত ভাল জীবাণুদের সঙ্গে যুক্ত চালিয়েছে, গরী হয়েছে। ভাল জীবাণুই নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি করে। কতকরা ও ধর্মোদ্ভব জীবাণুদের উপর এইভাবেই চরম আঘাত হানা সম্ভব হয়েছে। এদই ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও পদ্ধতিতে ব্যটেছে বিপ্লব। একদিন যেন রোগের ফলে মানব জাতি ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাচ্ছিল আজ তাবের নিঃশ্রম করা যাচ্ছে। কলেরা ও মলের মড়কে আগে এত লোক মারা যেত যে মানুষের ইতিহাসে বত বুদ্ধ হয়েছে তাতে অন্ত মানুষ মরে নি। কিন্তু আজ আর এই সর রোগ তত ভয়াবহ নয়। শিশুদের রোগ প্রায় নেই বললেই চলে। আত্মিক প্রবাহ, গলায় রোগ এবং অন্যান্য অন্যান্য সংক্রামক রোগ এখন আর আগের মত বিপর খটতে পারে না। মানুষের আর অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। এমন কি দম্বা বা প্রোটোজোয়িক যুগ থেকে সব থেকে বেশী মাংসাত্মক রোগ বলে পরিগণিত হয়েছে, যা বতলে পড়ে পর্যাধিক লম্বাচ লোক প্রাণ হারিয়েছে—একবারে নিঃশ্রিত হয়ে চলেছে।

রোগ উৎপাদক জীবাণুদের সঙ্গে যুক্ত করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা কতকগুলি পরিবর্তনশীল জীবের আছে বলে জানা গিয়েছে। জার্মানিক কালের এ হল অত্যন্তম জটিলত্ব আবিষ্কার। মাত্র বিশ বছর আগে এ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। কৃষি, ব্যাকটেরিয়ার এবং ব্যাকটেরিয়ার টেস্টের মধ্যে এক ধরনের জীবাণু যে এক ধরনের বাসান্নিক জীব

সৃষ্টি করতে পারে, যাতে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর বৃদ্ধি রোগ করা যায় তা ১৯৩৯ সালের আগেই জানা গিয়েছিল। কিন্তু এই জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে খুব কমই প্রয়োগ করা হয়েছিল। আর পরীক্ষাও চালান হয়েছিল খণ্ড খণ্ড ভাবে। বেক্টারিয়ার ক্ষেত্রেই টেষ্ট টিউবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। রোগ চিকিৎসার ক্ষত তাবের ক্ষমতা পুরাপুরি উপপদ্ধি করা হয় নি।

ব্যাকটেরিয়ার টিকনত আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৩৯ সালে। এই বছর দুইর ব্যাকটেরিয়ার টাইবোয়েটাইসিন সম্বন্ধে নিম্ন গবেষণার ফল প্রকাশ করেন। ১৯৪০ সালে ফ্রোয়ে, চেন ও তাঁহার মর্গগণ পুনরায় পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। এই বছর আবার গবেষণাগারে সৃষ্ট হল স্ট্র্যাক্টোমাইসিন। তারপরেই এস স্ট্র্যাক্টোমাইসিন আর স্ট্র্যাক্টোমাইসিন। এই সব আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের এক নতুন দ্বার খুলে গেল।

যে সব জীবাণু ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি করে থাকে তাবের মধ্যে স্ট্র্যাক্টোমাইসিনের স্থান পুরাতাপে। সংক্রামক রোগ চিকিৎসার ক্ষত বর্তমানে ত্রিংশটি বা তার বেশী ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে দুটি বা তিনটি ব্যাকটেরিয়ার থেকে হয়, দুটি বা তিনটি ফুল থেকে আর বাকী পঁচিশটি স্ট্র্যাক্টোমাইসিন থেকে তৈরি হয়। এ পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে সব চেয়ে ক্ষতপূর্ণ হল পেনিসিলিন আর স্ট্র্যাক্টোমাইসিন। পৃথিবীতে বত সংক্রামক রোগ আছে তার প্রায় দরই ক্ষতাপে এইগুলি দিয়ে নিঃশ্রম করা যায়।

ব্যাকটেরিয়ার শুধু যে মানুষের বত তা নয়, হাঁস-মুরগীদের রোগের চিকিৎসার ক্ষতও তাবের প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদের কয়েকটি রোগ দূর করার ক্ষতও এগুলি ব্যবহৃত হয়।

আজ মানুষের জীবনে জীবাণু এক যুগের ভূমিকা গ্রহণ করেছে—তার ব্যতন্ত্রের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে, দত জল্লাল দূর করা যাচ্ছে, স্খাবান শিহজাত জীব পাওয়া যাচ্ছে আর সংক্রামক রোগ নিঃশ্রম করা সম্ভব হচ্ছে। তাই জীবাণুকে বলা হয় মানব বত।

জীবনের ক্রমাবিকাশ

বিজল দে

(পূর্ণাহুতি)

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে একপ্রকারের শিপহ সন্ন্যাস হইতে পক্ষী প্রজাতির উৎপত্তি হয়। এই সন্ন্যাসপত্ন মনে তাঁহারা দিচ্চেন *Pseudosuchiaus*। পৃথিবীতে তখন এইগুলির জীবন বিপদমংকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সমস্ত এইগুলিকে খুব লম্বা লম্বা পা কেশিকা দোঁড়াইতে হইত। খুব সম্ভবতঃ দোঁড়াইবার সময় এইগুলি লাফাইয়া চলিত। অপরদিকে জীব-বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে অন্য এক জাতির অধুনাস্থল সন্ন্যাস (বয়স্ক বছর পূর্বে অট্টয়ায় একটি সন্ন্যাসের জীবন আদিভার হইয়াছে যাহাকে কোনো কোনো জীববিজ্ঞানী পাখীর পূর্ব পুরুষ বর্ণিতা সম্বন্ধ করেন) হইতে ছুড়পাখী প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে। এইগুলির নাম থেরাপিড হইয়াছে *Therapsids*। কিন্তু এই সম্বন্ধ এখনও কোনো ভূত সিদ্ধান্তে পৌছান যায় নাই। এইখানে বলা প্রয়োজন যে কু-পূর্বে পাখী অথবা ছুড়পাখী প্রাণী যেখা হিবার বহু পূর্বে, যখন সন্ন্যাসপৃথিবীতে রাজত্ব করিত তখন এক-প্রকারের বিরাটকার সন্ন্যাস যাহাকে জীববিজ্ঞা ডাইনোসর বলে, বর্তমানে যে স্থান গোবিন্দভূমি নামে খ্যাত সেইখানে ডিম্ব প্রসব করিত। তখন এই প্রাণীগুলিই প্রাণী জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। বর্তমান পৃথিবীতে মাংসখের যে স্থান তখনকার পৃথিবীতে এই বিরাটকার সন্ন্যাস-সেতার সেই স্থান ছিল।

সন্ন্যাসপের পল্কাৎ গমন :—গ্রীষ্মকালের কাছ : কাছ সন্ন্যাসীগুলিকে *mud skipper* নামক একপ্রকারের মাছের মত প্রাণী প্রায়ই দেখা যায়। এইগুলিকে সন্ন্যাসীতীরে লাফাইয়া চলিতে দেখা যায়। এইগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী তক্ষণ করে। সন্ন্যাসীতীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যোগ ঝাড়ের উপর উঠিয়া এইগুলিকে, ইচ্ছাযে বাহির হইয়া পড়া চক্ষু দ্বারা এদিক শুদিক

চাহিতে দেখা যায়। এই তথাকথিত মাছগুলির অল ছাড়াইয়া হুলে উঠিয়া এইরূপ শিকার অবলম্বন এবং চল্যকর্য করা বাস্তবিক পক্ষেই জীবজগতের একটি স্বদেশীয় ঘটনা। এইগুলির ভিতরেই আমরা প্রথম দেখিতে পাই যে মাছের সন্মতন যদি একটি মুসুদুনে পরিণত হইয়াছে। এই তথাকথিত মাছের ভিতরেই প্রথম দেখিতে পাই যে, একটি প্রাণীর পক্ষেই অল এবং হুলে বাঁচিয়া থাক। সম্ভব। আমরা জানি মাছ হইতেই উভচর প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা এও জানি যে এই উভচর প্রাণীই, মেরুভূমী প্রাণীবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম পাকাপাকিতাবে হুলে পদার্পণ করিয়া জীব অভিযাত্রির পথে শক্ত মাটির হুলের সূচনা করে। আমরা সবাই জানি একটি তেজ কি প্রকার পাকাপাকিতাবে হুলে জয়লাভ করিয়াছে, আবার আমরা এও জানি এই তেজটি কি প্রকারে জলের মধ্যে ডিগ প্রদান করিবে এবং ডিগ হইতে বেড়াচি বাহির হইবে এবং তাহা পূর্ণাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত কি প্রকারে সুলক। দ্বারা মাছের মত খাল গ্রহণ করিয়া অল জীবন যাপন করিবে। আমরা ইচ্ছাও জানি এই উভচর প্রাণী হইতেই সন্ন্যাস জয়লাভ করিয়াছে এবং কিছু পূর্বে আমরা ইচ্ছাও পাইয়াছি যে এই সন্ন্যাস হইতেই একদিকে পক্ষী এবং অপরদিকে ছুড়পাখী প্রাণী জয়লাভ করিয়াছে। জীবের হুল অধিকার করা নিশ্চয়ই অভিযাত্রির পক্ষে একটি বড় ঘটনা কিন্তু এই হুল অধিকার করিতে জীবজগৎকে শ্রম করিতেও হইয়াছে প্রচুর। অল হইতে হুল অধিকার করিবার পর জীবজগৎকে এক দলে কতগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবস্থায় সন্মতন হইতে হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিবেশের সহিত হুজু করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার অন্য জীবজগৎকে তাহার শরীরস্থলের পরিবর্তন সাধন করিতে হইয়াছে অনেকবাদি। প্রথমতই দেখিতে পাইল

বে তাহারা মলে যতটা চলা ফেলা করিতে পারিত হুলে ততটা সহজে পায়ে না। মলে ডিখ প্রসব, ডিখ বকা, শাবক বকা যতটা সহজ হুলে ততটা সহজ নহে। এই জন্যই তেঁক মলে ডিখ প্রসব করার অভ্যাস এবং যেটাচি পাশনের অভ্যাস করিয়াছে। উহারা প্রতিবেশের কক্ষতর অল্প অধিকতর কর্কশ এবং শক্ত প্যাকেরের প্রয়োজন অনুভব করিল। প্রতিবেশের চাপে, বাঁচিয়া থাকিবার তাগিদে তাই উহাদের পাত্রের ক্রমে ক্রমে পুরু এবং কর্কশ হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পাত্রের পুরু হইবার অল্প ইহাদের পক্ষে চামড়া অথবা সুলকার সাহায্য আর ঝাপ গ্রহণ করা সম্ভব হইল না, বরিত হুলে স্নান:জনের পরিমাণ অনেক বেশী। কিতাবে এই সমস্ত প্রতিফল প্রতিবেশের সহিত সূক্ষ্ম করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার অল্প ইহাংগিকে লুকান স্থানে ডিখ প্রসব করিতে হইয়াছিল, কিতাবে উহাংগিরের বেষ্মবন্ধকে বলাইয়া ফেলিতে হইয়াছিল তাহা যথেষ্ট আকর্ষণের বিষয় হইলেও আমরা বর্তমানে সেই সমস্ত আলোচনা হইতে বিরত থাকিব, কারণ আমাদের বর্তমান অবস্থারের উদ্বেগ হইতেছে কিতাবে এই সমস্ত প্রতিফল প্রতিবেশের সহিত নিজেকে ঝাপ ঝাড়াইতে না পারিয়া কোনো কোনো সন্নীস্থপ ক্রমে ক্রমে পিছনের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া আবার মলে বাইরা উপস্থিত হইল। বর্তমান জগতে সন্নী হইতে কোনো সন্নীস্থপই অধিকতর ছুঁতব নহে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা জানি বর্তমান পৃথিবীতেই অসংখ্য সামুদ্রিক সন্নী বর্তমান। আমরা জানি দুকপারী প্রাণী হুলেই সন্নীস্থপ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও আমরা যেখানে পাইতেছি বর্তমান পৃথিবীর সমুদ্রে দুকপারী তিমি অবশ্যে বিচরণ করিতেছে। নৌ অস্তিত্বের পক্ষে চার কিংবা পাঁচবার জীবজগৎ হুলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

জীববিজ্ঞানীদের মতে প্রথমত একপ্রকারের ক্ষুদ্র ক্রিমিকট হুলে আসিয়া পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছিল। তারপর একপ্রকার ঝাপগ্রহণক্ষম অ্যানথ্রোপড (Anthropoid) এবং কথাক্রমে স্তন্যপায়ী কাকাদ এবং উভচর প্রাণী হুলে আসিয়া পৌঁছাইতে সক্ষম হয়। এই বাপগুলির প্রত্যেকটির অল্প লক্ষ সন্নী বহু প্রয়োজন হইয়াছিল এবং ইহার

প্রত্যেকবাহাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিখুঁত কিলটারের ভিতর দিয়া ইহাংগিকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে এবং প্রত্যেক বাহই কি শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক টেট্রিটিবে অনুপস্থিত প্রমাণিত হইয়া মলে কিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে? ইহার উত্তরে খুব সম্ভব ইহা বলাই ঠিক হইবে—যে ইহার প্রত্যেকবাহই, ইহাদের হুলে আসিয়া পৌঁছিবার পর হইতে প্রতিবেশের এমন পরিবর্তন হইতে আরম্ভ করিয়াছিল যে আবহাওয়ার উদাহরণ আর হুলে থাকা সম্ভব হয় নাই। তাই হয় ত বাধ্য হইয়া ইহার উদাহরণের ক্রমবিকাশের পক্ষে হঠাৎ পিছন দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া মলে কিরিয়া বাইতে বাধ্য হইয়াছে। ইহার কারণ হয়ত আরেরপিরির জরাজপাত, আবহাওয়ার পরিবর্তন, দাবাড়ি, অস্বস্থানে বহু সংখ্যক প্রাণীর সমাগণ হেতু বাতের অভাব আরও অনেক কিছু। বর্তমানে আমরা যে সমস্ত স্তন্য সন্নীস্থপের সম্মান পাইতেছে তাহাদের অনেকই স্তন্য হইবার সময় মলচর ছিল বলিয়া নৌ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন। কিন্তু তাহারা ইহাও বলেন যে, এই সমস্ত সন্নীস্থপ নিশ্চয়ই হুল হইতে মলে বাইরা উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদের আদিমতম উৎপত্তিহুল জল নহে, হুল। এই বিষয় আল নৌ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ নাই। যে বিরাট সন্নীস্থপ গেটী পারমিয়ান (Permian) হুলে সৃষ্টি হইয়াছিল, নৌ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন তাহাদের সবাই শুক মাটিতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। ইহার অন্ততঃপক্ষে ১৮ প্রকারের হুলে এবং এই ১৮ প্রকারের অন্ততঃ ১১ প্রকার মলে কিরিয়া গিয়া সন্নীস্থপে মলচর হইয়া গিয়াছিল। Prof. Osler মনে করেন যে এই মলে কিরিয়া যতরা একচোটে হয় নাই। ইহার শুভ স্থান হইতে অল্পগুল এবং খেণ্ডাযুক্ত স্থান, তাৎপর্য নদী এবং অবশেষে সমুদ্রে বাইরা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন, যে স্থান বর্তমান দুকপারী তিমি এবং শুভকরা অধিকার করিয়া আছে, আদিম হুলে সেই সমস্ত স্থানে বিরাট বিরাট সামুদ্রিক লিথর্ড, সন্নী, কুমীর এবং কচ্ছপগণ অধিকার করিয়াছিল। ইহাদের অনেকই বর্তমানে স্তন্য হইয়া গিয়াছে।

প্রজীববিদ্যাবিশুদ্ধ তাহাদের অস্বাভাব্য পরিচয় এবং প্রতিভাবলে নৌ-জীবসম্প্রদায়কে সন্নী করিয়া আদিম

দুপের মূগু হইয়া যাওয়া প্রাণী সমাজকে আশঙ্কের কাছে
 ডিরাইয়া রাখিয়াছেন। প্রত্ন-জীববিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা
 জানিতে পারি, অধিদ্রুত কিংবা যঃগা সর্পসর্পগুলির
 বিভিন্নশাখা কিংবা বিভিন্ন উপায়ে চলিতেছে।
 ইহাদের কোনোটি কোনোটি প্যাডেলের সাহায্যে চলা কেন্দ্র
 করিত—যেমন নাকি, *Plasiosaurus*। আবার কোনোটি
 চলিত পিছনের অংশের আকাবাকা গতির সাহায্যে। এই
 সম্ভাব্যের নান কেওয়া হইয়াছে—*fish lizard*। আমরা
 আর ইহাও জানিতে পারিতেছি, -কিছুপ ভাবে *Icyo-*
saurus নামক চলের সর্পসর্প মূলে আসিয়া ভিৎপ্রদ
 করিবার অনুবিধা হইতে হুতা পাইবার মত জীব-
 অভিযান্ত্রিক পথে অগ্রসর হইতে হইতে উন্নত মলজীবনেই
 ভিৎ প্র-ব হ্রাভিয়া দিয়া মধ্যাহ্ন (*Viviporous*) হইয়া
 দিয়াছিল, অথবা *Mosasaurus* নামক গাঁতাক সর্পসর্প
 ভিত্তপ ভাবে তাহাদের বাকিয়া যাওয়া গাঁতের সাহায্যে
 মস্ত পিকার করিত। অভিযান্ত্রিক্যের একটি
 প্রবান পথে হইতেছে এই যে, ইহার প্রতীপগতি
 (*retrogression*) হইতে পাবেন। কিন্তু আশঙ্কের
 বিপর এই ক্ষেত্রে তাহাই যে হইয়াছিল, সে বিপর কোনো
 সম্ভব নাই। প্রকৃতির ইহা একটি সাধারণ ধর্ম কিনা
 জানি না, তবে এই বিপর হইতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে
 যে প্রকৃতির ঘটনাপ্রবাহের অনেক সময় পুনরাবর্তি
 হইয়া থাকে—একই কাঠামোর ভিত্তর উহা অনেক সময়
 ঘুরিয়া কেবে। এই পুনরাবর্তির মধ্যে দ্ব্যত নামাক

যের ক্ষেত্র হইতে পারে তবে ঘটনাপ্রবাহ যে দুজকে
 অবলম্বন করিয়া চলিতে থাকে তাহার পরিবর্তন হয় না।
 বর্তমানে বিজ্ঞানের অস্ত্রাস্ত্র শাখা যেমন আজ বিশ্বাস করে
 সে বিশ্বাস ঘটনা প্রবাহ কোনো বাধাব্যাপ পদ ঘটিয়া চলেনা
 —ইহার মধ্যে *indeterminacy* বর্তমান, গ্রিক সেইরূপ
 জীববিজ্ঞান অভিযান্ত্রিক্যের ভিতরের যেমন আজ এই ঘটনা
 হইতে এই *indeterminacy* বই একটি উপাধরণ
 মিলিল, অবশ্য ইহাতে অভিযান্ত্রিক্যের মূলমন্ত্রের
 কোনো অংশহানি হয় নাই। সর্পসর্পের প্রতীপগতি
 হইতে এই মত্যা প্রকাশ পাইয়াছে যে জীবপদের
 অভিযান্ত্রিক্য পদ যে সর্বদাই সোমা উপরের দিকে
 উঠিয়া আসিয়াছে তাহা নহে, ইহা যে 'ক' বিন্দু হইতে
 আরম্ভ হইয়া 'ব', 'গ' ও 'ঘ', 'ঙ' প্রভৃতি উন্নত হইতে
 উন্নততর স্তর অতিক্রম করিয়া জীবজগতের অভিযান্ত্রিক্য
 সর্বশেষ স্তর "ক" বিন্দুতে ঘাইয়া পৌঁছাইয়াছে তাহা নহে।
 অভিযান্ত্রিক্য গতি 'ক' বিন্দু হইতে আরম্ভ হইয়া একটু
 ডায়নে একটু বায়ে ছেলিয়া 'হ' বিন্দু পর্যন্ত ঘাইয়া
 পৌঁছাইয়া অভিযান্ত্রিক্য গতি—মূখ্য কিংবা উল্টা দিকে
 চলিতে আরম্ভ করিয়া 'দ'তে কিংবা আসিয়া আবার
 সামনের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অভিযান্ত্রিক্য
 গতিপথের দ্ব্যত বারংবার পরিবর্তন হইয়াছে
 কিন্তু অভিযান্ত্রিক্য তাহার গতিপথ হারাইয়া ফেলে
 নাই।

[ক্রমশঃ]



চীনা সাহিত্যে ভারতীয় প্রভাব

হিমেলা ঘোষ

ভাৰতবৰ্ষ ও তাৰ ঐতিহ্যবাহী ৱাই চীনদেশৰ সাথে সম্পৰ্ক ছ'হাৰাৰ বহুবেল। এই সময়ৰ মধ্যে উত্তৰ দেশৰ মধ্যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰে প্ৰচুৰ লেনদেন হৈছে; একথা বিশেষ কৰে সাহিত্য সম্পৰ্কে প্ৰযোজ্য।

বিশ্ববৃদ্ধিৰ লগেৰে বহু পূৰ্বে য়েৰুই ব্যাবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্ৰে ভাৰত ও চীনেৰ সাথে যোগাযোগ ছিল, কালিদাসেৰ "অভিজ্ঞান শকুন্তলম" "মহাভাৰত" প্ৰভৃতি গ্ৰন্থেও আমৰা চীন শব্দেৰ উল্লেখ পাই। পণ্ডিত ম্যাক্সমুলাৰ সাহেব অৱশ্যি বলেছেন যে, মহাভাৰতে চীন শব্দেৰ যোগনা পৰবৰ্তী কালে হৈছে। সে যাই হোক, স্তবজুতি, কবি অমর প্ৰভৃতিৰ ৰচনাৰ আমৰা এৰ উল্লেখ পেয়েছি। মধ্য এশিয়াৰ ষাটী খৃষ্টে এখন সব প্ৰাচীন তথা অৱশিষ্ট হৈছে যা ইতিপূৰ্বে আমাৰেৰ জানা ছিল না। অৰ্থাৎ সেৰ লেখা গ্ৰন্থত পাওয়া গিয়েছে ওখান থেকে। এখন দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে ভাৰত ও চীনেৰ সাথে সম্পৰ্ক কত প্ৰাচীন। হান সাম্ৰাজ্যেৰ আমলে চীনে বৌদ্ধধৰ্মেৰ আগমন হলেও পশ্চিম সিন সাম্ৰাজ্যেৰ সাম্ৰাজ্যকালে বৌদ্ধ শিল্প-কলা ও সাহিত্য প্ৰচাৰ হতে সূত্ৰ কৰে এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতসেৰ লেখাগুলি বীৰে বীৰে চীনা ভাষাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হতে থাকে। এই লেখাগুলিৰ মধ্যে আছে কাহিনী, উপাখ্যান, কবিতা এবং গান, চীনেৰ সাহিত্য, বিজ্ঞান, বৰ্ণন ও সাহিত্যে এৰ প্ৰভাৱ অনবীৰ্য্য; ভাৰতীয় ভাষাৰ্ণ এবং চিত্ৰকলাৰ প্ৰভাৱে চীনেৰ শিল্প ও সাহিত্য বিপুলভাবে প্ৰভাৱান্বিত হয়। তাৰ প্ৰমাণ বহু আছে।

প্ৰথমে য়েৰুই ভাৰতীয় কাহিনী ও উপাখ্যানগুলি চীন দেশে প্ৰচাৰিত হয়। খৃষ্ট পূৰ্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনেৰ প্ৰথম মহান কবি চু উয়াংৰ লেখাতে এৰ উল্লেখ পাওয়া যায়।

৪-৩-২২ খৃঃ পূৰ্বে চীনেৰ ইতিহাসে য়ুয়ুমান ৱাংৰ কালত (Warring states period) অনেক ভাৰতীয়

কাহিনীৰ অন্তৰ্ভুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। তিন সাম্ৰাজ্যেৰ আমলে (Three kingdom period) বহু ভাৰতীয় কাহিনী চীনা সাহিত্যে স্থান পায়। কেমন কৰে সাও চুং (Tsao Chung) এৰুটি হাতী ওজন কৰেছিল—এই কাহিনীটি এ প্ৰসঙ্গে উল্লেখ কৰা যেতে পাৰে। চীনা ছেলে মেয়েসেৰ কাছে এই গল্পটি খুবই প্ৰিয়। এই ঘটনাটি সংযুক্ত ৱাংকৰ শিটক সূত্ৰেৰ প্ৰথম ভাগে পাওয়া যায়। ওয়েই সাম্ৰাজ্যেৰ আমলে (৪২৪-৪৩৯) এটা অনুবৃত্তি হয় এবং সম্ভবতঃ হান সাম্ৰাজ্যেৰ শেষভাগে পৰ্যটকসেৰ য়েৰুই তা' চীনে গিয়ে পৌঁছে।

তৃতীয় ও ষষ্ঠ শতাব্দীৰ মধ্যে ভাৰতীয় পৌৰাণিক কাহিনী ও উপাখ্যানগুলি চীনা সাহিত্যকে খুবই প্ৰভাৱান্বিত কৰে। এ সময়ৰ অপাৰ্থিৱ ঘটনা গিয়ে অনেক গল্প চীনা সাহিত্যে পাওয়া যায়। লু সুন তাঁৰ চীনা উপজাতিসেৰ ইতিহাস নামক গ্ৰন্থে একথা উল্লেখ কৰেছেন।

প্ৰাচীন ভাৰতীয় লেখকসাই সৰ্বপ্ৰথম বিন্দভাৱে নৱকেৰ কথা বৰ্ণনা কৰেন। চীনা সাহিত্যে নৱকেৰ যে বৰ্ণনা পাওয়া যায় তাৰ নায়ক য়ু ৱাং ভাৰত থেকেই নেওয়া। এ সময়ৰ পৰী, ভূত, বৈজ্ঞানিক-মানব অনেক কাহিনী লেখা হৈছেছিল, উদাহৰণ স্বৰূপে সুন এবং ওয়াং ইয়েনেৰ লেখাৰ কথা বলা যেতে পাৰে। ওয়াং ইয়েন তাঁৰ "খাৰাৰেৰ ঘটনাবলী" গ্ৰন্থে (Occurances in the dark) ভগবানেৰ অতিশয় নিম্নে বলেছেন যে, সত্যিকাবেৰ বৌদ্ধতা প্ৰচলিত হয় ও অবিদ্বানীৰা পায় শক্তি।

বাং সাম্ৰাজ্যেৰ আমলে ভাৰতীয় প্ৰভাৱেৰ ৰূপে ছ'বৰেৰ চীনা সাহিত্য প্ৰগমনতঃ দেখা যায়। পত্ৰ লেখা প্ৰেৰ কাহিনী এবং কবিতাৰ লেখা কাহিনী। ওয়াং জুৰ লেখাতে দেখতে পাওয়া যায়—একটি মূল কাহিনী ও তাৰ সাথে ছোট ছোট গল্প। গল্প বলাৰ এই পদ্ধতিটি চীনা

সাহিত্যে নূতন সংযোগনা ; কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এটা ঘামেশাই দেখা যায়। যেমন,—মহাভারত, পালি ভাষায় লেখা রামায়ণের কাহিনী, পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদি। এমনও থেকে একথা ধারণা করা খুবই সহজ যে, বাং রামায়ণ-কালে গদ্য সাহিত্য ভারতীয়দের দ্বারা নিপুলভাবে প্রকাশিত হয়। কবিতায় লেখা কাহিনীগুলিতেও গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। লেখকরা এই বরষের ভঙ্গী ভারতবর্ষ থেকেই চীনে যায়। এই পদ্ধতি বৌদ্ধ গ্রন্থ এবং দ্বারা এশিয়ার প্রাচীন ভাষাগুলির মাধ্যমেই চীনে উপস্থিত হয়।

এ ছাড়া সাহিত্যে বর্ণিত বিষয় বস্তুর উপরেও ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন, প্রাচীন চীনের ভাগনের কথাই বহুতর। প্রাচীন সাহিত্যের বিখ্যাত গীতিতে ওয়েন ই তো (Wen Yi To) বলেছেন,—সংস্কৃত সাহিত্যের মাগ থেকেই ভাগনের উৎপত্তি। নাগকেই শেষ পর্যন্ত ভাগনে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

সম্প্রতি কালে ভারতীয় লেখকদের বহু গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে বৌদ্ধ শ্রমণ এবং কবি সুমান-সু তরুণসুতের কবিতা অনূদিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের ঠাকুরের বহু লেখা চীনা ভাষায় আছে। ১২২৪

শালে তিনি যখন চীন ভ্রমণে যান, তখন সেখানে প্রচুর উদ্ভিদপত্র সৃষ্টি হয় এবং তখন বৌদ্ধধর্মকে নিয়ে অনেক রচনা হয়েছিল।

আমাদের দেশেও চীনা থেকে ভারতীয় ভাষায় অনেক লেখা অনূদিত হয়েছে। তবে বেশীর ভাগই ইংরাজী থেকে ; অর্থাৎ চীনা থেকে ইংরাজী এবং ইংরাজী থেকে চীনাতে। কিন্তু চীনা ভাষা আমাদের না জানার মত মূল চীনা থেকে অনুবাদ অপেক্ষাকৃত কম।

প্রাচীনকালে ভারত ও চীনের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রে যে যোগাযোগ ছিল, তার মাধ্যমে উভয়দেশের চিন্তার আদান-প্রদান হয়। কালক্রমে দেখা যায় যে, ভারতীয় চিন্তাধারা চীনে উপস্থিত হয়ে ক্ষুদ্র ভিত্তি তৈরী করে নেয় এবং চীনে মিথস্বাচারের মাধ্যমে তার তীব্র সংঘাত ঘটে। তখনকার দিনে সেই সংঘর্ষটি ছিল,—কনফুসিয়াস বনাম বৌদ্ধ মতবাদ। সে ঘাই হোক, এই যশের শেষে দেখা গেল ভারতীয় ধর্ম ও সাহিত্য চীনে একটি বিশিষ্ট আসন দখল করে রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পূর্বে দেওয়া হয়েছে। ভারত ও চীনের এই আনন্দিক সম্পর্কটি লক্ষ্যণীয় এবং উভয় দেশের ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয় বিষয়কর হবে।



মুখর অতীত রঞ্জিত কুমার সেন

একদিন সন্ধ্যা শুভদিনে নিজে এক আনন্দ ভিটুটা শুভিয়ে নিয়েছি। এ বাড়িটার তিনতলায় হিন্দু বোধি, চার তলায় একটা গুরুত্বের ঘর, আর পাঁচ তলায় মুসলমানদের ঘর।

সুন্দরাম—বিখ্যাত ভাটিয়াস আকাস উদ্দীন আহমেদ এই ঘরেই থাকেন। দু'একদিনের দেখা-সাক্ষাতেই বেশ বনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। আকাস উদ্দীন তখন রাইটার' বিন্দিয়ের পদস্থ কর্মচারী, তা ছাড়া গান বেকডিয়েন্টের স্বত্ব বিজ্ঞান' তরঙ্গের সঙ্গে জড়িত; কুচবিহারের লোক, যিনি পছন্দ সুরের মানুষটি। কবিদপুত্র মুসলীম টুডেটস্ কেডারেন্সের কন্ডারেন্স প্রথম দফা তাঁকে কাজি নবরুল ইসলাম ও গোলাম মুস্তাফার সঙ্গে দেখে, তখনই তাঁর মধুর কণ্ঠস্বরীতে মুদ্রিত হুজুরিগাম, এবারে তাঁর সঙ্গে বনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়ে খুলিতে মনটা ভরে গেল। আমার পড়িত রচনার কথা জানতে গেলে তিনি দ্রুতই তাঁর ঘরে নিরমিত আনন্দ্রণ বানালেন। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হ'লো যে, প্রত্যহ ভোরে ঘুম থেকে উঠে পাঁচ তলায় দাঁড়ি ভেঙে আকাস উদ্দীনের সঙ্গে গিয়ে চা খেতে লাগলাম। চা খেতে খেতেই তিনি হারমোনিয়ম খুলে নিয়ে ব'সতেন, সুর কবিতেন রেওয়াজ কিম্বা আমাকে শোনাবার জন্যে কোনো গান। শুনে শুনে মুগ্ধ হ'য়ে যেতাম।

এ সময়ে আমি একটি ইসলামী কাব্য লিখে প্রায় শেষ ক'রেছিলাম, সেই সঙ্গে কিছু ইসলামী গদ্যও। তাহিল-উদ্দীন আর নিরাজউদ্দীনের সঙ্গে মুসলীম কালচারের কলে সাক্ষাৎভাবেই এ সব রচনা আমার কলমে এসে যেতো। তার সঙ্গে শব্দ চরনের অপেক্ষা থাকতো না; অনেক আবি এবং পাশি শব্দ তখন লিখে নিয়েছি। একদিন আমার গানের খাতায় একটা পৃষ্ঠা আকাসউদ্দীনের হারমোনিয়মের উপর খেলু ব'রে ব'ললাম, 'সুর দিয়ে গান দিকি, কেমন লাগে শুনি।'।

আকাস উদ্দীন কিছুক্ষণ গানের পদগুলির উপর দিয়ে চোখ বুজিয়ে নিয়ে আমার সুরের বিবেক একবার বিশ্বাসের ভূমিতে তাকালেন, তারপর ব'ললেন, 'আপনি এত ভালো ইসলামী গান রচনা ক'রতে পারেন, তা তো জানতুম না।'।
উত্তরে শুধু ব'ললাম, 'নিই, দেখুন, সুর হয় কিনা!'

—'যেটা মুটে একটা সুর ক'রে আপাতত আপনাকে শোনাই, তারপর সময় ক'রে কখনও ঘড়িকাঁই করা যাবে।' ব'লে স্বভাবস্বন্দর কণ্ঠে এবারে সুর ব'ললেন আকাস উদ্দীন—

আমি চাই গো আজি তোমার কাছে

তোমার মহানন্দ,

তোমারই ধ্যান ক'রে যেন

মরি গো হৃদয়ং।

তোমার রূপের আশিতলে

যেখান থেকেই প্রাণী অঙ্গ,

শালায় দিয়ে পাই যেন গো

নাশতেই পথ।

এই ছবিটার থেকেই খোঁজ

কুট হ'তেছে নিতি,

শুনে থেকে পাই যেন গো

তোমার প্রেমের গীতি!

এই সাহায্যে কঠিন বৃকে

আবার কাটে যে দিন গভীর চুপে,

আমি সকল ভুলে চাই গো এবার

ব'রতে তোমার রথ।

ইহং গদ্য মিশ্রিত সুর। ভোরে তৈরবলয়ে তখন হ'য়ে শুভিলাস গান। মনে হ'ছিল না যে এ গান কখনও আমি লিখেছি। সুর এমন ক'রেই আমার নিজেই অন্তরিক কুপিয়ে দিছি।

একসময় গান বামিরে আকাশ উদীন ব'লু'লেন, 'হিঙ্গ
মাঠা'লু'লেন আনু না মাথে মাথে! কর্তৃপক্ষকে দিয়ে গান
এপ্রভ ক'রে নিলে আমি অন্যায়সে বেকর্ড ক'রে
পারলাম।'

আজসউদীন আমার গান বেকর্ড ক'রেছেন, শুনে
অনেকদিন বাধে মনটা আবার খুলীতে চকল হ'য়ে উঠে।
কিন্তু বোধ করি আমার ভাগ্যবিধাতার একম ইচ্ছা ছিল
না। হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে যিন কয়েক করিহপুর থেকে ঘুরে
এলাম। এসে দেখলান—আজসউদীন এ বাড়ি ছেড়ে নতুন
ক'বে গিরে দিট নিঃস্বেনে স্রাতের হোটেল। হোটেলটা
কাছে হ'লেও অনেকের মতো আর আজসউদীনের সঙ্গে
প্রাসক্তিক চায়ের বোস হইল না। দেখা হয় কখনও
স্বপ্নে। কেন যেন নিজের মতো আর উৎসাহ পেলাম
না; স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে হিঙ্গমাঠার গিরে ধাঁড়াতে
পারলুম না। এত অল্প কিছুদিন বাদে মিউজিক-ট্রেনার
চিত্ত ব্যর্থ নিজে থেকে আমাকে দিয়ে একবারি স্রাম্যস্রীত
দিখিরে মিরে মৃগালকান্তি থেকে দিয়ে হিঙ্গমাঠার
বেকর্ড করালেন। গানবাণি হ'ল—

কে বলে তুই পাষাণী মা,
মুখে যে তোর ঘেঁষের হাসি,
চোখের কোণে ঞ্জের বারি
ফুলে মতো যায় যে তানি।
ঐধারে তোর প্রাণী আলি
ভর ভাঙারে ধাঁড়ান কাণী,
খড়গ কেসে আবার যে মা
ফুল হ'য়ে বাজল বাঁশী।
মহিগ যবে রাবিস কোলে,
নিশ মা ফুলে টানি,
আঘাত সে যে ফুলের মতো
পরশ শুভ জানি।
জেকে বা তোর পাইন। সীমা
পেরেও মা তোর নাগুদিমা,
আমার পূর্ণ করে সব সাধনা
মুজিরে যে মোর ভাবনাবাণি।

গানের সুরেই এখানে মৃগালকান্তির সঙ্গে পরিচয়

হইলো। বাকেন তিনি নৈরাটীতে, সেখান থেকেই
ক'লকাতার ডেইলি প্যাসেজারী করেবু। অনেকটা বেহালা
ও আশ্রয়লা। কথা বলতে বলতে অনেক সময় ঘোমতুরে
হািরিয়ে যেতেন। বেশ সাংগো লোকটিকে। কিছুদিন
বাদে দেখলান যেতবসন ছেড়ে রক্তবসন প'রতে সুরু
ক'রেছেন। বিজ্ঞপ করলাম, 'কি ব্যাপার, হঠাৎ এমন
পরিবর্তন হে!'

মুখ টিপে হেসে মৃগালকান্তি ব'লু'লেন, 'মা পরাজেন।'

এ কেন? মা, বুঝতে পারি রইল না। অজীবন স্রাম-
সাধক মৃগালকান্তি, মায়ের নামস্রীত ক'রে মাতৃসাধনার
মন তাঁর বিভোর হ'য়ে গিয়েছিল। মায়ের মৃদয় স্রীতে
রাঙা জবা সাজিয়েই তৃপ্তি ছিল না, সেই রাঙা জবার বসন
স্রান্তির নিজের বহুরেকও জবার মতই মায়ের পায়ে অর্ঘ্য
দিতে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন তিনি। বাইরে থেকে তা
বুঝবার উপায় ছিল না। এমনি ক'রে একসময় তাঁর
মাঝার বাণিকটা রোগ প্রকাশ পেলে এবং অল্পদিনের
মধ্যেই তিনি মারা গেলেন।

এর কিছুদিন আগে থেকে হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল
প্রোডাক্টসের মতো বেগাকোম প্রামোকোম কোম্পানীর
সঙ্গে আমার যোগাযোগটা কিছু নিশিড় হ'য়ে উঠেছিল।
হিন্দুস্থানে দেখেছি অল্প ভট্টাচার্য, মহেশ্বর ভট্টাচার্য, শতীন
দেব বর্মন, গোহুল মুখোপাধ্যায় এবং কখনও কখনও
জিহের গান রেকর্ডিংয়ের সময় কে. এল. দায়াল, উমা
শর্মা আর পরজসুয়ার মল্লিককে; আর বেগাকোমে দেখেছি
ভীমদেব চট্টোপাধ্যায়, সুধামাধব সেনগুপ্ত, তুলসী
লাহিড়ী, বীরেন দাস, ভবানী দাস, কমলা স্বরিনা, ছায়া
দেবী আর সন্তোষ সেনগুপ্তকে। অনেকের দর্শেই অনেক
সময় সন্ধ্যা নিয়ে নানাভাবে আলোচনা ক'রে যেন যেন
বিভিন্ন মতের মালা গাঁবেছি। বেগাকোমে আমার প্রথম
গান নির্বাচন করেন তুলসী লাহিড়ী; বীরেন দাস ও ভবানী
দাসের মিলিত সুরে গান রেকর্ড করেন সুরকান্ত
অধিকারী। নিজের যদিও এটা আগল নাম নয়, তবু
সুরকান্ত নামেও তিনি জনপ্রিয়তা পান। এ সময়ে
সুদীপলাল চক্রবর্তীও আমার কিছুকিছু গানের সুর করে,
পরে তা স্বরশিল্পি সখ গীতিকার বিনয়কুল দাশগুপ্তের

সম্বোধিতার সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার প্রকাশিত হয়।
 গানের মধ্যে মনটা তখন একবারেই আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছিল।
 সংস্কারের জটিলতার বাইরে এখানে সূক্ষ্মত্বের স্পর্শ আছে।
 চিরকালের শৌন্দর্যপিয়ানো যেন কেবলই তাই সঙ্গীত সন্ধান
 ক'রে মগ্নছিল। সঙ্গীতের স্বরধারা প্রবেশ ক'রে মনটাও
 বেশ স্বরধারা হ'তে উঠলো। অল্পকালের মধ্যে সিরিকের
 প্রথম সাক্ষা পাই স্থল-জীবনে, এতদিনে এসে বোধ করি তা
 পরিণতি পেলে।

'রূপ ও বীতি'র কাছ ছেড়ে দেবার পর আমার
 আগেকার মতো বেকার হ'য়ে পড়েছিলাম। ভাবলাম—
 যাতে যা সামান্য টাকা আছে, তাই তাড়িয়েই কিছুকাল
 চুক্ক। তাই চ'ললো। কিন্তু মনটা কেমন যেন ক্রমেই
 স্থূলভাড়া হ'য়ে উঠতে লাগলো। সাধারণ সঙ্গীতের
 মধ্যে কটির সন্ধ্যার দিকে নিজেকে মনে হ'তো বড়
 নিঃশব্দ। সঙ্গীতহীন জীবন। হাঁটতে হাঁটতে নিজের
 অলঙ্কারেই একদিন গিয়ে বসলাম নিমন্তলা শ্রমানে। সঙ্গীত
 থেকে শ্রমানে। নিজের কাছেই কেমন অস্বস্তি মনে হ'লো।
 তা হ'লেও শ্রমানে যেন কেমন নিবিড়ভাবে আমাকে আবর্ষণ
 ক'রলো। যে মাটিতে আমার মায়ের ভাবনাগণ মিশে
 আছে, মিশে আছে নবীন্দ্রনাথ, সেই মাটি—সেই মহা-
 শ্রমানে নিমন্তলা প্রতিদিন আমাকে হাতগানি দিয়ে ডাকতে
 লাগলো। সাধারণ যোগ্যতাই থাকি, যে কাগজেই থাকি,
 সন্ধ্যা হ'লে কাকের সঙ্গে আর স্পর্শ নেই, তখন এমত
 স্পর্শ নিমন্তলার সঙ্গে। মাঝে মাঝে কেওড়ালা আর
 কান্না মিলেই বাটগে গুঁবে আশি, বুঁবে এসে নির্ভয়ে চুপ ক'রে
 বসি নিমন্তলার। অথচ কেন, তা নিজেই জানি না।
 শব্দবোধের পর শব্দবোধ এসে ভিড় হ'তো শ্রমানে। কত কাগা,
 কত বিলাপ, কত ইতিহাসের সাক্ষ্য রোমন্থন, চিত্তাগ্রি
 লকে সেই কাগা মিশে আকাশকে ভারী ক'রে তুলতো।
 শব্দবোধের কত বৈচিত্র্য। শিশু, বালক, বুড়ী,
 প্রৌঢ়, বৃদ্ধা, নানা বয়সের নানা মানুষ জীবন থেকে
 ছুটি নিয়ে হিমশীতল বেধ নিয়ে ছুটে এসেছে এখানে।
 পঞ্চভূতের যেহ পঞ্চভূতে মিলে বাজে চিত্তাগ্রিতে।
 ব'লে ব'লে বেধি আর, মনে মনে বসীন্দ্রনাথ শ্রবণ
 করি—

'এই বেধটার তেলা নিয়ে ফিরেছি শাঁতার গো,
 এই ছ'বিনের নকী হ'লো পার গো।
 তার পরে যেই ছ'বিরে যাবে তেলা,
 তারিবে বেধো তেলা।

তার পরে তার খবর কিছু খারি নে তার খার গো,
 তার পরে সে কেমন আশো কেমন অন্ধকার গো!'

ছ'বিনের এই নকী পার হ'য়ে একদিন আনিও আস'লো
 এখানে—যেমন ক'রে আসে শ্যাই, যেমন ক'রে আসতে
 যায় মঙ্গলকে। এখানে দাড়া নেই, এলা নেই, উঁচু নেই,
 নিচু নেই। যে শাসক তার নক্ষত্রে একদিন বুটের নিচে
 গিয়েছে, সেই শাসক আর নক্ষত্রে এখানে কোনো ভেদ
 নেই। এই চিত্তাগ্রি, একই তার রূপ, একই তার হাফিকা-
 শক্তি। এখানে শাসকের বুটের শাপন নেই, নক্ষত্রে
 গোলামী নেই। ছ'বনের এখানে একই পরিণতি। তবে
 এই জড়পৃথিবীর চৈতন্তের মধ্যে এত জট কেন, এত বস
 কেন, এত অহমিকা আর উচ্ছৃঙ্খল কেন? কেন পারে না
 মানুষ ঐতির স্পর্শ নিয়ে এই ছ'বিনের জীবন-মর্যাদাকে
 প্রেমের সূত্রেই ক'রে তুলতে?

চিত্তাশ্রমার এক একটি বেধ পুড়ছে, যেন নিজেকেই
 পুড়তে বেধেছি। যেখনি আর বিশ্ব-অস্তিত্বকে ভাবি।
 মনে হ'য়েছে—পৃথিবীর মানুষভোগ্য মনে যদি এতটুকু
 শ্রমানে-বৈরাগ্য থাকতো, যদি এই মহাশ্রমানে এসে এখনি
 ক'রে তারা তাদের নিজের পুড়তে বেধতো, তবে হয়তো
 পৃথিবীতে আর কোনোকাপেই হুঁত আসতো না, জীবন
 সূক্ষর হ'তো, সহজ হ'তো।

মনে মনে আমার সন্ধ্যার তহবিলটা একবার হাতড়ে
 দেখুলাম। বেধলাদ—এতদিন মানুষের কাছ থেকে যত
 স্পর্শ পেয়েছি, তার চাইতে অনেক বেশী স্পর্শ পেলাম
 চির সন্ন্যাসী এই মহাশ্রমানের কাছ থেকে।

প্রায় বছর চার পাঁচ এই অবস্থার কাটলো। এ সময়ে
 একটিকে বৌদ্ধ শাস্ত্র, অপর দিকে হিন্দু শাস্ত্রের নানা বিষয়
 নিয়ে অনেক গ্রন্থ পড়েছি। মনে মনে কোথাও কোনো-
 ক্রমেই শান্ত হ'তে চাইত না। সমস্ত মনের মধ্যে রক্তপ
 একটা দাবাদাবি অহনিদি জ'লছে। জীবনকে প্রতিদিন

ভিলে ভিলে পুড়িয়ে পুড়িয়ে যথা সত্যকে উদ্ধার ক'রবার
অন্তে অশান্ত মন কেবলই ছুটে চ'লেছে। কোথায় সেই
সত্য, কোথায় আছে কীমনের পরম প্রাপ্তি—যা পেলে
এক মুহূর্তে সব পাওয়া হয়ে যায়, যা পেলে এ জীবনে আর
সব কিছু মিথ্যা হয়ে যায়।

এই মন নিয়েই বেরিয়ে প'ড়লাম একদিন মঠে মন্দিরে
মসজিদে স্ট্রীটার। ধর্মাত্মের বিচার থেকে পরেশনাথ,
হকিগেথর আর বেহুড় থেকে নবাবীণ মারাণুর, খড়হর থেকে
ত্রিবেদী, কালীঘাট থেকে ভাবকেতব, আর নাগোরা থেকে
শেপ্টপল্ল ক্যাথোলিক। কোথাও পাঠা, পুরোহিত আর
হাক্কের সঙ্গে তর্ক ক'রেছি, কোথাও শ্রমণ, ভিক্ষু, স্বামীজী
আর বেভারেন্ড কাবারের সঙ্গে এতদূরগরে ভুবেছি।

কোথাও আঘাত পেয়ে কিরে এসেছি, কোথাও প্রেমে
আবদ্ধ হয়েছি। কোথাও পশা আর ভাগিনেবীর পুণ্য-
সলিলে বেহুড়িয়েছি, কোথাও হাঙ্গামাবাদের পাছাড়
আর বনরাঝিনীলাগ চোখকে তুলুপ ক'রেছি। এন্নি ক'রে
আবার একদিন ফিরে এসাম কলকাতার আশুনার।
আজানা থেকে নীমতলা, কোনোদিন বা শিয়ালবহের ওঠার
ত্রীক্ষ। সন্ধ্যার ত্রীক্ষের উপর দিয়ে লোক-চলচল যখন
বেশে যেতো, নীবেবে এনে দাঁড়াভাম রেগিনে ব'রে, দেখতাম—
প্যাপেঞ্জার নিয়ে কত ট্রেন আসুচে, কত ট্রেন প্রাটকর্ম
য়েড়ে যাচ্ছে। তাহের সঙ্গে সঙ্গে আঘাত মনটাও দূর
দূরান্তে উৎখাত হ'য়ে যেতো। 'বেশে বেশে চলতানি, বেশে
বেশে চ বাঙবা'; মনে হ'তো 'বসন্তের কুইকক'।'
ভাবতাম—সমস্ত বিশ্বই তো আমার মনের মধ্যে ছড়িয়ে
আছে। সেখানে সকলের সঙ্গে আমি আত্মীয় হ'য়ে ফিলে
আছি। এই বোধ থেকেই একদিন মধ্যরাত্রে কলমে
কবিতা এলো—

এই পথ চ'লে গেছে সুস্থর সীমার পারে আরও কত দূর,
এই নদী কুলে কুলে হ'য়ে গেল শুনে নীল সমুদ্রের সুব।
এই বন, এই তরু, এও তো অগ্ন্যবাহে ব্যাণ্ড সীমারান,
কোথাও মস্তুর মারা, কোথাও হুর্গর ঘাবে উঁচানো সন্তান।
কোথাও বটের কুলে শিবালয়ে বটী বাজে সন্ধ্যা-ছায়ার,
কোথা বা বোস্তর লাগে, কালো বল ছেয়ে যায়

আগামী বোয়ায়।

পরিক্রমা চলে নিত্য তারই মাঝে যেহি মোহে বসন্ত জনের,
কতনা বিচিত্র লোক : কাঠুদিয়া, মাঠি আর

পথিক কণের।

নিরালায় হ'লে ব'লে যতবার দূর পানে কেবলই তাকাই,
এই পথ, নদী, বন, তরু আর মানুষেতে এক হ'য়ে বাই।
নিঃশেষে সম্পূর্ণ হ'কি কী জীবনের শেষ কথা মধ্য পৃথিবীতে
কিছু গরি নিতে হয়, বাকী যে স্নান্যেতে সব হয় অর্থ : হিতে।
আমি যে কখন কোথা নিঃশেষে ছাড়িয়ে দূরে

কোথায় হাবাই,

চেয়ে দেখি নদী, বন, পথ আর মানুষেতে

কোনো ভেদ নাই।

কবিতাটি সাপ্তাহিক 'সৌগামী' পত্রিকার প্রকাশিত
হয়। মন শুখন কেবলই বর্ণনে অশ্রয় নিচ্ছে। সেই
বর্ণন থেকেই বোধ করি যানিকটা জীবন-বর্ণন বুঁকে
গেলাম। অনিত্য ছেড়ে নিত্যে হাত বাড়ানো, সীমা
ছেড়ে স্নান্যে। 'বো বৈ ভূমা তৎস্বয়ম, নারে সুবমজি।'
কেবলই সর্গীয়তা থেকে মুক্তি চেয়ে উভার ঔষার্বেদ মধ্যে
খাপ নিয়ে বাঁচতে চাচ্ছি। কিন্তু আঘাতই কি কম ?
পায়ে পায়ে কাঁটা আর কাঁটার। ঔষার্বেদ আকাশ দেখানে
মেখে আচ্ছন্ন। ভাংলান—যে স্বর্গ থেকে এই মহাপৃথিবীর
অস্ত, তার বিবরণ আরও কি এ চোখে উন্মোচিত হবে না ?
আমার 'আগামী পৃথিবী' উপক্কাসের অস্ত এইখানেই।
আমার তখনকার এই মনের সুব উপক্কাসের নায়ক
সীপক্করের মনে ছপ নিয়ে প্রকাশ পায়। বর্ণনের মধ্যে
জীবনকে বুঁকে গেতে গিয়ে যেনেব বসন্তর থেকে মনটা
সংবে ছিল না। এই যেনেব মাটির বসই তো বস্ত হ'য়ে
আমার সারা বেখে ছড়িয়ে আছে। যেনেব কোথাও তাই
কোনো আবের্গনা আর বিকলাঙ্কের ছায়া মেনে নিতে
পারিনি। সীপক্করের চরিত্রে এই ভাবটাই প্রবল হ'য়ে
বেধা বিরছে। বেখলান—আমার মূল বস্তব্য অনেকেরই
ছবর স্পর্শ ক'রেছে। 'আগামী পৃথিবী' নিয়ে ভ্রাম্যমাণ
এ, কি, স্থল একদিন আলোচনা সন্ধ্যার সমবেত হ'লে
ডক্টর শ্রীহরার বন্যোপাধ্যায়, মনিলাল বন্যোপাধ্যায়,
অরুণা গোখরাণী, বটক্কর বন্যোপাধ্যায়, শিবদাস চক্রবর্তী এবং
ভায়েব হক্টা আরও বহু কবি, সাহিত্যিক ও অধ্যাপক।

জন্য সার্থকতা অনুভব করে খুবীতে ঘনটা তরে সেল।
কিন্তু এ ইতিহাস অনেক পেরে।

‘রূপ ও রীতি’ ছাড়ুগার পর বেতার জীবনে বেশ কিছুকাল কেটে গেল। এ কালের অভিজ্ঞতার দরকার হয় নাই। কিন্তু সে অভিজ্ঞতার মন পূর্ণ হ’লেও পাকিস্তানী মুক্ত থেকে যাক্ছিল। ইতিহাসে ‘কৃষক’ পত্রিকার যথেষ্ট বহুর মনোহরতার কাকি নক্কুল ইসলাম সম্পাদিত বৈমিক ‘নবযুগ’ পত্রিকার সাব-এডিটরের একটা কাজ পেয়ে গেলাম। কাজ পেয়ে যে বস্ত্রে গেলাম, এমন নয়, বস্ত্রে গেলাম কাকি নক্কুলের সাহিগ্যলাভের সুযোগে। ‘নবযুগের’ প্রধান মালিক ছিলেন মৌলভী এ. কে. কক্কুল হক এবং তদন্থ ভোগ্যেতন তৎকালীন ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হেমেন্দ্রনাথ হস্ত। বৈমিক ‘কৃষক’ পত্রিকারও মূলতঃ মালিক তখন তিনি। আর্থিক অসুস্থ উন্নত হওয়ার ক্রমক অকিস তখন বাড়ি ফল ক’রে গ্রন্থ জৌক বোতে উঠে এসেছে। ‘নবযুগ’ হ’লো আমার চাকরীস্থল আর ‘কৃষক’ অকিস হ’লো আচ্ছাদ্য। নবযুগের পরিচালকমণ্ডলী ও সম্পাদকীয় বিভাগের সম্পর্কে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে ঘনটা স্বভাবতঃই খুবীতে তরে উঠলো। একবিক্রে কাকি নক্কুল ইসলাম সম্পাদক, অত্রবিক্রে অমলেন্দু হানুগুণ বার্তাঙ্গলাপক। অত্রীয়ের মতো মাহুবক কাছে টানবার তাঁদের দুর্বল পক্তি আমাকে মুক্ত ক’রলো। অমলেন্দু বাবুও করিবপুত্রে লোক। ১৯২০ সালে ছাত্রাবস্থার তিনি অলহোবগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৪ সালে ভারকেশব নত্যাগ্রহে তিনিও একজন নত্যাগ্রহী ছিলেন। ১৯১১ সালে চট্টগ্রাম অগ্রদার লুণ্ঠন মামলার তাঁকে আবছ ক’রে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কারাগারে অন্তরীণ রাখা হয়। আবরা একই সর্বের এবং একই মনের মাহুব। তখন তাঁর ‘বঙ্গ ক্যান্স’ রচনার পরিকল্পনা চলছে। তাই নিয়ে মাঝে মাঝে তাঁর কাছ থেকে বঙ্গ ক্যান্সের বন্ধী জীবনের ইতিহাস শুনি আর বিবিত্ত হই। নাকে মাঝে মাঝে অকালে অমলেন্দুগার সঙ্গ সম্পাদকীয় হগুখে কাকি সাংবেষু ট্রেবলে গির বসি, মিঝেব কঠে ভাষা থাকুলিত যোবার মতো মুক্ত বিষয়ে তাঁর কথা শুনি।

কখনও তিনি অমলেন্দুগার সঙ্গ স্বাভাবিক বিধরে আলোচনা ক’রে কড় বইয়ে বিশ্লেষ, কখনও বা গান আর কবিতা নিয়ে যেতে উঠতেন। কোনোদিন এমনি ক’রে তাঁর মাথিগে এসে চাকরী করবে, বঙ্গন করতে পারিনি। প্রধানতঃ কবিতাতেই তখন কাকি সাংবেব নবযুগের সম্পাদকীয় লিখতেন। সৈনিক পত্রিকার ইতিহাসে এ জাতীয় সম্পাদকীয় রচনা অগ্নিব। পাশে পুরো ছ’কলম। লম্বা কখনও পুরো এককলম, কখনও বা বেড় কলমের কাছাকাছি। তাতে মাঝে মাঝে হুম্বের শৈবিলি ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিবদেস্তার স্তরাক পরিবেশনে ব্যত্যয় ঘটেমি।

একদিন কথামলে ব’ললাম, ‘পতর্ঘমেউ থেকে আপনাকে পুত্কার দেওয়া উচিত।’

হেসে কাকি সাংবেব বললেন, ‘মর্গৎ এক বেতল খাটলাম, তাতেও তোমাদের আশ মিটলো না; এই বয়সে আর এসবার হোসে পাঠাতে চাই?’

ব’ললাম, ‘পতর্ঘমেউ’ পুত্কার মানে কি বল?’

কাকি সাংবেব ব’ললেন, ‘এর বাইরে তুঁট পতর্ঘমেউ’র কাছ থেকে জ্বলনের লোক আর কি পদম পুত্কার আশা করতে পারে? অগ্নি ওহেব চাককতির শিকলটাকে ভাঙতে চেরছিলাম।’

ব’ললাম, ‘তার ইতিহাস আমার স্মৃতিশক্তিতে ঘরে বেঘেছি।’ ব’লে আস্থিতঃ সুতর তাঁর ‘শিকল পরার গান’-এর ছ’লাইন উদ্ধারণ ক’রে ব’ললাম—

‘এই শিকলপর হল নোবের এই শিকল পরা হল।

এই শিকল পরেই শিকল তেবেব করলো বে শিকল।’

মাঝে মিছু করে কিছুক্ষণ ব’ল হইলেন কাকি সাংবেব, তারপর ব’ললেন, ‘আমার লেখা ঘনি বেলের লোকের মনে থাকে, তবু সেই বয়ে আমার শ্রেষ্ঠ পুত্কার। এর বাইরে ইংবেবেব বেলাত আনি চাই না।’

এ কথাব পর নতুন করে কিছু বলবার ছিল না। উঠে এলাম মিঝের কাছে।

মনে মনে একসবর দুঃ অতীতের বিকে মুক্তি প্রদারিত করে বেলোম। ইতিহাসের পৃষ্ঠার সর্বদে এসো ১৯২৫ সালের কথা। করিবপুত্ সর্বদে কংগ্রেস অবিবেশনে

উদ্বোধন সঙ্গীত গাইছেন কাজি নবজল ইসলাম। আমার
শৈশবে সেই মহিমময় বৃষ্ণ আশু ও ভুলতে পারিনি। সেই
বহুই জুন মাসে হাখিলিতে গ্রাণ ত্যাগ করলেন বেশবহু
চিত্তেমন। সে শোক সেদিন নীরবে সহ করতে পারেন
নি নবজল, যেমন পারেন 'মি রবীন্দ্রনাথের বেলার। শোক-
সত্ত্ব কঠে রেডিওর গান বলেন তিনি : 'ঘুমাও ঘুমাও
ভূমি কবি', গাইতে গাইতে কঁপে কলসেন তিনি। তার
আগে দ্বিতীয় বার দেখেছিলাম তাঁকে কবিবরু মুসলীম
টুডেসডে ফেভারেশন কনফারেন্সে। অনেক গান শুনেছিলাম
সেদিন তাঁর কঠে। জীবনে অনাধিক তিন হাজার গান
রচনা করেছেন তিনি, এবং বেশীর ভাগ গানেইই সুর তাঁর
নিজস্ব। এককালে মেগাকোম এ্যানোফোনে কোম্পানী,
রিজ্ মাঠার ভয়েন ও সেনোলা কোম্পানীতে সুরকারের
কাম ক'রে বহু নবীন শিল্পীকে তিনি সঙ্গীত জগতে
সুপ্রতিষ্ঠ করেছেন। বহুক্ষেত্রে কাজি সাহেবের এই সুর-
সৃষ্টিকাজ লক্ষ্য ক'রে আমি নিশ্চিত হয়েছি। সুরের
বুলবুল তিনি। কৃৎস পত্রিকার নবজলের সঙ্গীত জীবন
সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখে আমি নবজল কর্ত্তী পালনে
আবেদন জানাই। সেই আবেদনে প্রথম পাড়া জাগে
চট্টগ্রামে। বিব্রটী কাজি সাহেবের চোখে পড়তে হেঁচা
হয়নি। ব'ললেন, 'ব বেশে রবীন্দ্র সঙ্গীত রয়েছে, সেখানে
এদর কি কাজ !'

রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই সম্মান আগাগোড়া তিনি
পোষণ ক'রেছেন। অগচ্ছ আকর্ষণ হয়েছি, যখন দেখছি
তৎকালীন কোনো এক মুসলীম মাদ্রিকগতের কর্ত্তৃপক্ষ
তুলাবও আঁকিয়ে বাটখারার ছ'মিকে রচনা করেছেন
রবীন্দ্রনাথ ও কাজি নবজলকে। নবজলের দিকের
পালাটা ওঝনে তাতী, রবীন্দ্রনাথের পালাটা হাফা হওয়ায়
উপরের দিকে উঠে গেছে। এই স্বারক চিত্র ব্যাটা উজ্জ
পত্র প্রোষণ করতে চেয়েছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের চাইতেও
নবজলের আসন উপরে। কাজি সাহেব ব'ললেন, 'এঁদের
কি চক্ষুসম্মা ব'লেও কিছু নেই ? ছি, ছি, ছি:।'

এরকম নানা কথা হয়েছে 'সবুগ' পত্রিকার সম্পাদকীয়
বগুরে ব'লে। অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে চোখ
কিনিয়ে এনে নিম্নের বিভাস্তির কাণের বগুরে কসে নতুন

ক'রে তাৎপতে মুক্ত করলাম কাজি সাহেবকে। গজীহতাবে
তাঁর সম্পর্শ লাভের সুখাপ পাওয়া বগুই যে নবযুগ এসে
খোপ দেবার এই প্রয়াস ! দত্তগারই তাঁর কাছে গিয়ে
ব'লেছি, মুক্ত হ'য়েছি তাঁর প্রেরণা মনের স্পর্শে।
আলোচনা করতে গিয়ে দেখছি—বিশুদ্ধ ও পুণ্যনাম্য
সম্পর্কেই শুধু অগাধ পাণ্ডিত্য নয়, সেই সঙ্গে সংকৃত
সাহিত্যও তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি হয়েছে। বিন্দু-বর্শন ও
সুখী-বর্শনের একত্র সমন্বয় ঘটেছে তাঁর জীবনে। তাই
তাঁর সাহিত্যের বৃহত্তর অংশ জুড়ে আছে বিন্দু ও সুসলীম
বর্শ ও বর্শনের তত্ত্ব। সঙ্গীত তাঁর জীবন ও জীবিকার
একটি বৃহত্তর স্থান অধিকার ক'রে বসলেও বিতুচ্ছ সাহিত্য-
রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ও জনপ্রিয়তা রবীন্দ্র-পরবর্তী
গ্রাম সমস্ত কবিকেই ছাড়িয়ে গেছে। নিপীড়িত জনগণের
সুখ বেদন তিনি প্রিয়বের ভাষা দিয়েছেন, তেমননি দিয়েছেন
গানের সুর। কৃত্রিম সত্যতার চুনকে আভিজাত্য ভেঙে
ওড়ো ওড়ো হয়ে গেছে। একদিন ব'লে ব'লে বই থেকে
নিভেত অনেক কবিতা আত্মস্থি ক'রে শোনাগেন কাজি
সাহেব। আত্মস্থি করেবার মতো হঠাৎ কঠেবও তাঁর
অভাব ছিল না। কে জানতো সেই কঠ অকস্মাৎ একদিন
চিত্রকালের মতো শুভ হয়ে যাবে। হঠাৎ উদ্ভাব-রোমে
আক্রমণ করলো তাঁকে। এই আক্রমণ হরতো অনেককাল
আগে থেকেই সূত্র হয়েছিল—যখন কবিতার নিরমিত
সম্প্রদায়ের লিখতেন তিনি নবযুগ। কিন্তু কেউ তা
ধরতে পারেনি। যখন ধরা পড়লো, তখন তিনি
চিত্রকালের মতো শুভ হয়ে গেছেন। বাংলায় শেব বিপ্লব
ও ভাঙনের যুগের সার্থক রূপ মুটে উঠতে পারতো কাজি
সাহেবের লেখনীতে, কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য, এদেশের সমাধ-
ব্যাপহার অহুতুল পরিবেশে তাঁর বিতোবী স্বর প্রণত
না হ'তেই ব্যাধির কাল এসে এসে তাঁকে আক্রমণ
করলো; যেমে গেল তাঁর লেখনী, যেমে গেল তাঁর কঠ।
আমি যে বিন্দু-সুসলীম বৈত সংকৃত সাধনার পথে অগ্রসর
হ'য়েছিলাম, কাজি সাহেবের সম্পর্শে এসে সে-পথ আরও
বেশী প্রশস্ত হ'তে পারতো, কিন্তু তাঁর যাতায়াত চৈতন্য
লোপ পেয়ে সে পথ আমার দেখিনুর মুতো রক্ত হ'য়ে গেল।
নবযুগের নতুন সম্পাদক হ'লেন আব্বাস আলী।

অনেকের মতো। আমিও তাকে 'নান' বলে ডাকতাম। মাঝামিঝি ম'হুরটি। যেত সন্ধ্যাতে সারা দুখমণ্ডল আচ্ছন্ন, পরশে পাখশাখা আর পাঞ্জাবী। মাঝে মাঝে তাঁর হস্তের এসে উপস্থিত হ'তেন এ. কে. ফজলুল হক ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর। কবীর সাহেব তখন নবদুগ্ধের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। এর ঠিক অবসানহিত পূর্বের একটি ঘটনা বড় মনোহর। বঙ্গীয় কৃষক প্রজা পাটির সম্মেলন ডাকা হ'য়েছে কুষ্টিয়া মহকুমা সড়রে। হক সাহেব এবং কবীর সাহেব যাচ্ছেন সম্মেলনে। আতও অনেক থাকে—যেমন থাকে দিরাংউলীম প্রকৃতি। কেউ বা ডেলিপেট হ'য়ে, কেউ বা সাধারণভাবে। পাড়িতে রঙনা হবার সময় আবারে সঙ্গে টানুলো দিরাংউলীম। গিরে যেখানাম সম্মেলনে লোকে লোকাবণ্য। ডায়ালি উঠে হুমায়ুন কবীর ব'লুলেন, 'আজ আমার পক্ষে আনন্দে দিন যে, এই প্রথম যি: হকের সঙ্গে একই প্লাটফর্মে উপস্থিত হ'য়ে কিছু কালের কথা আলোচনা করবার সুযোগ পামি।'—মুসলীম লীগের প্রাক্তন দুর্ভর নেতা হক সাহেবও অসুস্থ পড়ি উক্তি ক'রে তাঁর বক্তৃতা শুরু ক'রলেন :—'সম্মেলন ভেঙে যাবার পর আমরা মগাই মিলে গোবী নদীতে সাঁতার কেটে স্নান ক'লোম। সাঁতার-স্নানে কবীর সাহেবের মেখলাম অপরিণীয় আনন্দ। ক'লকাতায় ফিরে এসে সাম্প্রাদিক কৃষক পত্রিকার ট্রব মধ্যকার 'কৃষক-প্রজা সমিতি ও প্রজা-স্বার্থ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন হুমায়ুন কবীর। প্রবন্ধটির কিয়দংশ উদ্ধৃত ক'রলেই এর আসল বিষয়বস্তু স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। তিনি লিখলেন—

"ভারতের অস্ত্রাত প্রবেশের মধ্যে বোধ হয় বাংলা-দেশেই প্রথম প্রজা আন্দোলন শুরু হয়। বাংলাদেশে এ আন্দোলন আকস্মিক নয়, এর মূলে যেসব কারণ ছিল, তাতে বিক্ষোভ ছিল অসংস্কার্য।...নতাবীকালের মধ্যেই অমিহারী প্রচার হোম ভারতীয় জীবনের সব বিককেই ছেয়ে কেলো। বাংলার শিল্প, বাংলার বাণিজ্য ধ্বংসাপুখ হ'য়ে উঠলো। মানুষের কর্ম-প্রেরণা ও উদীপনা ধীরে ধীরে স্তিমিত হ'য়ে আসতে লাগলো। অস্ত্রের পরিভ্রমে উপর নির্ভরশীল একদল পঞ্চাঙ্গার আবির্ভাব হ'লো। যারা দুই সমাধি-নিষেধ পরিভ্রমে ঐর্ষ্য সৃষ্টি ক'রে সমাজের

নেতৃত্ব স্ব'রতে পাংহো, অমিহারী প্রচার কলে তারা সমাজের পক্ষে যোদ্ধা হ'য়ে দাঁড়ালো। বাংলার চারিদিক জীবনযাত্রার মান একেই পদ, সেই নিম্ন জীবন-মান আরও নিম্নতর হ'তে চ'ললো। বহু কৃষকের জীবনেই দুর্ভাগ্যের অঙ্ককার ব'নিয়ে এলো—কোনো বন্দমে ছ'মুঠো শেরে বিন ক'টোতে লাগলো। এই অবস্থায় যে ভীত অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রকাশ হ'বেই, তা অসংস্কার্য। সমস্ত উন্নয়ন শত্রু স্ব'তে এই অসন্তোষ বেড়ে চ'ললো।...১৯২১ খ্রীঃাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে ও ডাঃ মদনমোহন মেননঃর সভাপতিত্বের 'বঙ্গীয় প্রজাসংঘটি' স্থাপিত হয়। এই সমিতির মধ্যে বাংলার চাষি প্রথম নিজেদের স্বেচ্ছায় ও স্বজিহাদী সংগঠন প'ড়ে তোলে। কেবলমাত্র বুদ্ধি-জীবনগের হাতা সৃষ্টি এই সমিতি পূর্ণভাবে আইনামুগ উদ্বেগ সাধনের চেষ্টা নিয়ে কাজ ক'রে চ'ললো। ভারতীয় স্বাধীনতার অস্পষ্ট স্বাবী কিংবা প্রজাহের প্রতি অমিহার-দিগের সদ্ অচরণের অস্পষ্টতর স্বাবীর বহলে এই সমিতি চাষিদের নিদিষ্ট অভিযোগগুলি নির্দেশ করে আইনগত প্রতিকারের স্বাবী মানলো।...এইভাবে বাংলার কৃষক আন্দোলন কৃষক-বিপ্লবের অ'র্ধণ ও অ'র্ধিকের অসুপ্রেরণায় গামিষ্টা প্রভাবান্বিত হ'লো। তা হ'লেও এর অসুনির্ভিত আর্ধণ অসুস্থ হ'ল। তাইও কারণ ছিল। ষাঃ এই আন্দোলনের সংগঠক-সহায়ক ছিলেন, তাঁরা বাংলার কৃষকদের অর্থনৈতিক দুর্বলতা হ'তে স্বভাবের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক কেন্দ্রীভূত ক'রেছিলেন। চিরস্থায়ী মন্দোবস্তু ও পুস্তনি মধ্যেও ভাগ্যভাপির কলে বাংলার অস্ত্রাত মেলার চেয়ে মোদাখালি, ত্রিপুরা এবং নিকটবর্তী মেলো সমূহ বেশী ভাবে নির্ধাতিত হ'য়েছিল। সেইজন্য এই মেলোগুলিতেই ক্রমিগণ ও অমিহারের নির্ধাতনের বিস্তৃতি ভীত অস্তিমান আবর্ত হ'লো।...১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের কলে মুসলমান কংগ্রেসের নেতারা বুঝলেন যে, চাষিদের কষ্ট হুর করবার কোনো আত কার্ধকরী নীতি অসুস্থরণ না ক'রলে তাঁরা জনসাধারণের সাহায্য পাবেন না। বাংলা-দেশে মতামত ও অমিহার প্রেরণা যোষণ এত বেশী যে, তাই বিস্তৃতি লড়তেই জনসাধারণের সমস্ত উত্তম সুরিয়ে যায়। সে অবস্থায় তারা কেমন ক'রে শাস্তাচার্য্যবী শোষণের

বিকল্পে গাড়ীতে ? শোবক ও শোবিতের মধ্যে যে প্রান্তীয়, তাকে সরাসরে চেষ্টা হিসাবেই কৃষক প্রজা সমিতির কল্প। ... চিরস্থায়ী কমিটারী প্রজা নিয়ে কৃষকপ্রজা সমিতি তার উদ্দেশ্য চাইল, লীগ তাতে রাঙ্কি হলো না। নিঃশিষ্ট প্রজনে কৃষকপ্রজা সমিতিতে সঙ্গে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সমিতির অর্থনৈতিক সংস্কারের পরিকল্পনা যেনে নিতে অস্বীকৃত হ'লেন। সেই নির্বাচনে হুম এবং তার ফলাফলও কবা তারও অবস্থিত নাই। কোনো পক্ষই এই স্বপ্ন সম্পূর্ণ বিজয়ী হতে পারেনো না। কিন্তু লীগনেতা পরাভিত হওয়ার কৃষকপ্রজা সমিতির প্রাণান্ত বেড়ে গেল। এর পরই মৃতন শাশন আইন অদ্ব্যস্তী নিঃ কল্পুল হক কৃষকপ্রজা হলের নেতৃত্বপে ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রধান মন্ত্রী হ'লেন। কিন্তু তিনি লীগ হলের সঙ্গে আপোষ করেতে বাধ্য হ'লেন। তাঁর মন্ত্রী-পরিষদে কিন্তু কৃষকপ্রজাহলের চেয়ে কার্যদী স্বার্থওয়ালারা বেশী হ'লো। এই সময়েই কৃষকপ্রজা হলের মধ্যে একটা ভাঙন আরম্ভ হয়। তখন সংস্কারীরা বলে যে, নিঃ কল্পুল হকের অক্ষমতার ফলে সমিতির কার্যবাহী হ'চ্ছে না, তাহা আলাদা হ'বে যাওয়ার ভয় দেখালো। কয়েক মাস পরে আন্দামের তাড়নৈতিক বন্ধীসৃষ্টির সমস্তা নিয়ে ভাঙন সত্য সত্যই হলো—হকসাংসং ও তখন লীগে যোগ দিয়ে লীগকে 'সক্তিশালী' করেতে উঠে পড়ে লাগলেন। সমিতিতে ভাঙন হ'লো। বটে, কিন্তু মন্দের ভিতর দিয়েও ভালো আসে। এই ভাঙনের ভিতর দিয়ে এমন সক্তি এলো যে, কল্পই প্রচলিত আইন প্রণয়ন করেবার তাগিদ এলো। মন্ত্রীমণ্ডলী কোনোবাকমে এই বিকোষ প্রথমিত করেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কৃষকপ্রজা সমিতির পরস্বেতা অবিলম্বে আইন পাশের জোর তাগিদ দিলেন। বঙ্গলেন, নির্বাচনের সময় যে কার্যবাহী ছিল, তা পূর্ণ করতে হবে। এইভাবে নির্বাচনী শপথের অনেক অংশই আইনে পরিণত হ'লো। কৃষকপ্রজা হলের এই তাগিদের ক্ষত ক্রবিশ্ব এবং স্বাক্ষর্য হার প্রভৃতি সঙ্কে অনেক আইন রচিত হ'লে কৃষকের দুঃখ অনেকাংশে লাঘব হ'লো।"

'নববুগের' কাজের হস্তে তার কাটানুগ্ণায় হেয়েমেন্নাথ হকের সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠতে দেখা হ'লো।

না। মাঝে মাঝে গর্তা বোড়ে তাঁর বাড়িতে যেতাম। শুনেছিলাম—তিনি শুধু কল খেতে থাকেন। কল বেহ, দুতি ও ঘলাবড় কোট গারে। বাবুয়ার প্রতিষ্ঠিত সাধনাশ্রমের পরিচালন-তার তাঁর উপর দ্রাষ্ট। এ সময়ে ডারমণ্ডহারবার অকলেব সংকল্পে লেছে ছাত্রেরা মিলে বাবুয়া সাধনাশ্রম প্রাঙ্গনে এক উৎসবের আয়োজন করে বিমল ঘোষ (মোহাছি) ও আমাকে নিয়ে যাত্র। মোহাছির সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না, এবারে সংযোগ ঘটলো। ছাত্রেরা বেথলায়—আমাদের পেয়ে আর ছাড়তে চায় না। কাগজে আমাদের বিরতি বেরো-বার পর প্রায়ই ছেলেরা ছুটে আসতো কল্কাতার। তাদের আদর্শ বড় মধুর ছিল। কোনো দ্বার্ব নেই, কোনো উদ্বেগ নেই; তাদের হলের বিশেষতম একজন করে পেতে চায় আমাদের, পাবার আশঙ্কেই ছুটে আসতো, এলে নিয়ে বেতে চাইত তাদের নিকষের পরিবেশে। লক্ষ্য করে একদিন হেয়েমেন্নাথ গুপ্ত হ'লেন, 'গুপ্তা স্বপন কাছে পেতে চায়, বেরো তখন মাঝে মাঝে আশ্রমে; তাতে আশ্রমকেও ভালো লাগবে, ছেলেরকেও ভালো লাগবে।'

কিন্তু তাতে যা অর্থের প্রয়োজন ছিল, তা সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। ফলে ডারমণ্ডহারবারের ছাত্রবৃত্তবের সঙ্গে যোগাযোগটা বেশীকাল স্থায়ী হ'লো না।

হেয়েমেন্নাথ তখন তাঁর ব্রাহ্ম ট্রুটির বেড অফিস থেকে নিজস্ব একঘানি মাসিকপত্র সম্পাদনা করতেন, নাম 'মাক্কুমি'। 'মাক্কুমি'র বাবতীয় সম্পাদনা কার্য নির্বাহ করতেন কবি গোপাল ভৌমিক; 'কৃষক' পত্রিকার নব-মৌগি সম্পাদক গোপালচন্দ্র নির্যাস্তিও এ কাজে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হেয়েমেন্নাথ একদিন প্রস্তাব করলেন, 'তুমি তো নানা কাগজে গল্প প্রবন্ধ লেখ, এবার থেকে মাঝে মাঝে মাক্কুমিতেও লেখ।'

আমি তখন সমাজ ও বর্শন বিষয়ক কিছু কিছু রচনা লিখছি। এ সম্পর্কে কিছু কিছু বিশেষত্ব বইয়েরও আবশ্যকতা ঘোষ করছিলামও হেয়েমেন্নাথের প্রস্তাবে রাজি হ'বে বঙ্গলায়, লিখবো। তবে আমার, প্রয়োজনীয়

কিছু বই যদি আমাকে আনিরে দেবার ব্যবস্থা করেন, তবে বিশেষ উপকার বহু।'

হেমেন্দ্রনাথ বললেন, 'কোন বইয়ের কত হান, আমাকে লিষ্ট ক'রে দিও, আনিরে দেবো, ও বই তোমার নিকেরই থাকবে।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা লিষ্ট ক'রে দিলাম, James Allen প্রণীত From poverty to power, All these things added, By ways of Blessedness, The life triumphant, Above life's turmoil ও Light on life's difficulties. আপাতত এই কয়েকখানি। সব মিলিয়ে হান উনিশ শিলিং কি কিছু বেশী। হেমেন্দ্রনাথ আমার হাতে টাকা ভণ্ডে দিবে বললেন, 'হোকান থেকে তুমিই এনে নিও।'

দোকানে গিয়ে সেদিনই বই নিয়ে এসে হেমেন্দ্রনাথকে দেখালাম। খুশী হ'রে তিনি বললেন, 'এমনি থেকেই তা হ'লে মাতৃভূমিতে লিখছো? লিখে গোপাল জৈমিন্যকে কপি দিয়ে এসো।'

তাই হ'লো। James Allen-এর বই আমার যে খুব উপকারে এলো, এমন নয়। লেখা যা তৈরী হবার, আগে থেকেই হ'রেছিল। এবারে গিয়ে কপি গোপাল জৈমিন্যের হাতে দিলাম। এই স্ত্রে অল্প দিনের মধ্যেই গোপাল জৈমিন্যকে বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু বিধেবে পেলাম। 'আপনি' থেকে কখন যে দু'জনেই 'ভূমি'তে নেমে এসাম, নিষেধাই আনি না। মাতৃভূমির প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে

আমার রচনা ব্যবহার ক'রে পত্রিকার তরফ থেকে আমার প্রতি সে বিশেষ মৰ্যাদা প্রদর্শন ক'রলো। রচনা পাঁচ হেমেন্দ্রনাথ ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'অপূর্ব লেখা হ'রেছে, এবারের সংখ্যার তোমার লেখাটাই আমার সব চাইতে ভালো লাগলো। এ জাতীয় আরও কিছু লেখ।'

বললাম, 'দিশবার পর মনে মনে সেই তাদিহই অমৃত্যু ক'রছি; আরও অল্পতঃ তিন চারটে লিখবো, সবগুলো মিলিয়ে Socio-philosophyর একটা পুরো series হবে, এ সিবিজ আমি মাতৃভূমিতেই রেবো এবং পরে বই আকারে বার করবো।'

খুশী হ'রে হেমেন্দ্রনাথ বললেন, 'খুব ভালো আইডিয়া। লেখ; আমি তোমার পরবর্তী রচনার অপেক্ষার রইলাম।'

এমন সম্পাদক তখন খুব কমই দেখেছি—যিনি এমন ক'রে আত্মবিক্রমতা সঙ্গে লিখিয়েছেন এবং রচনা প্রকাশের পর উজ্জ্বলিত প্রকাশের মুখর হ'রে উঠেছেন। মনে মনে একসঙ্গে সেদিন শ্রদ্ধা আনিরেছি হেমেন্দ্রনাথকে। উত্তর-কালে এই রচনাগুলো একত্রিত ক'রে আমার 'সমাজ-বর্ধন' গ্রন্থ প্রকাশ ক'রলাম। 'অগামী পৃথিবী' উপস্থানে যে আইডিয়ায় সূত্রপাত, 'সমাজ-বর্ধন' তাই পদ্ধতি। একদিন যা কথাসাহিত্যের নাটকের মনে মন্ত্রবিত্ত হ'রে উঠেছিল, পরবর্তী-কালে তা বিপুল প্রাচীর রূপ নিয়ে দেখা দিল। দু'টোর ক্যানভাস আলো, অথচ সুর একই; কথা এবং বিষয়ের বিস্তৃতিতে সে সুর শুধু নানা তালে বেজেছে।



দুই সোঁতা নদী

মগেন দত্ত

ছিয়াম সাহা বেচিন গ্রাম ছাড়ল সেদিন গ্রামের দার-
বাকীর কাঁচবার বন্ধ হল। নন্দলাব মা ভাবছে কলঃমুলো মা
হয় বাড়িতে ভগ্নাংশ, তেল লজা কোথায় পাই অতএব যাই
ছিয়ামের কাছে বা-হোক-কিছু পাওয়া যাবে। আশ্বিন-
কান্তিক নারকেল সুপারি বিক্রির পরমা দিগে দার ফেলা
গোধ কটা যাবে। কিন্তু গাছের সুপারি গাছে পাকছে
লোকেরা এসে পেড়েও নিচ্ছে বটে, কিন্তু সরলা বা সরলাব
মায় প্রতিবাদ করতে সাহস হয়না, কি ছানি বাছ। কি
বলতে কি হয়। থাক, থাক, কিন্তু প্রতিবাদ বন্ধ হলে আর
বন্ধ হয়। আর ছিয়াম নেই ত দার-বাকীর পাট বন্ধ।
মা মেরে পরান্ন করে, উপায়। মা বলে, উপায় মা ভাবনা।
কিন্তু মা ভাবানীর মন্দিরে আজকাল সন্ধ্যা হীপ জলপেও,
কঁসার বট্টা বাতলে যাবা প্রতিবাদ করে তাহের সঙ্গে
প্রতিবাদের সাহস সরলাব নেই। বুড়ো মায়ের প্রতিবাদ
কোন কাজের প্রতিবাদ নয়। নিতান্তই অর্থহীন প্রসঙ্গে
পড়িত হয়। আজকে কামার বাড়ি কামারবাং বড়োয়না
হল। সে খবর মায়ের কাছে পৌঁছে গেছে; বলি বাতাল কি
কথা কহ? সরলা ভাবে, না পাবোনা সব হাঁক দিয়ে
মানিয়ে যায়? কিন্তু কে যে কোথায় যাচ্ছে, কেউ বলতে
পারে না। এতদিন সরলা মানত, যাত্রাকালে সবাই গন্তব্য
স্থানটা কোথায় বলে যায়। যে-ই যেখানে যায় যাবার
বেলায় বলত, মাসী অথুক স্থানে বাড়ি বসবোটা দেখে।
কিন্তু। কেউ বাড়ি ছেড়ে আস্তর বন্ধনের বেশে পেল, বলত
মাসী বহরোর দাকল, গাছের হল দাকল তোবা কিন্তু থেয়ে
নিবি। শশা যদি বেশী থাকে তবে দু-একটা পাকিয়ে
রাখবি। ইয়া এই শশা, সাধা কুন্ডো। এই সব বস্তু বহরিন
থবে তুলে রাখা চলে বলেই পেরাং সবাইকে তুলে রাখতে
বলে। গাছের নারকেল থাকলে পাড়িয়ে এক কুড়ি
আমায়ের লজ রাখবি তোরাও পাঁচটা নিসু। বিথবা
মাগুবের নারকেল বড় প্রির গাছ একথা গ্রাম বেশের সবাই

জানে। কিন্তু এবারের বিদেশ যাত্রা বড় অসুস্থ। কেউ
কাউকে কিছু বলেনা। কে যে কখন যায় তা-ও কেউ
জানেনা। দারাব পর এক ভীতপ্রব বিশ্বকর আবিভার
হল সেই পরন মতাটি—অথুক ঘেরাং নেই। সরলা বলে,
মা কামার বাড়ি বতন কামার চলে গেল। মা শঙ্কিত হয়ে
বলে, কিছু বলে গেল?
না কিছু বলেনিত!

এতদিন সরলা আর সরলাব মা এই কামার বাড়ির
ভরসা-ইে ধেশে ছিল। কামার বাড়ির অনবল ছিল।
অনেক কাহিনী শুনে-শুনে সরলাব মা স্থির করেছিল যদি
শর ছাড়তেই হয় তবে ওদের সঙ্গে যাব। কোথায় যাব?
পুত্রব ছেলে কেউ নেই যে বোঝাটা বইবে। মারে-মিরে
বতরিন পারি শরত বাড়ি পাহারা যোবে। বাড়ি পাহারা
যোবা সম্ভব, কিন্তু পেট পাহারা সম্ভব নয়। কেননা
ছিয়ামের পাওয়া-যোনাও ওপর শংসার চলে। কিন্তু সেই
ছিয়াম ত আজ আর গ্রামে নেই! কামার বাড়ির সম্ভ
কামার তবুও-বা ছিল। এবার কি উপায় হবে? সত্যি,
সত্যি সরলাব মা এক নির্বম ব্রহ্মপুত্রের মাঝে নিজেদের
অস্তিত্ব বিপর বোধ করল, নিঃসহায় বোধ করল। এই
প্রকাণ্ড বাড়ি না যেন বিরাট কারাগার। এই কারাগারে
ছুটি মাত্র করেদি, বাড়িতে কে যে এই বিরাট কারাগার
পাহারা দেয় তা সরলা জানেনা। কিন্তু মায়ের চোখে খু
নেই। কী যে আশঙ্কা দিনে-দিনে মনের মধ্যে বাসা
বৈবেছে এর থেকে যেন আর রেহাই নেই। মধ্য রাতে
ভোগে ওঠে মা, সরলাকে ডাকে, এই ওঠ যেবি। সরলাব
পড়ন্ত বৌবনের বিন তাই অনেকটা শঙ্কাবিহীন মনেই
সব কাণ স্বাধীন ভাবে চলে। তাই যুগ্মতও শান্তি
খানিকটা আছে বই কি? আয়ার আবার ভয় কি?
ভয়ের ব্যক্তি ত স্তোর হয়েছো। অধঃসে ব্যক্তিও শুকতারা
বেধতে পাচ্ছি। খানিকটা নিশ্চিত ইয়া নিশ্চিত, কিন্তু

খোঁপুলির রঙ যেমন আকাশের পা থেকে মুছে যেতে সময় নেয়—এও যেন ঘাই-ঘাই করেও গাছে না। এ ঘেঘের আনাচে-কানাচে কিছু-কিছু আলত উঁকিঝুঁকি নাগেছে। কিন্তু এ লুকিয়ে ছাপিয়ে কি করে চলি? না কিন্তু এই বিকেই বারবার বড় বড় চোখে করে তাকায়। কেন তাকায় এমনও কি...?

সবো শোন মা।

কেন, ঘুমতে দাও। বড় ঘুম পাচ্ছে।

ভোর ত ঘুম আসে আমি যে...।

হ্যাঁ যে সন্ত কামার কিছু বলে খেল।

কি আর বলবে। তোমার মাত লবঙ্গ হাংটা কেল দিয়ে গেল। আর আমার বাগা ছোড়া নিরিয়ে বিলে।

মা আমার একবার কাং হয়ে শুয়ে ঘুমবাং চেষ্টা করে আর কিছু বললে না।

আবার কি বলবে। আঃ ঘুমোতে দাও।

হঁ, তুই ঘুনা। আমি ভোর ঘুম পাহারা দেবো। তাই দিও। আমি ঘুমেই। সেই ভাল।

সবলা নিশ্চিন্ত মনে নাক ডেকে ঘুমেয়। মাং ঐ শব্দ শুনে রাত্রি ভোর হয়। আর শুক নীরব রাত্রি ভোরের বুকের মত নায়ের চোখের সামনে ভাসতে থাকে। এ কেমন নীরবতা গো! শূন্য বিন, কান্নার সাক্ষাৎ মেলেনা। সমস্ত গ্রাম নিশ্চেষ্ট ভাঙাত, শুধু দি বি করে ওঠে একটা লনি। সুপরি বাগানেও আনাচে-কানাচে ফুঁয়ের আলোটা শেব খেলা খেলো যায়। আবার সেই রাত্রি। সেই ঘুম না-আগা দৃষ্টিভার বসনা, বুড়ো বয়েসের ঘুম একবার ভাগলে আর তেমন করে ঘুমেনা। কিন্তু দৃষ্টিভা মনে। সবাই যাচ্ছে কোথায়, গং—বলতে পারিসু?

ও মা। আমি কেমন করে বলব।

একই প্রশ্ন ঘুমে-ঘুমে মায়ের মনে আসে।

মারে বিয়ে একই উত্তর দেয়।

মিত। দিনকার একই উত্তর। একই কথার শ্রুত মনোর আঁব ভাল লাগেনা। বারবার ভেবে কি হবে। যা স্থির করবে সেই মুহূর্তকাল স্থায়। কিন্তু মায়ের এলো-বোলো মন শু আর বাগা সম্ভব নয়।

মা আমার সবলাকে শুভায়, হ্যাঁ যে সবো, একটা কাক কোকিলেরও ডাক শুনিবে। দেশের কাকগুলো কি কোথায় চলে গেল?

না সেগুলো বেশ ছাড়বে কেন? সেগুলোর আমবেব নত কেউ নেই কোথায়। তারা ঠিকই আছে এখনই ভাত ছাড়াও। সব এসে দেখা দেবে।

তাই ভাল সবো চাওটি চাল ছড়িয়ে দে। ছুটা কাক আশুক তবু দেখি। একেবারে কান্নার মুখ দেখতে পাচ্ছিবে, মা বলে।

কাকের মুখের দেখতে হয় জুনি দেখো মা। আমি রান্নাঘরে থাব, সবো অনেকটা বাগত গবে বলে।

হঁ রান্নাঘরে থাকিত সবো। কিন্তু ছিদান পা চলে গেল তেল পাখি কোথায়? মা অনেকটা শঙ্কানুল ভিত্তে কথটা আপন মনে আউড়ে চলেন।

গরলা বলে, সেই গাঁয়ের শুভায় লছর মিকার বোকাগনে শুনিছি...।

তুই বলিসু কি হতভাগী, বলে মা ক্রমে ওঠে। আমি বাঘনের ফের...

তবে এমনি করে এখানে থেকে কাঁধিন ভাত বাগবে শুনি। এখানে থাকতে হলে লছরের বোকাগনের তেল খেতে হবে। সবো কথগুলো আজ্ঞেশের মতোই বলে। নির্জন গ্রাম। সাধাক্ততম মুখ দুখের লগাছতুতি বোকাগার কেউ নেই। দুটি বিখ্যা গ্রামী কেমন করে বাঁচি। পোড়া ছাই, মা তাত বুকে না। আর খুঁথিয়ে লাভ নেই মা তার খণ্ডের ভিত্তে ছাড়বে না। পোড়া ছাই ভিত্তের এত মায়া। এ ভিত্তের থেকে কবব কি যদি উপোস করে মরতে হয়।

মা বলে, তবে যে সেদিন ওরা সব মাতকরা এসে বলে গেল কোম তর নেই সব ঠিক হয়ে বাবে। দুদিনেই সব ঠিক হয়ে বাবে। তারা গেছে তারাও কিবে আসবে। মা আতঙ্কিত হয়ে তাবে কই, কেউত কিবে আসছে না। গ্রামের সবই চলে গেল!

সবো খোঁজ নিয়েছিল সবাই গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। আর গাঁয়ে কেই নেই।

মা মিছেই আঁব বাড়ির বাইরে বাবার লগ্ন গ্রন্থত।

লাঠিগাছি হাতে নিয়ে আন্তে-আন্তে বেরিয়ে পড়েন।
ক্রোধের ঠাণ্ডা হয় না। তবু চেষ্টা করে দুটি দিলে মোটা-
মুটি বেগুতে পান।

হাটুন পাড়ার বামুনরা বড় একটা কেউ নেই। কণ-
পাড়া শূন্য। মাহিচপাড়া উজাড়। মার হাঁটতে সাহায্য হল
না। আশ বহুকাপ পরে না গোরিজেছেন গ্রাম যুগে।
কিছু দূর গিয়ে আর মনের পা ওঠে না। বিরাট নিষ্কিন্তা
বেন বাসনার মত মাকে গ্রাস করতে চায়। সমস্ত গ্রাম
খাঁ-খাঁ করছে ভয় পাখীটি যেন নড়ে না। ছেলেগুলোর
উৎপাত নেই। কোথায় কোন গোলমাল শুনিছি না।
একটা গরুর গাড়ির ক্যাচ, ক্যাচ, শব্দ শুনে মা গাড়িরে
পড়েন। কপালে হাত তুলে খুব খুব থেকে কিছু ঠাণ্ডা
করতে চেষ্টা করেন।—পাঠিটা আকাশের দিকে তুলে
অশ্রু পূর্ণ কিছুই প্রতি ইঙ্গিত করেন। একটু ছোরে
পলার ঘর ঢুকিয়ে বলেন, কে যায় গা।

অ.জ: ছাতু মোড়ল।

ছাতু ভূই গাড়ি করে কোথায় বাচ্চিল বাপ।

মা সেখানে ঐ ইষ্টাশনে।

গাড়ীতে কে যায় রে।

আপনার ঘরে।

এমন অংগলার বাচ্চিল। আমকে শনিবার বৌকে
নিয়ে বেরিয়েছিল। তোমাদের মত ধর্ম সব গেল ছাতু।
ছাতু গাড়ি থেকে নেমেই দূরে গাড়িরে আপাম কবল।
তা বলত কোথায় বাচ্চিল।

ছাতু কোন কথাই শুন্য না দিয়ে চুপ করে থাকে।
কোথায় বাচ্ছে তা সে নিজেও জানে না। টিকেট করে
বর্ণনা পার হবে তারপর কোথায় যাবে—তা কেমন করে
বলবে ছাতু।

ছাতুকে নীরব ঘেঁষে মা ভেতরে-ভেতরে বানিকটা
বিলেতে হয়ে ওঠেন। ভাবেন, সজ্জি শ্রদ্ধাও বেশ থেকে চলে
গেল। একটা কথার শব্দও কেউ দিতে চায় না।

ছাতু একটু দূর নিয়ে বলে, বাচ্চি, ইষ্টাশনে তারপর
আগাখাটে।

এর বেশী আর ছাতুর কথনা বেলে না। সে আনত
না এতদূর কোন পদযা স্থান আছে কি না। সবাই

যাচ্ছে। সে-ও মিছিলে যোগ দিয়েছে মাত্র ভাল মন্দ,
ভূত-ভবিষ্যতে বিচার করার মত বুদ্ধি, তাহ নেই। শুধু
বুকে নিয়েছে যেতে হবে। কোথায় যেতে হবে, কেন
যেতে হবে তা সে জানে না।

মা আর বিবস্ত্রিতরে কোন প্রশ্ন করেন না। লাঠিতে
ভর দিয়ে ঘেঁষেবে এসেছিলেন সেই পথেই বাড়ি দিয়ে
গেলেন। মনের মধ্যে সেই এক কথা আমি অহরের
হোকানের তেল কি করে ধাব। তবে কি এখানে থাকলে
শেষ ঐ লগ যেতে হবে। মা শিটরে ওঠেন। একদিকে
আতর্ষ্য আর একদিকে স্বভাবের ভিটে। দৃষ্টো জোল হতে
ওজন করতে চান। এখন কাকে রাখি। এই বাড়ির
ঘোড়ামা পুছুর বাগান। সব ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু
কোথায় যাবে? কে দেখবে আমাদের? এখানে না ঘর
মায়ের-দিয়ে আছে। মা আপন অন্তরে পীড়া বোধ করেন
শশুর কষ্টকিত চেতনা মৃত্যুপথযাত্রীর মত প্রশ্ন
যেহনায় বিহ্বল। আগার বাড়ি ঘর ঘোড়ামার কথা মনে
পড়ে। শামসুদ্দিনের ঘর দিয়ে বয়ার কথা ছিল। সে-ও ত
কই আসছে না; এতদিন শামসুদ্দিনের না-আগাটা তত
মনে হয়নি। আজ যেন কোন কারণে সেই না-আগাটাই
মনে বড় হয়ে বেধা দিল। স্রুত ও অস্রুত কাহিনী, অচেনা
আগত্যা নীবিড় মেঘের মত মনে ছড়িয়ে পড়ে। বাড়ি
দিয়েই ঘেঁষে শামসুদ্দিন বানরে ছিলেব করছে সবলার সঙ্গে।
মা ভাবে, তবেত যা শুনি তা সত্যি নয়।

চাটী কোথায় ছিলে এতজন, শামসুদ্দিন বলে।

মা একটু লজ্জা পেয়ে বলেন, ছিলাম ত ও-পাড়ার
বাবা, কিন্তু বেশ-গায়ে কেউ-ই যে নেই কেমন করে থাকি
বলত?

সবলা বলে, মাকোমার কি আর সময় নেই। এখন
কাণ করতে দাও। সবলা ভাবে, এর সামনে এ আলোচনা
কেন? সত্যিকার শামসুদ্দিনের সামনে আলোচনাটাকে
চাপা দিতে চায়।

শামসুদ্দিনও আর এগিয়ে আলাপ করতে চায় না। বৃদ্ধ
পক বেশ শামসুদ্দিনও আনত, চাটীরা চলে যাবে সে
অনেককে বলেছে, যেরোনা তেউ শ্যোনেমি। চাটীরাও
শুনবে না। যাক, এ এক আখ্যায়ি বই।

খেতে বসে যা বলেন, লগা, একটা লোক নেই গায়ে।
কেমন করে থাকি, বলত ?

কেন তোমার খবরের ভিটের থাকবে ভয় কি ?

মা ক্রমে উঠে বলেন, ভয় কবি কাকে ? ভাবনা হচ্ছে
যাত দুপুরে—অমুখ-বিমুখ হলে বাড়ির হাতের ওয়াল্টু
মিলবে না। হাতাখনও চলে গেল। হাতাখন কবিয়াল চলে
গেল শুনে মায়ের বাস্তব বাধা বেন আরো বেড়ে গেল।
এমন নিমখ পীড়ন না আর জীবনে কোন দিন অতুভব
করেননি। নিমেষ পরিচিত সমাজ, সমাজ পরিবেশ যে
এমন ভয়াবহ প্রত্যয় বিস্তার করে তা কি কবে বা বুঝবেন।
যা শুধু কে গেল, কে নেই তারই হিসেব নিয়ে ব্যস্ত।
থেকে-থেকে একই কথা মনের মধ্যে বাজতে থাকে সবাই
গেলে আমার বাব কবার লোকটি মিলবে না। গলা সাক্ষী
কহবে কে ? মৃত্যুকাল, ভবিষ্যৎ পুণ্যের সন্ধর, মার
চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে চীৎকার
করে ওঠেন, লগা।

মা উচ্চাছ, সরলা উত্তর করে। সরলা আজ বহুদিন
পরে পুঙ্খবহে বাবে দাঁড়িয়ে নোড়ন বুঝকো কুলের গাছ
বেশছিল। মার অস্বাভাবিক চীৎকারে দর চুটে এলে।

মা বলেন, নে, মন স্থির কর। সবকছিয়ে নে আমারও
বাব। এখানে থাকল গলা পাব না।

মা গলা পাবে না। এই আশার গ্রাম ছাড়তে রাজী
হলেন। সরলা কিন্তু জানত গ্রাম ছাড়লে উপবাস।
সাতকুল কেউ নেই। আর ঘারা আছে সবাই সরে
পড়ছে। বোঁক বের না, পাছে সাধাণ্য করতে হয়।
সরলায় স্বাভাবিক মর্যাদাবোধ সাহস্যের কথা শুনেসেই
বিম্ব হয়।

সরলা জানত গ্রাম ছাড়লে সেই সাধাণ্য, সেই অপমান,
তাকে পীড়া দেবেই। অনেকটা এই আশঙ্কা করেই গ্রাম
ছাড়বার কথা মূগেও আগেনি। খবরকুলের সবাই তাদের
গ্রাম ছেড়েছে, এ খবর সে পেয়েছে। যারা ছেড়েছে গ্রাম
তাদের হস্ত ভরসা আছে। কিন্তু আমাদের উপায় কি
হবে। যদি একটা ভাই-ও থাকত তবে হস্ত এই দুহিনে
সে কাছে এসে ঠাড়াত। কাকে কিছুই নেই শুধু বেবে গ্রাম
আছে, আর মনে ইচ্ছা আছে তারা কি হবে বীচে। সন্ত

কামার গ্রাম ছাড়বার পর সরলার অনুৎকণ্ঠার ইচ্ছে যথেষ্ট
মাকে বলে, এমন আর নয় না নির্জন বাড়ি দুখপের মত
মনে হয়। এ থেকে বেছাই গেলে বীতি। সরলায়
স্বাভাবিক বাস্তব বৃদ্ধি তাকে বাধা দিয়েছে—আমাদের
কেউ নেই, আমরা বাব কি, কোথায় কি জুটেবে।
মাকে নিয়ে আর ত পেরে ওঠা যাচ্ছে না, মা ক্রমশই
গ্রাম ছাড়বার তত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন। এই
উৎকণ্ঠা ভবিষ্যৎ পুণ্যের ভরসা মার মনকে ক্রমশই
আলোড়িত করছে। এই আলোড়নের চেউ সরলাকেও
স্পর্শ করেছে। মায়ের-বিয়ে এই নিয়ে কন তর্ক হয়নি।
কথা বড়, ভাত-মল গ্রহণ বড় এসবই এতদিনে হয়ে গেছে
কিন্তু মামাংগা নেই, সমাধন নেই, এমনই সমস্ত। গ্রামে
কাস্তর মুখটি না বেবে-বেবে সরলার মনটা ক্রমশই হাঁকিয়ে
ওঠে। নিশল জীবনযাত্রার অত্যাচার অতুভব করে। নিত্য-
বিন মায়ের কথা আর শুনেতে ভাল লাগে না। মনটা
গুরিয়ে মস্তকুনি হতেছে। মার কথা শুনেসেই আজকাল
সরলা ক্রম হয়ে উত্তর করে। মা বেন সরলার কাছে
বাখ-বিগতি, বিস্তারের কারণ। একে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে
কোথায় বাব। যদি একা-একা থাকতাম, নিজের পেট ত
চালিয়ে নিভাম। কিন্তু দুটো মাহুখ বে, কপালের দুগে
ঠেকাবে কে ? মরত সব বেয়ে বৃদ্ধি এখনও বীচে আছে।
আর এমন সময় বীচে থাকল বখন বাড়ি পর ছেড়ে সব
পালাই-পালাই করছে—এ কী দুব গো। এ কী ধারা
এলে বেলে।

বর্ষনা টেনের তিন দিনের ভূত বেবে সরলা হস্ততথ।
তার ব্যস্তকিত্তি এক ব্রহ্মক রহিত বসেই বোধ হয়। এ
দুস্তিত্তার বেবে ছায়া নয়, অন্ধ, ক্রম, ক্রম বেবে গোপন
নিমখ পর সকার চলছে মনে-মনে। অনিচ্ছিত ভবিষ্যৎ,
অপরিচিত বস্ত, অপ্রয়োজনীয় আলোচনা, অবাঞ্ছিত
কৌতুহল, অবাঞ্ছিত মেহ—এসবই বেন এক কৌতুকাবহ
সমাবেশ রয়েছে এই টেনে। এখানে আন্তঃয়ের অতাব
নেই, দুটি দিয়ে ইচ্ছিত বিনিময়ের বস্ত অস্ত নেই।
প্রথমটা সরলা খুব ভরহকে গেল, থাকে জামিনা-ভূমিনা সে
এত নিকট আত্মীয় ! এটা সরলার জীবনে মরা অভিজ্ঞতা,
মা কিন্তু উঠে। কথা বলেন, লগা, খুব সাবধান। এখানে-

কার হাঙ্গুর হাল-চাল বোঝা মুক্তি। আমাদের সব টিক আছে ত। উঃ সব ছুঁয়ে ফিলে। আশ তিন দিন ধরে চাঁদকার শুনে-শুনে কান কালাপালা হয়ে গেল। এ কী বেশে বাবা, এখানে সবাই কথা বলে। মায়ের কাছে এই অল্প প্রত্যাশা ভাল লাগে না, কোথা থেকে আসছি—এত কথা তোমাদের জান লাভ কি বাপু। না, এ হাটের মধ্যে ভাল লাগেনা সরো, চল বাই অল্প কোথা বাই। সরো দিনে-দিনে আরো তিক্ত হয়ে ওঠে, তীব্র সুখে জীবন কে, কোথায় বাবে শুনি ?

বাবা বিশ্বনাথের কাছে।

সরো খাতে-খাত চেপে, অশ্রু পলার বলে, তার আগেই পলা পাবে।

আশ তিন দিন ধরে লোক আসছে-ই আসছে। এর যেন বিরতি নেই। অমৃত জনশ্রোত, কোথা থেকে আসছে, কেন আসছে তা না কিছুই ভাবতে পারেন না। শুধু তাইবন সবাই কি আমাদের মত বাড়ি ছাড়ল। এদের কাকুর কি নিজ বাড়ি বহু কোত জমার প্রতি মনতা নেই গা। বা, এত লোকের ভীড় কোন দিন দেখেননি সবাই মুখে এমন আশের চিহ্নও কোন দিন দেখেননি। লোকে লোকান্তর ঘূর্ণনা টেনে। আশ তিন দিন ধরে জন শ্রোত জমে-জমে এখন যেন টেনে জনতার ডেউ উপচে পড়ছে। কে যে কোথায় আছে, হাঙ্গুরে মাথার-মাথার ঠেকছে, গায়-গায় খাটা লাগছে। টাক বিছান: বাজে পাহাড় জমে গেল। অল্প কোলাহল, আর অশ্রু চাঁদকার, আশ ক'দিন ধরে কথা শুনে-শুনে মায়ের মন, মেঝা, পিঁড়ি তিক্ত হয়ে উঠেছে। সরো কোন কিছু প্রশ্ন করবার আগেই মায় মুখে হয়ে ওঠে। এই অতি কক্ষ মেঝারের কথা ভেবে সরো দু'একবার নিজের ভেতরেও উক হয়ে উঠেছে। বাড়িকোর তিক্ততা মায়ের মনকে এমন তার অগভীর, এমনতর তিক্ত-বিরক্ত করেছে। প্রথম প্রথম এই কথা কেহই সরো নিজেকে শাশুনা দিয়েছিল। কিন্তু মায়ের কক্ষ মেঝারের ক্রমিক পরিণতি হেঁপে সরো শাশুনার ঘুঁ হয়েছিল। অন্তর থেকে কেমন যেন একটা তাড়িয়া, উদ্বাসিত বোধ দিয়েছে। শাশুনার অসহ্য মত মনে

হচ্ছিল। এমন বোঝা, বহন করলেও বেহাই নেই ছেড়ে গিয়ে শান্তি নেই। নিরুপায় ভেবেই সরো নৈরাশ্রের মধ্যে তলিয়ে যায়, কোন এক অস্থির চেতনা নিয়ে ফিরে আসে। এ জীবনের এক অশ্রু পলার মুখ। এর হাত থেকে বেহাই না গেলে সে নিঃশেষ বাঁচবে না। তারকত বাঁচতে হবে অনেক দিন। এই বৈধব্যের কীটাপন ফিরে অনেকখানি পথ বেয়ে যেতে হবে। অথচ জীবনের মূল্য নেই, না মেরুর অবলম্বন আর এই নির্বন্ধ কণে ছিন্ন যন্ত্রে নির্বন্ধ বোঝার পরিণত হয়েছে। মা তাইবে, সরো আমাকে ডোবালা, আমার নিশ্চিত গৃহপাল ছাড়িয়ে হাটে বিকিরে ছিল। এই কথা ভেবে-ভেবে কস্তাক কুলের ক...ল...ল...। এইখানে আসা, হাটে বাজারের মত সব গায়-গা খেঁপে হাট বাজারী কথা-পাড়া বলা। টেনে বাসের-তৃতীয় দিন সরো রেল বাজারে গিয়াছিল কিছু কিনতে। এই অশ্রুপূর্ণিত আর কল্পিত মেলামেশার চিত্র একে মায়ের মন স্মৃতিস্থান হয়ে ওঠে। মায়ের হাটে কি মান সন্ধান থাকে। মা কুহু স্মৃতিস্থান মুষ্টি বেনে বলে, এ কোথায় নিয়ে এলি হতভাগী।

সরো প্রথমটা ধমক থাকে। উত্তর দেয় না। উত্তর দেবার নয় তাই ব্যবহার ফিরে জানিয়ে দেয়—তোমার সঙ্গে থাকি মায় না।

মা আরো তীব্র ভাষার বলে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ সর্বনাশী। সরো সর্বাঙ্গ ফিরি করে ওঠে। মনে হয় শাশুনার মত কমা তোলে। কিন্তু এই ক্রমবিন্যাস জনশ্রিত অবস্থা তার মনে এক অসীম উদ্বাসিতের সৃষ্টি করেছে। যেখানে বাবে বলে বাজা করে বেরিয়েছে সেখানে আরো পৌঁছতে পারবে কিনা তাও সে জানে না। অসংখ্য লোকের নিরুদ্দেশ ঘাত্রার সঙ্গীত, পক্ষ্মতী, জ্ঞাত ভবিষ্যৎ তার মনকে নিম্পূর্ণ করে তুলেছে। এই অল্প ঘাত্রী সমাজের পরিতৃপ্ত বীণা অস্তিত্বের পরেও যে জীবন আছে—এমন কথা ভাববার ক্ষমতা সরো ছিল না। এই জনশ্রুতির ডেউ যেখানে পৌঁছায় সেও সেখানে পৌঁছবে। কিন্তু মায়ের শাশুনা ডেউয়ের পরে বোঝা।

সরো নীরব থেকে কুহু মুষ্টি নিঃসৃত দেয়। মুষ্টিতে আশ্রয় টিকতে পড়ে।

মাঝের কাছে এই দুটি অজস্র ইন্দিতির মত তেলে
আনে। মনে বহুবেন যতবিধা মেল কথা কইছে।

মা আশঙ্কায় চীৎকার করে বলে, কী বলি সারা হুই
কথা বল।

মাঝের কথা সুরে উদ্ভাসিত হয়ে কাটার ঝোঁরাব
ছাপিয়ে উঠতে চায়।

বিস্ত্রস্ত মা হাতে তুলে কি যেন বলতে বাবে অমনি
উল্লসিত অন্তঃতঃ টেউরব এক অংশ নায়েব গারে পড়ে
মাকে বাণা দেয়।

আ...আ...একি হচ্ছে! সরা, সরা।

উৎকণ্ঠিত অন্তঃতঃ দিন এক দুহুর্ভের ঝলকে উঠল।
অকৃত্য ভ্রমণেও তবিত্ব সামান্ত একটু পদা তুলে একবার
দুচকি ছেলে, আবার বহুস্তের অন্তঃতঃ মিলিয়ে গেল।
আজ তিন রাত্রি তিন দিন গত হবার হুং বানপুর থেকে
কয়েক বানি বগী ততি অধ্যাষা যাত্রী নিয়ে ইন্দির দর্শনা
ঠেলে প্রবেশ করল। এ প্রবেশ না যেন সবুজের
চেউয়ের বুক চিবে অতিকার জাহাঙ্গীর রথ গতি বিশেষণ,
বিজ্ঞি চেউগুলোর অতঃতঃ অদ্ব উৎকণ্ঠন। অন্তঃতঃ
চেউয়ের এক অংশ আহুড়ে পড়ছে আর এক অংশ বেল
কাবুদার বহুজা আনালা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। এই আপন্ন
ও নিগমনের খেলায় মা-ময়ে নেই বটে, কিন্তু আশ্বাসন
কাউকে রেহাই দেয় না। মা-ময়েকও না। অজস্র কল
কর্ভর মধ্যে একটি কণি কর্ত্তর, কণি আর্জনাগ,
অম্পষ্ট মোখবন, সরা! সরা!! সরা!!!

আর সরা, রাইখা বেও তোমারি সরা। আগের
গারিতে উঠা লই।

লাঠিতে ভর সরা না। বেহ আর পা আর বাধতে চায়
না। মন চায় শুধু এগোতে সেই ভিটে মাটির পানে।
মা এক পা ছু পা করে এগোয় যে-পথে এসেছিল সেই
পথেই। কাকুর কথা তার মনে হচ্ছে না। এ শেষ তার
নেই কোথায় সে যাচ্ছে শুধু যাচ্ছে নিজের ভিটে মাটির
পানে এবং তা চিরাচরিত অভ্যাসের বশে। থক বাঁচা
গেল। ওরে রাপুর্ কি নইকহুত, কি নইকহুত। ওখানে
কি মায়াব ঝল করতে পারে। বাস করতে পারে না,

জবে...না থাক সে হতভাগী। না, না, ওর নরকগণ
সইবে। ও আমার কেউ নয়। ওকে আমি গর্ভে ধরিনি।
ও আমার গর্ভের লজ্জা কলক কলকিনী নরকে ডুবছে।
মা উৎকণ্ঠ উত্তেজনার আপনি টাল পড়ে। বেহ আর
বেহ নেইত, জাহা মাংসপিত্ত। যন্ত্র-যন্ত্রাঙ্গী ভিটে,
বশের ইচ্ছাতের প্রতীক বহু-বাড়ি কোত-জমা এছেড়ে
কোথায় বাবে সে। না বেউ আমার নয়, বস্তাও নয়।
আমার কনি আমার বহু তৈজসপত্র বাসন-কোশন আমার
জপেত মালা, আমার নামাবলী।

হুর্গের শেষ ঝলক যোহ ছর নির্জন গৃহ অজনের কাছে
শেষ বস্তাও বেহে বিহার হুং-বহে করছে এমন সময় মা
এলেন ছুটে, বেহে আমায়...!

অগ্নির দাক্ষেয় লিখিত এক বিরাট ইতিহাস, বহু
দোহের অন্তঃতঃ অতীত ইতিহাসের কথা। এক
সিরাট তদুপের মধ্য থেকে ওঠি কয়েক লোক, কি
যো হুং-বহে করছিল। মা লাঠি উঠিয়ে সেই দিকেই
ছুটলেন। আগন্তুক, অচেনা মাংসবো বহু-বাড়ি মাঝিল
সেই দিকে মা লাঠি উঠিয়ে একবার পা বাড়লেন। শাম-
সন্নি পেছন থেকে ডাকল, চাট, তুনি এসেছে। বাঁচানাম,
বেহ হাত খানা ওশা কেটে বেহে গেছে।

মা অর্ধহীন দুটির মাহুত, গতিহীন জড়, গাহারীম
পুরোনো অতীত। মনে হয় কোন এক হুং সে ছিল।
হ্যাঁ ছিল বই কি কোন এক বেহে এক বিবাহ মা।

আপনাদের বেশ হুঁকি বর্ণনার কাছে? কে একজন
প্রশ্ন করল।

গাড়িটা কেবলই বেহে বেহে রথ গতিতে চলছে।
লতার-পাতার অড়ানো কলকাতার বহু-বাড়ি মত
গাড়িটা চলছে। এখানে অবিত্তি লতা নেই, আছে অধ্যা
যোহা-লতা—যে বেধান থেকে পারছে টেন বহু-বাড়ি।

সবলা হুং তুলে তাকাল। গাড়িতে মাংসের মাথা
ছাড়া কিছুই বেহেতে পাওয়া যায় না। সব মাথাই চলছে
গাড়ির ভাল-ভালে।

পানের লোকটির বেহে মহলার বেহে স্পর্শ করতাই

সরলা ঝংকে ওঠে। আঃ একি অন্ধার। অতঃ—সরলা
নিঃশব্দ মনে-মনে বলে।

লোকটি আবার একটু ঘেসে বলে, হ্যাঁ অন্ধারত বটেই
কিন্তু করি বসুন।

সরলা কটনট করে তার বিকে তাকায়।

ঘর্শনার মানুষ হলেন আপনি আমার বেশের লোক।

সরলা আবার তাকায়, বলে, আপনার বেশ বুড়ি
ঘর্শনার।

হ্যাঁ।

সরলা যেন একটা আশ্রয় পেলে। মনটা একটু স্বস্তির
নিশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই হঠাৎ বন্ধ হয়ে এলে—কিন্তু
না। এ ভীষণ চাপে কে যে তাকে এই ট্রেনের কামরায়
তুলে দিয়েছে তা ঠিক মনে নেই। কে যে হাত ধরে ট্রেনে
তুলেছিল এইটুকু মনে আছে। সরলার একবার ইচ্ছে
হল জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে। কিন্তু গাড়ির
জানালাগত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বাইরের সব
পৃথিবী ঠাই নিয়েছে কয়েক হাত প্রশস্ত রেলের বগীর
দশে। সামান্য দুই বিদ্যুতের আলোতে সেই লোকটা
তাকাল। বলল, লাগছে নাকি। কিছুতেই শরীরাটা তাল
শাদলাতে পারছি না।

তাল শাদলাতে না পাতেনত অন্ধ লোকের গায় পড়ুন।
সরলা ক্রম্ব হয়ে উত্তর দেয়।

ডাইত! ডাইত!!

এখানে গাড়ির গতি বেশ বেড়েছে। এই বয়স আলোর

আবছা অন্ধকারে সমগ্র বাত্মীগুলো বিশেষ তাকীতে তাল
ঠুকে-ঠুকে চলছে। শব্দের আর বিরতি নেই। বাক্যের
ঝাঁপিতে আর চাকনা পড়ে না। চোখ কান্নের ফ্রিয়ার স্বত্ব
হয়ে আসে। পানের লোকটির বেহ আবার সরলার বেশ
স্পর্শ করে। এবারে স্পর্শ যেন প্রবল হয়ে ওঠে। এ বেহের
স্পর্শ অন্ধ বেহের বাই বহন করে আনে—প্রথমটা সরলা যেন
কেমন বিভ্রান্তের ভাবল এ কি বকম অহুত্ব। তারপর
আবার বেহটা এলিয়ে পড়ে অঙ্গে। বহুকাল এ অহুত্বটির
সাদা নেই জীবনে। মনের মস্ততে কবে, কোন দিন, কে
কোবার একটু অক্ষ কেলেছিল—তা আক স্মৃতিয়ে গেছে।
নিশ্চিৎ অক্ষর স্মৃতি রেখা যের সরলার মন বেয়ে চলল
অস্পষ্ট বহুতমর সুখ স্নেহের ঘেশে। হয়ত তাই এমনি
অহুত্বটি পেদিনও ছিল। অঙ্গে স্পর্শের এই অহুত্বটিটা
কিছুক্ষণের অল্প বহত পরিচিত বোধ হচ্ছে—সরলা
কেমনতর যেন আড়মোড়া দিয়ে উঠল।

গাড়ি কোন একটা ষ্টেশনে লাল আলো দেখে হঠাৎ
ধনকে ধাঁড়াল। বাত্মীঘের বিশেষ ভঙ্গীর গতিটা হঠাৎ
স্বচ্ছ হয়ে যায়, এর-ওর গার ছিটকে পড়ে। সেই লোকটা,
হ্যাঁ লোকটাই সরলা বর আবছা অন্ধকারের মধ্যে দেখতে
পেল, ছিটকে সরলার কোলের ওপর পড়ল। দু'বাহু দিয়ে
সরলার গলা ধড়িয়ে গানের কাছে মুখ এনে বলল, মনে
করবেন না কিছু। অমনিতেই পড়ে গেছি।

সরলা তখনও সেই পাত অন্ধ স্মৃতির ঘেশে যুবে
বেড়াচ্ছে। সরলার শিরার শিরার কেমনতর যেন এক
শিহরণ।



পছন্দ ঐশ্রীভিন্নরী কর

এবারে খবরটা কিছু কন্দের উপর দিয়ে পেল তেবে কিছুটা স্বস্তির মিখান ফেললেন ভবেশ বাবু। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আনেন নি। পরামর্শ ক'বে গ্রহিণী সুমনাঃ নকেই পুঞ্জোর বাজারটা সেবে ফেলেন। ছেলে মেয়েরা কেউ তেমন ছোটটি নেই—তাদের মতামত একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। বড় ছেলের নবপবিত্রতা বধু কথায় নবাব আগে শুনতে হয়—কারণ সে বড়ই মেহের পাখী।

রায়ে এই পরামর্শের পর সকালে খাওয়ার সময় পুঞ্জোর বাজারের কথা উঠতেই সুমনা নবাবা আত্মগত ভাবে স্বভাব দিয়ে বললেন,—কেন? আমায় কি নাহয় না? খাইয়ে পরিবে সব এত বড়টি কবলাম, আর এখন আমায় পছন্দ ক'বে তোমাদের জামা-কাপড় কিনে দিতে পারিনে যে আমার বাড়ী শুভ বোকায়ে যেতে হবে? এবার আমায়ই তোমাদের কাপড়-জামা কিনে এনে বেবে।

নিমকি, টোট, ডিমপোচ সবথোপে চা ও জলযোগ হজিল। সুমনাব কথা শুনে বড় বড় চোখ ক'রে ছেলে-মেয়েরা নবাই তার দিকে তাকাল। মেজ ছেলে পরিমল বললে আচ্ছা না, শুধু শুধু জুনি ব'লছে—আমায় কি বলেছি যে বোকায়ে বাবে।

—বোলানি, ব'লোন, তাই ব'ললাম। সব সময়ই তো তোমাদের নিজেদের বোকায়ে যাওয়া চাই। এবারে আমায়ই তোমাদের জামা কাপড় সব এনে বেবে।

ছোট ছেলে সুবিনল বলল,—বেশতো হাও না, আমায় কি না বলেছি?

বড় ও মেঝো মেয়ে রেবা ও লেখা এক সঙ্গে বলল,—বেশ তো, ভালই তো?

হ' বহুবেয় মেয়ে মালা হেসে কলরব করে উঠলো,—যা কি মজা! না, আমায় কি জামা এনে বেবে এবার?

—সে আমি ব'লবে না। যখন আনবে তখন দেখবে কাকে কি এনে দেই! মেহের সুয়ে সুমনা ব'ললেন।

বিকালে অনেক তাড়াতাকি ক'বে বেরিয়েও বাজার শেষ ক'বে কিরতে আর সন্ধ্যাই হয়ে পেল ভবেশ বাবুদের। তিনি আর বাড়ী কিরলেন না। শেষের কুন্তোর নিকট বড় কণ্ঠের প্যাকেট আর বাস্তবলো সুমনা শুধিয়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। সুমনা ও তাকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি গেলেন পার্কের ওদিকে ঘুরে আসতে। বাড়ীও তাঁর বেশী ঘুরে নয়।

পার্ক যেতে ছোট বাস্তা পার হ'তে হয়। ছোট বড় নানা বরনের বাড়ীর শ্রেণীর মাঝে মাঝে ঠাঁকা জমিতে পুঞ্জার জন্ত ছোট ছোট ঢালা বাগা হ'য়েছে। চেষ্টে ছুলে চাবি পাশ সাফ করা হচ্ছে। উৎসাহী ছেলের বল ক'বেছে বোতা ফেটা। পুঞ্জার আর দেয়ী নেই।

পার্ক এশে একটা বেজিতে বললেন ভবেশ বাবু, একটা কামিনী ছুয়ের ঝাড়ের পাশে। এখানেও প্রকাণ্ড ঢালা বাগা হ'য়েছে শার্বজনীন দুর্গাবসবের জন্ত। বহু ঠাঁকা ব্যার ক'বে এখানে দুর্গাবসব হয়। দিনেবা, গণের বিয়েটার কিছুই বাধে হয় না। মাইক্রোফোনে চলবে রেকর্ড গানের জলসা।

হু' তিন দিন পরে বজী, শরতের বহু নীল আকাশ আর ভূতীয়ার দস্ত চাঁদ আপনা থেকে মনটাকে কেমন আনমনা করে দিল।

ভবেশ বাবুর মনে প'ড়ে পেল তিনি একদিন গ্রামের ছেলে ছিলেন। ঠিক তাঁদের বাড়ীতে নয়, তাঁর ভোঠামশাইয়ের বাড়ীতে পুজো হ'তো। এই উপলক্ষে বাবা, ভোঠামশাই নবাই বেশে কিরতেন, নবর থেকে পুঞ্জোর বাজার নিয়ে। সে বাজারে আর আত্মকালের বাজারে কি তফাৎ তা আত্মকালকার ছেলে মেয়েরা বাহুগাই ক'রতে পারবে না। গল্পর গাড়ী, নৌকা বোঝাই ক'বে আনা সে সব জিনিষ

পত্র। গাঁট গাঁট কাপড় আস্তো মাথা এ্যাংে বিতরণেও
জ্ঞ। প্রতিমা ভাঙ্গনের দিন, সেই বাইত খেলা, নৌকোয়
উপর বৈঠা। ঠুক ঠুক তাল বিরে বিরে সেই শরি পান
গাওয়া,—এ সব আর কাগজে কলমে লিখলে কাব্যকথার
মত ন্যূনায়, কিন্তু তিনি তো মিছে চেয়ে দেখছেন।

তার বাবাও বিশেষ থেকে মস্তবড় এক গাঁট কাপড়
জানতেন। একই ধরনের কোরা মিলের বা তাঁতের
কাপড়, পাড়া পড়নি, বাড়ীর সবাই চাকর হামো সকলেই
দেওয়া হ'তো। তাইই একথানা পুজোর পাওনা কাপড়
ভবেশ বাবুর মা বতীর দিন শুক্রে পরতেন, বেশ মনে আছে।
আজকার দিনে বাড়ীর লোকের বাইরের কারোয় কথা
আর ভাববার অবকাশ হয় না, ভবেশ বাবু লম্বা পকেটে
হাত ছিলেন। মানিবাগটা বাত ক'রে টাকা করাও গুনে
বেশলেন। হ্যাঁ, কিংয়েছে কিছু! বা তালিকা কবেছিলেন
তা থেকেও কিছু বাচাতে পেরেছেন।

চাকরিব আর বেহাং খালাপ না হ'লেও বরচের দাড়ি
কিছু তাঁর কম নয়। অবসর বেচার প্রায় বহুস হ'য়ে এল।
তাঁকে বাড়ী ক'রতে হ'য়েছে। বড় ছেলেকে বিয়ে দিয়ে
বিশেষ প্যাট্রিয়েছেন নিজের খেজার। এখনও তিনটী ছেলে,
তিনটী বেয়ের শিক্ষা ও বিবাহ থাকি। মোকো গু পেছো
ছেলে স্কুল কাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। দুই বেয়ের কলেজে
পড়ে। দুপ কাইনাল উত্তীর্ণ বধূকও বেয়েদের সঙ্গে
কলেজে ভর্তি ক'রে দিয়েছেন। ছোট মেয়ে পড়ে স্থল।
তার উপর যা দিনকাল, তেবে চিন্তে চ'লতে হবে বইকি।

তেবে বেশলেন সার কিছু কিনতে থাকি আছে কিনা।
হ্যাঁ, চাকর ছোড়াটার একটা গুতি আর একটা শাট কেনা
হয় মাই। তা সুরমা বলেছেন গুটা তিনি নিজে কিনে
নেবেন—হকারেই কণার থেকে ঘেঁষে শুনে। ওখানে
অনেক নিবেশ মাল সজার পাওয়া যায়। প্রতি বৎসরই
সুরমা সেখান থেকেই চাকরের কাপড় কেনেন।

পার্কি আলো জ'লে উঠে, ক্রমে লোক চলাচল কমে
এল। কানিনী স্কুলের বড় ছালাপ আর গিলত যিনের চিন্তা-
মহিরতা ছেড়ে ভবেশ বাবু উঠে পড়লেন। পকেটে হাত
দিয়ে মানিবাগটা আর একবার দেখে নিয়ে ছুট চিন্তে
কিনলেন বাড়ীতে। গাড়ি প্রায় আটটা।

বরবার কড়া নাড়তেই সুরমা এসে বরফা পুলে দিয়েই
গিছন কিংর ডাড়াডাড়ি চলে গেলেন। মনে হল বেশ
মুখখানা ভারী। বরফাটা বন্ধ করে দি'র ভিতরে ঢুকে
গেলেন ভবেশ বাবু। সমস্ত বাড়ীটা বেশ থম থম ক'রছে।
কেউ পোখাও নেই। ছেলে-মেয়েরা সব গেল কোথায়!

ভিতরের বড় ঘরে ঢুকে দেখেন বড় বাউখানায় উপর
আজকার বাজার থেকে কেনা ছেলে-মেয়েদের জামা-কাপড়-
শুলা ছড়ানো পড়ে রয়েছে। সুরমা পাশে বসে ভবেশ
বাবুর একটা পুরানো জামাতে হোতায়া লাগানছেন। মুখে
অগ্রসরতার ছাপ।

ভবেশ বাবু ভেংবহিলেন বাড়ী ঢুকে দেখবেন, মা আর
ছেলে ঘেরতে মিলে পুজোর জামা-কাপড় নিয়ে আনন্দের
বৈ ঘল্লাও পড়ে গেছে। বিমিত হ'য়ে গিজাগা করলেন,
কি গো, ওরা সব গেল কোথায়? কাউকে দেখছিলেন।

তেমনি অগ্রসর মুখে সুরমা বললেন—বাঘে আর
কোথায়? আছে সবাই ঠিক।

—তা মাড়া শম নেই কেন?

—ওঘের কারও জামা-কাপড় পছন্দ হয় নি। মনমবা
হয়ে বেবা হোখা বসে আছে।

—কেন? কার কি পছন্দ হয়নি? ডাকো দেখি
ওঘের?

ভবেশ বাবুর কণ্ঠে হতাশার সুর।

—আমি কেন? তুমিই ডাকো না? ছেলে-মেয়েদের
আজর দিয়ে দিয়ে যা তৈরী করেছো।

—আমি করেছি? ভবেশ বাবু একটু হেসে কেললেন।
ছেলে-মেয়েদের আবহার উপেক্ষা করতে পাবেন না।
এ ঘেহ-ছলপতা তাঁর আছে। এ সত্য অস্বীকার করতেও
তাই পারলেন না।

ভবেশ বাবু হাঁক দিয়ে ডাকলেন চাকর বাবুকে।

একটি বছর পনের বোল বহুসের ছোকরা চাকর এসে
বরবার শামনে গাঁড়ালো।

পরকারি চাহুরী বৌলতে নানাযানে খুঁতে খুঁতে
একবার তিনি দারজিলিং জেলার কিছুকাল বাস করে-
ছিলেন। তখন ছোট বাবুকে এন্ড্রোয়ানীর একটি পাখাড়ী
ঘরে সান্না মা তাঁদের বাড়ীতে থেকে কাঁদ করতো।

বামুর মার কাণ্ড শু্যবহার ভাল, মাইনা কম বেধে হুন্মা তাকে পছন্দ করেই বেধেছিলেন, এবং সঙ্গে নিয়ে বিশেষ যত্নে নেন। দ্বিগুণে বামুর মার কপালে এ স্থল বেশী দিন গইলো না। পাঁচ ছয় বছরের বামুর বেধে বামুর না মিটোনিয়া যোগে মারা গেল।

হুন্মা এই মা-মরা ছোট ছেলে রাখতে খুসি অস্থবিধা যোগ করেছিলেন। কোথাও ওর আত্মীয় বন্ধন আছে কিনা, কোন অন্যায় আক্রমে দ্বিগে দেওয়া যায় কিনা, প্রায়ই ভবেশবাসুকে একথা মনে করিয়ে দিতেন।

ভবেশবাসু এ বিষয়ে উদাসীনই ছিলেন। বলতেন, কী এমন ছোট? পাখাভী ছেলে আর একটু বড় হলেই বেধবে, তোমার কত কাৰ করবে। ওদের গারে শক্তি বেশী। এখনই তো ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলো করে বেড়াচ্ছে, বন্ধ কি?

সকলের খাতির উৎকৃষ্ট কিনিষ বেধে, ছেলেদের পবিত্র্যন্ত পুখানো জামা ও হাকপ্যাণ্ট পরে, হিন্দুস্থানী আত্মবাসীরা কাছে ঘুমিয়ে, সেই বামু আজ এত বড়টি হয়েছে। বিহারী আত্মবাসীওর নাম ঘিরেছিল আমন।

এখন বামু বাংলার কথা বলে। কাম্বেকর্ষে সে মিশ্রণ। হুন্মার সঙ্গে থেকে রাত্তা শিখে সে এখন হুন্মাকেই হার মানতে চায়। কলকাতা সবরে ভবেশবাসুর আর আত্মবাসীরা থাণে পোষায় না। একটু টিকে যিদের কিছু সাহায্য ব্যতীত সপারের বত কাৰ বামুই মাথায় করে থাকে।

হোবের মধ্যে বুদ্ধিভাভ মোটা। হুন্মার আওতাগ হ'বহর কলকাতার জল বাতাস সেগেও তাং বটে একটু বুদ্ধি এল মা। এই সংসারে প্রতিপালিত বলে মনিবের হরায় উপর নির্ভর করা ছাড়া মাইনার কোন মিহিট সংখ্যা বা হাবী তাং নেই। প্রতিবেশীর হাংয়ান ও ছাইভারং বেশী মাইনার প্রোভান দেখিয়ে তাকে ভাবিয়ে নিতেও সম্ভব হয় নাই।

কলবহর আর বামুভার মাক্খান দ্বিগে যেতে ওপারের কোণে ছোট একটা অস্থকার ঘর। একটিকে হাংয়ান বত পরিভ্যন্ত কিনিষে বোঝাই, একটু বহই চাকরদের থাকবার ঘর। এই ঘরে বামু বাড়ীর পরিভ্যন্ত ক্যালেক্টার আর বহরের কাগজের বিজ্ঞাপনের ছবি দাড়া দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে মহানন্দ বসি করে।

ভবেশবাসুর ডাকে বহরার এসে বামুর হঠাৎ ঘরের ভিতরের খাতির উপরকার জামা-কাপড়গুলোর উপর মজব পড়ে গেল। তাংই ভিতর কোন একটা বিশেষ স্থানে অস্থদ্বানী বৃষ্টি নিবন্ধ করে হঠাৎ খুদীর জলকে ভীত মূখ্যানা অস্থত রাজা হয়ে উঠলো।

বামুর মা বামুকে আর কিছু দ্বিগে যেতে পারে নাই, শুধু দ্বিগে পেছে তাং জুং-আলতা খোলা থাকেই রং। সে বহর সমত জাতা বেন জমাট হয়ে বোঝে জগদানো তার থলো থলো জুটা গালের উপর মাংসপিণ্ডে ঠিক ঠিক করে।

বৃষ্টিতে বামুর মন বন্ধন নেচে ওঠে; তখন বামুর গালে যে বহর ছড়াছড়ি পড়ে, ভবেশবাসুকে তাং জুলনা বৃষ্টিতে অনেকখানি ভাবতে হয়।

—ভাভ বিহিমনি হাংবাসুভর ডাক দেখি, বসু বাবা ডাকছেন। বামু জাং একবার তাং চকচকে চক্ষুভারকা দ্বিগে জামা-কাপড়ের জুংপর কোন একটা অংশে পঞ্জর চাছনি বিজার করে দিল।

হুন্মা ব'ট থেকে মুখ জুলে ব'ললেন, জুংতের মত দীড়িয়ে বইলি যে? স্তনছিল না? ওদের ডেকে নিয়ে আর।

মাই মা বলে পিছন কিয়ে বামু ভড়িতে অন্তর্ধান হয়ে গেলো।

মিনিট কয়েক পরে ছেলে-মেয়েরা এসে দীড়ালো, কেউ মাংন, কেউ পরবার আড়ালে। ভবেশবাসু আবার সাজারে ডাকলেন, এগো এদিকে সবাই।

পরিমল মুখ নীচু করে এগিয়ে আসতেই বললেন, তোদের নাকি জামা কাপড় কিছু পছন্দ হয়নি স্তনলায়। কি কি পছন্দ হয়নি বল বেধি! জামা? কোন জামা?

—কান্ জামা আবার? ও কি শাট এনেছেন। এ কি আঙ্গকাল কেউ পরে!

—ভবেশবাসু বলেন, তবে হোকানে রয়েছে কেন?
—হোকানে কত কি থাকে, সব পরতে হবে?
—তবে জুই কি চেয়েছিলি?—ভারী গলায় ভবেশবাসু ব'ললেন।

—পরিমল বলে—হাংয়াই শাট।

ঐ তো হাওয়াই শাট। বিদল পরতো। এখনও তাখা আছে বাজে।—সুমনা বলে উঠলেন।

—হাণ্ডা পরতেম, সে কবেকার কথা! তাতো জালিন শাট—ও এখন চলে না। এখন হ'য়েছে বুলগেনিন শাট, এ বছরে সবাই কিন্দে।

—বুলগেনিন শাট? সে আবার কি বকম? আমি তো জানিনে বাবু! ভবেশবাবু বিদিত দৃষ্টি বিস্ফাবিত ক'রে বলেন।

—তোমরা জানো না ব'লে নেই নাকি? তার কলার অস্তরকম আর বোতাম বদানোর কাছাকাছি...। একটু খেমে বলে—আমার বহুদা আসে আপটু:ডেট ডিভাইসের শাট পরে।

সুমনা এবার কজার দিয়ে উঠে বললেন,—তা আগে বলিস নি কেন? বেধিয়ে বিলে পারতিস্তু কিবকম শাট হবে। আমাধের তো খেয়ে ঘেয়ে কাছ নেই, তোর বহুদা কি পরে আসে তাই ব'লে ব'লে বেধি!

—তোমরা বললে, সব ঠিক ক'রে জানবে, তা আর বলবো কি?—সুবিদল অবাব বিল।

পিছন কিরে মুখ তার ক'রে পরিমল চলে গেল। তার পিছনে সুবিদল খুঁরে গাঁড়াছিল। সুমনা বললেন—জুই কি বলিস? তোবও কি জামা পছন্দ হয়নি?

—আমি ও-শাট পরবোই না। ও হিট বুড়োবাব মতন, আমাধের মানার না। আমার জামা করবো নেবেস্ত শাট।

হুহুস্তে সে হাণ্ডার পিছু নিয়ে চলে গেল। ভবেশবাবু ছতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে বইলেন।

সুমনা দুই ঘেরে বেধা ও লেগাৎক বললেন—তোদের জামা-কাপড় কী মন্ডা হলো জনি। বেধে থেছে কিন্দুব, বাসা বং, পাড়!

—তোমার দেনন পছন্দ না? ঐ সব বং ভালো হলো? লেগা ব'ললে মুখ খুঁড়িয়ে ঠোট ফুলিয়ে।

কথার খেই ধ'রে বেধা ব'লল,—আর ব্রাউজই কি শাড়ীর সঙ্গে মানাবে?

—কেন মানবে না? বঙে বঙে মিল ক'বে খুঁজে

আনবুম। তোরা বললেই হ'লো, আমাধের আর পছন্দ নেই?—সুমনার কণ্ঠে দৃঢ়তা।

বেধা ব'লে উঠলো,—নেই-ই তো। শুধু বঙে বঙে মিলগেই হলো! তেমনার যা একটু বড়ো জ্ঞান নেই।

সুমনা মুখ ভারী ক'রে শুক হয়ে বইলেন। অগ পরে বললেন—তা ছুতিনখানা করে জামা-কাপড়ের জিতর কোনটাই ভাল হ'লো না?

—তা হবে না কেন? এটা হ'লে তো গুটা হচ্ছে না। জামাতে শাড়ীতে ম্যাচ হওয়া চাই তো।

সুমনা আবার মুখ কালো করে কথার বলেন—জানিনে বাবু তোদের সব কথা। আমাধও এক সময় সাজ-গোজ ক'রতুম—কিছু একটা জংলি হ'য়ে বেহোজুম না। কিন্তু জামা-কাপড়ের ম্যাচ করা নিয়ে এমন গোলমাল আমাধের ছিল না।

বধু বধু এক পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল, সে বলল—তখনকার দিনের কথা ছেড়ে বিন মঃ। দিনকাল বদলাচ্ছে। জামা-কাপড়ের ফ্যাসান কি বদল বদলার।

সুমনা কিছুক্ষণ চুপ করে বইলেন। পরে বধুর দিকে চেয়ে বললেন—তোমারও কি জামা-কাপড় পছন্দ হয়নি যা? পরেও খেয়ে নেয়ে আর বাড়ীর বধু ব'লে তার শাড়ী-খানা বেগেধের চেয়ে বেশী হায়ে কিনেছেন সুমনা।

বীর অবত দৃঢ়তাব্যাক্ত করে মজ্জ বলল—আমাধের পছন্দ আমাধের উপরই ছেড়ে দেওয়া ভাল মা। শুধু শাড়ী ব্রাউজই তো নগ, শাড়ী, ব্রাউজ, ভ্যানিটি ব্যাপ, জুতো সব কিছুই সঙ্গেই ম্যাচ হওয়া দরকার।

—একটু এথিক সেথিক হ'লে কি হয়?—দস্তীও হ'য়ে ব'ললেন সুমনা।

—“মিছিরি বেধার। পাঁচজনের ভেতর বে বা'র হওয়া যায় না।”

সুমনা বা ভবেশবাবু আর কোন কথাই বললেন না। বোতাম লাগানো শেব করে অগপরে উঠে দাঁড়িয়ে ভবেশবাবুকে বললেন—জাও ঠাণ্ডা সামলাও এখন জুনি। আমি এসব আখিখোতা মুখিও না জামিও না।

—এই সব জামা-কাপড় মশ ফেঁপল? কত খেয়ে থেছে কিন্দুব! আশ্চর্যত ভাবে ভবেশবাবু কথাগুলি বলে এক

একটা করে জামা-কাপড় তুলে তুলে দেখতে লাগলেন, আর হুতমা সেগুলি পাট করতে লাগলেন। সবগুলিই তো আবার ফেরত যাবে।

এরই মধ্যে কখন আবার মহা রামুর মুখখানা পড়বার কঁকে উঁকি দিয়ে গেল, কি একটা কাজের ছুতোর। গালে সেই রক্ত-আভার ঝিলিক।

সবার শেষে হুতমা যখন একটা খুঁটি আর একটা হাক সাট তুলে বরলেন পাট করতে—কোবা দস্তপাড় খুঁটি, নীল ডোবা ডোবা ছিট একটা হাক সাট। হাকের কর্ণার বেকে বেধে শুনে কেনা। এটি বৎসরের মত। তখন ভবেশবাবু বললেন,—ওগুলি কার? বাবু?—

আবার কার। দেখছো না, ওই কাপড় ডাখবার জুতে দুখপোড়ার দশবার ঘরের মধ্যে উঁকিঝুকি বেওয়া। ক'দিন ঘরে সাবা বাড়ী কান পেতে বেড়াচ্ছে কবে পুণ্ডার বাজার হবে শেনবার জুতে। আমি ওর নাড়ীনক্সর লব জানি।

একটু থেমে আবার বললেন হুতমা—এমনিতে দারাকণ ওঁতিয়ে কাজ করতে হয়, আর স্মৃতি হ'লে তো কথা নেই। একটা মাহুং তার পাঁচকনের বল হয়। পক্ষমারন তুলতে পারে। আজ ঘেঁই শুমছে পুণ্ডার বাজার হবে, সারা দিনে ডাখো আজ বাড়ী ঘর সব বরলে কেসেছে। বাগা বাড়ী, সাক সাকাই কিছু বাব নেই। বাড়ীর দশ খুসে গেছে। ও বেলার মাংশ আজ কেমন খেলে? জমন কি বোজ হয়? শুধু কি এখানে? কি বছর এমনি। আমি ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি।

হুতমা বিজ্ঞের সঙ্গে ক্ষত মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। ভবেশবাবু বললেন,—সত্যি বটে!—তা দিয়ে হাও না, ওর কাপড় ওকে।

—শোন কথা। ছেলে মেয়ের মুখ কালো হয়ে রইল, আর কিরা চাকরে পায়ে আলে কাপড়। হুঁড়ির বলিবারী।

হুতমা জামা-কাপড়ের বড় বড় মোড়ক ও বাক্সগুলো আলমারীতে তুললেন, কতক রইল বাইরে ট্রাকের উপর। কম তো নয় পুণ্ডার তিন দিনের পরবার মত কেনা।

অত্যন্ত হুজিসমস্ত কক্ষ। ভবেশবাবু অপ্রস্তুত হলেন, জমাগাদে, কথটা ব'লে কেসার জুত। ছেলে-মেয়েদের

মুখ যদি অন্ধকার হয়ে থাকে, তবে কিসের বা পুজা উৎসব, কিসের বা দ্বাদি আর বীন্দী।

পর পর ছ'দিন ধ'রে ছ'তিনবার অরল বরলের পর ভবেশবাবুদের ছেলে মেয়ের জামা-কাপড় কেনা শেষ হল।

মেয়ে বউরা সঙ্গে বোকাগে নিয়ে যে দার পছন্দ করে দিল। এদিক ঠিক তরকারি মাগে এ বৎসরের নতুন আমদানী হুতুং রেশমী নমিতা শাড়ী বেথা ও লেখার জুত, মধুর পাড়বিহান মূল্যবান স্নানর শিখন ইত্যাদি। মেয়েদের শাড়ীর নাম নিয়ে ভবেশবাবু খুঁৎ খুঁৎ ক'রলেন, মহা ব'ললেন, কি আর কথা বাবে, নাম তো গ'রে দেখা নেই। ও হলো বোকানীদের বেতবার ঘন্টা। বেধতে কেনম জোঁদুশ।

ছেলে ছরন নিজেবাই পছন্দ ক'রে নিয়ে এল তারের নাইলনের হাওড়াই সাট, বুগাশিনি কাট। মাপার ঝকত হ'ল পছন্দ মত।

যত যা কিছু বাঁচাবার চেষ্টা ক'রেছিলেন ভবেশবাবু সে আর সম্ভবই হ'ল না, অধিকন্তু আরও বেঁটী ক'রে নামাতে হল বরল ক'রে তিনতে।

হুতমা বউর দিন ছেলেমেয়েদের ডেকে আবার ক'রে জামা-কাপড় ভাগ ক'রে বিলেন। বহুক পরিরে দিলেন দি'বুর আলতা। সে হ'ল য'রেও চন্দী।

শরতের সোনালি প্রভাতে বর্ষেক্সানের তরঙ্গে বাড়ী ঘর ভ'রে উঠলো। পুণ্ডার তিন দিনের কোন দিন কোন শাড়ী, কোন জামা, কোন জুতা, কোন বিবণ ম্যাক ক'রবে সে আলোচনা আর মীমাংসা ঘেন আর শেষ হয় না।

ছোট বয়ে মাল্য এলে এক সময় মাকে জড়িয়ে বরল,—মা, তুমি আমার ব'লে হাও না কেনিদিন কোনটা পছন্দ। দি'বরা শুধু নিজেদের কথাই বলছে আবার কিছু বলছে না।

হুতমা হাসলেন, আবার ক'রে মাল্যকে চুষে থেয়ে ব'ললেন—আমি কি আর অত জানি মা! তোমার মৌখিক বগো সে খুব ভাল জানে। সে তোমার রোজ সাঝিয়ে বেবে।

গিটাই হুতমা জুত জেনেন না। মা বাবার কাছে এলব বিবরে শিক্ষা পান নি। তারপর বিশেষ ঘুরেছেন,

যখন যেমন হয়েছে, তখন তেমন খেয়েছেন পরেছেন। তাঁর নিজস্ব পুজো হ'ত, তাতে কোন দিন কুমারী পুজো হয়, কোন পাড়ার বাম্বনের ঘরে আসবে, কোন দিন কুমড়া বলি হবে, দাগানো পে ছুটি কুমড়া ঠাণ্ডার কোন নিকের রাধা আছে—কোনদিন কোন ভোগ হয়, কোন বছরে পাড়া থেকে কে আসে নারকোলের খাবার ক'রতে, কোনদিন কতকগুলি থাকতে হয় উপোস,—তাঁর শৈশব মন নিয়ে এই সবেরই হিসেব রাখতেন ও মুখ ক'রতেন মাথানো।

মাশা ছুটে চলে গেল বৌবির মতানে। সুদমা ছেলে-নেত্রের কাপড় দেওয়া শেষ ক'রে বাবুকে ডেকে তার হুতিখানা আর হাফ সাটটা দিয়ে দিলেন। এতক্ষণ দূরে ধাঁড়িয়ে সে সব দেখছিল।

সুদমা পায়ের উপর গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে রানু গলায় এমন এক প্রচণ্ড লাক দিয়ে তার সেই ঘরের সামনে ছোট রোয়াকটার উপর প'ড়ল, যে সুদমা আঁতকে উঠে টেঁচিয়ে বললেন—বেচিস বেচিস যেন প'ড়ে মহিষনি হুমান।

ভবেশবাবু ঘর থেকে হাঁক দিলেন—কি হ'লো আবার?

—ওবে আবার কি? ছুনিয়ায় নতুন কাপড় যেন কচো হয় না, তোমার বাবু তাই আক্সো লাক যোগেছে।

সুদমার কথা শুনে ছেলেমেয়েরা ছুটে ঘর থেকে বেঁচিয়ে এল। ছেলেরা হাততালি দিল। রেবা বলল—প'ড়ে পা তেড়ে যেতো তো বেশ হ'তো।

—হ্যাঁ, বেশ হতো। বৈ কি? পুণ্ডার যিনে চাকর পা তেড়ে প'ড়ে বাবু, আর আমি অঁধে বলে পড়ি আর কি?—সুদমা নিজের কাছে চলে গেলেন।

এসব ও বেলাকার কথা। দুপুরে আবারোই শেষে একটু বিশ্রামের পর নিজের ঘরে বসে কতকগুলো লেখা পড়ার কাজ শেষ ক'রতে ভবেশবাবুর খোয়ালই ছিল না কখন মজা হ'য়ে গেছে। সন্ধ্যার পর বড় পার্কের বাহোয়ায়ী পুজার ওখানে পুজা কমিটির মিটিং তাকে বোপ দিতে হবে। ভবেশবাবু একথা যেন ভুলেই গিয়েছিলেন, ভিনি ব্যস্ত হ'য়ে উঠে পড়লেন।

ঘরের বাইরে হালালে এগে চার দিকে চেয়ে দেখলেন, ছেলে-মেয়েদের কেউ কোথাও নেই। এতারা সব বেয়িবে প'ড়েছে, পাড়ার পাড়ার কোন কোন পুজা মতপে ঠাণ্ডার এসেছে সেইসব বেথতে একথা বুঝতে বোঝা হ'ল না তাঁর। মাশা দুপুর বেলা থেকেই দিহিদের কাছে বাহন্য ব'রছিল “গেড়াক্তে কখন নিয়ে যাবে” বলে। বড় পার্কের পুজার আনুষ্ঠানিক দ্বী আশ প্রকাশ করা হবে। ছেলে ছুটি তো দেখানকার দেখেদেবক।

ঘরে ঘরে আলো জালা হ'য়েছে। বড় ঘরের কোণের লক্ষীর আসন থেকে দুলোর গন্ধ আসছে। সুদমা সেই আসনের সামনে নিবিষ্ট মনে ব'সে কি যেন করছিলেন। ভেজানো হংসার ঝাঁক দিয়ে বেধা দাঙিল।

মহুও বসেও আলো জালা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে ধাঁড়িয়ে সে যেন মড়াচড়া করছিল মনে হয়। বোব হয় সন্ধ্যাকালীন চুল ঝাঁক ও প্রসাধন ক'রতে যে ব্যস্ত।

ভবেশবাবু তোরাগেলখানা নিয়ে কল ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রস্তুত হয়ে তাকে তাড়াতাড়ি দেওয়াতে হবে। কল ঘরের মাঝার বড় জলের ট্যাংকের পাশের আকাশে বজীর আধখানা ভাঙা টাফ হাঙ্গছিল, সেদিকে তাকাতো গিরে ভবেশবাবু সুদমা স্তম্ভ হ'য়ে থেমে গেলেন।

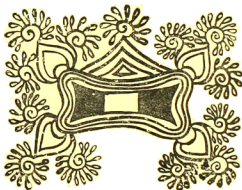
কল ঘরের পাশেই বাবুর ঘর। দরজা অর্ধেক ভেজানো। সেই দরজা কি বায়ো পাওয়ারেব আলোটা নিটুনিটু ক'রে জ্বলছে। ভিতরটা দেখতে পাওয়া যায়। সেই আলোকে বাবুর গাল ও স্বকমক করছে দরজা পাওয়ারেব একটা বালকের আলো:ও ও ম্পষ্টতর হয়ে ছুটে উঠেছে। নিজে নিজে হাসতে গিরে দাঁতগুলো একবার খেবোজে, একবার হ'জে বুক বুক আগরাক। ও বেলাকার পুরমার দেওয়া সেই নৃতন জামা আর কাপড় সে একবার গায়েব উপর একবার পেদী বহল আঁহুর উপর। আনন্দেব আভিগম্য মন্থন করতে না পেরে নিজেই এক একবার গুং পাক দিয়ে নেচে নিজে।

কিন্তু কেন? শরতের মধুরসন্ধ্যার কল ঘরের মাঝার ট্যাংকের উপরকার আকাশের বজীর চাঁদের ঝাঁক দাণি

নীচে ঠাঁড়িয়ে ভবেশবাসু বিবিত হ'য়ে ভাবেন। বাবু এতো আনন্দ হওয়ার কি আছে ? একখানা নতুন কাপড় আর জামা তাকে দেওয়া হয়েছে, সে তো প্রতি বছরের পুনরাবৃত্তি। একখানা কোরা মিলের দৃতি একটা ছিটের ধাক্কা মার্ট। প্রতি বৎসরের মত বকায় বর্ণার থেকে বেধে শুনে কেনা নিবেশ সস্তা মাল। কোন পরিবর্তন নেই, গৈচিহীন নেই তাকে। শুধু বাবু এত আনন্দ হবার কি আছে ? এই কাপড় কেনার খরচ শোনার বস্ত্র বিনেত পব বিন সারা বাড়ী কান পেতে পেতে বেড়ানো ? এরই আশায় তার তরুণ বেধে বসন্ত সমাগমের মত স্মৃতি আর অমিত বলের সকার ? এরই বস্ত্র সেদিন সত্য সত্য

দৃষ্টিতে বহুর ভিতর বার বার উকিছু'কি দেওয়া ? আপন মনের মধ্যে কোন কোন সহস্র না পেয়ে অগত্যা ভবেশ বাবুকে ভাবতে হয় বাবুও তবে কাপড় জামা খুব পছন্দ হ'য়েছে। কিন্তু কেন ? কিসের বস্ত্র ?

ভবেশ বাবু মনে দত কিছুই থাক, বাবু তাকে কিছু আগে যায় না। তার আপন রাজ্যে সে মুহূর্তহীন সস্তাট। তার আশিকার এই পবম দৌতাপোর খুশমবলে পরিতৃপ্ত প্রাণের আনন্দ-মন্দির তার দেবার মত আর কেউ নেই। আশে পাশেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই নিজেই সে তার খুশীর উৎসব পমাখা করছে, আপন মনে অসম্বদ হাসিতে, আর অমোহিত মুখ্যহমে।



সোভিয়েট গুপ্তচর আইন হোর্ণ

শ্রীমতীভূষণ দেব

[চার]

উক্ত ইরানের যে অংশ তাহের অধিকারে ছিল, সেখানে ধনী কৃষ ওমরাহগণ অনেক তেলের ইকাগে সংগ্রহ করেছিলেন। কৃষ বিপ্লবের ডানডেলের সময়, তাহের একজনের ইকাগে আংশে পানীয়াস ভলের হয়ে কিনে নেয়। সোভিয়েট সরকার নিজের বেশের বনিম সম্পদের উপর ঠেট ছাড়া কারও অধিকার স্বীকার করেন না এবং সরকার নিজ বাস্তিগ করে বিয়হিলেন। সূতপূর্ব কৃষ সাত্তাত্যের তাঁরাই প্রকৃত উত্তরাধিকারী অন্তঃস্থ উত্তর ইরানে এ্যাংলো পানীয়াসের নতুন কেনা দিগও নাকচ করে ছিলেন।

এই থেকে সূত্র হল এ হুগের ইতিহাসের কলকল্প অধ্যায় 'ইনটারভেনশন।' এর শিছনে ছিলেন পৃথিবীর ব্যবসায় তৈল সন্নাট। কৃষ অধিকৃত ইরানে যেমন ইংরেজের দিগ ছিল, খস কলীয়াব বাসু ও কেকশালে তেননি দিগ ছিল সুইডেনের নোবেল ব্রাংসের, আমেরিকার ট্যাভার্ডের হল্যাণ্ডের রয়লভাডের। দিগ বাস্তিগ হওয়ার এরা প্রত্যেকে নিজ নিজ গভর্নমেন্টকে চাপ দিয়ে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে। বেশবোয়া ভুয়াবীর মত টাকা তেল খেতকৃষ হলকে খাড়া করল। এবং অংশেবে কালকের কৃষের নিজস্ব সমবেত হয়ে আঙ্গকের কৃষকে আক্রমণ করলেন চতুর্বিধ থেকে।

আইন হোর্ণ [Einhorn] নামে একজন কৃষ হুককে সে মনরে ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে বেধা মেত। প্রবাসী খেত-কৃষমদালে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল হুকের। এরই কর্তব্যপন্থতার ফলে সোভিয়েট সরকার খেত-কৃষ বড়গল্প ভাল আরম্ভেই ছিন্ন করতে সক্ষম হয়ে-ছিলেন।...তৈল সন্নাটের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার, বাসুর তেল ময়দানের সূতপূর্ব মগদুর ও শ্রমিক নেতা কনরভ ট্যাপিন আইন হোর্ণকেই প্রধান কর্তৃত্ব নির্বাচিত করলেন। অগপূর (O. G. P. U.) প্রধান কার্যালয়ে পৃথিবীর ব্যবসায় তেলের ইতিহাস, তৈল সন্নাটের গুপ্তচর-

পনের আকৃতি, প্রকৃতি ও কর্তব্যভিত্তির বিবরণ সজিত ছিল। সেইখানে তাঁর শিক্ষা আরম্ভ হল।...তৈল শায়ে সুপজিত হওয়ার পরে তিনি গেলেন কোমিনটার্ণের প্রাচ্য দপ্তরে শিক্ষানবীশ হয়ে। তাবপর এসেন তেহরাণ—মোটর মেকানিকের ছত্র-বেশ একটি মোটর গ্যারেজ স্থাপিত করলেন। ইরানের তেলের ইতিহাসে নতুন অঙ্কের ব্যবসিকা উঠলো—নতুন অভিনেতা, সম্পূর্ণ নতুন অভিনয় কোশল।

তখন এ্যাংলো পানীয়াসের পূর্ব লনকমা। তেলের ময়লাটির উপর ভিত্তি করে ইরান সরকারের বাজেট তৈরী হই। তেলের গুপ্ত ভাতারের স্বর্ষ সাহ এবং ওমরাহগণের বিলাসের খবর যোগায়। এ্যাংলো পানীয়াসের তেল কম উঠলে, তেহরানে বাহাকার গটে—রাজকর্মচারীদের মাইনে বাকি পড়ে—ওমরাহগণের ককমকে মোটর গাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। সাহ এবং সাহেব গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণরূপে তেল কোম্পানির অধ্বাণ। তাই আইন হোর্ণকে বৃষ্টি রিতে হল ইরানের নীচের ময়লে।

আইন হোর্ণের কারখানা আরম্ভে ছিল মোট—হাষায় পঁচিশ টাকা মাত্র মূলধন। কিন্তু যেখতে যেখতে কারখানা বড় হল—সর্বত্রই তাঁর গ্যারেজের মোটর বেধা বেতে লাগল। গ্যারেজের মাঘনে কারখানা ও শোরুম, শিছনে লাইব্রেরী। লাইব্রেরীতে মোটা মোটা বই, গুঞ্জে ভাতি, পক্ত লাগ মলাট।...হাষায় মাইল দূর থেকে পাহাড় ডিমিয়ে, লক্ষ পেদিয়ে, মক্কুভূমি অতিক্রম করে ইরানে এসেছে। নাম না জানা সব সাহেবদের লেখা। তাতে ছিল লগৎ থেকে হারিঅ্য দূর হবে, মাহুনে মাহুনে অস্তায় তেব লুগ হবে। পৃথিবীর আলো বাতাসের মত, আবায় বিহার সম্পন্ন সুবেগেও সব মাহুদের সমান অধিকার থাকবে।...এবং সে অধিকার অর্জন করা কাহত মাঘের বাঘিরে নয়।

এই নতুন ধর্মের পুবেদিতকৃত আইন হোর্ণের গাড়িতে পাড়া ঘেমে ছড়িয়ে পড়লেন। হাজ বেভারেশুন, ইহ

লীগ, ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হতে লাগল। এবং অতিরিক্ত মধ্যে কমিউনিষ্ট সেল-এ বেশ ভরে গেল। তারা দলের যেখানে মার্কস ও লেনিনের ছবি হুটে উঠতে লাগল।... কোষ ব্যবস্থা আঁতুত করে দিয়েছিলেন এই ১৯২৬খ্রিঃ দোকতি।

এর পর আইন হোর্ণ উত্তর ইরানের অর্থনৈতিক জীবনে অগ্রদূত কবলেন। কৃষির ব্যবসায়ীরা এসেন, নগর হামে দরাজ হাতে, সব জিনিষ কিনতে লাগলেন। রেশম, পশম, পশমী কার্পেট,—হুসা, আকুত, খেজুর, চাল গাড়া বোঝাই হয়ে চলল কুশিয়ার বিকে। স্থিতি কাপড়, ঘরঘা, কেরাসিন, পেট্রল, লোহালকড় আসতে লাগল কিরাত গাড়ীতে। চামড়া ব্যাগ—ছুতো, বেন্ট, জিনলাগান হয়ে ফিরে আসে। অন্ন বিনের মধ্যেই উত্তর ইরানের শতকরা নব্বই ভাগ উৎপন্ন জরুরি খরচকার হল কুশিয়া এবং দেখা গেল কৃষ বেষের কাপড় মাথা ছাড়া ইরানীরেব শীতাতপ নিবারণিত হয় না। সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ার পথ বানিয়ে বেশ সোভিয়েট মোটর চুটোছুটি করে—সে ভিয়েট ব্যাক ছাড়া ইরানের ব্যবসা জমে না।

ইরানীরােব বিশাল, জিন পতীর দৃষ্টি পড়লে, ক্ষেতের কল অল যায়—উট ভেড়া ব্যাঘ্র মতো থাকে। তেল কোম্পানীর সাহেববাগ এক জিন পতীর হয়ে সজ্জ হতে উঠলেন।... আকিদের দিম্বুক থেকে হংকারি কাগজ পত্র উথাও হয়—টেসিকোনের তারের কে বেন কাম পেতে বসে থাকে। ডাকের ব্যাগ থেকে পোপনীর কাগজপত্র হাওয়া হয়ে যায়।...কে যে এ সব করে দেখা যায় না। কোম্পানি একটা নতুন বেল লাইন খুলেছিলেন—প্রতি পথে বাঁধা আসতে লাগল। কুলিদের মায়ে মড়ক লাগল—তার পালাল। ডিনামাইটের গুহায়ে বিস্ফোরণ হল—টানেলের কাণ আটকে পড়ে রইল কিছুদিন। স্থিতি তেমন মারাত্মক নয়—কিন্তু বিস্তৃত হয়ে উঠলেন কোম্পানির সাহেববাগ।

অকস্মাৎ সোভিয়েট সরকার উদার হয়ে পড়লেন ইরানের উপরে। উত্তর ইরানে সোভিয়েট রাষ্ট্রের ও সোভিয়েট প্রভাব হতে লিঙ্গ ছিল সব ইরান সরকারকে দান করে ফেললেন—(আ্যাংলো পার্শিয়ানের পচে বাওয়া লিঙ্গও এর মধ্যে পড়ল) কার্যকর বৈশিষ্ট্য সম্পদের

মাসিক হওয়া উচিত সেই বেষের গুহায়েট।...শুধু সর্ব রইল কোন বিবেচক এই সব সম্পদ লিঙ্গ কোরা চলবে না।...পরিবহীয়ায় বস্ত্র খড় পড়ে গেল সোভিয়েটের নামে।

অবিলম্বে তেল উত্তোলনের জন্য নতুন কোম্পানি স্থাপিত হল, বিলান অয়েল কোম্পানি। অবশ্য সোভিয়েটের সাহায্যসুত—তবু ইরানের নিজের প্রথম অয়েল কোম্পানি। হোক না ছোট একটুখানি প্রতিষ্ঠান—তেল ভুলবে আর খাচ্ছে চালান করবে—তাই বা কম কি? রিকাইন হবে সোভিয়েটের কারখানায়? তা হোক না? সোভিয়েট দরকারে নগর হামে কিনে নেবে তে:—তা হলেই হল!

...হানও করা হল—তেলও হাত ছাড়া চল না। উপরন্তু হাততালি পাওয়া গেল এক চোট এবং হাতিয়ার পাওয়া গেল একখানা—অবিদ্যতে আ্যাংলো পার্শিয়ানকে ধারেল করবার।

এইবার জিনের দৃষ্টি পড়ল বহু সাহেব মাথায়।

উত্তর ইরানে আরেব আমলে একটা টেবিলেটরিয়েল আমি ছিল—“কসাক ডিভিশন”—দক্ষিণ ইরানে ইংরেজের বেসন ছিল “সাইট পার্শিয়ান রাইকস্‌”। কসাক ডিভিশন নামেই কসাক—দৈনিক সংগৃহীত হতে ইরানী উপ-ভাতীরের মধ্য হতে, উল্লেখিত অভিযার ছিলেন কুশিয়ার। বহা হুই বখন শেষ হয় তখন কসাক ডিভিশনে একজন সারটাপ (Sirtip) বা নেটট অভিযার ছিলেন বেজাবী। এই শক্তিমান মেতা সাধারণ দৈনিক হাতে অতি অল্পদিনে ‘সারটাপ’ পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সোভিয়েট বিপ্লবের পরে কসাক ডিভিশনের অভিযাত কুশ অক্সিয়ারের বন্দী করে নিজের হাতে সমস্ত স্বত্বতা গ্রহণ করেন।

আইন হোর্ণের একজন শিল্প জিজ্ঞাসীদীন ছিলেন তেহরাণের ভাতীরতাবাহী হলের মেতা এবং একখানি ভাতীরতাবাহী পত্রিকার সম্পাদক। তিনি বেজাবীর মধ্যে ভাবী সম্ভাবনার চিহ্ন আবিষ্কার করলেন। ১৯২১ সালে এক সুপ্রভাতে কসাক ডিভিশন রাহবানী তেহরাণ অধিকার করল। জিজ্ঞাসীদীন শাসনতায় গ্রহণ করলেন—বহু প্রদান মন্ত্রী হয়ে বেজাবীকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। সাহেব এরম দাখা ছিল না যে প্রতিবাদ করেন। হু'বহুর পরে জিজ্ঞাসীদীন নির্বাসিত হলেন, বেজাবী হলেন

প্রধান নহী। তারপরে একদিন সুপ্রভাতে সাহ ইটোপা
ক্রমশঃ যাত্রা করলেন এবং রেখাধী পক্ষহী সিংহাসনে
আবোহণ করলেন। ইরানের মালভূমিতে সোভিয়েটের
সহায়তায়, বিনা বক্তৃপণ্ডে সত্যাটের অভ্যন্তর সম্পন্ন হল।

ইরানে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত
নতলিশ ছিল, কিন্তু তার কোন ক্ষমতা ছিল না। দেশ
শাসন করতেন মিশিটারি অফিসারবৃন্দ, এবং প্রকৃত ক্ষমতা
ছিল জেনারেল তাইমুর খাঁর হাতে। এংক তিন দ্যহ
রেখাধী পক্ষহী বক্তব্য—তত্পরি তাঁর কৌতুহল ইরানের
ক্রান্তি প্রিন্স—এংক সর্বোপরি তেল কোম্পানির টাকার
বদলে একটি সুতাত্ত্বিক বহুদিন থেকেই তাঁর হাতে। রেখাধীর
বক্তব্য হওয়ার আগে থেকে।—এংক তাইমুর খাঁকে
১৯০২ সালের এক সুপ্রভাতে, সাহ বহন ক্ষমতাসূত্র
করলেন, তখনই আইন হোপের এংক বহুরেং অস্ত্রাণ্ড
পরিচয় সার্থক হল।

এতদিনে ছোটবড় সামাজিক কর্তব্যের দিকে তুলি দেবার
অবদর পেলেন সেই তন্ত্রলোক। বিতন্ত্রে সদ্বীরে তেল
কোম্পানির যেত আকর্ষে উপস্থিত হলেন—তন্ত্রলোকে
জানালেন ও স্বাভা কামনা করলেন। তেহাধাণ থেকে
মোটর চালিয়ে এসেছেন আখাধান, সমগ্র ইরান অতিক্রম
করে শুধু শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাতে। কথার কথার প্রশ্ন
করলেন—“তেহাধাণের নতুন ধর জানেন কি?” নতুন
ধর?—সাহেবেরা কিছু জানেন না। তিনিও কৌতুহল
নিবৃত্ত করলেন না। উত্তর সাহেবেরা তেহাধাণে ব্রিটিশ
হুতাবাসে টেলিফোন করলেন। হুতাবাসও কিছু বলতে
পারল না।

পরের দিন যত্রপাত হল। অ্যাংলো পার্সিয়ানের লিড
বাতিল করে দিয়েছেন—সাহ রেখাধী পক্ষহী! কোম্পানির
শাস্ত্যভিঙা ঠাট্টে হবে। কমিউনিটি সেলগুলি আগে হতেই
প্রস্তুত ছিল। সুপণ্ডে সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে স্বাধীনতা
বিবল উদ্ঘাপিত হল। তেহাধাণের বাতপথে ইংরেজের
সুপনুতলিকার তাকিয়া নিয়ে গপট লোকের এসেশন বের
হল। কনি উটল গমন তেহি “আংরেজ...হায় হায়!”
বিশেষী নাপণাষ দ্বিগ্ন করে জেলে উটল ইরান।

আগের দিন হলে কামানের ঘূষে ইংরেজ এই উচ্চতোর
অবদর দিতেন। এই বক্তব্য অপরূপে এই ত্তো করে বহুর
আগে ইংরেজের নৌবহর ছুটে গিয়েছিল সোভিয়েটের
উপকূল—অবহাণ করে বিশাল ক্রম বেককে অনাবহাণে
তুকিয়ে মারতে চেয়েছিল। অস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে, বুদ্ধি
পরামর্শ দিয়ে রাষ্ট্রত্রেতা যেত ক্রমকে সহায়তা করেছিল।
কিন্তু এখন দিনকাল বহলে গেছে। আমেরিকা ক্রম
সহকারকে স্বীকার করে নিয়েছেন। যাবনা বাণিজ্য আরম্ভ
হয়েছে দুই দেশে। মোটা টাকা ক্রম বেওয়ার কথা চলছে
সোভিয়েটকে। ওয়াল স্ট্রীটের টাকার বাজারে সাহ সাহ
রব পড়ে গেছে। এখন বুঝে বুঝে চলতে হয়।

এই পরিবর্তনের মূলে ছিল ষ্ট্যান্ডার্ড। ষ্ট্যান্ডার্ডের বল
এখন আমেরিকান দিমচেট সংখ্যাগরিষ্ঠ। ষ্ট্যান্ডার্ড ও
সোভিয়েট ক্রুটি হয়েছে বাকুর তেল সত্তার কিনে পৃথিবীর
বাজার ভাঙিয়ে দেবে। তাই ষ্ট্যান্ডার্ড নিজেই পথে
সোভিয়েটকে জাতে তুলে নিয়েছে। ষ্ট্যান্ডার্ডের স্বল্পা না
পেলে কি সাহ ইংরেজের সঙ্গে পাড়া লড়তে সাহস পান।

অ্যাংলো পার্সিয়ান তীত্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে,
আন্তর্জাতিক আইনের হোহাই দিল, স্বাধী বহুরেং
ইন্ডিয়ায় নিবৃত্ত করল—শেষে বলল, তবু বহি সাহ বাতিল
সীল চালু করতে নারাজ হন—তবে নতুন লিড দিন।

রেখাধী উজাভিলাধী ব্যক্তি কিন্তু প্রকৃত দেশপ্রেমিক,
ইংরেজের হাত থেকে ছুটে ষ্ট্যান্ডার্ড বা সোভিয়েটের স্বর্পরে
পড়বার লোক নন। ইংরেজকেই পুনরায় লিড দিলেন।
তবে বয়সটি বাড়িয়ে নিলেন শতকরা বোল থেকে কুড়ি।
একদা ইক ডিউটি বদালেন বত তেল উঠবে তার উপর এবং
তেল হাড় অস্ত্র যে সব বনিম পথেরে উল্লেখ ছিল ডি'
আতির দনবে সেগুলো বাহ পড়লো...এই নতুন লিড সর্হি
ও শোহতাকিত করায় অস্ত্র সাহ নকহানা পেলেন দশ লক্ষ
পাউণ্ড—এংক সর্বোপরি কোম্পানিকে মাঘটি পালটাতে
হল। পারসিক একটা ভাবার নাম, দেশের নাম ইরান—
ইংরেজেরা ভুল করে বলতেন ‘পারশিয়া’। সাহ জোর করে
সেই ভুলটি সংশোধন করে দিলেন...নতুন নাম হল অ্যাংলো
ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানি।

ব্রিটিশ গুপ্তচর ক্যাপ্টেন ম্যাকলীন

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাস।

একখানা ব্রিটিশ আর্মির ঠাকুরার উত্তর থেকে ইস্তাহানের দিকে চলছিল। গাড়ীর ভিতরে ডাইভার ছাড়া তিনজন আরোহী—একজন প্রিমেজিয়ার, একজন ক্যাপ্টেন ও একজন এন সি। পিছনে লগেব-কামার ছদ্ম সৈনিক। গাড়ীর উপরে মস্ত বড় ইউনিয়ন জ্যাক। গাড়ী দক্ষিণ ইরানের রাজধানী ইস্তাহান পৌঁছাল।

...ইস্তাহানের উপকণ্ঠ...এসটি চা. বোকার, দুতিনজন ইরানী সহকার বসে আয়তোলা টানছে...কতকগুলি বাড়ী ভিড় করে গাড়িরে—আবার করে কটা পোকান...ভাবপর মোড় ঘুরতেই একেবারে সহরের প্রধান সড়ক। গাড়ী, গাধা, উট, মানুষের হাট। অস্তব্ধ পতাকা, ঠাকুরার, ইংরেজ সৈনিক পথচারীকে কৌতূহলী হয়ে চেয়ে থাকে। পথের পাশে আশ্রুজ একখানা বেরাটোপ নিশিটারি ট্রাক। ভিতরে সাপ না ব্যাং বেধা যায় না। সেটিকে পার হয়ে ঠাকুরার দক্ষিণ ইরানের সামরিক শাসনকর্তা জেনারেল জাহেদির প্রাসাদে প্রবেশ করল। গেটের শায়া এটেনশনে গাড়িরে স্প্রাউট দিল—বেচারার হাতের মস্ত ধানো বিলেতি সিগারেট ধুসায় পড়ে পেল...সাত্তর পাশে একজন ব্রিটিশ সৈনিক ছিল—সে আর একটি সিগারেট তুলে দিল খাতে।

তখন ইউরোপের যুদ্ধ ঘোড়াসো হয়ে ঝড়িয়েছে। জার্মান আর্মী শীর্ষাণীর আকারে দুটি বাছ প্রসারিত করে এগিয়ে আসছে। একটি পৌঁছেছে ককেশাসে...আরসু পর্বতে বিশেষ ভাবে শিক্ষিত 'জিগার' বাহিনী। অপর বাছ বোমেলের 'আফ্রিকা'র ও নিশের সীমার মধ্যে ঝাঁট করেছে। বাছ দুটি আসছে ইরানকে ধরতে।

ইরানের তেলের উপরেই ব্রিটিশের জল স্থল ও অন্তরীক বাহিনীর নির্ভর। ইরানের পথেই মহাবল্য আয়তোলা আমেরিকান সাহায্য সেভিয়েটে পৌঁছায়। অথচ এখানে নিরস্ত্রদের দৈন্ত জর করে কখন মায়। তাহের খাঁটি ককেশাসের এগারে তেহরানের কাছে। তবু এরা আছে বলেই দুর্ভব বিপার বাহিনী আকণ্ড ইরানে আসতে পারে

নি। দক্ষিণ ইরানে ইংরেজের ভরসা একমাত্র দাউখ পানীয়ান রাইকেলস। তাহের যা ভাবগতি—জুয়াগ পেলেই বিরোধ করণে—যেনম করেছিল প্রথম মহাবল্যের সময়। সেগার ওয়াসমুন একসা এগেছিলেন—এবার প্রত্যেক পবস্থ 'শেখ' এর দুর্গে একটি এসটি ওয়াসমুন খাঁটি করেছেন। জাহেদি তাহের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছেন। উপকণ্ঠের গোষ্ঠিগুলি প্রস্তুত হয়ে আছে।

ডিটার নতুন ধরণের দুপালায় সাবমেরিন ছেড়েছেন—'৬৫ উলভন'। তাহের উপরে নির্দেশ—জগতি তৈল-চিকন লখোবর টাকার বেশ'সেই ছুড়ি ঝাঁপিয়ে দেওয়া চাই। কলে আমেরিকার বন্দর থেকে বড় ট্যাঙ্কার তেল ভর্তি হয়ে বওনা হয় তার অর্ধেকও ইউরোপে পৌঁছাতে পারে না। ইরান হাতছাড়া হলে নিজ বাহিনী শুধু তেলের অভাবেই অচল হয়ে পড়বে।

ইরান অবশ্য কাগজ কলমে নিউট্রাল—কোন কলেই নয়! কিন্তু সাহ বেলাখী পল্লবীর প্রাণের টান জার্মানীর দিকে। তাঁর দক্ষিণ হস্ত জেনারেল জাহেদি দক্ষিণ ইরানের শাসনকর্তা।...এক পূর্ব অতীতে, কৈশোরের প্রথম উষ্মার, জাহেদি একজন সাগর পারের নীল আঁধি রাজ-নৈতিক দরবেশের সংস্পর্শ লাভ করেছিলেন। কত বেশ খেলেছেন পর্বতের উপত্যকায়—কত চাঁদমারি করেছেন পাহাড়ের গারে। সেই উৎসাহে দীপ্ত দিনগুলির ছবি আজও রান হয়নি। ওয়াসমুনের উল্ল রীক এত দিনে মহীকূষে পরিণত হয়েছে...আয়তোলা ইরানীরাও তেলের মরদান ও শোষণকার বক্ষার জন্ত জেনারেল জাহেদি ইরানী সৈন্ত সমাবেশ করেছেন—যেন ইংরেজ বিহারের বেলা পোড়া মাটির নীতি অবলম্বন করতে না পারে।

ককেশাসের জার্মান হাই কমান্ড নতুন প্রায় স্থির করেছেন। এককল বিমানবাহী সৈন্ত হঠাৎ তেহরানে অবতরণ করবে...সাহ আধুনিকভাবে ইক-সমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন—এবং একই সময়ে জাহেদি ইস্তাহানের ব্রিটিশ সুতাপাণ নিষিদ্ধ করে আয়তোলা ইরানীরাও তেল অবিকার করবেন। সেভিয়েটের জন্ত

যে সব সমসস্যার ইরানে এসে নেমেছে—গুজলি পাঠানো হবে ইরানিপ্রান্তের ভার্য্যন অভিযাত্রীদের কাছে। জাহেদি প্রচুর খাজনক সংগ্রহ করছেন বেশ বেশ—যে অস্ত্র ইরানে গদ আটার দর আকাশে চড়ে গেছে এবং ইরানীরা ইঙ্গ-ক্রমের কাশাকি নবন করে ফেলে আছে—সেই সব খাজনা পাবে জার্মানী।—এখন শুই দিন তারিখ বস্তু নির্ধারণ থাকি।

ইরানের ইতিহাসেই এই সম্ভাবনা পূর্ব দিনে আবিস্কৃত হলেন ব্রিটিশ ডক্টর ক্যাপ্টেন ফিল্ডরয় ম্যাকলীন (Captain Fitzroy Maclean)। ম্যাকলীন ছিলেন বিশেষ স্পেশাল এয়ার সার্ভিসে। (প্রধান মন্ত্রীর পুত্র ব্যানডলফ চার্লিসও তখন ম্যাকলীনের সহকর্মী ছিলেন এবং পরে জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সে গুলি কার্যকলাপের অপরাধে বন্দী হন।) এদের কাজ ছিল—প্যারাসুটে করে শত্রুর লাইনের পিছনে নামা আর ডায়েটেক করা। ভুল ব্যরণার নেমে পড়লে বিপদ—প্যারাসুট না খুললে তো চন্দকার! অতঃপর নাইনে পা পড়তে পারে—সেটির সাহায্যে পড়ে যেতে পারেন। বরা পড়ার কথা না বললেও চলে। এই সব বিপদ এড়িয়ে শত্রুর দুর্গের অভ্যন্তরে বসটা পারা আর কল করে—একথানা গাড়ী চুরি করে হৌড় লাগাতে হবে বাড়ীর দিকে। যদি না পারেন—ছতিমশো নাইল দরুজি পথপ্রবেশ অতিক্রম করে নিজের ঝাঁপেতে কিংবা বস্ত্রী করবেন। বেশন, জল, বা এমুনিশান কোনোটা যদি ফুটরে যায়? তখন ভগবান সুরগা।

ম্যাকলীনকে জানা হল ইরানে একটি পেরিসাবাহিনী সৃষ্টি হচ্ছে। জার্মানরা ইরান অধিকার করলে—(অধিকার যে করবে তাতে আর সন্দেহ কি?)। খোপকাড় পাখাড়ে আত্মগোপন করে শত্রুর পাল্লাই লাইন বিপন্ন করতে হবে। ইতিপূর্বে কিছুদিন তিনি স্যোভিয়েট কর্তৃপক্ষীদের চোখে কুলা দিয়ে মধ্য এশিয়ার নির্বিঘ্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন—নালজুদির ইরানী সুবাদীদের স্বত্ব ও চরিত্র একেবারে অজানা নয়। কিছু ইরানীকে কি আর বলে টানতে পারবেন না?

তিনি ইংরেজ ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করলেন—মরুভূমির নির্জনতার পেরিসা হুন্ডের মধ্যও গিলেন কিন্তু আসল কাজ কিছু হল না। বেচাবনে জার্মান ভিৎপাটি—ইঙ্গক্রমের নকশে কোন প্রণয়ের কারণেই, সেখানে জা-মান নিয়ে কে আর সহজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় জার্মানের বিপক্ষে?

অংশেই ম্যাকলীনের মাথার মজুন প্রান এল। বাগবানের আমি যেড কোরটারেই অসুস্থমানও পাওয়া গেল—মরুভূমির এক নিষ্ঠুর স্থানে ম্যাকলীন বসে গেলেন পেরিসাবাহির নিয়ে চিহ্নাঙ্গল দিতে। কিতাবে কোন দিক থেকে বাশ আসতে পারে—কোন বাশ কি উপায়ে উৎসাহে হবে—কত কম সময়ে চকিতে কার্যোদ্ধার তৎপা হবে, পরীক্ষা চলতে লাগল ষ্টপওয়াচ হাতে করে।

জাহেদির প্রাণাধে যে ষ্টাফকার প্রবেশ করল—তার ক্যাপ্টেনটি ম্যাকলীন। ব্রিগেডিয়ার একজন লোক এসেছেন নইলে অভিনয় ভবেন না। বাগবানের ব্রিটিশ ইন্ডেকোয়াটার থেকে শুভেচ্ছার বাণী বহন করে এনেছেন এই আগন্তুকল। জেনারেল ফতই ইংরেজ বিধেয়ী ঘোম, মুখে খুঁ ওস্তা। অভিযাত্রের মাথের অত্যাধনা করলেন। পরিপূর্ণ মিষ্টিচারি পোখাক ও ডেকরেমেনে সজ্জিত হয়ে শুভেচ্ছার বাণী গ্রহণ করতে এলেন।

চোখের নিম্নেই ম্যাকলীনের বিভলতার বেদিয়ে এল। মূহুর্তে জেনারেলকে নিস্ত্র ও বন্দী করে জানিলা গলিয়ে ষ্টাফকারে তুলে ফেললেন ম্যাকলীন। জেনারেলের বাড়ি-গার্ড ও লোকজন অস্ত্র ধরে ছিল—ভাড়া কিছু বৃদ্ধাব্য আপসেই গাড়ী ক্রতবেগে বেড়িয়ে গেল গेट বিয়ে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের সংযোগ আপসেই বিচ্ছিন্ন হয়েছিল—মুগলেও কেউ এলাহি দিতে পারতো না।

সদন্ত ইচ্ছাযান ইরানী মৈনিকে বেষ্টিত—ব্যারাকের মাঝ দিয়ে নির্গমনের পথ। গাড়ী ব্যারাকে প্রবেশ করল—মৈনুতল বস-ইন করল ক্রান্তি হল—জেনারেল ক্রান্তি মিলেন (ম্যাকলীনের বিভলতার তখনও তাঁর পাজডার) —পিছনে দুগানা ট্রাক বোঝাই পোতা মৈনুত। আত্মসুরের সেই বেরা টোপ মিষ্টিচারি ট্রাক। সকলে বসে করল জেনারেল কোন কাজে চলেছেন—এরা বেহরকী। আগল ঘটনা কেহ সন্দেহ করল না।

মরুভূমির মাঝে রয়েল এয়ার কোর্সের একথানা প্লেন ধাঁড়ান ছিল। সেই প্লেনে আগ্রহের করে নিকট প্রান্তে জার্মানীর সর্বপ্রধান বহু নিরুদ্দেশের পথে বাজা করলেন।

অভিনয় চতুর ব্যক্তিও স্নায়ুহারা অসুস্থাবানী হন... ভুল করে বলেন। বৈব বহন নিরুপ হয়—হুর্ঘটনা ঘটে।

কথিত গল্প

নিম্নতঃ কুরু কৰ্ম ভূম্

খলিজিত্রাম্

অনুবাদ—অধ্যাপক বিজ্ঞানেন গুহ

জুনিবৰ্ণক্যারী ভবন বঙ্গলো প্রেরিত পুস্তকে,

“বলো আদ্যের কাছে কর্মের ত্যাগপৰ্ব”—

তিনি উত্তর দিলেন :

কর্ম কর কর্মের মধ্য দিয়েই আমরা তাল রাখি

পৃথিবীর চলার হ্রস্বের সঙ্গে, তার জ্বলন্তের সঙ্গে।

অসল হয়ে থাকে মানেই পৃথিবীর শুভু চক্রে

সকালের আসরে অপায়ন্তের হয়ে থাকে।

জীবনের বহুক্ষণ মিছিল এগিয়ে চলেছে, আত্মবর্ধারায় শুভু

অবশ্য নিম্নতঃ পরবর্ত্তে সেই বিশ্ববিধাতার উদ্দেশ্যে।

অসল হয়ে থাকে মানে সেই মিছিল থেকে হিটকে পড়া

পেছিয়ে পড়া।

যতক্ষণ কাজ করে, তোমার দেহ যেন বাঁশীর মত

যেতে গুঠে।

কালের প্রথমগুলি তখন সকালের মত কথা করে।

সমস্ত জগৎ জুড়ে যখন চলছে এ সকালের ঐক্যতান

তখন তোমাদের মত কে থাকবে

মলমলগড়ার মত বোবা হয়ে, শুষ্ক হয়ে ?

চিরদিন তোমরা শুনে এসেছ, কাজ হচ্ছে অভিলাপ,

পরিশ্রম হচ্ছে হুঁচকণা ;

কিন্তু আমি বলছি তোমাদের

পৃথিবী থেকে এক বস্ত্রীম দূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন

তোমরা যখন কাজ কর, সেই স্বপ্নের স্বপ্নকেই

তোমরা সার্থক করে তোলা।

পৃথিবীতে তোমাদের যখন পাঠিয়েছি

তখন তোমাদেরও বিয়েছি তার সে স্বপ্নকে সত্য

করে তুলবার,

সে স্বপ্নের জোয়ারেও দাঁড়ি।

প্রমের মধ্যে যখন নিম্নতঃ মুক্ত করে,

তখনই সত্য করে

জীবনকে ভালবাস এবং প্রমের মধ্য দিয়ে

যে জীবনকে ভালবাসলো, সেই জীবনলো

জীবনের গৃহতম সহজ।”

যদি দুঃখ বেদনার ঝিল্লি হয়ে বলো—“জন্মই যন্ত্রণা,

আর যন্ত্রণারই মড়া এ দেহ বন্ধা কপালে লেখা

নিষ্ঠুর বিধিলিপি”

তবে আমি বলবো, “এ বিধিলিপি মুছতে হবে

শুধু প্রথমদ্বার কপালের দ্বার দিয়েই।”

তোমরা শুনে এসেছ জীবন হচ্ছে আবার নিশি,

এবং দেহ যখন ক্লান্ত, তখন ক্লান্ত মানুষের এ কথার

তোমরা প্রতিপত্তি করেছ।

কিন্তু আমার কথা শোন, “জীবন সত্যই অপ্রত্যাশ্য,

যখন থাকে না তাতে কোন উত্তর,

এবং সে উত্তর হচ্ছে অন্ধ, যার পেছনে নেই জ্ঞানের দীপ্তি

আর সে জ্ঞান হচ্ছে মিথ্যা বোঝামাত্র

যা আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করার না—

আর সমস্ত কর্মই হচ্ছে নিষ্ফল

যার প্রেরণা জোগার না অন্তরের মত ভালবাসা।

যেদিন ভালবেসে কাছ কর, সেদিনই তো মুক্ত কর
নিঃশেষে নিঃশেষে অন্তরাত্মার সঙ্গে, বিশ্বের মানুষের সঙ্গে
ও বিশ্ববিধাতার সঙ্গে।

আর ভালবেসে কাছ করা—সে কেমন ?

এ যেন জ্বলন্ত তপ্ত হৃদয় দিয়ে কাপড় বোনা
যে কাপড় দিয়ে পরম সোহাগে জড়ান্তে চাপ তোমার
প্রিয়তম অঙ্গ।

এ জ্বলন্ত সন্তপ্ত মনটা উজাড় করে গড়ে তোলা মনুষ্য গৃহ
সে গৃহে যে বাস করবে তোমার পরাণ প্রিয়।

এ হচ্ছে তোমার সন্ত সন্তকে জীবন্ত করে তোলা
তোমার প্রাণের উদ্ভূত স্মারক।

সেই মার্ক সন্তর মুহূর্তেই অমৃতত্ব করবে

তোমার পূর্ব পুরুষের চেয়ে আরোহণ, তোমার কীর্তির পানে,
তাঁরা উপর থেকে বর্ষন করছেন পবিত্র আনিসূখার।

কতদিন শুনেছি তোমরা যেন আচ্ছন্ন হৃদয় .বাগেই বলেছ,
শ্রীঃ তাকর হারা শ্রীঃ তাঁরা

তাঁদের আশ্রয় বাসী হুঁত করে তোলেন শেও মর্মে—
তাঁরাই মৃত।

আর অর্থম তরা বাবা ক্ষেত লাঙ্গল হবে কৃষি চাষ করে।

বস্ত্র তাঁরা স্বা আকাশের রামনয়কে ধরে আনেন
বেশবের সুতোয় বুনানীতে।

তাঁদের সঙ্গে কি তুলনা হয়, বাবা চামড়া দিয়ে গড়ে
পায়ের জুতা ?”

কিন্তু আমি তোমাদের বলছি,—দুঃখের ঘোরে নয়

বিনের আলোর তীক্ষ্ণ জাগ্রত কর্ণ-কোলাহল

মুগ্ধিত মুহূর্তে,

শিখাতার খাতাস বিরাট মহীত্বকে বস্ত্রানি সাধর
সন্ধ্যাপ জানয়,

পায়ের তলায় অর্থম তুণের হলের কানেও শুধুনি জানায়
দুঃখ সোহাগ।

আর সেই-ই তো বড়ো, যে বাতাসের মুহূর্ত সন্ধ্যাতকে
মুখরত্ব করে তুলতে আনে, জ্বলন্ত ভালবাসার
মুহূর্তে মুহূর্তের ছোঁয়া দিয়ে।

শ্রমই তো প্রেমকে মার্ক জীবন্ত করে তোলে !

যদি ভালবেসে কাছ করতে না পারে,

যদি-কাছ তোমার মনে আগার বিরক্তি,

তবে সে কাছ থেকে সরে দাঁড়াও,—

যাও ভিক্ষুকের মতো হোসো গিয়ে মন্দিরের দ্বারে,

হাত পেতে ভিক্ষা নাও তাহের কাছে

যারা প্রেমের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে শ্রম করে।

কারণ যে কটি ভূমি সেকি জ্বলন্ত জ্বলন্ত বিরক্তি নিয়ে
সে বিরক্তির বিধে তিত্ত কটিতে তো মানুষের জুতা
মিটেবে না।

আর যদি বিরক্তি ভরা মন নিয়ে জাকাজকের মন
নিষ্কাশন কর

তবে তোমার মনের তিত্ততা নিশ্চয় সে সরাবে

তাতে কি তুণ্যত মানুষের তুণ্য মিটেবে ?

আর যদি কিম্বদন্তি গান করো কিন্তু সে সন্ধ্যাতকে

যদি থাকে

বিরক্তির ধারমেশানো, তবে তোমার শত নিপুণ

কৌশল সফলত

সে সন্ধ্যাত ক্লাস্ত মানুষকে তুণি যাবে না—

আনবে না তাহের কানে আনন্দের প্রভাতের কলকলনি

আনবে না তাহের কানে তারা শুধা নিশীথরাতের

মর্মবাণী।

তাই কর কর আর আনন্দের সঙ্গে গান করো

তবেই তোমার শ্রম মার্ক, তোমার জীবন মার্ক।”

দূর্য-সূক্ত

[পদ্ম-বেশ ; ১২ মণ্ডল, ১১৪ সংখ্যক সূক্ত ।]

শ্রীঅরোজ্জ্বলং সুবোপাখ্যায়

উদয়-আকাশে দাঁড়ারে সূর্য অপূৰ্ণ-ভেদোদয়
মিত্র বরুণ অগ্নি বাঁহাব প্রভায় প্রকাশ লভে ;
আকাশ পৃথিবী সব কিছু হয় পূর্ণ তাঁহার ভেদে ;
চলমান আর অচল যা কিছু তাঁর প্রাণে প্রাণবান্ ।

কৰ্ম-আলোকে কয়েন বিনাশ অজান-ভ্রম যিনি
প্রকাশিতা নিজ দেবত আর মহিমার গৌরব
নাত-বাড়া-বাড়া রবে তিনি যবে চলেন বৃদ্ধ-ভেদে
সংকৃত হয় যাত্রি যত নিগূঢ় অন্ধকার ।

ওই চলেছেন সূর্য-দেবতা অমৃত-উষাদেবী
মাছুষ যেমন নারীর পিছন চলে আঘাতের লোকে ;
সুদূৰ্ঘে নোদেব অনন্ডকাল, কীবন অন্তহীন ;
অনন্ডকাল আনন্ড ভূক্ত বাহারী সূর্য-যাকী ।

মধ্যপন ওই আলো করে উজ্জল তাঁর রূপ ;
মিত্র এবং বরুণদেবের প্রজ্ঞা-নয়ন তিনি ।
শত-অৰ্ধ-ব্যোমিত তাঁহার রবেই চলার পথে
দিনের আলোক হুটে উঠে, নিতে নিশীথ অন্ধকার ।

ওই উঠেছেন সূর্য-দেবতা নাত-বাড়া বাড়া রবে ;
দিক্ হতে দিক্ বিনিয়া উঠিছে তাঁর আনন্দ-গমন ;
আকাশ এবং পৃথিবী হয়েছে পূর্ণ তাঁহার ভেদে ;
এদ যমবান্ । সূর্যের দিকে জানাও নমস্কার ।

হ্যালোক আলোকি ওই উঠেছেন সূর্য উদয়চলে,
দেবপদ আল কলম ঘোচন আঘাতের সব পাণ ;
সব বিপত্তি দূর হয়ে যাক, মিত্র বরুণদেব
অবিত্তি সিদ্ধ আকাশ পৃথিবী রক্ষা করুন সবে ।

কাজরীকন্যা

শ্রীপ্রণব চট্টোপাখ্যায়

কাজরীকন্যা, তোমার তনুর গানে,
হৃদয়কে নিশিভায় ভূমি ডাকো ।
দে গান সুদৃঢ় একটি ভ্রমর আনে,
ভূমি তার পরে আঁধার শিশির ঝাঁকো ।
কাজরীকন্যা, নীল-আভা ছাতিমর
এই রাতে আমি তোমাকে বলেছি কিয়,—
মেঘের তনুতে আকাশ অবেশময়,
আমি আবিষ্ট তনু-স্থপদ যিরে ।

রামধনু-আঁকা দূরদিশে থাকে,
সে কথা কেবল আত্মনিবিকুলি করে ;
যাওয়ার পত্রালিকার পবন ভালে,
সে কথা শুধন পবন মেঘেতে ঝরে ।
সারা ঘুংঘেরা শরীরে রাস্তা আছে,
কাজরীকন্যা, আমার হৃৎকোণ তরে ।

একটি দুঃখের কবিতা

পরিমল চক্রবর্তী

আহত আকাক্ষাগুলো ঠিক যেন বিহবের মতো
আমাকে বিধুর কঁঠে দূর হতে আরো দূরে ডেকে,
মনের আকাশ ভরে রানবহু আশ্রয়না এঁকে
প্রাণের বীণায় তোলো কলাবতী স্বপ্ন আরা কতো।

তখন জ্বরে ঘর অন্ধ এক নাটকের মূর্ত—
অকাংগ বেহনার সেনাটিক অঙ্গ করণ;
পরিচিত হাধাকারে তীক্ষ্ণ বুক ঝাঁপে চুত্‌চুত,
বীবে নানে ঘবনিকা; (মাগকেব নয়ন অরুণ!)

ফুড়ে আগে একে একে পুঁথিবীর সব পরিচয়,
বিদূত আবেগ-স্তর্য চেতনার অতল সাগরে
থেকে থেকে গায়ে ডেউ কী-করণ আর ব্যাধনয়!
একটি ছায়াবানো মুখ বারবার শুধু মনে পড়ে।

ছ'চোখে আঘাত নামে। বতাসার মেঘ রাশি রাশি
স্বস্তির আকাশে ভাসে; অতঃপর পাখাড়িয়া নদী
নামে না তো কোনো বাঘ।

কোমোহিনো তাকে পাই যদি

তা'হ'লে বলবো আমি, বলবো, 'তোমাকে ভালোবাসি'।

তিবটি পাখির ছায়া

শঙ্করনাথ চট্টোপাধ্যায়

একটি ছায়া ধনেক ছিলো নদীর পাশে গাছে,
একটি মাঠে ঘূরে
নিষেধ ছায়া বেধতে গেলো গোনালী রোহুয়ে।
ধানিক ঘূরে বনের ছায়ানীলে
একটি আরো নতুন ছায়া তখন দেখা বিলে!
নিজম শাখা কাঁপলো কেন, শাখার কিছু পাতা
কাঁপলো কেন, মাঠের ছায়া বৃক্ষতে পারে না তা!
তখন কিরে আসে
নতুন ছায়া বিগল হয়ে বাওগার উড়ে আসে!
বয়ল হলো ভালোবাসার মায়া!
নিষেধ ছায়া বেধতে গিরে একটি করুণ ছায়া
এখন একা আছে।
(তিবহুদী থাকে না কেউ ভালোবাসার কাছে?)

ডাক

সন্তোষকুমার অধিকারী

আকাশের বুক ব'য়ে পানী এক ডেকে উড়ে গেল;
ডেকে ডেকে উড়ে গেল দিক ছাড়া পানী।
উজ্জল হাওগার ছন্দে চলিছে গণের সুরে সুরে
ডাক দিয়ে উড়ে গেল কোথা।

সবুজ অরণ্যে বেধা সমুজের অনন্ত শুভ্রন
অশ্রুত স্বপ্নের কথা জীবনের মত জ্বলে বুনে
বেগে গেছে। সে আকাশে নীল মেঘ জ্বরে
অনেক আবেশে

আকাক্ষা গাড়া হয়; গোখুলি বিকল
বুঁজে ফেরে যে পথের সীমা। অস্ত্র নেই,
ভয় আছে অনন্ত বাসনা; আর
পবিত্রের উত্তর জ্বরে দীপ্ত আশ।
দূর আকাশের লগ বৃক্ষবত মেঘের আভাশে
সে ডাকের ছায়া দেখা দৃষ্টিতে বলাকার মত।
অশ্রুত চেউয়ের পুঞ্জ জীবনের বিচিত্রবিত্তবে
সে শুধু আরেক প্রান্ত, আরও এক বিগল সুনীল।
মর্ষের নিবিড় হ'তে বস্ত্র তার দুবস্ত্র ইশারা
ডাক সে কোন্ পানীর?

রূপনারায়ণ

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

একটি মেয়ে গারাদিন ছুটাছুটি করে,
এখানে ওখানে, বনে, পাখাড়ে-প্রান্তরে।
একটি মেয়ে গারাদিন হালকা রঙিন প্রজাপতির মতো
উড়ে উড়ে বেড়ায়।

সে আমাকে বসতে দিয়েছিল আশ্রয় করে,

তার নায়েকল হৃদীর চাবপাখাখানায়,

তাল পাখার বাতাপ করেছিল,—আর তারপর,
আমার ভূমিত চৌঁচের সামনে ধরেছিল আশ্রয় শীতল লল।

সে-মেয়েটা গারাদিন রজনীগন্ধা বৃক্ষ ছায়াতে ভ'রে থাকে।

আর ছায়ায় হাওগার রঙিন গাবানের বনের মত

উড়ে উড়ে বেড়ায়।



বহি-বন্যা গজেন্দ্র কুমার মিত্র

(পূর্ব-হৃদয়)

॥ ৬৩ ॥

আমিনা অস্থিরিত বহর পরে বহুক্ষণ হীরালাল সেই-
খান্নেই দাঁড়িয়ে বইল। পিছনের অভিশপ্ত বাড়িটা থেকে
তখনও যেন ছ' একটা অশুট গোঙানি ভেদে আসছে,
হয়তো এখনও গিরে পড়লে কাটকে কাটকে বাঁচানো যায়,
অন্তত অস্তিম মুহুর্তে দু-একজন মূর্খকে এতটুকু বাহুদ্য
একটু আশ্বাস দেওয়া যায়—কিন্তু হীরালাল সে চেষ্টাও
করতে পারলে না। 'বিবিধের হত্যা'র কথা শেব হয়েছে',
এই বহর বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে—এই মতো
একজন ছন্দন করে কৌতুহলী হর্ষক ভংসা বা সাহস সত্য
ক'রে এসে লক্ষ্যে গুরু করেছে আশে পাশে—যদি-কিছু
করার থাকে, ওরাই করবে। হীরালালের এত মনের
বল নেই।

অনেকক্ষণ পরে একটা কথা ওর তখনকার সেই অর্ধ
বিকারাক্ষর মাথাতেও ঢুকল; উপস্থিত কৌতুহলী লমতার
উৎসাহ ওর সঙ্কেতও কম নয়। তারা ওকেই ডাকিয়ে
ডাকিয়ে বেগছে যেন বেশী করে। অর্থাৎ ওর ক্ষম এই
হত্যা'র সন্দেহটা অসম্ভব করতে চায়।

চিন্তা বা বাতণী শক্তি বড়ই আচ্ছন্ন হোক—এই
বরণের কৌতুহলের পিছনে যে লাবণ্যবিশিষ্ট এমন কি
টানটানি থাকে সাধারণত, সে কথাটাও ওর মাথায় যেতে
দেবি হল না। এক বকম কোর ক'রেই অর্ধলক্ষণ বেহাটকে
টেনে নিয়ে সেখান থেকে সরে এস।

কিন্তু কোথায় যাবে, একাঙ্গার গেলে একটু নির্জনতা,
একটু শান্তি, সত্যকার একটু বিশ্রাম পায়ে তা সে ভেবে

ঠিক করতে পারলে না। সকালে যে কোকানে আশ্রয়
নিতেছিল—সেখানে কিংব সেলেই এই ঘটনার আলোচনা
শুরু করবে কোকানী, সে কথা মনে হতেই একটা চরম
বিকার মনটা ভরে গেল। এখন এই প্রশ্ন আর একটুও
সহ হবে না ওর। অথচ আশ এ শহরে কারও মূখে কি
অন্ত কোনও প্রশ্ন আছে ?

অপত্তা অনেকক্ষণ পর্যন্ত পথে পথেই ঘুরে বেড়াল
হীরালাল। আবারের আকাশ কিন্তু এতটুকু মেঘের
চিকু নেই কোথাও। অথচ বর্ষার গুয়েটেটা আছে বোল
আনা। এখানে এই প্রথম গ্রীষ্মকালের অভিজ্ঞতা
হীরালালের; পশ্চিমের যে ভয়াবহ গমনের কথা সে
ছেলেবেলা থেকে শুনেছিল সে গরম ওর এতদিন অসহ
লাগেনি, তার কাছপ এতদিন যায় হত না। উত্তর বাতাসে
মুখ চোখ ঝলুনে যেত কিন্তু বাঘের কষ্টটা টের পায় নি।
এই কদিন শুরু হয়েছে সেটাও, তাপ কবে নি—বাতাস
কমনেছে। ফলে অবস্থা হয়েছে আরও শোচনীয়। নামে
ওর দিবাচরী পায়ের দিকে লেপটে গেছে, তার ওপরে
রৌদ্রের তাপে যেন ও সেজ হচ্ছে ভেতরে ভেতরে।
দিবাগার বুক অবশিষ্ট করে উঠেছে। খুলো তেতে হাঁটু
পর্যন্ত পা ছুঁতে ঝলুছে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মত, অতিভূতের মত পথে পথে
যেতাবার পর এক সময় মিথের এই অবস্থাটা সঙ্কে
সচেতন হয়ে উঠল হীরালাল। শব্দেটা বহুক্ষণই ভারী
পাথর হয়ে উঠেছিল—সে তার পা ছুঁতে আর বইতে
পারছিল না। একটু একটু ক'রে সচেতনতা ফিরে

আসবার পর আর একবারেই নড়বার অবস্থা হইল না। যখন হল আরও একবার স্বপ্ন—এখনই পথের ওপর বলে পড়তে হয়।

ট্রিক সেই সময়ই গোখে পড়ল—সামনেই গঙ্গা। অস্ত্র-মনস্বভাবে তুস্ত্রস্ত্রের মত পথ চললেও প্রকৃতি বৃষ্টি নিম্নের কাকটিক ক'রে গেছেন—তুস্ত্রস্ত্রের মত পথের কাছে টেনে এনেছেন।

সর্বদৃষ্টিবাহিনী, সর্ব-দৃষ্টি-বিনাশিনী গঙ্গা।

হীরালালকে আর জানাইল না। সে কোন দিকে চাইলে না, অগ্রপশ্চাৎ কিছু ভেবেও যেনে না। যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই—জামাকাপড় শুধু বলে গিয়ে মানল।

আঃ! সব তাপ জুড়িয়ে গেল বৃষ্টি। সব জ্বালা। বোঝার নয়—মনেও।

ইতল, মনুষ্য। পণ্ডিত মত মুখ দিয়েই আকর্ষণ পান বলে হীরালাল। বার বার ভূঁই হিলে। তাৎপর্য গলা অর্থাৎ ভূমিত অনেককাল পড়ে রইল বলে।...

আর কিছু চার না সে। আর কিছু ভাববেও না। এই ভাল। এই ভাবেই যদি সারা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে ত আরও ভাল। এমনি আশা, এমনি বিশ্বাসিত তরা শাস্তিতে।...

কিছু আশাের বেলাও ক্রমশ শেষ হয়ে আসে। গঙ্গার বলে, ওপারে বনোবনো নামে সন্ধ্যা। হঠাৎ এক সন্ধ্যা হীরালালের মনে হল ওর দৃষ্টি করছে। বুকের মধ্যে ওর ওর করে উঠছে কাঁপুনি। সে তাকাতাকি বল থেকে উঠে পড়ল।

এতকণে তার মেঘাল হল যে ঐ প্রচণ্ড হৌত থেকে এগেই বর্ষাক্ত দেখে ঠাণ্ডা বলে মায়া তার ট্রিক হয়নি। এগেই মধ্যে সন্ধ্যা হয়ে উঠেছে—প্রবল সন্ধ্যা। অচট তখনও—জল থেকে উঠেও তাকে জামা কাপড় ছাড়ার কোন উপায় হল না। কিছুই সে বুঝে রাখেনি পাড়ে, নামবার সময় অস্ত্র বিবেচনা করার অবস্থাও ছিল না। যদি উত্থানটাও অস্ত্রত বুঝে রেখে নামত ত এখন সেটা পরা চলত।

কিছু তা এখন রাখেইনি—তখন নিম্নের নিরুদ্ভিতাকে

বিকার বেগের ছাড়া আর কতবারও কিছু নেই। জামাকাপড় বস্তা সন্তব নিখুঁত নিয়ে আশুর সেইগুলোই পরে—তুস্ত্রস্ত্রের ছাড়াটা হাতে জুলিয়ে ঠক্কর ক'রে কাপতে কাপতে বাগার পথ ধরে হীরালাল—এব সেই অবস্থাতেই বিস্তার ঘুরে ফিরে যখন শেষ পর্যন্ত সেই হোকারটার এসে পৌঁছল তখন তার মতিই আর ঠাণ্ডা বাহ বা কথা কইবার শক্তি নেই। প্রবল অর্থাৎ তখনই সে অতিভূত হয়ে পড়েছে। কোন মতে টলতে টলতে হোকারের পাশে অতিবিশেষের মত নিখুঁত বস্তার ঢুকে সেই আশুত্বকো কাপড়-জামা শুভই বাটীরেতে চলে পড়ল। এতকণে তার পূর্ণ শান্তি অর্থাৎ বিশ্বাসিত মিলেছে।

হোকারী পড়ল মধ্য অস্ত্রের। লোকটা সম্পূর্ণ অপরিচিত, বিবেকিত। কোথায় কে আছে ওর তার জানা যায়নি। নিফল কেনেও সে হীরালালকে বার বার উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করেছে—কিছু ওর তখন পূর্ণ বিকার। উত্তর যেরূপে কে ? সন্ধ্যা এমন কোন কাপড়পত্র নেই যে পরিচয় দেবে। টাকা-পয়সার অবস্থাও তখনও। এ কী কথাকে তাকে ফেললেন মহাবীরী।

এখার মতের তখন যোর অর্থাৎ অবস্থা চলছে। ইংরেজরা এসে পৌঁছেছে। নামাশাহের মতের একটা স্মরণ দেটা করেছিলেন ভাইকে পাঠিয়ে—সে ভাই পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসেছে। নামাশাহের কানপুর ত বটেই বিদ্রোহ থেকে চলে গিয়েছেন কাপুণী দিকে। ইংরেজরা কানপুরের পূর্ণ মালিক। মাজে ক'দিন আগে বাঘের কুস্তুরের মত চলি ক'রে মারা হয়েছে, বাঘের মেয়েরা মাজে দুদিন আগেই কসাইয়ের হাতে শাগির মত চুকুকাটা হয়েছে—ভায়েবই জাতি, যামেলাশী এরা—এই বিকল্পীরা।

সুতরাং সেদিনের সেই বিশ্বাসঘাতকতা, অকারণ নিরুত্তরতার পূর্ণ শেষ উঠবে—এইটাই বাস্তবিক। সে শোণও উঠেছে তেমনই, যেমন ওর তার তেমনই ওয়াদি। শোণ হচ্ছে স্ত্রী স্ত্রী, মস্ত চক্রবর্তী স্ত্রী স্ত্রীই কিন্তু তাতেই বা বলবার কি আছে ? যেনা করলে স্ত্রী দিতে হয়।

ইংরেজরা যে-কোন এমনি লোককে হাতের সামনে পাচ্ছে, বলতে গেলে তাকেই ক'টা কাঠে চুড়ছে। কিন্তু শুধুই কাপী নয়—তার আগেও লাঞ্ছনা বড় কম হচ্ছে না।

যে না প্রমাণ করতে পারছে সে যে ইংরেজের শত্রু নয়, কোনমতে তাদের বিতৃষ্ণাচরণ করেনি—তাই এই পরিণাম ঘটছে। আর সাধারণ লোক—বিশেষ করে বাবা দিগাই নিবিরোধ, নির্দোষ—তারা এত প্রমাণ প্রেরণের কথা জানেও না। তারা ওপর পরজ ক'রে বাগতেই বা যাবে কেন? সুতরাং তাই এই ভাবে মরতে লাগল বলে বলে। বাবা ছাঁপিয়াব, বাবা ইংরেজের বাংলা। মুঠ ক'রে ছু পরমা করেছে—তাই এই এখন সাত্বত্রে ইংরেজ ভক্তি প্রদায় করতে লেগে গেছে উঠে-পড়ে, আর তাদের প্রাণেরও অভাব হচ্ছে না।

এই যালচালের মধ্যে বেচারী বোকানাবাবের অবস্থাটা হয়ে উঠেছে অবর্ণনীয়। তার দিনের আহার যাত্রের মিডা দুই-ই চলে গেছে। ব্যবসা ত গোমায় গেছেই—তা যাক—এখন সে কোনমতে দেহাত টোরাতে পালিয়ে যেতে পারলে বাচে—কিন্তু সে উপায়ও যে বন্ধ হতে বসল। এই অজান, অচেতন—মুর্খ লোকটাকে কেলে সে আর কেনম ক'রে? বিশেষ করে লোকটা ব্রাহ্মণ, জাতের পরিচয় আগেই পেয়েছিল, তাছাড়া জেনেই দেখেও মানুহ হচ্ছে। ব্রাহ্মণ সত্যনকে নিশ্চিত সত্য্যর মধ্যে কেলে যেতেও ঠিক মনটা মরল না।

একটা জিনিস সে জেনেছিল, এ অতিথি 'বাংলালী'।

মরীয়া হয়ে ঐ শোলমালের মধ্যেই শহর কে কোথায় 'বাংলালী' আছে—বোঁধ করতে লেগে পেল সে। বহর পাওয়াও পেল শেষ পর্যন্ত। অধিকাংশ বাঙ্গালীই—যারা সুযোগ পেয়েছে কোন বসম—সবই ছেড়ে পালিয়েছিল। বাবা পারেনি তারা ছুঁতিনটে আরপার কড়ো হয়ে অহরহ মৃত্যুভয়ে কোনমতে বিন কাটাছিল। মৃত্যুভয় এই ভজ্ঞে যে—বাঙ্গালী মাজেই সাধেবের পা-চাটা এবং গোপনে গোপনে তাদের সাহায্যকারী—গিলাহীদেব এই বিশ্বাস। তারা এতদিন ঘোর সন্ধ্যের চোখে দেখে এসেছে। হুকীও বড় কন যেমন। কড়া নম্বর রেখেছে ওদের ভগ্ন। অথচ যা ছু একজন সাধেব কোনমতে গিলাহীদেব হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে—ছুটে এসেছে বাঙ্গালীদেব কাছেই, একটু সাহায্য বা আশ্রয়ের ভক্ত। অনেক সময় সেটুকুও বেওয়া যায়নি—

তবে বেবার চেষ্টা করেছে অধিকাংশ সময়ই। তারা জানত যে সাধেবরাই জিতবে শেষ অবধি—এং তা না জিতলে বাঙ্গালীদেব মলল নেই। কিন্তু আপাতত শমন শিরের যে! যদি এতটুকু এই সাহুস্লোর সংবহ প্রকাশ পারত কারুর শির থাকবে না।

কতকটা সেই ভজ্ঞেই—বোকানী এখন যে বাগার এসে শহর দিলে যে এক অপরিচিত বাঙ্গালী ছোকরাযাবু জবের অচেতন হয়ে পড়ে আছে তার বোকানো—এং 'খুন' 'হক্ত' এইদর কী বন্ধে—তখন সে বাগার কোন লোকই ও উড়ে-আপব খাড়ে নিতে রাজী হলেন না। বাগার গন্তিক বেখে দ্বিতীয় বাগাতে গিয়ে অনুমতি নেবারও চেষ্টা করলে না বোকানী—দূর থেকে বাগাটা বেখে এসে অতি কষ্টে একটা ভুলি ভোগাড় ক'রে হীরালালকে তুলে এনে একেবারে হোরের কাছে নানিয়ে দিলে।

তারা আর এড়াতে পারলেন না। একে বাঙ্গালী (চেবরা) বেখেও তাই মনে হচ্ছিল আর বিচারের ঘোরে যা বকছিল তা বাংলা ভাষাই। তার ব্রাহ্মণ, এই ছুর্গোণের বিনে কোথায়ই বা বলেন? আশ্চর্য কন্ট-কিত হয়েও 'আপবকে' আগ্রহ দিতে হল এবং শহরের অবস্থা একটু সহজ হতে বৈজ্ঞও ডাকতে হল। আশঙ্কা এবার ইংরেজের কাছ থেকে—তারাত ঠিক বিদ্যাপের চোখে দেখতে পারছে কৈ? তার ওপর এ ছোকরা বা বন্ধে তা আরও সাংঘাতিক; 'বিবির' 'সর্গীর বা' 'খুন' 'হক্ত' 'ভলোদ্যব'—এই সব। সাধেবের কান পেলেত আর বন্ধা নেই-ই, পথে-ঘাটে এখন অসংখ্য পেয়েছা, তাদের কানে পেলেও বধেই।

বৈজ্ঞ এসে অবস্থা দেখে মূখ বিকৃত করলেও হীরালাল শেষ পর্যন্ত সেবেই উঠল। হরন্ত তার খাড়া অসাধারণ ভাল ছিল বলেই, কিছা অন্ন বালসে রোগের সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতা বেশী থাকে বলেই—বৈজ্ঞরাজের 'সামিগান্তিক বিকার'ও তাকে পেড়ে ফেলতে পারল না।

কিন্তু সে দেবে উঠে বসতে বসতে বছদিন কেটে গেল। বহ ঘটনাই ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। খাবাণ্ডা

চিত্তাশক্তি যেমন একটু একটু করে ফিরে আসতে লাগল—
একটু একটু করেই শুনলে সব খবর।

হীরালাল যেদিন জ্বর ঝেঁটতক্ত হয়ে পড়ে—তার
পরের দিনই বিক্রয়ী ইংরাজ হল কানপুরে প্রবেশ করেছে।
তখনও নানা সাংঘর্ষ বিটুতে ছিলেন—পরের দিন রাতে
তিনি বিটুর ত্যাগ করে গঙ্গা পেরিয়ে ওপারে পালিয়ে
গেছেন। ঠিক সময়েই গিয়েছিলেন, কেননা—সেই রাত্রি
শেষেই ইংরেজরা বিটুর প্রাসাদ ধ্বংস করেছে ও ধ্বংস
করেছে। ইংরেজদের এ হলের প্রধান সেনাপতি
হাভলক কানপুরে বেসী দিন থাকেন নি,—আট ন দিন
পরেই লক্ষ্যের দিকে রওনা হয়েছেন—যেথেকে গেছেন
মীলকে। মীল তার অভ্যাস ও স্বভাব মত পৈশাচিকতার
তাণ্ডব শুরু করেছে।

কানপুর পর্যন্ত হাভলকের গতি অব্যাহত থাকলেও,
তৎপরে বিশেষ সুরক্ষা করতে পারেন নি। কানপুরে
পৌঁছবার আগে বার-দুই নানাব প্রবৃত্তি বাহিনী তাঁকে
বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল—পারে নি। কিন্তু লক্ষ্যেরের
পক্ষে হস্তিরংগ প্রায় হস্তে গিয়ে হাভলককেই পিছিয়ে
আসতে হয়েছে—দু-দুবার।

এরপর এসেছেন সেনাপতি আউটরাম। তাঁকে পরন্ত
থেকে আনানো হয়েছে। আগে ঠিক হয়েছিল আউট
রাম বিহারেই থাকবেন—কারণ আরা ও হানাপুরে
আগুন জলেছে ভাল ভাবেই। কিন্তু কানপুরে সন্ধ্যা
অস্বস্তিকর সংঘর্ষ পৌঁছতে তাঁকে সোজা কানপুরেরই চলে
আসতে হল। এর মধ্যে কানপুর গ্যাংগিসনের অবস্থা
সত্যিই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল।

দুবার দুই এবং মড়কে হাভলকের দলে বিস্তার লোক
নাথ্য পেছে, সংখ্যা মাত্র ম সাতকেই এসে ঠেকেছে। অশ্রু
চারণকেই প্রবল শত্রু। গোয়ালিয়রে নাকি একটি হল
প্রবৃত্ত হাচ্ছে, যে কোন নুহুতে তারা কানপুরের ওপর
কাঁপিয়ে পড়বে হয়ত। নানাসাংঘর্ষও অদূরেই বলে
আছেন—কতপুর চৌবান্ধিতে বলে এই হলের অপেক্ষা
করছেন, ওদের অগ্রগমনের সংবাদ পেলেই তিনিও কাঁপিয়ে
পড়বেন।—গোয়ালিয়র হল এতদিন এসেই পড়ত—শুধু

নাকি সিঁড়িয়ার কৌশলেই তারা চূর্ণ করে বলে আছে,
এখনও ইতস্ততঃ করছে।

ইতিমধ্যে লক্ষ্যেরের নাকি অনেক কাজ হয়ে গেছে।
সংরক্ষণ মারা গেছেন—সে খবরটা অশ্রু হীরালাল আগেই
পেরিয়েছিল পক্ষে আসতে আগতে—ইংরেজরা বেগতিক বেধে
মহি ভবন থেকে বাট সড়িয়ে এনেছেন, লম্বাই এসে আশ্রয়
নিরেছেন রেসিডেন্সীতেই। মজি ভবন প্রাসাদের আদ্যার
আগে তোপের মুখে ডুঁড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেন খানিকটা—
কিন্তু তাতে সিপাহীদের ভয় বেশানো যায়নি। অববোধ
ভীতস্তর হয়েছে। মৌলবী সাংঘর্ষ ও অযোধ্যার বেগম
হজরত মল সিপাহীদের নেতৃত্ব নিরেছেন—বহু সিপাহী
এসে জড়ো হয়েছে, সিপাহী হাড়াও বহুলোক এসেছে—
তালুকদাররা অনেককেই এসেছেন সোকলঙ্গর নিয়ে বেগম
সাংঘর্ষের আয়োজন।

অববোধের মধ্যে ইংরেজদের জীবন দুর্বল হয়ে উঠেছে
প্রতিদিন বহুলোক নারা যাচ্ছে, শত্রুপক্ষের তলিতে, রোগে,
খাদ্যভাবে। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, ঔষধ নেই। আ-
কাশক কাটা—এলব কল্লনাভীত বিলাস হয়ে উঠেছে।

ভবুও তাঁরা কোনমতে বাইরের অগস্তর দলে
যোগাযোগ রেখে যাচ্ছেন। অমর তেওয়ারী নাম এক
জগুচর অস্যাগ সাধন করেছে, এই নিরস্ত অববোধের মধ্যে
মিরেও খবর আদানপ্রদানের কাজ অব্যাহত রেখে যাচ্ছে।
তাইতেই এইসব শোচনীয় সংঘর্ষ কানপুরে এসে পৌঁছেছে
—এবং আউটরামও পেছনে গোয়ালিয়রের আসন্ন ঝড়ঝড়ার
ভয় উপেক্ষা করে এগিয়ে গেছেন লক্ষ্যেরের দিকে।

কিন্তু লক্ষ্যেরের দুঃখ শোচনীয়। হাভলক ও আউট
রাম লক্ষ্যের অববোধ ভেদ করে রোগশল্যেই চুকেছেন
ঘটে, বোরয়ে আসতে পারেননি, অববোধও বদ্ধ য়ানি।
তারা স্তব্ধ আটকা পড়েছেন সেখানে। ফলে সেখানকার
সেই সামান্য খাদ্যই ভাগ বণাবার লোক বেড়েছে শুধু,
আর কোন উপকার হয়নি। সব মিলিয়েও সমর্থ লোকের
সংখ্যা এখন দাঁড়ায়নি যে শত্রু ব্যাধ কেটে বেরিয়ে আসা
যায়।

আততুস্তের মত, ময়নুস্তের, মত হীরালাল শুনল
এইসব কাহিনী। সে এতদিন রোগে পড়েছিল। এত

ঘটনা ঘটে গেছে এখানে—আর সে কিছুই টের পায়নি ?

এ যেন একেবারেই অবিধাত, গল্পকথা ।

কিন্তু বিশ্বস্তের ধাক্কা শেষ হতেই বেধা দিল সমস্তা ।

অবিদ্যত এসে গাড়াল সামনে ।

এখন কি করবে ? বাঁহের অঙ্গরে আছে—ঠাঁহের অবস্থাত কম শোচনীয় নয় ; আর ঠাঁহের গলগ্রহ হয়ে আর একদণ্ডও থাকে উঠিত হয়না । অথচ করবেই বা কি ? শরীর দুর্বল ; তাছাড়া ওর প্রাক্তন মনিবকেও তো কোন বোঝ খবর নেই । বেশে কিবে যাবে ? তাই বা কেমন ক'রে কিবে—এখনও তো পথঘাট কিছুমাত্র নিরাপথ হয়নি । টাকাই বা কৈ ?

অকস্মেৎ ঐ বাগানই এক প্রাণী ভক্তলোক সুপারামর্শ দিলেন । ইংরেজেরা এখানে এসে বসলেও ওদের আসনটা এখনও পাকা হয়নি—আবারও উৎখাতের স্তর আছে—সেইঘরে বাল্যালীরা এখনও প্রকাজে ঘুং একটা ঘনিততা করতে সাহস করেনি তবে শোপনে পূর্ব সংযোগিতাই করছে, কেউ কেউ ঘড়টা সম্ভব ওদের কাশও করে দিচ্ছে । রামগোপাল চক্রবর্তী এই ঘরদেই লোক—তিনি এইসব গোলমালের আগে ছিলেন এক কাপড়ওয়ালা সাংঘেবের কেবানী, ষাভাগজে পাকা । তিনিই এখন ইংরেজ গ্যারিসনের বিদ্যাপত্রের কাছে সাহায্য করছেন । রামগোপালবাবু ওকে বললেন, 'তুমি এখানকার অভিশ্রাবের নমুনা দেখা কর । সব কথা খুলে বলা, এখানেই চাকরী পেয়ে যাবে ।'

'এঁরা বিখান করবেন আমার কথা ?'

'অবিশ্বাস করবার কী আছে ? তুমি আমাদের এখানে এই আড়াই মাস রোগে পড়ে আছ এটা ত মিছে কথা নয়, আমরা সবাই জানি । আমরাই দাকী দিতে পারব । আর তুমি কমিশারিয়েটে কাজ করতে কিনা সেটা শু তোমাকে জেবা করলেই তাঁরা টের পাবেন ।...চলো, বহু আমিই তোমাকে নিয়ে যাই একদিন ।'

রোগ ওস্তুর সূত্রে—শরীর সাধারণতঃ হস্ত হরকার হস্ত রদায়ন । রামগোপালবাবু এই আশাশ্রুতঃ রদায়নের কাজ করল । হীরালাল এই ভরসা পাওয়ার তিন চার দিনের মধ্যেই যেন বেশ খানিকটা স্বল ও সুস্থ হয়ে উঠল ।

সে অল্প সেইদিন থেকেই নিত্য তাগালা শুরু করেছিল—কিন্তু রামগোপালবাবু আরও করেকদিন সময় নিলেন—সাংঘাতিক রোগে রক্তশূন্য ও দুর্বল ক'রে দিয়েছে, এই অবস্থার বেশী পরিগ্রহ করলে আবার পড়তে পারে—বৈজ্ঞানিক বাস্তবায়ন ক'রে দিয়েছে ।

অবশ্য বেশীদিন অপেক্ষা করা গেল না । হীরালাল এই নিষ্ক্রিয়তা ও পদবৃথাপেক্ষিতা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ছুটুছুটি করছে—আর একদিনও এমন ক'রে পথের স্তর খেয়ে বেঁচে থাকতে চায়না সে । ওর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে রামগোপালবাবুকে লিগলিই একটা ভাল দিন বেধে ওকে সঙ্গে ক'রে বেঘর সাংঘেবের কাছে নিয়ে যেতে হল ।

বেঘর সাংঘে ওর সব কথা শুনলেন । জেরা করলেন দ্বিত্ব । লাক্তো ছেড়ে যাওয়ার অজুহাতটা তাঁর খুব পছন্দ হলনা । হীরালাল অবশ্য সত্য কথাই বলেছিল—কিন্তু তাতে ওঁদের খুন্সী হবার কথা নয় । যাই হোক সব শুনে বললেন, 'স্তর কলিন ক্যাম্পবেল আর তাঁর হাইল্যাণ্ডাররা আদর্শে লাক্তো ঘর করতে । তাঁদের কমিশারিয়েটে অভিজ্ঞ লোক বহুকার । আরও বহুকার লাক্তোরের পথঘাট জানে, রেগিডেলীয়ার মাপটা বোঝে এমন লোক । আমাদের এখানে এখন কেবানীর প্রয়োজন নেই—ও লোক ডের আছে । আমাদের এখন বোড়ার বহুকার ।...তুমি এক কাজ করো—খরি দত্তি সত্তিই আমাদের সার্ভ করতে চাও ত আমাই বত্তা হয়ে যাও কতপুংর হিংক, পদবস্ত তুমি সেখানে পৌছতে পৌছিতে স্তর কলিনের দল সেখানে এসে যাবে । তাহলে কাছেই গিয়ে রিপোর্ট করো যে ।...কতপুংর পর্বস্ত পব পদিকারই আছে এখনও—যেতে কোন অসুবিধা হবে না । চাও ত একটা চিঠি লিখে দিতে পারি, এখান থেকে একটা বোড়ার দিতে পারি ।'

অগত্য ! হীরালাল মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে উঠল ।

আবার অনিশ্চিতের উদ্বেগে ব্যাভা !

কিন্তু উপায়েই বা কি ! সাংঘেবের ঘুং দেখে বোকা সেল যে এর বেশী সেখানে কোন সুবিধাই হবেনা ।

সাংঘে আর একবার তথু প্রশ্ন করলেন, 'বোড়ার চড়তে জানো ত ?'

মাথা হেলিয়ে হীরালাল উত্তর দিল, জানে সে ।

'তাহলে কাল ভোরে তৈরী হয়ে এশো—বোড়া ও চিঠি প্রস্তুত থাকবে ।'

ট্রেবে বিড়ম্বনা

ঐশ্বর্যবানীনাথ রায়

বাগাঘাটে বাড়িলাম। অতি কষ্টে একখানি হুতীয় শ্রেকীর কানদ্বারা কেণ্ডের দিকে স্থান পাণ্ডে করলাম। অরোহণ করে ঐশ্বর্য দিয়ে বসে একটি বিড়ি ধরলাম।

বিড়ি ধরিয়ে বিপত্তি হবে সেটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু তখন টু পেটে। বেরি হয়ে গেছে—বেরি হয়ে ফেলেছি।

গাড়ির অপর অংশে নব্য ছোকাটায়ের একটি হল ছিল তাড়াও আনার সহযোগী কিন্তু অগতঃ দিকে দোটা খেলান করিনি। খেয়াল করলে বহুত গাড়ি বহন করতাম।

আজ্ঞে আজ্ঞে কবা বললেও বেশ শুনতে পাচ্ছিলাম—একজন বললে, যা নবিশ, ঐ বুড়োর কাছ থেকে বেশলাইয়েই বাকটো চেয়ে নিয়ে আর।

নবিশের উত্তরটাও শোনা গেল। সে বললে, না তাই আমি পারবো না। বাবার চেয়েও উনি বহুত বড় হবেন আমি ওর কাছে বেশলাই চাইতে পারবো না।

চাইতে পারবে না তা ত বুঝলাম কিন্তু তা হলে সিগারেটটা ধরাবে কি দিয়ে তাই শুনি?

নবিশ চুপ করে বসল। বললে, ধরাব না।

ধরাবে না মানে? তা হলে আজ থেকে তোমাকে আমদেব হল থেকে বার করে দেব। আমরা আর কেউ তোমার সঙ্গে মিশবো না।

বেশ মিশো না। আমিও আজ থেকে সিগারেট বাগড়া ছেড়ে দিলাম। আর সিগারেট ছোঁব না।

ওরে বাবা একেবারে যে সাধুপুত্র। সিগারেট আর ছোঁবেন না। তা হলে এতকাল ধরে আমাধের যে সিগারেট ধরান কবেই তার সমস্ত পয়সা তোমার কাছ থেকে উদ্ধার করবো।

বেশ তাই কোরো আমি রাগী হইলাম। কত হয়েছে হিদাধ করে আমাকে আনিয় বাও আমি হান দিয়ে বেব।

নবিশকে দিয়ে সুবিধা হল না দেখে হলপতি ঐশ্বর্যের দিকে তাকালো। বলল, ঐশ্বর্য, ভূই বা, বেশলাই বাবুসো চেয়ে নিয়ে আর।

ঐশ্বর্য বললে, চাইব ত কিন্তু তাই বহি না দেব।

ইস, অমনি না দিলেই হল, ওর কাছে রয়েছে আর সিগারেট ধরাতে বেশলাই বাবুসো দেবে না?

দেবে না তা বলছি নে কিন্তু বহি না দেব ত তখন কি করা যাবে?

হলপতি উদীপ্ত হয়ে উঠলো, কি করা যাবে? করার অনেক পথ আছে—বাগাঘাটে নামবে ত? তখন পেটের কাছে চেপে ধরে 'চোর' 'চোর' বলে চেঁচালেই হল। লোক জমে যাবে—তখন সকলে মিলে উক্ত মহাম হু'বা দিলেই হবে।

ব্যবস্থা শুনে শীতের মধ্যও আমার গা দিয়ে ঘাম ছুটতে লাগলো। আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম এবং কান পেতে ওঁধের কথা শুনতে লাগলাম।

ঐশ্বর্য আন্তে আন্তে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। সে এসে পৌঁছাবার আগেই বেশলাই বাবুসোটা তার দিকে তুলে ধরলাম। বিনা বাকা হয়ে ঐশ্বর্য বেশলাইটা নিয়ে ফিরে গেল।

আমার আশেপাশে যে কয়জন মধ্য বয়সী এবং প্রৌঢ় লোক বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে এবার এর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। তারা বললেন, হ্যাঁ মশাই, বাবুসোটা দিয়ে দিলেন? আপনাব্য এতটুকু সংগ্রহ নেই?

ধন্য দিয়ে বললাম, সংগ্রহসেই বহুত ত দেখলাম, মশাই। কেউ একটি কথাও ত বললেন না। তারপর আমাকে গেটে বস্কর আর হু'চর বা দিক আর কি? তখন আপনাদের কোথায় পাওয়া যাবে? নিশ্চয় তখন আপনারা হাওয়া হয়ে যাবেন।

একজন বললেন, বাবু, এখন ত আপনি দিয়ে দিচ্ছেন—আর ত আপনাকে কিছু বলতে পারবে না।

অপর একজন একটু রসিকতা কল্পনার লোক সংবরণ করতে পারলেন না। বললেন, আপনি ও বান না, ঐ হলে ভিড়ে পড়ুন। একসঙ্গে হু'চরটে সিগারেট টেনে আনুন।

তখনো আমার কর্ণস্থ লুল হয়ে উঠলো। কিন্তু বলারই বা কি ছিল? এতলেও হাসি, পেছল ত হাসি।

ভারতীয় মুদ্রার কথা

ঐশ্বর্যবোধ চক্ষু দস্ত

(সপ্তম পর্বাংশ)

ষ্টার্লিং অম্বা (accumulation of sterling balance) :—পূর্ব পর্বাংশে ষ্টার্লিং সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। একথাও বলা হ'য়েছে যে সর্বদাই কাপকৌ মুদ্রার ক্রমান্বিত রূপে ষ্টার্লিং ব্যাংক অব ইংলণ্ডে সংরক্ষিত থাকত। ১৯৩৮ সালে এতদপূর্ব পর্যন্ত পরিমাণ ৬৪ কোটি টাকা থেকে ১৯৪৫-৪৬ সালে ১৭০০ কোটি টাকার ষাঁড়ায়। স্বাধীনতার সময় ভারতের বিস্তার ছিল ১৪১৬ কোটি টাকা। ভারতবাসীর অক্ষমতার বিনিময়ে মুদ্রার সময় এ ষ্টার্লিং উপাধিত হয় পূর্বপর্বাংশে সে কথা বলা হয়েছে। মুদ্রার পর ইংলণ্ডের বক্ষণশীল শাসক সম্রাটের আপানী আক্রমণের হাত থেকে ভারত রক্ষার কৃতিত্ব দাবী করে এবং ষ্টার্লিং পাওনা নিষ্টিরে বিত্তে সে মুদ্রার সুযোগ নিয়ে ভারত অস্বাভাবিক ভাবে বেশী দাম দাবী করে মিত্রপক্ষকে মালপত্র সরবরাহ করেছে। কিন্তু ভারতের ভ্রমণ এ অস্ত্রের ক্ষতি কোন নিতে রাজী হয়নি। মুদ্রা ভারতের ক্ষতি, পুনর্নির্মাণ ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা ও নিয়ন্ত্রিত মূল্য মুদ্রাকালে পণ্য সরবরাহের প্রমাণ দিয়ে ভারী ষ্টার্লিং পাওনা কড়ায় পত্তায় বুকে পেতে চায়। ইংলণ্ডে শ্রমিকবলের হাতে শাসনকার গেলে ইংরেজ সরকার ষ্টার্লিং পাওনার পরিমাণ কমানো বা অস্বীকার করা স্বেচ্ছা মনে করেনি। তবে কিস্তিতে সম্পূর্ণ দায় শোধ করবার অস্বীকার করে এবং উত্তর দেশের মতো ষ্টার্লিং পাওনা নিয়ে কতকগুলি চুক্তি হয়। ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৪৯, ১৯৫১ ও ১৯৫৩ সালে বিভিন্ন চুক্তি হয় এবং এসব চুক্তির পর ভারত নান্দশময়ে ষ্টার্লিং পাওনা উল্লিখে আনতে থাকে। এভাবে উল্লিখে আনার ফলে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পাওনা ষ্টার্লিংএর পরিমাণ ছিল ৫০০ কোটি টাকা এবং এর পরিমাণ ১৯৫৮ সালের জুন মাসে বাড়িয়েছে ২১৭.৭২ কোটি টাকায়। 'উন্নয়নমণী' পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলি

সময়ানুগে ষ্টার্লিং বিদেশী মুদ্রা সংস্থানের মাধ্যমে কিছুটা সহায়তা করেছে। মুদ্রান্যূন্য-হ্রাস (Devaluation)—
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই ইংলণ্ড বাণিজ্যিক বিষয়ে আমেরিকার মুদ্রাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে আরম্ভ করে। যুদ্ধোত্তর কালে এ নির্ভরতা অত্যন্ত বেড়ে যায়। আমদানী ও রপ্তানীর অসামঞ্জস্য এতদপূর্ব পর্যন্ত আসে যে দুটোনের ডলার অকলস তথা আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্য করা দুঃস্বপ্ন হয়ে ওঠে। ষ্টার্লিং এলাকার অস্বস্তি বেলজিয়াম বাণিজ্যকাল ইংলণ্ডেরই অবস্থার মত থাকায় তাৎক্ষণিক সংরক্ষিত তহবিলে স্বর্ণ ও ডলার ক'ম বেতে থাকে। এতদপূর্ব অবস্থায় ১৯৪৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড মুদ্রান্যূন্য হ্রাস করে। এ হ্রাসের পরিমাণ ষাঁড়ায় ০.৫%। কমনওয়েলথ মুদ্রা পারিভ্রাম হ্রাসে অস্ত্র সব কটি দেশই অল্পরূপ বাবদ্য অবলম্বন করে। ভারতও মুদ্রান্যূন্য হ্রাসে- প্রকৃতপক্ষে বাধ্য হয়। ভারতের বৈদেশিক ভাগ্য বৈদেশিক বাণিজ্য ষ্টার্লিং অকলের বেশগুলির সঙ্গে। মুদ্রার শেষ দিক হাতেই বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদান্যের ঘাটতির লক্ষণ দেখা দেয় এবং ১৯৪৬—৪৯ সালে ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে চলে। স্বাভাবিক, বিভিন্ন ভোগ্য পণ্য ও কিছু উৎপাদন যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য আমদান্যের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ নৈরাশ্রজনক ভাবে বৃদ্ধি পায়। তাই মুদ্রান্যূন্য হ্রাস করে ভারতীয় পণ্য আমেরিকা ও যারা মুদ্রান্যূন্য হ্রাস করেনি তাদের বাজারে সস্তায় চালান দেওয়ার প্রয়োজনেই ভারতীয় মুদ্রান্যূন্য হ্রাস করা হয়। মুদ্রান্যূন্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গেই ঈশিত কল লাভ হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদান্যের ঘাটতি ছিল ১৮০.৫ কোটি টাকা আর মুদ্রান্যূন্য হ্রাসের ফলে ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৫০-৫১ সালে এর পরিমাণ কত বর্ধাক্রমে ১৮৮.৮৯ কোটি ও ২২.০.১ কোটি টাকা। এ

অনুসারে সঙ্গে সঙ্গেই মুদ্রাস্ফীতি অত্যন্ত বিপজ্জনক আকার নেয়। ১৯৪০ সাল থেকে আর পৰ্ব্বত অব্যাহত। পণ্ডিত হিকে তাকালে এটা বোকা ঘাট। মুদ্রাস্ফীতি যোগ এবং বিপুল পরিমাণ আমদানীর কথা ভেবে মুদ্রানুপাত বৃদ্ধির চক্র (re-valuation) সরকারকে অস্বপ্নেও করা হয় কিন্তু ওলেন্ডন অর্থমন্ত্রী প্রিন্সিপাল এ অস্বপ্নেও করপাত করেন না। অবশ্য যে ডাক্তার জন মাথাইয়ের আমলে মুদ্রানুপাত হ্রাস করা হয় তিনিই মুদ্রানুপাত বৃদ্ধির পক্ষে মত দেন এবং আমদানির বিবাস পাঁচশতাংশ পরিচালনার ক্ষমতা যে বিপুল পরিমাণ মুদ্রাপ্রতি আমদানী করা এবং তার ক্ষমতা যে মোটা অংশের বিদেশী মুদ্রা ব্যবহার সেইদিকে লক্ষ্য রেখে মুদ্রানুপাত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এর ক্ষমতা প্রয়োজন-বোধে আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থারও প্রস্তাব তোলা হতকর।

কংগ্রেসী মুদ্রা ব্যবস্থা:—১৯৪৭ সালে আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থারের সভা হওয়ার পূর্বে পৰ্ব্বত ভারতীয় মুদ্রার ন্যূনা টোলিং এর দ্বারা হিসাব স্থির করা হ'ত। অর্থ-সংস্থারের সভা হওয়ার পর টাকা যে কোন বিদেশী মুদ্রার সঙ্গে পরিবর্তনীয় বলে পরিগণিত হয়। অবশ্য ওলেন্ডনের অজ্ঞান হেতু ১৯৪৭ সালেই বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন বলে (Exchange Control Act) ডলারের সঙ্গে টাকার বিনিময় নিয়ন্ত্রিত-বোধনা করা হয়। বর্তমান ব্যবসায় এক টাকার নোট ছাড়া আর সমস্ত মুদ্রা বিক্রান্ত ব্যাংক ইস্যু করে। এক টাকার নোট ইস্যু হয় কেন্দ্রীয় অর্থবিভাগ থেকে। বিক্রান্ত ব্যাংকের ইস্যু বিভাগে মোট মোট ইস্যুর পরিমাণের সঙ্গে আনুপাতিক হারে বণ্যার মধ্যে স্বর্ণ ও বিনেশী মুদ্রা সঞ্চিত রাখা হয়। এরূপ সঞ্চয়ের অস্থগত পার্সোনেটের আইনে স্থির করা থাকে।

১৯৫৪ সালের বিক্রান্ত ব্যাংক আইনে মোট মোট ইস্যুর সীমাকর ৪০ ভাগ মূল্যের সমান স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণপিণ্ড ও টোলিং-এ ওনা থাকতে হ'ত। ১৯৪৭ সালের সংশোধন অনুযায়ী এই ৪০ ভাগ হিসাবের মধ্যে টোলিং ছাড়া অষ্টাঙ্গ বিনেশী মুদ্রাও বণ্য হয়। প্রাক্তন আইনে যে স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণপিণ্ড এভাবে ওনা রাখা হ'ত তা কখনো ৪০ কোটি টাকার কম যেতনা এবং সরকারী সিকিউরিটিতে নিয়োজিত

(invested) স্বর্ণের পরিমাণ মোট সম্পত্তির ২৫% বা ৫০ কোটি টাকার বেশী করা যেত না।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চাধিকারী পরিচালনার অর্থনৈতিক কাজকর্ম অসম্ভব বৃদ্ধি পায়, তবে নোট ইস্যুর পরিমাণও বৃদ্ধি করা দরকার হয়। ১৯৫৪ সালের আইনের কড়াকড়ি বণ্যার মধ্যে বন্দি চাহিদা মিটানোর মত টাকা বাজারে ছাড়া অসম্ভব বিবেচনা করে ১৯৫৬ সালে ১৯৫৪ সালের বিক্রান্ত ব্যাংক আইন সংশোধন করে এরূপ ব্যবস্থা করা হল যে স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণপিণ্ড ওনা পরিমাণ ন্যূনপক্ষে ১১৫ কোটি টাকার সমান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অথবা (foreign securities) ৪০০ কোটি টাকার সমান রেখে যে কোন পরিমাণ টাকা বাজারে ছাড়া যাবে। কিছুদিনের মধ্যেই বৈদেশিক মুদ্রা ওনা পরিমাণ কমিয়ে ৩০০ কোটি টাকা করা হয়। দেশের অর্থনীতিবিদগণ মুদ্রাস্ফীতির বর্তমান ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে বিক্রান্ত ব্যাংকের হাতে এরূপ ক্ষমতা স্বর্ণপে চিত্রিত হন। কিন্তু সরকারী প্রয়োজনে এক বছর পার হবার আগেই রাষ্ট্রপতির আদেশ (President's Ordinance) জারী করে বিক্রান্ত ব্যাংক আইন আবার সংশোধিত হয়। নতুন ব্যবস্থার স্থির হ'ল স্বর্ণ, স্বর্ণমুদ্রা ও বিদেশী মুদ্রা স্বর্ণমুদ্রা ন্যূনপক্ষে ২০০ কোটি টাকার সমান ওনা রেখেই বিক্রান্ত ব্যাংক যে কোন পরিমাণ টাকা ইস্যু করতে পারবে আর এ ছাড়া কোটির মধ্যে ন্যূনপক্ষে ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও স্বর্ণমুদ্রা ওনা থাকতে হবে অর্থাৎ বিক্রান্ত ব্যাংকের হাতে মুদ্রা ব্যবস্থার যে ক্ষমতা ক্ষমতা দেওয়া হ'ল তা ও অযোগ্য পরিচালকের হাতে পড়লে যে কোন সময় জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করতে বশত।

বিশ্বিক মুদ্রা প্রবর্তন:—১৯৫৫ সালে পার্লামেন্টে ১৯৫৬ সালের মুদ্রা আইন (Coinage Act) সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইন বলে বোধনা করা হয় যে টাকা (rupee) মূলমুদ্রা (standard coin) অপেক্ষে মতই বণ্যার থাকবে তবে একে একশো নয়া পরসার বিভাগ করা হবে, অর্থাৎ প্রচলিত ৫০ পরসার ১ টাকার স্থলে ১০০ নয়া পরসার ১ টাকা হবে। আগুণ ও সিকি-বণ্যাক্রম ৫০ ও ২৫ নয়া পরসার মুদ্রার রূপান্তরিত হবে। ১৯৫৭

সালের ১লা এপ্রিল দশমিক মুদ্রা প্রচলন করা হয় এবং পূর্বতন মুদ্রার সঙ্গে নতুন মুদ্রা বাজারে চালাই করা হয়। ১, ২, ৫, ১০ নগা পয়সা মানের মুদ্রা এ পর্যন্ত (১৯৫২, ফেব্রুয়ারী) বাজারে চালাই আছে। লেনদেনে এত অল্প মূল্যের মুদ্রাই যথেষ্ট নয়, তাই ২৫ ও ৫০ নগা পয়সা মূল্যের মুদ্রা চালাই হওয়া প্রকারণ। নগা পয়সা প্রবর্তনে বিশেষতঃ খুব সুবিধা হয়েছে। দশমিক ওজনপদ্ধতি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষতঃ পক্ষে আরো সুবিধা হলে। দশমিক ওজন-পদ্ধতি (Metric system) ইতিমধ্যেই আঞ্চলিক ভাবে হয়েছে।

বাণীন ভারত উন্নয়ন ধর্মী অর্থনীতির আশ্রয় নিচ্ছে। এক্ষণে অবস্থার মুদ্রাব্যবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নমনীয় (flexible) হওয়া প্রকারণ। ১৯৫৬ সালের পর এক্ষণে

নমনীয়তা বা flexibility-র ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়তা বোধিত। দল পরিচালনা এবং সন্তর্কৃষ্টি ছাড়া আরও মুদ্রাক্রান্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। যা হোক, ইংরেজ স্টার্লিং-এর সঙ্গে ১:১.৬৬:১.০০ এ বিনিময়মান বার্ষিক করে স্টার্লিং প্রবর্তিত করার বাধ্যবাধকতা পালন করে টাকা ইত্যাদি যে-ব্যবস্থার আদ্যের মুদ্রাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিমার্জিত করে তুলেছিল আজ সে ব্যবস্থার বাইরে এসে আদ্যের মুদ্রাব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং প্রয়োজনবশতঃ এতে দৃঢ় বা নমনীয় (rigid or flexible) করার তার ও ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় পার্লামেন্টের। আর্থনোমিক বিনোদ মুদ্রা প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মুদ্রাব্যবস্থার মার্ফকতাই আদ্যের মুদ্রাব্যবস্থার সাফল্য নির্ধারিত করবে।



এমন কিছু কঠিন নয়

ছোট ছেলের সঙ্গেও সম্ভব যদি ঠিকমতো
বঁধিয়ে দেওয়া যায়



আপনার সমস্যা
আপনার পুণ্যের কর্ম-জীবনের
সাফল্য বিশেষভাবে
সুচিত করবে।



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪নং ব্রাইড বাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

জীবন ব্রহ্ম তমাল রায় চৌধুরী

এতিহাস্য এন্ড ডোমডোমেতে বাজীটা খুঁজে নিতে অসুবিধা হয় নি। এশ্যারার গ্র্যাণ্ডের প্রখ্যাত অভিনেত্রীর টিকানা ত্রাসেন্সের পথ চলুতি লোকের কাছে জ্ঞান বাধার কথা নয়। পথ নির্দেশ পেয়ে যেখানে গিয়ে উঠলান, সেটাকে কোন লোকের অন্তর্ভুক্ত না বলে আত্মবল বলতে পারলে হয়তো সুখী হতে পারতাম, প্রাথমিক অভিনেত্রীর ঘর দেখে একটু হতবাক হতে হ'ল। তবু বিশ্বদ্র বিদ্যুৎ হইনি, কাগজ মানব মনব বিভিন্ন পরিচয় তখন একটু এতটু পাঞ্জিলান।

তটপন্নীর সন্তান শক্তিপথ ভট্টাচার্যকে জানতাম কলেজ জীবন বোলে। চারপাশের জল মাটি আলো আর বাওয়া নিয়ে গাছকে বড় হতে দেখছি। শক্তিও তেমনি ছেলেবেলা থেকে ভট্টপন্নী থেকে জীবনের যে উপাধান সংগ্রহ করে বড় হয়েছিল তা অতি ন্যায় সুনস্কৃত কলেজ জীবনের প্রথম ছ' বছরের পর। শক্তি গেল হর্ষনকে জানতে আর আমি প্রাক্তনচার চর্চার ননোষণে তিলায়। ছুজনের খেচা সাক্ষাৎ কন হলেও যোগবুদ্ধী কখনোই পুণ্যপুত্রি ছিন্ন হয়নি। শেষ খবর পেয়েছিলান, ক্যান্সারটা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার বোঝাওলা উপর শক্তি গেছে হাইডেনবার্গ ইউনিভার্সিটিতে হোকার্টে, স্পিনোজা কান্ট, কোমৎ ফেদেল আর নীট্শের জীবন বাবর পরিচর পাওয়াটাও বরকার।

ছোটখাট ছ' চারটে ডেটের গাজার আমিও এগাম ইউরোপে একটি সংবাহ প্রতিষ্ঠানের অধীনে চাকরী নিয়ে, ত্রাসেন্সের এশ্যারার গ্র্যাণ্ডে সাংবাদিকের আসন থেকে অভিনয় বেথতে বেথতে ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিলান, দার্শনিক ছেলে শক্তিকে হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটির যথলে এশ্যারারে পিয়ানোবাহক রূপ বেথে আমার চমক লাগবাইর কথা। যানোজাবের সাথে বেধা করে শক্তির টিকানা ভেনে নিয়ে ওর আন্তানায় বেলায়, বহুদিন পরে একজন পরিচিত লোক বেথতে পেয়ে ও যে সত্যিই খুঁজী হয়েছিল, তা বুঝতে পারছিলান। এর পর আমার সাংবাদিক জীবনের প্রচুর অবসরের ইঁাকে শক্তির সাথে বহু মিশেছি, কিন্তু কখনও আভাসেও জানতে পারিনি কি করে ওর এ অবস্থা বিপর্য

হোল, প্রস্ত করতে দিয়েও বাবহার তার নিষ্কৃতিপ কাঠিক্তেব কাছে বাণ পেয়ে ফিরেছি, অতীত আমার কাছে অজানা থাকলেও বর্তমান আমার কাছে গোপন ছিল না।

এশ্যারার গ্র্যাণ্ডের ইতিহাসে শততম অভিনয় রজনী পার হয়ে গেছে এমন নাটকের সংখ্যা অতি কম, 'হি লিপি এও লাভ' এর শততম অভিনয় রজনী যখন সমাহোহে শেষ হলো, তখন মঞ্চ পরিচালক প্রাণ খুলে হস্তবাহ বিলেন স্ত্রেট চরিত্রাভিনেত্রী প্যাটসী স্ক্রিনেন আর দার্শক সহস্রটিকারী পিয়ানোবাহক শক্তিকে।

চিত জুযাবের বেশেও সোনার নাম দেয় না এমন লোক সত্যিই কম আছে। পিয়ানোবাহকের বোলনের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখলেও প্যাটসী বোবহার শক্তিকে চিনেছিল। শক্তির কাছে এসবছে আঁচ পেয়েছিলান। সোনার ছোয়া দিয়ে নিজের মনটাকেও হাতিয়ে নিতে চায় প্যাটসী, সেই আত্মানে সাড়া দিতে দার্শনিক বছর মনের আকাশে কোন রাসমধু গুঠে কিনা তা চেষ্টা সবেও জানতে পারি নি।

এতিহাস্য এন্ড ডোমডোমেতে প্যাটসীর কাছে এসেছিলান সংবাদিকের দায়িত্ব নিয়েই। শততম রজনী উত্তীর্ণ অভিনয়ের দায়িত্ব সাথে ইন্টারভিউ আমার মেসের সংবাহপথে মুখোচক ধবর ঘোষণাে বটে। আবাস বেথে যেটুকু হতবাক হয়েছিলান, ব্যবহারে তার মাজা বেড়ে গেল, প্রথম পরিচর এমন কি আমার সংবাহ প্রতিষ্ঠানটার নাম বলবার আগেই যে বলে উঠল, 'আমি আপনাকে চিনি, আপনি আমার বন্ধু।'।

জীবনকে তখন বীরে বীরে চিনেছিলান, তখনও তার সব রূপ দেখিনি তাই, আমার অবাক হওয়ার পালাও চলছিল।

কিন্তু বিশ্বব্রহ্ম হতেও দেখী হোল না। প্যাটসীই আমার কথা বলল, 'শক্তি আমাকে আপনার কথা বলেছে, আপনি যে আশ আসবেন তা আমার জানা ছিল, সাক্ষাৎ কবের কথা বা হয় একটা। কিন্তু লিখে পাঠাবেন কাগজে, আপনাকে আমার বরকার আছে।

অভিনেত্রীরা অবশেষে বড়ি পেলাম না। নিজেদেরই যে ইন্টারভিউ দিতে যেন তা ভাবিনি, আগন্তুক। পরে যখন 'বাড়ীর বার হলান, তখন মনে হোল প্যাটনীর কাছে শক্তি ইতিমধ্যে আর কিছুই গোপন হইল না। বস্তু এই হয় ছাড়া জীবনের উৎস না জানা থাকলেও তার উপকার করবার ক্ষমতা আমি সব সময়ই পড়েই ছিলাম। প্যাটনীর কাছে এই ব্যাপারে অভিনেত্রী রূপে যেখিনি যলৈও গুকে নতল বিবাসে শক্তির ইতিহাস বলেছিলাম।

মনে আছে, এর পরে শক্তির মাঝে যখন দেখা হয়েছিল, তখন হেলে বলেছিলাম 'শক্তি তোমার চেতনের একত্ববিন্দুও নে পর আছে তা জানতাম না। প্যাটনীর কাছে যখন শুনলাম তুমি আমার কথা ওর কাছে বলেছ, তখন সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। পর্জ্যোতঃশক্তি বলল, 'জানি ত, আমি না তবে কোন কার্য করি না—এবং প্রয়োজন আছে, আর তা ছাড়া, মকে উঠে বাতলা বাজাই বলে কি তুমি মনে করিস আমার মনটা শুকিয়ে গেছে।'

ঐহিক বাঁকা ভাবেই বললাম, 'আমার মত বাইরে থেকে যেখানে পারলে তুমি নিজেও তাই বলতি।'

'হি দিলি এন্ড লাভের' মফাভিনর সমাপ্ত হয়েচে, এশ্যারার গ্রাণ্ডে তখনও নতুন কোন নাটক আরম্ভ হয়নি। নিজের কাঃবর ক্ষমতা অনেক দিন শক্তি বা প্যাটনীর কাঃবর সংবাহই নিতে পারেনি, হয়তো আর কিছুদিন এখনিভাবে কেটে যেত। কিন্তু হঠাৎ একদিন অচিল থেকে বাড়ীতে কিংবদন্তি শক্তির টেলিফোনে আহ্বান পেলাম।

কথামত সঙ্ঘার সময় যখন বেল টেপনে এলে উপস্থিত হলাম, তখন শক্তি আসেনি, একটা দিগায় বসিয়ে পায়চারী করছিলাম, আর শক্তির আঃকে হঠাৎ এই রকম রহস্যময় ভাবে আহ্বানের কথা চিন্তা করছিলাম—হঠাৎ নঃবর পড়ল শক্তি আসছে পেছনে যালপত্র সমেত তার Helping hand বা হাত।

অবাক হলাম একটু, বাইরে কোথাও বেড়াতে যাবার কথাও আমাকে আগে জানানো আমি হয়ত অঙ্গিণে কোন যোঃযাই দিয়ে বেই হতে পারতাম, শক্তিই প্রথম আমার মাঝে কথা বলল, 'কিঃফে ওরকম ভাবে দেখছিল কি? একটু হাঃওয়া বঃল করতে যাকি।'

গভীরভাবে সংক্ষেপে বললাম, 'কোথাও?'

আমি যে কিংকং মনঃস্থঃ হয়েছি তা শক্তির নঃবর পড়ল না, ও বলল, আপাততঃ বঃকিং বাঃ, পরের কথা বলতে পারি না।'

প্যাটো ছাড়বার সময় হয়েছিল, শক্তি হঠাৎ ব্যস্তভাবে পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'তোমার চিঠি। আমি চলে গেলে পড়িস।'

লম্বা মাঃড়ীটা টেপন পার হয়ে গেছে এইমাত্র। প্রঃয় মনঃস্থ প্রাঃটকঃর্থে উপর লম্বা লম্বা পা ঝেলে এঃপাতে এঃপাতে ভাবছিলাম, আহঃকের যিনে প্যাটনীর কেন শক্তিকে বিঃয় দিতে টেপনে এলনা, শক্তি কি তাকে জানাঃয়নি?

পকেট থেকে চিঠিটা বার করে প্রাঃটকঃর্থে আসোতে মেলে বঃললাম।

'হুম্বাস,

শেষ বিঃয়ার সময়ও যে তাকে নিজঃ হুঃং সব কথা বলতে পারলাম না এ হুঃং আমাঃ কোনদিন যাবেনা। হাইডেলবার্গে জানার ডিঃভঃরিত জীবন থেকে-হঠাৎ চ্যুতির কারণ সঃক্ষে তোমার কৌতুঃল ছিল। এবার তা নিঃবে।

হেলেবেলা থেকেই জানের দেশায় বঃর্শনকে ভালঃবেদেছিলাম, কিন্তু হাইডেলবার্গে এলে বুঃললাম, বঃর্শন বইতে নেই, আছে তোমার-আমার জঃয়নে। তাই কথাটা জীবন-বঃর্শন। বইয়ের পাঠ ছেঃড়ে বিঃয়ে জীবনকে জানতে যেদিয়ে পড়লাম, জাঃধান চাঃয়র খং, ডাঃয়নিঃ জেলেডিজি আর ডাঃয়েলেগের নাটমক, সব কারঃপায় আমি জীবনের বঃহঃক্ষে বুঃংগে গেদিয়েছি। বঃহঃস্ত মাঃহুঃয়ের মঃযাই, কাঃবঃ মাঃহুঃই কথাটা সঃষ্টি বঃয়েছে।

প্যাটনীর কাছে আমি নিঃবে চাইনি, আঃবার মকঃজীবনের বঃহঃক্ষে জীবনের চঃবঃ কথা-বলে বঃকায় করে নিঃবে নিঃবে এই জীবনে বঃড়িয়ে ফেলেতেও চাইনি।

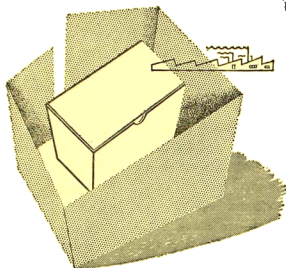
আঃবাত আমি দেখ না কাটকে তাই সময় থাকতেই সরে যাকি। নতুন পূঃবঃবী আমাঃর ক্ষমতা কি বঃহঃস্ত আমাঃবে?

প্যাটনীর কাছে কথাটা জানাস, হুঃবা কেন আমাকে 'শক্তি' দিয়ে বাঃচাবে।'

একাত্তই তোমার, শক্তি।'

বিঃম্বী অভিনেত্রীকে জীবন-বঃহঃস্তের কথা কোনদিন জানাতে পারিনি।

factory freshness preserved



with

★ **POLYBOARD**

★ **POLYKRAFT**

packaging

Acid, alkali and moisture resistant polythene-coated POLYBOARD and POLYKRAFT help to preserve the factory-freshness of your products, whether they be confectionary, tea, biscuits or chemicals.

These new, revolutionary packaging materials are several times stronger than ordinary board or paper and prevent damage to your products even when they are subjected to rough handling. And the eye-appeal of your products is enhanced considerably because of the glossy finish on POLYBOARD and POLYKRAFT.



CHANGE TO
★ **POLYBOARD** ★ **POLYKRAFT**
★ *PACKAGING FOR INCREASED SALES*

ORIENT PAPER MILLS LTD., CALCUTTA.

জীবন জিক্সাসা কৰ্মপন্থা

জীবন একটা প্রবেশিকা। মাহুগুণ্ড তাই।

জীবন আর মাহুগুণ্ড মধ্যে সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্য, আদৰ্শ-অনাচার প্রকৃতি বারপাকসো প্রবৃত্তিয়ার মত চির পরিবর্তনশীল পৃথিবীর ক্রুটি উপেক্ষা করে অচল অনড় ভাবে সৰ্ব্ব মাহুগুণ্ড মনে অবস্থান করে, সৰ্ব্ব সৰ্ব্ব তাহের কার্যকলাপ বিপৰ্য্যয় আনে সংসারে, বামচাল করে যেস সমস্ত—গৃহস্থালী পরিবার শাস্তি। প্রাচীনরা সমাজ পড়েছেন ব্যক্তি-মগ্গলের মত; তাই বহুত এতদ্ব্যক্কে স্বাৰ্ধ ভ্যাগে উদ্বুদ্ধ করা হয়—জীবনের পরম রমণীয় কণগুলি অকাতরে উপেক্ষা করে লোভাচারের অহুশাসন বীকার করতে আনন্দ আননে। সেকালে সংসার ছিল বহু, বাইরের তীক্ষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঝটিল হয়ে উঠেছিল অন্তরের বৃত্তিগুলি, বিবেক নিজের সভা মিলিয়ে দিয়েছিল শাস্ত লোকচাচার সমাজপতির অহুজার, ঘন দুঃখের হয়ে ওঠেছিল সাধারণের জীবন, অসুখ তার পরিচয় অল্প।

আজ বহলেছে জীবন কাল রূপ পৃথিবী। তাই বিবে বৈচিত্র্যের যেমন নেই বিরাম, জীবনে স্বন্দেহ তেমন নেই অবশ্য।

জীবনকে জানবার মত সুজাতার আগে যে আকৃতি ঘেঁষেছিল, ভাল করে দেখ মনে প্রকাশ পাবার আগেই দেখল তার সীমন্তে নির্ভর টানা। ক্রাশ এইটের যেরের পৃথিবী কতটুকু, জুগোলে মহাখেতাবির কাছে পড়েছিল, কিছু মনে দাপ কাটেনি। অবশ্য সেটুকু পরিচয়ও কোন-কালে হত কিনা সম্ভব, সম্ভব হয়েছিল শুধু দাবন মল্লিকের নগাশরতীর কারণে। বৈকুণ্ঠ লাভ ঘোক তাঁর, ধ্যানধৰ্ম্ম দান করে 'কাহিনী নারী মন্দিরে' মেয়েদের বিনা বেতনে পড়বার ব্যবস্থা করে সেওয়া আলকালকার দিনে সত্যিই দুর্লভ। 'হুপা এগিয়েই হুল না হলে হুল মাঠার প্রণবের সাধ ছিল না বাগে চড়িয়ে লগা বিননীতে যীবন সুলিয়ে টিবিন সংগ, যেরেক পড়তে পাঠায়। কেদা জানে প্রাথমিক-শিক্ষক সবকারী অকিলের চাপদাসী বেয়াবাহের

চেষ্টায় কম মাইনে পায়। সমাজের কল্যাণের জন্যই তার জীবন, অর্থ উপার্জনের মত তো সে কলেজে স্বর্শন ইতিহাস সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেছে!

'কাহিনী নারী মন্দিরে' সব ক্রাশ-চোমাই একে একে পার করে গিল সুজাতা, বম্কে পাড়াতে হয়নি বাড়িতে স্থাপে, পাঠে—কোথাও না, বাড়িতে হয় তো হত যদি 'নারীমন্দিরে' কাইনাল ছাড়িয়ে হুল কাইনালের বিকে ঘুটি পড়তো, প্রণবের শপ ছিল, পড়ো ছিল না।

তার অবসর হলনা। একটি সন্ধ্যার শুভ উৎসব হুলের সভাপতি বিকর বাবের হাত থেকে কয়েকখানি বই আর একটি হেশনী কাপড়ের টুকরো খুশি মনে সুজাতার গ্রহণ করে বাড়ী কিলো সুজাতা, তার হুমানের মাগার তাঁরই মোটরে তাঁর ছেলের সংগে পাঠছড়া বাধা হয়ে কল্যাণগুণেরা হলমে বহুর বাড়ীতে গিয়ে উঠল বেনারসী সলমলিয়ে। চোখে লল ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল কৌতুহল। আত্মীয় স্বজনরা বৈধা দত্তটা করেছিল জানা মেই, ভাগ্যের জোর যে ছিল সম্ভব কি! সাধন, মল্লিকের বদান্ততার প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ মিটলো, বিকর বাবের মহাহুতবস্তার নারী জীবনের একমাত্র গতি শুভবিসাহ মদাধা হল সাড়ম্বরে। ইয়া অতাব কি ওব, বাড়ী বাগান রেডিও রেফ্রিজিটোর পাড়ী অগ্নি—পাঁচটি সন্ধ্যার পিতার বিতীয় কস্তা এর চেয়ে বেশী কি আশা করতে পারে! আশা করেনি সুজাতা, আশা করেনা। একতলাব স্যাঁতস্যাঁতে বহু, জগদীশ শংগ। বাববীর সাবান কাটা ক্রক, হুলু মাধা হাত, বাসিকা সুজাতার এর বাইরে কিছু নেই। কৈশোণের বহুসন্ধি আগে অ পে উত্তরোল তাবের শিবরম আগিরে তোলাবার আগেই দেখল তার বহন : বামী, স্বামীর স্বনামস্ত পিতা, নিয়মলক্ষ ও হুশপলক্ষ পরিজন, পরিচায়ক ক্রাইভাও, যাং সবলম্বর একতলাব থেকে গুলতানি করতে।

অম্বর লোক মন্দা। কুতী ব্যবসায়ী পিতার

বিদ্যামহীন ব্যঙ্গলোর মাঝে মল্ল ঘরার পথ কোথায় ?
তাহাড়া যে বরষে হেলেরা কলেজের মন নিয়ে
বিরাট পৃথিবীতে আপনায় ক্ষুদ্র সত্তা হাবিয়ে ফেলে,
বৈচিত্র্যময় পরিবেশে মন বসাতে পারে না, সে বরষে তার
পত্নী লাভে। অর্থ উপার্জনের উপায় অল্পসংখ্যক করার
প্রয়োজন নেই, পত্নী প্রেরণীও না, সুবোধ বালকের মত সে
সামান্য শ্রেণীকৃত হাত থেকে একটি পানের খিলি
যুখে পূরে বোকারে গিড়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিত নিত্যকালে।
বোকারের হিসাব-পত্র বুঝতো। ভাল, কোন বন্ধের
কোনদিন অসন্তুষ্ট হয়ে ফেরেনি; এমেরিকা থেকে সেলস-
ম্যানশিপ পাল না করে এসেও অল্পর কাম চানতো।
কাব্য রচনা মনস্তত্ত্ব পড়েনি, কলেজেই পড়েনি, নিয়ম
মাত্তিক কাম করে যেতে হয় এই জানতো, সকাল পদ্ম-
দুপুর জটীহীন।

অল্পর লোক ভাল, সুজাতা বহিঃশ্রেণীর বর থেকে এসেছে
সেতবা তুলে গিয়েছিল চুপসেই। দিন কাটছিল গুর
বনে তিকে চুল এগিয়ে দিয়ে গল্পের বই পড়ে, কোন কোন
পঙ্কায় গিনেমা হেঁথ, অজয়ের কাছ থেকে নতুন ডিঙাইনের
নাম শুনে। আদেবাবাধ বধে কানপুর বাংলা মহিষুত,
কোথায় কোন কাপড় ভাল তৈরী হয়, কোন কাপড়ের
চাহিদা কোন মহলে বেশী, গুরু পরিবর্তন চাহিদার
ভারতম্য, কুচি অর্থ শ্রম বুড়ি স্ত্রীর ঠাস বুধনের মধ্য দিয়ে
কি ভাবে পিস্ফুট হয়, অভিজ্ঞতার বুঝতে পারা যায় কিনা
কোন রেষের মাপ—অবদীপাক্রমে বলে বেত অল্পর।

আপানী গুম বসছে এবার বাতলায় আশ্বিন পাক্রাবী
খুলতে খুলতে বলে।

বালিশে সুরতি চেলেছে অনেকটা অর্থ মনঃপুত
হচ্ছে না। গোষ বুকেই ভিজেন করে, কেন ? পাওয়ার
কম লাগবে, ওদের কাপড় নাকি টেকসই হয় বেশী।
প্রথমটা ওহেরি ইঞ্জিনিয়ার চালাবে। তোমাদের কি
ভাতে ?

বাবে ! ওর অজ্ঞতার বিরক্ত হয় না, বখাইয়ের ভারী
তাহী জাফান বেশিন, আর এখানকার ছোট ছোট গুম টাকু
কুটিরনিয়মে মত, অনেক কম লোকে চালাবে, খরচ কম,
হাফস প্রতিযোগিতা হবে যে। ওকে উত্তেজিত মনে হয়।

আলোটা নিভিয়ে হাও।

আমার খাওয়া হয়নি যে, বিশুদ্ধ হয় অল্পর সুজাতার
নিঃস্পৃহতার।

বোম্ব এত হেঁচী কর কেন ? ওর কঠোর মিনতি।

বহুক্ষণ না করে আসতে পারিনি যে, বাথরুম তো কই
হেঁয়রা ঘর না।

পড়া, শিশু, অমৃত, এরা কি করে ?

ওদের ভগ্নর ছেড়ে নিশ্চিহ্ন হওয়া যায় কি ? গত
মাসে এক থান ভয়েলের হিসাব পাওয়া গেল না। কে বেবে
খোপায়ে, বল ?

হাদি পায় সুজাতার, বিক্রি ঘমা বাকি নগর এই নিয়েই
এবের পৃথিবী ; অল্পর মহলেও তার বিদ্যাম নেই। পিতা-
পুত্রের আসাপ আলোচনার শতকরা নব্বই ভাগ বাজার দর
আর বোকারের কথা, শ্রীর সংগে কথাবার্তাভাও।...ভাল
লাগে না সুজাতার ভাবতে। অজয়ের মেঘবহল ক্রাম
হেঁহে সজীবতা নেই, অনাহুত হেঁহে পাখার তলায় বসে
কেবলি হাঁকার। ককুণা হয় সুজাতার, ভাবলেনহীন
সুবে চার মাঝে মাঝে : স্পীকৃত কাপড়ের প্রতীক নিধর
অবসাবে যেতা। কিছুই ভাল লাগে না।

ভাল লাগতোনা, কি জানি কি হতো কিন্তু ঘটনা
সম্পূর্ণ বরষে গেল সুকোমল আমার সংগে, অজয়ের পিসির
ছেলে সুকোমল ডিগ্রে কোর্সে ভর্তি হল এসে, আমার বাড়ী
থেকে কলেজে পড়বে। কোন বিন বোণা হয়নি তবু মনে
হল কতকালের পরিচিত নিত্যন্ত আপন, ওর ধরণ-ধারণ
চলন বলনে তাড়াতাড়ির ভোটার।

আমাকে হেঁথ পালানেন কেন বোধি, কিন্তু
কিমানকার বুধ, না গারে দুর্গত ? বেশ মগ্নভিত্তি ভাবে
চেরায়ের পাশে ঝাড়িয়ে ওঠে সুজাতার আপননে।

আপনি ঝাড়ালেন কেন, বহন।

আপনাকে সম্মান দেখাতে হবে না বৌবিধির্মণ, পরম
পূজনীয় যে আপনি।

পালালাম যদি মনে হল তবে সম্মান দেখানটা ঠাট্টা
নয় তো, আর বলে করে পূজনীয় কর্তে তোলা কেমন যেন।
শেষ করেনা সুজাতা।

কথা শেষ না হতেই উঠ হাসিতে ভবে ওঠে বরষ

যাতায়াত। বহুদিন বহু দিনের যাত্রা এমন একটি বন্ধন হুক্ত নির্বাহ হাদির প্রতীক। কবেছে, পায়নি। সুভাষার মনে বহু মূল্যবান আদর্শের পত্র অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছিল যত্নের অজান্তে চেতনা, এই চেতনা থেকেই তখন তরুণটির বেশেরা হাদিতে তার মুক্তি পায়। অল্পমাত্রা অল্পমাত্রা নত। পুণ্ড্র পুণ্ড্র উপরে পড়েছে প্রাণের শাখাগুলি মুক্তি, সাংগঠন শূন্যের স্রোত। কিশোর একটা সন্ধ্যা ছিল চিরদিন, তবুও মত, মুখের পাতলাতা; টিক, এর অর্থ হাদিতে তার টিকানা মিলল। পুণ্ড্রের আনন্দের বড়বড়ি খুলে দিয়ে এসে বদল সুভাষা সুকোমলের সামনে।

বৃষ্টি-স্রোত বহুল গাছের লক্ষ পাতার স্বর্গের ঐক্যমিত্তিক, সে বিকেল চেয়ে আনন্দ করে সুভাষা, বিয়ের সময় আপনাকে দেখিনি।

যেখনি বৌদি, অল্পমাত্রা চেয়ে পাতা মাড়ে পাঁচ বছর পরে আদ্য পূর্ববর্তী স্বর্গের হয়েছিল। মুক্তি মান-সম্মান ব্যতীত কোন বিষয়ে তাঁর মনকে বহুদিন মনে করতে পারিনি, কিন্তু আদ্য হয়ে যাবে পরীক্ষার ফল বেরলে, অতএব আপনিতা বার না বলে অনেক কিছুই ভাবতে পারি আমি।

ওর কণ্ঠে আদ্য মুকুটেরি খেলা।

অল্পমাত্রা হাদিকার সীমার বাইরে সুভাষার পর পুণ্ড্রের সংগে পরিচয় কম। সাহস পেয়ে হাদিমুখ বলে, পরম পুণ্ড্রীয়টা তাহলে বদলে।

পুণ্ড্রীয় আপনি থাকবেন, বাবা হিরেও বলে, তবে সেটা সবসময় শুনে ভাল না-লাগলে শোনাও না। আজো বৌদি, আপনায় হাদি' কি, মানে কোনও বিশেষ ভিনিস বা কালের প্রতি আপনায় বৌদি আছে কি? সারা দিন জো প্রাণ একাই থাকেন।

মনে মনে চিন্তা করতে থাকে কিশোর আগ্রহ। ছিল কিছু কিছু ছোট বেলার বৌদি মুক্তি হলে যেত স্বপ্ন, তাইনর আর মানে না, তুলে গেছে গত দু'বছরে, সব।

আমায় কিছু একাধিক আছে, তার ঠেলায় চোটে বাড়ীছাড়া হয়েছি। সুভাষার উত্তরেও অপেক্ষা না করে বলে চলে আপন মনে।

আদ্য যে শুভলাভ পড়ায় জন্মে এখানে আসা।

আবার সেই প্রাণখোলা হাদি দু'বছর পরে সুভাষার বিশ্বর ভাব।

মুখের না, কলেজে নাম না-লাগলে থাকলে গিল বহুবার বড়ো খোকারে মনে নিবিয়াবে আশ্রয় যেমন কেন? একই খেমে বলে, আর আপনায় মত পৌঁছাই বা এত মূল্যে পাণ্ডি কি করে? মুখ তারের মত কবে সুভাষা উত্তর দেয়, আমি মুক্তি মূল্য, বেশ।

হাদি হাদি মুখ চোখে তার রেশ। সুকোমল বলে, মূল্য কে বলল, মহামূল্য। ব্যতীতই সবই হয়েছিল। মতঃশলের ছেলে তার গুণের মোটে মুক্তি নেই, দোষ ধরবেন না। থাকতে থাকতে আপনায়ের সঙ্গে কথা বদলায় গড়ে উঠবে' খন।

ওর কথাই ভাবতে থাকে সুভাষা।

এই তো সত্যিই বাগ কখন নি তাহলে, অল্পমাত্রা ফেন হো অকালগুলোই বীরে বীরে ক্রিতিতে দিই।

পরিচয় হয়েছিল শুধু কাকের বা অকালের নর, আরও অনেক কিছুই। বহু পরিচয়ের সীমা ছাড়িয়ে গথাতার, বনিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে ছড়তার।

সুভাষার কাছে সুকোমল ঠাকুরপো একটা নতুন জগৎ, যে জগতের প্রতি সুভাষার একটা স্রোত স্রোত ভাবে ছিল অচেতন ভিতরে; বানিকটা উজ্জল, অনেকটা ব্যক্তিমায় পৌঁছবে। ওর নিরুদ্ধ অন্তরলোক প্রকাশের পর পেয়ে বাহির হয়ে এল, নিজেই জানতনা এত কথা আছে মনে, এত কথা বলা যায় ক'দিনের পরিচিত পুণ্ড্রের পাশে বসে। অল্পমাত্রা কথাব্যর্থ্য কাব্যবাহকে কেন্দ্র করে আর রাত্রিরের বিশ্ব নিয়ে। সুভাষা কাব্যবাহ খোলায় ভাগ করে দি, রাত্রির ভাব তার উপর ছিল না। সুকোমল তপ্ত ভাবনায় মীপ।

বৌদি, আজ 'রূপলেশ্বর' আসার রূপময়, কিংবদন্তি রূপো চালবে নাকি?

কি ছবি, ম্যাটিনি আছে নাকি? সুভাষার আগ্রহ কোন অংশে কম নয়।

না না, পর্দার নয় টেলে। বাণীশ্রী রূপের 'নটীয় পুণ্ড্র'। অলকানন্দ বলে একটি মেয়ে যা বেবানী নট নাটকে, ওক্।

মুহুর্তে হেসে সুভাষা বিগলিত করে, পরিচয় হয়েছে মনে হচ্ছে।

কাম লাল হয়ে ওঠে সুকোমলের।

কোমলিন বা, চল শৌর্য আশ্রয়ের কলেজের নতুন বিজ্ঞান ভবন বেধে আসবে, নানা বকম বস্ত্র পাতির প্রদর্শন চলছে।

সেখানেও আর সুভাষা এবং বাত খেলা দেখতে বাবাইয়ের মহিলা শীতাল নানাবাইয়ের 'দোঁতে, এমনি, সমস্ত রূপের সঙ্গে কলেজের টিমের ক্রিকেট খেলা দেখে সমান উৎসাহে। সুকোমল খেলার হিল না, শুভাব্যবসায়ের দিকে। খোঁজ নেয় মাঝে মাঝে।

কেমন দেখছে বৌদি ?

বুঝছি না, তবে দেখতে খারাপ লাগছে না। একটু থেমে বলে, তোমার সংগে সংগে বৌড়াবৌড়ি করে বেড়াচ্ছে অশ্রমনির হস্তের সাজী পরা এক মেয়েটি ঠাকুরপো? সুকোমল একবার তাকারে সুভাষার চোখের দিকে, দৃষ্টি কিরিয়ে এনে রাখে যেখানে খেলোয়াড়দের অপায়ারনের উদ্ভোগ চলছিল। ও, সুনীলা সেম, কলেজ পরিষদের প্রেসিডেন্ট। একটু হেসে বলে, সুনীল সুনীলা বেশ মিল না, ব্যস্ত বীবনেও বোঝ হয়। ঐ যে বোলিং করছে লকামত ডেলোটা ওই সুনীল, সুনীলার প্রিয় বন্ধু, আনন্দের আরও বসন্ত স্বপ্নের আশা রাখে।

অভিমান একদিন পতিয়াই হয়েছিল সুভাষার। ছুদিন কথাই বলেনি সুকোমলের সংগে। অন্ধর বেদিয়ে যাবার পর হঠাৎ খেলেনি, চুল এলিয়ে শুয়েছিল, সারাক্ষণ চোখ বুজে। পরে জানিলা খুলে তাকিয়ে ছিল বিরাট বহুল সাহচর্য দিকে, ওর ডালে ডালে কাঠবেড়ালী হস্ততির সুকোমলি খেলা, টুইটলির ফোল দেখছিল হস্ত আনন্দে, দৃষ্টি কোথায় ছিল, গোবে না মনে, বলা যায় না। কোন ছাত্রী সংস্কার সাহিত্যিক অধিবেশন ছিল বেন। পর পর কয়েকটি গল্প কবিতা পাঠের পর নাম ঘোষণা হল—হ্যাঁ সুকোমলের! উঠে এল সে, পাঠ করলে 'সুখসুখী কামনা', আধুনিক ছন্দে গল্প কবিতা। বাড়ী কোথায় সময় অত্যন্তকে মুখ কিরিয়ে রইল সুভাষা, কবিতার প্রশংসা করে থাক, বিশ্বাস নয়, উল্লেখ পর্যন্ত নয়।

অপরূপ স্বীকার করল সুকোমল তিন দিনের দিন। মান ভাঙতে হল শেষে। তোমার আশ্রয় করে দেবার একটা সুযোগ বুঝছিলাম, বলা একটু আনন্দ হতো। না? তাছাড়া বামঃখ্যাগি লেখা, রসের চেয়ে আড়ম্বরই বেশী।

আমার কাছে গোপন রেখেছিলেন কেন, এতই অজ্ঞ যদি তাহা, তবে তোমাদের মতায় নিয়ে গেলে কেন? পড়বার মত হয়নি শোনাতে চাইনি, মানদীর আগ্রহে শুধু।

যে মেয়েটি নাম পড়ছিল সৌর্য চুড়ি পরে ?

ওই প্রশ্ন উত্তোক্ত।

সকলেই জানে তুমি কবিতা লেখ, শুধু বাড়ীর মূর্খ-মনে রাখি—গলা গবে আসে সুভাষার। ক্ষমা কর বৌদিমনি, বোঝ হয়েছে।

আমার ক্ষমা করা না-করার কি-আসে যায়! একবার সুকোমলের পানে তাকিয়ে কিরিয়ে নেয় দৃষ্টি।

ওঠে সুকোমল, ওর হাতে হাত রাখে আলতোভাবে। শিবরত্ন-বিজয় কোমল কর-গল্প একখানি, গুত্র ঘেঁষানিত।

একটি মুহূর্ত। বিম্বত হয়ে যাচ্ছে স্থান কাল কার্ণপরম্পরা। অঙ্গ দ্বিগ্ধ হয়ে শুধু বিশ্ব গদ্যে! বেগুলালে বিলম্বিত রাখাল রালের প্রতিকৃতি চেয়ে আছে শুধু বেগুর মধ্য দিয়ে আকুল সুর জুলে। ছাত্রাবেরা তমালের অনিশ্চিত ব্যবধানে গুঁথে কিরাছে শ্রীমতী কলপ কাঁধে। কথা নেই, তাহা নেই, যৌন অন্তরেব বিশাখা চেতনা শুমবে শুমবে গুরুছে কোন অনন্ত বিভাসার পিছু পিছু। মনিবন্ধ থেকে করতলের আরত আঙুলগুলি,—লোভ লাগে। পতীর চোখের দিকে চায় সুকোমল। নীল নীল নীমাখা আকাশের চেয়ে নীল অন্তরাত্ম মাগবের চেয়ে নীল, অপরিচিত সম্পদ অর্চন দেশের ভাবার কিংবদন্তি কলরোল। না, সুকোমল জানে, সন্ধান পেয়েছে ওর নবঃপ্রতঃস্পর্কাতর অন্তর। নবঃপ্রতঃস্বপ্ন বহুর বস্তুনা আর বস্তুবন, বহুনা আর বস্তুবন, মাঝখানে একি মধ্যস্থিত সাড়া।

হাত ছাড় ঠাকুরপো, লাগেনা বুদ্ধি আমায়। বৌদি!

সুখ কিরিয়ে দেয় সুখাতা জীবনীশক্তি ত্রোতক পূর্ণ
দৃষ্টির চেতনা খেতে।

আমি আনিয়া, ধরতে পারিনি তোমার কিণের যেন
কষ্ট আছে, প্রকাশ করা যায়না এমন মর্মান্তিক প্রধায়ে
তুমি পীড়িত হচ্ছ অহরহঃ।

না না, ঠাট্টাংগো বেশ আছি আমি, অন্তর চিত্তা নিয়ে
তুমি ব্যস্ত হয়েনা। অকারণ জোরে বলা হয় কথাতুলো।

অনধিকার চর্চা, হানি, তবু বলি, বেদনাকে অবজ্ঞা
রেখে নিজেকে অনর্থক নিশ্চাবিত করোনা।

কি বলছ, কি বলতে চাও তুমি? কিরে ধাঁড়ায়
সুখাতা, বন বন নিখাসে সুকের আশোড়ন, আত্মক্লিষ্ট আনন
মরে আসে সুকোমল খোলা জানলার কাছে, নিখাস
দেয় নির্বল আকাশের, কিছু হলেনা।

অনেকক্ষণ মাটির বিকে চেয়ে থাকে সুখাতা। পৃষ্ঠ
দৃষ্টিতে কথা ভোগায় না। অন্তঃস্থলে আঘাত হেনেছে
লোকটি। সত্যিই কি-ও অসুখী! নিজে আনেনা,
যোশেনা, অন্তরকে যোশাতে পাহেনি—আর সুকোমল
ইঙ্গিত করলো বলেই বিখাস করবে। স্বামীকে জিজ্ঞেস
করবে না, অন্তরের নথি বোঝাপড়া করবে না! হঠাত
তার নিজের অক্ষমতা, অথবা বোধ, মূল্যহীনভাবে কি
বাহির হয়ে পড়ে কে জানে! অল্প প্রশান্ত গভীর কিন্তু
অহমিকা নেই, বিতর্কালী অথচ মমতা আছে। অর্থ মর্গলা
শান্তি গরুণা আশ্রয় কিছুই অতাব নেই, তবে আর কষ্ট
কিণের—সবধিক সকলের থাকেনা সেমত কোত করে
লাভ কি! কষ্ট কিণের, কষ্ট নেই। তুল বুঝেছে
সুকোমল, মুহূর্তের ত্রাণি হয়েছিল তার নিজের, এ কষ্ট
নয়। সে সুখী, বেশ শান্তিতে আছে। সাধন যাহুয বা
চায়, কোনটিই অতাব গটেনি তার তিন বছরের নতুন
লোককে, ভালই আছে অনেকের চেয়ে।

মাহুকের সুখ অর্থহীনো যাগাই হয় না বৌদি, বিশেষতঃ
মেরেদের। ধানিকরণ খেয়ে বলে সুকোমল, তুণ কিনা
জিজ্ঞেস কর নিজের নিতৃত অন্তরকে, বাইরে প্রকাশের ওস্ত
কেউ পেড়াপিড়ি করবে না।

তোমার কলোজের ভাষা আমি সব সময় বুঝতে
পারি না।

সহজ করেই বলছি মাহুতাবার, অবস্ত বোঝবার চেই
না কংলে আমি অপারক।

বল হেঁয়ালি করছনা। সন্ধ্যা বুঝেছে যেন সুখাতার
ছদয়।

জীবনটাই একটা প্রকাত হেঁয়ালি বৌদি, চিরন্তন প্রশ্ন
হয়ে নিলে আছে শিরায় শিরায় কোথেকে কোথেকে তার অশান্ত
পর্যবেশ—সবাপান তুমি বুঝে পাওনি। বেরিয়ে যায়
সুকোমল নিশ্চয়।

অজরের পূর্ণাঙ্গ ছবি হেঁয়ালে টাঙান, সাহেবী
পোষাকে অল্প। হাশি পায় সুখাতার, কোন কালে তাকে
গাছেব দেখে বার হতে দেখেনি, ছবি তোলাবার শযে শুখ।
আশ্চর্য সুটোল নথর বাণি কোনখানে এতই বিনুতি
নেই, তবে! মোটা, পেটের পরিধি ক্রমেই পুটলাত
করছে, ঠিক গহিতে-বসা মহাঅনর্থের মত। হোকানে
হেঁয়ালি কোনদিন তাকে।

অজরের অভিজ্ঞত নয় তাকে হোকানে হেঁয়ালি। স্বামী
অল্প, পতি, কে যেন বলেছিল অল্প অম্মাত্তরের—মনে
পড়েছে, বিয়ের মত পড়াবার সময় কালা ভুট্টাভাঙি। অল্প
অল্প মনে বার বার। পৃথিবীতে এলোছে বতবাব ঝাঁড়ু
বতের পাট পেরে বাইরে আসবার অসুখিত পেয়েছে, অল্প
পরে বড় হয়েছ, তুলে পেছে তারপর এত গলায় মালা দিতে
হয়েছে প্রতিবার। অর্থ্যে তারপর আর নেই, তারাই
যুগে এলোছে আবার প্রতি যুগে প্রতি অল্প। চেয়ে থাকে
ছবির বিকে, পোষাক ছাড়া কোথাও কৃত্রিমতার লেশ নেই,
চোঁকাত হাশি পর্যন্ত না। অসুখল্যা হয় সুখাতার,
লোকটি মন্দ না। বছরিন ওর দিড়বিত সুখের দিকে চেয়ে
কষ্টই হয়েছে, অপরাধী অপরাধী তাব! নিজের অতৃপ্তি
ঝেড়ে কেলে শুব হতাপার শাখনা দিয়েছে, নানা কথায়
কোত প্রশমনের প্রয়াস করেছে। কে জানে কার হোষ,
পূর্ণপুস্তকের! বিপরীক বিষয় বার সত্যকে কি এটা অস্বস্ত
গুণন আছে এ-বাড়ীতে, ভাল করে শোনবার আগ্রহ ছিল
না পরচর্চায় ভয়ে। উত্তরাধিকার! বাড়ী বাগান ব্যবসা
ব্যাক ব্যালাল সমস্ত। কি করবে সুখাতা প্রচুর বিত
নিয়ে। নীচের মনোমত বিমল আবির্ভাব এরাই তোলা
করবে, বেশাখোষ আবির্ভাব। ডল পুতুলের মত একটি

নিত—২০০ ইঞ্চি করে। টলতে টলতে খুব বেড়ায়ে,
 লুকাচুড়ি খেলয়ে, হালানো হালানো ছুটোছুটি পেটামিতি
 করে সবদিক ঘুরে বেড়াবে বাঙালী।

কিন্তু না। কোন নবীন অতিথিও গুপ্তাগমে শম্মলমি
হবার আশা নেই। বেনারসী পরে সলাজ শিরলে
শানাইতে পুহরী ব্যক্তিরে চলে যাবার নেই কেউ; বরণ
কবে তুলবেন। কাটিকে কোন আদ্যুতীকে হুজাত। কেন
কেন! না না, এই স্থান। বুক ধোড়া হাতিব মাঝে
ডেকে আনতে চাও না তার কাটিকে, মুখ আছে শান্তি নেই,
ঈশ্বরের মাঝে বিদেহ তপ্তিরীন একপেরে জীবন।

টিক সংগ্রহ করেছে সুকোমল ঠাকুরপো, আমার সখ
সুদ অর্থবিলম্ব।

কি দেখনা, কোথায় অভাব! রোগ শোক নেই ছোটবেলায় আর্থিক অস্টনের লেশমাত্র নেই, হুচিয়ে স্বামী পত্নিনয়ের সংলগ্ন ব্যবহার—স্বাভাব্য নেই কি! বিবিধ কথা মনে পড়ে, জামাইবাবু মন্ডল লোক নন, সাতটি সন্তানের কেয়ানী জনক বতখানি ভাল হতে পারে। দামত বোন অনিবার্য অবস্থা ভাল, স্বামী চিকিৎসা। ভালই আছে সে, কোর নেই দায়িত্ব নেই, দিবা। মোরকে প্রিয় হবে না। সুকোমল ঠাকুরপো ঠিক বলেছে হয়ত, সে নিজে বুঝতে পারেনি এতদিন, কিন্তু উপায় তো নেই। ত্রেপান্তবেব মাঠ পার হয়ে গিটিচুড়ার বন্ধিনী রাজকস্তার গল্প পড়েছিল ভ্রমকথায়, সেও তো রয়েছে পানাপণ্ডীর অঙ্ককারায়। না, অঙ্ককার নয় আলো আছে, সেখানেও ছিল আলো, ঐশ্বর্য অপরিমিত বিলাস, শুধু ছিল না প্রাণ,

আশ্চর্য লাগে, তার কাব্যরসিক কোন বৈভাবাধ,
 জীবনের অন্তত গ্রহরূপে বিগাধ করছে কোন বাহ!
 জানে না, ভাবতে পারে না।

একি পাশ ! চিত্তায় স্থান পেল কেন তবে, ভূমকম্পের
মত উৎস হল কেন এসে ! সর্বাচকল একঝোড়া চোখ
মামনপটে দেখা যায়, এই কি জ্বীনকাটি-বাম্পুত্র, চেহারা
মিল নেই । বাজপুত্র বলা চলে বটে আর একজনকে,
নিটোল ভারী মেরেবের মত আনন, আপোক্তিকের পড়ছে
বুকের হীরে বসান বোতাম থেকে, একাদিক রঙের আঙুলি
ঘাড়ে । কে তাকে উদ্ধার করবে, কে সন্ধান মেবে
অসুস্থের, পান্যপূরীর ধীর উন্মোচন করবার শক্তি আছে
কার ।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ঠাকুরপো, তবুও বলতে
 চেষ্টা করছি। নতুনখী জুজাতার আর কথা ছোটোনা
 বাইবে এসে।

বিধা কি, ভয় কি, তুমি নিজের মন জানতে পারনি,
অকলঙ্ক রেখেছ বহুবেশনা ।

সুকোমল গুহ হাত ডুলে নেয়।

মোট মোটের খায়াব নক ।



আর্থিক প্রসঙ্গ

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

১. খাত পরিস্থিতি :

বিস্তৃত কয়েক বছর ধরে দেশের খাতাবস্থা অত্যন্ত মনোহর ছিল, কিন্তু পরকালে মুখপাত্রেদের বিবৃতি অনুযায়ী এ বছরে অবস্থার কিছু উন্নতি দেখা যায়। পার্শ্বদেশের উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে খাত পরিস্থিতি এ বছর উৎসাহবোধক এবং সবক'র বেশী পরিমাণ খাতবস্ত্র দখলিত ক'রবার ও স্টেট ট্রেডিং এর গভী আওতা সন্তোষজনক ক'রবার ইচ্ছা রাখেন। প্রধান মন্ত্রীও এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন যে এ বছর ঢালের উৎপাদন খুব ভাল হয়েছে, গমের উৎপাদনও ভাল দেখা যায় এবং খাতোৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা শাক্ষ্য অর্জন করেছে। কেন্দ্রীয় খাত মন্ত্রীও বিভিন্ন বক্তৃতায় একথা পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং আরও বলেছেন যে কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভারত বস্ত্রমানে অবস্থাতে বিদেশে খাত রপ্তানী করতে পারে। এ ব্যবস্থাসমূহে হ'ল রূপিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, খাত সংরক্ষণের সুব্যবস্থা, জনসাধারণের খাত গ্রহণের হীতি পরিবর্তন ও অপচয় বন্ধ করা।

দেশের চাষিরা কোটি লোকের চাষিরা মেটাবার পথে, উপরের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও, বিদেশে রপ্তানীযোগ্য খাতবস্ত্র থাকবে কিনা তা সম্বন্ধেই বিষয়। তবে একথা বোঝা যাচ্ছে যে এ বছর খাতবস্ত্রের পরিস্থিতি ভাল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে পরবর্ত্তাহেব অবস্থা ভাল হওয়া সত্ত্বেও খাতমূল্য হ্রাসের কোনই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। খাতের পরবর্ত্তাহ যদি খাতবিক্রী ভাল হয়ে থাকে তবে তাকে 'জাবা' মূল্য সাধারণের ক্রয়যোগ্য ক'রবে ও পরকালের কঠোর নীতি গ্রহণ করা প্রকারণ। পরকাল

স্টেট ট্রেডিং এর মাধ্যমে এ কাজে অগ্রদূত হওয়াই ইচ্ছা রাখেন কিন্তু দেশের হ্রদ পল্লী অঞ্চলের সমস্ত স্টেট ট্রেডিং এর মাধ্যমে সমাধান করা কঠোর সম্ভব হবে তা চিন্তার বিষয়। ব্যবসায়ী ও আত্মসংরক্ষণ যদি অতিদ্রুত মূল্যাকার দোত্রে খাতের ক্রয় অগ্রাহ্যের সূচী ক'রে কিংবা তার মূল্য বৃদ্ধি ক'রে তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। স্টেট ট্রেডিং এর সাহায্যে খাতের পাইকিতরী ব্যবহার পরিচালনা করতে গেলে সংগঠনের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রকারণ : প্রশাসনিক ব্যাপারে কোনরকম নৈপল্য কিংবা দুর্নীতির প্রস্তর খাতের পরবর্ত্তাহে থাকে অত্যন্ত বিশলক্ষনক। তাতে প্রকৃত সমস্তার কিছুমাত্র সমাধান হবে না।

খাত মূল্য বৃদ্ধি হোণ করার সপে সপে খাত সমস্তার আদল বিকটাব প্রতি সমস্ত হিতে হবে। আল খাত পরিস্থিতি কিছুটা ভাল দেখা যায় বলে আমরা যেন নিশ্চেষ্ট না হয়ে পড়ি। খাত সমস্তার সমাধান করতে গেলে আমাদের অপ্রত্যাভাবে খাতোৎপাদন বাড়িয়ে যেতে হবে। বর্ত্তমানে বছরে শতকরা ২০ জন হিগাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। গত লোক সংখ্যা হিসাব অনুযায়ী তখন ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১২.৫ জন। জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানার প্রয়োজনীয়তা কেবল অস্বীকার ক'রবে না। কিন্তু কেবল মাত্র পরিবার পরিকল্পনার দ্বারা খাত সমস্তার সমাধানের বিশেষ কিছু হবে না। ক্রমবর্ধমান জনতার ওস্ত খাতোৎপাদন ক্রমগত বাড়িয়ে যেতে হবে। তার ওস্ত চাই উপযুক্ত পরিকল্পনা, আধুনিক যন্ত্রপাতি, লাব, ভাল বীজ প্রভৃতির পরকালীন

যাথেষ্ট পরিমাণে যোগান এবং উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও ন্যূনতমের মধ্যে সহযোগিতা।

বেশের খাড়াংপাখন হুঁড়ির প্রাপ্তকে সরকার যে গুরুত্ব দিয়েছেন তা জানকের কথা। বার্ষিক আন্দোলনকে জোরপূর্ব্যে করবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকার নতুনকৈ কর্মচারীদেব কাজের সুবিধার ক্ষমতা বৈচিত্র্য পর্দায় ও সময়ের নির্দেশ দিয়ে পুঁজিকা বচনা করতে বশেছেন। এই নির্দেশপুঁজিকা বচনাকালে সম্প্রদায় ও জনবলের কমা অবশ্যই হিশাব করে দেখতে হবে। বার্ষিক শক্ত বলতে প্রধানত ধান, হুঁড়ায়, ভূটা, বজা ও রাগি বোকার। এধের মধ্যে ধানই প্রধান। তাই বার্ষিক আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্যই হবে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

খাড়াংপাখন বাড়্যাবার পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার ক্ষমতা প্রথমে সরকার রাজ্য সরকার নতুনকৈ কৃষি হস্তগুণির পুনবিস্তার। এই পুনবিস্তার দি তাগে কমা মাত্র সে সম্পর্কে কিছুকাল পূর্বে কৃষি প্রশাসনিক কমিটির রিপোর্ট বিশেষ আলোক সম্পাত করে গিয়েছে। এই রিপোর্টের সুপারিশ নতুন বৈচিত্র্য ক্ষেত্রে থেকে প্রশংসা অর্জন করেছিল। আনকের কথা যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার নতুন এই সুপারিশগুলির গুরুত্ব স্বীকার করেছেন ও তাগেব কার্যে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করেছেন। নয়া দিল্লীতে গত কয়েক মাস ধরে রাজ্য সরকার নতুনকৈ ১৯৫২-৫৩ সালের পরিকল্পনার গ্রুপ আলোচনাতে প্রত্যেক রাজ্য সরকার এই রিপোর্টকে কার্যকরী করবার ক্ষমতা যাগেটে কিছু ব্যয় বরাদ্দ করেছেন।

রাজ্য সরকার নতুনকৈ কৃষি মন্ত্রীর নয়া দিল্লী বৈঠকে তিনটি প্রস্তাব উপাধান করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে আপানী বার্ষিক বসন্তে বেশের সর্বত্র খাড়াংপাখন হুঁড়ির আন্দোলন চালাতে হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বেশে বসন্তে পরিমাণ সাবোংপাখন না হওয়া পর্দায় কেন্দ্রীয় সরকার বেশের ক্রম-বর্ধমান সাবের চাষিরা মেটাবার ক্ষমতা বিশেষ থেকে আমদানী করবার বসন্তবস্ত করবেন। আর তৃতীয় প্রস্তাবটি হচ্ছে সমস্তাগুলির সমস্ত দিক বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার উৎপাদকেবা যাতে তাগেব উৎপন্ন ক্ষমতার ক্ষমতা মূল্য

গেতে পাগে তার ব্যবস্থা করেবে।

তৃতীয় পক্ষ বার্ষিকী পরিকল্পনা বচনাত প্রত্যন্ত চলছে।

ভারত সরকার তৃতীয় পরিকল্পনাকালের শেষে বেশের খাড়াংপাখনকে বিগুণিত করবার ইচ্ছা রাখেন। এ প্রস্তাবে সকলেই আনন্দিত হবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার ক্ষমতা যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকার অর্থাৎ ভূমিগব্যবস্থার ক্ষমতার আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ, ভাল সাব ও বীজের ব্যবস্থা, শক্ত সবেক্ষণের ব্যয়স্থা এবং কমিতে উৎপন্ন ফলের ক্ষমতা মূল্য দিয়ে চাষীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন প্রত্যন্ত করতে না পারলে উদ্দেশ্য বস্ত মহত্বই হোক না কেন তাতে কোন লাভ হবে না।

২. বস্তের রপ্তানী

বিশেষে যে সব জিনিষ রপ্তানী করে ভারত বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করে—বস্ত তার মধ্যে অন্ততম। কিন্তু শস্যের বিষয় এই যে গত বৎসর বস্তের রপ্তানী অস্বাভাবিক কম হয়েছে। ১৯৫১ সালে বস্তের রপ্তানী যেখানে ৭৮ কোটি ৮৩ লক্ষ গম ছিল সেখানে ১৯৫৮ সালে হয়েছে মাত্র ৬০ কোটি গম অর্থাৎ ১৯৫১ সালের তুলনায় শতকরা ২৪ ভাগ কম। বস্তের রপ্তানীর এই অস্বাভাবিক অবস্থা বর্তমান বছর তো বটেই আপানী বছরগুলিতেও এই রকম থাকতে বাধ্য, যদি নাকি বস্ত কলগুলিকে প্রতিবন্ধিতা করবার মত হয়ে খাড়াংপাখন করবার ক্ষমতা যথাপূর্ণ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয়।

যে সব বেশ পূর্বে বস্ত আমদানী করত সেখানে ক্রমে ক্রমে বস্ত শিল্প গড়ে উঠতে থাকায়, আন্তর্জাতিক বাজারে বস্তের রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে বস্তের রপ্তানীতে প্রতিযোগিতাও অন্ত্যস্ত কট্টন হয়ে পড়ছে। চীন বেশ এখন বস্ত রপ্তানীতে একটি প্রতিযোগী হয়ে পাড়িয়েছে। যে সব বেশ পূর্বে ভারত বিংশ অন্ত্যস্ত বেশ থেকে বস্ত আমদানী করত, তার মধ্যে কয়েকটি এখন চীন-বেশ থেকে বস্ত আমদানী করছে। শোনা যায় চীন নাকি অন্ত্যস্ত বেশ যে ধরে বস্ত রপ্তানী করতে চায় তা থেকে শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ কম ধরে বস্ত রপ্তানী করছে। এ ছাড়া আপানীর সত্য

যেমনও বহু-শিল্প রপ্তানীর পথে বাধার সৃষ্টি করছে। এর উপর কোন কোন দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের বাটতির ক্ষয় বহুর আমদানীতে কড়া কড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ পূর্ব আফ্রিকা ও সুরিনামের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

এ অবস্থায় ভারত কিভাবে তার পূর্বতম বাজার পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং আরও নতুন বাজার অধিকার করতে পারে, এ প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্ব দায়ক করে। ভারতীয় বহু-কল উন্নয়নসমূহের কমিটি সভা সমিতিগুলিকে ও তাঁদের মাধ্যমে সমস্ত বহু-কলগুলিকে বহুর রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য আগ্রহ চেষ্টা করতে বলেছে। বহু রপ্তানীতে যে সব অসুবিধা আছে তা কমিটি স্বীকার করে নিয়ে এসেছে, যে বহু রপ্তানীর প্রায় একটি শক্তি পরীক্ষার প্রশ্ন এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক হিসাবে ভারতের এই শক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া উচিত।

কমিটির প্রস্তাব উত্তম কিন্তু বহুরপ্তানী বৃদ্ধি করতে গেলে এবং বিশ্বের বাজারে স্থান দখল করতে ইচ্ছা করলে প্রথমেই বহুরকার অঙ্গ খরচে বহুরোৎপাদনের ব্যবস্থা করা।

আমাদের দেশে বহুরোৎপাদনের খরচ বেশী হওয়ার কারণ প্রধানতঃ অত্যন্ত পুরাতন কল-সম্পদ সাহায্যে উৎপাদনের কল চালানো হয়, অল্প অল্পাংশ দেশ আধুনিক বহুর-প্যাকার সাহায্যে অনেক কম খরচে বহুরোৎপাদন করে। দ্বিতীয়তঃ পুরাতন পদ্ধতিতে বহুরোৎপাদন হওয়ার মাধ্য-পিত্ত মজুরদের উৎপাদনও কম হয় অথচ শ্রমিকদের টাকাকড়ি দিতে হয় অনেক বেশী। উৎপাদন খরচের শতকরা ৩০ থেকে ৩২ ভাগ শ্রমিকদের আইন হিসাবে দিতে হয়। কাজেই আমাদের দেশের বহুর-কলগুলির পুরাতন কল-সম্পদ বাদ দিতে তার কাছপায় নতুন কল-করা ও মাল-সংগ্রহাদ যদিও আধুনিক পদ্ধতিতে বহুরোৎপাদনের ব্যবস্থা করা বহুরকার। বহু শিল্পের আধুনিকীকরণ ও পুনর্বিভাগ সাধন করলে বহুরোৎপাদনের খরচ অনেক কম পড়বে এবং বিশেষ বহুর-প্যাকার বৃদ্ধি করাও সম্ভব হবে।

রপ্তানী বৃদ্ধির প্রশ্নে আর একটি কথাও চিন্তা করা বহুরকার। তা হচ্ছে মিহি কাপড়ের রপ্তানী বৃদ্ধির কথা। বিশেষ ভারত যে সব কাপড় বিক্রি করে তা প্রধানতঃ ঘোটা কিংবা মধ্যম প্রকারের। বিশেষ মিহি কাপড়ের চাহিদা বাড়ানোর জন্যও প্রচেষ্টা চালানো বহুরকার।





॥ ডক্টর জয়াকর ॥

গত ১০ই মার্চ রাত্রি এগারোটার প্রাক্তন উদাহরণী নেতা, পূনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস্ চ্যান্সেলর মুহুৎ রামচাঁদ ভট্টাকর মাল্যাবার পাহাড়ে তাঁর বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. বিলেত থেকে ব্যাবিট্রারি পাস করে' এসে বোম্বাই হাইকোর্টে প্র্যাক্টিস্ আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর বেশ পসার হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাম্বাইতে ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। বোম্বাই আইন-সভায় স্বাক্ষর দেবার, তথা বিবোথী পক্ষের নেতা হিসাবে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন। ১৯৩৭-এ তিনি ভারতের একতাবাল কোর্টের অন্ততন বিচারপতি নিযুক্ত হ'ন। প্রিভি-কাউন্সিলের বিচারক-সমিতিতেও তিনি স্থান পেয়েছিলেন। তাঁর 'আন্তর্জাতিক' এদেশের বাহ্যনৈতিক ইতিহাসের বিক থেকে 'কৌতুহলজনক। প্রধান কর্তব্যেরে ধীবনাবলান যথেষ্ট গিয়েছে অনেক উজ্জল স্থিতি।

॥ কেমব্রীজ বাজেট ॥

অর্থমন্ত্রী শ্রীমুখ মোহরাজি বেশাই উপস্থাপিত বাজেট নৈরাশ্রজনক বা খুব চাকল্যকরও হয়নি। নূতন প্রত্যাক কর বসেনি। কতকগুলি পণ্যের উপর শুদ্ধ বৃদ্ধির প্রস্তাব হয়েছে। এ বাজেট ব্যবসায়ী মণ্ডলে মোটের উপর সমর্থন পেয়েছে, কিন্তু বিবোথী বেলের কেউ কেউ তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। আগাধী কৃপালনী বিশেষ ক'রে সরকারী অপচয়ের এবং কংজার বৃদ্ধির নিশা করছেন। তিনি বলেন, ষাটতি-অর্থ-সংস্থান নির্ধারিত গীষা অতিক্রম করে চলেছে, ফলে ষট্টে মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধি। সাধারণের দুর্গতি বাড়ছে। এরিকে বড় বড় পরিকল্পনা-গুলিতে অব্যবস্থা এবং অনাযুক্তার দক্ষণ প্রচুর অপব্যয়

হয়েছে এবং হচ্ছে। ভারী সত্যমুখের আখ্যান দিয়ে আকর্কের ভারতবাসীর উপর অসহনীয় কষ্টের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার কর্তব্য হয়নি। পরিকল্পনার ব্যয় বেড়ে চলেছে, অথচ দেশের অভাব অভিযোগের লাঘব হ'চ্ছেনা দেখলে জনসাধারণ আখ্যান-বাক্যে আস্থা স্থাপন করবে কি ক'রে?

বস্তুতঃ সমালোচকগণও পরিকল্পনা-বিবোথী মন, তাঁদের লাভি পরিকল্পনার স্রষ্টা পরিচালনা আত্র, এবারে বাজেটে প্রস্তাবিত পত্রোক কবের চাপ, তাঁদের মতে, পড়বে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে। শ্রীমুখ বেশাই বাজেটের সমর্থন করে বলেছেন : বর্তমানের এই সঙ্কটকালে আবাহ্যেই হয়তো কিছু সাময়িক অসুবিধা সহ করতে হবে; তা বলে উন্নতি প্রচেষ্টার ক্ষান্ত হওয়া চলবেনা। দ্রুতবতম সংকটকাল আশা করি, আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি।

॥ পাকিস্তানি আক্রমণ ॥

মুশিবাবদ জেলাব চরবালা নগরের উপর পাকিস্তানী সেনাগুলি কিছুদিন খেতে অবিরাম শুধী বর্ষণ করে চলেছে। মলীয়াতেও কয়েকবার গোলাবর্ষণের কথা ইতিপূর্বে শোনা গিয়েছে। শুবিকের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের যতবার আলোচনা আলোচনা ও অনাক্রমণ-চুক্তি হ'লো ততবারই দেখাশোনা, পাকিস্তান চুক্তি ভগ্ন করতে ফেরি করলোনা। আমেরিকান অত্র সে ভারতের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিতো ব্যবহার করে চলেছে। যদিও ভারতস্থিত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বলেছেন, তাঁদের প্রায়ই অত্র ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা চলবেনা এবং পাকিস্তানের সঙ্গে পারমাণবিক সাহায্যচুক্তিতে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য করার কোন প্রতিক্রিয়া নেই, তবু পাকিস্তানের আচরণে ভারত নিশ্চয় হ'তে পারছেন। দম্প্রতি পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী এক বক্তৃতায় খোলাসা করে

বলেছেন, মাকিশ রাষ্ট্রদূত বাই বন্স, ওটা মাকিশ সরকারের কথা নয়; বস্তুতঃ সাহায্যচুক্তিতে ভারতকে বাধা দিয়ে চলবার কোন উদ্দেশ্য নেই।

এ বিষয়ে পণ্ডিত নেহরু বলেছেন, প্রতিরক্ষার তার শুধু সীমাত পুলিসের উপর না রেখে ঘটনামূলে সেনাবল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়েছে।

॥ সীমার আটক ॥

৩রা মার্চ শিলঙের খবরঃ ২২শে ফেব্রুয়ারি থেকে, কলকাতা থেকে আশামের করিমগঞ্জ ও শিলচরযাত্রী সব সীমার ও নৌকো পূর্ব পাকিস্তানের জিহাদী—কচুগঞ্জ আটক করা হয়েছে। সীমারে নৌকায় মোট ৪২ খানা এ পর্যন্ত আটক হয়েছে। আশাম সরকার পূর্বপাকিস্তান সরকারের কাছে প্রতিবার জানিয়েছেন।

সকল একাধারে শত্রুতা-মাফনের মনোবৃত্তি অঙ্কণ পাকিস্তান সরকারী মহলে প্রবল। অথচ এ শত্রুতা যে কেবল ভারতের ক্ষতি করবে না, পাকিস্তানকেও বিপর্যয় করবে, সে চেতনা কবে আগবে জানিবে। উত্তর রাষ্ট্রের জনপদ ছুঃস্থ, দুর্গত। কংড়া বিবাহে অর্ধ ও সামর্থ্যের অপচয় না করে ভারতের উন্নতির জন্য গঠন কর্ণে আত্ম-নিয়োগ করলে এতদিনে উভয়েই আত্ম এপোতে পারতাম। এক পক্ষের অবিবাহিত ছমকি ও অক্রমণ অপর পক্ষকে প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়িতে বাধ্য করছে এবং গঠন কার্ণে বাধা দিচ্ছে। বস্তুতঃ পাকিস্তানের যা মতিগতি, তাতে ভারতের আরও কঠোরতা-অবলম্বন অবশ্যক, একথা সকলে অস্বত্বণ করছেন।

॥ মুহূর্তকণ্ড ॥

চোরাই চালানো কারবারের অপরাধে শাহুল সিং নামে একজন ভারতীয় শিখ পাকিস্তান সামরিক আইন অঙ্গুদারে

মুহূর্তকণ্ডে বন্ডিত হয়েছে। পাকিস্তান-বন্ডিত ভারতীয় মাই কমিশনার মানসার বিবরণ জানতে চেয়েছেন এবং তৎসম্পর্কে মুহূর্তকণ্ডে হুগত রাখতে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে অস্বঃবাধ করেছে।

অবশ্য বিবৃত্ত বিবরণ জানিবে জানিবে। তা হলেও মনে হয় অপরাধের জুলনার শাস্তি শুভ্রতর হয়েছে। চোরাই চালানোর জন্য মুহূর্তকণ্ডে দেবার রীতি আধুনিক অন্য কোনও দেশে আছে বলে মনে হয় না। আর সম্বোধনী মূলমন্ত্রনিয়িত যেখানে সাত খংসব কারাবন্ড, সেখানে শাহুল সিংএর মুহূর্তকণ্ড—এ ব্যাপারটাও মনে সংশয় আগ্রহ, রাষ্ট্র এবং বর্ধের পার্শ্বকই হওঁতে পার্শ্বকোর কারণ হয়তো ?

॥ কংগ্রেসের কথা ॥

এবারে জিন্নাতী ইন্দিরা গান্ধি সর্বদলসংক্রমণ কংগ্রেস সভাপতি পং নির্বাচিত হয়েছেন, তাতে সকলেই সুখী হয়েছেন। তাঁর যোগ্যতা, আন্তরিকতা এবং সনিষ্ठा সম্পর্কে কারও সন্দেহ নেই। বর্তমানে কংগ্রেস পরিচালনা এক দিক্ থেকে সহজ, অন্য দিক্ থেকে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সহজ এই হিসাবে, যে, বিশেষ শক্তির সঙ্গে সংগ্রামের প্রয়োজন বেশ হয়েছে। আর কঠিন এই কারণে যে, সংগ্রামের দিনে দেশবাসীর উৎসাহ উদ্যোগ হ'তো আল তা অত্বিত; উপরন্তু কংগ্রেস রাষ্ট্র-শাসনভার গ্রহণ করার সরকারী এলাকার বাইরে কর্মক্ষেত্র অনেকটা সীমাবদ্ধ; সরকারের হোদেব ভাগী কংগ্রেস, কিন্তু ভগেব ভাগী ততটা নয়, গঠনকর্মে বেশক উচ্ছ্ব ক'রে তোলা আল তার প্রগাম কর্ণা, কিন্তু স্বাধীনতার মন্ত্রপ্রচার আপেক্ষা এ কাল অনেক ছুঃসাধ্য ও ধৈর্যপালক।

আমরা আশা করবো, কংগ্রেস তার শৈথিল্য এবং আন্তরিক হৃৎলতা পরিহার করে দলপাণ ও সন্তোজ হয়ে উঠবে।

বিপ্লবের পদচিহ্ন

৪০০

[বিপ্লব যুগের উজ্জ্বল ইতিহাস]

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

বিভিন্ন সংবাদপত্রের মতামত

"Amrita Bazar Patrika".

—“This is a graphic and intimate account of the revolutionary movement in Bengal when the Bengalee youths rose in revolt against the mighty British Raj. The full story of the movement is still to be unfolded in all its glory. From the very few accounts which have made their appearance uptil now the hearts of Bengalees are filled with pride. Freedom-loving people all over the world will also cherish these accounts as priceless contributions of a nation in revolt against an alien and tyrannical rule.....”

—“Those who want to know about the immortal youths of Bengal in all their glory and of whom Rabindranath sang and gave adequate expression will do well to go through this book. This book will also help future historians who may undertake the task of writing a full and authentic account of Bengal's revolutionary movement. We know how the Bengalee youths, forgetful of their personal safety and promises of earthly riches mounted gallows in such a cheerful way that even their executioners were surprised. We should know the history of this period of Bengal.”

“দেশ”

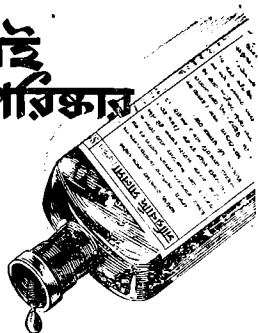
—“শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত বাঙালার বিপ্লবী সংঘ ‘বুপাঙ্গর’ পার্টির অঙ্গতম গুপ্ত। ‘বকসা ক্যাম্প’ নামক গ্রন্থে তাঁহার এইরূপ একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র-পরিচয়ের দাফাৎ পাওয়া যায়,—“যে সময়জন ব্যক্তির পড়াশুনা খুব বেশী বলিয়া বেলে খ্যাতি ছিল, ভূপেনবাবু তাঁহারই একজন। ভূপেনবাবু ছাত্র হিসাবে খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন, ইংরেজী ভালো দিখিতে পারেন বলিয়া বন্ডমরগে বন্দিত। তেজ, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের সম্মিশ্রণে ভূপেনবাবুর যে চরিত্র গঠিত হইয়াছে, তাহাতে অন্যায়ের বিপ্লব আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন। এই শক্তিময় পুরুষ ভবিষ্যতে দেশের স্বাধীনতাতে কি অংশ গ্রহণ করিবেন, বকসা ক্যাম্পে সম্ভাব্য এই কথা আনার মনে আগ্রহ হইয়াছে। ‘বিপ্লবের পদচিহ্ন’ তাঁহারই জেলকীবন্দের কাহিনী। ইহা নিছক তাঁহার আত্মজীবনী নহে, ইহাকে বাঙালার বিপ্লব যুগেরও কাহিনী বা ইতিহাস বলা চলে।”

—“গ্রন্থে স্তম্ভাভ্যন্তর, বাহ্যোগোপাল বুপোগোপাল, অরুণ শুভ গ্রন্থক বিপ্লবী নেতাদের সাতখানি ফটো মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙালার বিপ্লবের অবিনাশক বতীন বুপাঙ্গির ‘দেহাবদান’-এর (বালেশ্বরে) যে অগ্রকাশিত ফটোখানি গ্রন্থে অগ্রকাশিত হইয়াছে, তাহা গ্রন্থের মর্যাদা ও গৌরবেই বৃদ্ধি করে নাই, ইহা বাঙালার একটি অবিমর্যবীয় সম্পদরূপে গ্রন্থের হান বলিয়া বিবেচিত হইবে। শুধু এই ফটোখানির জন্তই ভূপেনবাবুকে বাঙালীর জনসাধারণ সন্তুষ্ট ও ধন্যবাদ জানাইবে। ‘বিপ্লবের পদচিহ্ন’ শুধু গ্রন্থকারকেই নহে গ্রন্থে বর্ণিত বহু বিপ্লবীদেরই অমরীয় করিয়া রাখিবে। ইহাযেব প্রাণহানি ও সংগ্রামে দেশের স্বাধীনতার প্রথম ভিত্তি রচিত হইয়াছে, তাঁহারই কাহিনী এই ‘বিপ্লবের পদচিহ্ন’ এবং বাঙালীর বুকে এই পদচিহ্ন যতদিন অরান ও স্মৃতি বহিবে, ততদিন বাঙালীর মৃত্যু নাই—ইহাই হইল গ্রন্থের মর্যাদা।”

সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা-১

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে অসুখে কোষের সহযোগে শরীর
ও মস্তিষ্ক গঠিত হয়, রক্ত প্রবাহের
মাধ্যমেই তারা পুষ্টিপাত করে; তাই
রক্তকে প্রাণরক্তের প্রধান উপাদানে
বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত
হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতই বিবিধ
কঠিন ব্যাধির আক্রমণে জীবন চুঁচি-
বহু চলে ওঠে।



সংক্রামক সংক্রান্ত রোগ প্রতি রক্তের
দ্রবত্ব হ্রাসের কারণে সংক্রমণের
বল। রক্তের অপ্রতিরোধ্যতা পালিশ।
সংক্রামক সংক্রান্ত রোগের অন্যতম
কেন্দ্র পালিশ। তাই, রক্ত, পালিশ,
রক্ত রক্ত, রক্তের অপ্রতিরোধ্যতা
চলবে, রক্ত ও রক্তের অপ্রতিরোধ্যতা
সংক্রামক সংক্রান্ত রোগের
কেন্দ্র হ্রাসের কারণে, রক্তের অপ্রতিরোধ্যতা
সংক্রামক সংক্রান্ত রোগের
কেন্দ্র হ্রাসের কারণে, রক্তের অপ্রতিরোধ্যতা

সারিষাদি সালসা

চর্মরোগের রক্ত পরিষ্কারক ঔষধ



অধ্যাপক ডাঃ বরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,
অধ্যাপক (পাঠ্য), এম-বি-এস (পদ),
এম-বি-এস (মহাবিদ্যালয়), ডাবলপু
কলেজের প্রাথমিক চিকিৎসা
অধ্যাপক।

কলিকাতা-কেন্দ্র—ডাঃ বরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ,
এম-বি (কলি); অধ্যাপক-আচার্য।
৩৬ নং গ্যোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

সাধনা ওষধালয় ঢাকা

স্বাধা ও ঔষধ-পুষ্টি-সর্বত্র

স্বাস্থ্যের সমুচ্ছল দীপ্তি

হয় শরীর, স্বাস্থ্য-ভরা মন ও অকুণ্ঠ
উৎসাহ থাকলেই জীবিকার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।
এতলে আগে পুষ্টির আহ্বার থেকে।
হৃদয় পুষ্টির আহ্বারের মধ্যে স্নেহমাতী
সম্পর্ক একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ—এতে
ভিটামিন পরিপাকের সহায়তা হয় আর
অকুণ্ঠ শক্তি পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রেই
হুম্যান বনস্পতি আপনার পক্ষে ভালো। প্রতি
আউন্স হুম্যান বনস্পতিতে ১০০ ইন্টারক্র্যাশনাল
ইউনিট ভিটামিন 'এ' ও ৫৬ ইন্টারক্র্যাশনাল
ইউনিট ভিটামিন 'ডি' রয়েছে। তাই, স্বাস্থ্য ও
পুষ্টির হুম্যান বনস্পতি নিয়ে রান্না করলে
আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে সে-খাবার রক্ষাকবচের
কাজ করবে।



হুম্যান বনস্পতি

'এ' এবং 'ডি' ভিটামিন দ্বারা সমৃদ্ধ
বৈজ্ঞানিক উপায়ে আপনার সুবিধার ভিত্তি
২ পাঃ, ৫ পাঃ, ১০ পাঃ এবং ৫৬ পাঃ
টিনে প্যাক করা।



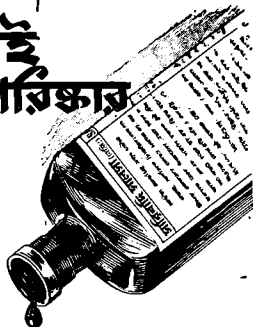
রোচাস ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ

ডালমিয়ানগর, বিহার

স্বাস্থ্যের
উৎসাহ

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে শরীর
ও মস্তিষ্ক গঠিত হয়, রক্ত প্রবাহের
মাধ্যমেই তারা পুষ্টিলাভ করে; তাই
রক্তকে প্রাণরক্ষার প্রধান উপাদান
বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত
হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতই বিবিধ
কঠিন ব্যাধির আক্রমণে জীবন হুমকি-
গ্রস্ত হয়ে ওঠে।



সর্বাধিক সাধারণ প্রায় অর্ধ শতাব্দী
যাবত জগৎব্যপে সর্বত্র সর্বশ্রেষ্ঠ
রক্ত বিশোধক মর্মেদগুণে প্রসিদ্ধ।
সার্সাপারিলা সর্বত্র সেখানে বিখ্যাত
করে রক্তের বিষ, খেঁস, পিঁচড়া,
গুঁঠ ফুঁ, একচেঁয়া প্রভৃতি সর্বাধিক
চর্মরোগ, হাত ও পায়ের লোঁচা
সংক্রমণজনিত সমস্ত কঠিন রোগ
সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, পিঁচারের জিয়া
স্বাভাবিক হয়, মুখা শুষ্ক পায় এবং
শরীরে প্রচুর বিত্তম নূতন রক্ত
সঞ্চারিত হয়।

সার্সাপারিলা সালসা

ওর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক ঔষধ



মধ্যম প্রীতবেশমল বোম্বে, এম-ও,
আই-সি-এলসী, এক-সি-এল (সিওস),
এক-সি-এল (আমেরিকা), তাংগপু
কোম্পানী লিমিটেড বঙ্গদেশের কলিকতা
অফিস।

কলিকতা - কেম্স - ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম-বি (কলিঃ), অধ্যাপক-আচার্য।
৩৬ নং গোয়ালপাড়ী বোম্বে, কলিকতা-৩৭

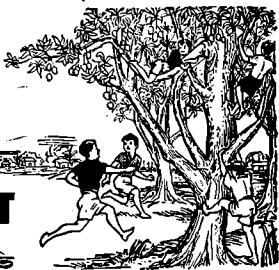
সাধনা
ওষধালয়
ঢাকা

শাখা ও এককো-পুণিবীর মর্মেদ

আপনার
রক্তনোপকরণে
যে সুস্থি
চান

হনুমান

বনস্পতি



সাত জের টেবুলেট

'এ' এক 'ডি' ভিটামিন দ্বারা সমৃদ্ধ

বৈজ্ঞানিক উপায়ে
অংশের সুবিধায় ৭৫
৪ পাঃ এবং ১০ পাঃ টিবে
প্যাক করা। ৩৬ পাঃ টিবেও
পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক
বোম্বে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লিমিটেড

ভাদ্রবিহানগর, বিহার

সুখাদ্যই সুখ ও

স্বাস্থ্যের উপাদান

(P. ৫৮৮ ২/৪)